নির্বাচিত বুলবুল

নির্বাচিত বুলবুল

সম্পাদকমণ্ডলী

আনিসুজ্জামান আবদুর রাউফ

বুলবুল পাবলিশিং হাউস • বিশ্বকোষ পরিষদ

স্বত্ব
ইকবাল বাহার চৌধুরী
নাসরীন শাম্‌স

বুলবুল প্রকাশ কাল
১৩৪০-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ
নির্বাচিত বুলবুল
প্রথম প্রকাশ
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৭

প্রকাশক
নাসরীন শাম্‌স
বুলবুল পাবলিশিং হাউস
১০ ইস্কাটান গার্ডেন রোড
ঢাকা, বাংলাদেশ
সোমনাথ দত্ত
বিশ্বকোষ পরিষদ
২১৬, বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা-৭০০০০৬
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বর্ণস্থাপনা
নীলাদ্রি সেনগুপ্ত
সামওয়ান
১২২/১বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মুদ্রক
বেঙ্গল লোকমত প্রেস
১১বি, ক্রীক লেন, কলকাতা

(বছরে তিন বার)

সম্পাদক:

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বি-এ

শামসুন্ নাহার বি-এ

সম্পাদক

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্, বি-এ

শামসুন্ নাহার, বি-এ

বার্ষিক ১॥০, প্রতি সংখ্যা ॥০

এই সংখ্যার লেখকগণ ঃ

কবি নজরুল ইসলাম

কাজী আবদুল ওদুদ, এম্-এ.

আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ

কবি জসীম উদ্দীন, এম্-এ

আবুল হোসেন, এম্-এ, এম্-এল্

ডক্টর কুদরত-ই-খোদা, পি-আর-এস্

আদেলা খানম

মুজীবর রহমান খাঁ, বি-এ.

আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ বি-এল

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, বি-এ

মাহ্‌বুব উল্-আলম

অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম এম্-এ

অধ্যাপক কাজেম উদ্দীন এম্-এ

সাদ্‌ত আলী আখন্দ, বি-এ.

কাজী আনোয়ার-উল-কাদির এম্-এ.

শামসুন নাহার বি-এ.

বুলবুল

(বছরে তিন বার)

বৈশাখ—শ্রাবণ, ১৩৪০

প্রথম বর্ষ ১৩৪০

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

নির্বাচিত বুলবুল-র সূচিপত্র ৭২৯-৭৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বুলবুল

গান

নজরুল ইসলাম

পিলু মিশ্র—রূপক

পাষাণ গিরির বাঁধন টুটে
নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়,
ডাকছে উদার নীল পারাবার
আয় তটিনী আয় নেমে আয়।
বেলা-ভূমে আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে সাগর তোরি তরে
তরঙ্গেরি নূপুর প'রে
জল তটিনী আয় নেমে আয়॥

দুই ধারে তোর জল ছিটিয়ে
ফুল ফুটিয়ে আয় নেমে আয়,
শ্যামল তৃণে চঞ্চল অঞ্চল লুটিয়ে
আয় নেমে আয়।
ডাগর যে তোর চোখের চাওয়ায়
সাগর জলে জোয়ার জাগায়
সেই নয়নের স্বপন দিয়ে
বন্-হরিণী আয় নেমে আয়॥

যুগের মন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

জিজ্ঞাসা মানুষের মনের কোনো নূতন অবলম্বন নয়। সংস্কার, বিশ্বাস এবং এদের পৃষ্ঠপোষক শাসন মানুষের মনকে বশীভূত করেছে বিবিধ আয়োজন-অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মম রাজদণ্ড উঁচিয়ে। কিন্তু একেই সে চরম পরিতৃপ্তি জ্ঞান ক'রে খুশী থাকেনি। প্রহরীর হাতে মার খেয়েছে, মারের চাইতেও ভীষণতর সম্ভাবনাকে মাথা পেতে নিয়েছে; তবু প্রাচীরের বাইরেকার অজানা অচেনার জন্যে তার ভিতরের গুমরে-ওঠা কান্নাকে সে থামাতে পারেনি। গোষ্ঠীপতির শাসন, দলপতির শাসন, মণ্ডলীর শাসন এবং সংস্কার ও বিশ্বাসজাত রাষ্ট্রকেন্দ্রের শাসন, এদের কাছে বাইরে বাইরে সে হার মেনেছে; কিন্তু তবু তার ক্ষতজর্জ্জরিত পক্ষপুট বাড়িয়েছে অজানা অমৃতের সন্ধানে। মানব-মনের চিরকালের এই অতৃপ্তিকে আশ্রয় ক'রে মানুষ অনেক ধাপ উঠে এসেছে সভ্যতার বিচিত্র সোপানে।

আদিম যুগ থেকে মধ্যযুগ, এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের বিকাশের ধারায় মানব-মনের এই তৃষ্ণার পরিচয়। আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় করতো,পূজা করতো; প্রকৃতির শক্তির বিচিত্র রূপ কল্পনা ক'রে তার মূর্ত্তি গ'ড়ে প্রতিষ্ঠা করতো; আর এই শক্তিমতীর নামে গোষ্ঠীপতি বা দলপতির শাসন মেনে চলতো। কিন্তু চিরদিন এতেই সে খুশী রইল না। এই আদিম সংস্কার ও শাসনের বাইরে তার মন অনেক বাধা, অনেক দণ্ড, অনেক সংশয় অতিক্রম ক'রে চলে এল।

এই থেকে হ'ল মধ্যযুগের শুরু। এ-যুগে মানুষ প্রকৃতি-শক্তির সঙ্গে নিজ শক্তির বিরুদ্ধতা বড় ক'রে দেখ্‌লে; আর সেই বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে আশ্রয় খুঁজলো আর এক অজানা মহাশক্তির কাছে। সে - মহাশক্তি প্রকৃতির চাইতেও শক্তিমান; এমন কি, প্রকৃতি যেন তারই হাতে-গড়া সৃষ্টি। এই শক্তির নামেও অনেক সংস্কার, অনেক বিশ্বাস মানুষের উপর তাদের দোর্দণ্ড-শাসন চালালে। শেষে দেখা গেল : মানুষ আশ্রয় ভিক্ষা কত্তে এসে বন্দী হয়েছে, তার ভিক্ষার ঝুলি ভ'রে উঠেছে রিক্ততার কলঙ্কে।

এ-কলঙ্ক ঘোচাতে মানুষকে কঠিন সাধনা কত্তে হ'ল। তার দীর্ঘ ইতিহাস অনেক দ্বন্দ্ব-কলহের দুন্দুভি-নাদে শব্দায়িত, অনেক হিংস্র নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত, অনেক শহীদের নিরীহ রক্তে রঞ্জিত।

তবু শেষে মানুষের তৃষাতুর মনেরই জয় হ'ল, তার জিজ্ঞাসাই তাকে বন্দীশালার বাইরের আলোকে এনে দিলে। অজানা মহাশক্তির নামে শাসনটাই শুধু সত্য হয়েছিল, তার নাগপাশ থেকে মুক্তি হ'ল। এই হ'ল আধুনিক নূতন যুগের শুরু।

এ-যুগে মানুষ জ্ঞানাতীত মহাশক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকালে; কিন্তু এবারে তার দৃষ্টি একেবারে নূতন। আদিম যুগের ভীতিবিহ্বলতা বা পূজাপ্রবৃত্তি তাতে নেই; মধ্যযুগের বিরুদ্ধতা বা নিঃসহায়তাও নেই। এবারে প্রকৃতির সঙ্গে সে আত্মীয়তা স্থাপন কত্তে চাইলে। তাই তাকে জানবার ও বুঝবার আয়োজন তাকে কত্তে হ'ল। বর্ত্তমান যুগ বিশেষ ক'রে এই আয়োজনের যুগ।

প্রকৃতিকে জানবার ও বুঝবার আয়োজন, এই-ই বিজ্ঞানের সাধনা। বর্ত্তমান যুগের মনকে বুঝ্‌তে হ'লে বিজ্ঞানের এই সাধনাকে বুঝ্‌তে হবে; কেননা পথিকের সত্য পরিচয় তার পথের পরিচয়ে।

কিন্তু মুশ্‌কিল হল এই, যে, আমরা—প্রাচ্যবাসীরা বিজ্ঞানের সাধনাকে সন্দেহ ও অপ্রীতির চক্ষে দেখে থাকি, যদিও এর প্রয়োজন অস্বীকার করবার অমর্য্যাদা বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকতায় আমাদের পক্ষে যার-পর-নাই লজ্জাদায়ক। অর্থাৎ যে-মন আমাদের জীবনের চারিদিকে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার অনিবার্য্যতা আমরা বুঝ্‌তে পারলেও তাকে স্বীকার কত্তে আমরা কুণ্ঠিত। এইজন্যে তার পথকে কলঙ্কিত ক'রে দেখার চেষ্টা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচ্যের সব-চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা এইখানে। এই দুর্ব্বলতার জন্যে তার চরণ হয়েছে পঙ্গু, হাত হয়েছে অসাড়, দৃষ্টি হয়েছে মলিন। সে- দৃষ্টির সামনে শাখান্তরালের জ্যোৎস্না রূপ নিয়েছে এক শ্বেতবসন প্রেতমূর্ত্তির।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানের সাধনা আমাদের চোখে তার সত্য রূপে দেখা দেয়নি। ভোগ আমাদের কাছে এতো নিন্দার তার প্রধান কারণ ভোগ আমরা করিনি; যা ক'রেছি সে হ'ল উপভোগ। পরিপূর্ণরূপে জানা ও বোঝা-ই হচ্ছে সত্যি ক'রে পাওয়া, আর সত্যি ক'রে পাওয়ার নামই ভোগ। আমাদের কাছে ভোগ হ'ল বিলাসিতা, যা অত্যন্ত অসত্য ক'রে পাওয়ারই নামান্তর; অর্থাৎ আসলে সেটা উপভোগ ছাড়া আর কিছু নয়। উপভোগ মানুষের জীবনে সত্যিকার সুষমা ফোটাতে পারে না; তার কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সমচ্ছন্দতা সৃষ্টি তার কাজ নয়। জীবনের সচ্ছন্দতা যাকে বলি সেই হ'ল তার সুষমা; আর আমাদের চারিপাশে যে-শক্তির প্রকাশ, তার সঙ্গে সমচ্ছন্দতাই হ'ল সচ্ছন্দতা। তালরক্ষা না হলেই হ'ল অসাচ্ছন্দ্য। সচ্ছন্দতা শুধু স্ব-চ্ছন্দতা নয়, অর্থাৎ আমাদের জীবনের অন্তর্ভূতা নানা গতি-উপগতির পরস্পরের মধ্যে তাল রক্ষা নয়; আমাদের সত্তার সঙ্গে প্রকৃতি-শক্তির যোগরক্ষা, তালরক্ষা, ছন্দরক্ষা, এর ভিতরেই বরং তার মূলতত্ত্ব। সচ্ছন্দতার যেখানে অভাব, এমন স্ব-চ্ছন্দতা সেখানে নয় যাকে সহজেই অকৃত্রিম বলতে পারি; কারণ যাকে বলি স্ব-ভাব সেটা যদি স্বভাবশক্তির সঙ্গে তাল হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে ছন্দের কথাই সেখানে আস্‌তে পারে না।

বিজ্ঞান-সাধনা মানুষকে ভোগের পথ দেখিয়েছে। কত গতি, কত ছন্দ, কত ভাষা, কত গান, কত ভাব, কত সম্ভাবনা প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে; তাকে জানা ও বোঝার চেষ্টা বিজ্ঞানবাদী মানুষের অবিশ্রান্ত সাধনা। জীবনের কদর্য্যতা মানুষকে পীড়া দেয়, তার দুঃখের সঞ্চয় ক্রমাগত বেড়ে ওঠে। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ একে এড়িয়ে তার জীবনে সচ্ছন্দতা আন্‌বার প্রয়াস করেছে, কিন্তু ছন্দজ্ঞানের অভাবে বুঝিবা তার দুঃখের বোঝা-ই ভারী হয়ে উঠেছে। পূজাপ্রবণতা যার মূলে মানুষের শঙ্কাকুল চিত্ত, অপৌরুষেয় জ্ঞানকে অঙ্গীকার যার মূলে প্রধানতঃ তার অন্ধবিশ্বাসী মন, এ-সমস্তেরই পরীক্ষা হয়েছে; কিছুতেই যেন জীবনের তালরক্ষা হ'ল না; তার কোনো-না-কোনো দিক এমন ছন্দহীন, এমন গতিহীন হয়ে পড়্‌ল যে তার ফলে গোটা জীবনটাই হয়ে উঠ্‌ল অসঙ্গত, তার কদর্য্যতায় মানুষ সহজেই পীড়িত হ'ল। - সে নূতন পথে বেরুল, কেননা সে তাল হারিয়েছে। বিজ্ঞানের সাধনায় সে যেন ছন্দের ইঙ্গিত দেখেছে। এ-পথ তার ছাড়া চলে না।

চলে না যে, এ-কথা বুঝ্‌তে পারা আমাদের প্রাচ্য মনের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষ মনের নানা বৃত্তি ও বিশ্বাসের মাল-মসলা দিয়ে নীড় নির্ম্মাণ করে ভেবেছে : এই আমার সুখের আবাস, এখানেই আমার সচ্ছন্দে জীবন কাট্‌বে। সেখানে যদি বা সাচ্ছন্দ্য আসেনি, কিন্তু মমতা অতি সহজেই তার মায়া বিস্তার করেছে; তার বাঁধন কাটানো শক্তির কাজ। আমরা সে- শক্তি হারিয়েছি।

অর্থাৎ বিজ্ঞান-সাধনার পথকে দোষা ছাড়া আপাততঃ আমাদের সাম্‌নে আর কোনো কাজ দেখা যাচ্ছে না। কেননা আমাদের ক্ষমতার সীমা ঐখানে গিয়ে থেমেছে। আর বিজ্ঞানযুগের নবীনতা একে দোষ দেবার সুযোগও কিছু সৃষ্টি করেছে। বহু যুগ ধ'রে বিজ্ঞানের সাধনা অবিশ্রান্ত গতিতে চল্‌বার পর হয়তো এর খুঁৎ ধরবার পথ খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌বে, কিন্তু সে-পথ এখনো বেশ প্রশস্ত। প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানে মানুষ সবে-মাত্র বেরিয়েছে; তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা কর্ব্বার কৌশল হয়তো এখনো তার দৃষ্টি-সীমার অনেকখানি বাইরে। তবু নূতন পথে সে যতটুকু এগিয়েছে, তাতেই তার গতি বেড়েছে, সাহস বেড়েছে; জীবনকে সচ্ছন্দ কর্ব্বার চেষ্টায় নূতন প্রেরণা এসেছে। অনেক কল্পনা তার হাতের মুঠার মধ্যে এসেছে, অনেক স্বপ্ন বাস্তবে এসে ধরা দিয়েছে। এই কারণে মানুষের বুকেব পাটা বেড়ে গেছে এতো বেশী যে, সমগ্র জীবনকে নূতন দৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌বার ইচ্ছা তার প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

মানুষের জীবনের প্রকাশ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। এদের ভিত্তিমূলে যে-সব বিশ্বাস সংস্কার ও বিধি-বিধান, তাদের উপর নির্ভরতা নেই। তাদেরকে জড়িয়ে মানুষের যে-জীবন গ'ড়ে উঠেছিল তার সমগ্রতা নষ্ট হয়েছে; খানিকটা গেছে বদ্‌লে, বাকীটুকুতে প্রত্যয় নেই। যে-গৃহের খানিকটা গেছে ধ্বসে--তার শেষটুকুকে বিশ্বাস কত্তে স্বভাবতই বাধে। তাই মানুষের মন আজ সংশয়ে চঞ্চল; জীবনকে নূতন ভিত্তিমূলে দাঁড় করাবার জন্যে সে ব্যতিব্যস্ত। বাইরেকার সৃষ্টিকে যে নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌ল, নিজের জীবনকে সে কোন্ দৃষ্টিতে দেখ্‌বে? তার মাল-মসলা, তার উপকরণ, তার রচনা-কৌশল, সব-কিছুতেই নূতন আলোকের তীব্র রশ্মিপাত হয়েছে। অনেকখানি মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে মানুষ তার বোঝাপড়ায় লেগেছে। রথ-চক্রের যে সুর যে-তাল সে আজ রাজপুত্রের কাণে ঠেক্‌ছে বেজায় বেসুরো বেতালা; ওকে পরীক্ষা কর্ব্বার প্রয়োজন হয়েছে। চক্র তার জীর্ণতায় পরিত্যজ্য হয় হোক, রথ নূতন ঢঙে গড়্‌বার দরকার হয় হোক, তার গতি সুসঙ্গত সচ্ছন্দ হওয়াই আসল কথা।

মানুষের মন আজ রাজশ্রীমণ্ডিত। পূজারী নয়, অনুগত দাস নয়, ভীতিবিহ্বল আশ্রয়ার্থী নয়, আজ সে অধিকারী। তার অধিকার- সীমা আজ দিগন্তপ্রসারী। বাধা নেই, বন্ধ নেই; সব-কিছুকেই সে দেখ্‌বে জান্‌বে বুঝ্‌বে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অভিভাবক-অভিভাব্যের সম্বন্ধ, সমাজে অর্থ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার, এ-সকলের মূলে যে- মন তার অনুসরণ নয়, তাকে বিচার কর্ব্বার, তার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখ্‌বার বুঝ্‌বার ভার আজ মানুষের। তাকে বিশ্লেষণ ক'রে তার তত্ত্ব নিয়ে বোঝাপড়া চল্‌ছে; কিন্তু সে মনের সঙ্গে আধুনিক মনের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বড় কম। কেননা আগেকার মনের কোথাও গতি কোথাও বা আড়ষ্টতা, কোথাও সমতা কোথাও বা বিঘ্নকর বন্ধুরতা। এর মধ্যে যে-ছন্দ সে হ'ল বিষম, তাকে স্বীকার কত্তে যুগ-মনের স্বভাবতই বাধে। তাই নূতন ব্যবস্থার আয়োজনে সে তৎপর। কোথাও ব্যস্ততা, কোথাও বা মন্দ গতি, কিন্তু আয়োজন চল্‌ছেই।

নালিশ হয়েছে : এ আয়োজন হ'ল ব্যভিচারের। অভিযোগ হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আয়োজন বন্ধ হবে। যা আচরণীয় তার ব্যতিক্রম হ'ল ব্যভিচার। মানুষ যেখানে প্রত্যয়শীল, যেখানে সে নিশ্চিন্ত, অর্থাৎ যেখানে সংস্কার ও বিশ্বাস চারিদিকে বেড়াজাল রচনা ক'রে তার মনের গতিকে পরম নির্ভরতায় স্থিতিশীল করেছে, আচারের মূল সেইখানে। সেখানে টান পড়্‌লেই মন চ'টে ওঠে, বলে : বাইরে যাওয়া চল্‌বে না। এই হ'ল আচারের শাসন। এখানে কথা মেনে-চলার, বিচারের নয়। কেননা এখানকার ভাঙা-গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। যেখানে প্রত্যয় নেই, নির্ভরতা নেই, ভাঙা-গড়ার আয়োজন যেখানে সবে-মাত্র শুরু হয়েছে, সেখানে কথা পরীক্ষার, মেনে-চলার নয়। মানুষের গতি সেখানে অনেকখানি নির্ব্বন্ধ। তার মন জ্ঞানার্থী কিনা এইটুকুই সেখানে দেখ্‌বার। গতি গতানুগতি মাত্র কিনা সেদিকে দৃষ্টি হ'ল আচারের, এখানে সে-কথা নয়। তার পিছনে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা অর্থাৎ ভোগের সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা যদি থাক্‌ল তাহ'লে আর কোনো কথা এখানে জোর গলায় বল্‌বার নেই।

এতে যে বিপদ নেই, বিড়ম্বনা নেই এমন কথা নয়। কিন্তু যে নূতন পথে বেরিয়েছে তার সম্মুখে নিঃসীম অনন্ত। বিড়ম্বনা তার পথের কাঁটা, তার জ্ঞান-লিপ্সু চিত্তের কলঙ্ক নয়। পবিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে-আচার যে-বিধান তাতেও বিড়ম্বনা প্রচুর। অনেক দিনের পুরাতন ব'লে যে বস্তুতই তার সহনীয়তা কিছু বেড়েছে এমন নয়, তবু মানুষ যুগ যুগ ধ'রে তাকে বহন ক'রে এসেছে শুধু একটা অচেতন বিশ্বাসের সান্ত্বনায়। এ-কলঙ্ক শুধু তার পথের নয়; তার চিত্ত একে ক্ষমা করেছে, শুধু ক্ষমা নয় বরণ করেছে, এ-কলঙ্ক তারও। যে বাঁধা পথে চলেছে তারই যদি এই অদৃষ্ট, তবে যার অচেনা পথের সম্বল শুধু জিজ্ঞাসা, সে শুরুতেই বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচ্‌বে এ আশা কেন?

মুশ্‌কিল এই যে, আচারের চতুঃসীমার মধ্যে যে-বিড়ম্বনা তাকে অনিবার্য্য বিধিলিপি মনে করা আচার-নিয়ন্ত্রিত মানুষের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরনারীর প্রতি, কৃষকশ্রমিকের প্রতি, রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তির প্রতি যুগ যুগ ধ'রে অনেক অবিচার চলে এসেছে, তার নির্ম্মমতায় মানুষের ইতিহাস মসীলিপ্ত হয়েছে; কিন্তু অসহায় হতবুদ্ধি মানুষ তাকে মেনে নিয়েছে, ভেবেছে; এর বাইরে যাবার শক্তি তার নেই, এই বিধির বিধান। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়, তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু স্রোতমুখে যখন জলসঞ্চয় হ'ল, বাঁধ তখন আপনা থেকেই ভাঙল; দুঃখের সঞ্চয় বিশ্বাসের বাধা মান্‌ল না। বিধান টুটেছে, বিধাতারও বুঝি পরিত্রাণ নেই, তাঁর আসনও টলমল। ব্যথাতপ্ত কণ্ঠে বিদ্রোহের বাণী ফুটেছে : "....খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!"

এর মানে এমন-যে-কিছু ভয়ানক তা নয়। আমাদের বর্ত্তমান জীবন-প্রণালী যেমনতর, একটা অন্ধ খেয়ালী বিধাতা ছাড়া তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। অর্থাৎ বিশ্বাসী মন জীবনযাত্রার ব্যবস্থাকেই মেনেছে দেবতা, মানুষ তার কাছে খেলার পুতুল মাত্র। সেই পুতুল আজ বল্‌ছে : দেবতা, নৈবেদ্য আর নয়, তোমার হাতের দণ্ড তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েই তোমার পূজা সমাপ্ত কর্ব্ব। তোমার বিষম ছন্দে আমাদের নাচিয়েছ, বিড়ম্বনা হয়েছে প্রচুর, দুঃখ জমেছে পর্য্যাপ্ত, এখন আমাদের তালে তোমাকেই নাচ্‌তে হবে।

দেবতা রাজী হবেন কি না সেকথা জানা নেই; কিন্তু মানুষের মন একান্ত জিজ্ঞাসায় দুলে উঠেছে : কেন নাচবে না? অর্থাৎ মানুষ আজ তার অন্তরতম সত্য-দেবতার খোঁজে মুক্ত রিক্তের বেশে বেরিয়েছে। এঁকে অস্বীকার ক'রে ফেরাউন ডুবে মরেছিল নীল দরিয়ায়। আজ মানুষের ব্যথা-বিষে নীল হয়ে উঠেছে বিশ্বের মন। তার গহীন জলে খেয়ালী দেবতার ভাগ্য নির্ণয় হবে। যদি তিনি ডোবেনই তবে সে অত্যন্ত অকারণে নয়, একথা স্বীকার কর্ব্বার জন্যে তৈরী থাক্‌তে হবে।

আমরা করছি কিন্তু তার উল্‌টো। বিজ্ঞানবাদকে আমরা বলছি জড়বাদ এবং জড়বাদকেই ভেবে নিয়েছি নাস্তিকতার রকমফের। কিন্তু আসলে বিজ্ঞানবাদ জড়বাদ মাত্র কিনা এবং নাস্তিকতার সঙ্গে তার মিল কোথায় কতটুকু সেটা নিতান্তই বিচার্য্য বিষয়। আমাদের মনে আস্তিকতার যে-রূপ, তার সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর আস্তিকতার মিল নেই, এইটুকু মাত্র নির্ব্বিবাদে বলা যেতে পারে। আমাদের ভগবান আমাদের নাগালের বাইরে; তিনি আমাদের আরাধ্য মাত্র, আর কিছু নন। বিজ্ঞানবাদীর কারবার জ্ঞানাতীত ভগবানকে নিয়ে নয়; তাঁর পরিচয় জান্‌তে সে সমুৎসুক, তাঁকে দূর থেকে আরাধনা কত্তে নয়।

বিজ্ঞানকে আমরা নাস্তিকতার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখ্‌ছি তার একটা কারণ, বিজ্ঞানবাদ এখনো পরিপূর্ণরূপে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জ্ঞানের সাধনার অন্ত কোথায় জানা নেই; এতে কিছু মুশ্‌কিল ছিল না যদি মানুষ তার গোটা জীবনটাকেই জ্ঞানগতির সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে নিতে পারত। মানুষ তা পারেনি, কেননা স্বভাবতই সে সাবধান এবং এই জন্যে সাধারণতঃ সে রক্ষণশীল, এই কারণে যেখানে বিজ্ঞানবাদ বিশেষ ক'রে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেখানেও মানুষের জীবনের এক দিকের সঙ্গে আর এক দিকের মিল ভালো জ'মে ওঠেনি; এমন কি, অনেক জায়গায় এক দিক হয়ে পড়েছে আর এক দিকের প্রতি একেবারে মারমুখো। যারা একটু সাহস দেখিয়ে জীবনের এই কেটে-যাওয়া তালটাকে আবার নূতন ক'রে বাঁধবার আয়োজন করছে তারা প্রচলিত ধর্ম্মকে তাড়াচ্ছে। এতেই জ্ঞান-সাধনার সঙ্গে বিশ্বাসগত ধর্ম্মের সে সহজ বিরোধ তা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, এবং বিজ্ঞানবাদকে অতি ভীষণ রকমের নাস্তিকতা ব'লে প্রচার কর্ব্বার সুযোগ খুবই বেড়ে গেছে। জোর গলায় বলা হচ্ছে : আধুনিক যুগের জ্ঞান-সাধনা স্থূল জড়বাদ মাত্র, তাতে আধ্যাত্মিকতা বিন্দুমাত্র নেই; তার মূলে শুধুই ভোগ, নইলে ধর্ম্ম তাদের কী ক্ষতি করেছে?

বিশ্বাসগত ধর্ম্ম ভোগ চায় না। এইজন্যে তাকে আশ্রয় ক'রে জীবনের দুর্ভোগ কতখানি বেড়ে উঠেছে, তার হিসাব মানুষের মনের খতিয়ানে লেখা পড়্‌ছে এবং আরো পড়্‌বে। আপাততঃ দেখ্‌বার এইটুকু যে আধ্যাত্মিকতার রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক মনের কাছে ভোগ ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো লড়াই নেই, কারণ এরা এক। স্রষ্টাকে অস্বীকার নয়, কিন্তু তাঁকে পাওয়ার জন্যে সৃষ্টির বাইরে হাতড়ানোর চেষ্টাও নয়। শিল্পী-মনের তত্ত্ব শিল্পের বাইরে মেলে না; কাব্যের বাইরে কবির খোঁজ নিতান্তই বৃথা। বিজ্ঞানবাদ মানুষকে এই সহজ তত্ত্বের পথে তুলে দিয়েছে।

সৃষ্টিকে জান্‌বার বুঝবার জন্যে একনিষ্ঠ ঐকান্তিক প্রযত্ন, এ কিসের জন্যে? তার সঙ্গে জীবনকে মেলানো, এই হ'ল পরমানন্দ। জীবনের সাচ্ছন্দ্য বিধান অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভোগের ভিতরেই হ'ল আনন্দের অভিসঞ্চার। সেই হ'ল আধ্যাত্মিক জীবনের পরম লাভ। যাকে বলি ভোগ, সেই হ'ল এন্‌জয়মেন্ট্ (enjoyment); আর এনজয়মেন্ট মানে সৃষ্টিতে আনন্দ জাগিয়ে তোলা, তাঁকে আনন্দে পরিণত করা। এইখানেই সৃষ্টিব সঙ্গে জীবনের যোগ, স্রষ্টার সৃষ্টিপরায়ণ মনের যে-তত্ত্ব তার সঙ্গে মানুষেব মনের যোগ। রহস্যবিলাসী কবির বাণী :

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো!"

বিজ্ঞানবাদীর আধ্যাত্মিক সাধনার এই পথ। এখানে বিজ্ঞানসাধনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনা দু'য়ে মিলে এক হয়ে গেছে।

এই পথে চল্‌তে গিয়ে নবসৃষ্টির জন্মবেদনাতুর মানুষ ধর্ম্মকে তাড়াচ্ছে, শুন্‌তে বড্ড খাপছাড়া লাগে। ওতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। যাকে ছাড়্‌বার জন্যে মানুষের সজ্ঞান প্রয়াস হ'তে পারে এবং যাকে ছেড়ে সে চল্‌তেও পারে, তার জন্যে কাতরতা মমতার, বুদ্ধির নয়। তথাপি একথা বলতে হবে যে ধর্ম্মকে মানুষ ছাড়্‌তে পারে না এবং বস্তুতঃ সে তাকে ছাড়্‌ছেও না। আমার ধর্ম্ম আমার আধ্যাত্মিকতা, সে আমার জীবনকে ছেড়ে নয়, এই কথাই সে বল্‌ছে। জীবন সচ্ছন্দ হ'লেই সুন্দর হল, মানবচিত্তের আনন্দ-আহরণের শক্তি জেগে উঠ্‌ল, অর্থাৎ তার ধর্ম্মকে সে নিবিড়ভাবে লাভ করলে। মনের এই শক্তিকে বাড়ানোর চেষ্টা বিজ্ঞানবাদী বিবিধপ্রকারে কর্‌ছে, এই তার ধর্ম্মসাধনের প্রণালী। দুঃখকে জয়, তাকে স্বীকার ক'রে নয়, তাকে লঘু ক'রে, হয়তো নির্ম্মূল ক'রে, এ- কাজ তাকে কত্তে হবে এবং সে কর্‌ছেও। মানুষের কল্যাণ-আয়োজনের অবিশ্রান্ত চেষ্টা তারই। সে প্রয়াস কত বিশাল, কত বিস্তৃত। কত দিকে কত রূপে তার প্রকাশ! তার বিপুল প্রসার, তার বিরাট সম্ভাবনা, তার অপরূপ বৈচিত্র্য এক আনন্দময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যুগের মনে তার ক্ষীণ রশ্মিপাত হয়েছে। তার অস্ফুট আলোকে মানুষ যেন নিজের উচ্চতার পরিমাণ উপলব্ধি করেছে, পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্য্যন্ত তার পূর্ণ অবয়বের সন্ধান পেয়েছে।

বালক মো'মেনের জবানবন্দী

মাহ্‌বুব-উল্‌-আলম

চাঁদপুর-গোয়ালন্দ-চলিষ্ণু জাহাজে এক যাত্রী চোখের জলে ভাসিয়া মোনাজাৎ করিয়াছিলেন--''আহা কন্যা শামারোখ নানামতে দিলা দুখ তথাপিও না পাইনু তোরে! বেরহ্‌মতেকা এয়া আরহাম র্‌রাহেমিন!!'' এক সহযাত্রী বন্ধু মন্তব্য দিয়াছিলেন--লোকটি মা'রেফতের লোক।

এই ঘটনা আমাকে আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করিল। আমি দেখিতে পাইলাম এটা নিঃসন্দেহ যে আমি একজন মোমেন। কিন্তু দেখিলাম কিসে আমি বিশ্বাস করি তাহা বর্ণনা করা শক্ত। কারণ, আমি যাহাতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি তাহা বরাবরই একই পদার্থ থাকে নাই। মনে পড়িল, শৈশবে মাকে দেখিতাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন--''আল্লাহ্! তুই!!'' যেন আল্লার নিকট বল ভিক্ষা করিতেন। আমার শিশু মনটিতে বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। পরাক্রান্ত আল্লাটীকে মা কোন্ সাহসে 'তুই' সম্বোধন করেন? মাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন--''প্রিয়জনকে আমরা 'তুই' ছাড়া 'আপনি' 'তুমি' বলি না। এই যেমন তুই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। কই তোকে তো 'তুই' ছাড়া 'আপনি' 'তুমি' বলি না! সেইরূপ আল্লাও আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তাঁকেও আমরা সেইজন্যই 'তুই' ছাড়া অন্য সম্বোধন করিতে পারি না।'' আমি কল্পনায় আল্লাকে আঁকিতে চেষ্টা করিতাম--যে আল্লা মায়ের নিকট আমার মতই প্রিয় এবং আমার নিকট মায়ের মতই। কিন্তু, মায়ের উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া কল্পনা বেশী দূর অগ্রসর হইত না। এতকাল পরেও তাঁহার মুখের সে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ আমার বেশ মনে পড়ে। আর মনে পড়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শান্তি অনুভব করিতাম।

মা আজও বাঁচিয়া আছেন। ততোধিক তাঁহার কল্পনার আল্লাটীও বাঁচিয়া আছেন। তখন মা ও ছেলের মাঝে যাহা হইত এখন দাদী ও নাতি-নাতিনীর মধ্যে তাহা হইতেছে। মা তখনও নমাজ পড়িতেন। বাস্তবিকই আমার মনে হয় তিনি যেন অনন্ত কাল ধরিয়াই নমাজ পড়িতেছেন--এমন কি তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে। এখনও নমাজ পড়েন। এ সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ না করিয়া পারি না। সেটি এই : শৈশবে মায়ের নমাজ পড়াকে আমি খেলার উপযুক্ত সুযোগ মনে করিতাম। আমাকে কোলে করার কেউ ছিল না কিনা--মা আমাকে 'জায় নমাজে'র পাশে বসাইয়া নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন। যেন আমি 'জায় নমাজে' না উঠি, উহার সম্মুখ দিয়া হামাগুড়ি না দিই এজন্য খুব করিয়া নিষেধ করিয়া তবে তিনি নমাজের 'নিয়ৎ' বাঁধিতেন। কিন্তু, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার ভাল লাগিত না। ততোধিক ঠিক তাঁহার সেজ্‌দার জায়গাটির প্রতি আমার ভারী একটা লোভ হইত। ফল এই দাঁড়াইত যে আমি প্রায়ই তাঁহার নিষেধ এবং আমার খেয়ালের মধ্যে একটা আপোষ করিয়া ফেলিতাম। সেটা হইত এইরূপ : তিনি সেজ্‌দা হইতে মাথা তুলিয়া খাড়া হওয়া মাত্রই আমি ঐ জায়গাটিতে গিয়া বসিতাম, পুনরায় তিনি রুকুতে আসা মাত্রই হামাগুড়ি দিয়া 'জায় নমাজে'র পাশে পলাইয়া আসিতাম। এইরূপে মা এবং তাঁহার আল্লার মাঝখানে আমি লুকোচুরি খেলিতাম। এটা চলিত, যেদিন আমার মেজাজ ভাল থাকিত সেদিন। কিন্তু, আমার মেজাজ সব দিন ভাল থাকিত না। মাঝে মাঝে উহা প্রায়ই বিগড়াইয়া যাইত। তখন রাগটা থাকিত প্রায়ই মায়ের উপর এবং ঝালটা ঝাড়িতাম প্রায়ই তাঁহার নমাজের উপর। সেটার সহজ উপায় ছিল তাঁহার সেজ্‌দার জায়গায় গিয়া জহ্নুমুণির মত খুব ভারী হইয়া বসিয়া থাকা। তখন সেজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে মাকে রীতিমত Arm exercise শুরু করিতে হইত, অর্থাৎ প্রতি সেজ্‌দার পূর্ব্বে আমাকে দুই হাতে ঠেলিয়া স্থানচ্যুত করিতে হইত। যাহা হউক, অন্ধকার রাত্রে মা যখন লম্বা নমাজ শুরু করিতেন তখন নীরবে বসিয়া থাকিতে আমার বড় ভয় পাইত। আমি মাঝে মাঝে 'মা'কে ডাকিয়া উঠিতাম। মা ভুরুতে ইসারা করিয়া উত্তর দিতেন, আমাকে অভয় দিতেন। এ সম্বন্ধে বড় কথা এই যে, মা তাঁহার নাতি-নাতিনীদের লইয়া এখনও এইরূপই করিতেছেন। তাঁহার সব তেমনই আছে। শুধু আমিই বাড়িয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছি।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান বাড়িয়াছে। মায়ের কথা এখন বেদ-বাক্য মনে হয় না। মাকে মনে হয় এখন একটি বোকা মেয়ে--হয়তঃ আমার ক্ষুদে মেয়েটারই রূপান্তর মাত্র। তবুও সকালে উঠিয়া যখনই দেখি মা তাঁহার ক্ষুদে নাত্নীটিকে এক মনে 'কালামুল্লা' পড়াইতেছেন এবং ক্ষুদেটী অভিনিবেশ-সহকারে উহা আবৃত্তি করিতেছে--এবং উহার এক বর্ণও না বুঝিয়া উভয়ের কী সে তন্ময়তা!- তখন সে দৃশ্য আমি উপভোগ না করিয়া পারি না। এটা নিশ্চয় যে, মায়ের এবং তাঁহার ক্ষুদে নাত্নীর ধারণা আমার শিক্ষা-গর্ব্বিত মনের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। সময় সময় উহাকে আমি অন্ধ কুসংস্কার অপেক্ষা বেশী কিছু মনে করি না। এই নিয়া মায়ের সঙ্গে আমার কত তর্ক-যুদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু,কোন দিন আমরা সমাধানে পৌছিতে পারি নাই। প্রতিবারেই শুধু পরস্পরকে সংশোধনের অতীত বোকা মনে করিয়া আমরা রণে ক্ষান্ত দিয়াছি। — তথাপি সকালের এই দৃশ্যটি আমার ভাল লাগে। এই চিন্তা আমাকে আনন্দ দেয়, যে অন্ততঃ আমার ক্ষুদে মেয়েটী প্রাণে এমন শান্তি পাইতেছে, যেটা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যেন উহার (জ্ঞানের) সহিত আড়ি করিয়াই আমার প্রাণ হইতে চলিয়া গিয়াছে।

আজ আল্লাকে লইয়া মাথা ঘামান আমি প্রয়োজনীয় মনে করি না। ফলে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁহার কোন আকারই আমার মনে আসে না। কিন্তু, এমন সময় গিয়াছে যখন আমি তাঁহার আকার কল্পনা করিতাম। ইহারও অধিক কথা এই, যে, আমার সাকার আল্লার একটা ইতিহাসও আমি দিতে পারি। সেটা এইরূপ ঃ –

প্রথম আল্লা যেদিন আমার কল্পনায় আকার গ্রহণ করেন সেদিনের কথা আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে। তখন আমি ও জেঠাদের রউফ এবং বর--আমরা সব ক'টিই মায়ের কোল ছাড়িয়াছি--যদিও ঠিক তাঁর আঁচল ছাড়িয়াছি বলা চলে না। তখন ধূলা-কাদা লইয়া সারাদিন কী মাতামাতিই না করিতাম! বেশ মনে পড়ে এমনই এক মাতামাতির দিনে হঠাৎ আকাশে একটা আবছায়া গুমোট করিয়া আসিল। উহারই পিঠে বড় বড় কাল মেঘ লেপ মুড়ি দিয়া জোর বাতাসে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরা শিশুগণ তখন খেলা ছাড়িয়া উর্দ্ধমুখে উহাদের গুণিতে লাগিলাম--এক, দুই, নয়, সাত, চৌদ্দ প্রভৃতি অর্থাৎ শতকিয়ার দফা একেবারে কাবার করিয়া। লজ্জার কথা এই যে আমরা প্রতিখণ্ড মেঘকে এক একটা আল্লা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম এবং কা'র আল্লা কা'র আল্লার চেয়ে বড় তাই নিয়া বিচার বিতর্ক করিতেছিলাম।

এই ঘটনা লইয়া আমি পরবর্ত্তী জীবনেও ভাবিয়াছি। বিশেষতঃ, আমার ক্ষুদে মেয়েটীর স্বীকারোক্তি আমাকে না ভাবাইয়া পারে নাই। একদিন ছেলেমেয়েদের লইয়া গল্প করিতেছি। হঠাৎ কি খেয়াল হইল। জিজ্ঞাসা কবিলাম "আচ্ছা মা, বল্ দেখি--আল্লা কি রকম?" মেয়েটী উত্তরে আমাকে অবাক করিয়া দিল : "কেন বাবা! আমি মনে করি আল্লা প্রকাণ্ড এক পুরুষ, চিৎ হইয়া আকাশে শুইয়া আছেন।"

কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন মোল্লার ছাপ আমার আষ্টেপৃষ্ঠে পড়িতেছে। এই সময়েও আমার কল্পনার আল্লার একটী মূর্ত্তি ছিল। তখন ঐ মূর্ত্তি ছিল আমার এক দূর সম্পর্কীয় মামার মত। তাঁহার কপাল ছিল বড়, মুখের ভাবটা ছিল হাসি ও বিরক্তির মাঝামাঝি। তাঁহার গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল। তিনি যে-কাপড়ই পরিয়া থাকুন আমার মনে হইত তিনি সব সময়ই সাদা কাপড় পরিয়া আছেন! এই সময় আমি ঐতিহাসিক ভাবে হজরত মোহম্মদ ও তাঁহার খলিফা চতুষ্টয়ের কথা জানিতে পাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কোন রকম হেতু ছাড়াই আমি প্রত্যেকের এক একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম। যেমন প্রেরিত পুরুষবরকে আমি মনে করিতাম আমার এক জেঠার মত। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিষয়েই তাঁহার ন্যায় অমন আলোচনা কেহ করিতে পারিতেন না। হজরত আবুবকরের মূর্ত্তি আমার নিকট বরাবরই কৃষ্ণবর্ণ ছিল। কারণ, তাঁহাকে আমি আমার যে দূরসম্পর্কীয় জেঠার সহিত মিলাইতাম তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ। আমার মনে হইত তিনি (আমার এই জেঠাটি) অত্যন্ত কম কথা বলেন এবং তাঁহার অন্তরটি কত ভাল সে খবর আমার ন্যায় কেহ জানিত না। আমার ওমর ছিলেন চিরকালই কল্পনার। কারণ, তাঁহার ন্যায় বলিষ্ঠ ও প্রত্যুৎপন্নমতি লোক আমার পরিচিতদের মধ্যে ছিল না। আমি মনে করিতাম, তিনি এত বলিষ্ঠ ছিলেন যে দীর্ঘাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে খর্ব্বাকৃতি দেখাইত। হজরত আলীকে আমি মনে করিতাম আমার পরিচিত এক বলীর মত। তিনি দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে হইত, তাঁহার গায়ে কত জোর আছে তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। পরবর্ত্তী জীবনে আরবদেশে আমাকে তিন বৎসর থাকিতে হইয়াছিল। আরবদের শরীরাকৃতি যে আমার তখনকার কল্পনা হইতে কত পৃথক তাহা আমি বুঝিতে পারি। তবুও শৈশবের সেই কল্পনা হইতে আমি এখনও নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করিতে পারি না।

এই গেল আমার সাকার আল্লার ইতিহাস। এখন অবশ্য আল্লার আকার লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। কিন্তু, তবুও এই সাকার ভাবার কার্য্য-কারণ আমি নিজের মনে আলোচনা না করিয়া পারি নাই। স্বতঃই মনে এ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, যে, শিশু মনে মনে আল্লাকে একটা আকার না দিয়া পারে না কেন? অবশ্য এ প্রশ্ন আমার মনে আসার পূর্ব্বেই আমি ধরিয়া লইয়াছি যে সব শিশুই মনে মনে আল্লার একটা আকৃতি কল্পনা করে। যেমন আমি করিয়াছি এক কালে, যেমন আমার ক্ষুদে মেয়েটা করে আজকাল, যেমন হজরত ইব্‌রাহীম করিয়াছিলেন হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

এখন, শিশু ইব্‌রাহীমের সাকার ভাবার পেছনে একটা যুক্তি দেখান যায়। সেটা এই যে তিনি সাকারবাদীর ঔরসে জন্মিয়া ঐরূপ আব্‌হাওয়ায় বড় হইতেছিলেন। কিন্তু, আমার কিংবা ক্ষুদে মেয়েটার জন্য সে যুক্তি খাটে না। কারণ, আমার পিতৃপুরুষেরা সকলেই ভাল আলেম ছিলেন এবং আমাদের শৈশবের পারিপার্শ্বিকতা যে কোনরূপ সাকারবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

অবশেষে ইহার প্রকৃত কারণ আমি দেখিতে পাইলাম। তাহা এই : প্রথমতঃ— ইহার একটা মামুলী কারণ এই আছে যে মানুষ সীমাবদ্ধ জীব বলিয়া যে কোন সংজ্ঞার পদার্থকেই--তাহা যত অদৃষ্ট এবং অদৃশ্যই হউক—একটা গণ্ডীর ভিতর আনা তাহার স্বভাব। কারণ, তাহা না হইলে সে ঐ পদার্থের ধারণা করিতে পারে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার শতশত প্রমাণ নিয়তই পাওয়া যায়। যেমন, একটা লোককে ভালরূপে নজর করা মাত্রই আমরা মনে মনে আশা করি, যে, তাহার নামটা আমাদের জানা একটা বিশেষ নাম বা বিশেষ শ্রেণীর নাম না হইয়া যায় না। অবশেষে যখন তাহার অশ্রুতপূর্ব্ব নামটা জানা যায় তখন একই কালে আমরা আশ্চর্য্যান্বিতও হই, নিরাশও হই। তদ্রূপ একটা বিশিষ্ট নাম শুনিয়া আমরা অনেক সময়ই নামধারীর অবয়ব কল্পনা করিয়া লই। পরে নামধারী চোখের সম্মুখে হাজির হইলে আমরা নিজের ভুলও বুঝিতে পারি এবং তা'র সঙ্গে একটু নিরাশ না হইয়াও পারি না। অনেক সময় আমাদের এইরূপ করিবার মূলে কোন ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বের জানা—হয়তঃ বর্ত্তমানের ভুলিয়া যাওয়া—কোন বিশেষ নাম বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সাদৃশ্য বশতই এইরূপ হয়। কিন্তু, অনেক স্থলে এইরূপ কোন স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে না। এই সকল স্থলে যে আমাদিগকে অজানা পদার্থের একটা আকার কল্পনা করিতে চালিত করে সে আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্বভাব।

কিন্তু, দ্বিতীয় কারণটিই আমাকে অধিকতর ভাবিত করিল। সেটা এমন একটা স্থান আমাকে দেখাইয়া দিল যেটা মানুষের বর্ত্তমান সভ্যতার অনুপাতে বিশ্বাসের অযোগ্য একটা ত্রুটি বলিয়া আমার মনে হইল এবং মুসলমানদের পক্ষে এই ত্রুটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সুতরাং পরিহার্য্য বলিয়াই আমি মনে করি।

সেটি এই যে বর্ত্তমান সভ্যতার বড় বড় দাবী সত্ত্বেও একটা দিকে উহা মোটেই নজর দেয় নাই। অথচ যখন মনে করা যায় যে গোটা মনুষ্য-সমাজটাই এখন একভাবে না একভাবে একজন সৃষ্টি কর্ত্তায় বিশ্বাস করে এবং সভ্য মানুষদের মধ্যে এই বিশ্বাসের অনেকটা সম-সূত্রিতা আছে তখন এই অবহেলা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে হয়।

আমি বলিতে চাই যে সৃষ্টিকর্ত্তাটী সম্বন্ধে শিশুদের মনে কিরূপে ধারণা জন্মান যাইতে পারে এবং কি ধারণা জন্মান উচিত—সে বিষয়ে আমরা মোটেই মাথা ঘামাই নাই। কোন দেশের শিক্ষা-প্রণালীতে এ বিষয়ের বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া দেখা যায় না। এ সব বিষয়ে শিশুকে একরূপ তাহার খেয়ালের উপরই ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার ফল ভাল, কি মন্দ, সেটা বলা দুষ্কর। কিন্তু, ইহার ফলে যে সাকার আল্লার রচনা হইতে থাকে তাহা ঠিক।

আমি জানি, আমাকে এক নিমিষেই উত্তর দেওয়া যাইবে যে আমার অনুমান মোটেই ঠিক নহে। কারণ, যে কোন দেশের যে কোন শিশু পাঠ্য পুস্তকেই ভগবান সম্বন্ধে বিষয়ের সন্নিবেশ আছে। আমার উত্তর এই যে, আছে বটে, কিন্তু তাহা না থাকারই সামিল। কারণ, উহার দ্বারা কোন কাজ হয় না, হওয়া সম্ভবও নহে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। সর্ব্ব-প্রথম, আল্লাকে যিনি আমার খেয়ালে ঢুকাইয়া দেন তিনি আমার মা-ই হইয়া থাকিবেন। আল্লাকে স্বীকার করা—এটা তাঁহার অভ্যাস এবং সম্ভবতঃ ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জীবনে তাঁহার কোন দিন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বিশ্বাস তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণ। কিন্তু, আমি জানি জীবনের কোন ব্যাপারেই তাঁহার বিচার করার প্রবৃত্তি নাই, হয়ত ক্ষমতাও নাই। তিনি খাঁটী মা—এই অর্থে যে, মহৎ-ক্ষুদ্র সব কিছুরই বিরুদ্ধে তিনি সমান স্নেহে সন্তানদের পৃষ্ঠ-দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনে অনেক কিছুই শিখিবার আছে, নাই শুধু যুক্তি। অর্থাৎ জীবনের

সব বড় ব্যাপারেই তিনি অন্ধ। কি প্রেম, কি স্নেহ, কি ভগবদ্ভক্তি--সব ব্যাপারেই সমান অন্ধ। সংসারের পানে তাকাইয়া দেখিতে পাইতেছি সব সন্তানই প্রথমে নারীর মুখে আল্লার বিষয় শুনিয়া থাকে এবং এই নারীদের — দু একটি ছিঁটে ফোঁটা ছাড়া--সকলেই জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে যেরূপ, তদ্রূপ এই বিষয়েও অন্ধ ধারণার বশবর্ত্তী। আমার পরবর্ত্তী জীবনের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া মায়ের আল্লার যে সংজ্ঞা আমি বাহির করিয়াছি তাহা হইতেছে 'ব্যক্তি-খোদা'। তিনি বিশ্বাস করেন— অবিশ্বাসীদের প্রতি ব্যবস্থিত যন্ত্রণার ভয়ে এবং বিশ্বাসীদের প্রতি ব্যবস্থিত সুখ-শান্তির কামনায়--এক বিরাট শক্তিতে এবং সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য্যশালী রাজার মূর্ত্তিতে উহা তাঁহার অন্তরে মিশিয়া গিয়াছে।

জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই মা'র সঙ্গেই আমি আছি এবং জীবনের এক মুহূর্ত্তও তাঁহার আল্লাকে আমার মনে আরোপ করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই। মনে হয়, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে, হয়ত পৃথিবীরই ঘরে ঘরে, মা ও ছেলেতে এই অভিনয় চলিতেছে—যৌবনের তপ্ত হৃদয়াসনে এই ব্যক্তি খোদার আসন স্থাপনার। এবং সম্ভবতঃ আমারই মত, অন্ধ বিশ্বাসের--অন্ধ জননীর পদতলে নত হইয়া প্রতি যুবা ছেলেই অনুযোগ শুনিতেছে--এই মামুলী পিতৃ-পিতামহদের আল্লায় আস্থা হারাইবার দরুণ।

মেঘকে আল্লা মনে করার ব্যাপারে মানব-মনের এই একই ধারণা লক্ষ্য করিতেছি, যে, আল্লা উর্দ্ধাকাশে আছেন। হয়তঃ উর্দ্ধাকাশ অসীম, উদার, চির-রহস্যময় এবং সতত দৃষ্টি গোচর বলিয়াই মানুষ উহাতে আল্লার আসন স্থাপনা করে। এই অনুসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে ভাবে কর জুড়িয়া আমরা মোনাজাত করি তাহাতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে আমরা বহির্জগতের কোথাও তাঁহার আসন কল্পনা করি--অন্তর্জগতে নয়। বহির্জগতের কোথাও তাঁহার আসনের স্থান থাকিতে পারে ত, তাহা থাকিবে, অসীম আকাশের ঐ নীলিম বুকে। বিশ্বাসী মাত্রেরই--এমন কি তাঁহাদের অজ্ঞাতে হইলেও, এই রকম একটা মনোভাব আমি দেখিয়া আসিতেছি। যাহা হউক, আমি চিরদিনই মেঘকে আল্লা মনে করি নাই। জীবনের বড় বড় অনুভূতি-বিপর্যয়ের পর, আমি তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পাইয়াছি অন্তর্জগতে--আমার যন্ত্রীরূপে। তাঁহার চিন্তা যখনই আমি খুব বড় ভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছি তখন বিশ্ব-জগৎকে দেখিতে পাইয়াছি তাঁহার প্রকাশ রূপে। ইহার ফলে--বিশ্বাসীর হৃদয় আল্লার আসন--এই কথাটিই আমার এক সেরা বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

মেঘ হইতে আল্লাকে মানুষ কল্পনা যখন করিতেছি তখন আমার শিক্ষার পালা শুরু হইয়াছে। কেতাব ও বহির আল্লা তখন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা পড়াইতেন তাঁহাদেরও উহা তেমনই মুখস্থ ছিল। আজ এতদূরে বসিয়া মনে হইতেছে : মুখস্থ আল্লা--কি তাঁহাদের নিকট, কি আমার নিকট--বইর পাতা অপেক্ষা বড় ছিল না, যদিও উহার দাবী ছিল অসীম, আব্দার ছিল অফুরন্ত। শোচনীয় ব্যাপার এই ছিল যে, যেমন আজকালও প্রায় হইয়া থাকে প্রাথমিক মোল্লা-গুরুদের বেলায়--তখনকার ইঁহারা ছিলেন আত্মাহীন লোক, অতি ক্ষুদ্র। আল্লাতো দূরের কথা জীবনের অতি তুচ্ছ দিকেও ইঁহাদের কোন চিন্তার প্রবাহ, নিজের বলিতে কোন অভিজ্ঞতা, ছিল না। শিশু পারুক বা না পারুক--চাপাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহাদের শিক্ষার ধারা। উহাতে ঘাড় যদি বা বেঁকা হইত তাঁহারা ঠেঙাইয়া সোজা করিতে জানিতেন। পাঠ্য পুস্তকে আল্লার বিষয়ে বর্ণনা ছিল--মৃত্যুর মত নিখুঁত। এতটুকু তর্ক-যুক্তির ফাঁক উহাতে থাকিত না। মৃত্যু জিজ্ঞাসার প্রতি দৃক্‌পাত করে না; কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতারা জিজ্ঞাসার যে সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া কাজে হাত দিয়াছিলেন। আজও দেখিতে পাইতেছি সেই বিধান অক্ষয় হইয়া আছে। শিশুর মনে কষ্টি-পাথর গড়িয়া তোলার জন্য কোন আয়োজন নাই। নিজের ভাবে অনুভব করিয়া দেখার জন্য তাহার প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই, তাহার কৌতূহল উদ্রেক করার প্রয়োজন বোধ ত নাইই, বরং ভিতর ঠাসিয়া দেওয়া হইতেছে--ভগবানের নির্য্যাস, তা, সে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারুক আর না-ই পারুক। আজ শিক্ষা বিজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে--আমাদের দেশেও। ছেলের কৌতূহল উদ্রেক করিতে করিতে আরোহ-পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু ভয় হয়, ইহাতেও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। কারণ, আজকাল পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়টির সন্নিবেশ পূর্ব্বের মত হয় না। ইহা ঐ সত্যের প্রমাণ যে, জড়বাদের সংস্পর্শে আমরা ক্রমেই এ দিক হইতে দৃষ্টি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছি। যা'ও এক আধটুর সন্নিবেশ হয়--তাহা পূর্ব্বের মতই এক তরফা।

যাহা হউক, ৭/৮ বৎসর বয়সের সময় আল্লার বিষয়ে আমার ধারণা বেশ চোখা হইয়া উঠিল। তখন স্কুলে পড়ি। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রে মিলিয়া বিদ্যাসাগরের বোধোদয় পড়ি--"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।" ইনি বইর ঈশ্বর। স্কুলের ঈশ্বর

হিন্দুর ছিল এক, মুসলমানের ছিল অপর। উভয় ঈশ্বরের তুলনা করিতে গিয়া পরস্পর আমরা ঝগড়া করিয়া ফেলিতাম, নিম্নতম শিক্ষক যিনি তিনিও পরম উৎসাহে নিজের জাতের (হিন্দুর) পক্ষে যোগ দিতেন। একদিন তাঁহার ঈশ্বরকেও রেহাই দিলাম না। দু'একটি আঁচড়-খোঁচা তাঁহারও গায়ে পড়িয়া থাকিবে। তিনি দলশুদ্ধ মুসলমান শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিতে সাহসী না হইয়া উর্দ্ধতন শিক্ষককে ডাকিয়া আনিলেন। ইনি ছিলেন অঙ্কের পণ্ডিত, আমরা তাঁহাকে ছোটখাট যমণ মনে করিতাম, আর সব চেয়ে বেশী ভয় করিতাম। কারণ, দু আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল দিয়া টিপিতে থাকা, কানের ভিতর পেন্সিল দিয়া মোচড়ান, নখের তলায় পিন ঢুকাইয়া দেওয়া, কণ্ঠার হাড় নীচের দিকে দাবিয়া দেওয়া, সহজ kneel down, half kneel down, নারিকেলের মালার উপর kneel-down, half kneel-down টেবিলের তলায় ঘাড় গুঁজাইয়া রাখা, হাতের আঙ্গুল উল্টা দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, দুরকমের চিমটি, কয়েক রকমের থাপ্পড়, গাধার টুপী তিনি এত রকমের শাস্তির ব্যবস্থা জানিতেন যে, আজ মনে হয় Black Napoleon কি নীরোর যুগে হইলে ইনি নিশ্চয়ই Provost-Marshal এর সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। তিনি আসিয়া সর্দ্দার রূপে আমাকেই পাকড়াও করিলেন সংকারীর নির্দ্দেশ মত। "এ অসভ্য!" "বাবুর সঙ্গে তর্ক করেছিস্?" "হাঁ, সার।" "কেন তর্ক করলি?" ক্রোধে এবং ঘৃণায় আমার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। কারণ, মাতাপিতার আদুরে ছিলাম। শিক্ষকগণও আদর করিয়া আসিতেছিলেন। আর সব শ্রেণীর সামনে এই অবস্থাটা আমি অত্যন্ত অপমানের মনে করিতেছিলাম। ওদিকে, ক্ষুদ্র হইলেও দলপতির গৌরব অনুভব করিতেছিলাম। ক্রুদ্ধ অশ্বের ন্যায় ঘাড় বাঁকাইয়া আমিও প্রশ্ন করিলাম—"তিনি কেন তর্ক উঠালেন?" "তিনি আর তুই সমান? তিনি ত বিয়ে করেছেন, তাঁর ছেলেপুলেও হ'য়েছে। কই, তোর হয়েছে?" শাস্তি অনিবার্য্য! নিরুপায়ভাবে বলিলাম, "স্যার, বড় হয়ে বিয়ে কর্লে, আমারও হ'বে।" তিনি উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। বোধ হয় বিশ্বাস করিলেন না। তখন ত আর উপায় ছিল না। আজ কি কয়েক বৎসরও পরে হইলে অবশ্য ইহার সত্যতা তিনি দেখিতে পাইতেন। অতঃপর বেত্রহস্তে আমার দুর্ব্বল স্থান আক্রমণ করিলেন। "আড়াইয়ার নামতা বল্।" গণিতে আড়াইয়ার নামতা, বোধ হয় পাছে ছেলেরা বে-আন্দাজী শিখিয়া ফেলে এই ভয়ে, ত্রিকোণমিতির জ্ঞান খাটাইয়া জমাট আকারে সঞ্চিত করা ছিল। উহা লাটিনের মতই আমাদের চোখে ঠেকিত। বলা বাহুল্য, ও জায়গাটায় প্রায় ছেলেই ঠেকিত। আমিও ঠেকিলাম। অতঃপর খুব করিয়া ঠেঙ্গাইয়া পণ্ডিত মহাশয় নেকড়ে ও মেষ-শাবকের গল্পের হাতে কলমে শিক্ষা দিলেন। আজ সোয়াকুড়ি বৎসর পরেও সে ঘটনা দিনের আলোর মত আমার মনে পড়ে এবং গণিতের সেই স্থানটা এখনও আমার অভিশাপ কুড়াইতেছে।

কিন্তু, বাড়িতে ও সমাজে মহলা চলিতেছিল অন্য রকম। মা সারাদিনই যেন আল্লা নিগড়ের মধ্যে আছেন এমনভাবে চলিতেন। সদা ভটস্থভাব। যেন পান থেকে চুন খস্লেই আর রক্ষা নাই, এ রকম ভাব। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যখনই উহা করিতে যাইতাম জীবন বিষাদে ভরিয়া উঠিত এবং এক এক সময় মনে হইতে থাকিত, আল্লা না থাকিলেই যেন মা'র জীবনখানি অধিকতর হাসি খুসিতে ভরিয়া উঠিত। যাহা হউক ভাল ছেলের আচরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। কারণ, সারাদিনই আমার চেষ্টা সত্ত্বেও এত ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করিত যে আমি বহুবারই খোলস ফেলিয়া আমার আসল রূপ (দুরন্ত শিশুর) গ্রহণ করিতাম। চলার সময় মাটীতে 'গুম্ গুম্' করিয়া আওয়াজ হইলেই কোন কোন মুরুব্বী সাবধান করিয়া দিতেন—উহাতে গোনাহ্ হয়। মাটী উহার প্রতিশোধ লইবে। পানি বেশী ফেলিলে বলিতেন--দোষ! পরকালে হিসাব হইবে। এতগুলি দোষ ঘাড়ে করিয়া নিজেকে মনে হইত, শোচনীয়। নিজের পরকাল সম্বন্ধে ভয় হইতে থাকিত।

সমাজে অনেক ওয়াজ-নছিয়ৎ হইত। মনে উদ্দেশ্য ছিল ভাল লোক হওয়ার। কাজেই প্রায় ওয়াজেই যাইতাম। যাইতাম আর মনোযোগের সহিত সব শুনিতাম। ইহার ফলে মনে ছাপ পড়িয়া গেল--তিনটা। প্রথম--কষ্ট, কবর এবং দোজখের। দ্বিতীয়--ভোগ সুখ, বেহেস্তের। তৃতীয়--মেয়ে লোকদের বদ্‌খতি। প্রত্যেক বক্তাই অন্দরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া--হাসি পর-পুরুষের কানে গেলে (আর অলঙ্কারের আওয়াজ), মেয়েদের মাথার খোশ্‌বু তাঁহার নাকে গেলে, উঁকি মারিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলে, এমন প্রকাণ্ড কল্পনার শাস্তির রেওয়ায়েৎ আনিতেন যে ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। এই ছাপ আমার মনে এত অধিক দিন বর্ত্তমান ছিল যে পরবর্ত্তী জীবনে এইসব ত্রুটিতে বাড়ির বৌ'রা কিছুদিন আমার হাতে রেহাই পান নাই। অথচ মজার ব্যাপার এই যে ইঁহাদের কেহ কেহ বক্তাদের ঘর হইতে আমদানী।

কিন্তু সব চাইতে বেশী কার্য্যকরী হইল--প্রথমটা। কারণ, আমি রীতিমত ভীত হইয়া পড়িলাম। ভয়ের প্রকাশ হইত এই বলিয়া : কবরে কি করিয়া থাকিব? এই সূত্রটি ছিল আমার মাতামহীর। বৃদ্ধা (এখনও বাঁচিয়া আছেন) ইহা আওড়াইয়া নিজের মনে শোক করিতেন। ধার্ম্মিকা বলিয়া তাঁহার দেশ-জোড়া এমনই খ্যাতি যে তাঁহার ভদ্রাসনে তাঁহার দৃষ্টির তলে ভূমিষ্ঠ হওয়া আমার সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা হইত। কিন্তু, আমি যে ভয়ের ভান করিতাম, তাহা নয়। কবরের চিন্তা আমাকে প্রকৃতই পাইয়া বসিল। এক বক্তা, যাঁহাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতাম--বর্ণনা করিয়াছিলেন, কত লক্ষ বৎসরের পথ হইতে কী ভীষণ সব সাপ কবরের লোককে দংশন করিতে আসিবে। ইহার পর বিশেষ করিয়া রাত্রে আমার শান্তি থাকিত না। আঁধারে যেন সেই সাপগুলিকে দেখিতে পাইতাম। রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর, দৈবাৎ যদি জাগিয়া থাকিতাম বা ঘুম ভাঙিয়া যাইত--আমি নীরবে কাঁদিতে থাকিতাম। কখনও কেহ টের পাইয়া বাতি জ্বালিতেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া ও ক্রন্দনের কারণ জানিয়া আশ্চর্য্য হইতেন—এত ছোট বয়সে এ রকম ধর্ম্ম-ভয়! কথাটা প্রতিবেশী-মহলে জানাজানি হইতেই আমার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

ইহার ফলে দিনগুলিও বিষাদ-মাখা হইয়া উঠিল। আমার বিষাদাচ্ছন্ন নিবিড় মুখ-ভাবের খাতিরে 'সচ্চরিত্রতা'র এক আধ খান পুরস্কারও কান ঘেঁসিয়া গেল। শুধু দুই এক জনের মুখচ্ছবি আমার অপেক্ষাও অনুতপ্ত-গোছের ছিল বলিয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। সম্ভবতঃ শ্রেণীর মধ্যে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অনুতাপ করার বিষয় ছিল। একদিনের ঘটনা হইতে আমার অবস্থা বেশ বোঝা যাইবে। সেদিন এক এক শ্রেণী করিয়া দীঘির পাড়ে নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল--ডাক্তার সাহেব আমাদের টীকা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদিগকে বসন্তের টিকা দেওয়া হয়। যাহা হৌক, পণ্ডিত মহাশয়ের কড়া হুকুম ছিল— ডাক্তার সাহেব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে স্কুলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব আসিলেন অনেক দেরীতে এবং আমাদের শ্রেণীটি দেখিলেন সকলের শেষে। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর যা একটু সময় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিল-- আমার মনে হইল উহা ন্যায়তঃ স্কুলের। কিন্তু দুইটা অপেক্ষাকৃত ঢেঙা ও বলবান ছেলে—শ্রেণীতে পণ্ডিত মহাশয়ের হাত-সই করার টার্গেট্—এক জন তাঁহার উদ্দেশ্যে শূন্যে বাহু ঠুকিয়া, আর একজন সকলের সামনে কাপড় খুলিয়া দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিল যে উহা অসম্ভব। ক্রমে সকলেই চলিয়া গেল, রহিলাম আমরা তিনজন—আমি ও ঢেঙা দুইজন। বড় ঢেঙা আবার শূন্যে বাহু ঠুকিয়া বলিল—"আমি! আমি কাউকে ডরাই না। এক শুধু ডরাই ঝড়কে। ঝড় বড় ভয়ানক, কেমন কিনা?" ছোট ঢেঙা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল--"ফুঃ: ঝড়কে আবার ভয় কিসের! আমি কাউকে ডরাই না, এক শেয়ালকে ছাড়া। শেয়ালে কামড়ালে লোক পাগল হয়ে যায়। কেমন না?" তার পরে উভয়েই এক যোগে জিজ্ঞাসা করিল--"এই তুই কাকে ডরাস? বল্ না, বড় যে চুপ ক'রে আছিস।" আমি ভাবিয়া উত্তর দিলাম,--"আমি ডরাই সিংহকে।" পশুরাজের সঙ্গে তখনও কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। বাড়ি আসিয়া বাবাকে বলিতেই মাথা নাড়িয়া মন্তব্য করিলেন--"বড় তো খারাপ করেছিস! বলতে হত যে একমাত্র খোদাকেই ভয় করিস।" নিজের ভুলটা নিমেষেই বুঝিতে পারিলাম, আর অনুতাপের অবধি রহিল না। এমন সুযোগটা মাটী হইল! ধর্ম্মের খোলসটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও খসিয়া পড়া তখন অমার্জ্জনীয় পাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ এতদূর হইতে দৃষ্টি চালাইয়া মনে হইতেছে, যে শিশুটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া নিজের নিকট খাঁটি হইয়াছিল সে যেন আল্লার ভয়ে ভীত শিশুটী অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল।

এগার বৎসর বয়সে আমার জীবনে এমন একটা ব্যাপার আসিয়া পড়িল যেটা আল্লার সহিত মোকাবেলায় আমাকে ক্ষত -বিক্ষত ও শান্তিহীন করিয়া তুলিল। সেটা যৌন-বোধ। স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে এটা কত দেরীতে আসিত বলা যায় না। কিন্তু আমার অবস্থায় উহা এই বয়সেই আসিয়া পড়িল। জীবন-কাহিনী হিসাবে এই বর্ণনার কোন মূল্য নাই। কিন্তু, আল্লার সম্বন্ধে সচেতনতার ইতিহাসে উহা একটি বিশেষ ঘটনা। তাই বর্ণনা করিতে হয়। ব্যক্তিগত হিসাবে মাটির মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার দৃষ্টির বহু নিম্নে।

এই বয়সে এক মহিলা আমার পুঁথি পড়া শুনিতে চাহিতেন। তাঁহার কোন মৎলব ছিল এরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু, পুঁথির রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে একদিন আমি সচেতন হইয়া উঠিলাম যে আমি পুরুষ, তিনি নারী। এই জ্ঞান আমার মাঝে একটা তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার করিল। তখন আর আমি বালক নহি, নব-যুবক।

দায়ুদ খাঁ

সাদত আলী আখন্দ বি-এ

।১।

দায়ুদ খাঁর পিতা সোলেয়মান কাররাণি পাঠান-সম্রাট সলিম শাহের অধীনে বেহারেব শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সম্বলদেশের রাজ-প্রতিনিধি তাজ খাঁ, বাদশাহের মন্ত্রী হিমুর কুদৃষ্টিতে পড়িয়া পদচ্যুত হইবার পব সোলেয়মান খাঁও বেহারের শাসনভার হইতে অপসারিত হন। অতঃপর ভাগ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি গৌড়নগরে আগমন করেন (১৫৬৪ খৃঃ)।

দিল্লীতে তখন বাদশাহী তখ্‌ত লইয়া গণ্ডগোল চলিতেছিল। সোলেয়মান খাঁ এই সুযোগে গৌড়ের সিংহাসন অধিকাব করিয়া বসেন। তারপর একে একে বেহার ও উড়িষ্যা জয় কবিয়া পাঠানের বিজয়পতাকা উত্তোলিত করেন।

উড়িষ্যা বিজয় লইয়াই হয়ত পূর্ব্ব-ভারতে পাঠান-মোগলের বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু বাংলার পাঠানের সৌভাগ্যবশতঃ উৎকল-রাজ মুকুন্দদেবের প্রধান সহায় মোগল-সম্রাট আকবর শাহ তখন পাঞ্জাবের বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত থাকায় পাঠানের বিরুদ্ধে উৎকল-রাজকে কোনোই সাহায্য করিতে পারিলেন না।

মোগল-সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমান্তে সোলতান সোলেয়মান শাহের অধীনে আবার একটি শক্তিশালী পাঠানরাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা আকবর শাহেব শ্যেনদৃষ্টির অগোচব ছিল না। তাই বাংলার এই নবীন পাঠান-শক্তিকে ধ্বংস করিয়া মোগল-সিংহাসন নিরাপদ করিবার মানসে বাদশাহ্ পূর্ব্বাহ্নেই উৎকল-রাজ মুকুন্দদেবের সহিত একটি আক্রমণ ও রক্ষামূলক (offensive and defensive) গোপন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

মোগল উৎকলের এই বন্ধুত্বের কথা গৌড়েশ্বরের অবিদিত রহিল না। সুযোগ উপস্থিত হইলে মোগল যে উৎকল-হিন্দুর সহায়তা লইয়া বাংলা-বেহার হইতে পাঠান অধিকার নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারে, এ সম্বন্ধে সোলতান সোলেয়মান কোনোই সন্দেহ পোষণ করিতেন না। অথচ সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া মোগল-উৎকলের সমবেত শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিতেও সাহসী ছিলেন না। অপরপক্ষে উৎকল-রাজকে দমন করিতে না পারিলে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ ছিল না। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সোলতান সোলেয়মান একটা শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সোলেয়মান খাঁ এই সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করিলেন না। তিনি দ্রুতগতিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া রাজা মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিলেন। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়ের হস্তে উৎকলের দেবালয় ও দেবমূর্ত্তিগুলি উৎসন্ন হইয়া গেল,—মোগল-সম্রাট তাঁহার অনুগত ও বিপন্ন বন্ধু মুকুন্দদেবকে একটি মোগল-সৈনা দিয়াও সাহায্য করিবার অবসর পাইলেন না।

উৎকলরাজ মুকুন্দদেবের পরাজয় শুধু উৎকল-শক্তির পরাজয় নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা নব-প্রতিষ্ঠিত মোগল-শক্তির পরাজয়। কিন্তু তখন এই বিরাট অপমান নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আকবর শাহের গত্যন্তর ছিল না।

—হঠাৎ বাংলার পাঠানের বিজয়-রথ জয়-যাত্রার মধ্যপথে থামিয়া গেল। মোগল-সম্রাটের উদ্যতরোধ মস্তকে ধারণ করিয়া বিজয়ী সোলতান সোলেয়মান ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

অতঃপর সোলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ শাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পাঠান-অভিজাতবর্গ অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা দায়ুদ খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (১৫৭২ খৃঃ)।

ইনিই বাংলা বেহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন পাঠান সোলতান আবুল মোজাফ্ফর দায়ুদ শাহ্ কাররাণী।

। ২ ।

গৌড়ের সিংহাসন সোলতান সোলেয়মান শাহের পৈতৃক সম্পত্তি নহে। ইহা তাঁহাকে আপন বুদ্ধি ও তরবারীর সাহায্যে উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এই বিজয়লব্ধ সিংহাসন রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুইটি প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একজন উৎকল-রাজ মুকুন্দদেব—অপরজন মোগল সম্রাট জালালউদ্দীন আকবর।[১]

এই দুই শক্তির মধ্যে মোগল-শক্তি দৃঢ়তর ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ছিল বলিয়া সুচতুর নবাব সোলেযমান প্রথম হইতেই মোগল-বাদশাহের সহিত বন্ধুত্বভাব রক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।[২] এই রাজনৈতিক-বন্ধুত্বের ভিত্তি কায়েম রাখিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে দিল্লী দরবারে মূল্যবান্ উপহারাদি প্রেরণ করিতেন।' সম্রাট আকবর বাংলার পাঠান নবাবের এই বন্ধুত্ব মূল্যবান মনে না করিলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহ তাঁহাকে এতই বেশী ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যে, সে সময় তিনি পূর্ব্ব-সীমান্তের উদ্ধত পাঠানের বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মোগলসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা বাবর শাহ্ প্রথম হইতেই ভারতীয় পাঠান-শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু-শক্তিকে নিয়োজিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র আকবর শাহ্ সেই নীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুস্থানের বিভিন্ন পাঠান-শক্তিগুলিকে নির্ম্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হন। সোলতান সোলেযমান খাঁ মোগলের এই ভেদ-নীতির সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন বলিয়াই যতদিন সম্ভব অন্ততঃ ততদিন মোগলের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া তিনি আপন শক্তি বৃদ্ধি করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার বহির্নীতি (foreign policy) সম্বন্ধে মোগল সম্রাটকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তিনি পলায়িত মোগল-রাজদ্রোহিগণকে বাংলা-বেহার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন--তাঁহার রাজ্যমধ্যে মস্‌জেদে মস্‌জেদে আকবর শাহের নামে খোতবা পাঠ ও তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচল করিতে আদেশ জারি করিয়াছিলেন।

পাঠানের সহিত মোঘলের এই রাজনৈতিক বন্ধুত্বের মূল্য সম্রাট আকবরকে কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিতে লইয়াছিল। মোঘল-শক্তিকে বন্ধুত্বের নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়া পাঠান সোল্‌তান সোলেয়মান খাঁ যখন নিশ্চিন্ত মনে উড়িষ্যা-বিজয়ে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন আকবর শাহ্ তাঁহার গোপন-বন্ধু উৎকল-রাজ মুকুন্দ দেবকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য এতটুকু ছলনাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।

বাংলা-বেহার-উড়িষ্যা-বিজয়ী বীর নবাব সোলেয়মান খাঁ তাঁহার স্বল্পকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে কখনো প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া সম-সাময়িক ইতিহাসে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। এই একটি মাত্র কারণে মোগল ঐতিহাসিকগণ প্রকারান্তরে সোল্‌তান সোলেয়মানকে মোগল সম্রাটের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্ত ধারণা। সোলেয়মান শাহের অষ্টবর্ষব্যাপী রাজত্বের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ ও সন্ধির সর্ত্তগুলি বিশ্লেষণ

(১) "Sulaiman was pressed on two sides the Hindu King of Orissa on the south and the Moghul power on the north west. His method of meeting this pressure was by maintaining friendly relations with the Moghul Court. Accordingly he allowed the Khutba to be read and money to be coined in Akbar's name and sent away political refugees from his kingdom. By this means he was enabled to carry on undisturbed hostilities against the Hindu power to the south in which he seems to have been on the whole succesful."

History of the Great Moghul by P. kennedy

(২) "Sulaiman found it advisable to send valuable presents from time to time to Akbar and to recognise his superior authority in a certain measure, with which the Emperor was content for the moment."

Akbar the Great Moghul. p 124 by V. A. Smith.

করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে, যে, প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। একটি নবীন রাজবংশ স্থাপন করিয়া, প্রতিকূল ঘটনা পরম্পরার মধ্যে নানাদেশ জয় করিয়া একটা শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সোলতান সোলেয়মান তেমন অবসর পান নাই। তাঁহার বিজয়-রথ কালের ইঙ্গিতে অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছিল আরব্ধ জয় যাত্রা অসমাপ্ত রাখিয়া বিজয়ী বীরকে মরণের কোলে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল (১৫৭২ খৃঃ)।

।৩।

গৌড়ের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইয়াই নবীন সোলতান সেই অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইলেন। প্রথমেই তিনি আপনাকে বাংলা-বেহার-উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করিলেন। মস্‌জেদে মস্‌জেদে তাঁহার নামে খোতবা পাঠ হইতে লাগিল--টাকশালে তাঁহার নামে মুদ্রা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল।

দায়ুদ শাহ্ তাঁহার পিতার রক্ষণশীল নীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মোগল ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে অতিশয় মন্দ বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন।[৩] কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মোগল সম্রাটের বেতন-ভোগী ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও আবদুল কাদির বদায়ুনীর মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

দায়ুদ শাহের বাংলা-সিংহাসনের দাবী কোনো অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বাধীন পিতার স্বাধীন সন্তানের পৈতৃক সম্পত্তিতে যে দাবী, বাংলার সিংহাসনে নবাব দায়ুদ খাঁর সেই দাবী বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু বাংলার শক্তিমান, পাঠান সামন্তগণ তাঁহাকে পৈতৃক সিংহাসনের উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার ন্যায্য দাবীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ মোগল-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন যে নরপতি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছেন মোগল ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকেই নানা অপ্রীতিকর বিশেষণে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রবল মহারাষ্ট্র শক্তির জন্মদাতা শিবাজীও একদিন এমনি ভাবে "পার্ব্বত্য-মূষিক" বলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন। অথচ এই "পার্ব্বত্য-মূষিকের" হস্তেই গর্ব্বিত মোগল-শক্তি কিরূপে বারংবার লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা মোগল ঐতিহাসিকগণ সঙ্কুচিত হইয়াও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু পাঠান সোলতান দায়ুদ শাহ্ মরণ-পণ করিয়াও নবোদিত মোগল-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া মোগলের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে তাঁহার নামে সহস্র অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে।

উৎকল-রাজ মুকুন্দ দেবের পরাজয়ে বাংলার নবাবের দুইজন সীমান্ত-শত্রুর মধ্যে একজনের নিপাত হইয়া গেল। অতঃপর বাংলার পাঠান ও দিল্লীর মোগলের মধ্যে আর কোনোই ব্যবধান রহিল না। সোলতান সোলেয়মান যে সুযোগ পাইবার আশায় অতি উচ্চমূল্যে মোগলের বন্ধুত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন--উড়িষ্যার হিন্দুশক্তি ধ্বংসের পর বাংলার নবাবের নিকট সে বন্ধুত্বের বড় বেশী দাম রহিল না। অতঃপর হীনতা স্বীকার করিয়া মোগলের বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে চাহিলেও বলদৃপ্ত মোগল শক্তিকে যে সে ছলনায় আর বেশী দিন ভুলাইয়া রাখা যাইত না, তাহা তদানীন্তন দিল্লীর রাজনৈতিক ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবের বিদ্রোহ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ষড়যন্ত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে--বিজয়ী-সম্রাট আকবর শাহের বিরাট-বাহিনী রাজপুতনার স্বাধীন-হিন্দুরাজ্য চিতোর আক্রমণ করিতে অভিযান করিয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহকে পদানত করিতে পারিলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে, তখন মোগলের বিজয়-রথ বাংলা অভিমুখে অভিযান করিতে যে এতটুকু কাল বিলম্ব করিবে না, তাহা দায়ুদ খাঁ ও সুবিজ্ঞ পাঠান-মন্ত্রী খান জাহান লোদী দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাংলার পাঠানের বন্ধুত্বের মোহে দিল্লীশ্বর যে তাঁহার পূর্ব্বসীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের গতি বেশী দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা নবাব ও তাঁহার মন্ত্রী কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

---

(৩) "That prince (Daud Shah), who was a dessolute scamp and knew nothing of the business of governing forsook the prudent measures of his father and assuming all the insignia of royalty, ordered the Khutba to be proclaimed in his own name through all the towns of Bengal and Bihar and directed the coins to be stamped with his own title, thus completely setting at defiance the authority of the Emperor Akbar"

Akbar the Great Moghul p 124 by V A Smith

উড়িষ্যার লুণ্ঠিত ধনদৌলতে তখন বাংলার নবাবের কোষাগার পরিপূর্ণ। দুর্গে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার কামান, তিন হাজার ছয় শত রণহস্তী ও কয়েক শত রণতরি নবাবের আদেশ অপেক্ষায় প্রস্তুত[৪]। এই অতুল ধনৈশ্বর্য্য ও রণসম্ভারের অধীশ্বর হইয়া পাঠান সুলতান দায়ুদ শাহ্ প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন না। যে বৃদ্ধ মন্ত্রী খান জাহান লোদীর মন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া সোলতান সোলেয়মান খাঁর রাজত্ব অপূর্ব বিজয়শ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল--সেই কূট রাজনীতিজ্ঞের পরামর্শ মতই নবীন সোলতান প্রকাশ্যে বাংলা সিংহাসনের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

শুধু স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই পাঠান-সোলতান ক্ষান্ত হইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আক্রমণমূলক বহির্নীতি অবলম্বন করিলেন। মন্ত্রী খাঁন জাহানই এই পরিবর্ত্তিত রাজনীতির জন্য বেশী পরিমাণে দায়ী। বিচার করিয়া দেখিলে এই পরিবর্ত্তিত রাজনীতি উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।[৫] সফলতা লাভ করিতে পারিলে এই নবপ্রবর্ত্তিত রাজনীতিই একদিন বাংলার সোলতান দায়ুদ খাঁকে, শের খাঁর মত, দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করিতে পারিত।

।৪।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দ।

সম্রাট আকবর তখন গুজরাটে পাঠান-বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। এমন সময় দূত মুখে সংবাদ পাইলেন, যে, বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ সসৈন্যে মোগল সীমান্তের জামানিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

নবাব দায়ুদ খাঁর এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ ও মোগল-দুর্গ অধিকারকে মোগল-ঐতিহাসিকগণ বুদ্ধিহীনতার কার্য্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন মোগল-ভারতের সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বাংলার সোলতানের এই আক্রমণকে অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক চাল বলিয়াই মনে হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই দায়ুদ খাঁ প্রকাশ্যভাবে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার নামে বাংলা-বেহার-উড়িষ্যার মস্‌জেদে খোতবা পঠিত হইতেছে, নবাবী টাকশাল হইতে নবীন সোলতানের নামাঙ্কিত মুদ্রা বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মোগল-পাঠানের মধ্যে এতদিন যে বন্ধুত্বের ভাণ ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে মোগল-আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল না।

গুজরাটের পাঠান-বিদ্রোহের সন্ধিক্ষণে মোগলের বিরুদ্ধে বাংলার নবাবের এই বিরাট অভিযান বাংলার ইতিহাসের এক পরম সৌভাগ্যের সামগ্রী। পাঠান-বাংলার ইতিহাসে এক শের শাহ্ ব্যতীত আর কেহই দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযান করিতে সাহসী হন নাই। পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনকে এমনিভাবে গুজরাট বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত দেখিয়া বাংলার পাঠান নবাব শের খাঁ মোগলের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করিয়া ছিলেন।[৬] আজ সেই দিল্লীর সম্রাটকে সেই গুজরাটের বিদ্রোহী পাঠান লইয়া বিব্রত থাকিতে দেখিয়া বাংলার পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁও এ মহেন্দ্র সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করিলেন না। তিনি অকস্মাৎ মোগলের জামানিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গ-শিরে পাঠানের পতাকা উত্তোলিত করিলেন।

আকবর শাহের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বিজয়ের ইতিহাসে সোলতান দায়ুদ খাঁর মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ এক অভিনব

---

(৪) 'He found himself in possession of immense treasure, 40000 well mounted cavalry, 140,000 infantry, 20,000 guns of various calibres, 3600 elephants and several hundred war-boats--a force which seemed to him' sufficient justification for a contest with Akbar, whom he proceeded to provoke by the seizure of the fort of Zamania, as a frontier post of the Empire. Akbar the Great Moghul. p.124 by V. A. Smith

(৫) 'Soleiman's vizier Khan Jahn Lodi.......seems to be a man of very considerable abilities'.......

History of the Great Moghul by P. Kennedy

(৬) The report of these rapid successes (of Sher Shah) had alarme'd Humayun during his residence in Guzrat an- Malwa; and now, after his return to Agra, made him march with his grand army to reestablish his authority in Behar' (1537)

ব্যাপার। মোগল-ঐতিহাসিকগণ এই পাঠান আক্রমণকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া ঘোষণা না করিলেও স্বয়ং মোগল-সম্রাট আকবর যে বাংলার নবাবকে হীন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করেন নাই, তাহা তাঁহার পাঠান দমনের বিরাট আয়োজন হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া যায়। স্বয়ং মোগল সম্রাট একাধিক বার দায়ুদ শাহের বিরুদ্ধে বাংলা সীমান্তের রণপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ সেনাপতি মোনায়েম খাঁ, রাজা টোডরমল, ভগবানদাস, মানসিংহ, বীরবল, হোসেন কুলি খাঁ, শাহবাজ খাঁ, কাসিম খাঁ (নৌ-সেনাধ্যক্ষ) প্রভৃতি বীরগণ একযোগে বাংলার উদ্ধত পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। —কোনো একজন শত্রুর বিরুদ্ধে, এমন কি চিতোর আক্রমণের সময়েও, মোগলকে এমন বিরাট সমর-সজ্জা করিতে দেখা যায় নাই।

বাংলার নবাবের পক্ষেও আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন সমর সচিব খান জাহান লোদী, উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য ধ্বংসকারী মহাবীর কালাপাহাড়, পাঠান-শার্দ্দুল গোজার খাঁ ও জোনেদ খাঁ প্রভৃতি সমরবিদ্‌গণ পাঠানের অপহৃত গৌরব উদ্ধারার্থে মোগল-সীমান্তে কোষমুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

পাটনা নগরীর উপকণ্ঠে হাজিপুরের বিশাল প্রান্তরে মোগল-পাঠানে প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোগল পক্ষে বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি খান খানান মোনায়েম খাঁ ও পাঠানপক্ষে পক্ককেশ সমরসচিব খান জাহান লোদী। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে উভয়পক্ষে বহু সৈন্য হত-নিহত হওয়ার পর বৃদ্ধ সেনাপতিদ্বয় রণক্লান্ত হইয়া এক যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষর করিলেন।

এমন বিরাট অভিযানের প্রারম্ভেই উপসংহার হইতে দেখিয়া যুধ্যমান শক্তিদ্বয় আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মোগল বাদশাহ মোনায়েম খাঁকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া পাঠাইলেন। খান জাহান লোদীকে ইহা অপেক্ষাও ভীষণতর শাস্তি ভোগ করিতে হইল। নবাব দায়ুদ খাঁ বৃদ্ধ সমরসচিবকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বন্দী করিলেন। তারপর কয়েকজন পার্শ্বচরের কুপরামর্শ মতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন।

কোন্ অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সোলতান দায়ুদ খাঁ পাঠানের এই পরম হিতৈষী বৃদ্ধ সচিবকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা সম-সাময়িক ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দায়ুদ খাঁর এই রাজনৈতিক হত্যা কোনো মতেই অনুমোদন করা যায় না। যাঁহার সুদীর্ঘ জীবন পাঠান-জাতির কল্যাণ-কামনায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যাঁহার সুমন্ত্রণায় ভূতপূর্ব্ব সোলতানের রাজত্ব বিজয়শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এমন কি ঘাতকের কুঠারে মস্তক ছিন্ন হইবার প্রাককালেও তিনি হত্যাকারী নবাবকে সুপরামর্শ[৭] দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা যে দায়ুদ খাঁর একান্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ--ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

এই হত্যা উপলক্ষ্যে মোগল-ঐতিহাসিক আবদুল কাদের বদায়ুনিও অত্যন্ত নিরপেক্ষ মন্তব্য[৮] প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পাঠান সমর-সচিব খান জাহান লোদীর হত্যাই যে দায়ুদ খাঁর পতনের একমাত্র মুখ্য কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অতঃপর মোগল-সম্রাট আকবর শাহ্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পাটনা ও হাজিপুরের পতন হইল (১৫৭৪ খৃ.)

পাঠান সোলতান দায়ুদ শাহ্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে বাংলা অভিযানের সময় মোগল-সম্রাট হুমায়ুন যে মন্থর যুদ্ধ-নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎপুত্র আকবর শাহও পিতৃপ্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিবেন, এই ভরসায় দায়ুদ শাহ্ অনেকটা আশান্বিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই মোগলের পূর্ব্ব রণ নীতি যে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে--প্রয়োজন হইলে নবীন মোগল-সম্রাট যে শ্রাবণ গগণের প্রবল বারিধারা মস্তকে ধরিয়া সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া সুদুর পূর্ব্ব-সীমান্তের রণ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে পারেন—এ বিষয়ে দায়ুদ খাঁ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বয়ং মোগল-সম্রাটকে পাটনায় যুদ্ধ পরিচালনার ভার হইতে দেখিয়া নবাব পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন।[৯]

---

(৭) "After I am killed, fight the Moghuls without hesitation. If you do not do so, they will attack you and you will not be able to help yourself." Akbar the Great Moghul by V A Smith

(৮) 'Thus, Daud struck his own foot with the axe and at the same time uprooted the plant of his prosperity with the spade of calamity'...

(৯) 'The capture of so great a city in the middle of the rainy season was an almost unprecedented achievement and a painful suprise to the Bengal Prince. He had reckoned on Akbar following the good old Indian custom of

পাটনা-হাজিপুরের পতনের পর যুদ্ধক্ষেত্রের পট পরিবর্তিত হইয়া গেল। অতঃপর বাংলার শ্যামল প্রাঙ্গণে পাঠান-মোগল মরণ-আহবে মাতিয়া উঠিল।

'মোগল মারী' নামক স্থানে পাঠান-সেনাপতি গোজার খাঁ যে অদ্ভুত রণ-কৌশল প্রদর্শন করিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। সেদিন পাঠানের বিজয়ের আসন্ন প্রাক্কালে সেনাপতি তোডরমল প্রধান সেনাপতি খান খানান্ মোনায়েম খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর না হইলে মেদিনীপুরের মৃত্তিকাগর্ভেই সমগ্র মোগল-বাহিনীকে সমাধি লাভ করিতে হইত। কিন্তু তখন মোগলের সৌভাগ্য-নদীতে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছিল। সেনাপতি তোডরমল পরাজয়ে বিচলিত না হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন মোগল বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিজয়ে উৎফুল্ল পাঠান সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া যুদ্ধের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু বাংলার পাঠান পরাজিত হইয়াও মরিল না। বালেশ্বর জেলার তুকরায় নামক স্থানে দায়ুদ খাঁ আবার মোগলের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতি মোনায়েম খাঁ নবাবের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।[১০] যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি আহত হইয়া পড়িলেন। রণলক্ষ্মী পাঠানের গলে বিজয়-মালা প্রদান করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর গোজার খাঁর পতনে পাঠান-বাহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল--সোলতান দায়ুদ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

তুকরায়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মোগল-সেনাপতি পরাজিত নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। এই যুদ্ধে এত অধিক সংখ্যক মোগল-সেনা নিহত ও আহত হইয়াছিল যে নবাবের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মোগল-সেনাপতি সে প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদন করেন (১২ই এপ্রিল, ১৫৭৫ খৃঃ)।

কিন্তু বাংলার পাঠান এই সন্ধি বেশী দিন মানিয়া চলেন নাই। গৌড়নগরে সেনাপতি মোনায়েম খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র নবাব সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বাংলা-বেহার-উড়িষ্যা হইতে মোগল-শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া দেন ও সুপ্রসিদ্ধ তেলিয়াগড়ি গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ভুক্ত করিয়া লন।[১১] সেই সময় অস্থায়ী মোগল শাসনকর্তা শাহেম খান্ পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।

বাংলার নবাবের এই অভিনব বিজয়-কাহিনী সম্রাট আকবর শাহের নিকট দুঃস্বপ্নের মত প্রতীয়মান হইল। মোগলের বিজয়ের ইতিহাসে পাঠান কর্ত্তৃক এই পরাজয় যেমন অভূতপূর্ব্ব, তেমনি লজ্জাজনক। মোগল-ঐতিহাসিকগণ এ পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছেন--শতশত সমরবিজয়ী সম্রাট আকবরের গৌরবময় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলার পাঠানের এই অপূর্ব্ব শৌর্য-বীর্য্য-কাহিনী অতি কষ্টে এতটুকু স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলায় মোগল-শক্তির পতনের সংবাদে দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়া মোগল-সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বাংলার পাঠানকে নির্ম্মূল করিবার জন্য সম্রাট স্বয়ং দ্বিতীয় বার বাংলা-সীমান্ত অভিমুখে ছুটিয়া আসিলেন (জুলাই ১৫৭৬ খৃঃ)।

নবাব দায়ুদ খাঁ মোগলের বজ্র বক্ষে ধারণ করিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাঠান অশ্বারোহীসহ রাজমহল-দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। বাদশাহের আদেশে নব-নিয়োজিত সেনাপতি হোসায়েন কুলি খান খান্ জাহান নবাবকে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করা মোগল-সেনাপতির সাধ্যে কুলাইল না। রাজমহল দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া সেনাপতি খাজা আবদুল্লাহ্ তাঁহার বাহিনী সহ সমূলে ধ্বংস হইলেন।

---

waiting till the Dashara festival in October to begin a campaign. But Akbar resembled his prototype Alexander of Macedon, in his complete disregard of adverse weather conditions and so was able to win victories in definance of the Shastras and the seasons' Akbar the Great Mogul, by V A Smith

(১০) "The action was forced on Munim Khan who was compelled to engage before he was ready. In the early stages of the conflict the imperial commander received several severe wounds and the victory seemd assured to the Bengal army. But later in the day, the fall of Daud's general Gujar Khan, caused fortune to change sides and brought about the total defeat of Daud, who fled from the field" Akbar the Great Mogul p 129 by V A Smith

(১১) "At Gaur the strong wind 'amounted to a typhoon' and in October swept away Munim Khan with multitudes of his officers and men. Pending the order of the Emperor, the army elected a stop-gup commander, but no body really competent was available and the officers thought only of getting out of odious Bengal with their booty, as quickly as possible. It seemed as if Bengal must be lost. Daud encouraged by the dissensions among the imperialists, did not scruple to break the treaty and re-occupy the country, even including the important Teliaghari Pass"
Akbar the Great Mogul p 144

এই দ্বিতীয় পরাজয়ের সংবাদে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের উপর দিয়া একটা আতঙ্ক বহিয়া গেল। [illegible] বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সাম্রাজ্যের সমগ্র সামরিক শক্তি একত্র করিয়া বাংলার পাঠানকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য সর্ব্বত্র পরওয়ানা জারী করা হইল। খান্ জাহানের পাঞ্জাব-বাহিনীর সহিত বেহারের শাসনকর্তা মোজফ্‌ফর খানের সমুদয় সৈন্য মিলিত হইল। পাটনা ও ত্রিহুত হইতে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং আগ্রার দুর্গ হইতে নৌকাযোগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরিত হইল। ইহার উপর স্বয়ং বাদ্‌শাহ যুদ্ধ পরিচালনা করিতে বাংলা সীমান্তে আসিতেছেন এই উত্তেজক সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র করা হইল।

নবাব দায়ুদ খাঁ সম্রাটের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি পাঠানের ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া রাজমহল দুর্গমূলে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী সহ দণ্ডায়মান হইলেন (১২ই জুলাই—১৫৭৬ খৃঃ)। দক্ষিণে পাঠান শার্দ্দুল জোনেদ খাঁ, বামে উৎকল-বিজয়ী বীর কালাপাহাড়, মধ্যস্থলে স্বয়ং সোলতান যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। ইহাই ইতিহাসে 'রাজমহলের যুদ্ধ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বাংলায় পাঠান সেদিন মরণপণ করিয়া লড়িল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মোগলের গ্রাস হইতে প্রনষ্ট পাঠান-গৌরবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। বীরবর জোনেদ খাঁ কামানের গোলায় আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেনাপতি কালাপাহাড়ের অঙ্গ মোগলাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। ছত্রভঙ্গ পাঠানকে সংঘবদ্ধ করিতে গিয়া ক্ষিপ্ত অশ্বসহ সোলতান দায়ুদ খাঁ পঙ্কে আপতিত হইলেন। মোগল-সৈনিকেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁর সম্মুখে হাজির করিলেন।

দায়ুদ শাহের কণ্ঠ তখন শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। পিপাসাতুর নবাব জল ভিক্ষা করিলেন। মোগল আমিরগণ নবাবের পাদুকা জলে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। নবাব সে জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিলেন না—ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করিলেন।[১২]

বন্দী পাঠান-নবাবের প্রতি মোগল যে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার দেখাইল তাহা সম্রাট আকবরের পূর্ব্বপুরুষ 'আল্লার-গজব' চেঙ্গিস খান ও তাইমুরলঙ্গের রক্তমাখা ইতিহাসেও অতুলনীয়। পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত ও আহত পাঠান-মন্ত্রী হিমুকে বন্দী অবস্থায় কিশোর আকবরশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সম্রাট স্বহস্তে নির্জীব পাঠান মন্ত্রীকে হত্যা করিয়া যে নৃশংস উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন,[১৩] রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী পাঠান সোলতানকে তেমনি সহস্র উপায়ে অপমান, নির্য্যাতন ও পরিশেষে হত্যা করিয়া মোগল সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ আপন প্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করেন। বিজিত পাঠান মন্ত্রী ও পাঠান নবাবের প্রতি মোগলের এই জঘন্য ব্যবহার মোগলের সভ্যতার ইতিহাসকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দুই সহস্র পূর্ব্বে পাঞ্জাবের বিজিত রাজা পুরু এমনি ভাবে সম্মুখ-যুদ্ধে বন্দী হইয়া বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন। সেদিন গ্রীক্ বীর বন্দীর প্রতি রাজোচিত ব্যবহার করিয়া যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে তাহা আজও সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আজিও, যুগযুগান্তর পরেও, রাজা পুরুর প্রতি বিজয়ী গ্রীক সম্রাটের সেই রাজোচিত ব্যবহারের কথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু বিজয়ী মোগল-সেনাপতি বিজিত পাঠান-সোলতানের প্রতি যে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সুধীসমাজ এখনও শিহরিয়া উঠিয়া থাকেন। তিনি নবাব দায়ুদ খাঁর প্রতি শুধু মৃত্যুদণ্ড দিয়া তৃপ্ত হইলেন না, নিহত নবাবের ছিন্নমুণ্ড সম্রাটের নিকটে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তাণ্ডা নগরীর সহস্র সহস্র নরনারীর সম্মুখে নবাবের মস্তকহীন দেহটাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া বাংলার স্বাধীন পাঠান ইতিহাসের গৌরবময় যুগের অবসান করিলেন।[১৪]

পাঠানের অপহৃত-গৌরব উদ্ধারার্থে মহাবীর দায়ুদের এই শহীদের মৃত্যু, কারবালার শহীদ ইমাম হোসেন বা ফরাসী-

(১২) "Daud being overcome with thirst asked for water. They filled his slipper with water and brought it to him.. he refused to drink" Badauni P.245

(১৩) Akbar the Great Moghul. By V A Smith

(১৪) "So he ordered them to cut off his head They took two chops at his neck without success, but at last they succeeded in killing him and in severing his head from his body. Then they stuffed it with straw and anointed it with perfumes and gave it in charge to Syed Abdullah and sent him with it to the Emperor. Daud's headless trunk was gibetted at Tanda.' Babauni p 245

বারাঙ্গনা জোয়ান অব আর্কের মৃত্যুর মতই গৌরবোজ্জ্বল ও বেদনাময়। শহীদ ইমাম হোসেনের কাহিনী আজ মুসলিম-জাহানের প্রতি নরনারীর নিকটে সুপরিচিত। ফরাসী জাতি আজো জোয়ান অফ্ আর্কের আত্মবিসর্জ্জন কাহিনী গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য নবাব দায়ুদ খাঁর শাহাদাতের কথা বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই মোগল হস্তে তাঁহার শোচনীয় পরিণামের ইতিহাস পড়িতে বসিলে দুঃসহ বেদনায় অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে, মহাবীরের উদ্দেশ্যে দুই ফোটা আঁখিজল ঝরিয়া পড়ে।

মোগল-ভারতের যে কয়েকটি মাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র জগতের স্বাধীনতার ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার মধ্যে রাজপুত-গৌরব প্রতাপ সিংহের নাম কর্ণেল টডের লিপিচাতুর্য্যে সুধীবৃন্দের নিকটে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পাঠান-নবাব দায়ুদ খাঁর গৌরব-গাথা গাহিবার জন্য কোনো 'টড' এ পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করেন নাই বলিয়া দায়ুদ খাঁ আজও সকলের নিকটেই অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন।

সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে রাণা প্রতাপ-সিংহ ও নবাব দায়ুদ খাঁর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রতাপসিংহ মোগলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে আপনার ধনমান জীবন যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন--দায়ুদ খাঁ মোগলের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রনষ্ট পাঠান গৌরব উদ্ধার করিতে গিয়া শহীদ হইয়াছিলেন।

এই বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান থাকা হেতু প্রতাপ নন্দন অমর সিংহ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবামাত্র মোগল রাজপুতের যুদ্ধের অবসান হইয়া গিয়াছিল। আর অনুতপ্ত বাদশাহ চিতোর-ধ্বংস পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাজপুত শহীদ জয়মল্ল ও পুত্তের প্রস্তরমূর্ত্তি দিল্লীর তোরণে সংস্থাপিত করিয়া রাজপুত জাতির চিত্ত অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন [১৫]। বাদশাহের এই কার্য্য সমগ্র রাজপুত জাতির অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, তাই ঐ তারিখ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া রাজপুত জাতি সমগ্র ভারতে মোগলের নিশান-বরদার হইয়া বেড়াইয়াছিল।

কিন্তু পাঠান-নবাব দায়ুদ খাঁকে হত্যা করিয়াও সম্রাট আকবর বাংলার পাঠানকে বশীভূত করিতে সক্ষম হন নাই। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কতলু খাঁ, ওসমান খাঁ ও ঈসা খাঁর মত পাঠান-বীরগণ বাংলা-বেহার-উড়িষ্যায় যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন সে আগুনে সহস্র সহস্র মোগল-রাজপুতকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল।

রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ যে হীনতা স্বীকার করিয়া মোগলের রোষ হইতে আপনাকে ও আপনার জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নবাব দায়ুদ খাঁ বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মোগলের নিকটে ততটুকু হীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বাংলার পাঠান বুকের শেষ শোণিত বিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অসি কোষবদ্ধ করেন নাই--মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহ ভিখারী হইয়া দাসের জীবন যাপন করিতে সম্মত হন নাই।

উত্তরকালে পাঠানের এ দাম্ভিকতার মূল্য বাংলার সমগ্র মুসলিম-সমাজকে করার গণ্ডায় পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। বাংলা-বিজয়ের পর মোগল-বাদশাহগণ সহস্র উপায়ে নির্যাতন করিয়া বাংলার শক্তিশালী পাঠান অভিজাতসম্প্রদায়কে হতশ্রী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাঠান আমলের জায়গীর, আয়মা, লাখেরাজগুলি মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি তোডরমল্লের বাজেয়াপ্ত আইনের কবলে পড়িয়া উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল।

বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্যের ধনী ও মানি ব্যক্তিগণ এমনিভাবে সৌভাগ্যের শিখরদেশ হইতে একেবারে পথের কাঙাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজিকার বাংলার মুসলিম সমাজের জঘন্য দরিদ্রতা ও মুর্খতার জন্য মোগল সম্রাটগণ কতখানি দায়ী, তাহা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক মহাগবেষণার বিষয়।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ দায়ুদ খাঁ ও প্রতাপসিংহের পতনের ইতিহাসের উপসংহারে লিখিয়াছেন ঃ--

'The historians of Akbar, dazzled by the commanding talents and unlimited means which enabled him to gratify his soaring ambition, seldom have a word of sympathy to spare for the gallant foes

(১৫) 'One of the acts gratifying to national vanity' which helped to heal the wounds of the Rajput heart, was the erection of fine statues in honour of Jaimall and Patta, the defenders of Chitore."

whose misery made his triumph possible. Yet, they too, men and women are worthy of remembrance. The vanquished, it may be, were greater than the victors.

(Akbar the Great Moghul p. 154)

ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বাংলার তরুণ-মুসলিমকে আজ পাঠান স্বাধীনতার শেষ প্রতীক্ দায়ুদ খাঁ, জোনেদ খাঁ, কতলু খাঁ, ওসমান খাঁ ও ঈসা খাঁর গৌরবময় উজ্জ্বল চিত্রগুলি উন্মোচন করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিতে হইবে। সে সমস্ত বীরসন্তান পাঠানের গৌরব উদ্ধার করিতে গিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, যাঁহাদের পবিত্র রক্ত এখনো বাংলার মুসলিমের শিরায় শিরায় বহিতেছে, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় নামগুলি যদি মুসলিম সমাজের নিকটে চিরদিনই অপরিচিত রহিয়া যায়, তবে অতীতের আর কোন্ আলেখ্য আজিকার তরুণ-মুসলিমের নিকটে অধিকতর গৌরব করিবার, শ্রদ্ধা করিবার ও অনুকরণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া সমাদর লাভ করিবে?

গান

নজরুল ইসলাম

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ ডুবিয়া যাই এখন
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন।
তুমি সুখে থাক আমি চলে যাই
তোমারে চাহিয়া ব্যথা যেন পাই,
জনমে জনমে এই শুধু চাই
নাই যদি পাই মন।।
ভয় নাই রাণি, রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের লেখা।
জলের লিখন শুকাবে প্রভাতে
আমি চলে যাব একা।।
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা
ভুলিতে কতক্ষণ?

আহ্‌লে সুন্নত

আবুল মনসুর আহ্‌মদ বি-এল

--নক্‌শা--

বেহেশ্‌তের হুর-পরীর প্রতি ছেলেবেলা হইতেই হালিমের বিশেষ একটা লোভ ছিল। সে তখন নিতান্ত ছেলে মানুষ হইলেও এবং হুরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত না থাকিলেও মৌলবী সাহেবানের ওয়াযে যখন হুরের সুরৎ ও চাঁদের সুরতের সূক্ষ্ম সমালোচনামূলক বিচার হইত, তখন সে মুখের পরিসর এতটা বড় করিয়া সে-ওয়ায শুনিত যে, অনেকে মনে করিত সে মৌলবী সাহেবকে মুখ ভেঙচাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু আসলে সে বিদ্রূপ করিত না। ওয়াযের মধ্যে হুরের উল্লেখ থাকিলেই সে কল্পনায় বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইত, এবং সেখানে বেহেশ্‌তের কামরায় উকি মারিয়া হুরদের সুরৎ দেখিত, ওয়াযের অবশিষ্টাংশ আর তার শোনা হইত না। সুতরাং দুযখের ভীষণ আযাবের বয়ান সে কোনো দিন শুনিতে পায় নাই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই লোভ বাড়িল। হজরত পয়গম্বর সাহেবের সুপারিশ ব্যতীত কাহারো পক্ষে বেহেশ্‌তে যাওয়া সম্ভব নহে, একথা হালিম বহু ওয়াযেই শুনিয়াছিল। এ কথাও সে যবরদস্ত আলেমের মুখে শুনিয়াছিল যে, কেয়ামতের সেই সখ্‌ত্‌ আযাবের দিনে হযরত পয়গম্বর সাহেব বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বপ্রথম সেই সমস্ত লোকের সুপারিশ করিবেন যাহারা দুনিয়ায় তাঁহার সুন্নত পালন করিয়াছে। উক্ত যবরদস্ত আলেম সাহেব একটা আরবী বচন (বোধ হয় সহী হাদিসই হইবে) আবৃত্তি করিয়া তার মানে বলিলেন যে হজরত বলিবেন, "আমাকে দুনিয়ার যাহারা ভালবাসিয়াছে, আজ তাহাদিগকে আমি ভালবাসিব।"

সুতরাং হালিমের আর তিল মাত্র সন্দেহ রহিল না যে, আমাদের বেহেশ্‌ত সুতরাং হুর লাভ করিবার একমাত্র উপায় হজরত পয়গম্বর সাহেবের সুন্নত পালন করা।

হালিম আর অধিক সময় নষ্ট করা সমীচীন বোধ করিল না, সে ভাল ভাল আলেম সাহেবদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বড় বড় অক্ষরে হজরতের সুন্নতের একটা লিষ্টি তৈয়ার করিয়া শুইবার ঘরে দেওয়ালে লট্‌কাইয়া রাখিল। সে একটা একটা করিয়া সুন্নত পালনে মনোনিবেশ করিল।

সে দাড়ী ও বাব্‌ড়ী লম্বা করিল। গোঁফটা ক্ষুর দিয়া নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল। অক্‌সফোর্ডের নূতন জুতা জোড়া অর্দ্ধেক দামে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। শার্ট পাঞ্জাবী বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া সে লম্বা কোর্ত্তা তৈয়ার করিল; তাতে একটা মাত্র বোতামের ঘর থাকিল, ঝিনুকের বোতাম অসিদ্ধ বলিয়া তাতে কাপড়ের পুটুলীর বোতাম লাগাইল। কাপড়ের পুটুলীর বোতাম লাগানো সুন্নত। কিন্তু চুড়ীদার পায়জামা তৈয়ার করিয়া সে মুশ্‌কিলে পড়িল। এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েৎ হইয়াছে। কেহ ফর্‌মাইতেছেন যে, হজরত তহবন্দ করিতেন, কেহ ফরমাইতেছেন যে, তিনি পায়জামা পরিতেন। সুতরাং হালিম ভীষণ ভাবনায় পড়িল। টুপী ও পাগড়ী লইয়াও সে এমনি মুশকিলে পড়িয়াছিল--কেহ বলিলেন হজরত পাগড়ী পরিতেন, কেহ বলিলেন তিনি টুপী পরিতেন। কিন্তু হালিম অতি সহজেই এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইল। সে টুপীর উপর পাগড় বাঁধিত; সুতরাং যেটাই সুন্নত হোক, তাতে হালিমের সওয়াব কাটা যাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু পায়জামা-তহবন্দের সমস্যা সে অত সহজে মিটাইতে পারিল না। কোনো কোনা আলেম বলিয়াছিলেন বটে যে, ঐরূপ সন্দেহস্থলে একটা পরিলেই চলিবে; কিন্তু সতর্ক হালিম সেভাবে ঠকিতে প্রস্তুত ছিল না। সে বলিল "ধরুন, যদি না-ই চলে, তবে ত মস্ত একটা সুন্নত নষ্ট হয়।" সুতরাং অন্য কোন রূপে মনকে প্রবোধ দিতে না পারিয়া সে পায়জামার উপরই তহবন্দ পরিতে লাগিল।

। ২ ।

সুন্নত প্রতিপালনে হালিম গভীর মনোনিবেশ করিল। নামাজের মধ্যে সে ফরজ অপেক্ষা সুন্নতেই বেশী মন দিল। ওয়াক্তিয়া নামাজে সে ফরযটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইয়া সুন্নত নামাজে মশ্‌গুল হইয়া পড়িত। ওয়াক্তিয়া নামাজ ব্যতীত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সে এশ্‌রাক, চাশ্‌ত্, সালাতে আত্তযাবীন, সালাতুত্‌ তস্‌বিহ্, এশ্‌তেখারা এবং তাহাজ্জুদ পড়িত। তাছাড়া সূর্য্যগ্রহণে কসুক ও চন্দ্রগ্রহণে খসুক, এবং সামান্য গরম পড়িলেই বৃষ্টি হওয়ার জন্য এস্তেস্কার নামাজ পড়িত। শুধু নামাজে নহে, অন্যান্য কাজেও হালিম কোনো সুন্নত আদায়ের সুযোগ ত্যাগ করিত না। সে প্রত্যহ কুলুখ করিত। কুলুখ করিবার জন্য সে তাহাদের পাকা পায়খানায় এত ঢেলা জড় করিল যে, তাতে পায়খানার অভ্যন্তরে হাজত রফাকারীর গোঞ্জায়েশ হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িল। এস্তেঞ্জা করিবার পর কুলুখকার্য্য উপলক্ষে সে যখন দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরিয়া পুকুরের পাড়ে পায়চারী করিত এবং পুরাপুরি সুন্নত পালনের জন্য উঠ্‌বস্ করিত, তখন সে ব্যায়াম করিতেছে মনে করিয়া পাড়ার বহু ছেলেমেয়ে তার চারিপাশে ভিড় করিত। সে লজ্জায় দৌড়িয়া কলার ঝোপে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বেশরম বলিয়া গাল করিত। তারপর সে দুইবার অযু করিত, একবার এস্তেঞ্জার জন্য, আরেকবার ছেলেদের গালি পাড়িবার জন্য। কারণ ফাহেসা কথা বলিবার পর অযু করা সুন্নত। বাড়ীতে কোনো মেহমান আসিলে যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার আগে একবার অযু করিয়া লইত। কারণ সালাম আলায়কুম করার আগে অযু করা সুন্নত। একবার এক ভিক্ষুক তাহাকে সালাম করিয়াছিল। তদুত্তরে সে ভিক্ষুককে বলিয়াছি "একটু অপেক্ষা কর বাপু।" বলিয়া সে দৌড়িয়া পুকুরের ঘাটে নামিয়া অযু করিয়া সেই ভিক্ষুকের কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, "ওয়া আলায় কুমুস্ সালাম।" ভিক্ষুক অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভিক্ষা না লইয়া দ্রুতপদে সেখানে হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং চলিয়া যাইবার সময় সে পুনঃ পুনঃ পিছন ফিরিয়া দেখিয়াছিল হালিম তাকে তাড়া করিতেছে কিনা। মোট কথা, নামাজে, অযুতে এবং কুলুখে হালিমকে প্রায় হামেশাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। যে কেহ যে কোনো সময় হালিমদের বাড়ীতে গেলে দেখিত, হালিম উপরোক্ত তিন কাজের একটিতে ব্যস্ত আছে।

গ্রামের হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে সে পড়িত। পড়িত মানে, স্কুলের খাতায় নাম ছিল। স্কুলে সে বড় একটা যাইত না, কারণ যোহরের নামাজের সময় কুলুখ করিতে গিয়া তাহাকে সহপাঠীদের নিকট বড়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতে। কুলুখ করিবার জন্য সে প্রত্যহ নূতন নূতন নির্জ্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু দুষ্ট সমপাঠিরা গোয়েন্দা লাগাইয়া তাহাকে প্রত্যহই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। অগত্যা সে স্কুলে যাওয়া একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিল। মা দুই একবার তাহাকে স্কুলে যাইবার জন্য তাকিদ করিয়াছেন, তাহার বাপের ভয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু হালিম ত আর দুষ্টামীর জন্য স্কুল ছাড়িয়া দেয় নাই, সে দীন ইস্‌লামের জন্যই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, সুতরাং মা-বাপকে ভয় করিবার তাহার কোনো কারণ ছিল না। কাজেই মার শাসানির উত্তরে সে বলিত, "স্কুলে পড়িয়া কি হইবে? পয়গম্বর সাহেব কি কোনো দিন স্কুলে পড়িয়াছিলেন? তার চাইতে এবাদত বন্দেগী করিয়া দিন কাটানোই কি ভাল নয়?" মা একে ত ধর্ম্মপ্রাণা মেয়ে লোক, তার উপর এসব অকাট্য যুক্তির উত্তর দেওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই তিনি বেশী কিছু বলিতেন না।

। ৩ ।

হালিমের বাপ মাদ্রাসা পাশ-করা মৌলবী। তিনি অন্যত্র এক হাই স্কুলে আরবী-পারসী শিক্ষকের কাজ করিতেন। তিনি এক ছুটীতে আসিয়া হালিমের সুন্নতপ্রিয়তা দেখিয়া অবাকও হইলেন, ক্রুদ্ধও হইলেন, কিন্তু বিপদে পড়িলেন সব চাইতে বেশী। তিনি নিজে পরহেযগার মুত্তাকী আলেম ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আঠারো বৎসরের সুন্দর ছেলে যে মুখে এক বোঝা দাড়ী, গায়ে লম্বা কোর্ত্তা, পরনে তহবন্দ ও পায়ে নাগরা জুতা পরিয়া অমন কাবুলী মার্কা চেহারা করিবে, সুন্নতের নামে এমন অনাচার তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ এ বিষয়ে ছেলেকে স্পষ্ট করিয়া বারণও তিনি করিতে পারিতেন না। সেজন্য তিনি মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেন।

কিন্তু এবার বাড়ী আসিয়া হালিমের সুন্নত-প্রিয়তার যে বাড়াবাড়ি দেখিলেন, তাতে রাগে তাঁহার শরীর গির্ গির্ করিতে

লাগিল। পরে বিবীর মুখে যখন তিনি ক্রমে শুনিতে পাইলেন হালিমের তহবন্দের নীচে পায়জামা ও পাগড়ীর ভিতরে টুপী আছে, তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়া ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বিবীকে বলিলেন, "বল কি, মাথা খারাপ হয় নাইত?" বিবী যখন বলিলেন যে মাথা খারাপ হওয়ার অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, তখন তিনি একটু শান্ত হইলেন। বিবী তখন কি ভাবে হালিম সমস্ত পরিবারকে সুন্নতের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, কি ভাবে হালিম তাহার মার পোযাক-পরিচ্ছদে এমন কি রান্না-বান্নার কাজে সুন্নত প্রচার করিয়াছে, ঠিক সুন্নত মোতাবেক যবেহ করা হয় নাই বলিয়া কিভাবে হালিম একদিন একটা মোরগ ফেলিয়া দিয়াছিল, মেয়ে লোকের বেণী গাঁথা সুন্নত বলিয়া কি ভাবে হালিম তাঁহার মত বৃদ্ধা স্ত্রীলোককেও জোর করিয়া বেণী গাঁথাইয়াছিল, এশার নামাজের পর পুরুষের দাড়ী ও মেয়েলোকের চুল আচড়াইয়া খুশ-বু লাগানো সুন্নত বলিয়া কি ভাবে হালিম দুপুর রাতে তাঁকে জ্বালাতন করিয়াছে, এই সব কথা এমন করুণ-সুরে বলিলেন যে মৌলবী সাহেব বহু কষ্টেও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মৌলবী সাহেবকে হাসিতে দেখিয়া বিবীর দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন "আপনি যা হয় এবার ওর একটা ব্যবস্থা করিয়া যান, আমি ওয়া জ্বালাতন আর সইতে পারি না।" মৌলবী সাহেব বহু কষ্টে হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন "ও এত সব করে, অতে পড়াশোনাই বা করে কখন, স্কুলেই বা যায় কখন?" বিবী উৎসাহভরে বলিলেন, 'স্কুলে সে যায় না, আর পড়াশোনা ত বুঝিতেই পারিতেছেন।'

মৌলবী সাহেব লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "বল কি? সে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে? হালিম, হালিম, এদিকে আস তা বাবা।" অসহ্য রাগ গোপন করিবার জন্য তিনি অতি কষ্টে জোর করিয়া বাবা শব্দটীর প্রয়োগ করিলেন।

মৌলবী সাহেব যখন বাড়ী আসেন তখন হালিম সালাতুৎ তস্‌বিহ পড়িতেছিল। এই নমাজে প্রত্যেক রেকাতে সুরা ফাতেহার পর এগার বার আয়াতুল কুরসী এবং প্রত্যেক দুই রেকাতের মধ্যে এক হাজার বার দরুদ ও সত্তুরবার সুরে এখলাস পড়িতে হয় বলিয়া নামাজ শেষ করিতে হালিমের সময় লাগিয়াছিল। নামাজ শেষ করিয়া পিতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সে আবার অজু করিতে বসিয়াছিল, এমন সময় এস্তেঞ্জা লাগায় সে এস্তেঞ্জা ও কুলুখাদিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য চাবি ঘন্টা আগে তাহার পিতা ছয় মাস পরে বাড়ী আসাতেও পিতার সঙ্গে এযাবৎ দেখা করিবার সময় পায় নাই। পিতা যখন তাহাকে ডাকিলেন তখন সে এস্তেঞ্জা-কুলুখাদি সমাপনান্তে অজু করিতেছিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিয়া মোসাফেহা করিবার জন্য পিতার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কারণ সে ভাল ভাল আলেমের মুখে শুনিয়াছিল যে, কদমবুচি করা বেদাআৎ এবং মোসাফেহা করা সুন্নত। নিজের ছেলেকে এভাবে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াইতে দেখিয়া মৌলবী সাহেব অবাক হইয়া গেলেও অভ্যাস বশে তিনিও হাত বাড়াইয়া দিলেন। ছেলের হাত প্রত্যাখ্যান করিতে তিনি কতকটা সঙ্কোচও বোধ করিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার ভারি রাগ হইল। তিনি অপমানও বোধ করিলেন।

ছেলেকে বসিতে বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি রীতিমত স্কুলে যাইতেছ ত?'

"জি না, আজকাল যাই না।"

"কেন?"

হালিম একটু ভাবিয়া জওয়াব দিল, "দীন-ইসলাম রক্ষা করিয়া স্কুলে যাওয়া সম্ভব নহে।"

"কেন অসম্ভব?" মৌলবী সাহেবের কণ্ঠে একটু উষ্মা ফুটিয়া উঠিল।

হালিম কুলুখ-কার্য্যে সমপাঠিদের বাধাদানের কথাটা বাপকে জানাইতে কি রকম একটা লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিল না। কাজেই বলিল, "স্কুলে যাইতে হইলে অনেক সুন্নত তর্‌ক করিতে হয়।"

পিতা এবার সত্যই রাগিয়া গেলেন। তিনি রাগ গোপন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'সুন্নত তর্‌ক হয় বলিয়া তুমি স্কুলে যাইবে না? জান, বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয?'

পিতার রাগ দেখিয়া হালিম একটু ভয় পাইল! সে সুর নরম করিয়া বলিল, "জানি, কিন্তু সে ত ইংরাজী বিদ্যা নয়, সে দিনী এলেম।"

পিতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। "বলিলেন, কে বলিয়াছে একথা?"

হালিম আরও নরম সুরে বলিল, "আলেমরা ত বলেন।"

"আমরাও ত হাদিস-কোরআনের কিছু খবর রাখি।" পিতার কণ্ঠে একটা অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া বলিলেন "না, একথা তোমার বিশ্বাস হয় না।" পিতার অভিমানের সুরটুকু ধরিতে না পারিলেও হালিম শেষ কথার শ্লেষটুকু ধরিতে পারিল। তাহারও কড়া কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "যাঁহারা হাদিস কোরআন মানিয়া চলেন, তাঁহারাই প্রকৃত আলেম।" কথাটা হালিম যতটা নরম করিয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, ততটা নরম হইল না। পিতা ইহাকে দস্তুর মত বেতমিজী মনে করিয়া লাফাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন "কী, আমি কোরআন হাদিস মানি না? একথা তুমি বলিতে চাও?"

মৌলবী সাহেবের ক্রোধ দেখিয়া হালিম এক পা পিছাইয়া গেল। তিনি হালিমকে মার-ধর করিবেন আশঙ্কা করিয়া তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন।

হালিম আমতা-আমতা করিয়া জওয়াব দিল--"সুন্নতের পা-বন্দ না হইয়াও কি কোরআন-হাদিস মানা সম্ভব?"

মৌলবী সাহেব কি জওয়াব দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। হালিম স্থির বুঝিয়া লইল, পিতা পরাজিত হইয়াছেন। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মৌলবী সাহেবও বুঝিলেন, তিনি ছেলের সঙ্গে তর্কে হারিয়া গেলেন। অথচ ব্যাপারটাকে এইখানেই শেষ হইতে দেওয়া তিনি উচিৎ মনে করিলেন না। সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা-সূচক কোনো কথা না বলিলেও ছেলেকে কি করিয়া ফেরানো যায়, তিনি তাই ভাবিতে ছিলেন। বলিলেন, "সুন্নত পালন কর ভাল, কিন্তু সুন্নতের নামে যা-তা করিলে চলিবে কেন?"

হালিম প্রশ্নটা বুঝিল না। বলিল "যা-তা কি করিলাম?"

মৌলবী সাহেব পুত্রের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন "সুন্নতের নামে বাড়াবাড়ি করিলেই সুন্নত পালন করা হয় না।"

হালিমের তহবন্দের নীচে তখনও পাযজামা ছিল। পিতা সেদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন মনে করিয়া তার রাগ হইল। কারণ ঐ ব্যাপার লইয়া সম-বয়সীরা তাকে এত ক্ষ্যাপাইয়াছে যে, এখন উহার উল্লেখমাত্রে তার রাগ হইত। সে অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া দেওয়ালে লট্‌কানো পিতার পোষাক-পাতির দিকে চাহিয়া বলিল "আলপাকার শেরওয়ানী, তুর্কী টুপী ও ডার্বি জুতা পরিলেই কি সুন্নত পালন করা হয়?"

মৌলবী সাহেবের মুখ লজ্জা ও ক্রোধে লাল উঠিল। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, ছেলের এই বেআদবীর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি নিজে ছেলের পোষাকের প্রতি কটাক্ষ না করিলে ছেলে এমন কথা বলিতে সাহস করিত না। তাই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। হালিম বিজয়ীর মুখ-ভরা আনন্দ লইয়া বিদায় লইল।

।৪।

ইহার পর মৌলবী সাহেব বিবীর সঙ্গে উপর্য্যুপরি কয়দিন কি পরামর্শ করিলেন। হালিম যাতে তাঁহাদের পরামর্শের এক বর্ণও জানিতে না পারে, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

একদিন মৌলবী সাহেব হালিমের নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। হালিম প্রথমটা আপত্তি করিল। কারণ বেহেশ্‌তে তাহার জন্য অসংখ্য হুর রিজার্ভ রাখা হইয়াছে, এ বিষয়ে সে একরূপ নিঃসন্দেহ ছিল। কাজেই বিবাহে তাহার অনিচ্ছা ছিল।

কিন্তু মৌলবী সাহেব যখন স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, বিবাহ করা সুন্নতে-রসুলুল্লাহ্, তখন সুন্নতের অত বড় পা-বন্দ হালিম আর কোনো মতেই আপত্তি করিতে পারিল না।

বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। আমাদের দেশের বিবাহ-শাদীতে যে সমস্ত বিধি নিয়ম প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই হালিমের নিকট সুন্নতের বরখেলাফ বলিয়া গণ্য হইল। বর ও কন্যা উভয় পক্ষকে নানা অসুবিধায় ফেলিযাও সে পুরাপুরি সুন্নত অনুযায়ী বিবাহ কার্য্য সমাধা করাইল।

মোটের উপর বিবাহে কোনো সুন্নতই লঙ্ঘন হইল না। দেশে হালিমের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। দীনদার মুসলমান ভাই সাহেবদের দস্তরাজি ইস্লামের তরক্কীর সম্ভাবনায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে বধূর সঙ্গে শাহ-নজর করাইবার জন্য হালিমকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। হালিমের বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল, কতকটা সুন্নতের বরখেলাফ হইবে ভয়ে, কতকটা লজ্জায়। হালিম ইতিপূর্ব্বে বধূর রূপগুণ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারিলেও বধূর রূপ সম্বন্ধে সে মনে মনে একটা ধারণা করিয়া রাখিযাছিল। বিভিন্ন পুঁথিতে সে বেহেশ্‌তের হুরদের অনেক রূপবর্ণনা পড়িয়াছিল। হুরদের চেহারা সম্বন্ধে তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। বেহেশ্‌তের হুরের মত সুন্দরী দুনিয়ায় সম্ভব নহে ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইলেও তাহার প্রাণের এক কোণে তাহার ভাবী স্ত্রীর যে চেহারা তাহার এক রকম অজ্ঞাতসারেই আঁকা হইয়া গিয়াছিল, শাহ-নজর করিতে রওয়ানা হইবার সময় হালিম ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিল, তা হুরদের চেহারার নিতান্তই কাছাকাছি। কল্পনা-নেত্রে স্বীয় স্ত্রীর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া আনন্দে তাহার রোমাঞ্চ হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার মানস-সুন্দরী সোনালী ফুল-তুলা বেগুনী রঙ্গের বেনারসী শাড়ী পরিয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছে। সে গিয়া বিছানার নিকট দাঁড়াইল।

ঘরে চাপা খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। হালিম চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অনেকগুলি শাড়ী জোড়া দিয়া ঘরটিতে পর্দ্দা করা হইয়াছে। পর্দ্দার অন্তরালে অনেক মেয়েলোক বিরাজ করিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। বেগানা আওরতের উপর নজর পড়িতে পারে মনে করিয়া হালিম মাথা নত করিল। আবার চাপা হাসির গুঞ্জন শোনা গেল। শালীদের অত্যাচারের কথা হালিমের কিছু কিছু শোনা ছিল, সুতরাং পর্দ্দান্তরালস্থিতা সমস্ত স্ত্রীলোককে শালী মনে করিয়া লইয়া হালিম তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বস ভাই বস, আমি তোমার দাদী শ্বাশুড়ী।" হালিম দাদী-শ্বাশুড়ীকে দেখিয়া বলিল, "আস্‌সালামু আলায়কুম।" সে কদমবুসী করিত না, কারণ উহা সুন্নতে বরখেলাফ।

পর্দ্দার আড়ালের হাসি এবার একটু উচ্চতর হইল।

বৃদ্ধাও হাসিলেন। তিনি হালিমের হাত ধরিয়া এক রকম জোর করিয়াই কন্যার সাম্‌নে তাহাকে বিছানায় বসাইলেন। স্বীয় মানস-প্রতিমার এতটা নিকটবর্ত্তী হওয়ার হালিমের সর্ব্বশরীরে কম্পন উপস্থিত হইল। সে দেখিল কন্যার একপাশে শরবতের গ্লাস ও পান সাজানো রহিয়াছে। সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ রূপসী নিজ হাতে ঐ পান ও শরবৎ তাহাকে খাওয়াইবে ভাবিয়া পুলকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হালিমের দম আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইতে লাগিল।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভাই, কন্যার মুখ দেখ, লজ্জা করিও না।" বলিয়া ধীরে ধীরে কন্যার মুখের ঘোমটা টানিয়া তুলিলেন।

হালিমের সমস্ত উন্মুখ আগ্রহ তীরবেগে বধূর মুখের উপর পতিত হইয়া যেন পাথরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে এ কি দেখিল? এ যে পঞ্চাশ বছুরে বুড়ী! বেহেশ্‌তের হুরীর সঙ্গে ইহার যে কোনো মিল নাই! ঠোঁটে কামড় দিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকায় কন্যার মুখ আরো ভীষণ কদর্য্য দেখাইল। হালিমের চক্ষের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চৈতন্য লোপ হইল।

সম্মিলিত উচ্চ হাসিতে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, শুনিল পর্দ্দার আড়ালে কে চাপা গলায় বলিতেছে "বর কন্যায় মানাইবে ভাল। বরের বয়সও ঐ রকমই হইবে, দেখিতেছিস না কত লম্বা দাড়ী।"

লজ্জা, ঘৃণা ও ক্রোধে হালিম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষের সাম্‌নে দুনিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে কানের কাছে কেবল এক প্রকার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনিতে লাগিল।

দাদী-শ্বাশুড়ী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দাও বোন্, শরবতের গ্লাস হাতে তুলিয়া দাও।"

শাড়ীর ভিতর হইতে একখানা লোল-চর্ম্ম হাত বাহির হইয়া আসিয়া গ্লাসটী ধরিল। হালিম নিজের অজ্ঞাতসারে আঁৎকিয়া উঠিয়া এক হাত পিছাইয়া গেল। যখন সেই শুষ্ক হস্তনামধারী কঙ্কালখানা গ্লাসসহ হালিমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন হালিমের মনে হইল যেন কোনো নির্জ্জন শ্মশানে ভাঁটার মত চক্ষু বিশিষ্ট কোনো ভূত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে স্থান কালের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। কোনো প্রকার ভদ্রতার ধার না ধারিয়া সে টলিতে টলিতে দ্রুতবেগে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় সে শুনিতে পাইল, অন্দরমহলে তুমুল কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

দুই একজন কৌতূহলী বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত বরযাত্রীকে আর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্ধুদের ব্যগ্র প্রশ্নের জওয়াবে কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া কাহাকেও ভ্যাঙচি দিয়া সে একপাশে শুইয়া পড়িয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সারারাত কাঁদিয়া শেষ রাত্রে একটু শান্ত হইয়া ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পিতা কেন যে তাহার এই শত্রুতাই করিলেন, তা কোন মতেই বুঝিতে পারিল না। সুন্নত লইয়া পিতার সঙ্গে একদিন বেআদবী করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই রাগে পিতা তাহাকে এমন শাস্তি দিবেন, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাকে বুড়ী বিবাহ করাইবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সে নিজেও কি বুড়া দেখায়? তবে পর্দ্দার আড়াল হইতে অমন উক্তি হইল কেন? সে অন্ধকারে নিজের দাড়ীতে হাত দিল। এই দাড়ীর জন্য সে বৃদ্ধের মত দেখায়? কতজনই ত দাড়ী রাখে, কই তাহার চক্ষে কেহই বুড়া দেখায় না। সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্নে দেখিল যেন, এক মাংস চর্ম্মবিহীন নারী-কঙ্কাল তাহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়া করিতেছে।

বধূ লইয়া বাড়ী ফিরিল। বর ব্যতীত আর সকলেই বিবাহে যথারীতি আনন্দ উপভোগ করিল।

*　　　　*　　　　*

বাড়ীতে বধূ লইয়া ফিরিবার পর মেয়েমহলে আনন্দের সোরগোল পড়িয়া গেল। কিন্তু হালিম এক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। নাইয়রীদের যাহারা হালিমের বউএর প্রশংসা করিতে তার সঙ্গে দেখা করিতে গেল, তাহাদের আহ্বানে হালিম সাড়া দিল না। পরে এক চাচাত বোন যখন বলিল, "ভাবীকে আমার খুব পছন্দ হইয়াছে, ভাই সাহেবের সঙ্গে মানাইয়াছে ভাল," তখন হালিম চীৎকার করিয়া তাকে এবং সমস্ত নাইয়রীকে তাড়া করিয়া আসিল। মেয়েরা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

হালিম গোসলের সময় গোসলও করিল না। খাইবার সময় খাইতেও আসিল না। বহির্ব্বাটী হইতে মেহমানরা কতবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু হালিমের কোনো সাড়াশব্দ নাই।

মা যখন খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে গেলেন, তখন হালিম দুই এক কথাতেই দরজা খুলিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। খাওয়ার জন্য মা যখন বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া মার পা জড়াইয়া ধরিল। কিছু বলিতে পারিল না। মা বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন বাবা, বউ দেখিয়া কি খুশী হও নাই?" হালিম করুণ দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া বলিল "এই ষাট বছরের বুড়ীকে তুমি বউ বলিতেছ মা!"

"হজরতের সুন্নতের প্রতি বেতমিযী করিও না, বাবা হালিম" বলিয়া পিতা ঘরে ঢুকিলেন। পিতাকে দেখিয়া হালিম ক্ষণেকের জন্য অপ্রতিভ হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তে তার ক্রোধ ও অভিমান ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "সুন্নতের প্রতি আমি কি বেতমিযী করিলাম!"

পিতা বলিলেন, "হজরত বৃদ্ধা বিবী খদিজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন!"

হালিম ক্রোধে ধৈর্য্য হারাইয়াছিল। সে উত্তেজিতস্বরে বলিল "হজরত বৃদ্ধা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাকেও বৃদ্ধা বিবাহ করিতে হইবে?"

"কেন করিতে হইবে না? ইহা যে হজরতের সুন্নত।"

হালিম বুঝিল, পিতা তাকে কিসের জন্য এই শাস্তি দিয়াছেন।

মাতার ইঙ্গিতে হালিম পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকে মাফ করুন, বাপ্‌জান। আমাকে এ বুড়ীর হাত হইতে মুক্তি দিন।"

পিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাও কি হয়! একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আর কি ফেরানো যায়! বিশেষ করিয়া এ যে হজরতের সুন্নত। সব সুন্নত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছ, এ সুন্নতটা আর বাকী থাকে কেন?"

হালিম হতাশ হইয়া পিতার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল "তবে কি এই বুড়ীকে লইয়াই আমার ঘর করিতে হইবে?"

পিতা অবিচলিত-স্বরে বলিলেন 'এ যে হজরতের সুন্নত।'

পিতার এই অবিচলিত-সুরে হালিমের মাথায় রক্ত উঠিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সব সুন্নত কি মানুষ পালন করিতে পারে, তবে আমাকে ঠাট্টা করিতেছেন কেন?"

পিতা একটু হাসিলেন। বলিলেন "পারে না?"

হালিম উত্তর দিল "না।"

পিতা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "এ কথা মনে থাকিবে?"

হালিম মাথা নত করিয়া বলিল "জি, হাঁ।"

পিতা হালিমের দিকে অগ্রসর হইয়া মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন "যাকে দেখিয়াছ তিনি তোমার নানী শ্বাশুড়ী, তাঁকে কদমবুসি করিয়া বউমাকে দেখিয়া আস গিয়া যাও।"

* * *

ইহার কয়দিন পরে দাড়ী-মুড়ানো, শেরওয়ানী ও তুর্কীটুপী পরা হালিমকে স্কুলে যাইতে দেখা গেল।

শিক্ষিতা নারীর বিবাহ

কাজী আনোয়ার-উল-কাদির এম-এ, বি-টি, বি-এল

কতকগুলি idea আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল। এ সব idea যদি আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখি তবে দেখা যায় যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বিরোধ বর্ত্তমান।

সীতাও সতী, দ্রৌপদীও সতী। এখানে ideaয় ideaয় দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। এই দ্বন্দ্বের reconciliation করবার জন্য Justification (দোষখণ্ডন) এই কথাটির সৃষ্টি হ'য়েছে।

সত্যবাদী হওয়া, প্রিয়বাদী হওয়া এই দুইটী আদর্শের মধ্যেও দ্বন্দ্ব যথেষ্ট। অথচ আদর্শবাদী দুইই চান; কিন্তু একটিকে অনুসরণ ক'রতে হ'লে অন্যটিকে অন্ততঃ কখনও কখনও আংশিক ভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সতীত্ব, নারীত্ব, মাতৃত্ব এগুলির মধ্যেও অনেক সময়ে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। প্রত্যেকের জীবনে এই সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ফেলা দরকার। দুঃখের বিষয় সমাজ, ধর্ম্ম এবং আইন এ সব সমস্যা বা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ফেলার জন্য কোনো পরিষ্কার formula (সূত্র) দিতে পারে নাই। অনেক সময়ে সতীত্বের নামে নারীত্ব এবং মাতৃত্বকে অস্বাভাবিক ভাবে খর্ব্ব করা হয়। আবার কখনও কখনও নারীত্ব এবং মাতৃত্ব এমন অস্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয় যে সতীত্ব তাতে অপমানিত হয়। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারে সমাজ, ধর্ম্ম এবং আইন এই তিনের কোনটির অনুমোদন নাই।

সতীত্ব জিনিষটির Physical (দৈহিক) এবং mental (মানসিক) দুটি দিক। Physical সতীত্ব অপেক্ষা Mental সতীত্বের মূল্য বেশী। Mental chastity কিন্তু ধরা মুস্কিল। ওখানে হয়তো অনেকেরই পদস্খলন হয়। কথাটি পদস্খলন ব'লেছি; কথা কথাই; অনেক সময়ে এই পদস্খলনের মধ্যে একটি স্নেহপ্রবণতার ভাব, যেমন শরৎ বাবুর পল্লীসমাজে রমার অথবা চরিত্রহীনের সাবিত্রীর চরিত্রে। এই স্নেহপ্রবণতা যে খুব খারাপ, তা বলা যায় না। একে খারাপ বলা হয়, কেবল সমাজের ভয়ে বা ideaর খাতিরে।

গোলাপ ফুল গন্ধ বিলিয়ে দেয়। তা সবাইকে দেয়—সেখানে সে অসতী, অসতী আমাদের তৈরী একটি কথা মাত্র। গোলাপ ফুল তার রূপ, রস ও গন্ধ অকাতরে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না ক'রে বিলিয়ে যায়,—ওই তার ধর্ম্ম। সেই রকম যে সমস্ত নরনারীর মধ্যে রূপ, রস ও গন্ধ আছে, তারা তা না বিলিয়ে পারে না। রোগীর শুশ্রূষায় অনেক সময়ে নার্সরা যে রকম স্নেহ বিলায় অনেক সতী-সাধ্বী স্ত্রী তার কাছে হার মানতে বাধ্য। এ সব নার্স কি অসতী?

কল্যাণী নারীর স্নেহপ্রবণতা তার ধর্ম্ম। নারীত্ব, মাতৃত্ব এ দুটিও তার ধর্ম্ম। সঙ্গিনী হওয়া, মাতা হওয়া এ সবে তার সৃষ্টিকর্ত্তার দেওয়া অধিকার। সৃষ্টিকর্ত্তার দেওয়া এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা একই কথা। সমাজ নারীর এই অধিকারের উপর অনেকখানি হস্তক্ষেপ ক'রেছে ব'লে অনেক সময়ে সমাজকে যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হ'য়েছে এবং কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যে সমাজ তার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে তা আমরা বলতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে লজ্জাহীনতার কথা এসে পড়ে। লজ্জাও নারীর একটি স্বাভাবিক ভূষণ এবং ধর্ম্ম—ওটি নারীত্বের একটি রূপ; ওটিকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না; ওকে বিসর্জ্জন দেওয়া আর নারীত্বের পক্ষে আত্মহত্যা করা একই কথা। তাই নারীর নারীত্বকে মাতৃত্বকে সার্থক ক'রবার জন্য দোরে দোরে প্রার্থী হওয়ায় নারীত্বের অপমান করা হয়।

আজকাল আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন অসহায় অবস্থায় পতিত যে তাদের নারীত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করবার জন্য অনেকখানি অপমান স্বীকার করতে হয়। যে সমাজে এই বিপদ উপস্থিত হয় সে সমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার কথা আমরা সব সময়ে বলি; কিন্তু শিক্ষিতা নারীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়েছে ব'লে আমার তো মনে হয় না। অনেক শিক্ষিতা নারী আজীবন কুমারী অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হন। শিক্ষিত হবার জন্য এঁদের নারীত্ব এবং মাতৃত্ব অপমানিত হয়েছে।

শিক্ষিতা নারীদের অনেকেই শিক্ষয়িত্রী হয়ে সমাজের কিছু সেবা করছেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষয়িত্রীদের মান নাই। শ্রদ্ধা, সত্যিকার স্নেহ, কিছু appreciation না হ'লে জীবন সার্থক হবে কেমন করে? মেয়েদের মঙ্গলের জন্য শিক্ষয়িত্রীদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, অভিভাবকদের অশ্রদ্ধার বিষে। সব বিসর্জ্জন দিয়ে ওঁদের এই ব্যবসা—সেখানেও এই বিড়ম্বনা; তবে কি শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি--সরমের ডালি—এই এঁদের পুরস্কার?

এই সব শিক্ষিতা নারীদের অসহায় অবস্থা যে আমাদের সমাজের স্ত্রীশিক্ষার কতখানি অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তা উপলব্ধি ক'রবার জন্য আমরা একটুও চিন্তা করি না। শিক্ষিতা নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার দরুণ আমাদের সংসারের বধূ মাতা এঁরা অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিতা। তাঁদের সতীত্বের দরুণ তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁদের যে সব গুণ আছে তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা থাক্‌লে আরও যে সুন্দর হ'তো। তাঁরা সন্তান সন্ততিদের লালন পালন শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে অধিকতর পারদর্শী হ'য়ে সমাজের অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হ'তেন।

শিশুপালন ও শিক্ষা ব্যাপারে যে সংযম ও যে স্নেহ-মমতার আবশ্যক শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে তা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। তাই শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষিত নারীরা অধিকতর পটু একথা অস্বীকার করা যায় না; এমন অবস্থায় শিক্ষিতা নারীদের প্রতি সমাজের উদাসীনতা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

অনেক সময়ে দেখা যায় এই সব শিক্ষিতা নারীরা বিবাহ ব্যাপারে উদাসীন। তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

সমাজের উদাসীনতার দরুণ উপযুক্ত পুরুষ এঁদের পাণীপ্রার্থী হয় না। যারা এঁদের চায় তাদের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে এঁদের শিক্ষা দীক্ষায় খাপ খায় না। এমন অবস্থায় এঁদের বিবাহ ব্যাপারে আত্মসম্মান জ্ঞান বাধা দেয়। এ সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া দরকার। শিক্ষিতা নারীকে বধূরূপে বরণ ক'রে নিতে সমাজের যত রকম বাধা আছে সেগুলিকে পরীক্ষা ক'রে অর্থশূন্য সংস্কার এবং মোহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টাবান হওয়া আবশ্যক। তা না হলে এই (dying race) মুমূর্ষু জাতির মুক্তির দোষ সঙ্কীর্ণ হ'য়েই থাক্‌বে।

এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে সতীত্বের কথা। অনেক সময়ে দেখা যায়, যে-সমস্ত মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে তারা যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন কোনো কোনো পরিচিত শিক্ষাভিমানী ভাবপ্রবণ সংস্কারপ্রয়াসী যুবক হয়তো কোনো একটি সরলার প্রতি একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে। বালিকারা সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির এবং স্নেহপ্রবণ। স্নেহ পেলে মেয়েরা কেমন যেন হ'য়ে যায়। এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে অধিকাংশেরই অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং অনেক সময়ে এই সব যুবকেরা কাপুরুষের মত মেয়েদের সঙ্গে গোপনে আলাপ চালায় এবং পরে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করে। এ দিকে এই সরলা বালিকার অবস্থা যা হয় তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে নিন্দুকের অভাব নেই; পরের কুৎসা রটাবার বেলায় আমরা সব পঞ্চমুখ। এমন কি আমাদের দেশের বোবা কালারাও কুৎসা রটাবার বেলায় বোবা নয়। বোবার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে নারীনির্য্যাতনের কথা কানে এসেছে। যাক্‌, মেয়েটির দুর্ণাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার বিষাদময় পরিণামের জন্য তাকে প্রস্তুত হ'তে হয়। এই সব নারীদের ক্ষমা করবার মত উদারতা সমাজের থাকা নিতান্ত দরকার। অবশ্য ব্যাপার যেখানে গুরুতর হ'য়ে দাঁড়ায় সেখানে কতখানি ক্ষমা করা সম্ভব সে সম্বন্ধে শান্তভাবে বিবেচনা করা উচিত।

অনেক সময়ে নাটক-নভেলভক্ত শিক্ষিতা নারীরা অত্যধিক তীব্র সতীত্বের উপাসক হ'য়ে পড়েন। কবে কোনো একদিন কোনো যুবক একটু স্নেহ দেখিয়ে মনকে আকৃষ্ট করেছিলেন, সেই স্মৃতিকে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন ক'রে সতীত্বের আদর্শ রচনা করবার জন্য নিজকে কল্পনায় উৎসর্গ ক'রে ফেলেন। এই উৎকট সতীত্ব যে একটি খেয়াল এ সম্বন্ধে শিক্ষিতা নারীদের সচেতন হওয়া দরকার। সংসারে যে যার পথে চ'লে যায়। এঁদের উৎকট সতীত্বের

মূল্য এঁদের কাছে যত বেশী, অন্যের কাছে তা না হ'তেও পারে। প্রত্যেক নারীর নারীত্ব তখনই সার্থক হয়, যখন তিনি বধূরূপে মাতারূপে প্রীতি বিলিয়ে গৃহে বিরাজ করেন। সতীত্বের উচ্চ আদর্শকে আমি সম্মান করি; তাই ব'লে মোহকে, খেয়ালকে সম্মান করতে নারাজ।

এই শ্রেণীর নারীর আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি কারও কোনো স্মৃতি থাকে তবে সেই স্মৃতিকে বিসর্জন দিতে হবে, না তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করতে হবে সে বিষয়ে মন ঠিক করা আবশ্যক। সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ফেল্‌তে হবে। যদি পূজা করতে হয়, তা হ'লে মনকে দৃঢ় ও সবল করতে হবে। অনেক সময়ে দেখা যায় মন টল্‌ছে, কিন্তু সেই যেমন আব্দেরে ছেলে ভাত খাব না ব'লে জিদ ক'রে ব'সেছে, এখন ক্ষুধাও পেয়েছে খাবারও ইচ্ছে বেশ প্রবল, অথচ জিদের খাতিরে "খাব না" এই ভাবটা প্রকাশ করে। নারীনিগ্রহের এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা সমাজ ক'রে রেখেছে যে স্নেহপ্রবণা নারীর প্রেমতৃষা যখন কূল ছাপিয়ে উঠে--যখন পশুপক্ষীর প্রতি তাদের স্নেহের ধারা ব'য়ে যায়, তখনও সেই উৎকট্ সতীত্বের মোহ দিয়ে তাকে চেপে রাখ্‌তে হবে। স্নেহপ্রবণা নারীর স্নেহের বন্যার গতিরোধ করবার জন্য অনেকখানি সংযম দরকার। কত নারীর এই সংযমের অভাব; তাই অনেক সময়ে উৎকট্ সতীত্বের মোহ অনেক বিষময় পরিণামের জন্য দায়ী। উপরোক্ত অবস্থায় স্মৃতি পূজা মিথ্যা—এখানে স্মৃতিকে মুছে ফেলবার জন্য মনের জোর আবশ্যক। স্মৃতিপূজা করবার জন্য সংযম আবশ্যক আবার স্মৃতিকে মুছে ফেলবার জন্যও সংযমের প্রয়োজন। স্মৃতিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য যে সংযম আবশ্যক তা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে যদি পূজনীয় জনের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধার অভাব থাকে, অর্থাৎ ব্যাপারটি যদি শুধু একটি খেয়াল বা মোহ ভিন্ন আর কিছুই না হয়। এখানে নারীকে প্রশ্ন করতে হবে, স্মৃতিতে কি তার সব ক্ষুধা মিটেছে? যদি সত্যি তার সব ক্ষুধা মেটে--যদি সত্যি তার মন কখনই চঞ্চল না হয়, তা হ'লে ভিন্ন কথা। নইলে ওটা একটি মোহ মাত্র। ওর থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা পাওয়া উচিত। এই সব নারীকে বিবেচনা করতে হবে, যে, সংসারে তাঁদের স্বেচ্ছাচারিণী হবার কতটুকু অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই ভেবে দেখ্‌তে হবে, পিতামাতা ভাই ভগিনী ইত্যাদি আত্মীয় আত্মীয়াদের প্রতি তাঁদের কোনো কর্ত্তব্য আছে কি না? হয়তো তাঁদের এই সব স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ ভবিষ্যতে তাঁদের ভাই ভগিনীর পরিণামও বিষাদময় হ'য়ে উঠবে। হয়তো তাঁদের একটুখানি বিবেচনাহীনতার দরুণ অনেকগুলি আত্মার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হবে।--শুধু ক্ষণিকের উত্তেজনা, শুধু একটা খেয়ালের জন্য সতীত্বের নামে অসতীত্বের স্তূপ গ'ড়ে তোলা হবে। এই লেখা প'ড়ে হয়তো কেউই কিছু বিবেচনা করবেন না। শুধু ভেবে দেখ্‌তে অনুরোধ করা গেল। "Every idea is a prison" এই কারাগৃহ থেকে মুক্তি কি অসম্ভব?

গান

জসীমউদ্দীন এম-এ

আরে ও রঙ্গিলা না'য়ের মাঝি,
(তুমি) এই ঘাটে লাগায়েরে নাও
নিগুম কথা কইয়ে যাও শুনি।
তোমার ভাইটাল্ সুরের সাথে সাথে
কান্দে গাঙ্গের পানি,
(ও তার) ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া
কাষ্ঠের কলস খানি।
(ওরে) পুবাল বাতাসে তোমার না'য়ের বাদাম ওড়ে,
আমার শাড়ীর অঞ্চল ধৈরয না ধরে;
তোমার নি পরাণরে মাঝি হরিয়াছে কেউ
কলসী ভাসায়ে জলে গণেছ নি ঢেউ।

মুস্‌লিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি

আবুল হোসেন এম-এ, এম-এল

১৮৪৮ সনে পণ্ডিতপ্রবর রেনান তাঁর চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার মধ্যে তিনি বলেছেন : "Islamism will perish without striking a blow by the sheer influence of European Science and history will point to out century as the one in which the just causes of that immense event began to appear on the horizen. The Turkish and Egyptian youth coming to our schools in search of European Science will take back with them that which is its inseparable corollary, the rational method, the spirit of experiment, the sentiment of the real, the impossibility of being in religious traditions evidently conceived beyond all sphere of criticism. Rigidly orthodox Mussalmans are already growing uneasy at this and pointing out the danger to the emigrating younger generation."

মঃ রেনানের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি সত্য না হ'লেও যে কতকটা সত্য হয়েছে তা বলা বাহুল্য। European Science এর সামনে ইস্‌লাম যে হটে যাচ্ছে তার বড় প্রমাণ, মুসলিম-শক্তি দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ ইউরোপীয় সায়ন্স-পরস্ত শক্তির হাতে নাকাল হচ্ছে। তুর্কি কিছু মাথা খাড়া করে উঠেছে, তার কারণ সে ইউরোপীয় সায়ন্স-পরস্ত হয়েছে। এছাড়া আরও প্রমাণ : আধুনিক জগতের নামজাদা মুসলমান সবই ইউরোপীয় সায়ন্স-দীক্ষিত।

এই পরিবর্ত্তনের দৃশ্য রক্ষণশীল মুসলমানদের মনে গুরুতর পীড়ার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা দিশাহারা হয়ে ইউরোপীয় সায়ন্স-দীক্ষিত মুসলমান ও তুর্কিকে 'ইসলাম বহির্ভূত' বলে গালি দিচ্ছেন, আর প্রাণপণে তার প্রভাব হতে মুসলমানকে মুক্ত করবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক নামজাদা ভারতীয় মৌলানা সাহেব সগর্ব্বে ও দর্পে কোন এক বিরাট সভায় বলেছিলেন, "জগতের সর্ব্বত্র মুসলমানগণ কাফেরী ভাবাপন্ন হয়ে গেছে—ইস্‌লাম সে সমস্ত স্থান হতে উঠে গেছে--সুখের বিষয় ভারতের মুসলমান এখনও শরিয়তের পা-বন্দ আছে।"

তাঁর বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, ইউরোপীয় সায়ন্স-দীক্ষিত মুসলমান খাঁটি মুসলমান নয়—শরিয়ত-পরস্ত মুসলমানই খাঁটি মুসলমান।

তা'হলে এখন দেখতে হবে ইউরোপীয় সায়ন্স ও শরিয়ত বাস্তবিক পরস্পর বিরোধী কি না। যদি এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে, অর্থাৎ শরিয়তে যদি ইউরোপীয় সায়ন্সের সমর্থন পুরোপুরি পাওয়া যায়, তবে রক্ষণশীল মুসলমানদের দুঃখ বা ক্ষোভের কোন কারণ থাকতে পারে না।

বর্ত্তমান জগতের কালচারের জননী ইউরোপীয় সায়ন্স, আর ইউরোপীয় সায়ন্সের জনক হচ্ছে ইউরোপীয় ফিলজফি—যাকে এক কথায় Rationalism বলে। Rationalism এর মূল বাহন হল অদম্য জিজ্ঞাসা (indomitable criticism) ও অতৃপ্ত সন্ধান (insatiable inquiry or thirst for knowledge), ইউরোপে এই Rationalism এর যুগ শুরু হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে—পরিণতি লাভ করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যার ফলে আজ জগত একটা পরিবারে পরিণত হয়েছে--ভৌগোলিক ও ভাষাগত, সামাজিক ও জাতিগত বাধাবিঘ্ন সব আজ দূরীভূত হয়েছে।

Rationalismএর প্রাচীন জন্মভূমি হল ভৌত্তিক ও অতিজাগতিক শক্তিতে অন্ধবিশ্বাস (unquestioning faith). Authorityকে মেনে নেওয়াই হল তার নিদর্শন। এই Authorityর প্রভাব ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলেছিল। মানুষের বুদ্ধি, প্রাকৃতিক ও প্রত্যক্ষ জগতের সার্থকতা, মানুষের জীবনের অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে সব চিন্তাই তখন Authorityর খেলাপ বলে গণ্য হত। Churchই তখন হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, তার সুখ-দুঃখ সবই Church এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্য ইউরোপ বিস্তর দুঃখভোগ করেছে। Rationalism যে চিন্তার প্রসব-বেদনায় প্রসূত

হয়েছিল তার জন্ম ইতিহাস আজ মানব জাতির কলঙ্ক বলে গণ্য হচ্ছে। Saints, Prophets এর প্রভাব মধ্যযুগায় ইউরোপে কম ছিল না। তাঁরা মানুষের বুদ্ধিকে চেপে প্রাধান্য করতেন—ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মের অভিনয়ই না তাঁরা করেছিলেন। মানুষ সে প্রাধান্য-প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে প্রথমে দেখল তার আপনার রক্তমাংসের শরীর—আর তার পরিপোষক এই সুন্দর পৃথিবী। ভৌতিক থেকে সে নামল জাগতিকে, অতিমানুষের পূজা ছেড়ে সে চিনতে ও ভালবাসতে আরম্ভ করল মানুষকে। এই অতিমানুষের পূজা ছাড়তে ইউরোপকে যে কত শতাব্দীব্যাপী বেদনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, আর কত দার্শনিকের কত চিন্তা, কত আত্মবলিদান করতে হয়েছিল তার ইতিহাস এই সামান্য প্রবন্ধে দিতে চাই না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। দাসত্ব প্রথা (slavery) উঠিয়ে দিতে সতর শ' বৎসর লেগেছিল। slavery তুলে দেওয়ার মূলে যে ফিলজফি রয়েছে সেটা হল প্রত্যেক মানুষই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। এই রূপে বর্ত্তমান ইউরোপীয় কালচারের গৌরবের বিষয়গুলি হাসিল করতে ইউরোপকে বহু চিন্তাশীল দার্শনিককে নির্য্যাতন করতে হয়েছিল।

কাজের পিছনে চিন্তা চাই। কালচার হল কর্ম্মফলের সমষ্টি, সুতরাং কালচারের পশ্চাতে চিন্তা অনিবার্য্য। চিন্তাই Philosophy। Religion (ধর্ম্ম) বলছে : চোখ বুজে মেনে চল। Philosophy (দর্শন) বলছে : চোখ খুলে চেয়ে দেখ। একটার বাহন হল ভক্তি, অন্যটার বাহন হল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসূতি হল কালচার, আর ভক্তির প্রসূতি হল সন্ন্যাস বা কালচার ত্যাগ। একটার জন্য অনন্ত চেষ্টা, অসাধ্য সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম—অন্যটার জন কর্ম্মবিমুখতা, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা। একটার ফল ক্রমপরিণতি, অন্যটার ফল ধ্বংস। একটা মানুষকে স্বার্থমুখী বা জগতমুখী, আর অন্যটা তাকে জড় বা শূন্যমুখী করে। তাই যারা জড় বা শূন্য-পরস্ত তারা স্বার্থ-পরস্ত মানুষকে materialist বলে, আর আপনাদিকে spiritualist ব'লে আস্ফালন করে। কিন্তু জগত ও জগতের মানুষকে ছেড়ে যে spiritualist হতে চায় মুস্‌লিম কালচার বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় কালচারে তার স্থান নাই। বর্ত্তমান ভারত অক্ষমতার লজ্জা ও লাঞ্ছনাকে ঢাকবার জন্য তার উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ সন্ন্যাসকে চরম spiritualism বলে ইউরোপকে নিন্দা করেন। এই মনোভাবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক ভারতীয় মুসলমান সেই সন্ন্যাসকেই spiritualism এর চরম বলে মনে করেও ইস্‌লামের বড়াই করে থাকেন। তাঁরা ইস্‌লামের মূলনীতি ও তার প্রভাবে জন্মলাভ করেছিল যে কালচার, তা হয় অবজ্ঞা করেন, নয় তার খবর রাখা ইস্‌লামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন না।

আমি ইঙ্গিত করেছি পূর্ব্বে যে, ইউরোপীয় কালচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে Rationalism, অর্থাৎ যুক্তি-পরস্ত জ্ঞান। আর তার বাহন হল materialism, অর্থাৎ মানুষ ও জগতের চর্চ্চা।

আমি আপনাদের বলতে চেয়েছি মুস্‌লিম কালচারের দার্শনিক ভিত্তি কি? এক কথায় সেটা Rationalism। সেই Rationalism এর ভিত্তির উপর সেকালের মুসলমান চর্চ্চা করেছিল মানুষ ও জগতকে।

Rationalismএর আবির্ভাবে ইউরোপ প্রথম কথা শিখল : বিচার করে দেখ, অনুসন্ধান কর। তার ফলে সেখানে কত দার্শনিক জন্মলাভ করল, তারা প্রচার করল : মানুষ এক পরিবারভুক্ত—Philosophy দিয়ে সেটা তারা প্রমাণ করল। জগতের সর্ব্বত্র সকলের প্রবেশ অধিকার সমান ও অবাধ। সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশে জাহাজ ছুটল, গমনাগমনের পথ সুগম হল, কল কারখানা বেড়ে গেল, পরস্পর আত্মীয়তা ঘনীভূত হল, ক্ষুদ্র গ্রাম্যতার গণ্ডি কেটে মানুষ বিরাট দেশ—বিরাটতর জগতকে চিনে ফেলল। স্বল্পক্ষুধা তার ঘুচে গেল—বিপুল ক্ষুধা নিবৃত্তির বিপুলতর আয়োজনে সে লেগে গেল। ইউরোপীয় Philosophyর এই পরিণতি আজ ইউরোপীয় কালচার নামে পরিচিত।

যে Rationalism-এর সন্ধান পেয়েছিল ইউরোপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে—ইস্‌লাম তা প্রচার করেছিল ঊষর মরুভূমির বুকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, যার ফলে আরবগণ ক্ষুদ্র গ্রাম্যতার গণ্ডি কেটে এক হয়ে প্রবল স্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর ঘোষণা করেছিল : সকল মানুষই এক জাতি, মানুষই এই দুনিয়ার প্রভু,—তারই জন্য এই জগত, সকল মানুষ এক স্রষ্টার বান্দা ইত্যাদি....। তারা শূন্য ও জড়কে ছেড়ে জীবন্ত মানুষ—চলন্ত জগতকে চোখ খুলে দেখল, ও তারই চর্চ্চায় লেগে গেল। তাই আমরা আজও গৌরব করছি তাদের অক্ষয় কীর্ত্তির স্মৃতিচুম্বন ক'রে। কর্ডোভায় যান, কাইরোতে যান, সিরিয়ায় যান, বাগদাদে যান, মোগল বাদশাহের কীর্ত্তি অবলোকন করুন—আর তাদের জীবন-চর্চ্চার উপকরণ ও ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করুন—কে বলবে সেকালের মুসলমান Rationalism এর বাহন materialism-পরস্ত ছিলেন না? এজগতকে তাঁরা সরাইখানা মনে করেন নাই—এজগতকে তাঁরা বেহেশ্‌তে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

ইস্‌লামকে তাঁরা পেয়েছিলেন humanism রূপে, যার প্রেরণায় তাঁরা মানুষকে ভালবেসে ছিলেন--পাড়াপড়সী, ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধু, গরীব দুঃখী, অনাথ অনাথা, নাবালক নাবালিকা, সকলের জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরিতৃপ্তির আয়োজন করাই ছিল তাঁদের কালচারের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ তাঁরা অনুভব করেছিলেন--ইস্‌লামই তাঁর attributes transcendental থেকে humanistic ক'রে ধর্ম্মের যথার্থ সার্থকতা সকলের পক্ষে উপলব্ধির বিষয়ে পরিণত করেছিল। ইস্‌লামের পূর্ব্বে ধর্ম্ম একটা অজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য, অর্থাৎ আপামর সাধারণের জ্ঞানবহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য হত।

ইস্‌লাম প্রবর্ত্তককে খাতেমুন্নবীঈন বলা হয়। তার কারণ ইস্‌লাম অজ্ঞতার যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে--সে যুগে নবী ছিলেন কেবল পূজা বা ভক্তির এক অস্পৃশ্য অজ্ঞেয় অশরীরী প্রতিমা স্বরূপ—যার কোলে মানুষের বুদ্ধি বিবেক আশ্রয় নিয়ে চিরদিনের জন্য সুপ্ত ছিল।

হজরত মুহম্মদ ভাঙ্গলেন সেই প্রতিমা। জোর গলায় ঘোষণা করলেন : 'নবীর যুগ খতম', নবীর চেয়ে আল্লাহ্‌ বড়। আল্লাহ্‌কে এক জীবন্ত শক্তি রূপে তিনি উপলব্ধি করলেন ও সকলকে সেই উপলব্ধি লাভের সামর্থ্য অর্জ্জন করবার জন্য প্রাচীন কালের সকল প্রতিমাকে ভাঙ্গতে বললেন। তিনি এই প্রতিমাকে ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার কালচারের এক চরম বিঘ্ন মনে করেছেন। তাই তিনি বিচার-শক্তির প্রাধান্য দিয়েছেন অন্ধ বিশ্বাসের উপর। কালচারের জন্য যে কোন প্রতিমা আমাদের সামনে এসে বাধা দেয় তা তিনি সজোরে ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তাঁর জীবনে সে আদেশ পালন করেছেন।

তাঁর অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় কোরাণ হাদিসের উপর কত গবেষণা, কত বাগবিতণ্ডা, কত টিকাটিপ্পনী হয়েছিল। কোরাণ অভ্রান্ত Starting point ধরেও বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিত তার বিভিন্ন অর্থ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই বিভিন্ন মতাবলম্বনকে হজরত মুহম্মদ নিজেই মুস্‌লিম সমাজের জীবনের নিদর্শন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এখন কোরাণের কয়েকটি আয়েতের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই আয়েতগুলির অর্থ গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় কালচারের পিছনে যে Philosophical theories আছে তা সমস্তই ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক উপলব্ধি করেছিলেন। আজ ইউরোপীয় কালচারের মূলে যে Philosophy তাকে বলা হয় Social utilitarianism--Individualism ক্রমে Communism বা Internationalismএ পরিণত হয়েছে। জাগতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির Unlimited expansion হয়েছে--যার ফলে মানুষ তার অনন্ত সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকাশে উড়ছে, সাগরে ডুবছে, অসম্ভবকে সম্ভব করছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের কুক্ষ ঘেঁটে Efficacy of human effort theoryএর উপর আস্থাকে জায়েজ করবার জন্য ইউরোপ আর এখন ভ্রূক্ষেপ করছে না। মানুষের অনন্ত ক্ষুধা নিবারণ করবার জন্য অনন্ত প্রয়াসই বর্ত্তমান ইউরোপীয় কালচারের স্বরূপ। তার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষকে সমান ভাবে সুখী করা, প্রত্যেকের জন্য সমান সুখভোগের আয়োজন সম্ভব করা। এই Idealএ পৌঁছতে ইউরোপকে বিভিন্ন Idealএর experiment করতে হয়েছে। সেই সমস্ত experiment এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা, যাঁরা প্রতিমুহূর্ত্ত গবেষণাময়--যাঁরা কেবলই সন্ধান করেছেন কোন্‌ পথে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্থাৎ পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। তাই ইউরোপীয় কালচারের মূলে যে Philosophy তা কখনো Stable বা চিরস্থায়ী, বা সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় বলে গণ্য হয় নাই। মানুষের বুদ্ধি intellectও প্রকৃতির এক অংশ। প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তন লাভ করছে মানুষের intellectও তেমনি পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির স্রষ্টা যেমন আল্লাহ্‌, intellect এর স্রষ্টাও তিনি। সুতরাং intellect প্রসূতিও তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং যে intellectএর ফলে ইউরোপীয় কালচার, যে intellectএ অধিকারী মুসলমান হয়েও তারা আজ পরমুখাপেক্ষী কেন? কারণ তারা intellect এর গতিকে আজ অস্বীকার করেছে--মনুষ্য জীবনের অনন্ত সম্ভাবনায় তারা আস্থাহীন হয়েছে। আজ চাই আবার সেই হজরত মুহম্মদের মত নির্ভীক মুক্ত-বুদ্ধি পুরুষের দুর্দ্দমনীয় চিত্তগতি।

কোরান বলছেন ঃ --

ইন্নি জায়েলুন ফিল্‌ আরদে খলিফা--এমন একজনকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যিনি এই পৃথিবীর প্রভু হবেন।

ও আল্লামা আ'দামাল্‌ আস্‌মায়া কুল্লাহা--আদমকে তিনি সর্ব্বগুণাধার করলেন।

হুয়াল্লাযি খালাকা লাকুম্‌ মা ফিল্‌ আরদে জমিয়া--এ জগতে যা কিছু সবই তোমাদের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

কা'না ন্নাসো উম্মাতাও ওাহেদাতান্‌--সমস্ত মানুষই এক জাতি।

কেবল পূর্ব্ব বা পশ্চিমে মুখ ফিরালে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না--আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শী অভাবগ্রস্ত, দুঃখীদের সাহায্য করলেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায়। (২ : ১২৭)

ফালাকিন্নাল বের্‌রা মানে তাকা--অন্যায় হতে যে মুখ ফিরায় সেই ধার্ম্মিক।

ওলা তা'তাদু--ইন্নাল্লাহা লা ইউহেব্বুল মু'তাদীন--সীমা অতিক্রম করো না। অমিতাচারকে আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না।

ধন ব্যয় করতে হবে অভাবগ্রস্তকে মাতাপিতা আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবার জন্য। ২ : ২১৫

মুস্‌লিম ওয়ারিসী আইন বর্ত্তমান সোশ্যালিজম এর সমর্থন করে। আজ ইউরোপীয়ান স্টেট্‌ state ও রুষিয়ানা স্টেট্‌ যা চাচ্ছে সেটা ঠিক ইস্‌লামিক Theory of distribution of income, যার ইঙ্গিত কোরানে বহুবার করা হয়েছে।

আজ মানুষের অশান্তির বড় কারণ কতিপয় ব্যক্তির হাতে ধনসঞ্চয় ও জনসাধারণের দারিদ্র্য। এই দুইয়ের বিরুদ্ধে ইস্‌লাম আপত্তি তুলেছিল। ধনীকে ধন ব্যয় করতে হবে সমাজের সকলকে সম-অবস্থাপন্ন করবার জন্য--দরিদ্রকে মিতাচার হতে হবে--এই golden mean হল মুস্‌লিম কালচারের মূল কথা, জাগতিক জীবনের সুখসাচ্ছন্দ্য অর্জ্জনের জন্য। আজ ইউরোপীয় কালচারের উদ্দেশ্য হয়েছে প্রত্যেক প্রত্যেক মানুষকে সুখী করা--মুসলিম কালচারের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সে-উদ্দেশ্য যে বহু পরিমাণে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ, মুসলিম রাজ্যে ভিক্ষুক ছিল না--শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল না। জনৈক পর্যটক বলেছেন : I was struck by the perfect order and marvelled at the cheapness of commodities, specially at a universal standard of living which permitted every one to ride a mule instead of journeying on foot and at the prevalent spruceness of attire" মুক্ত বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সেকালের মুসলমান যে কালচার ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার ফলে মানুষের জাগতিক জীবন কত মধুময় ও সুখকর হয়েছিল তা এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। আজ ফোর্ড তাঁর গাড়ী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সঙ্কল্প করেছেন তার পিছনে মুস্‌লিম কালচারের একটি বাস্তব নজির বিদ্যমান--সেখানে প্রত্যেকে যদি ঘোড়া ব্যবহার করবার ক্ষমতা জন্মে থাকে, তবে আজ মটর কার কেন প্রত্যেকের ঘরে যাবে না?

মুস্‌লিম কালচারের এই নজীর থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা সামান্য চিন্তার স্ফূর্ত্তিতে ধৈর্য্য হারিয়ে বসি। এটুকু বুঝি না সেই চিন্তার ভিতর দিয়ে কালচার-পরিব্যাপ্তির একটি নূতন পদ্ধতি বা পথ হয়ত আবিষ্কার হতে পারে। আজ আমরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার চিন্তার স্ফূর্ত্তিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছি। কিন্তু মুক্তবুদ্ধির দ্বার প্রথমে ইস্‌লামই খুলেছিল। আবু হানিফার মত মুক্তবুদ্ধি পণ্ডিতের সংখ্যা জগতের ইতিহাসে খুব কম। ইবনে খলদুনের মত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইউরোপীয় মুক্তবুদ্ধির নজির জুগিয়েছিল।

ইবন খলদুন সম্বন্ধে জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলছেন : --

"Ibn Khaldun anticipated Vico to a remarkable extent by more than three centuries. His Kitabul Ibar contains a philosophy of the history of the Moslem peoples far in advance of anything in European literature prior to vico."

কালচারের প্রধান নিদর্শন হচ্ছে--অনন্ত-গতি, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা। Necessity (জরুরত) অনুসারে নীতির পরিবর্ত্তন। Philosophy চায় change, চায় modification। কালচার তদনুসারেই তার রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লাভ করে। আধুনিক ইউরোপীয় কালচারের মূলে হল Emancipation of intellect (বুদ্ধির মুক্তি)--যেটার জন্মলাভ হয়েছিল ইস্‌লামে ও পরিণতি ঘটেছিল মুস্‌লিম সাম্রাজ্যে। স্কটসাহেব এই কথার সমর্থন করেছেন :--

"Modern progress is due to the Emancipation of human intellect which can not be attributed to Ecclesiastical inspiration. It was not a product of the Crusades. It was not the effect of the Refor-

mation. It was not the work of Christianity whose policy has indeed been constantly inimical to its toleration or encouragement. It is a legitimate consequence of the liberal policy adopted and perpetuated by the Ommeyide Caliphs through out their magnificent empire whose civilisation was the wonder, as its power was the dread of medieval Europe."

মুস্‌লিম কালচারের দার্শনিক ভিত্তি কি সেটার সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া গেল। এই ভিত্তিটা সনাতন নয়—মুক্তিবুদ্ধি তার বাহন, আর মুক্তিবুদ্ধি প্রয়োজন বশতঃ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন লাভ করে। সে-ই মুক্তবুদ্ধির পরিণতি কালে ইউরোপীয় কালচারকে জন্ম দিয়েছিল। মুস্‌লিম কালচারের সেই দার্শনিক ভিত্তি ইউরোপীয় কালচারে পরিণত হয়েছিল; তা সত্ত্বেও আমরা আজ বুদ্ধি সিকেয় তুলে রেখে আস্ফালন করছি আমরা মুসলমান। পূর্ব্বপুরুষরা বাঘ মেরেছিল, আর আমরা বিড়াল দেখে বিছানার তলে লুকাই—এতে আমাদের লজ্জা হয় না। মুসলমান একদিন ঘোড়ায় চড়েছিল—আজ সে ঘোড়ার সইস হতে পারলে নিজকে পরম ভাগ্যবান মনে করে। তার কারণ বুদ্ধি আমাদের জাগ্রত হয় নাই। বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতিরেকে মুসলিম কালচার যে অচিরে বিলুপ্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? রেনান সাহেব ঠিকই বলেছিলেন : "Islamism shall perish" ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে।......

কারণ তাঁর সময়ে তিনি দেখেছিলেন মুসলমান জগত বুদ্ধির ঘরে তালা লাগিয়ে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানের চলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সে শাস্ত্র ত নয়—শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। শাস্ত্র চিরন্তন হলেও ব্যাখ্যা ত চিরন্তন হতে পারে না। আজকাল আমরা Text ফেলে commentaries নিয়ে টানাটানি করছি। Text এর আলোকে যে যুগে যেমন পড়বে মানুষ তেমনি চলবে—তাতে বিঘ্ন ঘটনায় টিকাকার। কাজেই টিকাকারের দোহাই ত্যাগ ক'রে প্রকৃত মুস্‌লিম কালচারের যে ফিলজফি, আসল Text এর light এ ধরা পড়বে, সেইটাই স্বাধীন প্রয়োগই হবে এখন আমাদের বর্ত্তমানে অধোগতির একমাত্র ঔষধ।

গান

সিন্ধু মিশ্র দাদ্‌রা

নজরুল ইস্‌লাম

তুমি বর্ষায়-ঝরা চম্পা
তুমি যূথিকা অশ্রুমতী।
তুমি কুহেলি-মলিন ঊষা
তুমি বেদনা-সরস্বতী।।
কদম কেশর কীর্ণা
তুমি পুষ্প-বীথিকা শীর্ণা,
হলে ধরণীতে অবতীর্ণা
ক্ষীণ তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতি।।
মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী
তুমি কি অলকানন্দা,
আঁধারের কালো কুন্তল-ঢাকা
তুমি কি ধূসর সন্ধ্যা?
পাষাণ দেবতা-চরণে
তুমি মরেছ অমর মরণে,
তুমি অঞ্চলি ঝরা কুসুমের
তুমি ব্যর্থ ব্যথা আরতি।।

শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শামসুন নাহার বি-এ

শিশুপালন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই সকলের আগে দুটো বিষয় আলোচনা করতে হয়,--শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা আর চরিত্র গঠন। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই মানুষের জীবনে খুব দরকারী জিনিষ, আবার দুটোই এমন ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত যে দুটোকে মোটেই আলাদা করে' দেখা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, শিশুর আহার। সকল শিক্ষিতা জননীই আজকাল জানেন যে, শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে খেতে দিতে হবে। নিরূপিত সময়ের বাইরে শিশু কাঁদলেও তার আহারের জন্য মাতা ব্যস্ত হবেন না, কারণ তাতে তার পরিপাকের বিষম অসুবিধা হবার আশঙ্কা। এইত গেল শারীরিক ক্ষতির কথা, তারপরে আরও একটা কথা আছে, যেটা স্বাস্থ্যের চেয়ে কিছু কম দরকারী নয়। সেটা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা (moral education)। শিশু কাঁদলেই যদি খাবার পায়, তা হলে কান্নাকে সে স্বার্থসিদ্ধির একটা অব্যর্থ অস্ত্র বলে জেনে নেবে। শুধু শৈশব জীবন বলে' নয়, পরবর্ত্তী কালেও যখন তখন অন্যায় আবদার করে', অভিযোগ করে' কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে। কাজেই শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নয়--অকারণ অতৃপ্তি ও অসন্তোষ যেন শিশুর মজ্জাগত না হয়ে যায়, এই জন্যও শিশুকে কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে দিতে নেই--আধুনিক বিজ্ঞান এই বলছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া চাই স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই। শিশুর দেহ সবল, স্বাস্থ্যবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও দৃঢ়, বলিষ্ঠ হোক--এই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধেও এই বিষয়ই আমরা আলোচনা করব।

ঠিক জন্মের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, একথা আগে মানুষের ধারণাতেই আসত না; যুগে যুগে সকল পিতামাতাই নবজাত শিশুকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করে' এবং ভালবেসেই তৃপ্তি পেয়েছেন। অন্ততঃ কথা বলতে শিখবার আগে যে শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত হওয়া দরকার, একথা কেউ ভাবেন নি। এখনো পর্য্যন্ত অনেকে ভাবতে পারেন না, ঠিক জন্মের সময় থেকে আরম্ভ করে' এক বৎসর বয়স পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পিতামাতার হাবভাব আচার-ব্যবহার থেকে শিশু সকলের অজ্ঞাতে তিলে তিলে যে শিক্ষা আহরণ করে, ভবিষ্যৎ জীবনে তার মূল্য কত বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে এই সূক্ষ্ম সত্য ধরা পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে: শুধু জন্মের পর থেকেই নয়, মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেও সন্তানের দেহমনের সুস্থতা এবং চরিত্রগঠনের জন্যে জননীকে অনেকখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মায়ের এই সময়কার প্রত্যেকটী কাজ ও প্রত্যেকটী চিন্তার প্রভাব সন্তানের উপর তিলে তিলে সঞ্চারিত হয়।

শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার অভ্যাস বলে' একটা জিনিষ মোটেই থাকে না। যা থাকে সেটুকু তার স্বভাবজাত বুদ্ধি--ইংরাজীতে যাকে বলে Instinct. মাতৃগর্ভে আট, দশ মাস থেকে যে সব অভ্যাস তার তৈরী হয়েছিল, বাইরের জগতে সে সব একেবারেই অচল। কাজেই এই রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রত্যকটি ব্যাপার তার কাছে একেবারে অদ্ভুত, বিসদৃশ ঠেকে। নতুন জীবনে, নতুন আবহাওয়ায় প্রত্যেকটী জিনিষ তাকে নতুন করে' শিখতে হয়। এমন কি, অনেক সময় দেখা গেছে, শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রাণালীও অনেক কষ্টে শেখে। একমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় শিশু আর কিছুতেই আরাম পায় না। এই বিশ্রী অসোয়াস্তির ভাব থেকে বাঁচবার জন্যেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সে ঘুমিয়ে কাটায়। ক্রমে সপ্তা' দুয়েকের মধ্যে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে আসে, এই নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে সে ক্রমেই পরিচিত হয়ে ওঠে। চৌদ্দ পনর দিনের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। এই সময় থেকে আরম্ভ করে' এক বছর পর্য্যন্ত শিশু কোন কিছুতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু যে দ্রুত অভ্যস্তই হয়, তা নয়; প্রথম বৎসরের অভ্যাস ও শিক্ষা শিশুর মনে একেবারে শিকড় গেড়ে বসে যায়। শিশু যে স্বভাবজাত বুদ্ধি বা Instinct নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঠিক তারই মত এই সময়কার অভ্যাস গুলো একেবারে রক্তমাংসে মিশ্রিত হয়ে যায়।

মানুষ চিরদিনই অভ্যাসের দাস। কিন্তু অতি শৈশবের অভ্যাসের মতো পরবর্ত্তী জীবনের অভ্যাসের মূল কখনো এত দৃঢ় হয় না। এই সময়ে যে অভ্যাস হয়, এরপরে তা বদলানো অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই সময়কার শিক্ষা যেন সুশিক্ষা হয় এবং এমনভাবে যেন শিশু না গড়ে ওঠে যার জন্যে ভবিষ্যৎ জীবনে অসুবিধা ভোগ করতে হবে, এ বিষয়ে পিতামাতা বিশেষ সর্তক হবেন। বাস্তবিকই ঠিক জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর নৈতিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়া খুবই দরকার। যে কাজ বড়োরা করলে একান্ত অশোভন ও আপত্তিজনক ঠেকে, শিশুরা যদি তা' করে পিতামতার স্নেহের চোখে তার দোষ নিশ্চয়ই অতটা ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। সন্তান শিশু হলেও সে একেবারে নির্ব্বোধ নয়। তার বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যেটুকু সে বোঝে তার মধ্যে আর কোন ফাঁকি থাকে না। মোটের ওপর তার বুদ্ধির সীমা যতদূর চলে, তার ভেতর সে বুড়োদের চেয়ে কোন অংশ কম চালাক নয়—তার সঙ্গে ব্যবহারে একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। অবশ্য বুড়োদের সঙ্গে এক বৎসরের শিশুর কার্য্য-কলাপের তুলনা করাই অন্যায়। কিন্তু তবুও বড় হলে সন্তানের পক্ষে যে কাজ আপত্তিজনক হবে, সে কাজে একান্ত শৈশবেও তাকে যতদূব সম্ভব প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো।

সাধারণতঃ শিশু যখন ছোট থাকে তখন তার নৈতিক শিক্ষার কথা আমরা একেবারেই ভুলে থাকি; শুধু আদর সোহাগ আর স্নেহ-মমতায় তাকে আচ্ছন্ন করে' রাখবার চেষ্টা করি। তার পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিন আমরা এবিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠি এবং তার সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহারে সেদিন থেকে পুরোপুরি কঠোর হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে কিন্তু এটা একটা দারুণ হতাশার মুহূর্ত্ত। জন্মের পর থেকে শিশু কোন কাজেই বাধা পায় নি, সে একেবারে হঠাৎ বাধা-নিষেধের কড়াকড়ির মধ্যে পড়ে বিষম হাঁপিয়ে ওঠে; যে দুনিয়াটা এত দিন ছিল মাধুর্য্যে মধুর, করুণায় মেদুর, হঠাৎ তা' হয়ে ওঠে একেবারে কঠোর, কর্কশ। এই নিদারুণ হতাশা থেকে শিশুকে বাঁচাতে হলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে আরম্ভ করে' আগাগোড়াই মিল রেখে চলতে হবে, বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের আগেও তার নৈতিক শিক্ষার দিকটাকে অবহেলা করলে কোন মতেই চলবে না।

সময়ানুবর্ত্তিতা শিশুর জীবনে খুবই দরকার। আহার, নিদ্রা, স্নান, পায়খানা, প্রস্রাব প্রত্যেকটী ব্যাপারে তাকে প্রথম থেকেই নিয়মানুবর্ত্তী করে' তোলা চাই। প্রতিদিন একই সময়ে শিশু যেন একই জিনিষ প্রত্যাশা করতে শেখে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক, আবার নৈতিক শিক্ষার দিক দিয়েও এতে অনেক লাভ হয়।

জন্মের পরে কিছুদিন শিশুকে স্থানান্তরিত না করাই ভালো। একই আবহাওয়া, একই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সে যেন অন্ততঃ প্রথম বৎসরটা কাটাতে পায়। মর্ত্ত্যের মাটিতে নূতন জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে তার কিছুটা সময় লাগে, একথা বলেছি। এই সময়ে এক জায়গায় থাকতে পেলে এই পরিচয়টা স্বাভাবিক গতিতে ক্রমে নিবিড় হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। কিন্তু স্থান হতে স্থানান্তরে যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয়—তাহলে অত পরিবর্ত্তনের তাল সামলানো তার পক্ষে সহজ হয় না, অত নতুন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে তার কোমল মস্তিষ্ক সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই বয়সে নূতনত্বের প্রতি শিশুর শুধুই যে বিতৃষ্ণা থাকে তা নয়, প্রত্যেকটা নূতন জিনিষকে সে ভয়মিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখে। অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষের মধ্যে সে কিছুতেই নিজকে নিরাপদ মনে ভাবতে পারে না। একটা আশঙ্কার ভাব তার লেগেই থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বুদ্ধির বিকাশ হয় ও পৃথিবীটাকে জানবার বুঝবার আগ্রহ বাড়তে থাকে ততই তার এই স্বাভাবিক ভীরুতা কমে আসে। ক্রমেই সে পারিপার্শ্বিক জগতের প্রত্যেকটী জিনিষের সঙ্গে শীগগির পরিচয় করে' নিতে ব্যাকুল হয়—আর তাই করতে গিয়ে অনেক সময় দুঃসাহসিকতারও পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলে' জন্মের অব্যবহিত পরে অন্ততঃ এক বৎসরকাল দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্ত্তন না হলেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এতে তার মনের স্বাভাবিক শান্তি, আনন্দ আর সন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকবার সুযোগ পায়।

শিশুকে প্রথম থেকেই আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলবার চেষ্টা করা উচিত। সে যেন তার নিজের ইচ্ছামত মনের আনন্দে খেলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে—এইজন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও স্বাধীনতা দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় পরিজনবর্গের আদর সোহাগে শিশু এত বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, তার নিজের কিছু করবার আছে একথা অনুভব করবারই অবসর পায় না। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ না কেউ অনবরত শিশুকে কোলে নেওয়া, ঘুম পাড়ানো, গান, শোনানো বা দোলা দেওয়া মোটেই ভাল নয়। শুধু যে এতে তাব দেহের অবাধ রক্ত-সঞ্চালনেরই প্রতিবন্ধকতা হয় তা নয়, সে একেবারে

অসহায়, নির্জীব, পরমুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। সন্তান গঠনের সময় প্রত্যেকটী ব্যাপারে শিক্ষাদাতার দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত রাখতে হবে। এখানেও তিনি ভুলবেন না যে, শৈশবের শিক্ষা শুধু শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শৈশবের অভ্যাস ভবিষ্যৎ জীবনেও সন্তানকে পরনির্ভরশীলই করে' রাখবে।

শিশুর সুখশান্তিবিধানের জন্য পিতামাতা কখনো উদাসীন হবেন না, বরং তার সকল অসুবিধা দূর করে' কেমন করে' তাকে আরাম দেওয়া যায় এই চিন্তায় রাত্রের সুপ্তি ও দিনের বিরামকে নির্ব্বাসিত করবেন, এ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানে বলে রাখা ভালো যে সন্তানের আরামের জন্য তাঁদের ব্যগ্রতা যেন কোন মতেই সীমা ছাড়িয়ে না যায়--অন্ততঃ শিশু যেন তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে না পারে। শিশুর প্রতি ঔদাসীন্য ও অতি-মনোযোগ, এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন হচ্ছে শিশু-শিক্ষার ব্যাপারে একটা খুব বড় জিনিষ। শিশুর মঙ্গলের জন্য, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতখানি দরকার পিতামাতা সবই করবেন; তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদর বা সহানুভূতির ভাব কখনো প্রকাশ করবেন না। নবাগত ক্ষুদ্র শিশু অল্প দিনেই তাঁদের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করেছে--তাঁদের স্নেহের চোখে তার স্থান কত উচ্চে, একথা যেন সে কখনো অনুভব করতে না পারে। কারণ তাতে সে নিজকে খুব বড় মনে করবার সুযোগ পায়। Self importanceএর ভাবটা শিশুদের পক্ষে খুবই খারাপ।

দু তিন মাসের সময় শিশু হাসতে শেখে; সেই সঙ্গে বস্তু এবং ব্যক্তির পার্থক্যও বুঝতে আরম্ভ করে। এর আগে দুধের বোতলের (feeding bottle) জন্যে তার যতটা মমতাবোধ ও আকর্ষণ থাকে মায়ের জন্যে তার চেয়ে বেশী থাকে না। এই বয়সে মায়ের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক সে প্রথম নিবিড়ভাবে অনুভব করে। মাতাকে দেখে' অস্ফুটস্বরে আনন্দপ্রকাশও এই সময় থেকেই শুরু হয়। এর পরেই প্রশংসা আর তিরস্কার বুঝবার শক্তি হয়--সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা পাবার জন্যে একটা আগ্রহও জন্মায়। দেখা গেছে, পাঁচ মাসের শিশু টেবিলের উপর থেকে একটা ভারী জিনিষ তুলতে পেরে বিজয়গর্ব্বে চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে--যেন তার এই সাফল্যটাকে অন্যরা কিভাবে গ্রহণ করল তা বুঝবার জন্যে তার বড় আগ্রহ। যে মুহূর্তে শিশুর এই বোধশক্তি জন্মায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে শিক্ষাদাতার হাতে আর একটা নতুন অস্ত্র এল--শিশুমনের ওপর যার ক্ষমতা অতি অসাধারণ। কিন্তু এর প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁকে খুব সাবধান হতে হবে, যেন কোনো ক্রমেই অপব্যবহার না হয়। প্রথম বৎসরে শিশু তিরস্কারের তিক্ত আস্বাদ যেন মোটেই না পায়। তার পরেও যত কম তিরস্কার করে' পারা যায় ততই ভালো। তিরস্কারের মত প্রশংসা ততটা ক্ষতিকর নয়। শিশু এক একটী নতুন কথা উচ্চারণ করতে শিখলে বা 'চলি চলি পা পা' করে হাঁটতে আরম্ভ করলে কোন পিতামাতাই প্রশংসা না করে পারেন না। বাধাবিঘ্ন জয় করে' শিশু কোন কিছু একটা করতে পারলে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিতও নয়। শিশুকে বুঝতে দেওয়া চাই যে তার শিখবার আগ্রহ ও চেষ্টার সঙ্গে পিতামাতার সহানুভূতি আছে। তবে প্রশংসা জিনিষটাও বেশী সস্তা হলে শেষটার শিশুর কাছে তার কোন মূল্যই থাকে না--এ কথাও মনে রাখতে হবে।

প্রথম বৎসরে শিশুর বুঝবার, শেখবার ইচ্ছা আর আগ্রহ বড়দের চেয়ে অনেক বেশী কথা। পিতামাতা যদি সুযোগ সৃষ্টি করে' দেন সে নিজের চেষ্টাতেই শিখে নেবে। তাকে হামাগুড়ি দিতে, হাটতে বা কথা বলতে শেখাবার দরকার হয় না। অনেকে চেষ্টা করে' তাড়াতাড়ি বুলি শেখাতে চান; কিন্তু এ ভুল। আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সে এসব নিত্যই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বাকীটুকু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার নিজের চেষ্টাতেই হবে। কিছু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে' যদি সে কোনো কিছু একটা শিখতে পার--তবে সেই সাফল্য তাকে আরো শিখবার আগ্রহ আর উৎসাহ এনে দেয়; আর সেই প্রেরণার জোরে সে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। শুধু শিশুজীবনে কেন, বড়দের সম্পর্কেও একথা খুবই খাটে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মানুষের জীবনেই এটা একটা অতি বড় সত্যি কথা। কাজেই নিজের চেষ্টাতে সাফল্যলাভ করবার আনন্দ থেকে যেন শিশু বঞ্চিত না হয়। তবে এমন কোন কঠিন কাজেও তাকে প্রবৃত্ত করা উচিত নয়--যা তার ক্ষুদ্র শক্তিতে একেবারেই অসম্ভব। কারণ সে ক্ষেত্রে অক্ষমতার গ্লানি তার সমস্ত উৎসাহকে ম্লান করে' দেবে। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, একেবারে অতি সামান্য চেষ্টায় যদি কিছু করা যায় তবে সাফল্যের যে আনন্দ ও গৌরব তার আস্বাদ শিশু পাবে না। তার শক্তির পরিমাণে কিছুটা চেষ্টা করলেই যে কাজ করা যাবে তাতেই তাকে উৎসাহিত করা উচিত। ধরুন, ঝুমঝুমি বাজানো। বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ যদি একবার দেখিয়ে দিয়ে তার শিখবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলেন, শিশু নিজের চেষ্টাতেই তা শিখে নিয়ে একটা তৃপ্তি অনুভব করতে পারে।

আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কাজ যেন শিশু নিজের প্রয়োজন বোধে করতে শেখে তার চেষ্টা করা উচিত। তাকে কোন কাজে জোর করে' বাধ্য না করে' শুধু এমন সুযোগ ও অবস্থা তৈরী করে' দেওয়া চাই, যাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তা করতে পারে। External discipline জিনিসটা মোটেই ভাল নয়। Internal self-disciplineই হচ্ছে আধুনিক শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা। এই জিনিষটা শিশুকে প্রথম বৎসরেই যতটা সম্ভব শিখানো দরকার। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। অনেক মাতা শিশুকে দোয়া দিয়ে, গান গেয়ে, অনেক আয়োজন করে' ঘুম পাড়াবার বন্দোবস্ত করেন। এ অভ্যাস ভালো নয়। ঠিক সময়ে স্নানাহার শেষ করিয়ে নিরিবিলি শিশুকে বিশ্রাম করবার সুযোগ দিলে তার আপনি ঘুমিয়ে পড়া উচিত। এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘুমাবার অভ্যাস হলে শিশু পরিপূর্ণ শান্তিতে অনেক বেশী ঘুমাবে। আহার, নিদ্রা ইত্যাদি ব্যাপারে বেশী তোষামদের ভাব দেখালে শিশু ক্রমেই আরো বেশী খোসামদ দাবী করতে শেখে। ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে সে মাতাকে নেহাত অনুগ্রহ করল অথবা তাঁকে স্রেফ সন্তুষ্ট করবার জন্যেই দুধ খেল, এমন ভাব জন্মাতে না দেওয়াই ভালো। প্রথম বৎসরে শিশুর এই বোধশক্তি থাকে না, একথা মনে করা বিষম ভুল। তার জ্ঞানবুদ্ধি অস্ফুট, শক্তি কম। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে বুড়োদের চেয়ে সে কোন অংশে কম চালাক নয়, এ কথা আর একবার বলেছি। প্রথম বৎসরে তার শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলে। এত অল্প কালের মধ্যে এত বেশী শিক্ষা জীবনের আর কোন সময়েই হয় না। নবজাত শিশুর বুদ্ধি অতি প্রখর না হলে এটা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

মোটের উপর ক্ষুদ্রতম শিশুর সঙ্গেও আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, সন্তান গঠনের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটা নিগূঢ়তম সত্য। বিশেষ করে' শিশুর জীবনের প্রথম বৎসর সম্পর্কেই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। এই সময়ের শিক্ষায় যেমন অত্যন্ত বেশী সতর্কতা দরকার, এই দিকটায় ঠিক তেমনি আমাদের উদাসীনতাও সবচেয়ে বেশী--একথা আগেই বলেছি। আমাদের এই ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটী সন্তান যেন দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের ও দশের আত্মনিয়োগ করতে পারে—একেবারে গোড়া থেকেই প্রতি ঘরে ঘরে জননীদের এই-ই যেন সাধনা হয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি-এ

সাহিত্য-জগতে সাধারণতঃ তিন প্রকার লেখক দেখতে পাওয়া যায়। এক প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন নিজেকে খুশী করবার জন্য—নিজের মনের খেয়ালে। আরেক প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন সমঝদার পাঠকের বাহবা পাবার জন্য--তাঁদের মনোমত ক'রে। আর তৃতীয় প্রকার, যাঁরা লিখে থাকেন দশজনকে খুশী করবার জন্য--দশজনের মর্জ্জি মাফিক।

প্রথম প্রকারের লেখকদের লেখা পড়ে এই মনে হয় যে, তাঁদের মনে আনন্দের আবেগ আছে এবং তা প্রকাশ করবার জন্যও তাঁরা উদগ্রীব। কিন্তু কি ক'রে যে সে আনন্দ যথাযথ ভাবে ছবির মতো ক'রে প্রকাশ করতে হয়, তার নিয়মকানুন তাঁদের ভালো জানা নেই। মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য যে এল্‌জাবরার ফরমুলার মতো কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে, তা বলা আমার অভিপ্রেত নয়। সে নিয়ম লেখকের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি থেকেই সঞ্জাত, বাইরের থেকে লাভ করা অসম্ভব। তবু সাজাবার গুছাবার জন্য দরকারী architectonic skill বা মিস্ত্রি-বুদ্ধি, এই ধরণের লেখকদের লেখায় তা নিতান্তই বিরল। কারণ, জগত ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য সব চাইতে আবশ্যকীয় যে দু'টি জিনিষ--তিতিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ--তাদের ধার ধেয়ে চলা এঁদের পক্ষে অনেকটা কষ্টসাধ্য। আপন প্রা েের উদগ্র সুরা পান ক'রে এঁরা চলেন হাওয়ার বেগে - চারদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার সময় কোথায়? অনায়াস শক্তিকে আয়াসের আগুনে পুড়িয়ে খাটি ক'রে নেবার সংযম এঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাই বিধিদত্ত শক্তির কাঁচা মালই এঁরা সরবরাহ করেন, তা আর পাকা ক'রে তুলতে পারেন না। মানে, এঁদের সৃষ্টি বিধাতারই সৃষ্টি, এঁদের নিজের কিছু নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, কেবল সুকণ্ঠ হ'লেই ভালো গান গাওয়া যায় না, কেবল স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাও ভালো সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। উভয়ের জন্যই প্রস্তুতি দরকার--গানের বেলা কণ্ঠের আর সাহিত্যের বেলা মনের।

অবশ্য অনেকে ব'লে থাকেন যিনি যতো হার্টের চর্চ্চা করেন তাঁর সাহিত্য ততো মূল্যবান। কথাটায় আমি তেমন সায় দিতে পারিনে। কেন, বুঝাবার চেষ্টা করছি। --প্রাণের জাগরণে মনের খুশীতে অনেকেই নাচে। কিন্তু সবার নাচাই কি আর নাচা হয়? অথচ নাচা ভালো হচ্ছে না ব'লে এও বলা চলে না যে, তারা ভালো নাচতে পারছে না, কেননা, তাদের মনে আনন্দ নেই। মনের আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু তা বাইরে সুপ্রকট করবার জন্য দরকার যে নৃত্যজ্ঞান, তার অভাব তাদের যথেষ্ট। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, প্রাণের আনন্দ ও নৃত্যজ্ঞান এ দু'য়ের মিলনেই সৃষ্ট হয় সত্যিকারের নৃত্য—একটির অভাবে আরেকটি পঙ্গু থেকেই যায়। নৃত্যের জন্য দরকারী যেমন নৃত্যজ্ঞান, সাহিত্যের জন্য আবশ্যকীয় তেমনি সাহিত্য-পদ্ধতি—আর্ট। আর্টবিহীন সাহিত্য—যতোই প্রাণের প্রাচুর্য্য থাক্ না তাতে—কখনো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য ব'লে গৃহীত হ'তে পারে না। সাহিত্যের সাহিত্যত্ব নির্ভর করছে শুধু মনের আনন্দ বা অনুভূতির প্রকাশের উপর নয়, প্রকাশের ভঙ্গির উপর, কায়দার উপর। আর এই ভঙ্গির সৌষ্ঠব সাধনের জন্য দরকার আর্টের, বুদ্ধির, অথবা পূর্ব্বে যাকে বলেছি architectonic skill, তার।

দ্বিতীয় প্রকারের লেখকদের পানে তাকালে মনে হয়, এঁদের প্রাণশক্তি প্রথম প্রকারের লেখকদের মতো প্রবল নয়, কিন্তু মাথাটা একেবারে পাকা। কিভাবে সাজালে গুছালে লেখাটি সমঝদার পাঠকের বাহবা পেতে পারে সে সম্বন্ধে এঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এঁদের লেখা প্রায়ই বেশ যথাযথ ও ঠিকঠাক হ'য়ে থাকে, এবং এই অতিরিক্ত যথাযথতার জন্যই তা perfect ও শ্রীসম্পন্ন হ'তে পারে না।* লিখনভঙ্গির কারসাজির দ্বারা এঁরা পাঠকের মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চালাকির দ্বারা মানুষের বাহবা আদায় করতে পারা গেলেও মানুষকে সত্যিকার আনন্দ দেওয়া হয় না। তাই ফরাসী

* জুবেয়ার বলেছেন : 'অতিমাত্রায় ঠিকঠাকের ভাবটা ভালো নয়,—কি সাহিত্যে কি আচরণে শ্রীরক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম রাখা আবশ্যক'--আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যিক জুবেয়ার বলেছেন : Beware of tricks of style, স্টাইলের চালাকিতে ভুল' না। সাহিত্যের নিয়মকানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল হ'লেও প্রতিভাবানের যে স্বাভাবিক শক্তি—না লেখাকে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলে—তা হ'তে এঁরা বঞ্চিত। ইংরাজী সাহিত্যে Pope ও Dryden এর মধ্যে এ ধরণের লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম ধরণের লেখকরা যেন হার্টের পূজারী দ্বিতীয় ধরণের লেখকরা তেমন আর্টের পূজারী, আর তা এতো বেশী যে, এঁদের লেখা পড়লেই নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বলতে হয়—Too artistic। এই দু'দল নিজ নিজ মতের চরমে গিয়েছেন। দ্বিতীয় ধরণের লেখকরা বুদ্ধির এতটা চর্চ্চা করেন যে, প্রাণকে চিত্তের স্বাভাবিক সরসতাকে, এঁরা আমলই দিতে চান না। কিন্তু বুদ্ধিসৃজিত প্রাণবর্জ্জিত সাহিত্য থিয়েটারের অভিনেতার অনুভূতিহীন অভিনয়ের মতোই কৃত্রিম। অভিনয় যতই চমকপ্রদ হোক্ না কেন, একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়, সত্যিকারের দরদের স্পন্দন এর পেছনে নেই। অভিনেতা হয়তো হাস্‌ছেন, কাঁদছেন, দুঃখ প্রকাশ করছেন; কিন্তু হাসা, কাঁদা অথবা দুঃখের সত্যিকার অনুভূতি নেই তাঁর প্রাণে। প্রাণবর্জ্জিত বুদ্ধিসৃজিত সাহিত্যেও, প্রথমে না হোক, শেষে চোখে পড়ে একটা কৃত্রিমতা। রবীন্দ্রনাথ লিপিকার এক জায়গা বলেছেন--".....প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগ্‌বা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হ'য়ে উঠে।" কথাটা ভেবে দেখ্‌বার মতো।

বুদ্ধির পূজারী সাহিত্যিকরা মূর্ত্তি গড়তে পারেন মন্দ নয়, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন না মোটেই। প্রথম দর্শনে মূর্ত্তিগুলি সুন্দর দেখালেও পরিণামে বুঝ্‌তে পারা যায় প্রাণশক্তির অভাবে এরা নির্জ্জীব, সুতরাং হয়তো অসুন্দরও--অন্ততঃ সজীব মানুষের তুলনায়। মানুষের চেহারায় নিয়তই যে ইঙ্গিতের লাবণ্য ফুটে পুতুলের চেহারায় তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পুতুল হাজার হ'লেও পুতুল। হার্টের পূজারিয়া আবার সৃষ্টি করতে পারেন কিছুটা সজীব মূর্ত্তি, কিন্তু তাও পূর্ণাবয়ব নয় ব'লে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়। সাহিত্য সুন্দরের প্রকাশ। সুতরাং সজীব হ'লেও এঁদের রচিত সাহিত্য সমঝদার পাঠকের খুব বেশী আদরলাভ করে না। উপরোক্ত দু'ধরনের সাহিত্যের মধ্যে কারো কিছু মূল্য থাক্‌লে তা প্রাণপ্রধান সাহিত্যেরই, এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হ'বে। কবিতার বেলা প্রাণের প্রাধান্যই স্বাভাবিক। কারণ —

আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রা । শুধু পায় তাহা প্রাণে।

—রবীন্দ্রনাথ।

তবে আমরা এই মাত্র বল্‌তে চাই যে, প্রাণশক্তি যদি একটু নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে দেখা দেয় তবে তা যেন কেমন একটু বুনো বুনো ঠেকে।

তৃতীয় ধরণের লেখকদের লেখা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেননা এঁদের লেখা যে লেখাই নয় সে সম্বন্ধে হয়তো সকলেই একমত। সাহিত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। সাহিত্যিক কখনো দশজনের একজন নন, দশের মধ্যে এগারো। Emerson বলেছেন : He (poet) is isolated among his contemporaries, by truth and by his art, but with this consolation in his pursuits that they will draw all men sooner or late... অবশ্য দশজনকে নিয়েই সাহিত্যিকের কারবার আর দশের আনন্দ ও বেদনাবোধই তার মাল মস্‌লা। কিন্তু তাই ব'লে তিনি দশের এক হ'য়ে যান না,—একটি বিশিষ্ট মন, বিশিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে বিরাজ করেন সাধারণের মধ্যে। সাহিত্যে সেই বিশিষ্ট মনেরই প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মানুষের সমস্ত বেদনা নয়,—বিশেষ বিশেষ আশা, সাড়া জাগায় তাঁর প্রাণে। এখন এই যে নির্ব্বাচন, এর হেতু কি? কেন অন্য সব বাদ দিয়ে এই এই জিনিষ তিনি বেছে নেন তাঁর আলোচনার বিষয় রূপে? উত্তর অত্যন্ত সহজ। এই বেছে নেওয়া, এই নির্ব্বাচনের পেছনে আছে তাঁর রুচি, তাঁর ক্ষমতা ও স্বভাব; আর বলা বাহুল্য এ সবেই তো রূপ পরিগ্রহ করে মানুষের ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের এই ব্যক্তিত্বের মূল্য কতো বেশী W. H. Hudson এর একটি উক্তি থেকে তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় : 'Literature, according to Mathew Arnold's much discussed definition, is a criticism of life, but this can mean only that it is an interpretation of life as life shapes itself in the mind of the interpreter... The French epigram hits the mark--"Art is life seen through a temperament", for the mirror which the artist holds up to the world about him is of necessity the mirror of his own personality.

—সাহিত্যে যদি বস্তুই একক হ'য়ে দেখা দিত, যদি জগতের সুখ দুঃখ নিয়েই তার একমাত্র কারবার হ'ত, তা'হলে

সাহিত্যে এতো বৈচিত্র্য, এতো রকমারিত্ব আমরা দেখ্‌তে পেতেম কিনা সন্দেহ। কেননা, জগত সেই এক, মানুষের সুখ দুঃখের ধারাও এক, সুতরাং তার প্রকাশও এক হবে তাতো সুনিশ্চিত। কিন্তু তা হয় না। কারণ জগত এক হ'লেও যে-চক্ষু দিয়ে তাকে দেখা হয়, তা বিভিন্ন।

কিন্তু তৃতীয় ধরণের লেখকদের লেখায় এই বিশিষ্ট মন বা দৃষ্টির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। তাঁরা সাধারণতঃ লিখে থাকেন দশজনের মন ভোলাবার জন্য—তাদের মন জুগিয়ে। তবে সত্যিকার সাহিত্যে যে সাধারণের কাছে কোন appeal বা আবেদন নেই তা নয়। জুবেয়ার বলেছেন—'লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে যেন বাছা বাছা কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি অথচ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি না।'* অর্থাৎ লিখ্‌বার সময় মনে রাখা উচিত আমার এই লেখা সাধারণের কাছে পেশ করছি, অথচ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীরও অনুমোদন চাই। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের লেখকদের লেখায় সাধারণের কাছে appeal থাক্‌লেও বিশিষ্ট মণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণের চেষ্টা নেই; আর এই জন্যই তা যথার্থ সাহিত্য-পদ-বাচ্য হ'তে পারে না। এঁদের লেখার পেছনে প্রাণের তাগিদ কি নামের আশা কোনটাই আছে ব'লে মনে হয় না। খুব সম্ভব অর্থের আশাই এঁদেরকে লেখায় প্রবৃত্ত ক'রে। অন্ততঃ বিয়ের প্রীতি-উপহারের জন্য লেখা রঙচঙে বইগুলি দেখ্‌লে তা'ই মনে হয়।

অতএব বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় ধরণের লেখকরা কিছুটা সাহিত্য সৃষ্টি করলেও তৃতীয় ধরণের লেখকের লেখা মোটেই সাহিত্য হচ্ছে না। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্ট হয় তখনি যখন এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল-স্পর্শে মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও আনন্দ, হার্ট ও আর্ট একত্রে মিলিত হয়।+ এই মিলন সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। একে বাস্তব ক'রে তুলতে হ'লে প্রথম ধরণের লেখকদের করতে হ'বে কিছুটা বুদ্ধির চর্চ্চা, আর দ্বিতীয় ধরণের লেখকদের করতে হ'বে, প্রাণের। এ দু'য়ের মিলনেই সৃষ্ট হ'বে 'A thing of beauty' সুতরাং 'A joy for ever'। প্রাণ অন্ধ, তাই সহায়তা গ্রহণ করতে হয় বুদ্ধির, আবার বুদ্ধি নিশ্চল, তাই বাহনরূপে গ্রহণ করতে হয় প্রাণশক্তিকে। এ সব হয়তো কোন নতুন কথা নয়; নিতান্তই পুরানো। তবু সাহিত্য-চর্চ্চার, শুধু তা'ই নয়, সত্যিকার জীবনচর্চ্চার গোড়ার কথাও হয়তো এই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, খুব সাধারণ হ'লেও কথাটি সম্বন্ধে আমরা সব সময় সজাগ থাকি নে।

।২।

উপরোক্ত খেয়ালপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য থেকে সাহিত্য-জগতে দু'টি পরস্পরবিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে Realism ও Idealism আদর্শবাদ আর বাস্তববাদ। এই দু'মতের মধ্যে প্রায়ই লড়াই লেগে আছে, আর সে লড়াইয়ে বড় বড় সাহিত্যরথিরা যোগ দিয়ে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন। দেখ্‌তে জমকাল হ'লেও অন্যান্য তর্কের মতো এ তর্কও শূন্য প্রসব করে। প্রত্যেক দলই মনে করেন, —আমাদেরই জিত্, বিরুদ্ধ পক্ষ এবার চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছে। —আর এই ফাঁকে আসল তর্কটি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এ তর্কটি আমদানি করেন স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, যখন ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দেশ-চর্য্যাকে বস্তুতন্ত্রতাহীন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সুরে সুর ধরেন। (১) তখন সবুজপত্র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি চমৎকার কথা বলেন। কথাটি প্রণিধানযোগ্য। —'Realismএর পুতুল নাচ ও idealismএর ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবন চিৎ ও জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণে যা হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে Realist এবং Idealist—কি বহির্জগত, কি মনোজগত দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। (২)—বস্তুতঃ মানুষের জীবনে কল্পনা ও বাস্তব ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সুতরাং সাহিত্যেও তাদের একটা সমন্বয় কামনা করা স্বাভাবিক। দেহহীন আত্মার বন্দনা অথবা আত্মাহীন দেহের জয়গান, উভয়ই সমান বিসদৃশ। মনে হয়, সাহিত্যকে Realistic ও Idealistic এই দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে না দেখাই ভালো।

*জুবেয়ার—আধুনিক সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ।

+শুধু বুদ্ধিমান সাহিত্য কাগজের ফুল, শুধু প্রাণপ্রধান সাহিত্য বনফুল, আর বুদ্ধি ও প্রাণমিশ্রিত সাহিত্য ফুল—মানুষ আর প্রকৃতি সেখানে হাত ধরাধরি করে' চলে।

সাহিত্য যতোদিন জীবনের আলেখ্য হ'বে এবং যতোদিন কলের দ্বারা লিখিত না হ'য়ে সজীব মানুষের দ্বারা লিখিত হ'বে, ততোদিন তাতে কমবেশ আদর্শবাদিতা থাক্‌বেই। নামজাদা Realistic সাহিত্যগুলিও এক হিসেবে idealistic সাহিত্য, —এক নবতন্ত্রের Idealism এর সূত্রপাত হ'য়েছে এদের মধ্যে। এমন যে শরৎচন্দ্র, যাঁকে আমরা বাংলা সাহিত্যে realistic সাহিত্যের গুরু ব'লে মানি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিই কি আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করে? রাজলক্ষ্মী, বিজয়া, পার্ব্বতী, আর কমলকে কি আমরা সচরাচর যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাই? আর শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি কি আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী? আসলে শরৎবাবু ফটো তোলেন নি, ছবিই এঁকেছেন। তবে সে ছবিকে যথাসম্ভব বাস্তবতা দিতে, মানে, life-like করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

G. B. S. এর মতে realistic সাহিত্যের গুরু Ibsen এর নাটকের মূল কথা হচ্ছে—'His attacks on ideals and idealism' কিন্তু কথাটায় কি সম্পূর্ণ সায় দেওয়া যায়? Ibsen এর মানসকন্যা নোরাতেও তো আদর্শবাদের ছাপ কম লাগেনি। সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারীর চিত্র তিনি আঁকেন নি, বিদ্রোহিনী আত্মসম্মানজ্ঞানী নারীর চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ ও আত্মসম্মানজ্ঞানও তো এক নবতন্ত্রের আদর্শবাদ। মনে হয় Shaw 'আইডিয়েল' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। হয়তো প্রাচীন মামুলি বুলিগুলিই তাঁর কাছে ideal। কিন্তু যুগে যুগে নানা প্রয়োজন অনুযায়ী নব নব আদর্শের সৃষ্টি হওয়াও তো কিছু অসম্ভব নয়; ইতিহাসের পাতায় তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। Shavianismও কি একটা ideal নয়? অন্যান্য আদর্শের মতো Shavianismও তো কম সম্মোহনের সৃষ্টি করে না। Shaw এর মতবাদের জালে আট্‌কালে মুক্তি পাওয়া যে কতদূর দুরূহ ভুক্তভোগীর তা অবিদিত নেই।* আসলে idealকে ছাড়তে গেলেও ideal আমাদিগকে ছাড়তে রাজি কি না সন্দেহ। Idealism চাই নে Realism চাই, এও তো একটা ideal। আদর্শ কি? জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ যা একান্ত ক'রে আঁকড়ে ধরা যায়, ভাবরূপে যা নিত্য আমাদের শ্রদ্ধা ও ধ্যানের বস্তু হ'য়ে উঠে, তাই তো আদর্শ। সুতরাং এই আদর্শ থেকে মুক্তি পাওয়া যে অনেকটা অসম্ভব সামান্য চিন্তাশীলেরও তা ভেবে দেখা কষ্টসাধ্য নয়।

অতি আধুনিক লেখকেরা Realism এর বাহাদুরি ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিই কি বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়? বুদ্ধদেব বসুর নিরঞ্জন রায়ের মতো নাঁভাস নিরীহ অথচ দুর্জ্জয় সাহসী লোক, যিনি over nothing যুদ্ধ করতে পারেন এবং যুদ্ধ করতে করতে অসম্ভব রকম হাঁপিয়ে উঠেন, বর্ত্তমান জগতে ক'টি মেলে আমার জানা নেই। নিরঞ্জন দৈবাত মধ্যযুগ থেকে ছিট্‌কে এসেছে, বিংশ শতাব্দীতে ও anachronism—বজ্রধরের এই উক্তি মোটেই ফেল্‌নার নয়। যতদূর মনে হয়, এই অসাধারণত্বের জন্যই গল্পটি জমেছে ভালো। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন—'যতই আমরা Realism এর বড়াই করিনে কেন, অসাধারণ মানুষকে নিয়েই গল্প হয়।'—এখন এই যে অসাধারণত্ব, এতো লেখকেরই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তব জগতে এর প্রতিরূপ পাওয়া যায়। অতনু মিত্র আর অমিতাচন্দর মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছেলে মেয়েও হয়তো বাস্তব জগতে বিরল নয়। কিন্তু এমন সুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন মার্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা তো কোথাও দেখ্‌তে পাই নে। এই যে বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে পুস্তকের চরিত্রের বিভিন্নতা, এই তো কবির মানসসৃষ্টি, আর এইখানেই লেখকের আদর্শবাদিতা। তবু যে আমরা Realism এর বড়াই করি তার কারণ, বর্ত্তমানে আমরা অনেকখানি য়ুরোপীয় মতবাদের দ্বায়া সম্মোহিত। Realism চাই, এ কথাটির দ্বারা যদি বুঝান যায়,—শুধু সৌন্দর্য্যে চলে না সত্যেরও প্রয়োজন, তা হ'লে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তবু মনে রাখা উচিত—সাহিত্যের জন্য শুধু লজিকই নয়, ম্যাজিকেরও দরকার।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

*(১) তাঁদের বস্তুতন্ত্রতার আদর্শে আর অতি-আধুনিকদেব বস্তুতন্ত্রতার আদর্শে অনেক প্রভেদ। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন, সেই সাহিত্য যাতে দেশোন্নতির কথা প্রচুর। আর এঁরা বুঝতে বা বুঝাতে চাচ্ছেন : nakendness--prudery বা আব্রুহীনতা। (২) সবুজ পত্র--মাঘ, ১৩২১।

* অনেকের ধারণা Shaw আইডিয়েলের ধার ধেরে চলেন না। Shawর নিজের ধারণাও হয়তো তাই। কিন্তু তার নোবেল প্রাইজের incription এ আমরা দেখতে পাই :

'For his literary works, which is characterised by idealism and by humanity.....। সুইড্রিস একাডেমির সদস্যরা কি তবে বাতুল?—Iconoclast ও যে অনেকাংশে iconoclaier একথাটা অনেক সময় আমাদের স্মরণে থাকে না। মূর্ত্তিভঙ্গকারীরাও যে অনেক সময় নতুন মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন, উম্মাদনার আতিশয্যে তা তাঁরা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।"

প্রাচীন মুস্‌লিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

বাঙ্গলার যে যুগে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চার উন্মেষ হয়, আমরা সেই যুগেরই উদয় এবং সেই যুগেরই অস্ততারা। সেই যুগের শেষচিহ্নস্বরূপ আমার মত এখনও যে কয়েকজন বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মুস্‌লিম বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্মেষের যুগ যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুগে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার সেবায় বিভিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমিই ছিলাম পাল হইতে পলাতক। আমার সহকর্ম্মীরা কবিতা, সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির রচনায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে বেশীর ভাগই প্রেরণা দান করিয়াছিল--স্বধর্ম্মানুরাগ। আমার সাহিত্য-সাধনা ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা হইতে একটু পৃথক। আমি ছিলাম বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানদের প্রাচীন অবদানের তথ্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর। প্রাচীন বাঙ্গলায় মুসলমানের দান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমি যে-সকল নূতন তথ্যের উদ্‌ঘাটন করি, তাহা জাতির পক্ষে সম্মান কি অসম্মানের, গৌরব কি অগৌরবের বিষয় ছিল, সে বিচার আমি করিতে চাই না; তবে তাহা প্রকাশ করিয়া আমি আমার কোন কোন স্বজাতীয় ভ্রাতাদের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি। আমি সে-বিষয়ে লক্ষ্য করি নাই, আপন মনে কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছি। এ-সকল বিষয়ে মন দেওয়ার মত অবসর আমার ছিল না, এখনও নাই; কেননা আমি মুসলমানকেই দেখিয়াছি, তাহার ধর্ম্ম ইস্‌লামকে দেখি নাই।

আমার সহকর্ম্মীরা আরবী, ইরাণী, তুরাণী জাতভাইদের কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিয়াছেন; বাঙ্গলা ভাষার ভিতর দিয়া তাহা আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু আমি করিয়াছি আমার পাশের বাড়ীর মুসলমানের, আমার দেশের জাতভাইদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্ত্তিকলাপ সংগ্রহ। তৎসঙ্গে যদি প্রতিবেশী হিন্দুভাইদের জন্যও কিছু করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি লজ্জাবোধ করি না; কেননা ইহাও আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম। আমি সোজা কথায় ইহাই বুঝি, আমার দেশের জাতভাইরা দেশের ভাষার জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহাই যদি জানিতে না পারিলাম, তবে পরের দেশের ও বিদেশীয় ভাইদের কথা জানিয়া কি হইবে?

দেখিতে পাই, প্রত্যেক জাতির পশ্চাতে যেমন জাতীয় গৌরবসূচক কাহিনী (tradition) বর্ত্তমান রহিয়াছে প্রত্যেক আধুনিক সভ্যজাতি যেমন দেশের প্রাচীন সংস্কার, আচার, রীতিনীতির নব্য সংস্করণ, ঠিক তেমনই প্রত্যেক জাতির সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের নূতন বিকাশ। আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সহিত পাশ্চাত্য ভাবধারা, শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্রবের ফলে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যও ঐ পাশ্চাত্যপ্রভাবে বিশেষরূপে প্রভাবিত। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য অপর্য্যাপ্তরূপে পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিপুষ্ট হইলেও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসে নাই। বাঙ্গলার আধুনিক মুস্‌লিম সাহিত্যও প্রাচীন মুস্‌লিম সাহিত্যকে একেবারে বাদ দিয়ে মুস্‌লিম সাহিত্যরূপে বাঁচিতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, বাঙ্গলার বর্ত্তমান মুসলমানগণ তাঁহাদের সাহিত্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে প্রাচীন মুস্‌লিম সাহিত্যের প্রতিদৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির তিমিরাচ্ছন্ন দুর্গম পথে ক্ষীণ আলোক বর্ত্তিকারূপে সহচর হইতে পারে, এই ভরসায় অদ্যকার এই চট্টল সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রাচীন মুস্‌লিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি মোটামুটিভাবে অতিসংক্ষেপে দুই একটি কথা নিবেদন করিতে চাই। মনে হয়, এ-স্থলে ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আপনারা অবগত আছেন, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান তুর্কীরা বঙ্গদেশ জয় করেন। দেশ বিজিত হইল বটে, কিন্তু এদেশে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইতে ন্যূনাধিক এক শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে প্রধানতঃ দরবেশের

দ্বারাই বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে ধীরে ধীরে ইস্‌লাম বিস্তৃত হইতে থাকে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর অধীনতা-নাগপাশ ছেদন করিয়া বাঙ্গলা যখন মুসলিম শাসনের অধীনে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে, তখন হইতেই বাঙ্গলার মুস্‌লিম শাসক-সম্প্রদায় নানা বিষয়ে নিজদের স্বার্থকে বাঙ্গলার স্বার্থের সহিত এক বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গলার মুসলমানগণ অনেক ঘরোয়া ও সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গলার হিন্দুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িতে থাকেন; এবং বঙ্গদেশের সহিত নানাদিক হইতে তাঁহাদের পরিচয় ঘনীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। এই সময় বাঙ্গলার মুসলমানগণ দেশীয় ভাষায় সাহিত্যরচনায় মন দিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না--অন্ততঃ এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অর্থাৎ হোসেন শাহের রাজত্বকাল হইতে বাঙ্গলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ দেশীয় ভাষার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কবিতায়, বৈষ্ণবদের সাহিত্যে, প্রাচীন মনসামঙ্গল গ্রন্থে, প্রাচীন মহাভারত ও রামায়ণ পুস্তকে এই যুগের মুসলমান নরপতিগণের বঙ্গসাহিত্যপ্রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তাহা আপনারা বন্ধুবর রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। গৌড়ের সুলতানগণের দেশীয় ভাষানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যপ্রীতি এই যুগের বাঙ্গলার মুসলমানের মধ্যেও যে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মুসলমানগণ ধীরে ধীরে এইরূপে পরোক্ষভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলার মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে দেশীয় সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধও, বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিতান্তই "হাতেখড়ির" যুগ ছিল না; কেননা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের বহরাম দৌলত উজির নামক কবির "লায়লি মজনু" নামক গ্রন্থে যেরূপ পাকা বাঙ্গলা রচনার নমুনা পাওয়া যায়, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত না পাকিলে সাহিত্যে এইরূপ বাঙ্গলার আমদানী করা ও তাহার প্রচলন হওয়া অসম্ভব। চন্দ্রের প্রতি বিরহীর অনুযোগ প্রসঙ্গে এই কবি যে ভাষা ব্যবহার ও যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে নমুনা স্বরূপ তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :

"বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ।।
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর মরণ।।
* * *
দুঃখের বারতা জানে রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাই কেনে।।
যদি মুঞি লম্ফ দিয়া হস্তে লাগ পাম।
লামাই আকাশ হতে সাগরে ডুবাম।। ইত্যাদি

কবি দৌলত উজিরের বংশ-বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের হামিদ খাঁ নামক কোন অমাত্যের পৌত্র ছিলেন; চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ নামক নগরে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল এবং তাঁহার প্রকৃত নাম বহরাম। নিজাম শাহ নামক "সুর" বংশীয় কোন চট্টল শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে তৎপিতৃলব্ধ "দৌলত উজির" নামক উপাধিটি প্রদান করিয়াছিলেন। এই নেজাম শাহের প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে গিয়া কবি বহরাম লিখিয়াছেন :

"চাটিগ্রাম অধিপতি, নানা মত মহামতি,
নৃপতি নেজাম শাহা সুর।
একশত ছত্রধারী, সভানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গড়েশ্বর।

রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর।।

ষোড়শ শতাব্দীর এই বঙ্গীয় মুসলমান কবি নানা বিষয়ে অতুলনীয়। কি ভাষার মাধুর্য্যে, কি, ছন্দবৈচিত্র্যে, কি ভাবগাম্ভীর্য্যে—সকল বিষয়ে এই প্রাচীন মুসলমান কবি তৎকালীন যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির সহিত একাসন পাইবার যোগ্য। এই সময়ের আর কোন খ্যাতনামা মুসলমান কবির রচনা এযাবৎ আমার হস্তগত না হইলেও, আমার সন্দেহ নাই, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলার মুসলমানগণ বাঙ্গলা সাহিত্যরচনায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার মুস্‌লিম সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ একটি স্বর্ণময় যুগ। এই যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান অতুলনীয় ও অপরিমেয়। দৌলত কাজী, আলাওল, মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ্ খাঁ প্রভৃতি অসংখ্য কবি অমর প্রতিভা লইয়া এই যুগে জন্মগ্রহণ করে। এই যুগের মুসলমান কবির কাব্যালোচনা ও জীবনী সংগৃহীত হইলে সহজেই বিরাট গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। মহাকবি আলাওলকে সপ্তদশ শতাব্দী‸ ‸ীন্দ্রনাথ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। হিন্দু মুসলমান লেখকদের কৃপায় এখন তাঁহার নাম অবিদিত নাই। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কবি দৌলত কাজি আলাওলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রায় সমকক্ষ কবি ছিলেন। লস্কর উজির আশরফ খাঁ নামক কোন রোসাঙ্গ রাজ অমাত্যের আদেশে তিনি 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না' নামক বিখ্যাত কাব্যদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' আশরফ খাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দৌলত কাজি এই রাউজানের এলাকাধীন সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার কোন বংশধর বর্ত্তমান নাই।

কবি মোহাম্মদ খান "মুক্তল হোসেন" "জঙ্গনামা" "কাসিম যুদ্ধ" "কেয়ামত নামা" নামক অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বীর ও করুণ রসের বর্ণনায় এই কবির পদ্যসুধাধারা লেখনীমুখে শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠে। "মুক্তল হোসেনের" ভূমিকায় তিনি যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি "পরাগলী মহাভারত" প্রণয়নের উৎসাহদাতা পরাগল খাঁর বংশধর ছিলেন। তাঁহার এই প্রসিদ্ধ কাব্য ১০৫৫ হিজরী অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

সৈয়দ সোলতানের ন্যায় সুলেখক ও এত অধিক গ্রন্থপ্রণেতা কবি প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। তাঁহার "নবীবংশ" একটি বিরাট গ্রন্থ;—ইহা আদ্যন্ত পাঠ কবিবার মত ধৈর্য্য রাখা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। 'কাসাসুল আম্বিয়ার' ছায়াবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত বলিয়া মনে হয়। "নবী বংশ" ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির মধ্যে, "হজরত মোহাম্মদ চরিত" "ওফাত রসুল" "শবে মেরাজ" "জ্ঞান-চৌতিশা" প্রভৃতির নাম করা যায়। "জ্ঞান প্রদীপ" ও "জ্ঞান চৌতিশা" হিন্দুযোগের সহিত দরবেশী শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাব গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি নসরুল্লাহ্ খাঁ "মুসার সওয়াল", "জঙ্গনামা" এবং আরও কতিপয় নামহীন পুঁথির রচিয়তা। "জঙ্গনামায়" তিনি যে বংশ বিবরণ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার পিতা শরিফ মনসুর সন্দীপের মোগল শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁর (১৭০৭ খ্রীঃ) সমসাময়িক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার মুসলমানের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। রাজ্য হারাইয়া, শক্তি খোয়াইয়া বাঙ্গলার মুসলমান ধীরে ধীরে অধঃপতনের চরম সীমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনায় ভাটা পড়ে এবং অধঃপতন ঘটে। মুসলমানের মধ্যে এই সময়ে যে কম কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহাদের পূর্ব্বশক্তি লোপ পাইয়াছিল; তাই সাহিত্যসেবায় যে তীব্র অনুভূতি ও গভীর সাধনার আবশ্যক, তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া পড়ায় তাঁহারা পূর্ব্ব সূরিদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

মুসলমানদিগের বঙ্গসাহিত্য সেবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। তাঁহাদের সাহিত্যসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, প্রাচীন মুসলমান কবিগণ প্রধানতঃ মুসলমানী বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক কাব্য আরবী ও ফারসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। সাধু বাঙ্গলা ভাষায় ইস্‌লামী সাহিত্যের সৃষ্টি করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অবিকৃত বাঙ্গলা ভাষার মধ্যস্থতায় মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আরবী ও ফারসীর বিরাট

সাহিত্যভাণ্ডার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই ভাণ্ডার হইতে যথাসম্ভব মণিমুক্তা আহরণ করিয়া তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলায় প্রধানতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যই বিকাশ পায়। এই সময়ের কতিপয় মুসলমান কবি বাঙ্গলা সাহিত্যের এই নবীন বিকাশকে বৈষ্ণবীয় ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধশত এবংবিধ মুসলমান কবির পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে কেহ কেহ "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামে অভিহিত করিতে চাহেন। তাঁহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবীয় ঢঙে পদরচনা করিতেন, তাঁহারা বৈষ্ণবীয় ভাবপ্রবুদ্ধ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া তাহা করেন নাই। কেননা মুসলমান বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের কেহ কেহ মুসলমান শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে ঐ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন কী? বৈষ্ণবীয় রূপকের সাহায্যে মানবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমমূলক সম্বন্ধ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই মুসলমান কবিগণ বাঙ্গলার সর্ব্বজনপরিচিত বৈষ্ণবীয় রূপকের সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানদের মধ্যে ফারসী সূফী ও তত্ত্বজ্ঞানসমন্বিত বিরাট সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। এই সাহিত্যে পারস্যদেশীয় "সাকী" "শিরাজী" প্রভৃতি রূপকের ভিতর দিয়া মানবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমমূলক সম্বন্ধই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবিদের কেহ কেহ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় রূপককে তাঁহাদের সাহিত্যে স্থান দিয়া থাকেন, তাহাতে দোষের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।

সঙ্গীতশাস্ত্র মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, এ-বিষয়ে মুস্‌লিম্ ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তদ্রূপ মতভেদ বিদ্যমান আছে। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন মুসলমানগণ সঙ্গীতবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেন নাই। এখনও ইতিহাস খুলিলেই দেখা যায়, মুসলমানগণ একদিন কিরূপ সঙ্গীতপিপাসু ও রসজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতের চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্গীতের রাগরাগিণীর সহিত মুস্‌লিম ও ভারতীয় রাগরাগিণীর মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালী মুস্‌লিম্ সঙ্গীতজ্ঞদের পুস্তকগুলি "রাগমালা", "রাগনামা", "ধ্যানমালা" প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমরা সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ বা সমঝদার না হইলেও, নিম্নোদ্ধৃতি সঙ্গীতটির ন্যায় গানগুলির রসাল ভাবের অনুভূতিলাভ হইতে নিতান্তই বঞ্চিত নহি। নিম্নোদ্ধৃতি গানটির সুরের কথা বাদ দিয়াও কথাটি কত মধুর ও উচ্ছ্বাসময়, তাহার নমুনা দেখুন ঃ

রাগ - গুঞ্জারী ভাঙা

'মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার সনে।
নিঠুর কালার প্রেমজ্বালা না সহে পরাণে। ধু।
ঘরেতে বসিয়া শুনি মথুরা বাজে বাঁশী।
সুতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী।।
বাও নাই, বাতাসরে নাই, কদম্ব কেনে হেলে।
মুঞি নারীর করমের দোষে ডাল ভাঙ্গি পড়ে।।
কলসীতে জলরে নাই বসিয়া রৈলুং ঘরে।
চলিতে ন পারি আমি যৌবনের ভরে।।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে মনেত ভাবিআ।
মুঞি কেনে বসিআ রৈলুং পীরিতি লাগিআ।।"

বাঙ্গলার প্রাচীন সারস্বতকুঞ্জে মুসলমানগণ যাহা করিয়াছেন, তাহার একটু ক্ষীণ আভাস দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। উপরোক্ত সংক্ষিপ্তাদপি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আপনারা দেখিতে পাইবেন বঙ্গদেশের হিন্দুর মত এদেশের মুসলমানদেরও একটা বিরাট প্রাচীন সাহিত্য আছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, এই সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ়। আমাদের এই সাহিত্য পল্লীর নিভৃত নিকেতনে, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মুসলমান পরিবারগুলিতে এযাবৎ অযত্নে রক্ষিত হইয়া কাল, কীট ও হুতাশনের আহুতি যোগাইয়া আসিয়াছে। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে যে-ভাবে বিবাহ-

সভায়, উৎসব-বাসরে, বা কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে বিশ্রাম-ভবনে পঠিত ও আলোচিত হইত, কালের কুটিল গতিতে আজ আর সে-অবস্থা নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া কালের ঝঞ্ঝাবাত্যা ও উত্থান-পতনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে-সাহিত্য মুসলমানদের মধ্যে এখন জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে, সাময়িক নবভাব-প্লাবনের প্রবল স্রোতে পড়িয়া তাহার পূর্ব্বশক্তি অনেকটা হ্রাস পাইলেও এখনও এই সাহিত্যের মধ্যে যে শাশ্বত বস্তু ও মহান আদর্শ বিদ্যমান আছে তাহা কিছুতেই উপেক্ষার সামগ্রী নয়। আমার বিশ্বাস, তাহাকে একেবারে অবহেলা করিয়া ভবিষ্যৎ মুস্‌লিম সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতে গেলে সফলতার আশা নিতান্তই কম। বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমানকে বিশেষভাবে দেখিতে হইলে, চিনিতে গেলে এ-জাতির প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করা অত্যাবশ্যক; জাতির চিন্তাধারা ও সমাজবন্ধনের ইতিহাস তাহার সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এই বৃদ্ধের ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে, চট্টগ্রাম বিভাগের নানাস্থান হইতে, আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের অনেক বিলুপ্তপ্রায় রত্নের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়া এই অমূল্য জাতীয় সম্পদের উদ্ধারকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার মত শক্তি ও সামর্থ্য আর আমার নাই। তাই অদ্যকার সাহিত্য-সম্মিলনীতে আমার তরুণ বন্ধুদিগকে এ-কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের শত শত উপকরণ এখনও পল্লীর নিভৃত নিকেতনে আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় জীবন-পরিচয়ের উপকরণগুলি সংগৃহীত হইলে দেশের ও সমাজের, সর্ব্বোপরি মাতৃভাষার যে মহোপকার সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিগত ১৯১৮ ইংরাজীতে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর চট্টল অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আমি ভাবী মুসলমান সাহিত্যের ভাষা ও গতি সম্বন্ধে যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম, আজ আবার সে-কথা কয়টি বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এ-বিষয়ে এ-পর্য্যন্ত আমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; সুতরাং পুরাতন কথা না বলিয়া আর উপায় কি? বোধ হয়, আপনারা আমার পূর্ব্বালোচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন : "হিন্দুর মত আমাদেরও সাহিত্যের একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ আছে। সেই বনিয়াদের উপরেই আমরা ভাবী জাতীয় সাহিত্যের নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে পারি। মুসলমান সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন আলোচনা করিলে দেখা যায়, বরাবর যুগে যুগে ভাষা সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। যতই পশ্চাদ্দিকে যাইবেন, ততই আরবী ফারসী শব্দ-বহুল ভাষা দেখিতে পাইবেন, আর যতই সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবেন, ততই আরবী ফারসী শব্দ কমিয়া প্রায় হিন্দুর ভাষার মত ভাষা হইয়াছে দেখিবেন। আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ বুঝিয়াছিলেন, আমাদের সাহিত্য কেবল আমাদের জাতির মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, অন্য জাতির জন্যও তাহার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে। বিজাতীয়ের সহিত ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজন তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এখন অনেক বেশী হইয়াছে। এই অবস্থায়, আমাদের সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বজাতিবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের স্বরূপ নিজের বুঝা যেমন আমাদের আবশ্যক, পরকে বুঝানও আমাদের কম আবশ্যক নহে। প্রধানতঃ, অজ্ঞাতবশতঃ বুঝিতে না পারিয়াই যে বিজাতীয়েরা আমাদিগকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার কথা নহে। মুসলমানেরা বঙ্গভাষার জন্মদাতা, মুসলমানের রক্তমাংসে, মুসলমানের অস্থি-মজ্জায় বঙ্গভাষার দেহ গঠিত, মুসলমানের আদরে ও অনুগ্রহে তাহা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত। এ-অবস্থায়ও বঙ্গভাষা জাতিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিবে, সে-ভয়ে আমাদের কি বিচলিত হওয়া উচিত? বঙ্গভাষার অঙ্গে আমাদের অগণিত শব্দ ও ভাব এবং অসীম প্রভাব মিশ খাইয়া গিয়াছে। তৎসমুদয় বিচ্ছিন্ন করিতে গেলে, তাহার লোম বাছিতে বাছিতে কম্বল উজাড় হইয়া যাইবে, কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে। ....কবি আলাওল আমাদের মুসলমান সাহিত্যের গুরু। গুরুর অনুকরণ ও অনুসরণ করাই ভক্তিমান শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাঁহার ভাষাকে আদর্শ করিয়া আমরা অনায়াসেই নূতন স্রোতে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত করিতে পারি। বাঙ্গলার বর্ত্তমান ভাষা ব্যবহার করিয়াও আমাদের সাহিত্যকে ইস্‌লামী সাহিত্যে পরিণত করা অসম্ভব নহে। ভাবসম্পদে সম্পন্ন না হইলে শুধু শব্দসম্পদে কোন সাহিত্য জাতিবিশেষের প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। ভাষা চিরদিন ভাবের অনুগামিনী, ভাব ভাষার অনুগামী নহে। ভাষা জাতীয়তা চিনিবার বাহ্য লক্ষণমাত্র। ভাব ভিন্ন কেবল ভাষায় কোন জাতির প্রকৃত জাতিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। মনে হয়, গায়ে নামাবলী, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক কেবল বৈষ্ণবতার বাহ্য চিহ্নমাত্র; তাহাতে ভিতরের বৈষ্ণবতার পরিমাণ করা চলে না। ধর্ম্মের পার্থক্যে দেশে এখন এত অশান্তি; তার উপর ভাষারও যদি পার্থক্য ঘটে, তবে আমাদের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের লেখকগণ এই কথাটুকু স্মরণ করিয়া সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইলে, দেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।'*

*চট্টগ্রাম জেলার সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ। (১৩৪০)

সমন্বয় ও সৃষ্টি

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

মানব সমাজবদ্ধ জীব। তাই শুদ্ধমাত্র ব্যক্তিজীবনের মুক্তিতেই যেমন মানব-কল্যাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে না, তেমনি সামাজিক প্রভুত্বের চাপে যেখানে ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ বাধাগ্রস্ত, সত্যিকার মানব-কল্যাণ সেখানেও সম্ভবপর নয়। সমাজ-জীবনের প্রতি উপেক্ষাশীল অনাহত ব্যক্তিত্ব যেমন মানব-কল্যাণের পরীপন্থী, বল্‌গাহারা সমষ্টির প্রভুত্বও তেমনি সত্যিকার মানব-কল্যাণ-বিরোধী। তাই পরিপূর্ণ মানব-কল্যাণের জন্য চাই ব্যক্তিত্বের মুক্তি এবং তার সঙ্গে সুসমঞ্জস সমাজ-জীবনের স্ফূর্তি। Russel বলেন : "The life of an individual, the life a community and even the life of mankind, ought to be, not a number of separate fragments, but in some sense of whole. When this is the case, the growth of the individual is fostered and is not incompatible with the growth of the other individuals. In this way the two principles are brought to harmony."

মানবকল্যাণের ধারা অগ্রসর হয় সমাজ বিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে। সমাজ বিবর্ত্তন কি ব্যক্তির দান, না সমষ্টির সমবেত চেষ্টার ফল?

অনেকে সমষ্টির কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপর ততো জোর দিতে চান না। বলেন : ব্যক্তির প্রতিভাই সব--সমষ্টি ব্যক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

ব্যক্তির প্রতিভার কথা স্বীকার্য্য হতে পারে; কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিভা যত বড় হোক, অলৌকিকতা তাতে কিছু নেই--তা আসলে পারিপার্শ্বিকতারই দান। Croce বলেন : "The cult and superstition of the genius has arisen from this quantitative difference having been taken as a difference of quality. It has been forgotten that genius is not something that has fallen from heaven, but humanity itself. The man of genius who poses or is represented as distant from humanity finds his punishment in becoming or appearing somewhat ridiculous. Examples of these are the 'Genius' of the Romantic period and 'superman' of our time."

এখানেও দেখা যাচ্ছে : ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্যিকার বিকাশ পরস্পরনিরপেক্ষ নয়, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

তাই সমাজ-বিবর্ত্তনের জন্য যাঁরা প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতীক্ষায় বসে থাকেন, মানব-কল্যাণের ধারা সম্পর্কে তাঁদের মনের সচেতনতা খুবই কম, এ-কথা বলতেই হবে। সমাজ-বিবর্ত্তনের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি অনুকূল হয়ে উঠে, তবে প্রতিভা বা উদ্যমের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠতে খুব বেশী দেরী না হওয়াই স্বাভাবিক।

সমাজের এই বিবর্ত্তন সক্রিয় হয়ে উঠছে নব-নব সৃষ্টিলীলার ভেতর দিয়ে। কিন্তু সৃষ্টির মূলে কিসের প্রেরণা? আবেগের না বুদ্ধির? Russel বলেন, : "Reason is too negative, too little living to make a good life.'

বস্তুতঃ সৃষ্টিক্ষমতা বুদ্ধির নেই,--সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ আবেগ--passion, impulse--যেমন, যৌনজীবনে সৃষ্টির বেলায় রয়েছে Livido, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে intuition. Art is the expression of impressions, not the expression of expressions." (Croce).

তবে সৃষ্টির ব্যাপারে বুদ্ধির কোনো দাম নেই, এ-কথা বলা যেতে পারে না। আবেগের কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য--সৃষ্টিকে সুসংহত ও সুন্দর করার জন্য বুদ্ধির দরকার। "Blind impulse is the source of war, but it is also the source of science and art and love. It is not the weakening of the impulse that is to be desired, but the direction of impulses towards life and growth rather than towards death and decay." (Russel)

এখন, এই নবসৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠে কি করে'? সমন্বয়ে, না, আমূল পরিবর্ত্তনে?

কেউ কেউ বলেন : সমন্বয়ের ভেতর দিয়েই সৃষ্টিলীলা অগ্রসর হয়,--আমূল পরিবর্ত্তনের দরকার নেই :

এ-মত কতদূর সত্য? প্রথমতঃ, দেখ্‌তে হবে, সমন্বয় ব্যাপারটা কি? যা আছে, তাকে অস্বীকার করা বা ধ্বংস করা সমন্বয়ের কথা নয়; বর্ত্তমানকে স্বীকার করে' নিয়ে তার বিরোধী উপকরণগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধানই প্রধানতঃ সমন্বয়ের কাম্য। কিন্তু সামঞ্জস্যবিধানের কার্য্যটা প্রধানতঃ বুদ্ধিসর্ব্বস্ব ব্যাপার। আবেগের অস্তিত্ব এতে একেবারেই নেই, এ কথা বলা যায় না নিশ্চয়ই, কিন্তু সে খুবই সামান্য; বুদ্ধিই এর পরিচালকশক্তি। আবেগের আধিক্য বরং এর পক্ষে ক্ষতিকরই।

কিন্তু সৃষ্টি প্রধানতঃ আবেগের উপরই নির্ভর করে, তা আগেই বলা হয়েছে। বুদ্ধিও সেখানে আবশ্যক বটে, কিন্তু তা গৌণভাবে। কিন্তু সমন্বয়ে বুদ্ধিই মুখ্য, আবেগ গৌণ। তাই সমন্বয়কে সত্যিকার সৃষ্টি-প্রসূ ব্যাপার বলা যেতে পারে না। সমন্বয় বড়ো জোর জোড়াতালী মাত্র। সমন্বয়ে reform সম্ভব, কিন্তু নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা এতে কোথায়?

--তাই বলে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই, একথা বলি না। প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে করে' নূতন সৃষ্টি সম্ভাবনা সমন্বয়ে আছে, এ-কথা মেনে নেওয়া চলে না।

সমাজ বিবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় সবখানেই সমন্বয়বাদীর ঘন ঘন আবির্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশও বাদ যায়নি। আকবর, দাদু, নানক, কবির, রামমোহন প্রভৃতি সমন্বয়বাদীরা আবির্ভূত হয়ে আমাদের দেশে সমাজ-বিবর্ত্তন আনতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের কেউবা ধর্ম্মসমন্বয়, কেউ বা সৃষ্টিসমন্বয় দ্বারা সমাজবিবর্ত্তন সংঘটনে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাতে এদেশের সমাজের সত্যিকার বিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয়েছে কি? এঁদের কারো কারো চেষ্টায় এদেশের মুষ্টিমেয় লোকের সমাজ-জীবনে সামান্য কিছু কিছু reform সম্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজবিবর্ত্তন বলতে যে নূতন সৃষ্টির কথা বুঝায়, তা এর ফলে সম্ভব হয়েছে কোথায়?

এই সমন্বয়বাদীদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ--সৃষ্টিপ্রতিভা এঁদের ছিল না; সমন্বয়বাদীদের মাঝে তা থাকাও সম্ভবপর নয়। সামঞ্জস্যসাধনের জন্য আবশ্যক বুদ্ধি এঁদের ছিল হয়ত প্রচুর, কিন্তু নূতন সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক তীব্র আবেগ তেমন এঁদের ছিল না। তাই এঁদের চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে প্রধানতঃ গোঁজামিলে।

সমাজ-প্রগতির দিক দিয়ে লাভ হয়ত তাতে কিছু-কিছু হয়েছে, কিন্তু ক্ষতিও তাতে কম হয়নি। যে সামাজিক ঐক্যের জন্য তাঁদের সমন্বয়-চেষ্টা, যথোপযুক্ত আবেগের অভাবে উদগ্র কর্ম্মোন্মাদনা না জাগায় বস্তুতঃ তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি--অনৈক্যের উপকরণই তাতে আরো নতুন ভাবে বেড়ে গেছে।

এমন লোকও আছেন, যাঁরা এই অনৈক্যের উপকরণ বৃদ্ধিকে 'বৈচিত্র্য' বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সত্যই এ কি বৈচিত্র্য? ঐক্য-নাশী যা, তা সত্যিকার বৈচিত্র্য নয়,--বিরোধ। মানব-কল্যাণের জন্য আবশ্যক ঐক্য,--বিরোধ নয়। এই ঐক্যমুখী যে বৈচিত্র্যের ধারা, তা-ই মাত্র মানব-কল্যাণের সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন সমন্বয় চেষ্টার ফলে যে তথাকথিত বৈচিত্র্যের উপকরণ বেড়ে গেছে, তা আসলে ঐক্যমুখী হতে পারেনি,--সমাজ জীবনে তা বিরোধই বেশী করে' জাগিয়ে তুলেছে। তার কারণ এ-চেষ্টায় ঐক্য বড় কথা ছিল না,--এর আসল কথা ছিল আপোষ। ফলে অবাঞ্ছিত অনেক-কিছুই এই আপোষের মায়ায় এতে স্থান লাভ করতে পেরেছে। তাই গোঁজামিল ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে!

আর আপোষের ফলে কখনো সত্যিকার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; বিরোধী উপকরণ সমূহকে কখনো আপোষ-সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভবপর নয়--একমাত্র গরজের ঐক্য ছাড়া। সত্যিকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা বিরোধী উপকরণ সমূহের ধ্বংসের ভিত্তির উপর নতুন সৃষ্টির দ্বারাই মাত্র সম্ভবপর হতে পারে। এই নতুন সৃষ্টিতে বিরোধী উপকরণ সমূহের ধ্বংসাবশেষের দরকার থাক্‌তে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু কি দরকার এবং কতটুকু দরকার, তার বিচার-ভার ভাঙনের পরিচালক স্রষ্টার উপর--বিরোধী উপকরণ সমূহের আপোষের দাবী সেখানে অগ্রাহ্য।

তাই সমন্বয় নয়,--আমূল পরিবর্ত্তনই নবসৃষ্টির জন্য অপরিহার্য্য। আমূল পরিবর্ত্তন মানে যা ধ্বংস করা হচ্ছে, তার সমস্ত উপকরণের একেবারে বিলুপ্তিসাধন নয়--নতুন সৃষ্টিসৌধের ইট সুরকীর কাজে এদের ব্যবহার বাধাগ্রস্ত নয়।

এই আমূল পরিবর্ত্তনের অন্য নামই বিপ্লব--যা শুনলে অনেকেরই পিলে চমকে উঠে।

গোঁজামিলই যাঁদের মানব-কল্যাণ-প্রচেষ্টার চরম আদর্শ, তাঁরাই সাধারণতঃ এই নামে ভয় পান। বস্তুতঃ আতঙ্কিত হওয়ার বিশেষ কিছু এতে নেই। পরিপূর্ণ মানব-কল্যাণকামী যাঁরা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সুসমঞ্জস স্ফূর্ত্তি যাঁদের কাম্য, তাঁরা একে বরণ না করে' পারেন না। যাঁরা absolute, individualist, তাঁদের এতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে; কারণ সত্যিকার মানব-কল্যাণ-কামী তাঁরা নন--হতে পারেন না। মানব-কল্যাণ-কামনার চেয়ে ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থচিন্তাই তাঁদের মধ্যে প্রবলতর। নিছক ব্যক্তিত্ববাদীদের পক্ষে মানব-কল্যাণে উপেক্ষাশীল হয়ে ''নিগূঢ় আনন্দে''র খেয়ালে প্রমত্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এঁরা যে বিপ্লব-বিরোধী হবেন, তাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? এঁদের কথা : 'বিপ্লব মানুষের সমাজের এক ব্যাধি, সুতরাং মানুষের জন্য কাম্য নয়।'

বিপ্লব সম্বন্ধে যাঁরা উপরোক্ত মত পোষণ করেন, বিপ্লবকে তাঁরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন : 'বিপ্লবীদের বড় কথা হচ্ছে, সর্ব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি--আর তাঁরা বিশ্বাস করেন, সেই বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে এক সুন্দরতর ভবিষ্যতের জন্মলাভ হবে।'

বলা বাহুল্য, এ 'বিপ্লবে'র অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ অপব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে বিপ্লব সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণার ফলেই।

Houghton এর কথায় বিপ্লব হচ্ছে 'Sudden and radical change attended with a principle' বিপ্লবীরা সাময়িকভাবে একটা সর্ব্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা চান, এ-কথা ঠিক; কিন্তু এ ভাঙার আয়োজন করা হয় শুধু নতুন সৃষ্টিকে সম্ভব করে' তুলবার জন্যই। কিন্তু যতদিন না তাঁদের সম্ভাবনার চোখে ভাবী নতুন সৃষ্টির ধারণা স্পষ্টরূপে ধরা দেয়, ততদিন তাঁরা ভেঙে ফেলার কাজে নেমে আসেন না। নূতনতর সৃষ্টির জন্য একটা অন্ধবিশ্বাসই মাত্র তাঁদের সম্বল নয়, মানব-কল্যাণের জন্য গভীরতম চিন্তাই এর পেছনে কাজ করে। কাজেই বিপ্লবীরা Mystic কিংবা Dreamer নন মোটেই, তাঁরা নিতান্তই Realist।

মানুষের সমাজ-জীবন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল; কাজেই বিপ্লবের ধারণাও যুগে যুগে বদলেছে। আগে সমাজ-জীবনের পরিচালকশক্তি ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্ম। তাই তখন মানুষের ধর্ম্মজীবনের দিক দিয়ে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হতো। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মোহাম্মদকে এই শ্রেণীর বিপ্লবী বলা যেতে পারে। এঁরা অতীতের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন বটে; কিন্তু তা সমন্বয় বা আপোষের ভেতর দিয়ে নয়--সর্ব্বব্যাপী ভাঙার ভেতর দিয়েই। এঁরা মানব সমাজকে 'ব্যাধিগ্রস্ত' করেছিলেন, এ কথা বলা কি ঠিক হবে?

এর পরে এলো সমাজ-জীবনের উপর রাষ্ট্রনীতির প্রভাবের যুগ। ক্রমে বিপ্লব হয়ে দাঁড়ালো "Transference of political power through violence or under the threat of violence." (Bernard Shaw)

এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ভেতরেও ধারণার পরিবর্ত্তনশীলতা যুগে যুগে কাজ করেছে। ফরাসী বিপ্লবে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ছিল, তা হচ্ছে "Transference of political power from the autocrat to the Bourgeois, আর রুশবিপ্লবের পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য ছিল "Transference of political power from the Bourgeois to the proletariat " (Marx)

এর পর আবার যখন বিপ্লবের প্রয়োজন হবে, তখন হয়ত আবার তার জন্য নতুন principle গৃহীত হবে। তাই বিপ্লবীরা মানব-মঙ্গলকে আদর্শ করে' সমাজবিবর্ত্তনের জন্য ভাঙায় বিশ্বাসী। কারণ তাঁরা জানেন, না ভাঙলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়।

যাঁরা বিপ্লবে বিশৃঙ্খলা দেখে মনে করেন : ''এক সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিনাশের চর্চ্চার ভিতর দিয়ে মানুষের সমাজের শ্রেয়োলাভ কি করে' হতে পারে, তা আমাদের দুরধিগম্য,'' তাঁরা যেন Russel এর নিম্নলিখিত কথাটী একবার সমাহিত চিত্তে ভেবে দেখেন : 'Only passion can control passion and only a contrary impulse or desire can check impulse.....It is not by reason alone that wars can be prevented but by a positive life of impulse and passions antagonistic to those that lead to war.'

এঁরা বিপ্লবে অহিংসার অভাব দেখে দুঃখ করেন। অহিংসা যে খুব ভালো জিনিষ তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এঁদের জানা উচিত যে অহিংসা মানব-সমাজের চরম লক্ষ্য নয়,--চরম লক্ষ্য হচ্ছে মানব-মঙ্গল। ব্যক্তিগতভাবে অহিংসার চর্চা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সমাজ-বিবর্ত্তনের ব্যাপারে সমষ্টির কল্যাণ-যেখানে আসল উদ্দেশ্য, সেখানে বর্ত্তমানে তা সম্ভব কি? বর্ত্তমানে বললাম এই জন্য যে, সমাজবিবর্তনের ব্যাপারে অহিংসা যে কখনো নীতি হিসেবে গৃহীত হবে না, তা বলা যায় না। কিন্তু সে কখন? যখন সমষ্টিগত ভাবে মানব-সমাজ পূর্ণ মানুষের পর্য্যায়ে উঠতে পারবে, তখন। এ অবস্থা কখনো আসবে কিনা, তা নিশ্চয় করে' বলা সুকঠিন, কিন্তু আসতে যে কখনো পারেই না, তার স্বপক্ষে যুক্তির অভাব।

সমষ্টি-জীবনের সম্যক স্ফূর্ত্তি না হলে মানব-কল্যাণের দিক দিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন অর্থহীন, বিশেষ পূর্ণ মানুষের সমাজের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যান্ত সমাজ-বিবর্ত্তনের দিক দিয়ে অহিংসা নীতিও তেমনি অর্থশূন্য। তাই ফারসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ কোনো এক রুশীর পণ্ডিতকে পত্রোত্তরে জানিয়েছিলেন যে, সোভিয়েট রুশিয়াই যথার্থ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সাধনা করছে।

আসল কথা, বিপ্লব-বিরোধী সমন্বয়বাদীদের মানব-কল্যাণ সম্পর্কে চিন্তা নিতান্তই হাল্‌কা ধরণের। সম্ভবতঃ বুদ্ধিলেশহীন emotion-সর্ব্বস্ব ত্রাসবাদীদের দেখেই বিপ্লবী সম্বন্ধে তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ এরাও সর্ব্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা চায় এবং 'স্বদেশ-প্রেমের' একটা মোটা অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এক রকম radical change এদেরও কাম্য। মানব-কল্যাণের সম্পর্কে এদের কোনো সুস্পষ্ট চিন্তা নাই,--আছে শুধু কিছু গোঁজামিল। কিন্তু এদের দেখে সত্যিকার বিপ্লবী সম্পর্কে কোনো ধারণা করা অসমীচীন। কারণ সত্যিকার বিপ্লবী যুগের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাশীল ও কর্ম্মী মানুষ।

মিসেস আর এস্ হোসেন

আদেলা খানম

মিসেস্ আর, এস, হোসেনের সম্বন্ধে প্রথমেই এই একটী কথা আমার মনে আসে যে তিনি সমগ্র মোসলেম নারীসমাজের মুকুটমণি ছিলেন। তাঁহার গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত; তাঁহার যশোমহিমায় আমরা ধন্য। নারীর দুঃখে তাঁহার মত কেহ কাঁদে নাই; নারীর প্রাণের সত্যিকার ব্যথা তাঁহার মত কেহ বুঝে নাই। তিনি খুব অল্প বয়সে স্বামী হারান। স্বামীর স্মৃতি বুকে করিয়া আজন্ম তিনি বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কিসে নারীর মঙ্গল হইবে সর্ব্বদা তিনি সেই চিন্তা করিতেন। তাঁহার নিজের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। বুকভরা হাহাকার লইয়া তিনি পরের সন্তানের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন, কত অপবাদ তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়াছে। তথাপি কখনও তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। অন্ধ নারী সমাজ তাঁহার মূল্য কোন বুঝিয়া তাঁহাকে প্রতিপদে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল ছিলেন। সহস্র দুঃখ তিনি নারীর মঙ্গলের জন্য বুক পাতিয়া লইয়াছেন। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত নারী জাতির জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মরাগ' ও অন্যান্য পুস্তক জলন্ত অক্ষরে চিরদিন এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

কবি গাহিয়া গিয়াছেন ঃ

'কাঁদ্ তোরা অভাগিনী আমিও কাঁদিব।''-

কিন্তু তিনি শুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিসে নারীব মঙ্গল হইবে, আদর্শ কন্যা, ভগিনী ও জননীরূপে নারী আবার কবে জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে, সেই দিনের প্রতীক্ষায় তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানতার অতল জলধিতলে নিমগ্ন বঙ্গীয় মোসলেম নারী যাহাতে তাহাদের এই মূর্খতার কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেজন্য সকল লাঞ্ছনা তিনি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। অম্লানবদনে সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখে এক্ দাঁড়াইয়াছেন। পুরুষ নারীকে খেলার পুতুল না ভাবিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে; নারী কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে স্থান অধিকার করিবে; নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবী করিবার যোগ্য হইবে; ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সাধন-স্বপ্ন। এই জন্যই মিসেস্ আর, এস, হোসেন নারীকে শিক্ষাদীক্ষ'য় আদর্শ রূপে গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। নারী যদি স্বচেষ্টায় নিজের দাবী নিজে বুঝিয়া লইবার উপযুক্ত হইত, তাহা হইলে পুরুষেরা আপনা হইতে তাহার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত, এই সত্য এই আদর্শচরিত নারী তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই নারী-সমাজে নূতন যুগ আনিতে গিয়া তিনি ক্ষত বিক্ষত হইলেন। মোসলেম নারীর তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ের রুদ্ধ লৌহদ্বার খুলিতে গিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিলেন।

তিনি বঙ্গীয় মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি হাই স্কুল খুলিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহার সমস্ত সম্বল দান করিয়াছেন--মাত্র এইটুকু বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কিছুই বলা হয় না। দান অনেকেই করে; কিন্তু নিঃস্বার্থ যে-দান, যে দানে প্রতিদান নাই, যে দানে নামযশের লালসা নাই, যে দান করিতে যাইয়া দাতা গ্রহিতার নিকট হইতে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে আঘাত পাইযাছেন, এবং সেই আঘাতে তাঁহার বক্ষ জর্জ্জরিত হইয়াছে, এমন দান জগতে কয়জন করে?

হজরত রাবেয়া বস্‌রী প্রার্থনা করিতেন; 'হে খোদা যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি তাহা হইলে দোজখই যেন আমার ভাগ্য হয়; আর যদি বেহেশ্‌তের কামনা লইয়া সাধনা করি তাহা হইলে আমার জন্য বেহেশ্‌তের দ্বার যেন রুদ্ধ হয়! হে খোদা শুদু তোমারই প্রেমসাধনা যেন আমার কাম্য হয়। স্বর্গীয়া মিসেস্ আর এস্ হোসেন ঠিক এইরূপ নিষ্কামভাবে বঙ্গীয় মোসলেম নারীর কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সত্যই তিনি ছিলেন সংসাবে থাকিয়া সংসারত্যাগিনী দরবেশ। অর্থের অভাব যাঁহার কোন দিন ছিল না, সমাজের কল্যাণের জন্য সমস্ত দান করিয়া তিনি অতি দীনহীন বেশে একটি অল্প মূল্যের কম্বল মাত্র সার করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

একদিন তিনি কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র জীব মাকড়সা তাহার নিজের প্রাণ দিয়া শত শত মাকড়সাদের প্রাণ রক্ষা করে। আর আমরা মানুষ, আল্লার সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা কি কেহ্ এইরূপ একটি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত শত মোসলেম নারীর মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করিতে পারি না? সমগ্র জীবন দিয়া তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন-- "হ্যাঁ, পারিব।"

আজ যে মোসলেম নারীর প্রাণে জ্ঞানের সাড়া জাগিয়াছে, তাহার জন্য আমরা কাহার নিকট কৃতজ্ঞ? জীবনে তাঁহাকে আমরা যেন ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই। মরণে সকলের চমক ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহাকে হারাইয়া মোসলেম নারীর রিক্ততা যে কতখানি বাড়িয়া গেল, তাহার বুঝিবার সময় এখনও আমাদের আসে নাই। ধীরে, অতি ধীরে যতই সময় চলিয়া যাইবে ততই তাঁহার সহিত আমাদের সত্যিকার পরিচয় গভীর হইতে গভীরতর হইবে। তিনি থাকিতে যে মহাভুল আমরা করিয়াছি তাহার সংশোধন যে কিরূপে হইবে, তাহাই আমাদের সম্মুখে এখন বড় সমস্যা। এই মহাসমস্যার সমাধান কে করিবে? দুর্গম তমসাচ্ছন্ন গিরিপথের অগ্রগামী কে হইবে? মোসলেম নারী যদি এই ক্ষণজন্মা মহিলার পদাঙ্কানুসরণ করে, তবেই কল্যাণ; নয়তো সম্মুখে যে রাহু তাহাকে পুনরায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইবে না। এই মহীয়সী নারীর যে মৃত্যুহীন প্রাণ আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন যদি তাঁহার সেই মহাদান আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি, যে পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন, যদি সেই মহা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারি, যে দীপশিখা তিনি আমাদের সম্মুখে জ্বালিয়া গিয়াছেন যদি তাহার আলোকে পথ বাহিয়া চলিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল, তবেই আমাদের মুক্তি।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

মুজীবর রহ্‌মান খাঁ

কবি হুইটম্যান আমেরিকার জাতীয়তার জয়গান করেছেন, তার নব-মানবতার বাণী বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। তবু তিনি দেশবাসীর ভালবাসার মালা পাননি--পেয়েছেন দেশবাসীর উপেক্ষা ও অনাদর। কিন্তু আমেরিকা যদিও হুইটম্যানের কাব্যের উপযুক্ত সম্মান করেনি, তথাপি বৃহত্তর সাহিত্যিক-দুনিয়ায় হুইটম্যানের কাব্য-প্রতিভার যথেষ্ট সম্মান হয়েছে--যা নিয়ে জগতের যে-কোন কবি গর্ব্বানুভব করতে পারেন। মানবতার এই পুরোহিত কেন যে আপন দেশে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন, তা ভাবতে যদিও প্রথম একটু বিস্ময়করই ঠেকে, কিন্তু এর স্বাভাবিকত্ব বেশ ধরা পড়ে একটুখানি অনুধাবন করলেই। কবি হুইটম্যান তাঁর স্বদেশের কথা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রটি এমনভাবে জগতের কাছে তুলে ধরেছেন, যাতে আমেরিকাবাসীর কাব্যমন এতটুকু বৈচিত্র্যের সন্ধান, এতটুকু নূতনত্বের আস্বাদ পায়নি। তাদের সমাজ-জীবনে রূপায়িত আদর্শ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবচিত্র, তাদের সমাজ-জীবনের অদূর সম্ভাবনাই হুইটম্যানের কাব্যে ধরা পড়েছে এমন ভাবে, যাতে য়ুরোপ আবিষ্কার করেছে এক অফুরন্ত রসের খনি--যা জীবনের বাস্তবতায়, প্রাণ-রসে, সংযম ও শক্তি-মহিমায় অতুলনীয়; আর তাতেই কবির স্বদেশবাসীর মন নিরাশ হয়েছে কতকগুলো অর্থহীন খণ্ডিত কথার আড়ম্বর মাত্র দেখে। হুইটম্যান আমেরিকাবাসীর জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও নগ্ন সত্য দিয়ে একটি নবীন সাহিত্য-সৃষ্টির পটভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন,--দেশবাসীকে তিনি কোন নূতন আদর্শের প্রেরণা বা স্বপ্ন দিয়ে যাননি। সুতরাং হুইটম্যানে কাব্য যদি তাঁর দেশবাসীর চিত্ত-বিনোদন না-ই করে' থাকে, তার জন্য দায়ী বোধ হয় কবিও নন, কিম্বা তাঁর দেশবাসীরাও নয়। যদি দায়ী কেউ থেকেই থাকে, সে হল আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবিহীন অমৌলিক সাহিত্যিক কৃষ্টি। হুইটম্যান তাঁর সাহিত্য-সাধনায় এক নতুন কৃষ্টির গোড়া-পত্তন করতে চেয়েছিলেন। তাই কবি হুইটম্যান যে তাঁর স্বদেশবাসীকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হবেন, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় তেমন কিছুই নেই। দেশে যে তাঁর কদর হল না তাতেও দুঃখের বিশেষ কিছুই নেই। কারণ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন কায়েম হয়ে গেছে। হুইটম্যানের রচিত The Leaves of Grass, Children of Adam, Calmus আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

হুইটম্যানের প্রথম ও বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল তাঁর Leaves of Grass। যে-মানুষ একই সময়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বন্ধনের দাবী স্বীকার করেছে, তাঁরই জীবনের জাগ্রত সত্তাকে রূপ দেবার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই এই Leaves of Grass এর ভিতরে। হুইটম্যানের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন প্রকাশ-ধারার উৎসমূল এই গ্রন্থের মধ্যেই দেখতে পাই। হুইটম্যানের প্রেম, ধর্ম্ম ও মানবতার বাণীর একটা ইঙ্গিত এই Leaves of Grass-এর কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়।

যৌন-জীবনের উলঙ্গ বাস্তবচিত্র কুণ্ঠাহীনভাবে হুইটম্যান অঙ্কিত করেছেন Children of Adanএ। Children of Adam-এ এমন অনেক কথাই বলা হয়েছে, যার ফলে শ্লীলতার গতানুগতিক আদর্শে আঘাত লেগেছে অনেকখানি এবং এরই জন্য অনেক রুচি-বিলাসীর অভিযোগও হুইটম্যানের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে। Children of Ada" কবি আদমকে গ্রহণ করেছেন মানুষের আদিম প্রকৃতির প্রতীকরূপে, আর তার মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন আদিম যৌনজীবনের অনবদ্য সারল্য। কবি তারই সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন এক অনাগত আদর্শ-ভবিষ্যতে। মানুষ সে-স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে তার মনুষ্যত্বের বিকাশের দ্বারা, তার আত্মার প্রসারের দ্বারা। Leaves of Grass-এর কবি নরনারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনীন মানব-প্রীতির কথা বলেছেন; কিন্তু মনে হয় হুইটম্যান যেন সে সুর তাঁর Children of Adam-এ রক্ষা করতে পারেননি;--এখানে যেন তিনি কতকটা feminist। Children of Adam-এর প্রতি সমালোচকদের আরও একটি বড় অভিযোগ এই যে হুইটম্যান মনোবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট সত্যকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করেছেন। দেহের ক্ষুধা, ভোগের লালসা মানুষের

রক্তের ধারায় সচেতন--প্রচণ্ডতা তার সীমাহীন, উদগ্রতা তার বিপুল। কিন্তু শালীনতা ও সুষ্ঠুতা মানব-মনের ধর্ম্মাবশেষে -সমাজ-জীবনের মহত্তর কল্যাণকামনায় এদের শক্তিও প্রচুর। কিন্তু হুইটম্যানকে এভাবে যাচাই করতে গেলে সমালোচকরা অবিচার করবেন বলেই মনে হয়। কারণ হুইটম্যান মনে করেন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-কলাপ মানবাত্মার গভীরতম সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁর মতে তার স্বচ্ছন্দ, কুণ্ঠাহীন বিকাশের প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। মানব-প্রগতির জন্য ইহা অপরিহার্য।

এই সব মতামতের জন্য হুইটম্যানের জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে। তিনি বীরের মত নিজের জীবনে এই সব নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। একবার তাঁর এক গুণমুগ্ধ শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Don't on the whole regret having written your poems of sex?" কবি তার উত্তরে বলেছিলেন, "Don't on the whole regret that I am Walt Whitman?"

যৌনজীবনের এই সব কথা হুইটম্যানের খেয়ালমাত্র নয়, এগুলো তাঁর জীবনের তীব্রতম অনুভূতির সহজ প্রকাশ। কবির কাব্যবিচারকদের একথাটা ভাল করে' হৃদয়ঙ্গম করতে হবে সর্ব্বপ্রথম।

এর নিগূঢ় রহস্যের মায়াজালে হুইটম্যানের Calmus আবৃত হয়ে আছে,--কবি এখানে কতকটা mystic। তাই আমরা Calmusকে এক হিসাবে রূপক-কাব্যের পর্য্যায়ে ফেলতে পারি। কবি তাঁর Children of Adam-এ কেবল দেহসর্ব্বস্ব প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন, কিন্তু Calmus-এ তিনি দেহের ঊর্দ্ধে মানবাত্মার জয়গান করেছেন। মানুষ এখানে দেহের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করেই সুখী হতে পারেনি, তার প্রেমপিপাসু আত্মা অন্য আত্মাকেও তার ভালবাসার কুসুম-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়,--ব্যক্তির সীমারেখা ছাড়িয়ে সমষ্টির সহিত তার মিলনের জয়গান বেজে উঠে এখানে; সসীম হতে চায় অসীমের মাঝে হারা। Children of Adamএর কবি ছিলেন একক; বহুর সঙ্গে তার ছিল স্বতন্ত্রভাবে। কিন্তু Calmus এর ভিতর কবি একই সঙ্গে আপন সত্তার জয়গান গেয়েছেন--আবার বাহিরের বৃহত্তর মানবতার আহ্বান স্বীকার করে' নিয়েছেন। কবি যুগপৎ এখানে আপনার ও সকলের।

হুইটম্যান চিরদিন যা কিছু আদিম, যা কিছু মৌলিক, তার কথাই বলেছেন। একদিন আদিম মানুষ আদুল গায়ে, প্রকৃতির কোলে বিচরণ করত--তার সারাজীবনব্যাপী ছিল প্রাচুর্য্যের মহোৎসব. আদেশ নিষেধের কোন বালাই তার ছিল না কোথাও, ভোগের আনন্দে তার জীবনের পানপাত্র ভরে থাক্‌ত কানায় কানায়--সূর্য্যালোকে, ঝড়ের দোলায়, সমুদ্রের নোনাজলে মাতামাতি করে' সারা দেহ দিয়ে করত সে আপনাকে উপভোগ! এই যে 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ, হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা', হুইটম্যান হলেন তারই কবি। এজন্য অনেকে হুইটম্যানের নিন্দা করে' বলে থাকেন যে তিনি পশুধর্ম্মের (Animalism) জয়গান করেছেন। আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক Thoreau একদিন হুইটম্যানের প্রেমের কবিতাকে লক্ষ্য করে' বলেছিলেন, "He does not celebrate love at all. It is as if the beasts spoke". এ-কথায় কিছুই যে সত্য নেই তা নয়। কারণ হুইটম্যানের প্রেম দেহের ভোগই মাত্র--এ কথা তাঁর কাছে দিবালোকের মত সত্য। তিনি মনে করেন--এই প্রেমের অন্তরালেই জীবনের সকল শক্তির রহস্য অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে।

যদিও হুইটম্যান প্রকৃতির নৈকট্য ভালবেসেছেন, যদিও আধুনিক জীবনের জটিলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছেন, যদিও তিনি বলেছেন, "I furnish no specimens; I shower them by exhaustless laws, fresh and modern continually as Nature does" তথাপি বর্ত্তমান মানবসভ্যতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। পৃথিবীর নিঃসঙ্গ বিজনতা তাঁর কাছে যেমন ছিল বিস্ময়ের, তেমনি শহরের বিচিত্র অগণিত মানুষ ছিল পরম কৌতূহলের।

হুইটম্যানের কাব্য-প্রতিভার অনবদ্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর মানবতার গানে। বিশ্বমানবের মিলনের বাণী এমন উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্য-বীণায় এক অপূর্ব্বশক্তি ও মুক্ত আবেগের সাথে--যা কেবল আমেরিকার সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও নূতন। মানবতা ও গণতন্ত্রের এত বড় ভক্তপূজারী শুধু মার্কিন সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও নূতন। মানবতা ও গণতন্ত্রের একবড় ভক্তপূজারী শুধু মার্কিন সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও খুব কমই আছে। য়ুরোপের শিল্পবিপর্য্যয়ের (Industrial Revolution) ফলে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে নবজাত গণ-শিশু আবির্ভূত হল, সে তার বাণীর প্রকাশ চেয়েছিল সে-দেশের সাহিত্যেও--যার জন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী তাঁদের কাব্য-বীণায় দীপকের রুদ্র আলাপন করেছিলেন

একদিন। কিন্তু এঁদের প্রথমটি ছিলেন বিজন ধ্যানলোকের নিঃসঙ্গ দার্শনিক, আর অন্যটি ছিলেন কল্পলোকবিহারী। কিন্তু য়ুরোপের লোক চেয়েছিল আরও একটি আপন জন, মাটীর মমতারসে যার মন অভিষিক্ত, দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে যার নিবিড় আত্মীয়তা। অতিপরিচয়ের ঘনিষ্টতার মধ্যে আমেরিকা যাকে গ্রাহ্যই করল না, সেই হুইটম্যানের ভিতর য়ুরোপ তার সন্ধান পেল এবং যথোপযুক্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সাথে তাকে বরণ করে নিল।

হুইটম্যানের গণতন্ত্রের বাণীকে ভালো করে বুঝতে হলে তার একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। হুইটম্যান মানবাত্মার অমৃতত্বে পূর্ণবিশ্বাসী; কিন্তু সে-বিশ্বাসে বেশ একটু অভিনবত্ব রয়েছে। দার্শনিকেরা মানবাত্মার অমৃতত্বের কথা নানানভাবে বর্ণনা করেছেন। এঁদের একদল বলে থাকেন, পুনরুত্থানেই মানবাত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয় না; স্রষ্টা মানুষের জীবনের কাহিনী সতত স্মরণ করে থাকেন, কাজেই মানুষ অমর। আর একদল বলেন--ইতিহাসে মানুষের জীবনের যে-প্রভাব পড়ে থাকে, ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক, ক্রিয়া তার অপ্রতিহত ও শাশ্বত। অতএব মানুষের মৃত্যু নেই। আমার আর একদল দার্শনিক বলেন--মানুষ অমর, কারণ মানুষ এমন একটি সার্ব্বভৌম শক্তির অধিকারী, যার বলে যে কতকগুলো চিরন্তন মানব-বৃত্তির স্বভাব ধর্ম্মকে লাভ করেছে যার সাহায্যে এমন কতকগুলো জিনিষ যথা প্রেম, সত্য, শিব, সুন্দরের সাথে আপনার অখণ্ড সত্তাকে মিশিয়ে দিতে পারে পরিপূর্ণ ভাবে। এসব দার্শনিকদের গভীর তত্ত্বকে হুইটম্যান গ্রহণ করেননি। তিনি মানবাত্মার অমরত্বের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষ অমরতা লাভ করে ধন্য হয়েছে সেইখানে, যেখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে নিবিড় ভ্রাতৃত্বে, আপন সত্তার একীকরণে ও সর্ব্বোপরি সর্ব্বজনীন মানব-মনের ধর্ম্মে। এই ভাবে যদি মানবাত্মার অমরত্ব প্রমাণিত না হয়, তাহলে এই যে মনুষ্য জীবনের কর্ম্মপ্রবাহ, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশ ও বিবর্ত্তন, সকলই অর্থহীন ও দুর্জ্ঞেয় বলেই মেনে নিতে হয়। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অর্থ হুইটম্যান মনে করেন . মানবাত্মার অমরত্ব, মানবতার প্রসার ও আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিজ্ঞা—যেখানে মানুষ হবে চিরপ্রগতিশীল।

হুইটম্যানের সাম্য ও মৈত্রীর ধারণাও কতকটা আদর্শবাদীর মত। তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন বিশ্বমানব-মৈত্রীর কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবেই হবে। আজিকার মানুষ সত্য বটে বৈষম্যের ভেদ-ব্যবধানে নিপীড়িত, উচ্চ নীচের সীমারেখা এখনও বেশ সুনির্দ্দিষ্ট--কিন্তু এমন এক সুন্দর দিন মানুষের ইতিহাসে আসবে, যখন ভেদ-বৈষম্যের কোলাহলের সত্য সত্যই অবসান হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ভাবী মহামানবতার অক্ষয় শক্তি নিহিত আছে বিকাশের স্বপ্নমায়ায়, সাধনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে তাকে, সমাজ-জীবনে বাস্তব রূপ দিতে হবে তার। অমর মানবাত্মার অভিযান যদি সত্যই এই ভাবে চলে, তাহলে মানুষ এমনই এক সাম্য-স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল দেশে উপনীত হবে ঃ --

"Where no moments exist to heroes but in the common
words and deeds,
Where the men and women think lightly of the laws,
Where the populace rise at once against the never ending
...of elected persons.
Where the citizen is always the head, the ideal and
President, Mayor, Governor and what not are agents for pay."

কবি হুইটম্যানের সে আদর্শ-রাজ্যের মানুষ আপনার বিবেকরচিত আইন কানুনের দ্বারা আপনার জীবনকে করবে নিয়ন্ত্রিত, কোন রাজা-বাদশার গৌরব-স্তম্ভের সামনে তার মস্তক বিলুণ্ঠিত হবে না--রাজ্যের কর্ম্মচারী হবে মাত্র রাজ্যের আনুষ্ঠানিক অলঙ্কার। মানবতার এই স্বপ্নলোকের তাজমহল ধরার ধূলায় রচনা করতে পারে মানুষ তার অমর আত্মার তপস্যার সাহায্যে, তার প্রেমের দুর্ব্বার শক্তি-বলে। হুইটম্যান তাই মানুষকে ডেকে বলছেন ঃ--

"Come, I will make the continent indissoluble,
I will make the most splendid race the sun ever shone upon,
With the love of comrades
The life-long love of comrades."

স্বাধীনতা হুইটম্যানের মতে প্রত্যেক মানুষেব ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অধিকার, স্বকীয় সাধনার বলে তার আপন পথে চলার

দাবী, আপন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিজের ইচ্ছার সম্পূরণ--এছাড়া স্বাধীনতার স্বতন্ত্র কোন মানে হতে পারে না। হুইটম্যানের মতে দুঃখ মানুষের জীবনকে কেবল অভিশপ্ত করে না, দুঃখ মানুষের জীবনে আনে কল্যাণের শুভ আশীর্ব্বাদ। অভাবে দৈন্যে, বিরোধ বিগ্রহে মানুষের মনুষ্যত্ব খাঁটি হয়, তার মনের মানিক জ্বলে উঠে। তাই স্বাধীনতার দাবী কেবল আরাম আয়েসের দাবী নয়--এ যে আত্মার চিরন্তন প্রগতির পথমুক্তি। ব্যক্তির অমরত্ব এখানেই। ব্যক্তির বিলুপ্তি-কামনা হুইটম্যান কখনও করেন নি তার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমন্বয় বিধান, ব্যষ্টি ও সমষ্টির ছন্দোবন্ধন মিলন। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মিলন সাধন করতে হলে চাই প্রগতিশীল মানুষ (growing man) ও একটি আদর্শ রাষ্ট্র। হুইটম্যান একক ব্যক্তিত্বের বিকাশও যেমন চাননি, তেমনি তিনি ব্যক্তিত্ব-বিরোধী রাষ্ট্রকেও সমর্থন করেন নি। তাই তাঁর বাণী :

"I am for those who walk abreast the whole earth
Who inaugurate one to inaugurate all."

হুইটম্যানর জীবন-দর্শনের সত্যকে কোন একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক পরিভাষা দ্বারা বেঁধে দেওয়া কঠিন। তবে তাঁর কোন কোন সমালোচক হুইটম্যানের দর্শনকে বলেছেন--Evolutionary Vitalism। তাঁর দর্শন কতকটা যে তাই, তা তাঁর চিরবর্দ্ধমান মানবতা, প্রগতিশীল আত্মার কথা থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি।

আর্ট ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও হুইটম্যান কম সচেতন ছিলেন না। আর্ট ও সৌন্দর্য্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জিনিসও ছিল, কিন্তু নিছক আর্ট ও সৌন্দর্য্য তাঁকে সুখী করতে পারে নি। কারণ হুইটম্যান মনে করতেন, আর্টের বিকাশ ধারা অতীতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আর সৌন্দর্য্যত সমাপ্তিরই নিদর্শন। কাজেই সত্যিকার কবির কারবার হল ভাব-রাজ্যে, কারণ ভাবই (Idea) একমাত্র জিনিস যার গতি অন্তহীন। ভাব চিরদিন আদর্শ হয়ে আমাদেরে ডেকে নেবে হাতছানি দিয়ে কর্ম্মের পথে, আর তারে লক্ষ্য করেই মানব-প্রগতি গতিশীল থাক্‌বে চিরদিন।

হুইটম্যানের এই সব বড় বড় কথার বিচার কর্ব্বার অধিকার বড় বড় দার্শনিক ও রসতাত্ত্বিকদেরই। আমাদের সে সব নিয়ে বেশী গবেষণার প্রয়োজন বিশেষ নেই। আমরা কবির কাব্যের মধ্যে যে অফুরন্ত রসের সন্ধান পেয়েছি, একটি বিচিত্র সৃষ্টিরাজ্যের আবিষ্কার করে' বিস্ময়-মুগ্ধ হয়েছি, কবির কাব্যবিচারে এই বোধ হয় আমাদের চরম পাওয়া। কবির সাধারণ আনন্দলোকের উর্দ্ধে যাওয়া আমাদের শুধু অনধিকারই নয়, কবির প্রতিও কতকটা অবিচার। হুইটম্যানের বিচারকদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে একেবারেই আমল দিতে চান না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলে থাকেন যে, হুইটম্যানের হাতে কাব্যের যতটুকু লাঞ্ছনা হয়েছে, জগতের আর কোন কবির হাতে ততটুকু হয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ শালীনতার বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন তিনি, যৌন-লীলার অশোভন চিত্র নগ্নরূপে দেখিয়েছেন তিনি, রক্ত-মাংসের ক্ষুধার কথাকে সকল নীতিধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়েছেন তিনি। সুতরাং হুইটম্যানের কাব্যকথা কোন সুমার্জ্জিত কাব্য রসিকের প্রিয় হতে পারে না।

কিন্তু কোন কবির কাব্য-বিচারকদের মধ্যে তাঁরাই সব চেয়ে ভাগ্যবান, যাঁরা কেবল স্বকল্পিত বিধিবিধানের মাপকাঠি নিয়ে কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হন না, যাঁরা কতকগুলো চিরাচরিত নিয়ম নীতিকেই কাব্য-বিচারের একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না--যাঁরা আপনার মন প্রাণ কবির মন প্রাণের সহানুভূতির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারেন। প্রত্যেক যুগপ্রবর্ত্তক কবির কাব্যে এমন কতকগুলো জিনিস থাকে যেগুলো সমালোচকের কল্পিত সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিক বিধি ও আদর্শের গণ্ডীর বাইরে হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে আমরা বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক মনীষী Croce-র নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলোর দিকে পাঠকের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি :

"Every true work of art violated some established class and upset the ideas of the critics who have thus been obliged to enlarge the number of classes, until finally even this enlargement has proved too narrow, owing to the appearance of new works of art, which are naturally followed by new scandals, new up-settings and new enlargement."

সন্ধ্যাবতীর দেশে

(বাউল সুর)

জসীম উদ্দীন এম-এ

সন্ধ্যাবতীর দেশে,
বেলা শেষের সোণার কমল
মেঘের নায়ে যায় যে ভেসে।
অন্ধকারের ছায়ার তলে
একটি ছোট প্রদীপ জ্বলে;
সেথা, তারার মালা জড়িয়ে গলে
কে দাঁড়াল এসে।
ও তার, রূপে আলো ঝল মল
সারা ভুবন গেল ভেসে।
সন্ধ্যাবতীর দেশে।
কাহার তরে দোলায় বালা
সোণার হাতে চাঁদের থালা
অধর হ'তে বিজলী আলা
ছড়ায় সে যে হেসে,
ও কে, আসবে তাহার রঙিন বঁধূ
সিঁদুর পথের পথিক বেশে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন

গত ডিসেম্বব মাসেব (১৯৩২) শেষ সপ্তাহে কোল্‌কাতায বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনেব পঞ্চম অধিবেশন হয। এবাবকাব সাহিত্য সম্মিলনকে চাবটী শাখায ভাগ ক'বে উদ্যোক্তাবা বাঙালী মুসলমানেব সাহিত্যিক জীবনে এক নূতন অধ্যাযেব সূচনা কবলেন।

অভ্যর্থনা সমিতিব মুখপাত্ররূপে খান সাহেব মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সমাগত সাহিত্যিক ও সুধীজনকে সাদব সম্বর্দ্ধনা জানান। একটী সুন্দব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায আমাদেব এই প্রবীণ সাহিত্যিক অগ্রজ তকণ আন্দোলনকে অভিনন্দন কবলেন, তাতে তাঁব সমৃদ্ধ চিত্তেব পবিচয পাওয়া গেল।

তিনি বল্লেন, "ইহাব পূর্ব্বে মুসলমানেব দিক দিযে যে চাবিটী সাহিত্য সম্মিলন হইযা গিযাছে, তাহাতে যে পন্থা অনুসবণ কবা হইযাছিল আপনাবা সেই পুবাতন পথ ও মত পবিত্যাগ কবিয়া আজ যে নূতন পথ গ্রহণ কবিযাছেন, তাহা কেবল সমীচীন নয, সুসঙ্গতও বটে। আমাদেব তকণদেব মনে জ্ঞানার্জ্জনেব জন্য যে বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগিযাছে, ইহা তাহাব বাহ্য প্রকাশ। আমি এই আকাঙ্ক্ষাকে সকল প্রাণ মন দিযা অভিনন্দন কবি।"

"জ্ঞানেব জযযাত্রাব মত বড যাত্রা আব নাই। আমি আশা কবি, আমাদেব তকণেব দল জ্ঞানেব অন্বেষণে আজ যে শুভযাত্রা কবিলেন, তাহা বিজয মণ্ডিত হইবে।"

অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতিব সুবে সুব মিলিযে সম্মিলনেব সভাপতি বৃদ্ধ কবি কাযকোবাদও তকণদেব জযগান কবলেন। বর্ত্তমান তকণ আন্দোলন তাঁব প্রাণে আশাব গুঞ্জবণ তুলেছে। তিনি অদূব ভবিষ্যতে বাঙালী মুসলিমেব শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত জীবনেব আভাস পেযে উচ্ছ্বসিত হযে উঠেছেন।

সাহিত্য-শাখা

সাহিত্য শাখাব সভাপতি অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, এম-এ, "বাঙালী মুসলমানেব সেকালেব সাহিত্য চর্চ্চা প্রধানতঃ তিনভাগ ক'বে' দেখেছেন—"অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য ও মাবফতি সাহিত্য।"

"পুঁথি সাহিত্য নামে যে বিবাট 'মুসলমানী' সাহিত্য আছে তা অনুবাদ সাহিত্যেব অন্তর্গত ক'বে আমবা দেখাতে চাচ্ছি। বলা বাহুল্য এই পুঁথি সাহিত্যেব খুব কম গ্রন্থই অনুবাদ, অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থেব অনুসবণ মাত্র, কতকগুলো তাও নয, প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী প্রভৃতিব বর্ণনা। আমি নিজে এই সাহিত্যেব সঙ্গে তেমন পবিচিত নই। তবে যেটুকু পবিচয লাভ কবেছি তাতে চিন্তা, কল্পনা, বচনা সমস্তেবই বড বেশী দৈন্য চোখে পডেছে।" 'কাছাছল আম্বিয়াতেও এমন কিছু পাইনি যাকে বলা যেতে পাবে চিত্তাকর্ষক।"

"মোটেব উপব অনুবাদ সাহিত্য সত্যকাব সাহিত্য-হিসাবে তেমন কিছু নয বলেই মনে হয।"

"এই অনুবাদ সাহিত্যেব চাইতে গাথা সাহিত্যে প্রাচীন মুসলমানেব দাম অনেক উঁচু দবেব।"

একটী দৃষ্টান্ত কাজী সাহেব দিযেছেন। মুসলমানেব বচিত গাথা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোধ হয় মৈমনসিংহ গীতিকায় 'দেওযানা মদিনা।' গ্রাম্য ভাষায এই গাথা বচিত, কিন্তু বচয়িতা সত্যকাব কবি ব'লে তাঁব সৃষ্টি তাতে ম্লান হয় নাই।"

"মাবফতী সাহিত্য এক সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য। মুর্শিদী গান, দেহতত্ত্ব গান, বাউল গান এব অন্তর্গত।"

বাউলবা কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে ভাবিযে তুলেছে। এবা কোন্ সাধনাব উত্তবাধিকারী—সুফী সাধনাব, না বৈষ্ণব সাধনাব? কাজী সাহেব নিজেই উত্তব দিযেছেন, "আমার মনে হয়েছে এঁদেব ভাষায় বাংলার বৈষ্ণব কবিতাব কোমলতা ও মৃদুতার চাইতে বাএজিদ বোস্তামি, হাফেজ প্রমুখ সুফীদের বাণীর বিদ্যুৎভঙ্গি ও দাহই বেশী ফুটেছে।"

"এই যে কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করা হলো, এভিন্ন নানা রকমের পল্লীগান মুসলমান চাষীর কণ্ঠে গীত হয়ে থাকে, সেই গানের রচয়িতার নাম প্রায়ই পাওয়া যায় না।"

"মাতৃভাষার সাহায্যে" "বাংলার মুসলমানদের" "ভাব-চর্চ্চার' এই ইতিহাস দিয়ে কাজী সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন--"এই সহজ ধারা একালে এমন বিকৃত হলো কেন?" "সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান এখন নানাভাবে দ্বিধান্বিত, এমন কি পল্লীর মুসলমান চাষীর সেই গানের সাধনার ধারাও অনেকখানি বদ্‌লে গেছে।"

কাজী সাহেব স্বীকার করলেন--"ব্যাপারটি বাস্তবিকই বড় জটিল।" তথাপি এর তিনটি কারণ তিনি দিলেন।

"প্রথম কারণ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন।" রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ের জন্যে "বাংলার মুসলমানের সাহিত্যিক জীবনে" পরিবর্ত্তন আস্‌ল, তার কারণ মুসলমানের "সমাজ-গঠন ও কৃষ্টির দুর্ব্বলতা।"

"দ্বিতীয় কারণ ওহাবী প্রভাব।" কাজী সাহেব ওহাবী কথাটার দ্বারা কাদের বোঝাতে চেয়েছেন, তা পরিষ্কার করে বল্লেন না। শুধু এইটুকু বল্লেন--এদের 'প্রচারের ফলে' 'অনেকে নামাজ পড়্‌তে শিখেছেন কিন্তু কিছুই না বুঝে।' আর বল্লেন--'ওহাবী আন্দোলন ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের এক সশস্ত্র প্রতিবাদ। কিন্তু সে সংঘর্ষে তার ভাগ্যে জয়লাভ ঘটে নি। তাই তার পক্ষভুক্তদের ভাগ্যেও লাভ হয়েছে পরাজিত পক্ষের যত নৈতিক ও আত্মিক দুর্গতি।"

"তৃতীয় কারণ--মনীষীর অভাব।" "বাংলার মুসলিম জীবনে ওহাবী প্রভাব ও মনীষীর অভাব সম্বন্ধে বহু কথা বল্‌বার আছে।" কিন্তু কাজী সাহেব তেমন--কিছু বল্লেন না। এজন্যে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ ক'রে তাঁর মতটাকে আমাদের মনের সাম্‌নে স্পষ্ট ক'রে তুল্‌তে বাধা পাওয়া গেল।

"বাংলা মুসলমান এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনে উপস্থিত; সেই পরিবেষ্টনে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য নূতন আয়োজন তার চাই-ই; কিন্তু সেই আয়োজনের উপকরণ সে তার চারদিকে সন্দিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পাবে না, পাবে শান্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ।

এই প্রয়োজনীয় কথাটাও মুসলমান বুঝ্‌তে পারছে না। কাজী সাহেব বল্লেন--এরও কারণ 'ওহাবী প্রভাব ও নবসৃষ্টিধর্ম্মী মনীষীর অভাব।'

বর্ত্তমান "মুসলিম সমাজে সাহিত্য-চর্চ্চার যে অবস্থা, অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের যে সম্বন্ধ"' কাজী সাহেবের মতে "তা অনেকখানি আপত্তিকর। পাঠক-সমাজের বিচার-শক্তি এখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক লেখককে অনেক সময়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় অকিঞ্চিৎকর রচনায় হাত দিতে। পাঠক-সমাজের অজ্ঞতা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে, লেখক সমাজের উৎকর্ষলাভের পরিপন্থী হয়ে। এর আর এক ফলও ফলেছে।......এমন পাঠককে অবহেলা কর্‌বার......ফলে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন চরমপন্থী চিন্তাশীল এবং পরিবর্ত্তনভীত পাঠক সমাজ এই দুয়ের প্রাদুর্ভাব এই সমাজে হচ্ছে।'

মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটা গভীর আশা ও বিশ্বাস কাজী সাহেবের মনে জেগে উঠেছে। তাঁর কথা "একালের বাংলা-সাহিত্যে এমন একটী চিন্তাধারা রূপলাভ কর্ত্তে চাচ্ছে যার পরিপূর্ণ বিকাশে মুসলমান সমাজ-উদ্ভূত সাহিতিক বিশেষভাবে সাহায্য কর্ত্তে পার্ব্বেন ব'লে মনে হয়।"

এরকম কেন তাঁর মনে হলো, অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন মুসলিম তরুণদের সম্বন্ধে এতো বড় কথা তিনি কেন ভাব্‌লেন? কারণ তিনি দিয়েছেন--'হিন্দু সাধনার শ্রেষ্ঠ কথা হয় ত নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা,...কিন্তু....নিগুর্ণ ব্রহ্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় উৎকট ব্যক্তিত্ব বাদ ও কর্ম্মে অবিশ্বাস। বাংলার একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশে রূপ ধরে উঠ্‌তে চাচ্ছে বীর্য্যবন্ত জাগতিক জীবনের আদর্শ--বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্ব সৌন্দর্য্যের দিকে যার গতি।.....কিন্তু তার (হিন্দুর) নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ ও জাতি-অভিমান এর সার্থকতা লাভের অন্তরায় সহজেই হতে পারে। এই অবস্থায় মুসলমান সমাজের সাহিত্যিকদের দ্বারা এই ভাব ধারার বিশেষ সার্থকতা সাধনের কথা মনে হয় এইজন্য যে মুসলমানের......আল্লাহ্‌...নানা সদ্‌গুণের আধার, সেই সদ্‌গুণময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ ক'রে দৈনন্দিন জীবন সুন্দরভাবে যাপন কর্ব্বার.....প্রাচীন......শিক্ষার সাহায্য তার (মুসলমানের) লাভ হবে এ স্বাভাবিক।"

কাজী সাহেব উপসংহারে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন। রসসৃষ্টি সাহিত্যের উদ্দেশ্য--"একথাটার সঙ্গে আমরা সবাই অত্যন্ত পরিচিত।" কাজী সাহেব এটুকুতে খুশী নন। "সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যার সমাধানের প্রয়াস'--এও তিনি বল্‌তে চান। কারণ তাঁর মত--"সমস্যার সোণার কাঠির স্পর্শ না পেলে সাহিত্যিক চিত্তের নিদ্রাভঙ্গ হয় না।"

ইতিহাস শাখা

ইতিহাস শাখার সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল ইস্‌লাম, এম-এ, মানুষের লিখিত ইতিহাসের প্রতি দ্রুত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর অভিভাষণে। "মানুষের প্রথম ইতিহাস দেবদেবী লইয়া।" এই স্তরের ইতিহাসের দুটো উপস্তর। প্রথম উপস্তরে "প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও ভারতীয় আর্য্য ইতিহাস।" দ্বিতীয় উপস্তরে "হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি এবং ভারতীয় রামায়ণ মহাভারত লিখিত হয়। এই সমস্ত মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা মানুষ,--অতি মানুষ নহে।"

"ইহার পরস্তরে ইতিহাস লিখিত হয় রাজা-বাদশাহ লইয়া, সৈন্য-সেনানী লইয়া। এ স্তর আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্টজন্মের পাঁচ শ' বছর পূর্ব্বে, আর চলিয়াছে এখনও। উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ ইতিহাসের প্রতিবাদ করেন একদল লোক। তাঁহারা বলেন, ইতিহাস মানব-সমাজের তথ্যপূর্ণ সাহিত্য,--এ সাহিত্যে রাজা-রাজড়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তথ্যও থাকিবে; মানুষের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক সর্ব্ববিধ কথা কথিত হইবে।" এ-প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়নি; বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস নূতন ক'রে লেখা হচ্ছে। "খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন হিরোডোটাস।" হিরোডোটাসের পর থুকিদিদিস। তাঁর আদর্শ--'আমি বলিব সত্য--নিছক সত্য, শ্রুতিমাধুর্য্যের অনুরোধে সত্যের অপলাপ করিব না।" এ বড় কঠিন আদর্শ। "ধর্ম্মমত, স্বদেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত হওয়া" সব সময় সম্ভবপর নয়। "প্রাচীন রোমকেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মযাজকেরা সম্বৎসর প্রধান প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন।.....প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে শিখেন তাঁহারা প্রবাসী গ্রীকদিগের নিকট হইতে।"

"খৃষ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্যের রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইলে ইতিহাস লেখার ধারা পরিবর্ত্তিত হইল।.....মধ্যযুগ।...... (এই যুগে) ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইবে। বলিতে হইবে--জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বাভাষ রূপে। এই যুগেই ইসলামের আবির্ভাব হয়। ইসলামের ইতিহাসও একই দোষদুষ্ট। এই প্রভাবের দরুণ মধ্যযুগে প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই।"

এর পরে এল মানুষের মনে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক সংশয়। তার দৃষ্টির অগ্নিতাপে "প্রাচীন ইতিহাসের প্রাণসংশয় ঘটিল। ইতিহাসের পুনর্জ্জন্ম হইল।"

"চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তিউনিসবাসী ইবনে খালদুন.......তাঁহার 'মুকদ্দমা'য় রাজ-রাজড়ার ইতিহাসের সঙ্গে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য প্রভৃতির তথ্যসংযোগ করেন।"

"ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কতকগুলি উচ্চদরের ইতিহাস লিখিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতিহাস-লিখন-পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হয়।" "উনবিংশ শতাব্দীতে.....মানব জাতির ইতিহাসকে মানুষের আর্থিক সংগ্রামের অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়। ইহার মূলে ছিলেন কার্ল মার্কসের ন্যায় মনীষী। এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে।"

"জগতের ইতিহাস-সাহিত্যের কথা' বল্‌বার পর জহুরুল ইসলাম সাহেব ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখনও তমসাবৃত।" একে উদ্ধার কর্ত্তে হচ্ছে 'গ্রীক রোমক বা মুসলমান পরিব্রাজকের কৃপাভাণ্ডার হইতে;--তাহার অভাবে প্রাচীন মুদ্রা, ক্ষোদিত প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপি, অশোকের ক্ষোদিত অনুশাসন প্রভৃতি ইতিহাসের প্রামাণ্য সাক্ষ্য হইতে।" "ভারতবর্ষের মুসলমান ইতিহাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। মুসলমানেরা তাঁহাদের আগমন কাল হইতেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ইতিহাসে দোষগুণ উভয়ই আছে। গুণ : ইতিহাস লিখিয়াছেন ইতিহাস বলিয়া।......দোষ : এই ইতিহাস কেবলমাত্র রাজা-বাদশা লইয়া।" এরপর জহুরুল ইসলাম সাহেব বাদশাহ্‌দের আত্মচরিতগুলোর কয়েকটা দোষ দেখিয়েছেন। "আবুল ফজল বহুস্থলে আকবরের চাটুবাদ করিয়াছেন।.....তবে ইব্‌নে বতুতা, জিয়াউদ্দীন বারানী, ফেরেশ্‌তা,

বদায়ুনী, নিজামউদ্দিন, খাফি খাঁ প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার প্রমাণ দিয়াছেন,....তাহা ঐতিহাসিক ও বাদশাহবৃন্দ উভয়কুলের সত্যবাদিতা ও সত্যসহিষ্ণুতার আশ্চর্য্য সাক্ষ্যরূপে চিরকাল বিদ্যমান রহিবে।"

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস পুনর্লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তত্ত্বসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ ভারতের মুসলমান ইতিহাসকেও পুনর্গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।" "তাহার পর বৃটিশ ভারতের ইতিহাস।" এর মালমসলা প্রচুর; কিন্তু অনেক কাগজপত্র সরকারী সিন্দুকে—অনেক বা বৃটিশ মিউজিয়মে। "বিশেষতঃ এ ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সুস্পষ্ট দেখি না।" এই সব কারণে 'ব্রিটিশ ইতিহাস লেখা সুকঠিন।

সকলের শেষে মুসলিমকে ঐতিহাসিক হবার জন্যে জহুরুল ইসলাম সাহেবের আবেদন : "আমি মুসলমানকে ইতিহাস লিখিতে আহ্বান করি মুসলমানরূপে নয়, ঐতিহাসিক রূপে,.......থুকিদিদিসের উচ্চ আদর্শ লইয়া, ইবনে খাল্‌দুনের ভাবে প্রণোদিত হইয়া। আমীর আলী সাহেব, খোদা বখ্‌শ সাহেব আমাদের সম্মুখে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন--আমি আপনাদিগকে সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।"

দর্শন শাখা

দর্শন শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহ্‌মদ এম-এ, তাঁর সুন্দর অভিভাষণটিতে মুসলিম দর্শনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

দর্শনের জন্ম-ইতিহাসের মূলে মানুষের জীবন-সমস্যা। "সমস্যা শুধু মানুষের জীবনেই উপস্থিত হয়....। আদর্শের সহিত বাস্তবের সংঘাত হইতে সমস্যার উৎপত্তি।"

সমস্যার সমাধানের চেষ্টা মানুষ ধর্ম্মের সাহায্য নিয়েও ক'রে এসেছে। তার সঙ্গে দার্শনিক প্রযত্নের তফাৎ আছে। "ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগে যে সমাধান হয়, তাহা দর্শন এবং সমষ্টির অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রসূত যে সমাধান, তাহা ধর্ম্ম।" এইজন্যে "সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির যে-দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মের সহিত দর্শনের কলহ তাহার একটি পর্য্যায়মাত্র।"

রক্ষণশীলতার সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার বিরোধ সমাজগঠনের একটা স্বাভাবিক ও চিরন্তন ধারা। "সমাজ রক্ষণশীল না হইলে ব্যক্তির জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আঘাতে সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া যাইত.....। অথচ বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমাজের যাহা কিছু উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন তাহা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার দ্বারাই সকল সময়ে এবং সকলদেশে সম্পাদিত হইয়াছে।"

অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহ্‌মদ মুসলিম দর্শনকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করেছেন। "মুতাজিলীয় যুক্তিবাদ, নিছক দর্শন, সুফী অতীন্দ্রিয়বাদ ও ধর্ম্মাত্মক দর্শনবাদ।"

"মুতাজিলীয় যুক্তিবাদ প্রাথমিক মুসলমানগণের স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তি।... হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর.....শেষার্দ্ধ হইতেই ইহার প্রকৃত বিস্তারলাভ হইতে আরম্ভ হয়।"

তবে কি প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ স্বাধীন চিন্তায় চর্চ্চা করেন নি? "মুসলিম সভ্যতার প্রাণস্পন্দন কি মুক্তবুদ্ধিবর্জ্জিত জ্ঞানালোকশূন্য অন্ধকারেই আরম্ভ হইয়াছিল?" কাজেমউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব বল্লেন, "কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য।"

মুসলিম সভ্যতার যুগকে 'বিশ্বাসের যুগ' বলা যেতে পারে। 'ইহা ইসলামের নিছক ধর্ম্মীয় যুগ। এই সময়ে মুসলমানগণের ভক্তিপ্রবণ চিত্ত হজরত ও সাহাবাগণের অনন্য-সাধারণ চরিত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল।'

এর পর এলো আর এক যুগ। "উম্মিরা খলিফাগণের দুর্নীতিপরায়ণ জীবন" আর মুসলমানদের "অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং জীবনের অতিপ্রাচীন সমস্যাগুলি ....নূতনভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।" সুতরাং "মুসলমানগণের মধ্যে জীবন-সমস্যা-সমাধানে ব্যক্তিগত চিন্তার প্রয়োগ অর্থাৎ দর্শনের আবির্ভাব হইল।"

"রাজ্য-বিজয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য উললক্ষে' মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম গ্রীসীয় দর্শনের সংস্পর্শ লাভ করেন।"

'মুসলমানদিগকে গ্রীসীয় দর্শনে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন সিরিয়াদেশের নেষ্টরীয় ও মনোফাইসাইট্ সংঘের ধর্ম্মযাজকগণ।" খৃষ্টান ধর্ম্মকে তখনকার শিক্ষিত সমাজে গ্রহণীয় কর্ব্বার জন্যে যাজক সম্প্রদায়কে গ্রীসীয় ও নব্যপ্লেটীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হয়েছিল।

এইভাবে "মুসলমানগণের মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত হইল, তাহারই প্রথম ফল মুতাজিলগণের যুক্তিবাদ। ....ধর্ম্মের যে অংশ বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কোরাণকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধির মীমাংসাকেই মানিয়া লইতেন।"

"মুতাজিলীয় দর্শনের উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছিল....আব্বাসবংশীয় প্রাথমিক খলিফাগণের সাহায্যে। আর সংকীর্ণচেতা পরবর্ত্তী খলিফাগণের প্রতিকূলতায় ও বিষম রক্ষণশীল ইব্‌নে হাম্বালের অনুবর্ত্তিগণের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হইল তাহার পতন। কিন্তু এই দুর্দ্দিন আসিবার পূর্ব্ব হইতেই মুক্তবুদ্ধিধারা আর একটি নূতন পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুতাজিলগণের গবেষণার বিষয় ছিল কোরাণের প্রচলিত ধর্ম্মীয় মতগুলি। কিন্তু এখন যাঁহারা চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইল নিছক দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান। ইঁহাদেরও শিক্ষাগুরু হইলেন গ্রীসীয় মনীষিগণ।"

"মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ফারাবি, আবু সিনা ও এব্‌নে রোশদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরিষ্টটলের দর্শন, বিশেষতঃ তাঁহার মনোবিজ্ঞানই ইঁহাদের গবেষণার কেন্দ্র হইয়াছিল।

সুফীদের অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের সঙ্গে অনেকেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। এঁদের উদ্ভব সম্বন্ধে কাজেমউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব ইউরোপীয় লেখকদের মতামতের প্রতিবাদ ক'রেছেন।

"প্রাথমিক সুফিগণের বৈরাগ্য-সাধনার মূলে বিশেষ কোনো দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুসলিম দার্শনিকগণ যখন নব্যপ্লেটোয় দর্শনের নির্গমনবাদের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন, তখন হইতেই ক্রমশঃ সুফী রহস্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।"

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ সুফী দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু ইহাদের অলঙ্ঘ্য ভেদ কোরাণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ।" তথাপি অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের শোভাসমারোহে এসে যোগ দিলেন ইমাম গাজ্জালী। তিনি সুফী মতবাদকে "পূর্ণভাবে ইসলামে দীক্ষিত" করেন। সুফী মত ইসলামের অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াল।

এইবার আমরা মুসলিম দর্শনের শেষ অঙ্কে এসে পড়েছি। ইসলামের ধর্ম্মাত্মক দর্শন এই অঙ্কে জন্মলাভ করল। "এতৎপ্রসঙ্গে আবুল হোসেন অল্ আশারী ও ইমাম গাজ্জালীর নামই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িতেছে।"

আশারী প্রথমে ছিলেন মুতাজিল্। শেষে হ'য়ে দাঁড়ালেন এঁদের বিরুদ্ধবাদী। তাঁর কাজ হ'ল "যুক্তিবাদের খণ্ডন এবং কোরাণের ধর্ম্মীয় মতের সমর্থন।" এই চেষ্টা কত্তে গিয়ে তিনি কল্লেন "এক পূর্ণাবয়ব ভাবতন্ত্রবাদী দর্শনের সৃষ্টি।" "কোরাণের....মতগুলিকে......যুক্তিযুক্ত" প্রমাণ কত্তে তিনি ব্যস্ত হলেন।

তারপরে এলেন ইমাম গাজ্জালী। তিনি ইসলামকে বাঁচানোর জন্যে জোরপায়ে দাঁড়ালেন।

এঁর চেষ্টায় "শাস্ত্রীয় ইসলাম পুনর্জ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তাও চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ইমাম গাজ্জালীর নির্ম্মম কুঠারাঘাতের পর মুক্তবুদ্ধি আর কখনও ইসলামে মস্তকোত্তোলন করে নাই। 'দর্শনধ্বংস' নামকগ্রন্থে তিনি বুদ্ধির পঙ্গুতা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সত্যের একমাত্র পথ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।"

"পরবর্তীকালে ইব্‌নে রোশ্‌দ দর্শনকে পুনরায় ইসলামে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সে-দর্শনের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন ইউরোপের খৃষ্টানগণ—মুসলমানগণ নহে।"

বিজ্ঞান শাখা

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর কুদরৎ-ই-খোদা, পি-আর-এস, ডি-এস-সি, তাঁর অভিভাষণে "মুসলিম বৈজ্ঞানিকের অতীত দিনের গৌরব-গাথার সামান্য ইতিবৃত্ত আহরণ করিতে প্রয়াস" পেয়েছেন। ডাঃ কুদরৎ-ই-খোদা নিজে রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; এইজন্য বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখা সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন।

"আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুগ্রহে প্রাচীন রোমান, গ্রীক এবং ফিনিসীয় সভ্যতার যুগে মানবের রসায়ন-জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হই; অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলিম সভ্যতার যুগে সে কিমিয়ার সামান্য চর্চ্চা হইবে, ইহা আশ্চর্য্যজনক কিছুই নহে।"

কিন্তু প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের সাধনার কথা বইয়ের পাতায় লেখা পড়েনি; এজন্যে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্ববর্ত্তীদের সাহায্য কিছু পাননি। "তাঁহারা যাহা কিছু সাধন করিয়াছেন সে সকলই তাঁহাদিগের মৌলিক গবেষণার ফল।"

"খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরবগণ জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় গণিত, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র হইলেও তাঁহারা পদার্থবিজ্ঞান, অস্ত্র-চিকিৎসা এবং কিমিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

কিন্তু সেকালের পণ্ডিতদের মধ্যে একটা আত্মসর্ব্বস্বতার ভাব প্রবল ছিল। তাঁরা জ্ঞানের আদানপ্রদান বড় একটা কর্ত্তেন না। বরং কেউ কোনো নূতন তথ্যের পরিচয় পেলে তাকে গোপনে পোষণ কর্ত্তেন। এইভাবে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপর্য্যাপ্তবোধের অন্তবালে "বিজ্ঞানও যাদুবিদ্যার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।"

ডাঃ কুদ্‌রৎ-ই-খোদা পরিতাপের সঙ্গে বল্লেন যে এই কুহক বিদ্যার পথ ছেড়ে তখন বিজ্ঞান যদি বৈজ্ঞানিক পথে চলত "তাহা হইলে রসায়ন শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুগের লোক জার্ম্মানী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে না গিয়া মিসরে এবং বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইত।"

এর পরে সভাপতি প্রাচীন মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের রাসায়নিক জ্ঞান-গবেষণায় কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

"আধুনিক যুগে রসায়নকে ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে।" "পুরাকালে কিন্তু এই রসায়নের ত্রিশাখার বিভিন্ন আলোচনা হইত না। সে যুগে কেবলমাত্র খনিজ ও ধাতব পদার্থ সম্বন্ধে অনুশীলন হইত। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও রসায়নের এই বিভিন্ন ভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা খনিজ পদার্থ ও জৈব পদার্থ উভয়বিধ দ্রব্যের আলোচনা বহুল পরিমাণে করিয়াছেন।"

প্রথমে কাচের কথা। "ঈজিপ্টের মমীর সহিত কাচের টুক্‌রাও পাওয়া গিয়াছিল। আধুনিক রাসায়নিক সেই কাচখণ্ডের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার যাবতীয় উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মুসলিম বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ-জ্ঞান তেমন না থাকায় কাচখণ্ড পাইয়া থাকিলেও তাহারা তাহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পান নাই। কিন্তু মরুদেশের লোকে তাঁহারা, বালুকা হইতে প্রাপ্তব্য কাচ নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাদিগকে বেগ পাইতে হয় নাই।"

তারপর বারুদের কথা। "পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মহলে ধারণা ছিল বারুদ পাশ্চাত্যের আবিষ্কার।" "কিন্তু মুসলিমগণ যে বারুদের ব্যবহার জানিতেন এবং দূর হইতে শত্রু নিধন করিতে সমর্থ ছিলেন তাহা 'খালেদ বিন এজিদের' লেখা হইতে প্রতীয়মান হয়।"

ধাতু পদার্থের গঠন, বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে : "রৌপ্যকে রৌপ্য এবং লবণ সহযোগে উক্ত ক্লোরিনের সহিত সংযুক্ত করিয়া শুভ্রবর্ণের চূর্ণে পরিণত করিবার বিধি "আর-রাষির" পুস্তকে রহিয়াছে। এই শুভ্র চূর্ণকে পারদ সংযোগে পুনরায় রৌপ্যে পরিণত করিবার বিধিও প্রায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।"

"পরমাণু এবং অণু সম্বন্ধে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিতে বহুল চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

এ-চেষ্টা অবশ্যি সফল হয়নি, কিন্তু এর ফলে অনেক মিশ্রধাতু তৈরীর প্রক্রিয়া বের হ'ল। এই যুগেও ২/৪ জন বৈজ্ঞানিক তাঁদের সাধনার ফল লিখে রেখে গেলেন; জাবের-বিন-হাইয়াম তাঁদের একজন। "সুবর্ণ তাম্রের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার বর্ণে তারতম্য ঘটে। এই মিশ্রিত ধাতুকে সুবর্ণের প্রকৃত রূপ দিবার প্রক্রিয়া আবুল হাকিম মুহম্মদ বিন আবদুল মালিকের লিপি হইতে পাওয়া যায়।"

"আঈনাস্ সানাহ ও আউনাস্ সানাহ" নামক মূল আরবী গ্রন্থে পারস্য অনুবাদ অল্পকাল পূর্ব্বে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। এই পুস্তকে...তাম্রকে শুভ্রবর্ণের ধাতুতে পরিবর্ত্তন" কর্ব্বার প্রণালী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরপর মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের 'যাফ্‌রানুল হাদিদের' কথা বলা হয়েছে।

ডিস্‌টিলেশন সম্বন্ধেও "মুসলিম রাসায়নিকদের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" তাঁরা এ সম্বন্ধে অনেক নূতন

আলোচনা বিশদভাবে করেছেন। "জাবের, আল্-বোখাসিস্ এবং আর-রাজি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

"অতি আদিমকালে" মুসলমানেরা ডিষ্টিলেশন (distillation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে গোলাপের গন্ধসার (আতর) তৈরী করেন।

"দামেস্কের চিকিৎসক সেরাফিন এবং মরক্কোর খলিফা ইব্‌নে আতাফিলের পারিবারিক চিকিৎসক ইব্‌নে যোয়ার দশম শতাব্দীতে পরিশ্রুত গোলাপ জল চক্ষুরোগের ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করিতেন।"

"আধুনিক রসায়নাগারের প্রস্তুত বহুতর দ্রব্যের সহিত মুসলিম রাসায়নিকগণ পরিচিত ছিলেন।' এলকালি, সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রভৃতি মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নিত্য ব্যবহৃত বস্তু ছিল।

রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চা যাঁরা বিশেষভাবে করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম তালিকা ডাঃ কুদরৎ-ই খোদা তাঁর অভিভাষণে দিয়েছেন।

আধুনিক ইলেক্‌ট্রন থিওরি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলেছে। ডাঃ কুদরৎ বল্লেন, এ সম্বন্ধে হজরত আলীর একটী উক্তিতে যেন ইলেক্‌ট্রন সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। তিনি নাকি বলেছেন—"পারদ এবং অভ্র একত্র করিয়া যদি বিদ্যুৎ বা বজ্র সদৃশ কোন বস্তুর সহিত ইহাকে সম্মিলিত করিতে পার তাহা হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হইয়া পড়িবে।"

এমন হতেও পারে যে এই "বিদ্যুৎ বা বজ্রসদৃশ বস্তু" ইলেকট্রন।

"বিস্ময়ের বিষয় যে সত্যই পারদ ধাতু লইয়াই তাহার পরমাণুর অন্তর হইতে ইলেকট্রোন বিচ্ছুরণের চেষ্টা চলিতেছে। হয়তো সেই মহামুনির.....বাণী সত্যই......সফল হইতে চালিয়াছে।"

এই সাফল্যের জয়টীকা লাভ কর্ব্বার জন্যে ডাঃ কুদরৎ উপসংহারে মুসলিম যুবকদের আহ্বান করেছেন।

বুলবুলের কথা

কুঁড়ির বুকে ঘুমিয়ে বিচিত্র বর্ণগন্ধের উৎসব লক্ষ্মী। তার উদ্দেশে বুলবুলের কণ্ঠে গান ঃ

আজি বসন্ত জাগত দ্বারে
সখি জাগো, জাগো!

● ● ● ●

বুলবুলের কণ্ঠ চিরে কেন জাগে এই গান, এ জিজ্ঞাসায় আনন্দে গোলাপ-বালারা নৃত্য করেছিল, কিন্তু এর জবাবে সত্যিই তাদের প্রয়োজন ছিল না কোনো দিন।

● ● ● ●

বুলবুল-কবির মনের মণি-কোঠায় যে স্বপ্ন-পরী তার রঙীন পাখা মেলে, তার দেহের মদির গন্ধ ছড়িয়ে এক মায়া রাজ্য রচনা করেছিল, সঙ্গীত-মুখরিত বনানীর সবুজ-মহিমার মাঝখানে কুঁড়ির বুকে তারই নবজন্ম কামনা করেছিল বুলবুলের তৃষাতুর কণ্ঠের গান।

● ● ● ●

উপরে দিগন্ত-বিস্তৃত উদার আকাশ, নিম্নে অনন্ত-প্রসারিত সবুজের আস্তরণ-এর মাঝখানে বাধাবন্ধহীন মুক্তির লীলাছন্দে তার চিত্ত দোদুল-নৃত্যে দুলে উঠেছিল; আর তাব মনের সেই অপূর্ব্ব সুন্দর সম্ভাবনার আভাস ফুটে উঠেছিল তার চোখের মায়ায়, তার কণ্ঠের সঙ্গীতে। গান তার সার্থক হ'ল সেই দিন, যেদিন তার মনের বনের কামনা মাছায় নেমে এলো শ্যাম-ধরণীর পুষ্প-বীথিকায় ফুটন্ত গোলাপ হয়ে।

● ● ● ●

নিষ্ঠুর ঝঙ্কারাতে বুলবুলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে পারে, ব্যর্থতার নির্ম্মম প্রহরণে কণ্ঠ তার বিদীর্ণ হতে পারে:—সেজন্যে বুলবুলের মনে ভাবনা ছিল না কোনো দিন। সে গান করে আপন মনে—আপনার ভাবে পাগল হ'য়ে; কারণ ওই তার জীবন, ওই তার ধর্ম্ম!

● ● ● ●

তার গানের ভাষা জুগিয়েছেন যে সব স্বপ্নলোকচারী বন্ধুরা তার, তাঁদেরকে তার অন্তরের প্রীতি সম্ভাষণ।

৯০/৩ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—মাসপয়লা প্রেস হইতে শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ কর্ত্তৃক ২৩ ক্রিমেটোরিয়ম স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ] ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ [দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)

বেগম শামসুন্ নাহার

বার্ষিক ১॥ ০, প্রতি সংখ্যা ॥ ০

এই সংখ্যার লেখকগণ :

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

কবি নজরুল ইসলাম

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মাহ্‌বুব-উল-আলম

আবুল হোসেন, এম-এ, এম-এল

কবি মহীউদ্দীন

কাজী আনোয়ার-উল-কাদীর এম-এ

কাজী আবদুল ওদুদ, এম-এ

হুমায়ুন কবির, বি-এ (অক্সন)

কবি জসীমউদ্দীন, এম-এ

আবদুল কাদির

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, বি-এ

আবুল ফজল বি-এ, বি- টি

কামাল উদ্দীন, বি-এস-সি

শামসুন নাহার , বি-এ

No true progress can there be where there is no freedom--freedom from the shackles of priestcraft; freedom from the bondage of superstition; freedom from the fetters of authority--secular or otherwise. Naught but an emancipated intellect can seek, strive and achieve. No power could bend him to submission; no glittering gewgaw could lead him away from the path of duty.

-- S. Khud Bukhsh

বুলবুল

সম্পাদক

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)
বেগম শামসুন্ নাহার

বুলবুল

(বছরে তিন বার)

ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

—

বুলবুল

গান

নজরুল ইসলাম

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে।।
তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর,
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর,
তুমি ফোটার আগে ঝরা মুকুল
বৈশাখ হাওয়াতে।।
তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি
মরা নদীর চরে,
তুমি শ্বেতবসনা অশ্রুমতী উৎসব বাসরে।
তুমি মরুর বুকে পথহারা
গোপন ব্যথার ফল্গুধারা,
তুমি বাণীহীনা নীরব বীণা
সঙ্গীত-সভাতে।।

বঙ্কিমচন্দ্র

কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ

বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচকদের তিনটি বড় দলে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে। প্রথম দল বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে দেখেছেন ভারতীয় অথবা এশিয়ার আধ্যাত্মিক আদর্শের এক সুন্দর পরিণতি; দ্বিতীয় দল তাঁর ভিতরে দেখেছেন সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভা, অর্থাৎ ভাষার পর্য্যাপ্ত প্রকাশ-সামর্থ্য ও মানবজীবনের সত্যোদ্‌ঘাটনের দুর্লভ শক্তি; আর তৃতীয় দল তাঁকে ভাবেন খেয়ালী কিছু রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা-স্রষ্টা। তৃতীয় দল তাঁদের মতামত তেমন পূর্ণাঙ্গ করে' ব্যক্ত করার তাগিদ এখনো অনুভব করেন নাই, তাই প্রথম দুই দলের মতই বিচার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্রেব ভিতরে যাঁরা ভারতীয় অথবা এশিয়ার আধ্যাত্মিক আদর্শেব সুপ্রকাশ দেখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন অগ্রগণ্য, কেননা তিনি এই আধ্যাত্মিকতা বল্‌তে মানুষের অন্তরাত্মার এক বিশেষ বিকাশ বুঝেছেন, সাধারণতঃ আমাদের দেশের আধ্যাত্মিকতাবাদীরা যেমন প্রচ্ছন্ন অথবা অপ্রচ্ছন্ন দাম্ভিক, সেই সাহিত্যিকজন-অশোভন রূঢ়তার দ্বারা তিনি কখনো আক্রান্ত হন নাই।

কিন্তু মনে হয় যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ও দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও কতকটা সমসাময়িক কালের প্রভাবের বশীভূত হয়েই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালে এমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন, হিন্দু সমাজের জাগরণ নামে যে-ব্যাপারটির জন্য দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করে' থাকেন তার সঙ্গে তাঁর সংস্রব এত বেশী যে তাঁর সম্বন্ধে এরকম ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। —আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মজীবন বল্‌তে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে একাধিক সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংজ্ঞাটিও সুন্দর;—তিনি বলেছেন · সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরমুখী হওয়ার নাম ধর্ম্ম। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে—অথবা কৃষ্ণচরিত ও সাম্য-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরেও—এই সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরমুখী হওয়ার শান্তি বাস্তবিকই কি আমরা অনুভব করি? তার চাইতে দুঃখবোধ, নৈরাশ্য ও অশান্তি—প্রকৃতির নির্ম্মমতার জন্য দুঃখ, মানুষের অক্ষমতার জন্য নৈরাশ্য ও তাঁর নিজের প্রকৃতির ভিতরকার কি-এক অশান্তিবোধ, এই সবই কি তাঁর উপন্যাসগুলোতে আমরা বেশী করে' অনুভব করি না? অনেক সাধুসন্ন্যাসীর কথা, তাঁদের পরোপকাব ব্রতের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আছে বটে;—মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এসব কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভাবতেন, কিন্তু সাহিত্যিকের যে-চেতনা তাঁর সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় সেই চেতনায় এই আধ্যাত্মিকতার শান্তি ত পৌঁছায় নাই!

তাই দ্বিতীয় দলের কথাই বেশী ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যিক বৈভবও কম নয়, সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টিও তাই এঁদের মতামতের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু মনে হয় এঁরাও কিছু বিভ্রান্ত হয়েছেন সমসাময়িক কালের প্রভাবে। বিদ্যাভাসের সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চ্চা আমরা করি, ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচকদের নানা তত্ত্ব আমাদের রাগ-দ্বেষের বিষয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে এই দ্বিতীয় দল ইংবেজি বা ইউরোপীয় সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়ই দিয়েছেন বেশী, বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে যে বাস্তবিকই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়েছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রকে এঁরা বলেছেন দুর্লভ রূপাঙ্কন ক্ষমতার অধিকারী—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় objective artএর শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই রূপাঙ্কনের ক্ষমতা যে তাঁর আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক রূপাঙ্কন বল্‌তে আরো কিছু বোঝায়। সুবিখ্যাত শিল্পী চসারকেও কোনো কোনো সাহিত্য-সমঝদার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রূপস্রষ্টা বলেন নাই এই ভাবনা থেকে যে (তাঁদের ধারণায়) মানবের অন্তর্জীবনে চসারের দৃষ্টি যথেষ্ট গভীর নয়। অপর পক্ষে টলষ্টয়ের রচনায় প্রচলিত সাহিত্যিক সৌষ্ঠব লক্ষ্যযোগ্য না হলেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী বলা হয় এই জন্য যে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁব পরিচয় গভীর

ও ব্যাপক। এই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে চাইলে খুশী হবার অনেক কিছু তাঁর ভিতরে আমরা পাই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে ত পরিতোষ লাভ হয় না। ধরা যাক তাঁর বিষবৃক্ষ। তাতে যে-সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন সহজেই সে-সব মনোজ্ঞ। কিন্তু তারা বড় বেশী প্রাদেশিক। অবশ্য প্রাদেশিকতা মাত্রই সাহিত্যে নিন্দনীয় নয়, বরং অনেক স্থলে প্রশংসনীয়। কেন না পরিবেষ্টনের ভূমিকায়ই রূপসৃষ্টি সম্ভবপর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও সার্ব্বভৌমিক। টলষ্টয়ের নায়ক নায়িকাও কম প্রাদেশিক নয়, কিন্তু সেই প্রাদেশিকতার বেশে যে তারা সার্ব্বভৌমিক একথা বুঝতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না। মনে হয় বিষবৃক্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত চরিত্রই নিতান্ত অল্প পরিসরে উজ্জ্বল বা মহৎ, একটু বিস্তীর্ণ পরিবেশে তাদের দাঁড় করালেই তারা যেন হয়ে পড়ে অনেকখানি গৌরবহীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক কমলমণি চরিত্র। বাঙালী মাত্রেরই অন্তরের অভিনন্দন তার উদ্দেশে, কিন্তু অন্তর্নিহিত যে রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তির ফলে নায়কনায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় বাস্তবিকই তার সেটি লাভ হয় নাই।

তেম্‌নি ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের প্রতাপ। প্রতাপ আমাদের পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয়। তাকে যে মহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ করে' কবি এঁকেছেন তা বুঝতে দেরী হয় না। কিন্তু লুণ্ঠন যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারের সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করে' তার ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে বিকশিত করতে পারলে এই সব চেষ্টা অর্থপূর্ণ হতো সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সম্ভবপর হয় নাই। অর্থাৎ প্রতাপ কবির খানিকটা সৌন্দর্য্যময় উপলব্ধি, কিন্তু সত্যকার চরিত্র-সৃষ্টি বা জীবন-সৃষ্টি নয়।

সত্যকার রূপসৃষ্টি তেমন নয়, বরং কিছু কিছু সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে মনে হয়। রূপ-সৃষ্টিও তাঁর সাহিত্যে আছে, যেমন, নবকুমার, মতিবিবি, জেবুন্নিসা, সীতারাম ইত্যাদি।* কিন্তু একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এসব ক্ষেত্রে সত্যকার রূপসৃষ্টির চাইতে ideaর সৌন্দর্য্যময় উপলব্ধিই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সেই idea ও তিনি অনেক জায়গায় পূর্ণাঙ্গ হতে দেন নাই দেশের ও সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ধারণার ফলে।

অদ্ভুত কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। বৃহত্তর দেশ (সুতরাং পূর্ণ সত্য) তাঁর চিন্তা-ভাবনার বিষয় তেমন হতে পারে নাই, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য আগ্রহের অস্বস্তিই তাঁর ভিতরে হয়েছে বেশী লক্ষ্যযোগ্য। বলা বাহুল্য তাতে হিন্দু-সমাজের প্রকৃত উন্নতিও সম্ভবপর নয়, কেননা হিন্দু-সমাজ একক কিছু নয়, অনেক কিছুর সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত।

প্রতিভা ফরমাসে গড়া যায় না, ও প্রকৃতির দান—কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সেই প্রতিভার স্ফূরণ যতটুকু লক্ষ্যযোগ্য হয়েছে সেইটুকু নিয়েই আমাদের আনন্দ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তার পরিমাণ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল্য ও মর্য্যাদা নিরুপণও সেই কারণে কতকটা অসম্ভব!

*রোহিণী হত্যার অপরাধে "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গোবিন্দলাল চরিত্র হয়ে পড়েছে অনেকখানি প্রাদেশিক। —লেখক।

সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি-এ.

(৩)

সাহিত্যে বর্ত্তমানে আরেকটি সুর শুনতে পাওয়া যায়। সে হচ্ছে cynicismএর সুর, নৈরাশ্যের সুর। এ অতিরিক্ত আশাবাদেরই reaction বা প্রতিক্রিয়া। মানুষ অসম্ভব রকম আশা করতে করতে যখন দেখতে পায়, সে আশা মোটেই ফলবতী হচ্ছে না, তখন সম্ভব রকম আশাতেও সে আর আস্থা রাখতে পারে না। ছেলেবেলায় মনে মনে যে ডেপুটি সাজে, বয়োপ্রাপ্ত হ'য়ে সামান্য কেরাণীগিরিকেও তার ভয় করে' চল্‌তে হয়।

মানুষ আশা করেছিল, একটা স্বপ্নরাজ্য, একটা শান্তিপূর্ণ millennium সৃষ্ট হ'বে এই জগতে। তখন জাতিতে জাতিতে বিরোধ, মানুষে মানুষে শত্রুতা, পুরুষ নারীতে পার্থক্য, এ সবই লোপ প্রাপ্ত হ'বে ধরণীর বক্ষ থেকে। ধরা এক শান্তির আগার, এক মিলন-মন্দিরে পরিণত হ'বে। যাঁরা মানুষকে এই আশায় আশান্বিত করেছিলেন তাঁরা এই স্বর্ণযুগের লক্ষণ পেয়েছিলেন জগতের কলঙ্ক-কুশ্রীতার মধ্যেই। তাই তাঁদের একজনের মুখে ফুটে উঠেছিল--"If winter comes, can spring be far behind?" কিন্তু এই যে winter এল আর যাবার নাম করলে না, মৌরসী স্বত্ব নিয়ে ব'সে গেল চিরদিনের জন্য। springএরও আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মানুষের কল্পনা গেল ঘুচে এবং আশার রংমহাল থেকে খ'সে পড়ল সে মাটির পৃথিবীতে। আর এই জন্যই মাটির পৃথিবী তার কাছে অত্যন্ত মাটির পৃথিবী মনে হ'তে লাগল। সাহিত্য লেখকের মানসসৃষ্টি নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার পেছনে যুগ এবং traditionও কম কাজ করে না। আশাভঙ্গতা আজ জগতের সর্ব্বত্র এক বিকট মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দিয়েছে, জগতের সুন্দর ভবিষ্যতে সহজে কেউ আর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না! সুতরাং সাহিত্যেও তার কিছুটা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে এতো স্বাভাবিক।

Cynicism দু'প্রকার। একপ্রকার, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব দেখ্‌বার দৃষ্টির অভাব থেকে জাত। আরেক প্রকার, প্রচুর আন্তর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাহ্য কদর্য্যতার বিরোধ থেকে সৃষ্ট। একদল লেখক আছেন যাঁদের চোখে সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব ধরাই পড়ে না; মানে, তাঁদের দৃষ্টিটাই কুৎসিত, অন্তর সৌন্দর্য্যহীন। আরেক দল আছেন যাঁদের অন্তর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, চোখেও স্বপ্ননেশা বর্ত্তমান। কিন্তু জগতের হীনতা কুশ্রীতার দ্বারা তাঁদের স্বপ্ন বারবার মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে বলে' জগতের উপর তাঁ'রা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের স্বপ্নের প্রতিরূপ জগতে দেখ্‌তে পান না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ! প্রথম ধরণের Cynicরা মানুষের দুর্ব্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ ক'রে থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের Cynicদের লেখায় বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে একটা সহানুভূতিই ফুটে' ওঠে। মানুষ দুর্ব্বল, অসহায়; তাই তো করুণ রসে অভিষিক্ত ক'রে তাকে দেখ্‌তে হয়। আমরা এক অদৃশ্য শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র, নিজের ভাগ্যকে নিজে গ'ড়ে তুল্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই, মাঝে মাঝে ঘটনা বিপর্যায়ের দ্বারা সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আয়োজন ভণ্ডুল হ'য়ে যায়,—এসবই হচ্ছে তাঁদের লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়।

এতো দিন য়ুরোপই cynicismএর লীলাক্ষেত্র ছিল। Hardy* প্রমুখ লেখকদের লেখায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এর ছোঁয়া লেগেছে! এটা রেলগাড়ী, স্টীমারের যুগ। শুধু তা'ই নয়, দ্রুততরগতি এরোপ্লেনও নানা দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় লাভ করতে আমাদের কম সহায়তা করছে না। সুতরাং এখন যার যার ভাব নিয়ে কোণায় ব'সে থাকা মুশ্‌কিল। যাঁরা নিজেকে জানিয়ে দিতে জানেন তাঁরা গায়ে প'ড়ে জানিয়ে দেন—আমরা আছি—। আর যাঁদের সে শক্তি নেই, তাঁরা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে বলে' ওঠেন—হাঁ আপনি আছেন, আপনাকে মানি। তবু তা ভালো; নিঃসাড়

---

* "Hardy makes man an insignificant part of the world, struggling against powers greater than himself,--sometimes against system which he cannot reach or influence, sometimes against a kind of grim world-spirit who delights in making human affairs go wrong--Long

নিস্পন্দ ঘুম থেকে যে কোন রকমের জাগরণ ভাল। হাঁ, যা বল্‌ছিলাম; বাংলা সাহিত্যে cynicism এর হাওয়া লেগেছে। প্রমাণ : বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। বুদ্ধদেবে তা ঘৃণার ভাব উদ্রেক করেছে, আর প্রেমেন্দ্র মিত্রে কারুণ্যেব। বুদ্ধদেব যেখানে নাক সিট্‌কান, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে দু'ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করেন, যদিও তিনি জানেন, 'অশ্রুব মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না'। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুরটি কী কারুণ্যমণ্ডিত!

এ মাটিব ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্য্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম।
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিবদিন সে যে ঘুবিয়া ঘুবিয়া ফেরে
সূর্য্যেরে অবিরাম।
তারি সন্ততি আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি।
মোদের সকল স্বপ্নের গায় না জানি কেমন করি
লেগেছে মলিন ধূলি।

* * *

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ!

আরেকটা নমুনা দেখুন--

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে?
ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুল্‌ল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

* * *

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোরে চল্‌বে না
তুই যে মাটি, চিরকালের মাটি--
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে,--
মাটিরে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

Cynical লেখার মস্ত দোষ এই যে, আত্মবিশ্বাস দূর ক'রে তা মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম ক'রে তোলে। মানুষের বড়ো বড়ো আশা, বড় বড় আকাঙ্ক্ষা এ সাহিত্যে স্থানই পায় না। এঁদের কারো কারো কাছে মানুষ একটা শরীরি কল ছাড়া আর কিছুই নয় ;--তাই এঁদের উক্তি--

সকলে আমরা শরীরি-কল, প্রথা-প্রাচীরের ভাঙি শিকল;
এই সে গর্ব্ব--মোরা বিফল,--দাহময় মর-দেহ;

+ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

মানি না কিছুই, খুঁজি না মিল, গতি উচ্ছ্বাসে ছুটি ফেনিল,
ভ্রুকুটি-ভয়াল ভালে কুটিল সুতীব্র সন্দেহ।

*　　　*　　　*

পাপ করি, ভালো লাগে যে পাপ, অনুতম নাই অনুবিলাপ,
প্রেম শুধু ফাঁকি, ফাঁকা প্রলাপ, দৈহিক প্রয়োজন।*

কিন্তু আমরা যে শরীরি কল নই তার প্রমাণ, আমরা প্রথা-প্রাচীরের শিকল ভাঙ্‌তে চেষ্টা করি। কলের পক্ষে তো শিকল ভাঙা না ভাঙা একই--বন্ধন আর অবন্ধন তার কাছে সমান।

Cynical সাহিত্যের গুণ এই যে এর দ্বারা মানুষ বুঝ্‌তে পারে তার যথার্থ স্থানটি কোথায়। বর্ত্তমানের গলদ ত্রুটি ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হ'লে ভবিষ্যতের তাজমহল সৃষ্টির আশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই গলদ ত্রুটিগুলিকে চিরন্তন প্রমাণ করতে গেলেই যত মুশ্‌কিল। একটু আশার ক্ষীণ রশ্মি পথ না দেখালে মানুষের পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। দক্ষ শিক্ষক ছাত্রকে তার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত সম্বন্ধেও একটা ভালো আশা জাগিয়ে তোলেন তার প্রাণে। আমাদের সাহিত্যে যেন আশার এই ক্ষীণ রশ্মিটি ম্লানিয়ে না যায়, এই আমার কামনা।

Cynicদের লেখায় বিশ্বপ্রেমের মধুর বাঁশি বেজে ওঠে না, অথচ স্বদেশ প্রেমও তাঁদের তেমন আনন্দ দিতে সমর্থ নয়;--বর্ত্তমান তাঁদের কাছে রুক্ষ, অথচ ভবিষ্যতের সোণার স্বপ্নেও তাঁরা বিভোর নন। ঘর তাঁদের ভালো লাগে না, আবার বাহিরও তাঁদের নাম ধ'রে ডাক দেয়নি--এমনি নিদারুণ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা এই হতভাগ্যদের। এঁরা Browningএর মতো 'All's right with the world' অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো 'যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবি ভালো', বল্‌তে পারেন না। হয়তো এ তেমন অন্যায় কিছু নয়। এই শুভ ক'রে দেখা, সুন্দর ক'রে দেখা নিতান্তই Subjective। অর্থাৎ এ হচ্ছে Browning ও রবীন্দ্রনাথের মানসিক সৌন্দর্য্যের বাহ্যিক আরোপ। cynic লেখকরা হয়তো আবার উল্‌টে' বল্‌তে পারেন--'যেদিক পানে নয়ন মেলি কালো সবি কালো'। কিন্তু এও বাড়াবাড়ি। জগতে যেমন অবিমিশ্র সৌন্দর্য্য নেই, তেমনি অবিমিশ্র কদর্য্যতাও নেই। মানুষকে দেবতা ক'রে আকাশে উঠিয়ে দেওয়া অথবা দানব ক'রে পাতালে নাবিয়ে দেওয়া উভয়ই সমান বোকামি; কেন না উভয়ই unreal। মানুষ কামসর্ব্বস্ব পশু নয়, আবার প্রেমসর্ব্বস্ব দেবতাও নয়--একথা মনে না রাখ্‌লে আমাদের প্রতি পদে ঠেক্‌তে ও ঠক্‌তে হবে। এই পৃথিবীর নরনারীর বুকে বুকে মদন ও রতির লীলাবাসর পাতা। তাই ধরণীকে উল্লেখ ক'রে আধুনিক কবির উক্তি--

ফুলে ফুলে হেথা ভুলের বেদনা,---নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে হেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বনতাপ।

*　　*　　*　　*

কায়ায় কায়ায় মায়া বুনে হেথা, ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ।
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে বাজে বাঁশী।

*　　*　　*　　*

ময়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি ইসারায়
লক্ষ যুগের মহাতপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দর বসুমতী!
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়--কাম রতি!

নজরুল ইসলাম।

এইখানেই শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা এসে পড়ে। সুতরাং সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা উচিত।

(৪)

শ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল সাহিত্য, নীতি-সাহিত্য, দুর্নীতি-সাহিত্য ব'লে কোন জিনিষ নেই। Oscar Wilde বলেছেন--"There is nothing as a moral or immoral book, books are well-written or badly written That is all" কবি যা লিখেছেন তা সুন্দর হয়েছে কি না, উপভোগ্য হয়েছে কি না, তাই দেখ্তে হ'বে; শ্লীল কি অশ্লীল হয়েছে, তা নয়। শ্লীল বিষয় নিয়ে লিখ্লেও সাহিত্য না হ'তে পারে, আবার অশ্লীল বিষয় নিয়ে লেখাও সাহিত্যে উঁচু স্থান লাভ করেছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণে অশ্লীলতার নিদর্শন কম নেই। কিন্তু তাই ব'লে সেগুলি পরিত্যক্ত হয় নি। বরং তাদের মূল্য অনেকটা বেড়ে গেছে। কারণ মানুষকে বড়ো ক'রে না দেখ্লেও পূর্ণ ক'রে দেখবার চেষ্টা আছে তাদের মধ্যে। দোষেগুণে দেখাই আসল দেখা। মানুষের একটা দেহ্ আছে তা অস্বীকার ক'রে লাভ কি? ইন্দ্রিয় মানুষকে কম আনন্দ দেয় না। আত্মা ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়ই আনন্দ অনুভব করে। এখানে Browningএর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। ...'nor soul helps flesh more than flesh helps soul'. Wildeএরও এ ধরণের একটি উক্তি আছে। --'Nothing can cure the soul but the senses; just as nothing can cure the senses but the soul.'-- আত্মা যখন নির্জ্জীব ও নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে তখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতিই, তাকে সঞ্জীবিত করে, আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতি যখন উগ্র ও প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে তখন আত্মানুভূতিই তাকে শান্ত স্নিগ্ধ ক'রে তোলে। আত্মার পক্ষে উগ্রতা নির্জ্জীবতা ও ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উগ্রতা উভয়ই ব্যাধি, সুতরাং পরিত্যজ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকার লোক আছেন যাঁরা সাহিত্যে sexএর আলোচনা দেখলেই আঁতকে উঠেন। আবার আরেক প্রকার লেখক আছেন যাঁরা sex ছাড়া আর কিছুই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় ব'লে মনে করেন না। এঁরা উভয়ই ভ্রান্ত। কেন না sex-প্রীতি জীবনের একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক দিক, আর erosএর মাধুর্য্য যে জীবনকে রঙীন ও মধুর ক'রে তোলে একথা অস্বীকার করতে গেলে জীবনের বাস্তবতাকে অনেকখানি উড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে জীবনের সবখানি জুড়ে erosই একক হ'য়ে বিরাজ করছে না। মানুষের আরো অনেক দিক আছে। সেদিকে কিন্তু sex-প্রধান সাহিত্য-স্রষ্টাদের দৃষ্টি নেই। এই জন্যই এঁদের লেখা অনেকটা অপূর্ণ ও অস্বাভাবিক ঠেকে। sex-প্রীতিও যেন এঁদের জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত নয়--একটা খেয়াল ও মাতলামির উপর ভর ক'রে আছে। এইখানেই আমাদের আপত্তির কারণ। যে জিনিসটা উপভোগ করা হচ্ছে তার আনন্দের ক্ষণিকতা নিয়েও যেন এঁরা মনে মনে হাসেন। জীবনের পক্ষে এ কতদূর মারাত্মক ভেবে দেখ্বার বিষয়। কারণ এ মনোভাব মানুষকে অবিশ্বাসী ও হাল্কা ক'রে তোলে। Walt whitmanও sex নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় হাল্কামি ও বিদ্রূপের পরিবর্তে একটা স্তবের ভাবই দেখ্তে পাওয়া যায়। দেহকে তিনি দেখেছেন আত্মার মন্দির রূপে। তাই তাঁর উক্তি—

'I will make the poems of my body and of mortality, for I think I shall then supply myself with the poems of my soul and of immortality.'—এর থেকেই বুঝা যায় তাঁর দৃষ্টি কতো সুন্দর, মন কত পবিত্র। sex-প্রীতি তাঁর কাছে শুধু ইন্দ্রিয় উপভোগই নয়, আত্মার মিলনের সাগ্রহ প্রকাশ।

> প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ তরে,
> প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন;
> হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
> মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।

প্রেম সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর ও সত্য কথা কি হ'তে পারে আমার জানা নেই। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সাধারণের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৃশ্যতঃ এক হ'লেও আসলে অনেকটা পৃথক। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতির পেছনে আছে একটা সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ-স্পৃহা। আর সাধারণের ইন্দ্রিয়-প্রীতি একটা instinctএরই ব্যাপার। কবিরা ক্ষণিকের উপভোগকে অমরত্ব দান করেন কল্পনা ও স্মৃতির আলোকে মণ্ডিত ক'রে। দেহের দাবী শেষ হ'য়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যায় না। সাধারণের কাছে তা ক্ষণিকেরই জিনিষ, ক্ষণিকেই লয়প্রাপ্ত হয়,—দেহের আনন্দ আত্মার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় না। আমাদের sex- প্রধান সাহিত্যের স্রষ্টারা

সাধারণের sex-প্রাতকেই সাহিত্যে বড়ো ক'রে দেখাতে চাচ্ছেন। এইখানেই তাঁদের গলদ। কেন না এ মানুষকে যথাপূর্ব্বং তথাপরং অবস্থায় রেখে দেয়—উর্দ্ধে টেনে নেয় না। 'কাব্যশাস্ত্র কামশাস্ত্র নয়'--একথা মনে না রাখলে সাহিত্যিকদের পক্ষে ভুল করা কিছু অসম্ভব নয়।

(৫)

সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে আমাদের মুসলমান সাহিত্যে, প্রায়ই একটা চীৎকার শুনতে পাওয়া যায়--ধর্ম্ম-সাহিত্য চাই, মুসলমানী সাহিত্য চাই। কথাটা ভালো। ধর্ম্ম-সাহিত্য যে আমরাও না চাই, তা নয়। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দটির দ্বারা তাঁরা কি বুঝতে চান? মনুষ্যত্ব, বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি, অন্তর্মুখিনতা, না, আচার-পদ্ধতি ও বিশেষ বিশেষ আদেশ পালন। যদি শেষের কথাগুলির সঙ্গে তাঁরা সায় দেন তবে বলতে হবে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সেগুলির সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। সাহিত্যিক সেগুলি পালন করতেও পারেন, নাও পারেন;--তাতে সাহিত্যের কিছু আসে যায় না। সাহিত্যের বিকাশের জন্য দরকারী একটি অপ্রমত্ত শুদ্ধ বুদ্ধ চিত্ত যা মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্নতা থেকে রক্ষা করে। এই শুদ্ধ বুদ্ধ চিত্তের পরিচয় যাঁর লেখায় যতটা পাওয়া যায়, তাঁর লেখা ততটা মুল্যবান ব'লে গৃহীত হয়। ধর্ম্ম-সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি উদার বিশ্ববোধ ও সর্ব্বানুভূতির সাহিত্য। এ সাহিত্যের যে কটা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে seriousmindedness, সত্যপ্রিয়তা, আত্মজিজ্ঞাসা, চিরন্তনতা, বিশ্বজনীনতা ও ঈশ্বরানুভূতির নাম করা যেতে পারে। এইভাবে দেখতে গেলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এমার্সন ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যকে ধর্ম্ম-সাহিত্য বলা যেতে পারে। আমাদের সুফি সাহিত্যও ধর্ম্ম-সাহিত্য। এ আত্মজিজ্ঞাসাও ঈশ্বরানুভূতির এক চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু অত্যন্ত subjective ব'লে এ-সাহিত্য নিজের জন্য এক বৃহত্তর ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে নি।

যাঁরা মুসলমানী সাহিত্য চান তাঁরা আসলে কি বস্তু চান ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। মুসলমানী সাহিত্য বলতে তিনটি জিনিষ বুঝায় : মুসলমান রচিত সাহিত্য, মুসলমান-সমাজ-নিয়ে-লেখা সাহিত্য, আর মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রধান সাহিত্য। মুসলমান রচিত সাহিত্যে মুসলমানের সমস্ত লেখাই স্থান পায়--এমন কি যাকে আমরা অনৈসলামিক সাহিত্য বলি, তাও। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গীতনিচয়, নজরুলের বিদ্রোহী, আগমনী, রক্তাম্বরধারিণী মা পর্য্যন্ত এর গণ্ডির মধ্যে পড়ে।* মুসলমান-সমাজ-নিয়ে-লেখা সাহিত্য সেগুলিই যেগুলিতে মুসলমান সমাজের চিত্র যথাযথ ভাবে ফুটে ওঠে। এ সাহিত্য অমুসলমান দ্বারাও লিখিত হতে পারে। আবার মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রধান সাহিত্য বললে বুঝতে হবে কোরাণ, হাদিস ও ফেকার আলোচনা।

এখন কোন্ ধরণের সাহিত্যকে মুসলমান সাহিত্য বলা উচিত আলোচনা করে' দেখা দরকার। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ধরণের সাহিত্যকেই মুসলমান সাহিত্য বলতে চাই। তৃতীয় ধরণের সাহিত্যকে বাধ্য হ'য়ে বাদ দিতে হচ্ছে। কারণ তা আসলে সাহিত্য পদবাচ্য কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে। তবে যে তাকে সাহিত্য বলা হয়, তার কারণ, বাংলা দেশে ছাপার হরফে লেখা বই মাত্রই সাহিত্য। যে আলোচনায় ঘন ঘন Sanction বা অনুমোদনের প্রয়োজন তা নিয়ে, আর যাই হোক, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। শাস্ত্রালোচককে বড় জোর annotator বলা যেতে পারে, সাহিত্যিক নয়। সাহিত্যিকের স্বাধীন মনন-শক্তি থেকে তিনি বঞ্চিত। শাস্ত্রালোচনাই যদি সাহিত্যের প্রাণ হ'ত তা হ'লে রবীন্দ্রনাথ না পড়ে পড়তাম শশীভূষণ তর্কালঙ্কার, আর গ্যয়টে, এমার্সন, টলষ্টয় না প'ড়ে পড়তাম মিশনারীদের লেখা—যার দিকে আমরা সাধারণতঃ চোখ তুলেও চাইনে। সাহিত্যের পক্ষে শাস্ত্রানুগত্য নদীর পক্ষে মরুভূমির মতই ভয়ঙ্কর। কেননা তা লেখকের স্বানুভূতি নষ্ট ক'রে দেয়,--আর স্বানুভূতিই যে লেখার প্রাণ এতো সকলেরই জানা কথা। সাহিত্যিক যে শাস্ত্র পড়েন সে হচ্ছে দিল্-কেতাব,

* ইংরাজী সাহিত্যে গ্রীক পুরাণের প্রভাব বাইবেলের চাইতে কম নয়। এ প্রভাব বাদ দিতে গেলে ও-সাহিত্য অনেকখানি নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্মধ্বজীরা তা স্বীকার না করলেও সাহিত্য-রসিকরা তা স্বীকার করতে বাধ্য। আসলে সাহিত্যিকের মন কোত্থেকে আহার গ্রহণ করবে তা কেউ আগে থেকে ব'লে ক'য়ে ঠিক ক'রে দিতে পারে না। তা সাহিত্যিকের মনই খুঁজে নেবে, আর সে ক্ষেত্রে সহায়তা করবে তার temperament বা আভ্যন্তর প্রকৃতি। কোন সাহিত্যিকের temperament এমনও হতে পারে যে symbol ছাড়া তার তৃষ্ণা মেটে না; তখন হিন্দু বা গ্রীক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এ ক্ষেত্রে ফতোয়া-মহার্ণবের নিষ্ঠুর আদেশ, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু তাঁর তৃষ্ণা মিটাতে পারে না।

* বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা, নব পর্য্যায় ২য় খণ্ড।

বিশ্বগ্রহ। সাহিত্যিক সব সময়ই free-lance। স্বধর্ম্মের হোক আর পরধর্ম্মের হোক, অন্ধতা ও কুশ্রীতা কখনো তাঁর বিদ্রূপবান থেকে রক্ষা পায় না। সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান নিজের পানে যে ভাবে তাকায়, সাহিত্যিক হিন্দু বা মুসলমান সে ভাবে তাকায় না। "সাধারণ (মূলে আছে সাম্প্রদায়িক) হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে জগৎকে এ কথা বুঝাতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান, তার পরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ, তার পরে হিন্দু অথবা মুসলমান।"

সাহিত্যিকের পক্ষে শুধু নিজ সমাজকে নয়—বিশ্বসমাজকে ভালোবাসা উচিত। না বাসলে বিশ্বের কিছু ক্ষতি হয় না, হয় তার নিজেরই। কেননা, সে প্রাণের প্রাচুর্য্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। গাছ যেমন চার দিকে শিকড় মেলে দিয়ে মাটির রস টেনে নিয়ে সঞ্জীবিত হয়, মানুষও তেমনি চারদিকে প্রেমের শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠে। জগৎকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যার বাহুর বিস্তার যতো বড়ো হয় তার মূল্যও ততখানি।

তবে সাহিত্যে যে শাস্ত্রের স্থান একেবারে নেই তা নয়! শাস্ত্র অর্থাৎ race-cultureএর ছাপ কোন কোন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মিল্টন ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। কিন্তু শাস্ত্র সেখানে তার বস্তুরূপ হারিয়ে রস ও ভাবরূপ পরিগ্রহ করেছে। মিল্টন খৃষ্টান শাস্ত্র হজম ক'রে তার রসটুকু নিয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু শাস্ত্র নয়, হিন্দু আধ্যাত্মিকতা নিয়েই আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্ম্ম এক জিনিষ নয়! আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থগুলি হজম ক'রেও অনেকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন—যেমন সুফীরা করেছিলেন। কিন্তু শুধু এই ধরণের সাহিত্যই মুসলমান সাহিত্য, অন্যগুলি নয়, একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য, মুসলমান-সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য—এভাবে ভাগ ক'রে দেখা ভুল। যদি ধর্ম্মই সাহিত্যের ঐক্য ও পার্থক্যের কারণ হয় তা হ'লে ফরাসী-সাহিত্য, জার্ম্মান-সাহিত্য ও ইংরাজী সাহিত্যের সৃষ্টি না হ'য়ে এক অবিভাজ্য খৃষ্টান সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ত। কিন্তু তা হয়নি,—শুধু ভাষার পার্থক্যের দরুণ নয়, মূলগত কারণে। উক্ত সাহিত্য ত্রয়ের মধ্যে যে প্রভেদ সে শুধু ভাষার নয়, ভাবেরও বটে—ভাষার চাইতে ভাবেরই বেশী। সাহিত্যে জাতির স্বভাব নিয়েই কারবার। ধর্ম্ম সে স্বভাব গঠনে যতটুকু সহায়তা করে সাহিত্যে তার ততটুকু অধিকার। বলা বাহুল্য ধর্ম্মের চাইতে দেশ-প্রকৃতিই মানুষের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। বাইরের নীতির চাইতে রক্তের ধারার প্রভুত্বই বেশী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, কিন্তু বাঙালীত্ব বর্জ্জন করতে পারেন নি। আমিও দরকার হ'লে কালকে ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমার বাঙালীত্ব অপরিবর্ত্তনীয়। ইচ্ছা করলেই আমি ইংরাজ কিংবা ফরাসী হতে পারি নে। অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে ধর্ম্মের চাইতে দেশপ্রকৃতির, মানে, জাতীয় স্বভাবের প্রভুত্বই জীবনে ও সাহিত্যে বেশী। তাই বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা বাঙালী হিন্দুর সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে যতটা নিকট সম্বন্ধযুক্ত হবে, অন্য দেশীয় মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে ততটা নিকট-সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না।

যাক্, আর বেশী ব'কে আপনাদের উপর অত্যাচার করতে চাইনে। কাগজ ধৈর্য্যশীল হ'লেও শ্রোতা ধৈর্য্যশীল নন। সুতরাং খতম করচি। কিন্তু তার আগে প্রার্থনা ক'রে যাই : আমাদের সাহিত্য সুন্দর হোক, উদারতা ও বিশ্বজনীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে, সীমাকে নিয়েই অসীম, খণ্ডকে নিয়েই অখণ্ড। তাই সঙ্গে সঙ্গে এ কামনাও করতে হচ্ছে : আমাদের যুগের ও সমাজের স্বাতন্ত্র্যটুকুও যেন ফুটে ওঠে এর মধ্যে—নিতান্ত বেয়াড়া ভাবে নয়, স্বাভাবিক ভাবে।*

---

* বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

গজল

নজরুল ইসলাম

দূর বনান্তের পথ ভুলি' কোন বুল্‌বুলি বুকে মোর
আসিলি হায়।
হায় আনন্দের দূত যে তুই, তবু তোর চোখে কেন জল
কি ব্যথায়।।
কোথায় দিই ঠাঁই তোরে ভীরু পাখী
বেদনাময় আমারো প্রাণ,
এ মরুতে নাই তরু, নাই তোর তৃষার তরে জল
যে হেথায়।।
নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান
বিঁধিলি বুক কণ্টকে,
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর এ বরষায়।

পল্টন ও বাঙ্গালী মুসলমান

মাহ্‌বুব-উল্‌-আলম

বাঙ্গালী পল্টনের প্রথম ও প্রধান রিক্রুটিং কেন্দ্র খোলা হয় কলিকাতায়। এই কেন্দ্র শেষ পর্যান্ত ছিল। কলিকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই অবাঙ্গালী। ফলে, ইঁহাদের কেহ কেহও পল্টনে ঢুকিয়া পড়েন। এরূপ দুজনের নাম মনে পড়িতেছে -সত্যনারায়ণ সিং ও কুঞ্জলাল মিসির। সিংজীর বাড়ী ছিল বেহারে, মিসিরজীর আদি নিবাস সম্ভবতঃ উড়িষ্যায়। ইঁহাদের কেহই বাঙ্গলা ভাষা বলিতেন না, উভয়েরই মাতৃভাষা ছিল হিন্দী। এরূপ, সুবেদার মন বাহাদুর সিং, নামে, চেহারায় এবং শুনিয়াছি জাতিতে, গুর্খা ছিলেন। (যদিও তিনি বাঙ্গলাতেই কথাবার্ত্তা বলিতেন)। অন্য একটি সেপাই ডাক নামই ছিল গুর্খা। চেহারায় ও আসলেও নাকি সে গুর্খাই ছিল। তালে তালে পা ফেলিয়া গাহিবার জন্য সে "বাঙ্গালী পল্টন!" নাম দিয়া হিন্দীতে একটি গান রচনা করিয়াছিল। 'মার্চ্চিং' এর সময় আমরা উহা গাহিতাম। চট্টগ্রামের 'সাধনা' পত্রিকায় আমি গানটি প্রকাশ করিয়াছিলাম।

রিক্রুটিং কেন্দ্র কলিকাতায় হওয়ায় পল্টনে কলিকাতাবাসীদের আধিপত্য হয়। ইঁহারা স্বভাবতঃই পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ফলে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রমোশন বাধাসঙ্কুল হইয়া উঠে। পল্টনের ১নং সেপাই জগদীশচন্দ্র বর্দ্ধন, যতটা মনে পড়ে, হাবিলদার মেজরের উপরে উঠিতে পারেন নাই। রণদা প্রসাদ সাহা খুব ভাল ব্যায়াম ও প্যারেড জানিতেন এবং ভাল disciplinarian ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে সেপাই বনিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীদের মত পাগড়ি পরিতেন এবং পল্টনের কাজের বেলা হিন্দুস্থানী বলিতেন। যতটা মনে পড়ে, জমাদারের বেশী তাঁহার পদোন্নতি হয় নাই। ইঁহাদের উভয়েরই নিবাস ঢাকা জেলায়। পূর্ব্ববঙ্গের লোক না হইলে তাঁহারা আরও উপরে এবং আরও দ্রুত উঠিতে পারিতেন, আমরা এরূপ মনে করিতাম।

কলিকাতার পরে বাঙ্গলার শহরগুলিতে রিক্রুটিং কেন্দ্র খোলা হয়। ইহার ফলে, কলিকাতাবাসীদের পরই পল্টন শহরে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়ে। এরূপে শুরুতেই বৃহত্তর পল্লীবাঙ্গলা উহা হইতে একরূপ বাদ পড়িয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক দিক দিয়া পল্টন ছিল হিন্দু-আন্দোলনের ফল। মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী প্রমুখ মুস্‌লিম জননায়কেরা উহার পরিপোষকতা করিলেও ডাঃ সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতি হিন্দু নেতাগণের আপ্রাণ চেষ্টার তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর ছিল। ফলে, পল্টন একরূপ হিন্দু-পল্টন হইয়া পড়ে অর্থাৎ উহা কলিকাতার হিন্দুদের প্রভাবাধীন শহুরে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি যেমন ছিল উহার বিরূপতা, মুসলমানদের প্রতি তেমনিই ছিল উহার বিরুদ্ধতা। শিখ পল্টনগুলি 'মার্চ্চিং'এর প্রাক্কালে 'ওয়া গুরুজীকি ফতে' অথবা 'সৎ শ্রী আকাল' রবে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে। দেখাদেখি বাঙ্গালী পল্টন হইতে যখন 'জয় কালী মায়ি কি জয়' রবে গর্জ্জন উঠিত আমরা মুসলমানগণ তখন চুপ করিয়া থাকিতাম।

মেকিনায় এক নামকরা সুবেদার "তোমরা মুসলমানেরা কেন আস্‌লে?" এই বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিয়াছিলেন। .....আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস করিতাম। ছাত্র-জীবনে এক রুগ্ন হিন্দু সমপাঠিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি সঙ্গের হিন্দু সমপাঠিগণকে ভিতরে ডাকিয়া জল-যোগ করাইয়াছিলেন। আমাকে একা বহির্ব্বাটীতে জলখাবার দিয়াছিলেন। হিন্দু-বন্ধুদেরে লইয়া যে-সময় তিনি ভিতরে আহার করিতেছিলেন, সে সময় বাহিরে আমি আঙ্গিনায়-বাঁধা একটি গাভীর সম্মুখে থালাশুদ্ধ জলখাবার ঢালিয়া দিতেছিলাম। অন্য বারে এক বিদেশী হিন্দু শিক্ষকের মাতৃ-বিয়োগ হয়। বাসার নিকটে লোকালয় ছিল না। তাঁহার মায়ের সৎকারের জন্য আমি কুড়াল কাঁধে কাঠ সংগ্রহ করিতে যাই এবং লোকালয়ে গিয়া হিন্দু সহপাঠীগণকে ডাকিয়া আনি। কিন্তু, বাসায় পৌঁছিলে সঙ্গীদিগকে স্নান করিতে বলা হয়, আমাকে ছুঁইয়াছিল এই পাপে।

হিন্দু-মুসলমানকে এক যোগে কাজ করিতে হইলে মুসলমানকে যে কতটা সর্ব্বংসহা হইতে হইবে এই দুই ঘটনায় উহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। .. আমি নীরবে সুবেদারের এই বিরুদ্ধতা জয় করিবার সঙ্কল্প করি। পরিণামে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন হই। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া কিন্তু এডজুট্যান্ট কাপ্তেন এগ্‌বার্ট উইলিস বার্ণেট গিব্‌সের আর্দ্দালীর মুখে শুনিতে পাই যে, সে সময় আমি তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছিলাম ঠিক সেই সময়েই আমাকে প্রমোশন দেওয়ার জন্য এডজুট্যান্ট কৃত একটা প্রস্তাব তাঁহার বিরোধিতায় পণ্ড হইয়া যায়।

১৯১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কুর্দ্দী বিদ্রোহ হইতে তালুমা হেড্‌কোয়ার্টার্সে প্রত্যাগমন করিয়া বাঙ্গালী পল্টনের নিজস্ব রূপ দেখিতে পাই। আমরা যে সময় বিদ্রোহ দমনে রত ছিলাম সে সময় করাচী ডিপো হইতে একটা ড্রাফ্ট-দল তালুমায় আমাদের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরিত হয়। ইহাদের অধিকাংশই ছিল পল্লীবাসী বাঙ্গালী এবং মুসলমান। অর্থাৎ প্রাথমিক কয়েক বৎসরের উচ্ছ্বাস কমিয়া গেলে পল্টন যখন স্থিতিশীল হইয়া উঠে তখন পল্লীগ্রাম হইতেই দলে দলে বাঙ্গালী উহাতে যোগদান করিতে থাকে। এই সময় রিক্রুটকারীদের প্রচার-কার্য্য পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ১৯২০ সালে যখন পল্টন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তখন পল্টনে পল্লীবাসী সাধারণ বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য ছিল। ইহাদের অধিকাংশই যেমন একদিকে ছিল পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তেমন উহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। ইহা স্বাভাবিক। অবশ্য তখন আর হিন্দু-মুসলমান রূপে পল্টনকে বিচার করি নাই। কারণ, দেখিতে পাইলাম এই সকল পল্লীবাসীর মনে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধচিন্তা নাই।

ইহাদের মধ্যে একটি অতি বলশালী যুবকের কথা এখনও মনে আছে। তাহার নাম ছিল আবদুল করিম, বাড়ি ত্রিপুরা জেলায়। Trench diggingএ এবং পল্টনের Tug of warএ সে একাই দশজনের ক্ষমতার পরিচয় দিত। পল্টনের একটি অতি দুষ্ট খচ্চরকে সে বড় জব্দ করিয়াছিল। উহার পেছনের দুই পা সে এত জোরে ধরিয়া রাখে যে খচ্চরটি প্রাণপণ করিয়াও উহা ছাড়াইতে অপারগ হয়। কিন্তু, ইহার কয়েক দিন পরে অন্যমনস্ক আবদুল করিম উহার পেছন দিয়া চলিবার সময় খচ্চরটি এত জোরে তাহাকে লাথি মারে যে তাহার চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া দুই টুক্‌রা হইয়া যায়। বেচারীকে অনেক দিন হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হয়।

কুটলআমারার হত্যাকাণ্ডে শিক্ষিত হিন্দুর উচ্ছ্বাস-প্রবণতা প্রমাণিত হয়। একই রাত্রে গার্ড-রুমে-নিদ্রিত সুবেদার অরুণকুমার মিত্রকে রিভলবারের গুলীতে হত্যা করা হয়। সুবেদার-মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু সাতগুলি খাইয়াও বাঁচিয়া থাকেন। সুবেদার দুর্গাপদ ব্যানার্জী ও জমাদার ভূমেন্দ্রনাথ রায়কে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া হয়। জমাদার রাজেন্দ্র লাল মুখার্জী আহত হন। সে রাত্রে সুবেদার অধিক্রম মজুমদার নদীর অপর পারে 'ডিউটী'তে ছিলেন। নতুবা নাকি তাঁহাকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র ছিল। হত্যাপরাধে কোর্ট মার্শালের বিচারে সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য এবং সুকুমার সিদ্ধান্ত--এই দুই জন সিপাহীকে আমাদের চোখের সুমুখে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং এড্‌জুট্যান্ট্ সুবেদার ধীরেন্দ্রকুমার সেনকে পল্টন হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন একটি কুমারীর পাণিলাভের জন্য ইঁহাদের কয়েকজনের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। রিক্রুটিং উপলক্ষে নাকি এই কুমারীটীর দর্শন-লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিত এবং অরুণকুমারের ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ারই নাকি সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কাম ও লোভের এক একটি কণিকা হইতেই নাকি অত বড় ট্রাজেডির সংঘটন হইয়াছিল। অন্যান্য পল্টনে অবশ্য ক্রোধেরই কিছু কেরামতের পরিচয় পাইয়াছিলাম। যেমন, আজিজিয়ায় গাড়োয়ালী পল্টনে এক হাবিলদারের কম্বল-মোড়া লাশ দেখা গিয়েছিল নদীতে ভাসিতে; Devonsদের 2nd in-command হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যান, আর supersession এর দরুণ এক পাঠান তাহার seniorকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। কুর্দ্দীস্তানে দেখিয়াছিলাম 9th Bhopal পল্টনের একটা দলকে কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে রাখা হইয়াছে। ইহারা নাকি একজন অফিসারকে হত্যা করিয়াছিল। এই পল্টনের হাবিলদার ছত্র সিং সাহসিকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান-পদক 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' লাভ করিয়াছিলেন।

শহুরে বাঙ্গালী এবং পল্লীবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য সুপরিস্ফুট। পল্লীবাসীদের পল্টনের কল্পনা করিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছে সে সহনশীলতায় (endurance) ইহা শহুরেদের পল্টন হইতে শ্রেষ্ঠতর হইবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে নির্ব্বিকার সাহসেও (cool courage) ইহা শ্রেষ্ঠতর হইবে। চট্টগ্রামের নাবিকগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া সাগর-বুকে এই

নির্ব্বিকার সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময় তাহাদের সাহসিকতা প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধের কাজে বিগত-জীবন এই সকল নাবিকদের আত্মীয়গণ পেন্সনের জন্য লাইফ্ সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করাইতে আসিয়া আমাকে যখন দুইখানি স্মারক-লিপি দেখায় তখন ইহাদের নির্ব্বিকার সাহসিকতার কথা আমার মনে পড়িয়া যায়। একখানি স্মারক-লিপি সম্রাটের স্বাক্ষরিত। উহার পাঠ এইরূপ : "Buckingham Palace. I join with my grateful people in sending you this memorial of a brave life given for others in the Great War. George R I." অপরখানির পাঠ এইরূপ : "He whom this scroll commemorates was numbered among those who, at the call of king and country, left all that was dear to them, endured hardness, faced danger, and finally passed out of the sight of men by the path of duty and self sacrifice, giving up their own lives that others might live in freedom. Let those who come after see to it that his name be not forgotten." শেষের স্মারক-লিপিখানি 2nd Class Engine-Driver আবদুর রহমানের। এই সকল স্মারক লিপি পড়িতে পড়িতে ১৯১৫ সালের একটা দৃশ্য মনের কোণে ভাসিয়া ওঠে। আরব-সাগরের বুকে 'S. S. Baroda'কে সব্‌মেরিণ তাড়া করিয়াছে। ডেকের উপর জীবন-বয়া পরিয়া আমরা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া সারি-বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। মৃত্যুর স্পর্শ তলে দাঁড়াইয়া আমি নেভিগেশন-ব্রিজে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, চট্টগ্রামের নাবিক একমনে steering-wheel ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে ভয়ের বিকার নাই, পৃষ্ঠে জীবন-বয়া নাই। নীচের ইঞ্জিন-রুমের কথা মনে হইল। এমনই নির্ব্বিকার মুখে, জীবন বয়াহীন চট্টগ্রামের আরেকটি নাবিক সেখানে একমনে ইঞ্জিন-চালনা করিতেছে। টর্পেডো যদি লাগে, আমরা জীবন তরীতে উঠিয়া যাইব, আর সম্ভবতঃ উহারই জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে steering-wheel ও driving-wheel হস্তে নিঃসীম সাগরের অতলবুকে নামিয়া যাইতে হইবে।

১৯৩০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর কাক্সবাজারের পথে S. S. Mallard এ ভারতীয় সৈন্যদলের লেফ্টেন্যান্ট্ কর্ণেল D.S.এর সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি ...Rifles-এর খ্যাতনামা অধ্যক্ষ। বাঙ্গলার Terroristদের সম্বন্ধে তিনি অনেক মন্তব্য করেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাঙ্গালী মুসলমানের--বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের, একটা পল্টন গড়িলে কিরূপ হয়? তিনি মত দেন যে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান পল্টনের জন্য "excellent material" হইবে, অবশ্য "under British Officers."

এইরূপ পল্টন যদি গঠিত হয় উহার ফলে পূর্ব্ববাঙ্গলার ভূমির উপর জীবিকাবাহীর যে দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে উহার কথঞ্চিৎ নিবারণ হইবে এবং যুবকদের বেকার-সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে। পুলিস-ফৌজে যথেষ্ট পরিমাণে না ঢুকার ফলে বাঙ্গলার মুসলমানগণ একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র হারাইয়াছে। সৈন্য-বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার লাভের জন্য পুনরায় চেষ্টা হইতেছে। এই সময়ে মুসলমানকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই ব্যাপারে তাহার স্বার্থ এক বিন্দুও কম নহে।

---

* চট্টগ্রাম জেলা-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত, ১৩৪০।

উর্দ্দু বাংলা তর্ক ও বাঙ্গালী মুসলমান

আনোয়ার-উল-কাদীর, এম-এ, বি-টি, বি-এল

বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা সম্বন্ধে তর্ক আজও শেষ হয় নি। এ নিয়ে কয়েকটি দল আছে :

(১) বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একদল, মুসলমান যে বাঙ্গালী একথা স্বীকার ক'রতে নারাজ। তাঁদের ধারণা, যে হেতু তারা বাঙ্গালী নয় এবং যে হেতু সকল দেশের মুসলমান উর্দ্দু কিছু কিছু জানে, অতএব বাঙ্গালী মুসলমানেরও ভাষা উর্দ্দু হওয়া উচিত। এঁদের অধিকাংশ কলকাতায় বাস করেন, অথবা কলকাতাবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মুসলমান সমাজে এঁদের সম্মান খুব বেশী—কারণ এঁরা অধিকাংশই উচ্চপদস্থ।

(২) অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কিন্তু বেশ সচ্ছল অবস্থার একদল মুসলমান, যাঁরা মফঃস্বলের শহরে বাস করেন এবং আত্মীয় স্বজনকে একেবারে বাদ দিতে এখনও সক্ষম হন নি, তাঁদেরও কেউ কেউ বল্‌তে চান যে মুসলমান বাঙ্গালী (বঙ্গ দেশবাসী) হ'লেও এদের ভাষা প্রকৃতপক্ষে উর্দ্দু এবং উর্দ্দুকেই এদের মাতৃভাষা ক'রে নেবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

(৩) তৃতীয় দলের বাঙ্গালী মুসলমান, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানকে হেয় ক'রে দেখান হ'য়েছে, এবং ইস্‌লামের আদর্শকে অপমান করা হ'য়েছে, এই দুঃখে বাংলার চর্চ্চাকে বর্জ্জন ক'রে উর্দ্দুর চর্চ্চা করতে চাচ্ছেন।

(৪) বাংলাদেশে যখন মুসলমান বাস করছে তখন তারা বাঙালী, অতএব তাদের মাতৃভাষা বাংলা; কিন্তু উর্দ্দুকে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ ওটি মুসলমানদের Lingua franca.

(৫) আবার আর একদল বিদ্রোহী বাঙ্গালী মুসলমান বলছে : বঙ্গদেশে আমাদের বাস, অতএব আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষাও বাংলা। কলকাতাবাসী সমাজ আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন; তাদের চোখ রাঙানীকে আমরা ডরাই না। আর অমুসলমান লেখক যদি বাংলা সাহিত্যে ইস্‌লামের মর্য্যাদাহানী করে, তাই ব'লে আমাদের সত্যিকার অধিকার আমরা ছাড়বো না। আমাদের জমীদারী বন্য বরাহে ছেয়ে গেছে বলে' কি জমীদারী ছেড়ে পালাবো? —আমরা আমাদের আদর্শ দিয়ে বাংলা সাহিত্য রাঙিয়ে তুলবো।

এরা আরও বল্‌ছে : আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের সাহিত্যকে আমরা গ'ড়ে তুলি। তারপর যদি আবশ্যক হয় তখন Lingua franca র কথা ভাব্‌বো।

এই সমস্ত মতামত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু বক্তব্য এই যে, এই উর্দ্দু ও বাংলা নিয়ে যে তর্ক তাতে ক'রে আমরা কোনো ভাষার চর্চ্চা করছি না, এবং তার ফলে আমাদের চিন্তাশক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হ'য়ে চলেছে।

যে জাতির মন ভাব-সম্পদে ভরা, তাদের ভাষা নিয়ে তর্ক উঠ্‌তেই পারে না। ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। মনে যখন ভাবের বন্যা আগত হয় তখন কোন্ জাতীয় ভাষায় মনের ভাব বেরিয়ে আসবে, সে বিচারের অবসর থাকে না। যদি বাইরে থেকেই আগে ভাগে বিধি-নিষেধের বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়, তা হ'লে ভাবরাজি ভেতরে আট্‌কে থাকে এবং সেখানেই দম বন্ধ হ'য়ে মারা যায়।

বাঙ্গালী মুসলমানদের যাঁরা পথ-প্রদর্শক, যাঁরা উর্দ্দু ও বাংলা নিয়ে তর্ক করছেন, তাঁরা কয়েক কোটী মানব-সন্তানের চিন্তাশক্তির বিষয় না ভেবে শুধু ভাষার জাতি-বিচারে ব্যস্ত। তাঁরা ভাবের আদান-প্রদানই যে ভাষার মূল উদ্দেশ্য একথা ভুলে যাচ্ছেন। তাতে ক'রে অসুবিধে হচ্ছে—কয়েক কোটী মানব-সন্তানের হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ হচ্ছে। সহজে যে ভাষায়ই হোক তাদের ভাবরাজিকে প্রবাহিত হ'তে বাধা দেওয়া ভালো কাজ হচ্ছে না।

মানব-হৃদয় কত জটিল! তার হাসি-কান্না কত বিচিত্র বর্ণের এবং কত বিচিত্র ভঙ্গীতে তার বিকাশ! তাই, মানব-হৃদয়ের

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে প্রশংসা করা যায় না। আমারই মত একজন মানব-সন্তান পুত্রশোকে কাঁদ্‌ছে। তাকে যদি বলা হয় : 'ও কান্না কান্নাই হ'ল না, উর্দ্দুতে কাঁদতে হবে,--যদি উর্দ্দু না জান তবে উর্দ্দু শিখে নাও, তার পরে উর্দ্দুতে কাঁদবে এবং তখন তোমার কান্না 'দারোস্ত্‌ হবে;' তা হ'লে তার কান্নাকেই বন্ধ করে' দেওয়া হয়। আজ বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা; দাঁড়িয়েছে তাতে এমনি করে' তার সমস্ত ভাব বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে; তার হাসি-কান্না তার কণ্ঠ পার হয়ে, এমন কি ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত এসে, বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। ফলে তারা আজ যেমন ভাষাহীন, তেমন ভাবহীন। তাদের চিন্তাশক্তি আজ অসাড়, বুদ্ধি আড়ষ্ট।

একজন দুইজন নয়, দুই এক শত নয়, দু চার হাজার নয়, লাখ লাখ, পল্লীবাসী নির্ধন নিরন্ন অক্ষম বাঙ্গালী মুসলমানদের দুরবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা একেবারে বেখবর, তাঁরা বাইরে থেকে শুধু এদের ভাষা উর্দ্দু হবে কি বাংলা হবে এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে এদের কোনো উপকার করতে সক্ষম হবেন না। সত্যিকার উপকারের স্পৃহা যার আছে তাকে অন্তরের দরদ দিয়ে বিষয়টি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হবে।

মানুষের অন্তরের দরদ বা অনুভূতিটি কোন্‌ ভাষায় প্রকাশ করতে হবে সে সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ দ্বারা শাসন করা নিষ্ঠুর আচরণ। এই নিষ্ঠুরতার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাশক্তিকে দুর্ব্বল করা হয়েছে। সত্য সত্যই এদের কোনো ভাষা নেই। বাংলাও তাদের ভাষা নয়; উর্দ্দুও তারা আয়ত্ত করতে পারে নি--পারছেও না।

প্রাইমারী স্কুলে এরা যে বাংলা পড়ে, সে ভয়ে ভয়ে পড়ে এবং পাছে বাংলা ভালো জানার অপরাধে লোকের কাছে নিন্দনীয় হ'তে হয়, সেই ভয়ে তারা কোনো প্রকারে পরীক্ষায় পাশের পড়াটুকুই পড়ে; এবং পরীক্ষায় পাশ হ'য়ে গেলে যেটুকু শিখেছিল সেটুকুও ক্রমে ক্রমে ভুলে যায়। আবার মক্তব হ'লে তো কথাই নেই। অনেক প্রাইমারী স্কুলেও একজন উর্দ্দু শিক্ষক বাংলা শিক্ষার নিষেধের পাহাড় স্বরূপ বিরাজ করেন। তিনি অনবরত কোমলমতি বালকগণের কাণে পৌঁছচ্ছেন : 'কি হবে ওসব হিঁদুদের দেবদেবীদের কথা পড়ে?' এদিকে এই সব উর্দ্দু শিক্ষক নিজেরাই উর্দ্দু ভালো জানেন না। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই বাঙ্গালী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল বালক বালিকারা না শেখে উর্দ্দু, না শেখে বাংলা।

যাঁদের অবস্থা সচ্ছল এবং যাঁরা শহরে বাস করেন, তাঁদের দু একজনের ছেলেরা যা একটু কোনো প্রকার লেখাপড়া শিখ্‌ছে; কিন্তু সহস্র সহস্র পল্লীবাসী বাঙ্গালী মুসলমানদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষা শুধু এই উর্দ্দু ও বাংলার তর্কের জন্য ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই এদের চিন্তাশক্তিকে মুগুর মেরে' মেরে' থেঁৎলে দেওয়া হচ্ছে। তারা তাই প্রাথমিক জ্ঞানের ওপরে উঠ্‌তেই পারছে না; এবং শুধু এই কারণেই প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এত কম।

একমাত্র কারণ উর্দ্দু ও বাংলার তর্ক একথায় আপত্তি হবে। কেউ বলবেন : অনেক প্রাইমারী স্কুলে উর্দ্দু শিক্ষকও নেই--উর্দ্দু পড়ানোও হয় না। সে কথা ঠিক। কিন্তু স্কুলের বাইরেও তো একটি আকর্ষণ আছে। এবং সেই আবেষ্টনের একটি অদম্য প্রভাবও আছে! এঁরা বলেন : দারিদ্র্যই মূল কারণ; কিন্তু এই দারিদ্র্যেরও একটি কারণ এই উর্দ্দু ও বাংলা নিয়ে তর্ক। এই তর্কের দরুণ মুসলমান ভাব্‌তে শিখ্‌ছে না মোটেই। যে জাতির ভাষা নেই তার ভাববার শক্তিও নেই--আর ভাববার শক্তি না থাক্‌লে একটি জাতি দরিদ্র তো হবেই। কেউ কেউ বলবেন : মুসলমান সুদ খায় না, তাই তারা দরিদ্র। এই যদি দারিদ্র্যের কারণ হতো তাহ'লে বিহার প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থাও বাঙ্গালী মুসলমানদের মতো হতো। বিহার প্রদেশে উর্দ্দু বাংলার তর্ক নেই।

ভাষা না জান্‌লে ভাবের আদানপ্রদান হয় না--সৌভ্রাত্র অসম্ভব। জাতির উন্নতির জন্য ভাবের আদানপ্রদান সৌভ্রাত্র একান্ত আবশ্যক। ভাবের আদান প্রদানের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। বাংলা দেশে যে-সব ওয়াজ্‌ হয়, সেখানে আজকাল যদি বা কোনো বাঙ্গালী মৌলবী বা মওলানা সাহেব বাংলায় ওয়াজ্‌ করেন, সে বাংলার অর্দ্ধেক আরবী, সিকি ফারসী এবং কতকাংশ উর্দ্দু। সে ভাষা সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমানদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। তাছাড়া এইসব মৌলভী মওলানারা উর্দ্দু বা আরবী বা ফারসী কোনো সাহিত্যের উপরই ভালো দখল লাভ করেন নি। এঁদের অনেকেরই পড়াশুনা অতি সামান্য। আজকের দিনে জীবন-সংগ্রামে নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। যাদের পড়াশুনা কম তারা কোনো বিষয়ে চিন্তা বা আলোচনা করতে অক্ষম।

মস্‌জিদে যে খোত্‌বা পড়া হয়, তা হয় আরবীতে; মিলাদ শরীফের সভায়ও আরবী ফারসী বা উর্দ্দুতেই হয় আলোচনা তা পল্লীবাসীরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। এ সবে শ্রোতাদের মনে কোনো সত্যিকার প্রেরণা আনে না। এই সব কারণে ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছে না। তাতে করে' চিন্তা-শক্তি বর্দ্ধিত হতে পারছে না এবং কোনো চরিত্র গড়ে উঠ্‌ছে না। ফলে চরিত্রহীনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জেলখানা তার সাক্ষী!

অতএব নিঃসংসয়ে বলা চলে যে চিন্তাশক্তির অভাবেরও একমাত্র কারণ এই উর্দ্দু ও বাংলা নিয়ে তর্ক। এই তর্কের ফলে বাঙ্গালী মুসলমান আজ দিশেহারা, তারা কিছুই ঠিক করতে পারছে না--কোথাও এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না। উর্দ্দু তারা শিখ্‌তে চায়, কিন্তু সুযোগ, সুবিধে, আবেষ্টন সবগুলির সমান অভাব। উর্দ্দু আয়ত্ত করতে পারছে না, এই দুঃখেই তাদের মন চঞ্চল, সুতরাং ভালো বাংলাও শিখতে পারছে না।

ভাষাহীন মানুষের দুর্গতি তো অনিবার্য্য। ভাষার অভাবে ভাব প্রস্ফুটিত হ'তে পারছে না। ভাবের (ideas) দৈন্য মানুষের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ভাব হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমান যে কত দরিদ্র তা ভাব্‌তেই চিত্ত পীড়িত হয়।

বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে অন্নের অভাব। ক্ষুধার জ্বালায় সে একান্ত কাতর। কিন্তু তাকে যে উর্দ্দুতে কাঁদতে হবে--উর্দ্দুতে তার নালিশ ব্যক্ত করতে হবে। সুতরাং তার কান্নারও পথ বন্ধ, নালিশ করবারও ক্ষমতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌বারও ক্ষমতা নেই।

বাস্তবিক বাঙ্গালী মুসলমানের অন্নাভাবের কথা এরা তেমন ভাবছেই না। কি উপায়ে যে এদের অন্নাভাব ঘুচান সম্ভব সে সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি একটু স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা যাক্‌।

বাংলাদেশে বৎসরে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ টাকা কেবল তুর্কী টুপির জন্য বাঙ্গালী মুসলমান ব্যয় করছে। অথচ এই টাকার একটি পয়সাও মুসলমানের পকেটে যাচ্ছে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তুর্কী টুপীর ব্যবহার বেশ ব্যাপক ভাবে চল্‌ছে। এই ত্রিশ বৎসরে বাঙ্গলার মুসলমান অন্ততঃ কয়েক কোটী টাকা ব্যয় করেছে এই তুর্কী টুপীতে। এই কয়েক কোটী টাকা যদি তার ঘর থেকে এমন করে' না বেরিয়ে যেতো তো তার অন্নাভাবের অনেকখানি লাঘব হ'তো।

যে-কারণে এই টুপি পরা হয় সে কারণ তো আজ অন্তর্দ্ধান হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনো আলোচনা কানে পৌঁছয় নি। এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, পূর্ব্বে যে সব টুপি ব্যবহৃত হ'তো তাতে মুসলমানদের ঘরে অন্ততঃ কিছু পয়সা যেতো।

শুধু টুপির কথা নয়, আমাদের দেশে যে সব সহজ ব্যবসা আছে--যেমন কর্ম্মকারের ব্যবসা, কুম্ভকার, কংসকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, তাঁতি, পরামাণিক ও তেলীর ব্যবসা, পাথর খোদাই করা, ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা ইত্যাদির ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমান নেই। এর একমাত্র কারণ এদের এসব idea দেওয়া হয়নি! কে দেবে? যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তারা উর্দ্দু ও বাংলার তর্কের মীমাংসায় ব্যস্ত; দেবার অবকাশ, স্পৃহা ও ভাষা কোনোটাই নাই।

তাই, মুসলমান ওজু ক'রে নামাজ পড়বে, বদনা সে তৈরী করতে জানে না। ভাত রেঁধে খাবে, সে ডেক্‌চি পাতিল তৈরী করতে জানে না। মশলা পিশবে, সে শীল নোড়া তৈরী করতে জানে না। লাঙ্গলের ফথা ইত্যাদির জন্য তার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ তাকে ব্যয় করতে হবে। সংসারের যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তার একটিও সে তৈরী করতে পারে না। তার গামছাখানা কিনতে হবে। এমন কি, চিড়ে মুড়ী পর্য্যন্ত সে কিনে খায়!

এমন ক'রে কি কোনো জাতির অন্ন-সমস্যার সমাধান হতে পারে? যে জাতি উপার্জ্জন করবে সব চেয়ে কম, অথচ ব্যয় করবে সব জাতির চেয়ে বেশী, তার দুঃখ তো অনিবার্য্য।

বাংলাদেশে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ লাঙ্গলের ফলা বিক্রী হয় এবং তার জন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর মুসলমান ব্যয় করে, সে-সম্বন্ধে যাঁরা উর্দ্দু-বাংলার তর্কে ব্যস্ত তাঁরা খবরও হয়তো রাখেন না।

সুতরাং উর্দ্দু ও বাংলার তর্কে এ সমস্ত বিষয়ে ভাববার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত থেকে বঞ্চিত করা হ'য়েছে। এ তর্কের দরুণ তারা গোড়ায়ই আট্‌কে গেছে। অগ্রসর হবে কেমন করে? এতে করে' এমন করে' এদের সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে যে, অচিরে একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তাই মনে হয়, যাতে ভেতরে ভাব্‌বার শক্তি জাগে, যাতে ভাবের আদান-প্রদানের অসুবিধে না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য থাক্‌লে উর্দ্দু ও বাংলা নিয়ে তর্ক উঠ্‌তেই পারে না।

এ সব ছাড়া আবার এই তর্কের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে : যাঁরা উর্দ্দুর পক্ষে তাঁরা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর এবং যারা উর্দ্দুর বিপক্ষে তারা ইতর। সচ্ছল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করতে আরম্ভ করেন এবং কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ সুদূর বিদেশ থেকে তাঁদের এদেশে আগমন হ'য়েছিল, তার ইতিহাস এবং তাতে ক'রে যে তাঁদের মাতৃভাষা উর্দ্দু তারই প্রমাণাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে শ্রেণীবিভাগ বেশ দৃঢ় হ'য়ে গেছে। এখানে একটী অবান্তর কথা না বল্‌লে একটু অন্যায় হবে। অনেক পল্লীবাসী বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানও বরাবরই এদেশের বাসিন্দা নন্। তারাও সুদূর অতীতে সুদূর বিদেশ থেকে এসেছিলেন।

উর্দ্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। এমন কি মফঃস্বলের শহরে অনেক স্বচ্ছল অবস্থার মুসলমান, যাঁরা উর্দ্দু ভালো জানেন না কিন্তু কেবল মুখে বলেন যে উর্দ্দু বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হওয়া উচিত, তাঁরাও বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন বা অন্য কোন দায়িত্ব এ সমাজে নেই।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত তথাকথিত ইতর শ্রেণীর মুসলমান, যখনই একটু অবস্থার উন্নতি হয়, তখনই, সম্ভ্রান্তের দলে মিশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে পাড়াপ্রতিবেশীকে ভুলে যায়।

এমনি করে' একদিকে অবস্থাপন্ন মুসলমান যেমন বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানকে পর করে' রেখেছেন, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী তাঁরাও বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানকে কিছু আপনার মনে করেন না।

অবস্থার সঙ্গে কৃষ্টির নৈকট্যকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বাংলাভাষাভাষী মুসলমান, কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার উৎকৃষ্ট কৃষ্টির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

আবার কয়েক কোটী মুসলমানের বাস সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলমানের কোনো কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। একটি কৃষ্টিকে গড়ে তুলতে বা পুনরুদ্ধার করতে সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আমাদের যেমন ক'রে শক্তিক্ষয় হ'য়েছে তাতে কোনো কৃষ্টি সম্ভব হয় নি।

যে সব সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাংলা বর্জ্জন করেছেন, উর্দ্দু যাঁদের মাতৃভাষা, কৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁদেরও বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য উর্দ্দুতে কথা বল্‌তে পারাই একটি কৃষ্টি যদি বলা হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। তা না হলে ভাব (idea) হিসাবে এঁরাও যে এমন কিছু সম্পৎশালী তা নিশ্চয় করে' বলা চলে না। উর্দ্দু সাহিত্যে এঁদের কারও কোনো বিশেষ দানের কথা শোনা যায় না। অন্য কোনো ললিতকলায়ও এঁদের কোনো এমন কিছু উল্লেখযোগ্য দানের নিদর্শন দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার মধ্যে কত বিচিত্র ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। উর্দ্দুভাষাভাষী সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে কি কেউ তেমন কিছু দান জগতকে দিতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিয়ে দেখা যাক্। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, জলধর, ভূদেব, রামেন্দ্রসুন্দর ইত্যাদি অসংখ্য বাঙ্গালী মনীষীর নাম উল্লেখ করা যায়, যাদের দানের সমকক্ষ দান কোনো উর্দ্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দু সাহিত্যের ভেতর দিয়ে করতে সক্ষম হন নি। এই সব মনীষীদের নাম করতেই হৃদয় যেমন ভক্তিতে পূর্ণ হয়, মাথাও তেমনি শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে পড়ে। উর্দ্দু ভাষাভাষী উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী মুসলমানের নামোল্লেখে তাঁদের ভাগ্যের প্রশংসা করা যায়, তাঁদিগকে সম্মান করতেও বাধা নেই; কিন্তু হৃদয়ের ভক্তি, অন্তরের শ্রদ্ধা তেমন কি জাগে? তাঁরা ধনে প্রতিপত্তিতে বড়; মুসলমান হিসাবে করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা : তাঁরা আরো বড় হউন! এবং সত্যিই বড় হউন!

কিন্তু, ভাবের জগতে তাঁদের অক্ষমতার কথা মনে হ'লে মুসলমান হিসাবে দুঃখ লাগে। তাঁদের এই অক্ষমতার কারণ এই যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের যাঁরা উর্দ্দুর চর্চ্চা করছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এঁদের ভাবের আদান প্রদান অল্পসংখ্যক কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ। সুবিস্তৃত বাংলার বড় বাজারে এঁদের গতিবিধি নেই। তাই কোনো প্রতিযোগিতাও নেই। যিনি যা জানেন, ভালো হোক, মন্দ হোক, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। এঁদের দলের অবস্থা এই যে—'তু মরা হাজী বগো মন তোরা

[illegible]। বাস্তবিক এঁদের মধ্যে এমন একটি অনড় Self-complacent attitude দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যা আজকের দিনে জগতের কোনো জাতির পক্ষে অসম্ভব। এঁদের এমন কতকগুলি সুবিধে আছে যা জগতের কোথাও মেলে না।

এঁদের সুবিধের ভিত্তি-মাথা গুন্‌তির অর্থাৎ Communal representation এর ওপর; অথচ, সেই Community'র প্রতি এঁদের কোনো দায়িত্ব নেই! কিছু লেখাপড়া কোনো প্রকারে আয়ত্ত ক'রে ঐ সাম্প্রদায়িক অধিকারের ধাপের ওপর পা রেখে একবার ডেপুটি বা মুন্সেফ বা অমনি একটা কিছু হবার পর সম্প্রদায়ের প্রতি সব দায়িত্বের একেবারে অবসান! এমন সুবিধে আর কোথাও আছে বলে' কেউ বলতে পারবেন না।

যখনই এঁদের দায়িত্বের অবসান হ'ল তখন থেকেই এঁরা স্বজাতি প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েন। তখন বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলমানকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেন।--এমন কি, বাঙ্গালী বা হিন্দু কনভার্ট ব'লে তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয় না, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। বাস্তবিক অনেক উর্দ্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানের মনের ভেতরকার ধারণা এই যে, সম্ভ্রান্ত বংশের হ'লেই ভালো উর্দ্দু বল্‌তে পারা যায় এবং উর্দ্দু না বল্‌তে পারলেই বুঝ্‌তে হবে সে লোকটি ইতর শ্রেণীর এবং তার প্রতি তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই এবং থাকা অস্বাভাবিক।

এমনি ক'রে অবস্থা ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মুসলমান শহরে বাস গ্রহণ করেন এবং সুদূর বা অদূর পশ্চিমের কৃষ্টির অনুকরণ করতে আরম্ভ করেন, তাঁদের সুদূর পল্লীবাসী আত্মীয়-প্রতিবেশীর প্রতি তাঁদের কোনো কালে কোনো দায়িত্ব ছিল বা আছে এ কথা স্বপ্নেও মনে হয় না।

এমন দায়িত্বহীনতার সুবিধে অন্য কোনো জাতির ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ অন্য কোনো জাতির বেলায় এমন সুদৃঢ় ভাষার প্রাচীর রচনা ক'রে সেই প্রাচীরের অভ্যন্তরে নিরাপদে ও নিরুপদ্রবে থাকা অসম্ভব।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক--দায়িত্ব জিনিসটি এমন যে ওকে যথেচ্ছা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করা চলে। সংসারে এমন লোকও আছেন যাঁরা, যেমনই অবস্থা হোক্ না কেন, সমস্ত জগতের সুখদুঃখের কথা ভেবে তাঁদের জীবনকে যেমন মহিমান্বিত করেছেন, অন্যদিকে তেমন বিপন্নও ক'রেছেন। বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের বেলায় দায়িত্ববোধ জিনিযটি যে যথেষ্ট প্রসারিত একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না।

কিন্তু, এই দায়িত্ববোধের অভাবের দরুণ আজ সমগ্র বাংলাদেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যা নিয়ে বাংলার মুসলমান বড়াই করতে পারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বেলায় সারা বাংলাদেশে এক করোটিয়া ভিন্ন অন্য কোথাও একটি কলেজ নেই। মাথা গুন্‌তির উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের মুসলমান মিনিষ্টার হ'তে চাচ্ছেন, একজিকিউটিভ্ কাউন্‌সিলার হ'তে চেষ্টা করছেন, হাইকোর্টের জজ্ হবার আশা করছেন; কিন্তু কৈ, এক করোটিয়া কলেজ আর বড় জোর Sir Ahsanullah School of Engineering ভিন্ন, অন্য কটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, যার সঙ্গে মুসলমানের নাম করা যেতে পারে? বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে এমন পরিবারও আছে যাদের মধ্যে একাধিক ভাগ্যবান পুরুষ 'Sir' উপাধি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হ'য়েছেন। অবশ্য এঁদের মাতৃভাষা উর্দ্দু এবং বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীর মুসলমানের প্রতি এঁদের কোনো সত্যিকার দায়িত্ব আছে কি না, তা তাঁরাই বল্‌তে পারবেন।

দায়িত্ববোধ আছে কি না তা তাঁরা জানেন, কিন্তু সত্যিকার দরদ যে নেই তার প্রমাণ আমরা মাঝে মাঝে পেয়েছি। এবং এমনি ক'রে সত্যিকার দরদ,--একটুখানি সহানুভূতির অভাবে আজ কয়েক কোটী বাঙ্গালী মুসলমান কাণ্ডারীহীন তরীর মতো ভেসে চলেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার তাদের সামর্থ্য নেই, নিজের দেশের কাছে একবিন্দু দাবী দাওয়া নেই তাদের।

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এই হতভাগ্য বাঙ্গালী মুসলমানই সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম ক'রে এবং সকলের অসম্মান মাথায় নিয়ে দেশের সকলেরই অন্ন যোগাচ্ছে।—তাদেরই মাথা-গুন্‌তির ওপর নির্ভর ক'রে সম্ভ্রান্ত মুসলমান জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন। কিন্তু এরা যে কী অন্ন খায়, কী জলে তাদের পিপাসা মেটে, কী সুগভীর এদের অশিক্ষা, তা খোঁজ করবার কেউ নেই। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম ধারা, মাঘের প্রচণ্ড শীত, সবই এদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যায়। এদের তপ্ত অশ্রু এদের গণ্ড বেয়ে আপনিই ঝরে পড়ে, মুছাবার কেউ নেই! সকল সুযোগ ও সুবিধে থেকে বঞ্চিত এরা। তার ওপর এই উর্দ্দু ও বাংলা তর্ক দিয়ে তাদের ভাষাটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নেবার বন্দোবস্ত, আর তাতে ক'রে এই শ্রেণীর বিভাগ! এমনি ক'রে এই সর্ব্বহারাদের একেবারে সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে।

অকারণে

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

কাজে বেরিয়েছি। হন্ হন্ ক'রে এসে দাঁড়ালুম গাড়ীর অপেক্ষায়।

দেখ্‌লুম আরো একজন দাঁড়িয়ে,--তার চোখে উৎসুক দৃষ্টি, মুখে প্রতীক্ষার আবেদন।

সে-ও যাত্রী। কোন্ পথে তার যাত্রা জানিনে;- তবু আমরা দুজনেই তো যাত্রী।

আমি গাড়ীর অপেক্ষা করছি; সে-ও প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

আমরা এক প্রতীক্ষায় আত্মীয়।.....

সে আমার দিকে চাইলে না, আমি-ও তার দিকে না।

তবু এই অদেখাই যেন দেখার চেয়ে সত্যি।

চোখোচোখি না হ'লেই কি কেউ কারো নয়?...

গাড়ী আসে-ই না। সে যেন উশিখুশি কত্তে লাগ্‌লো।

আমার দেরী হচ্ছে, আমিও কিছু অধীর হ'য়ে পড়্‌লুম।

এক ব্যস্ততায় আমরা আত্মীয়।.....

আমি কি ওকে কখনো দেখেছি; ও কি আমাকে কখনো দেখেছে? আমি কি ওকে জানি; ও কি আমাকে জানে?

...তাতে কি? এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এক প্রতীক্ষায় চঞ্চল, এক ব্যস্ততায় অধীর, আমরা পরমাত্মীয়!

অন্তরে বাঁশীর সুরে ব্যথার কাঁটা কুসুম হ'য়ে ফুটছে, গানের দাহনে হিমের কুণ্ঠা আগ্রহে রঙিল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

..ওর কেন এই অধীরতা, এতো চঞ্চলতা। --এই তো গাড়ী এলো, এই একটুখানিক দেরী বই তো নয়!

গাড়ী এলো। বড়ো ভিড়, সবাই ঠাসাঠাসি করে বসেছে, কেউ কেউ বা দাঁড়িয়ে।

এক-রকম ছুটেই গেলো তরুণী। --ঠাই নেই, ঠাই নেই।--কুণ্ঠিত হয়ে সে ফিরে এলো। তার পায়ের নীচে মাটীর শিহরণ থেমে গেলো।

আমার দেরী হচ্ছে; গাড়ীতে উঠ্‌তে পাত্তুম, আমার দাঁড়াবার স্থান ছিল।

কিন্তু ওঠা আমার হ'লো না!

ওর ওঠা হ'লো না; আমার ওঠ্‌বার কথা যেন আস্‌তেই পারে না!

মনটা ভারী ব্যথিয়ে উঠ্‌লো। ওগো আমার অপরিচয়ের আত্মীয়! ওগো অনামিকা বন্ধু আমার!....

গাড়ীতে। সে সা'মনে, আমি পিছনে।

আমরা দুজন একই পথের যাত্রী!

....কিন্তু গাড়ীতে ব'সে শিস্ দেওয়া ভালো দেখায় না।

সে-ও আমার দিকে চাইলে না, আমি-ও তার দিকে না; সে-ও আমাকে জানে না, আমি-ও তাকে না।

তবু একই পথের যাত্রী আমরা, একই রথের স্পর্শে এলায়িত অঙ্গ আমাদের!...

তারপর কত লোক এসে ভিঁড় জমালো।

কাজের তাড়ায় তাড়াতাড়িতে নাম্‌লুম।

বেশ খানিক চলে এসেছি। কই, সে কোথাও নাম্‌লো, না গাড়ীতেই ব'সে রইলো, দেখ্‌লুম না তো!

কিন্তু তা দিয়ে কি দরকার?......

সত্যিই আজ বড়ো দেরী হয়ে গেছে; প্রথম গাড়ীটাতে এলে হয়তো দেরীই হ'তো না।

শরৎ

জসীম উদ্‌দীন

সোনার বরণী রাণী,
ঝাউ শাখে তোর রঙিন শাড়ীর
দুলিছে আঁচল খানি।

কাশ ফুলে মাজা চরের বাতাস
ঝরা শেফালীর মাখিয়া সুবাস
বন পথে পথে ফিরিছে উদাস,
তোরে বুঝি সন্ধানি।

এইখানে দাঁড়া রাজার দুলালী
রাতের চাঁদের সনে,
হাসিয়া হাসিয়া নাড়ে দীঘি-জল
সাপ্‌লা লতার কনে।

কল্‌মীর ফুল জড়াইব পায়ে,
জোছ্‌নার গুঁড়ো মাখাইব গায়ে,
নীহারে নাওয়ায়ে তুলট মেঘেতে
মুছাব অঙ্গখানি।

প্রবাহ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নববর্ষের প্রথম দিনটা......

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খুব মেঘ ক'রে এল। তারপর ঝড় উঠ্‌লো। ধূলো খুব উড়লো, বাতাসে সোঁদা সোঁদা ভিজে মাটীর গন্ধ দূর হ'তে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো, বিদ্যুৎ খুব চম্‌কাতে শুরু ক'রে দিলে।

অনেক কাল আগের শৈশবের সেই সব কালবৈশাখী দিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘরের কোণ খোঁজা, কাঁথা পাতা, শিল পড়্‌বার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন ঘন্ চাওয়া; ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্ব্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক; বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে মনে পড়্‌ল কত কথা; অনেক দূরে আজ আমার গ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠ-বিহার—ছেলেবেলার মত মেলা হচ্চে, কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কত মাটীর ঘর থেকে এসেচে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেচে পঁচিশ বৎসর আগেকার মত হয়তো।.....

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বৎসর কেটে যাবে। তিন হাজার বৎসর পরেকার সে বাংলার ছবি আমি এই মেঘান্ধকার নির্জ্জন সন্ধ্যাটীতে বাংলা থেকে দূরের দেশে এক জঙ্গল পাহাড়ের ধারের ঘরটীতে বসে মনে আনতে চেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভ্যতা, যার বিষয় এখন আমরা কল্পনা করতেও সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেচে। হয়তো ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মত ইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েচে। রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব-সভ্যতার কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন স্বরূপ সে ভবিষ্যৎ যুগের মানবের চিত্র-শালিকায় রক্ষিত হচ্চে। বর্ত্তমান বাংলা ভাষা তখন আর কেউ বুঝতে পারে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের ভাষা দেশে প্রচলিত হয়েচে।

বহুদূর ভবিষ্যতের ছবি....

তখনও এই রকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকম মেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরস্পৃক্ত ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া নিয়ে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমক নিয়ে.....তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ অপরাহ্ণের উপর।

তখন কি কেউ ভাব্‌বে, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগতটী এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব্ব আনন্দে দুলে উঠতো? এই মেঘান্ধকার আকাশের বিদ্যুৎ-চমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা,—কি আশা, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, দূর দেশের, দূরের উত্তাল সমুদ্রের, ঘটনাবহুল, অস্থির জীবন-যাত্রার কি মায়াছবি তার শৈশব মনে ফুটিয়ে তুল্‌তো?

কোথায় লেখা থাক্‌বে তার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবন-যাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে গিয়ে মায়ের হাতে বেলের পানা খাবার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটী, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভঙ্গে পাপিয়ার সে মন-মাতানো ডাক—গ্রাম্য নদীটির ধারে শ্যামতৃণদলের উপর বসে বসে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ-কল্পনা! কোথায় লেখা থাক্‌বে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলির সে সব আনন্দ-কাহিনী?....

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এ-সব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্ত্তা আন্‌বে, কোন্ পথে তারা আস্‌বে?

এই সন্ধ্যায় বসে গভীর ভাবে এ কথাগুলো ভাব্‌তে ভাব্‌তে কোন গভীরতার মধ্যে যেন ডুবে গেলুম! মেঘভরা নির্জ্জন সন্ধ্যা.....বিদ্যুৎ-চমক্......ঝড়ের শব্দ.......হঠাৎ এই জলের গন্ধে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তার আনন্দে মন শিউরে উঠলো।......

ঐ ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবহমান জীবনের উৎসব,--নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা, অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা--আর যা আছে তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই--কোন ভাষার ব্যাকরণে তার প্রতিশব্দ গড়তে পারে নি, 'অনন্ত', 'শাশ্বত', 'নিত্য', 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলি একঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না, বোঝানো যায় না প্রকৃত রূপ, সে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধ মিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমক, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্যে মনে আসে......অনন্তের সে বেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানে পৌঁছোয়। নক্ষত্রলোকে যদি কোন দুঃসাহসিক মানুষ যেতে যায় তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দ্দিষ্ট করলে তাকে চলবে না তাকে যোগাড় কর্ত্তে হবে আলোকরথ--একমাত্র আলোকের গতিই তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখান পৌঁছুতে হলে। এমন একটা জিনিষ আছে, যা মনোজগতের এই আলোকরথের কাজ করে; মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিষটা। Logic সঙ্গত, শান্ত, সুষ্ঠু, ক্রমবদ্ধ, হুঁসিয়ার চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তুমি লীলাসম্বরণ ক'রে ফেলবে, তবু হয়তো পৌঁছুতে পারবে না। সে জিনিসটা কি তা বোঝানো মুস্কিল, শুধু অনুভব ক'রে আস্বাদ করবার জিনিষ সেটা। Bergson তাকেই Intuition বলেছেন, বোধ হয়--আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। মৃত্যুটার সঙ্গে এই পৃথিবীর দেহটারই সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিষ নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে, এক অনন্ত জীবন পৃথিবীর এই মৃত্যুটায় স্পৃষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ণ, অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে। তা তোমার, আমার, সকলের। যুগে যুগে চিরদিন.....এই জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার--আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই--যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বা নিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। তাঁরা তা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা--শুধু এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে---আত্মার খাদ্য ক'জন যোগায়?...

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষে মনে প্রাণে যে দিন বরণ ক'রে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে।

কালবৈশাখীর শীকরস্পৃক্ত স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতাদগ্ধ মনে অমৃতত্ব বর্ষণ করুক্, দূর অজানা স্বপ্ন-জগতের কোণ থেকে বয়ে এনে।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব্ব সম্পদ। একে অবহেলা না ক'রে দুঃসাহসিক আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে এর অজানা দেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

∴

মোঁপাসার সেই পলাতক লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল--সেই জাহাজের ডেকে ছোট ছেলেটা যখন তার হতভাগ্য নির্ব্বাসিত খুড়োকে দেখ্‌লে তখন তার বালক-হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু!

তাই মনে হোল--সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফুটানোর চেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়--অনেকের মন এমন ভাবে তৈরী, যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এই গভীরত্ব অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এ দৈন্য অর্থে পূরণ হয় না, ঐশ্বর্য্যে নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক সাচ্ছল্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এসব অপূর্ব্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে-ওঠা মনের সঙ্গে। এই মোঁপাসার মত লোকেরা আসেন সমাজের এই বড় অভাবটা পূর্ণ কর্ত্তে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাব-জীবনের গোপন অনুভূতির কাহিনী তাঁরা লিখে রেখে যান উত্তর কালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীন হীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোন বিস্মৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনের কুণ্ডের ধারে আরাম কেদারায় বসে মোঁপাসার মনে হয়ে তাঁর চোখে জল এনেছিল, আজ সর্ব্বদেশের নরনারীর চোখে জল আন্‌চে--আজ কতকাল পরে সেই কল্পনাসৃষ্ট বৃদ্ধ ও তার দীন নাবিকের ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুলি-মাথা হাত পা, চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্চি।

সাহিত্য-শিল্পীদের জীবনের Missionই তাই। যে যুগে তারা জন্মেচে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্ত্তমান যুগে যাঁরা জন্মেচেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অনন্তের এক মুহূর্ত্তের কথা তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। এই যুগের সেক্সপীয়ার, হোমার, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, তাজমহল, Great war, এই কলকারখানা, সামাজিক বিপ্লব, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাদ্বন্দ্ব, বাংলার এই ম্যালেরিয়া ও দৈন্য, বার্ণার্ডশ, ওয়েলস, ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের প্রতিভা, আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীদের এই পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সব শুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার নানাদিকের কাহিনী, ইতিহাস লেখা হচ্ছে। প্রত্যেক লেখকই তাঁর নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা, বাপ, ছেলেমেয়ে সব আছেই- আমি তাদের কি রকম দেখলুম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলুম সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক্ না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনও কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না--পড়বেই সেটাকে সকলে। সকলেই খেলার তাঁবুর বাইরে দুয়ারে অপেক্ষা কর্চ্চে, রহস্যভরা খেলাটা সকলেরই ভালো লাগে, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না--তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও তুলনা হয়--মশায়, কি রকম দেখলেন? মশায় কি রকম দেখলেন? প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে--প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি চোখে দেখেচে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েচেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় ক'রে তবে শূন্যে ভর করে--যেমন সনেটের পিছনে--তেমনি হ্যামলেটের পিছনে সেক্সপীয়ার গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েচেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন ক'রে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগতকে কি রকম দেখলুম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ মুহূর্ত্তে পেলুম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃত-রসে স্নিগ্ধ করলে? গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার ক'রে লেখার জালে তাদের বেঁধে রেখে যাবো--সুদীর্ঘ ভবিষ্যত ধ'রে ভবিষ্য বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আস্‌বো না, হয়তো যুগযুগান্ত পরে আবার ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পরের পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা, এ ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে--তাজমহলের ধ্বংস-স্তূপ তখন মহেঞ্জোদারোর মত গভীর মাটীর রাশির তলা থেকে খুঁড়ে বার কর্ত্তে হবে--Great war এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে কলিকাতা শহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে--সেই সুদূর ভবিষ্যতে নতুন যুগের শিক্ষাদীক্ষার মানুষ এ সব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়্‌বে—বল্‌বে : আরে দেখ দেখ, সেই সেকালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে কর্ত্তে যেতো।.......এই রকম জমি নিয়ে মারামারি কর্ত্ত--মেয়ের বিয়েতে বিদায়ের সময় মা বাপ কাঁদতো! ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তরের শাশ্বত জীবন-দেবতা বসে বসে মৃদু হাস্‌বেন।

বস্তু রহস্য

কামালুদ্দীন বি-এস-সি

জল, মাটি, আগুন, বাতাস, আকাশ--এই পঞ্চভূতের বিভিন্ন সংযোগে জীব-জগতের বাকী সব জিনিষের সৃষ্টি, এই ছিল এদেশের মধ্যযুগীয় ভাবুকদের ধারণা। কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা এ ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন, এখন তা জানবার উপায় নেই; বিজ্ঞানের এ অতি গোড়ার কথা ইতিহাসের আওতার বাইরে। তবে এ ঠিক যে, প্রমাণের হেঙ্গাম তখন কমই ছিল; জ্ঞান ছিল নিতান্ত অগভীর, প্রকৃতির সাথে মানুষের পরিচয় ছিল নিতান্ত কাঁচা। কেউ কোনো কথা ব'লে বস্‌লে তার প্রতিবাদ করবার আয়োজন ছিল যৎসামান্য। কিন্তু যখন থেকে রসায়ন শাস্ত্রের ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হ'ল, তখন পঞ্চম ভূত হিসেবে বাদ পড়ে গেচেন, ব্যোম তখন বৈজ্ঞানিকের কাঁধ ছেড়ে দার্শনিকের মস্তিষ্কে গিয়ে উঠেচেন। হয়তো ভারতীয়দের চাইতে গ্রীক্ এবং সারাসেনরা অধিক বস্তুতান্ত্রিক বলেই আকাশের দিকে হা ক'রে চেয়ে থাকতে মন তাঁদের সায় দিলে না। এতে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সুযোগ বেড়ে গেল অনেকখানি। কারণ, বাকী চার ভূত--জল, মাটি, আগুন, বাতাস--ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইচ্ছামত আমরা এদের পরিচালনা করতে পারি।

যা'হোক, লোহায় মরচে পড়লে বা পারদ মুক্ত বায়ুতে সিদ্ধ করলে কেন যে তাদের ওজন বেড়ে যায়, সে উত্তর দিতে আজকালকের ইস্কুলের ছেলেরও ঠেকে না : অক্সিজেন এর সাথে তাদের সংযোগের তথ্য সে জেনে ফেলেচে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ মনে করতেন, খাঁটি পারদ বা লোহা বা তামা উপরিউক্ত কোনো ভূতের সাথে অগ্নির সংযোগে তৈরী। Iron-oxide, Mercuric oxide ইত্যাদিকে তাঁরা বলতেন 'লোহার গুঁড়া', 'পারার গুঁড়া'; এসব গুঁড়ার (calxর) সাথে দাহিকা (phlogiston)-র সংযোগই সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মূল--এই ছিল তাঁদের সিদ্ধান্ত।

এ মতবাদ প্রথম অগ্রাহ্য করলেন Lavoisier, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি টিনের টুকরো থেকে যথেষ্ট উত্তাপের সাহায্যে তথাকথিত দাহিকা-পদার্থ বিতাড়িত ক'রে নির্ভুল নিক্তিতে দেখালেন, যে পরিমাণ টিন থেকে গুঁড়ো তৈরী করা হয়েচে, গুঁড়ার ওজন সেই পরিমাণ টিনের চাইতে বেশী। তিনি স্থির করলেন, কোনো ধাতু গুঁড়ায় পরিণত হবার বেলায় কিছু ত্যাগ তো করেই না, তার উপর বাতাস থেকে 'আরও কিছু' আহরণ করে। আর টুক্‌রো টিন তিনি বাতাসের স্পর্শ এড়িয়ে কাঁচের গোলকের মধ্যে উত্তপ্ত ক'রে দেখ্‌লেন, তা' গলে যায় কিন্তু ওজনে বাড়ে না। অতএব এই 'আরও কিছু' যে বাতাসেই মিশে আছে--এতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। এদিকে Priestley পারার গুঁড়ায় উত্তাপ প্রয়োগ করে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে 'নতুন এক বাতাসে'র আবিষ্কার করে ফেললেন। Priestley দেখ্‌লেন, এ বাতাসে নিঃশ্বাস টান্‌লে চমৎকার লাগে, এতে ইঁদুর ছেড়ে দিলে তার আনন্দ আর ধরে না। তাই তিনি এর নাম দিলেন fresh air বা air eminently respirable. পর বছর Scheeleও সোরা উত্তাপ ক'রে স্বাধীনভাবে এ বায়ুর পরিচয় পেলেন। দাহন-ক্রিয়ার সহায়ক বলে তিনি এর নাম দিলেন fire-air।

Lavoisier ভাবলেন, এই কি সেই? ধাতুর সাথে এর সংযোগেই কি গুঁড়া তৈরী হয়? অবিলম্বে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলেন। সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসের সংস্পর্শে বারো দিন ধ'রে পারদ সিদ্ধ ক'রে তিনি দেখালেন, গুঁড়ো তৈরী হ'বার সাথে সাথে বাতাসের কতেক অংশ কমে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখালেন, যখন মোমবাতির অংশ বিশেষ জ্বালানো হয় এবং বাতির বাকী অংশ ও উদ্ভূত বাষ্প ওজন করা হয়, তখন সে ওজন দাঁড়ায় আদত মোমবাতির চাইতে অধিক। এ গ্যাসের নাম Lavoisier দিলেন oxygen, কারণ তাঁর মত ছিল, এসিড তৈরীর এ অপরিহার্য্য উপাদান।

লোহা, দস্তা, টিন ইত্যাদি ধাতুর সাথে তরল সাল্‌ফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশালে যে এক প্রকার গ্যাস উদ্ভূত হয়, Cavendish, Priestley প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা ক'রে জানলেন, তাতে অগ্নি সংযোগ করলে জ্বলতে থাকে।

তাঁরা এর নাম দিলেন inflammable air. Priestley ছিলেন দাহিকা-পদার্থের পক্ষপাতী। তিনি ভাবলেন, এও সেই সব ধাতুর একটা অংশ বিশেষ হবে, এসিড প্রয়োগে মুক্তিলাভ করেচে। কিন্তু Lavoisier ঘোষণা করলেন, ধাতুই মৌলিক পদার্থ, এবং এ গ্যাস এসিড-এরই এক অংশ। Scheele ১৭৭৩ সনে প্রমাণ করলেন, inflammable air ও নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাস একসাথে মিলিয়ে অগ্নিসংযোগ করলে বাতাসের ($\frac{১}{২}$) অংশ কমে যায়। আবার inflammable air ও fire-air মিলিয়ে অগ্নিসংযোগ করলে fire-air এর সবটাই অদৃশ্য হয়ে যায়। Priestley আরও দেখালেন, একটা শুকনো কাচের বাক্সে inflammable air বাতাসের সাথে মিশিয়ে জ্বালানো হলে, বাক্সের ভিতরটা শিশির-সিক্ত হয়ে ওঠে। Cavendish পরে যখন দুইভাগ (volume) inflammable air এর সাথে একভাগ fire-air মিশিয়ে এবং বৈদ্যুতিক উপায়ে তাদের মিলন সংঘটন ক'রে জল তৈরী করলেন, তখন জল যে একটা যৌগিক পদার্থ এতে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। Lavoisier এ কারণে inflammable air এর নাম দিলেন হাইড্রোজেন বা জল তৈরীর মশলা। বাতাস যে একটা মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ নয়, বরং Nitrogen (নাইট্রোজেন) (78.06%) Oxygen (অক্সিজেন) (21%), Argon (.94%), Neon, Helium, Xenon, Krypton, Carbon dioxide, জলীয় বাষ্প--এ সব কিছুর মিশ্রণে গঠিত, ধীরে ধীরে এ সত্য প্রমাণিত হলো। যে সব যৌগিক পদার্থ ইতিমধ্যেই জানা ছিল, সেগুলো বিশ্লেষণ ক'রে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হ'তে লাগলো। Inorganic Chemistryর এ অধ্যায় দীর্ঘ ও সুবিন্যস্ত। মোট কথা, ক্ষিত্যপতেজঃ মরুদ্ব্যোমের স্থানে ১৮৭০ সালের কাছাকাছি যে লিষ্টি খাড়া করা হল, তাতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭০এর উর্দ্ধে। Mendeleff ও Meyer তাদের ওজন ক্রমে লাইন বন্দী করলেন; তার উপর তাঁরা নতুন আরও গোটা দশেক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। এদের মধ্যে তিনটি পরপর আবিষ্কৃত হলো, নিষ্কর্মা গ্যাস্ --Argon, Helium, Krypton, Neon ও Xenon ধরা পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৭। এদের সব চাইতে লঘু তিনটার নাম হচ্চে Hydrogen, Helium ও Lithium, এবং সব চাইতে ভাবী তিনটীর নাম Radium, Thorium ও Uranium. Hydrogen ওজনে বাতাসের চাইতে প্রায় ১৪ গুণ লঘু; Uranium, Hydrogen এর তুলনায় ২৩৮.৫ গুণ ভারী।

মৌলিক পদার্থের তালিকা থেকে বোঝা দেখা গেল যদি হাইড্রোজেন পরমাণু (atom)র ওজন একক, অথবা অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৬ ধরা হয়, তবে অন্য প্রায় সবগুলির ওজনও integer বা তার কাছাকাছিতে দাঁড়ায়। এ মিল এত স্পষ্ট যে, আকস্মিক বলে এমন ব্যাপার ছেড়ে দিতে রাজী না হয়ে পণ্ডিতগণ শতবর্ষের কাছাকাছি গরম ঝগড়া করলেন,--হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন সংযোগে অন্যান্য পদার্থের উদ্ভব হয়েচে কি না--এর উত্তর নিয়ে। অবশেষে যে সব সুচিন্তিত প্রমাণের* উপর নির্ভর ক'রে এ প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তরে সবাই রাজী হলেন, তাদের অধিকাংশ অতি আধুনিক; আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তবে Aston ও Einstein এর সিদ্ধান্ত দুটি মোটামুটি উল্লেখ করা যায়। Astom ১৯১৯ সনে প্রমাণ করলেন, একই রাসায়নিক গুণসম্পন্ন মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন নমুনার ওজন কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অক্সিজেন-এর ওজন ১৬ ধরলে Neon- এর ওজন হয় ২০.২। তিনি দেখালেন, এ পদার্থের ২০ ও ২২ ওজনের দু'রকম নমুনার এমন এক মিশ্রণকে আমরা Neon বলি (অর্থাৎ, প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় যে রকম পাওয়া যায়) যার গড় ওজন হয় ২০.২। অর্থাৎ নয় ভাগ ২০ ওজনের নমুনার সাথে মিশে থাকে একভাগ ২২ ওজনের নমুনা। এ রকম Chlorine ৩৫.৪ হ'ল ৩৫ ও ৩৭ ওজনের দু'নমুনার সমষ্টি; Krypton (৮৩) এর বেলায় এমন ৭৮ থেকে ৮৬ পর্য্যন্ত ওজনের ছয়টি নমুনার প্রমাণ পাওয়া গেচে। এরপরের একটু যা গরমিল, Einstein দিলেন তার নিপুণ এক সমাধান, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত theory

* Evidences in favour of the Unitary theory --
1 Atomic weights approximate to whole numbers.
2. Groups of elements exhibit family-relationships
3 Closely related elements are often found associated together in nature
4 From grouping of the spectral lines
5 From magnetic perturbation of the spectral lines.
6 From phosphorescent spectra of the meta-elements.
7. From spectra of the stars and nebulae.
8. From electric discharges in attennuated gases.
9 From Radio-activity.

of relativity থেকে। ব্যাপারটি এই : অক্সিজেন-এর ওজন যদি ১৬ ধরা হয়, তবে হাইড্রোজেন-এর ওজন দাঁড়ায় ১০০৮ যোলটা হাইড্রোজেন কণার সংযোগেই যদি অক্সিজেন কণার উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে এর ওজন আরও অধিক নয় কেন? Einstein বললেন, হাইড্রোজেন এর যোলটা কণা একীভূত হতে যে শক্তি (energy) মুক্তিলাভ করে, অক্সিজেন কণা থেকে তার ওজন বাদ পড়ে যায়। তাঁর দেওয়া জটিল গাণিতিক প্রমাণ বৈজ্ঞানিক সমাজকে মেনে নিতে হয়েছে, এবং এ নিয়ম অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থের বেলায় খাটিয়েও সুফল পাওয়া গেছে।

আমাদের বস্তুজগৎ সৃষ্টির মূল কথা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এই : পৃথিবী গঠিত হ'বার বহু বহু বহু বছর পূর্ব্ব থেকে শুধু এক প্রকার প্রাকবায়বীয় (protyle) পদার্থ শূন্যে ভেসে বেড়াতো, যার তাপ ছিল যে কোনো পার্থিব বস্তুর উত্তাপের চাইতে অনেক অনেক বেশী। ক্রমে সে protyle শীতল হ'তে হ'তে ঘনীভূত হয়, আর তার থেকে নানা প্রকার বস্তুকণার সৃষ্টি শুরু হয়। হাইড্রোজেন জন্মলাভ করে সর্ব্বপ্রথমে, তারপর helium। পরে পরে অধিকতর জটিল পদার্থাবলীর সৃষ্টি হতে থাকে। সর্ব্বশেষে জন্মগ্রহণ করে সব চাইতে অধিক জটিল পদার্থ uranium. কিন্তু radium, thorium, uranium এর জন্য এ পৃথিবীর আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর নয়; তাই তারা এখানে অস্থায়ী। তারা যাচ্ছে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে, তাদের লাশ থেকে জন্ম নিচ্চে, আরও লঘুতর পরমাণুর দল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিজ্ঞানের উপর দিয়ে যে বিপুল বিপ্লব-বন্যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার কিছু কিছু বুঝতে হলে রাতারাতি আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি অনেকটা বাড়িয়ে তুলতে হবে। বিদ্যুতের সাথে বিজ্ঞানের নবতর ও ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ই এ বিপ্লবের মূল। তড়িৎকুণ্ডের (cellএর) দুই মেরু (poles) কোনো ধাতব-তারের সাহায্যে সংযুক্ত করা মাত্রই যোগমেরু (+ve pole) থেকে বিয়োগমেরুর দিকে তড়িৎ-প্রবাহের (current) সৃষ্টি হয়। এই ধাতব-সংযোগে একটু ফাঁক পড়ে গেলে সাধারণ অবস্থায় তড়িৎ সে ফাঁক লাফিয়ে পার হ'তে পারে না। কিন্তু, একটী কাচের টিউবে অতি সামান্য চাপে (pressureএ) কোনো গ্যাস্ আবদ্ধ ক'রে যদি তার দুই প্রান্ত শক্তিশালী তড়িৎকুণ্ড-অবলম্বী দুই মেরুর সাথে সংযুক্ত করা হয়, তা'হলে সে গ্যাসের মধ্যে সুন্দর এক প্রকার আলোক-কণা ও তরঙ্গপুঞ্জ বিকীর্ণ হ'তে দেখা যায়। গ্যাসের চাপ আরও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিলে, বিয়োগ মেরু থেকে আলোকরশ্মি সরল রেখায় প্রসারিত হ'তে থাকে। Sir W. Crookes এ রশ্মি নিয়ে বহু পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করলেন, এ এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার মিছিল। বিভিন্ন গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলে এ সময় থেকে বৈজ্ঞানিকগণ ভাবতে শুরু করলেন, যাকে আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ বলি, তাকেও বিদ্যুতের অবিভাজ্য কণা-সমষ্টির প্রবাহ বলে মনে করা যায়, যেমন অতি ক্ষুদ্র জলকণার সমাহারেই জলস্রোত। তা হ'লে জলের অণুর ন্যায় বিদ্যুতেরও একটা নৈসর্গিক একক (unit) থাকতে পারে, যাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা চলে না। Prof Stoney ১৮৯১ সনে এই আন্দাজী বিদ্যুৎ-কণার নাম দিলেন electron (বিদ্যুতিন্)। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ বিজ্ঞান-জগতে একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বছর Rontgen বিশ্ববিখ্যাত রঞ্জনরশ্মি (x-rays)-র আবিষ্কার করেন। এই বছরই স্যার জে জে টমসন, Perrin-র ও [illegible]দের বহু গবেষণার ফলে ঘোষণা করলেন, বিয়োগ-মেরু থেকে যে বস্তুকণার মিছিলের (cathode ray-এর) উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঋণাত্মক (-ve) বিদ্যুৎকণা বই নয়। তিনি দেখালেন যে অবস্থাতেই হোক্ না কেন, প্রত্যেকটী বিদ্যুৎকণায় যে পরিমাণ তড়িত সঞ্চিত থাকে (charge 'e') বিদ্যুৎ কণার ওজন দিয়ে তাকে ভাগ করলে ফলে সব সময় একই সংখ্যা পাওয়া যায়। বিয়োগ-মেরুতে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার ক'রে, কাচের টিউবে বিভিন্ন গ্যাস আবদ্ধ ক'রে এবং তড়িৎশক্তি (voltage) বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োগ ক'রেও এ ভাগফলে কোনো পরিবর্ত্তন পাওয়া গেল না। আরও দেখা গেল, যে কোনো পদার্থ থেকেই এ সব বিদ্যুৎকণা নিষ্কাশন করা যায়; অর্থাৎ সব পদার্থেই এর অবস্থান। এই ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণাকেই বলা হয় electron। এর পরিচয় আরও একটু জেনে রাখা ভাল : ওজন অতিশয় নিপুণতার সাথে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ($\frac{১}{১৮৪৫}$) অংশ, ৯×১০ গ্রাম্ বা ৮×১০^{২২} তোলা, অর্থাৎ একের পিঠে উনত্রিশটী শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, আটকে সে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত হয় তত তোলা। কার্য্যতঃ এ ওজন গণনায় ধরা হয় না। গোলকাকার (spherical) মনে করলে, এর ব্যাসার্দ্ধ হয় ১.৯×১০^{১৩} সেন্টিমিটার, বা প্রায় ৭.৫×১৪^{১৪} ইঞ্চি; পরমাণু (atom)-র ব্যাসার্দ্ধের প্রায় ($\frac{১}{৫০,০০০}$) অংশ। Lord Kelvin-এর আণবিক আকার (size of the molecule) সম্বন্ধে মোটামুটী

আন্দাজ থেকে electron এর আকারেরও একটী আভাষ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একবিন্দু জলকে যদি পৃথিবীর সমান কল্পনা করা হয়, তবে এক একটা অণুর আকার প্রায় ক্রিকেট বলের আকারে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলেন, একের পিঠে আঠারোটী শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, সেই সংখ্যক অণু (অতএব তার ৫০,০০০ গুণের অধিক electron) সূক্ষ্মতম সূচীর অগ্রভাগে সহজে আস্তানা হতে পারে। এ সব গণনা অবশ্য বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয়; electron এর সব ব্যাপার হিসাব করা হয় তার তড়িৎ সমাবেশের (Charge-এর) অনুপাতে।

x-ray আবিষ্কারের পরে Bequerel ও Curie দম্পতি মহাউদ্যমে লেগে গেলেন, প্রাকৃতিক মূল পদার্থ সমূহের মধ্যে এ ধরণের আলোক-বিকীরণকারী কোনো বস্তু আছে কি না, সে পরীক্ষায়; ফলে uranium ও thorium এর সে গুণ ধরা পড়লো, radium-এর আবিষ্কার হলো এবং বিজ্ঞানের একটা অপূর্ব সম্ভাবনাময় অধ্যায়- radio-activity- বেড়ে গেল। কুরী দম্পতি প্রমাণ করলেন, এ শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থ অন্য লঘুতর পদার্থে প্রতিনিয়তঃ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে রূপান্তরিত হচ্চে। যে তিন প্রকার রশ্মিবিকীরণের ফলে এ পরিবর্তন সাধিত হয়, তাদের নাম দেওয়া হলো : আলফা , বিটা- , এবং গামা--, রশ্মি। আলফা--, রশ্মি-কণা পরীক্ষা ক'রে জানা গেল, আকার এর পরমাণুরই মতো, ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ঠিক চতুর্গুণ অর্থাৎ helium পরমাণুর সমান, এবং electron-এ যে পরিমাণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অবস্থিতি করে, এতে তার ঠিক দ্বিগুণ ধনাত্মক বিদ্যুতের অবস্থান। Helium পরমাণু থেকে দুইটি electron তাড়িয়ে দিলে বাদ বাকী যা দাঁড়ায়, এ যে ঠিক তাই, এ সত্য আমরা পরে নিঃসন্দেহ জানলাম। আরও জানতে বাকী রইলো না যে, বিটা রশ্মি-কণা এবং electron এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। অতএব আমরা দেখতে পাই, কোনো radio-active পদার্থ থেকে যদি একটা আলফা particle ছুঁড়ে পড়ে, তার ওজন হয়ে যায় ৪-unit কম, সাথে সাথে তা রূপান্তরিত হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদার্থে, যদি বিটা--, কণা ছুঁড়ে পড়ে, তবে ওজন কমে না বটে, কিন্তু বস্তুর পরিবর্তন হয়েই যায়। মনে রাখা দরকার, এ পরিবর্তন সাধিত হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে, অতএব বাহ্যিক কোনো উপায়ে এ পরিবর্তন দ্রুত সাধিত করা বা প্রতিহত করা যায় না। Alchemistরা তামাকে সোনায় পরিণত করার বিফল সাধনাতেই নাকি রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন; প্রকৃতি কিন্তু দুনিয়ার সব চাইতে মূল্যবান ধাতু radiumকে পর্যবসিত করেছেন সীসক-এ। uranium কি করে যে নিজের বিনিময়ে অপরাপর পদার্থের জন্ম দিচ্চে তার একটি লিষ্টি প্রত্যেকটী পরিবর্তিত বস্তুর আয়ুর গড় সহ নীচে দেওয়া গেল :

রেডিয়াম পরিবার ও তাহাদের আয়ুর গড়

হাইড্রোজেন পরমাণুর কম ওজনের কোনো ধনাত্মক বিদ্যুৎকণার পরিচয় পাওয়া যায় নি, তার উপর সব ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণার ওজন এর multiple কিন্তু যে হেতু প্রত্যেক স্থায়ী পরমাণুই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ (electrically neutral), হাইড্রোজেন পরমাণুকেও একটী ধনাত্মক এবং একটী ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার (electron এর) সমবায় হ'তেই হবে। আবার যেহেতু electron-এর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের প্রায় দু'হাজার ভাগের এক ভাগ, অতএব পরমাণুর সবটা ওজন তার ধনাত্মক বিদ্যুৎকণারই গুণ বললে ভুল হয় না। এ থেকে কেউ কেউ বলেন, আমরা যাকে 'ওজন' বলে জানি, তা প্রকৃত পক্ষে ঘনীভূত ধনাত্মক বিদ্যুৎসমষ্টি বই নয়। Lord Rutherford এই ধনাত্মক কণার নামকরণ করলেন Proton, এই Protonই তা'হলে সব ওজনের অবিভাজ্য অংশ। বস্তু ও বিদ্যুৎ–যে দু'টো জিনিসকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ বরাবর বিভিন্ন মনে করে এসেছেন,--আমাদের কাছে তা' হলে দাঁড়াচ্চে একই মূল জিনিষের দুই ভিন্ন রূপ।

আগেই বলা হয়েছে, Mendeleeff সব মৌলিক পদার্থকে ওজন-অনুসারে লাইন বন্দী করেছেন। হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে এদের ক্রমিক সংখ্যাকে আণবিক নম্বর (atomic number) বলা হয়। Rutherford এর থিওরী অনুসারে, পরমাণুর কেন্দ্রে (nucleus-এ) যতটা proton ও electron একীভূত (compact) অবস্থায় থাকে তাদের বিয়োগফল আণবীক নম্বরের সমান। Helium-এর উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটী পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্। Helium-এর ওজন হাইড্রোজেন-এর চারিগুণ এবং আণবিক নম্বর দুই। অতএব চারিটী Proton ও দুইটী electron নিয়ে Helium কেন্দ্র, যেহেতু চারের থেকে দুই বাদ দিলে বাকী থাকে দুই। কিন্তু বিদ্যুৎ- নিরপেক্ষ হ'তে হলে helium-এর electron-এর সংখ্যাও চার হতে হবে। সুতরাং বাকী দুই electron helium কেন্দ্রের বাইরে রয়েছে। Thomson, Sommerfield, Bohr, Rutherford

প্রমুখ এ শতাব্দীর নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানবীরদের গবেষণার ফলে প্রকাশ পেয়েছে, এ সব বাইরের electron কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার পথে অতি দ্রুত ঘুরচে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ যেমন ঘোরে সূর্যের চারদিকে। Lithium এর ওজন সাত, আণবীক নম্বর তিন; অতএব এর কেন্দ্রে আছে সাতটী proton ও চারিটী electron, এবং বাইরে ঘুরচে তিনটী electron।

Bohr ও Thomson, Planck-এর প্রসিদ্ধ Quantum theory প্রয়োগে প্রমাণ করলেন, Nucleus-এর চারিদিকে electron-রা যে সব পথে ঘোরে, সে সব বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার পথের প্রথমটিতে দুইটীর বেশী electron থাকতে পারে না এবং দ্বিতীয়টিতে আটটীর বেশী electron থাক্‌তে পারে না। এরকম তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ orbit-এর জন্যও Thomson নির্দ্ধারিত সংখ্যক electron-এর ব্যবস্থা করেচেন। এ হিসাব থেকে দেখা যায়, যে মৌলিক পদার্থের বাইরের electron-এর সংখ্যা দুই বা দশ (৮+২), তাদের বৃত্ত সম্পূর্ণ এবং তারা অন্যান্য পদার্থের সাথে সংযুক্ত হ'তে পারে না। এ দুটী পদার্থ যথাক্রমে helium ও neon--দুইটী নিষ্কর্ম্মা গ্যাস। Lithium-এর প্রথম orbit--দুটী electron সমাবেশের পর, দ্বিতীয় orbitএ থাকে মাত্র একটী; অতএব সে এই electronটী ত্যাগ করে, বা অন্যান্য পদার্থ থেকে সাতটি electron কেড়ে এনে যৌগিক পদার্থে পরিণত হতে পারে। Carbon এর ওজন বারো, আণবিক নম্বর ছয়। অতএব তার দ্বিতীয় orbit-এ electron-এর সংখ্যা চার এবং চারটি electron গ্রহণ করে' বা চারটী electron ত্যাগ করে' সে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব আমরা দেখ্‌চি, পরমাণুর সব-চাইতে বাইরের বৃত্তপথে electron-এর সংখ্যার উপরই নির্ভর করে পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ। Nucleus-এর বিভিন্ন সংখ্যক proton-কে পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব থেকে বাঁচিয়ে একতা সূত্রে আবদ্ধ রেখেচে nucleusএর অন্তর্নিহিত electronরা। সমমেরুর (like poles) পরস্পর বিদ্বেষ ও অসমমেরুর (unlike poles) পরস্পর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের ন্যায়ই একটী বিশ্বজনীন নিয়ম। এ নিয়মের প্রসাদেই, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার পরস্পর আকর্ষণ আমাদের বস্তু-জগতকে স্থায়ী করে' রেখেচে। হাজার কথা জেনেও কিন্তু এ মূল নিয়মের গোড়ার খবর আমরা জানি নি। Russell বলেন : "We know very little and yet it is astonishing that we know so much, and still more astonishing that so little knowledge can give us so much power".

Sir Oliver Lodge বলেন : "I believe the universe to be a majestic reality far above our present comprehension, and that it is ruled over by a fatherly power whose name is Love".

সবের শব

আবুল ফজল বি-এ, বি-টি.

—গল্প—

যে মেয়েটীকে নিয়ে এই গল্পের অবতারণা তিনি হচ্ছেন এম-এ পাশ। এই গল্পে তাঁর আসল নাম প্রকাশ ক'রে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের লজ্জিত করতে চাই না। ব্যাকরণের দিক থেকে কোন আপত্তি যদি না হয়, তাঁকে এ-মাই বলা যেতে পারে--। যাক্ এ-মা,--তাঁর ভক্তরা হয়ত রাগ করবেন, মিস্ এ-মাই বলি, কৃতিত্বের সহিত-ই এম-এ পাশ করেছেন। বি-এ অনার্সের পরীক্ষায় তিনি যখন ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হলেন তখন দেশব্যাপী যে সেন্সেসন্ প'ড়ে গেল, সেই সেন্সেসনের প্রজ্জ্বলিত আগুনে আমার আণ্ডার গ্রেজুয়েটীয়ানা বালক-মনও পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে না পড়ে' পারে নি। সে থেকে মিস এ-মা ও তাঁর স্মৃতি-সৌরজগতে আমার ঘোরা ফেরা চলেছে অনেক দিন। প্রেমে পড়েছিলাম বল্লে মিথ্যে বলা হবে, কারণ এক ডিগ্রী ছাড়া প্রেমে পড়বার তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছুই ছিল না--এখনো নেই। তবে প্রেমে না পড়লেও প্রেম নিবেদন কম করিনি--কত ক'রে তাঁকে বুঝাতে চেয়েছি : প্রেম-ই হচ্ছে দেহ-মনের শাশ্বত ধর্ম্ম--নিস্প্রেম হওয়া মানে অমানুষ হওয়া। শেষে রাগ করে' এই পর্য্যন্ত বলেছি যে, বই পড়তে পড়তে বউ হবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তোমার লোপ পেয়েছে।--ডিগ্রী আর যাই ভাল করুক, প্রেম করার সহজ শক্তিটুকু নষ্ট করে' তোমাকে একেবারে বিশ্রী বুড়ী বানিয়ে ছেড়েছে। এত বড় আঘাতের উত্তরেও সে মেয়েদের নরম হাসি হেসে উত্তর দিয়েছে : উচ্চ শিক্ষা আর যাই ক্ষতি করুক, আমাকে প্রেমে immune করেছে,--অশিক্ষিতা ও অর্দ্ধ শিক্ষিতা মেয়েদের মত যখন তখন যার তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার মেয়েলী ভাব কাটিয়ে উঠেছি। এর উত্তরে তর্ক করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি; পৃথিবীর কল্যাণ, সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের নজীর উত্থাপন ক'রেছি; কিন্তু মিস্ এ-মা এক ফুঁয়েই সে-সব উড়িয়ে দিয়েছেন। বিয়ের কথা উত্থাপনে যে-সব উত্তর তাঁর মুখ থেকে বেরোয় তা শুন্‌লে মনে হয়, এই মাত্র তিনি জষ্টিস ম্যাক্‌কার্ডির রায় প'ড়ে এসেছেন।

মিস্ এ-মাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই;--তবে সে নেহাৎ সুবিধার খাতিরে, সাংসারিক প্রয়োজনেই; --তাতেই অ-প্রয়োজনের অর্থাৎ প্রেমের কোন তাগিদ ছিল না। মেয়েরা পাস করে, লেখাপড়া শিখবার জন্যে তো নয়--হয় বিয়ের জন্য, নয় চাকরীর জন্য। মিস্ এ-মার বিয়ের প্রতি অভক্তি আছে, চাক্‌রী নিশ্চয়ই করবেন,--আর এখন চাক্‌রীর বাজার যা হয়েছে তাতে মেয়েদের ছাড়া পুরুষদের ত চাহিদাই নেই,--কোন প্রকারে যদি রাজী করাতে পারি, আমার দিনগুলো বেশ বিনা আয়াসেই কাটাতে পারি--ইন্সিওরেন্স ক্যানভাসিংএর মত নেষ্টী কাজ না ক'রেই হয়ত মিস্ এ-মার চাকরী-ছায়াতলে বসে বসে গল্প ছেড়ে উপন্যাস লেখা শুরু করে দিতে পারি। অনেকেই হয়ত ছি ছি ক'রে উঠ্‌বেন, স্ত্রীর রোজগারে বেঁচে থাকা, ধিক্! তাঁদের এই এক তরফা মতামতের কী আর উত্তর দেওয়া যায়? --আবহমান কাল থেকে মেয়েরা পুরুষের রোজগারে বেঁচে রয়েছে, তা' যদি কিছুমাত্র ধিক্কারের বিষয় না হয়ে থাকে, তবে আমার মত দু'চার জন অকর্ম্মণ্য পুরুষের স্ত্রীর রোজগারে বেঁচে থাকতে কি আর এমন এসে যায়--,

মিস এ-মা বলেন--প্রেম করতে চাও হাজার বার করো, কিন্তু বিয়ের নামে প্রেমের গলায় দড়ি-কল্‌সী পরাও কেন্? নিজেদের গলায় দেবার দড়ি-কল্‌সী কি জোটে না?--

এর একমাত্র উত্তর--দড়ি-কল্‌সী প্রত্যেকেরই জোটে, কিন্তু ডুবে মরবার সাহস প্রত্যেকের থাকে না। মিস্ এ-মা জানেন না যে পরের বই প'ড়ে তাঁর মাথা যদি কতকগুলো আইডিয়ায় বোঝাই না হতো, শতকরা নিরানব্বই জন মেয়ের মত তাঁরও জীবনের চরম ও পরম সাধনা হতো (স্বামী জোটানো) বিয়ে। তবু এই দুই অক্ষরের ছোট্ট শব্দটি উচ্চারণ করতে গেলে অনাবশ্যক মিস্ এ-মার গালে এখনো একটী লাল আভা খেলে যায়--মিস্ এ-মাকে যা একটু সুন্দর দেখায় তা তখনি মাত্র,

অর্থাৎ তখনি মাত্র কোন যুবক offered হলে একটা চুমো খেলেও খেতে পারে। এ হেন মিস্ এ-মার জন্যে মাসে একবার ক'রে আমার জুতোর হাফসোল লাগাতে হয়েছে। কিন্তু মিস্ এ-মাকে কোন দিন বিরক্ত হতে দেখি নি--আমার অজস্র প্রশংসা তিনি হাসি মুখেই শুনতেন। নিজের কাণে নিজের সম্বন্ধে শুনবার এমন অসীম আগ্রহ দেখে আমার মাঝে মাঝে মনে হত, এও একটা মানুষের instinct নয় ত?

বিয়েব বিরুদ্ধে মিস এ মাব সংস্কার আছে, যাক্, তাঁর সেই সংস্কারকে আমিও অশ্রদ্ধা করতে চাইনি। বিয়ের বিরুদ্ধে আমার কোন সংস্কাব নেই, কিন্তু মিস এ-মার মুখে শুন্‌তে শুন্‌তে আমারও এক রকম বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, বিয়ের বৃত্ত-রেখার মধ্যে প্রেমকে ধরে' রাখার চেষ্টা, সে নেহাৎ অক্ষমেরই বৃত্তি এবং প্রেমের রাজ্যে তার চাইতে অস্বাস্থ্যকর কিছুই নেই। তবুও এই ভেবে বিয়েব চেষ্টা করছিলাম যে, মিস্ এ মার সঙ্গে আমাব প্রেমের কোন সম্বন্ধ নেই· আর ছেঁড়া জুতো বদলাবার অধিকার আমার থাক্‌লেও মিস্ এ-মা এম-এ পাশ করেও সে অধিকার থেকে বঞ্চিতা। --ইচ্ছে হয় দূরের বলে বুদ্ধিমান পূর্ব্বপুরুষদেব উদ্দেশে একবার থ্রি চিয়ার্স দিয়ে উঠি।

একদিন মিস্ এ মাব ওয়েটিং রুমে বসে বসে হাই তুলছি। সেগুলের পটাপট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টনেস্ ছড়াতে ছড়াতে মিস্ এ মা এসে ঢুকল। · ও তুমি,--বলে' হাতের বইটি এক রকম আমার মুখের উপরই ছুঁড়ে ফেল্লে। তারপর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চেয়ার ঢুলাতে ঢুলাতে বল্লে--এদেশের আর হ'ল না। বিলেত ফেরৎ আই-সি-এস্ গুলো পর্য্যন্ত এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

আই সি এস্‌গুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাতে কিছু এসে যায় না--কিন্তু এই অভূতপূর্ব পোষাকে মিস্ এ-মাকে দেখে আমাব ত চক্ষুস্থিব! কোথায় বা তার সুন্দব পাখীব বাসা খোঁপা (এই খোঁপার এই যদি সঠিক নাম না হয়ে থাকে এই খোঁপাওয়ালীরা আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা কববেন--দোষ আমাব নয়, আমার গল্প পড়ে আর পরিচিতা ও আত্মীয়ারা তাঁদের যুবতী মেয়েদের আমার সামনে আস্‌তে বারণ করেছেন; আর সকলেই জানেন এই খোঁপা বাঁধেন একমাত্র যুবতীরাই;--কাজেই যুবতী-জীবন থেকে নির্ব্বাসিত জীবনে বিভিন্ন খোঁপার, অলঙ্কারের ও শাড়ী পরার ঢঙের নাম যদি আমি না জানি, তা ক্ষমার্হ নিশ্চয়ই) তার জায়গায় ববড় চুল, গায়ে চায়না সিল্কের সার্ট, পরনেও সাদা সিল্কের পায়জামা, পায়জামা ও সার্টের ইস্তিরীর ভাঁজ এখন শিবদাঁড়া খাড়া ক'রে আছে। দেখেই আমার হাই-টাই সব পগার পার। উৎসাহ ও কৌতূহলের আগুন আমাব শিরায় শিরায় লিক্ লিক্ ক'রে উঠল। আমি যেন এক নতুন গ্রহে এসে পৌঁছেছি। --তাক কাট্‌তে অবশ্য বেশী দেরী হল না। মিস্ এ-মার পুরাতন কথা স্মরণ হল। তিনি মাঝে মাঝে বল্‌তেন বটে--লম্বা কেশ, শাড়ী, ব্লাউজ, এই সমস্ত মেয়েদেব অতি মাত্রায় অবলা সরলা ক'রে রাখে--আজানুলম্বিত কেশদাম, শুনে মেয়েদের বুক নাকি এখনো খুশীতে তোলপাড় করে' ওঠে! শুধু এই? --পটলচেরা চোখ, বাঁশী-মার্কা নাক, মৃণাল বাহু--পুরুষের মুখে সৌন্দর্য্যের এই এক ঘেয়ে উপাখ্যান শুনতে শুনতে নারীর আর বুঝতে বাকী নেই, সৌন্দর্য্যের এই-ই ষ্টেনডার্ড (standard)। তাই নারীর লেখায়ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা এর বাইরে পা বাড়াতে পারেনি। এর পরিণাম এই হল যে, পুরুষের দেখাদেখি নারীও শুধু নারী-সৌন্দর্য্য বর্ণনার বাঁধা গলিতে পায়চারী করতে লাগল। মাঝখান থেকে পুরুষ পুরুষের সৌন্দর্য্যবর্ণনা করল না বলে' পুরুষের সৌন্দর্য্যবর্ণনা বাংলা সাহিত্যে আর হ'লই না। পুরুষের লেখায় পুরুষেব সৌন্দর্যবর্ণনা খুঁজে না পেয়ে নারীও মনে করলে পুরুষ সুন্দর-ই নয়--। যাক্ এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম--মিস্ এ-মাও যে থাম্‌তে জানে সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ!--

আয়নায় নিজের চেহাবা দেখে যদিও হতাশ হয়ে যেতাম, তবু মিস্ এ-মার এই সব কথা শুনে মনটা ভিতরে ভিতরে উৎফুল্লই হয়ে উঠত।

ভাবনা শেষ না হতেই পর্দ্দার বাইর থেকে আওয়াজ এল--মে আই কাম.........। কিছু ইতস্ততঃ করার পর--মে আই কাম্ স্পিনস্টার!

কণ্ঠস্বর শুনতেই বুঝা গেল। --মিস এ-মা সজোরে মেঝেয় পদাঘাত ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, কাম ইন্ মিষ্টার উড্-বি, কাম্ ইন্।

উড্-বি ব্যারিষ্টার ততক্ষণে তাঁর সুবিশাল বপু নিয়ে ঢুকে পড়েছে। Would-be Barrister এর ঐতিহাসিক নাম কখন

যে কোথায় তলিয়ে গেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই- বন্ধু ও পরিচিত মহলে উড্-বি ব্যারিস্টাব ই তার পবিচয়। এই উপাধিতে তার নিজের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই, ববং কেউ উড্-বি ব্যাবিষ্টার ডাকলে মনটা নিজের অজ্ঞাতেই যেন বেশ ফেঁপে ওঠে। উড্-বি ব্যারিষ্টার বি-এ পড়ে, তার উদ্দেশ্য নাকি বি-এ পাশ ক'রে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হওয়া। এই উদ্দেশ্যটা সে এত ঘন ঘন প্রকাশ করে যে তার পরিচিতদের সে যে উড্ বি ব্যারিষ্টার-ই তার পরিচয়। এই উপাধিতে তাব নিজেব কিছু মাত্র সঙ্কোচ নেই, ববং কেউ-ই উড্-বি ব্যাবিষ্টাব, এ কথা ভুলবার আর সুযোগ-ই হয় না। এবং দেখতে দেখতে এব লাঙ্গুলাংশ খসে গিয়ে কখন যে একেবারে উড্ বিতে এসে ঠেকেছে তাও কারো মনে নেই, তাব শরীরটা বেশ মোটাসোটা, পেটেব পবিধি বুকেব পবিধি বুকের পরিধির প্রায় ডবল। গাল দু'খানি এত বড় যে তাতে চুমো খাওয়াব চেয়ে ওকে তাকিয়া করলেই আরাম পাওয়া যাবে ঢেব বেশী। স্বভাব কিন্তু এর বেজায় লাজুক -মিটি মিটি হাসি ছাড়া এর দ্বারা অন্য কোন বসিকতাও সম্ভব, এ কথা মনে হয় না। অন্ততঃ মিস্ এ-মার সামনে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কথা বলতেই তাব গাল দু'খানি সমেত কাণ শুদ্ধ লাল হয়ে ওঠে।

মিস্ এ-মা চট্ করে উড-বি ব্যারিষ্টারের হ্যাট্‌টি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে নিজেব মাথায় বসিয়ে পটাপট ক'রে ক্লাসের ভিতর পায়চাবী শুরু করে দিলে। সামনে বেশ এট্ এটেনশন্ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কবলে কেমন লাগে উড বি?

প্রশ্নটী উড্-বিকে লক্ষ্য করে' বটে—কিন্তু এ-মা এর যোগ্য উত্তর লাজুক উড্-বির থেকে প্রত্যাশা করেনি। তাই প্রশ্ন ক'রে তার চোখ এসে পড়ল আমার চেহারায়। তার চোখে চোখ পড়তেই সেই চোখের আলোতেই যেন হঠাৎ কি ক'রে আমার মনে পড়ে' গেল, আজ ত সেভ্ কবা হয়নি, এই কথা মনে হতে না হতেই চেহারাটি ভয়ানক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। চিবুকের নীচে দাড়ির শক্ত গোড়াগুলিতে বাম হাতের তালু ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বল্লাম-বেশ, ক্রিকেট্ ষ্টারের মত দেখাচ্ছে।

মিস্ এ-মা লাফিয়ে উঠে বল্লে--সত্যি মেয়েদেব একটা ক্রিকেট টীম গঠন কবলে কেমন হয়?

বেশ হয় --টিকেট সেলেব টাকা দিয়ে ভারতবর্ষের বাজেট্ ব্যালেন্সড্ হয়ে যাবে।

--বলছেন বটে, বেশ হয় -কলেজে থাক্‌তে এক ফুটবল টীম করতে গিয়ে কী নাকালটাই না হয়েছি। ফুটবল নাম শুনতেই মেয়েরা প্রথমত সব হেসে গড়িয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল--! শেষকালে আমাকে রাগতেই হল- রেগে বল্লাম equal rights এর কথা উত্থাপন করতে লজ্জা হয় না? যাক্ মিস্ মুখার্জ্জীর তর্জ্জন গর্জ্জনে (মিস্ মুখার্জ্জীর আবার ঘরে বসে কারও তোয়াক্কা রাখি না বলে সংবাদপত্র-রণভূমে নিরীহ পুরুষদেব বিরুদ্ধে তরবারি চালাবার অভ্যাস আছে কিনা) ঠিক হল টীম গঠন করবাব আগে চারটার সময় সবাই মিলে একবার কলেজ কম্পাউণ্ডে খেলা যাক্।

চারটার সময় কলেজ কম্পাউণ্ডে গিয়ে অবাক হতে হল সত্যি--মেয়েরা হাতের চুড়িগুলো পর্য্যন্ত খোলেনি- খোঁপাটা পর্য্যন্ত শক্ত করে বাঁধেনি, শাড়ীর আঁচল আর পিঠভরা চুল উড়িয়ে মেয়েরা ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে, হেসে এ উহার গায়ে ঢলে পড়ছে। আমাকে দেখে তারা যেন, আজকের তোমাদের মত, আকাশ থেকে পড়ল আর কি--! আচ্ছা, বল ত, শাড়ী প'রে ফুটবল খেলা কি উড্-বি সাহেবের কাঁটা-চামচে নিয়ে পুঁটী মাছ খাওয়ার মত নয়? উড্-বি'র ঠোঁটে একখানি নরম হাসি ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

--আমি হাফ্‌পেন্ট পরে' জারসী গায়ে দিয়ে, চুলগুলিকে শিখদের মত টাইট্ করে' ঝুঁটী বেঁধে যেই নেমেছি--সবাই হেসে, আর ছি ছি করে' একেবারে খুন হবার উপক্রম। সেই হাসি আর ছি ছি-র ঝড়ের মাঝে (এমন কি মিস্ মুখার্জ্জী পর্য্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিল) খেলাটেলা সব কোথায় ভেসে গেল। ঐ পর্য্যন্তই। --আর কোনদিন ফুটবলের নামও কেউ মুখে নেয়নি।

বল্লাম--ক্রিকেটের নামও আজ বাদে আর মুখে নেবেন না। মিস্ এ মা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লে--সত্যি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কাজ করার দিন এখনো এদেশে আসেনি;--ভাবছি, যাক্, যা পারি নিজেই করব। যা পারি--এই অত্যন্ত emotional বিনয় মুহূর্ত্তেরই কথা। কিন্তু পরক্ষণে এই দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠে তিনি যা-পারির যে ফেরেস্ত্ দিতে লাগ্‌লেন, তা বলার চেয়ে তিনি যে কি কি পারেন না, তা বলা সহজ। তিনি এমি-জনসন হবেন, প্যাভ্‌লোভা হবেন, গৌরীশঙ্করে আরোহণ করবেন;--অপরের তাঁবে রইবেন না,- প্রয়োজন হলে ইসাডোরা ডানকান হতে তাঁর আপত্তি নেই। শুনে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দোল্লাসিত হয়ে উঠল--ইসাডোরা ডানকান বাংলা দেশে জন্ম নেবে। এই স্বামীত্ব ও সতীত্ব জর্জ্জরিত দেশে ইসাডোরার মত প্রতিভার

আবির্ভাব, আশার আকাশে দুরাশার স্বপ্নের মত হলেও মিস্ এ-মার মুখে আজ এই কথা শুনে মনে হল, মিস্ এ-মাকে একটা নমস্কার করি। উড্-বিও সিগারেট বের করে চোঁ চোঁ টান্‌তে লাগল--উড্-বি'র অতিমাত্রায় আনন্দ প্রকাশের এই-ই নিয়ম।

--কি উড্-বি, মিস্ এ-মা উড্-বির বিরাট গালে বেশ মায়া-পরিপূর্ণ লোভনীয় একটা টোকা মেরে বল্লেন--আমাকে একবার তোমার সঙ্গে বিলেত নিয়ে যাবে?

উড্ বি শুধু একবার ঈষৎ হাসির চেষ্টায় ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে দিলে।

--বাবাকে বল্লাম আমাকে বিলেত পাঠান। তাঁর যেন কানেই গেল না।--আচ্ছা নালিশ ক'রে বাবার কাছ থেকে বিলেতের খরচ নেওয়া যায় না? উড্-বি, আইনের মাথামুণ্ড কিছু বোঝ?

আইনের সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা ঢাকবার সুযোগ পেয়ে বলে বল্লেম—নিশ্চয়ই যায়; বাবা কেন, বাবার চৌদ্দপুরুষ খরচ দিতে বাধ্য।

ডান হাতে টেবিলে কীল্ মেরে মিস্ এ-মা বল্লে--মেয়েকে এম-এ পর্য্যন্ত পড়িয়ে বিলেত না পাঠাবার মজাটা একবার দেখিয়ে দেব নাকি?

--এ দেশের মেয়েরা, পিতৃদ্রোহী হওয়া দূরে থাক, মাসীদ্রোহী হয়ে ইচ্ছামত বিয়েটুকু পর্য্যন্ত করতে সাহস পায় না--আর তুমি বাবার কাছে থেকে বিলেতের খরচ আদায় করবে নালিশ করে! দেখে নেব!

--আমাকে কি সাধারণ মেয়েদের মত মনে করেছ--অন্যের পক্ষে যা অসম্ভব আমার পক্ষে তা সম্ভব, তা কি এত দিনেও বুঝতে পারনি! এক্ষুণি বাবাকে লিখে দিচ্ছি, বিয়ে আমি করব না, সে টাকা দিয়ে হলেও তিনি যেন আমাকে বিলেত পাঠান। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি এর সন্তোষজনক উত্তর না পাই, তবে উকিলের চিঠি দেব, তার পর নালিশ।

উড্-বি হাতের সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ছুঁড়ে ফেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে' ফেল্লে : ইসাডোরার পক্ষে পিতৃখরচে বিলেত যাওয়া লজ্জার্ বিষয়--ইসাডোরা নিজের খরচেই পৃথিবী ভ্রমণ করেন। উড্-বি'র এই সূক্ষ্ম রসিকতায় আমিও হো হো করে হেসে উঠলাম। এ-মা উড্-বির গালে আর একটী মধুর টোকা দিয়ে বল্লে--ভিতরে ভিতরে দেখছি একেবারে রসের অতলান্ত?

তবুও মিস্ এ-মা উড্-বি'র এই খোঁচায় লজ্জা পেল। হঠাৎ এ-মা টেবিলের উপর থেকে বইটি (যে বইটী প্রথম ঢুকে আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল) উঠিয়ে নিয়ে বল্লে—এদেশের আর হল না, বিলেত ফেরৎ আই-সি-এস্ গুলো পর্য্যন্ত এমন গোঁড়া! জিজ্ঞেস করলাম--কেমন?

--দেখ না, এই এক আই-সি-এস্ লিখেছেন-- ইউরোপের মেয়েদের ভারতের জননী হবার জন্য বাধ্য করতে হবে। আর দুর্ব্বলতা বশতঃ এইটুকু বল্‌তে পারেনি যে ইউরোপের পুরুষদের ভারতের জনক হবার জন্যও বাধ্য করতে হবে; না হয়, এদেশের মেয়েগুলো কি বন্ধ্যা হয়ে থাক্‌বে নাকি? --আর, জনক হওয়া আর জননী হওয়া যে একেবারে একই ব্যাপার, এইটুকু এক আই-সি-এসের মাথায়ও আসেনি। অথবা পুরুষ তিনি, সনাতনী অথর্ব্বদের মত পুরুষ অন্য জাতে বিয়ে করলে গৌরবানুভব করা, মেয়েরা অন্য জাতে বিয়ে করলে লজ্জিত হওয়া, মেয়েদের সম্বন্ধে এই Property মনোভাব হয়ত এড়াতে পারেন নি। পুরুষেরা ইউরোপিনী বিয়ে করলে ভবিষ্যৎ বংশধর শক্তিমান হবে, আর মেয়েরা ইউরোপীয় বিয়ে করলে হবে না, এ কেমনতর লজিক, --উড্-বি? জেনো, বিয়ে যদি কোন দিন করিও তবে বিলেতীই করব,--কি বল?--তুমি ত ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে মেম নিয়ে আস্‌বে একটা, কেমন?

চেয়ারে সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে উড্-বি হতাশ ভাবে বল্লে—না রে বাবা, এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে শ্বেতহস্তী পোষা আমার কাজ নয়।

--তাহলে তোমার জন্যে একটা ঘোম্‌টা-ঘেরা, নথ-পরা, লাল টুকটুকে বৌ দেখ্‌তে হবে, যার চোখ হবে পটল-চেরা, নাক হবে বাঁশী (ঘুমে যদি বেজে ওঠে, তবে গেছ আর কি) বাহু হবে মৃণাল। --পুত্রার্থে ভার্য্যা, সে কথা মান তো? এরা তোমাকে সে আশায় নিরাশ করবে না -- ।

সবের শব
মাথায় টোপর দিয়ে
উড়্-বি করবে বিয়ে--

ব'লে তার চিবুকটী নেড়ে দিয়ে, এ-মা প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে খুশীর খোশ্‌বু ছড়াতে ছড়াতে বেশ স্মার্টলি টেবিলের চারিদিকে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কাল টুক্‌টুকে হলেও চল্‌বে--উড়্-বি হাসি হাসি ঠোঁটে এইটুকু মাত্র মন্তব্য করলে।

হাতের ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লাম। উড়্ বিও ভদ্রতা ক'রে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু এ-মা, আরে তুমি বস বস--বলাতে সে আবার চেয়ারে ডুবে পড়ল।

মনটা একটু অনাবশ্যক ক্ষুণ্ণ-ই হল; --উড়্-বি মিস্ এ মার সঙ্গ-ছায়াতলে বসে বসে আরাম করবে, আর আমাকে চল্‌তে হবে নিঃসঙ্গতার রৌদ্রে। অন্যকে ছায়ায় বসে থাক্‌তে দেখেও নিজের রৌদ্রে হাঁট্‌তে কষ্ট হয় না, অতখানি যিশুত্ব আমার স্রষ্টা আমাকে দেয়নি। মিস্ এ-মা একটুখানি বসবার অনুরোধও করলে না। পুরুষের সিভাল্‌রী জ্ঞানে ফুল্‌তে ফুল্‌তে আমি বেরিয়ে এলাম।

উড়্-বি'র প্রতি মিস এ-মার করুণাময় patronising বীরজনোচিত নয় বটে, কিন্তু একটী যুবতী নারীর এই মধুময় আচরণ বেশ আবেশময়--এই লোভকে উপেক্ষা করতে হলে বাড়ীতে একটা উর্ব্বশী থাকা দরকার!

উড়্-বি আর নিজেকে নিয়ে মাথার ভিতর ঈর্ষা দ্বন্দ্ব চালাতে চালাতে সন্ধ্যায় মেডেনে ঢুকে জাষ্ট্ আমার সাম্‌নের রো'তে চোখ পড়তেই মনের ভিতর অত্যন্ত নৈরাশ্যের সঞ্চার হল। মিস্ এ-মা আর উড়্-বি পাশাপাশি বসে। এ-মা ডান হাত উড়্-বির চেয়ারের পিঠে রেখেছে বটে, কিন্তু তা উড়্-বি'র কাঁধে এসেও ঠেকেছে। সেদিন বায়স্কোপ দেখা ঐ পর্য্যন্ত-ই? যাক্, তবু টিকিটের পয়সাগুলো জলে ফেলেছি ব'লে আপসোস্ হল না।

কয়দিন ধরে' মনে মনে উড়্-বি আর নিজেকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছি। নিজের মধ্যে অত্যন্ত বিনয়ের সঞ্চার ক'রে নিজের প্রতি নিতান্ত অবিচার ক'রেও নারীর ভালবাসার পাত্র হওয়ার জন্য আমার চেয়ে উড়্-বি'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারিনি। দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে, আর্থিক ব্যাপারে কোন দিকেই উড়্-বি আমার সঙ্গে তুলিত হতে পারে না। তবে কি সেই পুরাতন কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও সত্য রয়ে গেল?--বুদ্ধির আলোর চেয়ে মোহের অন্ধকারই নারী-জীবনে বড় সত্য! বি-এ পাশ, এম-এ পাশ কথার কথা মাত্র--শুধু কপালের সিন্দুর বিন্দু! মশায়, দুঃখের কথা আর কাকে বলি? --লভ্‌লেইন দিয়ে সর্ট কাট্ হওয়া সত্ত্বেও আমি আশ্‌কার দীঘির পাড় দিয়ে কেন আন্দরকিল্লা আসা যাওয়া করি, এই কথাটি একটি মেয়ে বুঝল না;--অথচ মেয়েটিকে কচি খুকী কিছুতেই বলা যায় না,--এবং তার চেহারা, কাপড় পরার ঢং, চুল আচড়াবার কায়দা দেখে তাকে নেহাৎ বেওকুফ বলেও মনে হয়নি! এই মেয়েটীর স্বামী ইয়া মোটা--কিছুমাত্র অলঙ্কার না ক'রে বল্লেও তার রঙকে একমাত্র আল্‌কাতরাই বলা যেতে পারে।--গোঁফগুলো সজারুর কাঁটা বল্লেই হয়--সকালের কামানো মুখখানি বিকেলে দেখলেই মেয়েটির জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে--ঘন তৃণাঙ্কুরের মত দাড়ির আল্‌পিন সারা মুখে ছেয়ে আছে। জানালার পর্দ্দার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে যে মুখখানি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে চাঁদপানা বল্লে হয়ত কবিত্ব করা হয়,--কিন্তু এক ঝলক জ্যোৎস্নার মত সেই ঢলঢল মুখখানির উপরে যে দুটো বড় বড় চোখ, তার অম্লান স্বচ্ছ শ্বেত পটভূমির উপর ঘনকৃষ্ণতারকা বিস্ফারিত ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে--তারি দর্শন লোভে দিনে কয়েকবার অনাবশ্যকও সেই রাস্তা দিয়ে আন্দরকিল্লা যাওয়া আসা করা যেতে পারে। খড়খড়ি নাড়ার শব্দেই বোঝা যায়--সুন্দর চোখের স্নিগ্ধ আলো আমাকে দেখে সরে যাচ্ছে।--আল্‌কাতরা, সজারুর কাঁটা আর আলপিনের কাছে হিমানী-চর্চ্চিত পালিশ করা লাবণ্যময় চেহারার এই পরাজয়, গোটা শতাব্দীর মুখে চুনকালী লেপে দিয়েছে। মহাকবি নাকি এই যুগে জন্ম নেবেন না; নিলে, তিনি এই নিয়ে এই যুগের নব মেঘনাদ-বধ লিখতে পারতেন।

যেদিন আমার দূতী এসে জানালে, মেয়েটী আমার চিঠি না পড়েই জ্বলন্ত চুলায় ফেলে দিয়েছে, সেদিন ভেবেছিলাম,--যাক্, প্রেম-রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি এরকমই : প্রথমে বিমুখতা, অস্বীকৃতি, বাধা ইত্যাদি ইত্যাদি, তারপর.....; কিন্তু তারপর আসার আগেই একদিন খবর পেলাম মেয়েটীর একটী মেয়ে হয়েছে। প্রাচীন মুনিঋষিদের প্রাচীন শাস্ত্র-বাণী : নারীর আত্মা নাই।-

-একদিন নিজের না-বালক মুহূর্তে নারীর champion হতে গিয়ে ইতিহাসের শত নজীর উত্থাপন ক'রে এই পবিত্র শাস্ত্রবাণীর অযৌক্তিকতাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেদিনের অর্ব্বাচিনতা ও বুদ্ধিহীন অনভিজ্ঞতার আস্ফালনের কথা স্মরণ হতেই নিজের প্রতি নিজের করুণায় হেসে উঠ্লাম। নারীর আত্মা নেই--এ-মারও আত্মা নেই। জ্ঞান ও বুদ্ধির আলো তার পথ প্রদর্শক নয়--মোহের অন্ধকারই তার পথের নকীব। নারী এখনো ইভলিউশান স্কেলের এত নীচের ধাপে যে এখনও সে নিম্নস্তরের প্রাণীদের মত বিবেককে বাদ দিয়ে impulse এর জোরেই চলে। আজ কয়দিন ধ'রে এ-সব কথা ভাবতে ভাবতেই দিন যাচ্ছে।

একা একা পথ চল্লে এই বিপদ--পরের (বৌয়ের) চিন্তায় মাথাব্যথার আর অন্ত থাকে না। সেই হতভাগিনী মেয়েটী যদি আল্‌কাতরাকে জ্যোৎস্না ভাবতে পারে--আর কাঁটা কাঁটা দাড়ির খোঁচাকে পুষ্প-স্পর্শ মনে ক'রে খুসী থাক্‌তে পারে, তাতে আমার নাকের নিশ্বাস দীর্ঘ হয়ে ওঠে কেন? তবুও রাত্রি আট্‌টায় পথ চল্‌তে চল্‌তে এই কথাই মনে হল;--আর, কোন নারীর প্রেম-পাত্র হতে পারলাম না ব'লে নৈরাশ্যের বাষ্প জমে জমে ফুটে উঠতে লাগল। চোখে জল এসে পড়ল নাকি, ভেবে বাম হাতে শুষ্ক চোখ মুছে হাত নামাতেই--কার এক কোমল হাত এসে আমার কাঁধে ঠেকল। পিছন ফিরতেই দেখি এ-মা আর উড়্‌বি।

এ-মা বল্লে--আজ কয়দিন ধরে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

উড্-বিকে দেখে যে-ভাবের সঞ্চার হল, তা আর যাই হউক, মোটেও আনন্দের নয়।

বিরক্ত মুখে বল্লাম--উড্-বি থাক্‌তে আমার আবার প্রয়োজন?

--ও ত একটা আস্ত অপদার্থ--ওকে দিয়ে কোনদিন কোন কাজ হয়েছে, দেখেছো।

--আমি ত ভাবছিলাম তোমার সব কাজ উড-বিকে দিয়েই হবে--মোড় ফিরতে ফিরতে বল্লাম।

--অভিমান রাখ--এ আমার কাজ নয়, দেশেরই কাজ।

--দেশসেবার ব্যবসা আবার কবে থেকে শুরু করলে?--দোহাই, পিকেটিং ক'রে লোককে মদ ছাড়াবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

--আরে, পিকেটিং টাঁকেটিং তোমাকে করতে হবে না। দেখছ না, দেশের কতগুলো লোক নিজেদের অবসর অর্থ ও বিদ্যার জোরে দেশের প্রতিনিধি সেজে কতিপয় অর্থ ও বিত্তহারা অসহায় গরীব নর-নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লাগিয়েছে। তাঁদের বড়মানুষী খেয়াল--বেশ্যা ব্যবসাকে দেশ থেকে তুলে দিতে হবে। এঁদের দেখাদেখি যাঁরা বিয়ে করেছেন ও যাঁদের বিয়ে করার সংস্থান আছে, সবাই তাল ঠুক্‌তে লেগে গেছেন। এঁরা, নিজেরা বিয়ে করেছেন বা বিয়ে করার যোগাড় এঁদের আছে, এই মোহে--যারা বিয়ের বাজার থেকে বিতাড়িত বা বিয়ে করার আদৌ সংস্থান যাদের নেই, তাদের দেহেও যে রক্ত মাংস আছে, এই কথা ভুলে গেছেন। গরীবের ঘোড়া-রোগ হয়নি সে ত ভাল-ই?

পরের কথা যে মালুম নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার অভ্যাস মিস্ এ-মার আছে, জানি।

বল্লাম--পরের কথা আওড়িয়ে কী লাভ। নিজে কি করতে চাও, তাই বল।

--রবিবার আলবার্ট হলে সভা করব। তোমাকে তারি যোগাড় ক'রে দিতে হবে।--বাংলদেশে অন্ততঃ লক্ষ মেয়ে এই ক'রে খাচ্ছে--ব্যবস্থাপক সভায় এদের প্রতিনিধি নেই ব'লে বিনা বাধায় এরা এতগুলি লোকের মুখের গ্রাস ও জীবনের সামান্য তৃপ্তিটুকু কেড়ে নেবে?

মিস্ এ-মার কথা শুনে সেদিনের হাততালির জন্যে লজ্জানুভব করলাম। --খামকা ঘুরতে ঘুরতে সেদিন টাউন হলে গিয়ে দেখি নেতা আর নেতীরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে পতিতা মেয়েদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করছে। পতিতা মেয়েরা চুলোয় যাক্--হাততালি দিয়ে একটু inspirationএর উষ্ণতা অনুভব করতে আপত্তি কি,--ভেবে খুব ক'রে সেদিন হাততালি দিলাম; এখন দেখছি হাততালি দিয়ে বক্তাদের কণ্ঠের জোর বাড়ান উচিত হয়নি।

মিস্ এ-মার মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বল্লাম--সে কিছুতেই হতে পারে না। এনিফেলিস্ ধ্বংস না ক'রে এরা আইন ক'রে ম্যালেরিয়া তাড়াতে চায়?

আমার মুখের কথা লুফে নিয়ে মিস্ এ-মা শুরু করলে--আমি ত বার বার বলছি, এদেশের কিছু হবার নয়। বল ত আজ এই লক্ষ মেয়ে যদি ব্যবসা ছেড়ে দেয়, কাল এরা খাবে কি? এদের স্থান-ই বা কোথায় হবে? সমাজ কি এদের জায়গা দেবে? এ দেশের লোকের গড়পড়তা যে আয়--তাতে কি প্রত্যেকে বিয়ে করতে পারে? আইন পাশ হলে-ই কি এদের দেহের প্রয়োজন মিটে যাবে?

বল্লাম--পথে দাঁড়িয়ে এমন বক্তৃতা দিলে আলবার্ট হলের অপেক্ষা না ক'রে সভা এখানেই জমে উঠ্‌বে।

--কোথায় বস্তিগুলিকে একটু Hygienic করে তুল্‌বে, তা না ক'রে এরা আইন করে মানুষকে সতী করতে চায়।

এতক্ষণে উড্-বি মুখ খুল্লে--অতটুকু Humanitarian work-ও ওরা করবে না। আমি জোর ক'রে বলতে পারি, এরপর দেশে kidnapping এর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আর অর্থনীতির ছাত্র হিসেবেও ত দেশের এই দুর্দিনে এতগুলো লোককে বেকার করা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। পুণ্য, নীতি, সতীত্ব ইত্যাদি বড় কথা বিশ্বাস করি--কিন্তু এইসব বড়কে উপেক্ষা ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে,--ইচ্ছে করলে সুন্দর ক'রে-ই বাঁচতে পারে;--কিন্তু পেটের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে মানুষ বাঁচতে পারে না। আগে এদের পেটের প্রয়োজন (Lambএর ভাষায় বল্লে বলতে হয়--The eldest and strongest of the passions,) মিটাবার উপায় না ক'রে এদের ঘর ছাড়া করা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, অমানুষিকও বটে।

এই প্রথম উড্-বি'র এত লম্বা কথা শুনলাম। এ-মা প্রশংসমান দৃষ্টিতে উড্-বি'র দিকে চাইলে এবং উড্-বি থাম্‌তে না থাম্‌তেই আমাকে যেন ক্যান্‌ভাস করা শুরু ক'রে দিলে--সত্যি-ই দেশের জন্য এরা কি কিছুই ক'রেনি? সঙ্গীতে, রঙ্গমঞ্চে, নৃত্যকলায় ওদের দান কি একেবারে উড়িয়ে দেবার? দেশের এই সব শিল্পচর্চ্চায় মেয়েদের কিছু দান করার এই একমাত্র field ছিল--তাও এরা বন্ধ ক'রে দিতে চায়!

বিনীত ভাবে বল্লাম--তুমি এমনি-ই বেশ বক্তৃতা দিতে পার, ডিবেটিং ক্লাবে বার কয়েক প্রাইজও পেয়েছিলে বলে বলেছিলে, মনে পড়ে--আর আমার উপর practice করে কী লাভ। আমি তোমার সব কথা চিরদিন মেনেছি, আজও মানছি। ট্যাক্সী যাচ্ছে, ডাক দিলাম।

সে বলে উঠল--তাহলে আমি নিশ্চিন্ত, তুমি সভার আয়োজন করবে?

--হাঁ, তার জন্যে ভাবতে হবে না। ট্যাক্সীতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্লাম--ওঠ, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে যাই।

এ-মা সুন্দর হাতখানির দুই আঙুলে জড়ানো রুমালখানি দুলিয়ে বলে উঠল,--না, না, গুড্, বাই--আমরা হোটেল থেকে একেবারে খেয়েই ফিরব।

মিস্ এ-মাকে নিয়ে আর কিছু লেখার উৎসাহ আমার নেই--কোন্ ভদ্রলোকেরই বা থাকতে পারে? কাজেই এই গল্পের দৈর্ঘ্য এবার হ্রাস পাবে।

বি-এর ফল বেরুতেই বাবা বল্লেন--চাকুরীর বাজারে যে দুর্ভিক্ষ, বিলেত গিয়ে আইনটা পড়ে আয়--ধার কর্জ্জ ক'রে হলেও খরচ চালাতেই হবে।

একবার ইচ্ছে হল সংবাদটা মিস্ এ-মার কান পর্য্যন্ত পৌঁছে দিই। আবার মনে হল, যাক্, এমি জনসন, প্যাভ্‌লোভাকে বধূ বানিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করতে চাই না--ইসাডোরা ডানকান একটা হলেও জন্মে এদেশের মুখ রক্ষা করুক। আর বিলেত থেকে পাশ সেরে আস্‌তে পারলে বহু মিস্ এ-মার বাবা আমাদের বাড়ীতে হাট্‌তে হাট্‌তে মাসে মাসে-ই হয়ত জুতোর হাফসোল বদ্‌লাবেন।

কাজেই মিস্ এ-মার জগতের সঙ্গে আমার জগতের আর কোন সম্বন্ধ রইল না।

বিলেত দু'বছর ছিলাম, এ দু'বছরে মিস্ এ-মা কি কি রেকর্ড ব্রেক করেছেন তার খবর নেবার সুযোগ ঘটে নি। ইউরোপে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-মা যোগ দিলে, তা জানবার একটু কৌতূহল হয়েছিল বটে, কিন্তু চেষ্টা করেও কোন খবর পাইনি।

ইউরোপের মেয়েদের ভারতের জননী হবার জন্যে বাধ্য করতে হবে--এই সুন্দর কথাটী বিলেত এসেও আমার মনে পড়েছে। তবে বাবা বেঁচে আছেন--সাবধাতে চল্‌তে হবে। বনে যাবার যুগ চলে গেছে বটে--কিন্তু সাবধানে চল্লে অযোধ্যার সিংহাসন না মিলুক, মাসের প্রথমে খরচের টাকা মেলে।

বিলেত থেকে ফিরে এসেছি মাস দুই। মনে করেছিলাম উড্‌-বি, এ-মা দেখা করতে আসবে; দু'মাসেও যখন খোঁজ পেলাম না, তখন ভাব্‌লাম, উড্‌-বি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ডিঙাতে না পেরে হতাশ ভাবে হয়তো মফস্বলের কোন শহর থেকে পশ্চিমে সুপুরী চালান দিচ্ছে; --আর এ-মা প্যাভ্‌লোভার দেশে গিয়ে তার নব-আবিষ্কৃত সাগর নৃত্য দেখিয়ে বাহবা নিচ্ছে

সেদিন বেশ ক'রে বর্ষা নেমেছে। এইমাত্র নিজ হাতে সেভ্‌ করে মুখ হাত ধুয়ে বৈঠকখানায় একা বসে বসে একটি সিগারেট উপভোগ করছি। আর ভাব্‌ছি, কি করা যায়--ইউরোপের মেয়েকে ভারতের জননী করার জন্যে ত নিয়ে এলাম, কিন্তু আর কতদিন তাকে এ-ভাবে মসৌরীতে ফেলে রাখা যায়। --বাবার কাছে কথাটী কিভাবে পাড়ব, এই চিন্তা করছি; হঠাৎ দেখি আমাদের গেট্‌ ঠেলে একটী মেয়ে ঢুক্‌ছে--বেশ মোটাসোটা। কাছে আস্‌তেই চিন্‌তে দেরী হল না--মিস্‌ এ-মাই, তবে আগের থেকে অনেকটা মুটিয়ে গেছেন।

হাত উঠিয়ে বল্লাম--এসো, কেমন আছ? আগা খাঁ প্রাইজের জন্যে কেপ্‌ টাউন প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে না বটে কিন্তু ভাইস্‌রিগেল এয়ার রেসেও ত তোমার নাম দেখলাম না! মিস্‌ এ-মার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম!

বল্লাম--কি, কাঁদছ কেন?

শুধু নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন চল্‌তে লাগল। আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ হলেও প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলাম।

অনেকক্ষণ পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এ-মা কোন প্রকারে বল্লে--উড্‌বি আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

--আপনার বন্ধু উড্‌-বি?--আমাদের সেই উড্‌-বি?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার কান্না যেন আরও বেড়ে চল্ল।

আবার বল্লাম--উড্‌-বি এমন সোজা লোক, সে আপনার কী সর্ব্বনাশ করল?

--নিমকহারাম শয়তান কোথাকার, আবার সোজা লোক! তার পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলেছি, আমাকে এ লজ্জা থেকে বাঁচাও--বাঁচান দূরে থাক, আরও চাকর দিয়ে ঘর থেকে বের ক'রে দিলে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌ছে।

--উড্‌-বিটা একেবারে অসভ্য জানোয়ার হয়ে গেছে নাকি? কি সর্ব্বনাশটা করেছে তোমার আগে খুলেই বল না।

--মেয়েদের ওর চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ আর হতে পারে না। বল্‌তে না বল্‌তে তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগল।

এ-মার অবস্থা দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। বল্লাম--ও-দেশের এমি-জনসন, প্যাভলোভার সর্ব্বনাশ ত কেউ করতে পারে না--তারা ত এমন কারও সঙ্গে দেখা করতে এসে চোখের জলের পাইপ্‌ খুলে দিয়ে বসে না। অত যদি এন্‌টি-কন্‌সেপসন নিলেইত পারতে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লে--আমাকে কি একেবারে বাজারের মেয়ে মনে করেছ?

--সেবার বাজারের মেয়েদের জন্য বক্তৃতার চোটে আলবার্ট হলের দেওয়ালগুলোকে পর্য্যন্ত inspired ক'রে তুলেছিল; আজ বাজারের মেয়েদের জন্য এত ঘৃণা যে!

বাণবিদ্ধ অসহায় পক্ষীশাবকের মত দু'টী মিনতি ভরা চোখ আমার চোখে রেখে বল্লে--তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ত কোনদিন ভুল্‌তে পারব না। ব্লাউজের ভিতর থেকে কতকগুলো চিঠি বার ক'রে ফের শুরু করলে--তোমার এই চিঠিগুলো ত আমার চিরদিনের মেঘদূত। তারপর মুমূর্ষু সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসে মায়ের বুকের ভীরু প্রার্থনা নিয়ে বল্লে--তুমিও ত ইচ্ছে করলে আমাকে এ লজ্জা থেকে বাঁচাতে পার।

বল্লাম--কেন? একদিন আলবার্ট হলে দাঁড়িয়ে যাদের জন্য গলা ফাটিয়েছিলে, আজ তাদেব দলে ভিড়তে এত আপত্তি কেন?

--তুমিও আমাকে এতখানি বাজে মনে কর--একেবারে সাধারণ?

--সাধারণ তোমাকে কোনদিন মনে করতাম না--কিন্তু সাধাবণ মেয়েদের মত চোখের জলের ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে শীকারে বেরিয়েছ দেখে তা ছাড়া তোমাকে কি ভাব্‌ব, ভাবছি।

--যাই হই, সত্যি তোমাকে ভালবাসি।

মসৌরীর চিন্তায় আমার ঘুম হয় না; তা এই ঘ্যানর ঘ্যানর, সত্যি রাগ হল, বল্লাম--শুধু রংয়ের দিক দিয়ে যে কোকিলের সঙ্গে তোমার সাদৃশ্য আছে তা নয়, বুদ্ধিতেও তুমি কোকিলের চেয়ে কম নয় দেখ্‌ছি--কাকের বাসায় ...., যাক্, হাস্‌তে জান একটু হাস. নারীর চোখেব জল কবিদের aesthetic senseকে তৃপ্তি দিলেও আমার কাছে অসহ্য--বিশেষতঃ ইসাডোবা ডানকানের চোখের জল আমি দেখতে চাই না। স্বামী লাভের আগে সন্তান লাভ যদি ঘটে, তাতে এত উতলা হবার কি আছে?

মোহ মদিরাই যাদের সম্বল যুক্তিতে তাদের কি ফল হবে। এ-মা ফুঁপিয়ে আবার কান্না শুরু ক'রে দিলে। যা স্বপ্নেও ভাবিনি, উঠে এসে আমার পা ধরে ফেলে আর কি;--হিমালয়ের চূড়া ভেঙ্গে পড়্‌লে যেই দুঃখ আমারও সেই দুঃখ হল। বল্লাম--তোমাকে যে ভাল না বাসি, তা নয়--কিন্তু বিপদ হচ্ছে ভারতের জননী হবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এক মেয়ে এসে মসৌরীতে আমার অপেক্ষা করছে; আর তুমি ত জানই পুরুষরা দিন দিন উদার হলেও মেয়েরা দিন দিন সঙ্কীর্ণ হ'তে সঙ্কীর্ণতর--সঙ্কীর্ণতম হয়ে উঠ্‌ছে। পুরুষেরা ঘরের বৌ ছেড়ে পরের বৌকে ভালবাসছে--এক মেয়ে ছেড়ে বহু মেয়েব জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করছে; আর মেয়েরা এম্‌নি সঙ্কীর্ণতর হৃদয় যে দুতিন জনে মিলেও একটা পুরুষকে ভালবাস্‌তে পারে না। একবার বলেছি না, মেয়েরা এখনো Evolution Scaleএর একেবারে নীচের ধাপে। চোখের জলেব বন্যায় মিস এ-মাব মুখের কথা কণ্ঠেই আটকে রইল। এক মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ কি করে আমার মনে পড়ে গেল--ও ভাইভে, আমাকে যে এক্ষুণি বেরুতে হবে.....ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

আঁচল দিয়ে চোখ দুটী ভাল করে মুছে, চিঠিগুলো আবার ব্লাউজের বুক পকেটে ঢুকিয়ে মিস এ-মা উঠে পড়ল--তারপর বাইরের কলে ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

মসৌরীব চিন্তা আবম্ভ করবার পূর্ব্বে চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে আব একবার উচ্চারণ করলাম- স্বদেশী ইসাডোরা।

মুক্তি

হুমায়ুন কবির

সংসারের পথে যাত্রী চলি
আমি চলি, তুমি চল, এ বিশ্ব-সংসার চলে
দিবারাত্রি বিরামবিহীন।
অন্ধকারে অকস্মাৎ তিমিরে কখন ওঠে জ্বলি
প্রাণের প্রদীপখানি ক্ষীণ।
প্রথম স্পন্দন তার অভিষিক্ত নয়নের জলে,
শিশু কাঁদে আলোকের প্রথম পরশে
জননীর সর্ব্বঅঙ্গ সর্ব্বহিয়া ব্যথায় বিবশে।
জন্মের প্রথম দিনে ধরণীর মন্দির অঙ্গনে
প্রাণের প্রথম পূজা অন্তরের বেদনা স্পন্দনে।

তারপরে দিনে দিনে
সুখদুঃখ-হাসি অশ্রু-উচ্ছ্বসিত জীবনের ধারা
আপন আনন্দে রাঙি ধরণীর ফলফুল তৃণে
অজ্ঞাত ভবিষ্যপানে চলে বেগে বাধাবন্ধহারা।
জন্ম তাঁর আঁধার গুহায়,
নাহি জানে কোথা তার শেষ
কোন্ অন্ধকারে হবে কোন্ সিন্ধুবুকে নিরুদ্দেশ।
তবু প্রাণপণ বলে চায়
অন্ধকারে জাগাইতে আপনার অন্তরের আলো,
মানসস্বপন স্বর্ণে যতনে সাজালো
প্রাণ-পুষ্পদল
আপনার আকাঙ্ক্ষারে সত্য ভাবি
আপনারে ভুলালো কেবল।

কেবলি কি ভুলাইল আপনার হিয়া
আপন বাসনা দিয়া স্বরগ রচিয়া?
তার মাঝে সত্য কিছু নাহি?
সকল অন্তর ওঠে প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গাহি'।
'নহে নহে, স্বপ্ন শুধু নহে কোন কালে,
মৃত্যুর আড়ালে
সত্য যদি না থাকিত, তবে ক্ষীণ মানুষের হিয়া

মুক্তি

অনন্ত তিমিরে কবে অকস্মাৎ যাইত নিভিয়া।
চতুর্দ্দিকে জড়ের জঞ্জাল,
জীবনেরে চারিদিকে ঘেরিয়া রেখেছে মহাকাল,
অদৃশ্যে অদৃষ্ট বসি' গাঁথে নিত্য নিয়তির জাল।
অন্ধকার প্রেমহীন বিশ্বমাঝে মানবের প্রাণে
যে দীপ্তি ঝলসি ওঠে, স্নেহে, প্রেমে, হাসিরূপে, গানে,
সে কখনো নহে শুধু বস্তুর প্রকাশ,
অজর অমর আত্মা, দেহ শুধু তার জীর্ণ বাস!'

ফুল যায়, লতা যায়, পাতা ঝরি পড়ে ভূমিতলে;
শিশিরের অশ্রুজলে
ধরণীরে সিক্ত করি চলে যায় তিমির রজনী;
প্রভাত নামিয়া আসে আলোকের গাহি জয়ধ্বনি।
দিনান্তে মলিন রবি
সায়াহ্ন-গগনে আঁকি আপনার পরাজয় ছবি--
আনত নয়নে চলে যায়,
বিষাদ ব্যথায়।
যে আভা ফুটিয়া ওঠে অস্তাকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘে
যে হিল্লোল ফাল্গুনের পবনের উদ্দাম আবেগে
মর্ম্মরে কানন ভরি'
আপনারে একবার প্রকাশিয়া চির তরে দেয় লুপ্ত করি'।
জীবনের নির্ঝরিণী আপনারে উৎসারিয়া বেগে
চারিদিকে ঢালি দেয় প্রাণ,
বাক্য, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ মহাশূন্য গর্ব্বে ওঠে জেগে,
দুরন্ত উল্লাসে
বিচিত্র বর্ণের জালে রঞ্জিয়া আকাশে
অনন্ত গহ্বর মাঝে আপনার হারায় সন্ধান
কোন্ শূন্য হতে আসি কোন্ শূন্যে চির অবসান।
শূন্য হতে একদিন না জানি কেমনে
প্রাণের প্রবাহে ভাসি আসিনু ভুবনে,
হেথায় বাঁধিনু গেহ
ভায়ের মায়ের স্নেহ,
বন্ধুর প্রণয় পাশে ভরি' ওঠে ধরণী আলোকে।
মৃত্যুর যে লীলা চলে দিবানিশি তারি অন্তরালে
পড়িল না চোখে।
প্রেম আসি যৌবনের রাজটীকা পরাইল ভালে
কাজল নয়নতলে হেরিনু আগুন জ্বলে
জীবনের অর্থ যেন উদ্ভাসিত হ'ল মোর কাছে
তীব্র আনন্দের ভরে টলে বিশ্ব, দেহমন নাচে।

মুক্তি

পুলকে কখন জাগে নিগূঢ় বেদনা
প্রেয়সী জননী রূপে বহি আনে নূতন জীবন
প্রসব মুহূর্ত্তে তারে করে অভ্যর্থনা
ধরণীর বেদনা বন্ধন।

কে নিষ্ঠুর রচেছিল নিষ্ঠুর বসুধা
কে দিল এ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,
নিত্য পরস্পরে হানি বাঁচিতেছে সব প্রাণী
মৃত্যু জীবনের ভিত্তি, প্রাণ হত্যা করি বাঁচে প্রাণ,
রূপ যত, হাসি যত, গন্ধ যত, রক্তে করি স্নান!
জীবন-তরণী চলে অনিবার বেগে রাত্রি দিন
কোন দূর সিন্ধুনীরে আপনারে করিতে বিলীন।
তরী মাঝে বসি'
সমস্ত হৃদয় মথি একটী ব্যথিত প্রশ্ন উঠিছে নিশ্বসি,
কোথা হতে এসে মোরা কোন খানে ভেসে চলে যাই?
জীবনের দান যদি লভেছিনু কেন তবে আবার হারাই?
নাহি জানি, নাহি চাহি জীবনের অর্থ জানিবারে।
শুধু জানি ধরণীর দ্বারে
প্রাণের খেলায় যদি এসেছি ভাসিয়া,
এ নিষ্ঠুর সৃষ্টি মাঝে রব বাঁচি যে কয়টী দিন,
অন্ধকার উদ্ভাসিয়া
প্রাণের প্রবাহ ঢালি শুধিব মৃত্যুর মোরা ঋণ।
নিষ্ঠুর বন্ধন পাশ বারে বারে করিব লঙ্ঘন
রচিব করুণা দিয়া প্রেম দিয়া প্রীতি দিয়া স্নেহ দিয়া মানস-
ভুবন।
বিশাল বিশ্বের মাঝে নাহি কোন মমতার কণা
চারিদিকে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে শুধু অনন্ত যাতনা
আমরা আনিব সেথা করুণার কোমল সান্ত্বনা।
চলেছে মানবযাত্রী অন্ধকার পথে শঙ্কা ভরে
রোগ শোক দুঃখ সহি বেদনা অনলে দহি'
জন্ম অন্ধ গুহা হতে মরণের অতল গহ্বরে।
পরস্পরে বুকে বাঁধি কহিব ডাকিয়া,
'জানি মোরা সব চলে যায়
ফুল ঝরে ঝরে পাতা, মৃত্যু মাঝে মানুষের হিয়া।
তবু এই ধরণীর সাগর বেলায়
যে নিমেষটুকু রবে জীবন-তরণী,
সে নিমেষ লাগি মোরা দীপ জ্বালি উজলিয়া তুলিব রজনী।
জন্মমৃত্যু-রহস্যেরে নাহি যদি বুঝি
তবু তারি অর্থ খুঁজি খুঁজি

মুক্তি

যে বেদনা জাগে হিয়া তলে,
তারি অশ্রু-সরসতা সিক্ত করি দিবে এই ধরণীরে
পত্রপুষ্পফুলে।
প্রীতির করুণ ক্ষীণ দীপশিখাখানি
অতল আঁধার মাঝে জাগাইবে আশ্বাসের বাণী
তারি ম্লান কম্পিত আলোকে
বাহিব জীবন-তরী এই মর্ত্যলোকে।
মৃত্যু শেষে সত্য যদি থাকে, তবে বুঝিব নিমেষে,
নাহি যদি থাকে, তবে নিমেষে হারায়ে যাব কোন নিরুদ্দেশে।

লণ্ডন, অক্টোবর ২১শে, ১৯২৮

সাত ভাই চম্পা

নজরুল ইসলাম

প্রথম ভাই

—আমি হব সকাল বেলার পাখী।
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠ্‌ব আমি ডাকি'।
সুয্যিমামা জাগার আগে উঠ্‌ব আমি জেগে,
''হয়নি সকাল, ঘুমো এখন''--মা বল্‌বেন রেগে!
বল্‌ব আমি, 'আল্‌সে মেয়ে! ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকল--তাই ব'লে কি সকাল হবে নাক?
আমরা যদি না জাগি মা, কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠ্‌লে গো মা রাত পোহাবে তবে!'
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠ্‌ব পাহাড় চূড়ে,
দেখ্‌ব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মু'ড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়,
বল্‌ব আমি ''ভোর হ'ল যে, সাগর ছু'টে আয়!''
ঝর্ণা মাসি বল্‌বে হাসি, ''খোকন্ এলি নাকি?''
বল্‌ব আমি, ''নইক খোকন, ঘুম-জাগানো পাখী!''
ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলো,
সুয্যিমামা বল্‌বে উ'ঠে, ''খোকন্, ছিলে ভালো?''
বল্‌ব, ''মামা, কথা কওয়ার নাইক সময় আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার!''
রবির আগে চল্‌ব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগ্‌বে সাগর, পাহাড়, নদী, ঘুমের ছেলে মেয়ে!

দ্বিতীয় ভাই

—আমি হব গাঁয়ের রাখাল-ছেলে;
বল্‌ব, ''দাদা, প্রণাম তোমায় ঘুম ভাঙিয়ে গেলে!'
আঁচল ভ'রে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটীরে কোলে ক'রে পার হব ভাই খাল,
বটের ছায়ায় জুট্‌বে এসে রাখাল-ছেলের পাল।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,
ছাতিম তরু ধর্‌বে ছাতা আমার মাথার পরে।

শালের পাতার মুকুট গ'ড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাত্‌বে এনে নবীন ধানের চারা।
গলায় বন-ফুলের মালা; দুল্‌বে ছাতিম-শাখে
কাঁচা রোদের সোনার ঝালর পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
দণ্ড তু'লে বল্‌ব আমি, "ওগো কবদ নদী,
কর্‌ব শাসন এই মাঠে কর না দিয়ে যাও যদি!
এদেশে না ফল্‌লে ফসল, না পেলে ঘাস গরু,
না হাসিলে ফুলে ফলে আমার দেশের তরু,
পাহাড় কেটে পাথর এনে রাখ্‌ব তোমায় বেঁধে,
তোমায় খুঁজে সাগর-মাতা মরবে তোমার কেঁদে!"
বল্‌ব মেঘে, 'জল দিয়ে যাও, আমি রাখাল রাজা,
নৈলে বন্ধ থামিয়ে দেবো তোমার মাদল বাজা!
বজ্র তোমার নেব কে'ড়ে নিবিয়ে বিজ্‌লি-বাতি
রাখ্‌ব বেঁধে তোমার রাজার ঐরাবতী হাতি!"
বনকে ডেকে বল্‌ব, "কানন, শোনো আমার কথা,
ভিড় ক'রে সব নীড় বাঁধিবে সকল পাখী হোথা।
ঝড়কে ব'লো, আমার আদেশ—একটা পাখীর নীড়
উড়ায় যদি, ধ'রে তারে পরাব জিঞ্জীর!"
সন্ধ্যা হ'লে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফির্‌ব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে!

তৃতীয় ভাই

—আমি হব দিনের সহচর।
বল্‌ব, "ওরে রোদ উঠেছে লাঙল কাঁধে কর্!
তোদের ছেলে উঠ্‌ল জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশী,
জাগ্‌ল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ্‌রে, মাঠের চাষী!"
"শ্যাওলা" "হাঁসা" দুই না বলদ দুই ধারেতে জু'ড়ে,
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটীর কাগজ ফুঁড়ে
লিখ্‌ব সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি,
ওপর হ'তে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
ধরায় ডেকে বল্‌ব 'ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল ভরা!
জংলী মেয়ে ছিলে তুমি, ছিলনাক 'ছিরি',
মরুর বুকে থাক্‌তে শুয়ে, ফির্‌তে কানন গিরি।
আমরা তোমায় ধ'রে এনে দিয়েছি ঘর-বাড়ী,
গা ভরা তোর গয়না মাগো ময়নামতীর শাড়ী।
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি ফসল সেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর "বাংলো" তু'লে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্ধ্যা সম যে সুধা তোর এক্‌লা নিয়ে ছিলি,

আমরা নিয়ে সে সুধা তোর বিশ্বে করি বিলি!
বন্য মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজ-রাণী,
ধূলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসন আনি''।

খামার ভ'রে রাখ্‌ব ফসল গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায়-কাতর ভাই গুলিরে আমি দেবো প্রাণ!
এই পুরানো পৃথিবীকে রাখ্‌ব চির তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটীর রাজা!

চতুর্থ ভাই

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাস্‌বে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চল্‌বে আমার বেচাকেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজ্‌রা আমার ''লাল বাওটা'' তু'লে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চল্‌বে দু'লে দু'লে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মাণিক তার
আমার তরী বোঝাই ক'রে দেবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখ্‌বে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজ্‌রানা।
চারপাশে মোর গাং চিলেরা করবে এসে ভিড়,
হাতছানিতে ডাক্‌বে আমায় নতুন দেশের তীর।
আস্‌বে হাঙর কুমীর তিমি--কে করে তার ভয়,
বলব, ''ওরে, ভয় পায় যে এ সে ছেলেই নয়!''
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার আমি বণিক-বীর,
খাজ্‌না জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজী মোল্লামাঝি, নৌ- সেনা ঐ জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধ্‌বে তারা, রাজ্যে আমার এলে।''
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখ্‌ব নাক আর,
বন্যা এনে ভাঙ্‌ব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে নেবো,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো।
বল্‌ব মাকে, ''ভয় কি গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাইত মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব--ঢাক্‌ব মা এ লাজ!''
লাল জহরত পান্নাচুণী মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরাণী।

বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শামসুন্ নাহার বি-এ

শাস্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা

শিশুর শিক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাই : কিছুদিন আগেও ইউরোপের ধারণা ছিল "Spare the rod, spoil the child". আমাদের দেশেও চাণক্য পণ্ডিত বিধান দিয়ে গেছেন,

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্রম্ মিত্রবদাচরেৎ।"

যে শিশু জন্মের পর থেকে শুধু সোহাগ আর স্নেহ-মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, শৈশবের সীমারেখা অতিক্রম করতে না করতেই এক দারুণ হতাশার মুহূর্ত্তে সে সচকিত হয়ে দেখতে পায় যে, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তাকে তাড়না করবার জন্যে লাঠি উঁচিয়ে আছে। বাস্তবিকই আবহমান কাল থেকে আরম্ভ করে দুনিয়াতে এই অসহায় মানব-সন্তানদের উপর কারণে অকারণে যত অত্যাচার হয়েছে, কোনো নিকৃষ্টতম জীবের ওপরও বোধ হয় অতটা হয়নি। এদেশে একটা কথা চলিত আছে, শিশুর যখন প্রথম হাতে-খড়ি হয়, উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে সন্তানের শিক্ষাভার অর্পণ করবার সময় পিতা বলছেন 'আজ থেকে এর হাড়গুলো আমার, আর মাংস তোমার।' নধর বালকটির নবনীতকোমল দেহের শুধু হাড়গুলো ছাড়া অন্য কিছুর উপরে যে পিতামাতা কোন দাবী দাওয়া রাখলেন না, এর অর্থ অতি সুস্পষ্ট।

স্মরণাতীত কাল থেকে যে-মানুষ দুর্ব্বলের ওপর সবলের অত্যাচার নিবারণ করবার জন্যে যুঝে এসেছে, এমন কি ইতর প্রাণীর ক্লেশ নিবারণ করবার জন্যেও যার চেষ্টার অন্ত নাই—আপনার বুকের রক্তে গঠিত শিশুর বেলায় যে তার দয়া মায়ার লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। আরো মজা হচ্ছে এই যে, উৎপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে শিশু শিক্ষার পথে, মনুষ্যত্বের পথে বুঝি অনেকখানি এগিয়ে গেল, এই মনে ক'রে পিতামাতা একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। বাস্তবিকই মানুষের ধারণায় শিশুর শিক্ষা ও উৎপীড়ন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ যে, এ'দুটো জিনিষকে যেন আলাদা করে' দেখাই যায় না। এই আইডিয়ার কারাগৃহ থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য যে সকল মহামানবের চিন্তাশক্তি নিয়োজিত হয়েছে তাঁরা বাস্তবিকই আমাদের নমস্য।

মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন : "Reasonable parents create reasonable child". ঠিক জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই যদি সন্তানের চরিত্রগঠনের জন্যে পিতামাতা যথেষ্ট সতর্ক হন, তা'হলে তার স্বভাবের বক্রগতি অবলম্বন করবার আশঙ্কা খুবই কম থাকে; কাজেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনের কঠোরতা বাড়াবারও দরকার হয় না। বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের সাথে সাথে ছেলে যদি বেয়াড়া গোছের হয়ে দাঁড়ায়, তবে গোড়ার দিকে চেয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, ছেলে নিজে এর জন্যে পুরোপুরি দায়ী মোটেই নয়;—বেশীর ভাগ দায়িত্ব এতে পিতামাতার ও তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির। জন্মাবধি স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় প্রশ্রয় না পেলে স্বাভাবিক সুস্থ সন্তান (Normal child) বেশী বেয়াড়া কখনই হবে না, আর হলেও শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে বাগ মানাবার আশা করা বিষম ভুল।

মনে হয়, শিশুর শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের ব্যাপারে শাস্তি ও কঠোরতার প্রয়োজন অতি কম। তিরস্কার এবং বিরক্তি প্রকাশকেও শাস্তির মধ্যে ধরা যেতে পারে। একেবারে গোড়া থেকেই সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি যদি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়, তা হলে এর চেয়ে বড় শাস্তির দরকার কোন সময়েই না হওয়া উচিত।

ছেলেরা মাঝে মাঝে কোন জিনিষ পাবার জন্যে জেদ করে এবং তার বদলে পায় চপেটাঘাত। কিন্তু তা না ক'রে যুক্তি
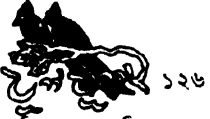
দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে হবে। ছোট ভাই বোন বা সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ছেলের কলহ মীমাংসা করতে গিয়েও পিতামাতাকে প্রথমে যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। তাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, যাদের সঙ্গ তাকে অত আনন্দ দেয়, তাদেরই সাথে নিষ্ঠুর অথবা স্বার্থপরের মত ব্যবহার করা মোটেই ঠিক নয়। মোটের উপর সব সময় তার Reasoning power এর কাছে appeal করতে হবে, যেন সে ধীর ভাবে ভালমন্দ বিচার করবার সুযোগ পায়।

তবে এও সত্যি যে যুক্তি সব সময় কার্য্যকরী হয় না। যুক্তি যখন বিফল হয়, কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা তখন দরকার হতেও পারে। তখন দেখতে হবে, সে-ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব যেন কম কঠোর হয়। চূড়ান্ত শাস্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন : দেখা গেছে ছেলেকে শাস্তিস্বরূপ কোন একটা ঘরে খানিকক্ষণ আটকে রাখলে তাতে বিশেষ ফল হয়; মারধর কিছুই নয়, ঘরের দরজা একেবারে খোলা--ইচ্ছা করলে অনায়াসে সে বেরিয়ে আসতে পারে। - কিন্তু সে যখন বুঝতে পেরেছে যে কোন বিশেষ অপরাধের জন্যে তার প্রতি এ ব্যবস্থা, তখন আর কিছু না ক'রে প্রথম চোটে সে করুণ চীৎকারে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবারই চেষ্টা করবে; তারপরে কান্না থামলে যখন সে বেরিয়ে আসবে, বুঝতে পারা যাবে যে, তার অন্যায়ের জন্যে সে তখন পুরোপুরি অনুতপ্ত।

ম্যাডেম মন্টেসরী তাঁ'র স্কুলে ছেলেমেয়েদের প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন, তা' স্থান বিশেষে অনেক সময় মায়েরা বাড়ীতেও প্রয়োগ ক'রতে পারেন। মন্টেসরী বলেছেন--যে-ছেলে বেশী উৎপাত করে তার উপযুক্ত শাস্তি নির্ব্বাসন; কিন্তু শাস্তি দেবার আগে তাকে ডাক্তার দেখান উচিত যে সে normal child কিনা। যদি তাই হয়, তবে এ ভাবে তার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে · সঙ্গীদের কাছ থেকে তাকে আলাদা ক'রে অন্য ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে হবে এমন ভাবে, যেন সেখান থেকে তার কর্ম্ম-নিরত সঙ্গীদের সে স্পষ্ট দেখতে পায়। বসে বসে সে দেখবে তার বন্ধুরা কেমন মনের আনন্দে খেলছে, কাজ করছে; দেখে দেখে তার লোভ জন্মাবে, দুঃখ হবে সে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে'। মন্টেসরী বলেন : অনেক উদ্ধত ছেলেমেয়েকেই এভাবে শোধরাতে পারা গেছে। এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি হাবভাবেও কঠোরতা প্রকাশ করতে নেই। তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যেন সে বিষম অসুস্থ, তাই তার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা। ইতর প্রাণীর প্রতি বা সমবয়সীদের প্রতি শিশুর নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধানের কথা বলতে গিয়ে রাসেলও ঠিক এই কথাই বলেছেন · নিজেকে অপরাধী মনে করবার সুযোগ তাকে দেবার দরকার নেই; বরং এমন ভাবই জন্মাতে দেওয়া ভাল, যেন নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির রূপ ধরে একটা বড় অমঙ্গল তার এসেছে, আর সে-অমঙ্গলের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্যে পিতামাতা বিশেষ চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। সে যেন বুঝতে পায় যে, তার সাহচর্য্য অন্য ছেলেমেয়েদের পক্ষে নিরাপদ নয়,--এই জন্যে তাকে আলাদা রাখা দরকার। বাস্তবিকই শিশুর যদি নিষ্ঠুর ক্রুর প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখা যায়, তাকে মারধর ক'রে বা কঠিন শাস্তিবিধান ক'রে শোধরান যাবে না। গোড়া থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন নিষ্ঠুরতার বীজ না ঢুকতে পারে। কোমলমতি শিশুর চোখের সামনে যেন কোন রকমের প্রাণী-হত্যা না হয়--এমন কি, সাপ বিছে বা পোকা মাকড় পর্য্যন্ত নয়। যদি বা দৈবাৎ কোন জীবহত্যা তার চোখে পড়ে--ধরুন একটা সাপ--তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে ক্ষেত্রে তা' না ক'রে উপায় ছিল না। ভাই বোন বা বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি তার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় তবে তখনই প্রতিবিধান করা উচিত। সঙ্গীদেরকে যদি সে ইচ্ছা ক'রে আঘাত দেয়, তবে সেই আঘাত তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বোঝান উচিত যে, তার যেমন লেগেছে অন্যদের শরীরেও ঠিক তেম্‌নি লাগে। তার নিজের গায়ে কেউ চিম্‌টি কাটলে সে যেমন ব্যথা পায়, অন্য একজনকে কাট্‌লে সেও ঠিক তেমনি কষ্ট অনুভব করে,--একথা তাকে তখনই দেখিয়ে দিতে পারলে বিশেষ ফল হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ প্রকাশ করা কোন মতেই সঙ্গত নয়। শাস্তি হিসাবে এই ব্যবস্থা না ক'রে এ-ভাবে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যেন সে ধীরভাবে চিন্তা করবার সুযোগ পায়। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই ছোটোখাটো ব্যাপারে এ-ভাবে হাতে কলমে দেখিয়ে দিলে যথেষ্ট ফল হবার সম্ভাবনা।

কোন ছেলেই মার খেতে বা শাস্তি পেতে ভালবাসে না। কিন্তু যখন-তখন চড়টি চাপড়টি যদি লেগেই থাকে, কারণে অকারণে বকুনীরও যদি আর বিরাম না থাকে, তাহলে শাস্তির প্রতি যে একটা স্বাভাবিক ঘৃণা ও ভয়--তা অনেকটা কমে যায়, যার পরিবর্ত্তে আসে একটা বেপরোয়া ভাব;--এই সোজা কথাটা সবাই বোঝেন। এই অগ্রাহ্যের ভাবটা যতই না আস্‌তে

পারে, ততই ভাল;—এজন্যেই শাস্তি সম্পর্কে পরিমিত হওয়া বেশী দরকার। অপরাধ যখন কঠিন হবে, তখন পিতামাতার ব্যবহার থেকে ছেলে যেন তার গুরুত্ব ঠিক ওজন ক'রে নিতে পারে। অনবরত কঠোর ব্যবহার করলে কিন্তু তার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না।

ছেলেবেলায় আমাদের গৃহ-শিক্ষক যিনি ছিলেন, এ-সব ব্যাপারে তাঁর ব্যবস্থা ছিল বড় চমৎকার। শিশুশিক্ষার আধুনিক বই পুস্তক তিনি হয়ত কখনও পড়েননি, ডেন্টেন তিনি জানতেন না, মণ্টেসরীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও হয়ত তাঁর জীবনে হয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশু মনের সাইকলজি যে তিনি কেমন ক'রে অতটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, ভাবলে আজও আশ্চর্য্য হই। এক আধটা কথা এখনও বেশ মনে আছে : আমাদের পড়ার ঘরের এক কোণে একটা waste paper basket ছিল, কোন বিশেষ অপরাধের জন্য চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা যা' হ'ত—তা' ঐ ঝুড়ির কাছে গিয়ে বসা। শাস্তি হিসাবে ধরতে গেলে কিছুই নয়—প্রচণ্ড বকুনি নেই, শারীরিক নির্য্যাতন নেই, কিন্তু ঐ যেখানে ছেঁড়া কাগজের বাস্কেটটি থাকত ঘরের সেই কোণটার জন্যে আমাদের মনে এমনই একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মনে হ'ত ঐখানে বসার চেয়ে বড় অপমান বুঝি দুনিয়ার নেই। আজও মনে পড়ে : 'ঝুড়ির নীচে গিয়ে বস'—ব'লে যখন তিনি হুকুম জারী করতেন, অপমানে, ক্ষোভে, কুণ্ঠায় পা দুটো যেন অচল হয়ে যেত। খানিক দূরে যেতে না যেতেই কিন্তু ভেবে চিন্তে তিনি শাস্তি প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন—অধিকাংশ দিনই এমন হয়েছে; আর বেশী ক'রে ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ঐ শাস্তিটার জন্য আমাদের দারুণ বিতৃষ্ণা আর অপমান বোধ বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছিল।

আর একটা কথা মনে আছে। তিনি থাকতেন বাইরের ঘরে, আর আমরা শুতাম বাড়ীর ভিতরে মায়ের কাছে। তিনি খুব ভোরবেলায় শয্যাত্যাগ ক'রে নমাজ পড়তেন। আমাদেরও প্রাতরুত্থান অভ্যাস করাবার উদ্দেশ্যে তিনি বলে দিয়েছিলেন, দুজনের মধ্যে সকাল বেলা উঠে যে আগে আমার কাছে আসতে পারবে তাকে নমাজের শেষে "কুল্ হু আল্লাহ" পড়ে ফুঁ দেবো। কথাটার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু ছিল না—বকুনি নয়, কড়াকড়ি নয়, "কুল্ হু আল্লা"র ফুঁয়ের জন্যে যে আমাদের খুব বেশী আকর্ষণ ছিল, তাও নয়। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে ভাইবোন দুজনের মধ্যে এই যে একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হল, তার ফলে দুজনেরই ঘুম ভেঙে যেত রাত্রি শেষে। কিন্তু তা'ও মুশ্‌কিল হল এই যে, দুজনের একজনও দরজার ছিট্‌কিনী নাগাল পেতাম না—এমন কি চেয়ারের উপর চ'ড়েও নয়। বাড়ীতে তখন কেউ জাগে নি যে দরজা খুলে দেবে, দুজনেই নিজের মনে বুদ্ধি খাটাতাম কেমন ক'রে দরজা খুলে আগে বেরোনো যায়। তারপরে মাষ্টার সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলে তিনি হয়ত দুজনকেই সেদিন ফুঁ দিয়ে দিতেন। কেমন ক'রে শিশুমনে প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা ও শাস্তির প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ান যায় তা' খুব ভাল করেই জানতেন তিনি। শিশুর মন উন্নত করবার, সৌন্দর্য্যবোধ জাগাবার, শিশুকে নিয়মানুবর্ত্তিতা শেখাবার এমনি ধারা কত শত উপায় জানা ছিল তাঁর। আজ বুঝবার শক্তি হয়েছে—কত সাবধানে, কত পন্থা অবলম্বন ক'রেই না তিনি আমাদের চরিত্র-গঠনের পথে সহায়তা করেছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এ কথা বোঝেন না যে, "ভাল" আর "জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল অবস্থা" একই কথা নয়, evil আর activity এ দুটো ভিন্ন জিনিস। ছেলে পিলের চাঞ্চল্য—যা সজীবতার লক্ষণ—তাতে আমরা বাধা দেবো না যতক্ষণ না সে কোন অভদ্র আচরণ করবে। active discipline জিনিসটা আয়ত্ত করা যতই কঠিন হোক না কেন, শৈশবে যদি সন্তানকে এতে অভ্যস্ত করা যায় তবে এর ফল শুধু বাল্য জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমস্ত জীবনের জন্যে তার চরিত্রগঠনের ভিত্তি পাকা হয়ে গেল, মনে করতে হবে। অর্থহীন শাসনের নমুনা দেখাতে গিয়ে মণ্টেসরী বলেছেন যে, হয়ত বড়দের মধ্যে কেউ কতগুলো জিনিস পত্র গুছিয়ে বাক্সে তুলছেন, আর শিশু হয়ত এগিয়ে এসে তাঁর অনুকরণে সযত্নে গোছাবে ব'লে আস্তে আস্তে জিনিস গুলোতে হাত দিয়েছে, অমনি এল এক প্রচণ্ড ধমক! শিশুর মধ্যে জাগ্‌ছিল যে-কাজ করবার প্রবৃত্তি, এক নিমেষে তা উবে গেল। হয়ত তাতে ক'রে একটা দরকারী কাজ—জিনিস-পত্রের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা—শিখবার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হলো।

কবি সুন্দর বলেছেন—

"পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে ক'রে।"

একেবারে নির্জ্জীব ভাল ছেলে হওয়ার চেয়ে মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের আবেগে চঞ্চলতা প্রকাশ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ছেলে পিলে যদি ছোট খাটো আঘাতও পায়, তাতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। খেলবার সময় বা ছুটোছুটী করবার সময় একটুখানি কেটে গেলে অথবা ব্যথা পেলে, সে বুঝেসুজে নিজেই সাবধান হওয়ার সুযোগ পায়। যতক্ষণ না বেশী বাড়াবাড়ি করতে যাবে, অন্ততঃ পক্ষে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বড়দের হস্তক্ষেপ করবার মোটেই দরকার হবে না।

কুঁড়ি যখন দলের পর দল মেলে অপূর্ব্ব আনন্দ-বেদনায় বিকশিত হ'তে থাকে, তখন তাকে ধূলো কাদায় ফেলে পদদলিত করা যেমন নিষ্ঠুরতার কাজ, তেমনি জীবনের সোনার ঊষায় পারিপার্শ্বিক জগত থেকে রূপ-রস-গন্ধ আহরণ ক'রে শিশু যখন শতদলের মত ফুটে ওঠে তখন পদে পদে তার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে বাধা দেওয়ার মত নিষ্ঠুরতা বুঝি আর নাই। শৈশব জীবনে পরম আনন্দে শিশু নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, শৈশবে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা জিনিস জানবার, বুঝবার শিখবার কৌতূহল যতটা থাকে জীবনের আর কোন সময়েই বোধ হয় অতটা থাকে না। ঐ সময়ে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তাকে শিক্ষা আহরণ করবার যতটা সম্ভব সুযোগ দেওয়া উচিত। 'সদা সত্য কহিবে', 'পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিবে'—নৈতিক শিক্ষা এভাবে না দিয়ে যখনই সুযোগ হবে, হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দিয়ে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দিলে তার বুঝবার ও মনে রাখবার দুটোরই সুবিধা হয়। প্রত্যেক ব্যাপারে যখনই concrete example পাওয়া যাবে, বলতে হবে যে, এ-কাজটা এই কারণে ভাল এবং প্রশংসাযোগ্য, আবার ও কাজটা ঐ কারণে অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ। Deductive প্রণালীতে একটা সাধারণ নিয়ম (general rule) উপস্থাপিত ক'রে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে inductive প্রণালীতে দিনের পর দিন ছোটখাট ঘটনা থেকে একটা সাধারণ সত্য তাকে উপলব্ধি করবার সুযোগ দিলে ঢের বেশী ফল হয়।

আর একটা জিনিস থেকে শিশু যথেষ্ট শিক্ষা আহরণ করে—সে হচ্ছে সংসর্গ। সঙ্গীদের কার্য্য-কলাপ যদি ভাল হয় তবে তার বিপরীত ব্যবহার করতে শিশুর বিবেক-বুদ্ধি নিজেই লজ্জিত হবে। এ-সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

শৈশবে আহার নিদ্রা ইত্যাদি কাজ যেমন শিশুকে নিজের প্রয়োজন-বোধে করতে শেখানো উচিত, তেমনি শিক্ষা সম্পর্কেও সে যেন বুঝতে পায় যে, এটা তার নিজেরই দরকার। শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতা যা কিছু করেন তাতে তারই মঙ্গল, এটা যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পায়। কোন একটা শিক্ষা গ্রহণ ক'রে পিতামাতাকে সে নেহাত অনুগ্রহ করল এমন ভাব জন্মাতে না দেওয়াই ভাল।

প্রশংসা ও নিন্দা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, শিশুশিক্ষার ব্যাপারে এ দুটো জিনিস খুবই দরকারী; তবে দুটো জিনিষেরই প্রয়োগ করতে হবে একটু সাবধানে এবং পরিমিত ভাবে, বিনা কারণে বা সামান্য কারণে প্রশংসা করতে নেই,--নিন্দা ত নয়ই। কোন ব্যাপারে যদি ছেলেপিলে সাহসের, নৈপুণ্যের অথবা উদারতার পরিচয় দেয়, তবে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। পরিমিত প্রশংসা মানুষের মনের উৎসাহ এনে দেয়, এ কথা সকল বয়সের মানুষের পক্ষেই সমান খাটে। প্রশংসা যেমন কোন একটা ভাল কাজের পুরস্কার, তেমনি তিরস্কার ও নিন্দাকে পুরোপুরি শাস্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। যথেষ্ট কারণ না থাকলে নিন্দা করা ঠিক নয়, মোটের উপর প্রশংসার চেয়ে নিন্দা সম্পর্কে আরো পরিমিত হতে হবে। যে মুহূর্ত্তে শিশু ভুল বুঝতে পারবে, তার গত অন্যায়ের প্রতিকূল সমালোচনা তখনি বন্ধ হওয়া উচিত। প্রশংসা বা নিন্দা কোনটাই তুলনামূলক হওয়া ঠিক নয়। অন্য ছেলের সঙ্গে তুলনা ক'রে যদি বলা হয় "তুমি ওর চেয়ে ভাল"--তা হলে ঐ ছেলেটির প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। আর যদি বলা হয় "তুমি ওর চেয়ে মন্দ"—তা হলে আসে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব।

মোটের ওপর সব রকম শাস্তির চেয়ে শারীরিক উৎপীড়নই বোধ হয় বেশী অনিষ্টকর। কারণ এর ফলে শিশু নিজেই ক্রমশঃ ক্রুর ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। তীব্র শাসনের ফল এই দাঁড়ায় যে, শিশু এবং শিক্ষাদাতার মধ্যে বিশ্বাস ও মমতার সম্পর্ক আর থাকে না, শিশুর মনের সরলতা নষ্ট হয় এবং অগোচরে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করবার প্রবৃত্তি তার বেড়ে ওঠে। আর এও দেখা গেছে যে, আধুনিক উন্নত প্রণালীতে যথেষ্ট স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে-শিশু বর্দ্ধিত হয়, তার সঙ্গে তুলনায় কঠোর শাসনে গঠিত শিশু অনেক বেশী দুরন্ত ও নীচ প্রকৃতি হয়ে থাকে। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের এবং শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের মধুর মমতার সম্পর্ক বজায় রেখেও যদি ছেলে পিলেকে মানুষ নামের যোগ্য ক'রে তোলা যায়, তবে তাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়।

নিদ্রামগ্ন নিষুপ্ত ধরণী

মহীউদ্দীন

নিদ্রা-মগ্ন নিষুপ্ত ধরণী,
থির জলে পড়িয়াছে আকাশের ছায়া।
দূরে ঘন ধান ক্ষেত,
ওপারে গ্রামের কালো রেখা।--
পদ্মার সুদূর ওই কূলে
বিস্তারিত যেন শান্ত স্বপনের মায়া।।
খণ্ড খণ্ড রূপালিয়া মেঘের লহরীগুলি কেটে
আকাশে দিয়াছে পাড়ি চাঁদের তরণী।
নারিকেল গাছের শাখায়
শুনি যেন পবন-পরীব অদৃশ্য পাখার আঘাতের ধ্বনি।।
স্তব্ধ শান্ত স্থির ওই অসীম নীলের বাতায়ন হতে
তারকা-বধূরা; যেন আত্মহারা--
চেয়ে মূক ধরণীর পানে;
স্বর্গ হতে ঝরিয়া পড়িছে জ্যোছ্না-অমৃতের-ধারা।।

ধরণীর দুঃখ-দগ্ধ ব্যথিত জীবনখানি লয়ে
অনন্তের ধ্যানে--
নিঃসঙ্গ একেলা; ওই সুদূরিকা তারকাগুলির মত
নির্নিমিখ আঁখি মেলি চেয়ে আছি মহাশূন্য পানে।
জানিনা সে অজানা অজ্ঞাত কোন্ দেবতার পানে
দীর্ঘশ্বাস সাথে
আমার অন্তর হতে ভেসে গেলো একটী প্রার্থনা :
মুক্ত কর
মুক্ত কর
মানুষেরে মুক্ত কর
ঘুচাইয়া দাও তার সর্ব্বদুঃখ সমস্ত বেদনা।।

ঘুচে যাক্ দ্বেষ-হিংসা হানাহানি স্বার্থের সংঘাত
জগতে বসাও তুমি আনন্দের মেলা।
সেথা বসে দুঃখহীন আমি শুধু রচিব কবিতা,
আত্মভোলা প্রকৃতির শিশু--
সেথায় করিব আমি খেলা।।

বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ

আবুল হোসেন এম-এ, এম-এল্

দীর্ঘ তিন বৎসর যাবত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে স্বাধীনতার রঙ্গ-ভূমি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের হৃৎপিণ্ডের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার নকশা আঁকা হচ্ছে। সে-নক্‌শার খসড়া হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান রুদ্রমূর্ত্তিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সেই স্বাধীনতার অভিনয় শুরু করবে। এই অভিনয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুষ্টিমেয় মুসলমানের কি অবস্থা হবে, তা ভাববার বিষয়। সে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যা-গুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মতই প্রবল হবে--সংখ্যা-লঘু মুসলমানের মত প্রতিহত হবে। ফলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের তরফ হতে মুসলমানের উপর অবিচার ও অত্যাচার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।* এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু প্রভুত্বের ভয় না ক'রেই Hindu communal majorityকে মেনে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী এবং মুসলমান মুষ্টিমেয়। তাতেও মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুরাজের ভয় না ক'রেই তা অনুমোদন করেছেন। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও তাদের ষোল আনা প্রাপ্য না পেয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন। এতে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে-ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা অবলম্বন ক'রে কাজ করবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত। বিজয় লাভ অপেক্ষা শান্তি অধিকতর কাম্য (peace is better than victory), ইসলামের এই নীতি অবলম্বন করেই মুসলিম সম্প্রদায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা চান শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে--বৃথা হৈ চৈ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, আত্মহত্যা, আস্ফালন, গর্ব্ব অভিমান ক'রে সময় নষ্ট করতে চান না। ১৯১৯ সন থেকে এ পর্যন্ত আন্দোলনে দেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার পেছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের শান্তপ্রিয়তা, কর্ম্মে আগ্রহ, উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই মনোভাব আজ কাজে লাগানো দরকার,—নতুবা এ দেশের কল্যাণ সুদূরপরাহত। এই মনোভাবকে কাজে লাগাতে হলে চাই মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক দিল্ হয়ে কাজ করা।

পক্ষান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব লক্ষ্যযোগ্য। সে-মনোভাব দূর না হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেটা দূর করবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে মহত্তর চরিত্র ও উচ্চতর আদর্শের দ্বারা।

বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায় আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন শুরু করেছেন এবং ভয় দেখাচ্ছেন যে বাঙ্গলাতে মুসলমান-রাজ হলে হিন্দু বিপ্লববাদীরা ক্ষান্ত হবে না--মুসলমান প্রতিনিধিদের ওপর অত্যাচার করবে। মিঃ বি সি চাটার্জ্জী, স্যার এন্ এন্ সরকার প্রকাশ্যে এই ভয় দেখিয়ে লম্বা আস্ফালন করেছেন। সুখের বিষয়, মুসলমান সম্প্রদায় বিচলিত না হয়ে এই আস্ফালনকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক এইরূপ আস্ফালন যে একেবারে childish তা বলাই বাহুল্য। আস্ফালনটা হেসে উড়িয়ে দিলেও এর পশ্চাতে যে মনোভাব আছে, সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেটা হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ! বাংলা পরিষদে কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধি বেশী হওয়ার দরুণ হিন্দু সম্প্রদায় কি আস্ফালনই না করছেন! কিন্তু তাঁরা অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানের অবস্থা কি হবে তা' একবার ভাবছেন না! 'সেখানে হিন্দু communal majority responsible government এর পক্ষে বিঘ্ন হবে না--কিন্তু বাংলাদেশে Muslim majority responsible government প্রতিষ্ঠার পক্ষে মারাত্মক হবে'--এই আন্দোলনে আজ আকাশ বাতাস সরগরম হয়েছে। এই আন্দোলনে একদিকে যেমন সরকার পক্ষকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে মুস্‌লিম মেজরিটিকে terrorise করবার জন্য। বাংলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতের মূলে

---

*মনে হয়, লেখকের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মানুষকে সব সময় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই দলে ভাগ ক'রে দেখা ভুল- আজকাল অনেকেই এ সম্বন্ধে বেশ সজাগ হয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে অর্থনীতির ভিত্তির উপর যখন দল গড়ে উঠবে, তখন তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সহজেই সমাধান হয়ে যাবে, আশা করা যায়। ---বুলবুল সম্পাদক

এই মনোভাব বিদ্যমান। এই মনোভাব দূরীভূত না হলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ হতে পারবে না। এটার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় নানা উপায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমান নারীহরণ আন্দোলন একটা দৃষ্টান্ত। এই আন্দোলনে স্যার পি. সি. রায়ের মত লোকও যোগ দিয়েছেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা। মুসলমানকে শিক্ষিত করবার জন্য, সুরুচি সম্পন্ন করবার জন্য হিন্দু নেতাদের কখনো ব্যতিব্যস্ত হতে দেখিনি- বরং মুসলমানকে শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য কিছু সুবিধা করতে গেলেই তাঁরা চীৎকার করে আপত্তি জানিয়েছেন এই বলে যে, সে সুবিধাটা সাম্প্রদায়িক। আজ হিন্দু নেতৃবৃন্দ গোটা মুসলমান সমাজকে গুণ্ডা, নীতিহীন বলে গালি দিতে কুণ্ঠিত নন। সুখের বিষয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঐ গালিতে বিচলিত হন নাই।

কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের এই নারীরক্ষা আন্দোলনের পশ্চাতে যে গভীর আত্মবিস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সেইটেই ভবিষ্যতের পক্ষে সাংঘাতিক। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ধরে নিয়েছেন যে, মুসলমান নারী হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত-সে গুণ্ডা, কিন্তু অপহৃতা নারী সতী-সাধ্বী নিরপরাধ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে এই সাধারণ প্রশ্নটা জাগছে না যে, অপহৃতা নারীটাও মুসলমান গুণ্ডাটার মত অপরাধী ও নীতিচ্যুতা হতে পারে। সে যদি মুসলমানটাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তির পিপাসা নিবারণার্থে কিম্বা দুর্ব্বহ জীবনের বিড়ম্বনা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে, তবে তাকে কোন্ নীতিতে নিরপরাধ বলা যেতে পারে? তাঁদের মনে কি এই প্রশ্নটা জেগেছে, কেন এই সব নারী মুসলমানদের সংস্পর্শে আস্‌ছে? মুসলমান আদালতে শাস্তি পাচ্ছে--কিন্তু কেমন করে পাচ্ছে? হিন্দুসম্প্রদায়ের তা' অবিদিত নাই; কিন্তু বলি, কতদিন আর তাঁরা এই মিথ্যার পুজো করবেন?

মোটের উপর এই নারীরক্ষা আন্দোলন একটা প্রপাগাণ্ডা বই আর কিছু নয়--মুসলমানকে demoralise করাই এর উদ্দেশ্য। হাজার হাজার নারী হিন্দুসম্প্রদায় হতে চ্যুত হয়ে পথের উপর দেহের হাট খুলেছে-- তাদের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের একবিন্দু অশ্রু ঝরছে না--তাদের উদ্ধারের জন্য একটা নারীসদন এখনো খোলা হয়নি। জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু সম্প্রদায় কি একবার অনুসন্ধান করেছেন--কারা ঐ সমস্ত অবলা নারীকে এই নরকের পথ দেখিয়েছে? সমাজ থেকে বের করে এনে কারা ঐ পথে তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে? তারা কি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নয়? তাদের প্রতি হিন্দু নেতৃবৃন্দকে ত একটা কড়া কথা বলতে শুনি নাই। আজ মুসলমানের সংস্পর্শে এসে স্ব-সমাজ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হিন্দু নারী শান্তিময় সংসার পাতাতে যাচ্ছে, আর অমনি মুসলমানকে ধ'রে মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীর ভবিষ্যত ঝরঝরে করা হচ্ছে। অপহৃতা নারীদের জীবন-ইতিহাসে যে সত্য নিহিত আছে সেটা যদি কেউ কোনদিন আবিষ্কার করে, তবে সেই দিন বোঝা যাবে আধুনিক নারীরক্ষা আন্দোলনের মূলে কতখানি মিথ্যা হৃদয়হীন ভণ্ডামি বিদ্যমান। সত্যকার অপরাধী যে, তাকে শাস্তি দেবার জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু অপরাধী চরিত্রহীনা নারীকে অবলম্বন করে নির্লজ্জ আস্ফালনে যাঁরা গৌরব অনুভব করেন এবং দেশের যুবক সম্প্রদায়কে সেই গৌরব-মুকুট পরতে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করেন, তাঁদের প্রতি আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নাই। তার ফল যে কোন দিক থেকেই মঙ্গলময় হচ্ছে না ও হতে পারে না সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ। এতে হিন্দু যুবক সম্প্রদায় গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, বীতশ্রদ্ধ ও হিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই নীতিচ্যুত হচ্ছে। চক্ষু বন্ধ ক'রে হিন্দু সম্প্রদায় এখন অবলা নারীর ইজ্জত আব্রু রক্ষা করবার অজুহাতে মুসলমানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন। আমি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলেছি এই জন্যে যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে যে মনোভাব বিদ্যমান সেটা রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয় ও হতে পারে না।

গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-সমাজে যে সামাজিক ব্যাধি প্রবেশ করেছে, সেটা দূর করার জন্য আন্দোলন করা এক কথা-কিন্তু ঐ ব্যাধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে গোটা মুসলমান সমাজকে শায়েস্তা করবার জন্য আন্দোলন করা অন্য কথা। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান আন্দোলন কেবল মুসলমানকে শায়েস্তা করবার আন্দোলন বই আর কিছু নয়। অবশ্য মুসলমান যদি অপরাধী হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার জন্য ছুটাছুটি করার পূর্ব্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে রাখা উচিত "সাম্‌লা আপন ঘর সাম্‌লা।" অপহৃতা নারীর অপরাধ কতখানি সেটাও এই আন্দোলনের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত--এবং তারও শাস্তির বিধান করা উচিত।

এই নারীরক্ষা আন্দোলনটী একটা মিথ্যা সেন্টিমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া গুপ্ত ঘাতক ও আইন অমান্যকারীদের আন্দোলন ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। অতর্কিতে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা ক'রে বীর আখ্যা লাভ করবার লোভে অনেক হিন্দু যুবক এই মারাত্মক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তাদের মনোভাব কোন দিক থেকেই প্রশংসার্হ নহে এবং তাদের কার্য্য দেশের

বৃহত্তর কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ--একথা হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ খুব জোর গলায় বলতে চাচ্ছেন না ও পারছেন না। এমন কি অহিংসাপন্থী গান্ধীজীও এদের কার্য্যে তেমন বিচলিত হন নাই--পরন্তু পরোক্ষভাবে তাদের উদ্দেশ্য সাধু বলে ঘোষণা করেছেন। তারা মনে করছে গুপ্তভাবে নরহত্যা ক'রে আত্মহত্যা করা সবচেয়ে বড় দেশ-সেবা ও বড় বীরত্ব। মনে করার হেতু এই যে, হিন্দুজনসাধারণের তরফ থেকে তারা ঐরূপ আত্মহত্যার জন্য নিন্দার পরিবর্ত্তে পেয়েছে পূজা--সাধুবাদ। কিন্তু আজ তাদের ঐ মনোভাব দূর করবার জন্য বিপুল আয়োজন ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে। তাদের বুঝান দরকার হয়েছে, "দেশের জন্য বেঁচে থাকাই সব চেয়ে বড় বীরত্ব--মৃত্যুর পূজা কাপুরুষতা।" জীবনের শ্রীসাধনে লেগে থাকাই মহত্ত্ব ও সবচেয়ে বড় দেশসেবা। আজ হিন্দু সম্প্রদায়কে এই কথাটা ভাল করে প্রচার করা উচিত। গুপ্তঘাতক দেশপ্রেমিক নয় দেশদ্রোহী--খোদাদ্রোহী--মানবদ্রোহী। তার জীবনের প্রকাশ বেঁচে থাকায়--আত্মহত্যায় নয়--ফাঁসিকাষ্ঠে নয়।--একথা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

গুপ্তঘাতকের হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে আর এক দল--দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন অমান্য করে কারারুদ্ধ হয়ে। এরা মনে করে আইন অমান্য করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বেড়ালেই খুব দেশ-সেবা করা হল। কিন্তু এরা যে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বপন করেছে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তাতে কোন কল্যাণকর আইনের প্রচার সম্ভবপর হবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ত্রিবিধ মনোভাব বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়কগণের চেষ্টা ব্যর্থ করবে যথা, (১) মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা, (২) গুপ্তঘাতকের দেশদ্রোহিতা ও (৩) আইন-অমান্যকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। এই তিনটী অন্তরায় দূরীভূত না হলে কোন শুভচেষ্টাই ফলবতী হবে না।

কিন্তু কি উপায়ে এই অন্তরায় দূর করা যায় সেই হল সমস্যা। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁদের উপর, যাঁরা এই তিনটি অন্তরায় দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে পারবেন। হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক ও আর্থিক মঙ্গল অর্জ্জন করতে হলে উভয়েরই চাই এই তিনটি অন্তরায় হতে দেশকে মুক্ত করা। হিন্দু-সম্প্রদায় চিরকাল মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ক'রে চলতে পারবেন না--আবার মুসলমান সম্প্রদায়ও হিন্দুর শ্রদ্ধা অর্জ্জন না ক'রে বাঁচতে পারবেন না। গুপ্তঘাতকের গুলির ভয় হতে মুক্ত না হলে কোন সম্প্রদায়ই কোন কাজ করতে পারবেন না। বাঙ্গলার প্রভুত্ব হিন্দুদের হাতে গেলে হিন্দু গুপ্তঘাতকের গুলি থেমে যেতে পারে, কিন্তু তাতে কি মুসলমান সম্প্রদায় নিরস্ত হবে? আইন-অমান্যকারীর দল যতদিন থাকবে, ততদিন কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই কোন আইন প্রচার করতে পারবেন না। সুতরাং উপরোক্ত তিনটী মনোভাব দূর করা উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য। এ কাজে যদি হিন্দু-সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে যোগ না দেন, তবে মুসলমান সম্প্রদায়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণপণ ক'রে চেষ্টা করতে হবে ঐ ত্রিবিধ অন্তরায়কে দূর করবার জন্য। তাঁদের কর্ত্তব্য হবে আগামী ব্যবস্থা পরিষদে এমন একটা প্রোগ্রাম খাড়া করা, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি একটুকু অবিচার না হয়; --তাঁদের উচিত হবে এমন philosophy প্রচার করা, যার প্রভাবে গুপ্ত ঘাতকের দল মৃত্যু-পূজা ত্যাগ ক'রে জীবন-চর্চ্চায় লেগে যাবে--তাঁদের কাজ হবে এমন দৃঢ়হস্তে দেশের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আইন-অমান্যকারীর দল আইন মানা করাকেই অধিকতর উপকারী, প্রয়োজনীয় ও লাভবান মনে করবে। এ-জন্য চাই, মুসলিম যুবক সম্প্রদায়কে এখন হতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের আদেশ পালন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া। আজ অনেকেই চান lead করতে, কিন্তু আমাদের সমাজে follow করবার জন্য লোকেরই অভাব। নেতার অভাব নেই, আছে নেতার অনুচরের অভাব। আজ এই অভাব দূর করা দরকার হয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব যেমন দেখা যাচ্ছে, তাতে তাঁদের তরফ থেকে co-operation পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। যদি তা না ই পাওয়া যায়, তবে কি হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? কখনই না। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে এখন এই মনে করতে হবে যে, এই বাংলাদেশ আমাদের--এ যদি গোল্লায় যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য বা অভিমান বা ক্রোধের জন্য, তবে তার জন্য দায়ী হব আমরা মুসলমান। এদেশ সুফলা শস্য-শ্যামলা করেছিলেন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ--এখন এর শ্রী বাড়ান ও রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

অতএব মুসলমান যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি আমার এই অনুরোধ, তাঁরা যেন অবিলম্বে এই গুরু দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। *

---

* বলা বাহুল্য লেখকের সঙ্গে আমরা সব সময় একমত হতে পারিনি। লেখক সমস্যার এক দিক মাত্র আলোচনা করেছেন। এ ভাবে যদি মুসলমান হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপায়, আর হিন্দু যদি মুসলমানকে সব কিছুর জন্য দায়ী করে--সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। আজ যে জিনিষটির অভাব বেশী ক'রে অনুভব করছি, সে হচ্ছে Self-criticism সমস্যার অন্য দিক যদি কেউ আলোচনা করেন, আমরা সাগ্রহে তা প্রকাশ করব।
--'বুলবুল' সম্পাদক

সৈয়দ আহ্‌মদ

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্

সৈয়দ আহ্‌মদের স্মরণ-স্তম্ভ রচনার কথা হইতেছিল। বন্ধু বলিলেন : তাঁর আবার স্মৃতি স্তম্ভের প্রয়োজন কি? মুসলমান সমাজটাই তো তাঁর স্মরণ-স্তম্ভ।

সত্যই সৈয়দ আহ্‌মদের স্মরণ-স্তম্ভের কোনই প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের দিকে দিকে তাঁর স্মৃতি স্তম্ভ মাথা উঁচু করিয়া আছে। শিক্ষা বল, সাহিত্য বল, রাজনীতি বল, ধর্ম্ম বল, সমাজ-সংস্কার বল,--জাতীয় উন্নতির কোন্ দিক আছে, যেখানে না তিনি কাজ করিয়াছেন?--কোন্ বিভাগ আছে, যেখানে না তিনি স্থায়ীভাবে আপনার চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছেন?

মুসলমান সমাজে আজ জাগরণের বেশ একটু আভাস দেখা যাইতেছে। এই জাগরণের গোড়ায় ছিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ। মুসলিম সমাজ আগে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে--তুলনা করিলেই সৈয়দকে বোঝা যাইবে; বোঝা যাইবে তিনি কত বড় ছিলেন, কত মহৎ ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে আঁধার যুগ। মোগল রাজত্বের ভিত্‌পাথরগুলি এই সময় একে একে খসিয়া পড়িতেছিল। জ্ঞানের আলোগুলিও নিবিয়া যাইতেছিল একটি একটি করিয়া। অজ্ঞানতার ছিদ্রপথে ইংরেজ এ দেশে আসিয়া হানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যও তাসের ঘরের মতই উড়িয়া গেল।

রাজত্ব গিয়াছে তার জন্য তত দুঃখ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুই চলিয়া গেল। --জ্ঞান গেল, শৌর্য্য গেল, শিল্প গেল, সাহিত্য গেল--অমন যে দুর্লভ রত্ন মনুষ্যত্ব, তা'ও মুসলমান খোয়াইয়া বসিল।

বৃটিশ শাসন এদেশে যখন সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, মুসলমানের সম্মুখে তখন বিরাট সমস্যা। তারা না পারিল ইংরেজের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে, না পারিল তাকে গ্রহণ করিতে; অভিমানে কেহ মুখ ফিরাইয়া থাকিল, কেহবা গায়ের জোরে ইংরেজ তাড়াইবার দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ শাস্ত্র এবং সংস্কারের জাল ছড়াইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিল। দেশের এই দুর্দ্দিনে, জাতির এই দুঃসময়ে সৈয়দ আহ্‌মদের আবির্ভাব। সমাজের অবস্থা দেখিয়া সৈয়দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন--কেমন করিয়া দেশকে বাঁচাইবেন সমাজকে উদ্ধার করিবেন। দিনের পর দিন চিন্তা করিয়া সৈয়দ আহ্‌মদ পথ আবিষ্কার করিলেন--সে-পথ জ্ঞানের পথ। টলষ্টয় বলিয়াছেন : জাতির উন্নতির জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন--স্কুল, স্কুল, স্কুল। সৈয়দ আহ্‌মদও স্থির করিলেন, মুসলিম সমাজের তরক্কির জন্য দরকার তিনটি জিনিষের--শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা।

সৈয়দ আহ্‌মদ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাই অন্ধকারে তিনি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ মহৎ লোক ছিলেন, তাই পথ আবিষ্কার করিয়া তিনি বসিয়া থাকেন নাই। সত্য পথে দশজনকে টানিয়া আনিবার জন্য তিনি জান কবুল করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য মহাপুরুষরা অনেক কিছুই করিয়া থাকেন। কেহ পুস্তক রচনা করেন, কেহ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন, ধনসম্পত্তি দান করেন। স্যার সৈয়দ ঢের বড় কাজ করিয়াছেন--তিনি সমাজের জন্য জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ সাধারণতঃ আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কথা নয়। সৈয়দের জীবনের বড় কথা হইতেছে, মুসমলান সমাজকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া আসা--অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের পথে তুলিয়া দেওয়া। একজন মাত্র লোক একটা জাতির চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে--এ যদি দেখিতে চাও-সৈয়দের জীবনী পাঠ কর। একটী মাত্র মানুষ একটা যুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছে--এ যদি জানিতে চাও--উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস আলোচনা কর। এক কথায় বলিতে পারা যায়, সৈয়দ আহ্‌মদই হইতেছেন বর্ত্তমান মুসলিম

ভারতের সৃষ্টিকর্ত্তা। মুস্‌লিম সমাজের দোষ গুণ কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি সব কিছুর জন্য যদি একটি মাত্র লোককে দায়ী করিতে হয়, তো করিতে হইবে সৈয়দ আহ্‌মদকে। এই জন্যই বলিতেছিলাম। সৈয়দের স্মৃতি-স্তম্ভের প্রয়োজন নাই, মুসলমান সমাজটাই তাঁর স্মৃতি-স্তম্ভ।

এক শ্রেণীর খেলোয়াড় আছেন,--তাঁরা সমষ্টির গৌরবের জন্য খেলেন না, খেলেন ব্যক্তিগত সুখ্যাতির জন্য। তাঁদের নজর থাকে গ্যালারির দিকে। দর্শকদের সস্তা প্রশংসার জন্য তাঁরা উন্মুখ হইয়া থাকেন। সৈয়দ আহ্‌মদ এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন তারিফ নিন্দার অতীত। সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন। লোকে কি বলিবে, সমাজ কি ভাবিবে, এ সব কথা কোন দিনই তাঁর মনে স্থান পায় নাই। জীবনে যত কাজ করিয়াছেন, বেশীর ভাগই করিয়াছেন তিনি জনমতের বিরুদ্ধে। ইংরেজীর নাম শুনিলে যখন মুসলমানরা আঁতকিয়া উঠিত, সেই সময় তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন। অন্ধবিশ্বাস যখন এদেশে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, তখন তিনি নির্ভয়ে উদারতার বাণী প্রচার করেন। বিজ্ঞানকে যখন জনসাধারণ নাস্তিকতার অংশ বলিয়া মনে করিত, সেই দিনে তিনি বিজ্ঞান-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানেই সৈয়দের জীবনের বিশেষত্ব, এইখানেই তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

সৈয়দ আহ্‌মদ যখন জন্মগ্রহণ করেন চারিদিকে তখন ঘোর অন্ধকার, শাস্ত্রকারদের অত্যাচারে দেশ হইতে স্বাধীন চিন্তা লুপ্তপ্রায়, পাশ্চাত্য মনীষীরা যাকে open air religion বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ইস্‌লাম তখন অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জ্জনায় পূর্ণ। সৈয়দ আহ্‌মদ দেখিলেন শত্রু বাহিরে নয়--মজ্জার ভিতরে। সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি মজ্জাগত শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। পরে পরে অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু সৈয়দ আহ্‌মদ ছিলেন এই ব্যাপারের অগ্রদূত। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, যুদ্ধের যশোভাগ তাঁহারই প্রাপ্য।

সৈয়দ আহ্‌মদ মুস্‌লিম সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, উর্দ্দু সাহিত্যের তিনি অন্যতম সৃষ্টিকর্ত্তা, ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভায় বিল উপস্থিত করেন তিনি সকলের আগে, মুসলমান-কীর্ত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল কীর্ত্তির কথা আলোচনা করিলেই সৈয়দের সত্য পরিচয় দেওয়া হইবে না। কারণ, সৈয়দ ছিলেন তাঁর কর্ম্মের চেয়ে বড়, তাঁর কীর্ত্তির চেয়েও মহৎ।

সৈয়দের চিন্তায় ত্রুটি ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না; ত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-সব লইয়া বিচার বিতর্ক আজ নয়। আজ শুধু বলিতে চাই--তাঁর মত আপনভোলা কর্ম্মী, সর্ব্বত্যাগী সেবক, মুস্‌লিম ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেশের কাজ করিতে আজকাল অনেককে দেখা যায়। তাঁরা কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে নাম প্রচারের চেষ্টা করেন। সৈয়দ কাজ করিয়াছেন--সকলের চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন, কিন্তু নাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই কোন দিনই।

সমাজের দুঃখে প্রাণ কাঁদে অনেকের, দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন কেহ কেহ। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পরের জন্য বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া সাগর পাড়ি দিতে কে কাকে দেখিয়াছে!

সৈয়দ আহ্‌মদ ছিলেন একজন সত্যিকারের সৈনিক। ছেলেবেলায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দূরদর্শী মাতামহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন : আমার ঘরে জাঠ পয়দা হইয়াছে। সত্যই আহ্‌মদ সমস্ত জীবন অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জাঠের মতোই যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বীর্য্যের সহিত কোমলতার সংমিশ্রণ না হইলে বীর্য্যের মূল্যই থাকে না। সুখের বিষয়, সৈয়দের চরিত্রে পৌরুষের সহিত কোমলতার, বলিষ্ঠতার সহিত সহৃদয়তার মিলন ঘটিয়াছিল। স্যার সৈয়দ জাঠের মত যুদ্ধ করিতেন, আবার সমাজের দুঃখের কথা ভাবিয়া এক এক সময় বালকের মতো কাঁদিয়া ফেলিতেন।

সৈয়দের জীবনী লেখা হইতেছে--বন্ধু আসিয়া খবর দিলেন। সৈয়দ হাসিয়া বলিলেন : আমার আবার জীবন-চরিত! ছেলেবেলায় মারামারি করিয়াছি, কাবাড্ডি খেলিয়াছি, বড় হইয়া নেচারী আর কাফের আখ্যা পাইয়াছি--এই তো আমার জীবন! এই একটি কথায় সৈয়দের জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। সত্য সত্যই সৈয়দ একজন স্পোর্টসম্যান ছিলেন। জীবনের দুঃখ দৈন্য সব কিছুকে তিনি সত্যকারের স্পোর্টসম্যানের মতোই হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতেন। তারপর তাঁর কাফের আখ্যা। কাফের আখ্যাও সহজ কথা নয়। সমস্ত জীবন যিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন--কাফের উপাধি একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

আগেই বলিয়াছি--সৈয়দের চিন্তায় হয়ত ত্রুটি ছিল, তাঁর আদর্শেরও হয়ত আজ আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁর মং জেন্দা-দিল কর্ম্মীর প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। ইংলণ্ডের বিপদের দিনে ইংরেজ কবি মিল্টনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন--Milton, thou shoudst be living at this hour. England halh need of thee! আমরাও আজ বলিতে পারি -'সৈয়দ আহ্‌মদ, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! ভারতবর্ষের তোমাকে বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বড়ই স্বার্থপর তুমি আমাদের ত্যাগ করিতে শিখাও। আমরা বাকসর্ব্বস্ব, তুমি আমাদের কাজ করিতে শিখাও। আমরা কাপুরুষ, তুমি আমাদের যুদ্ধ করিতে শিখাও। --তোমাকে আমাদের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে!' প্রতিধ্বনি বলিতেছে--'তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে।'

পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত

আব্‌দুল কাদির

--গল্প নয়--

রাশিয়া হইতে কবে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এত দিনেও রবীন্দ্রনাথের মন প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তাই কখনো তিনি হিজ্‌লী ডেটেনিউ-ক্যাম্পে গুলী-ছোঁড়া নিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, কখনো গান্ধীজীর উপবাস নিয়া মাতিয়া উঠিতেছেন।--সেদিন বোলপুরের আম্রকুঞ্জে 'বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত কবি' উতলা হইয়া পায়চারি করিতেছিলেন। কখন মিঃ এণ্ডরুজ আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গিয়াছেন। চিঠি লিখিয়াছেন বিখ্যাত ফ্যাবিয়ান্-মনীষী জৰ্জ্জ বার্ণার্ড শ'। শ' হিন্দুস্থানে শীঘ্রই পদার্পণ করিতেছেন, তাই কৃপাবশতঃ পত্র-মারফৎ তিনি ভারতের জন্য একটা Five-year-Plan প্রস্তাব করিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অকূল সমুদ্রে একটা অবলম্বন পাইলেন। শ্রীমতী কমলা নেহেরু ও অন্যান্যকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। উত্তরে ডাঃ আম্বেদকর উসিত-ভাষায় Five-year-Plan সমর্থন করিয়া কবিকে লিখিলেন। সি-এস্ রঙ্গা জানাইলেন যে, প্রস্তাবটা মন্দ নহে।

এই প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য মিঃ ভাগৎ সিংহের চিতাশালে ন্যাশনাল্ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইল। প্রত্যেক দলের বিশিষ্ট নেতাগণ আমন্ত্রিত হইলেন। অধিবেশনে দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই সমবেত হইলেন।

মিঃ দেশপাণ্ডে ও মির্জ্জা বাকের আলী তাঁহাদের 'রেড আর্ম্মি' সহ প্যাণ্ডেলের দরজায় পাহারা দিতেছিলেন। কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী ঈষৎ হাসিয়া অভ্যাগতাদের সর্ম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন।

আমাদের সংবাদদাতাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কারণ তার ছিন্ন পরিধান দেখিয়া দ্বারীরা সন্দেহ করিয়াছিল, সে 'বিশেষ বিভাগের' কেহ।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা লীলায়িত নৃত্যে বেদের স্তোত্র গাহিয়া সভা উদ্বোধন করিল। মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন। কিন্তু সহসা পীরে-জমানা হজরৎ শাহ্ সুফী ক্যাব্‌লা ছাহেব্ 'তওবা' 'তওবা' করিয়া উঠিলেন, এবং মুসলমানী নয়েৎ আওড়ানো হয় নাই বলিয়া সভাগৃহ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রমণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি উত্থিত হইল।

সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সভার কাজ শুরু হইতে পারিতেছিল না, কারণ Introductory speech দিবার কেহ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বাগ্রেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ', ও 'বিশাল ভারতের' তীব্র প্রতিবাদের ফলে তিনি নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাথমিক বক্তৃতা উঠিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন : পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্প গ্রাহ্য হইলে পর তাঁর বক্তৃতা নিরাপদ হইবে। ইহাতে ডাঃ দত্ত চার্লি চ্যাপলিনের মতো মুখভঙ্গী করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাঁর অপেক্ষা করার উপায় ছিল না, কারণ সিম্‌লা-ব্যায়াম-সমিতির সার্ব্বজনীন কালীপূজার ভোজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ স্যর মোহম্মদ ইকবাল্‌কে চিম্‌টী কাটিতেছিলেন। কিন্তু তিনি উহুঁ উহুঁ করিয়া গররাজি হইতেছিলেন, কারণ Seventh Lecture on the Reconstruction of Religious thought in Islam এর ইলেকট্রিসিটীতে তাঁর brain cell এর সমস্ত atoms তখন পর্য্যন্ত দ্রুত নৃত্য করিতেছিল।

পণ্ডিত মালব্য দাঁড়াইতেই পারিলেন না। তাঁর চাপকানের পকেটে একটী 'থার্ম্মো ফ্লাস্ক' দেখা যাইতেছিল, প্রেসিডেন্ট্

পরিশেষে স্থির হইল, প্রারম্ভিক বক্তৃতা ছাড়াই সভার কার্য্য আরম্ভ করা হউক। প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠিলেন জনৈক রাজপুত মহারাণা। প্রতাপসিংহের মতো গুম্ফ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন : সভায় জনসমাগম দেখিয়া মনে হইতেছে, ভারতবর্ষে বলশেভিক চরের প্রভাব কম নয়। বলশেভিজম্ দেশনীতির পরিপন্থী, বিশৃঙ্খলার পরিপোষক। এমতাবস্থায় দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তাব করা যাইতেছে যে ভারতবিহারী বলশেভিক এজেন্টদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারত-সরকারকে অনুরোধ করা হউক। যথারীতি একজন নবাব বাহাদুর কর্তৃক সমর্থিত হইলে প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবটী ভোটে দিলেন, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

অতঃপর five-year-plan কোথা হইতে আরম্ভ করা যাইবে, কার্যসূচীর এই দ্বিতীয় item এর আলোচনা আসিল।

শ্রীজওহরলাল নেহেরু গাত্রোত্থান করিলেন। রাশিয়ায় তিনদিন ভ্রমণের ফলে লিখিত তাঁর Soviet Russia বইখানা বগলে চাপিয়া তিনি কম্রেড সাখলাৎওয়ালার প্রেরিত Cable পড়িতে লাগিলেন। সাখলাৎওয়ালা এই সম্মিলনীর সাফল্য কামনা করিয়া, গান্ধীবাদ নিপাত যাউক, সোভিয়েট-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই, ইত্যাদি অনেক উৎসাহপূর্ণ কথা লিখিয়াছেন। সভা যখন বাক্যের বিদ্যুতে শিহরিয়া উঠিতেছে তখন পণ্ডিতজী প্রস্তাব করিলেন : রাশিয়া five-year-plan প্রবর্ত্তিত করিয়াছে ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লবের সাফল্যের উপর, আমাদেরও বিপ্লবের লাল-ঘোড়ায় চড়িয়া five-year-plan কে আমন্ত্রণ করিতে হইবে, অতএব মিত্রগণ প্রস্তুত হউন।

আবেগে- উত্তেজনায় সভাস্থ সকলের মাথার চুল আইনস্টাইনের মতো খাড়া হইয়া গিয়াছিল। সেই উদ্দীপনার ঝড় ঠেলিয়া মহাত্মা গান্ধি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : এ্যাঁ, বল কি, বলশেভিজম্! —ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিতেছিল।

ডাঃ আলম ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া প্রস্তাব করিলেন : এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য রাশিয়া হইতেই কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করা হউক।

স্বদেশী-বিড়ির ধোঁয়া নাকে-মুখে ছাড়িতে ছাড়িতে শ্রীমতী আনি বেশান্ত অর্দ্ধনিমীলিত-চোখে বলিলেন : রাশিয়া হইতে আনিবার হ্যাঙ্গাম কেন? যদি বলেন, লেনিনের প্রেতাত্মাকেই এখানে উপস্থিত করি।

স্যার সাপ্রু বলিলেন : রাশিয়াকে অনুকরণ করার দরকার কি? যদি অনুমতি করেন, এ-সম্পর্কে আমি একটা নূতন 'ফরমুলা' আবিষ্কার করি।

হস্‌রৎ মোহানী বলিলেন : মিছামিছি আবার মস্তিষ্ক ব্যয় কেন? five-year-plan এর মাঝামাঝি কোথাও হইতে আরম্ভ করিলেই হয়!

মিঃ যোশী বলিলেন : ইহাকে 'তৃতীয় চূড়ান্ত বৎসরই' না-হয় করা যাক।

শ্রী জে. এম. সেনগুপ্ত বাধা দিয়া বলিলেন : তা কেন? একেবারে end হইতে start করা যাউক। আমাদের Advance এর 'রিগা'স্থ সংবাদদাতা নিশ্চিতরূপে জানেন where the end is.

সর্দ্দার প্যাটেল মিঃ সেনগুপ্তের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট বাকী item টির উল্লেখ করিলেন। অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্প দ্বারা কিসের সমাধান হইবে? ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হইবে, না ক্যাপিট্যালিজম্ অব্যাহত থাকিবে?

মৌলানা শওকত আলী তাঁর সাদা ফেজ উড়াইয়া আরবী এল্‌হানে বলিলেন : আল্লাহ্‌তা'লা কোরাণ্-মুজিদের সুরা নেসা'য় ফরমাইয়াছেন : And do not give away your property which Allah has made for you a (means of) support'.....4:5.

—অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা যাইতে পারে না। আর ত াহা করিলে হজ, জাকাৎ প্রভৃতি ইস্‌লামীয় অনুশাসনই যে বাতিল হইয়া যায়!

মিঃ জিন্নাহ্ বলিলেন : ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অর্থ existing system এর collapse, collapse অর্থ disorder, disorder অর্থ more police, more police অর্থ more expense. কিন্তু আমার মনে হয়, এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে সরকার অতিরিক্ত ব্যয়মঞ্জুর করিতে মোটেই সমর্থ নহেন।

এই যুক্তিসঙ্গত কথায় সকলেই প্রশংসাসূচক ধ্বনি করিলেন। সভাপতি মন্তব্য করিলেন যে, আলোচনা অতি চমৎকার হইয়াছে, এবং এক্ষণে তিনি তাহা ভোটে দিতে ইচ্ছে করেন।—"কে কে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাতিলের পক্ষে? জহরলালজী, আপনি ভোট দিতেছেন না?"

"আমি নিরপেক্ষ থাকি, মিঃ চেয়ারম্যান!" জহরলাল বলিলেন।

পিছন হইতে কাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল : এইই ইঁহার স্বভাব! Full- blooded socialist বলিয়া পরিচয় দিতেন, অথচ কলিকাতা-কংগ্রেসে 'ডমিনিয়ন্-স্টেটাস্' প্রস্তাব পাশ করিয়াছিলেন!

"অতএব ভদ্রগণ! ধনিকতন্ত্র অব্যাহত রহিল।" হাসিমুখে সভাপতি ঘোষণা করিলেন।

ভোটের ফলাফল শুনিয়া শ্রীযুত জহরলাল অভিমানে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার তাঁর নয়া-বাংলা জবানে জানাইলেন যে সোস্যালিজম্ প্রচারের জন্য ইষ্টারের ছুটিতেই তিনি জর্ম্মানী রওয়ানা হইতেছেন।

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু শাসাইয়া বলিলেন : দু'এক বৎসর অপেক্ষা করা যাক্, অতঃপর 'জেনারেল স্ট্রাইকের' ব্যবস্থা করিতেছি।

মিঃ শাহেদ সুরাহবর্দ্দি পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন : কিন্তু মিঃ বোস্ আপনার গতবারের অভিভাষণ.....

শুনিয়া মিঃ বসু রাগতভাবে পিছন ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু চিনিতে পারিয়া করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন, এবং পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর কন্‌ফারেন্সে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত হইল :—(১) বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির সুযোগে নামমাত্র মূল্যে দেশের সমস্ত পাট খরিদ করতঃ আশাতিরিক্ত লাভের আশায় মজুদ্ রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের মূলধন বাড়ানো হউক। (প্রস্তাবক শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, সমর্থক হাজী আদমজী দাউদ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।)

(২) মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে 'ধর্ষনায়' একটী Salt Trust প্রতিষ্ঠা করা হউক। (প্রস্তাবক শেঠ যমুনালাল বাজাজ্, সমর্থক জি, ডি, বিরলা। বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে গৃহীত)।

(৩) বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশের প্রত্যেক নরনারীকে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হউক, এবং ৪৬ বৎসর বয়স হইতে তাহাদেরে পেন্সন দানের ব্যবস্থা করা হউক। (শ্রীহেমন্তকুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও পরে প্রত্যাহৃত।)

(৪) "দরিদ্ররা যাহাতে একেবারে না খাইয়া মরিয়া না যায় সে উদ্দেশ্যে ধনীদের আহার্য্যের ভাগ কিছু কমাইতে অনুরোধ করা হউক।"—শ্রীনিকেতনের শ্রীকালীমোহন সেন এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী পকেট হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ বাহির করিয়া বলিলেন যে, ইহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যনাশের ঘোরতর সম্ভাবনা, অতএব এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হউক। — এই মন্তব্যে দুই দলে বচসা এমন জমিয়া উঠিল যে, কখন যে সভাপতি সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ টেরই পাইলেন না।

[মিঃ আবদুল কাদিরের প্রেরিত এই রিপোর্টখানির যথার্থতা সম্যগ্‌ভাবে যাচাই করিয়া দেখা গেল না। এ-ধরণের কোনো কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আদৌ না হইয়া থাকিলেও হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।]

ডাকঘর

বীরবলের পত্র

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পাঁচ ছ দিন আগে পেয়েছি। পত্রপাঠ যে উত্তর দিই নি তার কারণ--'বুলবুলে'র জন্য অপেক্ষা করছিলুম। অতঃপর 'বুলবুল' পেয়েছি ও পড়েছি, এবং পড়ে খুশী হয়েছি। বিশেষ খুশী হয়েছি এই কারণে যে, সবগুলি লেখাই আপনার স্বসম্প্রদায়ের লেখকদের। এই রকম একটি কাগজ থেকে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদের নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের নব-মনোভাব যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই-- যেমন আমাদের হিন্দুদেরও হয়েছে। আমরা হিন্দুরাও একেবারে পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত নই, এবং নূতন মুসলমান লেখকরাও তা হতে পারেন না এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ চিন্তারও progress--সামাজিক ধর্ম্মমত ও আচারকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। ইউরোপের মহা মহা free thinker কি খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব থেকে মুক্ত?

'বুলবুলে'র ভাষা স্পষ্টই, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা পাঁচজনে লিখি, সেই ভাষাতেই 'বুলবুলে'র লেখকরা লিখেছেন। আর অনেকে যে সাধু ভাষার মায়া কাটিয়েছেন তা দেখে খুশী হলুম। কারণ বাঙালীর মনোভাব বাঙলাতেই পুরোপুরি প্রকাশ করা যায়। একটি মাত্র লেখক শুধু আমাদের কাছে অপরিচিত বহু আরবী অথবা ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে বিষয় তিনি লিখেছেন, সে বিষয়ে হয়তঃ এ সব কথার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অত অপরিচিত বিদেশী কথা বাঙলার গায়ে খাপ্ খায় না। যদিচ লেখকের প্রতি কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, তবুও লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়েছি, কারণ লেখাটি আগাগোড়া ফুর্তি ক'রে লেখা। ...... আশা করি, দিন দিন 'বুলবুলে'র শ্রীবৃদ্ধি হবে। ইতি--শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

গান

নজরুল ইসলাম

ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা
　　　　চলে গিরি-কন্যা চঞ্চল ঝর্ণা।
নন্দন-পথ-ভোলা চন্দন-বর্ণা।।
　　　　গাহে গান ছায়ানটে
　　　　পর্ব্বতে শিলাতটে,
লুটায়ে পড়ে তীরে শ্যামল ওড়না।।

ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ধীরি ধীরি বাজে
　　　　তরঙ্গ নূপুর বন-পথ-মাঝে।
এঁকে বেঁকে নেচে যায় সর্পিল ভঙ্গে
　　　　কুরঙ্গ সঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
গুরু গুরু বাজে তাল মেঘ-মৃদঙ্গে
তরলিত জ্যোৎস্না বালিকা অপর্ণা
　　　　　　চঞ্চল ঝর্ণা।।

ক্ষমা ক'রো হজরত্

(গান)

নজরুল ইসলাম

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ
ক্ষমা করো হজরত্।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ
তোমার দেখানো পথ।
ক্ষমা ক'রো হজরত।।

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধূলি সম তুমি প্রভু
আমরা হইব বাদশা নওয়াব
তুমি চাহ নাই কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের এতে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ।।

তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন্-ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত।।

তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াছ অমর বাণী;
মোরা ভু'লে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত্ হ'তে ঝরেনাকো আর তাই তব রহমত্।।

সম্পাদক

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)
বেগম শামসুন্ নাহার

বার্ষিক ১॥০, প্রতি সংখ্যা ॥০

এই সংখ্যার লেখকগণ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রমথ চৌধুরী
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
নজরুল ইসলাম
সুফিয়া এন হোসেন
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ডি-লিট্
অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস্
আবুল মনসুর আহ্‌মদ বি-এল
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
মরহুম মোজাম্মেল হক্
কাজী আবদুল ওদুদ, এম-এ.
হুমায়ুন কবির, বি-এ (অক্সন)
জসীম উদ্দীন এম-এ
মাহ্‌বুব-উল-আলম
আবদুল কাদির
আবুল ফজল, বি-এ, বি-টি.
মহীউদ্দীন
কামালউদ্দীন, বি-এস-সি

'বুলবুল' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী : 'বুলবুল পড়েছি এবং পড়ে খুশী হয়েছি।.....এই রকম একটি কাগজ থেকে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদের নব মনোভাবের পরিচয় যায়।'

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী : 'তোমাদের কাগজে যে এতজন মুসলমান লেখক এমন বাঙ্গলা লিখছেন, তা' দেখলে বাস্তবিক খুশী হওয়া যায় ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়।'

কাজী আবদুল ওদুদ : 'বুলবুল পড়ে যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছি। অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রবন্ধগৌরব দুই দিক দিয়েই এ কাগজখানি বেশ 'মর্য্যাদাবান' হয়েছে। সেজন্য আপনারা আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র!'

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ : 'বুলবুল' পড়িয়া শুধু আনন্দিত নয় উল্লাসিত হইলাম। নামে, কাগজে, ছাপায়, প্রবন্ধ-সম্পদে পরম উপাদেয় জিনিষ হইয়াছে। যোগ্য ভাইবোনের যোগ্য কাজ মিলিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে যুক্তসাধনায়-অমর ভাইবোনের একাধিক নজীর আছে। বাংলার সাহিত্য, বাংলার ভাব-সম্পদ আপনাদের যুক্ত-সাধনায় সমৃদ্ধিলাভ করুক, কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।'

সওগাত : 'পরিচালকবর্গ একখানি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র পরিচালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আন্তরিক প্রীত হইয়াছি। আলোচ্য পত্রিকায় মুস্‌লিম বঙ্গের খ্যাত-নামা লেখক লেখিকাগণ যখন সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তখন পত্রিকাখানির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।'

Amrita Bazar Patrika : This periodical magazine in Bengali represents the best type of literary and cultural thought among the Muslims of this province. The high literary excellence, fine breadth of views and the refreshing spirit of modernism exhibited throughout the present number of "Bulbul" point to a great future not only of the great Muslim community, but of Bengal as a whole.... The aim of the Magazine is to liberate the minds of young men from the thraldom of old rusty ideas and ideals and show them the way to a life resonant with a voice that can speak only in terms of the entire humanity.

Advance : This Bengali periodical representing as it does the best literary and cultural thoughts among the younger generation of Muslims is a welcome publication. Everyone, who would take the trouble of going through its pages, will be agreeably surprised at the literary excellence and breadth of outlook displayed in almost all the essays published in the present number of "Bulbul". It is really a hopeful sign of the times that the younger section of the Muslim community is growing bold enough for an attempt to climb a height, where man's vision remains unblurred by the encompassing mist of passions and prejudice...There is no doubt that "Bulbul", if it lives up to what appears to be its sacred mission, will prove to be of invaluable help in strengthening the forces in operation for the creation of a united Bengal, for which every cultured mind in the land must be longing amid the gloomy outlook of the present situation.

The Mussalman : The articles published in the first issue are almost all well-written and thoughtful Most of the articles are worth mentioning ......Hearty congratulations to the editor and editress for their commendable venture.

বুলবুল

(প্রথম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা)

পৌষ-চৈত্র ১৩৪০

বুলবুল
প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

শুভবুদ্ধির আহ্বান

বুলবুল পত্রখানি পড়ে আশান্বিত হলুম। আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে কোথাও ধ্বনিত হোতে পারল এ'কে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনার বিনাশ যখন আপনিই ঘটাতে বসি তখন তাকেই বলে মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মারীকে মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুবিষ আপনার মধ্য থেকেই উদ্ভাবিত করে তোলে তখনি পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আজ আমাদের। আমাদের দুঃখ আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে, আমরা স্পর্দ্ধা করে আত্মঘাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্ব্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা করো, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।

আমি পারস্য ইরাক ইজিপ্টে ভ্রমণ করে এসেছি। বহু শতাব্দীর মোহান্ধকার ভেদ করে সর্ব্বত্রই নব প্রভাতের আলোক আজ প্রকাশিত, সর্ব্বত্রই সেখানকার নানা লোকের মুখে শুনে এলেম ভারতবাসীর অন্ধতার প্রতি ধিক্কার। স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি আজকের দিনে নবজীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত সমস্ত প্রাচ্য মহাদেশের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তির ক্ষেত্রে কাঁটাগাছ রোপণ করতে বসেছি। এই মূঢ়তার অপমান সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আজ অনাবৃত অথচ হতভাগ্য দেশে এর প্রতিকার আজ এত দুঃসাধ্য। এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্ব্বোধ জড়ত্বে বেদনাসঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের এই পত্রে তারই লক্ষণ সূচিত। তাই আনন্দের সঙ্গে আজ আমি আমার অভিনন্দন প্রেরণ করছি। কৃতজ্ঞ দেশের আশীর্ব্বাদে তোমাদের উদ্যম জয়যুক্ত হোক্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ঘটনা মা ও জ্যেঠাইকে এবং রউফ ও আমাকে পরস্পর হইতে আড় করিয়া রাখিল। কিন্তু, এক বাড়িতে থাকিয়া এই আড় যেমনই ছিল রাখিতে কঠিন, তেমনই হইল উহা যন্ত্রণাদায়ক। অবশেষে মা ও জ্যেঠাইতে আবার ভাব হইল। মার মুখে শুনিলাম : কানা যে মারিয়াছিল উহা রউফের দোষ নয়, উহা শয়তানের চালবাজী। কারণ, যত বিভেদ সে-ই তো ঘটায়। ইহাতে আমি আর রউফ আবার মিলিয়া গেলাম। মোটের উপর সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

প্রথম দেখাতেই কানা মারার জন্য শয়তানের প্রতি আমার আড়ির ভাব জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এক রাত্রে শয়তানের প্রতি আমি নাড়ির টান অনুভব করিলাম। সে রাত্রে বাহিরে যেমনই ছিল বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার তেমনই ছিল ভয়ানক দুর্যোগ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া যে কক্ষে আমরা মায়ে-পোয়ে শুইয়াছিলাম উহা আলোকিত হইতেছিল। কিন্তু, পরক্ষণেই ভয়ানক শব্দে বজ্রপাত হইয়া উহাকে খান্ খান্ করিবার উপক্রম করিতেছিল। আমি ভয়ে মায়ের বুকে গুম্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন এমন হয়?' মা বলিলেন 'শয়তান আর্শের মন্ত্রণা শোনার জন্য আড়ি পাতিয়াছে। তাহাকে তাড়ানোর জন্য ফেরেশ্‌তাগণ ঢিল ছুড়িতেছেন।' দুইটি কাজই আমার এমন সুপরিচিত ছিল যে মাকে বিশ্বাস করিতে আমার এক রত্তিও বাধে নাই। আমার শিশু-মনের চর্খায় সুতা টানিয়া বিষয়টি আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল। তাহা হইলে শয়তান খুব চালাক, আর ভারি smart. সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে মনে হইল যেমনি যুবক, আল্লাকে মনে হইল তেমনি বৃদ্ধ ও অথর্ব্ব। এইখানে বলিয়া রাখি আল্লাকে আমি চিরকালই বৃদ্ধ ও অথর্ব্ব মনে করি নাই। পরবর্ত্তী কালে আমি আল্লাকে অনুভব করিয়াছি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা dynamic কেন্দ্র হিসাবে।

এই হইতে শয়তানের সহিত দেখা-শোনা বাড়িতে লাগিল। একদিন প্রজাপতি জলে ডুবাইতে গিয়া আমি পুকুরে পড়িয়া গেলাম। সেদিন নিশীথ রাতে যখন আমার জ্ঞান হইল তখন মা জায়নমাজে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, তাবিজ-পোড়া ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গিয়াছিল—আর আমার এক জ্যেঠা আমাকে এক টুক্‌রা ছেঁড়া জালে জড়াইয়া কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। আমার প্রতি যে শয়তানের দৃষ্টি (আছর) হইয়াছে ইহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। আমি নাকি 'জরিণা ও বারিক্যা বাপে'র নাম করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলাম। জ্যেঠার পরিচয় ছিল 'বড় মৌলবী সাহেব।' 'বড় মৌলবী সাহেব' গুণী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শয়তান 'জরিণা ও বারিক্যা বাপ'এর মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিয়াছে। এ যাত্রা আমি বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু, এই বাঁচিয়া যাওয়ার গতিকে আমার গলায় দুই একটি তাবিজের বোঝা বাড়িয়া গেল। 'নজর' হইতে বাঁচিবার জন্য গলায় ঘুন্‌সীতে গাঁথিয়া একটি কানা-কড়ি, একটি পয়সা, ছেঁড়া জুতার চামড়া এক টুক্‌রা, ঝাঁটার শলা কয়েক কাঠি, 'বজ্র-বাটাইল', 'নজর-গোটা' প্রভৃতি পরার বিধান ছিল। ইহাদের পাশে বোঝার উপর শাকের আঁটির ন্যায় আরও দু'একটি তাবিজ আমার গলায় দুলিতে লাগিল।

'জরিণা ও বারিক্যা বাপ' এর মূর্ত্তি যে দেখিয়াছিলাম তাহা সত্য। কিন্তু, আজ বড় হইয়া ইহার একটা কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি। তাহা এইরূপ : একদিন দাদা আমাকে কোলে করিয়াছিলেন। এমন সময় মেজ জ্যেঠা তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে ডাকাইয়া নিলেন। মেজ জ্যেঠা ছিলেন বাড়ির প্রভোস্ট্-মার্শাল--দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। দাদার ভয়ে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, মা ও কাটা মুর্গীর ন্যায় করিতেছিলেন। কিন্তু, দাদাকে যাইতেই হইল। যাওয়া মাত্রই মেজ জ্যেঠা তাঁহাকে আচ্ছা করিয়া পিটিয়া দিলেন। তখন 'বারিক্যা বাপ' তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে মিথ্যা নালিশ করিয়াছিল যে দাদা তাহাদের একটি ছাগলের গলা হইতে রশি খুলিয়া খেজুর গাছে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। 'জরিণা' তাহার পিতার পেছনে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, সে নিজের চোখে উহা দেখিয়াছে। এই শাস্তির জন্য মেজ-জ্যেঠার ন্যায়বুদ্ধিকে আমি জীবনে মানিয়া নিতে পারি নাই এবং 'জরিণা ও বারিক্যা বাপ'কে জীবনে ক্ষমা করিতে পারি নাই। দু এক দিন পরে লাঠির আঘাতে একখানি তস্‌তরি ভাঙ্গার জন্য যখন আমি জ্যেঠার নিকট আনীত হইলাম, তখন আমি তাঁহার সহিত এমন জটোপাটি শুরু করিয়া দিলাম যে বাড়ির ছেলে-বুড়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু, স্নেহশীল জ্যেঠা নিজে না হাসিয়া পারেন নাই। ইহার মূলে ছিল আমার শিশু-মনের সঙ্কল্প যে জীবনে কখনও এই জ্যেঠার শাস্তিতে আত্মসমর্পণ করিব না। আর হতভাগ্য তস্‌তরির কথায় মনে পড়িতেছে যে, উহাকে ভাঙ্গা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু না ভাঙ্গিয়া উহার কত নিকটে লাঠি ঠুকা যায় উহাই আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। ভোর হইতে মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও ইহা সাফল্যের সহিত করিয়া আসিতেছিলাম। তবুও যে জ্যেঠা বাড়ি ঢুকার পরক্ষণেই তস্‌তরিখানা দুখান হইয়া গেল, আজ দেড় কুড়ি বৎসর পরে জিজ্ঞাসা করি, সে দোষ কি শয়তানের ঘাড়ে চাপান যায় না।

৩

বাঙলা ভাষা শুধু আমাদের মত শিক্ষিত লোকের ভাষা নয়, দেশশুদ্ধ নিরক্ষর লোকের মুখের ভাষা। সুতরাং সম্প্রদায় বিশেষের কাছে উর্দ্দু যে বাঙলার স্থান অধিকার করবে, এ আশা করা বৃথা। কোন দেশের অতীতকে মুখের কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর অতীতই দেশভাষা গড়েছে।

এ হেন প্রস্তাব যাঁরা করেন, তাঁদের মনোভাবই ঠিক বোঝা যায় না। প্রথমতঃ উর্দ্দু একটি Classical language নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের ভাষা আরবী ও সাহিত্যের ভাষা ফারসী; এ উভয় ভাষার উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক--যেমন গ্রীক ল্যাটিনের উপর ইউরোপীদের শ্রদ্ধা আছে এবং সংস্কৃত ভাষার উপর হিন্দুদের শ্রদ্ধা আছে।

কিন্তু উর্দ্দু ত ও শ্রেণীর ভাষা নয়। প্রথমত এ ভাষা অতি প্রাচীন নয়, কেবলমাত্র পুঁথিগত ভাষাও নয়; কিন্তু বাঙলারই মত একটি প্রাদেশিক প্রচলিত মৌখিক ভাষা।

উর্দ্দু ভাষা কে সৃষ্টি করেছেন তা জানি নে। আমীর খসরু যে করেন নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমীর খসরু ছিলেন কবি; সুতরাং তিনি হিন্দি ও ফারসী পাশাপাশি বসিয়ে গুটিকতক পদাবলী রচনা করেছিলেন, experiment হিসেবে কিন্তু সে experimental ভাষা উর্দ্দু নয়।

সত্যকথা এই : উর্দ্দু কোনও ব্যক্তি বিশেষ সৃষ্টি করেন নি। আপনা হতেই ও ভাষা লোকমুখেই জন্মলাভ করেছে। উর্দ্দু মূলতঃ ব্রজ ভাষা--অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের লোক ভাষা, এবং তার অন্তরে দেদার আরবী ও ফারসী শব্দ ঢুকে গিয়েছে।

বাঙলা ভাষার অন্তরেও এরূপ শব্দ কম নেই। আইন-আদালত জমী-জমা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই ত ফারসী। উপরন্তু আরও অনেক কথা আছে যা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। কিন্তু সে কারণে বাঙলার ধাৎ বদলে যায় নি--বরং তার কান্তি পুষ্ট হয়েছে। ইংরাজী ভাষার তুল্য মিশ্র ভাষা ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আর ভারতবর্ষের উত্তরাপথের সব ভাষাই অল্পবিস্তর মিশ্র। সুতরাং অপর ভাষা থেকে শব্দরাশি আহরণ করলে কোন ভাষারই জাত যায় না।

৪

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ব্রজ ভাষার বুনিয়াদের উপরেই উর্দ্দু ভাষা গড়ে উঠেছে। ভাষা-তত্ত্ববিদরা বলেন যে, সৌরসেনী প্রাকৃতই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে এখন পশ্চিম হিন্দুস্থানে হিন্দী ও উর্দ্দু এই দুই আকারে প্রচলিত। এ দুই ভাষাই সগোত্র। আর আমরা বাঙলার লোক এ দু'ভাষাকেই নির্ব্বিচারে হিন্দুস্থানী বলি।

এ দুয়ের ভিতর স্পষ্ট প্রভেদ লেখার। হিন্দীলিপি বাঁ থেকে ডাইনে চলে, আর উর্দ্দুলিপি ডাইনে থেকে বাঁয়ে চলে, আর এ উভয়ের অক্ষরও বিভিন্ন। কিন্তু এ প্রভেদ নিরক্ষর লোকের কাছে নেই। আছে শুধু লিখিয়ে পড়িয়ে লোকের কাছে।

এই কারণে খুব সম্ভবতঃ সাহিত্যিক হিন্দীর সঙ্গে সাহিত্যিক উর্দ্দু পৃথক হয়ে গিয়েছে। একালে এমন শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হিন্দী লেখক আছেন, যাঁরা যথাসাধ্য ফারসি কথা বর্জ্জন করে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। হিন্দীর এখন সাধুভাষা হবার দিকে ঝোঁক আছে এবং সম্ভবতঃ এমন উর্দ্দু লেখকও আছেন, যাঁরা যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে তার পরিবর্ত্তে ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এ সব কৃত্রিম ভাষার পরমায়ু অল্প। বাঙলায় আমরা "সাধুভাষার" মায়া কাটিয়েছি। এর থেকে অনুমান করছি যে, হিন্দুস্থানীরাও ক্রমে সে মোহ কাটিয়ে উঠবে। অর্থাৎ সে প্রদেশেরও সাহিত্যিক ভাষা মৌখিক ভাষার অনুসরণ করবে।

সে যাই হোক্, বাঙালীর মুখের ভাষা যে হিন্দুস্থানী হবে না, এ কথা জোর করে বলা যায়। বাঙলা ভাষা এখন শুধু মৌখিক ভাষা নয়! – বাঙলার সাহিত্যিক ভাষাও হয়ে উঠেছে। আর বর্ত্তমান বাঙলার সাহিত্য গড়ে তুলছেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই, আর উভয়েরই দেখ্‌তে পাই, সাহিত্যিক ভাষা একই। বাঙলা সাহিত্যের যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হবে, তার লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং "হিন্দী বনাম বাঙলা" ও "উর্দ্দু বনাম বাঙলার" মামলায় বাঙলারই যে স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

গান

কাজী নজরুল ইসলাম

স্নিগ্ধ শ্যামবেণী-বর্ণা এস মালবিকা।
অর্জ্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
এস মালবিকা।।

এস ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু বনে এস অমিতা।
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি' থালিকা—
মালবিকা।।

ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস অঞ্জনা রেবা নদীব তীরে!
পরি' হংস-মিথুন-আঁকা সাড়ি ঝিল্‌মিল্‌
এস ডাগর চোখে মাখি' সাগরের নীল!
ডাকে বিদ্যুত-ইঙ্গিতে দিগ্‌-বালিকা—
মালবিকা।।

যখন রক্ত ছুটিতে লাগিল দিদার উহা দেখিয়া হাসি-মুখে এক জোড়া উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপন করিল। ভিতরের কথাটি যেন এই : দেখলে কেমন সাহসের সহিত সহ্য করলাম।

এই জগতে 'আল্লা' ও 'শয়তান'কে লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার মত কৌতূহল ও সময় কোনটাই ছিল না। তবুও এক ভাবে মায়ের শিক্ষার জের চলিতে লাগিল। সেটি হইল এই যে, আমার ধারণায় যত সু তাহার মালিক করিয়া চলিলাম আমি 'আল্লা'কে, আর ধারণার যত কু 'শয়তান'কে করিয়া চলিলাম তাহার মালিক। এইরূপে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি যে আস্থা হইল আমার ক্রীড়াময় জগতের creed --আমার 'আল্লা'র ধারণা বড় হইয়া উহা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল।

এই সময় ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের 'চারি জন ধর্ম্ম-নেতা' ও 'তাপস-মালা'র খণ্ড বিশেষের কয়েকটি ছেঁড়া পাতা আমার হাতে পড়ায় আমার উপর 'ধ্যানময় জগতে'র ছায়াপাত হইল। ত্বকচ্ছেদ উপলক্ষে ক্রীড়াময় জগতের casualty-list এ ভর্ত্তি হইয়া যখন কয়েকদিন আমাকে নিষ্ক্রিয় পড়িয়া থাকিতে হইল, সেই সুযোগে আমি 'চারি জন ধর্ম্ম-নেতা' পড়িয়া ফেলিলাম--একবার নয়, বার বার। কিন্তু, পড়াই আমার বড় লাভ হইল না। বড় লাভ হইল যে একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভাই গিরীশচন্দ্র শ্রদ্ধানত মনে মহাপুরুষদের আলেখ্য আঁকিয়াছেন আমার শিশু-মনে উহার সঞ্চরণ। এই হইতে ধ্যানের 'আল্লা'কে আমি দেখিতে পাইলাম আমার পরিমাপের উর্দ্ধে এবং জীবনের জন্য আমি নিজেকে তাঁহার নিকট দায়ী ভাবিতে লাগিলাম। ঠিক এমনি সময়ে যৌন-বোধ আমার ভিতর তড়িত-প্রবাহের সঞ্চার করিল।

সেদিন তড়িতের চোখ্-ঝলসান রূপটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, আজ এতদূরে বসিয়া দেখিতেছি, জীবনে যাহার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে উহা তড়িতের সে অপরূপ রূপের নহে, কিন্তু উহার পশ্চাতে যে প্রচণ্ড দাহিকা-শক্তি লুকান ছিল উহার। কারণ, সে মহিলার সংস্পর্শ জীবন-পেয়ালায় আকাঙ্ক্ষার তীব্র মদিরা পূর্ণ করতঃ রূপ রস ও গন্ধের ইঙ্গিতে আমাকে যেমন করিয়া তুলিল উচাটন, তেম্‌নি প্রচণ্ড আলোড়নে উহা কাঁপাইয়া তুলিল আমার সত্তার ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত। আর সে কম্পনে খান্‌খান্ হইয়া গেল কৈশোরের সেই ক্রীড়াময় জগৎ। সেই ভয়ানক দুর্য্যোগে আশ্রয়হীন কিশোর আমি নিজেকে মুখোমুখি দেখিতে পাইলাম সেই 'আল্লা'র ও 'শয়তানে'র--ছাগল-ছানার গলায় ঘুন্‌সির মালা পরাইয়া দিয়া একদিন ক্রীড়াময় জগতে প্রবেশের প্রাক্কালে আমি যাহাদের নিকট হইতে পলাইয়াছিলাম।

এই হইতে শুরু হইল জীবনের প্রথম অন্তর্বিপ্লব। প্রতিকারের কোন উপায়ই যেমন শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে ঠেকাইতে পারিল না, তেমনি উহার প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতই ওজন করিয়া চলিল আমার ধারণার 'আল্লা'কে আর 'শয়তান'কে। আজ হিসাব খতাইয়া দেখিতেছি, সে ওজন করায় যাহার পাল্লা ভারী হইয়াছিল উহা 'আল্লা'র নহে, 'শয়তানে'র। অবশ্য আজ জীবনের পশ্চাৎ-পটে দৃষ্টি করিয়া কৈশোরের এই 'আল্লা'র জন্য ভক্তি বা 'শয়তানে'র জন্য ভয়--কোনটাই অনুভব করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, আজ আমি এখন 'আল্লা'য় বিশ্বাস করি না 'শয়তান' যাহার সহিত Co-existent।

শয়তানের পাল্লা যে ভারী হইয়াছিল উহা শয়তানের প্রতি আমার নাড়ির টান অধিক ছিল বলিয়া নহে। কারণ, জীবনে ভাল হইব এই ছিল আমার দৃঢ় পণ, আব ভাল যাহা কিছু তাহার মালিক আমি বিশ্বাস করিতাম আল্লাকে। আর মহিলাটির সংস্পর্শ যতই আমাকে মাতাল করিয়া তুলুক, সে সংস্পর্শের প্রত্যেকটি ক্ষণই যে মার্জ্জনার অতীত দূষণীয়, তাহাতে আমার কিশোর মনের কোথাও এতটুকু সন্দেহ ছিল না। ইহাতে আমার ক্ষুদ্র জীবনটা হইয়া উঠিল এক কুরুক্ষেত্র। তিক্ত অনুশোচনার মাঝে আমি যেমন আল্লাকে বলিতাম "আমাকে বাঁচাও; আমাকে পঙ্গু কর, অন্ধ কর, ক্ষয়রোগ দাও, কুষ্ঠরোগ দাও--তবুও আমাকে বাঁচাও", তেমনি উদগ্র বাসনার মত্ততায় শয়তানকে বলিতাম "আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাও। পঙ্গু হই, অন্ধ হই, ক্ষয়রোগী হই, কুঠে হই--কুছ্‌পরোয়া নেহি; শুধু আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাও।" আর এই অনুশোচনা ও বাসনা চলিত পর্য্যায়-ক্রমে; অর্থাৎ অনুশোচনা করিতে করিতে বাসনা মত্ত হইয়া উঠিত, আর ভোগের মাঝখানে বসিয়া আমি অনুভব করিতাম অনুশোচনার বৃশ্চিক দংশন। শয়তান-দর্শনে আমি আল্লার পথকে আঁকড়িয়া থাকিতাম, প্রাণপনে শিশু যেমন আঁকড়িয়া থাকে তাহার মায়ের কোলকে অপরিচিত কাহারও দর্শনে। আর এই আঁকড়িয়া থাকিতাম, প্রাণপণে শিশু যেমন আঁকড়িয়া থাকার মাঝখানেই আমার মুষ্টি শিথিল হইয়া উঠিত, আমি শয়তানের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। উহাতে আল্লার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইত কে জানে?

উর্দ্দু বনাম বাঙলা

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

"বুলবুলে", উর্দ্দু বনাম বাঙলার যে তর্ক উত্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে দু'টি কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে, যদিচ আমি জানি যে এ বিষয়ে কথা কওয়া আমার পক্ষে এক হিসেবে অনধিকার চর্চ্চা করা হবে।

উর্দ্দু আমি জানি নে। অর্থাৎ ও ভাষা আমি লিখতেও পারি নে, পড়তেও পারি নে। অবশ্য পরের মুখে শুনলে ও ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি, আর কাজ চালানো গোছ হিন্দুস্থানী বলতেও পারি। আমাদের মুখের হিন্দুস্থানী শব্দের উচ্চারণও বিকৃত, আর ব্যাকরণ নিতান্ত অশুদ্ধ;--অর্থাৎ সেই জাতের টটি-ফুটি উর্দ্দু, যা শুনে বিশেষজ্ঞরা হাসি সম্বরণ করতে পারেন না। এক কথায় উর্দ্দু ভাষা আমাদের শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে তামিলও নয়, তেলেগুও নয়। অর্থাৎ আমাদের কাছে হিন্দুস্থানী সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। এমন কি অনেকের হয়ত বিশ্বাস যে, বাঙলা ভাষাকে একটু বেঁকিয়ে বললেই তা হিন্দুস্থানী হয়। অবশ্য এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। বাঁকাচোরা ইটালিয়ান যেমন ফ্রেঞ্চ নয়, বাঁকাচোরা বাঙলা তেমনি হিন্দিও নয়, উর্দ্দুও নয়। কিন্তু এ ভুল লোকে করে এই কারণে যে, এ দুই ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার অনেকটা মিল আছে।

এক সময়ে যখন হিন্দিকে ভারতবর্ষের Lingua franca করবার প্রস্তাব হয়েছিল, তখন আমি সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি। একই কারণে উর্দ্দুকে উত্তরাপথের Lingua franca করবার প্রস্তাব আমি প্রসন্ন মনে অনুমোদন করতে পারি নে। বাঙালী হিন্দুর ছেলেরা যদি বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি লিখতে পড়তে শেখে, ও মুসলমান ছেলেরা উর্দ্দু, তাহলে খুব ভাল হয়। ছেলেদের এ রকম ভাষা শিক্ষা তেমন কঠিন নয়। তবে ইংরাজী শিখতেই যখন তাদের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়, তখন এ প্রস্তাব করতে আমার সাহস হয় না।

২

মুসলমান সম্প্রদায়ের জনকতক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে কি কারণে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তার কারণ 'বুলবুলে' প্রকাশ করা হয়েছে। সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। হিন্দুস্থানীকে বাঙলার ঘাড়ে চাপানোর নিষ্ফল চেষ্টায় শুধু ভাষা বিভ্রাট ঘটবে। এখানে এই কথাটি আমি বলতে চাই যে, বাঙলা ভাষা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ বাঙালীর ভাষা। আমি অসংখ্য মুসলমানের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে তাঁদের মুখের ভাষার যে কোন প্রভেদ আছে, তা ত আমি বুঝতে পারি নে। অবশ্য মুসলমানেরা কতকগুলি কথা ব্যবহার করেন, যা হিন্দুরা করে না। যথা, শানকি, বদনা, পানী প্রভৃতি। এ সবই বস্তুর নাম। বদনা, শানকি কোন্ দেশীয় কথা আমি জানি নে, কিন্তু 'পানি' যে সংস্কৃত 'পানীয়' কথার অপভ্রংশ, তা সকলেই জানেন; আর বাঙলার বাইরে উত্তরাপথে, হিন্দু মুসলমান সকলেই 'পানি' শব্দ ব্যবহার করেন। বাঙলায় কেন জল চল্‌ল, তা ভাষাতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন।

অবশ্য ধর্ম্মকর্ম্ম পুজাপাঠ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানরা পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের কথা অধিকাংশ সংস্কৃত, আর মুসলমান ধর্ম্মের কথা বোধ হয় অধিকাংশ আরবী। বলাবাহুল্য এ সব কথা সংখ্যায় অতি স্বল্প এবং তাদের স্পর্শে বাঙলা ভাষা দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে যায় নি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, এ যুগে অনেক ইংরাজী শব্দ, বিশেষতঃ বস্তুর নাম, বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, এমন কি তারা সাহিত্যেও প্রমোশন পেয়েছে। আমরা, যারা ইংরাজীছুট বাঙলা লিখতে চেষ্টা করি, আমরাও তা করতে কৃতকার্য্য হই নে। একটি মাত্র উদাহরণ দেই। আর্ট শব্দটার এখন সাহিত্যে চল হয়ে গিয়েছে, কারণ বাঙলায় আর্ট নেই। পদার্থের নাম অর্থাৎ বিশেষ্য কোন ভাষারই প্রাণ নয়, এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তাদের গতিবিধি অবাধ।

কিছুদিন পরে শয়তান ভয়ানক 'ভয়ের বস্তু' হইয়া উঠিল দুইটি ঘটনায়। প্রথম ঘটনাটি হইল 'নূর হোসেনের মা'কে লইয়া। এক গভীর রাত্রে এই মহিলাকে বিছানায় পাওয়া গেল না। 'নূর হোসেনের বাপ' আসিয়া কাঁদিয়া জ্যেঠার পায়ে পড়িলেন। তিনি অনেক তালাস করাইলেন। যখন কিছুতেই 'নূর হোসেনের মা'কে পাওয়া গেল না, তখন সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তাহাকে ভূতে নিয়াছে। 'আজানে'র শব্দে ভূত টিকিতে পারে না, এজন্য পাড়া হইতে ভূত তাড়াইবার উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক স্থানে অনবরত 'আজান' দেওয়া হইতে লাগিল। উহার শব্দে রাত্রে মায়ের বুকে থাকিয়াও ভয়ে আমাদের গা-কাঁটা দিতে লাগিল। জননীরা দিনের আলো থাকিতেই ঘরে দোর দিতে লাগিলেন। ভয়টা এমন সংক্রামক হইয়া উঠিল যে, বয়স্ক সাহসী পুরুষেরাও যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া 'আজান' ছাড়িতে লাগিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ কাল পাড়ায় এই অবস্থা চলিল। ইহার মধ্যে তিন তিনবার মহিলাটিকে পাওয়া গেল, আবার তিন তিন বারই ঘরের অর্গল খুলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। প্রথম বার তাঁহাকে পাওয়া গেল--শিশু-পুত্রের কবরের উপর তিনি উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন, দ্বিতীয় বার আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি নিজেই ঘরে ফিরিয়া আসেন, আর শেষ বার তাঁহাকে পাওয়া গেল লোকাতীত,--ঘাট্লার তলায় তাঁহার শব ভাসিতেছিল। একটি নিরালা বদ্ধ জলা, দুষ্মন্ চেহারার একটি তুলা গাছ এবং আরও অনেক অস্থান লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ভূতের ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কিত বহু চাক্ষুষ সাক্ষীতে দেশ ভাসিয়া গেল। বর্ণনা যতই লোমহর্ষণ হইতে লাগিল জননীদের উহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ততই বাড়িয়া গেল। আমরা শিশু-ছোক্‌রারা ত উহা বিশ্বাস করিলামই, তদুপরি উহার নানারূপ অভিনয় শুরু করিয়া দিলাম। ... ... আজ বহু বৎসর পরে এক কথায় এই ঘটনার উপর রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে--Somnambulism!

দ্বিতীয় ঘটনাটি--ছেলেদের সেই লজ্জাকর রোগ 'শেজে মোতা', যাহা মাকে করিল যেমন উত্যক্ত আমাকে করিল তেমনি সান্ত্বনাহীন। যে করিয়াই হউক মার ধারণা ছিল যে, তাঁহার ছেলে অপরের ছেলের বহু উর্দ্ধে এবং আমাকেও তিনি উহা প্রায় বিশ্বাস করাইয়া ফেলিয়া ছিলেন। কিন্তু, এখন নেহাৎ অপর দশ জনের ছেলের ন্যায় রাতের পর রাত বিছানা ভিজিয়া মার ও আমার মাঝখানে একটা দীর্ঘ রেখা টানিয়া দিল। উহার একদিকে মা আশাহতা ক্ষুব্ধা, অপরদিকে আমি আত্মসম্মান-আহত দুঃখিত। শীঘ্রই আমি মাকে বুঝাইতে পারিলাম যে, আমার পক্ষে রাত্রে জলপান না করা, মূত্রভাণ্ড খালি করিয়া শোয়া, রাত্রে মা ডাকিলেই উঠা--কোন সাবধানতারই ত্রুটি ছিল না। তবুও যে বিছানা ভিজিয়া যায় সে আমি স্বপ্নে প্রস্রাব করি বলিয়া--যে স্বপ্নে মনে হয় আমি নির্ঘাত বাহিরের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে ও কাজটা সারিতেছি। এই স্বপ্ন যে শয়তানই দেখায় উহাতে 'বড় মৌলবী সাহেব', মা, কি আমার কাহারও সন্দেহ রহিল না। নূতন উপসর্গের জন্য গলার বোঝায় তাবিজের 'শাকের আঁটি' বাড়িয়া চলিল। ভিন্ন গ্রামের এক সম্পর্কিত জ্যেঠার তাবিজের নাম ডাক ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কেহ ভূতকে বাগে পাইয়া তাহার দাড়ি কাটিয়া বাক্স-বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন--ইহা তাঁহারা যেমন জোর গলায় প্রকাশ করিতেন, শ্রোতারাও তেমন পরম আগ্রহে বিশ্বাস করিত। ইহাঁর তাবিজও কণ্ঠে দুলান হইল। কিন্তু, শয়তানের স্বপ্ন ও উহার পরিণাম এত দীর্ঘকাল অক্ষয় হইয়া রহিল যে আমাদের সকলকেই হাল ছাড়িতে হইল। ... ... আজ পুরুষান্তরে পৌছিয়া এই রোগের জন্য যখন ছেলে-মেয়েকে ক্রিমির ঔষধ প্রয়োগ করি, তখন শয়তান বেচারীর জন্য সত্যই দুঃখ হয় যে, সে নাহক আমার জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে।

জীবনেতিহাস হিসাবে এই সকল ঘটনার কোন মূল্য নাই। কিন্তু, মো'মেনের জীবনের কতখানি জুড়িয়া আছে এই শয়তান, তাহা ভাবিলে বেশ একটুখানি চমক লাগে। কতখানি যে জুড়িয়া আছে তাহার প্রমাণ পাইলাম জীবন-গাঙ্গে যৌবন-জোয়ার যখন থিতাইয়া উঠিতেছে তখন এক পীরের সহিত প্রণয় করিয়া। তাঁহাকে দেখিলাম কয়েকদিন ধরিয়া ভয়ানক আন্দোলিত-চিত্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, একটা খট্‌কার কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। খট্‌কাটি হইল এই : কয়েকদিন যাবৎ পীর সাহেব রসুলুল্লাহ্‌কে স্বপ্নে দেখার প্রত্যাশা করিতেছেন। এখন মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ্ প্রকৃতই রসুলুল্লাহ্ কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় কি। শয়তানও তো স্বপ্নে দেখা দিয়া দাবী করিতে পারে যে, সে'ই রসুলুল্লাহ্। শুনিয়া মাথা চুলকাইয়াছিলাম, আর মনে পড়িযাছিল 'শেজে মোতা' কালে আমাদের শয়তান-ভীতির কথা।

'শেজে মোতা' আমাদের দলে এত সাধারণ ছিল যে, এই শয়তান হইতে বাঁচিবার জন্য আমরা ছেলেরা মিলিয়া বুদ্ধি করিতাম। কিন্তু, কোন বুদ্ধিতেই যখন কাজ হইল না তখন আমরা একরূপ নিরাশ হইয়াই হাল ছাড়িয়া দিলাম। এমন সময়

এরূপ কথাও শোনা গেল যে, যে যত সহজে শয়তানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে, শয়তান তাহাকে তত সকাল রেহাই দেয়। আর যে যতখানি অবাধ্য হয়, শয়তানও তাহাকে ততখানি না ভোগাইয়া ছাড়ে না। একজনের কাহিনী শোনা গেল : সে স্বপ্নে 'শেজে মোতা' শয়তানকে বলিয়াছিল, সে কিছুতেই প্রস্রাব করিবে না। শয়তান বলিল : 'তথাস্তু, কিন্তু কিছু জলপান করিবে ত এস।' ছেলেটি এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শয়তানের অনুগমন কবিল। উভয়ে এক দোকানীর ওখানে বসিয়া ভূরি-ভোজন করিল। দোকানী দাম চাহিলে দেখা গেল, কাহারও ট্যাকে পয়সা নাই। ইহাতে শয়তান ছেলেটিকে পলাইতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও দৌড়াইতে লাগিল। ছেলেটি তাহার পেছন পেছন দৌড়াইতে লাগিল, পশ্চাতে থাকিয়া দোকানীও তাড়া করিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে পড়িল এক পাঁচিল। শয়তান এক লাফেই উহা টপ্‌কাইয়া গেল; কিন্তু পেছন ফিরিয়া দেখিল ছেলেটি দু'হাতে পাঁচিল ধরিয়া ঝুলিতেছে—কিছুতেই উহা টপ্‌কাইতে পারিতেছে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, দোকানী ছেলেটির ঠ্যাঙ্ ধরিয়া ফেলিয়াছে। শয়তান তাড়াতাড়ি পরামর্শ দিল : 'দেখ্ছ কি, ব্যাটার মাথায় হেগে দাও।' যেই বলা, ছেলেটি অম্নি সশব্দে ওকাজটা কবিয়া ফেলিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, ওকাজটি করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু দোকানীর মাথার উপর নয়, তাহার নিজেরই বিছানার উপর। সেদিন এ গল্প আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমি জানি আমার বন্ধু পীর সাহেব তিন কুড়িব কোঠায় ঠেকিয়াও ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবেন।

একদিন মা, তাঁহার আল্লা ও তাঁহার শয়তান হইতে আমি দীর্ঘ এক 'ড্যাশ্' টানিয়া বসিলাম। তখন ছোট ভাই দিদার মা'র কোল আলো করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিশু হইলেও আমি বুঝিতে পারিলাম, সে কোলে আগের মত আর আমার ঠাঁই নাই। সেদিন বানের জলে 'দক্ষিণের ভিটা' ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নীড়-হারা একটি পাখীর ছানার মত আমাকে অজস্র জল শিশুরা যেন ছোট ছোট দু'হাত নাচাইয়া শুধুই ডাকিতেছিল 'আয়, আয়, আয়।' আমি মা হইতে চুরি করিয়া 'দক্ষিণের ভিটা'র প্রকাণ্ড আল ধরিয়া চুপি চুপি খালের ধাবে গিয়া বসিলাম। জলের খেলা দেখিতে দেখিতে একটি ক্ষুদ্র সঙ্কল্প এক একবার মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল। আচ্ছা, আজ যদি আমি বান-জঙ্গল-খালের মধ্যে হারাইয়া যাই, তাহা হইলে মা কী কান্নাটাই কাঁদিবেন। তাহা হইলে তিনি টের পাইবেন, আমাকে আগের মত দেখা শোনা না করার কি মজা! সেই অদ্ভুত আবেষ্টনীর মধ্যে বসিয়া আমি জীবনে প্রথম বিদ্রোহের স্বাদ গ্রহণ করিলাম। পাশেই মার ছাগলগুলি চরিতেছিল। একটি পরিচিত বাচ্চা আসিয়া আমার সাথে খেলা শুরু করিয়া দিল। বিদ্রোহের প্রথম চিহ্ন-স্বরূপ আমি গলা হইতে ঘুন্‌সীর মালাটা খুলিয়া ফেলিলাম এবং অবলীলাক্রমে উহা সেই ছাগল-ছানার গলায় পরাইয়া দিলাম। ছানাটি নাচিতে নাচিতে দলে গিয়া মিশিল। সেদিন হইতে আমি 'ক্রীড়াময় জগতে' প্রবেশ করিলাম। পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন মা, তাঁহার আল্লা ও তাঁহার শয়তানকে লইয়া।

সন্ধ্যার দিকে বাড়ির বড় ছেলেরা আমাকে খুঁজিয়া পাইল এবং 'পাক্‌ড়াও' করিয়া বাড়িতে নিয়া গেল। আমাকে হারানোর কান্না হইতে আমাকে ফিরিয়া পাওয়ার কান্নাই হইল মাত্র দ্বিগুণ। সেই মালাটির জন্য অনেক খোঁজ হইল। কিন্তু, উহার কি হইল একমাত্র সেই ছাগল-ছানাটিই বলিতে পারিত।

'ক্রীড়াময় জগতে'র এই পেশাদারী যেমনি ছিল সুদীর্ঘ, তেম্‌নি হইল উহা অবসরবিহীন। যে দিদার আসিয়া আমাকে নীড়-ছাড়া করিল, অবশেষে সেও কোমর বাঁধিয়া আসিয়া আমাদের সহিত ভিড়িল দলের কনিষ্ঠতম হিসাবে। এই জগতে শিক্ষারও কামাই ছিল না। আজ ভিন্ন এক জগতে বসিয়া হিসাব খতাইয়া দেখিতেছি, মো'মেন হওয়ার যে সকল রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা-দীক্ষা জীবনের ভোর-বেলায় আমার চতুর্দ্দিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, আমার অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপেই উহার চক্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; আর ক্রীড়াময় জগতের এই সকল শিক্ষা আমাকে জোগাইয়া আসিয়াছে সেই প্রাণ-শক্তি, যার বলে সম্ভব হইয়াছে অগ্রগতির এই পদক্ষেপে। এই ক্রীড়াময় জগতে পেশাদারী করিয়াই আমি উপলব্ধি করিলাম অধ্যবসায়ের মূল্য, সত্যবাদিতার শক্তি, আর ন্যায়ের প্রতি আমার আন্তরিক আগ্রহ। কারণ, ভাল খেলুড়েদের যে brilliance উহাকে এই অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতার দ্বারা counter-balance করিয়া আমাকে তাহাদের পাশে একখানি আসন রচনা করিতে হইয়াছিল।

জগত ক্রীড়াময় হইলেও উহাতে দায়িত্ব ও গুরুত্ব কোনটারই অভাব ছিল না। একদিন তীর ছোঁড়ার সময় আমার একটি তীর ক্ষুদ্র দিদারের উরুতে গাঁথিয়া গেল। মা কি বাবার চোখে উহা পড়িলে রক্ষা থাকিবে না, এই ভয়ে সকলের দম্ আট্‌কাইয়া গেল। ক্ষুদে দিদার ইহা বুঝিয়া দাঁত দাঁতে চাপিয়া উহা সহ্য করিল। আমি নিজ হাতে শরটি টানিয়া তুলিলাম।

কিশোর মো'মেনের জবানবন্দী

মাহ্‌বুব-উল-আলম

তখন আমি নব-যুবক। আমার দুন্‌য়া জুড়িয়া রহিয়াছে খেলা ও খেলার সাথিগণ। মার স্থান পর্য্যন্ত উহাতে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাকে আগ্‌লাইবার আশা করেন না। তাঁহার বুক এখন আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। দিনের শেষে বাড়ি ফিরিয়া যখন সে বুকে আশ্রয় লই আমার ভিতরের কিশোরটি তখন জাগিয়া উঠে এবং দিনের খেলার হিসাব-নিকাশ লইতে থাকে : আমি চেষ্টা করিয়াছি কিনা, সত্য বলিয়াছি কিনা এবং অপরের প্রতি ন্যায় করিয়াছি কিনা। এই হিসাব-নিকাশে উত্তীর্ণ হইলে আমার শান্তিতে ঘুম আসে মায়ের বুকে, আর মনে হয়, উর্দ্ধাকাশে থাকিয়া মহিমান্বিত আল্লাটি আমার উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

কিন্তু, আমার যাহা খেলা মুরুব্বীরা তাহার উল্লেখ করেন 'শয়তানি' বলিয়া। অথচ, এই খেলার হাত হইতে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। কারণ আমরা যাহা করি তাহাই খেলা হইয়া দাঁড়ায়, অথবা খেলা বলিয়া যাহা তাঁহারা ধরাইয়া দেন তাহাই আমাদের হাতে 'শয়তানি'তে গিয়া পৌঁছায়। শৈশব হইতে ইহাই চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে 'শয়তান' সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশ চোখা হইয়া উঠিয়াছে। এই ধারণার ক্রম-পরিণতির একটা ইতিহাসও আমি দিতে পারি। তাহা এইরূপ। --

তখন আমরা খোকা দিগম্বর। 'মালা ও ধূলা' খেলার উর্দ্ধে উঠি নাই। এই খেলায় মার শুধু মত পাওয়া যাইত তাই নয়, তিনি নিজেই অনেক সময় আমাদের খেলা জোটাইয়া দিতেন। তিনি ভাঁড়ার হইতে নারিকেলের মালা দিতেন, আমরা কেহ কচুর পাতা, কেহ মোচার খোল, আর কেহ বা আর কিছু নিয়া আসিতাম। পরে বুঝিতে পারিয়াছি আমাদিগকে খেলায় মাতান ভিন্ন মার ঘরকন্নার অবসর মিলিত না, আর আজ এতদূর হইতে দৃষ্টি চালাইয়া মনে হইতেছে বুঝি বা আমাদের খেলার মধ্য দিয়া মা তাঁহার বহুদিন-পূর্ব্বে-গত-নয় জীবনের আস্বাদ উপভোগ করিতেন। যাহা হউক, সে বারে জ্যেঠাদের রউফ একটি ঘড়ার কানা যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল, আর খেলা এমন জমিয়াছিল যে আজ পৌণে দুকুড়ি বৎসর পরেও ঘাট্‌লার পার্শ্বের সে জায়গাটি আমি দেখাইয়া দিতে পারি। অবশ্য যার স্নিগ্ধ ছায়ায় মা খেলার স্থানটি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, সে ডালিম গাছটি বহু পূর্ব্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, এমন যে খেলা, শেষ-মেষ দেখা গেল উহা শয়তানের চালবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, সেদিন খেলার শেষ হইয়াছিল একটা ট্র্যাজেডিতে। .....খেলার ভাঙ্গার দিক্‌টায় আমরা বাতাসে ধূলা উড়াইয়া দিতেছিলাম, এমন সময় ক্ষুদে রউফ ঘড়ার কানা হাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল--তাহার মুখে-চোখে একটা দুষ্টামির হাসি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; তাহার মতলবটা বিদ্যুতের ন্যায় আমার শিশু-মনে রেখাপাত করিল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রউফ সশব্দে ঘড়ার কানাটা আমার মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল। অতঃপর যে ক্রন্দনের রোল উঠিল তাহাতে আমার ব্যথা-দীর্ণ কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল যে পর্দ্দায়, রউফের ভীতি-কাতর কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল তাহারও দুই ডিগ্রি উপরে। কিন্তু, উভয়ের কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া শোনা যাইতেছিল রউফের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ররের sympathetic ক্রন্দন-রোল। বস্তুতঃ, কিছু না বুঝিলেও সে দাদার পক্ষ হইয়া দু'হাটুতে দু'হাতে ভর দিয়া এমন গলা ছাড়িয়া দিয়াছিল যে অতখানি ব্যথার মাঝখানেও বিস্ময় ও কৌতূহল আমার শিশু-মনকে নাড়া দিতেছিল। মা ও জ্যেঠাই হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। মা আমাকে কোলে করিলেন। জ্যেঠাই দুহাতে দুজনের পাখা ধরিয়া তাঁহার ছানাদের ঘরে তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে মায়ের কোলে চড়া আমাকে যখন জ্যেঠাদের দোর-গোড়ায় দেখা গেল, তখন পৈঠার উপর বসিয়া জ্যেঠাই রুগ্ন আলিমের মাথা ধুইয়া দিতেছেন। মা অনুযোগের স্বরে আমার মাথাটি তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি আড় নয়নে একটি বার দেখিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। আমি তখন মাথায় হাত বুলাইতেছিলাম। মাথায় নাকি বুটা বুটা হইয়া ঘড়ার কানার সুন্দর একটি ছক উঠিয়াছিল। উহা দেখিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু, দেখার কোন উপায় ছিল না। তাই হাত বুলাইয়া উহা আমি অনুভব করিতেছিলাম। আর আমার চোখের সাম্‌নে ভাসিতেছিল রউফের সেই দুষ্টামি-মাখা দৃষ্টি, যাহা আমার স্মৃতি-পথে এখনও অক্ষয় হইয়া আছে।

অবস্থাপন্ন লোক। তিন চারিখানা পানসী নৌকার মালিক ছিল সে। নৌকাগুলি তার দেশে দেশে ধান, পাট, পেঁয়াজ, বোঝাই হইয়া ছুটিত। নৌকা বেচিয়া জমি কিনিয়াছিল। পাঁচ ভাই ভাগ-বাটওয়ারা করিয়া লইয়া অংশ মত যে যাহা পাইয়াছিল তাহাতেই বেশ চলিয়া যাইত; কিন্তু ধান-পাটের দর নাই, চলিবে কেমন করিয়া? পঁয়ষট্টি বছর তার বয়েস। চৌদ্দ বছরের একটী ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। পক্ষাঘাতে ভুগিয়া সমস্ত দেহ তার একটা কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। চোখে সে দেখিতে পায় না—মুরদারের ন্যায় একই জায়গায় সারাদিন বসিয়া থাকে। কে তাহাকে ভাত রাঁধিয়া দেয়? কে তাহার সেবা যত্ন করে?

ছিন্ন পালের এক টুক্‌রা ন্যাক্‌ড়া লেঙটী করিয়া সে পরিয়াছিল। মাষ্টার ফোয়াদের মনে হইল, ও যেন একটা জীবন্ত অভিশাপ। পঞ্চাশটি টাকা ওর কাছে খাজনার জন্য পাওনা হইয়াছিল। সেই কথা ওকে জানাইলে কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া সে বলিল : আমি কি এই টাকা দিতে পারব? আমার কি সেই অবস্থা আছে? হায় হায় আমি কি পাপ করেছিলুম যে খোদা আমাকে এম্‌নি দুঃখ দিলে!

তারপর যে বাড়ীখানাতে গিয়া তার নৌকা ভিড়িল তার সম্মুখে একটা নতুন কবর। রাত্রের বেলা শৃগালেরা কবরের এক পার্শ্ব খুঁড়িয়া গলিত শবের অর্দ্ধেকটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। সেই লাশটা ঘিরিয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাটীতে আছড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল! মাষ্টার ফোয়াদের প্রজা আল্‌কুর কবর। নৌকা সে ঘাটে ভিড়াইল, দু একটা কথা উহাদিগকে শুধাইল, তারপর সে ডিঙি ভাসাইয়া চলিয়া গেল।--খাজনার তাগাদা সে কাহাকে করিবে?

তৃতীয় বাড়ীখানার সম্মুখে একটা ছোট্ট নারিকেল গাছ শাখা বিস্তার করিয়া মাষ্টার ফোয়াদকে যেন আহ্বান করিল। ডিঙিখানার গলুইটা প্রায় ঘরের ভিতে গিয়া ঠেকিল। মাষ্টার ফোয়াদ ডাকিলেন : আজীমউদ্দীন বাড়ী আছ?

বাড়ীর ভিতর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে জওয়াব আসিল।

প্রথম তার নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল একটী যুবতী মেয়ে। অনুপম প্রীতিভরা দুই চোখ মেলিয়া মাষ্টার ফোয়াদ ওর পানে চাহিলেন। বেশ ওর মুখখানা। কিন্তু, কাপড়খানা এত ময়লা কেন? শুধু ময়লা নয়, এ যে ছেঁড়া। ছিন্ন বসনের একটা ফাটল দিয়া তার উন্নত বক্ষের এক অংশ যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! সুন্দর মসৃণ বসন ফুটিয়া জাগিয়া ওঠে যে নারী অঙ্গের আভা, তাহা দেখিতে ভালো লাগে। আচম্বিতে অসম্বৃত বসনে অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারী-দেহও দেখিতে ভালো লাগে। কিন্তু, দারিদ্র্যের এই চীর বসন আবৃতা নারীর অঙ্গ মাষ্টার ফোয়াদের চোখে যেন বিষের জ্বালা মাখাইয়া দিল।

তারপর আজীমউদ্দীন আসিল। উঁচু হিলের এক জোড়া ভারী খড়ম পায়ে দিয়া গোরস্থান হইতে সদ্য উত্থিত একটা প্রেতরূপী কঙ্কালের ন্যায় সে নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার ফোয়াদ বলিলেন : খাজনার জন্য তোমার কাছে পঁচিশ টাকা পাওনা হয়েছে।

ও স্থির হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার ফোয়াদ শুধাইলেন : কতদিন থেকে তুমি রোগে ভুগ্‌ছ?

--এই এক মাস ধরে। জমী দিয়ে তো আর পেট ভরে না—তাই চোখে মুখে পথ না দেখে পদ্মায় নেমেছিলুম ইলিশ মাছ ধরতে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ তিনটী মাস রৌদ্রে শুকিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাছ ধরেছি। বেশ দুপয়সা পাচ্ছিলুম--তারপর যে আমাশায় ধরলো.....কিন্তু, আপনি মনিব, বাপ-মা। বলিয়া সে অসহায় ভাবে মাষ্টার ফোয়াদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অতঃপর আজীমউদ্দীন বাড়ীর ভিতরে গিয়া একটী টাকা আনিয়া মাষ্টার ফোয়াদের হাতে দিয়া বলিল : খাজনা তো দিতে পারলুম না হুজুর! এই একটী টাকা আপনার নজর-সেলামী দিলুম।

মাষ্টার ফোয়াদ টাকাটা ওর হাতে ফিরাইয়া দিলেন। আসিবার সময় বলিয়া আসিলেন : টাকাটা দিয়ে তোমার মেয়েকে একখানা কাপড় কিনে দিয়ো।

সেদিন যে খাজনার তাগাদা করিয়া মাষ্টার ফোয়াদ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তারপর আর কোনদিন তিনি খাজনার জন্য বাহির হইলেন না। মা কখনো তম্বি করিলে তিনি বলিতেন : ওরা খেতে পায় না, খাজনা কোত্থেকে দেবে!

অতঃপর মা। মাটীতে পা গুম্ গুম্ করিয়া ফেলিলে দোষ হয়, ইহা তিনি যেমন বিশ্বাস করিতেন, উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য তদ্রূপ আমাদের চেষ্টা করাও দরকার—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। অথচ শিশু-জীবনের কতখানি যে এই ছুটাছুটী, তাহা মা হইয়া যে তিনি না বুঝিতেন, তাও নয়। ইহার ফলে খেলার জন্য নিষেধ তাঁহার তত ছিল না, যেমন ছিল নমাজের জন্য তাকিদ। কিন্তু নমাজ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়।

তুর্কী-বালা

(দীওয়ান-ই-হাফিয)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

শীরাযের সেই তুর্কী যদি খুশী করে দিল্ আমার এ

তার এক তিলের বদলে দিই সমরকন্দ বোখারারে।

দাও গো সাকী! শরাব বাকী পাবে না হায় বেহেশ্‌তে যে

রুক্‌নাবাদের কিনারা আর মুসাল্লার এই বাগিচারে।

হায়! বেহায়া নাচুনীরা দেখ্‌তে বাহার দিল্-জ্বালানী

দিলের সবুর কেড়ে নেয় গো তুর্কীরা লুট্ যেমন মারে।

আমার আধেক প্রেমে বঁধুর রূপের নাইক কোন দরকার

সুর্মা তিলক রঙ ও ভূষণ চায় না সুন্দর মুখখানারে।

জান্তেম আমি রোজ-বাড়ন্ত য়ুসুফেরি সে-রূপরাশি

পর্দা থেকে আন্‌বে ফাঁকে মিস্‌রী সতী যুলায়খারে।

গান শোনা আর শরাব টানো কালের তত্ত্ব কেন ঢোঁড়ো?

খোলেনি কেউ খুল্‌বে নাক' দর্শনে এই সমস্যারে।

শোনো বন্ধু! কথা দুটো, প্রাণের চেয়ে বাসে ভালো

লক্ষ্মীমন্ত জোয়ান যারা বুড়ো জ্ঞানীর হিত কথারে!

দিচ্ছ গালি কবছ ভালোই বেঁচে থাকো, খুশীই আমি

মিঠে ঠোঁটে তিতো জওয়াব খাসা লাগে তাই আমারে।

গযল গেয়ে মুক্তা গেঁথে যাচ্ছ হাফিয! গাও গো এসে

আকাশ তোমায় দান দিয়েছে সুরাইয়ার ঐ হার ছড়ারে।

মাষ্টার ফোয়াদ

মহীউদ্দীন

মাষ্টার ফোয়াদ ফিরিয়া আসিলেন। নগরের কোলাহল-কলুষিত বদ্ধ-জীবন হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

আম্রকাননের ঘনছায়াপরিবেষ্টিত তার ছোট্ট বাড়ীখানার চারিদিকে বর্ষার জল নিথর ঝিলের ন্যায় সূর্য্যের কিরণে ঝিকিমিকি করে। শুক্‌নো ঝরা আমের পাতা, জামের পাতা, পাল-তোলা নৌকার ন্যায় মৃদু মন্দ স্রোতের টানে কোন নিরুদ্দেশের পানে ভাসিয়া যায়। দূর বনের কোলে ঘুঘু ডাকে। দোয়েল, শালিক, টুনটুনীগুলি ডালে ডালে নাচিয়া বেড়ায়।

উর্দ্ধে সুন্দর নীল নভ—নিম্নে সবুজ ধরণী।

ক্ষুদ্র কুটীরখানার মধ্যে হৃদয় তার অশান্ত বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে। জগতের কর্ম্ম-চঞ্চল জীবন হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে। কর্ম্মহীন শান্ত এই নির্জ্জনতার মাঝে মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া জীবনের কথাটা সে একবার ভাবিয়া দেখিবে। অলস অবসরের মাঝে ঠিক করিয়া লইবে তার জীবনের সার্থকতা কোথায়।

কিন্তু বাহিরের নির্জ্জনতায়, বাহিরের উদার অবকাশ-ভরা প্রশান্তির মধুর শীতলতায় তার হৃদয় জুড়াইলো না। হৃদয়ে যেন তার অহর্নিশি আগুন জ্বলিতেছে। সেই আগুন কেমন করিয়া নিভিবে?

চুলগুলি তার ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখের শ্রী তার দিন দিন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সে গভীর দীর্ঘশ্বাসে নিস্তব্ধ বাড়ীখানা কাঁপাইয়া তোলে, দীর্ঘশ্বাস নয় যেন বিসুবিয়াসের অগ্নি-উদ্গীরণ। কখন কখন সে হাসে। ভীষণ বন্যপ্রকৃতির সেই হাসি, সেই হাসি হাসিতে পারে শুধু মরুভূমির সাইমুম, গ্রীষ্মের কাল্‌-বোশেখী, শেলীর ওয়েষ্ট-উইণ্ড, আর ভারত মহাসমুদ্রের সাইক্লোন।

নিস্তব্ধ নিশীথে ঘরের চালের উপর দৈত্যের মত প্রকাণ্ড নারিকেল গাছটা তার শাখার আঘাত হানে। স্তব্ধ আকাশে বাদুড়ের পাখার শব্দ বাজে। স্তিমিত তারকার আলো সুদূর ছায়াপথে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

মাষ্টার ফোয়াদ শুনিতে পায়—জীবন-সিন্ধুর ওপারে মৃত্যুর বাঁশী বাজিতেছে।

কিসের জন্য সে গান গাহিবে? কিসের জন্য সে বাঁশী বাজাইবে? কিসের জন্য সে কথার রঙে রঙিন করিয়া জীবনের নিত্য নতুন আলেখ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিবে? নামের জন্য? গৌরবের জন্য? জগতের মনস্তুষ্টির জন্য? তাতে তার লাভ কি? তা'তে তার আত্মপ্রসাদ কোথায়? তৃপ্তি নাই, পূর্ণতা নাই, তবে কিসের জন্য সে গান গাহিবে? এই জীবনের রূপ যাহাদের ভালো লাগিয়াছে, গান দিয়া, কবিতা দিয়া, কথা দিয়া, কর্ম্ম দিয়া তারা তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলুক- পথে পথে, দিকে দিকে তার বিজয়ের বার্ত্তা লইয়া অভিযান করুক। কিন্তু সে কাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবে? সে কাহার জয় ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে? সে কি লইয়া তৃপ্ত হইবে?

বুদ্ধের ত্যাগ, ক্রাইষ্টের আত্মবিসর্জ্জন, মুহাম্মদের সাধনা, লেনিনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—জগত হয় তো তাহাতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু, তাহারা তার কতটুকু পাইয়াছে? সৃষ্টি রহিয়াছে—স্রষ্টা নাই। সৃষ্টিও একদিন থাকিবে না!

কিসের কৃষ্টি, কিসের সভ্যতা, কিসের জ্ঞান, কিসের বিজ্ঞান? উন্নতি কোথায়, অবনতিই বা কোথায়। মুক্তি কোথায়, বন্ধনই বা কোথায়? মিথ্যা কোথায়, আর সত্যই, বা কোথায়? মাষ্টার ফোয়াদের দৃষ্টি ছুটিয়া চলে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তরে। কল কোলাহল-মুখরিত নগর, কর্ম্মচঞ্চল জীবন-ধারা, কল-কারখানার সৃষ্টি-গোল, বেচাকেনার হট্টরোল, অর্থের ঝনঝনানী, স্বার্থের নির্ম্মম সংঘাত। পুলিশ-প্রহরীদের চঞ্চল গতিবেগ, সৈন্যগণের সশস্ত্র কুচ্‌কাওয়াজ। গগনচুম্বী সৌধতলে রাষ্ট্র-সভা বসিয়াছে, কত পাণ্ডিত্য, কত রাজনৈতিক কূটতর্ক, কত অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা। গীর্জ্জায় উপাসনার স্তোত্র, মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা, মস্‌জিদে

হিন্দু-মুসলমান

পশ্চাদ্ দৃষ্টি

লীলাময় রায়

ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে আর্য্যেরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন কর্‌বার পূর্ব্বে এ দেশে কেবল যে অসভ্য অরণ্যচারী আদিম ট্রাইবরা ছিল তা নয়। ছিলেন যাযাবর আর্য্যদের চেয়ে সভ্য স্থিতিমান দ্রাবিড় জাতি। এঁদের বসতি ছিল গ্রামে ও নগরে; এঁরা খনি থেকে মণি ও নদী থেকে মুক্তা উদ্ধার করে সাগর পারে বাণিজ্য করতেন; এঁদের ছিল অনেক রাজা, অনেক জাত, অনেক দেবদেবী। এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে আর্য্যেরা এ এদেশের উত্তরাংশ ধীরে ধীরে অধিকার করেন। অনবরত তাঁদেরকে কৃষ্ণকায়দের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সহজে দ্রাবিড়রা নিজের দখল ছাড়েননি। আর দখল যাঁরা ছাড়লেন, তাঁরা প্রধানত রাজন্য শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীর লোক কোথাও উদ্বাস্তু হয় না, তারা হয় দাস ও করে সেবা। অনুমান হয়, নিম্ন শ্রেণীর দ্রাবিড়রা শূদ্র আখ্যা পায়, চাষ করে ও যাযাবরকে কৃষিনির্ভর করে তোলে।

আর্য্যেরা ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসেছিলেন, সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে আসেন নি, অথবা অল্প সংখ্যায় এনেছিলেন। বিতাড়িত শত্রু স্ত্রী সঙ্গে করে পালাবার অবসর পায় না, নিহত শত্রুর স্ত্রীও সব সময় চিতায় দেহত্যাগ করে না। আর্য্যেরা দ্রাবিড় স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, তা নইলে রামায়ণে রামের বর্ণ শ্যাম হবার হেতু ছিল না। মহাভারতের কৃষ্ণ কালো, কৃষ্ণা কালো, অর্জ্জুন কালো। সাঙ্কর্য্যের ফলে একই বংশে কেউ বা হয় কালো, কেউ বা হয় সুন্দর।

আর্য্যেরা দক্ষিণ ভারত জয় করেন নি, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রাজাদের সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। কদাচ এক আধ জনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন, যেমন সিংহলের রাবণকে। কিন্তু তাঁদের রাজ্য গ্রাস করেন নি।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরে আর্য্যেরা, দক্ষিণে দ্রাবিড়রা, আপোষে বাস করলেন। বিগ্রহ যা হলো তা আর্য্যে আর্য্যে দ্রাবিড়ে দ্রাবিড়ে। আর্য্যদের গৃহ-বিবাদে দ্রাবিড়রা ও দ্রাবিড়দের গৃহবিবাদে আর্য্যেরা পক্ষ নিলেন। স্বয়ম্বর সভাতেও আর্য্যে দ্রাবিড়ে বর্ণ বিদ্বেষ রইল না। আর্য্যদের রাজারা ও দ্রাবিড়দের রাজারা সকলেই ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত হলেন।

বর্ণ শব্দটার অর্থ জাত বা caste নয়, রং বা colour নয়। ইংরাজীতে এর অনুরূপ শব্দ order কিম্বা estate। দ্রাবিড়দের মধ্যে নানা জাত ছিল বলে অনুমান হয়! আর্য্যদের মধ্যে জাতের বীজ পর্য্যন্ত ছিল না। বেদের প্রথম দিকে বর্ণেরও উল্লেখ নেই। আর এই প্রথম দিক হলো ভারতবর্ষের বাইরের রচনা। আমার মনে হয় আর্য্যদের সমাজে শূদ্রই আদি বর্ণ, তার পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এজমালি থেকে পৃথক হলো আরো পরে।

কালক্রমে দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্য্যদের একটা সামাজিক সমন্বয় হলো। দেশের নাম হলো ভারতবর্ষ, একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তীরা ঐক্যের প্রেরণা দিলেন। দ্রাবিড় ও আর্য্য সমাজ বলে দুটো জিনিষ থাক্‌ল না। দ্রাবিড়দের জাত ও আর্য্যদের বর্ণ এ দুইয়ের মধ্যে একটা গোঁজামিল হয়ে প্রথমটা দ্বিতীয়টার কখনো সমার্থক কখনো অন্তর্ভুক্ত হলো। সমন্বয়ের শুরুতে কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে প্রবেশ পেতো, অন্যবর্ণাকে বিবাহ করলেও বর্ণচ্যুত হতো না, বর্ণসাঙ্কর্য্য ছিল না নিন্দনীয়। কিন্তু বর্ণের আইডিয়াটার উপর জাতের আইডিয়া কেমন করে চেপে বসল, দেখ্‌তে দেখতে বর্ণের মধ্যে এলো অনুলোম প্রতিলোম, বর্ণসাঙ্কর্য্য হয়ে উঠল বিভীষিকা, অবশেষে বর্ণ পর্য্যবসিত হলো নিরর্থক শব্দবিশেষে। জাত বল্‌তে তাই বোঝায় যা জন্মকালে স্থির হয়ে যায়, যার আর ইহজন্মে পরিবর্ত্তন নেই। কখনো এর একটার থেকে অন্যান্যের প্রভেদ সূচিত হলো পেশায়, কখনো প্রথায়। কখনো এক একটা আরণ্যক ট্রাইব সমাজের ভিতর ভর্ত্তি হলো নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখা গেল জাতের দোহাই দিয়ে। শক এলো, হূন এলো, তিব্বতী এলো, চীনা এলো, মগ এলো—

কুরুক্ষেত্রে জয়-পরাজয় শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ দাঁড়াইল, ইহার জন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু, আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় দাঁড়াইয়া কিশোর আমি'র জন্য অনুকম্পায় আমার বুক ভরিয়া উঠিতেছে এই ভাবিয়া যে, যখন ক্ষুদ্র এ জীবন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল তখন আমি এতই খোকা ছিলাম যে, যেদিন সেই মহিলাটি চিরকালের জন্য আমার চক্ষু হইতে সরিয়া গেলেন, সেদিন আমি শহরের হোষ্টেলের লিচু গাছে চড়িয়া মনের সুখে কাঁচা-পাকা লিচু চিবাইতেছিলাম। এ প্রশ্ন আমার জীবনে বহুবারই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে মহিলাটী কি সাক্ষাৎ শয়তান ছিলেন? কিন্তু, মন কখনও উহাতে 'হাঁ' করিতে পারে নাই। বরং মনের চক্ষুতে আকাঙ্ক্ষার অতীত তাঁহার যে মূর্ত্তি এখন দর্শন করি উহাতে এতটুকু ময়লা ত আমার চোখেই পড়ে না, বরঞ্চ মনে হয় মৃত্যুর ওপারে থাকিয়াও তিনি আমার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীটির জন্য ঠিক সেইরূপ 'তারিফ' অনুভব করিতেছেন যেমনটি তিনি এপারে থাকিতে করিতেন। কারণ, এই মহিলাই ছিলেন আমার যত সব 'শয়তানি'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমঝদার।

জীবন-কাহিনী হিসাবে ইহা লিখিতেছি না। লিখিতেছি আমার পরবর্ত্তীকালের এই অভিজ্ঞতার তাগিদে যে, ক্রীড়াময় জগতের নির্দ্দোষ সব ক্রীড়া-কৌতুক, যাহাকে 'শয়তানি'—এই সাধারণ নামে আখ্যাত করিয়া আমরা মাতাপিতারা 'মুরুব্বিয়ানা'র আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি, উহাই ছিল সেই মহিলার কবল হইতে আমার পলায়নের একমাত্র পথ। অথচ এই একমাত্র পথ যাঁহারা রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী—শিক্ষক, বড় ভাই ও মা।

শিক্ষক ছিলেন পূর্ণবাবু—গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। বড় ভাই বয়সে আমার মাত্র বছর তিনেকের বড়, আর পড়ায় এক শ্রেণী উপরে। কিন্তু, বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি আমার উপর ষোল আনা মুরুব্বিয়ানার দাবী চালাইতেন। এই দাবী চলিত দুই কারণে। প্রথমতঃ তিনি এক কথায় মায়ের যুক্তি-তর্ককে নাবাহাল করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পঠদ্দশায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য সর্ব্বত্র তাঁহার যে খাতির ছিল, কোনরূপ প্রতিভার অধিকারী না হইয়াও শুধু তাঁহার ছোটটি হিসাবে উহার অনেকখানিই আমি ভোগ করিতাম। যাহা হউক, ইহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি-ভঙ্গী একটা বিষয়ে একরূপ ছিল। তিনজনই ছিলেন আমার ছুটাছুটি ও খেলা-ধূলার প্রতি বিরূপ। অবশ্য এ বিরূপতার মাত্রা-ভেদ ছিল।

পূর্ণবাবু ছিলেন 'বাঘা' হেডমাষ্টার। 'বাঘা' হেড্‌মাষ্টার অর্থ এই যে, তাঁহার বেতের ডগায় পল্লী-বালকদের জীবন কেন্দ্রীভূত হইতে হইবে। আমাদের কালে অনেকটা হইয়াছিলও ইহা। প্রতিদিন স্কুলে হাজিরী দেওয়া ও তাঁহার শাসন-দণ্ডের প্রতি 'পূর্ণ সমর্পণ' শিক্ষা করা, ইহাই তখন আমাদের রুটিনে দাঁড়াইয়াছিল। এই রুটিনে পাব্লিক বা প্রাইভেট কোন 'শয়তানি'র স্থান ছিল না। এইরূপ 'শয়তানি'র খোঁজে পূর্ণবাবু স্বয়ং পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পরের দিন 'Roll call' এর পর তাঁহাকে দেখিয়া গাছে চড়িয়া বা আলের আড়ালে লুকাইয়া আত্মগোপন করার জন্য ভীম-গর্জ্জন সহ যখন রমণী কি কমলের পিঠে শপাশপ্ বেত পড়িত, তখন ভীত-নিস্তব্ধ সমগ্র স্কুলই বুঝিতে পারিত, কাল বৈকালে কে বা কাহারা লুকাইয়া লাটিম ঘুরাইয়াছিল কি কপাটি খেলিয়াছিল। গুরুদেব স্বর্গবাসী হইয়াছেন। কিন্তু, অধমের পৃষ্ঠে তিনি যে একবার বেতের দ্বারা, আর অন্যবার কাঠের 'রুল' দ্বারা, অহেতুকী কৃপা-বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি 'আল্লা' কি 'শয়তান' কাহার নিকট জবাবদিহী করিতেছেন কে জানে?

দাদা চাহিতেন আমাকে রাতারাতি স্কলার এ পরিণত করা। কিছুদিন শেখানর পর যেদিন 'ছোট ভাই'র ইংরেজী অবলীলা-ক্রমে money brother বলিয়া ফেলিলাম, সেদিন তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি আচ্ছা করিয়া আমাকে পিটিয়া দিলেন। আমি আড়ালে (অবশ্য মাকে শুনাইয়া) তাঁহাকে অনেক গালাগাল করিলাম, আর সাক্ষাতে তাঁহার তামাকু সাজায় আর পাখা টানায় আরও বেশীরূপ মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু, কিছুতেই তিনি ভুলিলেন না। দিনের পর দিন আমার খেলার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া শূন্যে আনিয়া ঠেকাইলেন, আর বৎসরের শেষে নির্ঘাত আমাকে একটা বিভাগীয় স্কলারশিপ নেওয়াইয়া দিলেন। যেদিন বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ পৌছিল সেদিন আমি 'আল্লা'র প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম, আর সপ্তম শ্রেণীতে ঢুকিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার সঙ্কল্প করিলাম। অবশেষে অষ্টম শ্রেণীতে উঠিয়া স্কুল হইতে পলাইয়া নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করিয়া যখন বৎসরখানিক কাটিল, তখন বৃত্তিও গেল বন্ধ হইয়া, আমারও হইল বিদ্রোহের শাস্তি, উহাকে উপলক্ষ করিয়া যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল। money brother কেন বলিয়াছিলাম, জানি না। কিন্তু, বড় হইয়াও আমার ইচ্ছা যায়, ছোট ভাইদেরে "money brother!" ডাকিতে।

মা বলিতেন : তবে এই নামের তালুকদারী রেখে লাভ কি? বিক্রী করে ফেলো।

তিনি বলিতেন : যার কাছে বিক্রী করবো সে যদি খাজনার জন্য ওদের উপর জুলুম করে?

মা বলিতেন : তাতে তোমার আমার কি?

মায়ের প্রতি অসন্তুষ্টিতে মনটা তার ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, সেই অসন্তুষ্টির জমাট বেদনা সেই দিন জুড়াইয়া গেল, যে দিন রাত্রে আকাশে মেঘ করিয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া ঝড় উঠিল। ঘরের ভিতরে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে মা বলিয়া উঠিলেন : আহা রে, কত মায়ের ছেলে না জানি এই তুফানে পদ্মার বুকে ভাসছে! আল্লাহ্ সবাইকে তুমি সহি-সালামতে রাখ। সকল মায়ের পরাণ তুমি ঠাণ্ডা রাখ।

ঘন আম্রকাননের ছায়ায়-ঘেরা ক্ষুদ্র বাড়ীখানার মধ্যে ব্যথিত জীবনটা তার আশা ও যাতনায় চঞ্চল হইয়া ফিরে। এই জীবনটা যেন বিধাতার এক নিষ্ঠুর পরিহাস! কোমল এই শিশুমন লইয়া কঠিন এই সংসারে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? ওই সভ্য-সুন্দর বসন-বেশে সুসজ্জিত মানুষ পশুগুলির মাঝে সে কেমন করিয়া একটু স্থান করিয়া লইবে? ওদের সভ্যতা, ওদের শিক্ষা, ওদের সৌজন্য ও শ্লীলতার আবরণে লুক্কায়িত যে বিষদন্ত--যে রক্তরঞ্জিত পাশবিক নখর, তাহার আঘাত সে কেমন করিয়া সহিবে? ওদের রাষ্ট্র, ওদের ধর্ম্ম, ওদের নীতি-পদ্ধতি, আচার-প্রণালীর পবিত্রতার চমকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে শোষণবাদ, যে নিষ্ঠুরতা, যে পৈশাচিক কদর্য্য পাপ--তাহার আঘাত সে কেমন করিয়া বক্ষ পাতিয়া লইবে! প্রহরীর প্রহার-দণ্ড, সৈনিকের সম্মান-পদক, রাষ্ট্র-মহাসভার গগনচুম্বী শিখার উড্ডীয়মান বিজয়-বৈজয়ন্তী--স্মরণ করাইয়া দেয় যুদ্ধের কথা, হত্যার কথা, লুণ্ঠনের কথা, নিষ্পেষণের কথা--আর স্মরণ করাইয়া দেয় প্রকৃতি-প্রদত্ত অধিকার চ্যুত করিয়া দেহে প্রাণে মানুষকে হীন দাস করিয়া রাখিবার কথা।

ভাবিতে ভাবিতে স্নায়ুতন্ত্রী তাহার শিথিল হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে সে ঢুলিয়া পড়ে, স্বপ্নে দেখে তার বৃদ্ধ প্রজাটীর পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট দেহ, আল্‌কুর কবর, আজীমের কঙ্কাল-মূর্ত্তি। ঘরে আজ চাউল নাই--সর্ব্বস্বহীন মাতুলটী যেন না খাইয়া চলিয়া গেছে। জোরে শ্বাস টানিতে টানিতে ও ঘরের শ্বাসরোগা মেয়েটীর হৃদ্‌পিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া গেছে। আহা, এমন সুন্দর সোনার মানুষগুলি--তারা গলিত শবের মত জীবনের পর্য্যুষিত রূপ কেমন করিয়া লাভ করিল?....

সে মরিয়া যাইবে! চারিদিকের এই মানুষেরা মরিয়া যাইবে! এই পৃথিবীও বুঝি একদিন অনন্ত মহাশূন্যের মাঝে বিলীন হইয়া যাইবে! এমন একটী উপায় কি সন্ধান করিয়া লওয়া যাইতে পারে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে--অনন্ত ছায়ালোকে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে!......

নারিকেল গাছের শাখাটা টিনের চালের উপর আছড়াইয়া পড়ে--যেন মৃত্যুর পাখার ঝাপট। মাষ্টার ফোয়াদ চমকিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে--বাহিরের পানে চাহিয়া দেখে নিবিড় অন্ধকার। মনে হয়, ওই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিঃশেষে মিশিয়া গিয়া অন্তরের সকল জ্বালা জুড়ায়।

পরদিন প্রভাতে ঘনছায়া-সন্নিবিষ্ট আম্রকানন-ঘেরা ক্ষুদ্র বাড়ীখানা পরিত্যাগ করিয়া মাষ্টার ফোয়াদ আবার কোলাহল-কলুষিত শহরের পানে যাত্রা করিলেন। শহরে না গিয়া তার উপায় ছিল না, কেননা, সত্যি সত্যিই ঘরে চাউল ফুরাইয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, মা'কে চারটী ভাত খাওয়াইতে হইবেই। আর ওই সর্ব্বস্বহীন মাতুলটী, যে ভিটেটুকুও বিক্রী করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে পথে দাঁড়াইয়াছে--ও যদি ভাত খাইতে আসিয়া ফিরিয়া যার তাহাই বা কেমন দেখায়? আর ওই শ্বাসরোগা মেয়েটী--ওর জন্যই বা সে কি করিতে পারে? কবিতা লেখ, গল্প লেখ, আর যত দর্শন, চিন্তা ও ভাবের কারবারই তুমি কর না কেন, শোষণবাদী এই সমাজ তোমাকে ক্ষমা কিছুতেই করিবে না। সমাজ তোমাকে শোষণ করিবে এবং অপরকে শুষিবার যন্ত্রে পরিণত করিবে। অত্যাচারীদের শোষণের উপায় হিসাবে মানুষ বাঁচিয়া আছে। জ্ঞান নয়, গুণ নয়, মহত্ত্বও কিছু নয়--ধনিকবাদের স্বার্থ, ধনিকবাদের প্রতিপত্তি, ধনিকবাদের প্রভুত্ব, ধনিকবাদের ভোগের জীবন শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তুলিতে তুমি শরীরের কত ফোঁটা রক্তদান করিতে পার--তাহাই হইতেছে সমাজের বিচারের বিষয়। কত প্রতিভা সৈনিক হইয়া মানুষের রক্তে সঙ্গীন রাঙ্গাইয়া আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিতেছে। কত কবি, সাহিত্যিক গোয়েন্দা সাজিয়া দুই মুঠো ভাতের

সংস্থান করিয়া লইয়াছে। কত বৈজ্ঞানিক-মন রাজনৈতিক ডিপ্লোম্যাসির বিষাক্ত বিষে হাবুডুবু খাইতেছে। পথে এই কথাগুলি চিন্তা করিতে করিতে মাষ্টার ফোয়াদ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে তার ছোট্ট ডিঙ্গিখানা নাচিয়া নাচিয়া জাহাজঘাটের অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাছধরা ডিঙ্গিগুলি লাল, নীল, শাদা পাল উড়াইয়া দূরের পানে ছুটিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নদী অনেক দূরে বহিয়া গেছে--যেন আকাশের সাথে মিশিয়া গেছে।

চিরন্তন মহাশূন্যের বুকে অনন্ত সৃষ্টি ভাসিয়া চলিয়াছে অনাদি কালের স্রোতে। সেই গতির বিরাম কোথাও নাই--সেই চলার শেষও বুঝি কোথাও নাই। তবু প্রাণ চায়, এই জীবনটাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি। সত্য কি, তা কে জানে? সার্থক কি তা কে জানে? তবু যেন মনে হয়, জীবন যদি প্রেমে, স্বাধীনতায়, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত!

মাষ্টার ফোয়াদের মনে হইল, সে গান গাহিয়া জগৎবাসীকে ফুকারিয়া ডাকে : ওরে তোরা আয়। বন্দীজীবনের অন্ধকার কারা হইতে তোরা ছুটিয়া আয়। অনন্ত মহাকালের বুকে, গতিচঞ্চল ক্ষুদ্র এই পৃথিবীর বুকে, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া শুধু মুহূর্ত্তের জন্য তোরা এক হইয়া দাঁড়া। জীবনের বৃহত্তম সত্তার জয়গান গাহিয়া, মুহূর্ত্তের এই মানব-জীবনে সকল মানুষের সম-অধিকারের জয় গান গাহিয়া তোরা আয়। ভোগের, আনন্দের, সুন্দরের, জ্ঞানের বিজয় নিশান উড়াইয়া তোরা আয়। বিশ্বপ্রেমের বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিলন-সঙ্গীত গাহিয়া তোরা আয়। মুহূর্ত্তের জন্য--সীমাহীন অনন্তের বুকে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য, তোরা ফুলের মত হাসিয়া ওঠ। পাখীর মত গান গাহিয়া ওঠ। বসন্তের গন্ধমধুর মুক্ত মলয়ের মত স্বাধীনতার গৌরবে নাচিয়া ওঠ। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহেরা দেখুক--অনন্ত ছায়ালোকের অসংখ্য নক্ষত্রেরা দেখুক। দেখুক, মানুষের সকল দুঃখ, সকল বেদনা, সকল অনাচার ঘুচিয়া গেছে--জীবনের এক মন্ত্রে, এক প্রেমে উজ্জীবিত হইয়া এক মহামানবের অভ্যুত্থান হইয়াছে. . .।

ভাটিয়ালী

নজরুল ইস্‌লাম

আমি ময়নামতীর সাড়ি দেবো
চল আমার বাড়ী।
ওগো ভিন্‌-গেরামের নারী।।

আমি সোনার ফুলের বাজু দেবো
চুড়ি বেলোয়ারি।
ওগো ভিন্‌-গেরামের নারী।।

বৈঁচি ফলের পৈঁচি দেবো, আলোক-লতার বালা,
গলায় দেবো টাট্‌কা তোলা ভাঁট ফুলেরই মালা।
রক্ত-শালুক দেবো পায়ে পর্‌বে আল্‌তা তারি।
ওগো ভিন্‌-গেরামের নারী।।

হলুদ-চাঁপার বরণ কন্যা! এস আমার নায়
সর্ষে ফুলের সোনার রেণু মাখাব ঐ গায়।
ঠোঁটে দিব রাঙা পলাশ মহুয়া ফুলের মউ
বকুল-ডালে ডাক্‌বে পাখী বউ গো কথা কও!
(আমি) সব দিব গো, যা পারি আর যা দিতে না পারি
ওগো ভিন্‌-গেরামের নারী।।

নামাজের তক্‌বির। বস্তাবন্দী মাল দেশবিদেশে যাতায়াত করিতেছে--সমুদ্রে জাহাজ, স্থলে গাড়ী, আকাশে ব্যোমযান। বৈজ্ঞানিক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গবেষণা করিতেছেন, শিক্ষার্থী শিক্ষা করিতেছেন, দার্শনিক চিন্তা করিতেছেন, কবি গান গাহিতেছেন। ধনিকের উৎসব-সভায় শরাবের গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে--ভোগ, আনন্দ উপচিয়া পড়িতেছে। ধনের লিপ্সা, গৌরবের লিপ্সা, প্রতিপত্তির লিপ্সা সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া জগতকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে। তাহারই পাশে পাশে শ্রমিকের গৃহে কোথায় হাহাকার উঠিতেছে--খাইতে না পাইয়া কে আত্মহত্যা করিয়াছে--মায়ের বুকে কোন্ দুগ্ধপোষ্য শিশু শুকাইয়া মরিয়াছে।

দিকে দিকে যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে, অস্ত্রের ঝনঝন্ রব উঠিতেছে, সৈন্যগণের গর্ব্বিত পদধ্বনি জাগিতেছে। পৃথিবীর এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আসন্ন এক মহাপ্রলয়ের নিঃসীম স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেই স্তব্ধতার বুকে গভীর পদবিক্ষেপে তারা অগ্রসর হইতেছে। একদিকে লাল নিশান উড়াইয়া কমিউনিজ্‌মের রক্ত-সেনা, একদিকে কালো নেকাবে আবৃত ফ্যাসিজ্‌মের ভীষণ-দর্শন প্রেত কঙ্কাল, আর একদিকে ব্যথিত মানবাত্মার বেদনার নীল রক্তে আর্দ্র নিশান উড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে বিশ্বের ক্ষুধা লইয়া অগণিত ইম্পিরিয়ালিষ্ট্ সেনা। দৃষ্টি তার শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। কর্ম্ম নয়, কোলাহল নয়, সে চায় প্রশান্তি, সে চায় [illegible] আরাম, সে ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে।

আবার সে শুনিতে পায়--জীবনসিন্ধুর ওপারে মৃত্যুর বাঁশী বাজিতেছে।

বাঁশী বাজাইতে ভালো লাগে না, কবিতা লিখিতে মন চায় না, কথা কহিবার লোক সে পায় না। একেলা সে বসিয়া থাকে। আম্রকাননের ছায়া-ঘেরা এই বাড়ীখানা--কোন দুঃখ, কোন বেদনা, কোন অভাব যদি ইহাকে স্পর্শ না করিত। সোরাহীতে অফুরন্ত শরাব, সোনার খাঞ্চায় ভোগের সম্ভার, অনন্তযৌবনা একটী সহচরী,--অকারণে আলাপ করিত, অনাহুত গান গাহিত, কবিতা লিখিত। চুম্বন, আলিঙ্গন, ভোগ। অবসাদ বিহীন প্রাণ, ক্লান্তিহীন জীবন, অনন্ত ফূর্ত্তি, অনন্ত উৎসব, আর মাঝে মাঝে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার নিদ্রা।

দিন চলিয়া যায়। আঁচল উড়াইয়া তার সম্মুখ দিয়া কেহ চলে না। নূপুর বাজে না। বাতাসে কাহারও গায়ের গন্ধ ভাসিয়া বেড়ায় না। কেহ তাহাকে ডাকিয়া শুধায় না। নিস্তব্ধ গৃহতলে সান্ধ্য-প্রদীপের সোনালী প্রভায় কাহারও রাঙা মুখ উদ্ভাসিয়া ওঠে না। রূপালী চাঁদের আলোকে ছোট্ট উঠানটুকুর মধ্যে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনন্ত মহাশূন্যের মাঝে মনের খেয়ালে সে গড়িয়া তোলে এক অপূর্ব্ব জীবন। সেখানে মানুষের কায়া সোনার আলোকে গঠিত, নীল বসনে আবৃত তাহাদের অঙ্গ, রূপার পেয়ালা ভরিয়া তারা অমৃত-রস পান করে। কাম নাই, তাহাদের আছে শুধু প্রেম। ক্ষুধা নেই, তাহাদের আছে শুধু পিপাসা। অনন্ত পুলক-ভরা সেই জীবন। অসীম ছায়াপথে তারা কেবল ভাসিয়া বেড়ায়--চিরন্তন সহচর ও সহচরীর দল।

সহসা কী যেন এক বেদনার আঘাতে ছিঁড়িয়া পড়ে তার সেই কল্পনার স্বর্ণসূত্র। সে শুনিতে পায় গ্রামের কোলে কোন্ দুখিনী যেন কাঁদিতেছে। ওই ঘরে শ্বাসরোগা মেয়েটী অসহায় ভাবে হাঁফাইতেছে। সর্ব্বস্বহীন মাতুলটী তার আজ রাত্রে খাইতে আসে নাই। টাকা যাহা আনিয়াছিল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনার কবি-কল্পনার কথা মনে করিয়া মাষ্টার ফোয়াদ লজ্জিত হইলেন। মস্তিকের শিরায় শিরায় তার বেদনার চঞ্চল নৃত্য জাগিয়া উঠিল।

পিতামহের আমলের শেষ সম্বল বার্ষিক পঁচিশ টাকা আয়ের একটা তালুক। তার বছর দশেকের খাজনা বাকী পড়িয়াছে। মায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধে মাষ্টার ফোয়াদ সেদিন খাজনার তাগাদায় বাহির হইলেন।

ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে থির জলে ঢেউ তুলিয়া ভাড়াটে ডিঙ্গিখানা চলিল। বিলের পারে বড় বাড়ীখানার হিজল বাগানে পাখীরা কলরব করিতেছে। জলের উপরে দ্বীপের ন্যায় জমাট শ্যাওলা-ঘাসের উপর 'কেউচা' পাখীগুলি নাচিয়া বেড়াইতেছে। পুকুরের ধারে নলের বনে একটা নল-ডোবা পাখী বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। ও বাড়ীর বউটী ঘাটে কলস বুড়াইতে আসিয়া তার ডিঙ্গিখানার দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবে, আকাশের এই ভাসমান শাদা মেঘখানার মত অনন্তকাল সে যদি ভাসিয়া বেড়াইতে পারিত।

যে প্রজাটীর বাড়ীতে প্রথম সে খাজনার তাগাদা করিবার জন্য নামিল, সেই গ্রামে সে-ই ছিল একদিন সকলের চেয়ে

কে যে কখন এসে চুপ করে এক একটি জাত হয়ে বস্‌ল, তার কালপঞ্জী নেই। জাতের বাঁধন খুলে যারা বেরিয়ে গেল তারাও পত্তন করল নতুন এক একটা জাত। এখনো জাত ভাঙ্‌ছে, গড়ছে জাতের তালিকা বাড়্‌ছে।

আর্য্যেরা যখন প্রথম আসেন তখন তাঁদের দেবতারা ছিলেন আকাশের উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্র ও অন্তরীক্ষের প্রবল মেঘ বায়ু ইত্যাদি। আর অনুমান হয় যে দ্রাবিড়দের দেবতারা ছিলেন নদীর, বনের, ভূমির, শস্যের, গ্রামের, নগরের অধিষ্ঠাত্রী। দেশে যে সব আদিম ছিল তাদেরও দেবতা ছিল--তাদের দেবতারা পশুর, পক্ষীর, সরীসৃপের, ভূতপ্রেতের প্রাণরহস্য। মোটামুটি বল্‌তে পারা যায় যে আর্য্যদের দেবতারা আকাশের, দ্রাবিড়দের দেবতারা মাটীর, আর আদিমদের দেবতারা প্রাণীলোকের। মহাভারতের যুগে আর্য্যে দ্রাবিড়ে--ও কতকটা আদিমে--সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের উদ্যোগ চলেছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের তীর্থ সার্ব্বজনীন হলো। গঙ্গা, গোদাবরী ইত্যাদি নদীর পবিত্রতা স্বীকৃত হলো সর্ব্বত্র। গ্রাম্য নালাগুলিকেও তত্রত্য লোকে গঙ্গা গোদাবরী ইত্যাদির বিভিন্ন নামরূপ বলে বুঝল। দুর্গা ছিলেন আর্য্যদের দৈত্যকুলনাশিনী রণশক্তি। তিনিই হলেন গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবতা, পুরে পুরে পৌরদেবতা এবং অবশেষে বিশ্বজননী, নিকটতম আত্মীয়, মা। দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গ পূজা প্রকৃতপক্ষে প্রজাসৃষ্টির অপার রহস্যের প্রতি বিস্ময়-জ্ঞাপন। আর্য্যদের প্রলযঙ্কর রুদ্র সেই রহস্যের সম্পূর্ণ বিপরীত রহস্যের প্রতীক। দুই কেমন করে এক হলো।

উপরে বলেছি যে আদিম-দ্রাবিড়-আর্য্য ব্যতীত অন্য অনেকে নানা দিক থেকে চুপি চুপি এসে ভারতবর্ষের সমাজে মিশে গেছ্‌ল। হিমালয়ের ওপার থেকে গিরিসঙ্কট দিয়ে কখন কে এলো কেউ তার খোঁজ রাখেনি। সেই সব মঙ্গোলীয় ট্রাইব শুধু হাতে আসেনি নিশ্চয়। তাদেরও কিছু দেবার ছিল ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে। ভারতের উত্তরে চীনের প্রভাব অতি পুরাকাল থেকে সক্রিয়। তারই বাহক হয়ে এই মঙ্গোলীয় ট্রাইবরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল বলে অনুমান করবার কারণ আছে। এদের মুখপাত্র বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব মহাভারতীয় সমন্বয়ে বাধা দিলেন না, তিনি দেবতাও মান্‌লেন, জাতও মেনে নিলেন, স্বর্গ-নরকও স্বীকার করলেন, জন্মান্তরেও আস্থাবান হলেন। তিনি সইতে পারলেন না যাগ-যজ্ঞে পশুবলি, রাজ্য-বিস্তার-ছলে নরহত্যা। তিনি দেখ্‌লেন যে জন্ম-জন্মান্তরেও দুঃখের বিরতি নেই, এবং দুঃখই প্রাণীভাগ্য। তিনি খুঁজলেন সেই অবস্থা যার পরে আর জন্ম নেই, আর দুঃখ নেই, আর মৃত্যু নেই। প্রাণীমাত্রেই যে আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা, দেবতার উপর বিধাতার উপর নির্ভর করবার প্রয়োজন যে নেই, এত বড় পুরুষকারের বাণী বিদ্রোহ ঘোষণার মতো শোনালো।

ঋষিদের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ আদর্শের বিরোধ উপস্থিত হলো। হত্যাকে ঋষিরা একান্ত বলে জান্‌তেন না। যে মরল সেও স্বর্গে গেল, যদি তার মৃত্যু বীরের মৃত্যু হয়। ইহলোকে যে দুঃখ পেল তার জন্য রয়েছে পরলোকে সুখ। এ জন্মের ক্ষতিপূরণ করে দেয় এর পরের জন্ম। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি, এইরূপে জগৎ চিরকাল থাকবে। দেবতাদেরকেও ঋষিরা স্বতন্ত্র করে দেখ্‌তেন না। তপস্যার বলে মানবও দেবত্ব পায়, দেবতারাও নানারূপে মানব-পরিবারে অবতীর্ণ হন। ভগবানের সঙ্গেও জীবের বিচ্ছেদ নেই। তিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে নিয়ে রয়েছেন। তাঁর থেকে নিজেকে অভিন্ন বলে জান্‌লে, সমুদয় বস্তুতে তাঁকে উপলব্ধি করলে ইহলোক থেকে উপরত হয়ে অমৃত হওয়া যায়।

বুদ্ধদেব স্বতন্ত্র একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন না। প্রতিষ্ঠিত সমাজে ওলট পালটও ঘটালেন না। তিনি যা রেখে গেলেন তার নাম সঙ্ঘ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের সমবায়। গৃহস্থেরা জাত রাখ্‌লেন, পেশা রাখ্‌লেন, কোনো একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন না। কেবল তাঁদের ক্রিয়াকর্ম্ম, তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সঙ্ঘের দ্বারা নির্দিষ্ট হলো। বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজন্যদের দাক্ষিণ্যে সঙ্ঘ কালক্রমে প্রভূত সম্পত্তিশালী হয়ে ওঠে। তাতে রাজানুগ্রহজীবী ব্রাহ্মণদের হয় স্বার্থহানি। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে কত স্ত্রী কত পুরুষ সন্ন্যাস নেয়। তাতে সমাজ হয় বিক্ষুব্ধ। যারা ঋষিদের শিষ্য হতে পারত তারা সঙ্ঘে গিয়ে শ্রমণ হওয়ায় আশ্রম শূন্য হয়, ঋষিরা হন্ বিলুপ্ত। ঋষিদের আশ্রমে নারীর স্থান ছিল, শিশুর স্থান ছিল। যোগীরা পর্ব্বত গুহায় লুকিয়ে যে সাধনা করলেন সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্র রইল না।

এমন সময় এলেন আচার্য্য শঙ্কর। তিনি তাঁর অতুল বিদ্বত্তার দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করে সঙ্ঘের প্রতি রাজন্যদের যে আনুকূল্য ছিল তকে পাত্রান্তরিত করলেন। সঙ্ঘের উপর থেকে তরুণদের মোহ অপসৃত হয়ে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠকে আশ্রয়

করল। সঙ্ঘের অর্থবল ও জনবল যতই কম্‌ল, মঠের অর্থবল ও জনবল ততই বাড়্‌ল। কাজেই সঙ্ঘের গৃহস্থ-পোষকরা মঠের দিকে ঝুঁক্‌লেন। সঙ্ঘ গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। তবে সঙ্ঘ ইতিমধ্যে ভারতের বাইরে শাখা স্থাপন করেছিল। সেই সকল শাখা বৌদ্ধ মতকে মানবের মধ্যে এখনো জীবিত রেখেছে।

শঙ্করের পরে এলেন রামানুজ। শঙ্কর ছিলেন পুরাতনের পুনরাবর্ত্তক, রামানুজ হলেন নূতনের প্রবর্ত্তক। ভারতীয় সাধনায় তিনি আন্‌লেন ভক্তির সুর। দেবতার পূজা গেল, তার স্থান নিল দেবতার অবতারের—দেবতার অংশসম্ভূত মনুষ্যের—পূজা। সে পূজায় ছিল অনাত্মীয়ের নিকট অভীষ্টলাভের কামনা। এ পূজা আত্মীয়তমের নিকট নিষ্কাম আত্মনিবেদন।

পরে যাঁরা এলেন তাঁরা দেবতাকেও মানুষ করে অবতারেরই মতো আত্মীয় করে তুল্লেন। মহাদেব হয়ে উঠলেন পাগ্‌লা ভোলা আশুতোষ, ভাঙ্‌ খেয়ে নাচ্‌লেন। সাগরোত্থিতা লক্ষ্মীর চেহারা হলো চাষী গৃহস্থের নিরীহ মেয়ের মতো। দেবতায় মানুষে ভেদ রইল না, মানুষ হলো দেবতা, দেবতা হলেন মানুষ। রামানুজ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে যে আকার নিল তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কথায়—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

রামানুজ দক্ষিণ ভারতের লোক। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি তাঁর ভক্তির সুরটি পেলেন মালাবারের খ্রীষ্টানদের কাছে। ততদিনে খ্রীষ্টীয় মত মালাবারে পৌঁছেছে। খ্রীষ্টীয় মতের আজ আমরা যে প্রকার দেখ্‌ছি তা ইউরোপ কর্ত্তৃক বিবর্ত্তিত। কিন্তু রামানুজের দিনে তা ছিল আদিম। তার মধ্যে যা বৈদেশিক, যা ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধ, তাকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র তার ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করা রামানুজের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। মানুষের প্রতি প্রেমে দেবতা হলেন মানুষ, সেই মানুষের প্রতি প্রেমে হবে মানুষের ত্রাণ।

রামানুজও সমাজের কাঠামো বদ্‌লালেন না। তিনিও সমাজের বাইরে মঠ স্থাপন করলেন। সে তরুণরা গৃহী হয়ে সমাজের শক্তিকে উদ্যত রাখ্‌ত, দেশরক্ষার দায়িত্ব নিত, তারা তো সন্ন্যাসী হলোই, তাদের প্রভাবে গৃহীদের মধ্যে জন্মালো একটা হীনতাবোধ। ওঁরাই উত্তম, আমরা অধম। ওঁরাই স্বামী, আমরা দাস। —এই দাসমনোভাব ইংরাজ আমলের নয়, তার বহু শতাব্দী পূর্ব্বের। এই মনোভাব প্রাঙ্‌ মুসলমান। এরই সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা এ দেশে এসে অনায়াসে রাজা হয়ে বস্‌লেন।

মুসলমানরা যদি কেবল দেশের মাটী দখল করতেন তবে একদিন তাঁরা শক হূনদের মতো ক্ষত্রিয় হয়ে যেতেন। মাটী নিয়েই তাঁদের সাধ মিট্‌ত। কিন্তু দেশের চিত্তের উপর তাঁদেব আগমনে সাড়া পড়ল।

এই সাড়ার ফল হলো দুটি। (১) সমাজে যাদের উপর অবিচার করা হয়েছিল, যাদের অবনমিত করে মানুষ হিসেবে খর্ব্ব করা হয়েছিল, সেই সব বামনের কানে ইস্‌লাম বল্ল, "তোমার উচ্চতা কারুর চেয়ে কম নয়। আমার দীক্ষা নিলে দেখ্‌বে ঐ কূপমণ্ডূকগুলোর চেয়ে সত্যি তুমি মাথায় উঁচু।" মুসলমান হওয়া মাত্রই তাদের বামন-মনোভাব যেন যাদুকরের যষ্টির স্পর্শে রূপান্তর লাভ করে বনস্পতি-মনোভাব হয়ে দাঁড়ালো। (২) ভারতীয় সাধনায় আর একটি নূতন সুর এলো—অলখ নিরঞ্জনকে মানুষ না করে তুলে, তাঁর মানুষিক বিকারকে তিনি বলে আত্মবঞ্চনা না করে, সোজা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়া, আপনার অন্তরকে তাঁর মন্দির কবে সেইখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া। নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকরা এই সুরকে দেশের আউল বাউলের কণ্ঠে দিলেন। এই সুর আধুনিক কালে রামমোহনের, মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে। এব সঙ্গে ভারতীয় সাধনার অন্যান্য সুরগুলিরও সুন্দর সঙ্গত ঘটেছে বলে এত শোভা।

মুসলমানের সঙ্গে ভারতীয় সাধনার বন্ধুতা তা সহজেই হলো, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বিবোধ মিট্‌ল না, আজো মেটেনি।

গান

নজরুল ইস্‌লাম

আমি অলস উদাস আন্‌মনা।
আমি সাঁঝ-আকাশে শান্ত নিথর
রঙীন মেঘের আল্‌পনা।

অলস যেমন বনের ছায়া
বিজন পথে বিছায় মায়া,
যেমন অলস তৃণের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা।

নদীর তীরে অলস রাখাল
এক্‌লা ব'সে রয় যেমন,
যেমন অলস নীড়ের পাখী
গান গেয়ে যায় অকারণ,
যেমন অলস দীঘির জলে
থির হয়ে রয় কমলদলে,
তেম্‌নি অলস, স্বপন আমি
কুহেলিকা কল্পনা।।

অলস তুহিন গিরির শিরে,
অলস ফেনা সাগর-নীরে,
গগন-ঘেরা গ্রহ তারার
যেমন নীরব বন্দনা—
আমি অলস উদাস আন্‌মনা।।

রামমোহন রায়
কাজী আবদুল ওদুদ

বাল্যজীবন

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামমোহনের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত একালের বিশেষজ্ঞেরা মেনে নিয়েছেন।

তাঁর বালককালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো; একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে ঘটেছিল একথা সবাই জানেন, দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখ্‌তে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য। কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক বুদ্ধদেবকে আমরা দেখ্‌তে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্য্যবেক্ষণশীল। বালক মোহম্মদ সম্বন্ধে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। --তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধৃবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে, তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না,একথা আজ সুবিদিত; তার সঙ্গে একথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নাই, বিগতজীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্য অশ্রু-তর্পণ তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল, the oriental gentleman, versatile, emotional, yet dignified এটি যথার্থ ধারণা।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠশিক্ষা লাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

রামমোহন ও মুস্‌লিম সাধনা

পাটনায় কিশোর রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু তাঁর জীবনের উপরে এর প্রভাব গভীর। এই প্রভাবের স্বরূপ একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রের যে সব আলোচনা রামমোহন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সে সবের অধিকাংশই আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছিলেন, অথবা করবেন আশা করেছিলেন, তার কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌছায় নাই। তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে অবশ্য কোরআনের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে, কিন্তু সে-আলোচনা তিনি করেছেন শাস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়ে, শাস্ত্র স্বীকার করে নয়। তবু এই তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থ ও তাঁর রচনার নানাস্থানে ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি আভাস ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে মুস্‌লিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অথবা তাঁর চিত্তের উপরে মুস্‌লিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ অনেকখানি বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই বলেছেন, তাঁর স্বসম্প্রদায়ের প্রতীক উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, এর মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। শুধু এইই নয়। খৃষ্টান সমাজের ত্রিত্ব-বাদ, যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা, অথচ যিশু-

খৃষ্টের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা, এ সমস্তেরও মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। যথা ঃ--তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রশংসা! তিনি পরম সমৃদ্ধ। আকাশে ও মাটিতে যা-কিছু আছে সব তাঁর। এর সমর্থক কিছু তোমাদের নেই। এমন কথা কি বলছ তোমরা আল্লাহ্র সম্বন্ধে যা তোমরা জান না? (১০:৬৭) আর আমরা মেরি-তনয় যিশুকে পরিচ্ছন্ন নির্দ্দেশ দান করেছিলাম ও তাকে "রুহুল কুদুস" (Holy Spirit) দ্বারা বলীয়ান করেছিলাম (২:৮৭)। --যিশুর প্রার্থনা নামে কোরআনের একটি আযেত আছে, তার অর্থ এই : "তুমি যদি তাদের শাস্তি বিধান কর (তবে)--তারা তোমারই দাসানুদাস; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তবে)-- তুমি মহান ও জ্ঞানময় (৫:১১৮)।" প্রসিদ্ধি আছে যিশুখৃষ্টের এই কোরআনোক্ত পরম নির্ভরতার প্রার্থনাটি একদা হজরত মোহম্মদ সমস্ত রাত্রি আবৃত্তি করেছিলেন।

শুধু এই-ই নয়। কোরআনের আরো বহু বাণী রামমোহনের মর্ম্মস্পর্শ করেছিল। কোরআনের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, প্রকৃতির দিকে, মানুষের ইতিহাসের দিকে, কোরআন বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে--সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বৃষ্টি বসন্ত-বায়ু কেমন করে' আল্লাহ্র মহিমাকীর্ত্তন করছে, মানুষের সেবায় এ সবের নিয়োগ হয়েছে, ফলে জলে শস্যে মানুষের কেমন পরিতোষ সাধন হচ্ছে এবং এই সব বিশ্বপাতার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামমোহন তাঁর তুহ্ফাতুল মুওয়াহ্হিদীন গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সব যুক্তি যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিধর্ম্মীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধেও কোরআনে কয়েক জায়গায় সুন্দর উপদেশ আছে,যথা. -- আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানতা বশতঃ সীমা অতিক্রম করে' আল্লাহ্কে গালি দেয়....(৬:১০৯)। যারা.....ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয়লাভ করবে (১৩:২২)। আমার ভৃত্যদের বল যা উত্তম তাই তারা বলুক (১৭:৫৩)। তারাই পরম কারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (শান্তি) (২৫:৬৩)।

নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করেছেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করবার উপদেশ কোরআনে বিস্তৃতঃভাবে আছে। যথা :--হে বিশ্বাসিগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরে পাবার জন্য তাদের বিপন্ন করো না অবশ্য যদি তারা জ্বলজ্যান্ত ভাবে অন্যায়াচরণ না করে, আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর; এরপর যদি তোমরা তাদের ঘৃণা কর তা'হলে, হতে পারে, তোমরা এমন একটি জিনিষ অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ পর্য্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (৪:১৯)। --নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার হজরত মোহম্মদের নিজের চরিত্রেও লক্ষ্যযোগ্য। যখন তিনি মদিনার রাজা তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁকে দেখেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন ও নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসবার জন্য।

কিন্তু কোরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে, সে-সবের পাশে পাশে কোরআনের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

কোরআন : --

..তাঁর তুলনা ব্যক্ত করবার মতো কোনো-কিছু নাই (৪২:১১)। আকাশ ও পৃথিবীর অপূর্ব্ব স্রষ্টা,--আর যখন তিনি কোনো-কিছু সংকল্প করেন তিনি শুধু সেটিকে বলেন, হোক, আর তা প্রকাশ পায় (২:১১৭)।

ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

কোরআন : —

তিনি জানেন তাদের অগ্রে কি আছে ও তাদের পশ্চাতে কি আছে, তাঁর যেটুকু অনুগ্রহ সেটুকু ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না; তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত, আর এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না........(২:২৫৫)।

কে বুঝিবে তার মর্ম্ম
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম
গুণাতীত পরব্রহ্ম কারণ।

কোরআন : দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু তিনি (সব) দৃষ্টি দর্শন করেন। তিনি সূক্ষ্মের পরিজ্ঞাতা—সদাজাগ্রত (৬:১০৪)।

ঈশ্বর, আত্মা বা প্রত্যাদেশ ইত্যাদির স্বরূপ চিন্তায় মানুষ বিব্রত হবে এ কোরআনের অভিপ্রেত নয়, যথা : "তারা তোমাকে প্রেরণা (প্রত্যাদেশ, আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে; বল, আমার প্রভুর হুকুমে প্রেরণা আসে, আর জ্ঞানের অতি অল্প অংশই তোমাদের দান করা হয়েছে" (১৭:৮৫)। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয়, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বুঝতে হয় এ কথা রামমোহন বারবার বলেছেন।

অনেকের ধারণা—কোরআনের আল্লাহ্ এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর, তাঁর ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত, দণ্ড বা পুরস্কার যা খুশী তাই তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে প্রদান করেন। এ সব ভাব যে কোরআনে নাই তা বল্‌বো না। কিন্তু কোরআন একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়—কোরআনের আল্লাহ্ অনন্ত মহিমান্বিত, সদা জাগ্রত, আর প্রেম-প্রবণ। এই আল্লাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য কোরআনে বারবার বলা হয়েছে—"আমেনু ও আমেলুস্ সালেহাত"—বিশ্বাস কর ও সৎকর্ম্মশীল হও। এই সৎকর্ম্ম বল্‌তে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্ম্মের কথাই ভাবা হয়েছে, যদিও অনেক মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য সৎকর্ম্মের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার উপরে বেশী জোর দেন না। সৎকর্ম্ম (লোকশ্রেয়ঃ) বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্ম্মের কথাই যে রামমোহন বুঝতেন সে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

মুসলমানের চিন্তায় কোরআনের স্থান সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু এই কোরআন কিভাবে বুঝতে হবে সে সম্বন্ধে সব মুসলমান নিশ্চয়ই একমত নন। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে সব মুসলমান কোরআন বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোতাজেলা-দল সুবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের অনুভূতি বিশেষভাবে তার সত্যোপলব্ধির সহায়ক, এই মত যে-সমস্ত মুসলমান পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সূফী সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা সুবিখ্যাত। রামমোহনের চোখে যে ইসলাম্ মহিমা বিস্তার করেছিল সে-ইসলাম্ সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের ইস্‌লাম তেমন নয়। ইস্‌লামের সেই পরিচিত রূপে তিনি যে তৃপ্ত হতে পারেন নাই, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর Second Appeal to the Christian Public এর এই উক্তি থেকে—Disgusted with the puerile and unsociable system of Hindoo idolatry, and dissatisfied at the cruelty allowed by Mussalmanism against Non-Mussalmans, I, on my searching after the truth of Christianity, felt for a length of time very much perplexed with the difference of sentiments found among the followers of Christ (I mean Trinitarians and Unitarians, the grand division of them) until I met with the explanation of the unity given by the divine teacher himself as a guide to peace and happiness. (Panini Office Edition, 1906, Page 580) তিনি যে-ইস্‌লাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে-ইস্‌লাম মোতাজেলা ও শ্রেষ্ঠ সূফীদের ইস্‌লাম।

সাদী হাফিজ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সুফী সাহিত্যিকদের রচনা তাঁর চিত্তের সন্তোষসাধন করেছিল। তাঁর কয়েকটি অতিপ্রিয় বচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হাফিজের একটি গজলের এই দুই চরণ :

ইহাকাল ও পরকালের আরাম এই এক কথায়—
বন্ধুদের নিয়ে উৎসব কর, শত্রুর সঙ্গে আপোষ কর।।

তাঁর তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীনে হাফিজের আরো দুইটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে :

বায়াত্তর দলের ঝগড়া নিরর্থক
সত্য না বুঝে তারা খেয়াল ও মূঢ়তার পথে চলেছে।।
কারো অনিষ্টাচারী হয়ো না, আর যা খুশী কর,
আমাদের পন্থায় এ ভিন্ন আর কোনো পাপ নেই।।

আর সাদীর এই বাণীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল :

জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম্ম আব কিছু নয়।
তস্‌বিহ্‌ জায়নামাজ (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম্ম নাই।।

তিনি নাকি মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, এই বচনটি যেন তাঁর সমাধি-গাত্রে উৎকীর্ণ হয়। আর ভারতীয় কৃষকের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে' তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য East India Company-র কর্ম্মকর্ত্তাদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাদীর এই বাণীটি উপহার দিয়ে—

প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এই ভাবে) তোমার
শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।
কেননা ন্যায়পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা।।

সুফীদের যে-সব বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন সে-সবের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্ত সুস্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সবাই জানেন ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ সম্পর্কে সুফী-সাহিত্যে অনেক তত্ত্বপূর্ণ কথা আছে। মৌলানা জালালুদ্দিন : রুমির কবিতায় অদ্বৈত-তত্ত্ব আশ্চর্য্য সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেছে। সে সবে রামমোহন কতখানি আনন্দিত হতেন তা তেমন জানতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফীদের সুগভীর মানব-প্রেম বা জীব-প্রেম যে তাঁর পরম আনন্দের বিষয় ছিল সেটি অতি সুন্দর ভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা আজ এ বিষয়ে একমত যে বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে করেছিলেন। সেই বিশ্ব-মানবের একত্ব সম্বন্ধে সাদীর এই বাণীটি সুবিখ্যাত—

আদম-সন্তানরা একে অন্যের অঙ্গস্বরূপ
কেননা তাদের উৎপত্তি একই মূল থেকে।
যদি এক অঙ্গে বেদনা বাজে
তাহলে অন্য অঙ্গও শান্তিতে থাকে না।
মানুষের দুঃখ যদি তুমি না বোঝো
তাহলে মানুষ নাম নেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।

সুফী সাহিত্য রামমোহনের অন্তরকে আনন্দিত করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর ও বাহির উভয়কে বীর্য্যবন্ত করেছিল মোতাজেলা-বাদ। তাঁর যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান অস্ত্র গৃহীত হয়েছিল মোতাজেলা তূণ থেকে, যথা —

(১) ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; কিন্তু তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না, তাঁর সমকক্ষ আর একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না।

(২) ঈশ্বরের গুণ তাঁর সত্ত্বা থেকে পৃথক নয়, গুণের স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করলে ঈশ্বরের একত্ব নষ্ট হয়। প্রধানতঃ এই যুক্তির দ্বারা রামমোহন বিভিন্ন দেবদেবীর ঈশ্বরত্বের দাবী খণ্ডন করেছেন।

(৩) রামমোহন বলেছেন বেদ নশ্বর। মোতাজেলারা বলতেন, কোরআন সৃষ্টবস্তু, স্রষ্টার মতো চিরন্তন নয়। প্রধানতঃ এই মতের জন্য মোতাজেলারা সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের বিরাগ-ভাজন হন।

তবে মোতাজেলাদের সঙ্গে রামমোহনের বড় পার্থক্য হয়ত এই--মোতাজেলারা সাধারণতঃ বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ, কিন্তু বিচারপন্থী পণ্ডিত তিনি যতখানি তার চাইতে বেশী তিনি বিচারপন্থী কর্ম্মী-- স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক।

মুসলমান নৈয়ায়িকদের কাছে রামমোহন যে বিশেষভাবে ঋণী সে কথা সবাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তর্ক-বিজ্ঞানের যথেষ্ট হেতুবাদ (Principle of sufficient reason) সূত্রটি আধুনিক বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রামমোহন মুসলিম সাধনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টি তাঁর সমকালে কোন কোন মুসলমানের ভিতরে ছিল কি না, তার পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাচ্ছে, মুসলমানরা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের জন্য এক সময়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কলিকাতা বাসকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশী ছিল বলেই তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা সন্দেহ করতেন, মুসলমানদের সঙ্গে তার পানভোজনও হয়ত চলে। তৎকালের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরা যে কৃতবিদ্য ও দক্ষ ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে শারীরিক বীর্য্যে পোষাকে-পরিচ্ছদে তৎকালের মুসলমান যে তৎকালের হিন্দুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বিলাতে সাক্ষ্যদান কালে স্পষ্টভাবেই তিনি সে-কথা বলেছিলেন।

কিন্তু তবু মনে হয়, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর এই যে সম্প্রীতি, সম-মতের সম্প্রীতি এ নয় সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রীতি। মুসলিম সাধনা ও তৎকালের মুসলিম কৃষ্টি তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এ সবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্ত্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি শাসকদের দিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, এর ফলে দেশের জনসাধারণ বিচারালয়ে কিছু সুবিচার পাবে, আর দেশবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় বিদ্যালাভের পথ সুগম হবে।

রামমোহন ও হিন্দু সাধনা

পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে পিতার সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর ঘটে। তার ফলে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন ও তিব্বতে গমন করেন।+ তিব্বতে গমনের বাসনা হয়ত পাটনা বাস-কালেই তাঁর হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল, পার্ব্বত্য জাতিদের বিচিত্র পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় লাভও তাঁর অবাঞ্ছিত ছিল না। এইভাবে নরপূজা পিশাচ-পূজা ইত্যাদি বিচিত্র অজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে তাঁর অত প্রবণতা জন্মেছিল মনে হয়।

তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণের পরে তাঁর জীবনে বড় ঘটনা হচ্ছে কিছুকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা; এই চর্চ্চা তিনি যে গভীর ভাবে করেছিলেন পণ্ডিতেরা সে কথা স্বীকার করেন। আর রামমোহন যত শাস্ত্রের চর্চ্চা করেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চ্চাই এ পর্য্যন্ত বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে। হিন্দু সমাজও তাঁকে আশানুরূপ ভাবে গ্রহণ করেন নাই, তবু তাঁরাই যে তাঁকে বেশী গ্রহণ করেছেন এ সত্য।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কৃত রামমোহন-চরিতকথায় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করলেও রামমোহন জোর দিয়েছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের উপরে, আর শঙ্করাচার্য্য জোর দিয়েছেন সন্ন্যাসের উপরে, এসব কথা বলা হয়েছে। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলতে চান। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণান শঙ্করদর্শনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, হিন্দু-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন অদ্বৈতবাদ রামমোহন যেভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবেই বোঝা হয়ত সঙ্গত। যথা--Sankara does not assert an identity between God and the world but only denies the independence

+ এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের দাবি এখনো অপ্রবল। লেখক।

of the world....If we raise question as to how the finite rises from out of the bosom of the infinite, Sankara says that it is an incomprehensible mystery, maya. We know there is the absolute reality, we know that there is the empirical world, we know that the empirical world rests on the absolute, but the how of it is beyond our knowledge......The greatest thinkers are those who admit the mystery (of the relation of God to the world) and comfort themselves by the idea that the human mind is not omniscient. Sankara in the East and Bradley in the West adopt this wise attitude of agnosticism (Hindu view of life Pp 66-68) অন্যত্র -- No theory has ever asserted that life is a dream and all experienced events are illusions. One or two late followers of Sankara lend countenance to this hypothesis, but it cannot be regarded as representing the main tendency of Hindu thought. (p. 69).

রামমোহনের হিন্দু শাস্ত্রের বিচার তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের চিরবিস্ময়ের সামগ্রী। হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে' তিনি যে ভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ- তত্ত্ব তাঁদের উপহার দিয়েছেন, সেটি যে কত বড় দান, সে সম্বন্ধে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বসাধারণ এ পর্য্যন্ত তেমন অবহিতচিত্ত হন নাই এই জন্য যে, তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে ভাবতে পারেন নাই। যে কারণেই হোক প্রতীক উপাসনার সঙ্গে হিন্দু সাধনা বহুকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। এই প্রতীক-উপাসনাকে কোনো কোনো হিন্দু সাধক অপকৃষ্ট সাধনা জ্ঞান করেছেন; কিন্তু এটি যে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য (অথবা জীবনের জন্য) হানিকর এমন নির্ম্মম কথা রামমোহনের মতো এতখানি জোর দিয়ে আর কোনো হিন্দুসাধক বলেছেন মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু এ রকম প্রতীক-উপাসনার বিরোধী একেশ্বরবাদী- দল হিন্দু সমাজে এত কম যে এঁদের গণনার ভিতরে না আনলেও চলে। প্রতীক-উপাসনার প্রতি এরূপ বিরূপতার জন্যই যে রামমোহন তাঁর সমকালে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ও বর্ত্তমান কালেও অনেকখানি অবহেলিত হচ্ছেন এ সত্য। এর সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় হবার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে--তাঁর বেশভূষা হিন্দুর চিরপরিচিত চিরশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা নয়। রামমোহন তাঁর বেশভূষা ও আহারাদি প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন, তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন--সুরুচিপূর্ণ বেশ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, আর মাংস আহারাদির দ্বারা তাঁদের নষ্ট বীর্য্যের পুনরুদ্ধার হতে পারবে।

রামমোহনের হিন্দুসাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নাই হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী "যত মত তত পথ" দেশের লোকদের অনেক বেশী স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের "লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র" এই মন্ত্র থেকে। আর "যত মত তত পথ" বাণীতে দেশের লোক শুধু স্বস্তিলাভই করে নাই, এ কালের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, যেমন ফরাসী ভাবুক রমাঁ রলাঁ ও ভারতের স্বনামধন্য মহাত্মা গান্ধী, এই বাণীকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে' মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে রমাঁ রলাঁর যুক্তি এই--I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages than this enfolding of all the Gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human Dreams, in the heart and the brain, in the Paramahangsa's great love and Vivekananda's strong arms....But you must not suppose that this immense diversity spells anarchy and confusion....Each note has its own part in the harmony. No series of notes must be suppressed, and polyphony reduced to unison with the excuse that your own part is most beautiful! Play your own part perfectly and in time, but follow with your ear the concert of the other instruments united to your own.....And this teaching condemns all spirit of propaganda, whether clerical or lay, that wishes to mould other brains on its own model (the model of its own God or of its own Non-god who is merely God in disguise) এই সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীরও অভিমত উদ্ধৃত করেছেন--My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible....Our prayer for others ought never to be : "God, give them the light thou hast given to me!" but . "God, give them all the light and truth they need for their highest development."

মানুষে মানুষে মৈত্রীকামী রলাঁ ও গান্ধী যে গভীর বেদনা থেকে এসব কথা বলেছেন তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। রলাঁ স্পষ্টই বলেছেন—At this stage of human evolution wherein both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "cooperation or death," it is absolutely essential that the human consciousness should be impregnated with it until this indispensible principle becomes an axiom : that every faith has an equal right to live, and that there is an equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects.+ কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হলেই সব সময়ে যে কার্য্যসিদ্ধি হয় তা নয়। মানুষে মানুষে যে মৈত্রীর কামনা করে' এই সব মনীষী এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে করেছেন এর প্রবর্ত্তনের ফলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিনা, অথবা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থার সত্যকার প্রয়োজন আছে কিনা, সে-সবও বিচার্য্য।

ধর্ম্ম যদি ললিতকলার মতো মুখ্যতঃ মানস ব্যাপার হতো তাহলে জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে এমন পরম আদরে সঞ্জীবিত রাখবার চেষ্টা হতো মানুষের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সাধারণতঃ জীবনে ও ললিতকলায় যে প্রভেদ, ধর্ম্মে ও ললিতকলায়ও সেই প্রভেদ। ধর্ম্ম ও জীবনের অভেদত্বের কারণ, ধর্ম্ম একই সঙ্গে জীবনের নিয়ামক ও জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু ললিতকলাকে তেম্‌নি ভাবে জীবনের নিয়ামক বলা যায় না। জীবন অস্থির অপূর্ণাঙ্গ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল, ললিতকলা অচঞ্চল পূর্ণাঙ্গ, সৌন্দর্য্যের নিত্যালোকে অবিনশ্বর, জীবন সত্য, ললিতকলা স্বপ্ন। ধর্ম্ম কখনো কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তিবিশেষের এমন মানস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেটি স্বাভাবিক বা সাধারণ ব্যাপার নয়। স্বভাবতঃ ধর্ম্ম মানুষের মানস ব্যাপার যতখানি তার চাইতে বেশী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব ও অসত্য, ধর্ম্মের ব্যাপারেও তেম্‌নি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য অবাঞ্ছিত, তাতে ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে কল্যাণের আয়োজন—তাইই ব্যাহত হয়। মানুষের বয়স কম হয় নাই, অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ এ কথা সে বুঝেছে যে জ্ঞান ও সত্যের অভিমানের মতো বিড়ম্বনা আর নাই। কিন্তু এই নূতন জ্ঞান লাভ করে' সে যদি ধর্ম্মে ধর্ম্মে Laissez faire নীতি অবলম্বন করে তা'হলেও কম ভুল সে করবে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হয়। তার কর্ম্মজীবনও বিকশিত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই বিরাট জগতের সাহচর্য্য যে তার লাভ হয়, সেটি তার জন্য অমূল্য। রলাঁ ও গান্ধীর এই নূতন ব্যবস্থার যে শান্তি ও স্বস্তি, লোকসমাজে সতেজ ও সন্ধান-তৎপর মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক না হবার সম্ভাবনাই তার বেশী।

হয়ত বলা হবে, অন্ততঃ বিভিন্ন জাতীয় বা কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা ত চাইই, নইলে মানুষ পরস্পরকে চিন্‌বে ও বুঝবে কেমন করে'? এই চিন্তা-ধারার মূলেও রয়েছে একটি বড় ভুল—অতীত ও কতকাংশে বর্ত্তমানকে এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে চিরকালের পরিচায়ক বলে'। অতীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগলিক ক্ষেত্রে লালিত হয়েছিল। কতকটা সেই ব্যবধানের প্রভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ সে-ব্যবধান চূর্ণ হবার পথে দাঁড়িয়েছে, মানুষের কৌতূহলও বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে, জাতিতে জাতিতে আন্তর ও বাহ্য স্বাতন্ত্র্য তাই পরস্পরের অজ্ঞাতসারেও নিশ্চিহ্ন হবার পথে চলেছে। মানব-সভ্যতার এই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যদি বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা type এর কথাই ভাবা হয়, তাহলে ভাবনার পরিচয় যা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশী পরিচয় দেওয়া হয়, অতীত-প্রীতির। কোনো কোনো চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের একাকারত্বের কথা ভেবে আনন্দ পান না এই ধারণা থেকে যে, তেমন একাকারত্ব হবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন সুতরাং অসুন্দর। কিন্তু কত অনাবশ্যক ও অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের শৃঙ্খলে এখনো মানুষ বন্দী, এখনো কত অবিকশিত তার সৃষ্টিশক্তি, এ চিন্তা মনে স্থান দিতে পারলে সেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্যের কথা ভেবেই তাঁরা আহ্লাদিত হবেন।

ধর্ম্ম জ্ঞানেরই প্রকার-ভেদ, এই কথাটি তেমন স্পষ্টভাবে মনে না রাখার ফলেই ধর্ম্ম-সমস্যা মানুষের জন্য এমন অশোভন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের, অন্য কথায় প্রত্যয়ীভূত জ্ঞানেরও উৎকর্ষলাভ হয়েছে। একালেও ধর্ম্মের উপরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও সেই একই সত্যের

+ Life and Gospel of Vivekananda--pp 353-359.

পানে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন অপ্রতিহত সন্ধানপরতা ও কল্যাণের আয়োজন ভিন্ন আর কোনো দিকে লক্ষ্য রাখলে শেষ পর্য্যন্ত বিড়ম্বিতই হতে হয়, ধর্ম্মের ব্যাপারেও তেমনি সত্য ও কল্যাণ-জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র শিথিল করবার প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কর্ম্মজীবনের দিকে চাইলে দেখা যায় তাঁরাও যথাসম্ভব অভিমান বিবর্জ্জিত হয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যপথ অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে অন্যের অন্তরে কতখানি বেদনা বাজ্‌লো সেটি তাঁদের চিন্তার মুখ্য বিষয় নয়।

তাই মনে হয় মানব-সভ্যতার নবসম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেয়ে রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্ত্তমান-প্রীতির পরিবর্ত্তে লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে-মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই, সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ক্রটির জন্য নয়--তাঁর দেশবাসীর সত্যপ্রীতি ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণ-কামনার অভাবের জন্যই।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র বিচারে এত চমৎকারিত্ব রয়েছে, পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির এমন স্ফুরণ সেখানে হয়েছে যে সে-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর তেমন কৌতূহল না থাকা তার মনন শক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়ত নয়। এই সব বিচারে তাঁর কোনো কোনো শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খুবই নূতন, যেমন গীতার এই সুবিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা--

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

গীতার গান্ধীভাষ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে এই : "কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট্ পালট্ না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষা পূর্ব্বক ভাল রকমে ভাল করিয়া তাহাকে যেন সর্ব্ব কর্ম্মে প্রেরণা দেয়।" --এইটি এর প্রচলিত ব্যাখ্যা, আর এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রচলিত আচার - পদ্ধতি মান্য করতে বলা হয়। কিন্তু রামমোহন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই :-- "জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গিকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেক। সুতরাং জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক। কর্ম্মসঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ভুরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। কর্ম্মাণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।....যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠ স্কন্ধ বচন।। ..."স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি। ন বাতি রোগিণে পথ্যম্ বাঞ্ছতেপি ভিষকতমঃ।। আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না।" (গ্রন্থাবলী--পৃষ্ঠা ২১৫)

রামমোহন ও খৃষ্টধর্ম্ম

রামমোহন তাঁর Precepts of Jesus--a guide to peace and happiness--এর ভূমিকায় বলেছেন, খৃষ্টের এই যে উপদেশ, অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্ম্মগ্রন্থে পান নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চে তিনি নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জ্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য বাইবেলের এই ধরণের ভক্তের প্রতি বাইবেলের ভক্ত-সাধারণের সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। খৃষ্টান সমাজের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা নির্ণয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক-ও-হিব্রুবচন-- কণ্টকিত Appeal to Christian Public তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য দর্শনে তৎকালীন খৃষ্টান জগত চমকিত হয়েছিলেন।

আধুনিক খৃষ্টান জগত তাঁর এই খৃষ্টানশাস্ত্র বিচারের কি মূল্য দেন জানি না। কিন্তু তাঁর দেশবাসীর কাছে এর মূল্য কম হওয়া উচিত নয়। তাঁর এই খৃষ্টানশাস্ত্র বিচারের ভিতর দিয়ে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই তিনি কাম্যজীবন জ্ঞান করতেন।

রামমোহনের সাধনা

রামমোহনের খৃষ্টান-শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজেকে খৃষ্ট-অনুবর্ত্তী বলে প্রচার করেছেন। তাঁর তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে কিন্তু দেখা যায়, তিনি "ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ" "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ" এ সবের কিছুই মানেন নাই। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা প্রায় একমত যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু পরে তাঁর সেই শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তিবাদ ধর্ম্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল; আর মানুষের জন্য এই ধর্ম্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি কাম্য মনে করতেন।

কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবসর আছে। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের বিচারেও দেখা যায় তিনি তিনি নিজেকে শাস্ত্রানুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন, ও সেইভাবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বেদান্ত আশ্রয় করে হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর দেশবাসীর জন্য ইয়োরোপীয় জ্ঞানলাভের পথ সুগম করবার অনুরোধ জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত-মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির শিক্ষাকে উপহাস করেছেন। বলা যেতে পারে, বেদান্ত-মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যাকে তিনি উপহাস করেছেন, প্রকৃত বেদান্ত-মীমাংসা ও ন্যায়কে নয়; তা'হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চ্চার চাইতে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন-চর্চ্চাকে তিনি বেশী মর্য্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের প্রতি তাঁর কিছু বেশী শ্রদ্ধা থাকলেও এর আলোচনা কালেও তাঁর যুক্তিবাদ বাস্তবিকই যে শিথিল হয় নাই, তার প্রমাণ স্বরূপ এই কয়েকটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে : প্রথমতঃ Precepts of Jesus--a guide to peace and happiness গ্রন্থখানি তিনি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এই দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জ্জিত সহজ সবল উপদেশ মালায় বিশ্ব-বিধাতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উন্নততর হবে ও তাদের একের অন্যের প্রতি ও সমাজের প্রতি ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হবে; তাঁর তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধেও তিনি এই ধরণের কথা বলেছেন, যথা--সব ধর্ম্ম আত্মা ও পরকালে বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোষহ নয়, কেননা মানুষ দুষ্কর্ম্ম থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পান-আহার পবিত্রতা-অপবিত্রতা শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কত শত অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে! তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে এই সব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়, তাহলে কি সত্য আর কিইবা অসত্য, তা সে নিরূপণ করতে পারবে আশা করা যায়,-ও এইভাবে অর্থহীন ধর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় মঙ্গল বিধাতার প্রতি ও সমাজ-কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের প্রতিপক্ষ এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী না হলে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না; রামমোহন দেখিয়েছিলেন, খৃষ্টের ভিতরে যা কিছু অলৌকিক বা অসাধারণ সব ঈশ্বর-প্রসাদে, তাঁর একান্ত নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, আর বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পরস্পরের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাই শিক্ষা দেওয়া। (Works P. 553)

তাই আমাদের বলতে ইচ্ছে হয় : তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে রামমোহন যে অলৌকিকতা নিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্ব ও লোকশ্রেয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন, পরে পরে এই মতের কোনো বিশেষ পরিবর্ত্তন তাঁর ভিতরে ঘটে নাই। যাঁরা এই পরিবর্ত্তন দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা বোধ হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নাই যে, তুহ্‌ফাতুন মুওয়াহহিদীন গ্রন্থেও রামমোহন একদিকে যেমন প্রখর যুক্তিবাদী অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানব-কল্যাণকামী।

বিলাতগমনের পূর্ব্বে রামমোহন Unitarian খৃষ্টানদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে গমনের পরে উভয় শ্রেণীর খৃষ্টানদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন ও উভয় দলেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুলাভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো ধর্ম্মযাজক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে ত্রিত্ববাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। মিস্ কলেট লিখিত জীবনীর সম্পাদক এসব কথা গণ্য করেন নাই। তবে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রামমোহনের ভিতরে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা চিরদিনই

অত্যন্ত প্রবল ছিল; সেই ব্যাকুলতার বশে প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন ও পরবর্ত্তী জীবনে যুক্তিবাদের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি করে' "ধর্ম্মবিশ্বাসের" দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি এই প্রমাণটি দিয়েছেন। -- রামমোহনের তাঁর সর্ব্বশেষ রচনায় উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতিস্থাপন সমর্থন করেন। এই বসতিস্থাপনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক তিনি উত্থাপন করেন, সে-সবের একটি এই : উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতি-স্থাপনের ফলে ও তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতবাসীদের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা; এই উন্নত ভারতবাসীরা ও ইয়োরোপীয়েরা সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করতে পারেন; তাহলেও তাঁদের ভিতরে বাণিজ্য-সম্পর্ক থাক্‌বে ও এই নব আলোকপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে। রামমোহনের মূল বক্তব্য এই : Americans were driven to rebellion by misgovernment.... .The mixed community of India, so long as they are treated liberally and governed in an enlightened manner, will feel no inclination to cut off its connection with England.........yet if events should occur to effect a separation, still a friendly and highly advantageous commercial connection may be kept up between two free and Christain countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners. এখানে সম্পাদক মহাশয় এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন, এটি সুসিদ্ধান্ত বলে' গ্রহণ করা যায় না কয়েকটী কারণে। প্রথমতঃ যে সমস্ত গণ্যমান্য ইয়োরোপীয় ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন করবেন তাঁরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হবেন, তাঁদের অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে রামমোহন খৃষ্টান ভারতবর্ষ বলতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ--তাঁর প্রিয় খৃষ্টাননীতির (Do unto others as you like to be done by) দ্বারা প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষকে তিনি খৃষ্টান ভারত বলতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁর দেশবাসীরা সোজাসুজি যিশুর উন্নততর ধর্ম্মে দীক্ষিত হবে এ চিন্তা রামমোহনের জন্য একান্ত অপ্রীতিকর হয়ত ছিল না, কেননা কোনো রকমে তাঁর দেশবাসীর ভালোর দিকে একটু পরিবর্ত্তন হোক, এ কামনা তিনি করতেন; তবু এই চিন্তা যে তাঁর খুব প্রীতিকরও ছিল না, তা বুঝতে পারা যায় আমেরিকার Bishop Ware কে লিখিত তাঁর এই পত্রাংশ থেকে --I am led to believe from reason, what is set forth in the scripture, that "in every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him" in whatever form of worship he may have been taught to glorify God -- Bishp Ware-কে লিখিত এই পত্রে আরো একটি লক্ষ্যযোগ্য কথা আছে। রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসারের সম্ভাবনা কিরূপ; তাতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই উত্তর দেন : বিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সুনীতি শিক্ষার আয়োজন যদি এ দেশবাসীর জন্য তাঁরা করতে পারেন, তবে সেই ভাবেই তাঁরা এ দেশবাসীর মনকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত করতে পারেন।

এই থেকে রামমোহনের সংস্কার চেষ্টার, অথবা সমগ্র সাধনার, স্বরূপ জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে তাঁর সাধনার দুইজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ, যে মত প্রকাশ করেছেন তার মর্য্যাদা নিরূপণ প্রথমেই কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁর সমকালে জগতে আর কারো ভিতরে এমন পূর্ণ ভাবে দেখা যায় না। বর্ত্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন সাধনার অবিনশ্বর যা কিছু তা আয়ত্ত করে' অন্যান্য সাধনার দিকে তিনি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথার প্রমাণ রামমোহনের বিরাট সাধনার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে--যদিও রামমোহনের সমকালে শুধু তাঁকেই বিশ্বমানবের একত্ববোধের পূর্ণ অধিকারী বলে ভাবতে আমাদের কিছু আপত্তি, কেননা রামমোহনের সমকালে অথবা কিছু পূর্ব্বে মহামনীষী গ্যেটের আবির্ভাব। নবযৌবনেই তিনি নিজেকে বলেছিলেন Worldling (বিশ্বসন্তান), আর পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বোধ সুবিদিত। তবু যিনি দূর স্পেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লাভে উল্লসিত হয়ে নিজ ব্যয়ে এক বড় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ও Naples-এর পরাধীনতা দুঃখের অবসান হয় নাই জানতে পেরে জগতের অত্যাচারীদের উদ্দেশে এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছিলেন--I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enenmies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful--মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ যোগ জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার যোগের চাইতে নিবিড়তর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রামমোহনের সাধনার স্বরূপ নির্দ্দেশ সম্পর্কে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য পরম হৃদয়গ্রাহী কল্পনার সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। তিনি রামমোহনকে দাঁড় করিয়েছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্ম্মোদ্‌ঘাটক রূপে। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্ব-জনীনতার এক একটি রূপ, এর কোনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্ব্বোচ্চ পরিণতির দিকে: বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করে রামমোহন তাদের সেই সর্ব্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন। কিছু ভিন্ন বেশে এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। সেই চিন্তাধারা দার্শনিক-প্রবর রাধাকৃষ্ণমানের লেখনীতে রূপ পেয়েছে এইভাবে....... If we believe that every type means something final, incarnating a unique possibility, to destroy a type will be to create a void in the scheme of the world. (Hindu view of life) . এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও নিবেদন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম্মে যেরূপ সহজভাবে প্রতিদিন আমাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে সেই পরিচিত রূপের পানে এরা তাকান নাই, এদের আলোচিত ধর্ম্ম ভাবলোকের ধর্ম্ম--সেখানে কোনো Type-কে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর ভাব্‌লে আপত্তির কারণ তেমন ঘটে না।

এই সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ভাববার আছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ "স্বাতন্ত্র্য"- বাদী চিন্তাশীলেরা ভারতের জাতিভেদে দেখেছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটি প্রয়াস। হয়ত তাঁদের এই অভিমতের মূলে সত্য আছে; কিন্তু এর ফল কি হয়েছে সেটিও বিচার্য্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতা ভারতের পতনের এক বড় কারণ অনেক মনীষী এই মত ব্যক্ত করেছেন; তারপর এই বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অংশসমূহ যে কালে অসুন্দর বৈ সুন্দর হয় নাই, তার পরিচয় পাওয়া যায় রামমোহনের সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-সমাজের জীবনে--তাঁরা পূর্ব্বপুরুষের সাধনা বিস্মৃত হয়ে রামমোহনের উদ্ধৃত উপনিষৎ-রচনাবলী ভেবেছিলেন রামমোহনের নিজের রচিত শ্লোক বলে। --আর হিন্দু সমাজের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহে শক্তি-তরঙ্গ খেলেছে তখন, যখন দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দের মতো স্বাতন্ত্র্য ধংসকারীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে।

স্বাতন্ত্র্য-বাদের বড় অপরাধ হয়ত এই যে, এর প্রভাবে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, সুতরাং অপ্রেমের, সৃষ্টি হয়--সৃষ্টিধর্ম্মী কৌতূহল-বৃত্তিরও খর্ব্বধতা সাধন হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যলোপভীতির কোনো সার্থকতা হয়ত নাই; পারশ্য সর্ব্বপ্রকারে আরবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, কিন্তু জগতে পারশ্যের বিলোপ সাধন হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায় আমাদের মধুদূদন সর্বপ্রকারে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালীত্ব ও মানবত্ব কিছুই পরিম্লান হয় নাই--হয়ত বা উজ্জ্বলতর হয়েছে। রামমোহনকে বলা হয় প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষির যোগ্য বংশধর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়াস তিনি যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশী করেছেন স্বাতন্ত্র্য-ধ্বংসের ও সর্ব্ব অভিমানশূন্য সত্যোপলব্ধির প্রয়াস।

বাস্তবিক, হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি প্রাচীন নামে রামমোহনকে পরিচিত করতে যাওয়া অসার্থক বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন সহজ ভাবে সত্যজিজ্ঞাসু,--আর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়ত এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত। --কিন্তু এই সহজ সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণায়ও মানুষ ধর্ম্মসংস্কারক সমাজসংস্কারক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বহু কিছু হতে পারে, রামমোহন এর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? বলা বাহুল্য জীবন এক অখণ্ড ব্যাপার, তাই কোনো শক্তিমান একই সঙ্গে ধর্ম্মসংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারেন। তবু বিশেষ বিশেষ দিকে শক্তিমানদের প্রবণতা দেখা যায়--রামমোহনের প্রবণতা কোন্‌দিকে?

ইতিহাসে রামমোহনের পরিচয় এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রূপে, যদিও তিনি নিজে বারবার বলেছেন কোনো নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক তিনি নন। কিন্তু চিন্তাশীল মাত্রই নূতন কিছুর প্রবর্ত্তক, কেননা জগৎ চিরনূতন, কাজেই তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে এক নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। একালের অনেক শিক্ষিত বাঙালীর অভিমত, রামমোহনকে ধার্ম্মিক পুরুষরূপে না দেখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী সমাজসংস্কারক রূপে দেখাই সঙ্গত; কেননা, তাঁদের মতে, ধর্ম্মভাবের যে মূল কথা বিশ্বাতীত কোনো শক্তিতে একান্ত আত্মসমর্পণ, সেই অহমিকাপরিশূন্য আত্মসমর্পণ তাঁর বিচিত্র বাদ-প্রতিবাদের ভিতরে দুর্লভ। কিন্তু এই অভিমত তেমন মূল্যবান নয় বলেই মনে হয়, কেননা, রামমোহনের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের উৎস স্বরূপ যে অবিচলিত মানব-কল্যাণ-বোধ তার প্রতি এর দৃষ্টি নেই। রামমোহনের নিজের এই মন্তব্যটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়--"ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

যে সম্প্রদায়ের তিনি নেতা তাকে বর্ত্তমানে একটি ভক্ত-সম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধারণা অনেক ব্যাপক, অভিনবত্বও তাতে কম নয়। প্রথমতঃ--একটি বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ভাবনের দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশ কম। সত্য বটে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেছিলেন ও নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ সব বিষয়ে যে অনাবশ্যক ভাবে ব্যস্ত তিনি ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুইটি ব্যাপার থেকে--হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতার তিনি বিরোধী হয়েছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল : Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society,* কিন্তু যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রকৃতই মূর্ত্তিপূজা করেন না, মূর্ত্তি ব্যপদেশে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের পূজা করেন, রামমোহন তাঁদের এই উক্তি যথার্থ বলে' স্বীকার করেন নাই; তবু বলেছিলেন, হিন্দু সমাজের লোকেরা মূর্ত্তিপূজার যে এমন রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন এ শুভ লক্ষণ; আর বিলাতে গমন করে' ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন তার কারণ মনে হয় এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ। দ্বিতীয়তঃ- সুফীমত, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম্মসাধন প্রণালীকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহ ও মনের উৎকর্ষ বিধানের উপাদান রূপে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ সমন্বিত দেহ-মনের ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে ও মানব-সেবায় অর্থাৎ তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি বিধানে। দেশের প্রাচীন অকল্যাণকর প্রথাসমূহের বিলোপসাধন, উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অত্যাচারিত কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য-বিধান, দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্নততর বিচার-ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের অশেষ প্রয়াসের কথা সুবিদিত। শুধু দুঃখ এই, এই প্রাণপ্রদ চিরন্তন ধর্ম্ম, ভাগ্যবান্ জাতির লোকেরা যার মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ভুল করেন নাই--আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্ম্মীদের যথাযোগ্য অনুধাবনের বিষয় হয়েছে এ কদাচিৎ।

গ্যেটে সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন, অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তের আশ্চর্য্য বিকাশ সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল। রামমোহন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁর যৌবনের তুহ্ফাতুল - মুওয়াহ্হিদীন গ্রন্থেই তাঁর মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সমস্ত বক্রতা থেকে উদ্ধার করে ঋজু করবার প্রয়াস রূপে। "তুহ্ফাতুল মুওয়াহ্হিদীন" এর মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন জনহিত-প্রচেষ্টার মানব-প্রেম ও কর্ম্মশক্তি রামমোহনের প্রতিভার মর্য্যাদা এসব ক্ষেত্রে অন্বেষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনাই বেশী।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল বিশেষভাবে জাতীয় গৌরব উপলব্ধির শতাব্দী। সেই শতাব্দীতে যদি বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি রামমোহনের বিরাট সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভাকে অনেকখানি সংকীর্ণ করে দেখে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক অভিমান তৃপ্ত করে থাকেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাধনা যত চমৎকারই হোক আজ তা বৃহত্তর জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করতে অপারগ হচ্ছে। তাই সেই উনবিশ শতাব্দীর সাধনার গৌরবময় উৎসের পানে নূতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন। তাতে সেখান থেকে নূতন প্রেরণা লাভ হতে পারে--এই কথাই বল্‌তে চেষ্টা করা হয়েছে; অথবা- সেই সমগ্র সাধনার কথা বিস্মৃত হবার প্রয়োজনও অনুভূত হতে পারে।

"যে লেখার ভিতর প্রচলিত সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত কিছু নেই, সে লেখা সাহিত্য নয়। – তাই এ কথা জোর করে বলা চলে যে, সাহিত্য-রাজ্যে হিন্দু শুধু হিন্দু নন, তার অতিরিক্ত কিছু; এবং মুসলমানও শুধু মুসলমান নন, তার অতিরিক্ত কিছু। এই অতিরিক্ত দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।"

ভাঙা-গড়া

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

শক্তির লীলা অতি বিচিত্র। নিরীহ শান্ত মধুর রূপে যখন তাকে দেখি, আমাদের মন শান্তির আনন্দ-নিবিড় শিথিলতায় ডুবে যেতে চায়, আর যখন দেখি তার রুদ্র-ভীষণ প্রকাশ, আমরা ভয়ে জড়সড় হই; মন ত্রস্ত হ'য়ে বলে : এ কি উপদ্রব!

মনের এই ভীরুতা আমাদের জীবনের অনেক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। মানুষের স্বাভাবিক সাবধানতার ফল তার রক্ষণশীলতা; বেশী নড়ন-চড়ন তার পছন্দসই নয়। অবস্থিতিকে সে ভালোবাস্‌তে পায়, মমতার বাঁধন তার কঠিন হয়ে ওঠে, ভাবে : এইখানে আছি, এইখানেই থাকি, এ-ই ভালো।

মুশকিল এই যে, মানুষের ভালোমন্দের বিচারবুদ্ধি তেমন সবল নয়। পুতুল যাই হোক, তাকে সাজ-সজ্জা পরিয়ে দৃষ্টিসই করে' সভায় হাজির কল্লেই আমরা ফাঁকিতে পড়ি। তার মানে এ নয় যে, বুদ্ধি আমাদের নেই; কিন্তু সভার একটা মাদকতা আছে, তার নেশা কাটিয়ে চলা শক্ত কাজ। পুতুলের সাথে সাথে যখন সভাজনের মন নাচ্‌তে থাকে আমরা দুর্ব্বল বুদ্ধিটাকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে তাতে যোগ দিই।

এটা ভীরুতার কথা নয়, মোহের কথা। মানুষের সহজ নির্ম্মল দৃষ্টি চারিদিককার ধূলি-ধোঁয়ার আঁধারে ঝাপ্‌সা দেখে, তার পরিচ্ছন্নতা আবিলতার আবছায়ায় ঢাকা পড়ে। তখন আত্মদৃষ্টিকে সে স্বভাবতই প্রত্যয় করে না; পাশের লোককে জিজ্ঞেস্ করে : কি ভাই, কেমন দেখ্‌ছো? সন্দেহ পাশের লোকটীরও ছিল; সেও পাল্‌টা ঐ একই প্রশ্ন করে। এতেই ব্যাপারটা হয়ে ওঠে আরো ঘোরালো। কেউ মন্দ বল্‌তে সাহস পায় না; ভাবে : মন্দ বল্‌লে হয়তো তার দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতাই ধরা পড়বে। কাজেই একজন বলে : নিতান্ত মন্দ কি? আর একজন বলে: মন্দ তো নয়। অপরজন বলে: বেশ ভালোই। এইভাবে আঁধারে হাতড়াতে হাতড়াতে মানুষ হয়তো রাক্ষসপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু সেজন্যে আপাততঃ তার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয় না।

জলজ্যান্ত রাক্ষস অবশ্যি প্রথম সুযোগেই এদের গ্রাস কর্ব্বে; কিন্তু মানুষের জীবনে যে-দুর্ব্বুদ্ধি তার গ্রাস কর্ব্বার ভঙ্গি বড় মোলায়েম। সে যখন মানুষের মেরুদণ্ড চিবিয়ে খেতে থাকে, তখনও তার সাড় হয় না। সে ভাবে: এই গহ্বর-পথেই তার মুক্তি, এই পথই তাকে স্বর্গের সিঁড়িতে নিয়ে চলেছে।

এই অনাস্বাদিত স্বর্গের জন্যে মানুষের যে-প্রচণ্ড লোভ, এতেই তাকে অন্ধ করেছে। সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়েছে। যে কেউ সাহস ক'রে বলেছে : ওরে মূর্খ, এই ভগবানের পথ, এসো এই পথে, স্বর্গে হবে তোমার গতি; আর কোনো কথা না বলে' তাকে-ই সে মেনে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু এই প্রগাঢ় অন্ধতা, এই গভীর দুর্ব্বুদ্ধি নিয়েও মানুষ জ্ঞানের আলোক পেয়েছে। পথ চল্‌তে চল্‌তে অন্ধগলিতে এসে সে অনেক দুর্ভোগ সয়েছে, তারপর পেছনে, পাশে তাকিয়ে দেখেছে : তার যাত্রা-পথ খোলা প'ড়ে আছে। সে-পথের জন্যে ব্যাকুল মন তার বেদনায় কেঁদে উঠেছে, সে ফিরে দাঁড়িয়েছে নতুন পথে চল্‌বার জন্যে।

তার এই আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ ক'রে দিতে পেয়েছে তার সঙ্গীরা সব। তারা অবাক হয়ে ভেবেছে : নতুন পথে কেন এ চল্‌তে চায়? কী ব্যাধিতে ধরলো একে? ব্যাধির চিকিৎসাও সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে, প্রথমে বাক্যের দ্বারা, তারপর বিদ্রূপের দ্বারা, শেষে প্রহার-দণ্ড উঁচিয়ে।

মানুষের সমাজে চিন্তা ও আচারের দ্বন্দ্বের শুরু এইখানে। সভার মাদকতা যে কাটিয়েছে, তাকে পুতুল-নাচের নেশায় মাতিয়ে রাখা চলে না। তখন সে আসরের বাইরে আস্‌তে চাইবেই। এতে যে সভায় একটা সোরগোল সৃষ্টি হবে, পুতুল-নাচে কিছু বাধা পড়বে, এবং তাতে সভাজন রুষ্ট হবেন, এটী নিতান্তই তার বিবেচনার বাইরে।

কিন্তু সঙ্গীরা তার পাত্র বড়ো সহজ নয়। তারা প্রহার-দণ্ড উঁচিয়েই তখন আর খুশী থাকে না, তার পরের কাজটুকুও কত্তে থাকে। এর ফল ফলে খানিকটা উল্টো। কতক মানুষ ভাবে : আহা, ও না-হয় ভুলই করেছে, তাই ব'লে এতোখানি? নিগৃহীতের প্রতি মানুষের এই সহজ সমবেদনা তাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। কি জন্যে তার প্রতি এই অত্যাচার?- সে ভাব্‌তে শুরু করে। তখন পুতুল-নাচের ভঙ্গিটার দিকে তার দৃষ্টি হ'য়ে পড়ে কিছু সজাগ। যে একে মান্‌ছে না, অসঙ্গত ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইছে, কী এমন তার অপরাধ? অন্তরের অনুমোদন পেয়ে এই জিজ্ঞাসা আরো এগিয়ে চলে। তার মন বলে : না না, ওর ওপর অত্যাচার হ'তে পার্ব্বে না, ওর কথা একেবারে তো মিথ্যে নয়।

নিগৃহীতের দলে আস্তে আস্তে লোক জম্‌তে থাকে। এরাও আঘাত পেতে থাকে বড়ো দলের কাছে, আর ক্রমেই যেন শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। শেষে একদিন যখন নিজেদের শক্তি এরা অনুভব করে, তখন বিনা বাধায় মার খাওয়া আর পোষায় না। ফলে বেধে যায় একটা বিষম দ্বন্দ্ব।

এর পেছনে ছোটো দলের যে-শক্তি তার ভিত্তি কি? কোন্ উৎস থেকে জীবন ও পোষণ সংগ্রহ করে' এরা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পায়? বড়ো দল বলে : ওরা বুদ্ধিহীন গোঁয়ার, ওরা জগতে একটা মূর্ত্তিমান উপদ্রব ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে এমন জমাট সভা ওরা ভাঙ্‌তে চায়!

এই বিচারের পেছনে বুদ্ধি বিন্দুমাত্র নেই বলিনে; কিন্তু তাকে সমাচ্ছন্ন সম্মোহিত করে' রাখে জমাট সভার প্রতি একটা অন্ধ মমতা চিরাচরিত পুতুল-নাচের দিকেই যার স্নেহ-দৃষ্টি, তার ছন্দের দিকে নয়, তার সঙ্গতির দিকে নয়। অন্য দলকে এরা বুদ্ধিহীন গোঁয়ার বল্‌বেই; কারণ এদের যে সত্যিই কিছু চিন্তা আছে এবং সে যে খুব সুষ্ঠু, একথা সপ্রমাণ কত্তে হ'লে এইটাই এদের সামনে একমাত্র সহজ পথ।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে অন্যদল নিশ্চয়ই বুদ্ধিহীন। মাতাল দ্বন্দ্বপ্রবণ হ'তে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্যে সত্যিই সে তৈরী নয়। প্রথম আঘাতেই তার শিথিল বাহু ভেঙে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও পড়ে লুটিয়ে। ছন্দ-পাগলের এ ভাব নয়। সে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, আঘাতের পর আঘাত নেমে আসে তার মাথার উপরে, দেহ হয় তার ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু মাথা তার নত হয় না। এমন-যে দুর্দ্দম শক্তি, তার একটা শক্ত পাকা ভিত্তি না থেকেই পারে না।

বড়ো দল সহজে এ-কথা বুঝতে পারে না। তারা ভাবে : ওরা নিতান্তই হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লড়্‌ছে, ওরা গোঁয়ার, ওরা উচ্ছৃঙ্খল, ওদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই;--দেখে না যে হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আর যা ই হোক জোট বাঁধা চলে না। নতুনের আকস্মিকতায় ভীত যে-মন, সে চোখ বুঁজে সাম্‌নের শত্রুকে অবাস্তব কল্পনা করে' তাকে উড়িয়ে দিতে স্বভাবতই ব্যস্ত; কেননা তার প্রধান অস্ত্র যে-ফুঁকমন্ত্র তার ক্রিয়া ভূতের উপরেই, বস্তুর উপরে নয়।

পুরাতনের অসঙ্গতি নিয়ে যখন প্রথম সাহস করে' মানুষ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া কত্তে শুরু করে, তখন থেকেই তাকে অনেক জবাবদিহী কত্তে হয়। এটা চাইনে বল্লেই সে রেহাই পায় না; তাকে ঢের ঢের ভাব্‌তে হয় : কি চাই, কেন চাই, কোন্ পথে কেমন ক'রে চল্লে আমার সিদ্ধিলাভ হবে, শ্রেয়কে আমি পাব। এইভাবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে এক নতুন জগৎ রচনা করে; সচেতন বুদ্ধি দিয়ে একটীর পর একটী সামগ্রী সাজিয়ে সেখানে সে সভামণ্ডপ তৈরী করে; এখানে পুতুল নাচবে নতুন ঢঙে, নতুন সজ্জায়, নতুন ছন্দে; --কিম্বা হয় তো পুতুল নাচ্‌বেই না, সে জীবন্ত স্বস্থ স্বাধীন হয়ে চল্‌বে, রজ্জুর আদেশ তার গ্রাহ্যের মধ্যে আস্‌বে না; আকাশ থেকে সূর্য্যটাকে উপ্‌ড়ে নিয়ে সভার প্রদীপ-সমারোহকে ম্লান করে' সে পূর্ণ মনুষ্যত্বের গৌরবে বাধাবন্ধহীন রাজপথে চল্‌তে থাক্‌বে। এতে কিছুটা শান্তিভঙ্গ হয় হ'লো, ক্ষতি কি?

অতি-সাবধান বল্‌ছেন : ক্ষতি এতোই প্রচুর যে তাকে ভয়াবহ বল্লেও বেশী বলা হবে না, ওতে মানুষের নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। এঁরা একটী কথা ভুলে যান : বুদ্ধির গৌরব যাঁরা বেশী করেন, দেখা গেছে, তাকে কাজে লাগানোর কথা অনেক সময় তাঁদের মনেই থাকে না। এটা বড়ো কম বিপদের কথা নয়। জ্ঞানের আলোকে স্বপ্নের মায়া মেখে নতুন যতোই রূপায়িত হয়ে ওঠে ততোই পুরাতনের অসহনীয়তা মানুষের অনুভূতিতে প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে; সে অধীর হয়ে সুদূরকে টেনে এনে বর্ত্তমানের বুকে বসিয়ে দিতে চায়। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের আঘাতে তার চাঞ্চল্য, তার তেজ হাজারগুণ বেড়ে ওঠে;

সে পাগল হ'য়ে তাকে ভাঙবার জন্যে হাত তুলে দাঁড়ায়। অফুরন্ত বিদ্রোহী প্রাণের রস তার হাতে বল জোগায়, তার শক্ত হাড্ডি বুদ্ধির মাল-মসলায় তৈরী।

সে ভাঙে আর ভাঙে। দ্বন্দ্ব প্রবল হ'য়ে ওঠে, চারিদিক চুরমার হ'য়ে যায়। ব্যথিতের চীৎকার, আর্ত্তের ক্রন্দন জ্বলন্ত আগুনের হু-হু শব্দের সঙ্গে মিশে আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যায়। প্রাচীন বুদ্ধির জীর্ণ বোঝা ব'য়ে যারা মরছে তারা কেঁদে বলে : সর্ব্বনেশেরা করলে কি! এরা দুরন্ত দানব, জগৎ ধ্বংস কত্তে এসেছে! কিন্তু এই অনিবার্য্য জন্মবেদনার পরক্ষণেই নবজাত শিশুর হাসিতে আকাশের মলিন চাঁদ পুলকিত হ'য়ে ওঠে, জগৎ একটা স্নিগ্ধ শান্ত শোভায় নবসৃষ্টির নিবিড় আনন্দে দোল খেতে থাকে।

বার বার বল্‌তে হবে : মানুষের জীবনে সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই লীলার পেছনে কাজ করছে তার প্রখর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও দুর্ব্বার প্রচণ্ড অনুভূতি। জগতের ক্রম-বিকাশের ধারায় যে-সূত্রটি সব-চাইতে বেশী স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, সেটি হচ্ছে এই যে, জোড়াতালি দিয়ে নতুন সৃষ্টি সম্ভবপর নয়, তার জন্যে চাই কিছু সর্ব্বনাশ, চাই নির্ম্মম নিষ্ঠুর ধ্বংস। পুরাতনী, সতী হ'য়ে থাক্‌বেন তার সিঁথায় সিঁদুর, পায়ে অলক্তক দিয়ে—তার প্রশস্তি কল্লেই ফল ফল্‌বে না; তার সর্ব্বনাশ যে কর্ব্বে সে-ই হবে নতুনদের জন্মদাতা, অন্তরীক্ষ থেকে যার মাথায় নেমে আসে অজস্র ধারে গ্রহ-নক্ষত্রের শুভ-আশীর্ব্বাদ।

অতিবুদ্ধির গোঁসাই বিধাতাকে চেনেন না। তাঁর সৃষ্টি এতোখানি প্রশস্ত নয় যে, নতুনকে স্থান দিতে হ'লে পুরাতনকে ভেঙে পুড়িয়ে সাফ না কল্লেও চল্‌তে পারে। সত্যিই এতে দুঃখের কিছু নেই। মানুষের জীবন কেন এমন হ'লো এ নিয়ে-যাঁর প্রচুর অবসর আছে তিনি চোখের জল ফেলুন, আপত্তি কি? কিন্তু অশান্তি, উপদ্রব, ধ্বংস—এই-সব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে গালি দিয়ে নিতান্তই কোনো লাভ নেই, সজাগ বুদ্ধি ওতে মোটেই সায় দেয় না। ছুঁই নিয়ে যার কাজ, কুড়ুলকে কাজে লাগানোর শক্তি ও অধিকার তার না থাক্‌তে পারে; কিন্তু ছুঁইয়ের মায়ায় কুড়ুলের অপ্রশংসা মোটেই মানান-সই নয়। বিধাতার বুদ্ধি ছুঁই গ'ড়েই কেন শেষ হলো না, এটা বস্তুতই আক্ষেপের বিষয় নয়। কুড়ুল না গড়্‌লেই বরং তিনি নিজেকে সীমার মধ্যে বেঁধে ফেল্‌তেন এবং তার ফলে মানুষ হয়তো তাঁকে ভুলেই যেতো। বিধাতার সেটী ইচ্ছা ছিল না, মনে হয়।

লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে একটু প্রশস্ত বুদ্ধির দরকার। দু'দিনের দোকানদারীর পরই যারা ভাঁড় গুণ্‌তি করে, তাদের হিসেব ঠিক না-ও হ'তে পারে, কেননা নিতান্তই দু'টী দিন নিয়ে কাল নয়। দুনিয়ার বিরাট খতিয়ানী হিসেবে মানুষের লাভ-লোকসান কেমন দাঁড়িয়েছে সেইটিই হ'লো বস্তুতঃ দেখ্‌বার বিষয়। নবসৃষ্টিকে সম্ভব করে' তাকে সঙ্গত ও সুন্দর কর্ব্বার জন্যে বিপুল ব্যয়-বহন আপাততঃ লোকসান বলে' মনে হতে পারে; কিন্তু সে যখন মনোহর মূর্ত্তিতে রূপ লাভ করে আমাদের চোখের সাম্‌নে, তখন কেউই আর শূন্যভাণ্ডকে স্মরণ করে না। চিরকাল মানুষের এই মন।

যুদ্ধ-বিপ্লব জগৎ থেকে চিরবিদায় নেবে, এই আশায় রণক্লিষ্ট মানুষ নানান্ ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রতারণা কর্‌ছে। কিন্তু সে পথের সন্ধানে যখন অলিগলি খুঁজে ফির্‌ছে, ঠিক সেই সময়েই তার প্রয়াসকে উপহাস করে' চারিদিক থেকে বেজে উঠ্‌ছে বিদ্রোহের ডঙ্কা, বিপ্লবের বিষাণ! সমর-ক্লান্ত মানুষ শান্তি চায়; কিন্তু তার ভেতরে অনুক্ষণ জেগে আছেন সন্দেহ লোভ হিংসা আর বাহুবল দিয়ে গড়া রক্তচক্ষু যুদ্ধ-দেবতা, তাকে মার্‌বার কোনো আয়োজন নেই। আর আয়োজন কর্‌লেও যে তা সফল হবে, এমন কথা জোর করে না বলাই বোধ হয় ভালো।

মানুষই যেন আজ কতকটা জেগেই ঘুমুচ্ছে। তার মানে অবশ্যি এ নয় যে জেগে সে একেবারেই নেই! সে জানে, তার মন বিশ্বের বিরাট পুঁথি থেকে এই পাঠ সংগ্রহ করেছে, যে, যদি বা যুদ্ধ-বিপ্লব চেপে রাখ্‌বার চেষ্টায় তেমন কোনো দোষ নেই,--কেননা সময় সময় হয়তো ওতে মানুষের প্রয়োজন আছে, সান্ত্বনাও আছে;—কিন্তু সত্যিই চিরকালের জন্যে ওদের ঠেকিয়ে রাখা চল্‌বে না। ওরা দরকার ও সুযোগ হ'লে আস্‌বেই এবং তাতে মোটের উপর জগতের অকল্যাণ হবে না, বরং তার পরিচ্ছন্নতাই কিছু বেড়ে যাবে।

মানুষ নিজের অগ্নিসাদী মূর্ত্তিকে ঢেকে রাখ্‌বার জন্যে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করে' এসেছে. সে শুধু শান্তিকে আশ্রয় দেবার জন্যে নয়, সভ্যতার ভণ্ডামির কাছে তার মুখরক্ষার প্রয়োজনে। নইলে ঝাড়ুদার যদি ঝাঁটা ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, কুড়ুলওয়ালা যদি তার অস্ত্রখানা নদীতে নিক্ষেপ করে, অগ্নিবাহী যদি তার হাতের শলাকা নিবিয়ে দেয়—তাহলে জগতের কি দশা হবে

অনুমান করা শক্ত নয়। জঞ্জালের সঙ্গে দু'চারটী রত্নকণাও হয়তো চলে যাবে, কুড়ুলের ঘায়ে ফল-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ দু'পাঁচটি গাছও হয়তো কাটা পড়বে, অগ্নিশলাকার স্পর্শে শান্তিময় গৃহ, ভগবানের মন্দির কতক পুড়ে ছাই হবে, এর জন্যে দুঃখ হ'লো অল্পদর্শী মমতার, পাকা হিসেবী বুদ্ধির নয়।

সৃষ্টির এক অত্যন্ত সহজ দিক ধ্বংস; একে ছাড়লে সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াবে এক অসহ্য আবর্জ্জনা। জঞ্জালকে মানুষ জ্বালাবেই তার নবসৃষ্টির প্রেরণায়। তাই ধ্বংস-পাগলের বাইরেকার উগ্ররূপ দেখেও তার ভেতরের স্রষ্টাকে আমরা স্মরণ করি, অভিবাদন করি। আর এই স্রষ্টার আগমন-পথ রচনা ক'রে তাঁর আবির্ভাব সম্ভব ও সত্ত্বর করেন যে-ধ্বংসদেবতা তাঁকেও আমাদের সম্মান, আমাদের অভিবাদন।

আমারো কাটিবে দিন

কামালউদ্দীন্

(১)

তুমি যে পাষাণোপমা, এ দোষ তোমার কভু নয়।
তোমারে বেসেছি ভালো--সেই মোর বড় অপরাধ।
তোমারে চেয়েছি আমি, অযাচিত আমাব প্রণয়
হোক্ দ্বিধা-লেশহীন, এ চাওয়ায় তোমার কি সাধ?
তুমি আত্ম-পরিতৃপ্ত, তোমার ছলনাপ্রিয় মন,
নৈবেদ্য কাহারো নয়, লুকোচুরি খেলিবার ফাঁদ!
মুহূর্তের মূল্য জানো, জানো প্রিয়া, দেহ প্রলোভন,--
এ দোষ তোমার নয়, তুমি ক্রুর কপট নিষাদ!

তোমারে বেসেছি ভালো,--এ আমার বিধির লিখন।
মোর অকল্যাণ-ভার তোমাতে পশিতে পারে ভয়!
আমার শিয়রে জাগে খরদৃপ্ত শনির নয়ন;
অভিশপ্ত এ জীবন, পুষ্পপাত্র মোর তরে নয়!
বিধাতার রোষ মোরে, উপলক্ষ্য তুমি শুধু তার;
বিধাতারে অভিশাপি,--তোমারে এ নয় তিরস্কার।

(২)

আমারে ভুলিতে চাও, এতো খুব বড় কথা নয়;
চিরদিন কেবা কারে মনে করে রেখেছে ধরায়?
এর তরে এত সাজ, এত কোপ, এত অভিনয়! --
হাসি পায় মনোরমা, হাসি পায়, শুধু হাসি পায়!
বসন্ত যে জেগেছিল একদিন তব প্রাণে-মনে,
সেদিন নিকটে ছিনু,--এই মাত্র দাবী কি বা আর?
সেদিন চলিয়া গেছে অলক্ষিতে; আজি অকারণে
তোমার আমার মাঝে হেরি তপ্ত ব্যথার পাহাড়!

যেদিন চলিয়া গেছে সেদিনের স্মৃতিও তো যাবে!
অতীতের অন্ধকার--ব্যস্ত কেন,--ধীরে ঘিরে আসে।
আমার নয়ন হ'তে জোর করে নয়ন ফিরাবে,--
এরি তরে প্রাণপণ! শুনি প্রতিশোধ অভিলাষে
আমারি প্রেতাত্মা যদি মন তব করি অধিকার
জ্বালায় বিদ্বেষ-বহ্নি, কে পথ রোধিবে বল তার?

(৩)

আমার কাটিবে দিন, যেমন কেটেছে এত কাল।
আজিকে দিয়েছ ব্যথা, এতো নয় প্রথম আঘাত;
বেদনার ঘনবাষ্পে পুঞ্জীভূত স্মৃতির কঙ্কাল
আমার হৃদয়াকাশ আলোকিয়া ঘুরে দিন রাত!
দুঃখ ও দৈন্যের সুরা নিঃশেষে করেছি সখি, পান;
চরণ টলেনি তবু, একটুও কাঁপেনি অন্তর!
দুর্ভাগা আমার প্রেম সয়েছে সহস্র প্রত্যাখ্যান;
মানুষের অত্যাচারে হিয়া মোর প্রহার-জর্জ্জর!

তোমারে হেরিয়া তবু ভাবিলাম সার্থক নয়ন,—
এতদিনে কাছে পেনু যারে মোর একান্তই চাই!
আজিকে ভেঙেছে ভুল, বুঝিয়াছি আপনার জন
নারী কভু কারো নয়;—নারীর হৃদয়-বস্তু নাই।
তোমার রূপের শিখা জ্বলিবে, জুটিবে প্রিয়জন;
আমারো কাটিয়া যাবে সুখে-দুঃখে সামান্য জীবন!

বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

নজরুল ইস্‌লাম

বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে' দেখলে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটী রূপ। এক রূপে সে শেলীর Sky-lark এর মত, মিল্টনের Birds of Paradise এর মত এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্দ্ধে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি ঊর্দ্ধে--আরো ঊর্দ্ধে উ'ঠে স্বপন-লোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটীর পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁক্‌ড়ে ধরে' থাকে--অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন ক'রে তার মাকে জড়িয়ে থাকে--তরু-লতা যেমন ক'রে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে ধ'রে থাকে--তেমনি ক'রে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি মলিন পৃথিবীর এই কর্দ্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না--তাহা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গ-লোকে যেতে চায় না। সে বলে : স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলার ধরাতেই নামিয়ে আন্‌ব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটীর মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুরলোকের দেবতারা হাসেন। বলেন : অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাত্‌লামী! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে : আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্দ্ধলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ ঔদ্ধত্য কোনো কালেই টেকেনি; নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে : কেন যে টেকেনি--তার কৈফিয়তই তো চাই দেবতা! আমরা তো আজ তারই একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুইদিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর-দিকে গর্কি, যোহান বোয়ার, বার্ণার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যের মোটামুটি এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্য রূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme এর মাঝে যে, সে এই মাটীর মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, পক্ষীরাজে চ'ড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালোবাসে, তাই বলে' স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে-স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্ব্বপ্রকারে সুখী--কিন্তু তাই ব'লে তার ওপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে ব'সে ব'সে গায়--তার দুঃখিনী মাকে বেদনা। - তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রু-জলে কর্দ্দমাক্ত হয়ে যে মাটী--সেই মাটীকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে--লিওনিদ্‌ আঁদ্রিভ্‌, ক্নুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল্‌ রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্ণার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান ক'রে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী--তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন--এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল নইচে দু'ই বদ্‌লে একেবারে নতুন ক'রে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব!

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন : A thing of beauty is a joy for ever. Beauty is Truth, Truth is Beauty. প্রত্যুত্তরে মাটীর মানুষের Whitman বলেন, --

Not physiognomy alone--

Of physiology from top to toe I sing,

The modern man I sing!

গত Great war এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই ideaর জগতের Great war বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন ক'রেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই capitalist- রাবণ ও তার বুর্জ্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদেরে বলে, হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরি ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজারপাইন যমরাজা প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার ন্যাজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাত মুখ যদি পোড়েই--তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব! ব'লেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে--এ আপনারা যে কেউ দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছেন বোধ হয়। না দেখ্‌তে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখ্‌তে পাবেন! দুর্বীনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখ-পোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়্‌ছে তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না--এ কথা কে বল্‌বে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাঁদের, তাঁদেরে বল্‌ছিনে, হয়ত তাতে ক'রে তাঁদের মাথা হেঁটই হ'বে!......

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্ব্বপ্রথম পড়ে--14th December ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের 14th dec.--এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি : Merezhkovskyর বেদনা-চীৎকার--"14th Dec!" এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্ব্বর রুষ সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস! এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশ্‌কিনের ফাঁসির রজ্জুতে লট্‌কানো মৃত্যু-পাণ্ডুর মূর্ত্তি।

এইদিনই এই নির্য্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লব-শিশু। বীণা-বাদিনী সরস্বতী এই দিন বীণা ফেলে খড়গ হাতে চামুণ্ডারূপ পরিগ্রহ করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল দলে দলে অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল। কেতকী-বিতানের শাখায় শাখায় দুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

এই নির্ব্বাসনের সাইবিরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভ্‌স্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভ্‌স্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্ত্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাসিয়ারই প্রতিমূর্ত্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহুপরিচর্য্যা-রতা সোনিয়ার পায়ের তলায় প'ড়ে বল্‌ল, "I bow down not to the, but to suffering humanity in you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠ্‌ল। নিখিল মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠ্‌ল। টলষ্টয়ের এর God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে নূহের তরণীর মত ভাস্‌তে লাগ্‌ল সৃষ্টি প্লাবন-শেষে নতুন দিনের প্রতীক্ষায়!

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত--ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে--ম্যাক্সিম গর্কি। শেকভের নাটমঞ্চ ভেঙে পড়্‌ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বল্‌লে : তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলষ্টয় কেঁপে উঠ্‌লেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না!

গর্কি বল্‌লে : দুঃখ বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না--আমরা এর প্রতিশোধ নেব! রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব: "লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়" আরাবে বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠ্‌ল! নির্জ্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নীচের ফণিনীর মত মোচড় খেয়ে উঠ্‌ল!

দূর সিন্ধুতীরে ব'সে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে! জার গেল—জারের রাজ্য গেল--ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি শাবলের ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল! ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মত গর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত--হয়ত বা নব রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজও রুষিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিক্‌সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে প'ড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে! পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে! ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে!

গর্কির পরে যে সব কবি লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি না, তা আজও বলা দুষ্কর!

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যানডেনেভিয়া। --আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত ব'লে দাবী রাশিয়া যেমন করে -তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স জার্ম্মাণীও এ-অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হ্যামসুন--যোহান বোয়ার--শুধু নরওয়ের ওরাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট বড় সব realistic লেখকই বুঝি বা ইব্‌সেনের মানস-পুত্র।

হ্যামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্দ্ধেক Dreamer, অর্দ্ধেক ঔপন্যাসিক। যোহান বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তার The Prisoner who sang এর নায়ক যেন পাপে-পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্ব্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হ্যামসুনের Growth of the soil-এর, Pan-এর, ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে--তার তুলনা জগতে কোনো কালের কোন সাহিত্যেই নেই!

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা প'ড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন ক'রে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায় তেমনি!

রাশিয়া দিয়েছে revolution এর মর্ম্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা, স্ক্যানডেনেভিয়া দিয়েছে--অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস! রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত-তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখভরা জল! রাশিয়া বলে : এ বেদনাকে পরুষ-শক্তিতে অতিক্রম করব,--ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধ-কারা! নরওয়ে বলে : প্রার্থনা কর! ঊর্দ্ধে আঁখি তোলো! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না!

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায়--হঠাৎ কোন্ অবিশ্বাসীর নির্ম্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে! পিছন ফিরে দেখি, চার্ব্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্ব্বাসার মত দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটীকুটিল বার্ণার্ড শ--আনাতোল ফ্রাঁস-জেসিঁতো বেনাভাঁতে। তাদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড! শ' বলেন : Love টাভ কিচ্ছু নয়—ও হচ্ছে--মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন : কি হে ছোক্‌রারা! খুব তো লিখ্‌ছ আজকাল! বলি, ব্যাল্‌জ্যাক জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardo'র মুখ দিয়ে বলে--"বন্ধু! যে জীবন ম'রে ভূত হয়ে গেল--তাকে ভুলতে হ'লে ভাল ক'রে কবরের মাটী চাপা দিতে হয়! মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে- ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়--সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে—তবে তার মরাই মঙ্গল।"

তাঁর মতে হয়ত আমাদের তাজমহল--সাজাহানের মোমতাজকে ভাল কবর দিয়ে, ভাল ক'রে ভুলবারই প্রচেষ্টা!

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্ম্মম, কিন্তু সে বার্ণার্ড শ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ ক'রে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে; তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল রেমণ্ট--পোলিশ,--আর একজন গ্র্যাৎসিয়া দিলেদ্দা--ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না--

হঠাৎ চম্‌কে উ'ঠে শুনি, আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজ্‌ছে--এ যুদ্ধ-বাদ্য বক্তশতাব্দীব পশ্চাতের। দেখি, তালে তালে পা ফেলে আস্‌ছে--সাম্রাজ্যবাদী ও ফাসিস্ত্‌ সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যআনান্‌ৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধ'রে মুসোলিনী এবং তার কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢু'লে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনিব মত শ্রেষ্ঠ স্বপন চারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী--"The sound of the bell-- that leaves the bell itself!--" তারপরেই সে বলে : আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না, ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে, তারি অতলতায় ডুব দেওয়াব জন্যই আমার এ গান শোনা!" শুন্‌তে শুন্‌তে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে! ধূলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব-গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি--পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র-চালকের বাঁশী;-- তুরস্কের নেকাবপরা মেয়ের মোমের মত দেহ!

তখন চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলিখেলা চলে। আমি স্বপনের ঘোরেই ব'লে উঠি--Thou wast not born for death immortal bird!

[প্রাতিকা]

গান

নজরুল ইস্‌লাম

শূন্য এ বুকে পাখী মোর, আয়
ফিরে আয় ফিরে আয়।
তোবে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।।
তুই নাই ব'লে, ওরে উন্মাদ,
পাণ্ডুর হ'ল আকাশের চাঁদ,
কেঁদে নদীজল করুণ-বিষাদ
ডাকে আয় তীরে আয়।।
আকাশে মেলিয়া শত শত কর
খোঁজে তোরে তরু ওরে সুন্দর
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড়
লুটায় লতা ধূলায়।।
তুই ফিরে এলে ওরে চঞ্চল
ফুটিবে আবার বনে ফুল দল,
ধূসর আকাশ হইবে সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়।।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

হুমায়ুন কবির

বাংলা-সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব নিয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করে থাকি, এবং সে আলোচনা হ'লে এ অভাবের অনেক কারণও যে ধরা পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায়ই আমরা ভুলে যাই যে বাংলাদেশে জীবনের মূলেই বাস্তবতার অভাব,—তাই সাহিত্যে যে অবাস্তবতার ছায়া পড়বে, তাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশে হাসির স্থান নিয়ে আলোচনা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাসি একান্ত ভাবেই সামাজিক, তাই নির্জ্জন নিঃসঙ্গ বনবাসে যে হাসতে পারে, সে আর যা'ই হোক মানুষ নয়। তবু আমরা অনেক সময়ে একা একা হেসে থাকি। কিন্তু খুঁজে দেখলেই জানা যাবে যে সে হাসির কারণ সামাজিক কোন ব্যাপারের মধ্যেই রয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়েই হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—তাই সে সম্বন্ধ বাদ দিলে হাসিরও কোন অর্থ বা কারণ থাকে না।

অনেকে মনে করেন যে, হাসি জিনিষটা অনেকটা ওষুধের মতন। অসুখ হ'লে ওষুধ খেয়ে শরীর ভালো হয়। রোগনাশ ছাড়া রোগনিবারণ ব্যাপারেও ওষুধের ব্যবহার আছে। তেমনি সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষাই হাসির গূঢ় উদ্দেশ্য। যেখানেই সামাজিক কোন অসঙ্গতি ধুয়ে মুছে দিতে চায়। যা চিরাচরিত, চিরদিন চলে আস্‌ছে, সবাই করে থাকে, তা নিয়ে কেউ হাসে না—তার বিপরীত কিছু করলেই সমাজ আত্মরক্ষার জন্য হাসির অস্ত্র প্রয়োগ করে। সে অসঙ্গতি যত বেশী, হাসির তীক্ষ্ণতাও ততই বেড়ে যায়। পায়ে হেঁটে দলে দলে মানুষ চলেছে, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু সেই জনসমুদ্রের মধ্যে যদি একটি লোকও হঠাৎ পা দুটি ওপরে তুলে মাথায় হাঁটতে শুরু করে, তখন চারদিকে লোক জমে ওঠে, হাসির হর্‌রা পড়ে যায়। সবাই যা করে, ব্যক্তিকে দিয়েও তাই করাবার জন্য সমাজের প্রধান অস্ত্র এই হাসি।

এই কারণেই অনেকে আবার হাসিকে নুনের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। নুনের কটুতা অস্বীকার করে চলে না—কিন্তু নুন না হ'লে সমস্ত খাবারই যে বিস্বাদ হয়ে যায়, সে কথা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই। হাসিতেও তেমনি কটুত্বের আভাস রয়েছে; কিন্তু নুন যেমন নিজে তেতো হয়েও অন্য সব জিনিষকে মিষ্টি করে তোলে, তেমনি হাসির মধ্যেও কটুত্ব বা তীক্ষ্ণতার আভাস থাক্‌লেও হাসি জীবনকে মহনীয়—সুন্দর করে তোলে। হাসির পাত্র অবশ্য একথা সব সময়ে স্বীকার করতে চায় না—তার কারণ এই যে, সে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িয়ে পড়ার হাসির সামাজিক রূপ দেখার তার সুযোগ থাকে না—অক্ষমতারই বহু স্থলে অভাব। কিন্তু সেই লোকই যদি নিজের সেই হাস্যাস্পদতাকে অন্যের খাড়ে চালিয়ে দিতে পারে, সেও তখন কারো চেয়ে কম হাসে না। বড় বড় হাস্যরসিকদের এই রকম অব্যক্তিক ভাবে হাস্যাস্পদকে দেখবার ক্ষমতা আছে বলেই তাঁরা হাসিকে সর্ব্ব-সাধারণের কাছে প্রিয় করে তুলতে পারেন—সেই জন্যই তাঁরা বড় হাস্যরসিক।

এই কথা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই হাসির অন্য একটি উপাদান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নুনে রাখ্‌লে যেমন জিনিষ ভাল থাকে—পচে না, তেমনি হাস্যরস সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে, একথা সত্য; কিন্তু হাসির মধ্যে যদি সহানুভূতি না থাকে তবে সে হাসি বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে যায়। সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা তাতে হয়তো চল্‌লেও চলতে পারে, কিন্তু সমাজের প্রাণকে সজীব রাখবার তাতে ব্যাঘাত হয়। এই সরস অনুকম্পাই হাসিকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে—তা নইলে তেতো ওষুধের মতন প্রয়োজনে মানুষ নাক-কাণ বন্ধ করে কোন রকমে হাসি সইত, অন্য জিনিষকে উপাদেয় করবার জন্য পরিমিত ভাবে নুনের মতন ব্যবহার ক'রত.—কিন্তু হাসির জন্য হাসিকে বরণ করে তাতে আনন্দ পেত না। আনন্দ রয়েছে বলেই মানুষ কারণে অকারণে হাসি খোঁজে, তার মাত্রা অমাত্রার কোন প্রশ্ন না তুলে তার সমস্ত প্রকাশকেই ভালবাসে।

হাসিরও তাই নানা প্রকারভেদ। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান মিশিয়ে যা তৈরী হয়, তার উপাদানের একটু কম বেশী করেই নানা প্রকারভেদ করা যায়। তাই বিদ্রূপে অসঙ্গতিকে আঘাত করবার চেষ্টাই বেশী ফুটে ওঠে—নুনের মতন সুস্বাদ করার প্রয়াস

বা অনুকম্পার সরসতা তাতে বেশী নেই। তেমনি ব্যঙ্গের মৃদু তিক্ততার আভাস মজলিস জমে ওঠে—জীবনে স্বাদ আনে, তাতে বিদ্রূপের কষাঘাত নেই বটে—কিন্তু হাস্যরসের মাধুর্য্যও নেই। স্নিগ্ধতায় ভরা প্রাণখোলা হাসির রূপও তাই সুস্পষ্ট-তাতে আঘাতের আভাস থাকলেও আঘাতের কঠিনতা নেই, তিক্ততার আমেজ থেকেও তিক্ততার কটুত্ব নেই। সে হাসি সুস্থ সমাজের প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বাস।

বাংলা সাহিত্য নিয়ে যার একটুও কারবার আছে, সে-ই জানে যে বাংলা হাস্যরসের এ পূর্ণ রূপ নেই। অসুস্থ সমাজের জন্য তীব্র আত্মগ্লানির পীড়ায় যে বিদ্রূপ, তার পরিচয় বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা-সাহিত্যে স্থান খুব উপরে নয়, কিন্তু তবু যে লোকে তাঁকে একেবারে ভুলে যায়নি, বোধ হয় যাবেও না--তার কারণ, যে বিদ্রূপের কষাঘাতে তাঁর লেখা পরিপূর্ণ। অসঙ্গতিকে দূর করবার তাঁর প্রয়াসের সঙ্গে মানুষের মনের সহানুভূতি আছে—তাই সেই অসঙ্গতিগুলি যদি কোন দিন দূরও হয়, তবু দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা সাহিত্যের কাচারী ঘরে আমলার পদমর্য্যাদা বোধ হয় চিরদিনই মিলবে। তাঁর লেখার সাহিত্য-মূল্য দিয়ে নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক গ্লানিপীড়িত মানব-মনের বিদ্রোহ সেখানে সাড়া পাবে বলেই তাঁর প্রতি সাহিত্যলক্ষ্মীর এ অনুকম্পা।

বিদ্রূপে কিন্তু মানুষের মনের তৃপ্তি নেই, কারণ আঘাত খেয়ে আঘাত ফিরিয়ে দিলে আঘাতকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই বিদ্রূপ যে করে, সে অসঙ্গতির গ্লানির তীব্রতা দিয়েই প্রমাণ করে যে তার মন সে অসঙ্গতিকে জয় করতে পারে নি--তার কিন্তু মুক্তির স্বাদ পায়নি বলেই মনে বিষ ফেনিয়ে উঠেছে—তার রচনা সেই বিষেরই জমানো ফেনা। সমাজ তাই তাতের বাহবা দেয়, মনের নিগূঢ় চেষ্টায় সহানুভূতি আছে বলে তাদের প্রতি অনুকম্পাও দেখায়, কিন্তু সাহিত্যিক বলে রসিক বলে তাদের আপনার অন্তরে স্থান দেয় না। তারা সাহিত্যের দরবারে ভাঁড়--মজলিসে মজলিসীদের মধ্যে তাদের স্থান নেই--স্পষ্ট অসঙ্গতির স্পষ্ট সবল অভিব্যক্তিতেই তাদের মোটা রসিকতা।

বিদ্রূপ রচনার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে আরো মেলে, কিন্তু ব্যঙ্গ রচনার স্তরে উঠলেই বাংলায় হাস্যরসের দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। বিদ্রূপের কষাঘাত হানা অপেক্ষাকৃত সহজ--তার মধ্যে মুন্সিয়ানা নেই, সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য্যের অবকাশ নেই। কামারের হাতুড়ী পেটার মতন তোতে জোর হলেই অনেকখানি চলে; কিন্তু বিনি সূতোর মালা গাঁথার যে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য, হীরে জহরৎ বসাতে হলে কারিগরের যে হাতসাফাই, তা না হলে ব্যঙ্গরসের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। তাই সত্যিকার মজলিসী রসিকতার আমাদের দেশে এ অভাব। তাতে বিদ্রূপের ক্রূরতা থাকবে না, সোজাসুজি আক্রমণ বা স্পষ্ট অবহেলা অপমান থাকবে না, অথচ কটুত্বের আভাসে অন্যান্য সমস্ত উপাদানগুলি সুস্বাদ মুখরোচক হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই সূক্ষ্ম সুনিপুণ ব্যঙ্গরসের পরিচয় মেলে--সেখানে কথায় কথায় আগুনের ফুলকি--তাতে দীপ্তি আছে, কিন্তু দাহ নেই। শোনা যায় যে দামস্কের তলোয়ার ধারে কাটত, ভারে নয়--কাউকে আঘাত করলে বিদ্যুতের মত তাকে কেটে চলে যেত, কিন্তু আঘাতের কোন চিহ্ন থাকত না--দু'ভাগ দু'ফাঁক হয়ে পড়ে যেত না। তেমনি ব্যঙ্গরসের আঘাতও এত সূক্ষ্ম, এত মৃদু যে যাকে আঘাত করা যায়, সত্যি তার আঘাত লেগেছে কি না, সেও তা ঠিক জানে না। ঠোঁটের কোণায় হাসির যে আভাস ফুটবার আগেই মিলিয়ে যায়, ভেঙে ফেটে পড়ে না--সেই হাসিই ব্যঙ্গরসের প্রতীপ। ইঙ্গিত নিয়েই তার কারবার, মনের সঙ্গে মনের সান্নিধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাবার উপক্রমেই তার উদ্ভব--সে বিদ্যুৎ ঝলসানোর প্রতীক্ষাও সে রাখে না, আভাসমাত্র দিয়েই সে আবার মিলিয়ে যায়।

ব্যঙ্গরসের মধ্যে কিন্তু নিষ্ঠুরতা রয়েছে, এবং সূক্ষ্ম বলেই সে নিষ্ঠুরতা আরো কঠিন। তার অব্যক্তিক হাসির আভাস কাউকেই রেহাই দেয় না।--নিজেকে পর্য্যন্ত আঘাত করে সে আপনার হাসির উপাদান সংগ্রহ করে। মৃদু বলে সে আঘাত আমাদের গায়ে লাগে না—কিন্তু দামস্কের সেই তলোয়ারের মতন সেও আমাদের অন্তস্তল ভেদ করে চলে যায়। সে ছেদ সকলের চোখে পড়ে না, কিন্তু যার দৃষ্টি আছে সেই জানে যে আমাদের চরিত্রের বিচিত্র দিককে যে জীবনের গ্রন্থী বেঁধে রাখে, ব্যঙ্গ সেই গ্রন্থী-বন্ধনকেই কেটে চলে যায়; আঘাত সূক্ষ্ম কেবল এই কারণেই জীবনের সঞ্চয় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। ব্যঙ্গরসের কথায় কথায় চারদিকে আলো ঝকমকিয়ে ওঠে, ওস্তাদের হাতসাফাই আমাদের বুদ্ধিকে আনন্দ দেয়। কিন্তু সেখানেও প্রাণের তৃপ্তি মেলে না। ব্যঙ্গরসের তাই মজলিসে আদর, ডেকে এনে তাকে আমরা আসরে বসাই, পান-তামাক

এগিয়ে দিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করি, কিন্তু প্রাণের অন্তঃপুরে তার স্থান নেই। অন্দর মহলে তাই তার ডাক পড়ে না--তাকে ওস্তাদ বলে খাতির করি, কিন্তু আত্মীয় বলে ভালবাসি না।

নিছক হাস্যরসও ব্যঙ্গের মতনই নৈর্ব্যক্তিক,--ব্যঙ্গরসিক যেমন আপনার কলানৈপুণ্যের প্রকাশে নিজেকেও খাতির করে না-হাস্যরসিকও তেমনি নিজেকে নিয়েও হাসতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক হলেও কিন্তু হাস্যরস ও ব্যঙ্গরসের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। ব্যঙ্গরসের অপক্ষপাত আঘাতে, তাতে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু হাস্যরসের অপক্ষপাত অনুকম্পায়, প্রীতিতে। নিজেকে এবং অপরকে ভালো-মন্দে মেশানো দোষেগুণে মানুষ বলে সে জানে--তাই তার হাসিতে তীক্ষ্ণতা নেই, কটুত্ব নেই। দোষগুণকে দোষগুণ বলে তাদের সত্যকার রূপে জানে বলে হাস্যরস প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে--সে হাসির মধ্যে কোন অভিযোগ নেই, কোন প্রচ্ছন্ন কণ্টক সেখানে গুপ্ত আঘাত করে না। –সেখানে রয়েছে প্রাণের প্রাচুর্য্য, সুস্থ সবল জীবনের মাধুরীর বিকাশ।

বাংলা সাহিত্যে হাসির এ রূপ নেই বল্লেই চলে--একা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সময়ে সময়ে এ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিত্ত না হ'লে সাহিত্যে নিছক হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভবপর নয়, এবং বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষার যে অবস্থা তাতে মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিত্ত একই সঙ্গে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যাদের বুদ্ধি মুক্ত তাদের চিত্ত দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় আতুর, যাদের চিত্ত-সম্পদে প্রাচুর্য্য রয়েছে বুদ্ধি তাদের মুক্ত নয়।

বুদ্ধি ও চিত্তের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতায়ই নিছক হাস্যরসের জন্ম। যার মনে কোনদিকে অভাব রয়েছে, দৈন্য রয়েছে, তারই কথা ও ব্যবহারে অভিযোগ ফুটে উঠবে–চেষ্টা করলেও সে অভিযোগ অভিমানের মনোভাব লুকোতে পারবে না। বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতায় প্রকাশ্য অভিযোগের বন্ধন এড়িয়ে ব্যঙ্গলোক সৃষ্টি করা চলে; কিন্তু যতই প্রচ্ছন্ন হোক না কেন, সেখানেও ইঙ্গিতে আভাসে অভিমান থাকবেই। নিজেকে আঘাত করলে সেও তো আঘাতই বটে! সুস্থ স্বাভাবিক মনে সংসারকে বাস্তব চোখে সত্যিকার রূপে দেখতে পারলেই এ অভিযোগ অভিমানের দায় এড়িয়ে মুক্ত পৃথিবীর নাগরিক হওয়া চলে, সেখানেই হাসি সত্যকার রূপে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। মেঘ-রৌদ্রে মিলিয়ে শরতের হাসি--আনন্দ ও বেদনার রঙে রাঙিয়ে বিচারের সঙ্গে ভালবাসা মিলিয়ে বাস্তব জগতের স্নিগ্ধতাই এ হাস্যরসের প্রাণ।

এল ঐ পূর্ণিমা-চাঁদ ফুল জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম ভাঙানো।।
লাগিল জাফরাণী রং শিউলি ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি খু'লে,
খুশীর আজ আমেজ জাগে মন-রাঙানো।।
চাঁদিনী ঝিল্‌মিলায় নীল ঝিলের জলে,
আবেশে শাপ্‌লা ফুলের মৃণাল টলে।
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো।।
এস আজ স্বপন-কুমার নিরিবিলি
খুলিয়া গোপন প্রাণের ঝিলিমিলি,
এস মোর হতাশ প্রাণের ভুল-ভাঙানো।।

– নজরুল ইস্‌লাম

কৃষাণীর ঘর

জসীমউদ্‌দীন

গোড়াই নদীর তীরে,
কুটীরখানিরে লতা পাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি'
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ কুমড়ার ঝাড়--
আড়াআড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল-ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়ীখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ীর বধূ কেউ!
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হ'তে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা ক'য়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখীরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালজিরা আর ধ'নে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ, আর
জিরা ও ধ'নের রঙের পাশেতে আল্পনা আঁকা কার।
সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখীর মত
চালার দুখানা পাখ্‌না মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।
কুটিরখানির এক ধারে বন, শ্যাম-ঘন ছায়াতলে
মহারহস্য লুকাইয়া বুকে সাজিছে নানান ছলে।
বনের দেবতা মানুষের ভয়ে ছাড়ি ভূমি সমতল,
সেথায় মেলিছে অতি চুপি চুপি সৃষ্টির কৌশল।
লতা-পাতা-ফুল-ফলের ভাষায় পাখীদের বুনো সুরে--
তারি বুকখানি সারা বন বেড়ি' ফিরিতেছে সদা ঘু'রে।
ইহার পাশে-তে ছোট গেহখানি, এ বনের বনরাণী,
বনের খেলায় হয়রাণ হয়ে শিথিল বসনখানি;
ইহার ছায়ায় মেলিয়া ধরিয়া শু'য়ে ঘুম যাবে বলে,
মনের মতন করিয়া ইহারে গড়িয়াছে নানা ছলে।

সে ঘরের মাঝে দু'টী পা মেলিয়া বসিয়া একটী মেয়ে,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।

দু'টী হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করিছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু'একটী চুল।
কুপিত হইয়া চুলেরে সরা'তে ছিঁড়িছে হাতের সুতো
চোখ ঘুরাইয়া চুলেরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।
তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার-জালেতে আসি।
কালো মুখখানি, বন-লতা-পাতা আদর করিয়া তায়,
তাহাদের গা'র যত রঙ যেন মেখেছে তাহার গায়।
বনের দুলালী ভাবিয়া ভাবিয়া বনের শ্যামল কায়া,
জানে না কখন জড়ায়েছে তার অঙ্গে বনের ছায়া।

আপনার মনে শিকা বুনাইছে, ঘরের দু'খানা চাল
দু'খানা রঙিন ডানায় তাহারে করিয়াছে আব-ডাল।
'আটনে'র গায়ে সুন্দী বেতের হইয়াছে কারু কাজ,
'বাজারের' সাথে 'পরদা' বাঁধন মেলে প্রজাপতি সাজ।
'ফুস্যির' সাথে রাঙতা জড়ায়ে 'গোখুরা' বাঁধনে আঁটি
'উলু' ছোন দিয়ে ছাইয়াছে ঘর বিছায়ে শীতল পাটি।
মাঝে মাঝে আছে 'তারকা' বাঁধন, তারার মতন জ্বলে,
রুয়ার গোড়ায় খুব ধ'রে ধ'রে ফুলকাটা শতদলে।
তারি গায় গায় সিঁদুরের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে
এমন করিয়া রাঙায়েছে যেন ফুলেরা উঠেছে জিয়ে।
এক পাশে আছে ফুল্‌চাং বাঁধা নানা কারুকাজে ভরা,
চাল ভাল কিবা ফুলচাং ভাল বলা যায় নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা কেলী-কদম্ব ফুল-ঝুরি শিকা আর,
আসমান-তারা শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার।
শিকায় ঝুলানো চিনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙ দিবানিশি।
তাহার নীচেতে মাদুর বিছায়ে মেয়েটী বসিয়া একা,
রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে বাচিছে ফুলের লেখা।

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুল্‌চাং আর শিকাগুলি ভরি ফুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখীদের গান, উঠানে লতার ঝাড়,
সবগুলো মিলে নির্জ্জনে যেন মহিমা রচিছে তার।
মেয়েটী কিন্তু জানে না এসব, শিকায় তুলিছে ফুল,
অতি মিহিসুরে গান সে গাহিছে মাঝে মাঝে করি ভুল।

বৈদেশী তার স্বামীর সহিত গভীর রাতের কালে,
পাশা খেলাইতে ভানুর নয়ন জড়াল ঘুমের জালে।

ঘুমের ঢোলনী, ঘুমের ভোলনী—সকলে ধরিয়া তায়,
পাল্কীর মাঝে বসাইয়া দিয়া পাঠাল স্বামীর গাঁয়।
ঘুমে ঢুলু আঁখি, পাল্কী দোলায় চৈতন হ'ল তার,
চৈতন হ'য়ে দেখে সে'ত আজ নহে কাছে বাপ-মা'র।
এত দরদের মা-ধন ভানুর কোথায় রহিল হায়,
মহিষ মানত করিত তাহার কাঁটা যে ফুটিলে পায়।
হাতের কাঁকণে আঁচড় লাগিলে যেত যে সোণারু বাড়ী,
এমন বাপেরে কোন্ দেশে ভানু আসিয়াছে আজ ছাড়ি।
কোথা সোহাগের ভাই-বউ তার মেহেদী মুছিলে হায়,
আপন সিথার সিঁদুর চাহিত ঘসিতে ভানুর পায়।
কোথা আদরের মৈফল-ভাই ভানুর আঁচল ছাড়ি,
কি করে আজিকে দিবস কাটিছে একা খেলাঘরে তারি।

এমনি করিয়া বিনায়ে বিনায়ে মেয়েটি করিছে গান,
দূরে বন-পথে 'বৌ কথা কও' পাখী ডেকে হয়রাণ। *

* লেখকের 'সোজন বাদীয়ার ঘাট' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে।

"বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ"

আবুল মনসুর আহ্‌মদ, বি-এল

উপরোক্ত শিরোনামা দিয়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ আবুল হোসেন সাহেব গত সংখ্যা 'বুলবুলে' একটী প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটাতে যে সমস্ত মতামত যে-ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তা দেখে সত্যি আমরা অবাক হয়েছি। তবু বন্ধুবর আবুল হোসেনের মত মনীষীর নাম ওতে জড়িত রয়েছে ব'লে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উহা একাধিকবার পড়তে হয়েছে। এই লেখাটার অগভীরতা খুব সাধারণ পাঠকের চোখও এড়াতে পারবে না, তা আমি বুঝতে পারছি, তবু এ লেখাটা উপেক্ষার নয় -দুটো কারণে। একটা লেখকের ব্যক্তিত্ব, আরেকটা বিষয়টার গুরুত্ব। কারণ, বিষয়টাকে আমরা খুবই জরুরী মনে করে থাকি বটে, কিন্তু ওটাকে আমরা যতটা জরুরী মনে করি, আসলে তা তার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী। কাজেই যতদিক থেকে ওর যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। 'বুলবুলে'র গোলাপ-কুঞ্জকে রাজনৈতিক বক্তৃতার আসরে পরিণত না করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এ বিষয়ে আমি গুটীকতক কথা নিবেদন করবো এবং বিজ্ঞতর বন্ধুগণের মতামতের অপেক্ষা করবো। কারণ মিঃ আবুল হোসেন তাঁর প্রবন্ধের নাম 'বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ' রাখলেও তিনি যে-বিষয়ের আলোচনা করেছেন তা আসলে শুধু বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ নয়, ওটা বাঙ্গালীর বৃহত্তর জীবনের ভবিষ্যতের কথা।

প্রবন্ধটাতে মোটামুটি এই ক'টা কথা বলা হয়েছে :

(১) মুসলমান নেতারা হিন্দু-প্রধান প্রদেশ সমূহে এবং কেন্দ্রে হিন্দু Communal majority মেনে নিয়েছেন।

(২) অই মেনে-নেওয়া এবং ১৯১৯ সনের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ না করে তা গ্রহণ করায় মুসলমানদের শান্তিপ্রিয়তা, কর্ম্মে আগ্রহশীলতা ও উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের প্রতি তাদের ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হচ্ছে।

(৩) হিন্দুদের মনোভাব মোটেই প্রশংসার নয়। কারণ :—(ক) বাঙ্গলার মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে 'সীট্' বেশী পাওয়ায় হিন্দুরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদের terrorize করবার জন্য কৃত্রিম নারীরক্ষা আন্দোলন শুরু করেছে। (খ) হিন্দুরা আইন অমান্য করে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা আনছে, (গ) তারা ত্রাসবাদের সহায়তা করে দেশদ্রোহিতা করছে। লেখকের মতে এই দুরবস্থা দূর করতে হলে হিন্দুদের মুস্‌লিমবিদ্বেষ, গুপ্ত-ঘাতকের দেশদ্রোহিতা ও আইন-অমান্যকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা-দূর করতে হবে। কিন্তু হিন্দুরা তা করবে না। কাজেই বেচারা মুসলমানকেই এই বেগার খাটনি খাট্‌তে হবে।

শ্রদ্ধেয় লেখক গোড়াতেই যে ভুল করেছেন, তা এই যে, হিন্দু-প্রধান প্রদেশ সমূহে ও কেন্দ্রে মুসলমানরা হিন্দুদের Communal majority মেনে নেন নি—তাঁরা ওটা চেয়ে নিয়েছেন। সমগ্র ভারতে ও অনেকগুলি প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা যে বেশী, সে অপরাধ হিন্দুদের নয়। আর এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বা অরাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার কল্পনা করা আপাততঃ যাচ্ছে না, যাতে করে হিন্দুদের অই সংখ্যাধিক্যের কোনো প্রতীকার করা যেতে পারে। কাজেই কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করতে হলেই ঐ ঐ স্থানে স্বভাবতঃই হিন্দু সদস্যের সংখ্যা বেশী হবে। মুসলমানদের সম্বন্ধেও অই কথা। এ অবস্থার একমাত্র প্রতীকার ও সংখ্যা-লঘুদের রক্ষা-কবচ হচ্ছে সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণকে সংখ্যালঘুদের নিকট দায়িত্বশীল করা। সোজা কথায়, মিশ্র অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন। কিন্তু মুসলমান নেতারা মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা গ্রহণ করবেন না, তাঁদের ধনুর্ভঙ্গ পণ। মুসলমানরা পৃথক নির্ব্বাচন পেলে হিন্দুরা আপনাআপনিই পৃথক হয়ে যায়। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী। কাজেই তারা পৃথকও হল, বেশীও হল। ফলে হল Communal Hindu majority. এ অবস্থার জন্য হিন্দুদেরকে দায়ী করা যায় না এবং মুসলমানদের এই অভীষ্ট পাওয়াকে তাদের মেনে নেওয়া ও উদারতার লক্ষণ বলে প্রচার করা যায় না।

শাসন-সংস্কার মুসলমানরা বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে, এ কথার সবটুকু সত্য নয়। এ কথা বল্‌লে গত ১৯২১ সালের আন্দোলন, হাজার হাজার মুসলমানের কারাবরণ, ৩৯ জন নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২২ জনেরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য-দল গঠন ইত্যাদি বড় বড় সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

মুসলমানদের কল্পিত শান্তিপ্রিয়তাকে প্রশংসা করে লেখক সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে এক কথায় নিন্দা করেছেন। বিনা প্রতিবাদে শাসন-সংস্কার গ্রহণ করার একটী মাত্র অবস্থা হতে পারে—যেখানে সংস্কার আমাদের সন্তোষ বিধান করতে পেরেছে। শাসন-সংস্কার আমাদের মনোমত হল না, অথচ বিনা-প্রতিবাদে আমরা তা গ্রহণ করবো, এর মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই। এটা বীরত্ব নয়, কাপুরুষতা; কর্ম্মে আগ্রহশীলতা নয়, কর্ম্মকুণ্ঠতা; জীবনের লক্ষণ নয়, মৃত্যুর লক্ষণ।

মুসলমানরা আজ যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে না, শিক্ষিত মুসলমানের নিকটও যে তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা শান্তিপ্রিয়তারূপে প্রশংসিত হচ্ছে, তার কারণ বাঙ্গলার মুসলমানদের কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ নেই। এরা মোল্লা সমাজের ভ্রান্ত মত প্রচারের ফলে বহুকাল কাবুলের আমীর, রুমের বাদশাহ্, আরবের শরীফের ছায়ার পিছনে ঘুরে ফিরেছে। যে মায়া-মরীচিকা শুধু বাঙ্গলার মুসলমান নয়, সমস্ত বিশ্বের মুসলমানকে এ যাবৎকাল উদ্‌ভ্রান্ত ও সম্মোহিত করে রেখেছিল বিংশ শতাব্দীর মেহ্‌দী মোস্তাফা কামালের গদার এক আঘাতে তা চুরমার হয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের চমক ভেঙেছে : কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের ঘুম এখনো ভেঙেছে বলে বোধ হয় না। তার কারণ এদের মধ্যে সত্যিকারের নেতা আজো জন্মায় নি। অশিক্ষিত, অভুক্ত, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্লিষ্ট, কঙ্কালসার মুসলমান কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাক্, তাদের সংখ্যার দোহাই দিয়ে বিশেষ নির্ব্বাচনের ভেলায় চড়ে শতকরা পঞ্চান্নটা চাকুরী আমরা জনকতক শিক্ষিত মুসলমান ভোগ করে যাই, এতেই মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষিত হল, ইস্‌লামের জয়ডঙ্কা বেজে উঠলো!

শ্রদ্ধেয় লেখক মুসলমান নেতাদের কর্ম্মে আগ্রহশীলতার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কী কর্ম্মটী মুসলমান নেতারা করেছেন? বাঙ্গলায় ধনী মুসলমানের অভাব নেই। কিন্তু করটিয়ার শ্রদ্ধেয় চাঁদ মিঞা সাহেব ছাড়া সারা বাঙ্গলায় একটী মুসলমানেরও কি নাম করা যায় যিনি জনহিতকর কার্য্যে দু'পয়সা খরচ করেছেন! প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষক বন্যায়, কলেরা-বসন্তে, কালাজ্বরে, ম্যালেরিয়ায় অন্নাভাবে মারা পড়ছে। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদী ইস্‌লামের স্বার্থরক্ষী নেতৃবৃন্দের কেউ কি কোনো দিন এ দিকে উঁকি মেরে দেখেছেন?

এই সমস্ত 'কর্ম্মে আগ্রহশীল' নেতাদের যে শুধু কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ নেই, তা নয়, এদের কোন অর্থনৈতিক আদর্শও নেই। মুসলমান সমাজকে অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য তাদেরকে শিল্পে বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করবার বাণী কোনো মুসলমান নেতার মুখ থেকে বেরুতে শুনেছে কেউ কোনো কালে? সমস্ত ভারতবর্ষে আজ শিল্প-বাণিজ্যের একটা বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। সর্ব্বপ্রকার শিল্পে আজ ভারতবাসী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠলো প্রায়। কিন্তু এই শিল্প-বিপ্লবে বাঙ্গলার সংখ্যা-গুরু মুসলমানের কোনো হাত আছে? কোনো 'কর্ম্মে আগ্রহশীল' নেতা মুসলমানের কাছে এ 'স্বদেশী'র বাণী পৌঁছিয়েছেন? পক্ষান্তরে এই সমস্ত 'কর্ম্মে আগ্রহশীল' নেতা মুসলমান কলওয়ালার কলের কাপড় ফেলে বিলাতী কাপড় ব্যবহার করে দেশী মুসলমান কলওয়ালার ব্যবসা লিকুইডিশনে দেন। দেশী তাঁতীর কাপড় ছেড়ে বিলাতী লুঙ্গি পরে দেশী লোকের তাঁত বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন; আর অ-মুসলমান বিদেশ-জাত তুর্কী টুপী মাথায় উড়িয়ে এই সমস্ত অভুক্ত পল্লী-মুসলমানের ভোট নিতে আসেন ইস্‌লামেরই তরক্কী সাধন করতে!

বন্ধুবর উচ্ছৃঙ্খলতাকে খুব ভয় করেন বলে বোধ হচ্ছে। একটা কথা তাঁকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এ দেশবাসীর মধ্যে যদি কারো এক-আধটু অনুকূলে থেকে থাকে তবে তা হিন্দুদের। বর্ত্তমান অবস্থার ওলট-পালট না হলে, ধনিক ও সর্ব্বহারার অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান না করলে জনসাধারণের সত্যিকার কল্যাণ সাধিত হবে না। বাংলা জনসাধারণ অর্থ মুসলমান। এদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক কল্যাণ বিধান করতে গেলেই বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে আপাততঃ একটা বিশৃঙ্খলার আসতে বাধ্য। এ বিশৃঙ্খলার যিনি বিরোধী তিনি হয় কাপুরুষ, নয় ধনিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। আশা করি বন্ধুবর এ দুটোর একটাও নন।

শ্রদ্ধেয় লেখক বাঙলার হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ এনেছেন তার মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের গুটীকতক বেশী 'সীট' পাওয়ায় হিন্দুদের অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতা অন্যতম। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে যদি কোনো সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করা হয়ে থাকে, তবে তার প্রতিবাদ করবার অধিকার সেই সম্প্রদায়ের আছে। সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের সীট-সংখ্যা কোনো অবস্থাতেই তাদের জন-সংখ্যানুপাতের কম হবে না, এটা মুসলমানদের দাবী এবং সরকার এই নীতি গ্রহণ করেছেন। তবু বাংলার সংখ্যা-লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সীট-সংখ্যা তাদের জন-সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে কম হল কেন? হিন্দুদের

সাম্প্রদায়িক দাবীর আমি ওকালতী করছি না! আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে যা ন্যায়, হিন্দুব পক্ষে তা অন্যায় হবার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ যাঁরা করছেন, তাঁদের সকলেই যে মুসলমানদের বেশী সীট পাওয়ার জন্যই ওটার প্রতিবাদ করছেন, তা হয়তো সত্য নয়। তাঁরা প্রতিবাদ করছেন, মুসলমানদের communal majorityর। বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা মেজরিটী দখল করে বসে থাকবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বা অন্যান্য সংখ্যা-লঘুদের নিকট তাদের কোনো দায়িত্ব থাক্‌বে না, অনেক হিন্দু শুধু এই নীতি থেকেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ করছেন।

হিন্দুরা মুসলমানদেরকে terrorize ও demoralize কর্‌বার জন্যই নারীরক্ষা আন্দোলন আরম্ভ করেছে, এ কথা বল্লে সমস্তটুকু সত্য বলা হবে না। নারীরক্ষা আন্দোলন বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এ ব্যাপারে অনেক হিন্দু সাংবাদিক ও নেতা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন, তা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়,--এমন কি অনেক স্থানে নিতান্ত জঘন্যরূপে সাম্প্রদায়িক, এটাও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাই বলে ও আন্দোলনটা কেবল মুসলমানকে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় প্রমাণিত করবার মতলবেই করা হয়েছে, একথা বল্‌লে একদিকে হিন্দুদের প্রতি যেমন অবিচার করা হবে, অন্যদিকে মুসলমান বদমায়েশদেরকেও তেমনি উৎসাহ দেওয়া হবে। বাংলার মুসলমান বদমায়েশের সংখ্যা হিন্দু বদমায়েশের চেয়ে বেশী, এ কথা ধরে নিলেও তার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। বাংলার পল্লীবাসী অধিকাংশ মুসলমান এবং তাদের মধ্যে অশিক্ষা শোচনীয় রকমে বেশী। কাজেই অন্যান্য অপরাধের ন্যায় নারীহরণ অপরাধটাও তাদের মধ্যে বেশী, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়ও নয়, এতে সাম্প্রদায়িকতাও কিছু নেই। তবু হিন্দুরা নারীহরণ ব্যাপারটার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে নারীরক্ষা আন্দোলনের মত পবিত্র আন্দোলনটা সাম্প্রয়াদিক নীতিতে পরিচালন করছেন; এটা আন্দোলন পরিচালকদের শুধু সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়--তাঁদের স্থূলবুদ্ধি ও অদূরদর্শিতারও পরিচায়ক বটে। কিন্তু এ আন্দোলনটা যে আজ সাম্প্রদায়িক রূপ পেয়েছে, তার কারণ সম্বন্ধে আমাদের একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ্‌বার মতো উদারতা থাকা উচিত। হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার দোষ দিয়ে শ্রদ্ধেয় লেখক গুণ্ডাদের অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা গৃহস্থের অসাবধানতার দোষ দিয়ে চোরের অপরাধ ঢাকবার চেষ্টার মতই লজ্জাজনক।

হিন্দুরা আইন-অমান্য আন্দোলন ক'রে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছে, এটা হ'ল হিন্দুদের বিরুদ্ধে বন্ধুবরের অন্যতম গুরুতর অভিযোগ। যে'কংগ্রেসের চেষ্টায় এই আন্দোলন চলেছিল,- তার সদস্য-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলমান। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সংখ্যাও কম নয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের দরুণ জেল-খাটিয়ে আশী হাজার লোকের মধ্যে বার হাজারের উপর মুসলমান। তার মধ্যে এমন বহু গণ্যমান্য লোক আছেন যাদের শিক্ষা-দীক্ষা, মান-মর্য্যাদা, অর্থ-বিত্ত অন্য কোনো মুসলমান নেতার চেয়ে কম নয়। এই আইন-অমান্য আন্দোলন ক'রে সীমান্তের বহু মুসলমান লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তবু এই আন্দোলনের দোষগুণের জন্য কেবল হিন্দুদের দায়ী করলে, কেবল হিন্দুদের প্রতি নয়, মুসলমানদের প্রতিও অবিচার করা হবে। বন্ধুবরের ন্যায় মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁদের চেয়ে ঢের বেশী-সংখ্যক হিন্দু নেতা এই আইন-অমান্য আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছেন। তবু কংগ্রেস তার এই নীতি পরিত্যাগ করছে না। তার জন্য কংগ্রেসই নিন্দাভাজন, হিন্দুসমাজ নয়। বন্ধুবর কি জানেন না যে, মুসলমানদের চাইতে ঢের বেশী সংখ্যক হিন্দু কংগ্রেস এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের পথে না গিয়ে সহযোগিতার জন্য বড় বড় ডালা পেতে বসে আছে?

সত্যাগ্রহের পিছনে যে দর্শন আছে, তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যেতে পারে। অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় যে জগৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সত্যাগ্রহ না হোক অন্য কিছু একটা যে অস্ত্রের স্থান দখল করতে আস্‌ছে, য়ুরোপের শান্তিবৈঠক, জাতি-সঙ্ঘ, নিরস্ত্রীকরণ সভা প্রভৃতি সব কিছুই কি সেদিকে অঙুলি নির্দ্দেশ করছে না?

শ্রদ্ধেয় লেখকের আব এক অভিযোগ হিন্দুরা গুপ্তঘাতকদের সমর্থন করছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে এমন একটানা অভিযোগ বন্ধুবর কিসের থেকে করলেন, আমরা ঠিক তা বুঝতে পারলাম না। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মডারেটদল সকলেই একবাক্যে ত্রাসবাদের নিন্দা করছে। যখনই কোনো সরকারী কর্ম্মচারীর উপর গুপ্ত ঘাতকের হানা পড়েছে তখনই মুসলমানদের বহু আগেই হিন্দুবা সভা করে তার তীব্র নিন্দা করেছে, তবু হিন্দুরা গুপ্তহত্যা সমর্থন করে, এমন সিদ্ধান্তে বন্ধুবর কেমন করে যে এলেন, তা বোঝা দুষ্কর। তবে বন্ধুবর বল্‌তে পারেন, হিন্দুরা অনেক গুপ্তহন্তাকে সম্মান করেছে--পূজা করেছে। এ যদি হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই দোষের এবং তার নিন্দা আমাদের কর্‌তেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানরা কি গুপ্তহন্তার

সম্মান করে নি ? স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী, রাজপালের গুপ্তঘাতক, ভোলানাথ সেনের হত্যাকারীর জানাজায় লক্ষ লক্ষ মুসলমান সমবেত হ'য়ে ঐ সমস্ত হত্যাকারীকে সম্মান ক'রে গুপ্তহত্যা সমর্থন করে' নি? কোনো মুসলমান কি তার প্রতিবাদ করেছে?

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর মতাবলম্বীরাই কেবল রাষ্ট্রনৈতিক গুপ্তঘাতকদের নিন্দা করবার অধিকারী। যাঁরা মহত্তর মানবতার আদর্শ নিয়ে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে লড়ছেন, তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত গুপ্তহত্যা ও অন্ধ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য সমষ্টিগত গুপ্তহত্যা দুটিই অত্যন্ত নিন্দনীয়। মানুষের মধ্যে যে পশু অলক্ষিতে শুয়ে আছে, সে পশু শত্রুর রক্ত দেখলে আনন্দে নেচে ওঠে—যদিও বাইরে আমার চোখ থেকে নিহত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনায় অজস্র অশ্রু বয়ে যেতে পাবে। এই পশুকে সংযত করে তাকে মানুষের মহত্ত্ব দান করা সে বড় কঠোর সাধনা। সেই সাধনাই বিশ্বের অনাগত ভবিষ্যতের সাধনা।

শেষের দিকে আমি এই বলতে চাই যে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, বন্ধুবর হিন্দুদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন, হিন্দুদের তরফ থেকে তার প্রত্যেকটীর যুক্তিপূর্ণ সদুত্তর দেবার আছে। হিন্দুরা শিক্ষায়, সম্পদে, কৃষ্টিতে, ধনে-জনে মুসলমানদের অনেক আগে। কাজেই তাদের কাছে আমরা অধিকতর উদারতা, জাতীয়তা ও অসাম্প্রদায়িকতা আশা করতে পারি। কিন্তু কেবল আশাই করতে পারি। তারা অধিকতর উদার না হলে, আমাদের চেয়ে বেশী মহানুভবতা না দেখালে তার জন্য তাদেরকে গাল দিয়ে লাভ কি হবে? হিন্দুদের অনেক দোষ আছে। অনেক ক্ষুদ্রতা নীচতা তাদেরকে দুর্ব্বল করে রেখেছে। রেখেছে বলেই ত আজ মুসলমানরা স্বরাজ সাধনার শর্ত্ত স্বরূপ হিন্দুদের নিকট নানাপ্রকার দাবী উত্থাপনের সুবিধে পাচ্ছে।

ত্রিশ কোটী লোকেব একটা দেশের স্বাধীনতা আনতে তেইশ কোটী লোকের ইচ্ছাই কি যথেষ্ট নয়? তবু কেন হিন্দরা স্বরাজ-সাধনায় মুসলমানদের যোগ দেওয়ার জন্য মুসলমানদের ঘুষ দিতে আসে? ঐ দুর্ব্বলতা ও দোষ-ত্রুটীর জন্য। হিন্দুর অনেক দোষ আছে। সে সব দোষ সারবার জন্য চেষ্টাও কম হচ্ছে না। কত হিন্দু নেতা নিজেদের দেশ ও জাতির দুর্দ্দশা দেখে উন্মাদ হয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথের ধূলোয় নেমে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিধারী কত শত যুবক নিজেদের জীবন যৌবন সিদ্ধি সাধনা স্বজাতির পদপ্রান্তে বিকিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র একটা সাধনার যুগ চলছে। হিন্দু সমাজের এই সাধনা সাম্প্রদায়িক, কি জাতীয় ফল প্রসব করবে, তা ভবিতব্যের গর্ভে নিহিত। কিন্তু হিন্দু তরুণ যে একটা স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছে, এবং সে স্বপ্নকে সফল করবার জন্য সে যে আজ অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, তার লক্ষণ ত আর অস্পষ্ট নেই। তার সাধনার পথ সত্য কি মিথ্যে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তার স্বপ্নটা ত সত্য? এ স্বপ্নকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারছে না!

ও স্বপ্নেও হয়তো ত্রুটী আছে--হয়তো সে স্বপ্ন পূর্ণাঙ্গ নয়। সে স্বপ্নকে পূর্ণাঙ্গ করবার দায়িত্ব মুসলমান তরুণের। কিন্তু মুস্‌লিম তরুণ তার সে স্বপ্ন-সাধনায় সহযোগিতা করছে না; মুস্‌লিম নেতারা তার সে সাধনার প্রতিবন্ধকতা করছে, শুধু প্রতিবন্ধকতা করছে না, প্রতিবন্ধকতা করে গৌরব বোধ করছে। নিজের দেশবাসী স্বদেশের-মুক্তি-সাধনায় সাহায্য করছে না, বিরুদ্ধদলকে সহায়তা করে তাতে গৌরব বোধ করছে, স্বদেশের মুক্তি-সাধনায়-উন্মাদ হিন্দু তরুণের চোখে এটা নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকছে। হিন্দু তরুণ স্বদেশের মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছে সে-স্বপ্ন তার কাছে এত বড় জাগ্রত সত্য যে, যে তার সে সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করছে, সেই তার শত্রু হয়ে পড়ছে। স্বদেশবাসী মুসলমান তার সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করছে, ফলে মুসলমানের প্রতি তার মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানের এই সহযোগিতা না পাওয়ার মধ্যে হিন্দুর দোষও নিতান্ত কম নয়। Self-criticism এর অভাবে সে নিজের দোষ দেখতে পাচ্ছে না। মুসলমান তার সাধনায় সহযোগিতা করছে না, এটাই তার চোখে বড় হয়ে ধরা দিয়েছে; কেন সহযোগিতা করছে না, এ প্রশ্ন তার মনে জাগে নি। জাগে নি এই জন্য যে তার নিজের উন্মাদনায় সে বুঝতেই পারছে না যে স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় বিরত থাকবার জন্য কোনো কারণই যথেষ্ট হতে পারে।

যত বিরোধ এইখানে এবং এ বিরোধের ফাঁক দিন দিন কেবল বেড়েই যাচ্ছে। বিরোধ কোনো চুক্তিতে মিটবে না। আদর্শের একত্বই এ বিরোধ মিটাতে পারে, আর কিছুতেই নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ জাতীয়তা হবে, কি সমাজতন্ত্র হবে-সে প্রশ্ন এখন উঠে না। জাতীয়তা বা সমাজতন্ত্র কোনোটাই আমাদের আদর্শ নয়। ও সবই সমষ্টি-সাধনার এক একটা

পুরাতনী

"হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর র'বে চিরদিন ধরিয়া।।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

(মোজাম্মেল হক্)

১

আমি অভ্যাগত নূতন বরষ
এসেছি তোদের দুয়ারে;
তাই কি হরষে ওগো নর-নারি!
হাসিছ নিরখি আমারে?
তাই দ্বারে দ্বারে আমোদে মাতিয়া
চুত-পল্লব দিয়াছ গাঁথিয়া,
কুসুমের হার, মরি কি বাহার!
দুলিছে কাতারে কাতারে।
এসেছি কি ব'লে নূতন বরষ
আমি গো তোদের দুয়ারে?

২

প্রভাতে উঠিয়া নাইয়া ধুইয়া
আ মরি পবিত্র আচারে,
সাজিয়া সকলে বসনে ভূষণে
ভেসেছে আনন্দ-পাথারে।
অনাথ দরিদ্রে কি চারু বিধান,
পরাণ খুলিয়া করিতেছ দান,
হিন্দু-মুসলমান নাহি ভেদ-জ্ঞান,
তুষিতেছ পান-আহারে!
আহা কি উল্লাস হেরি মর্ত্ত্যে আজ,
কহিব, দেখাব কাহারে!

৩

পাইলাম প্রীতি বড়ই হৃদয়ে
আজের আদর-আহ্বানে,
কি এক অমিয়া বিমল মধুর
ভরিয়া গিয়াছে পরাণে!
যে দিকে তাকাই কেবল আনন্দ,
ঢলিয়া মজিয়া বহিয়া মন্দ
বিলায় মারুত কুসুম-গন্ধ
আনমনে এক ধেয়ানে!
কি এক অমিয়া বিমল মধুর
ভরিয়া গেল রে পরাণে!!

৪

করি আশীর্ব্বাদ, যে ক'টী দিবস
থাকিব তোদের সকাশে,
এমনি বিমল আনন্দ-লহরী
খেলে যেন সব আবাসে।
যেন সদাচারে অতিথি সৎকার
থাক গো কবিতে সবে অনিবার,
ভ্রাতৃভাবে মজি' ধ্বজা একতার
তোলহ সুদূর আকাশে।
দ্বেষাদ্বেষী ঘৃণা মিথ্যা প্রবঞ্চনা
পলাইয়া যাক্ তরাশে।

(কোহিনূর-১৩১৩ সাল)

বাঙলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাত্র। এখন প্রয়োজন শুধু হিন্দু তরুণের মত মুসলমান তরুণের একটা আদর্শের স্বপ্ন দেখা—যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক না সে স্বপ্ন। সে স্বপ্নের সাধনায় বাঙ্‌লার মুস্‌লিম তরুণ তার হিন্দু বন্ধুর মতই সেদিন উন্মাদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসবে, সেদিন সাধনার চৌরাস্তার মোড়ে উভয় বন্ধুর কোলাকুলি হবে! সেদিন তারা দুই বন্ধুতে যে রাস্তা বেছে নেবে, সেইটে হবে 'বাঙ্‌লার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ'।*

—

*বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক ভাদ্র-অগ্রহায়ণ সংখ্যা বুলবুলে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় আবুল হোসেন সাহেবের প্রবন্ধের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গত সংখ্যাতেই বলেছি, আমরা আবুল হোসেন সাহেবের সঙ্গে একমত নই। বর্ত্তমান লেখকের কথাও ঠিক আমাদের কথা নয়। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত ভবিষ্যতে নিবেদন করব।—বুলবুলের সম্পাদক।

রাখালের প্রেমালাপ

মোজাম্মেল হক্

১

এস লো সুন্দরী! এস প্রেমের আবেশে
হেসে খেলে থাক মম সনে,
যে সুখ না মেলে কভু ভাণ্ডারে রাজার,
অবাধে ভুঞ্জিবে প্রতি ক্ষণে!

২

পর্ব্বত প্রান্তর বন রম্য উপত্যকা,
চিরন্তন সুখের আলয়,
ভ্রমিব উল্লাসে তথা ধরি গলে গলে,
সুখার্ণবে ভাসিবে হৃদয়।

৩

দূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে আহা বসিয়া দু'জনে
নিরখিব রাখালের খেলা,
ছাগ মেষ অনামনে আহারে মগন,
শাবকেরা করে সেথা মেলা।

৪

কুলু কুলু কুলু নাদে বহে নির্ঝরিণী,
আহা শ্রুতি-মন-বিমোহন,
যার স্বরে মিলাইয়া সুস্বর আপন,
গায় গান বিহঙ্গমগণ।

৫

তুলি নানা বনফুল ভরা সুবাসেতে
বিরচিব বিছানা তোমার,
শয়ন করিবে সুখে, যেন রাজরাণী
স্বর্ণ-খাটে পাশেতে রাজার।

৬

ফুলেতে সাজাব অঙ্গ, ফুল-আভরণ
শোভা দিবে বিতরি' সুঘ্রাণ,
মোহান্ধ মধুপ কত গুন্ গুন্ স্বরে
গাবে তব আশে পাশে গান!

৭

উপাদেয় সুরসাল ফল নানা জাতি
নিতি নিতি আনিব তুলিয়া
শীতল তরুর ছায়ে যেন বনরাণী
সুখে তুমি খাইবে বসিয়া।

৮

অবগাহি নিঝরের রজত-প্রবাহে
অঙ্গরাগ উঠিবে উথলি,
পিয়াসে বিমল বারি পিইয়া তাহার
মনঃপ্রাণ যাইবে শীতলি।'

৯

দু'নয়ন মম রবে প্রহরী তোমার,
হস্ত হবে সেবায় নিরত,
পশু-চারণের ক্লেশ যাইবে ঘুচিয়া
ও-বদন নেহারি' সতত।

১০

তোমার প্রীতির লাগি প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা
পাখীরা হরষে গাবে গান,
ময়ূরী ময়ূরী সহ নাচিবে রঙ্গেতে
বিমোহিত করিয়া পরাণ।

১১

এ ভোগ-বিলাস যদি চাহ লো ভুঞ্জিতে
তৃষা যদি থাকে হৃদয়ের,
এস গো আমার সনে এস বিধুমুখি!
বিলম্ব সহে না পলকের।

(লহরী-১৩০৭ সাল)

উৎকণ্ঠা

মোজাম্মেল হক্

১

অনেক দিন তো গত হ'ল
অনেক নিশি হ'ল ভোর,
ভেবে ভেবে হ'লাম সারা,
পাইনে তবু খবর তোর!

২

রোজ প্রভাতে আকুল প্রাণে
পিপাসার্ত্ত চাতক-প্রায়,
চেয়ে থাকি চিঠির তরে,
কিন্তু নিরাশ হতাশ হায়।

৩

ব'লেছিলে, 'ভুলব না নাথ,
প্রাণ রহিল তোমার ঠাঁই,
শূন্য দেহ ল'য়ে শুধু
অনেক দূরে যাচ্ছি ভাই।

৪

অনিচ্ছাতে যাচ্ছে ল'য়ে
বাদ সাধিয়ে সাধে মোর,
বুঝল না কেউ দুঃখ আমার,
হায় কি কলির বিচার ঘোর।

ইচ্ছা করে শিক্‌লী কেটে
তোমার কাছে উড়ে যাই,
স্বাধীনা চকোরীর মত
তোমার প্রেমের সুধা খাই।"

৬

মর্ম্মছোঁয়া তোর সে কথা,
তোর সে মধুর করুণ ছবি,
মর্ম্মে মর্ম্মে আছে গাঁথা
ভুল্‌বে না এ জন্মে কবি।

৭

কিন্তু ধনি! নীরব কেন?
রাখলে কই সে অঙ্গীকার?
দু'খান লিখেই হস্ত শিথিল!
পত্র লেখা এতই ভার?

৮

আমি যে তোর প্রাণের বোঝা—
প্রেমের বোঝা বুকে ল'য়ে
আর যে জ্বালা সইতে নারি,
বেড়াই হেথা উদাস হ'য়ে।

৯

শেল বিঁধেছে হিয়ার মাঝে,
গুম্‌রে মরি মনে মনে,
লোক-লজ্জা ভয়ে কেবল
অশ্রু ঢালি সংগোপনে।

১০

কি জানি গো মনের মাঝে,
সদাই আমাব সন্দ হয,
(বুঝি) অন্তরালে সুখে থেকে
ভুল্‌লে এ প্রেম বিষাদময়।

১১

ভুলেছ কি? হায় রে কপাল,
হায় বিধাতা কি করিলে,
এমন কোমল নারীর হৃদয়
ভাগ্য-গুণে কঠিন শিলে!!

১২

জানে নাক ছল-চাতুরী
বঙ্গ-বামা সরল মনে,
কিন্তু কি রীত—তাব বিপরীত,
এ কি খেলা চন্দ্রাননে?

১৩

আমার প্রাণের ব্যাকুলতা,
হতাশ হৃদয়ের গরম শ্বাস,
দেখেছ ত? তাও কি স্মরে'
হ'চ্ছে না তোর মন উদাস!

১৪

কোথায় তুমি প্রাণেশ্বরি!
কোথায় গেছ কোন্‌ কাননে?
মধুর হাসে ত্বরিত এসে
তোষ প্রেমের সম্ভাষণে।

১৫

তেম্‌নি মধুর চুম্বনেতে
শীতল কর তাপিত প্রাণ,
প্রেম-সরসে হর্ষে ভেসে
করি দুখের অবসান।

(প্রেমহার-১৩১৩সাল)

স্বভাব

মোজাম্মেল হক্‌

১

গোলাব-কুঁড়ি পাপড়ী খুলি'
ছত্‌রে দেখায় রূপরাশি,
উদার হিয়ায় সুবাস বিলায়
সবায় সমান সম্ভাষি।

২

মাকাল ফলটা হিঙুল বরণ
দেখ্‌তে বড়ই চমৎকার,
অন্তরে তার পূরীষ পোরা
বদ্‌-বু সহে সাধ্য কার।

৩

সরল সুজন জীবন যাপন
করেন সবার হিত সাধি,
দুর্ম্মতি জন স্বার্থ-বশে
ন্যায় কাজে হয় ঘোর বাদী।

৪

আপন জনের সুষ্ঠু কাজে
বাদ সাধে সে প্রাণপণে;
শিষ্ট জনে যার যে স্বভাব
বুঝে হাসেন আন্‌মনে।

(মোসলেম ভারত-১৩২৭)

ওবেদি-বিয়োগ

আবুল ফজল, বি-এ, বি-টি

তখনো দিনের সূর্য্য ওঠেনি, তুমি জাগি' সব আগে
গেয়েছিলে গান, রাঙালে উষারে তব রাঙা অনুরাগে।
উঠিল সূর্য্য, তুমি উড়ে গেলে প্রভাতের বুলবুলি
স্মরিছে তোমায় পথ-যাত্রীরা—যায়নি তাহারা ভুলি'।
— নজরুল ইসলাম।

'ওবেদি-বিয়োগ' চট্টগ্রামের মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ সাহেব কর্ত্তৃক অর্দ্ধ শতাব্দী-পূর্ব্বে রচিত একখানি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি স্যার হাসান সুহ্‌রাওয়ার্দির পিতা ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মরহুম মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ আল্‌ওবেদি সাহেবের* মৃত্যুতে ভক্ত-হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস।

ব্যক্তিগত কবিতা বা লেখা, শুনা যায়, অনেকের ভাল লাগে না। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পদই ব্যক্তিগত। বিষয় লইয়া সাহিত্যের বিচার নয়—বিষয়ের প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের মূল্য-নির্দ্ধারণ। আর ব্যক্তিগত বিষয়ে কবি নিজেকে বা নিজের প্রতিভাকে যে-রকম revealed করিতে পারেন—অন্য কোথাও সে রকম পারেন বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত বিষয়ে আমরা কবিকে স্ব-স্বরূপে পাই— অন্য বিষয়ে অনেক সময় মুখোস-পরা হইয়া থাকেন তিনি। ব্যক্তিগত বিষয়ে মিথ্যা দিয়া কিছু ঢাকিতে হয় না—কবির ভিতরকার সত্যকার feeling-ই তখন প্রকাশ পায়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ছন্দের বন্ধনে রবীন্দ্রনাথের সে শোকোচ্ছ্বাস, তাহা অনাবিল, অতুলনীয়; এর প্রধান কারণ, এই feeling রবীন্দ্রনাথকে create করিতে হয় নাই—এইগুলি সত্যকার রবীন্দ্রনাথ। গোরার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এত অনাবিল ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগতের অজুহাতে শেলীর Adonais, টেনিসনের In Memorium ও নজরুল ইস্‌লামের 'ইন্দ্রপতন' ভাল লাগে না বলিলে রসবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না।

খান বাহাদুর আবদুল আজিজের বাহিরের মূর্ত্তিকে জানিবার অসংখ্য নিদর্শন আছে– তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের এডুকেশন সোসাইটী (১৮৯৯), ত্রিতল ভিক্টোরিয়া ইস্‌লাম হোস্টেল (১৯০১), লী ইস্‌লামিয়া রিডিং রুম, কবীরুদ্দীন লাইব্রেরী, নোয়াখালী মুস্‌লিম ইন্‌ষ্টিটিউট, আহ্‌মদিয়া মাদ্রাসা, শিলং মুস্‌লিম ইউনিয়ন (১৯০৫), ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮২), ঢাকা ও চট্টগ্রামের এডুকেশন ফাণ্ড, ফেনী কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা সংস্কার স্কিম, তাঁহার বংশধর, বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্যবর্গ— সর্ব্বোপরি শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার জন্য আজীবনের সাধনা—এই সব দেখিয়া আমরা বাহিরের আবদুল আজীজকে এক নিমেষে ধরিতে পারি। কিন্তু ভিতরের আবদুল আজীজকে, তাঁহার সুকুমার অনুভূতির সঙ্গে যে আবদুল আজীজ মিশিয়া আছে, তাঁহাকে চিনিবার এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক ছাড়া অন্য কিছুই নাই। শান্তিনিকেতন হইতে গীতাঞ্জলী-বলাকা-নৈবেদ্যের রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়। মরহুম আজীজ সাহেবেরও ভিতরের দিক হয়ত তাঁহার স্কুল কলেজ, হোস্টেল, শিক্ষা-সমিতির চাইতেও অনেক বড় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা প্রকাশের পথে এক অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি শৈশব হইতে সাহিত্য-সাধনা করিতেন—গদ্য এবং পদ্যে তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনা যায়—অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি আপনার বিশিষ্ট স্থানটুকু অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ছিলেন অন্য

*মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কেবল আরবী, ফারসী, উর্দ্দুতেই যে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন তা নয়, ইংরেজীতেও ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। তিনিই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের ফারসী গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল মুহওয়াহ্‌হিদীন'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই সময়ে 'ওবেদি-বিয়োগের' কবি আবদুল আজীজ সাহেব ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মতাবলম্বী : 'যে -- জন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে।' পাছে সাহিত্য সাধনা করিতে যাইয়া তাঁহার পুত্রও আর্থিক সঙ্কটে পড়ে -এই আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; 'যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে'--তার সাক্ষাৎ নিদর্শন মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবন তাঁহার সম্মুখেই ছিল; কাজেই তিনি পুত্রকে সাহিত্য-সাধনা হইতে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। নিষেধে যখন ফল হইল না, তখন তিনি একদিন পুত্রকে এই জন্য খুব করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। অভিমানী পুত্র ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না- তিনি নিজের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি যেখানে যাহা পাইলেন সংগ্রহ করিয়া বঙ্গোপসাগরের অতল জলধিতলে নিক্ষেপ করিয়া তবে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই হইতে তিনি আর কখনো সাহিত্য রচনা করেন নাই।

'ওবেদি বিয়োগ' পুস্তকখানি তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী তাঁহার অগোচরে যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করিয়াছিলেন। আজীজ সাহেবের মৃত্যুর পরেই পুস্তকখানি অন্যান্য আত্মীয়দের সম্মুখে বাহির হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকখানিতে যে সুন্দর মার্জ্জিত ভাষা, বেগবান ছন্দ ও ভাব আছে সেকালের মুসলমান রচিত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ইতিহাসের দিক হইতেও এই পুস্তকখানির মূল্য অত্যন্ত বেশী;* সেই পুঁথি সাহিত্যের দোভাষী ভাষা প্রপীড়িত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন সুন্দর, সাধু, মার্জ্জিত বাংলা লেখা মুসলমান লেখকের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর। বলিতে পারা যায়, এই কবিতাগুলি সেকালের যে কোন শ্রেষ্ঠ হিন্দু লেখকের লেখার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। বাংলার মুসলমান সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস-লেখক এই পুস্তকখানিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।

এই ছত্র কয়েকের ছন্দ-বন্ধনের মধ্যে আমরা মরহুম খান বাহাদুরের অন্তর-পুরুষের সাক্ষাৎ পাই--বাহিরের আবদুল আজীজের যে বিরাট চরিত্র, যে অসাধারণ কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখিতেছি, এই ছত্র কয়টির মধ্যে তাহার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ভক্তি, ভালবাসা, বন্ধুপ্রীতি, সমাজ ও দেশ-প্রেমের সুস্পষ্ট ছাপ এই পুস্তকখানির প্রত্যেক লাইনে পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগত বিষয়ে মানুষ স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পায়--বিশেষতঃ শোক ও আনন্দের সময়। মানুষ ভাণ করিয়া অনেক কিছু করিতে পারে, কিন্তু হাসিতে ও কাঁদিতে পারে না—ভাণ করিয়া কাঁদা ও হাসা মানে নিজেকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করা।

খান বাহাদুর আবদুল আজীজ নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত সুকুমার অনুভূতি এখানে-- এই 'ওবেদি-বিয়োগে', আপন মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। স্থানে স্থানে এমন সব লাইন ও উপমা আছে যাহার তুলনা হয় না। এই গুলি পড়িলে মনে হয়, ভিতরে ভিতরে খান বাহাদুর পূর্ণ মাত্রায় কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-জীবনে অপ্রত্যাশিত বাধা না আসিলে তিনি হয়ত বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার রচিত 'কবিতা-কলিকা' ও 'মুসলমানের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ' নামক আরও দুইখানি বইর নাম পাওয়া গিয়াছে-কিন্তু এখনো এই বই দুইখানির কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

'ওবেদি-বিয়োগে'র সঙ্গে কবির রচিত গদ্য লেখা ভূমিকা আছে—তাহাতে খুব সুন্দর সাধু ভাষায় মরহুম ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের পরিচয় আছে। আজীজ সাহেবের মার্জ্জিত ও শক্তিমান ভাষায় গদ্য ও পদ্যরচনা দেখিলে আফসোস হয়—তাঁহার বাণী অকালে সিন্ধুগর্ভে নির্ব্বাসিত না হইলে হয়ত আজ সাহিত্যের কোন অংশ আমরা ভরাট দেখিতে পাইতাম। শুনিতে পাওয়া যায়, শেষ বয়সে তিনি আবার বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র শেষ করিয়া তিনি অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা পর্য্যন্ত পড়া শুরু করিয়াছিলেন। হয়ত বা আবার তাঁহার সাগর-পারে-নির্ব্বাসিতা বাণী অন্তর-লক্ষ্মীর করুণ আহ্বান তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধান! সেই সময় পরপারের শেষ পরোয়ানা আসিয়া হাজির হইল--হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা ফরিয়াদ করিয়া উঠিল : 'বন্ধু, বড় অবেলায়'।

পিতৃশাসনে তাঁহার হৃদয়ের নির্য্যাতিত বাণী--অন্তরের বেদনা-লক্ষ্মী, হৃদয়ের পাষাণতলে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শুধু গুম্‌রিয়া গুম্‌রিয়া কাঁদিয়াছে। নিরুদ্ধ বাণীর অশ্রুজলে যে নির্ঝরের সৃষ্টি হইয়াছিল আজ তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে তাহার 'স্বপ্নভঙ্গ' হইলে সুখের বিষয় হইবে।

*ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে মরহুম আবদুল আজীজই সম্ভবতঃ সকলের আগে বাঙ্গলা-সাহিত্য-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

মোজাম্মেল হকের সাহিত্য-সাধনা

আবদুল কাদির

রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও মোজাম্মেল হকের 'কুসুমাঞ্জলি' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। গাঁথা, পুঁথি ও মারফতী সাহিত্য পল্লীর মুসলমান-সমাজে প্রচুর রস পরিবেশন করিলেও ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমানের মার্জ্জিত রসবোধ তাহাতে তৃপ্ত থাকে নাই, সে-সম্প্রদায় 'কুসুমাঞ্জলি'তে পাইল তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাষার অকুণ্ঠ প্রকাশ। এই কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা -প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' বলিয়াছিলেন : "আমাদের জানাও ছিল, শুনাও ছিল, মুসলমানেরা ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারেন না। কুসুমাঞ্জলি আমাদের সে সংস্কার দূর করিয়া দিয়াছে। ...পাঠক দেখুন, মোজাম্মেল হক কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।" —শুধু 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'ই নয়, যে কবিত্বচ্ছটা ও সৌন্দর্য্যানুভূতি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা সেকালের বাংলা-কাব্যে বেশী নাই। 'বঙ্গবিধবা'র ছবিটী কি অপরূপ করিয়াই তিনি আঁকিয়াছেন!

"রূপের আধার ধনী ত্রিভুবন-শোভা!
আহা কি মাধুরী মরি, যিনি স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
নবীনা যুবতী রামা ষোড়শী রূপসী,
ভূতলে লুটায় যেন শরদের শশী।"

তাঁহার 'অপূর্ব্বদর্শন কাব্যে'র ছন্দ-চাতুর্য্য ও লিপিভঙ্গী অনেকটা নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'র অনুরূপ। -বাঙ্গলার সুবাদার বাখরা খাঁ দৈবচক্রে আপন-পুত্র দিল্লীশ্বর কায়কোবাদকে কুর্ণিশ করিয়াছিলেন, এই ইতিকথা অবলম্বন করিয়া উক্ত এপিক-কাব্য বিরচিত :

"অলক্ষ্যে করিয়া দৃষ্টি উচ্চ সিংহাসন
সাষ্টাঙ্গে আপন পুত্রে
নমিল সাক্ষাৎ সূত্রে,
যুগান্তর ধরাক্ষেত্রে আজি সংঘটন,
হায় রে ঘটিল আজ অপূর্ব্ব দর্শন!" ...

তিনি 'ফেরদৌসী-চরিতে' লিখিয়াছেন যে, 'ফেরদৌসী অগ্নি-উপাসকদিগের প্রশংসা-সূচক অনেকগুলি কবিতা শাহ্‌নামায় লিখিয়াছিলেন," এবং সেজন্য সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সত্য-মতের অনুসরণ করুন।" পৌরাণিক পরিকল্পনা ও অতিপ্রাকৃতিক পটভূমির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মনীতিক ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী লইয়া কাব্য-রচনা ফেরদৌসীর ভাগ্যে হয় নাই, যদি হইত তবে তাঁহার 'শাহ্‌নামা' মহাকাব্য-হিসাবে সার্থক সৃষ্টি হইত কি-না কে জানে! ফেনেলঁর মহাগদ্যকাব্য 'টেলিমেক্‌স' যদিও উদ্দেশ্যমূলক—খৃষ্টানোচিত নৈতিকতা বদান্যতা ও শ্রদ্ধেয়তা শিক্ষাদানই উদ্দেশ্য, তবু সে কাব্যেরও বিষয়-বস্তু পৌরাণিক—দৈবশক্তি, শিভ্যাল্‌রী, পেগ্যান্ মিষ্টিসিজ্‌ম ও রোমান্টিসিজ্‌ম্ এ-সবই রহিয়াছে তাহার ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণে। কিন্তু মধ্যযুগীয় ধর্ম্মাদর্শের তাড়নায় মোজাম্মেল হকের জীবনে ক্লাসিসিজ্‌মের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচলিত থাকে নাই। সেজন্য একালের অন্যান্য মুসলমান কবিদের মতো তাঁহারও এপিক্ রচনার প্রয়াস সার্থক হয় নাই। তবু 'অপূর্ব্ব' দর্শন কাব্যে'র পরিকল্পনা, লিপি-কুশলতা ও রূপসৃষ্টি মোটের উপর প্রশংসনীয়। অলঙ্কার ও উপমার বাহুল্য সত্ত্বেও তাঁহার সৌন্দর্য্য-বর্ণনা কেমন অনাড়ষ্ট!

"বাজিছে বিধি বাদ্য—বীণা মনোহরা,
বিমোহিত করি চিত বাজে সপ্তস্বরা।

শরদিন্দু-নিভাননা তনু হেমময়
বিলাসিনীবৃন্দ আহা গলা মিলাইয়া,
বাদ্যের স্বনন সহ গীত মধুময়
গাহিতেছে সমস্বরে চিত্ত বিনোদিয়া।"

ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গেই শুধু নয়, কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্টন, স্কট, ওয়ার্ডস্বার্থ, কীট্‌স প্রভৃতির সাহিত্য-সাধনার সঙ্গেও মোজাম্মেল হকের পরিচয় যে কত নিবিড়, সে-পরিচয় আছে তাঁহার 'প্রেমহার' গীতিকাব্যে। ইহার কোন কোন কবিতায় Lyricism-এর ছাপ চমৎকার সুস্পষ্ট। যৌবনের আবেগ ও দুর্নিবার গতির স্থানে এখানে দেখা দিয়াছে তীক্ষ্ণ স্বানুভূতি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বর্ণের গাঢ়তা ও রসের প্রাচুর্য্য শরতের খণ্ড-মেঘের মতো কেমন হাল্‌কা ও অনাড়ম্বর হইয়া উঠিয়াছে! ভাবের সূক্ষ্মতা ও ভাষার চটুলতা এখানে লক্ষ্যযোগ্য :

"কিন্তু ধনি! নীরব কেন?
রাখলে কই সে অঙ্গীকার?
দু'খান লিখেই হস্ত শিথিল!
পত্র লেখা এতই ভার?"

১৩০৭ সালে তিনি কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা "লহরী" প্রকাশ করেন; বাংলাদেশে এধরনের মাসিকপত্র আর হইয়াছে কিনা জানি না। 'লহরী'র সময় হইতে তাঁহার কাব্যজীবনে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা যায়--কাব্যের নিত্যকালের আদর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে বিশেষ যুগের বাণী। খৃষ্টানীতে যে পরম বিশ্বাসের ফলে সক্রেটিস্ প্লেটো ডেমোক্রিটাস্ হেরাক্লিটাস্ এনাক্সোরাস্, ইউক্লিড টলেমী আবুসিনা ইব্‌নে রোশ্‌দ প্রভৃতিকে নরকে প্রেরণ করিতে দান্তে দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইস্‌লামে তেমন নির্ভরতা মোজাম্মেল হকের ছিল না।

পক্ষান্তরে : 'Suppliant to thee he kneels, imploring grace
For virtue yet more high, to lift his ken
Towards the bliss Supreme ... .'*

দান্তের এই পরম প্রার্থনা, beatific vision বুঝিবার মতো মানসিকতাও তাঁহার ছিল না। লৌকিক ইস্‌লাম ও প্রচলিত নবী-কাহিনীই তিনি তাঁহার "হজরত মহাম্মদ" কাব্যে অনায়াস ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন* কিন্তু তাহারও মাঝে মাঝে কবিত্বের ঝলক বেশ দেখা যায়। 'হজরতের বিবাহ'- বৈঠকের বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ :

"সুচারু চামর কেহ হেলায়ে যতনে
সুধীরে বীজন করে, কোন জন রঙ্গভরে
ভরিয়া সোনার পাত্র সুরভি সিঞ্চনে'।
মোহন মৃদঙ্গ বাজে, চিত্ত-বিনোদন সাজে
নাচে নর্ত্তকীর দল ভঙ্গিমার সনে।
সহ তাল-মান-লয়, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
উৎসবের একশেষ, বর্ণিব কেমনে?"

স্বদেশের কৃষ্টি ঐতিহ্যের জন্য বীর মোশার্‌রফ হোসেনের ও পরবর্ত্তীকালে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের রচিত

---

* Paradiso, Canto XXXIII Cary-র অনুবাদ।

* স্বসমাজের জনসাধারণের প্রতি অত্যধিক মমতার বশেই বোধ হয় তিনি 'হজরত মহাম্মদ' রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেজনাই তাহাতে 'মহর্ষি মনসুরে'র মতো ভাবাতিশয্য ও তীব্রানুভূতির প্রকাশ নাই। এ কাব্য রচনায় তাঁহার কবি-মন যে আনন্দ পায় নাই, তার প্রমাণ, তার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল- তাহাতে হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যান্ত বর্ণনা আছে। কাজী নজরুল ইসলামের পরিকল্পিত "মরু-ভাস্কর" মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু একই, অতএব তাহা প্রকাশিত হইলেও-সে অভাব দূর হইতে পারিত :

সাহিত্যে যে মমত্ববোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিপক্ষে 'সমাজ ও সংস্কারক' 'অগ্নিকুক্কুট' প্রভৃতি প্রণেতা পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন প্রচারিত প্যান-ইসলামবাদের আদর্শ প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ''উঠ জাগো, হায় মুসলিম, হায় ইসলাম্'',এই কান্না মুসলমানদের অতীত গৌরব ও কীর্ত্তিকথা ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এমনভাবে ফুটিয়া উঠে যে তাহাতে রসসৃষ্টি অপেক্ষা প্রোপাগাণ্ডাই হয় অধিক। মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা'-র :

''ধন মান যশঃ অমিত সাহস
যাঁদের সমান ছিল না ভবে,
তাঁদেরি সন্তান হইয়া তোমরা
কলঙ্কের ডালা শিরসে ব'বে।''

অথবা 'ইস্‌লাম সঙ্গীতের' :

''এক দেশে বাস হিন্দু-মুসলমান,
শিরে বহে এক রাজার বিধান,
হিন্দুরা উন্নত, তোরা অবনত
কেন হ'লি, তাহা ভাব কি কখন?'

এ-সমস্ত উক্তির মূলে রসসৃষ্টি অপেক্ষা লোকপ্রিয়তার মোহই বেশী ক্রিয়া করিয়াছে কিনা বিচার্য্য। জনসাধারণ মুসলমানের ফরমাশ্ ও তারিফই হয়ত ছিল তখন তাঁহার লক্ষ্য, কাব্যের যে অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে 'to familiarise the highly refined imagination of the more select classes of poetical readers with beautiful idealisms of moral excellence' তাহাকে ধর্ম্মবাদীদের ভয়ে তিনি অবশেষে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেজন্য দুঃখ আমাদের অপরিমেয়, কিন্তু এই ভাবিয়া সে-দুঃখ আমাদের লাঘব হইতে পারে যে, এককালের অস্বস্তি উত্তেজনা ও প্রোপ্যাগাণ্ডার বুকেই জন্মলাভ করে পরবর্ত্তীকালের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য।

মওলানা মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ মুস্‌লিম জাগরণের পথনির্দ্দেশ যেভাবে করিয়াছিলেন তাহাতে মুসলমানের মনে অসহিষ্ণুতা ও অভিমানই জাগিয়াছিল বেশী। মীর মোশাররফ হোসেনের সমকালবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয় মোজাম্মেল হকের সাহিত্যে, সত্যদৃষ্টি ও প্রেমপরায়ণতা আশানুরূপ না থাকিলেও, ছিল শান্তিপ্রিয়তা ও কল্যাণমুখিতা—বিদ্বেষসাধনা কোনোদিনই নয়। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, 'মহর্ষি মনসুরের' অলৌকিক জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া মানব-চিত্তের পরমাশ্চর্য্য বিকাশে বহু ব্যাপার ও ভাবধারার প্রভাব তিনি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে, ধর্ম্মবিধি ও সমাজব্যবস্থার নির্দ্দিষ্ট কাঠামোতে জীবনকে গড়িয়া তোলার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়, কোনো মত-সংকীর্ণতা ও ধর্ম্ম-সংস্কারেরই অন্ধ-সমর্থক তিনি হইতে পারেন নাই।* কোনো 'অমৃতায়মান তত্ত্বজ্ঞান'কে, একটী আইডিয়াকে মনসুরের অপ্রমত্তভাবে বহন করিবার যে অসামর্থ্য সেজন্য তিনি ইঙ্গিতে কম কটূক্তি করেন নাই; কিন্তু আসলে মনসুরের যে ধর্ম্মোন্মত্ততা, উপলব্ধ সত্যের জন্য যে অবিচলিত আত্মত্যাগ, সে সবের জন্যই পরম শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে তিনি তাঁহাকে এক সূক্ষ্মদর্শী মহামানব-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অতি-প্রাকৃতিক ঘটনায় ও পীরভক্তিতে তাঁহার যে বিশ্বাস, তাহার মূলে হয়ত পৌরাণিকভাব প্রতি অনুরাগই বেশী ক্রিয়া করিয়াছে। আর তাঁহার সেই পৌরাণিকীয় মোহ যে মহাকবি-জনোচিত', ইহা তাঁহার ''শাহ্‌নামা'' পাঠে বুঝা যায়। বহু প্রতিকূলতায় প্রতিহত হইয়াও ক্লাসিক্যাল ও মিথোলজিক্যাল সাহিত্যের প্রতি দরদ তাঁহার যথেষ্ট ছিল, এবং সেজন্যই জ্ঞানবিমুখতা ও গোঁড়ামী তাঁহার জীবনে দেখা দেয়

* মোজাম্মেল হকের ধর্ম্মভাব, জীবনাদর্শ, ব্যক্তিগত মত-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অগ্নিগর্ভ সহানুভূতি 'মহর্ষি মনসুর' গ্রন্থে রূপলাভ করিয়া আছে। অথচ ইহাকেই আক্রমণ করিয়া সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন শিরাজী লেখেন যে, তাহাতে ইস্‌লাম-বিরোধী আদর্শেরই জয়গান করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালী মুসলমানের কাব্যরচনার আদর্শ কিরূপ হইবে এবং তাহাতে ইসলামের শিক্ষা কিভাবে রূপ লাভ করিবে, তাহার নমুনা স্বরূপ মরহুম শিরাজী সাহেব 'মহাশিক্ষা' কাব্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যহিসাবে তাহা যে অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। শেলী তাঁহার Prometheus Unbound এর ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—Didactic poetry is my abhorrence; nothing can be equally well expressed in prose that is not tedious and supererogatory in verse.

নাই। জামশেদ-জাবলনন্দিনী, জাল-রুদাবা ও রুস্তম-তহমিনার প্রেম-কাহিনী, কেয়ুমোর্য মনুচেহর শাম আফরাসিয়াব ও সোহ্‌রাবের যুদ্ধ-বিক্রম, জাবলস্তান মাজেন্দারাণ ও চেহেলেমিনারের সৌন্দর্য্য-বর্ণনা যে সাবলীল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার তুলনা এক "বিষাদ-সিন্ধু" ভিন্ন মুসলমান রচিত বাংলা-সাহিত্যে আর নাই।

প্রথম জীবনে মোজাম্মেল হক্‌ সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার ভাষা আত্মপ্রকাশের অনায়াস-ভঙ্গিমা এবং রচনারীতি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'টীপু সুলতানের" ভাষা অনাসক্ত ও গতিবেগরহিত হইলেও জড়তালেশহীন। উক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে রিসার্চ্চ-প্রবণতা না থাকিলেও সত্যকে আচ্ছন্ন করিবার দূরদৃষ্ট যে তাঁহার সামান্যও হয় নাই, সে প্রমাণ আছে। বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ্‌-ঘোষণা, অপরিণামদর্শিতা ও 'পররাজ্য আক্রমণ ব্যাধি'র ফলে, অসমসাহস ও অপূর্ব্ব রাষ্ট্রজ্ঞান সত্ত্বেও, টীপু সুলতানের সকল প্রয়াস যে ব্যর্থ হইয়া গেল, সেজন্য তাঁহার গভীর বেদনাবোধই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সত্য ও শ্রেয়ের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ সত্ত্বেও স্বসমাজের জন্য এমনিতর বেদনাবোধ মোজাম্মেল-সাহিত্যে লক্ষ্যযোগ্য। 'হাতেম তাই' 'তাপস কাহিনী' 'দরাফ খান গাজী' প্রভৃতি মানুষের বহির্জীবনের স্থূল ঘটনাদি-সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য সমাধা করেন নাই, 'জোহ্‌রা' নামক সামাজিক উপন্যাসে তিনি মুসলিম অন্তঃপুরের যে-ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মানুষের মনোজগতের অতল গহনে যেভাবে ডুব দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার এক নূতন বিকাশ দেখা দিয়াছে। বড় কথা এই যে, ১২৮৮ সালে 'কুসুমাঞ্জলি' ও ১২৯২ সালে 'অপূর্ব্ব দর্শন কাব্য' রচনা করিয়া একালের বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গীতিকবিতা ও মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবেই শুধু নহেন, স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ ও মর্য্যাদাবান সাহিত্য-পত্রিকা প্রচারেও তিনি মুসলমানদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁহার সম্পাদিত "মোসলেম ভারত"-এর মতো অভিজাত পত্রিকা আজ পর্যন্ত মুসলমান-সমাজের কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার লোকান্তরগমনে আজ এই একটী প্রশ্ন মনে জাগিতেছে যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইবে এই অকুণ্ঠ হৃদয় সাহিত্যসেবীর সৃষ্টি, না তাঁহার ব্যক্তিত্ব?

ভাই ভাই

আবুল ফজল

- কৌতুক নাট্য-

[সৈয়দ হামীদ আলী চেয়ারে বসে সমবেত সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন -সামনে টেবিলের উপর গুড়গুড়ি, কথার ফাঁকে ফাঁকে তাতে তিনি দম দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নীচে পাটিতে বসে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, তাদের মধ্যেও হুঁকা চল্‌ছে, তবে সেটা মাটির।]

সৈয়দ--ভাই সব, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন : ইন্নমাল্ মু'মেনুনা এখ্‌ওয়াতুন · অর্থাৎ সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, রোমের বাদশাহ্ থেকে পথের ফকির পর্য্যন্ত সব এক বরাবর। এটা আমার, ওটা তোমার বলে মুসলমানে মুসলমানে ফরক্ করা বিল্‌কুল হারাম।

১ম শ্রোতা--(আর্শ্চয্য হয়ে) বিলকুল্ হারাম!

সৈয়দ--ধ্যৎ ধ্যৎ, (মুখ বিকৃত করে) ইস্‌লামী শব্দগুলি-ই এখন পর্য্যন্ত তোমরা উচ্চারণ করতে শিখলে না। এই করে ইস্‌লামের উন্নতি হবে না ত কচু হবে (কচুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু হয়ে উঠল)। বল, আমার মুখে মুখেই বল--বিল্‌কুল হারাম--(হ'র উচ্চারণ একেবারে কণ্ঠনালীর তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল)।

১ম শ্রোতা--[সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে বলে উঠল] বিল্‌কুল হারাম।

সৈয়দ--(তিনবার মুখে মুখে বলানোর পর) এগুলো হচ্ছে ইস্‌লামী শব্দ, এগুলোর উচ্চারণ একেবারে হলক্ থেকে করতে হয়।

২য় শ্রোতা--বে-শক্।

সৈয়দ--আহ্‌হা, ফের ঐ--বল, বেশক্ (ক এর সঙ্গে কণ্ঠনালীর বেশ একটু ধ্বস্তাধ্বস্তিই হয়ে গেল)।

[সকলে সৈয়দের মুখে মুখে তিনবার 'বেশক' বেশ ইস্‌লামী ভাবে উচ্চারণ করলে]

সৈয়দ--মদিনার সে আন্‌সারদের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা কি করে তাঁদের মাল আসবাব মুহাজিরীন ভাইদের ভাগ করে দিয়েছিলেন।

১ম শ্রোতা--ওহো!

২য় শ্রোতা--কী ত্যাগ!

৩য় শ্রোতা--কী ভ্রাতৃভাব!

৪র্থ শ্রোতা--কী সাম্য-মৈত্রী!

৫ম শ্রোতা--কী ধর্ম্ম-প্রেম!

৬ষ্ঠ শ্রোতা--কী ঐক্য!

সকলে--(সমস্বরে) ওহো! (মাথা দুলিয়ে সকলের বাষ্প উদ্‌গীরণ)

সৈয়দ--আজ।। সেই বিশ্ববিজয়ী উদার, মহাপ্রাণ মুসলমানের বংশধর আমরা কোথায় পড়ে আছি,--অধঃপতনের কোন্ অতল গহ্বরে!

১ম শ্রোতা--আফসোস্!

২য় শ্রোতা--হাজার আফসোস্!

৩য় শ্রোতা--ছি, ছি!

৪র্থ শ্রোতা--শেইম, শেইম!

সৈয়দ--কি বল্লে! শেম, শেম, অ'বাবা, ওটার অর্থ কি! (চক্ষু বিস্ফারিত হইল)

১ম শ্রোতা -ও হুজুর, জুনিয়ার মাদ্রাসায় পড়েছে কি না, ওটা বোধ হয় আংরেজী শব্দ।

সৈয়দ- তৌবা, তৌবা--ইসলামী মজলিসে এক্কেবারে কুফরী শব্দ--এই বেটা তৌবা কর্--কানমলা খা। ওটার অর্থ কি হে!--(লোকটির কানমলা খাওয়া ও দুই গালে চড় খেয়ে তৌবা করা)

৪র্থ শ্রোতা--লজ্জা, হুজুর।

সৈয়দ ওঃ, শরম--,তবে শেম্ শেম্ করতে গেলি কেন, শরম, শরম, বল্‌তে পারলি না, বেটা, পাজি না-লায়েক উল্লু কাঁহাকা।

৪র্থ শ্রোতা- (লজ্জিত হয়ে) আর কখনো ভুল হবে না, হুজুর।

সৈয়দ--আজ ভাই-এ ভাই-এ আমাদের অমিল, ঝগড়া-ফসাদ, মারামারি, কাটাকাটি, মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। আজ আমরা ওর সঙ্গে খাচ্ছি না, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না--

১ম শ্রোতা--ছি, ছি।

২য় শ্রোতা--আমরা রাজ্য হারা-হব না ত কে হবে?

৩য় শ্রোতা--আমাদের অধঃপতন হবে না ত কার হবে?

৪র্থ শ্রোতা--শরম! শরম!

সৈয়দ--ইস্‌লামের উন্নতির জন্য আমাদের কি কিছু করা উচিত নয়?--আমরা কি চিরকাল লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব?

১ম শ্রোতা--(গায়ের র‍্যাপারখানি ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে) নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়।

সৈয়দ--আমাদের খাঁটী মুসলমান হতে হলে কোরানের হুকুম মান্‌তে হবে।

২য় শ্রোতা--(গলায় হাত দিয়ে) কোরানের হুকুম না মান্‌লে সে কিসের মুসলমান। (কোরানের 'কো' আর হুকুমের 'হু' এমন বোগ্‌দাদী কায়দায় উচ্চারণ করলে যে, ক'রেই সে হাঁফাতে লাগ্‌ল)।

৩য় শ্রোতা- আলবৎ ।

৪র্থ শ্রোতা -দেরী করা শয়তানের কাজ--আজ থেকেই আমরা কোরানের হুকুম পালন করে চলব।

৫ম শ্রোতা--এখন থেকেই মান্‌তে হবে।

সৈয়দ- তা'হলে, আজ থেকে আমরা পরস্পর ভাই ভাই, সকলে প্রতিজ্ঞা কর, ভাই সব,--আজ হতে আমরা সব ঝগড়া-ফসাদ, মামলা মোকদ্দমা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে গেলাম--

[উৎসাহে সকলে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল]

সৈয়দ ছি, ছি,--ভাই সব; হাততালি দেওয়া গুনাহ্ গুনাহ্--ওটা বেদীন্ কাফেরের তরিকা। বল সবে--মারহাবা, মারহাবা। (সকলে 'হ'-এর এমন আদর্শ উচ্চারণ করলে, যাকে খাস্ মিস্‌রী উচ্চারণ বলা যেতে পারে)।

সকলে--(সমস্বরে) আমরা শপথ করছি--আজ হতে আমরা সকলে ভাই ভাই।

সৈয়দ--(দুই হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়ে) চল, ভাই সব, আমাদের তরক্কীর জন্য খোদার দরগায় মুনাজাত করি--আমীন, এয়া রববুল আলমীন, এয়া আল্লা, তুমি মুসলমানকে দীন দুনিয়ার মালিক কর। কাফেরদের ধ্বংস কর, জাহান্নামে পাঠাও, জলে স্থলে শূন্যে আমাদের খেলাফৎ কায়েম কর, আমীন; এয়া আল্লা (চুপি চুপি) আমাকে (বড় করে) দুনিয়ার ধন দৌলত দাও, পরকালে বেহেস্ত নসীব কর, আমীন (সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলিও বল্‌ছে) আমীন। (অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে) হে আল্লা, আমাকে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডিং কর; (জোরে) আমীন (সকলে সমস্বরে) আমীন; (জোরে) এয়া আল্লা (আস্তে) আমার (জোরে) বিবিগণকে বালবাচ্চা দিও--আমীন, (সঙ্গে সঙ্গে সকলে) আমীন; (জোরে) হে আল্লা, (আস্তে) আমার (জোরে) জমিতে ধান বেশী করে দিও, আমীন (সঙ্গে সঙ্গে সকলে) আমীন। (খুব জোরে) হে আল্লা, (একেবারে আস্তে) রবিবারের লড়াইয়ে আমার মোষটিকে জিতিয়ে দিও, (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন (সমস্বরে) আমীন। হে আল্লা, (আস্তে আস্তে) এই লোকগুলিকে দিন দিন গরীব এবং আমাকে (জোরে) ধনী করিও, আমীন, (সমস্বরে) আমীন (জোরে) হে আল্লা, তোমার ত অজানা নেই (আস্তে আস্তে) কাল যে আমার ফৌজদারী মোকদ্দমার দিন, বৃষ্টি হলে কাচারী যেতে বুড়ো মানুষ বড় কষ্ট হবে, হে রহ্‌মানুররহীম কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টিটা একটু বন্ধ রেখো (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন, এয়ার রববুল আলমীন (সকলে সমস্বরে) আমীন, আমীন!

১ম শ্রোতা--(চট্ করে খালি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা হ'লে ভাই সা'ব, এই চেয়ারখানি আমিই নিলাম--আপনার ত অনেক আছে, আমার একখানাও না হলে লোকে আবার আমাকে আপনার ভাই বলে স্বীকার করতেই চাইবে না।

সৈয়দ--(ভেংচি দিয়ে) কি! পাঁচ টাকা খরচ করে নতুন চেয়ার বানালাম, বেটার আব্দার তো মন্দ নয় দেখছি। রাখ্।

১ম শ্রোতা--প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গবেন না ভাই, গোনাহ্ হবে, গোনাহ্ হবে--ওহো, মুসলমান ভাই ভাই। (চেয়ার নিয়ে প্রস্থান)

২য় শ্রোতা--(ইজি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা' হলে ভাই ইজি চেয়ারখানি আমি ই নেই, বুড়ো মানুষ এই বসে বসে একটু হুঁকা টান্‌তে সুবিধা হবে। আচ্ছা ভাই, হুঁকোর ইস্‌লামী উচ্চারণ কি রকম হবে--('হুঁ'-কে একেবারে গলার তলা থেকে উচ্চারণ করে) হুঁকা না হুক্কা?

সৈয়দ--বেরো, চোর বদমাস সব--(ভেংচিয়ে) আবার ইজি চেয়ারও চাই! এত সখ হলে কিনে নাও না কেন--বাজারে কি ইজিচেয়ারের দুর্ভিক্ষ লেগেছে।

৩য় শ্রোতা--আহা-হা, ভাই হয়ে ভাইকে গালাগাল দিচ্ছেন, ছি, ছি--ছি--ছি।

২য় শ্রোতা--আমরা ত ভাই কোরান-কেতাব বুঝি না--আপনিই ত এখন বুঝিয়ে দিলেন যে মুসলমান সব ভাই ভাই-ভাইয়ের মালের উপর ভাইয়ের পুরা হক্;--ওহো ইস্‌লাম কী উদার ধর্ম্ম। (ইজিচেয়ার নিয়ে প্রস্থান)

[সকলে উঠে যে যা পারল ঘরের মাল এক একটী দখল করে উঠিয়ে নিলে]

৪র্থ শ্রোতা--(হুঁকাটী উঠিয়ে নিয়ে) বেশ হুঁকাটী ভাই সা'ব, এইবার আনিয়েছেন বুঝি! (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বাঃ এই দেখছি আসল জৌনপুরী হুঁকা। আমার হুঁকাটীর তলায় ফুটো হয়ে গেছে, কয়দিন ধরে যে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি-ভাগ্যে খেয়ে এদিকে এসেছিলাম। (হুঁকাটী নিয়ে প্রস্থানে উদ্যত)

সৈয়দ--বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছে! (ঘরের কোণ থেকে একটী লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত)।

সকলে--মারবেন না, মারবেন না ভাই, মুসলমান মুসলমানকে মারতে নেই। (সমস্বরে) আমরা সব ভাই ভাই। (এই বলে সকলে সৈয়দকে ধরে রাখা, লোকটীর হুঁকা নিয়ে প্রস্থান)।

সৈয়দ--(রাগে দাঁত কড়কড় করতে করতে) বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছে। এক্ষুনি মেরে খুন করব।

৫ম শ্রোতা--ঠিক হল না ভাই, ঠিক হল না, আপসোস্ আপনিও শেষকালে ভুল করলেন হায় রে বাঙ্গালী মুসলমান, করে তোমার উচ্চারণ ঠিক হবে? বল্‌তে হবে পাঘল পাঘল, খুউন্, খুউন্, খুউন্ করব, (গলার ভিতর থেকে ঘ আর খ উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটার রীতিমত কসরত হয়ে গেল)।

৩য় শ্রোতা--দাদা, আমি শীতে কাঁপছি আর আপনি কাপড়ের উপর কাপড় চড়িয়েছেন--এ কেমন ভ্রাতৃত্ব। (বলে, আলোয়ানখানা সৈয়দের গা থেকে খুলে নিয়ে নিজে গায়ে দিলে। সৈয়দ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল)।

১ম শ্রোতা--(আবার ঢুকে) হায় হায়, ভাই সা'ব, একেবারে তিনটী জামার গরমে ভিজে যাচ্ছেন আর আমরা আছি কোন্ কর্ম্মে! (বল্‌তে বল্‌তে কোটটী খুলে নিলে--গায়ে দিতে দিতে বল্লে) মুসলমান ভাই ভাই, কি বল হে?

৫ম শ্রোতা--আলবৎ, ইস্‌লামে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট--সব এক বরাবর। (দলের মধ্যে একজন সবার চেয়ে লম্বা ছিল তাকে লক্ষ্য করে) কিহে, তুমি লম্বা হয়েছ কেন? পাপিষ্ঠ নরাধম, মুস্‌লিম-কুল-কলঙ্ক, ইস্‌লামে জন্মগ্রহণ করে মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও পার্থক্য সৃষ্টি করছ, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! বেটাকে কেটে সমান করে দাও না হে।

৬ষ্ঠ শ্রোতা--দোহাই বাবা, কাটতে হবে না, আমি নিজেই সমান হচ্ছি--(কুঁজো হয়ে সকলের সমান হয়ে নিয়ে) মুসলমান সব এক বরাবর!

(দলের মধ্যে একজন খুব মোটা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে)

৭ম--কি হে যূথভ্রষ্ট নরাধম, ইস্‌লামের সাম্য ও ঐক্যের শিক্ষাকে পদদলিত করে এমন মুটিয়ে গেছ কেন? লজ্জা করে না?

৮ম--এই পাষণ্ড ইস্‌লামের বিদ্রোহী, খারেজী, ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সমান করে দিতে হবে।

৭ম--ভাই সব, আমাদের শিরায় শিরায় যদি বিশ্ববিজয়ী পূর্ব্বপুরুষের রক্ত এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে, এর প্রতিকার আমাদের এই মুহূর্তেই করতে হবে।

সকলে--নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। (রোষ-রক্তিম নয়নে মোটাকে লক্ষ্য করে) এই বেটা;

মোটা--দোহাই বাবা, আমি সমান হচ্ছি (এই বলে হাত-পা গুটিয়ে, পেট খালি করে ছোট হবার চেষ্টা)।

৭ম--(নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে) এখনো হয় নি--নো, নো--

৮ম--(ভুঁড়িতে মুষ্টাঘাত করে) ভূঁড়ি বেরিয়ে রইল কেন, বেটা পাষণ্ড। (মোটা প্রাণপণে ছোট হবার চেষ্টা করতে লাগল)

৯ম--হবে না, হবে না, বেটা পাষণ্ডকে দুই দিকে ছেটে তবে সমান সমান করতে হবে।

সকলে - আলবৎ আলবৎ বেটা পাষণ্ড, ইস্‌লামের সাম্য ও একতা ধ্বংসকারীর নালাক দেহকে ছেঁটে ফেলে তবে লাক করতে হবে।

৭ম--এই, করাত লও। (বল্‌তে না বল্‌তেই করাত নিয়ে হাজির--৭ম-এর আদেশ মত মোটার কাঁধের উপর করাত রেখে দুই জন দুই দিকে ধরে টান দিতেই)

মোটা--ওরে বাবা, গেলাম, গেলাম--মুসলমান ভাই ভাই! (বলে প্রাণপণে পালাতে পালাতে)--সব এক সমান।

সকলে সমস্বরে--কম্‌বখ্‌ত পাপী, গুনাহ্‌গার।

৬ষ্ঠ--(মুখটী কাঁচুমাচু করে) ভাই নমাজ পড়ার জন্যে যে-আমার একটীও টুপী নেই। (এই বলে ধীরে ধীরে টুপীটী সৈয়দের মাথা থেকে উঠিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় পরা)

৭ম--ভাই, আমার একটীও সার্ট নেই--(সৈয়দ নির্ব্বাক--একটু ইতস্ততঃ করে সৈয়দের গা থেকে সার্টটী খুল্‌তে আরম্ভ করে দিলে--একা খুল্‌তে না পেরে আর একজনকে লক্ষ্য করে) এ--বোকার মত চেয়ে আছিস্‌ কেন, ভাইকে একটু সাহায্য কর না--ভাই সাহেবের হাত দুটো একটু তুলে ধর। (লোকটী ধরলে--ও খুলে নিলে)।

৮ম--ভাই সার্টটী আমাকে দাও না, আমার যে একটীও নেই।

৭ম--চুপ্‌রাও, বেটা হারামজাদা--বেটার আবদার দেখে বাঁচি না। (নিজেই পরা আরম্ভ করে দিলে)

৮ম--না-ভাই--আমাকে দিতেই হবে।

৭ম--ঘুষিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেব বল্‌ছি--

৮ম--(সার্টের কোণাটা ধরে) দাও না ভাই।

৭ম--ফের, হারামজাদা--(চলে যেতে যেতে) ওহো! মুসলমান ভাই ভাই।

৮ম--দাদা, আপনার ভাইপোটী একটি গঞ্জীর জন্য আজ তিন মাস ধরে কাঁদছে--পয়সার অভাবে আজও কিনে দিতে পাবি নি--যাক্‌, না হয় একটু বড়ই হবে, দাদারটী-ই নিয়ে যাই। (ধীরে ধীরে গঞ্জীটী খুলে নিলে)।

সৈয়দ--বেটা চোর বদমাস্‌ কাঁহাকা--(বলে পায়ের চটী একখানি ছুঁড়ে মারলে, গায়ে না লেগে জুতো গিয়ে পড়ল বাইরে)।

৮ম--আহা, আহা, ফেলে দেবেন না ফেলে দেবেন না ভাই, আমার যে একখানও নেই, (তাড়াতাড়ি পায়ের খানা ছিঁনিয়ে নিলে--বাইরের পাটি আর একজন খুঁজে আনলে এ পাটিও সে দাবী করতে লাগল)

৯ম--আমাকে দাও ভাই, আমার যে নাই।

৮ম--বাঃ, আমার বুঝি আছে ঐ পাটিও আমাকে দাও।

[দুইজন--এ বলে আমাকে দাও, ও বলে আমাকে দাও, এই বলে টানাটানি করতে লাগল]

৭ম--(দ্বন্দ্বরত একজনকে লক্ষ্য করে) তুমি কেমন মুসলমান হে, ভাইকে একপাটি জুতো দিতে পার না!

৮ম--এ বেটা কেমন মুসলমান, আমার মত একজন বুড়ো ভাইকে এক পাটি পুরান জুতো দিতে চায় না? হায়, আফসোস্‌। (কেউ কাউকে দিলে না, কাজেই যার যার পাটি সে পায়ে দিয়ে পটাস্‌ পটাস্‌ করে হাঁট্‌তে লাগল।

৫ম--বেশ, বেশ!

৬ষ্ঠ--হাঁ, এইত ভাইএর মত কাজ, ভাইএ ভাইএ একেবারে সমান ভাগ--একেই ত বলে ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্ব--ওহো! মুসলমান ভাই ভাই।

৫ম--এইত আসল মুসলমানী, ঈমানের পরিচয়।

[যে যা পেল নিয়ে বেরিয়ে গেল--যাবার সময়:]

সমস্বরে--জয় ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্বের জয় (বার কয়েক চেঁচিয়ে গেল)।

[একজন লাঙ্গল কাঁধে ঢুকে পড়ল—সৈয়দের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গল]

সৈয়দ—কি চাই!

লাঙ্গলওয়ালা—পশ্চিমের বিলে ভাই সাহেবদের ত চাষের জমি প্রায় দশ বিঘে আছে—

সৈয়দ—তা ত আছেই—তাতে তোমার বাবার কি?

লা—আমার যে ভাই এক বিঘেও নেই।

সৈয়দ—তা'তে আমার বাবার কি বেটা—মরগে, বেরো—

লা—(টুপীটা ট্যাক থেকে বের করে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান।

সৈয়দ—তাতে আমার কি মাথামুণ্ডু!

লা—অমন কথা বল্‌বেন না ভাই—মুসলমান সব ভাই ভাই।

সৈয়দ—তাতে হয়েছে কি—

লা—দশ বিঘে ত আর আপনার দরকার নেই, আজ থেকে বিঘে চারেক আমি চাষ করব—ভাই-এর অংশ ভাইকে না দিলে যে গোনাহ্ হবে ভাই; আমি বেঁচে থাক্‌তে আপনাকে গোনাহ্‌গার হতে দিতে পারি?

সৈয়দ—ওরে, বেটা পাজি হারামজাদা, শুয়ার বেরো, বেরো— (ভয়ে লাঙ্গলওয়ালার প্রস্থান)

[এক সঙ্গে আর তিনজন ঢুকে পড়ল]

সৈয়দ—কী চাই?

১ম—আমি মুসলমান।

২য়—আমিও মুসলমান ভাই। (টুপীটা ঠিক করে পরতে পরতে)

৩য়—আমিও ভাই মুসলমান। (দাড়ীতে হাত বুলাতে বুলাতে)

সৈয়দ—মুসলমানের সাতগুষ্টি মরুক, কি হয়েছে, তাই বল?

১ম—আমার মোকদ্দমাটী উঠিয়ে নিন্ ভাই।

২য়—আমারটীও ভাই, ভাই হয়ে ভাই এর সঙ্গে মোকদ্দমা করবেন!

৩য়—মুসলমানে মুসলমানে মোকদ্দমা করা গুনাহ—আমারটীও রফা করে দিন ভাই।

সৈয়দ—সুদে আসলে আদায় কর, বাকী খাজনা সব দিয়ে ফেল, আর ক্ষতিপূরণ বুঝিয়ে দাও—এক্ষুণি উঠিয়ে নিচ্ছি।

১ম—অমন কথা বল্‌বেন না ভাই—সুদ বিল্‌কুল হারাম (ক আর হ'কে বেশ ভাল করে উচ্চারণ করলে)।

২য়—তৌবা, তৌবা, ভাই হয়ে ভাইএর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেবেন!

৩য়—মুসলমান ভাই ভাই—সে কি শুধু মুখের কথা? ভাইএ ভাইএ মোকদ্দমা করা খারাপ, গুনাহ্‌র কাজ!

সৈয়দ—ডেম্—গোনাহ্—বেরো, বেরো—(সকলের প্রস্থান)

[আর একজনের প্রবেশ]

সৈয়দ—কি চাই—শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বল।

আগন্তুক—আমার একটী ছেলে আছে ভাই।

সৈয়দ—তার কি কলেরা হয়েছে?

আ—খোদা হাফেজ—এবার সে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে।

সৈয়দ—তহশীলদারী চাও?

আ—না ভাই।

সৈয়দ—তবে কি চৌকিদারী?

আ—যদি মর্জ্জি হয়, ভাই সাহেবের মেয়েটী আমার ছেলের জন্যে—

সৈয়দ—বেটা হারামজাদা, ডেম ব্লাডি—বেটা জোলার ঘরে মেয়ে দেব?

আ—(জেব থেকে টুপীটা বের করে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান।

সৈয়দ—তাকে কি? বেরো, বেরো—

আ--আপনিই ত বলেছেন সব মুসলমান ভাই ভাই--সব এক সমান।

সৈয়দ--খুব বলেছি, পাঁচশ'বার বলব--তা বলে আমার মেয়ে জোলাকে দেব নাকি? গলা ধাক্কা না খেতে বেরো বলছি, (লোকটির প্রস্থান)

[একটা ছেলে কোলে ও আর একটার হাত ধরে একটা বুড়ো লোক ঢুকল]

সৈয়দ--কি চাই? ভিক্ষে? ওরে-

আগন্তুক- না ভাই (ছেলেটাকে দুম করে মাটিতে রেখে নিজেও বসে পড়ে) অত ব্যস্ত হবেন না। একেবারে থাকব বলেই এসেছি--আপনার 'ভাবীও' ভিতরে গেছে। ঘরে খাবার নেই, হঠাৎ ভাইএর কথা মনে হল--হেঁ, হেঁ (লোকটা দুই গাল খুলে হাসতে লাগল)।

[আর একজন এক বিরাট গাট্‌রী মাথায় ঢুকল]

২য় আগন্তুক--তা' ভাই সাহেবের তবিয়ৎ কেমন?

সৈয়দ--তবিয়ৎ টবিয়ৎ দূর কর--বেরো, বেরো--

২য় আগন্তুক -(গাট্‌রীটা নামাতে নামাতে) ভাইএর প্রতি ভাইএর এ কি রকম ব্যবহার! এ যে পবিত্র ইস্‌লামের খেলাপ। ওহো,--কি উদার ইস্‌লাম ধর্ম্ম! (বাষ্প উদ্গীরণ করতে করতে বসবার জন্য মাথার গামছা দিয়ে জায়গা ঝাড়তে লাগল)।

সৈয়দ--ভাই টাই আমি চাই না--বেরো, বেরো, এক্ষুণি বেরো--

২য় আগন্তুক--(বলতে বলতে) আপনি না চাইলে কি হবে? আমরা ত আর ভাই হয়ে ভাই ফেলতে পারি না।

[ছেলে পুলে নিয়ে আবও দু'তিন জন ঢুকে পড়ে এক সঙ্গে কথা সুরু করে দিলে]

আগন্তুক--আদাব, আদাব, ভাই সাহেব--শুনলাম ভাই সাহেব একা একা বড় কষ্ট পাচ্ছেন! আমরা থাকতে আপনি একা একা কষ্ট পাবেন? ভাই আর কোন্ দিনের জন্য। তাই ছেলে পুলে সব নিয়ে এলাম; ভয় নাই দাদা, এখন আর যাচ্ছি না- নেহাৎ যেতে যদি হয় তবে এই বর্ষাটা সাবাড় করে ই যাবো।

সৈয়দ --কি!

আগন্তুকগণ--কুল্লু মুসলমান--

সৈয়দ- যাও যাও, আমি মুসলমান নই, বেরো, বেরো--

[আবও অনেকে ঢুকে পড়ে, সকলে প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল]

সকলে--তৌবা, তৌবা। এ যে গোনাহ্ , এ যে গোনাহ্, ভাই সাহেব--দূরের কথা চুলোয় যাক্, এই হিন্দুস্থানে আমরা সাতকোটী ভাই থাকতে আপনাকে গোনাব কাজ করতে দেব? (সর্দ্দার গোছের একজন বলে উঠল) ভাই সব বসে পড়, আজ একেবারে ভাই সাহেবের এখান থেকে খেয়েই উঠব (দাঁড়িয়ে এক এক করে গ'ণে নিয়ে) বেশী নয় ভাই, এই মাত্র পনর জনের কোর্ম্মা পোলাওর হুকুম দিয়ে দিন। (একজনের মুখ থেকে হুঁকাটা কেড়ে নিয়ে গড় গড় টানতে টানতে দূরে তাকিয়ে) ঐটি দাদার খাসী না হে--হাঁ নিশ্চয়ই, আর না হয় দাদার বারাণ্ডায় উঠে চুপটা করে বসে থাকে! (একজনকে ইশারা করে) ওবে, নিয়ে আয় নিয়ে আয়, আমরাই জবেহ্ করে এখানেই কেটেকুটে দিই--না হয়, দাদা আর ভাবী সাহেবের বড় তকলীফ্ হবে। ভাই-এব খাসী ভাই এরা না খেয়ে জামাই হারামখোরেব জন্য রেখে যাব নাকি? (তকলীফের 'ক' কে খ এর মত করে গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করলে)

একজন চেঁচিয়ে উঠল--নিশ্চযই নয়, নিশ্চযই নয়--জামাই হারামখোরকে খাওয়ান আর বিড়াল হারামখোরকে খাওয়ান এক কথা।

সকলে--আলবৎ, আলবৎ।

[গলায় চাদব জড়িয়ে ছাগলটীকে টানতে টানতে নিয়ে এসে উৎসাহে গানই সুরু করে দিলে]--

খাসীর গোস্ত বিলাতী আলু
পরটা খাইবানি.......

আর একজন উঠে--শালা চুপ্‌রাও, কলকাতাব সব মুসলমান ভাই শুনতে পেলে, শালা এক টুকরা করেও পাবি না--চুপ্। চুপ্।

সকলে সমস্বরে--হাঁ, চুপ্ চুপ্! (চুপ করাব যেন সমুদ্র গর্জ্জন শুরু হয়ে গেল--চুপ্ চুপ থাম্‌তে অনেকক্ষণ গেল)

[সত্যি সত্যই যখন দা নিয়ে এসে ছাগলটাকে সকলে ধরে চিৎ করার আয়োজন করলে তখন সৈয়দের যেন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল]

সৈয়দ--(উঠে চেঁচিয়ে উঠল) শুয়ারকা বাচ্চা, হারামজাদা বেটারা, এক্ষুনি দেখাব, পুলিস, পুলিস।

সকলে সমস্বরে (ভেংচি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল) পিলিস, পিলিস, ফিলিস--

[ছাগলটাকে চিৎ করে ফেলে, মোল্লাগোছের একজন বিস্‌মিল্লা, আল্লাহো আকবব বলে দা উঠাতেই দেখে বিকট লাঠি-কাঁধে লাল-পাগড়ী মাথায় পুলিশ ঢুক্‌ছে।]

সকলে--(ছাগল ছেড়ে দিয়ে, দা ফেলে) ওরে বা বা, আমি নই--ও হুজুর। (এ বলে সে, সে বলে এ, আর 'দোহাই, হুজুর বাবা,' করতে করতে যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচলো। লাল পাগড়ীর রক্ত চক্ষু একবার ঘুরপাক খেয়ে বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠল--পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো)।

[যবনিকা]

নিঠুর নিয়তি মোর প্রিয়া

সুফিয়া এন হোসেন

হে অদৃশ্য সাকী!
নেশায় করেছ ভোর যবনিকা অন্তরালে থাকি।
অদৃশ্য অদৃষ্ট সম, অন্তরের পরতে পরতে
জড়ায়ে রয়েছ তুমি--জন্ম হতে মোর অলখিতে।
হৃদি পাত্র ভরা!
বেদনায় নীল, সুখে সোনালী যে সুরা--
ঢালিয়া দিতেছে অনিবার
সেত আর নহে ফুরাবার।
কঠোর করুণা করি অদর্শনা তব দুটী হাত
ঢালিতেছে যে শরাব অক্লান্ত মুহূর্ত্ত দিবারাত--
তোমারি সুন্দর হাতে ঢালা--
পান করি সে শরাব না ফুরাতে পেয়ালা, পেয়ালা
নিঠুর নিয়তি মোর তুমি শুধু দাও পূর্ণ করে--
যে আসি দাঁড়ায় দ্বারে পাত্র লাগি তব মুক্ত দ্বারে।
ওগো অকরুণা!
বঞ্চিতের তিক্ত ব্যথা তুমি বুঝিবে না।
তোমার রঙীন সুরা মনেরে রঙায় কী যে রাগে--
বিরাগে ব্যথায় কিম্বা, রাগে, অনুরাগে।
একক জীবনে মোর তোমার স্মৃতির রাঙা সুরা
সাথী হয়ে জাগিতেছে--ওগো সুমধুরা।

নিঠুর নিয়তি মোর প্রিয়া

আমার নিয়তি
নিয়ন্ত্রিত করিতেছ অপরূপ রূপে নিতি নিতি।
দুর্ব্বার তোমার শক্তি—অলঙ্ঘ্য নিষ্ঠুর তব দান।
পরিমিত, অব্যাহত তোমার বিধান।

অয়ি নিরদয়া!
অলক্ষ্যে রচিয়া যাও মুগ্ধ মোহ মায়া।
বিদ্যুৎশিখার মতো হেরি তব ক্ষণিকের খরদীপ্ত দ্যুতি
পতঙ্গ পুড়িয়া মরি, অবিচলা! নাহি তব ক্ষতি।
নিয়াছ হৃদয় মন, প্রাণ ফিরে তব পায় পায়
দেহের বন্ধনে কাঁদে - মুক্তি দাও আমারে বাঁচাও!
নিঠুর নিয়তি সমা প্রিয়া!
বাঁচাও বাঁচাও মোরে অন্তঃসারশূন্য প্রাণ নিযা!
নিয়াছ হৃদয় মন, প্রেম প্রীতি, এ মুখের ভাষা--
সব শূন্য এই দেহ পুরাইয়া দাও তারো আশা।
দাও আনি মৃত্যুখানি, তোমাব অমৃত ভরা হাতে।
বিরহ বিধুর দেহ ঢেকে দাও মৃত্তিকা পরতে!
তোমার দীপ্তিতে আজি সবি যাক্ জ্বলি,
শুধু মোর প্রেমশিখা আরো উর্দ্ধে উঠিবে উজলি।
সুদূরিকা তুমি!
তোমারে জিনিয়া লব পরপারে তাই দিয়া চুমি।

ডাকঘর

(১)

বুলবুলের জন্য কিছু লিখতে আমার একটু সঙ্কোচ হয়। কারণ আমার প্রবন্ধ মাত্রেরই, উদ্দেশ্য না হোক, ফল হচ্ছে emancipation of intellect কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে মানুষ সহজে emancipated হতে চায় না। ফলে অনেক কাল ধরে আমার স্বসম্প্রদায় আমার প্রতি এই দোষারোপ করেছেন যে আমি ধর্ম্ম নীতি ও সমাজবিদ্বেষী,--সে অপবাদ অবশ্য আমাকে আজকাল আর কেউ দেয় না,--যদিচ বাঙলার হিন্দু ভদ্র সম্প্রদায় তিন পুরুষ ধরে ইংরাজী শিক্ষিত।

সুতরাং আপনার কাগজে কিছু লিখতে হলে অতি সতর্ক হয়ে লিখতে হবে, যাতে সে লেখা কোনও লোকের গায়ে না লাগে।... আমার কলম, আমার বিশ্বাস, এতদিনে সতর্ক হবার বিদ্যে শিখেছে।

আমার ইচ্ছে আপনার কাগজে 'উর্দ্দু বনাম বাঙলা'র যে আলোচনা শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে দু কথা লিখি। উর্দ্দু অবশ্য জানিনে, কিন্তু বাঙলা আমি জানি। সুতরাং এ তর্কে যোগ দেবার আমার...অধিকার আছে।

আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি এ লেখায় হাত দিতে পারি।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

(২)

"বুলবুল" আমি যথা সময়ে পেয়েছি, পড়েছি ও পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। প্রায় প্রবন্ধেই অসাধারণ সংযম রক্ষিত হয়েছে এবং মনীষা প্রকট হয়েছে অধিকাংশ প্রবন্ধে। বন্ধুমণ্ডলে আমি এই পত্রিকাখানির প্রচুর প্রশংসা করেছি।

প্রথম সংখ্যার লেখক লেখিকারা সকলে মুসলমান সম্প্রদায়ের। সেই জন্যে আমার ধারণা ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায় এই পত্রিকার দ্বারা আপনার বিশিষ্ট বাণী নিবেদন করবেন। বিদগ্ধ মুসলমানের চিত্ত কোথাও এমন করে স্ফূর্ত্ত হতে দেখিনি। "এই পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ আমাদের"—একথা মনে করলে যে স্ফূর্ত্তি সেই স্ফূর্ত্তি 'বুলবুলে'র প্রথম সংখ্যার লেখক লেখিকাকে প্রবুদ্ধ করেছিল বলে অনুমান হয়। 'বুলবুলে' হিন্দুর রচনা থাকলে ঐ স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হবে কিনা চিন্তা করবেন।

তবে এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন আছে যাতে হিন্দু ও মুসলমান অকপট চিত্তে বাণী বিনিময় করবেন, অবশ্য বিদগ্ধ-হিন্দু-মুসলমানের কথাই বল্‌ছি।

শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারলে আজকের দিনের অন্ধকার বহু পরিমাণে অপসৃত হতো। আলেয়ার পিছনে ছুটাছুটি করা যাদের পেশা তারা তাই করুক, কিন্তু তপস্যা যাঁদের আলোকের তাঁরা কেন পরস্পরের প্রতি অভিমান পোষণ করে অন্ধের সঙ্গে অন্ধ হবেন?

'বুলবুল' যদি মিলন দূত হয়ে শান্তির বার্ত্তা শোনায় তবে দেশের এই বেদনার্ত্ত মুহূর্ত্তে তার আবির্ভাব ইতিহাসের অন্তর্গত হবে।

'বুলবুলে'র শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডাকঘর

(৩)

'বুলবুলে'র প্রথম সংখ্যা পাইয়া প্রীত হইলাম। আমি এখনও অসুস্থ ও দুর্ব্বল আছি।... এই জন্য আপনাদের কাগজখানির বেশী কিছু পড়িতে পারি নাই। যতটুকু দেখিলাম, তাহাতে ভালই মনে হইল। বাহ্য চেহারা বেশ হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধটি তালতলার সাহিত্য সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আপনি কুমারসিংহ হলে পড়িয়াছিলেন মনে হইতেছে। উহা তখনই আমার ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া আপনাকে সেখানে বলিয়াছিলাম। আপনার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রবন্ধটি আগেকারটির অনুবৃত্তি। উহাও বেশ হইয়াছে।

একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। আমরা ইংরেজী শিখিয়াছি—আমাদের অনেক চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়া। এই জন্য তাহা প্রকাশ করিতে গেলে তাহার উপযোগী বাংলা শব্দের অভাবে আমরা সহজেই ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়া বসি। ইহা স্বাভাবিক হইলেও ইহাতে বাংলা রচনার বিশুদ্ধতার হানি হয়। অধিকন্তু যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহাদের পক্ষে আমাদের লেখা দুষ্পাঠ্য ও দুর্বোধ্য হয়। এই জন্য যেখানে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা একান্তই অপরিহার্য্য, সেখানেও তাহা বাংলা অক্ষরে লিখিয়া বন্ধনীর মধ্যে তাহা রোম্যান অক্ষরে দিলে মন্দ হয় না। যেখানে ইংরেজী শব্দটি পারিভাষিক শব্দ নয়, সেখানে লেখক কর্ত্তৃক নবরচিত তাহার বাংলা প্রতিশব্দটার পরে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী শব্দটি দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী কোন বাক্য উদ্ধৃত করিলে বাংলায় তাহার অনুবাদ বা তাৎপর্য দেওয়া আবশ্যক। অনেক লেখক (তাহার মধ্যে আমিও) এই সোজা কথাগুলির প্রতি মন দেন না বলিয়া আমি আমার সহকারী সম্পাদকদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিয়া থাকি। তাহা সত্ত্বেও 'প্রবাসী' এই ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই।

আপনাদের লেখার কোন কোন অংশ প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিয়া দিব মনে করিয়াছি। সম্পাদক সব কাজ একা করেন না ও করিতে পারেন না। এই জন্য অনেক বিষয়ে সম্পাদকের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বর্ষ শেষে

'বুলবুল'এর প্রথম বৎসরের জীবনে এ আশা-আকাঙ্ক্ষা, এর সাধন-সঙ্কল্প কতটুকু ফুটে উঠলো তার বিচারের অধিকার আমাদের নয়। আমরা আজ বর্ষশেষে শুধু এই নিবেদন কর্ব্ব যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনের পরিচয় হবে 'বুলবুল'- এই ভীরু আশা অনুক্ষণ আমাদের অন্তরে জেগে আছে। নব নব জ্ঞানের আলোকে মানুষ মানুষের সঙ্গে তার সহজ ঐক্যের আবেদনে পরম-আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সম্মিলিত হবে, এক ছন্দোময় জীবন যাপন কর্ব্বার জন্যে সুন্দরের পথ বেয়ে মুক্তির গান গেয়ে বন্ধনহারা বিহঙ্গের মতো অগণিত নরনারী শোভাযাত্রা কর্‌বে—এই স্বপ্নের আভাস অন্ধকারে আমাদের পথ দেখিয়েচে, তার মোহন মায়া পেছনের ভূতের কান্নার মোহ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে এনেচে।

জানি, আমাদের ''যতো সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'', কিন্তু তবু যে 'কঠিন কামনা' আমরা বয়ে চলেছি এর যা-কিছু গৌরব অন্ততঃ সেটুকু থেকে সাহিত্যিক সমাজ আমাদের বঞ্চিত কর্ব্বেন না—এই ভরসা প্রচুর অযোগ্যতার মধ্যেও আমাদের মাথা উঁচু ক'রে রেখেচে। আমরা বন্ধুদের বিশ্বাস কর্ত্তে বলি, যে, আমাদের বর্ত্তমান যদি-বা অতিশয় দৈন্যের লজ্জায় মলিন, কিন্তু সে আমাদের আশা-অভিলাষের তুচ্ছতার পরিচায়ক নয়। এক উদার মহামহিম ভবিষ্যতের ছবি বিশ্বমানুষের মনকে নতুন চিন্তায় প্রবুদ্ধ করেচে, তাকে নতুন প্রাণের রসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেচে। সেই মনোবনের মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের পথ বুলবুল-এর। তার সম্বল নিষ্কলুষ পবিত্র সঙ্কল্প, জীবনাদর্শে দৃঢ় গভীর প্রত্যয় এবং দেশের বিদগ্ধ চিত্তের সানন্দ সাহচর্য্য।

সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং বিশ্বস্ত পরিচালক। বাংলার চিন্তাশীল মনীষীদের আশীর্ব্বাদ, তরুণ চিন্তানায়কদের সাহচর্য্য, রসিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা এর চিত্তসুন্দর সাধনায় আমাদের অনেক শক্তি দান করেচে। সম্মুখে আমাদের দীর্ঘ পথ; একটী বৎসরের পর আমরা আজ নতুন ক'রে সকলের সহানুভূতি ও সাহচর্য্য প্রার্থনা করি।

বাঙালী মুস্‌লিমের জীবন-যাত্রার আদর্শ ও পদ্ধতির শোচনীয়তা অতি সহজেই চক্ষুষ্মান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের বিশেষ সাধনা : একে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মেলানো। অতীতে যে-বিপুল জলধারা সাগরের সঙ্গে যোগপ্রবাহ হারিয়ে পঙ্কিল মৃত্যুর সম্ভাবনায় নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়েচে তার পথের বাধা বন্ধ কেটে আবার সেখানে দুর্ব্বার স্রোত সঞ্চার করা অতি কঠিন কথা জানি, তবু সমাজের প্রকৃষ্ট চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপনের অভিলাষ আমাদের। দৃষ্টি যাঁদের নির্ম্মুক্ত, বুদ্ধি যাঁদের নিঃশঙ্ক, এই কামনায় আমরা বিশেষ ক'রে তাঁদের সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করি।

নববর্ষে আমরা যেন সাহিত্যিক সমাজের আরো বন্ধুতা, আরো সাহচর্য্য, আরো সহানুভূতি লাভের যোগ্য হই, এই আমাদের কামনা। যাঁরা আমাদের সাহস দিলেন তাঁদের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা, যাঁরা সহায়তা দিলেন তাঁদের অজস্র ধন্যবাদ, যাঁরা আশীর্ব্বাদ দিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা-নমস্কার, আর যাঁরা দিলেন অন্তরের বন্ধুতা তাঁদের আজ আমাদের প্রীতি-অভিনন্দন।

৯০/৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - মাস পয়লা প্রেস হইতে শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ কর্ত্তৃক ২৩ ক্রিমিটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

নির্বাচিত বুলবুল

বাকি সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত বাছাই রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মদিন

এই মম জন্মদিন সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠে এল বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে মগ্ন হয়ে; নব সূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
যাত্রী হেথা আছি শুধু অপেক্ষা করিতে; লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণ শিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।
প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য, অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়-শিখরে দেখ আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ হে ধরণী, যাক্ তৃষাতপ্ত দিগন্তের
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো, অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষা-মুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও; যাত্রা-তরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন-ভোজেব শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।
হে বসুধা,
নিত্য মোরে সংবাদ পাঠাও তুমি,—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসার রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছ রাত্রি দিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলি বেলা নিদ্রালু আলোকে ; তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে,
আড়াল করেছ দীপ ধূম্র-আবরণে, টানিছে কে
নেপথ্যের পথে মোরে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাট-পটে শেষের স্বাক্ষর। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে

চরম সম্মান দিয়ো তোমার অন্তিম নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি করে দাও অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো অশক্তির প্রদোষ ছায়ায়,
বন্দী করে বার্দ্ধক্যের, তবু ভাঙ্গা মন্দির বেদীতে
প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব। ভাঙ্গো ভাঙ্গো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ-স্বরূপ
রয়েছে নবীন হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চারিদিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
নানা ছন্দে বারম্বার বলেছে সে, ভালো বাসিয়াছে,
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয় ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে; তার ভাষা
হয় তো হারাবে মূল্য মোর ছন্দে নানা স্পর্শ লেগে,
সেই তবু একমাত্র সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু-পারে; এঁকেছিল তারি অঙ্গে অঙ্গে পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছিল তন্বী শেফালিকা
সুগন্ধী শিশির-কণিকায়। তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলী-সূত্রে। যেথা তব ছিল কর্ম্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে যেন পারত মোরে মালা
আমার ললাট ঘেরি অকস্মাৎ ক্ষণ অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; আনন্দিত স্মিতহাস্যে
মুহূর্ত্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে। সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে নিয়ো তুমি গণি
যা' কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্ম্মের যত সাজ
তোমার পথের যে পাথেয়,—তাহে সে পাবে না লাজ,
রিক্ততায় তার দৈন্য নহে। তবু অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, বসুন্ধরা, তার কাছে ঋণী
সে কথা জানায়ে যাব, তাহারি বেড়ার ধার হতে
অমূর্ত্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
খুলে যেত বাহিরের স্থূল যবনিকা, পুষ্পে তৃণে
রূপে রসে গন্ধে গানে যে মহারহস্য দিনে দিনে
হোত উদ্ঘাটিত, আজি মর্ত্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।
যবে নিরাসক্ত চিত্তে নিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে

তোমার অমরাবতী সেই শুভ্র সেই শুভ ক্ষণে
খুলেছ দুয়ার তার, বুভুক্ষুরে ক'রে সে বঞ্চিত
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, তুমি আছ জাগি
ত্যাগীর প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে করিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের উচ্চ সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা,
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জ্জনা কুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস গর্জনে তারা রাত্রি দিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি। শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি দিনে রাতে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনিকের দৈন্যের উৎপাতে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে অপদেবতা, কদর্য মুখ-বিকারে
তার হাস্য দেখে যাব; বলে যাব, সে প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লয় দুষ্ট দুঃস্বপনে,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষে মশালের, আর বিধাতার অট্ট হাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
রচিবে না কোন দিন ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।
বৃথা বাক্য থাক। তব দেউলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্য্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে,
রবে মোর দীন বীণা মূর্চ্ছিয়া তোমার পদতলে।

২৫ শে বৈশাখ, ১৩৪৫ কালিম্পঙ্।

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয়, মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি',
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

শেষ দান

শরৎ বেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ বেগ;
ক্লান্তি আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিকহারা তার ঝড়ের মত্তলীলা,
বিদ্যুৎ-প্রিয়া স্মৃতির গভীরে হোলো অন্তঃশীলা।
সময় এসেছে নির্জন গিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।
অস্তসাগর পশ্চিম পারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্ত ঋষির নীরব বীণার রাগিনীতে লীন হবে।
তবু যদি চাও শেষ দান তার পেতে,
ঐ দেখ ভরা ক্ষেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়া চলে যেতে দাও তারে,
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

নজরুল ইসলাম

সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ—নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টিধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা—নয়নের জল দুর্ব্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্রতপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল ক'রে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি— নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি।
ইরাণী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি' ভরি' ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি—বুঝি আমারি বাদল-মেঘ শেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণীর ডোরায় কাঁটাব কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী, তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি ; ধরণী ত তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম ক'রে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখদিন-শেষে আসে দুখরাতি আঁধার করি।
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতাভরা চিত্র-পাখা,
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝ'রে যায় কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিলভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন-বাদল-অশ্রু যূথীরে; এ নহে মাধবী পুষ্প নব।
মাটির করুণাসিক্ত এমন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ক্ষরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও—স্বপন-রাণী!
আমার বাণীতে তোমার মূরতি বীণাপাণি নয়—বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল তলে।

ওরা শুধু তব মুখ চেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জলশেষে চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী—তব বিস্মৃতি-বালুকাতলে
দু'দিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী, তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।
কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধুকূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দেবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা-কাঁদন যেটুকু সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
মোর দেহ-মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু-সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রাণী, তব ধ্যান ঐ চন্দ্ররাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার আমার সন্ধ্যা-তিমির শেষে,
আমি যাই সেই নিশিথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হ'ল সুনীলতর,—
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ—উজ্জ্বলতর তাহার কর্।
যদি সে চন্দ্রহসিত নিশীথে বিস্বাদ লাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত তোমারে খুঁজিও আমার বিধুর গানের লোকে।
সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দ্রন-সুশীতলতা,
যে ফুল জীবনে ঝরে না— সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম,
বিষ-শেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার উর্দ্ধে তুমি যে ফুল'
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায় বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী,
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালবাসি যেন অধিক করি।

গান

১

চিকণ কালো ভুরুর তলে
কাজল-কালো চোখ
আদি কবির আদিরসের
যেন দুটী শ্লোক।।
ফুল্ল-লতার পত্রপুটে,
দুটী কুসুম আছে ফু'টে
সেই আলোতে রেঙে ওঠে
বনের গহন লোক
গো আমার মনের গহন লোক।
কাজল-কালো চোখ।।

রূপের সায়র সাঁত্‌রে বেড়ায়
পানকৌড়ি পাখী
ঐ কাজল-কালো আঁখি।
মদির আঁখির নীল পিয়ালায়
শারাব বিলাও নাকি
ওগো কাজল-আঁখি।
তারার মত তন্দ্রাহারা
তোমার দুটী আঁখি-তারা
আমার পানে চেয়ে চেয়ে
অশ্রু-সজল হোক।
কাজল-কালো চোখ।।

২

আধো-আধো বোল
লাজে বাধো-বাধো বোল—
ব'লো কানে কানে।
যে কথাটী আধ-রাতে
মনে লাগায় দোল্—
ব'লো কানে কানে।।
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরম-পাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটী ঢেকে রাখে বুকের আঁচল—
ব'লো কানে কানে।।
যে কথা লুকানো থাকে লাজ-নত চোখে,
না বলিতে যে কথাটী জানাজানি লোকে
যে কথাটী ধরে রাখে অধরের কোল—
ব'লো কানে কানে।
যে কথা কহিতে চাও বেশভূষার ছলে,
আভাসে ইঙ্গিতে যাহা বল পলে পলে,
যে কথাটী বলিতে সই গালে পড়ে টোল্
ব'লো কানে কানে।

ফাররুখ আহ্‌মদ

জন্ম-দৈন্য

মম জন্ম-দৈন্য, পান্থ, জীবনের সায়াহ্ন পূরবী
উদাত্ত ওঙ্কারে তব ওঠো গাহি ব্যথা-দগ্ধ কবি;
নব বরষের প্রান্তে উদয়ের রক্ত বিভীষিকা
আনিলে প্রথম তুমি বিষদগ্ধ শিরীষ মালিকা।

হে কঠোর দিলে সাড়া প্রভাতের বহু বহু আগে
ধ্বংসের বাসনা আনি জীবনের নব অনুরাগে
জাগালে দৈন্যের বুকে। সে বীণার মুগ্ধ রেণুরাশ
বিষাক্ত নাগিনী সম ফেলিয়াছে সুতীব্র নিশ্বাস,
অমাবস্যা রাত্রি মূর্চ্ছাতুর।

সে কৃষ্ণ পক্ষের রাতে
প্রথম জেগেছি আমি জীবনের সবুজ আশাতে;
সেদিন আমার চোখে শ্মশানের শ্রান্ত তট সীমা
আঁকেনি বিশুষ্ক শীর্ণ বিসর্পিল বিদায় ম্লানিমা।

কখন পড়ালে মোরে পরাভব কণ্টক মালিকা,
তব অভিশাপে মোর ললাটের শুভ্র জয় টীকা
পথ-প্রান্তে এল নেমে।

. ... আমি চলিযাছি, সাথে সাথে
বুভুক্ষু পান্থেরা চলে আনন্দের দুরন্ত আশাতে
তাহাদের বুকে দোলে ধরণীর স্নিগ্ধ শিশু-শব
তাহাদের দৈন্য আনে সুন্দরের হীন পরাভব।

আমার দুয়ারে এল নববর্ষ দুর্ভিক্ষ সাজিয়া।
জীবনের যত সুখ নিরাশায় উঠিল বাজিয়া,
বুভুক্ষা আসিল দ্বারে দৈন্যের বঞ্চিত রিক্তবাণী
উলঙ্গ মৃত্যুর দূত এল কৃষ্ণ যবনিকা টানি'।

এখন শুনেছি আমি সমগ্র শক্তির অপরাধী,
দুর্ব্বল প্রাণীর চোখে সাজিয়াছে করাল নিষাদী।

অবিচার-স্বেচ্ছাচারে রিক্ততার প্রান্তরে প্রান্তরে
উঠায়েছে ঘূর্ণিঝড় নৈরাশ্যের তীব্র হাহাস্বরে।

আমার সংকীর্ণ বুকে হেরিলাম পড়িয়াছে ছায়া
এ বিপুল বিশ্ব-ধরণীর। গৃহ-হারা নগ্ন মায়া
চলিতেছে প্রত্যাখ্যান নিত্য মম ভালে অবিরত
অগণ্য কঠিন শাপ দুর্ব্বিসহ তিক্ত শত শত।

নবাগত সদ্যোজাত শিশু আমি হেরিণু চমকি—
শুষ্ক-স্তনা ধরণীর বুকে যারা চলিছে থমকি'
তাহাদের ললাটেতে তব উগ্র বাণী দীপান্বিত।
বৈশাখ সূর্য্যের জ্বালা খরতর মরণের মিত।
রক্ত-প্রাতে ডাক দিলে কর্ম্মযজ্ঞে কঠোর আহ্বানে
সমুদ্র উঠিল রুষি,' পর্ব্বত ফাটিল সেই গানে।

আমি জন্ম-দুঃখী-পান্থ দারিদ্র্যের রুক্ষ সহচর—
যৌবন স্বপ্নের জ্বালা জ্বলে মম পরশি' অম্বর
কোথা মেঘ, কালোছায়া দিবানিশি হেরি
কাল্‌বৈশাখীর ঝড় আসে ছুটে মহাশূন্য ঘেরি'।

হায় ঝড় সেও ছিল ভাল—জীবনের তিক্ত দান
এ যে ব্যর্থতার মাঝে কাঁদে মম অশান্ত পরান।
ঘুমায়ে দুঃস্বপ্ন দেখি অন্ধকারে প্রভাতের ছায়া
দৈন্য-বিভীষিকা আসে মৃত্যুর কঙ্কাল শীর্ণ কায়া
ক্ষুধা আর ক্ষুধিতের জাগে সাড়া শুনি এক সাথে
মথিয়া-উত্তরী বায়ু পউষের ধূমল প্রভাতে।

তখন শুনেছি আমি বিস্মৃতির আলোজ্জ্বল প্রাতে
কে যেন ডাকিছে মোরে এস এস বিশ্বের সভাতে
পরিপূর্ণ আনন্দের ভাগ নিতে আনন্দ যোগাতে।

কি অসহ বেদনায় কাঁদে প্রাণ কিসের ব্যথাতে,
নাহি জানি। হায় বন্ধু, কোথা মম দীর্ঘ অবসর—
আমার গৃহের দ্বারে শীতরাত্রি বেদনা জর্জ্জর
মম নিরাবৃত দেহে ঢালিতেছে আঘাত তুষার
আসিছে সুষুপ্তি নিদ্রা, মুক্তি কোথা, কোথায় উষার
পুণ্য আগমনী বন্ধু? ব্যর্থ আশা মম সাধনার—
হারায়েছে অন্ধকারে; মম রিক্ত সে আরাধনার—
সম্পূর্ণ নৈরাস্য হেরি।

জন্ম-দৈন্য

শুনি জেগে ক্ষুধার বাঁশীতে
আমারে ডাকিছে মৃত্যু ভ্রূকুটীয়া নির্ম্মম হাসিতে।
আমার এ ক্ষীণদেহ করিবে যে অন্যায় পেষণ
হতভাগ্য ব্যথিতের রক্তে তার যে পরিবেষণ—
যুগ যুগ চলিয়াছে আজি তার অভিব্যক্তি নব—
আমারে বাঁচিতে হবে মৃত্যুমন্ত্রে আমি দীক্ষা লব।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি শুনি নিত্য সেই একরব,
লাঞ্ছিত জীবন-পাত্রে হেরি সেই বিষাক্ত আসব,
শুনি নিত্য এক বাণী।

মৃত্যুমুগ্ধ আমি পরিয়াছি
জীবনের আকর্ষণে যে কদিন রিক্ততায় বাঁচি
আমাকে চলিতে হবে কণ্টকিত বিসর্পিল পথে।
বিষধর অজগর দৃষ্টিহানে মোরে কোনমতে
দৃষ্টি-মুগ্ধ টেনে নেবে মৃত্যু-কৃষ্ণ গভীর গুহায়।

মম চারিপার্শ্ব ঘেরি ওঠে সাড়া তীব্র ভৎর্সনায়
কেন এত স্বেচ্ছাচার মিথ্যাময় ঘৃণিত পীড়ন,
কেন নিত্য নব এই জীবনের রুগ্ন নিষ্পেষন?
আমাদের শেষ রাত্রি সমাপন হোক্ শেষ ভোরে।

বিবেক কাঁদিয়া ওঠে ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে।
কেন বন্ধু ব্যর্থতার বেদনায় ব্যঙ্গ অভিনয়ে—
যাপিব সুদীর্ঘ নিশা রঙ্গমঞ্চে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে?
নিত্য নব ব্যথা পাই সহিয়া ক্ষতির প্রবঞ্চনা
যার পায়ে লুটাইনু, সে আমারে হানিল লাঞ্ছনা;
পথ-শ্রান্ত পান্থ আমি শক্তি হীন, কি বিপুল বলে
বাঁধিব অন্যায় মিথ্যা, অসীমার মরণ অতলে
লুপ্ত হ'য়ে যেতে চাই বাঁধিওনা আর স্নেহ ডোরে
বিদায় বিদায় আজি, পার যদি ক্ষমা কোরো মোরে।

কে করিবে ক্ষমা তোরে রে অবোধ কোথা পুণ্যদান
জীবনের প্রতিদিক ব্যাপি ওঠে আকাশ সমান
লাঞ্ছনার অপরাধ। না-না ক্ষমা নাই ক্ষমা নাই
কাহারে করিব ক্ষমা চলো বন্ধু, চলো আজ যাই।

হৈমন্তী পার্ব্বণ আজি ঘরে ঘরে তুলিয়াছে সাড়া।
শুধু মোর গৃহ প্রান্তে কাঁদে আজি সেই সর্ব্বহারা,
অশান্তির অতৃপ্তির পরিহাসে ব্যর্থ অভিনয়ে
এ জীবন ভরি' কাঁদে সব জ্বালা, সব গ্লানি স'য়ে,—
সমস্ত আনন্দ নিশা জাগি যারে করিল প্রার্থনা
সে এল না, এল তার জীবনের অসীম বেদনা।

যখনি জাগিয়া উঠি ঘুম ভাঙা নিশীথের শেষে,
কে বিরহী কেঁদে মরে সুর তার যায় ভেসে ভেসে।
চোখ গেল চোখ গেল কাঁদিল সে চিরদিন ভবি
আমিও কাঁদিব বন্ধু সব সুখ আনন্দ পাশরি।
প্রভাতে দেখিব দ্বারে হাসিতেছে সেই কৃষ্ণ হাসি—
জীবনের অভিশাপ, জন্ম-দৈন্য মম সর্ব্বনাশী।।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

রাত্রি (সনেট)

ওরে পাখী, জেগে ওঠ, জেগে ওঠ রাত্রি এল বুঝি;
ঘুমাবার কাল এল জাগিবার সময় যে যায়--
ওরে জাগ্, জাগ্ তবু অকারণে। রাত্রির ভেলায়--
কোন অন্ধ তিমিরের স্রোতে আসা নিরুদ্দেশে যুঝি'
হে বিহঙ্গ, দিক্‌ভ্রষ্ট নাহি হোয়ো--যেন পথ খুঁজি'
অবেলায়। এখনো সম্মুখে আছে ঝড়, আছে ভয়--
এখনো আনন্দ আছে—খুঁজিবার দুরন্ত বিস্ময়--
তবু অন্ধকার এল, দেখিলাম রিক্ত মোর পুঁজি।।

এখনো যায় নি অস্ত সূর্য্য মম ব্যথা আকুলিয়া
এখনো রয়েছে তার শেষ রশ্মি পাতায় পাতায়--
তবু অন্ধকার এল, এল মোর আনন্দ ভুলিয়া--
অনন্ত বেদনা সম রিক্ততার কঠোর ব্যথায়;

প্রতি পল্লবের বুকে জাগিল তিমির শ্যামলিমা
এ আমার স্বপ্ন নহে, এই কালো মোর মৃত্যুসীমা।।

(শ্রাবণ, ১৩৪৪)

অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার

রুবাই-গুচ্ছ

(ফার্সির ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে)

(১)

শত মসজিদে মেরামত করি কি আছে পুণ্যফল?
তার চেয়ে বড় একটি প্রাণীরো মুছানো অশ্রুজল!
একটি মুক্ত স্বাধীন জনেরে হৃদয়ে বন্দী করা--
তার চেয়ে বড় খুলে দেওয়া শত কয়েদীর শৃঙ্খল!

(২)

যে পথেই হোক--তোমারে যে খোঁজে ধন্য চরণ তার!
তব রূপ যার ধেয়ানের ধন--ধন্য ধরণ তার!
ধন্য সে আঁখি--অনিমেষ হয় তোমার আননে চেয়ে!
যে বাণী তোমায় করেগো বরণ--ধন্য স্মরণ তার!

(৩)

জ্ঞানের সীমায় গেছে যেই জন সেই তো জানে—
ব্রহ্মের সাথে ভেদ নাই তার মনে ও প্রাণে;
তাই যদি হয়, বল--"তুমি আছ আমি তো নাই"--
"আল্লার নাই শরীক"- ইহার এই তো মানে!

(৪)

পেয়ালা শরাব কি হবে আমার? তুমি-মদ
মোরে মাতাল করে!
আমি যে কেবল তোমারি শিকার, আর কোন্
ফাঁদ আমায় ধরে!
কাবা-ঘর আর মন্দিরে মঠে বৃথাই তোমায়
খোঁজে সবাই;
আমা-হেন জন যাবে না কখনো মন্দিরে মঠে
কাবার ঘরে।

(৫)

প্রেমের বাঁধনে একদিন যবে বাঁধিবে বন্ধুর পাশে--
জান্নাত পানে চাহিতে আঁখি যে ঘৃণায় মুদিয়া আসে!
আর, যদি ঠাঁই হয় গো সে দিন তুমি-হীন অন্যবাস--
কিছুই তফাৎ রবে না আমার স্বর্গ-নরক-বাসে!

(৬)

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরায়--দুষিওনা মোরে ভাই,
করিও না ঘৃণা--পেয়ালা ও প্রেম এক করিতে চাই!
সাদা-চোখে বসি যাদের সমাজে তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে বন্ধুরে মোর পাই!

(শ্রাবণ, ১৩৪৪)

ফেরদৌসী-বন্দনা

হাজার বছর আগে--ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি!—
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্তপ্রায় কাব্যরবিচ্ছবি,
ধ্বংস রাজ্য-রাজপাট--দাস বসে প্রভুর আসনে,
ধরণী মূর্চ্ছিতা যবে লোভ হিংসা রণোন্মাদ শঠতার নিষ্ঠুর শাসনে--
সেইকালে ওগো পুণ্যবান!
তোমার সাধনা-বলে জাগিয়া উঠিল হর্ষে কবেকার প্রাচীন ঈরান!
হোমারের কাব্যে যথা সঞ্জীবিত হয়েছিল য়ুনানী মণ্ডলী
পশ্চিম সাগর-কূলে,
পূর্ব্বাচল হিমালয়-মূলে
গঙ্গার তরঙ্গ যথা উঠেছিল একদা উচ্ছলি'
মহাভারতের গানে--
সেই মত তুমি কবি, একমাত্র তুমি সেই দিন
বাজাইয়া সপ্তস্বরা বীণ,
জাতির গৌরব-গাথা বিরচিলে গর্ব্বোৎফুল্ল প্রাণে,
আপনি হইলে ধন্য, ধন্য হ'ল স্বজাতি তোমার!

তোমার সে গীতচ্ছন্দে নেমে এল স্বর্গ হ'তে পিতৃ-পিতামহ
কিরণ-কিরীট শিরে, মূর্ত্তি মহিমার!
ঈরানের প্রতি কুঞ্জে প্রচারিল-মুগ্ধ গন্ধবহ
পৌরুষের দিব্য পরিমল;

প্রত্যেক পর্ব্বত-সানু, উপত্যকা, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রতল
বীরদাপে করে টলমল!
নিভৃত সে ছায়া কত বৃদ্ধ বিটপীর,
পথচিহ্নহীন কত তুচ্ছ নদীতীর
সহসা লভিল খ্যাতি তীর্থের সমান!
হে ফারসী কবি!
তোমার গানের তানে প্রাচীন পহ্লবী
প্রতিধ্বনি সম ঘোষে অতি দূর সিন্ধুর আহ্বান—
জম্‌শিদের ভগ্নস্তূপ প্রাসাদ-বিজনে
শোনা যায় মধ্যাহ্নের তন্দ্রাহীন কপোত-কূজনে
উদাস করুণ সেই পুরাতন শ্লোক—
প্রতিটি অক্ষরে তার বিস্মৃতির পুঞ্জীভূত শোক!
হেল্‌মন্দ-নদীতীরে সীস্তানের বালুকাপ্রান্তরে,
সুদুর্গম গিরিদুর্গ পরে,
একাকী যে বৃদ্ধ পিতা শ্বেত-শ্মশ্রু নরপতি জা'ল্
বীরপুত্র-পথ চাহি' নিরানন্দে কাটাইছে কাল—
তার সেই হৃদয়-বেদন
নবীন ভাষায় লভে অপরূপ রূপ চিরন্তন!

সহস্র বৎসর আগে জন্মেছিলে হে কবি অমর!
জন্মান্তর হয়েছিল তারো আগে—আরো এক সহস্র বৎসর!
জাতিস্মর ছিলে তুমি; তাই নিজকাল অতিক্রমি'
ক্ষণজীবী পতঙ্গের অভ্রভেদী আস্ফালন, দস্যুতার দম্ভে নাহি নমি'
ফিরাইলে দৃষ্টি তব শাশ্বত সে মানুষের পানে—
যে মানুষ ক্ষুদ্র নহে, সঞ্জীবনী-শক্তিসুধা পানে
আপন প্রাণের সত্যে যে মানুষ মহাবীর্য্যবান্—
হোক্ ভৃত্য, হোক্ প্রভু, শত্রুমিত্র যুবাবৃদ্ধ সবাই সমান!
—তার সেই পৌরুষেব প্রবল বন্যায়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি নিত্য ধুয়ে যায়!
হিংসা-প্রেম পাপ-পুণ্য—দুই চমৎকার!—
হে কবি, তোমার গানে এই মর্ম্ম বুঝিয়াছি সার।
সহস্র বার্ষিকী তব স্মরণ-বাসরে
আমরাও আনিয়াছি অর্ঘ্য তব তরে,
ঈরানের হে কবি-প্রধান!
তোমার কবরে আজ বাঙ্গালীও করে দীপ-দান!
এ দুর্ভাগা দেশ
অশেষ দুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার উদ্দেশ।

প্রাণ তার ধ্যান করি' মানুষের পৌরুষ-মহিমা,
পিতৃ-পিতামহে স্মরি' গড়িয়া লইতে চায় একখানি মানসী-প্রতিমা,
অতীতের ইতিকথা হ'তে
সঞ্জীবন-মন্ত্র লভি' ভবিষ্যের দুর্ণিবার স্রোতে
বেয়ে যেন চলি মোরা এক তরি—এক কর্ণধার,
আমার এ বঙ্গ যেন বক্ষে ধরে শাহ্‌নামা সম কণ্ঠহার!

(কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৪১)

জসীমউদ্‌দীন

কল্পনা বিলাস

এখন একেলা নীরব নিঝুম স্তব্ধ গভীর রাতি,
কার মুখখানি ধেয়ান করিছে জ্বালায়ে তারার বাতি!
সকল পাখি ত ঘুমায়ে পড়েছে একটি পাখির হায়
কি আজ হয়েছে, রহিয়া কেঁদে ওঠে বেদনায়।
একটি ফুলের চোখে ঘুম নাই, সব ফুল অচেতন,
মরণের মত একটি মনের কাহিনী যে নির্জ্জন!

এমন সময় করিবার মত কি কাজ রয়েছে আর,
নীরব নিথর দীরঘ রজনী অন্ত নাহিক তার।
আমি আজ হেথা প্রদীপ নিবায়ে আমার ঘরের কোণে,
মনে মনে যদি একটি মেয়েরে ভাবি বসে নির্জ্জনে--
একটি সে মেয়ে, কোন দিন কেউ দেখে নাই কোন দেশে,
সকল ফুলের মধ্যে লুকায়ে এসেছে সে ফুল ভেসে।

তারার মতন মুখখানি নয়, জোছনাজড়ান নয়,
কাঁদিলে ঝরে না মুক্তাবিন্দু হাসিলে ভোর না হয়।
একটি সে মেয়ে অতি সাধারণ, অসাধারণ যে তাই,
ফুলের মতন চাঁদের মতন তারার মত না চাই।

সাধারণ মেয়ে মনে হবে যদি না পড়িত মোর চোখে,
এমন জোসিনী বনেতে শুকাত না জানিত কোন লোকে।
এমন একটি মেয়েরে বসিয়া ভাবি যদি এই রাতে,
নয়নে আবার ঘুম নাই মোটে কি আর হইবে তাতে!
এমনই একটি মেয়ে যেন আজ চাঁদের জোছনা জলে,
সীনান করিয়া এলোথেলো মেঘ জড়ায়েছে গায়ে ছলে;
শিশির ফোটায় রঙিন শাড়ীর রাঙা ছায়া দেখে দেখে
চলিতে চলিতে পথ ভুলে যায় ফুলদল পায়ে লেগে।

(বৈশাখ, ১৩৪৩)

বন্দে আলি মিঞা

ধরা দিলে দু'হাতে আমার

আঁধারের বক্ষ চিরি' মেঘে মেঘে জাগে গরজন
বেগে ধায় অশান্ত পবন।
অসীম শূন্যতা ভরি কলস্বরে ঝরে বৃষ্টিধারা
গতিময় বাধাবন্ধহারা।
নীরন্ধ্র জমাট মেঘ নভপটে করিয়াছে ভিড়,
উতলা সুরভি বাহি আসে হেথা পূবালী সমীর,
অশ্রান্ত ঝিল্লির ধ্বনি কানে এসে করিছে আঘাত,
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে রাত!

সেই জলধারা মাঝে আপনা পাসরি ঘুম-ঘায়
এলায়িত শুভ্র বিছানায়
অতনু শিহর তনু তব; ভাঙাইনু ঘুম,
ফুটাইনু মনের কুসুম।
অন্তরে বাহিরে মোর উঠিলো সে কী যে কলরব!
অঙ্গ বাহি এলো ঝড়--দেহে জাগে মধু-উৎসব!
সবার অলক্ষ্যে তুমি ধরা দিলে দু'হাতে আমার,
তুমি-আমি--কিছু নাই আর!

(আশ্বিন, ১৩৪৩)

আমার ধরিত্রী কাঁদে

ধূসর কোমল সন্ধ্যা প্রশান্ত নির্জ্জন
অরণ্যের মৃদু শ্বাস ধ্বনিছে আকাশ,
নিস্তব্ধ গহন সুখে শিহরায় মন
প্রসন্ন দিবসে মোর গাঢ় অবকাশ!
একান্ত বিজন ঘরে নীরব শয্যায়
তোমারে পেয়েছি প্রিয়া বক্ষে সুনিবিড়;
সমুদ্রের বালুতটে আলস বেলায়
বারম্বার রচি মোরা ক্ষণিকের নীড়।
দিবা শেষে অকস্মাৎ ভেঙ্গে যায় ঘোর
টুটে যায় যৌবনের প্রগাঢ় স্বপন—
নেমে আসে গণ্ড বাহি তপ্ত আঁখি লোর
বিষণ্ণ বিরহ আনে ক্ষণিক মিলন
আমার ধরিত্রী কাঁদে দুরন্ত ব্যথায়
সন্ধ্যার অরণ্যে মন করে হায় হায়।

(পৌষ, ১৩৪৩)

ফোটে ফুল—ঝরে দল

শীতের সন্ধ্যারাতি হিমেলা বাতাস বয় চারিপাশে কুহেলী তিমির
এমন আলস বেলা জীবনের তটে মোর কতবার করিয়াছে ভিড়,
কতবার এলো আর কতবার গেল হায় অকারণে গেল দিন চলি
কভু ফুল ফুটিয়াছে ঝরে গেছে কভু তাহা, আছে তার স্মরণ কেবলি।
বেশিদূর নহে সে তো একদা শরৎ দিনে তোমারি গো লভি পরিচয়
হাসি দিয়ে কথা দিয়ে নয়নের ভাষা দিয়ে দিনে দিনে করেছিলে জয়।
এতটুকু প্রীতি তরে একটু কথার লাগি চাহিতে গো দুটি আঁখি তুলি
তোমার হাসির সনে মিশেছে আমার বাণী সে কি তুমি গেছ আজ ভুলি!
আদিম বিরহী নারী তোমার মাঝারে হেরি গুমরিয়া কাঁদে নিশি দিন
আমার মুখের পানে অনিমিখ দিঠি দিয়ে চেয়ে আছো তৃপ্তি বিহীন।
নিরাশে ফিরিয়া গেছে ঊনিশ ফাগুন হায় তব দেহ-দুয়ারের পাশে

তাহারি ক্ষুধার ছায়া ডাগর নয়নে তব তাই বুঝি ঘনাইয়া আসে!
কথার পরশ দিয়ে যাহার হিয়ার মেঘ সরায়েছি হেলা ফেলা করি
অশেষ দাহন তার ভেবেছিনু মনে আমি দুই হাতে দেবো অপসরি।
তোমারে ঘেরিয়া তাহে বুনেছি সোনার জাল স্বপনের মায়া-মধুপুর
তোমার মাঝারে শুনি নিয়ত ধ্বনিত হয় অজানা কী কুহেলীর সুর;
লভিব তোমারে আমি জানি মনে প্রিয়তমা--আছো লয়ে বরণের ডালা
একদা মিলিব মোরা কোন্ বা সাগর-তীরে--গলে মোর দেবে ফুলমালা।
অতি অনায়াসে রাণী লভিব তোমারে আমি--হবে তুমি একেলা আমার
তোমার মনের দ্বারে অকথিত ব্যথা মোর অশ্রুর দেবো উপহার;
জীবনের পটে তব প্রথম পথিক আমি আঁকিলাম মোর পদলেখা
সে-লেখা তোমার মনে এঁকেছে কী দাগ কভু ভেবে দেখো নিরজনে একা
আমার ছোঁয়ায় তব ভেঙেছে মনের ঘুম--জাগিয়াছে কামনা-কমল
মিথ্যা নহেক ইহা বুকে মুখে দুই চোখে সে স্বপন হয়েছে উতল।
যে-সিন্ধু জাগায়ে দিনু বুকে লয়ে মরুতৃষা বিন্দু বারি পাইনিকো তার
জানি মনে একদা সে কত বা সুজলা ভূমি জনপদ করিবে সংহার।
নদীতটে দাঁড়াইয়া শূন্য বুকে কাঁদি হায় কাঁদি আজি নিরালা ভবনে
ভুবনের তরে তুমি--মোর তরে শুধু জ্বালা--কারে কহি এ ব্যথা কেমনে!

আমারে করিও ক্ষমা ক্ষণিকের সাথী মম--ক্ষমা কোরো মোর অপরাধ।
নিমেষে করেছি ভুল--একটি ভুল সে মোর বহুদিন ছিলো তার সাধ।
তোমাদের লয়ে প্রিয়া খেলিতে এমন করি ভালো লাগে—ভালো খুব লাগে
পুরাণো ছাড়িয়া নিতি নবীন বন্ধু সনে খেলিবার সাধ প্রাণে জাগে।
সে-দিন সাঁঝের কথা পড়ে কি তোমার মনে--তুমি ছাড়া জানে কেবা আর
তুমি আর আমি ছিনু--তুমি ছিলে প্রিয়তমা সুনিবিড় পাশেতে আমার।
তোমার আমার চিতে পোউষ সন্ধ্যা যেন জেগে থাকে যুগ যুগ ধরি
আমরা জীবনে শুধু সান্ত্বনা হে মায়াবী আছো মোর সারা মন ভরি।

(আষাঢ়, ১৩৪৪)

সুফিয়া এন্. হোসেন

চাহি না তোমারে

তোমারে হেরিনু যবে প্রিয়া--
চেয়েছিলে নীল নভে মৃগ আঁখি দিয়া!
সুশুভ্র গুণ্ঠনখানি তুলে দিয়ে কালো কেশ'পরি
চেয়েছিলে নীল নভে, বুঝি সখি আপনা বিসরি.
বদ্ধাঞ্জলী দুটী তব পরস্পর হংস-কণ্ঠসম
জড়ায়ে পড়িয়াছিল স্নিগ্ধ মনোরম।
বাহুর বাঁধনে তব লাজ মানের স্বর্ণের বন্ধনী--
বাজিতে ভুলিয়া গেছে তাই রিণি-ঝিনি ঝিনি-রিণি:
তোমার কাজল আঁখি নীলাকাশ চেয়ে মনোরমা--
নিজে তা জানো না প্রিয়তমা!
ছিল না আকাশে তবে মেঘ সমারোহ,
ছিল নাকো বর্ণ বিচিত্রতা;--
অসীম আকাশ জুড়ে ছিল শুধু শান্ত উদারতা,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন ক্ষণ তোমা হেরি থমকিয়া ছিল,
প্রকৃতি আপনা রূপ যত পায়ে উজাড়িয়া দিল!
মধুর! মধুরক্ষণে হেরিলাম তোমার মূরতি,
আমিও উজাড়ি দিনু যত মোর ছিল প্রেম-প্রীতি।
চাহি না তোমারে প্রিয়া--জানি নাকো কার গৃহ আলো
করিয়া বিরাজ তুমি, মোর চোখে লাগিল যে ভালো,
তোমার তনুর রূপ নয়নের অপূর্ব্ব সুষমা--
সেইটুকু মনে থাক্ চাহি না তোমারে, প্রিয়তমা!

(আশ্বিন. ১৩৪৩)

দরদী মাতা

নয়নে তোমার নামিয়াছে ঘুম; জীবনের দিন শেষে,
এ কী ঘুম মাগো! আর কত! জাগো, ডাকি যে আমরা এসে।
আমরা তোমার স্নেহ ছায়া তলে লভিতে আসিয়া ঠাঁই--
হেরিলাম এ কী! সব আছে, শুধু তুমি নাই-- তুমি নাই!
কর্ম্ম যে তব জীবনের সাথী, সত্য আছিল ছায়া--
সবি রয়ে গেল, কী করিয়া তুমি ভুলিলে তাহার মায়া!
সন্ধ্যা হয়নি, ফুরায় নি কাজ--কত কী রহিল বাকী--
মৃত্যুর সুধা পিয়াইল তোমা বেদরদী কোন সাকী?
গৃহে কাঁদে তব অসহায় মাতা, পথে কাঁদে সন্তান,
আমরাও কাঁদি, দিয়েছ মোদেরে তব গুণ ঋণ-দান।
হে জ্ঞানদা! তব জ্ঞান-আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়া কত
গৃহের আঁধার করেছিলে নাশ, তারাও বেদনাহত।
বাহিরেরে তুমি বেঁধেছিলে ঘরে, রচেছিলে যেই নীড়
সৃজিতে সেখানে মমতা মধুতে গৌরব সৃষ্টির
তব সন্তানে সেবা কর্ম্মের ব্রত শিখাইলে তুমি;
যার লাগি আজি পুলকে দুলিছে জননী জন্মভূমি।
তোমা-হারা হয়ে 'বুলবুল' আজি ভুলিয়া যে গেল গান--
'নাহারের' নাই দীপ্ত সে শোভা, 'বাহারও' হয়েছে ম্লান!
শত অনাথের মাতা হয়েছিলে, তাদের কাঁদন হেরি
আকাশও আজিকে মলিন হয়েছে রহিয়াছে মেঘ ঘেরি।
মহীয়সী মাতা! তব বন্দনা গান কি গাহিব আজ।
কণ্ঠ রুদ্ধ তোমা-হারা ব্যথা ভরিয়াছে হিয়া মাঝ।
বেহেশ্‌তে তুমি বাঁধিয়াছ বাসা আকাশে ফুটেছ তারা,
সেথা হতে তুমি বর্ষণ করো তোমার আশীষ ধারা।
তব প্রিয় পথ ধরে যেন চলি, তোমারে স্মরিয়া নিতি,
জান্নাত হতে এ আশীষ তুমি পাঠায়ো মাখায়ে প্রীতি।
আজিকে তোমার স্মৃতিসভা মাঝে ফাতেহার সাথে বলি,
জান্নাতী মাতা! ল'হ আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলী!

(বৈশাখ, ১৩৪৩)

"ভাল যদি তুমি নাই বাস"

ভালো যদি তুমি নাই বাসো মোরে
কী করিয়া তবে জানো--
তোমার লাগিয়া থাকি উন্মন
নিতি নিতি মাগি তব দরশন
তুমি কৌতুকী আমারে কাঁদাতে
বিরহ ছলনা আনো।

তুমি যদি মোরে নাই চেন তবে
কী করিয়া দাও আনি
নিশীথ গগনে শশধর হাসি
শান্ত প্রভাত! ভালো যাহা বাসি
ঘন নিদাঘের অবকাশ ভরি
স্বপনের মায়াখানি!

নাই-ই যদি তুমি চাও মোরে আজ
তবে কেন আজও দানো
আমারে তুষিতে সুমধুর সাঁঝ
ভুলাইয়া দিয়া যত মোর কাজ
সঞ্চারি দাও সাথে সাথে তার
আমারে ভুলাতে গানও!

ভুলে যদি ভালো থেকে থাকে তুমি
তব কেন আর আজি
আমারই তরে সৃজেছ যে সুর
কপোত কাঁদানো বিধুর মধুর
তোমার বাঁশীতে সেই সুর কেন
আজিও উঠিছে বাজি!

ওগো লীলাময়! ছলনা লীলায়
ভুলাতে পারো না মোরে;
আমি জানি তব নয়নের ভাষা
ও বাঁশীর সুর! তব যাওয়া আসা,
ওগো অভিমানি! দূরে থাকো তুমি
শুধু অভিমান ভরে।
জানি অভিমানি! এ ছলনা লীলা
ভুলে যাবে একদিন!
ডাকিল রে মোরে সেই সুসময়
আরো সুনিবিড় হবে পরিচয়,
তুমি মোরে ভালোবাস না, একথা
বলিবে না সেইদিন।

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

বাইসাইক্‌ল্‌

বাইসাইকেল জীবন যাদের চেন কি তাদের ভাই?
দেখেছ তাদের দুই চাকা'ওলা প্রাণ?
দ্বিপ্রহরের পিচঢালা পথে করুণ ঘণ্টাধ্বনি
শুনেছ কখন সহসা পিছন ফিরি?
মনের দীনতা ক্ষুধার তাড়না যাদের জীবন ভাই
অবিরাম চলে চাকার মতন ঘুরি,
দীর্ঘশ্বাস আর বেদনা-বিলাপ বাজে বিকৃত ছাঁদে ঃ
সকল পথিক পথ ছেড়ে দিয়ে চলে।

ট্রাম চলে যায়,--ট্যাক্সি ও কার, দোতালা বাসেরা চলে,
পাদপথে চলে কত মানুষেরা ভাই,
চেনা ও অচেনা সকল মুখেরি কিছু পরিচয় জানি,--
চাকার মানুষে চেন কি তোমরা ভাই?
সেই মানুষের চোখের জলেতে ট্রামের রাস্তা কাঁদে,
ব্যথার মরুতে নিরাশার প্রেত নাচে,--
সেই মানুষের বুকের রক্তে পিচের রাস্তা গলে,
কত মানুষের পদাঘাত আঁকা পড়ে।

সেই মানুষেরে দেখিয়াছি আমি--চাকা দুটি আছে সাথে :
মেঠো পথে যেতে রাত্রির চাঁদ ওঠে ঃ
চোখের জলেও জোছনা-স্বপন,--বেদনাও ওঠে গেয়ে,
বাতাসের গানে সঙ্কেতধ্বনি বাজে।
তখন দেখেছি সেই মানুষেরে। আর কহিয়াছি ডেকে ঃ
প্রাণের ঠাকুর, এই চায় মোর প্রাণ ঃ
বাসাইক্‌ল্‌ দিতে হয় দিও, দিও বেদনার 'বেল',
দিও জোছনা, মাটি-পথ, আর গান।

মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ এম.এ., বি.টি.

স্বপ্ন-ভঙ্গ

সেদিন স্বচ্ছ জ্যোছনা নিশীথে
খুলি' বাতায়ন তব,
দখিণার বুকে পুলক-শিহর
জাগাইয়া অভিনব,
তনু দেহখানি আলসে এলায়ে,
গ্রীবাখানি তব ঈষৎ হেলায়ে,
দ্রুত চম্পক আঙ্গুল চালায়ে
ব্যাকুল, বকুল ফুলে
গাঁথিতে ছিলে গো মোহন মালিকা,
--বুঝি বা মনের ভুলে।

অদূরে দাঁড়ায়ে অপলক চোখে
পুলক-বিভোল কবি,
আঁকিতে ছিল সে মানস পটেতে
কল্প-লোকের ছবি।
সহসা বিবাগী দখিণা বাতাস
ছাড়িল মদির সুরভি নিশাস,
দোলাইল তব বক্ষের বাস,
--বকুল মালিকা হাতে,
কি জানি কেন গো পাগল জাগিল
উতলা জ্যোছনা রাতে।

ফুলাহত কবি দু'হাত পসারি'
কহিলঃ কিশোরী বালা,
জানি দিতে তব প্রিয়ের গলায়
গেঁথেছে বকুল-মালা,
আজিকে উতলা রজনীর বুকে
জাগে চঞ্চল ব্যথা ভরা সুখে,
--জীবন পেয়ালা একটী চুমুকে
উজাড় করিতে চায়,

দুঃসহ এই বেদনার ক্ষতে
রাখ তব মালিকায়।

সহসা চকিতা হরিণীর মতো
ডাগর নয়ন দ্বয়
তুলিয়া ধরিয়া কহিলে নিঠুরা ঃ
এ কথা জগৎময়
কেবা নাহি জানে মানুষের মন
পাইতে যাহারে হয় উন্মন,
তার বুকে জাগে সুদূর স্বপন,
--সে গাহে আনের জয়;
স্বপন-বিলাসী হায় গো উদাসী,
এ মালা তোমার নয়।

হঠাৎ তোমার নয়নের তলে
ভাসিল বেদনাময়,
ব্যথিত কবির করুণ চাহনী;
কী যেন জাগিল ভয়
অন্তরে তব বেদিল্ বালিকা,
দু'হাতে সহসা বকুল-মালিকা
ছিন্ন করিলে;--অগ্নির শিখা
কবির পরাণ দহে;
চরণে দলিত ফুল দল কহে--
'এ মালা তোমার নহে।

নির্ব্বাক কবি ছবির মতন
নীরবে দাঁড়ায়ে রহে,
হিয়া খানি তার নিপীড়িত হয়
বেদনা কালিয় দহে।
বুক ভরা কথা চোখের ধারায়
নিঃশেষে বহি' আপনা হারায়,
উদাস তাহার চোখের তারায়
ব্যথার বাদল ছায়;
সে কোন্ বিরহী শুধু রহি' রহি'
হিয়া তলে মূরছায়।

কল্পলোকের স্বপন-বিলাসী
সহসা মাটীর ঘায়

মূর্চ্ছিত; তার জনম লালিত
স্বপন ভাঙিয়া যায়।
নতুন জীবনে নয়ন তুলিয়া
হিসাবের তার খাতাটী খুলিয়া
দেখিল সে হায়, কখন ভুলিয়া
সকলি করিয়া দান,
আজি সে ভিখারী--নিঃস্ব কাঙাল
লাঞ্ছিত হতমান।

রিক্তের ব্যথা তুমি বুঝিলে না
হায় গো নিঠুরা বালা!
ধূলা মাখা পথ আপন ভাবিয়া
তার গলে দিল মালা।
ব্যথিত পথিক দিবসে নিশায়
তাই সুরে তার আগুন মিশায়,
চলে--আর চলে পথের নেশায়
কোথায়--সে নাহি জানে,
তুমি জানিলে না হে অভিমানিনি,
কী ব্যথা তাহার প্রাণে।

(আশ্বিন, ১৩৪৪)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি.এ.

উতলা রজনী

আজ রাতে সখি জোছ্না ঝরিছে মাঠের পরে,
জোছনা ঝরিছে হাওয়ায় দোলান' ঝাউয়ের শাখে,
মুচ্‌কি হাসিয়া চাঁদ উঁকি মারে মেঘের ফাঁকে--
কালো আর আলো কোলাকুলি করে পুলক ভরে।

সুন্দরী ধরা রূপালী আলোর বসন পরে,
সারা দেহ তা'র শিউলি ফুলের সুরভি মাখে;
পথ-তরুতলে কুসুমগন্ধ ঘুমিয়ে থাকে--
উতলা পবন নিয়ে যায় তা'রে সকল ঘরে।

আজ রাতে মোরা ঘুমাব না সখি জাগিয়া র'ব,
ছিপ্‌ছিপে্‌ তব হাতখানি দাও আমার হাতে;
ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কানে কানে দোঁহে কথা যে ক'ব--
মনে মনে শুধু স্বপন রচিব কথার সাথে।

বন-মর্ম্মর শুনেছি গোপন মনের মাঝে,
উতলা রজনী; আজ কি মোদের ঘুমান সাজে?

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)

সুফী মোতাহার হোসেন

স্বপ্ন

আমার যৌবনস্বপ্নে যেই স্বপ্ন মিশেছে গোপনে
যে আনন্দ-বেদনায় প্রাণ-পুষ্প শিহরে বিকশি'
যে-সঙ্গীত গূঢ়ভাবে মর্ম্মে নিত্য উঠিছে উছসি'
ভাবাবেশে সর্ব্বঠাঁই যেই রূপ নেহারি নয়নে,—
সেই রূপ সে-সঙ্গীতে সে-আনন্দ-বেদনা-বন্ধনে
সে-স্বপ্ন-প্রবাহে ভাসি' চলিয়াছি যেথায় রূপসী--
মোর সর্ব্বজনমের লীলাময়ী একক প্রেয়সী
বিরহের মন্ত্র জপি একা রহে অলকা ভবনে।

স্বপ্নসম হেরিতেছি পথখানি বিস্তৃত উদার--
যে-পথ চলিয়া গেছে প্রেয়সীর হেম-স্বর্গ পানে
যে-পথের প'রে কাঁপে গুপ্ত গূঢ় সূক্ষ্ম ইশারায়
ললিত আভাসগুলি সে মায়াময়ীর; শুনা যায়
অপূর্ব্ব সঙ্গীতরাশি অপূর্ব্বসুন্দর ছন্দে তানে;
গভীর রহস্যরাশি দোলা দেয় স্বপ্ন-পারাবার।

শাহাদাৎ হোসেন

আমার যৌবন

আমার যৌবন নহে ক্ষণিকের বসন্ত-স্বপন—
দু'দিনের হাসি-গান রাগ-রঙ্গে কল-গুঞ্জরণ।
দক্ষিণের দুরন্ত মায়ায়
মুঞ্জরিত মালতীর হিন্দোল-দোলায়
সবুজের রূপছত্রে ফুটে যে যৌবন--
বঞ্চিত স্বপন;--
পাপিয়ার কলকণ্ঠ ধারে।
চন্দ্রিকার শীতল বিথারে
লাস্যলীলা-মধুকরী নগ্নিকার নন্দিত বাসরে
উছল উচ্ছ্বাসে জাগে যে-যৌবন লাবণ্য-সায়রে;--
সে নহে যৌবন মোর--নিমেষের আনন্দ-বিলাস
ঋতুচক্র-আবর্ত্তনে কেলিকুঞ্জে কলিকার প্রকম্প বিকাশ।

আমার যৌবন--
সে যে নিত্য চিরন্তন,
মানসের কল্পদলে বিচিত্র মায়ায়
অনন্ত বসন্তে জাগে সান্দ্র নিরালায়
সে-যৌবন ফুটে আছে প্রকৃতির পত্র-পুষ্পে কলিকা-পল্লবে
দক্ষিণের লীলায়িত মধুস্নিগ্ধ ছানিত সৌরভে।
তাঁ'রি রাগে সঙ্গোপনে
ঋতুলক্ষ্মী মঞ্জরী-ভূষণে
রূপ-পুষ্পে সাজাইয়া বরণের ডালা
রজনীগন্ধায় গাঁথে অভিসার-মালা।
তাঁ'রি সে সঙ্গীত গায়
গতিভঙ্গে চঞ্চল লীলায়
কলনৃত্যে নির্ঝরিণী বনান্তের শ্যামল ছায়ায়
অবিরাম ঝঙ্কার-ধারায়।
অনন্তের নীলান্ত বেলায়
ইন্দ্রধনু-রেখায় রেখায়
রবি-চন্দ্রে তারকার ফুলে
আমারি যৌবন দুলে
অন্তহীন বসন্তের বিচিত্র স্বপনে
নিখিলের রূপকেন্দ্রে কম্প্র শিহরণে।

(মাঘ-চৈত্র--২য়, ১৩৪১)

বেগম নুরুন্ নীহার

সর্ব্বহারা

চারিদিকে কত আলো কত হাসি গান
তবুও কাঁদিছে কেন আমার পরাণ
কাঁপিয়া উঠিছে কেন হৃদি ক্ষণে ক্ষণে
অতীতের স্বপ্ন কথা কেন পড়ে মনে।।
সবারে হারায়ে আমি ধরণীর বুকে
ঘুরে মরি একেলাটী ক্লিষ্ট মন দুখে,
দিকে দিকে এত হাসি এত খেলা গান।
মোর কাছে কিছু নয়--শ্মশান সমান।
আর কিছু লাগে নাকো ভালো
তুমি শুধু প্রিয় মোর আঁধারের আলো।।
একদিন সবি ছিল আজ কিছু নাই
সব হারা আজি আমি ভিখারিণী তাই।
মোর বুকে ধূ ধূ জ্বলে সাহারার বালি
শীতল করিবে কেবা মধু-বারি ঢালি?
দাব-দাহ বুকে ল'য়ে বসে আছি আমি
জানিনা পোহাবে কবে মোর দুখ-যামী।।
একদিন মোরে সবে বেসেছিল ভালো
মরমের অমবায় জ্বেলেছিল আলো।
ফিরে আসে সেই স্মৃতি তাই মন-মাঝে
ব্যথার রাগিণী চির করুণায় বাজে।
জগতের এই হাসি এই খেলা গান
একদিন মাতাইত আমার পরাণ।
আজ তাই বারে বারে পড়ে মোর মনে
হয়ত করেছি ভুল জীবনের ক্ষণে।।
উপেখার দিঠি লয়ে চেয়ে থাকে সবে
ওগো প্রিয় বল তুমি তুলে নেবে কবে?

(আশ্বিন, ১৩৪৪)

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

উচ্চৈঃশ্রবা

বন্ধুর গিরি তুঙ্গশৃঙ্গ উল্লম্ফনে লঙ্ঘি' চলে
অশ্ব দুঃসাহসী,
অশ্ব যেন সে উচ্চৈঃশ্রবা ক্ষুরে ক্ষুরে তার বহ্নি জ্বলে
গতি বেগে উল্লসি,'
চলে অশান্ত অবিশ্রান্ত ঊর্দ্ধলোকে,
সূর্য্য চন্দ্র তারা দেখে তারে মুগ্ধ চোখে,
দিবা-শর্ব্বরী লয় পায় তার চরণতলে--
পলে পলে পড়ে খসি!'
ঘাড়ের কেশরে দোলে বিদ্যুৎ, নীল চোখে নীলকান্তমণি.
উচ্চ পুচ্ছ জালে
মেঘল ধূমল কাল-বৈশাখী প্রলয়-পবনে উঠিছে ধ্বনি',
নিশাসে অনল ঢালে।
দুটি করে তার রশ্মি পাকড়ি' অশ্বারোহী--
আমি ছুটে চলি অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ী,
পুলকে শিহরি' শুনি ক্ষণে ক্ষণে হ্রেষাধ্বনি,
দুলে উঠি তারি তালে।
পাহাড়ের পরে পাহাড় ছাড়াই. ভেদ কোরে চলি অকূল গিরি--
শৃঙ্গ তরঙ্গিত;
ভয়াল করাল কত গুহা আর কত গহ্বর ঘুরিয়া ফিরি--
কত পথ বঙ্কিত।
চলিতে চলিতে সহসা আমার ক্লান্তি আসে,
সিক্ত স্বেদের স্রোতের ধারায় এদেহ ভাসে,
প্রতি নিশ্বাসে প্রাণ বুঝি যায় বক্ষ চিরি'--
যন্ত্রণা স্পন্দিত!
তুরঙ্গ মোর তবু যে থামে না, ছুটে চলে বেগে উল্কা সম,
মানে না সে মোর বাধা,
নিম্নে গহন গহ্বরদল গভীর গভীর গভীর তম,
ঊর্দ্ধ চূড়াতে বাঁধা।
ভয়ে বিস্ময়ে অসহায় এক শিশুর মত
আমি ব'সে থাকি কামনা-বাসনা-ভাবনাহত,
জানি না কোথায় ছুটে চলে মোর এ দুর্দ্দম--
কোন সন্ধানে সাধা।

শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, (একটি vision হইতে--ধ্যানে)
পণ্ডিচেরী। (শ্রাবণ -আশ্বিন--১৩৪১)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সত্যকার কবি তুমি, মর্ম্মবাণী তব
সবার অন্তরে তাই পশে অনায়াসে;
কবিচিত্ত বিগলিত অন্তঃসলিলা সে
বাধার ফাটলে তার গতি অভিনব,
ভাষার বিচ্ছেদে নাহি মানে পরাভব
স্বয়ংপ্রভা দীপ্তি তার অপূর্ব্ব আভাসে
অলক্ষ্যের ব্যক্ত করে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ব্বাসে,
অজানা সঙ্গীতে ফোটে প্রিয় কণ্ঠরব।

তুমি আজ গেছ নিভে মাটির প্রদীপে,
তোমার অমর শিখা মোদের অম্বরে
আপনার অনির্ব্বাণ দিব্য দীপ্তি ধরে,
ভঙ্গুর বর্ত্তিকা হতে আলোকের নীপে
আজি তুমি দীপ্যমান কবি ইক্‌বাল,
আ-দিগন্ত বলয়িত জ্যোতিশ্চক্রবাল।

ইমাউল হক

যারে নাহি প্রয়োজন

যদি চাহ তুমি, তবে হোক তাই--আমি চলে যাই দূরে
থাক তুমি থাক মগ্ন হইয়া তোমারি আপন সুরে।
বান্ধবীদের নিয়া
থাক আনন্দে, অসুখী তোমারে করিতে চাহিনা প্রিয়া।

তোমারে ত' আমি বাসি নাই ভালো আমার নিজের লাগি'
জেগেছিল সাধ করিতে তোমারে একটু সুখের ভাগি।
তোমার জীবনে নেমেছিল ঢল কালো অমাবস্যার--
আমি গেনু সেথা প্রদীপ লইয়া, খুলিয়া রুদ্ধ দ্বার।
সে-আলো তোমার যদি আরবার অসহ্য লাগে চোখে
বলে দাও সোজা, গ্লানি সঞ্চয় করো না মনের লোকে।
ভাবিছ কিসের তরে?--
আশ্রয়-ঠাঁই আছে গো আমার আমারি এ অন্তরে।

হৃদয়ের সাথে করিয়া আবার এ কি মহা প্রতারণা
আমার চাইতে বড় হলো তব ঘরের গৃহিণীপনা!
বুঝেছি, তোমার মধু নাই আর মরমের মৌচাকে
সুরভি-মদির ফোটেনা কুসুম সেথা আর লাখে লাখে।
খেদ নাই মোর, বাজিয়া উঠুক আজি বিদায়ের বাঁশী
যদি সেই সুর তোমার বেদনা নিঃশেষে দেয় নাশি'।
যারে নাহি প্রয়োজন
দুয়ারে তোমার কোনদিন আর আসিবে না সেই জন।

(শ্রাবণ, ১৩৪৪)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি.এ.

ভাবি আমি তাই

কি যে সুখ, কি সে সুখ--ভাবি আমি তাই!
যাহা চাই, যদি পাই, বেড়ে যায় লোভ;
অন্তরে নিয়ত জাগে বাসনার ক্ষোভ;
চারিদিকে ছুটে আঁখি দেখি কিবা নাই!
পরস্পরে দেখি সুখী নিজে দুখী জানি,
পরের বাহ্যিক ধনে নিজেরে মাপিয়া,
কাটাই কত না দিন বিজনে কাঁদিয়া;
"নির্ব্বোধ" বলিলে কিন্তু নাহি তাহা মানি।
না হয় সন্তোষ আনি মনের মাঝারে
চাপা দিয়ে রাখিলাম অসন্তোষ ভার
স্বভাব বিনাশ করা অভাব ক্ষুধার
যোগাইতে খাদ্য ভার কহিব কাহারে?
উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে জ্বলন্ত অনল
নিভে কভু চাপা দিলে শুষ্ক কাষ্ঠ দল?

(বৈশাখ, ১৩৪৪)

আলতাফ হোসেন হালী

মসদ্দসে হালী

অনুবাদক ঃ হুমায়ুন কবির

[কবি আলতাফ হোসেন হালী উর্দ্দু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি মসদ্দসে হালী, এক যুগে [illegible] মুসলমান, সোণার কাঠির স্পর্শে যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে রূপকথায় রাজকুমার। হালী ছিলেন স্যার সৈয়দের সহকর্মী। [illegible] সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করায় সৈয়দ আহমদ উত্তর দিয়াছিলেন যে আলীগড় আর কিছু করুক বা না করুক [illegible] হালীকে সৃষ্টি করিয়াছে।

সাহিত্যিক হিসাবেও হালীর স্থান খুব উচুতে। ফারসী আরবী ভারাক্রান্ত দুর্ব্বোধ্য উর্দ্দু ভাষাকে তিনিই রূপান্তরিত করিয়াছেন। [illegible] হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ চয়নে উর্দ্দু ভাষার বেগ, গতি এবং প্রকাশ ক্ষমতাকে নানা দিক দিয়া তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন। দেশের এই যুগসন্ধির সময় মসদ্দসের অনুবাদ করিয়া কবি হুমায়ুন কবির বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হালীর তীব্র বিদ্রূপ ও সমালোচনা, তাঁহার দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়, উদার [illegible] দৃষ্টি জাগরণ মুহূর্ত্তে বাঙ্গালীকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হালীর কাব্যের প্রধান গুণ ক্ষিপ্রতা। অনুবাদে তাহার প্রবেশ যে প্রায় অসম্ভব, অনুবাদক সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। অনুবাদ [illegible] অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, রূপান্তর করিবার প্রয়াস পায় নাই। ইহাকে অনুবাদ না বলিয়া ভাবানুবাদ বলাই সঙ্গত।]

১

শিষ্যেরা সুধাল আসি, সুধী বোকরাতে,
"নাহি থাকে বাঁচিবার একবিন্দু আশা,
কি আছে এমন রোগ?"--কহিলেন জ্ঞানী,
"খোদার বিধানে বিশ্বে নাহি হেন রোগ
প্রতিকার নাহি যার। তবু বুদ্ধি দোষে
পীড়ারে সামান্য গণি, হাকিমের কথা
অবহেলা করি' যদি চলে কোন রোগী
আপন খেয়াল মতে, নাহি যদি মানে
আহারে ঔষধে কোন নিষেধ বিধান,
সে অভাগা ডেকে আনে মৃত্যু আপনার।'

২

তেমনি যে ভাগ্যাহত জাতি আছে আজো
তীর হতে বহু দূরে, ভিড়ে নাই কূলে
জীবন-তরণী যার প্রবল ঝঞ্ঝায়,
--আস্ফালিয়া গরজিয়া উঠে উর্ম্মিরাশি
সে তরীর নাবিকেরা তারা যদি রহে
সুখস্বপ্নে, নাহি চাহি চারিদিকে যেই
রণরঙ্গ, প্রকৃতির উন্মাদ তাণ্ডব--
সে তরীর ঝঞ্ঝামাঝে নাহি পরিত্রাণ।

৩

সে জাতি ভাগ্যাকাশ গহন আঁধার।
বিপদের কালো মেঘ ছেয়েছে গগন,
দুর্য্যোগের ঘন-ঘন বিদ্যুত বিকাশ
ভাতিছে আঁধার মাঝে। পূরব পশ্চিম
কাতরে কাঁদিয়া কহে--"কিবা ছিলে হায়
কি আজ হইয়া গেছ। আছিলে শিখরে,
আজিকে এসেছ নামি অতল গহ্বরে।
এখনি জাগিয়াছিলে, এখনি ঘুমালে।"

৪

সে মৃত্যুতরণীযাত্রী আমরা মোস্‌লেম!
নিশ্চিত বিনাশপানে নিস্পৃহ বিরাগে
গড্ডালিকা সম চলি। আপনার দশা
নেহারি বিদ্রোহ নাহি জেগে ওঠে প্রাণে।
নাহি দুঃখ অতীতের গৌরবের লাগি,
নাহি লজ্জা বর্ত্তমান পতনের তরে,
নাহি চেষ্টা এ দুর্দ্দশা করিবারে দূর--
জড়ের মতন আছি দাঁড়ায়ে নিথর।

৫

পশুর মতন আছি বর্ত্তমান মাঝে,
পশুরি মতন আছি তৃপ্তচিতে মোরা

আপন অবস্থা লয়ে। যত হীন হোক,
যত দীন, যত নীচ মোদের আসন
এ নিখিল ভুবনের জাতির সভায়,
তাই নিয়ে তুষ্ট মোরা। জীবনের ধারা
শুকায়ে গিয়াছে বুঝি, তাই নাহি বাজে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার উন্মাদ গর্জ্জন
তাই আর নাহি সাড়া, নাহিক স্পন্দন।

৬

ধর্ম্ম হ'তে পাই নাই কোন শিক্ষা মোরা,
বুদ্ধির সহজ আলো করে না নির্দ্দেশ
মোদের জীবন পথে। যে ধর্ম্ম প্রভাবে
অসভ্য লভিয়াছিল সভ্যতার আলো,
রক্তলোভী হিংস্র জাতি মনুষ্য মণ্ডিত
রচিল কুণ্টুর নব, ভাগ্যহত মোরা
তাহারি প্রসাদ লভি' হেরিলাম তবু
আপন স্বভাব দোষে পশুরো অধম।

৭

নিখিল জগত হতে বিচ্ছিন্ন সুদূরে
আছিল আরবভূমি। সেই মরু মাঝে
নিকষে উষার মত কনক পরশে
জ্বলে নাই সভ্যতার আলো কোন দিন।
যে সভ্যতা ইউনানে, আছিল মিসরে
তাহারো পড়েনি কোন ছায়া রেখাটুকু--
আরবের মরুমাঝে। সেদিন আরবে
কিবা ছিল? চারিদিকে যতদূর দেখি
কেবলি ধূসর বালি উষর নীরস,
কেবল আতপ্ত ভূমি, নির্ম্মল গগনে
প্রদীপ্ত উজ্জ্বল রবি। রাক্ষসীর মত
বিলোল রসনা মেলি বসি' মরুভূমি
গ্রাসিবারে পথহারা অভাগা পথিকে।

৮

স্নিগ্ধ শ্যামলতাহীন সেই মরুবুকে
আছিল যে জাতি, তারা তাহারি মতন
নিস্মন, ভীষণ, ক্রুর। জিঘাংসায় ব্রতী
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় চিত্ত। কথায় কথায়
আরবের ঘরে ঘরে--উঠিত জ্বলিয়া
দ্বন্দ্ব-অগ্নি। কার মেষ আগে পাবে জল,
তারি লাগি' রক্ত স্রোত আরব ভরিয়া
বহিত বিপুল বেগে, বালক-বালিকা,
নরনারী ভেসে যেত শোণিত প্লাবনে।

৯

আসব ব্যসন নিয়া কাটাত জীবন
সেদিন আরববাসী। আপন দুহিতা
জননী পাষাণপ্রাণ করিত হনন
জীবন্ত সমাধি দিয়া আপনার করে।
নাহি ছিল একতা বন্ধন, নাহি ছিল
ধর্ম্মের শীতল জ্যোতি। খোদারে ভুলিয়া
প্রতি ঘরে গৃহদেব গৃহদেবী রচি
পূজিত প্রতিমা তার। প্রতি পরিবারে
নিজস্ব ঈশ্বর ছিল, তাহাদের লাগি
চলিত কলহ নিত্য। কাবাগৃহ ভরি,
কক্ষে কক্ষে শত শত মূর্ত্তি ছিল কত,
ফারাণ শিখরে ছিল গভীর আঁধার।

১০

সে অনাদি অন্ধকারে কোন পুণ্যবলে
একদা উঠিল জ্বলি আলোকের রেখা
সৃষ্টির বিস্ময় সম। লভিল জনম
খোদার রসুল সেথা। আগমনে তাঁর
পলক ফেলিতে দূর হইল আঁধার,
আলোক পুলকে দেশ উঠিল হাসিয়া।
হীরা পর্ব্বতের গিরি গুহার গহ্বরে
বসিয়া সাধনা করি লভিলেন তিনি
যেই সঞ্জীবনী সুধা, তাহার প্রভাবে
নবীন জীবন হ'ল আরবে সঞ্চার।

১১

আদিম অনন্ত সত্য লভি হজরৎ
হীরার শিখর হ'তে আসিলেন নামি।
তালেবের সন্তানেরে কহিলেন ডাকি,
"রয়েছে অরাতি সেনা অগণন হেথা
গিরিশৃঙ্গ-অন্তরালে, কহি যদি আমি,
তোমরা লবে কি মানি সে কথা আমার?'
একবাক্যে উত্তরিল সবে, 'সত্যভাষী

নাম তব আশৈশব কাল, মিথ্যা কথা,
মিথ্যাচার কোন দিন দেখি নাই তব,
তোমার বচনে নাহি কোন অবিশ্বাস।'
তখন তাদের পুনঃ কহিলেন তিনি,
"সেদিন স্মরণ তবে কর সবে আজ
যেদিন মৃত্যুর পরে সকলে দাঁড়াবে
খোদার আরশে আসি' বিচারের লাগি।
সত্য আমি কহিতেছি, নাহি যদি হও
তোমরা সতর্ক এবে, তবে সুনিশ্চয়
অনন্ত যাতনা আছে ললাটে লিখন।"

১২

উপদেশ বাণী--তাঁর দেখিতে দেখিতে
সঞ্চার করিল নব জীবনের ধারা
সকল আরব ভরি। উদিল সেথায়
নবীন যুগের ঊষা, হল উচ্চারিত
দিকে দিকে সাম্যমন্ত্র, উঠিল ধ্বনিয়া
বিশ্ব ভরি একমেবাদ্বিতীয়ম বাণী।

১৩

হজরৎ সকলেরে কহিলেন ডাকি
"শোন সবে এ ভুবনে আছ যে যেখানে,
তোমরা সকলে ভাই, সকলের আদি
এক খোদা দয়াময় রহিম ঈশ্বর।
কেহ নাহি পিতা তাঁর, কেহ নাহি মাতা,
নাহি ভ্রাতা-ভগ্নী-পত্নী-পুত্রকন্যা তাঁর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্যে তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
রয়েছেন আপন গৌরবে। সীমাহীন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই বিপুল বিরাট
তাঁহারি রচনা। মোরা সবে পুত্র তাঁর,
তাঁরি দাস, তাঁহারি সৃজন। সেই এক
আল্লাহ্-তালার সবে কর আরাধনা।

১৪

"আমি নর, তোমাদেরি মত তাঁরি জীব,
তোমাদেরি মত তাঁর দয়ার ভিখারী।
কেবল পেয়েছি মম এ মরজীবনে
তাঁহার আদেশবাণী, তাঁহারি সন্দেশ,
তাই আমি দূত তাঁর, ভৃত্য তাঁর আমি
জীবনে মরণে তাঁরি দাস-অনুদাস।
আমারে তুলো না কভু খোদার আসনে,
আমারে কখনো ভুলে করিও না পূজা,
সমাধি-মন্দির রচি' তীর্থ করি তারে
দিও না নৈবেদ্য কভু, শিরনীর নামে
রওজা মাজার গড়ি' ক'রো না ভজন।"

১৫

ধর্ম্মের চরম কথা সরল সহজ
শিখায়ে তাদের তিনি কহিলেন তবে,
"সভ্যতা-শিখর-দেশে আরোহণ লাগি
আপন জীবিকা নিত্য করিও অর্জ্জন।
সময় ফিরে না কভু, তার ব্যবহার
করিও সতর্কচিত্তে। আজি যাহা পার,
রাখিও না ফেলি তারে কালিকার লাগি।
জ্ঞানের আলোক যেথা সেথা রহে সদা
খোদার করুণাদৃষ্টি, শিক্ষার বিস্তার
উন্নতি-সোপান তাই। তাঁহার নয়নে
জ্ঞান প্রিয়। তাই জ্ঞানী জীবনে মরণে
তাঁহার করুণা লভে,--এ ভুবন মাঝে
পায় সদা অর্থমান সম্মান বিভব,
পরকালে দয়া তাঁর বরষে শিয়রে।

১৬

'সবারে বাসিও ভালো, অপরের দুখে--
কাঁদে যেন হিয়া তব। খোদার চরণে
আপনার তরে চাহ যে করুণা দান,
নিখিল মানব লাগি' চাহিও নিয়ত
সেই করুণার ধারা। প্রতিবেশীজনে
তোমাদের চিত্ত ভরি সকলে লাগি'।
পশু-প্রাণী সকলের লাগিয়া করুণা
ইস্‌লামের নিদর্শন। নিখিলের প্রেম
যাহার অন্তরে আছে, সেই ত মুসলিম,
তাহারে করুণা সদা করিবেন খোদা।

১৭

"যাহারা ধর্ম্মের নামে করে অত্যাচার--
সেই সব অন্ধজন কোরাণের বাণী
নিয়ত করিছে হেলা। মোমেনের মাঝে

তাদের নাহিক স্থান, নহে তারা কভু
শান্তি-কামী ইসলামের প্রেম-পথবাহি।
সংসারে বিভব মান নাহি তাহাদের,
নাহি লভে শান্তি কভু মরণের পরে,
ধর্ম্মের কলহ করি' এ-ভুবন মাঝে
বিফল আবর্ত্তে তারা কাটায় জীবন।

১৮

"সততার সাথে দিন করিও যাপন
প্রতারণা অত্যাচার হতে আপনারে
সতত রাখিও দূরে। নামাজেরো চেয়ে
শ্রেষ্ঠতর পাপহীন জীবন যাপন,
অহিংস হৃদয় নিয়া সংসারের পথে
সবারে বাসিয়া ভালো মঙ্গল সাধনা।

১৯

"আপনার পবিশ্রমে আপন জীবিকা
নির্ব্বাহ করিও সদা। আপন অর্জ্জনে
জীবন যাপন সম শ্রেষ্ঠ কিবা আর?
আপন-নির্ভর তবু অপরের লাগি
বিত্ত তব থাকে যেন, সেই সত্য ধনী
যার অর্থ দরিদ্রের উপকার লাগি'।
দীন যার কাছে নাহি লভে সহায়তা
তাহার সহস্র বিত্ত থাকিলেও তবু
সেজন পরম দীন। অল্প আছে যার,
তবু ভিখারীর নিত্য জোগায় আহার,
তার স্বল্পধন সেই ঐশ্বর্য্য অতুল।"

২০

তাদের দিলেন শিক্ষা ব্যবহার, নীতি,
আচার, পদ্ধতি, রীতি। জীবনের পথে
রাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, বাণিজ্যের নীতি,
শিক্ষানীতি, অর্থনীতি লভিয়া তাহারা,
আনিল নবীন দীক্ষা জগতের লাগি।
অজ্ঞান-আঁধার ছাড়ি সভ্যতা-আলোকে
আনিল নিজেরা তারা, আনিল আশ্বাস
নিখিল জগত তরে। কর্ম্ম-অবসানে
হজরৎ পুণ্যালোকে করিল প্রয়াণ,--
খোদার করুণা লভি জীবনে মরণে
চিরদিন সত্যাশ্রয়ী দুঃখ-জয়ী বীর
জীবনে দ্বন্দ্বময় দিবসের শেষে
চিরসুখ স্বপ্নমাঝে লভিলা বিরাম।

২১

শিষ্য তাঁর বিশ্ব-মাঝে রহিলেন যাঁরা
তাঁদের তুলনা আজো দেখেনি ধরণী।
ধর্ম্মে চির-অগ্রগণী, উন্নতির পথে
নিয়ত পথিক। বিপুল ভুবন ভরি
কিছুরেই নাহি ডরিতেন, একমাত্র
খোদার লাগিয়া চিত্তে ছিল শ্রদ্ধাভয়।

২২

তাঁহাদের সহায়তা তাঁহাদের প্রীতি
লভিত বিধবা নারী অনাথ এতিম
অসহায় দুঃস্থ দীন। দরিদ্রের তরে
রহিতেন সদা তাঁরা ব্যাকুল উন্মুখ,
কারো চিত্তে ব্যথা দিতে সরিত না হিয়া
বিলাসিতা নাহি ছিল, করিত যাপন
সরল জীবন সবে। রাজায়-প্রজায়
দরিদ্র-ধনীর মাঝে ছিল না তফাৎ।

২৩

যাহা ভালো তাই সদা করিত নিডরি।
তবু অপরের কথা শুনিত সতত
সযত্ন শ্রদ্ধায়। খলিফার চোখে
মোস্‌লেম খৃষ্টান পার্শী য়ুনানী ইহুদী
ধনী-দরিদ্রের মাঝে না ছিল বিভেদ।
নরনারী সকলেই নৃপতির কাছে
আছিল সন্তানসম, এক দৃষ্টি দিয়া
সকলেরে করিতেন সমান পোষণ।

২৪

সেদিন প্রভাত নব আরব ভরিয়া,
নবীন জীবন-জ্যোতি। সেদিন ভুবনে
ঘনায়ে আসিয়াছিল দেশদেশান্তরে--
গোধূলী-আঁধার ঘন। নিখিল মানব
হারায়ে সভ্যতা-আলো আঁধারের মাঝে
হাতাড়িয়া ঘুরে মরে। ইহুদীর মাঝে

প্রাচীন ধর্ম্মের মণি, আদিম বিশ্বাস
দেশপ্রেম, সরলতা, গিয়েছিল নিভে।
ধর্ম্মহারা অর্থহারা বিত্তহারা তারা
গৃহহারা ধরা মাঝে সুদূর বিদেশে
পড়েছিল ছড়াইয়া। গ্রীক সভ্যতার
প্রদীপ্ত কনককর নিস্প্রভ মলিন;--
প্রতিভা-উজল দেশ গিয়েছিল ডুবে
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর--নিবিড় তিমিরে।

২৫

পারস্য-সভ্যতাসৌধ ধূলায় সেদিন
অনাদরে পড়ে ভাঙি। দিগ্বিজয়ী রোম
ভুলেছিল আইন রচনা--ছত্রভঙ্গ
ছিন্নভিন্ন সিন্ধুবাহী রণপোতদল।
এ ভারতবর্ষ যেথা আমাদের বাস,
যেথায় উঠিয়াছিল একদা গম্ভীর--
উদাত্ত করুণাবাণী--"সর্ব্বজীবে দয়া"--
যেথায় সকল কলা, সকল দর্শন
লভেছিল পরিণতি,--সে দুর্দ্দিনদিনে
সে দেশ আঁধারে ঢাকা। জ্ঞানী ভুলেছিল
সাধন পূজন ধ্যান, সাম্য মৈত্রী দয়া
সেদিন কেবল স্মৃতি। আছিল কেবল
সমাজ-আচার অন্ধ, সংস্কার-বাঁধন।

২৬

আর যারা আমাদের শিক্ষাগুরু আজি,
আমাদের 'রক্ষাকর্ত্তা', 'প্রভু' আমাদের--
কোথায় আছিল তারা? আজি যারা সদা
পরের বেদনা দূর করিবারে চায়
আপন সর্ব্বস্ব দিয়া, সেদিন তাহারা
বনের পশুর মত একে অপরেরে
স্বার্থের কলহ করি করিত সংহার।
আজিকে সভ্যতা যেথা, যেথা আজি জ্ঞান
রবির করের মত গিয়াছে ছড়ায়ে,--
সেথায় আছিল শুধু অজ্ঞান আঁধার

২৭

জগতের সেই অমানিশীথ-আঁধারে
যে দীপ উঠিল জ্বলি আরবের বুকে,--
তাহার কিরণে দূর হইল আঁধার।
বাতাহার গিরিশৃঙ্গে উঠিল যে মেঘ,
নিমেষে ফেলিল ছেয়ে নিখিল গগন,
এ বারি ঢালিল তাহে ভুবন ভরিয়া
নবজীবনের নব জাগিল হিল্লোল।
গর্জ্জিল টেগাস পরে সেই কালো মেঘ
ঝরিল গঙ্গার বুকে তার বারিধারা।
গভীর গর্জ্জনে তার সারা বিশ্ব ভরি
সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া,
তাহার বিদ্যুত-দীপ্তি ভুবন ভরিয়া
উজলি তুলিল তম। জাগিল আবার
নিখিল ভুবন ভরি নবীন জীবন।

২৮

অজ্ঞান তিমিরমগ্ন ইয়োরোপবাসী
আরবের পদতলে বসিয়া শিখিল
বিস্মৃত বিজ্ঞান-শিল্প। ইরাকে ইরাণে
ধর্ম্মের বিমল ভাতি জাগায়ে তুলিল
নব জীবনের সাড়া। যুনানের সেই
অপূর্ব্ব সাহিত্যকলা এ জগত হতে
গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে, তাহারে আবার
আরবীরা বাঁচাইয়া সকল জাতিরে
শিখাল নূতন করি'। পূরব-পশ্চিম,
শাদা-কালো-পীত যত নর-নারী ভবে
আবার শিখিল সব প্লেটোর দর্শন,
সক্রাতিস, হিপোক্রাত, থালিসের বাণী,
নগরে নগরে গ্রামে গড়িয়া উঠিল
জ্ঞান-জ্যোতি উদ্ভাসিত নবীন এথেন্স!

২৯

এ ভুবনে যত ছিল দর্শন বিজ্ঞান
উৎসুক বালক মত শিক্ষার্থী আরব
আপনার করি নিল। রসুলের বাণী,
"বিজ্ঞান কুড়ানো মনি, যে পায় তাহার"
অক্ষরে অক্ষরে তারা পালিয়া চলিল।
যেখানে যা কিছু পেল নিল কুড়াইয়া,
অবাধ আগ্রহ ভরে না করিয়া দ্বিধা
না করি বিচার কভু দেশ কাল জাতি।

৩০

বিজন নীরস মরু বসতিবিহীন
তাদের প্রতিভাবলে নিমেষের মাঝে
মোহন কানন হ'ল। কোনদিন যেথা
শ্যামলের চিহ্ন-রেখা যায়নিক দেখা
সেথায় উঠিল হাসি' পত্রপুষ্প দলে
দিক্-বধূ। সভ্যতার রোপিল যে বীজ
ছেয়েছে তাহারি তরু আজি এ ভুবন।

৩১

রেখে গেছে সব দেশে ভুবন ভরিয়া
আপন সভ্যতা-চিহ্ন! করিয়াছে তারা
সুবিশাল রাজপথ সুদৃঢ় নির্ম্মাণ,
দেশ হ'তে দেশান্তরে গিয়াছে চলিয়া।
সে পথের দুই পাশে আছে ছায়াতরু
ক্লান্ত পথিকেরে দিতে নিদাঘের দিনে
আতপ্ত মধ্যাহ্ন বেলা স্নিগ্ধ শ্যামছায়া,
পথ-পার্শ্বে ছিল কূপ তৃষানিবারণ
শীতল সলিলপূর্ণ। প্রতি ক্রোশে ক্রোশে
প্রস্তর ফলকে ছিল পথের ঠিকানা।
তাই দেখি পথচারী জানিত কোথায়
আসিয়াছে কতদূর? কত পথ বাকী?

৩২

বিদেশ ভ্রমণ ভালোবাসিত তাহারা,
গিয়াছে সকল দেশে, সব মহাদেশে--
সকল সাগর নদী তাহাদের তরী
অবাধে দিয়াছে পাড়ি। বিপদের ভয়,
পথের সহস্র ক্লেশ, বিঘ্ন শত শত
রুধিতে পারে নি কভু তাহাদের গতি,
স্বদেশ বিদেশ সব আছিল সমান।

৩৩

মর্ম্মর প্রস্তরে তারা দেশ দেশান্তরে
লিখেছে কীরিতি গাথা। ভারত ভরিয়া
মিনার রয়েছে কত, কত রাজপুরী
পাষাণে গঠিত চারু মূক সাক্ষী সম।
সমাধিমন্দির কোথা, স্বপ্নময় তাজ
বাদশার অশ্রুজলে গঠিত কীরিতি!
এ ভুবনে যেথা যাবে যেই মহাদেশে
সেথায় দেখিতে পাবে কীরিতি তাদের,
অতীত গৌরবময় যুগের কাহিনী
লিখিয়া রেখেছে চির অমর অক্ষরে।
এই বঙ্গদেশে আছে গৌড় পাণ্ডুয়ায়
ভগ্ন অবশেষে তার। পথিকের আঁখি
আজো ভ'রে আসে জলে, ব্যথিত পঞ্জরে
জাগি দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস মিলায় পবনে।

৩৪

ছোঁয়ালে যাদুর কাঠি যেমনে পলকে
শ্যামলিয়া ওঠে ধরা ফলে ফুলে জলে,
তাদের পরশ লভি উষর হিস্পানি
নিমেষে উঠিল হাসি কুসুমে কুসুম
ধন ধান্য পুষ্পে ভরা। রহিয়াছে আজো
তাদের কীরিতি-কথা সারা দেশ ভরি
ছড়ায়ে নগরে গ্রামে। যাও গ্রাণাডায়,
যাও কর্ডোভায় আজি, স্মৃতি তাহাদের
জড়ায়ে রয়েছে আজো। একদা যেথায়
সুচারু প্রাসাদ ছিল রম্য উপবন,
সেথায় শৃগাল ফেরে, পেচকের নীড়।
তাদের বিরহে আজি বিধবা হিস্পানি
অনাথিনী ম্লান-আঁখি বেদনা-আতুর,
অতীত সৌভাগ্যদশা হইয়াছে দূর।

৩৫

আব্বাস বংশের যারা আছিল খলিফা
তাহাদের রাজধানী ইরাকে বোগদাদে
দেশ-বিদেশের যত খ্যাতনামা সুধী
নিখিল সাহিত্য-সুধা করিত বণ্টন।
লোকমান বোকরাত সোলনের জ্ঞান,
এথেনীয় যেই শিক্ষা ভুলেছিল লোকে
সেথায় লভিল পুন নবীন জীবন।
আজো তাহাদের সেই সঞ্চিত বিজ্ঞান
য়ূরোপের দেশে দেশে পুস্তক আগারে
শিক্ষার্থী সেথায় লভে কত তত্ত্বকথা।

৩৬

কৃফায় বসিয়া তারা সঞ্জর প্রান্তরে
গণিয়া করিয়াছিল এই ধরণীর
পরিধির নিরূপণ। জ্যোতিষির দল
বোখারা সমরকন্দ হতে হিস্পানিয়া
সাগ্রহে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া,
গ্রহ নক্ষত্রের গতি দেখিয়া দেখিয়া
রচিত খগোল শাস্ত্র। আকাশ-মন্দিরে
ছেয়েছিল সারা দেশ। ইতিহাসে তারা
জগতের শিক্ষাগুরু। গ্রীক সভ্যতার
অবসানে বিশ্ব হতে হইল বিলোপ
ইতিবৃত্ত রচনার ধারা--আরবীরা
পুনরুদ্ধার করেছিল তার সঞ্জীবন।

৩৭

রসুলের উপদেশ বাণী আহরিতে
তাহার হাদিসরাশি করিতে সঞ্চয়
ফিরিয়াছে দূর দূর দেশে সুধীজন।
যাহা কিছু মিথ্যা, যাহা সন্দেহ ভাজন
ত্যাগ করি গাঁথিয়াছে মনিময় হার
কুড়ায়ে সত্যের কণা কত না প্রয়াসে!

৩৮

সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পে সেদিন আরব
আরোহণ করেছিল যেই উচ্চ চূড়ে
আজিও জগত মাঝে অতুলন তাহা।
বিজ্ঞান ভূগোল আর ভ্রমণ কথায়
আরব-সাহিত্য ধনী। কাব্য-কবিতায়
আরবের নরনারী গৃহে গৃহে ছিল
আজন্ম স্বভাবকবি। আজো কত গাথা
বিকচ কুসুমসম রয়েছে অম্লান।
শিক্ষায় তুলনাহীন, আজো এ ধরায়
তাদের রচিত যত বিশ্ববিদ্যালয়
রহিয়াছে সুবিদিত। সালার্ণোর নাম
কেমনে ভুলিবে বিশ্ব? কত না পণ্ডিত
আবুসিনা এসহাক কসিসের নাম
অমর অক্ষরে লেখা--রাজী, জিনা, কত
পরম যতনে শিক্ষা দিত ছাত্রগণে।

৩৯

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যারা ভূগোল খগোলে
রসায়নে ইতিহাসে পদার্থ বিদ্যায়
গণিতে আনিয়াছিল নব যুগান্তর,
ভুবন কীরিতিভরা আজো যাহাদের,
নিখিল আজিও করে শিষ্যত্ব স্বীকার'
তাহারা কোথায় হায়! সমাধি তাদের
কোথায় কেহ না জানে! তাহাদের স্মৃতি
উড়ে যায় বায়ুভরে--সমাধির ধূলি
দুখে কাঁদে আজিকার এ পতন হেরি!

৪০

যতদিন ছিল তারা ধার্ম্মিক, সরল,
জীবনের গতি ছিল সহজ সুন্দর,--
ইস্‌লামের দীপশিখা ভুবন ভরিয়া
দেশে দেশে দিকে দিকে ছিল সমুজ্জ্বল!
তারপরে তারা যবে হারাইল সব--
সহজ সরল ধর্ম্ম, জীবনের গতি,
আচার যখন আসি' জ্ঞানের প্রবাহ
আবর্জ্জনা স্তূপ দিয়া ফেলিল বাঁধিয়া,
চপল সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের ছাড়ি
গেল চলি চিরতরে। সম্মান, বিভব,
বাণিজ্য, রাজ্যধন, সাহিত্য-বিজ্ঞান,
একে একে গেল ত্যজি অমা-অন্ধকার
আ-প্রশান্ত-অতলান্ত মোস্‌লেম জগত।

৪১

খোদা কারু সর্ব্বনাশ না করেন কভু
আপনার সর্ব্বনাশ আপনি না করে
হতভাগা যতদিন। মোস্‌লেমেরা সবে
যখনি ত্যজিল সত্য, ভুলিল ধরম,
কর্ম্মের প্রেরণা গেল ত্যজি তাহাদের
আত্মার প্রয়াণে যথা পড়ে থাকে দেহ--
সকলি হারায়ে শুধু ইস্‌লামের নাম
অতীতের স্মৃতি-সম রহিল ভুবনে।

৪২

আজি যদি চেয়ে দেখ মানস-নয়নে
হেরিবে নিখিল ভরি' নয়ন রঞ্জন

শোভন বাগিচা কত, কুসুম কানন
ফলফুল তরুলতা চারু সুশোভিত।
দেখিবারে পাবে কোথা রম্য উপবন,
কোথাও দেখিবে নব জীবন সঞ্চার
পুরাতন উপবনে। শুকাইয়া গেছে
পত্রপুষ্প, তবু সেথা নবীন পল্লবে
ছেয়েছে ধরণীতল,--নব জীবনের
অমর আভাসবাণী ভূমিতল ভরি।

৪৩

কেবল দেখিবে সেথা একটা কানন,
নাই ফুল ফল লতা, গেছে শুকাইয়া
পাদপ বিটপিরাজি। নাহি কোথা লেশ,
নাহিক আশ্বাস কোন, আবার সেখানে
উঠিবে ফুটিয়া ফুল, হাসিবে কানন।
সেখানে রয়েছে পড়ি শুষ্ক বৃক্ষমূল
নীরস জীবনহীন। উড়ে রুক্ষ বালু
দিকে দিকে, গ্রীষ্মকাল তপ্ত তপনের
প্রখর কিরণ-জালে গেছে দহি সব।
মেঘ হতে ঝরে যেই জীবনের ধারা
তাহাতে সে উপবনে ওঠে না বাঁচিয়া
মুঞ্জরিয়া ফুলে ফলে তরুলতা তৃণ।
সে বারি-ধারায় শুধু পচে গলে যায়
বিশুষ্ক তরুর শাখা। শাহানার মত
প্রাণহীন আশাহীন রহিয়াছে পড়ি
সে উদ্যান চিরতরে--ইস্‌লাম জগত!

৪৪

ইসলামের যেই তরী সকল সাগর
সব নদ নদী হ্রদ গেছে অতিবাহি'
তুমুল প্রলয়-ঝঞ্ঝা নির্ভয়ে উত্তরি',
গঙ্গায় ডুবিল কিরে আজি চিরতরে?
যাহারা আছিল সবে একদিন ভবে
জগতের শিরোমণি, জগত গৌরব
শিক্ষায় দীক্ষায় ছিল জগতের গুরু,
তাহাদেরি বংশধর আজি এ ভারতে
দেশের কলঙ্ক হয়ে রহিয়াছে বাঁচি!
কুমারিকা হতে আজি হিমাদ্রিশিখরে,
মরুময় কান্দাহার হতে ব্রহ্মদেশে
নদনদী তরুলতা বন উপবন
করুণ বিলাপ রোলে কাঁদি কহে শুধু:
"যাহারা ভুবন ভরি শিখাল সভ্যতা,
তাহাদের দেখি আজি একি এ পতন?
সকলে পিছে তারা, সকলের নীচে,
সকলের পদতলে, সবারই অধম,
ভারতবর্ষের আজি কলঙ্ক তাহারা!"

৪৫

এ সংসারে আরো জাতি আরো বহুদেশে
হারাইল রাজ্যধন, হারানু আমরা।
বিধির বিধান এই, আজি যেই রাজা
পথের ভিখারী কাল, তাহে নাহি লাজ।
রাজ্য হারাইয়া বহু পরাধীন জাতি
শিক্ষায় দীক্ষায় তবু উন্নতি-প্রয়াসী,
সদাই আপন ভোলা করিবারে চাহে,
সযতনে আপনার মানবতা-ধন
রাখিয়াছে বাঁচাইয়া। আমরাই শুধু
রাজত্বের সাথে দিনু সব জলাঞ্জলি!
মহৎ মনুষ্যধর্ম্ম, সততা, সম্মান,
সাধনা সত্যের লাগি, জ্ঞানের পিপাসা,
সকলি হারানু, তাই সবাকার পিছে
সকলের পদতলে পড়ে আছি বোবা!

৪৬

নিখিল চরণ আজি করে পদাঘাত,
তবু নাহি, "আমরা সে মোস্‌লেম সন্তান
যাহারা সভ্যতা-জ্ঞানে ছিল জগতের
শিরোমণি। আজি যদি লাজে অপমানে
সহিয়া ধিক্কার গ্লানি কাটে দিন, তবু
অতীত গৌরবময়।" ভাবি না বারেক
পূর্ব্বের কাহিনী আজি কলঙ্ক-কারণ--
যত উচ্চে ছিনু আগে তত নীচে আজি
পড়ে আছি। লাজে কণ্ঠ না আসে জড়ায়ে
মাথা নুয়ে নাহি পড়ে। আশায়, উদ্যমে,
উৎসাহে সাহসে বাক্যে প্রকৃতি স্বভাবে
ব্যবহারে বলে তেজে চরিত্রে শিক্ষায়
আমাদের মাঝে আজি মুসলমানের
মহত্ত্বের চিহ্নলেশ অবলুপ্ত হায়!

রহিয়াছে নাম শুধু, গুণ অন্তর্দ্ধান,
তাই যদি কারু মাঝে মেলে চিহ্ন তার
নিয়মের ব্যতিক্রম মনে হয় তারে,
বিস্ময় উদ্রেক করে আশ্চর্য্য ঘটন!

৪৭

কথায় জগতময়ী, আমাদের মত
সাহসী কে আছে কোথা? কাজের বেলায়
সকলের পিছে পড়ি। আলস্যে বিলাসে
আমরা সকলে রাজা, চরিত্র সম্পদে
ভিখারীরো চেয়ে দীন। নাহি বুদ্ধি জ্ঞান
সজীব কল্পনা নাহি, উচ্চ আশা নাহি,
মুখে পরাণের বন্ধু, অন্তরে গরল।
আচারে স্বভাবে মোরা পশুরো অধম
দিই শুধু আমাদের গৌরব উজ্জ্বল
পিতৃপুরুষেরে লাজ। ভারতের বুকে
আমরা কলঙ্ক রেখা শশাঙ্ক যেমন।

৪৮

এ নিখিল ধরণীর জাতির সভায়
আমাদের নাহি স্থান। পণ্ডিত সভায়
আমাদেব পুছেনাকো। আপনার মাঝে
নাহি আমাদের প্রীতি, নাহি ভালবাসা।
শৃগাল কুক্কুর সম পরস্পর মিলি
কলহে কাটাই কাল, একতা মিলন
নাহি ভারতের অন্য জাতিদের সনে।
রাজার সভায় নাহি সম্মান মোদের
সাহিত্যে বিজ্ঞানে মোরা সকলের নীচে,
শিক্ষায় অধম মোরা সকলের মাঝে।
বাণিজ্য ব্যবসা-শিল্প, ঐশ্বর্য্য বিভবে
রাজকর্ম্মে, কৃষিকার্য্যে, কোথা আমাদের
নাহি স্থান। ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রতিভা গৌরবে
উন্নতির আশা নাহিস নাহিক প্রয়াস।

৪৯

তবু আশা আছে মনে। রয়েছি সকলে
অন্ধের যষ্ঠির মত আঁকড়িয়া তারে,--
যত দুঃখ, যত লাজ, যত অপমান,
জীবন ভরিয়া সহি, মরণের পরে
স্বর্গে আমাদের লাগি রহিয়াছে স্থান!!
যাহারা ভুবনে আজি স্বাধীন মহৎ
ঐশ্বর্য্যে চরিত্রে ধনী, বঞ্চিয়া তাদের
একেলা বেহেস্তে মোরা করিব সম্ভোগ!
সকলেরে কহি তাই, "এ ভুবন মাঝে
তোমরা সকলে বড, তোমরা মহৎ
তোমরা বিদ্বান সুধী, কিন্তু তবু জেনো,
তোমরা দোজখপন্থী, জিন্নাত মোদের!"
নাহি জানি তবু কোথায় নরক স্বর্গ--
এ ভুবন মাঝে? অথবা আকাশতলে?
অথবা সুদূর গ্রহনক্ষত্রের পারে?

৫০

আল্লার সৃজন এই বিপুল জাহান,
অপূর্ব্ব গম্ভীর কোথা, কোথা মধুময়--
তার লাগি আমাদের নাহিতো নয়ন,
মোদের রয়েছে আঁখি শুধু খুঁজিবারে--
কার কিবা দোষ আছে। সিন্ধুর উচ্ছ্বাস
শুনিবার নাহি কাণ--রয়েছে শ্রবণ
শুনিতে পরের নিন্দা, কুৎসার কাহিনী।
কূপ-মণ্ডুকের মত রহিয়াছি মোরা
বদ্ধ আপনার অন্ধ প্রাচীরের মাঝে।

৫১

সকল স্বাধীন জাতি এ ভুবন মাঝে
অমূল্য সম্পদ বলি' সময়েরে জানে,
প্রত্যেক নিমেষ তাই রতনের মত
যতনে সঞ্চিত করে; সে অমূল্য ধন
মোস্‌লেম-সন্তান মোরা অবহেলা ভরে
অনাদরে অবজ্ঞায় করি অপচয়
নাহি ভাবি কি রতন হাতে পেয়ে তবু
হারানু আপন দোষে হেলায়-ফেলায়।

৫২

দীনহীন সর্ব্বহারা যদি চাহে কভু
এক মুষ্টি অন্নভিক্ষা, দিতে নাহি চাহি,
কহি মোরা, 'দীন অতি, নাহিক সঙ্গতি
ভিক্ষা দিব অপরেরে।' তবু আপনার
অমূল্য জীবনধন অবহেলা ভরে

অনাদরে করি ব্যয়। নাহি আমাদের
অন্তরে ভাবনা কোন জীবনের লাগি--
এ জীবন খনে খনে সদা চলে যায়
আর কভু আসিবে না ফিরে। এর চেয়ে
যে কুক্কুর রক্ষা সদা করে মেষপাল
তারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের জীবনে রয়েছে
যেই কাজ, তাই করি' কাটে দিবানিশি।

৫৩

এই ভারতের বুকে অন্য জাতি যত
--হিন্দু, পার্শী, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান--
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর আজি।
শিক্ষায় ঐশ্বর্য্যে তারা কৃষি শিল্প কাজে
বাণিজ্যে ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্রপতি।
আপনার বলে তারা আপনার পথ
করিছে নির্ম্মাণ। নাহি অভিমান মনে,
রক্তজলকরা শ্রমে জোগায় আপন
ক্ষুধার আহার, নাই ঘৃণা কোন কাজে।
সময়ের মূল্য জানে, আলস্যে হেলায়
নাহি কাটে ক্ষণকাল। শিক্ষার লাগিয়া
তাহারা সকলে করে আপ্রাণ প্রয়াস।
পুত্রকন্যা-নির্ব্বিশেষে দেয় সযতনে
নতুন যুগের শিক্ষা। আপন জাতির
মঙ্গল প্রয়াসে তারা সদাই উন্মুখ।
আপনার স্বার্থ নিত, করে বিসর্জ্জন
স্বধর্ম্ম স্বজাতি তরে। শিখেছে তাহারা
সৌভাগ্য জ্ঞানের পিছে চলে এ ভুবনে।

৫৪

কালের প্রবাহ সাথে যোগ রাখি চলে
জীবনের পথে তারা। যখন যেমন
তাহারি মতন চলে এ ভুবন মাঝে।
যেজন আঘাত সহি পড়ে ধূলিতলে
সেও প্রাণপণ করি উন্নতিশিখরে
আরোহণ করে পুন। দিবস রজনী
বরষ ঋতুর চক্র এই কথা কহে
"সময়ের সাথে চল।" সকলের সাথে
যোগ না রাখিয়া চাহে চলিতে যেজন
নাহি কোথা তার স্থান। চিরদিন তরী
চলিবে না এক মুখে—যেদিকে বাতাস
সেদিকে তরণী মুখ ঘুরাইয়া দাও।
সে ভাবনা নাহি মনে, আমাদের আঁখি
এত উচ্চে, তার কাছে মান অপমান
সুখদুঃখ লাজলজ্জা সকলি সমান।
তাই আপনার তরে নিয়াছি বাছিয়া
নিখিলের অপমান অনাদর হেলা।

৫৫

যে দারিদ্র্য সর্ব্বদোষ পাপের আকর,
মানবের মানবতা তাও হরি নেয়,
ধর্ম্ম-বীরু সেও ভোলে ধর্ম্মের বিধান--
এ ভারতে মোস্‌লেমের জাতিচিহ্ন তাই!
আমাদের দিনপাত তাই ভিক্ষা করি,
ভিক্ষা যদি নাহি জোটে করি প্রতারণা,
"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা" শিখিয়াছি মোরা।

৫৬

চাকুরী করিতে গেলে সেথাও নজর
উঠে না কখনো ঊর্দ্ধে। দাসবৃত্তি করি'
পেয়াদা নফর কারু, কোথা খানসামা,
কেহবা ঘেসেড়া হয়ে ঘাস কাটি করি
জীবিকা অর্জ্জন আজি। যারা ছিল রাজা
তাহাদের সন্তানের এই দশা হয়।

৫৭

কেহ মোসাহেব সাজি' ধনীর সভায়
হাস্য পরিহাস করি' গীতবাদ্য দিয়া
খুঁজি জীবিকার পথ। ঘৃণ্য সকলের--
সকলের কৃপাপাত্র হয়ে বেঁচে আছে।

৫৮

কেহবা ঘুরিয়া ফেরে, কহে সকলেরে
"সৈয়দ সন্তান আমি, অতএব কিছু--"
কেহবা প্রচার করে আপনারে কোন
পীরের খাদেম, তাই দরগা রক্ষার
কেহবা আসিয়া গ্রামে মূর্খ গ্রামবাসী
সকলের প্রাণে করে ভয়ের সঞ্চার,
বিবরিয়া কহে সবে হাশরের মাঠে

কোথায় বসিবে খোদা, কোথায় রসুল,
কেমন করিয়া হবে পাপীর শাসন,
কেমনে জ্বলন্ত লৌহকটাহের মাঝে
করিবে নিক্ষেপ সবে।--এই সব কহি
মধুর বচনে শেযে বোঝায় তাদের
"দানের মতন নাহি পুণ্য কোন আর,
ধর্ম্মের লাগিয়া দানে আরো পুণ্য হয়,
অতএব কিছু দান,--আমার লাগিয়া
নহে তাহা, মসজিদ রয়েছে হোথায়,
তাহার সংস্কার লাগি', কর কিছু দান!

৫৯

সৈয়দ দুলাল যত, পীরের খাদেম,
তাহারা বাণিজ্য কৃষি করিতে চাহে না
বড় পরিশ্রম বলি।' দেহপাত করি'
করিবে না দিনপাত, তাবে ভাবে তারা
অপমান। বিদেশীর অর্থ গণে তারা
নরকের মুক্তপথ। এ জাতির যদি
মরণ না হয়ে থাকে আজিও এখনো,
কাল তবে ধ্বংশ তার হইবে নিশ্চয়।

৬০

আর যারা আমাদের ধনীর সন্তান--
তাহাদের কথা কিছু নাহি কহিবার।
ধনীর দুলাল তারা। রয়েছে প্রচুর
সম্মান বিভববিত্ত, তাই ভাবে মনে
তাহারা নতুন সৃষ্টি খোদার জগতে।
প্রাসাদে আরামবাগে ঐশ্বর্য্যে গরবে
রাজার মতন রহে বিলাসে বিভবে,
মিথ্যা বন্ধু দলে দলে ঘিরে রহে সদা,
অযথা প্রশংসাবাণী, মিথ্যা স্তোক দিয়া
দিবানিশি তাহাদের রাখে ভুলাইয়া।
দুর্ভিক্ষে মরিছে কত দীন নরনারী
বালকবালিকা কত, অসহায় শিশু,
তার পানে দৃষ্টি নাহি, জোগায় কেবল
আপনার বিলাসের অজস্র ইন্ধন।
তাদের আহার মাঝে অন্নপান যত
সবি দীন অভাগার বুকের শোণিত।
চারিপাশে সকলের জীবন ভাণ্ডার।
চুরি করে' তাহাদের বিলাসবিভব।

৬১

শিক্ষা দীক্ষা হ'তে তারা আপনারে রাখে
দূরে সদা শঙ্কাভরে, পূতিগন্ধ হতে
মানুষ যেমন চলে বাঁচায়ে নিজেরে।
ঘৃণিত আচার যত, লজ্জাকর কাজ,
তাহাদের নিত্যকর্ম্ম। সুনামের লাগি'
স্পন্দন জাগেনা মনে। সমাজ সংসার
যায় যদি রসাতলে, বিশ্ব নরনারী
ডুবে যদি যায় চিরধ্বংশের গহ্বরে,
তার লাগি তাহাদের নাহি চিন্তা কোনও।

৬২

সোলেমান যেই ধন খোদার চরণে
মাগিয়া নিয়াছে বর, যাহার কল্যাণে
ক্ষুধিতের অন্ন জোটে, দীন দরিদ্রের
সকল দারিদ্র্য ক্লেশ, সকল বেদনা,
পলকে মিলায়ে যায়। পীড়িত জনার--
মরণ অধিক ব্যথা, যন্ত্রণা অপার
দূর হয়ে যায়। যাহার কল্যাণে ধরা
ভূতলে স্বরগ ভূমি হবে একদিন,
হিংসা দ্বেষ দ্বেষ ঘুচি রবে তার বুকে
ভাই ভাই নিখিল মানব। সেই ধন--
সকল সুখের সেই অশেষ ভাণ্ডার,
তাহাদের হাতে পড়ি যোগায় কেবল
বিলাসব্যসনে ঘৃত, তোলে জ্বালাইয়া
ঘরে ঘরে অশান্তির উগ্র বেদনার
তীব্র বিষ অগ্নিশিখা। হয় যারা ধনী,
ভুলিয়া কি গেছে তারা কোরাণের বাণী--
"প্রথম আদেশ বিশ্বে ঈশ্বরের মানবের পরে,
সকলি তাঁহার সৃষ্টি, সকলেরি লাগি তাঁর মনে
রয়েছে করুণাসিন্ধু। এ ভুবনে যাঁহার অন্তরে
পরের লাগিয়া প্রেম, সেই প্রিয় তাঁহার নয়নে।
এই ধর্ম্ম, এই ভক্তি, এই একমাত্র উপাসনা--
মানুষ করুক নিত্য মানুষের মঙ্গলসাধনা।"

৬৩

মোদের বিশ্বাস মনে ইয়োরোপবাসী
ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত, নাহিক আত্মার
মঙ্গল প্রয়াস। তাই ভাবি, "এ ভুবনে
রাজ্য ধন মান শক্তি সকলি তাঁদের,
তবু মরণের পরে হুর গেলেমান
তাহাদের ভাগ্যে নাহি, নাহি তাহাদের
নসীবে বেহেস্তসুখ অনন্ত অসীম!
আমার ধার্ম্মিক জাতি, ধর্ম্মের লাগিয়া
বেঁচে আছি,জগতের দুঃখভোগ শেষে
মোদের নাজাতপথ মুক্ত চিরতরে!!"

৬৪

পাখির মতন মোরা অর্থ না বুঝিয়া
কহি রসুলের বাণী, "দেশের লাগিয়া
প্রেম মোস্‌লমের চিহ্ন।" তবু ভুলে কভু
ভাবিনা দেশের কথা। ভালো না বাসিয়া
আপনার জন্মভূমি তার নদনদী,
তাহার কান্তার বন নগর নগরী,
বিদেশের পানে বদ্ধ দৃষ্টি আমাদের।
দেশের কল্যাণ লাগি স্বার্থ আপনার
ভুলিবার শক্তি নাহি-নাহিক বাসনা।

৬৫

ধর্ম্মহীন (?) ইয়োরোপ, তাই ইয়োরোপে
একে অপরের লাগি মৃত্যু তুচ্ছ করি
সহিছে যাতনা নিত্য! ধর্ম্মহীন (?) তারা
তাই অপরের দুঃখ করিবারে দূর
অকাতরে ঢালি দেয় আপন জীবন!
ধর্ম্মহীন (?) তারা তাই, দেশের লাগিয়া
হাসিমুখে দেয় প্রাণ! ধর্ম্মহীন (?) তাই
স্বধর্ম্ম স্বজাতি তরে জীবন শোণিত
ঢালি দেয় হাসিমুখে। ইয়োরোপ ভরি
কবির কবিতা কাব্য, গুণীর সঙ্গীত,
ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কবিদ্যা, চারুশিল্পকলা
জ্ঞানীর সকল জ্ঞান, মনীষীর মেধা
সৈনিকের হৃদয়ের তপ্ত রক্তধারা
সকলি দেশের লাগি। বক্ষে রহিয়াছে
দুর্জ্জয় সাহস বল, সকলের লাগি
সকলের প্রাণে প্রীতি, বন্ধুত্ব, একতা।
তাই আজি জগতের অধীশ্বর তারা।

৬৬

আর মোরা? আমাদের ধনী যেই জন,
সেজন বিলাসসুখে আপনার লাগি
করে নিত্য অপব্যয়। কেহ যদি কভু
দান করে, করে তাহা মূর্খের মতন।
অযোগ্য যদি বা হয় মানুষ নামের,
সেই নর-কলঙ্কেরে তবু দিবে দান,
সৈয়দ-সন্তান বলি। জ্ঞানবুদ্ধিহীন
দীর্ঘশ্মশ্রু, দীর্ঘকেশ ভণ্ড যত বাঁচে
তাদের করুণা লভি, অধর্ম্মের বিষ
ছড়ায় সকল দিকে। আমাদের ধনী
আপন ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব করিতে প্রচার
ল মুদ্রা ব্যয় করি, রচে মসজিদ,—
ভাবে মনে তারি বলে সাত পুরুষের
জিন্নাতে আসন স্থির হ'ল চিরতরে!
দান করে সবি সত্য,— তবু সেই দানে
পুণ্য নাহি, নাহি হয় কাহারো মঙ্গল!

৬৭

কোথায় আজিকে হায় তাহারা সকলে
একদিন এ ভুবনে আপনারে যারা
নিঃশেষে দিয়াছে ঢালি খোদার লাগিয়া,-
কোথা সেই মানবের বন্ধু পীরগণ?
কোথায় মিলাল সেই পণ্ডিতমণ্ডলী
যাহারা তুলিয়াছিল জ্ঞানের প্রভায়
উজলি নিখিল ধরা? সেই তত্ত্বজ্ঞানী,
সেই হাজী ইমামেরা কোথা আজি হায়?

৬৮

তাদের আসনে আজি বসিয়াছে আসি'
ছদ্মবেশী পাপী, মূর্খ! অজ্ঞানীর দল
আপনার অজ্ঞানতা ঢাকি সুকৌশলে
পণ্ডিত বলিয়া করে নিজেরে প্রচার,
লোকেরে ঠকায়ে করে অর্থ উপার্জন।
কেহ আপনারে কহে স্বর্গগত কোনো
মহাত্মার বংশধর, বেচি তাঁর নাম

দেখায়ে ধর্ম্মের ভাণ করে ছলভরে
জীবনযাপন। ভণ্ড গণ্ডমূর্খ যত, —
তারাই জোবেদ আজি, তারা বায়াজীদ,
তারাই মোদের গুরু, সুফী দরবেশ!!

৬৯

আরো বেশী দুঃখ লাগে চাহি যবে মোরা
আলেম সমাজ পানে। তাহাদের সাথে
মতের অমিল যদি হয় একতিল,
প্রচারে 'কাফের' তারে! কেহ যদি আসি
কোন প্রশ্ন তাহাদের জিজ্ঞাসে কখনো,
প্রহার কপালে জোটে। আঁখি দুটী সদা
রহিয়াছে রক্তবর্ণ, মুখে কটু কথা।
আলাপ করিতে হলে তাহাদের সাথে
চাহি দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশি, গুম্ফ অনধিক,—
ইজারের প্রান্তদেশ নাহি যেন পড়ে
গুল্‌ফনিম্নে, থাকে যেন ললাটের পরে
সেজদার চিহ্নরেখা। পণ্ডিত প্রবর
উচ্চারিবে যেই কথা, তাই যেন লয়
মানিয়া সম্ভ্রমভরে। তারি মতে মত
মিলায়ে চলিতে হবে—শত্রুর তাহার
সত্য মিথ্যা অপবাদ না করিলে পরে
তার সাথে আলাপন দুরাশা কেবল।

৭০

ইস্‌লামের শত্রু যারা তাহারাও কহে
সহজ সরল স্পষ্ট ধর্ম্মনীতি হেন
নাহি আর এ ভুবনে! কিন্তু সেই নীতি,
সেই সত্য, শুদ্ধ নিত্য জীবনের পথ,
মোদের আলেম যারা, তাহাদের হাতে
এতই জটিল আজি, এতই দুর্ব্বোধ
বুঝিবারে নাহি পারে নিজেরাই তারা,
পালন করিতে তাহা নাহি পারে কভু।
যেথায় বিধানে কোনো আছে দুই মত,
সেখানে সহজ অর্থ ছাড়ি খোঁজে তারা
অসম্ভব রূপকথা—রহস্য জটিল।
বুদ্ধি যারে করে ত্যাগ, তাহারেই নেয়
ধরিয়া আদরে তারা ধর্ম্মবাণী বলি।

৭১

অ-মোস্‌লেম করে যদি প্রতিমার পূজা
বিধর্ম্মী কাফের তবে। কেহ যদি বলে
ঈসা ঈশ্বরের পুত্র—নারকী সেজন।
কেহ যদি পূজা করে অনলশিখায়,
তবে সেই অগ্নিপূজী নিশ্চিত সে পাপী।
বিধান রয়েছে অন্য মোস্‌লেমের বেলা,—
মাজার শরীফ কোথা, কাহারো খানকা,
কোথাও চরণ-চিহ্ন, যাহা পায় তারে
পূজা করে ভক্তিভরে! তীর্থ রহিয়াছে,
রওজার ছড়াছড়ি, সেথা ভক্তিভরে
শিরণী মানিয়া আনে নজর নিয়ত!
তাই আজি শত পীর, হাজার ফকীরে
আমরা করেছি তুলি নবীর সমান।
নবীরে তুলেছি আজি খোদার আসনে,
খোদারে ছাড়িয়া করি তাহাদের পূজা।
তবু আমাদের দীন রয়েছে অটুট,
তবুও আমরা সবে একেশ্বরবাদী।

৭২

কোরাণের মহাবাণী "ধর্ম্মের লাগিয়া
করিও না অত্যাচার", সে কথা ভুলিয়া
গিয়াছি আমরা আজি, তুচ্ছ মতভেদে
জ্বলি ওঠে দাবানল আমাদের মাঝে।
আমাদের সকলের হৃদয় সাগর
এত প্রসারিত, তাহা এতই উদার,
সুন্নী কহে শিয়াগণে মধুর বচনে
"তোমরা নারকী সবে, নহেতো মোস্‌লেম!"
শিয়া যারা ইস্‌লামের ভ্রাতৃপ্রেমে গলি'
সাদর সোহাগে ফিরে কহে তাহাদের,
"তোমরা কাফের সবে, দোজখে বসিয়া
জ্বলিবে পরম সুখে!" ওহাবী, হানাফি,
কত ভেদ আসিয়াছে আমাদের মাঝে।

৭৩

ভুলিয়া সহজ ভক্তি উন্মত্ত আবেগ
মানবের মানবতা করি দেয় দূর,—
তাহারি লাগিয়া ধ্বংশ হইল সমূহের
ফেরাউন নিমরুদ। আজি আমাদের

ধর্ম্মকর্ম্ম সব গিয়ে সে অন্ধ আবেগ
--কেবল গোঁড়ামী আর মূর্খের আচার--
হয়েছে ধর্ম্মের অঙ্গ। যারা সমাজের
শিক্ষাদাতা, নেতা, গুরু, শিক্ষা তাহাদের,
"অন্য ধর্ম্মী কহে যারা, তারা যাহা করে
তোমরা ক'র না তাহা।" তারা যদি চলে
সহজ সরল পথ বাহি এ ভুবনে
আমরা ঘুরিয়া যাব দূর বাঁকা পথে
মাঠে, ঘাটে, কাঁটাবনে! তারা যদি কহে
উজ্জ্বল দিনেরে দিন, মোরা তবে তারে
কহিব আঁধার রাতি। তারা যা করিবে
আমরা করিব আন--এই আজি হায়
এ ভারতে আমাদের ধর্ম্মের চুম্বক!

৭৪

সকলে যা করে তার করি' বিপরীত
কুড়াই সবার ঘৃণা, তবু আমাদের
হৃদয়ে অচল দম্ভ, মূর্খের বিশ্বাস
আমরা জগতে শ্রেষ্ঠ। সকলেই যাবে
দোজখে মৃত্যুর পরে, আমরা কেবল
হব স্বর্গবাসী। মোস্‌লেম যে জন
হোক মূর্খ হোক পাপী হোক নরাধাম
সেও ভালো ধর্ম্মপ্রাণ বিধর্ম্মীর চেয়ে,--
এ অন্ধ বিশ্বাস চিতে জাগায় প্রসাদ।

৭৫

সমুদ্র পর্ব্বতময়ী এ ধরণী ভরি
একদিন যেই ধর্ম্ম করেছে প্রচার
সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃপ্রেম মানবে মানবে,
যাহার প্রভাব বলে চিরশত্রু যারা,
তারা হ'ল ভাই ভাই। দেশ বিদেশের
কত না অজানা জাতি--তাতার আরব
পারসিক, ভারতীয়, শক, হুনদল--
আপনার জাতিভেদ, বর্ণের বিভেদ
ভুলিয়া মিশিয়া গেল জলের মতন,
হয়ে গেল একাকার,--অশিক্ষা, অজ্ঞানে
রুদ্ধ স্রোতবেগ আজি সেই ধর্ম্মধারা।

৭৬

আমাদের মাঝে যদি কভু কোন কালে
সমাজ স্বজাতি লাগি' কাঁদে কারো প্রাণ,
সে যদি করিতে চায় এ জঞ্জাল দূর,
আমরা সকলে রুষি দিই তারে দোষ,
কহি তারে--'সয়তান, বিধর্ম্মী, কাফের।'
বিজ্রের মতন মোরা ছড়াই বচন,
"অভিপ্রায় ভালো নহে, রয়েছে নিশ্চয়
কূটবুদ্ধি, এ সকল অভিসন্ধি তার।"
কেহ যে সবারে ভালো বাসিবারে পারে,
কেহ যে পরের লাগি সহিবারে পারে
অম্লান বদনে দুঃখ--সেকথা শুনিলে
স্বপ্নের মতন লাগে, না মানে প্রত্যয়।
এত নীচ এত হীন আমরা আজিকে
স্বার্থত্যাগ আমাদের কল্পনা-অতীত!

৭৭

আচার চরিত্রগুণে ছিল খলিফারা
জগতের শিরোমণি। তবু সেইদিন
পারিত অকুতোভয়ে বৃদ্ধা ভিখারিণী
দিতে উপদেশ তাঁরে--খলিফা লইত
মানিয়া আনতশিরে তাহার নিদেশ।
সেদিন বিচার ছিল। রাজা অপরাধী,
ভিখারীর অভিযোগ, তবু স্থির-হিয়া
ন্যায়ের বিধান মানি করেছে শাসন
ধর্ম্মপ্রাণ বিচারক। ছিল ভাই ভাই
বেদনায় সমব্যথী একে অপরের
একমন একপ্রাণ বিপদে আপদে
ভৃত্য শিক্ষা দিত, তাহা প্রভু হৃষ্টমনে
করিত গ্রহণ, বাসিতনা কোন লাজ।

৭৮

সেই প্রীতি সেই প্রেম আমাদের মাঝে
আজিও রহিত যদি, তবে আমাদের
এই দীনদশা, এই ভিখারী-কুটীর
রাজার প্রাসাদ হ'ত। প্রেম আছে যেথা,
সেথায় দারিদ্র্যে নাহি গ্লানির আভাস,
ভ্রাতৃপ্রেমে সব দুঃখ হ'ত সুমধুর।
ইস্‌লাম শান্তির বাণী--আমাদের মাঝে

শান্তির কোথায় চিহ্ন? আপন ভায়ের
প্রশংসা শুনিয়া আজি জ্বলে আমাদের
হিংসায় হৃদয় মন। পরশ্রীকাতর
আমাদের মতো বুঝি এ ভুবনে আর
নাহি কোথা। অপরের সাধি অমঙ্গল
দিবারাতি। যদি থাকে দুজনার মাঝে
প্রীতির বন্ধন মধু, তবে তারে মোরা
ভাঙিব যেমনে পারি। বন্ধু ছিল যারা
তারা যদি শত্রু হয়, হৃদয়ে মোদের
উপজে গভীর সুখ, তবু মুখে করি
তার লাগি' দুঃখ মোরা। কপট কুটীল
মোদের মতন কেবা? মুখে যাহা কহি
কাজ করিবার বেলা করি বিপরীত,
মুখে মধু জ্বলিতেছে অন্তরে গরল।

৭৯

খোদার রসুল যদি আজি এ ভুবনে
আসিতেন নামি পুন, হেথায় তাঁহার
প্রথম সাধন হত মোদের উদ্ধার!
আমাদের মত কেহ পতিত অধম
নাহিত জগতে আর। আমাদের মত
পথভ্রান্ত সর্ব্বস্বান্ত কে আছে ভুবনে?
নাহি শিল্পকলা আজি, নাহিক সভ্যতা,
বিজ্ঞান সাধনা নাহি, বিদ্যার আচার,
অর্থ নাই, মান নাই নাহি বিত্তধন,
নাহিক সত্যের লাগি একাগ্র আবেগ,
হারায়ে বুদ্ধির মুক্তি স্বাধীন মানস
অজ্ঞান আঁধার মাঝে আপনারে ঘেরি
গোঁড়ামির দুর্গ রচি রহিয়াছি মোর।

৮০

আমাদের মাঝে যারা প্রাচীন প্রথায়
শিক্ষার প্রয়াসী আজো, তাঁরা রয়েছেন
সজোরে আঁকড়ি ধরি' য়ুনান দেশের
বিস্মৃত কল্পনা-ভর অতীত বিজ্ঞান।
সত্যের সাধনা ফলে যে সকল কথা
বহুদিন হল মিথ্যা হয়েছে প্রমাণ
সেই সব তথ্য নিয়ে ধ্রুবসত্যমত
আমাদের আলেমেরা অজ্ঞান আঁধারে
রয়েছেন কূপমাঝে। সে বিদ্যাজগতে
কোন কাজে নাহি লাগে। শিক্ষার্থীরে শুধু
কল্পনা, অসত্য আর অর্দ্ধসত্য দিয়া
রাখিয়াছে অন্ধ করি, শিখায়েছে শুধু
অর্থহীন লক্ষ্যহীন কূট তর্কনীতি।

৮১

তাহারা সকলে যেন সলুব বলদ
এই বিংশ শতাব্দিতে হয় নাই ভুলে
একপদ অগ্রসর। নিখিল জগত
এ দুই সহস্র বর্ষে সভ্যতা বিজ্ঞানে
গিয়াছে কত না দূরে উন্নতির পথে,
আমরা রয়েছি পিছে আজো আপনার
গোলক ধাঁধায় বদ্ধ। এই শিক্ষা যদি
না পেত ছাত্রের দল, তবে আপনার
শরীরের পরিশ্রমে পারিত করিতে
আপনার জীবিকা অর্জ্জন, অর্দ্ধশিক্ষা,
অশিক্ষার ফলে আজি অক্ষম অপটু,
অপরের কৃপাজীবী পথের ভিক্ষুক।

৮২

সকল মানুষ ভাই, সকলে সমান
কোরাণের মহাবাণী,--সে কথা ভুলিয়া
আশরাফ বলি যারা অতিদর্পে ভরা,
মোস্‌লেমসমাজে তারা কলঙ্কের ঠাঁই।
যত নীচ, যত হীন, যত মিথ্যাচারী
তাহারা নিয়ত সাথী, তাহাদের মাঝে
তাহাদেরি মত করে জীবন যাপন।
গণিকার সাথে প্রেম, পতিতের সাথে
অহোরাত্রি সহবাস। গঞ্জিকার ধূমে
আচ্ছন্ন চেতনা কারু, কেহবা সুরার
অবাধ প্রবাহে ভেসে যায় দিনরাত।
শৈশবে তাহারা রহে কঠোর বন্ধনে,
যখনি যৌবন আসে খসে যায় বাঁধ
অমনি যথেচ্ছাচারে মাতে তারা সবে।
মানবের মানবতা নাহি যার মাঝে
পশু ছাড়া তারে আর কি বলিতে পারে?
পশু করে সযতনে লালন পালন
আপনার সন্তানের--তাও নাহি করে

আমাদের সমাজের শিরোমণি যারা।
শিক্ষারে তাহারা ডরে বিষের মতন,
আপনি শিক্ষিত নহে, আপন সন্তানে
দিবে না জ্ঞানের আলো। শিক্ষিত সুজন
তাহাদের চক্ষুশূল, দেখিলে পলায়
দূর হ'তে শঙ্কাভরে। নীচের সহিত
বাস সদা, তাই তারা সদা নীচ মন,
কারো ভালো আঁখি মেলি
দেখিতে না পারে।

৮৩

সমাজে রয়েছে আছি আরো একদল
তাহারা শিক্ষিত সুধী, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে
সুনিপুণ, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য মোদের,
তাহারা মোদের হেরি' শুধু হেলাভরে
হাসে অবজ্ঞার হাসি। অশনভূষণ
মোদের বসনবস্ত্র সকলি তাদের
কৌতুক যোগায় শুধু। অবহেলাভরে
আমরা যা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি,
যা কিছু বিশ্বাস করি, সবি দেখে তারা--
সংস্কার বলিয়া দেয় উড়ায়ে হেলায়,
ভাবে সব অন্ধকার অজ্ঞানের ফল।
তবু নাহি লেশ চেষ্টা সে অন্ধ আঁধার
দূর করিবারে কভু, মোদের ব্যথায়
নাহি তাহাদের মনে সহ-অনুভূতি।
বিদেশীর হাব ভাব চরিত্র আচার,
বিজাতির বাস দেহে, শুধু শিখিয়াছে।
আমাদের দেখি তারা হাসিতে ঘৃণায়।।

৮৪

শুধাল পণ্ডিত বরে আসি একজন
"সংসারে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলি কারে?"
ধীর কণ্ঠে জ্ঞানী কহে, "বুদ্ধি, তার বলে
মানুষ করেছে জয় স্বরগ নরক।"
আবার শুধাল শিষ্য, "বুদ্ধি যার ক্ষীণ,
সেজন চাহিবে কিবা?" কহিলা পণ্ডিত,
"বিজ্ঞান-কৌশল বলে মানব সন্তান
জগতের শিরোমণি।" শুধাল আবার,
"তাও যদি নাহি থাকে?" উত্তরিল সুধী,
"ঐশ্বর্য্য থাকিলে তবু কাটিবে জীবন
সুখশান্তি আরামেতে।" জিজ্ঞাসিলা পুন,
"তাও যদি নাহি থাকে?" তখন পণ্ডিত
কহিলেন রোষ ভরে, "সেই অভাগার
এ ভুবনে বাঁচিবার নাহি প্রয়োজন।
বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, নাই বিত্ত যার
তার লাগি বজ্রপাত সকলের চেয়ে
শ্রেষ্ঠ বর। মানুষের সে ঘোর কলঙ্ক
দূর হবে ধরা হতে, অভাগাও নিজে
জীবন্ত মরণ হতে পাইবে নিষ্কৃতি।"

৮৫

মোস্লেম সমাজ--সে আজি বিপুল তরী।
ঝঞ্ঝাবাতে পড়ি ঘূর্ণিমাঝে ডুবে যায়।
রয়েছে ঘুমায়ে তবু সুখ সুস্বপনে
অভাগ্য আরোহী যত। অর্দ্ধ সুপ্ত যারা
এখনো জাগিয়া আছে, মোহমুগ্ধ তারা
তরণীতে বাঁচাইতে না করি প্রয়াস
বিমূঢ় চাহিয়া আছে, যারা আছে ঘুমে
তাদের জাগাতে চেষ্টা না করি এখনো
কেবল হাসিছে তারা, যেন সকৌতুকে
আরোহীর নিদ্রা হেরি। এদিকে তরণী
নিমেষে নিমেষে ডোবে ঘূর্ণী স্রোত মাঝে
তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাহি। নাহি হায় জ্ঞান,
এখনি জাগ্রত সুপ্ত হবে একসাথে
ধ্বংশের গহ্বর মাঝে হইবে বিনাশ।

৮৬

বুদ্ধিহীন বিদ্যাহীন পথের ভিক্ষুক
ভারত মোস্লেম আজি। ভয় লাগে মনে
ভুবন বিধাতা যদি ডাকে আমাদের
আজিকে শুধান কভু, 'মোস্লেম সন্তান,
তোমাদের বেঁচে থেকে ধরণীর বল
কিবা লাভ? তোমাদের জীবন মরণ
সকলি সমান যবে, ধরণীর ভার
অকারণে বাড়ে শুধু, তার চেয়ে ভালো
স্মৃতিহীন দীপ্তিহীন অতল মরণ।'

৮৭

তাই আজি ডাকি কহি হে মোস্লেম ভাই
তোমরা সকলে যদি না হও সত্বর,
এখনো সতর্ক যদি নাহি হই মোরা
তবে আমাদের ধ্বংশ অনিবার্য্য স্থির।
অতীত বিলাস ছাড়ি ওঠ পান্থ ওঠ,
জীবনের পথে দ্রুত হও অগ্রসর,
এখনো আলস্য ত্যজি', ত্যজি' স্মৃতিপূজা
আবার জাগিয়া ওঠো। ধর্ম্মের গোঁড়ামী,
অন্ধাচার বন্ধ যত করিয়া বর্জ্জন
বুদ্ধির আলোক দীপ্ত জীবনের পথ
বাছি লও। যারা দোষ শুধিবারে চাহে
তাহাদের শত্রু বলি গণিওনা মনে,
তাহাদের কথা শুনি নতুন করিয়া
জীবন পত্তন করি হও অগ্রসর।

৮৮

দেখ আজি দিকে দিকে ভারত ভরিয়া
নূতন জীবনস্রোতে নবীন হিল্লোল
জাগিয়াছে--জাগিয়াছে সব জাতি হেথা।
আজি হেথা চিরশান্তি নিত্য বিরাজিত,
নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি যুদ্ধ, নাহিক সংগ্রাম,
পথের বিপদ নাহি, দেশবাসী সবে
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হয়েছে বাহির
দ্রুত উন্নতির পথে। শিক্ষার প্রসার
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, য়ুরোপের জ্ঞান,
তাহার বিজ্ঞান শিল্প তোমার দুয়ারে--
ওঠ, জাগ, তার বলে নব বলীয়ান
আবার জগত মাঝে হও অগ্রসর,
আবার করিয়া লও আপনার স্থান।

৮৯

সমর অঙ্গন এই এ সংসার ভূমি,
নিত্য যুঝিবার তরে জনম মোদের,
যেজন সাহসহীন ভীরু কাপুরুষ,
যুঝিবার নাহি চাহে, তাহার লাগিয়া
রয়েছে মরণ শুধু, একান্ত বিস্মৃতি
যশোহীন ভাতিহীন অতল আঁধারে।
তোমরা পতিত আজি, নিখিলের মাঝে
অধম সবার চেয়ে, তবু যদি আঁখি
নাহি ফোটে, চিতে যদি নাহি লাজ
আমাদের নাহিক নিস্তার। রহিয়াছে
আরো দুঃখ আরো লজ্জা আরো অপমান
অদূর ভবিষ্য ভরি', আজিকার দশা
স্মরিয়া সেদিন মনে হবে স্বর্গসুখ!
আজি আর কি হয়েছে? কিছুদিন পরে
রহিবেনা আমাদের অনুচিহ্ন লেশ,
কেবল রহিবে নিন্দা, কলঙ্কের কথা,
কেবল নিখিল বিশ্ব দুষিবে মোদের।

৯০

তাই শেষবার ডাকি কহি আজি সবে,
এখনো জাগিয়া ওঠো, করমের পথে
এখনো সম্মুখে চলো। আসিবে আবার
পূর্ব্ব কীর্ত্তি পূর্ব্ব মান ফিরিয়া জগতে।
আজি আসিয়াছি মোরা জীবন যাত্রার
সন্ধি পথে। এক পথ গিয়াছে চলিয়া
উন্নতির শৃঙ্গশিরে, অন্যপথ গেছে
পতনের অতল গহ্বরে। ঘুমাবার
আর তো সময় নাহি, উঠেছে বাজিয়া
পূরবে পশ্চিমে শোন ডম্বরু-নিনাদ,
এখন সুপ্তির মাঝে আলস্যে বিলাসে
রহিবে কি? আজো আখি ফুটিল না তব?
আজি সবে আগে চল--লাজ অপমান
আলস্য আরাম ত্যজি'--দিবানিশি শুধু
কঠোর কর্ম্মের স্রোতে ভেসে চল সবে।
কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর সারা দিন মান
কর্ম্ম কর দিবসেতে ঘোর রজনীতে।
শিক্ষার মশাল জ্বালি হও অগ্রসর--
অসীম আঁধার আসে ঘনায়ে ভুবনে,
পরাণ-প্রদীপ খানি জ্বালি সযতনে
জীবনের পথে আজিও হও অগ্রসর।।

-- তামাম শুদ --

মহম্মদ ইকবাল

ইক্‌বালের প্রার্থনা

(উর্দ্দু হইতে)

অনুবাদ : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম-এ, বি-এল্‌, ডি-লিট (প্যারিস)

প্রভো! মুস্‌লিমের হৃদয়ে সেই সজীব ইচ্ছা দাও,
যা হৃদয়কে গরম করে দেয়, আত্মাকে সবল করে দেয়!
ফারান প্রান্তরের প্রত্যেক অণুকে আবার আলোকিত করে দাও,
আবার কৌতুকের আগ্রহ দাও, আবার সন্ধানের স্বাদ দাও।
কৌতুক-বঞ্চিতকে দেখবার চোখ দাও,
যা কিছু আমি দেখেছি অন্যকেও দেখিয়ে দাও!
পথহারা হরিণকে মক্কার দিকে আবার নিয়ে চল,
এই নগরের অভ্যস্তদের মরুর বিস্তৃতি দাও!
নিস্তব্ধ হৃদয়ে ক্বিয়ামতের জনতার কোলাহল এনে দাও,
এই খালি হাওদায় প্রিয়া লায়লীকে বসিয়ে দাও!
এই কালের অত্যাচারে ব্যাকুল প্রত্যেক হৃদয়কে
প্রেমের সেই কলঙ্ক দাও, যা চাঁদকে লজ্জা দেয়।
লক্ষ্যের উচ্চতায় কৃত্তিকা নক্ষত্রের সমান কর,
বেলাভূমির মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দাও, সমুদ্রের মত স্বাধীনতা দাও!
প্রেম নির্ম্মল হোক্‌, সত্য নির্ভীক হোক্‌,
বক্ষ উজ্জ্বল করে দাও, আয়নার মত হৃদয় দাও!
বিপদের পিছু পিছু আত্মবোধ জন্মিয়ে দাও,
আজকের কোলাহলে কালকের চিন্তা দাও!
শূন্য ফুল বাগানের এক বিলাপী বুলবুল আমি,
ফল কামনা করি, দাতা! ভিখারীকে দাও!

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫)

আকাঙ্ক্ষা

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের "এক আরজু" নামক কবিতার অনুবাদ

অনুবাদ : মঈনুদ্দীন

পৃথিবীর কলরবে ক্ষুব্ধ মোর মন,—
চিত্ত যবে অবসাদে নীরব নিশ্চল
কিছুই তখন আর নাহি লাগে ভালো,
আকর্ষিতে নাহি পারে মত্ত কোলাহল।

জনতার গুঞ্জরণ ছাড়ি মোর মন
একান্তে খুঁজিয়া ফিরে স্তব্ধ নীরবতা,
এমন স্তব্ধতা যাতে সমাহিত হয়
যত বাণী, যত গান—যতেক বারতা।

মৌনতার মাঝে যেন আমি ডুবে থাকি;
আর মোর আছে শুধু এক নিবেদন,
পর্ব্বতের পাদদেশে যেন থাকে মোর
পাতার কুটীর এক নিরালা নির্জ্জন।

পৃথিবীর চিন্তা থেকে মুক্তি আমি চাই,
শুধু অবসর যেন পাই প্রতিদিন,—
মনে মোর পৃথিবীর বেদনা কণ্টক
ফুটিতেছে, যেন তাহা হোয়ে যায় লীন!

পাখী-কাকলীতে যেন থাকে মধুরিমা,
ভোরের কূজনে শুনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত,—
ঝরণার ধারা যেন কুলু কুলু গাহে
আমার শিয়রে সদা বহে অবারিত।

কুসুমের কুঁড়ি যবে হয় বিকশিত
পাই যেন তাতে কারো সুধামাখা বাণী,—
সৃষ্টির আদি ও অন্ত তার মাঝে দেখি
কল্পনেত্রে হেরি তাহে সারা বিশ্বখানি।

থাকি যেন শুয়ে আমি বাহুর সিথানে
সুকোমল-শষ্প-শ্যাম শয্যার উপর;

আকাঙ্ক্ষা

নির্জ্জনতা হেরি যেন ক্ষুদ্র কুটীরের
শরমে কুণ্ঠিত হয় মুখর শহর।

বুলবুলির ভীরু হিয়া যেন নাহি কাঁপে
মোর ভয়ে ত্রস্ত যেন কভু নাহি হয়,
সখ্যের কুসুম-পাশে বাঁধে যেন মোরে—
বিশ্ব তায় হেরি, অপূর্ব্ব বিস্ময়!

বন্ধুসম পথে যেন রহে দাঁড়াইয়া
শ্যামল বৃক্ষের সারি মোর চারিদিকে,
কাচ-স্বচ্ছ নদী জল কৌতূহলে যেন
তারি অনুপম ছবি আঁকি অনিমিখে।

নির্জ্জন পাহাড় আর সুন্দর প্রকৃতি
প্রাণভরি হেরি যেন স্রোতস্বিনী ধারা,
দুরন্ত আবেগে ওঠে তীরে উছলিয়া
সিন্ধুবুকে জাগে নিত্য তরঙ্গের সাড়া!

স্বপনে শিহরি তৃণ নিরুদ্বেগে যবে
সবুজ মাঠের বুকে আলসে ঘুমায়,
আঁকি বাঁকি তারি 'পরে ঝরণার ধারা
বহিয়া চলিয়া যেতে যেন চমকায়!

ফুলদল নুয়ে যেন ছুঁয়ে জলতল
জলেরে আরসী কবি দেখে রূপরাশি,—
তন্বাঙ্গী রূপসী দেখে বাসরে যেমন
দর্পণে আপন রূপ মুখে মৃদু হাসি।

মেহেদীর রঙ-ছোপা সূর্য্যাস্তের রাগে
পুষ্পতনু ওঠে যেন প্রতিদিন রাঙি,—
সোনালী আলোর কণা অলস আবেশে
পাঁপড়ি পরাগে যেন পড়ে ভাঙি' ভাঙি'!

রাত্রির পথিক যবে দিক্-সীমা ভুলি
অন্ধকারে খুঁজে ফিরে আপন আশ্রয়—
মোর ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষীণ দীপ যেন
সতত আশার শিখা প্রজ্জ্বালিয়া রয়!

বিজলী চমকি যেন ওঠে অকস্মাৎ—
পথিকে দেখায় মোর বিজন কুটীর;
বাদল ঘিরিয়া যদি থাকে নীল নভেঃ
উজলিয়া ওঠে যেন যত বন তীর।

ভোরের কোকিল যেন নিশি শেষে মোরে
প্রত্যহ জাগায় গাহি' মধুর আজান্—
আমি যেন গাহি গান শুধু তারি তরে
সে-ও যেন মোর লাগি নিত্য গাহে গান।

চোখে যেন নাহি পড়ে মস্‌জিদ-মিনার,
কানে নাহি পশে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি,—
ভোরের আলোক যেন মোর বাতায়নে
পশিয়া জানায় মোরে তার আগমনী।

অজু করাইতে নিত্য সকাল বেলায়
আসে যবে ফুলদলে শিশির কলিকা
মোর তরে অশ্রুজল অজু হয় যেন—
আহাজরী জীবনের আশীর্ব্বাদ-লিখা!

এই নিস্তব্ধতা-মাঝে মোর কণ্ঠধ্বনি
সকল ছাপায়ে যেন ওঠে শুভ্রাকাশে,—
তারার 'কাফেলা' যেন চকিতে চমকি'
সহসা জাগিয়া ওঠে নীল অভ্র পাশে।

আমার ক্রন্দন প্রতি ব্যথিতের মন
কাঁদাইতে পারে যেন নিশি দিন মান,—
তন্দ্রায় আচ্ছন্ন যারা ঘুমে অচেতন
তাদেরে জাগায় যেন মোর গীত গান।

তর্জ্জমা

(ফারসী হইতে)

অনুবাদ : মোহিতলাল মজুমদার

অন্তর-তর

নিশীথ-স্বপনে তোমারেই হেরি,
দিবসে ভাবি গো তোমারি কথা;
বিজনে তোমার পথ-চেয়ে থাকি,
খুঁজে ফিরি তোমা জনতা যথা।
তবু তুমি, প্রিয়ে, আছ চিরদিন
কাছে কাছে--মোর ছায়ারও চেয়ে,
নিশাসেরও চেয়ে অন্তরতর
অন্তর মোর রয়েছে ছেয়ে!

ক্ষণিকা

চাই না প্রণয়--চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায়!
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি--
নিমিষের দেখা, মধুর বিদায়।

(বৈশাখ, ১৩৪৩)

তারানা-ই-হিন্দ

মহম্মদ ইক্‌বাল

সকলের সেরা মহান্ এ দেশ
আমাদের এই হিন্দুস্তান্
বুলবুলি এর আমরা সবাই
এই আমাদের ফুল-বাগান্।
"আসুক দুঃখ দৈন্য ভার
তবু প্রিয় তার কুটির-দ্বার।
ধূলি সনে তার জড়িত মোদের
এই দেহ এই প্রাণ।"
"ভা'য়ে ভা'য়ে যাহে ভেদ শিখায়
সত্য ধর্ম্ম নহে সে হায়!
আমরা সবাই হিন্দুস্তানী
ভারতের সন্তান।"

সাফল্য

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙা কালীবাড়ীর সামনে বাঁধানো বটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেচে। এখানে প্রথমেই বলা উচিৎ, রূপগঞ্জ কোনো বড় ব্যবসার জায়গা নয়--কোনো কালে ছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ- দু'দশঘর ব্রাহ্মণের বাস; এ ছাড়া কামার, কুমোর, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকা তো দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদীখানার দোকান। কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থা এমন করে তুলেচে যে, দোকানের মালিক দোকান তুলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে--অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকীবকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাক্‌বে না। রূপগঞ্জে সবাই গরীব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেচে।

কালীবাড়ীর বটতলায় বসে এইসব কথাই হচ্ছিল—রোজই হয়, আজ ত্রিশবছর ধরে হয়ে আস্‌চে। এর আগে কি হয়েচে না হয়েচে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখন অনেকেই বেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না— বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ীর আড্ডার মায়া কাটাতে হয়, পৈতৃক আমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে হয়। বিশবছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণ-করা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেন ঃ কি জানো নারাণ ভায়া! এই জায়গাজমিগুলোই হয়েচে কাল--নইলে এ গাঁয়ের মুখে কাঁটা মেরে কোন্‌দিন বেরুতাম। এই আমাদের দুঃখু! বিদেশে যারা বেরিয়েচে, তারা বেশ দু'পয়সা- এই ধরো না কেন, সকলের দীনু ভট্‌চায্যির ছেলে -চেনো তাকে? আরে, অই যে রোগা ঘ্যানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ী কালীপূজা দেখ্‌তে আসতো মনে নেই? সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায় মর-মর হলো, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। এখন বেশ সেরে উঠেচে, আর সে পিলেরোগা চেহারা নেই। সেদিন শুন্‌লাম, রেলে চাক্‌রী পেয়েচে—পঁয়ত্রিশ টাকা করে মাইনে। থাকে অই মগরা লাইনের ওদিকে যেন কোথায়। উপযুক্ত ভৌগলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যে বর্ণনাটাকে বিশদ করে তুল্‌তে পারলেন না।

হারাণ রায় বল্লেন ঃ তোমার সেই চাক্‌রীর কি হোল, পঞ্চু ভায়া?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গণ্ডী পার হননি, কিন্তু উঠ্‌তি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাকরী পেলে করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয়নি। গ্রামের সামান্য সম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না--অন্য জায়গায় হোলে অচল হোতো, রূপগঞ্জ বলেই চল্‌চে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ী 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন, কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটী দুই তিন চাকুরী খালি আছে--কাজ জানা দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েচেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানা মলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সকলকে দেখিয়ে ম্লানমুখে বল্লেন ঃ এই তো তারা চিঠি দিয়েচে--কালকে সকলের হাটে পিয়ন বিলি কল্লে। কিন্তু পাঁচ শো টাকা নগদ জমা চায়! কোথা থেকে দেবো নগদ পাঁচ শো টাকা জমা? পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই; নাঃ ও-সব আমাদের জন্যে নয় হে--

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ী থেকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে নিয়ে বটতলায় এসে পৌঁছুলেন। সবাই জানে যে মধু লাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েচেন তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, গত কার্ত্তিক মাসে। এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাঁকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বল্লেন : কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েচে আমার বাড়ী, জানো না বোধহয়? রান্নাঘরের জান্‌লার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজন দাঁড়িয়েছিল--রাম ছাদ থেকে দেখ্‌তে পায়। সে বাইরে এসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না রাত, দেখে যে কালোমত কে একজন জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙেচে। আমারও ঘুম ভেঙেচে। সবাই ছাদের বার হয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই--কিন্তু রান্নাঘরের পেছনে সেওড়া-গাছগুলোর মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে। সারা রাত জেগে কাটিয়েচি। গাঁয়ে বাস করা ভার হোল দেখ্‌চি!

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হোল না। কেউ কথাটা বিশ্বাসও করলে না। সবাই ভাব্‌লে হাতে টাকা হয়েচে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ীতে চোর যাতায়াত করে রাত্রে--এটা বড়মানুষী দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে বল্লেন : তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানের মধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাক্‌বে কাল পড়েছে বড়ই খারাপ।

মধু লাহিড়ী বল্লেন : উঠে যাবো উঠে যাবো করি, কিন্তু উঠে যাই বা কোথায়? একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়ী বলাগড় গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে বেজায় ম্যালরিয়ার জায়গা--আমাদের এখানকার চেয়েও বেশী। তাই দাদা বারণ কল্লে, দুই ভায়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেই থাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দি দু'জন। তাই--

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন : না, উঠে যাবে কেন? সবাই যদি উঠে যাবে, তবে গাঁয়ে থাক্‌বে কে? তোমাদের বাড়ীর পাশে শ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনও পড়ে আছে—তোমরা দেখোনি। আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যে এখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ী চলে গেল, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে। অবস্থা ভাল ছিল না, থাক্‌বার মধ্যে ছিল ওই ঘাটের ধারের আমবাগানখানা--এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছু ধানের জমি, তাতে বছর চল্‌তো না। একশো টাকায় সম্পত্তি বিক্রি করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা কিন্‌লেন, আমার বেশ মনে আছে। তারপর এখন আবার মাখনকাকা কিনে নিয়েচেন রাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনা সম্পত্তি, ও অপবাদ আছে, ওর ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি বল্লেন : অনেক দিন পরে শ্যামাপদর কথাটা উঠ্‌লো। শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনেরো বছরের বড় ছিল। তা'হোলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছি খাঁ'দের পুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁহে, তার সে ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো? তার অন্নপ্রাশনে নেমতন্ন খেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার মাস দুই পরেই শ্যামাপদদা মলো। আহা, সে সব কি আজকের কথা!

পঞ্চু বল্লেন : না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেন : কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায়? এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাকতো, তবে কি আর এখানে পড়ে থাক্‌তে যেতুম? এই যে আমার বাড়ী কাল রাত্তিরে কাণ্ডটা হয়ে গেল--মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পঞ্চু অসহিষ্ণুভাবে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎ মোটর গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাই সেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ী যে এ-গ্রামে আসে না তা' নয়, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী ষ্টেশন থেকে মাঝে মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই সখ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেচে, শক্ত অসুখে কেউ পড়লে মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে--কিন্তু এ-ধরণের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ী উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ দেখেনি। লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড গাড়ী, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল-ল্যাম্প--সবই ঝক্‌ঝকে; তবে গাড়ীর পেছনে ও মাড্ গার্ডে রাঙা ধূলো জমেচে--যেন অনেক দূর থেকে আস্‌চে।

একজন ত্রিশ বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ী চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় একমাথা ধূলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল এবং অল্পক্ষণ উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে কি যেন চেন্‌বার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বল্লে : এই যে কাকা! আমায় চিন্‌তে পারচেন না?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়েও বল্লে : কাকা, আমায় মনে নেই আপনার? আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই--

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চুও তাই। দুজনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন : রাজেনদা'র ছেলে সেই ননী!

এর বেশী কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বর্ত্তমানে বার হোল না। ইতিমধ্যে ননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদীর এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরের আদানপ্রদান চল্‌তে লাগল্‌।

হাঁ, রাজেন বাঁড়ুয্যেকে কার মনে নেই? বেশীদিনের কথা তো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়। রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। এই মাঠে কালীতলায় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো--সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁড়ুয্যে মহকুমার রেজেষ্ট্রি আফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশীউকীলের বাসার থাক্‌তো। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধূলো নিয়ে বাড়ী আস্‌তো--আবার সোমবার ভোরবেলা মহকুমায় ফিরতো। বিশ বছর আগে রাজেন বাঁড়ুয্যের লাঠির আগায় কেম্বিসের ব্যাগ-ঝোলানো মূর্ত্তি গ্রামের পথে ঘাটে অতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়ে রাজেন্‌ শশী উকীলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মা তার পরও বছর দুই গাঁয়ে ছিল, কিন্তু শেষকালে চলাচল্‌তির কোন উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরে ভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোন খবর কেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরে চড়ে।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে সবাই দেখ্‌লেন, গাড়ীর পিছনের সিটে একটী মহিলা ও দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হারাণ বল্লেন : সঙ্গে কে ননী?....বৌমা?......আরে ছি, ছি, কি ছেলেমানুষ! এসো, এসো নামিয়ে নিয়ে এসো। এই রদ্দুরে কিনা--এই কাছেই তোমার গরীব কাকার বাড়ী, এসো বৌমাকে আমার নিয়ে এসো। পঞ্চু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন : তা কি কখনো হয়? আমার সঙ্গেই বাবাজির প্রথমে কথা হোল--আমার বাড়ীতেই এ-বেলাটা অন্ততঃ--

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল মুখে ননী ও তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ-সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ রায়ের বাড়ীতে রথযাত্রার ভিড় শুরু হোল। ননীর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্ত্তায় খুব অমায়িক বড়মানুষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখেচে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে--সবাই বলাবলি করতে লাগলো : একেই বলে অদেষ্ট! এর মা ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কাণ্ড! ভগবান যাকে যখন দ্যান্‌--ইত্যাদি।

পঞ্চু বল্লেন : আহা, সকাল বেলাতেই তো বলছিলাম, এ গাঁ ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েচে সে-ই উন্নত করেচে--কেউ বেশী, কেউ কম। আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকে নিজেকে মাটী না করি, তবে আমার কি এ দশা হয়? না--এবার বেরুতে হবে। দেখি একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু যোগাড় টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে গ্রামের কেহই অসুখী নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সঙ্গে এগ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না--তা'ছাড়া সবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন ননী ছিল ছোট ছেলে--তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বন্দ্বের স্মৃতি কারো মনে গড়ে ওঠে নি--ছোট ছেলের উপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকাণ্ড মজ্‌লিস বসেচে--মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়ে বসে ননী--তাকে গোলাকারে ঘিরে গাঁয়ের বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি ক'রে সে বড়লোক হোল, এ কথা সবাই শুনতে চায়।

শ্রীপতি কর্ম্মকার ওপাড়ার একজন গণমান্য ব্যক্তি, তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতির সঙ্গে ননীর বাবা রাজেন্‌ বাঁড়ুয্যের খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীর আস্‌বার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়া থেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেন--তা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কল্‌কাতাতেই?

--আজ্ঞে না, আমি থাকি, হোসঙ্গাবাদ, নর্ম্মদার ধারে, সি, পি--সেখানেই আমার কাঠের গোলা আর আপিস্। কল্‌কাতাতে এসেছিলাম--একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিন্‌বো বলে। কাল তাই ভাব্‌লাম গাড়ীখানা তো কেনা হোল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখে আসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝতে পারলেন না, নর্ম্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন--কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এঁদের ধারণা কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। পঞ্চু মুখুজ্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগেস্ করলেন--বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজি?

--ওই হোসঙ্গাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করেচেন, তবে কল্‌কাতায় সব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। এক বেলা থাক্‌বার জন্যে ননী এসেছিল এখানে--কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিনবছর বয়েসে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ীর পেছনে ডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল; মৃতদেহ যখন ভেসে উঠেছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এ পাড়া ওপাড়া খোঁজা হচ্ছিল।

সেই ডোবাটি তেমনি আছে। এ-সব পাড়াগাঁয়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদ্‌লায় না, হয়তো আরও বিশ বছর ডোবাটা থাক্‌বে, হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর থাক্‌বে। ননীর বয়েস তখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষাদিনের কথা আজও তার বেশ মনে আছে--কখনও কি ভুল্‌বে? ওপারের ওই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপাড়ে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। হোসঙ্গাবাদে তার কিসের বাঁধন আছে? কিছুই না--সে দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর। এতদিন আসেনি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়ের করুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুট্‌লো--সে কিভাবে তার দিকে চাইতো, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিলটি--আশ্চর্য্য! মানুষের এতও মনে থাকে!

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্ত্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সাম্‌নে পড়ে আছে দেখ্‌তে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ--তার মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদলাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি! তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে, আজ মনে হচ্ছে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতাবিহীন একটা পথে চলে এসেচে--গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারেনি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটা তার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয়নি!

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলে-লুকোনো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে--তার সোপানশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে, এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি বা না পড়লেই কি?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব ঠিক করতে হবে, ফরেষ্ট্ অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অঙ্ককে বাড়াতে হবে। আরও কত শত দরকারী কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে হোসেঙ্গাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চল্‌বার মত সময়ও নেই, বয়েসও নেই। সাফল্যের আলেয়া তাকে ব্যর্থতার যে-পথে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেচে--সেই পথই তার পথ।

তবু এই দিনটী সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো, এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পানা-শেওলা-ভরা ডোবা, এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্ত্তটী--স্বপ্নের মত মনে আস্‌বে বহুদূর উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রশংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারী ফণ্ডে শ'দুই টাকা দিলে। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে হারাণ রায়ের বাড়ীতে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলে। একটী অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাকতে চায় না, ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হবে--তা ছাড়া হারাণ

রায়ের বাড়ী তেমন ঘরদোর নেই, থাকবারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ী চালিয়ে, হারাণ রায়ের বাড়ীশুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননী গ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পদ্ম মুখুয্যে বল্লেন : একেই বলে ছেলে ! বিদেশে না বেরুলে কি পয়সা হয় বাপু? দেখে নিলে তো চোখের ওপর? তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুনবে না? গাঁয়ে কারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সামনে বড়মানুষী চালে কথা বলে পার পায়। দেখি, এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি--

পূর্ণিমা রাতের স্মৃতি

আবু রুশ্‌দ্

মানতেই হবে বাবরের কপাল ভাল। তার মত ছেলে যে হঠাৎ আই.সি.এস হয়ে বসবে তা অনেকের পক্ষেই কল্পনা করা মুশ্‌কিল ছিল। কিন্তু সে বাবরই আই.সি.এস. হয়েছে। বিয়ে করেছে বাবর ভাল ঘরেই। আয়শাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে বাবর অসন্তুষ্ট নয়, আর বছর দুই হোল তাদের একটা সুন্দর সুস্থ সবল ছেলে হয়েছে। গ্লাক্সো খাওয়া স্টেটস্‌ম্যানে বিজ্ঞাপিত নাদুস নুদুস ছেলে — নাম শাহাদাৎ। বছর তিন হয়েছে মাত্র তাদের বিবাহের, তাদের পৃথিবী এখন রসে বর্ণে গন্ধে ছন্দিত। যৌবন-চাঞ্চল্যে উচ্ছ্বসিত, পৃথিবী এখন কোমল সুন্দর, মমতায় করুণায় প্রেমে উষ্ণ, উচ্ছ্বলিত।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে শ্রান্ত দেহকে একটা ইজি চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে আয়শাকে বাবর বলল — এবার বদলী করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। শাহাদাৎ তখন একটা টিনের বাক্স নিয়ে খেলা করছিলো, ক্রীড়ারত শিশুটীর দিকে চেয়ে আয়শার মুখটা সহসা আশঙ্কায় কাল হয়ে ওঠে। কথা বলার সময় তার গলাটা কেন যেন কেঁপে উঠেছে — সেই যেখানে তোমার ছোট ভাই মারা গিয়েছিলো? বাবর সংক্ষেপে উত্তর করে হুঁ। বাবরের জুতোর ফিতা আল্গা করতে করতে আবার একসময় বলে ওঠে : কখন যেতে হবে? — দিন পনের পরে, বাবরের মুখটা তবুও গম্ভীর বিষণ্ন।

চারিদিকে কি একটা রহস্যকর পারিপার্শ্বিকতা গড়ে উঠেছে। শিশু শাহাদাৎকে কোলে তুলে তার গালে চুমো খেয়ে আদর করে বাবর বলল : এই বল ঘোড়া গাড়ী টনটন। শাহাদাৎ অস্ফুট কণ্ঠে বাবরের স্বর অনুকরণ করবার চেষ্টা করে বললে : দোড়া দাড়ী তান তান। জোর করে হেসে ক্ষুব্ধতা ঝেড়ে ফেলে আয়শাকে লক্ষ্য করে বাবর বলে . বাহাদুর হয়েছেন তোমার ছেলে, এখনও একটা কথা ঠিক করে বলতে শিখল না। এ ছেলের হবে কি! গাল ফুলিয়ে 'বনীবেবী'র মত শাহাদাৎ হাসতে থাকে, দাঁতও কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আয়শা চেয়েছিলো আকাশের দিকে — আকাশ ক্রমেই গাঢ় কাল হয়ে আসছে, চিলরা উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে, এখনই হয়ত এ পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়বে জল, জননীর স্নেহে, হয়ত বা আয়শার হৃদয়ের প্রগাঢ় মমতা নিয়ে। আয়শার মনটা তবুও কেমন করতে থাকে, একটা কারণহীন অস্বস্তির ভাব। বাবরের কোল থেকে জোর করে শাহাদাৎকে ছাড়িয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে খুব করে চুমো খেতে থাকে — বাইরের আকাশের সঞ্চিত মেঘের নিবিড় কারুণ্যের প্রভাবেই হয়ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি হয়েছে শুনে বাবর ও আয়শার — মনে যে একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছিলো তা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেল। সাবডিভিশনাল অফিসারের গৃহিণী আয়শা। ডেপুটী গৃহিণীরা, সাবডেপুটী গৃহিণীরা এবং উকিল জমিদারদের গৃহিণীরা সকলেই একে একে এসে একবার আয়শাকে দেখা দিয়ে যান, করে যান গল্প-গুজব, শাহাদাৎকে আদর করে কেউ কেউ বা কিছু উপহার দিয়ে যান — আয়শার নিরতিশয় আপত্তি সত্ত্বেও ... এই সব ঘটনায় জীবন আবার স্বচ্ছ ভাবনামুক্ত হয়ে উঠল। আর বাবর। অফিসের কাজেই সে ব্যস্ত থাকে, এসে কোথায় পানা-কচুরী, কোথায় খাল কাটা দরকার, কোথায় পার্ক করবে ইত্যাদি সব জনহিতকর কার্য্যে মশগুল হয়ে ওঠে। কোনদিন বা ষ্টেশন-ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে, আলোচনা করে। বাড়ীতে আয়শা আর 'বনী' ছেলে শাহাদাৎ। এর চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিষ মানুষের কি হতে পারে? বেশ আনন্দে দিন কাটছে বাবরের। হাসি খুসী, গল্প গুজব, — টাকার স্বচ্ছলতা নেই, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর 'বনী বেবী', এমন সম্মান ... বাবরের ভাববার সময় কই যে দশ বৎসর আগে তার ভাই এখানে মারা গিয়ে এ দীর্ঘ সময় ধরে এখানকার এক অবজ্ঞাত জায়গায় গভীর ভাবে নিদ্রা যাচ্ছে?

ইষ্টারের ছুটী হয়েছে দুদিন। বাবর ভাবছিলো কেমন করে এ ছুটী কাটান যায়। ভৈরব বাজার এখান থেকে মাইল তের হবে। সেখানে এখানকার একটা বিশিষ্ট উকিলের বাড়ী। তিনি বিশেষ অনুরোধ করে বলছিলেন : স্যর বলতে সাহস

হয় না, তবে যদি মেহেরবাণী করে গরীবের ঘরে ... কিন্তু বাবর এ পর্য্যন্ত কিছু ঠিক করতে পারে নাই। কথাটা আয়শাকে বললে সে বলল : পাগল, ওখানে গিয়ে কাজ নেই। অতএব ও কিছু না। আয়শা আরও বলেছিল — একা কোথাও যেও না।

প্রকৃতির আদিম রহস্য এ পর্য্যন্ত মানুষ আঁচ করে উঠতে পারল না, সত্যি বিস্ময়ের কথা। না হলে বাবরের কেন হঠাৎ দুর্নিবার ইচ্ছা হচ্ছে রশীদের কবরের এখানে যেতে।

সে রাত ছিল পূর্ণিমার। বাবর কবরস্থানের দিকে যেতে থাকে, একবার ইচ্ছা হয়েছিলো আয়শাকে ডেকে নেয়, শিশু শাহাদাৎকে। কিন্তু না, আয়শা কাজে ব্যস্ত আছে।

কবরস্থানে। পূর্ণিমা মফঃস্বল শহরের বিশেষ করে এ জায়গাটায় কেমন এক বিচিত্র কুহক রচনা করেছে; পাশে অনেকগুলো টিনের বাড়ী, উত্তর দিকে ষ্টেশন, সামনে ধান ক্ষেত, রেল লাইন ... ষ্টেশনের বাতি, দূরে সিগন্যালগুলো। আর চারদিক ঘিরে গাছ — শ্যামলতার প্রাচুর্য্যে তা এ পূর্ণিমা রাতের শুভ্র জোৎস্নার সাথে মিশে এক অনুপম রহস্যব্যঞ্জক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। সামনের ধানক্ষেত, অনেক বড়, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। এ মাঠের ত' শেষ হওয়ার দরকার নেই। খানিক আগেই একটা আবছা অপার্থিব ভাব, চারদিকে একটা উন্মত্ত উল্লাসের ভাব, পেছনে কার হাতছানি। সমস্ত দৃশ্য কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে! এখানে কি কি জিনিস কাঁপছে, এখানে এমন বাতাস, আর আকাশের সুনীলতা এবং শূন্যে রুপার মত ঝকঝক-করা শুভ্রতা। ঘাসের ওপর বাবর বসে পড়ে। ওই বুঝি রশীদের কবর। ওখানেই এক জায়গায় হবে যেখানে দশ বৎসর আগে হেমন্তের কোন মধুর সন্ধ্যায় রশীদকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। বাবর সম্মোহিতের মত ভাবতে লাগল, মনে হল কার যেন কাঁদার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে, বাবরের হৃৎপিণ্ড দুলে উঠেছে হঠাৎ। বাবরকে কে যেন জোর করে এখান থেকে উঠিয়ে রশীদের কবরটার পাশে নিয়ে যায়, তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সেখানে বসে পড়ল। কবর যে এখানে এককালে ছিল তা এখনও বোঝা যায়, ঘাসে ঢাকা বলে দূর থেকে টের পাওয়া যায় না। বাবরের মনটা পরিমাণহীন মায়ায় হঠাৎ রণরণিয়ে ওঠে, কেমন করছে বাবরের মন। উপরে আলোকের পৃথিবী — উপরে যে পৃথিবী তার সুনীল আকাশে চাঁদ উঠে তাকে আলোকের উৎসবে, আনন্দের প্লাবনে, উচ্ছৃঙ্খল মাধুর্য্যে ছেয়ে ফেলে। বাবরের সহসা মনে হয়, এমনিই : দশ বৎসর ধরে শিশু কঠিন মাটী ও অভেদ্য আঁধারের ক্রুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য ব্যাকুল ... প্রাণপণ চেষ্টা করেছে — তার নরম, মোমের মত নরম দেহে যখন কোন জিনিসের মায়াহীন আঘাত লেগেছে তখন তার নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য এককালে সকলের খুব আদরের রশীদ পৃথিবীর মানুষের স্নেহোষ্ণ মমতাকোমল স্পর্শ পাওয়ার জন্য হয়ত বা এ দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে অবিরত কাঁদছে — পেতে চাচ্ছে মায়ের বুকের পরশ, বাবার বাহুবেষ্টন, ভাইবোনদের আদর আপ্যায়ন। বাবরের বুকটা কেমন করে উঠছে — রশীদ যে আসতে চাচ্ছে তার কাছে — যে ভাই তাকে সব চেয়ে বেশী আদর করত, তার কোলে ফিরে আসতে চাচ্ছে শিশু রশীদ। বোকা ছেলে বোঝে না যে এ পৃথিবী কত নিষ্ঠুর, আর মানুষরা কত হৃদয়হীন — অভিমানী নিষ্পাপ বালক তা ত' বোঝে না। বাবরের ঘুম পাচ্ছে, জড়িয়ে আসছে চোখদুটো — বাবরের আজকে কি হয়েছে তা ত' বাবর বুঝছে না।

বাবরের বাবা দশ বৎসর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাদার্ণ সার্কেলের অফিসার ছিলেন। নাম তাঁর সাদেক। স্ত্রী এবং তিনটা ছেলের সঙ্গে তিনি থাকতেন ষ্টেশন রোডের কাছেই। সে বাড়ীতে কাঁটাল, গোলাবজাম, আনারসের গাছ — বাড়ীর সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাগানের মত করা, তার পাশে খুব সরু একটা রাস্তা, তারপরই পুকুর। স্ত্রী পুত্র নিয়ে সাদেক সাহেবের জীবন একরকম কাটছিল — মানব-জীবন ত' সুখ দুঃখ নিয়েই। বড় ছেলে বাবরের বয়স তখন ষোল, ছোট ছেলে রশীদের আড়াই, মাঝারি রফিকের বার।

সেদিন সাদেক সাহেবের মফঃস্বল যাওয়ার কথা। চারটা সিপাহী এসেছিল সঙ্গে যাবার জন্যে। রশীদ মার কাছে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল : মা বাববা মাথার তেল চাচ্ছে। মা কোলে তুলে নিয়ে চুমো দিয়ে বলেন -- যাচ্ছি বাবা। নাস্তা খেতে বসে রশীদ। দিনটা ছিল শুক্রবার। নাপিত এসেছিলো, সাদেক সাহেব রশীদকে কোলে করে নাপিত দিয়ে তার নখ কাটিয়ে নেন।

ঘণ্টা তিন বাদে। বাবরকে মা বললেন — দেখত' একটু রশীদ কোথায়। বাবর পড়ছিলো খবরের কাগজ, বলল : যাচ্ছি একটু বাদে। মা রাগ করে চলে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে রফিককে বললেন — রশীদ কই রে? — বাইরে সাইকেল মেরামত করা দেখছে — রফিক উত্তর করল। মিনিট পনের পরে মা আবার বাবরকে এসে বললেন : দেখ না কোথায় রশীদ। বাবরকে উঠতেই হয়। বাইরে পুকুর-সংলগ্ন বাগানে সাইকেল মেরামত করা হচ্ছিল — সেখানে রশীদ নেই। ফিরে এসে মাকে বাবর বলল : না ওখানে ত' রশীদ নেই। মা ব্যাকুল হয়ে বললেন — খোঁজ না কোথায় গেল। সাদেক সাহেব বাইরের কামরায় ইজি চেয়ারে বসে পুকুরের দিকে চেয়ে ছিলেন। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে বসেই রইলেন। খুঁজতে বেরোল বাবর ও রফিক। দু-একটা জায়গায় খুঁজে বাবর পুলিস ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে এসে তাঁর ছেলের সাথে গল্প করতে লাগল। কি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ে ছিল — তার একটা গল্পে মন দিল। কিন্তু খানিক বাদেই বাবরের মন কেমন করে ওঠে — সে উঠে নানা জায়গায় খুঁজতে লাগল। সম্ভব অসম্ভব জায়গায় — যেখানে সেখানে, তবুও রশীদের কোন হদিসই নেই। বাড়ীতে তখন কান্নার রোল পড়েছে, খালি সাদেক সাহেব গম্ভীর হয়ে তখনও ইজি চেয়ারে বসে, দৃষ্টি তাঁর সেই পুকুরের দিকে।

বাবর রেল লাইন ধরে মাইল দেড়েক খুঁজে এল, পথে সব লোককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল রশীদের কথা। ষ্টেশনের সামনে একটা বিস্কুটওয়ালার দোকান। সে বলল : হাঁ রশীদবাবু এসেছিলেন এখানে, তাঁকে বিস্কুট দিতে চাইলাম, তিনি বললেন — যাঃ। রশীদকে যে পাওয়া যাচ্ছে না সে কথায় বিস্কুটওয়ালা খুব উদ্বেগ প্রকাশ করল, কিন্তু সেখান থেকে রশীদ কোথায় গিয়েছে তার খবর সে দিতে পারলে না। আবার বাসার দিকে ফিরে আসছিল বাবর। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টারের ভাইয়ের সাথে ষ্টেশনের সামনে দেখা, সাইকেল চড়ে কোথায় খুব ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে — তার দিকে যে অমন করে তাকাল — বাসার পাশেই তাদের বাড়ী! আবার পুলিশ ইন্সপেক্টারের ছেলের সাথে দেখা, সে বলল : যান রশীদকে পাওয়া গেছে পুকুর থেকে। সামনের গাছগুলো যেন বাবরের চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কম্পিত আশঙ্কাবিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল : মরে গেছে? — বোধ হয়, ছেলেটা দ্রুত চলে গেল সাইকেলে চড়ে।

হেমন্ত কাল হলেও তখন বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু করে, ঝরঝর করে কাঁটাল গাছ, আম গাছ, বেল গাছ, যতসব গাছ ছিল তারাও কেঁদে কেঁদে যেন আকুল হচ্ছে। মহাক্রন্দনের মহোৎসব। যে লোকগুলো ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে কাঁদছে, সহানুভূতিশীল করুণাময় লোকরা কাঁদছে আর কাঁদছে পাগলের মত, নেচে নেচে বুক থাপড়িয়ে আকুল হয়ে কাদছেন সাদেক সাহেব, বাবরের মা এবং কাঁদছে বাবর-রফিক। কাঁদছে, কাঁদছে, কাঁদছে — সকলেই কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে সাদেক সাহেব বলছেন : হায় রে আমি ইজি চেয়ারে বসেছিলাম, এই পুকুরের দিকেই চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বাচ্চা যে কখন ডুবে মরল তা জানতে পারলাম না। মা বলছিলেন — ওরে আমার তোতা পাখী, আমার কলজের টুকরো, তোকে আমি মেরেছিলাম রে, আয় লক্ষ্মী সোনা, একবার তোর মায়ের কোলে আয়, একটা চুমা দে। তারপর আবার বিনিয়ে বিনিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। আর বাবর ভাবছিলো সে যখন পত্রিকায় গল্প পড়ছিল তখন হয়ত রশীদ নিশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছিলো — একটু বাতাস।

বিস্কুটওয়ালার দোকান থেকে ফিরে রশীদ পুলিস ইন্সপেক্টারের বাড়ীর সামনে কাগজী নেবুর গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল — কে ধমক দিল — এই এখানে কি করছিস। অভিমানী শিশুর ঠোঁট দুটো হয়ত বা ফুলে উঠেছিলো, রশীদ বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। লোকজন কেউ ছিল না তখন সাদেক সাহেবের বাড়ীর সামনে। বাসায় ফেরার রাস্তা যেটা সেখানে একটা গরু বাঁধা। তার পাশ দিয়ে রশীদ ছোট ছোট পা ফেলে মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ গরুটা তাড়া দেয়। পা পিছলায় রশীদের, পা পিছলিয়ে পুকুর পারে পড়ে। আবার পিছলায়, তারপর জল। জলের মধ্যে ক্রমেই রশীদ তলিয়ে যাচ্ছে, কোমর ডুবল, গলা ডুবল, চোখে পানি, চোখ ডুবল। বন্ধ হয়ে আসছে বাতাস, ফুরিয়ে গেছে বাতাস, রশীদ নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে, খুব কষ্ট হচ্ছে রশীদের, জলের নীচে আগাছায় জড়িয়ে যাচ্ছে রশীদ ... রশীদ ঘুমিয়েছে। ঘুম...ঘুম...ঘুম।

রশীদের ঠোঁটের একটা কোণ নীল হয়ে উঠেছে। মৃতদেহে আর কোন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন নেই। খালি চোখের কোণে এক ফোটা জল জমে গাঢ় হয়ে উঠে কেমন শক্ত হয়ে গেছে। সেই ফুলের মত সুন্দর মুখ প্রস্ফুটোন্মুখ গোলাপের

মত হাসছে, সে মৃদু সুন্দর হাসির বিচ্ছুরিত আভায় সব কিছু সুন্দর...রমণীয়...পবিত্র। কত লোক সান্ত্বনা দিচ্ছে সাদেক সাহেবকে, পাশের সব বাড়ীর মেয়েমানুষরা এসে বাবরের মাকে বোঝাচ্ছেন...কত কথা। আর একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন --- মরে গেছে, হয়ত মিনিট দশেক আগেও তার দেহে শ্বাস ছিল, যদি আর একটু আগে তাঁকে খবর দেওয়া হোত। একটা মেয়েমানুষ রশীদের চোখ মুখ জিব নানাভঙ্গীতে দেখে বলল : ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে। তারপর তার বুকে মাটা রেখে অনেক কিছু অনেক ব্যাপার করল; কিন্তু রশীদের স্থির ঠাণ্ডা শরীর, তার পাষাণ মুখ তখনও প্রসন্নতার জ্যোতিতে চমৎকার।

তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে একটু অসাধারণ, মাত্র আত্মীয় স্বজনের বিচারে বেদনাদায়ক। এরকম অপমৃত্যু কত ছেলেরই হচ্ছে, তার সাথে এ পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সম্পর্ক কিসের...কতটা? কয়েকদিন মা-বাপরা কাঁদে, ভাইরা কাঁদে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য পৃথিবী হয়ে উঠেছে অশ্রুময়, তারপর হাসি গান আনন্দ। দুনিয়ার স্বাভাবিক সহজ নিয়ম এই-ই। সুতরাং মা বাপ ভাইদের মর্ম্মন্তুদ বেদনাকে উপেক্ষা করে রশীদ আর চোখ মেলে নাই — মায়ের কোলে আসতে চায় নাই, বাপের সান্ত্বনাহীন দুঃখকে ঈষৎ স্তিমিত করতে আর একবারও ও বা-ব্বা বলে ডাকবে না, বাবর ভাইয়ার আদর শিশু রশীদকে আর ভুলাতে পারছে না। অভিমানী শিশু অভিমান করেছে সকলের ওপর। যেন বুঝেইছিল রশীদ সে মারা গেলে কয়েকদিন মাত্র কাঁদবে মা বাপ ভাইরা, তারপর আর কয়েকদিন বাদে তাদের কান্না কমে আসবে, আর কয়েকদিন পরে তাকে এ অপরিচিত জায়গায় একা ফেলে রেখে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ সবাই পালিয়ে যাবে, তারপর নিজঝুম। কেন থাকবে তাদের কাছে রশীদ, যখন এমন ঘুম.. এমন মিষ্টি ঘুম...এমন মধুর ঘুম।

মাস দেড়েকের মধ্যেই সেখান থেকে সাদেক সাহেবরা সব চলে আসেন। যে রশীদের সামান্য ক্রন্দনে সাদেক সাহেব বিচলিত হয়ে উঠতেন, যার একটু আঘাতে মার বুকটা কেমন করে উঠত, যাকে বাবর রফিক খুউব ভালবাসত সে রশীদকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সাথীহারা, একেবারে একা ফেলে রেখে সকলে চলে আসছে। সেদিনটা ছিল দুর্যোগময়। বৃষ্টি...ঝড়। ট্রেনটা যখন রশীদের কবরের খুব কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে জানালা থেকে অসম্বরণীয় বেদনায় সাদেক সাহেব আর বাবরের মা চেয়েছিলেন, আর স্তব্ধ বাবরের চোখ দুটো যখন জলে ভরে উঠেছে তখন একেবারে কাছে কোথায় যেন বাজ পড়ল। বাবরের তখন সহসা মনে হয়েছিলো রশীদ মুখটা ভয়ে খুব কাল করে যেন তাকে ডাকছে — তাকে কোলে নিয়ে চুমো দিতে, বুকের মধ্যে পিষে ধরে মায়ায় মমতায় আদরে তার কচি মন থেকে সে ভয় দূর করে আবার তাকে হাসিয়ে ফেলতে।

কখন আয়শা কাজ সেরে বাবরকে খুঁজতে খুঁজতে কবরস্থানে তার পাশে এসে বসেছিলো শাহাদাৎকে নিয়ে। বাবরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েই যাচ্ছে, বাবর আপনভোলা হয়ে কাঁদছে। খুব কোমল করে নিজের হাত দিয়ে আয়শা বাবরের চোখের জল মুছিয়ে দেয়, মৃদু মোলায়েম আরও কোমল স্বরে বলে : আমি বুঝেছি। তার চোখেও জল। বিস্ময়াহত শিশু শাহাদাৎ বাবরের চুলে একটা টান দিয়ে তার আধা আধা বুলিতে ডাকলে — আ-ব্-ব্-আ! . তখন গাছের পাতায় পাতায়, বাঁ দিকের পুকুরের জলে, মাঠের মাঝে, ধান ক্ষেতে, এখানে সেখানে পূর্ণিমার আলো বন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে, আর একটা পাখী নিকটে কোন এক গাছে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আকুল হয়ে আবার চেঁচাচ্ছে।

(আষাঢ় ৪র্থ বর্ষ ১৩৪৪)

ফ্ল্যাট

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা সহর। চিত্তরঞ্জন এভেন্যুয়ের উপর চারতলা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের উপর তলায় উঠিবার জন্য লিফ্‌ট নাই—সিঁড়ি। সে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে বুকখানা যেন ছিঁড়িয়া যায়।

সেদিন বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক তিনতলায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—এতগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আসিতে প্রাণ বাহির হইবার জো! ভদ্রলোক হাঁপাইতে ছিলেন।

দশ মিনিট কাল সিঁড়িতে বসিয়া দম লইবার পর বাঁ দিকে অগ্রসর হইলেন। ঘরের পর ঘর—ঘরের দ্বারে নম্বর আঁটা, ১, ২, ৩, ৪।

৮ নম্বর কামরার দ্বারে দাঁড়াইলেন। দ্বারে তালা নাই—কলিং বেল্ ছিল, টিপিলেন।

ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্র যুবা সামনে দাঁড়াইল। তার দুই চোখে বিস্ময় ও প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করিতেছে।

আগন্তুক বলিলেন—এই ঘরেই প্রভাসবাবু থাকতেন?

যুবা কহিল— আমার নাম প্রভাসবাবু।

আগন্তুক বলিলেন—ওঃ তবে শুনেছিলুম, তিনি বাইরে গেছেন। এ-ঘর ভাড়া দেওয়া হবে, বাড়ীওলা শ্রীকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তিনি চাবি দিলেন, বললেন ঘর আগে দেখুন যদি পছন্দ হয়, তখন কথাবার্ত্তা হবে।

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতেও একরাশ বিস্ময়।

যুবা বলিল—আজ্ঞে না, আমি এখনো যাইনি তবে যাবো। পশ্চিমে। মানে, তিন মাসের জন্য। সে তিন মাস মিছামিছি পকেট থেকে ভাড়া গুঁজি কেন? তাই বাড়ীওলাকে বলেছিলাম যদি ভালো লোক পান, বলবেন এ ঘর তাঁকে দিয়ে যাবো ফার্নিচার সমেত। এ-ঘরের একটা চাবিও তাই তাঁকে দিয়েছি—মানে আমি কখন থাকি না থাকি।

আগন্তুক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবককে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; বলিলেন—বটে! তাহলে আপনাকে বিব্রত করলুম তো, যাই শ্রীকান্তবাবুকে বলি গিয়ে ...

যুবা মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল, পরে বলিল—তা এসেছেন যখন, দেখে যান। ঘর নয় পায়রার খোপ, তবে বেশ —আলো আছে, বাতাস আছে—তাই আমার থাকা। তাছাড়া বাজার বলুন, পোষ্ট অফিস বলুন কাছে। বাড়ী থেকে বেরুলেই বাস পাবেন ট্যাক্সি, ফিটন, বন্ধগাড়ী—অর্থাৎ কাজের লোকের পক্ষে যা যা দরকার। আপনি একা থাকতে চান?

ভদ্রলোক বলিলেন—না। আমি থাকবো, আর থাকবেন আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আর একটি মেয়ে। স্ত্রীর চোখের ব্যামো—চিকিৎসা করাতে চাই।

যুবা প্রভাস কহিল—কুলিয়ে যাবে। ছোট ফ্যামিলি। ঘর আছে খাবার একখানি, শোবার একখানি, তাছাড়া রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম। রান্নাঘরে কল আছে—টিউবওয়েলের জল। চাকরদের আলাদা পায়খানা, নাইবার জায়গা নীচের তলায়। আসুন দেখবেন—

আগন্তুককে আহ্বান করিলেন; কহিলেন—আপনার নাম?

আগন্তুক বলিলেন—অবিনাশ চাটুয্যে। ভাড়া কত দিতে হবে?

প্রভাস বাবু বলিলেন, 'আমি যা দিই। মানে সে জন্য ভাবনা নেই। শ্রীকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আমি লাভ করতে চাইনা—নিজের এ টাকাটা যদি গচ্চা না লাগে বুঝলেন কি না। কথাটা বলিয়া প্রভাস বাবু হাসিলেন। তারপর বলিলেন যদি কিছু মনে না করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি মশায়ের বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

অবিনাশ বাবু কহিলেন—সামান্য সরকারী চাকরি করতুম, এখন পেন্সন পাচ্ছি। দেশে থাকি, স্ত্রীর চোখের ব্যারাম চিকিৎসা না করালে নয়,—ঐ সঙ্গে মেয়ের বিবাহের পাত্রের সন্ধান বুঝলেন কিনা, তাই শ্রীকান্ত বাবুর মুখে শুনলুম ঘর খালি আছে।

অবিনাশ বাবুকে লইয়া প্রভাস বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—রান্নাঘরটুকু আগে দেখুন—ঐটি হলো আসল ঘর বাঙালীর—স্বাস্থ্য বলুন, পুষ্টি বলুন স্বস্তি বলুন ঐ ঘরেই বিরাজ করে।

প্রভাস বাবু হাসিলেন।

অবিনাশ বাবু বলিলেন—সংসার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা বেশ হয়েছে দেখ্‌ছি, তা গৃহিনী এখানে থাকেন বলে তো মনে হচ্ছে না!

প্রভাস বাবু যেন ঈষৎ অপ্রতিভ, অবিনাশ বাবু সে ভাব লক্ষ্য করিলেন।

প্রভাস বাবু বলিলেন—আজ্ঞে না, এখানে এনে খরচায় পোষাতে পারবো কেন! চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছোট, তাদের নিয়ে থাকতে হলে অনেক কামরা চাই।

বাধা দিয়া অবিনাশ বাবু বলিলেন,—তা এ ফ্ল্যাটের ঘর ভালো, না হলে অন্য যে সব ফ্ল্যাট দেড় হাত মাপে ঘর সে ঘরে বাস করার চেয়ে বস্তীতে বাস করায় আরাম আছে।

প্রভাস বাবু বলিলেন—এ ফ্ল্যাটখানি মফস্বলের জমিদারী বললে চলে। মাসে এথেকে ভদ্রলোক আয় করেন তা প্রায় সাত-আটশো টাকা, তাহলেই ধরুণ প্রায় দশ হাজার টাকা! সহজ কথা!

দুজনে রান্নাঘর ঘুরিয়া আসিলেন শয়নঘরে। জিনিষপত্র এলোমেলো ছড়ানো। টেবিলের ড্রয়ার খোলা রহিয়াছে—একটা সুটকেশ, তার ডালা বন্ধ, চাবি খোলা, ডালার ফাঁক দিয়া একটা সিল্ক সার্টের হাতা ঝুলিতেছে—বোতাম নাই।

অবিনাশবাবু সেই ডালার পানে চাহিতেছিলেন।

প্রভাসবাবু বলিলেন—জিনিষপত্র যা-তা ছড়ানো রয়েছে।

অবিনাশবাবু বলিলেন—তাই দেখছি— এর মতো।

প্রভাসবাবু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—চলে যাচ্ছি কিনা মানে—তা, যা বলছিলুম এ-ঘরে আরামে থাকবেন। সাজ পোষাক আমি এ-ঘরেই করি। এক কথায় এই ঘরই আমার জন্য শোয়া-বসা, সাজগোজ করা সবই।

অবিনাশবাবু কহিলেন—হুঁ। তিনি বসিলেন একখানা চেয়ারে; বসিয়া পথের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রভাসবাবু অস্বস্তি বোধ করিলেন, বলিলেন—একটা কথা ছিল।

—বলুন।

প্রভাসবাবু কহিলেন, —মানে, আমার এখনি বাজারে যেতে হবে। মানে, একটা ব্যাগ আরো কটা জিনিষ কিনতে হবে। তা আপনি যদি অন্য সময় আসেন।

অবিনাশ বাবুর ভাব সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি বলিলেন—একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। প্রভাস বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, আমি তা হলে আসচি—দু'মিনিট।

প্রভাস বাবু বাহিরে গেলেন। অবিনাশ বাবু তাড়াতাড়ি সুটকেশের ডালাটা খুলিলেন—দেখিলেন সার্টের গলার ও বুকের বোতাম জামায় রহিয়াছে—একটা রিষ্টওয়াচ ঠিক জামার তলায় সুটকেশের ডালা বন্ধ করিলেন—উঠিলেন। উঠিয়া সন্তর্পিত

পায়ে বাথরুমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, একখানা তোয়ালে পাকানো তার মধ্যে ... তোয়ালে খুলিয়া দেখেন, টাইমপীশ, টাই-পিন, ক্লিপ এমনি টুকিটাকি দ্রব্য। ...

তোয়ালে খানা হাতে লইয়া তিনি আবার ফিরিলেন শয়ন কামরায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসবাবু সে কামরায় প্রবেশ করিলেন। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হইলে অবিনাশ বাবু হাসিলেন, কহিলেন—আপনার একটু সন্দেহ হচ্ছে!

প্রভাসবাবু বলিলেন—হ্যাঁ। মানে আমি তাই পাশের কামরায় গিয়েছিলুম টেলিফোন করতে শ্রীকান্ত বাবুকে। তিনি বললেন, অবিনাশবাবু বলে' কোনো ভদ্রলোক তাঁর কাছে যান্‌নি এবং তিনি অবিনাশ বাবু বলে' কাকেও চেনেন না। .. অর্থাৎ ফ্ল্যাটে দুপুরবেলায় অজানা অতিথিদের পক্ষে নানা অভিসন্ধি নিয়ে আসা খুব সম্ভব কি না!

অবিনাশবাবু বলিলেন,—আমিও সেই ভয় করেছিলুম। আপনার যেমন সন্দেহ হয়েছে আমার [illegible] সম্বন্ধে আপনার সম্বন্ধেও আমার তেমনি সন্দেহ আছে।

প্রভাসবাবু কহিলেন—আপনি কি বলতে চান?

তাঁর স্বরে বিলক্ষণ ঝাঁজ।

অবিনাশ বাবু বলিলেন—আমি বলতে চাই, আপনি জেনে শুনে নিজেকে প্রভাসবাবু বলেই পরিচয় দিচ্ছেন?

অবিনাশবাবুর স্বর শান্ত।

প্রভাসবাবুর দৃষ্টিতে বিস্ময় একেবারে সীমাহীন।

অবিনাশ বাবু বলিলেন—আমি জানি, আপনি প্রভাস বাবু নন এবং এ ঘরে আপনি কস্মিনকালে বাস করেন নি। আপনি এ ঘরে প্রবেশ করেছেন প্রভাসবাবুর অনুপস্থিতিতে, আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন! কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

প্রভাসবাবুকে আমি জানি—খুব ভালোরকম জানি। আমি প্রভাসবাবুর বাবা। প্রভাসবাবু যাচ্ছেন লাক্ষ্ণৌয়ে -- এই ঘর খালি থাকে কেন। আমি আসছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে থাকতে---তাঁর চিকিৎসার জন্য ঐসঙ্গে যা বলেছি মেয়ের বিবাহের পাত্র সন্ধান করতে। ঐ তাঁরা আসছেন---সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনছি।

প্রভাস যেন কাঠ!

অবিনাশবাবু বলিলেন—জিনিষপত্র যা হাতিয়েছেন, রাখুন। না হলে পুলিশ এলে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যাবে। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝেছি কিছু কিছু সরিয়েছেন—অন্ততঃ ঐ সিল্কসার্টের মীনাকরা বোতামগুলো। এই আপনার তোয়ালে জড়ানো সংগৃহীত সম্পত্তি—নিন্ নিন্—দেরী নয়। আমি সরকারী কাজ করে চুল পাকিয়েছি---পুলিসের কাজেই এবং এই ক্যালকাটা পুলিশেই—ইনসপেক্টর ছিলুম।

প্রভাসবাবুর চোখের সামনে সাগরের তরঙ্গ। সে খুঁজিয়া দেখিল—সে সাগরের কূল নাই যে সেখানে আশ্রয় মিলিবে।

বাহির হইতে রমণী কণ্ঠে স্বর জাগিল---এই যে ৮ নম্বর কামরা। রাখাল কুলিকে বল এদিকে আসতে।

সর্ব্বনাশ। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার সপরিবারে!

প্রভাসের কপালে ঘাম জমিয়া গেল। বাহিরে কারা কথা কহিল—অবিনাশবাবু বলিলেন--রাখাল .....

রাখাল দ্বারের সামনে—অবিনাশবাবু বলিলেন—পুরোনো জমাদার—পেন্সন নিয়ে অবধি আমার কাছে আছে।

প্রভাসের গতি রুদ্ধ হইল, অবিনাশবাবুর ইঙ্গিতে রাখাল পাকড়াও করিল প্রভাসকে।

মাল বাহির হইল—পার্শ, রিষ্ট ওয়াচ, বোতাম—

অবিনাশবাবু বলিলেন—প্রভাস এখনো লাক্ষ্ণৌ যায় নি। একটু সবুর করতে হয়। তা এখন কি হবে। ছেড়ে দেবো? না, পুলিশ ডাকবো? ঐ টেলিফোন—

প্রভাস বলিল—আজ্ঞে ভালো থাকা যাচ্ছে না, এই [illegible]—

অবিনাশবাবু কহিলেন—পুলিশের চাকরির চাল! পেন্সন নিয়ে বাড়ী বসেছিলুম—যেমন আবার কলকাতা সহরে প্রবেশ করেছি, অমনি চুম্বকের লোহা টানার মতো মশায়কে পেলুম খপ্পরে।

নিরুপায়! বলছিলেন, তা যান, পুলিশের হাতে—তাতে অন্ততঃ আপনার বেকার সমস্যাটুকু ঘুচবে!

গৃহিনী ও কন্যা কহিলেন—ব্যাপার কি?

অবিনাশবাবু বললেন—পরে শুনো। এই জন্যেই প্রভাসকে আমি পই পই মানা করেছিলুম ফ্ল্যাটে থাকিসনেরে—ফ্ল্যাটগুলো এইসব শিক্ষিত বুদ্ধিমান বাহাদুরের চমৎকার লীলাক্ষেত্র। রাখাল, স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি ধান ভানে, বাবা কি করবে বলো, ভাগ্য! ওঁকে চৌকি দাও একটু—থানায় আমি টেলিফোন করে দিই। ওঁর কোন উপকার করতে পারবো না—পাকা বাঁশ নোয় না—তবে কলকাতার ফ্ল্যাটে যাঁরা বাস করবেন, এই পূজোর সময় তাঁদের অন্ততঃ খানিকটা সজাগ সচেতন করা যাবে এঁকে থানায় জিম্মা করে দিলে।

(বৈশাখ, ১৩৪৪)

শরৎ

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

দশ বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখে কাট্‌লো কি এই দশটী বছর? সুখেই একরকম — অবস্থায় যতোটা কুলিয়েছে। দু'টো সমান জোরালো বলদে টান্‌লে গাড়ী যে-রকম চলে — স্বচ্ছন্দে, তাড়াহুড়ো নেই কিন্তু চল্‌ছেই, তেম্‌নি তাদেরও জীবন; — সংসার টেনে চলেছে — যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে।

বিয়ের যে-সব রঙীন স্বপ্ন, প্রথম বছরে স্বতই তার অনেকখানি ভেঙে পড়লো। তাদের ধারণা ছিল বিয়ে জিনিসটা কেবলই সুখের, আনন্দের; কিন্তু ঠিক তা যে নয়, তারা বুঝতে পার্‌লো। পরের বছর থেকে ছেলেপিলে...। সুখের ভাবনা ভাববার সময়ই তাদের আর রইলো না।

স্বামীটীর ছিল ঘরোয়া স্বভাব — একেবারে কুণো। তার ছোট্ট সংসারটাই ছিল তার জগৎ; সে তার মধ্যবিন্দু, ছেলেপিলেরা যেন কতকগুলো ব্যাসার্দ্ধ-রেখা। স্ত্রীটীও চেষ্টা করতো মধ্যবিন্দুর স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে; কিন্তু ঠিক কেন্দ্রে পৌছুতে পার্‌তো না — কেন না স্বামীটী ছিল সেই খানে। এর ফল হ'তো এই যে ব্যাসার্দ্ধগুলো কেন্দ্র ঠিক করতে না পেরে কখনো ছুটতো বাপের কাছে, কখনো মার কাছে। — রেখায় রেখায় কাটাকাটির খেলা!

দশোঁয়া বছরে স্বামীটীর জুট্‌লো চাকরী — জেল পরিদর্শক। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো কাজ। তার ঘরোয়া স্বভাবে লাগ্‌লো বিষম চোট। পুরো একটী মাস ধ'রে বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে — ভাবতে তার মনটা উঠ্‌লো খিঁচিয়ে। সে ঠিক বুঝ্‌তে পারলে না কার জন্যে তার বেশী বাজ্‌বে — স্ত্রী, না ছেলেপিলে।

তার যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় স্ত্রী সব জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্‌সবন্দী করছে, সোফায় বসে সে তাই দেখ্‌ছে। মেজের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে স্ত্রীটী লিনেনখানা বাক্‌সোয় রেখে দিলে। তারপর কালো কাপড়গুলো ঝেড়েঝুড়ে ভাঁজ করতে লাগ্‌লো — যেন তারা বাক্‌সোর মধ্যে বেশী জায়গা না নেয়। এ-সব কাজ তার নিজের দ্বারা তেমন ভালো হয় না! অবশ্যি স্ত্রী এ-বাড়ীতে এসে যে তার চাকরাণী সেজেছিল তা নয়, এমন কি যেন ঠিক স্ত্রীও না। সে হয়েছিল মা — ছেলেপিলে এবং তার। স্বামীর স্টকিং ছিঁড়লে রিফু করতে তার বাধ্‌তো না — এতে আবার অপমান কি? এজন্যে ধন্যবাদই বা কেন তার পাওনা? বাপ ষ্টকিং এবং আরো কতো-কি-রকমের জিনিস ছেলে-পিলেদের এনে দেয়, না দিলে এসব আন্‌তে এদের বাড়ী ফেলে হয়তো মাকে বাইরে বেরুতে হ'তো। কিন্তু বাপটী এসব ক'রে যে তার দেনাই শোধ করছে একথাও মা ভাব্‌তো না।

স্বামী সোফায় ব'সে স্ত্রীকে দেখ্‌ছে। চলে যাওয়ার সময় কাছিয়ে এসেছে; তার মনে এসে কতো ব্যাথার দোলা লাগ্‌ছে। স্ত্রীর দেহটী সে নিরীখ ক'রে দেখছে। তাঁর কাঁধ দুটী আগের চাইতে উঁচিয়ে উঠেছে; পিঠটী যেন একটু নুয়ে গেছে — দোল্‌না, ইস্ত্রি, ষ্টোভ, এই সব ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার এই দশা। স্বামীটীও একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে ডেস্কে কাজ করতে করতে, তার চোখে এখন চশ্‌মার দরকার হয়; কিন্তু আপাততঃ সে নিজের কথা ভাবছে না। সে দেখছে : স্ত্রীর চুলগুলো আগের চাইতে পাতলা হয়ে গেছে, বিনোনো চুলের ফাঁকগুলো একটু স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, সৌন্দর্য্য চলে গেছে, — ওর এ দশা কি তার জন্যে, শুধু তারই জন্যে? না, তা নয়; এই গোটা সংসারের সকলের জন্যে; স্ত্রীটী নিজের জন্যেও তো কম খাটে না? স্বামীর মাথার উপরটায় চুল পাতলাচ্ছে — সেও তার একার জন্যে নয়, সকলের জন্যে সংসারের জন্যে লড়্‌তে লড়্‌তে। এতগুলো মুখে আহার জোগাতে না হ'তো যদি, হয়তো আর খানিক যৌবন তার থেকে যেতো। তবুও কোনো দিন তার মন বলে নি যে একা থাকাই ভালো ছিল।

"খানিক বেরুচ্ছো ভালোই হচ্ছে" —স্ত্রী বল্‌লে; "বড়ো বেশী ঘরলাগা হয়ে পড়েছ তুমি।"

"আমি দূর হ'লে বাঁচো তুমি, কেমন?"— স্বামী বল্‌লে; আওয়াজটা একটু তেতো। — "এদিকে তোমার জন্যে তো আমার প্রাণটা কাঁদ্‌ছে।"

"তোমার বেরালের ধাত, গরম জায়গাটুকু ছেড়ে যেতে তোমার মন সর্‌ছে না। নইলে আমার জন্যে যে তোমার বেশী বাজবে মনে তো হয় না।"

"ছেলেপিলের জন্যেও না?"

"ওঃ, ও কথা আসছে আজ বাড়ী থেকে যাচ্ছো ব'লে। নইলে বাড়ীতে তো দিনরাতই ওদের খোঁচাচ্ছ। হলোই বা তামাসা ক'রে, তবু তো খোঁচাচ্ছ। তবে তোমার উপর অবিচার কর্‌বো না, ওদের উপর সত্যিই তোমার খুব টান।"

রাত্রিতে খেতে ব'সে স্বামীর ব্যবহার বড়ো মিষ্টি হয়ে উঠলো — ভা-রী নরম মেজাজ। সেঁজো খবরের কাগজ আর পড়া হলো না, স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজবে সময়টা কাটিয়ে দিতে তার বেজায় ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে স্ত্রীটী ঘর-দোর সাফ কর্‌তে এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে আলাপ কর্‌বার সুবিধেই হলো না। ছেলেপিলে মানুষ করতে আর হাঁড়িকুড়ি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তার ভালোবাসাও যেন খানিক ভোঁতা হয়ে গেছে।

স্বামীটী ছিল বড়ো ঝোঁকের মানুষ, যদিও বাইরে বাইরে তাকে সে রকম দেখাতো না। চারিদিকে এ-ও-তা ছড়ানো দেখে তার ভারি অসোয়াস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। যে-সব জিনিস নিয়ে তার রোজানা কারবার — তার জীবন, সমস্তই রয়েছে পড়ে চেয়ারে টেবিলে, এদিকে ওদিকে, আর মুখখোলা কালো 'পোর্টম্যান্'টা তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে 'কফিনের' মতো, যেন তাকে গিলে খেতে চায় আর কি! জামাকাপড়গুলো শাদা লিনেনে-মোড়া, হাঁটু কনুই সমস্তই তাতে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। তার মনে হ'লো যেন শেষ-বস্ত্র পরিয়ে তাকেই শোয়ানো হয়েছে ওর ভেতর, এখনই ওর ডালা বন্ধ ক'রে কবরে নিয়ে যাওয়া হবে!

পরদিন সকালে — আগষ্ট্ মাসের একটী সকাল সেটি— সে হুড়মুড় ক'রে বিছানা থেকে উঠলো, তাড়াতাড়ি সাজ গোজ কর্‌তে লাগ্‌লো, যেন খুবই ব্যস্ত। ছেলেপিলেদের ঘরে গিয়ে সে তাদের চুমু দিলে, তখনো তাদের ভালো ক'রে ঘুম ভাঙ্গে নি, সবেমাত্র উঠে চোখ রগ্‌ড়াচ্ছে। তারপর স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন ক'রে সে চড়ে বস্‌লো গিয়ে গাড়ীতে — রেলওয়ে ষ্টেশনে যাবে। উপরিতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তার মনটা কিছু চাঙ্গা হ'লো। এখন তার মনে হ'তে লাগ্‌লো খানিক বাইরে থেকে ঘুরে আসা সত্যিই মন্দ নয়। পেছনে পড়ে রইলো বাড়ী, সে যেন মাল-ভরা গুদোম-ঘর, সেখানে নিঃশ্বাস ফেলাই দায়! এর পর লিঙ্কোপিং-এ পৌঁছে তার দস্তুরমতো খুশী-খুশী বোধ হ'তে লাগ্‌লো।

বাকী দিনটা কাট্‌লো বড়ো হোটেলটাতে জেল-ডিনার খেতে। এখানে তারা স্বাস্থ্য পান কর্‌লো প্রাদেশিক গবর্ণরের — জেলকয়েদীদের নয়, যাদের জন্যে সেখানে তার যাওয়া। এর পরে এলো রাত্রি। তার নির্জ্জন ঘরটীতে একটী শয্যা, দু'খানি চেয়ার, একখানি টেবিল, একটা হাত-মুখ-ধোওয়ার জায়গা, আর একটা মোমবাতি। জেল পরিদর্শকটীর ভারি অসোয়াস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। যা যা নিয়ে তার কারবার সবই যেন হারিয়ে গেছে — স্লিপার, ড্রেসিং-গাউন, পাইপ-র‍্যাক্ ডেস্ক-সবকিছু। তার স্ত্রী ছেলেপিলে — তারাই বা কোথায়? কি-রকম আছে তারা! ভালো তো? সে একেবারে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো, বিষাদে তার অন্তরখানি পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। ট্যাঁক-ঘড়িটায় দম দিতে গিয়ে দেখে চাবিটা নেই। যখন তাদের বিয়ে ঠিক হ'লো সেই সময় বাড়ীতে ঘড়ির ফ্রেমটী সুন্দর করে সাজিয়েছিল তার স্ত্রী। চাবিটা সেখানেই ঝুল্‌ছে। সে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌লো, একটা সিগার ধরালে। কিন্তু একখানা বই 'পোর্টম্যান' থেকে খুঁজে বের না করলে হচ্ছে না — আবার তাকে উঠ্‌তে হ'লো। জিনিসপত্রগুলো এমন সুন্দর ক'রে সাজানো, পাছে সব গুলিয়ে যায় এই জন্যে তার ওসব নাড়তেই যেন ভয় করতে লাগ্‌লো। খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো তার চটি-জোড়া। আঃ, সবই সে গুছিয়ে দিয়েছে! বইও পাওয়া গেলো, কিন্তু পড়া তার হলো না। পুরোণো কথা মনে এসে ভিড় জমাতে লাগলো — এই দশটী বছর বউয়ের সঙ্গে কি কি ভাবে তার কেটেছে। অতীতের ছবি তার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। বৃষ্টির জল চুয়িয়ে ছাদটায় ছাতা ধরেছে, সেই দিকে একে বেঁকে উঠছে সিগারের নীলাভ-পীত ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ায় তার বর্ত্তমান একেবারে ডুবে গেলো। অসীম বেদনায় তার মনটা যেন ভবে উঠলো। এতোকাল ধ'রে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে যে-সব কড়া কথা সে শুনিয়েছে, সবই এক

এক ক'রে তার কাছে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। তার স্ত্রীর জীবনের কতো মুহূর্ত্ত যে তিক্ততায় ভ'রে দিয়েছে, সমস্তই মনে এসে তাকে বিষন্ন ক'রে তুললো। শেষে তার ঘুম এলো।

পরদিন — কাজ এবং আবার সেই ডিনার, আবার সেই স্বাস্থ্য পান -- গবর্ণরের, কয়েদীদের নয়। রাত্রিতে আবার সে একা; সেই শীত, সেই নির্জ্জনতা। স্ত্রীর সঙ্গে দু'টো কথা বলা যেতো যদি এসময়! মনটা তার ব্যথিয়ে উঠ্‌লো। এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে সে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো। প্রথম আঁচড় টান্‌তে গিয়েই সে থেমে গেলো। কি ব'লে তাকে সম্বোধন করা যায়! আগে তার বাইরে কোথাও ডিনারে যাওয়ার দরকার হ'লে সে বাড়ীতে খবর দিত, তখন লেখা হতো "খোকার মা।" কিন্তু আজ খোকার মাকে সে চিঠি দিচ্ছে না, দিচ্ছে তার প্রেয়সীকে, তার মানসীকে। তাই সে লিখ্‌লো : "প্রিয়তমা লিলি আমার," — যেমন পয়লা প্রেমের সময় লিখ্‌তো। প্রথম প্রথম লিখ্‌তে গিয়ে তার কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেক্‌তে লাগলো — জীবনের সাধারণ রোজানা কথাকাজের শুক্‌নো একঘেঁয়েমির ভেতরে প্রেমের বাণী সবই যেন হারিয়ে গেছে। কিন্তু লিখ্‌তে লিখ্‌তে তক্ষুনি আবার তার ভুলে-যাওয়া প্রেম জেগে উঠ্‌লো; আর সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণে বাজ্‌তে লাগ্‌লো পুরোণো সেই মিষ্টি সুর — ফিরে এলো সেই ওয়াল্টজ্ নাচের তাল, জীবনের সেই কতো কতো কাহিনী-রচনা; সেই লাইল্যাক্ ও সোয়ালো, আয়নার-মতো-স্বচ্ছ সমুদ্রের বুকের উপর কাটিয়ে দেওয়া সেইসব রঙীন সন্ধ্যা। সোনালী মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তার মানসীকে ঘিরে নাচ্‌তে লাগ্‌লো জীবন-বসন্তের মধুর মধুর সব স্মৃতি। লেখা শেষ হ'লে চিঠিখানার নীচের দিকে সে একটী তারকা-চিহ্ন এঁকে দিলে — যেমন প্রণয়ীদের রীতি, — এবং ঠিক আগেরই মতো কায়দায় তার পাশে লিখ্‌লে : "এইখানটায় চুমু দাও।" তারপর সে চিঠিখানা আগাগোড়া একবার পড়ে দেখ্‌লে; গাল দু'টীতে তার সোনালী আভা ছড়িয়ে গেলো; তার যেন কেমন-কেমন বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কেন এমন হ'লো সে বুঝতে পার্‌লো না। মনে হলো যেন তার অন্তরের অন্তরতম বাণী সে এমন-একজনের কাছে প্রেরণ করছে যে হয়তো তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

তবু চিঠিখানা সে পাঠালে।

জবাব আস্‌তে দু'দিন গেলো। এই দু'টো দিন প্রথম বয়সের মতো তার কেমন-একটা লজ্জা লজ্জা ভাব ও অসোয়াস্তির ভেতর কাট্‌লো।

তারপর এলো জবাব, সে যা চাচ্ছিলো তাই। হেঁসেলের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ আর ছেলেপিলের চেঁচামিচির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন একখানি সঙ্গীত — সেই পয়লা-প্রেমের মতোই আলো ও ছন্দে ভরপুর -- নিবিড়, নির্ম্মল। এই থেকে তাদের মধ্যে দস্তুরমতো প্রেমপত্র বিনিময় হ'তে লাগ্‌লো। প্রতি রাত্রিতেই সে এক একখানা চিঠি লেখে। এতেও তার তৃপ্তি হয় না, কোনো দিন হয়তো দিনের বেলাতেও একখানা পোষ্টকার্ড ডাকে দেয়। ব্যাপার এমন দাঁড়ালো যে তার সঙ্গীদের তাকে চেনাই দায় হ'লো। কাপড়-চোপড়ের দিকে — দেহের পারিপাট্যের দিকে সে এতোই মনোযোগ দিতে শুরু করলো যে অনেকে ভাব্‌লো : নিশ্চয়ই সে কারুর প্রেমে পড়েছে। আর সত্যিই সে নতুন ক'রে প্রেমে পড়েছিলো। চশমা ছাড়া তার একখানা ফটো তুলে সে পাঠিয়ে দিলে, স্ত্রীও পাঠালে একগাছি চুল। তাদের চিঠির ভাষা হ'য়ে উঠ্‌লো একেবারে তরুণ-তরুণীর মতো। রঙীন চিঠির কাগজ, তাতে পায়রার ছবি-আঁকা - সেই কাগজ সে কিনে নিয়ে এলো। এদিকে কিন্তু তারা আধা-বয়সী -- চল্লিশ পেরিয়েছে, যদিও সংসারের সঙ্গে লড়্‌তে লড়্‌তে তারা নিজেদের ভাব্‌তো আরো বুড়ো। গত বছর দাম্পত্য প্রেমের সুবিধাও সে ছেড়েছে, — অবশ্যি প্রেমের অভাব তার কারণ নয়, তাকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে শিখেছিল — তার ভেতরে সে দেখতে পেয়েছিল তার ছেলেপিলের মাকে।

ক্রমে তার কাজ শেষ হ'লো — ঘরে ফিরবার সময় এলো কাছিয়ে। স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন ঘটবে — এই চিন্তায় সে কেমন একটা অশান্তি ভোগ করতে লাগ্‌লো। সে তার প্রেয়সীর সঙ্গে পত্র বিনিময় করেছে; আর এখন সে বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখ্‌বে সেই খোকার মা — সেই গিন্নীবান্নী! তার ভয় হতে লাগ্‌লো ঘরে ফিরে তাকে নিরাশ হতে হবে। সে যখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে যাবে হয়তো দেখ্‌বে তার রাঁধুনীর বেশ — ছেলেপিলেরা থাক্‌বে তার আঁচল জড়িয়ে, — এ তার ভালো লাগবে না। তারই চাইতে অন্য কোনখানে তাদের দেখা হ'লে ভালো হয় — যেখানে আর কেউ থাক্‌বে না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? তাদের পয়লা-প্রেমের অনেকগুলো আনন্দমধুর দিন কেটে গেছে ভাক্‌স্‌হল্‌মে —

সেই খানে তো আবার তারা প্রাণে প্রাণে মিল্‌তে পারে। বাঃ চমৎকার যুক্তি ঠাওরানো গেছে! তাদের জীবনের যে বসন্ত চিরদিনের জন্যে চ'লে গেছে — আর কখনো ফির্‌বে না — তাকে স্মৃতি-পথে আবার ফিরে পাওয়া যাবে দু'টী দিনের জন্যে।

সে ব'সে ব'সে চমৎকার ক'রে একখানা চিঠি লিখলো। তাতে মনের সব কথা সে ভেঙ্গে বল্‌লো। ফেরত ডাকে জবাব এলো — তারও মনে ঠিক এই আকাঙ্ক্ষাই জেগেছে, দু'জনার মনে একই খেয়াল, এতে তার কতো আনন্দ!

দু'দিন পরে সে ভ্যাক্‌স্‌হল্‌মে চলে গেলো। আগে থাকতে হোটেলে তাদের কামরাটী ঠিকঠাক ক'রে রাখবে — এই তার মতলব। সেপ্টেম্বরের চমৎকার একটি দিন। বড়ো খাবারঘরটীতে এসে সে একা একা ডিনার খেয়ে নিলে — এক গ্লাস মদও। তার মনে হ'তে লাগলো যেন তার চলে যাওয়া যৌবন আজ আবার ফিরে এসেছে। কতো আলো, কতো হাওয়া এইখানটাতে! পাশেই সমুদ্রের সেই নীল জল চিক্‌মিক্ করছে; শুধু বার্চ্চগাছ গুলোর রঙ বদলে গেছে, এই যা তফাৎ। বাগানে ডাহ্‌লিয়াগুলো তখনো ফুটে রয়েছে অম্লান শোভায় — আশপাশ থেকে মিগ্‌নোনেটিরা ছড়াচ্ছে মধুর গন্ধ — সে যেন তাদের সুরভি শ্বাস। মাঝে মাঝে দু'একটা মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে শুকনো ফুলের গায়ে গায়ে, কিন্তু নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে তাদের চাকের দিকে। খালে নৌকাগুলো পাল তুলে চলেছে ধীর বাতাসের আগে আগে। পালগুলো পত্‌পত্ আওয়াজে উড়ছে, এ ওর গায়ে পড়ে ঘা খাচ্ছে। ভয় পেয়ে 'গাল্' গুলো কিচির-মিচির করছে — ছোটো ছোটো ডিঙিতে ক'রে মেছুয়ারা বড়শীর সুতোয় ফাতনা বেঁধে হেরিং মাছ ধরছে, তাদের কাছ থেকে দূরে তারা উড়ে পালাচ্ছে।

বারান্দায় ব'সে সে কফি খাচ্ছে। ছ'টায় এসে পৌছোবে ষ্টীমার, তারই প্রতীক্ষায় সে চেয়ে আছে।

যেন একটা অনিশ্চিত ঘটনার সম্ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠলো — বা'র বারান্দায় এসে পায়চারি শুরু করলো। তার চোখ দু'টী বার বার ফির্‌তে লাগলো খালের দিকে — সমুদ্রের দিকে, যে-দিকে সহর থেকে আসবার পথ। ষ্টীমারখানা আসছে কি না তাই সে দেখছে।

শেষে — টেনোর ফার্‌-বনের ওপরে এক রাশ ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেলো। তার নাড়ী দ্রুত চলতে লাগলো; তাড়াতাড়ি সে এক গ্লাস খোসবুদার মদের শরবৎ খেয়ে নিলে, তারপর চললো সমুদ্রের কিনারে। দূরে — খালের মাঝখানে এক রাশ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে — ঐ যে ষ্টীমারের সামনেকার নিশান! সে কি আসছে? না, আসতে কোনো রকম বাধা হ'লো? বাধা ঘট্‌তে আর কতোক্ষণ — ছেলেপিলের একটীর একটু অসুখ-বিসুখ করলেই তো হ'লো! তাহ'লে তো রাতটা তাকে একাই কাটাতে হবে! গেলো ক' হপ্তা ধ'রে ছেলেপিলেরা অনেকটা পিছনে পড়ে ছিল; আজ তারা আবার এসে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে। শেষের ক'খানা চিঠিতে ছেলেপিলের কথা বড়ো একটা হয় নি — কতকগুলো আপদকে যেন তারা এড়িয়ে চলতে চাচ্ছিলো; তাদের মনের মধ্যে রঙের যে হোলি-খেলা চল্‌ছিলো, ছেলেপিলেরা তার কি দেখবে?

ঘাটে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে — তার পায়ের চাপে তক্তাগুলো মচমচ করতে লাগলো। একটা খুঁটির কাছে এসে সে থেমে গেলো — ষ্টীমারখানার দিকেই তার চোখ দু'টী। জাহাজখানা ক্রমেই বড়ো দেখাতে লাগলো — তার পেছনে বিস্তৃত নীল জলরাশির ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে মিলেছে যেন সোনালী রঙের বন্যা। সে দেখতে পেলে : উপরের 'ডেকে' মানুষ চলাফেরা করছে — জাহাজের সামনের দিকে খালাসীরা দড়াদড়ি নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

পাইলটের ঘরখানির পাশে যেন শাদা কি একটা জিনিস উড়লো। 'ডকে' সে একাই, তাকে ছাড়া আর কার উদ্দেশে ওটি ওড়ানো হ'তে পারে? আর সে ছাড়া আর কে-ই বা তার দিকে রুমাল ওড়াবে? নিজের রুমাল খানা বের ক'রে সেও তার জবাবে ওড়াতে লাগলো। কিন্তু সে দেখলে তার নিজের রুমালখানা শাদা নয়; খরচ কমানোর জন্যে সে অনেক দিন থেকে রঙীন রুমাল ধরেছে। ... জাহাজখানিতে বাঁশী বেজে উঠলো, ইঞ্জিনের জোর কমে গেলো। জাহাজ ঘাটের দিকে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। তাকে সে দেখতে পেলে। তাদের চোখে চোখ মিল্‌লো, কিন্তু কথা হলো না — জাহাজ এখনো খানিক দূরে। ঘাটে লাগানোর জন্যে জাহাজ-খানাকে দড়া দিয়ে টানা হচ্ছে। দেখলে : সিঁড়ির রেলিং ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ...হ্যাঁ এসেছে বটে, কিন্তু এ কি সেই! তাদের জীবনের দশটী বছর কেটে গেলো। এখন তার স্টাইল গেছে বদলে, পোষাকের ছাঁট-কাটও তার এখন আগের মতো নয়। আগে দেখা যেতো তখনকারদিনের বনেটে আধ-ঢাকা তার পেলব অঙ্গ, খোলাই থাকতো তার মাথার সাম্‌নাটা। এখন সেখানটা বিশ্রী মন্দাটে একটা টুপিতে ঢাকা

পড়েছে। আগে সে পরতো ঢিল ঝুলোনো ক্লোক্ তার কারুকার্যের নীচে বিচিত্র রেখায় লীলায়িত ছিল তার সুন্দরী-তনু। বাহুর দোল, কাঁধের গোলালো চেহারা — জামাটা যেন দুষ্টুমি ক'রেই কখনো ঢাক্‌তো কখনো ঢাকতো না। এখন তার গায়ে উঠেছে, আলষ্টার তার চোহারাটাই একেবারে মাটী করেছে; — যেন তার জামাটাই দেখবার দেহখানি কিছু নয়। সিঁড়ি থেকে ঘাটে উঠতেই সে দেখতে পেলে তার ছোট্ট পা দু'খানি। বোতাম-আঁটা বুটে কি সুন্দর মানাতো তার পা দুটো। চাইনিজ স্লিপারে তার সে মানান্ আর নেই, এখন যেন তাদের দেখাচ্ছে লম্বাটে: এই পা'র নাচুনী ছন্দ এক সময় তাকে মুগ্ধ করতো, স্লিপার প'রে সে ছন্দও যেন আজ আর নেই।

হ্যাঁ এ সে-ই বটে, কিন্তু আগের মতনটী তো নয়! সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু দিলে, দু'জনা দু'জনারই ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলে, — ছেলেপিলেদের খবরও। এর পর তারা ঘাট থেকে তীরে গিয়ে উঠলো।

তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুতে লাগলো — ভাঙা-ভাঙা শুক্‌নো যেন জোর ক'রে টেনে আনা। কি আশ্চর্য্য! দুজনায় দেখা হওয়ায় যেন এদের ভারি লজ্জা করছে! এতো যে চিঠি লেখালেখি হয়েছে, তা নিয়ে একটী কথাও হ'লো না।

শেষে স্বামীটী সাহসে ভর ক'রে বললে : "সন্ধ্যের আগে একটু বেড়িয়ে এলে হয় না?"

স্ত্রী বল্‌লে : "খুব, খুব, চলো না।" — বলেই সে স্বামীর হাত নিজের হাতে টেনে নিলে।

রাস্তা ধ'রে তারা চল্‌লো ছোট্ট শহরটীতে। দেখলো : বসন্তের সমস্ত উৎসব আনন্দ থেমে গেছে, বাগানের শোভা চলে গেছে। দু'একটা আপেল তখনো পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে, কিন্তু ফুল একটীও কোথাও নেই। সবগুলো বারান্দারই পর্দ্দা খুলে নেওয়া হয়েছে, তার যেন কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে ছিল প্রদীপ্ত মুখের হাসি — আনন্দের কলরব, আজ সেখানে মৌনী নীরবতা, একেবারে খাঁ-খাঁ ভাব।

স্বামী বল্‌লে : "ভাবটা যেন শরতের।"

স্ত্রী বল্‌লে : "সত্যিই বসন্তের উৎসব আজ থেমে গেছে, সবদিকেই যেন কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব।"

তারা চল্‌ছে।

"যেখানে আমরা থাকতুম, সেখানটায় একবার গেলে হয় না?" — স্ত্রী বললে।

"চমৎকার হয়, চলো যাই।"

সারি সারি বাড়ী, তার পাশ দিয়ে তারা চললো।

ছোট্ট কুটীরখানি, — তার একদিকে মালীর ঘর-দুয়ার, অন্যদিকে প্রধান পাইলটের বাড়ী। চারধারে রঙীন বেড়া। বারান্দা — বাগান, সবই তেমনি আছে।

অতীতের কতো স্মৃতি এসে ভিড় করছে তাদের মনে। ঐ ঘরে তাদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কতো আনন্দ, কতো উৎসব, কতো যৌবন, কতো সঙ্গীত সে সময়! ঐ যে ঐখানে তারা এক-ঝাড় গোলাপ লাগিয়ে ছিল, ওধারে ঐখানটায় ষ্ট্র-বেরি। সে-সব এখন আর নেই, ঘাসে ঘাসে সে-সব জায়গাই একেবারে ছেয়ে গেছে। ঐ যে ঐখানটীতে ছিল একটী দোলনা ঝুলোনো; তার শেষ-চিহ্ন এখনো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দোলনাটী আর নেই।

"কি-চমৎকার চিঠিগুলো লিখেছিলে তুমি!" — ব'লে স্ত্রী তার হাতে একটু চাপ দিলে।

তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, কিন্তু কোনো জবাব সে দিতে পারলো না। এর পর তারা হোটেলের দিকে ফিরে চললো : স্বামীটী তার ভ্রমণ-কাহিনী বলতে লাগলো।

আগে যে-বড়ো ঘরটীতে বসে তারা দু'জনে খেতো, সেইখানে সে একটা টেবিল আনিয়েছে। গিয়েই তারা খেতে বস্‌লো — ঈশ্বরের নাম নেওয়া-নেওয়ি আর হলো না।

আবার আলাপ শুরু হলো। রুটীর পাত্রটী নিয়ে সে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলে। স্ত্রী হাসতে লাগলো। এ রকম ভদ্রতা অনেক দিন সে দেখেনি। বাড়ী থেকে অনেক দূরে — এখেনে ব'সে দুজনে খাওয়া হচ্ছে—এ তাদের নতুন বোধ হচ্ছে,

ভালোও লাগছে খুব। দুজন দুজনার কতো পুরোণো স্মৃতি জাগিয়ে তুললো; সেই সব স্মৃতির ছোঁয়ায় যেন তারা নতুন করে বেঁচে উঠলো। তাদের চোখের চাউনিতে আবার দীপ্তি ফিরে এলো, মুখের বুড়ো-বুড়ো ভাব কেটে গেলো। আ-হ জীবনের গন্ধমধুর সোনালী সময়টুকু -- ভোগ করবার সুযোগ যদি আসে — আসে একবার মাত্র, কিন্তু কতো শতো লোকের তা-ও আসে না! -- আহার শেষে সে চাকরাণীটীর কাণে কাণে কি বল্‌লে, তক্ষুণি এলো এক বোতল শ্যাম্পেন্।

"এক্সেল প্রিয়তম, কি ভাবছো তুমি!" — একটু তিরস্কারের সুরে স্ত্রী বললে।

"ভাবছি সেই বসন্তের কথা যা চলে গেছে, কিন্তু আবার ফিরে আসবে।"

কিন্তু সত্যিই শুধু বসন্তের কথা সে ভাবছিলো না। হঠাৎ একটা কালো বেরাল ঘরের ভিতর দিয়ে দৌড়ে গেলে মানুষ যেমন ভয় পায়, তেমনি সেও স্ত্রীর তিরস্কারে খানিক ঘাবড়ে গেলো, একটা কালো ছায়ার মতো সহসা তার মনের সামনে ভেসে উঠলো ছেলেপিলের ছবি, -- তাদের পরিজ্-ডিশের চিত্র।

যাহোক, তার এ-ভাবটা আবার কেটে গেলো, গোলাপ-রাঙা শারাবের ছোঁয়ায় আবার দুজনার স্মৃতির তার বেজে উঠলো, অতীতের মাতাল মায়ায় আবার তারা ঢলে পড়লো।

হু হু করে কাট্‌তে লাগলো ঘন্টাগুলো। বসবার ঘরে ছিল পিয়ানোটী, সেখানে তারা গিয়ে বস্‌লো কফি খেতে।

ততোক্ষণে স্ত্রীর স্বপ্ন ভাঙতে সুরু হয়েছে। সে বল্‌লে : "তারা কি যে করছে বাড়ীতে?"

"এখেনে বসো, একখানা গান করতো শুনি।" — স্বামীর হুকুম হ'লো।

"কি গান করবো? জানোই তো কতো দিন ওসব ছেড়ে দিয়েছি।"

তা কি আর সে জান্‌তো না? কিন্তু এখন যে তার একখানা গান শোনাই চাই।

স্ত্রী টুলে বসে সুর ধরলে। কিন্তু হোটেলের পিয়ানো! — আওয়াজ ভারি খন্‌খনে — দাঁত ঢিলা হলে যে রকমটা হয় সেই রকম বাজ্‌তে লাগলো।

পাশ ফিরে সে জিজ্ঞেস করলে : "কি গাইবো বলো?"

স্ত্রীর চোখের দিকে চাইতে তার সাহস হ'লো না। এমনি উত্তর দিলে : "তুমি তো জানো, লিলি।"

"ওঃ, তোমার সেই গানটী? হ্যাঁ সে আমার মনেই আছে।"

সেই গানটাই ধরলে : কোথায় সে-দেশ যেথায় আমার বঁধু থাকে ...

কিন্তু হায় ! তার এ কি পাত্‌লা ঠন্‌ঠনে গলা — কৃত্রিম প্রাণহীন সুর! যার বেলা মাঝ-আকাশ পেরিয়ে দিনান্তের দিকে ঢলে পড়েছে, গানের মধ্যে সময় সময় মনে হচ্ছিলো এ যেন তারই অন্তরের আর্ত্তরব। সংসারের কাজ করতে করতে তার আঙুলগুলোর নড়ন-চড়ন গেছে কমে, তারা ঘাটগুলোতে ঠিক পড়ছিলো না। হোটেলের আগন্তুকরা বাজিয়ে বাজিয়ে যন্ত্রটার দফা রফা করে রেখেছে; উপরকার কাপড়ের পর্দ্দাটী গেছে ছিঁড়ে, কাঠের সঙ্গে পিতলের তৈরী ষ্ট্রিংগুলো লেগে বিশ্রী খট্‌খট্ আওয়াজ কর্‌ছে।

গান শেষ হলে লিলি যেন নিজেকে অপরাধী মনে কর্‌তে লাগলো। যে-কণ্ঠ, যে স্বচ্ছন্দ সুর তার স্বামী চাচ্ছিলো, তা সে এখন কোথায় পাবে? পাশ ফিরে স্বামীর দিকে তাকাবে, এমন সাহস তার হ'লো না, চুপটী ক'রে ব'সে রইলো। স্বামী নিজে উঠে এসে হয় তো তাকে কিছু বলবে, এই সে আশা করেছিলো। কিন্তু উঠে সে এলো না; ঘরটাতে যেন একটা অর্থপূর্ণ নীরবতা ছড়িয়ে পড়লো। লিলি শেষে নিজেই ঘুরে বস্‌লো; দেখলে : তার স্বামী এক কোণে বসে — কাঁদছে। তার ইচ্ছে হলো : ছুটে গিয়ে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে, চুমোয় চুমোয় তার মুখখানা ভ'রে দেয়, কিন্তু ওঠা তার হ'লো না, মাথা নীচু ক'রে সে মেজের দিকে চেয়ে রইলো।

স্বামীটির দুটো আঙুলে একটা সিগার, সেটা আর ধরানো হয় নি। যখন সে দেখ্‌লে সবাই নীরব, আস্তে আস্তে সিগারটার মুখ কেটে দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বাল্‌লে।

"ধন্যবাদ তোমায়, লিলি!" — ব'লে সে সিগারটা ধরালে। — "এখন কফি খাবে তো?"

তারা দুজনে কফি খেতে লাগলো, আর গল্প জুড়ে দিলে বসন্তের নানা উৎসবের, আসছে বছর কোথায় যাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ের। কিন্তু আলাপ তাদের জমলো না, কথাবার্তা যেন হোঁচট খেয়ে খেয়ে একই জায়গায় ফিরে আসতে লাগলো।

শেষে লম্বা একটা হাই তুলে স্বামী বল্‌লে : "আমি শুতে যাচ্ছি।"

স্ত্রীও উঠে দাঁড়ালো; বললো : "চলো আমিও যাচ্ছি, বারান্দা থেকে একটু ঘুরেই আমি আস্‌ছি।"

স্বামী ঘরে ঢুকলো। স্ত্রী খাবার ঘরে খানিক দাঁড়িয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে — পেঁয়াজের আচার, পশমী কাপড় ধোওয়া ইত্যাদি নানা কথা। একথা-সেকথায় আধ ঘন্টাটা'ক কেটে গেলো।

সেখান থেকে ফিরে এসে শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে কাণ পেতে শুন্‌তে লাগলো। তার স্বামীব বুট-জোড়া বাইরে পড়ে আছে, ভিতরে কারুর সাড়াশব্দ নেই। সে আস্তে আস্তে দরজায় ঘা মারলে, কিন্তু কোনো জবাব নেই। স্বামীটী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে!

পরদিন সকালে তারা দু'জনে কফি খেতে ব'সে গেলো। স্বামীটীর মাথা ধরেছে, স্ত্রীটীরও চোখেমুখে যেন কেমন একটা অসোয়াস্তির ভাব জড়িয়ে আছে।

দাঁত খিঁচিয়ে সে বললে : "দুত্তোর, কী কফি এ!"

স্ত্রী বল্‌লে : "এ তো ব্রাজিলের কফি।"

স্বামী ঘড়িটী দেখতে দেখতে বল্‌লে : "আজ কি করা যায় বলো তো?"

স্ত্রী বললে : "কফি নিয়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করার চাইতে তুমি বরং কিছু মাখন-রুটী খেয়ে নাও।"

স্বামীটী একখানি 'ট্রে'তে ক'রে মাখন-রুটী ও মদ নিয়ে এলো। খেয়ে সে বেশ তাজা হ'য়ে উঠলো।

"চলো পাইলট্-পাহাড় থেকে ঘুরে আসি, চমৎকার জায়গাটা!"

দুজনা বেরিয়ে পড়লো। আবহাওয়াটা ছিল ভারি সুন্দর; ঘোরা-ফেরা ভালোই চল্‌লো। মুশকিল হলো পাহাড়ের উপরে উঠতে গিয়ে। আগের মতো দ্রুত চরণ আর চলে না! স্ত্রী হাঁফ ধরতে লাগলো, স্বামীর হাঁটু ব্যথা করতে লাগলো। যে-দিন চলে গেছে তার সঙ্গে আজকের তুলনাই হয় না!

সেখান থেকে তারা চল্‌লো খোলা মাঠে। মাঠের সমস্ত ফসল কাটা হয়ে গেছে। তারপর যা ঘাস লতা পাতা গজিয়েছিলো সেও গরু ছাগল ভেড়ায় খেয়ে শেষ করেছে। একটা ফুলও কোথাও পাবার জো নেই। তারা দুজনা আলাদা আলাদা দুখানা পাথরের উপরে গিয়ে বসে পড়লো।

স্বামী তার জেল তদারকের অনেক কাহিনী বল্‌লো ; স্ত্রী বললো তার ছেলেপিলের কথা।

তারপর তারা সেখান থেকে উঠে আরও খানিক দূর গেলো। দুজনাই চুপ। স্বামীটী ঘড়ি বের ক'রে সময় দেখতে লাগলো।

"খাবার সময় হতে এখনো তিন ঘন্টা বাকী" — সে বল্‌লে।

ভাবতে লাগলো : কালকের দিনটাই বা কি ভাবে কাটানো যাবে।

তারা হোটেলে ফিরে গেলো। স্বামীটী খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। স্ত্রী হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে বস্‌লো তার পাশে, কিন্তু কোনো কথা কইলে না।

খাওয়া দাওয়াও হলো বিনা কথাবার্ত্তায়, শেষে স্ত্রী বাড়ীর চাকরবাকরদের কথা তুল্‌লে।

"আঃ, চাকর-বাকরদের কথা আর ব'লো না।" — সে রেগে উঠলো।

"আচ্ছা তাই। ঝগড়ার দরকাব নেই।"

"কেন, আমি কি ঝগড়া করছি নাকি?"

"তবে কি আমি করছি?"

তারপর আবার দু'জনা গম্ভীর হয়ে পড়লো। স্বামীটার মনে হতে লাগলো : কেউ এ সময় তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতো যদি, ভালো হ'তো। ছেলেপিলেরা এখানে থাকতো যদি! ওঃ, খুবই ভালো হ'তো। তাদের কথাবার্ত্তা যেন আর জমছে না! এই ভাবতেই তার মনে পড়লো গত দিনের আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলোর কথা। আর তার বুকে যেন একটা কাঁটা এসে বিঁধতে লাগলো।

স্ত্রী বল্‌লে : "চলো না এক্‌ব্যাকেনে গিয়ে কিছু ষ্ট্রবেরি তুলে নিয়ে আসি।"

স্বামী বল্‌লে : ওবে পাগলী, এখন কোথায় পাবে ষ্ট্রবেরি, এযে শরৎ কাল!"

"সে যাই হোক, চলো না একবার যাওযা যাক্‌!"

তাবা চললো। কিন্তু কথা-কওয়ার কোনো বিষয়ই তারা খুঁজে পেলে না। স্বামীটী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো যদি কোনো-এমন-একটা জিনিস বা জায়গা দেখতে পাওয়া যায় যার সম্বন্ধে কথা বলা চলে : কিন্তু সবই তখন শুকিয়ে গেছে; বসন্তে তাদের সম্বন্ধে এতো কথা বলা হয়ে গেছে যে সেই সব কথার ঘায়েই যেন তারা মারা গেছে। কোন্ বিষয়ে স্বামীর কি-মত, স্ত্রীর জানাই ছিল। সে-সবের অনেকগুলোই সে মান্‌তো না। এখন আর নতুন কি-ই বা শুন্‌বে — বলবে? তাছাড়া, স্বামীর মনটী এখন বাড়ীর জন্যে — যে-বাড়ীতে তার বাসগৃহ, তার ছেলেপিলে — তার জন্যে উতলা হ'য়ে উঠেছিলো। এদের দু'জনার মধ্যে যে কোনো মুহূর্ত্তে ঝগড়া লেগে যেতে পারে — এমন দু'টী নির্ব্বোধ মানুষের এমন ক'রে ঘুরে বেড়ানো — কী ঝক্‌মারি এ! শেষে তারা থেমে গেলো — স্ত্রীটী বড়ো ক্লান্ত হয়েছে। স্বামীটী ব'সে পড়্‌লো আর তার হাতের ছড়ি দিয়ে মাটীতে দাগ কাট্‌তে লাগলো, যেন একটা ছুঁতো পেলেই ঝগড়া লাগিয়ে দেয় আর কি!

শেষে স্ত্রী জিজ্ঞেস কর্‌লে : "কি ভাবছো তুমি?"

"আমি?" — সে উত্তব দিলে, যেন তার বুকেব উপর থেকে ভারি একখানা পাথর নেমে গেছে। — "আমি কি ভাবছি শোনো : আমরা বুড়িয়ে গেছি, খেলা আমাদের শেষ হয়েছে। এখন অতীত দিনের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের সুখী হওয়াই ভালো। তোমার যদি মত হয়, চলো রাত্রির ষ্টীমারেই বাড়ী ফিরে যাই! কি বলো?"

"এতোক্ষণে আমিও তাই ভাবছিলুম, কিন্তু কথাটা তুমিই পাড়বে ভেবে চুপ ক'রে আছি।"

"আচ্ছা তাহ'লে ফিরেই যাই চলো। বসন্ত চলে গেছে, তাব জায়গায় এসেছে শরৎ।"

"হাঁ শবৎই এসেছে।"

এব পর দু'জনাই বেশ হাল্‌কা বোধ করলো — সহজ-ভাবে তারা চলে যেতে লাগলো। তাদের মধুর মিলনটী শেষে এমন একটা গদ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো — ভাবতেই স্বামীটীর যেন লজ্জা করতে লাগলো। তার মনে হ'লো এর একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

"দ্যাখো, লিলি" — সে ব্যাখ্যা শুরু করলে — "তোমার প্রতি আমাব প্রে ..." (বলতে গিয়েই সে থেমে গেলো, কেন না ঐ শব্দটা তার কাছে যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হ'লো) -- "তোমার প্রতি আমার প্রীতির ভাবটী, এই ক' বছরের — লোকে যাকে বলে বিবর্ত্তিত হওয়া — তাই হয়েছে। সেটী এখন যেন আগের চেয়ে বিস্তৃত, বিকশিত হয়েছে। তাই আগে যেমন সেটী একা একজনের উপর গিয়ে পড়তো, এখন আর ঠিক তেমনটী নেই। এখন সেই প্রীতি আমাদের পরিবাব বলতে যে-সমষ্টিগত পদার্থ বোঝায় তারই উপরে গিয়ে পড়ছে। এ যেন তোমাকে আলাদা ক'রে দেখে না, ছেলেদেরও না, যেন সকলকে এক সাথে মিলিয়ে পেতে চায়।"

"যেকথা কাকা সব সময়েই ব'লে থাকেন : ছেলেপিলে বিদ্যুৎবাহী তারের মতন জিনিস।"

এই দার্শনিক ব্যাখ্যার পর সে যেন আবার আগের মানুষটী হয়ে পড়লো। যে-বয়েস নেই, তাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে আন্‌বার কস্‌রতের চেয়ে এই-ই তো ভালো।

এর পর হোটেলে গিয়েই স্ত্রী 'পোর্টম্যান' গোছাতে লাগলো। এতেই তার স্বস্তি।

ষ্টীমারে উঠেই তারা খেতে গেলো। স্বামীটী অবশ্যি চক্ষুলজ্জার খাতিরে জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দু'জনায় মিলে উপভোগ করবার প্রস্তাব করলে, কিন্তু স্ত্রী সে কথা কাণেই তুল্‌লো না। খাবার সময় স্বামীটীই আগে খেতে শুরু করলো; স্ত্রী রুটীর দাম কতো-কি তাই হোটেলওয়ালীকে জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগলো।

স্বামীটীর যখন পেট ভ'রে গেলো সে বিয়ারের গ্লাসটী মুখে তুলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেলো। কথাটী নিয়ে কতোক্ষণ ধ'রে মনে মনে সে বেশ কৌতুক বোধ কর্‌ছে।

"বুড়ো-বুড়ীর এ কি কারবার!" — সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো। স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে হাস্‌তে লাগলো। স্ত্রীটী রুটীর এক-কামড় নিতে নিতে তার দিকে তাকালো।

কিন্তু স্ত্রীটী হাসলো না। প্রথমে যেন তার মুখের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মতো একটা দীপ্তি খেলে গেলো, তার পরেই সেখানটায় ছেয়ে গেলো শুকনো সম্ভ্রমের কালিমা। ব্যাপার দেখে স্বামীটী দস্তুরমতো অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো।

তাদের স্বপ্ন টুটে গেছে। প্রেয়সীর শেষ চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন তার সাম্‌নে ব'সে আছে তার ছেলেপিলেদের মা! এই কথা ভাবতেই তার মনে হলো যেন কেউ তাকে জোর ক'রে পিষে মার্‌ছে।

"ক'দিন বোকার মতো কাণ্ড করলুম ব'লে আমায় যা তা বলার দরকার কি?" — কড়া সুরে স্ত্রী বল্‌লে। — " কিন্তু ব'লেই বা কি করবো, পুরুষের ভালো বাসার সঙ্গে অনেকখানি ঘৃণা মেশানো থাকে, তাতো জানি। বেশ মজার জিনিস ওটা।"

"আর মেয়েদের ভালোবাসায় কিছু থাকে না বুঝি?"

"থাক্‌বে না কেন? হয়তো পুরুষের চাইতে একটু বেশীই থাকে। কিন্তু তার মানে মেয়েদের চটবার কারণই ঘটে বেশী।"

"ঈশ্বর জানেন, হয়তো স্ত্রীপুরুষ দুজনের ঘৃণাই সমান — যদিও আলাদা আলাদা রকমে। সহজে মেলে না ব'লে যে জিনিসের ন্যায্য অতিরিক্ত দাম দিতে হয়, সেটী সহজেই আবার ঘৃণার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।"

"কেন ন্যায্যর অতিরিক্ত দাম দিতে হবে?"

"কেন সেটী পাওয়া এতো কঠিন?"

এমন সময় তাদের মাথার উপরে ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠলো, তাদের কথাবার্ত্তাও থেমে গেলো।

এখানেই নাম্‌তে হবে।

তারা বাড়ীতে পৌছুলো। মা গিয়ে মিশলো ছেলেপিলেদের সাথে। বাপটী বেশ বুঝতে পারলো . মা-টীর প্রতি তার যে ভালোবাসা সে একেবারে বদলে গেছে, আর তার প্রতি মা-টীর যে ভালোবাসা সেও চলে গেছে কাঁদুনে খোকাখুকুদের দিকে। এখনো যদি স্ত্রীর কিছু ভালোবাসা তার প্রতি থেকে থাকে, সেটুকু আছে সে এদের বাপ ব'লেই। ভালোবাসার এ-সূত্র তো শক্ত নয়। তার মনে হ'তে লাগলো যেন তাকে এক পাশে ঠেলে ফেলা হয়েছে। দানাপানি জোগাড়ের ভার তার উপর না থাক্‌লে হয়তো তাকে একেবারে বাদই দেওয়া হ'তো।

সে তার কাজের-ঘরে চলে গেলো; ড্রেসিং-গাউন ও স্লিপার প'রে পাইপটী ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে সে খানিক সোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো। বাইরে তখন ঘোর দুর্য্যোগ: ঝড়ের ঝাপ্‌টা বৃষ্টির জলের সঙ্গে যেন লড়াই কর্‌ছে, ষ্টোভ-পাইপে জোর বাতাস লেগে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে।

ছেলেপিলেদের দেখাশুনা ক'রে তার স্ত্রী ঘরে ঢুক্‌লো।

"ষ্ট্র-বেরি তুলবার সময় এ নয়" — সে বল্‌লে।

"না রে বুড়ী, বসন্ত চলে গেছে, এখন এসেছে শরৎ।"

"হ্যাঁ শরৎ এসেছে" — স্ত্রী উত্তর দিলে। — "কিন্তু শীত এখনো নামেনি, সে-ও এক সান্ত্বনা।"

"সান্ত্বনা! সান্ত্বনা তো বেশী পাইনে যখন ভাবি একবার মাত্র আমাদের জীবন।"

"একবার কেন জীবন? দুবার, যখন ছেলেপিলে হয়; তিনবার, যখন নাতি-নাত্‌নী দেখার সৌভাগ্য হয়।"

"কিন্তু তারপর তো সব শেষ!"

"শেষ, যদি এর পরে আর কোনো জীবন না থাকে।"

"কিন্তু তার ঠিক কি? কেই বা বল্‌তে পারে? আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস তো আর প্রমাণ নয়?"

"কিন্তু এ বিশ্বাস কতো সুন্দর, কতো মধুর! তবে বিশ্বাসই করা যা'ক না কেন। বিশ্বাস করা যা'ক যে আর একটী বসন্ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এই বিশ্বাসই আমরা করবো।"

"ভালো সেই বিশ্বাসই আমরা কর্‌বো" — বলে সে স্ত্রীর মাজা জড়িয়ে ধ'রে তাকে নিজের কাছে টেনে নিলে।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্লাব

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

সমুদ্রের ধারে একা একা বেড়াচ্ছিলাম।

সহসা একটা সুবৃহৎ বাড়ী, তাকে অট্টালিকা বলা যেতে পারে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিস্মিত হ'য়ে ভাবলুম, হয়ত কোন রাজা মহারাজার বাড়ী, কিন্তু একটু কাছে আসতেই সে ভ্রম দূর হ'য়ে গেল। দেখলুম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্লাব'।

অনেক জায়গায় অনেক রকম ক্লাব দেখেছি, কিন্তু কোন জায়গায় কোনও ক্লাবের এমন অদ্ভুত নাম শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। ভাবলুম সমুদ্রের ধারে কালো জলের অক্লান্ত উচ্ছ্বাসে দীর্ঘ-নিশ্বাসটাই মানুষের সাধারণতঃ সাথী হয়, তাই হয়ত এই ক্লাবের সৃষ্টি। কিন্তু এটুকু ভেবেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম না, এক পা দু' পা ক'রে ক্লাবের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। দারোয়ান যে ব'সে ছিল, সে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বল্লে — আসুন, ভেতরে যান।

দারোয়ানের এই আচরণটাও আমার কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকল। ভেতরে ঢুকলুম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইল না। সকলেই নিজ নিজ গভীর চিন্তায় ব্যস্ত আছে ব'লে মনে হ'ল। এবং কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা কোন রকম বিরক্ত না ক'রে সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম — এর মানে কি?

ম্যানেজার ভদ্রলোকটি একটু মোটা গোছের, গায়ের রংও বেশ ফর্সা। খুব বড়লোকের ছেলে বলেই মনে হ'ল। তিনি হেঁসেই বল্‌লেন — কিসের মানে?

বল্লুম — এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্লাবের অর্থ কি?

তিনি তেমনি হেসে বল্‌লেন — এর কোন অর্থ নেই। এখানে প্রধানতঃ মানুষের দুঃখের আলোচনা করা হয়, আর দুঃখী যারা তারা সকলে সব সময়েই এখানে সাদরে নিমন্ত্রিত। ... এই যে মোটা মোটা খাতাগুলো দেখছেন এর সব পাতায় অনেক মানুষের অনেক দুঃখের কাহিনী লেখা রয়েছে। আপনারও যদি কিছু লিখবার থাকে এখানে লিখে যেতে পারেন। এ ক্লাবে কোন চাঁদা লাগে না।

এই বলেই তিনি একটা কলম আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

আমি কলমটা হাতের মুঠোর ভেতর ধ'রে ভাবতে লাগলুম। তিনি বল্‌লেন, বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। মনের আনন্দে আপনার দুঃখের কাহিনী এই সব খাতার পাতায় লিখে যেতে পারেন, কেউ কোন রকম সমালোচনা বা উপহাস করবে না, যার ভয়ে মানুষ পৃথিবীর আর কারো কাছে সে কাহিনী প্রকাশ করতে পারে না। ... তা ছাড়া যারা সুইসাইড্ করে তাদের মত দুঃখী বোধ হয় দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আমরা তাদের সমস্ত দুঃখ, ব্যর্থতার কাহিনী অতি আনন্দের সঙ্গে নিয়ে থাকি। ... বলুন আপনাকে কোন্ খাতাটা দেবো ... সুইসাইড? ... না —

তাঁর কথাগুলো শুনে পলকে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল, কলমটা হাত থেকে খসে মাটিতে প'ড়ে গেল।

তিনি কলমটা মাটি থেকে তুলে আমার হাতে দিয়ে একটা মোটা বাঁধান খাতা দেখিয়ে বললেন — আচ্ছা, আপনি এইটেতেই লিখুন।

আমি ঘেমে উঠ্‌লুম, বল্লুম, কি লিখ্‌ব? ...

তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন — কেন, আপনার দুঃখের কাহিনী —

তোতলা স্বরে বল্লুম — কিছু মনে পড়ে না।

তিনি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, বল্‌লেন — আপনি জীবনে একটাও আঘাত পাননি?...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় বল্লুম, — হ্যাঁ, খুব ছোট বেলায় একবার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলুম, তার দাগটা এখনও রয়েছে।

তিনি বাধা দিয়ে বললেন — না সে কথা নয় —

হঠাৎ তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন — আপনি যৌবনে কাউকেও ভালবেসেছিলেন, প্রাণ দিয়ে, বুক দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে?

লোকটার ধৃষ্টতায় মনে মনে ভারী চটে উঠলুম। হায়, কি কুক্ষণে আজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছিলুম, আর কি কুক্ষণেই এই ক্লাবে ঢুকেছিলুম! একটু নরম হ'য়েই বল্‌লাম — তাতে কি যায় আসে?

আমার উত্তর শুনে তিনি ভারী খুসী হয়ে উঠলেন, বল্‌লেন — তাহলেও ত আপনার অনেক কথা লিখবার আছে। ... নিন্ ... লিখুন ... জানেন, যারা ভালবাসে তাঁদের মত দুঃখী আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে। ...

বল্লুম — ভালবাসলে দুঃখ কিসের? .. ভালবাসা তো একটা অনন্ত আনন্দের সন্ধান এনে দ্যায়।

তিনি বল্লেন — আহা আপনি বুঝছেন না। ... ঐ আনন্দের ভেতর যদি দুঃখ না থাকে, জ্বালা না থাকে, তৃষ্ণা না থাকে ... তা হ'লে ত তাব সবটাই ফাঁকি! ভালবাসায় বেদনা আছে বলেই তো পৃথিবী শুদ্ধলোক পাগল হয়ে তার পেছন পেছন ঘুরে হয়রাণ হচ্ছে। দুঃখের মত অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির কি আর কিছু আছে! এ পৃথিবীতে দুঃখটাই হচ্ছে মানুষের একান্ত আপনার জিনিষ। ....

কথাটা ব'লেই তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। বিরক্ত হ'য়ে মাথাটা একবার সজোরে নেড়ে বল্লুম, বুঝলুম না আপনার কথা, আর বুঝতেও চাই না।

তিনি আমাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তবু আমাকে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবশেষে বল্লেন, এই ধরুন, আপনি কাউকে ভালবাসলেন কিন্তু তাকে পেলেন না; তাহ'লে তো আপনার বুকে দুঃখের সৃষ্টি হ'ল।

বল্লুম — তাই বা হবে কেন? ভালবাসাই তো চরম পুরস্কার! আমি তাকে ভালবাসি এটুকু ভাবতে পারাই তো জীবনের এক মস্ত সান্ত্বনা!

তিনি হেসে বল্লেন, কিন্তু ঐ সান্ত্বনাটুকু কিসের?

আমি চুপ ক'রে রইলুম। তিনি বল্‌তে লাগলেন — অন্তবের সঙ্গে অন্তরের যে বিরহ সে মিটবাব নয়! ভালবাসার ক্ষুধা কখন মিটবার নয়, একটিকে নিয়ে সে আরম্ভ হয়, কিন্তু তারপর সে বেড়েই চলে।

বল্লুম, তা না হয় স্বীকারই করলুম, কিন্তু যদি তাকে পাওযা গেল, তাহলে?

তিনি বিজয়গর্ব্বে ব'লে উঠলেন, — তা হ'লে সে তো আরো আরো দুঃখী!...

আমি সজোরে কলমটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বল্লুম, মিথ্যে কথা।

তিনি চট্‌লেন না। সেই রকম নিষ্ঠুর হাসি হাসতে হাসতে বল্লেন — তর্কের ঝোঁকটা মাথা থেকে বিদায় করে দিন, আর আমি প্রমাণ না পেয়ে কোন কথা বলি না। ... পাওয়ার ভেতরেও যে অনেকখানি না-পাওয়া রয়ে গেল ; এই না-পাওয়াকে পেতে হলে গভীব দুঃখের তপস্যার দরকার। যারা এই ক্লাবে সুইসাইড্ করেছে, তাদের বেশীর ভাগই বিবাহিত আর তাদের লেখা কাহিনী থেকেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।...

এই বলেই তিনি অনেকগুলো মোটা মোটা বাঁধান খাতা বের করলেন।

আমি অধীর হ'য়ে বলে উঠ্‌লুম — দোহাই আপনার আমায় রক্ষা করুন।

ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, বাইরের রোদ ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। বালিসের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলুম আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম, ... দেখলুম টেবিলের উপর চা ঢাকা রয়েছে। একটা চুমুক দিয়েই বুঝলুম, একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা; অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় চায়ের দুঃখেই।*

। আশ্বিন ১৩৪৪ ।

* মোপাসা অবলম্বনে।

ঘটক চরিত

আবু আহ্‌মদ ফজলুল করিম, এম্-এ.

বহুদিন পরে সদর ঘাটে ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেখা হইল। সঙ্গে বটকৃষ্ণ, বিষ্ণুশর্ম্মা ও যুধিষ্ঠির। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচ বন্ধুর মিলন হবে মনে করি নাই। সকলে মিলিয়া করোনেশন পার্কের নিভৃত এক কোণে ঘাসের উপর বসিলাম। চারি পয়সার চিনাবাদামও নেওয়া হইল। একটা চিনাবাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ভাঁড়ু দত্ত কহিল "কি হে, সাড়া শব্দ যে বহুদিন পাওয়া যাচ্ছে না! ভাল ত? গৃহলক্ষ্মী গৃহে অধিষ্ঠান কল্লেন কি?

ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "না, লক্ষ্মীর আগমন এখনও হয় নি।"

বিষ্ণু—তা'হলে হবার সম্ভাবনা শীগ্‌গীর আছে নিশ্চয়ই।

কহিলাম, বলি, কেমন করে। তবে ঘটক তো আনাগোনা কচ্ছে নিত্য নূতন ডানা-কাটার সন্ধান নিয়ে।

"ঘটক"—জিহ্বা ও তালুর সংযোগে যুধিষ্ঠির একটা অর্থসূচক শব্দ করিল।—"ঘটকের কথার উপর নির্ভর করেই যদি বিয়ে করা ঠিক করে থাকো তা হলে নাকের জল আর চোখের জলের সঙ্গে কি গভীর সম্বন্ধ শীগ্‌গীরই বুঝতে পারবে।" অপর তিনজন সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "ঘটক সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের এই অকারণ বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পারলুম না।"

"কারণ ঘটক নামক জীবগুলির সঙ্গে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় হয়েছে। তোমার তা হয় নি।"

ভাঁড়ু দত্ত ধীরে ধীরে কহিল "পৃথিবীতে সব চাইতে ঠক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক এবং জঘন্য কোন জীব যদি থেকে তাকে তবে সে-"

কহিলাম—"ঘটক"

— "ঠিক!"

—"তোমাদের সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছে তারা প্রবঞ্চক হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সব ঘটকই কি সমান?"

বটকৃষ্ণ উত্তেজিত স্বরে কহিল—"সব ঘটক ! সব ঘটক ঠক, চোর ত বটেই —তাদের বাপ ঠক, চৌদ্দ পুরুষ ঠক।"

কৌতুক অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি অনেকে উকীল ব্যারিস্টারের নামে জ্বলিয়া ওঠে অনেকে স্বদেশী-ওয়ালাদের নামও শুনিতে পারে না কেহ বা ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু ঘটকের কথা শোনামাত্র কেহ যে এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, কোনদিন মনে করি নাই। হাসিয়া কহিলাম—"কেউ নিশ্চয় তোমাদের ঠকিয়েছে। তাই তোমাদের এত উষ্মা।" উত্তেজিত ভাবে দাঁতে দাঁত চাপিয়া যুধিষ্ঠির কহিল—"উষ্মা! কোনদিন যদি তার দেখা পাই তবে আলগোছে কাণ দুটো ধরে বেশ করে মোড়া দিই !"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

যুধিষ্ঠির অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"হাসির কথা নয়।"

যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করিয়া কহিলাম—"তা' তো' বটেই। তবে ব্যাপারটা কি হয়েছিল, শোনাই যাক্ না।"

সকলে সমস্বরে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিল।

যুধিষ্ঠির তাহার গল্প সুরু করিল।

—"ঘটক মহাশয়দের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব বেশী নয়। তবে যতটুকু জেনেছি তাতেই প্রজাপতির এই দূতগুলোকে দূর থেকে নমস্কার করাই সঙ্গত মনে করি। এই স্বল্প অভিজ্ঞতাই আমার কৌমার্য্য-ব্রতের প্রধানতম কারণ বলিয়া জানিও। যে ব্যাপারটার কথা বল্‌ছি সেটা তত ইন্‌টেরেস্‌টিং নয়। তবে সুখের বিষয় এই যে সে যাত্রা আমি বড় বাঁচা বেঁচে গেছিলাম।

"আমি তখন এম্‌, এ, পাশ করে বি, সি, এস্‌-এর লক্ষ্যভেদ কর্‌বার জন্য অস্ত্রে শাণ দিচ্ছিলুম। একদিন কাকাবাবু ডেকে পাঠালেন—এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিল। ভাবলুম কে আবার এলো— তোমরা কেউ হয়ত। বই রেখে নীচে এলুম। এসে দেখি এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। শীর্ণ লম্বা দেহ, কোঠরগত চক্ষু, আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, দরিদ্রতার পরিচায়ক বেশ। নমস্কার কর্‌লুম। ভদ্রলোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখে ইঁদুরের মত আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন- "বাবাজীর নাম?"

"যুধিষ্ঠির বন্দ্যোপাধ্যায়"।

"কি করা হয়।"

তাচ্ছিল্যভরে বল্‌লুম—"এম, এ পাশ করেছি।" বি, সি, এস, দোবো।"

ভদ্রলোক গদ্‌গদ্‌ স্বরে বল্‌লেন—"আহাহা! এইত ছেলে—আহাহা! একেবারে—রত্ন, রত্ন! ছেলে তো নয় যেন কার্ত্তিক!"

ভদ্রলোকের এ হেন ভাবোচ্ছ্বাস দেখে আমি প্রস্থানের উদ্যোগ কর্‌ছিলুম। তিনি ডেকে বল্‌লেন— "বাবাজী বস। তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। তোমার কাকা বল্‌লেন তোমার মতামতের উপরই সমস্ত নির্ভর করে।"

ব্যাপারটা ততক্ষণে অনেকটা আন্দাজ কর্‌তে পারলুম।

কিছুক্ষণ নানা ভণিতায় আমাকে অস্থির করে ভদ্রলোক কাজের কথা পাড়লেন "বাবাজীর বিয়ে হয়নি বোধ হয়?"

"না"

"তা বিয়ের বয়স ত হয়েছে। এইবার একটা বিয়ে করে ফেল।"

"হ্যাঁ, এইবার কর্‌ব। পাত্রী স্থির হবারই যা অপেক্ষা।"

"পাত্রী? পাত্রীর ভাবনা কি? বাবাজী তোমাকে আমি এমন মেয়ে এনে দেব, আকাশের চাঁদ সূর্য্যও যার রূপে মলিন হয়ে যায়। আচ্ছা বাবাজী, তুমি স্ত্রীলোক দেখেছ?"

লোকটার একি কথার ধারা! পাগল নাকি? না আমাকেই পাগল ঠাওরিয়েছে? অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"মনে কিছু কোর না। প্রয়োজন আছে বলেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

"দেখেছি।"

"কজন দেখেছ?"

ভাল বাচালের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি' কাকাবাবুর উপর রাগ হতে লাগল। মিছে আমার সময় নষ্ট করা।

একটু রুক্ষ্ম ভাবে বললুম— "তাতো হিসেব করে রাখিনি।"

"আহা চট্‌ছ কেন, তবু আন্দাজ ?"

পূর্ব্বের মত স্বরেই বললুম—দু'দশটাও হতে পারে, দু'চার লাখও হতে পারে।"

"আচ্ছা বেশীটাই ধরা যাক্‌।

ভদ্রলোক মুখ চোখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে বল্‌লেন "কিন্তু এরকমটী কোনদিন দেখেছ?" জামার ভিতরের পকেট

হতে অতি সন্তর্পণে ময়লা কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বের করে সদন্তে আমার চোখের সামনে ধরে বললেন—"বাবাজী এরকম কোনদিন দেখেছ?"

দেখলুম চৌদ্দ পনের বৎসরের একটা মেয়ের ফটো। বিশেষ সুশ্রী নয়; তবে একেবারে কুৎসিতও নয়। রংটা ময়লা বলেই বোধ হল। নাকে নোলক পরা, নিতান্তই গ্রাম্য-ভাবাপন্ন।

স্বীকার করতে হল এরকম কোনদিন দেখিনি। বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হয়ে ভদ্রলোক বল্‌তে লাগ্‌লেন— "দেখবে কি? একি পথে ঘাটে মেলে? কম বুনেদী বংশের লোক এঁরা। নাটোরের পাল বংশ,—কে না চেনে? ইদানীং এঁদের অবস্থা একটু মন্দা পড়েছে এই যা। নইলে এঁদের মেয়ে কুচবেহার, জোড়াসাঁকো, কাশিম বাজার ছাড়া অন্য কোথাও যায় না।

"আর সুন্দরী কি রকম সেত দেখছই। ডানাকাটা পরীও এর পায়ের নখের যুগ্যি নয়। লেখা পড়ায় মেয়ে যেন সরস্বতী। নিম্ন প্রাইমারী ফেল। কাজকর্ম্মে মেয়ে যেন দশভুজা! এ মেয়ে বাবা আমি তোমার জনাই রেখেছি। ...... তা বাবা তোমার কোষ্ঠিপত্রটা দেখি।" কোষ্ঠি আনান হল। কোষ্ঠি পত্রের উপর একনজর চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক নিতান্ত উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন —"শুভ! শুভ! যা দেখছি, একেবারে রাজ যোটক—হর গৌরী সম্মিলন।"

ভদ্রলোকের এহেন উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও আমি নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে বসে রইলুম। তিনি বিন্দুমাত্র না দমে বলে উঠ্‌লেন— "বাবাজী তোমার ভাগ্য ভাল। এ মেয়ে আমি তোমাকেই দেব। তোমার কাকারও এতে খুব মত আছে। এখন বাবাজী মেয়ে দেখতে যাচ্ছো কবে? অবশ্য এ মেয়ে দেখার যে বিশেষ দরকার আছে, তা নয়।" ভিতরে ভিতরে আমি ততক্ষণ প্রায় আগুন হয়ে উঠেছি। ভদ্রতার সীমা বজায় রেখে বেশী কথা বলার মত অবস্থা আমার তখন নয়। সংক্ষেপে বললুম—"বিয়ে আমি এখন করব না।"

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—"সেকি! এমন মেয়ে কি হাতছাড়া করতে আছে?" তারপর স্বর একটু নীচু করে বল্‌লেন —"অবশ্যি তোমার পাওনা গণ্ডা মেটাতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হবে না। সেদিক দিয়ে কিছু ভাবনা নেই।" এতেও আমাকে কাবু করতে না পেরে ভদ্রলোক কড়ি কোমলে বিভিন্ন রসের সমবায়ে এক নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে দুদণ্ডের আলাপেই ভদ্রলোক আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীর মধ্যে নারীশ্রেষ্ঠ এই রত্নটী, এবং আমার বিবাহ এই কন্যাটীর কুমারী ব্রত ভঙ্গের অপেক্ষাতেই এত দিন হয় নাই। আর এই বিবাহ নিতান্তই আশাতীত রকম লাভজনক ও কাম্য। কারণ আমার ভাবী শ্বশুরকুল বঙ্গদেশে নিতান্তই সুবিখ্যাত। এবং সর্ব্বশেষে, এই বিবাহ যে মঙ্গলময়েরই অভিপ্রেত সে বিষয়ে ভদ্রলোক অকাট্য সাক্ষ্যও প্রদান করলেন।

আর অধিক সময় নষ্ট না করে আমি এই সুরসাল বক্তৃতার মাঝখানেই রসভঙ্গ করে বললুম; "আমার কাজ আছে; নমস্কার।"

ভদ্রলোক সেদিন রইলেন। কাকামশায় সম্ভবতঃ তার প্রলোভন বাক্যে একটু ভিজে গিয়েছিলেন। খুব জোরালো রকমেই তাঁর আহারের আয়োজন হল।

পরদিন প্রাতে ভদ্রলোক আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসেই ভদ্রলোককে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে নিতান্ত বদরাগীদের মত বলে ফেললুম—"আপনি অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা দেখুন, এখানে সুবিধে হবে না।"

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক এতেই নিবৃত্ত হবেন। কিন্তু তিনি সহজে নিবৃত্ত হবার লোক নন। বললেন— "আচ্ছা বাবাজী, সে যাহোক, আমার আর একটী কথা আছে। বহুদূর এসেছি। কার্য্যসিদ্ধি ত হলোই না, তা যাক, এখন পথ খরচটা না হলে যে বাড়ী ফিরবার উপায় নেই। বাবাজীকে অন্ততঃ পথ খরচটা আমাকে দিতে হবে। এখানে না হয় অন্যত্র আমি ভাল পাত্রীর সন্ধানে থাকব।"

বুড়োর ভাব গতিক দেখে পূর্ব্বেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। এখন স্পষ্টই বোধ হল যে দায়ে ঠেকে ঘটকালির অজুহাতে এখানে এসেছে। আমি স্পষ্ট বলে দিলুম অযাচিত ভাবে পরোপকার করতে গেলে একটু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় বই কি? আমি উপরে চলে গেলুম।

বুড়ো সেই দিনই অবশ্য চলে গিয়েছিল। শুনেছিলুম কাকাবাবুই তার পথ খরচ দিয়েছিলেন।

ঘটক প্রবরের দেখা অবিশ্যি এর পর আর কোনদিন পাই নি।

বটকৃষ্ণ কহিল, "যদি তোমরা অনুমতি কর, তা হলে আমি এর চাইতেও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দিতে পারি। এবং আমার কাহিনী আশা করি যুধিষ্ঠিরের কাহিনীর চাইতে বেশী বিশ্বাসযোগ্য।"

আমি কহিলাম "বেশ ত। তোমার ব্যাপারটাই বল না।"

বিষ্ণু শর্ম্মাও অনুমোদন সূচক ঘাড় নাড়িল, কেবল যুধিষ্ঠির ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে লাগিল।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বটকৃষ্ণ বলিতে লাগিল ঃ—

তোমরা বোধ হয় আমাদের ক্যাপ্টেনকে জান। তিনি তিন বার ঢাকা ইউনিভার্সিটীর প্রথম তোরণ আক্রমণ করে সে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তখন চাকরী বাকরীর চেষ্টায় ঘুরছিল।

এমনই একদিন সন্ধ্যায় সদর ঘাটে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা। "আমার কনে দেখতে যাবি।" ক্যাপ্টেন বললে।

"কবে?"

"কাল। যাস্‌ত কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসিস্। ঘটক মশায় আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তোরা দু একজন সঙ্গে থাকিস তো ভালো হয়। দলে ভাবী হলে মেয়ে পছন্দ হোক চাই না হোক ঠেসে মিষ্টি খেয়ে ভাবী শ্বশুর মশায়ের খানিকটা খরচ তো করে আসা যাবে।"

অন্য কোন কারণে না হলেও এ মহৎ অভিপ্রায়ের কথা শুনে আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম "তথাস্তু।"

পরদিন সন্ধ্যায় যথাসময়ে সদলে ক্যাপ্টেন তার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের অন্দর মহলে হানা দিল।

প্রচুর মিষ্টি উদরস্থ ক'রে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই বললুম —"তা হলে এবার মেয়ে দেখানো হোক।"

ঘটক মশায় হেঁকে উঠলেন—'অ ঝি, মাইয়া দেহাও চে।

বলতে ভুলে গিয়েছি ঘটক মশায় পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী। অদ্ভুত তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গী। তাঁর যথাযথ অনুকরণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবু যতটা পারি তার নিজ মুখের কথাগুলোই তোমাদের কাছে বলব।

খানিক পরে ঝির পিছনে পিছনে কন্যা এসে উপস্থিত হলেন।

ভগবানের সৃষ্টি, বলতে নেই, তবে প্রথমে এই কন্যারত্নটাকে দেখে আমি আঁৎকে উঠেছিলুম। একটা কালো প্রকাণ্ড ফুটবলের উপর ছোট আর একটা ফুটবল বসিয়ে দিলে যেমন দেখা যায়, মেয়েটী দেখতে অনেকটা সেই রকম। বয়স বেশী নয়। বোধ হয় ১৬।১৭ হবে। তবে অসম্ভব রকম মোটা। মেয়েলী কথায় ধুম্‌সী। রং কালো। চোখ দুটো ছোট, নাকটী ঈষৎ চ্যাপ্‌টা। কপালটা উঁচু, প্রশস্ত। মোটের উপর বল্‌তে গেলে বিশ্রী। মাঘ মাসের শীতেও মেয়েটী প্রচুর ঘাম্‌ছিল।

মেয়েটীর পরিচয় হিসাবে ঘটক মহাশয় আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে মেয়েটী অধ্যাপক মুখার্জ্জির দৌহিত্রী। বাপও খুব পয়সাওয়ালা। বুঝতে বিলম্ব হ'লনা যে প্রফেসার মুখার্জ্জির দৌহিত্রী এবং পয়সাওয়ালা বাপের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও কেন এতদিন এর কুমারী-ব্রত ভঙ্গ হয়নি। নিতান্ত দুঃসাহসী না হলে কোন বাঙ্গালী যুবক এই মহিষমর্দ্দিণীর পাণিপীড়ন করতে সাহসী হবেন না। ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে দেখলুম। তার মুখ ইতিমধ্যেই নিতান্ত করুণ ভাব ধারণ করেছে। বেচারী বোধ হয় চেহারা দেখেই ভড়্‌কে গিয়েছিল। একটা মজবুত চেয়ার দেখিয়ে বস্‌তে বললুম। মেয়েটী বস্‌ল।

ওয়াটারলু বিজেতা ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের চাইতেও বেশী আস্ফালন করে ঘটক মহাশয় বললেন, "দ্যাখ্‌ছেন নি মাইয়া। এ মাইয়া দ্যাহনের চিজ্। প্র্‌ফেছার— বাবুর আদরে আহ্লাদে মাইয়াডা কুছু মুডা হইছে। নাইলে, নাক চোখ দ্যাখ্‌ছেন। চ্যাহারাডা দ্যাখ্‌ছেন।

মনে মনে বললুম— দর্শনীয় বস্তুই বটে। তবে এ চিজ আলীপুর জু'তেই মানায় ভাল। আদরে আদরেই যদি মেয়েটা এরূপ মোটা হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় বলতে পারি যে এই আদরেই মেয়েটার কপাল খেয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম —"তোমার নাম কি?"

সে নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

ঘটক মহাশয় সাহস দিয়ে বললেন ঃ —"কও মা ডর কি। নামডা কইয়া ফ্যাল।

দেখলুম দরজার ফাঁক দিয়ে কে যেন—সম্ভবতঃ মেয়েদের কেউ হবে—মেয়েটীকে ইশারা কর্‌ছে। মেয়েটী ইশারা বুঝতে পারল কিনা জানিনা। তবে একটু থেমে থেমে বলল "জ— জগদম্বা দাসী।" বাঃ, সোনায় সোহাগা! একেত চেহারার এই নমুনা, তার উপব তোত্‌লাও বোধ হয়। নামটাও দেখছি চেহারা অনুযায়ী মানান সই। ভাল!

"কি বই পড়?"

পূর্ব্ববৎ একটু থেমে সে বলল—"নীতিপাঠ দ্বিতীয় ভাগ। ইণ্ডিয়ান রিডার পার্ট ওয়ান।"

এদিকেও তো দেখছি অষ্ট রম্ভা। ক্যাপ্টেনের বরাত ভাল। বাঁহাতের কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে চুপি চুপি বললুম—"কিরে পছন্দ হয়?"

উত্তরে ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন আমার বাহুমূলে এমন জোরে চিমটী কাটল যে আমি 'উহু' করে উঠলুম, ঘটক মশায় আমাদের দিকে চাইতেই আমি বললুম "আপনাদের এ তক্তাপোষটায় বেজায় ছারপোকা।"

চিম্‌টীর ঝাল্‌টা একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম

"রান্না কর্ত্তে জানো?"

"জানি।"

"কি রান্না কর্ত্তে জানো?"

"ভাত ডাল"

"মাছ, মাংস?"

সে অম্লান-বদনে বল্‌ল "মাংস রান্না জানিনে। মাছ রান্না অল্প অল্প শিখছি।"

চিমটীর ব্যাপারেই বুঝতে পেরেছিলাম মেয়ে ক্যাপ্টেনের পছন্দ হয়নি। ঘটক মশাযকে বললুম এইবার এঁকে যেতে বলতে পারেন। আর জিজ্ঞেস করবার আমাদের কিছু নেই।"

ঘটক মশায়ের ইঙ্গিতে সে চলে গেল।

ঘটক মহাশয় এবাব কাজের কথা পাড়লেন "মাইয়া পছন্ হইচে তো? তারিকডা কবে কনচে।" ক্যাপটেনের কনুইয়ের গুঁতো সহ্য করতে না পেরে দশের মুখপাত্র হিসেবে আমিই বললুম; (বলতে ভুলে গিয়েছি ক্যাপটেন নিজেই তার অভিভাবক) —"তা মন্দ নয়, তবে কন্যাটী সামান্য মুটিযে গেছেন।"

ঘটক মশায় চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন "আপনেরা কন কি? এইরে কয় মুডা। মুডা আছিল আমার হাউরী। মুডার জ্বালায় গর্‌থন্ বাইর্ অইবার পারত না. বাপ পয়সাওলা পরফেছারের নাতনী। খাওন পরণের ত অবাব নাই। দুধ ঘি খাইতে খাইতে মুডা অইয়া গেছে। এ্যারাত শহুর্‌য়া মাইয়া না যে পর্‌তে পর্‌তে হুকাইয়া যাই বো। বাপের বারিতে কো কিছু কাজ কাম করে না। হউর বারী যাউক, দুইডা পোলা মাইয়া অউক, কাজ কাম করুক, কই থাকবো মুডা। আমার কাছথন 'গরন্টি লইবার পারেন। আসলে মাইয়াডার স্বাইস্থডা ভাল।"

মনে মনে বললুম— স্বাস্থ্যের লক্ষণই যদি এই হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে শুক্‌নো চেহারার পড়ুয়া মেয়েরাই ভাল। বললুম "মেয়েটীর রংটা একটু কালো।"

দাঁত বের করে বিকট হেসে ঘটক মশায় বললেন "আরে কনকি আপনে। এইরে নি কালা কয়। এত শাম-বরণ। আর কালাইতো তির্-ভুবনের আলো। আসলে মাইয়াডার রংডা চাপা। বিয়ার জলডা পড়ুকনা। শব্‌রী কলার লগে মাইয়ার রং

যুদি না মিশাইয়া লইবার পারেন তো আমার নাম গদাধরচন্দ্র ঘটকই না।"

ঘটকপ্রবরের নাম গদাধরই হোক, আর বজ্রধরই হোক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। তবে মেয়েটীর রং যেরকম চাপা তাতে বিয়ের জল পড়লেও শবরী দূরে থাক বীচিকলার মতনও যে হবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ঘটক মশায়ের উপমাটা ভাল। রসজ্ঞান আছে। যা হোক এতেও না দমে আমি বললুম "মেয়েটীর চোখদুটী যেন একটু ছোট বলেই মনে হয়।"

ঘটক মশায় তার হাত দুখানা আমার মুখের সামনে নেড়ে বললেন "আরে বুজ্‌চেন নি, লাজের খাতিরে বুজচেন নি। শহুর্‌য়া মাইয়া তো না। লাজ-শরম নাই। কড়্‌মটাইয়া চাইয়া বর দেখবো। বিয়া অউক লাজ-শরম কমুক। পোডল কাইট্যা যুদি চোখ মিলাইয়া না লইবার পারেন ত কি কইছি। আমার কাছথন 'গরন্টি' লইবার পারেন।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা কবিল "পোডল কাইট্যা" কিরে বটা?"

বটকৃষ্ণ হাসিয়া কহিল—"বুঝ্‌তে পারলে না? পটল-চেরার পদ্মাপারী সংস্করণ।"

যুধিষ্ঠির হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল—"খুব শুনিয়েছিস যা হোক। শেষটায় পটল-চেরা চোখ হোল " পোডল কাইট্যা। রক্ষে কর দাদা।"

আমি বলিলাম . যা হোক তোমার গল্পের শেষটা বল। বটকৃষ্ণ হাসিয়া বলিতে লাগিল "মনে মনে ঘটক মশায়কে অজস্র নমস্কার জানালুম। অন্য কিছুর জন্যে নাহোক অন্ততঃ পক্ষে "পোডল কাইট্যার" জন্য। তার কথা আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমাকে নীরব দেখে ঘটকপ্রবর বললেন—"এত ভাবন্ কিয়ের?"

বললুম "বিশেষ কিছু নয়। ভাবছি মেয়েটী যে একটু তোত্‌লাও দেখ্‌ছি।" ঘটক মশায় দাঁত বের করে বললেন — "আপনেরা লেখাপড়া জানা-লুক, আপনেগো আর কি কমু। আমাগো মাইয়া ত কলেজের পরা ছত্রিশি মাইয়া না যে টরটরাইয়া জামাইর হাম্‌নে কথা কইব। তোত্‌লামির কথা যা কইছেন হে হগ্‌গলই লাজের খাতিরে। বুজচেন নি। বিয়া অউক, লাজ শরম কমুক। মাইয়ার যুদি কুন তুত্‌লামি দ্যাহেন তো আমারে কইবেন। আমার কাছথন 'গরন্টি' লইবার পারেন।"

ভদ্রলোক যেরকম কথায় কথায় গ্যারান্টি দেওয়া আরম্ভ করেছেন তাতে তার উপর আমার বিশ্বাস কম হওয়া ছাড়া মোটেই বাড়ল না।

ঘটক মশায় উৎসাহের সঙ্গে বলে চললেন—"আরে মাইয়ার চ্যাহারাখান্ দ্যাখছেন নি। মাইয়া তো না য্যান লক্ষ্মীর পরতিমা। যার ঘরে যাইবো হের ঘরে লক্ষ্মীতো আচলা।"

তা একেবারে মিথ্যে নয়। দেহের যেরকম গুরুত্ব তাতে যদি একবার পেচকবাহন ঠাকরুণটীকে কোনক্রমে কায়দায় ফেলতে পারেন তা'হলে এ জগদ্দল পাথর সরিয়ে দেবীর পালাবার কোন উপায় থাকবে না।

ঘটক মশায় বলে চললেন—"আর মাইয়ার কপালখ্যান দ্যাখেন নি। বর ডালা কপাল গো মশয়। আমি ত ছাইল্যা মাইয়্যার বিয়া দিয়া বুরা অইলাম। এমুন কপাল কুনহানে দেহি নাই। যার গরে যাইবো হের তো ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী।"

তা ভদ্রলোক মন্দ বলেন নি। এমন মাঠকপাল মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। আমাদিগকে নীরব দেখে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন: "এমুন মাইয়া আর পাইবেন না। ভাবনা-চিন্তার কাম কি? তারিকডা কবে কনচে?" ক্যাপ্টেনের বোধ হয় নিতান্ত অসহ্য হয়ে পড়েছিল। সে জুতো পায়ে দিতে দিতে বলল— "আচ্ছা সে ভেবে পরে বলব। এইবার আসি নমস্কাব।" সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠলুম।

অপ্রসন্নভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি নমস্কার করে ভদ্রলোক বললেন—"তা দ্যাহেন, ভাইবা দ্যাহেন তারিকডা কবে একটু হক্‌কালেই কইবেন।

বাইরে এসে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলুম—"তা তারিখটা কবে হে।"

ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—ড্যাম্, ফুল। তারিখের নিকুচি করেছে।"

সেদিন এই পর্য্যন্তই। কিন্তু ঘটক মশায়ের উপদ্রব এত সহজেই ক্ষান্ত হোল না। পথে ঘাটে দেখা হলেই ঘটক মশায় তারিখটা কবে বলে বেচারাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে দিলেন। বন্ধুবান্ধবের দলও তারিখটা কবে বলে তাকে ক্ষ্যাপান শুরু করে দিলো। শুনেছি এদের জ্বালাতেই অতিষ্ঠ হয়ে ক্যাপ্টেন ঢাকা ছেড়ে কলকাতা পালিয়ে যায়। এবং অদৃষ্টক্রমে কাষ্টমে চাকুরী পায়।

আমি বলিলাম—"তা হলে দেখছি সত্যিই মেয়েটার পয় ভাল। বিয়ের কথাবার্ত্তা হোতেই হবু-বরের চাকুরী। বিয়ে হ'লে না জানি কি হোত। তা সে ছোকরা কি বিয়ে করেছে?"

"করেছে, তবে ঘটকের মধ্যস্থতায় নয়।"

সেই থেকে সে ঘটকসম্প্রদায়ের উপর বেজায় চটা। বিয়ে করেছে একেবারে কোর্টশিপ্ করে।"

"তাহলে ঘটকের যুগ শেষ হয়ে কোর্টশিপের যুগ আরম্ভ হল দেখছি।"

'অনেকটা তাই-ই-বটে।

ভাঁড়ুদত্ত এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল যে, এসম্বন্ধে তার নিজেরও কিছু বলিবার আছে।

আমি বলিলাম ঃ "ভাঁড়ুদত্ত, এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। সেটা শুনতে পেলেই সম্ভবতঃ আজিকার ঘটক-চরিতামৃতের উপসংহার হয়। এবং তোমার কাহিনী যে সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য এবং উপভোগ্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" বিষ্ণুশর্ম্মা আমাকে সমর্থন করিয়া বলিল ঃ "সে কথা ঠিক। আজকার আলোচনার ফিনিশিং টাচ্‌টা তুমিই দিয়ে দাও।"

ভাঁড়ুদত্ত নিতান্ত উদাসীনভাবে কহিল—"এ বিষয়ে আমার নিজের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা নেই। আর আমি তেমন গল্প-বলিয়েও নই যে কোন সাধারণ ব্যাপারকেই নিতান্ত ইনটারেস্‌টিং করে তুলতে পারবো।" আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম ঃ "আর বেশী ভণিতা দিয়ে কাজ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমার সাধারণ অভিজ্ঞতার বিবরণই আমাদের শুনিয়ে দাও।"

"আচ্ছা" বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ভাঁড়ুদত্ত আরম্ভ করিল ঃ—

"ছোট বোনটার বিয়ের কথাবার্ত্তা অনেকদিন থেকেই চল্‌ছিল। ফাইনালের পরে ভাবছিলুম একবার দার্জ্জিলিং ঘুরে আসি। হঠাৎ মায়ের চিঠি পেলুম প্রতিমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রতিমা সেবার সবে ম্যাট্রিক দিয়েছে। এত শীঘ্র তার বিয়ে হয় আমার সে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাপ মায়ের ইচ্ছা।

বাড়ী ফির্‌লুম। মা বললেন— যেমন বর তেমনি ঘর। ছেলে যেমন বিদ্বান অবস্থাও তেমন। উত্তর বঙ্গের কোন এক জেলায় নাকি বাড়ী। বিশেষ কিছু দিতে থুতে হবে না। ইত্যাদি—

পরদিন ঘটক মশায় পাত্রপক্ষ ও নিরীক্ষণসহ দেখা দিলেন। ঘটক মশায়ের দেহ কৃষ্ণবর্ণ, টিকিসম্বলিত মুণ্ডিত মস্তক, চক্ষু গোলাকৃতি ও ক্ষুদ্র, কিন্তু সাপের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। নাকটা খাঁড়ার মত বাঁকা হয়ে মুখের উপর ঝুলে রয়েছে। যেন কন্যাপক্ষকে বলি দিবার নিমিত্ত সদাই উদ্যত। মুখ-গহ্বর বেশ বিস্তৃত। বদন ব্যাদান কর্‌লে অনায়াসে দুই গণ্ডা রসগোল্লা মুখগহ্বরে স্থান পেতে পারে। ছোটখাট একটা ভুঁড়ি। এখনও পরিপক্ক হয় নি। পা দুটা বেশ লম্বা। অন্ততঃপক্ষে চার ফুট। ঘটক মশায়ের ভাঙা কাঁসরের মত খ্যান্‌খ্যানে বিশ্রী ঢং এর হাসি।

প্রচুর আহার এবং সুপ্রচুর দিবানিদ্রার পর অপরাহ্ন-কালে ঘটকপ্রবর তাম্রকূটসেবনে দিবানিদ্রার উপসংহার-পর্ব্ব সমাধা করছিলেন। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে গেলুম। পাত্রপক্ষের সবাই তখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। জিজ্ঞেস্ করলুম ঃ পাত্রপক্ষের আর্থিক অবস্থা কিরূপ?

এক মুখ ধূম আমার মুখের উপর ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, "আর্থিক অবস্থা? সে আর কি বলব, রাজা, মশাই রাজা।

গবর্ণমেন্ট খেতাবটুকুই শুধু দিতে বাকী রেখেছেন, নইলে রাজা হতে আর বাকী কি? বাড়ী-বাগান, পুকুর-পুষ্করণী, লোক লস্কর জমিদারী কোন কিছুরই অভাব নেই। এদের অন্ন খায় কে? আর না হবেই বা কেন? সাত ভাই—সাতটী যেন বত্ন, সবাই বোজগেরে।"

"বড়টী কি করেন?"

"বড়টী?—বড়টী ছাইপোতার রাজা বাহাদুরের সদর নায়েব। ছাইপোতাব নাম শোনেননি? মালদব ছাইপোতা।" ঘটক মহাশয় এরূপ নিঃসংশয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন যেন কলকাতার পরেই বঙ্গদেশে সব চাইতে সুবিখ্যাত স্থান ছাইপোতা।

নিরুপায়ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বললুম—"না শুনিনি।"

অবাক বিস্ময়ে ঘটক-প্রবর কিয়ৎকাল আমার দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন "তোমবা ঢাকার ছাত্র। কলকাতার যে-কোন গলিতে যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে ছাইপোতা কোথায়।"

নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হল। সর্ব্বজনবিদিত ছাইপোতা নাম্নী নগরীর নাম শুনি নাই। অপরাধের কথাই বটে। বললুম—"সেখানে বোধ হয় বেশ মোটা রকমই পেয়ে থাকেন।"

"মোটারকম? অর্থ করেই তো জমিদারী।"

"ভাল। মধ্যমটী কি করেন?"

"মধ্যমটী! আহাহা, মধ্যমটির কথা আর কি বলব। ছেলে তো নয় যেন সরস্বতী। অমন বিদ্বান উত্তরবঙ্গে বড় জন্মায় নি। তিন তিন বার এম. এ।"

একটু বিস্মিতই হলুম। তিন 'সবজেক্টে' এম. এ, নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি হবেন না নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করলুম—"কি করেন?"

সদন্তে উত্তর দিলেন—"প্রফেসার। মালদ'র প্রফেসার।"

মালদ'র প্রফেসার! সেখানে যে কোন কলেজ আছে আমার তো জানা নেই। একটু হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলুম "মালদ' কোন্ কলেজে প্রফেসার?"

ভাঙ্গা কাঁসরের মত শব্দ করে ঘটক হেসে উঠলেন।

"কেন, কোন্ কলেজে আবার? মালদ' কলেজে" ভাঙ্গা কাসর বাজতে লাগল।

আমি একটু লজ্জিত হয়ে চুপ করলুম। হয়ত আমারই বা চিত্তবিভ্রম ঘটে থাকবে। অথবা হয়ত নতুন কোন কলেজ সেখানে খুলে থাকবে।

ঘটকপ্রবর বিপুল বিক্রমে ধূম্র উদ্‌গীরণ করতে লাগলেন। আমি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলুম—"তৃতীয়টী?"

"তৃতীয়টী? ডাক্তার— গভর্ণমেন্ট ডাক্তার এম.ডি. না এম.বি. যেন। বেশ মোটা মাইনে। টাকার অঙ্কটা ঠিক মনে আসছে না।"

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলুল— "চতুর্থটী বুঝি ইঞ্জিনিয়ার?"

"ইঞ্জিনিয়ার নয়। চতুর্থটী ব্যারিষ্টার। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর বি.এল্."

অবাক হয়ে বললুম—বি. এল. ব্যারিষ্টার হয় কেমন করে?"

ঘটক মশায় ক্রুদ্ধভাবে বললেন: "বি. এল্. ব্যারিষ্টার হয় না! বি.এল্. যদি মুন্সেফ হতে পারে তা হলে ব্যারিষ্টার হতেই বা বাধা কি? আচ্ছা না হয় ব্যারিষ্টার নাই হলো, উকীল তো বটে। আর উকীল বলো, ব্যারিষ্টার বলো, রোজগার নিয়ে কথা। সত্যি কিনা?"

স্বীকার করতে হোলো। উকীল ব্যারিষ্টারের প্রভেদ শুধু উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে।

স্পষ্টই বুঝতে পারলুম ঘটকপ্রবর আমার এইরূপ সৌজন্যহীন কথাবার্ত্তায় নিতান্তই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কাজেই খানিকটা চুপ চাপ বসে ছাদের কড়িকাঠ গুণ্‌তে লাগলুম। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলুম ঃ—"পঞ্চমটীও কি গবর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট?"

"না গবর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট নয়। তার আবার স্বদেশীর ঝোঁক আছে। টাটা কোম্পানীতে কাজ করেন, ইঞ্জিনিয়ার। মাইনেও বেশ মোটা। দু চার শ'ত হবেই। টাকার অঙ্কটা ঠিক মনে আসছে না।"

যা দেখলুম ঘটকপ্রবর টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে বড়ই উদারপন্থী।

ভাবতে লাগলুম ঃ জমিদারের নায়েব, প্রফেসার, গর্ভমেন্ট ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার। বাকী রইল জজ আর ম্যাজিষ্ট্রেট। আর দুজন বোধ হয় তাই হবে। ভদ্রলোক যেরকম উষ্মা প্রকাশ কর্‌ছেন, তাতে আর বেশী প্রশ্ন কর্‌তে ভরসা হয় না। অবশেষে সাহসে বুক বেঁধে প্রশ্ন করলুম ঃ "তার পরেরটী বোধ হয় ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান?"

ঘটক মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "টাটু তৈরী কি? ওসব ইংরেজী ফিংরেজী আমরা বুঝি না, বাংলা করে বল।"

মৃদু হেসে বললুম "আজ্ঞে বলছিলুম কি যে ষষ্ঠ ভ্রাতাটী বুঝি ডিপুটী, কি ম্যাজিষ্ট্রেট?"

ঘটক মশায় গম্ভীরভাবে বললেন—"ম্যাজিষ্ট্রেট না হলেও তার চেয়ে বড় কমও নয়। কৃষির উন্নতির দিকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল বেশী চিরকালই। পি.সি. রায়ের ছাত্র কিনা। দেশে সে একটা ডাইরী ফার্ম্ম খুলেছে। সে এক বিরাট ব্যাপার। বাংলায় মনিপুরের ফার্ম্মের পরেই তার ফার্ম্ম। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা কত সময় এসে তার ফার্ম্ম দেখে যান।"

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললুম—"দেখছি তাহলে সবাই এক একটী রত্নবিশেষ। ছোটটী বোধ হয় এখনও পড়ছেন?"

ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে ঘটক মশায় বললেন—"ছোটটী? ছোটটীই সবার সেরা। রত্নদলে কোহিনূর বিশেষ ঈশ্বরেচ্ছায় দেশের পড়াশুনা একরকম শেষ করেছেন। এইবার বাবাজীর বিলেত যাবার ইচ্ছে। সেইজন্যই তো বিয়ের এত তাড়া। কাঁচা বয়েস। বলাতো যায় না, বিলেত গিয়ে কি হয় না হয়। তাই ঠিক হয়েছে বিয়ে করেই বিলেত যাবে।"

"সেত ঠিক কথাই। তা কি পড়তে বিলেত যাচ্ছেন?"

"সেটা ঠিক হয়নি। দাদারা তো সবাই এক একজন কীর্ত্তিধর। অর্থেরও তো আর অভাব নেই। বুঝলে না? কেউ বলছে একটা ডাক্তার টাক্তার হয়ে আয়। কেউ বলছে ব্যারিষ্টারিই ভালো। এখনও কিছু ঠিক হয়নি। তবে কিনা একেবারে দুধারী তলোয়ার! যেদিকে যাবে সেদিকেই কাটবে। হাঃ হাঃ।"

"তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পর যখন সমস্ত বিবরণ সঠিক জানা গেল তখন রাগে আমার নিজের গায়ের চামড়া দাঁতে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যদিও আমার বাপ মা এবং অনান্য আত্মীয়স্বজন তাতে তেমন বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হলেন না।"

বিষ্ণুশর্ম্মা ঃ "সে আবার কিরকম? যাতে তোমার মানসিক অবস্থা এই হলো, তাতে তাঁরা কিছুই বোধ কর্‌লেন না।"

"বলছি শোন। স্বরূপ যখন প্রকাশ পেল তখন জানা গেল যে,— এক দুই করে বলাই ভাল — এক নম্বর ভ্রাতাটী জমিদারী এষ্টেটেই কাজ করেন বটে। তার নায়েব নন, গোমস্তা। আর তার আয়ই ভ্রাতাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী। তাতেই কোন রকমে সংসার চলে।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "জমীদারের নায়েব, শেষে দাঁড়ালো গোমস্তায়! দুখের বিষয় বটে। তা যাক বাগান বাড়ী পুকুরতো আছে নিশ্চয়ই।"

বিদ্রূপভরে ভাঁড়ুদত্ত বলিল "হাঁ, তা আছে। একখানা টিনের ঘর, খান দুই খড়ের ঘর, আর বেতের বাগানও আছে। বহুদিন ধরে একটা জায়গা থেকে মাটি কেটে সংসারের নানান্ কাজে ব্যবহার করার দরুণ একটা ডোবা মতন হয়ে আছে। এটাকেই যদি ঘটক মহাশয় পুকুর বলে চালিয়ে থাকেন তাহলে আমি নাচার।"

বিষ্ণুশর্ম্মা বলিল "ঘটক মশায়ের দেখছি কল্পনা শক্তি খুবই প্রবল। পচা ডোবাও তার চোখে রমণীয় সরোবরে পরিণত হয়।"

বটকৃষ্ণ—"স্বভাবকবি কিনা!"

আমি বল্‌লুম ঃ "যাক্, বাড়ীর খবর তো পাওয়া গেল। এবার অন্য ভ্রাতাদের কথা শোনা যাক। মধ্যমটী কি করেন?"

"মধ্যমটী রত্নই বটে। তিন তিনবার এম্. এর সাগর উল্লঙ্ঘন কর্‌তে গিয়ে বোধ হয় লাঙ্গুল অভাবেই কৃতকার্য্য হতে পারেননি। ঘটক মহাশয়ের অভিধানে দেখছি পরীক্ষা দেওয়া আর ডিগ্রী পাওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। চাকরি করেন, মালদা স্কুলের মাষ্টার। ঘটক প্রবর নিতান্তই উদারনৈতিক। প্রফেসার আর স্কুলের মাষ্টার—তফাৎ আর এমন কি বেশী? পেশা তো উভয়েরই একই। তফাৎ যা মাইনের, —টাকার অঙ্কে। তা সে সম্বন্ধে ঘটক মহাশয়ের নিরপেক্ষ আচরণের কথা আগেই তো বলেছি।"

বটকৃষ্ণ ঃ "সাধু! সাধু! এবার তৃতীয়টীর পালা।"

"হ্যাঁ, তৃতীয়টী এম. ডিই বটে। তবে নামের পেছনে ছোট করে 'হোমিয়ো' লেখা আছে। তবু এও রয় সয়। কিন্তু যখন চতুর্থটী যাকে তিনি ব্যারিষ্টার বলে চালিয়েছিলেন এবং উকীল ব্যারিষ্টারের তফাৎ কেবল টাকার অঙ্কের উপরই নির্ভর করে বলে ফতোয়া জাহির করেছিলেন,—সেই চতুর্থ টীই যখন কার্য্যকালে ব্যারিষ্টার থেকে নেমে এসে সামান্য টুর্নী মোক্তার হয়ে দাঁড়াল তখন দুঃখ রাখবার স্থান আর কোথায়? যাক্ বাকীগুলোর কথা শোনো। ...টাটা কোম্পানীর সেই স্বদেশী-প্রেমিক সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব— যার মাইনের টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে ঘটক মহাশয়ের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল— বর্ত্তমানে টাটানগরেই চল্লিশ টাকা মাহিনার সামান্য একজন মিস্ত্রী। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হবেন, এই আশাতেই দিনান্তে আপন সাওতালী বান্ধবীর সহিত প্রেমালাপে তাঁর অবসর সময় কাট্‌ছে।"

বিষ্ণু শর্ম্মা ঃ "এযে দেখছি চীন দেশের ভোজবাজির খেলা।"

"এখনই অস্থির হোয়ো না। আরও আছে। তারপর মণিপুর ব্যতীত বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় কৃষিফার্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সেই ছয় নম্বর ভ্রাতা মহোদয় বর্ত্তমানে বাড়ীতে বসেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্নধ্বংস কর্‌ছেন। এবং যদিও তাহাদের কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমি আছে এবং প্রতি বৎসর বর্গা বন্দোবস্তে তার চাষও হয়ে থাকে, তবুও তাতে সম্বৎসরের ধান্যের একচতুর্থাংশও সঙ্কুলান হয় না। এবং পি.সি. রায়ের অতি ভক্ত এই ছাত্রটী ঘরে বসে তাস পিট্‌তে পিট্‌তে তার ফার্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্য্য সমাধা করে থাকেন।"

বিষ্ণু শর্ম্মা ঃ "হায়, পি.সি. রায়! তোমার অদৃষ্টে এতও ছিল। যাক, এবার আসল কথা বল। সপ্তম রত্ন সেই কোহিনুর মহাশয় কি করেন তাই শোনা যাক।"

"হ্যাঁ, এ বিয়োগান্ত নাটকের সেইটাই সব চাইতে করুণ দৃশ্য!— পাত্রটী যদি অন্ততঃ মানুষের মতো হতো তা হলে সবই সহ্য কর্‌তে পারতুম। ইনি বহু কাল ধ'রে ইউনিভারসিটীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে দিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই বিয়েটা করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। যা'হোক বিয়ের কিছুদিন পরেই জানা গেল যে, ছয় ছয়টী কীর্ত্তিধর ভ্রাতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু সে পরিবারে একটা ভারস্বরূপই গণ্য হয়েছে। প্রতিমা মুখ ফুটে কিছু বলে না। তবে অন্য লোকের মুখে সমস্ত খবরই পেলুম। মা আমার অনেক আপশোষ করে নিরীহ ভগবান বেচারার ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না আমি। তোমরা তো জানো আমি চিরকালই ভবঘুরে, নিজে কোনদিন চাকরী বাকরী করলুম না, চাকরীর জন্য মুরুব্বীদের খোসামুদী করতে হয় বলে। এবার ভগিনীপতির জন্যে তাও কর্‌তে হ'ল। ছোকরা টাইপ-রাইটিং শিখ্‌ছিল, বিয়ে করার পর তাও ছেড়ে দিলে। অনেক চেষ্টার পর 'বঙ্গবাণী' আফিসে একটা কেরাণী-গিরি জুটিয়ে দিলুম। তা' ছোকরার এদিক নেই ওদিক আছে। সামান্য কেরাণীগিরি তিনি কর্‌বেন না। ওতে মান থাকে না। উল্টে জুলুম শুরু করে দিলে, কিছু টাকা দাও বিলেত টিলেত যা' হয় ঘুরে এসে একটা হোমরা চোমরা হয়ে বসি। কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। কিন্তু কি করব, ভগিনীপতি, চুপ করেই রইলুম। এদিকে প্রতিমার শুক্‌নো মুখও আর দেখতে পারিনে।

কয়েকটা বই বিক্রী করে কিছু টাকা পেয়েছিলুম। টাকাগুলো ডিপজিট দিয়ে লুধিয়ানার এক সিল্ক কোম্পানীতে ভাল একটা চাকুরী জোগাড় করে দিলুম। ছোকরা মাসকতক বেশ কাজ কর্‌লে। তারপর একদিন পাঁচ ছয় শ'টাকার তহবিল ভেঙ্গে একদিকে উধাও হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডিপজিটের টাকাগুলো বাজেয়াপ্ত হলো।"

বটকৃষ্ণ "ফার্ষ্ট ক্লাস ভ্যাগাবণ্ড!"

বিষ্ণুশর্ম্মা ঃ—"পণের টাকা বুঝি কিছু কম দিয়েছিলে, তাই সুদে আসলে আদায় করে নিলে।"

"তাই। ফলে তার স্ত্রীটী আমার গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াল। পলাতক ভ্রাতার স্ত্রীর ভরণপোষণ কর্‌তে ছয় রত্নের এক রত্নও রাজি হলেন না!"

বিষ্ণু ঃ "পলাতক ভগিনীপতির আর খোঁজ পেলে?"

"শোন, মাস কয়েক পরে একদিন দেখি কার্ত্তিক এসে হাজির! বেশে দরিদ্রতার লক্ষণ। শরীরও খুব কাহিল দেখলুম। আমাকে দেখে দাঁত বের করে বললে ঃ অনেক দেশ ঘুরেছি, চাকরীও একটা পেয়েছিলুম।

"আমি নিরুত্তর রইলুম। ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁচা কঞ্চি দিয়ে বেশ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাব্‌কে দিই; কিন্তু চুপ করেই রইলুম। ছোকরা কয়েকদিন ভদ্রভাবে থাকলো। প্রতিমার মুখেও হাসি ফুটল। কিন্তু স্বভাব যায় মলে। দিনকতক পরে আবার তিনি গা ঢাকা দিলেন। তারপর আজ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলছি। ভগিনী ও ভগিনীপতির বোঝা টেনে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপক্ষয় করছি।"

বিষ্ণু ঃ "আর কোন চেষ্টা ব্যবস্থা কর্‌তে পারলে না?"

"আর কোন উপায় নেই। তবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে, যদি কোন দিন সেই ঘটকের দেখা পাই তবে এই ঘটকালী বিদ্যে সে কোথায় শিখেছিল তা দেখে নেবো।"

(মাঘ, ১৩৪৩ ও ফাল্গুন, ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত)

আস্‌গারীর প্রেম

আবু রুশ্‌দ্‌

সারওয়ার শিল্পী। সেদিন বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হলো, কার যেন সুন্দর স্নিগ্ধ দুটো চোখ সে দেখতে পেয়েছে। চোখদুটোর চাউনি বড়ো মধুর —তুলনা হয় না তার কমনীয়তার। সারওয়ার ছবি আঁকবে, কিন্তু চোখদুটোর সাথে কি রকম দেহ আঁকলে মানানসই হতে পারে? সে ভাবতে লাগল। কামরায় বসে নিবিষ্টমনে কতদিন সারওয়ার তার কল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে, রকম রকম রঙ মিশিয়ে—নূতন ভঙ্গিতে রেখা টেনে। মন তার খুসী হয় নি। কিসের যেন খুঁত রয়ে গেল। শেষে শিল্পীর একাগ্র নিষ্ঠার জয় হলো। সদ্য-সমাপ্ত চিত্রের দিকে অপলক-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল- রূপকথার রাজকন্যার মত এই মানস-সুন্দরী যদি একদিন তার এই ক্ষুদ্র গৃহে এসে দেখা দেয়, তা হলে... । সারওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

সারওয়ার ঠিক করল আগামী চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবিখানি সে পাঠাবে। কে জানে যদি তার মানসীর চোখে পড়ে যায় তার এই ছবিখানি! অসম্ভব কি!

প্রদর্শনীতে খুব প্রশংসা হলো সারওয়ারের। প্রতিভা স্ফূর্ত হয়েছে তার চিত্রের রেখায় রেখায়, একটা অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এর বিস্ময়কর পরিকল্পনায়।

প্রদর্শনীতে বিরামহীন ভিড়। একদিন এসে আসগারী এক জায়গায় দেখতে পায় তার নিজেরই ছবি। অবাক হয়ে বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। শিল্পীর নাম লেখা সারওয়ার। স্বাস্থ্যবান, প্রিয়দর্শন, অনিন্দ্য-সুন্দর সারওয়ার। সহসা মন তার গভীর লজ্জায় ভরে ওঠে। তার এমন নিখুঁত ছবি কেমন ক'রে সে আঁকলে! সে কোনদিন ত তাকে এতো কাছে পায় নি। তা না পা'ক, তবু তার অজ্ঞাতে সে তাকে এমন অর্থময় ক'রে দেখেছে। তার নারীহৃদয়ের সমস্ত মাধুরী এই প্রিয়দর্শন সুপুরুষটার উদ্দেশে উৎসারিত হয়।

তার আঁকা ছবিখানির নেশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। তার মানসীর রহস্যমাখা চোখ দুটো আর তাকে আকর্ষণ করে না। একটা অশান্তি থেকে সে যেন মুক্তি পেয়েছে।

একদিন সে নিজের কামরায় কি একটা ছবি আঁকছিলো, হঠাৎ একটা যুবক চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রীতিমত পণ্ডিতী স্বরে বলল— আসতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

শিল্পী হলেও সারওয়ারের কথাবার্তার মধ্যে এলোমেলো ভাব নেই মোটেই, সব সময়েই যেন সে সম্পূর্ণ সজাগ। যুবকটার দিকে তাকিয়ে কিন্তু সারওয়ার বিস্মিত হলো। বন্ধুমহলে সারওয়ারের সুচেহারার খ্যাতি আছে। সেই কথা মনে হতেই তার যেন লজ্জা করতে লাগলো। যুবকটীর চেহারা সুন্দর বললে বিজ্ঞতা করা হয়। চেহারায় সে এপোলো, তার দৈহিক শ্রী সৌন্দর্যের আদর্শ।

যুবক বলল — আমার নাম রওশন। আপনি কি ও ছবিটা বিক্রী করবেন? বলে আঙ্গুল দিয়ে সে সারওয়ারের আঁকা সেই ছবিখানি দেখিয়ে দিল।

—অসম্ভব, আমায় মাপ করতে হবে।

—কেন? রওশনের স্বরে তিক্ততার রেশ।

---কেনর উত্তর সব সময় হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে হলেও তা দিতে বাধ্য নই আমি। কণ্ঠের রূঢ়তা সারওয়ারের মেজাজের সাথে সমতা রক্ষা করছে।

নরম হবার আয়াস করে রওশন বলল— এ মেয়েটাকে কোথায় দেখেছিলেন আপনি বলুন তো?

— কোন্ মেয়েকে?

— যে মেয়েটার ছবি এঁকেছেন।

—আশা কবতে পাবি কি আপনি সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলছেন?

রওশনের পক্ষে ধৈর্য্য অবলম্বন করা ক্রমেই কঠিন হচ্ছে।

—লি রোডের আসগারীকে চেনেন না আপনি?

---কাহিনী শুনবার সময় আমার নেই। সারওয়ার রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে বলল।

—বাংলা ভাষায় ন্যাকা বলে একটা কথা আছে, আপনাকে দেখে কথাটার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু সোজা বাংলায় আপনাকে বলে যাচ্ছি আসগারীর সাথে প্রেম করবার স্বপ্ন দেখলে আপনার বিপদের কারণ আছে। চরম উষ্ণ স্বরে কথাগুলো বলে রওশন ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। সারওয়ার স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের দিকে। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ খোদাতালা পৃথিবীর এ নগণ্য শিল্পীর সাথে এ কি অদ্ভুত পরিহাস করতে আরম্ভ করেছেন !

রওশন আসগারীব সম্বন্ধ আত্মীয় মহলে সুনিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং চিত্র-প্রদর্শনীতে যে অভিজ্ঞতা রওশন সংগ্রহ কবল তা খুব মনোবম নয়। একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করে নেবার উদ্দেশ্যে আসগারীকে নিয়ে রওশন লেকে এসেছে। গ্রীষ্মের রাতে লেকের চমৎকারিত্ব উপভোগ্য। পূর্ণিমা ছিল নীল আকাশে সেদিন। স্থির জলে তারাগুলোর প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করে দেখলে ধরা যায়। মৃদু বাতাস বেশ আরামপ্রদ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে একটা নির্জ্জন জায়গায় এসে রওশন বলল— সারওয়াব বলে কোন লোককে তুমি চেন? তোমাকে নাকি সে ছোট বেলা থেকেই জানে?

প্রথমে ব্যাপারটা আঁচ কবতে পাবলো না আসগারী।

— কোন্ সাবওয়ার বলতো? অকৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে সে বলল।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে রওশনের ঈর্ষাক্ষুব্ধ মন— পাঁচ বছরেব ছেলে বুঝি তুমি আমায় মনে কর, গল্প করে আমায় ভোলাবে? সারওয়ার, সেই ছবিওয়ালা সারওয়ার, যাকে নিজের ছবি আঁকতে আমন্ত্রণ করেছিলে তুমি— সেই সারওয়ার গো। রওশনের কণ্ঠে অস্পষ্ট বিদ্রুপ জড়ানো।

শক্ত হয়ে উঠেছে আসগারীর মুখ। ভাঁড়ামি করবারও একটা ভদ্রসম্মত রীতি আছে— সে বলল।

---বক্তৃতা শোনার জন্য বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, এখন প্রার্থনা করি হে, দেবী, বিবরণ জানিয়ে এ দুর্ভাগা ব্যক্তির আশঙ্কা দূর কর।

ঠাট্টায় কিন্তু হাসল না আসগারী, মুখ তার আগেকার মতই গম্ভীর। রওশনের মনে সংশয়েব দোলা—আসগারীর অন্তরে নিশ্চয়ই এক রহস্য আছে যার গতি সারওযারের দিকেই। রওশন অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল—আসগারী তাকে ঠকাচ্ছে, কিছু একটা সে যেন বলতে চাচ্ছে না। সত্যিই কি সে এতদিন ভালবেসে এসেছে তাকে?

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটল, শেষে আসগারীর মনে হল ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হচ্ছে। অত গম্ভীর হওয়া তার উচিত হয় নি। হঠাৎ সে বলল— তুমি বিশ্বাস করতে পার না এ কথা যে সারওয়ার বলে কোন লোকের সাথে আমার এমন কোন রহস্যকর সম্বন্ধ নেই যাতে ভাবনায় তুমি ভ্রূ দুটো কুঁচকাতে পার।—ভাষার কসরৎ দেখাচ্ছে আসগারী।

বেশী খুসী হলো না রওশন।—কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না।

প্রসন্নভাবে হেসে আসগারী এবার বলল—হঠাৎ তোমার এ সন্দেহ যে?

—খারাপ লোকের মনে কত খারাপ ভাবনাই আসে—দার্শনিকতা করে রওশন বলল। আসগারী উচ্চ কণ্ঠে হেসে রওশনের হাতে খুব কোমল করে হাতখানি রাখল।

হপ্তাখানেক থেকে রওশন আর আসগারীর বাড়ীতে আসে না। আসগারীর বড় বোন জোবায়দা খুঁটি নাটি কত জানতে চায় এই ব্যাপার নিয়ে—ঝগড়া হয়েছে কি না ইত্যাদি। কিন্তু রওশনের সম্বন্ধে আসগারীর মন তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সকলে বলে ভালবাসে তারা এ ওকে, তাই আসগারীও মনে করত নিশ্চয়ই সে বুঝি রওশনকে ভালবাসে। কিন্তু হঠাৎ আজকে তাদের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক আসগারীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। রওশনের কেমন একটা অদ্ভুত ভাড়ামি আছে, কেমন একটা আপত্তিকর রুচিহীনতা। রওশনের এই একান্ত অর্থহীন ব্যবহারে আসগারীর মন বিষিয়ে উঠল। তার সম্বন্ধে কেউ খুঁচিয়ে কথা জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত রুঢ় জবাব দিতে লাগল। সকলকে বেশ বুঝতে দিচ্ছে আসগারী, রওশন সম্বন্ধে তার মনের একটা বিপর্যায় ঘটেছে। আর এদিকে শিল্পী সারওয়ার যেন আসগারীর মনে কেমন বিচিত্র ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার হৃদয়ের একটা অংশ যেন দাবী করছে প্রিয়দর্শন সারওয়ার। হঠাৎ তার কি খেয়াল হয়। একদিন শুধু কৌতুহল বশেই যেন সে সারওয়ারের বাড়ী গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে ত সারওয়ার নির্ব্বাক। তার চিত্র কি চোখের সামনে জীবন্ত রূপ নিয়ে এলো? বিস্মিত শিশুর মত সারওয়ার চোখ মুছে আরও পরিষ্কারভাবে চাইবার চেষ্টা করল! তার বিস্ময়ে যেন একটা ঠোকর দিয়ে আসগারী বলল - আপনার চেহারা ত' আমার চেনা বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আপনি ত' আমায় খুব ভাল ক'রেই চেনেন দেখছি।—রহস্যময়ী নারীর সমস্ত অকারণ অভিব্যক্তি দিয়ে সে ছবিখানির দিকে তাকাল।

সারওয়ার খুব ভাল করেই উপলব্ধি করছে যে কোন রকম নেশায় তার চিত্তবিভ্রম ঘটেনি, অথচ এতখানি বিস্মিত হওয়াও ত' তার পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার! —আপনাকে ত' আমি চিনি না—শুষ্ক প্রাণহীণ স্বরে অবশেষে সারওয়ার বলল।

—বাইরের লোকে কথাটা শুনলে ঠাট্টা করবে, গল্পটা আমায় বলুন দেখি।—খুব কাছে ঘেঁষে এসে আসগারী বলল।

সারওয়ার উৎকণ্ঠিতস্বরে উত্তর করল—নিশ্চয়ই আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে! নিদারুণ বেদনায় আসগারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, কথাটার আঘাত গভীরভাবে বেজেছে তাকে।

—আমায় মাফ করবেন,— অনুতপ্ত স্বরে সারওয়ার বলল, —কিন্তু আপনাকে কখনও জানবার সুযোগ আমার হয়নি।

তার কথায় খেয়াল না করে খুব সহজভাবে আসগারী বলল—আপনার ছবিগুলো কিন্তু বেশ ভাল। সে একাগ্র নিবিষ্টতায় ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ছবিগুলো।

সারওয়ার যেন স্বপ্ন দেখছে। বেশ করে সারওয়ার আসগারীকে দেখল। যে স্বপ্ন তাকে সেই বহু-প্রশংসিত চিত্র আঁকবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলো, তার জীবন্ত মূর্ত্তি সারওয়ারের একান্ত সন্নিকটে! নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তের ভেতর এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রহস্যময়ী রমণী! মাথায় তার অভিনব ভাবের দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব চলেছে। হঠাৎ ঘুরে আসগারী বলল—আপনার ছবি দেখে খুব খুসী হলাম, আপনার প্রতিভা আছে।—রাণীর মহিমা আসগারীর স্বপ্নসৃষ্ট সুন্দর মুখে। সম্ভ্রম-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সারওয়ার। কিন্তু আসগারী চলে গেল, যেন সম্মুখের একটা উদ্দাম সম্ভাবনাকে পরিহাস ক'রে।

ঘন ঘন আসতে লাগল আসগারী ছবির ও নিতান্ত অর্থহীন আর আর জিনিষের ছুতা ধরে। সারওয়ারের মনে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য জেগে উঠল। এটা নিত্যই স্পষ্ট হতে লাগল যে আসগারী সারওয়ারের সাথে প্রেম করছে। কিন্তু প্রেম করার কোন ইচ্ছে সারওয়ারের নেই। নারীর দেহ নিয়ে বিপদহীন বিলাস করতে তার হয়ত আপত্তি নেই, কিন্তু প্রেমে পড়ে আসগারীকে বিয়ে করা, এ তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তার শিল্পী-মন নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট; আসগারীর সৌন্দর্য্য তাকে মুগ্ধ করেছিলো—আসগারী নয়। যে বিপুল ও পরিমাণহীন সৌন্দর্য্য শিল্পী সারওয়ারের মনে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিলো তা থেকে আসগারীর এই সুন্দর দেহে কতো ব্যবধান। নিজের অনবদ্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে সারওয়ার কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না, সুন্দরতম কল্পনায় সমৃদ্ধ তার মন—কারও অকারণ দৌরাত্ম্য সহ্য করা এর স্বভাববিরুদ্ধ। সারওয়ার একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

হঠাৎ তার মাথায় একটা খেয়াল ঢুকল। নিতান্তই যখন সে বুঝল আসগারী তার সাথে প্রেমচর্চ্চা করতে চাচ্ছে, একদিন একটা ছবির মডেল সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে সে তার সাথে কথা বলতে শুরু করল। এমনভাবে সে বলতে লাগল যেন আসগারী বুঝতে পারে এ ছবির মডেল যিনি তিনি জীবিত আছেন এবং সেই মেয়েটীই সারওয়ারের প্রেমিকা।

গল্প শুনতে শুনতে আসগারীর মুখ এতটুকু হয়ে গেছে, নারীর এই চিরন্তন দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃত বর্ব্বরতায় সারওয়ার বলতে লাগল — মোটের ওপর বোঝাতে পারব না কেমন মেয়ে এ। এত ভালবাসে আমায় যে এক এক সময় গর্ব্বে আর বিস্ময়ে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই।

—তার নাম কি? সম্মোহিতের মত আসগারী জিজ্ঞাসা করল।

—মমতাজ।

- খুব সুন্দরী বুঝি তিনি দেখতে? আসগারীর স্বরে ঈর্ষার সাথে বেদনা মিশান।

খানিকটা থিয়েটারী করে সারওয়ার বলল — ভক্তের মুখে দেবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক, তবুও আপনাকে বিশ্বাস করতে বলি— তার মত সুন্দর মেয়ে সত্যি আর নেই।

—আচ্ছা আজকে তাহলে উঠি। অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে আসগারী উঠে বেরিয়ে এল। নিজের সাফল্যের আনন্দে সারওয়ার মুক্তির একটা দীর্ঘ বিলাসময় শ্বাস ফেলল।

অবশ্য এর পর আর আসগারী সারওয়ারের বাড়ীতে যায় না। তার মনে তুমুল ঈর্ষা জেগেছে, বিষাক্ত তার প্রভাব। এক এক সময় তার মনে হয় সারওয়ারের ওখানে গিয়ে সে জোর করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করবে, তার পরিপূর্ণ প্রেমে আচ্ছন্ন করে সারওয়ারকে একেবারে নিজস্ব করে নেবে। মনের আগুন যখন জ্বলে উঠেছে হঠাৎ রওশনের সাথে দেখা। তার নাকি অসুখ করেছিলো। খবর না পাঠাবার জন্যে সে আসগারীর কাছে মিষ্টি করে মাফ চায়। এ কয়দিন খুব গোপনে গোপনে আসগারী গেছে সারওয়ারের বাড়ী,—বেড়াবার ছলে, সিনেমা দেখবার ছুঁতায়। কেউ জানেনা কোথায় গেছে। মনে তার গভীর বেদনা ছিল সারওয়ারের প্রত্যাখ্যানে। রওশনকে পেয়ে তার হতাশাক্ষুব্ধ মন সেদিকে দ্রুতগতিতে ধাওয়া করল। না রওশনই তার প্রেমিক, এত সুন্দর বুঝি সারওয়ার? উহুঁ! যদি বহু লোকের সামনে সারওয়ারের কাণ ধরে সে দীপ্তকণ্ঠে বলতে পারত— চেহারা তার শয়তানের মত কুৎসিত, মনের বীভৎস দুর্ব্বলতা তার বিলজেবাবের মতো, সে লম্পট, চরিত্রহীন ইত্যাদি,—হৃদয়ের জ্বালা তাহলে তার অনেকটা মিটত।

রওশনের সাথে আসগারী গায়ে পড়ে খুব অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠত করতে লাগল। এ কয়দিনের বিরহ সুদে আসলে মিটিয়ে নিচ্ছে সে। রওশন খুব খুসী হয়েছে। আসগারী তারই, একান্তভাবে তারই। কথাটার মিষ্ট প্রতিধ্বনি নানাভাবে রওশনের মনে আঘাত করতে থাকে, আরও মিষ্টি, আরও কমনীয় হয়ে।

শেষে একদিন তাদের বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেল। একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্ততায় ক'টা দিন কেমন আশ্চর্য্যভাবে কেটে গেছে।

তাদের বিবাহের আর মাত্র মাসখানেক বাকী। উল্লসিত হয়ে উঠেছে আত্মীয়স্বজন সব। আজকাল আর রওশনের সাথে আসগারীর দেখা হয় না। সেদিন বিকেলের দিকে গড়ের মঠ থেকে বেড়িয়ে ফিরবার সময় হঠাৎ সারওয়ারের সাথে দেখা! — ওঃ, আপনি! আসগারীর সঙ্গ নিল সারওয়ার, তারপর একসময় অনায়সকণ্ঠে বলে ফেলল—চলুন যাবেন আমার বাড়ী।

আকস্মিক, সারওয়ারের সাথে দেখা হয়ে যেতে আসগারীর মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এল, সারওয়ার তার ব্যক্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আবার তাকে নিবিড় ভাবে বাঁধছে। অভিভূত হয়ে আসগারী বলল—আপনার সেই.....কথাটা শেষ করতে তার লজ্জা গেল।

—বহুত কথা আছে আপনার সাথে চলুন। আসগারীকে নিয়ে একটা বাসে সারওয়ার উঠে পড়ল। উভয়েই নীরব হয়ে বসে থাকল যতক্ষণ না সারওয়ারের বাসায় পৌঁছল তারা। একটু জিরিয়ে নিয়ে একসময় পরিষ্কারও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে সারওয়ার বলল—তোমায় একটা সত্যি কথা বলতে হবে। আমায় কখন তুমি ভালবাসতে? এমন অচিন্তিত ভঙ্গীতে এবং অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সারওয়ার কথাগুলো বলছে যে আসগারীর সামনে থেকে সমস্ত জগৎ যেমন সরে যেতে লাগল। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে আসগারী বলল—আপনার সেই-তার কি হলো? অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সাথে সারওয়ার বলতে লাগল—ওসব সব মিছে কথা, তুমি আমায় মাপ কর, কিন্তু আমার কথার জবাব দাওনি তুমি।

—আপনি আমায় অপমান করছে। এ কথাটাই ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি যে, সে সময় আপনার সাথে আমি

থিয়েটারী করতাম।

খুব কাছে সরে এসে সারওয়ার গম্ভীরস্বরে বলল— তুমি এখান থেকে চলে যাবার পর থেকে আমার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না, কত চেষ্টা করেছি তোমাকে না ভাবতে, কিন্তু তাতে মাত্র আরও বেশী করে তোমায় ভালবেসেছি, তোমায় আমি ভালবাসি, এর অধিকার তুমি আমায় দেবে?

উঠে দাড়াল আসগারী, বলল—তুমি কি বোঝ না? নিজের ছবির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

কাছে এসে দাঁড়ায় সারওয়ার, তারপর সহসা আসগারীকে নিজের বুকের মধ্যে পিষে ফেলে সে উন্মাদের মত চুমো খেতে থাকে তার মুখে, ঠোটে, গালে— সবখানে। নিজেকে জোর করে মুক্ত করে উদ্দাম শিহরণে কাঁপতে কাঁপতে আসগারী বলে জান আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

—কি! পাংশু, বিবর্ণ মুখে কম্পিত স্বরে সারওয়ার বলে। জল গড়িয়ে পড়েছে আসগারীর চোখ দিয়ে— এত হৃদয়হীন, এত পাষাণ তুমি, কেন তখন আমাকে তুমি জানাও নি? তবুও সারওয়ার বোকার মত তার দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ের বেগে আসগারী কামরা থেকে বেরিয়ে যায়।

নিরাশার তীব্র বেদনায় শিল্পী সারওয়ারের মন ভেঙে গেছে। নিজের অজ্ঞাতে আসগারীকে সে কখন এত গভীরভাবে ভালবেসেছিলো তা ভাবতেই এখন অবাক লাগে, অথচ একদিন এমন বিতৃষ্ণা ছিল এর প্রতি তার। না এখানে থাকা হবে না সারওয়ারের। দেশে গিয়ে যা জমি এখনও আছে তার যত্ন করবে, আসগারীকে হারিয়ে এ শহরে তারপক্ষে থাকা একেবারেই অসম্ভব, হতেই পারে না। কয়েকদিন উদ্‌ভ্রান্ত, অনুভূতিহীনভাবে কেটে গেল, আর বোধ হয় হপ্তাখানেক পরেই আসগারীর বিয়ে। নিজের অদৃষ্টের এমন কঠোর পরিহাস দেখতে রাজী নয় সে। একদিন রাতে সারওয়ার বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল— কালকেই সে দেশে চলে যাবে, আজকে রাতে সে একান্তভাবে ভোগ- করে নিক তার এই বেদনা। চোখের বাধাহীন উষ্ণ অশ্রুতে সে ভাবী দম্পতীর শুভকামনা করছে। খুশী হোক আসগারী, সুখে থাক।

মাঝ রাতে কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। দরজায় কে আঘাত করছে যেন। শব্দ সুস্পষ্ট—ভুল হবার কারণ নেই। আস্তে আস্তে সারওয়ার উঠল, খানিকক্ষণ ভেবে দরজা খুলে দিল। রাত্রির নিবিড় আঁধারে ভাল করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। উদ্বেগ কম্পিত নারী-কণ্ঠে কে ডাকল—সারওয়ার!

হৃৎপিণ্ড দুলে উঠেছে সারওয়ারের! কে?—ব্যাকুল স্বরে সে বলল। সারওয়ারের বুকে উপুড় হয়ে পড়ে যেন ছিন্নমূল একটা লতা। হতস্তব্ধ বিহ্বলিত সারওয়ারের মুখ গাঢ় আঁধারে ক্রমেই নীচু হতে থাকে— আসগারীর মুখের দিকে।

(মাঘ, ১৩৪৩)

যসিম

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

পার্কসার্কাস ট্রামডিপো হইতে যে-রাস্তাটা সোজা বালীগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরে একটা বড় ধূসরবর্ণের বাড়ীতে এক সময়ে এক মহিলা বাস করিতেন। তিনি ছিলেন বিধবা—অসংখ্য চাকর-বাকরে তিনি পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁর ছেলেরা ঢাকায় সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল, মেয়েদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্বচিৎ বাড়ীর বাহির হইতেন। বৃদ্ধ বয়সের দুঃখময় শেষ কয়টা দিন তিনি নিতান্ত নির্জ্জনতার মধ্যেই কাটাইতেছিলেন। তাঁর যখন বয়স ছিল—বার্দ্ধক্যে যখন তিনি উপনীত হন নাই, তখনো তাঁর জীবন বিশেষ সুখের ছিল না। এখন সেদিন তাঁর চলিয়া গিয়াছে। এই জীবন-সন্ধ্যায় রাত্রির চাইতেও গভীরতর অন্ধকারে তাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাঁর সমস্ত চাকরের মধ্যে সব চাইতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত দ্বারবান যসিম। লোকটি উচ্চতায় সাধারণ মানুষের চাইতেও অন্তত বারো ইঞ্চি লম্বা। তার শরীরের গঠন ছিল বীরোচিত—এবং জন্ম হইতেই সে ছিল কালা ও বোবা। মহিলাটী ইহাকে তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত এক গ্রাম হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। গ্রামে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে সে একাকী বাস করিত। ভাইদের সহিত তাহার বনিবনা ছিল না—তাই তাদের নিকট হইতে সে দূরেই থাকিত। দেহে ছিল তার অসীম শক্তি—সে একাই চারজনের কাজ করিতে পারিত। যে-কাজ সে ধরিত, তা-ই যেনো অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হইয়া যাইত। তার মাটীতে হল চালনার ব্যাপারটা ছিল দেখিবার মতো জিনিস। মাটীর উপর যখন সে লাঙ্গল ঠাসিয়া ধরিত, মনে হইত, লাঙলবাহী যাড়গুলির বিনাসাহায্যেই, শুধু তার হাতের জোরেই, মাটীর বুক চিরিয়া দু'ফাক হইয়া যাইতেছে। কিংবা যখন কাস্তে দিয়া সে ধান কাটা শুরু করিত, তখন তার কাঁধ দু'টীর মাংসপেশীর দ্রুত ও অবিরাম সঞ্চালন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিত। তার চিরস্থায়ী নীরবতা ছিল যেনো তার ক্লান্তিহীন শ্রমে একটা অভূতপূর্ব্ব মর্য্যাদা স্বরূপ। কৃষক হিসাবে সে ছিল চমৎকার লোক। অঙ্গের খুঁতটুকু না থাকিলে যে-কোনো মেয়ে তাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিত।...কিন্তু এহেন যসিমকে গ্রামের নির্জ্জনবাস হইতে কোলাহলময় কলিকাতানগরীতে লইয়া আসা হইল। শুধু তাই নয়, তাহাকে জুতা কিনিয়া দেয়া হইল—গ্রীষ্মকালের জন্য সার্ট এবং শীতকালের জন্য একটা ভারী কম্বলও সে লাভ করিল। এবং তার হাতে মোটা একটা লাঠি দিয়া তাকে দ্বারবান নিযুক্ত করা হইল।

প্রথম প্রথম শহরের এই নূতন জীবন তার মোটেই ভালো লাগিত না। ছেলেবেলা হইতেই সে মাঠের কাজে—গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত! মানুষের সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উর্ব্বর ভূমিজাত বৃক্ষের মতোই সে তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাকে যখন শহরে স্থানান্তরিত করা হইল, সে ভাবিয়া পাইল না, কী কাজ তাকে দিয়া করানো হইবে। তার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। প্রচুর কচিঘাসে ভর্ত্তি গোচারণের মাঠ হইতে সদ্য ধরিয়া আনিয়া রেলট্রেনের ভিতর চাবি বন্ধ-করা ষাড়ের অবস্থা যেমন হয় তেমনি আর কি! শহরে আনিয়া যসিমকে যে-কাজ দেওয়া হইল, তার কাছে সে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইল। আধঘণ্টার মধ্যেই তার নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ হইত ; তখন সে আবার বাড়ীর প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে স্থির হইয়া পাহারায় দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রতি আগন্তুকের পানেই জিজ্ঞাসু-নেত্রে হা করিয়া চাহিয়া থাকিত—যেনো সে তার নিকট জানিতে চাহে, কেনো তাকে আহাম্মকের মতো দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কখনো কখনো বা সে পাহারা দেওয়া ছাড়িয়া হঠাৎ নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া যাইত এবং লাঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো মাটীতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু কালে সবই গা-সহা হইয়া যায়। যসিমও ক্রমে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। কাজ তার ছিল সামান্যই বাড়ীর উঠান পরিষ্কার রাখা, দিনে দুইবার জল আনা, রান্নার জন্য লাকড়ি যোগাড় করিয়া দেওয়া, অপরিচিত লোকদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেওয়া আর রাত্রে পাহারা দেওয়া—এই ছিল তার মোটামুটী কাজের ফিরিস্তি। আর এ-কাজ সে খুব আগ্রহ সহকারেই করিত। বাড়ীর উঠানে তৃণ বা ধূলি পড়িতে পাইত না। কাঠ কাটিতে গেলে, তার কুড়ালের আঘাতে

অগ্নিবৃষ্টির মতো কাষ্ঠখণ্ড চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকিত। তারপর অপরিচিত আগন্তুকদের কথা! একরাত্রে দুইজন চোর সে ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাদের ঘাড় এমন জোরেই মট্‌কাইয়া ছিল যে, বাছাধনদের আর থানায় লইয়া যাইতে হয় নাই। ফলে আশে-পাশের সকলেই তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিত। এমন কি, দিনের বেলায়ও যারা আসিত (চোর ডাকাত তারা নিশ্চয়ই নহে, নিতান্তই ভদ্রলোক), তারাও ভীমাকৃতি দ্বারবানকে দেখিয়া ভয় পাওয়া যাইত এবং হাত নাড়িয়া ও তোয়াজপূর্ণ কথা বলিয়া (যেনো সে তাদের শুনিতে পায়) তাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা পাইত। অন্যান্য চাকরদের সঙ্গে যসিমের ভাব ছিল—অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব বলা চলে না, কারণ তারা দস্তুরমতো তাকে ভয় পাইত। সে উহাদিগকে নিজের লোক বলিয়াই মনে করিত। তারা বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া তাকে বুঝাইত; সে-ও সবই বুঝিতে পারিত এবং তাদের আদেশমতো কাজ করিত। কিন্তু নিজের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তার টনটনে। এইজন্য কেহই বড় তাহার কাছে ভিড়িত না। যসিমের মেজাজ ছিল ভয়ানক কড়া রকমের—সে প্রত্যেক কাজেই শৃঙ্খলা ভালো বাসিত। বাড়ীর মোরগ মুরগীগুলি পর্য্যন্ত তাকে সমীহ করিয়া চলিত—তার সম্মুখে তারাও যুদ্ধ বাধাইতে সাহসী হইত না। যদি সে-ব্যাপার কখনো তার নজরে পড়িত, সে দুই হাতে দুইটাকে ধরিয়া চাকার মতো প্রায় দশবার শূন্যে ঘুরাইত, তারপর দুইটাকে দুইদিকে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিত। উঠানে রাজহংসও কয়েকটা ছিল—এরা সাধারণতঃ ভদ্র ও বুদ্ধিমান পাখী। যসিম ইহাদিগকে বেশ-কিছুটা সমীহ করিয়া চলিত এবং তাহাদের যত্নও লইত। রান্নাঘরের উপরে তাহাকে একটা ছোট্ট ঘর দেওয়া হইয়াছিল। সে নিজের মনের মত করিয়া ঘরটা সাজাইয়াছিল। ঘরের মাঝখানে সেগুন কাঠের তৈরী একটা চারপায়া চৌকী—এমন মজবুত যে পনেরো-কুড়ি মন ভার চাপাইলেও তাকে বাঁকানো কঠিন। ঘরের কোণে তেমনি মজবুত একটা টেবিল। যসিম সর্ব্বদা একটা বিরাট তালা দিয়া ঘরটা চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিত। চাবিটা সে সব সময়েই নিজের কোমরে বাঁধিয়া রাখিত। তার ঘরে অন্য কেহ প্রবেশ করুক, ইহা সে পছন্দ করিত না।

এইরূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। বৎসর-শেষে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা যসিমকে বেশ কিছুটা চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বৃদ্ধ মহিলাটির জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল সেকেলে ধরণের। তিনি অনেক চাকর-বাকর পুষিতেন। ইহাদের মধ্যে ধোপা হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রধর, দর্জ্জী—এমন কি, পশু-চিকিৎসক পর্য্যন্ত বাদ ছিল না। চাকরদের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত ছিল। কর্ত্রীর জন্য আরেকজন আলাদা ডাক্তার ছিল। এ-সব ছাড়া কেরামত নামে একটা লোক নিযুক্ত ছিল জুতা মেরামত ও ব্রাস করার জন্যে। লোকটা ছিল পাঁড় মাতাল। সে প্রায়ই দুঃখ করিত, তার গুণের আদর কেউ করিল না! তার যোগ্য কাজ যে জুটে নাই, এ-কথাও সে যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইয়া মনের ভার লঘু করিত। কেহ তাহাকে অপরিমিত মদ্যপানের জন্য তিরস্কার করিলে সে প্রায়ই বলিত, দুঃখের জ্বালায় সে এরূপ বেপরোয়াভাবে মদ খাওয়া ধরিয়াছে।

তাই কর্ত্রী একদিন বাড়ীর সরকার গিয়াসুদ্দীনের সাথে তার সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। কর্ত্রী দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, কেরামতটা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে, আগের দিন সন্ধ্যায়ও নাকি তাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিতে হইয়াছে।

হঠাৎ কর্ত্রী বলিয়া উঠিলেন ঃ আচ্ছা গিয়াস, এখন যদি আমরা তার বিয়ে দিই, তার স্বভাব শোধরাবে, মনে করো?

গিয়াসুদ্দীন বলিল ঃ তাইতো! তার বিয়ে দিলে তো হয়! ঠিক বলেছেন কর্ত্রী, বিয়ে দিলে ভালই হবে বলে মনে হয়।

—হাঁ, কিন্তু কার সাথে তার বিয়ে দেওয়া যায়?

—হাঁ, হাঁ, ঠিক। কার সাথে বিয়ে দেওয়া যায়?...যার সাথে আপনার খুশী! তাকে নিশ্চয়ই এভাবে বয়ে যেতে দেয়া চলে না।

—আমার মনে হয়, সে ফুলজানকে পছন্দ করে।

গিয়াসুদ্দীন কী যেনো বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল।

কর্ত্রী বলিলেন : হাঁ, ফুলজানের সাথেই তার বিয়ে হোক। কি বল?

—হাঁ, হুজুরাইন! আম্‌তা আম্‌তা করিয়া এ-কথা বলিতে বলিতে গিয়াসুদ্দীন সরিয়া পড়িল।

নিজের ঘরে আসিয়া গিয়াসুদ্দীন প্রথমেই তার স্ত্রীকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল; তারপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কর্ত্রীর এই আকস্মিক ব্যবস্থায় তাকে ভারী বিপদে পড়িতে হইয়াছে। অবশেষে সে কেরামতকে ডাকিয়া পাঠাইল। কেরামত আসিল।... কিন্তু কেরামতের সাথে সরকারের কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগে এখানে ফুলজানের পরিচয় এবং তার সাথে কর্ত্রী কেরামতের বিয়ের ব্যবস্থা করায় গিয়াসুদ্দীন এমন বিচলিত হইয়া উঠিল কেন, তা বিবৃত করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ফুলজান কর্ত্রীর বাড়ীতে ধোপীর কাজ করিত। বয়স তার আটাশ বৎসর—পাত্‌লা চেহারা, সুন্দর চুল, বাম গালে কয়েকটা দাগ বর্তমান। বাম গালে দাগ থাকা নাকি অসুখী জীবনের চিহ্ন।...বাস্তবিকই ফুলজান বিগত জীবনে কখনো সুখের মুখ দেখে নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে লোকের মন্দ ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে। সে একা দুইজনের কাজ করিয়াছে, তবু কোথাও একটু খানি আদর স্নেহ পায় নাই। আত্মীয়-স্বজন তাহার বড় কেহ ছিল না। এক সময়ে তাকে হয়ত সুন্দরী বলা চলিত। কিন্তু এখন সে-সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। সে ছিল কতকটা নম্রপ্রকৃতির—ভীতু স্বভাবের বলিলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। নিজের প্রতি সে ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। অন্য সকলকে সে যেনো যমের মতো ভয় করিত। নিজের নির্দিষ্ট কাজটুকু ছাড়া সে কিছুই বুঝিত না। কাহারো সাথেই সে বড় কথা বলিত না। কর্ত্রীর নামেই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত, অথচ কর্ত্রী হয়ত ভালো করিয়া তাহাকে দেখেনও নাই। যসিম যখন এ-বাড়ীতে আসিল, সে তাহার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইয়া গেল। সর্ব্বপ্রকারে সে তাহার সাক্ষাৎ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিল। দৈবাৎ দেখা হইয়া গেলে সে কখনো তার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিত না। যসিমও প্রথম প্রথম তাকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। পরে দেখা হইলে সে মৃদু মৃদু হাসিত। এরপরে সে ক্রমে তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল এবং অবশেষে সে তার উপর হইতে আর চোখ ফিরাইতে পারিত না। ফুলজানের সুকোমল মুখখানা, না, তার ভীত-ত্রস্ত গমন-ভঙ্গি—ঠিক করিয়া বলা কঠিন—দেখিয়া যসিম কেমন যেনো তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

একদিন ফুলজান কর্ত্রীর একখানা কাপড় হাতে করিয়া বাড়ীর উঠান পার হইতেছিল। হঠাৎ কে পিছন হইতে তার কাপড় চাপিয়া ধরিল। ফুলজান চীৎকার করিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—ভীমাকৃতি যসিম দাঁড়াইয়া! মুখে তার নির্ব্বোধের মতো হাসি। একটা মোরগ সে ফুলজানের হাতে ঠাসিয়া দিল। ফুলজান প্রথমে তাহা নিতে চাহে নাই, কিন্তু সে জোর করিয়া তার হাতে মোরগটা গুঁজিয়া দিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে একবার পিছন ফিরিয়া তার দিকে প্রীতি প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিল।..

সেইদিন হইতে সে আর ফুলজানের পিছন ছাড়ে নাই। যেখানেই ফুলজান, সেইখানেই যসিমকে দেখা যাইতে লাগিল। ফুলজান ভাবিয়া পায় না, কিরূপ ব্যবহার সে তার সাথে করিবে। ফুলজানের প্রতি বোবা দ্বারবানের এই কৌতুককর ব্যবহারের কথা ক্রমে বাড়ীর সকলেই জানিতে পারিল। এরপর হইতেই ফুলজানের উপর হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ অবিরত বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু যসিমকে ঠাট্টা করিতে কাহারো সাহসে কুলাইত না। ঠাট্টা সে মোটেই পছন্দও করিত না। যসিমের সম্মুখে ফুলজানকেও কেহ ঠাট্টা করিতে সাহস পাইত না। সব বোবার মতো যসিমও ছিল অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। এবং তার আর ফুলজানের উদ্দেশে যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতেছে, শীঘ্রই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

একদিন আহারের সময় অন্য একজন চাকরাণী ফুলজানের সাথে ঝগড়া বাধাইল। ফুলজানের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিল। সে কথা বলিতে না পারিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে আর একদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ যসিম উঠিয়া সেই চাকরাণীর মাথায় সেই হাত রাখিয়া তার মুখের দিকে এমন ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিল যে সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কাহারো কথা কহিবার সাহস হইল না—সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। যসিম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।...

আর একবার কেরামত—যে কেরামতের সাথে ফুলজানের বিবাহের কথা হইয়াছে—সেই কেরামত ফুলজানের সাথে বিশেষ আগ্রহ সহকারে কী কথা বলিতেছিল। দৃশ্যটা যসিমের নজরে পড়িয়া গেল। কেরামতকে সে হাতের ইশারায় কাছে ডাকিল। কাছে আসিলে সে কেরামতের দিকে এমনভাবে ঘুসী বাগাইল যে তা দেখিয়া তার প্রাণ উড়িয়া গেল।..

এরপর হইতে ফুলজানের সহিত কথা বলিতে কেহ সাহস পাইত না। সেই চাকরাণীর কল্যাণে যসিমের এই সব কীর্ত্তি-কাহিনী কর্ত্রীর কানে পৌঁছিল। কর্ত্রী প্রতিকার করা থাকুক, যসিমের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া বেশ আমোদ বোধ করিলেন। হাসিয়া চাকরাণীকে বলিলেন : "যসিম কি-ভাবে তার ভারী হাতের চাপে তোমার মাথা নুইয়েছিল, আবার দেখাও দেখি!" পরদিন

তিনি যসিমকে পুরস্কার স্বরূপ একটা টাকা পাঠাইয়া দিলেন! বিশ্বস্ত দ্বারবান হিসাবেও যসিম কর্ত্রীর প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জ্জন করিয়াছিল।

যসিমের প্রতি কর্ত্রী বেশ-কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। যসিমও কর্ত্রীর অনুগ্রহ পাইবে বলিয়া আশা করিত। ফুলজানকে বিবাহ করার আরজী লইয়া শীঘ্রই সে কর্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করিবে মনস্থ করিল। বাড়ীর সরকার তাকে যে নূতন কোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা পাওয়ার জন্যই শুধু সে অপেক্ষা করিতেছিল। নূতন কোট না হইলে কর্ত্রীর কাছে যাওয়া যায় কি করিয়া! কিন্তু দুর্ভাগ্য যসিমের, ঠিক এই সময়েই কর্ত্রী ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কেরামতের সাথে ফুলজানের বিবাহ দিতে হইবে।

পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন, বাড়ীর সরকার গিয়াসুদ্দীন ফুলজানের সাথে কেরামতের বিবাহের প্রস্তাবে কেন অমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেরামতকে ডাকিতে পাঠাইয়া সরকার ভাবিতে লাগিল : যসিমের প্রতি কর্ত্রীর যে অনুগ্রহ-দৃষ্টি আছে, এটা ঠিক। কিন্তু তবু যসিম যে বোবা! সে যে ফুলজানকে বিয়ে করতে চাচ্ছে, এ-কথাই বা কর্ত্রীকে কি করে বলা যায়? কিন্তু তবু এ-কথা ঠিক। আর লোকটাও বড় ভীষণ। কেরামতের সাথে ফুলজানের বিয়ে হয়ে গেলে সে যে কী ভীষণ কাণ্ড বাধাবে, তা ভাবতে গা শিউরে ওঠে। তার সাথে যুক্তিতর্ক চল্‌বে না! নাঃ, একে নিয়ে ভারী বিপদে পড়া গেল দেখ্‌ছি!

এই সময়ে কেরামত ঘরে প্রবেশ করায় গিয়াসুদ্দীনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। কেরামতকে তখন যে-অবস্থায় দেখা গেল, তাকে নিশ্চয়ই তার প্রকৃতিস্থ অবস্থা বলা চলে না। সে টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিল। সে আসিয়াই যে-দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দীনের দিকে চাহিল, তাহাতে মনে হইল, সে যেনো জিজ্ঞাসা করিতেছে : "কি জন্যে আমায় ডেকেছো?"

সরকার কেরামতের দিকে চাহিল। কেরামত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল মাত্র, কিন্তু চোখ নত করিল না, বরং একপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুলের উপর একবার হাত বুলাইল। বলিল : আমি এসেছি! কি জন্যে ডেকেছেন?

সরকার বলিল : বেশ লোক তুমি! পরে কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল : আচ্ছা লোক তুমি যা'হক, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

কেরামত ঈষৎ কাঁধ কুঞ্চিত করিল। মনে মনে বলিল : আপনিই বা এমন কী আর ভালো লোক, শুনি?

সরকার তিরস্কারের সুরে বলিল : একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখো দেখি—কী হয়েছ?

কেরামত নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বিশেষ করিয়া তার ছিন্ন কোট ও পায়জামা এবং ডান পায়ের বুড়ো আঙুল বাহির হইয়া আসা ছেড়া জুতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। পরে আবার স্থির দৃষ্টিতে সরকারের দিকে চাহিল। বলিল : কী?

সরকার বলিল : কী? তুমি বলছো—কী? নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো তোমায় আজ দেখাচ্ছে।

কেরামত আবার ভ্রূকুঞ্চিত করিল। আবার মনে মনে বলিল : যত পারেন আমায় গালি দিতে থাকুন, সরকার সায়েব।

সরকার বলিতে লাগিল : আজকেও মদ খেয়েছো, কেরামত—কেমন? বল, হ্যাঁ, কি না।

কেরামত উত্তর করিল : হাঁ। আমার স্বাস্থ্য নেহাৎ খারাপ কিনা—তাই! ও খেলেই আমার মনটা একটু চাঙ্গা হোয়ে ওঠে!

সরকার মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল : স্বাস্থ্য খারাপ কিনা—তাই! বটে? তাই বুঝি পাঁড় মাতাল হোয়ে নিজের স্বাস্থ্য উদ্ধার করছো! অকর্ম্মণ্য, বেহদ্দ আলসে। এইভাবে পরের বাড়ীর ভাত গিলতে লজ্জা করে না তোমার?

—সরকার সায়েব! একমাত্র খোদা ছাড়া আমায় আর কেউ জানে না। তিনিই শুধু জানেন আমি কেমন লোক—আমি বেহদ্দ আলসে কিনা। আমার মদ খাওয়ার কথা যে বলছেন—তাতে আমার দোষ নেই। এক বন্ধুই আমায় এ-পথে ফেলেছে। এখন সে সরে পড়েছে—আর আমি...

—আর তুমি নর্দ্দমায় পড়ে কাৎরাছো! অদ্ভুত লোক বটে তুমি। যাকগে এ-সব কথা। যেজন্যে তোমায় ডেকেছি, এখন তাই বলা যা'ক। আমাদের মুনীব....। মিনিট খানেক থামিয়া সে আবার বলিল : আমাদের মুনীবের খেয়াল হয়েছে, যে, তিনি

তোমার বিয়ে দিবেন। শুনছো? তিনি মনে করেন, বিয়ে করলে তোমার স্বভাব শুধ্‌রে যাবে। বুঝতে পেরেছো।

—নিশ্চয়ই।

—বেশ, শোনো তবে। আমি অবিশ্যি মনে করি, এ-সব হাঙ্গামা থেকে দূরে সরে থাকাই তোমার পক্ষে ভালো। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম। মুনীবের খেয়াল! যাকগে তুমি রাজী আছো?

কেরামত মুখভঙ্গি করিল। বলিল : সরকার সায়েব, বিয়ে বাস্তবিক আমার মতো লোকের পক্ষে উপকারীই হবে। আমার এতে গররাজী হওয়ার কারণ কী থাকতে পারে!

সরকার বলিল : বেশ, ভালো কথা! পরে মনে মনে ভাবিল : রাজী যে হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই! পরে জোরে শুনাইয়া বলিল : কিন্তু বিয়ের যে পাত্রী ঠিক হয়েছে, সে কিন্তু তোমার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে না।

কেরামত বলিল : কেন, বলুন দেখি সরকার সায়েব। কে সে, আমায় বলবেন?

—ফুলজান।

—ফুলজান।

কেরামত চক্ষু কপালে তুলিয়া কতকটা পিছাইয়া গেল।

সরকার বলিল : কি হলো হে তোমার? এ তোমার পছন্দ নয়?

—পছন্দ নয় আবার! চমৎকার মেয়ে এই ফুলজান! কিন্তু আপনি তো জানেন সরকার সায়েব, সেই যে লোকটা—সেই জংলীটা এর পেছনে লেগেছে....জানেন তো....

কথা শেষ না হইতেই সরকার তাকে থামাইয়া দিয়া বলিল উঠিল : জানি ভাই, সবই জানি! কিন্তু তুমি তো জানো..

—কিন্তু দোহাই আপনার, সরকার সায়েব! সে যে আমায় মেরে ফেলবে—একেবারে মশা মাছির মতো পিশে মেরে ফেলবে। দেখেছেন তো, তার দু'খানা হাত তো নয়, যেনো গাছের গুঁড়ি! তা ছাড়া সে কালা—মারবে সে, কিন্তু শুনতে পাবে না, মারটা কেমন হচ্ছে!....তাকে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না। সে একটা জন্তু বই তো নয়। ....আমি আপনাদের কী করেছি, যে, আমাকে তার হাতে ঠেলে দিচ্ছেন? নাঃ, আমার আর রক্ষে নেই!

—জানিহে জানি! আর বাজে বকোনা....

কেরামত উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিল : এর শেষ কখন, খোদাই জানেন! দুঃখে-কষ্টেই জীবনটা গেল। ছেলেবেলায় একটা কাবুলীর হাতে মার খেয়েছিলুম, পরে নিজের দেশের লোকই আমায় মেরেছিলো। আর এখন? হায়, শেষে কি একটা জংলীর হাতেই জীবনটা খোয়াবো?

সরকার অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল : থামো হে বাপু! আর বক্ বক্ করো না!

—আমি বক্ বক্ করছি? বুঝতে পারছেন না সরকার সায়েব! স্ত্রীলোকের হাতে মার খেলে আমার দুঃখ নেই, কারণ তিনি আড়ালে মারেন, কিন্তু লোকের সম্মুখে আদর করেন। কিন্তু এ জানোয়ারটা....

সরকারের মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। বলিল : বাস্, বাস্, হয়েছে। আমি দেখিনি! এখন যাও এখান থেকে।

কেরামত ফিরিল এবং টলিতে টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সরকার পেছন হইতে চীৎকার করিল বলিল : তোমার শুধু ঐটুকুই আপত্তি! তাছাড়া তুমি রাজী আছো?

কেরামত চলিয়া যাইতে যাইতে উত্তর করিল : নিশ্চয়ই।

সরকার দাঁড়াইয়া উঠিয়া কক্ষমধ্যে কয়েকবার পায়চারী করিল। অবশেষে চাকরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল : এক্ষুনি ফুলজানকে ডেকে দাও দেখি!

কিছুক্ষণ পরে ফুলজান আসিয়া নিঃশব্দে দরজায় দাঁড়াইল। কোমলস্বরে বলিল : আমায় ডেকেছেন, সরকার সায়েব?

সরকার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইল। বলিল : ফুলজান, আমরা তোমায় বিয়ে দেব, স্থির করেছি। কর্ত্রী তোমার স্বামীও ঠিক করে ফেলেছেন?

ফুলজান মুখ নত করিল।

সরকার আবার বলিল : কেরামতকেই তোমার স্বামী নির্ব্বাচন করা হয়েছে। লোকটা অবিশ্যি মাতাল। তাইতো, তার ভার তোমার মতো বুদ্ধিমতীর উপর দেওয়া হয়েছে।

ফুলজান কথা বলিল না।

সরকার বলিয়া চলিল : তবে একটু মুশকিল আছে। তুমি তো জানো, জসিম—সেই কালা লোকটা তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। এই জানোয়ারটাকে কী করে সহ্য করছো? দেখো, সে কিন্তু তোমায় মেরে ফেলবে।

ফুলজান বলিল : সত্যি, সরকার সায়েব, সে আমায় মারবে—এতে আর ভুল নেই।

—মারবে?... আচ্ছা, সে আমরা দেখে নেবো। তোমায় সে মারবে কেন? তাতে তার কী অধিকার? তুমিই বলো দেখি?

—তার কোনো অধিকার আছে কিনা, সে আমি জানিনে সরকার সায়েব।

—কী বলছো হে মেয়ে? নিশ্চয়ই তুমি তাকে কোনরূপ কথা দাওনি— কেমন?

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারলুম না, সরকার সায়েব।

সরকার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল : মেয়েটী বাস্তবিকই ভারী নম্র স্বভাবের। পরে উচ্চস্বরে বলিল : আচ্ছা, এ-সব এখন থাক। এখন তুমি যাও। পরে তোমার সাথে আরো কথা হবে।

ফুলজান নীরবে চলিয়া গেল।

সরকার ভাবিতে লাগিল : আমি এ-সব কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি? হয়ত কর্ত্রী কালকের মধ্যেই এ-বিয়ের কথা ভুলে যাবেন। আর...যদি বিয়ে হয়ই, তবে জসিমকে শায়েস্তা করবার জন্যে পুলিশ ডাকলেই হবে।

সরকার উচ্চৈঃস্বরে তার স্ত্রীকে ডাকিল। সে কাছে আসিলে তাকে চা আনিতে বলিল।

সেদিন সমস্ত দিনের মধ্যে ফুলজান আর তার ঘরের বাহির হইল না। প্রথমে সে কিছুক্ষণ কাঁদিল, পরে চোখের জল মুছিয়া আবার আগের মতো কাজ শুরু করিয়া দিল।

কেরামত জনৈক বন্ধুসহ সেদিনও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মদের আড্ডায় কাটাইল।

সরকারের অনুমান কিন্তু ঠিক হইল না। কেরামতের বিবাহের কথা বাড়ীর কর্ত্রীকে এমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, রাত্রে তিনি সে-কথা ভুলিতে পারিলেন না—জনৈক পরিচালিকার সাথে এই প্রসঙ্গ লইয়া তিনি অনেক রাত পর্য্যন্ত আলোচনা চালাইলেন।

পরদিন সকালে সরকার আসিলে সবার আগে তিনি তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন : কেমন সরকার, বিয়ের আয়োজনের কতদূর?

সরকার জানাইল, সবই ঠিক হইয়াছে ; কেরামত কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য কর্ত্রীর সাথে দেখা করিতে আসিবে।

কর্ত্রীর মেজাজ সেদিন ভালো ছিল না। আর দু'একটা কথা বলিয়াই তিনি সরকারকে বিদায় দিলেন।

নিজের ঘরে আসিয়াই সরকার চাকরদের এক বৈঠক ডাকিল। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সহজ নয়। ফুলজানের পক্ষ হইতে অবশ্য কোনরূপ গোলমালের আশঙ্কা নাই ; কিন্তু কেরামত জানাইয়াছিল, বিবাহ হইলে ধরে তার মাথা আর আস্ত থাকিবে না। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।... জসিম যেভাবে সকলের দিকে তাকাইতেছিল, সে-দৃষ্টিকে খুব সুচারু বলা চলে না। ....।*

* চিহ্নিত অংশের দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। যসিম পুকুরের জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্য মনে আগাইয়া চলিয়া-ছিল। হঠাৎ তার মনে হইল, জলের কিনারায় কাদার মাঝে কি একটা জিনিস নড়িতেছে। সে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, শাদা আর কালো রঙের ডোরাযুক্ত একটী ক্ষুদ্র কুকুরছানা কাদায় আট্‌কাইয়া গিয়া তথা হইতে উঠিবার জন্য আঁকু-পাঁকু করিতেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিতেছে না—কেবলই পিছ্‌লাইয়া পিছ্‌লাইয়া কাদার ভিতরে পড়িয়া যাইতেছে। তার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল দেহখানা শ্রমের আতিশয্যে কাঁপিতেছে। যসিম একদৃষ্টে কতক্ষণ এই হতভাগ্য জীবটীর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তার মনে করুণা উছলিয়া উঠিল। এক হাতে কুকুরছানাটাকে কাদা হইতে তুলিয়া লইয়া সে তার কোটের পকেটে পুরিল। তারপর লম্বা পা ফেলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল।

যসিম নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুকুরছানাটাকে তার কোটে ঢাকিয়া নিজের বিছানার উপর রাখিল। তারপর একটু দুধের জন্যে প্রথমে গোয়ালঘরে এবং পরে পাকঘরে প্রবেশ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ এক বাটী দুধ পাওয়া গেল।

কুকুরছানাটীর বয়স মোটে তিন সপ্তাহ। এখনও তাহার চোখ দু'টী ভালো করিয়া ফুটে নাই। বাটী হইতে দুধ কি করিয়া চাটিয়া খাইতে হয়, তাহা এখনো সে জানে না। কাজেই দুধের বাটী তাহার নিকট আনা হইলে সে মোটেই খাওয়ার চেষ্টা করিল না। দুর্ব্বল পায়ে ভর দিয়া সে একবার দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল বটে ; কিন্তু পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতে আবার বসিয়া পড়িল।

যসিম আস্তে আস্তে কুকুরছানার মাথাটী দুই আঙ্গুলে ধরিয়া তার ক্ষুদ্র নাকটী দুধের মধ্যে ডুবাইয়া দিল। হঠাৎ কুকুরছানাটী যেনো অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। লোভাতুরের মতো আগ্রহ সহকারে চক্ চক্ করিয়া সে দুধ খাইতে লাগিল। যসিম সাগ্রহে সস্নেহে বিস্ফারিত চোখে তার দুধ খাওয়া দেখিতে লাগিল। কুকুরছানাটীর লোভাতুরতা লক্ষ্য করিয়া তার খুবই হাসি পাইল। ... সমস্ত রাত ধরিয়া সে কুকুরছানাটাকে নানা-প্রকারে যত্ন করিল। অবশেষে তারই পাশে হৃষ্টমনে একসময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

মায়ের অধিক যত্নে যসিম কুকুরছানাটাকে লালন-পালন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ দেখিতে সে ভারী কুৎসিত ছিল—আর ছিল খুবই দুর্ব্বল; কিন্তু ক্রমে যসিমের যত্নে সে বেশ সবল হইয়া উঠিল—শরীরে চেক্‌নাই বাড়িল, দেখিতেও সুন্দর হইয়া উঠিতে লাগিল। আট মাসের সময় তাকে খুবই চমৎকার দেখাইতে লাগিল—তার লম্বা কাণ দু'টী, লোমশ লেজটী এবং ভাবোদ্যোতক বড় বড় চোখ দু'টী যে দেখিত, সে-ই স-প্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকিত। যসিমকে সে খুবই ভালবাসিত —একলহমা তার কাছ ছাড়া হইয়া থাকিত না। লেজ নাড়িতে নাড়িতে সব সময়েই সে যসিমের অনুসরণ করিত। কুকুরছানাটার একটা নামও সে দিয়া ফেলিল। বোবারাও তাদের একটা বিশিষ্ট শব্দের অস্পষ্ট উচ্চারণে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। সে তাকে 'মুমু' বলিয়া অস্পষ্টস্বরে ডাকিত। বাড়ীর চাকররাও কুকুরছানাটাকে পসন্দ করিত। তারাও তাকে 'মুমু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মুমু ভারী চালাক কুকুর—সে সকলের সাথেই ভাব জমাইয়া ফেলিল ; কিন্তু যসিম ছাড়া কাহারো কাছে সে থাকিত না। যসিমও কুকুরটাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত—অন্যান্য সকলে তাহাকে আদর করুক, ইহা তার মোটেই পসন্দ হইত না। এর কারণ, তাহার নিকট হইতে কুকুরটার পলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, না, ঈর্ষাপরায়ণতা—তা খোদাই জানেন।

প্রতিদিন সকালে মুমু যসিমের কোট ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইত। যসিম যখন প্রতিদিন ভোরে কলসী ভরিয়া জল আনিতে নদীতে যাইত, মুমুও গম্ভীরমুখে তার অনুসরণ করিত—যেন কত বড় কাজের ভার তাকে দেওয়া হইয়াছে! যসিমের কক্ষে কেহ প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সে দাঁত খিঁচাইয়া তাকে কামড়াইতে আসিত। ফলে তার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না। যসিম তার ঘরের দ্বারের কাছে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া দিয়াছিল। মুমু সেই গর্ত্তে আনন্দে শুইয়া থাকিত। যসিমের ঘরে যখন সে থাকিত, মনে হইত, সে যেন সে-ঘরের কর্ত্রী আর কি! মনের আনন্দে সে তখন লাফাইত, খেলা করিত, তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত। যসিমের বিছানার উপরে ছিল তার অবাধ-গতি। যসিম তাতে কিছুমাত্র বিরক্তি-বোধ করিত না। রাত্রে সে মোটেই ঘুমাইত না; কিন্তু বিনা কারণে সে বাজে কুকুরের মতো চীৎকারও করিত না। যদি কোন অপরিচিত লোক দেখা যাইত কিংবা কোনরূপ সন্দেহজনক শব্দ তার কাণে আসিত তখনই সে শুধু

গর্জ্জন করিয়া উঠিত। ... মোটের উপর সে ছিল চমৎকার একটি পাহারাদার কুকুর।

মুমু কর্ত্রীর ঘরে কখনো যাইত না। যসিম যখন কাঠ লইয়া কর্ত্রীর বাড়ীতে যাইত, সে তখন পিছনে থাকিয়া তার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা করিত। একই জায়গায় বসিয়া থাকিয়া এদিক ওদিক তার কাণ ও লেজ নাড়িত—এবং দরজা খোলার সামান্য শব্দেও কাণ খাড়া করিয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিত।

এই ভাবে আরো এক বৎসর কাটিয়া গেলো, যসিম নিতান্ত সন্তুষ্ট মনে তার দ্বারবানের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা অভাবিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল।...

গ্রীষ্মকালে একদিন তাহার কর্ত্রী তাঁর নিজের বৈঠকখানা ঘরে পায়চারী করিতেছিলেন। কয়েকজন চাকরও সেখানে ছিল। চাকরদের সাথে তিনি নানারূপ হাসি-কৌতুক করিতেছিলেন। চাকরেরাও তাঁর সাথে হাসি-তামাসায় যোগ দিয়াছিল। কিন্তু চাকরদের এ হাসি-তামাসায় প্রাণের যোগ ছিল না ; কারণ কখন কর্ত্রীর মেজাজ আবার গরম হইয়া উঠে, সে-সম্বন্ধে তাদের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা করার কারণ ছিল। কর্ত্রীর মন যখন স্ফূর্ত্তিতে ভরা থাকে, তখন উপস্থিত সকলকেই তার স্ফূর্ত্তিতে যোগ দিতে হয়, নতুবা তিনি ভয়ানক চটিয়া উঠেন। কিন্তু কর্ত্রীর এই স্ফূর্ত্তির মাত্রাটা মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হইত না। অল্প পরেই তাঁর মেজাজ সম্পূর্ণ বিপরিত আকার ধারণ করিত। কাজেই চাকরদের কোনো দিক দিয়াই স্বস্তি ছিল না। কর্ত্রী সেদিন কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে ঘুম হইতে উঠিয়াছিলেন। সেদিনকার চা তাঁর কাছে অতি মধুর মনে হইল। চা খাইয়াই তিনি তাস খেলিতে বসিলেন। খেলায় তাঁহার জয় হইল। তাই তাঁর মনের স্ফূর্ত্তি তখনো পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিল। তিনি পায়চারী করিতে করিতে জানালার কাছে গেলেন। নীচে ফুলের বাগানে একটি গোলাপকুঞ্জের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মুমু সেখানে আরামে বসিয়া একটা হাড় চিবাইতেছিল। কর্ত্রী দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন : কুকুরটা ওখানে কেন?

যাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ত্রী এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রশ্ন শুনিয়া থতমত খাইয়া গেল। বলিল : আমি—আমি ঠিক জানিনে। কুকুরটা সম্ভবতঃ ঐ বোবা লোকটার।

কর্ত্রী তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিলেন : চমৎকার কুকুরটা কিন্তু! ওটাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে বল। কতদিন সে ওটাকে এনেছে? এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—আশ্চর্য্য!... এখানে ওটাকে নিয়ে আস্‌তে বল।

চাকরাণীটি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।—চীৎকার করিয়া ডাকিল : বয়, বয় মুমুকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে আয়! ঐ যে ফুলের বাগানে ওটা রয়েছে।

কর্ত্রী বলিলেন : ওর নাম তাহলে মুমু! ভারী সুন্দর নাম তো!

চাকরাণী উত্তর করিল : হাঁ হুজুরাইন, ভারী চমৎকার নাম! বয়, শীগ্‌গীর নিয়ে এসো।

বয় ফুলের বাগানে ছুটিল। মুমুকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু মুমু তার হাতের আঙুল ফস্‌কাইয়া লেজ উঁচু করিয়া ভোঁ দৌড় দিল। যসিম সে-সময়ে রান্নাঘরে কী করিতেছিল। মুমু একেবারে তার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মুমুর চঞ্চল পায়ের আঘাতে রান্নাঘরের কয়েকটা পাত্র উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেল। বয় দৌড়িয়া গিয়া যসিমের পায়ের নীচে মুমুকে ধরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কুকুরটা এক লাফে দূরে ছিট্‌কিয়া পড়িল—সে কিছুতেই এই অপরিচিত লোকটীকে ধরা দিবে না। যসিম মুমুর কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিল। অবশেষে বয় হাতের ইশারায় যসিমকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। জানাইল যে, কর্ত্রী কুকুরটাকে তাঁর কাছে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। যসিম শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু মুমুকে কুড়াইয়া লইয়া বয়ের হাতে দিল।

বয় তাকে কর্ত্রীর কাছে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া মেঝের উপর রাখিল। কর্ত্রী আদর করিয়া মুমুকে তার কাছে ডাকিলেন। কিন্তু মুমু বোধ করি ঘরের আসবাবপত্র দেখিয়া কতকটা ভড়কাইয়া গিয়াছিল। সে কর্ত্রীর কাছে না গিয়া দরজার দিক দৌড়িল। বয় আবার তাকে ধরিয়া কর্ত্রীর কাছে লইয়া আসিল। মুমু ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং দেয়াল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্ত্রী ডাকিলেন : মুমু, মুমু, এদিকে আয়—তোর কর্ত্রীর কাছে আয়! আয় না রে বোকাচন্দ্র! ভয় পাস্‌নে!

চাকরাণীও কর্ত্রীর অনুসরণ করিয়া ডাকিল : মুমু, কর্ত্রীর কাছে ছুটে আয় হতভাগা!

মুমু ভীত চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

কিন্তু নড়িল না।

কর্ত্রী বলিলেন : এর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আয় ভারী দুষ্টু তো এটা! তার মুনিবের কাছে আসতে চায় না! ভয়টা কি এর?

জনৈক চাকরাণী ভয়ে ভয়ে বলিল : সম্ভবতঃ ও আপনাকে দেখে নি—তাই ওরকম করছে।

বয় একবাটী দুধ লইয়া আসিল। মুমু কিন্তু সে-দুধ স্পর্শও করিল না—একবার শুঁকিয়াও দেখিল না। শুধু পূর্ব্বের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভীতদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিত লাগিল।

—কী বোকা রে তুই! বলিতে বলিতে কর্ত্রী আগাইয়া গিয়া মুমুকে আদর করিবার জন্য তার পিঠ চাপড়াইতে চাহিলেন। কিন্তু মুমু অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া কর্ত্রীকে কামড়াইবার জন্য দন্তবিকাশ করিল। কর্ত্রী সভয়ে হাত গুটাইয়া লইলেন।...

তারপর এক মুহূর্ত্ত নীরব। হঠাৎ মুমু চীৎকার করিয়া উঠিল।...কর্ত্রী পেছনে হটিয়া গেলেন। মুমুটারি চীৎকারে তিনি ভয় খাইয়া গিয়াছিলেন।

চাকরাণীরা সবাই একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল : কামড়ায় নি তো হুজুর? আহ্!

মুমু তাহার জীবনে কাহাকেও কামড়ায় নাই।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কর্ত্রী আদেশ করিলেন : এটাকে এখান থেকে নিয়ে যা! বদমাস কুকুর! এমন শয়তান তো দেখিনি!

হঠাৎ কর্ত্রী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁর শয়ন কক্ষের দিকে চলিলেন। চাকরাণীরাও ভীত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিতে চাহিতে কর্ত্রীর অনুসরণ করিল। তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন : আমার পেছনে পেছনে আস্‌চ কেন! আমিতো তোমাদের ডাকি নি!

সঙ্গী চাকরাণীরা হতবুদ্ধির মত মাথা নাড়িল। বয় মুমুকে তুলিয়া লইয়া দরজা দিয়া তাহাকে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। মুমু যসিমের পায়ের নীচে গিয়া পড়িল।

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া বাড়ীটায় একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। কর্ত্রীকে মেঘের মতো কালো মুখ লইয়া তার নিজের কোঠায় বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কর্ত্রী মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কারুর সঙ্গে তিনি একটা কথাও বলিলেন না—এমন কি, তাসও খেলিলেন না! রাত্রিটা তাঁর ভারি অস্বস্তিতে কাটিল।

পরদিন ভোরে তিনি বাড়ীর চাকর গিয়াসুদ্দিনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গিয়াসুদ্দিন আসিলে বলিলেন কাল সারারাত আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে কোন্ একটা কুকুর চীৎকার করিতেছিল।

সরকার আমতা আমতা করিয়া বলিল : কার কুকুর ঠিক তো জানিনে।... হয়ত বোবার কুকুরই এ!

—বোবার কুকুর, না, কার কুকুর তা আমি জানিনে। কিন্তু সে আমাকে এক মুহূর্ত্তও ঘুমাতে দেয় নি। এই শ্রেণীর কুকুরের আমাদের দরকার কি? বাড়ীর উঠানে একটা কুকুর আমাদের তো আছেই—নয়?

—হাঁ হুজুরাইন! আছে বই কি! বাঘের মত একটা কুকুর!

—তবে আর কুকুরের দরকার কি? কুকুর বেশী থাকার মানে বাড়ীতে আবর্জ্জনা সৃষ্টি করা। যসিম কুকুর দিয়ে করবে কি? কে তাকে এ-বাড়ীতে কুকুর পুষতে অনুমতি দিয়েছে? গতকাল জানালা দিয়ে তার কুকুরকে দেখছিলুম—আমার ফুলের বাগানে বসে হাড় চিবুচ্ছে। আমার ফুলের গাছগুলিই হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে।

কর্ত্রী একটু থামিয়া আমার বলিলেন : ও কুকুরটাকে আজকেই বিদেয় দাও...বুঝলে?

—হাঁ হুজুরাইন!

—আজকেই! যাও এখন। আজকেই কুকুরটাকে বিদেয় করেছ কিনা, সে-সংবাদ আমি পরে নেব।

সরকার চলিয়া গেল।

বৈঠকখানা ঘরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সরকার একটা ঘণ্টা বাজাইল। চাকর-বাকরকে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্কেত স্বরূপ ইহা এই বাড়ীতে অনুসৃত হইয়া থাকে। তারপর সরকার চাকরদের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে একবার উঁকি মারিল। কর্ত্রীর বয়টা তখনো অঘোরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। সরকার গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। বয় চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল এবং সম্মুখে সরকারকে দেখিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সরকার তার কানে কানে কী উপদেশ দিলেন। বয় সম্মতিপূর্ব্বক মাথা নাড়িয়া হাই তুলিতে তুলিতে একটুখানি হাসিল।

সরকার চলিয়া গেলে বয় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোট গায়ে দিতে দিতে বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণ পরেই একবোঝা লাকড়ি পিঠে যসিমকে বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঢুকিতে দেখা গেল। সঙ্গে তার চির-সহচর মুমু! যসিম লাকড়ি লইয়া কর্ত্রীর রন্ধনশালার দরজায় উপস্থিত হইল। মুমু অভ্যাস মতো জসিমের কিছু পিছনে দাঁড়াইয়া তার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বয় এই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া হঠাৎ লাফাইয়া গিয়া মুমুর উপর পড়িল। মুমুকে তার দুই বাহুতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রাঙ্গণ হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় আসিয়াই যে-বাস সে সম্মুখে পাইল, তাহাতেই উঠিয়া বসিল। বাস সে সম্মুখে পাইল, তাহাতেই উঠিয়া বসিল। বাস এক বাজারের কাছে আসিয়া থামিতেই সে নামিয়া পড়িল। একজন ক্রেতার কাছে সে তাকে এক টাকায় বিক্রী করিয়া ফেলিল। এত সস্তা বিক্রী করাতে বিনিময়ে ক্রেতাকে সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল মুমুকে ভালো করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে—এর মধ্যে যেনো সে কখনো ছাড়া না পায়। তারপর সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

এদিকে যসিম কর্ত্রীর রন্ধনশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে মুমুকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাইতো, মুমুটা গেল কোথায়? এ-অবস্থায় মুমু তাহার অপেক্ষায় প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকে নাই, এমন ঘটনা কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া তার মনে পড়িল না। অস্থির চিত্তে সে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। তার বিশিষ্ট বিচিত্র স্বরে সে মুমুকে ডাকিতে লাগিল। এবার সে আস্তাবলে দৌড়িয়া গেল, তারপর সে খড়ের গাদার কাছে ছুটিয়া গেল। কিন্তু মুমুর দেখা নাই! এরপর সে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইল, এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিল—।.... সে তখন হতাশভাবে চাকরদের কাছে গেল। মুমুর কথা তাদের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল—হাত দিয়া মুমুর উচ্চতা দেখাইল বিচিত্র ভঙ্গিতে তার হারানোর কথা বুঝাইয়া দিল এবং তারা এ-সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা তাহা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল।...চাকরদের যারা সত্যি সত্যি ব্যাপারটার কিছু জানিত না, তারা হাত নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, তারা মুমু কোথায় গিয়াছে জানে না। আর যারা ঘটনা জানিত, তারা জসিমের বিচিত্র ব্যাকুল ভঙ্গি দেখিয়া মুচকিয়া একটুখানি হাসিল মাত্র। সরকার মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে কোচোয়ানকে গালাগালি দিতে লাগিল। যসিম হতাশচিত্তে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা ঘোর হইলে সে ফিরিয়া আসিল। তার বিষণ্ণ দৃষ্টি, অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় তার গতিভঙ্গি, তার ময়লা কাপড় দেখিয়া মনে হইলে, সে মুমুর খোঁজে অর্দ্ধেক কলিকাতা চষিয়া ফেলিয়াছে! কর্ত্রীর ঘরের জানালার বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া সে সিঁড়ির দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। সেখানে কয়েকজন চাকর মিলিয়া জটলা করিতেছিল। সে আবার তার বিচিত্রস্বরে ডাকিল : মুমু! কিন্তু মুমুর উত্তর আসিল না। যসিম চলিয়া গেল! উপস্থিত সকলেই তার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কাহারো মুখেই হাসি ফুটিল না, বা কেহ একটা কথাও বলিল না।

পরদিন সকালে একটী চাকরাণী রন্ধন ঘরে আসিয়া জানাইল যে, বোবা লোকটী সারারাত ধরিয়া কেবল গোঙাইয়াছে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া যসিমকে আর দেখা গেল না। কাজেই কোচোয়ানকেই যসিমের কাজগুলি সম্পন্ন করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে কোচোয়ান মোটেই খুব খুশী হইতে পারে নাই। কর্ত্রী সরকারকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর আদেশ পালন করা হইয়াছে কিনা। সরকার জানাইল, হইয়াছে।

তারপর দিন সকালে যসিম নিজের ঘর হইতে বাহির হইল এবং যথারীতি তার নির্দ্দিষ্ট কাজে লাগিয়া গেল। যথাসময়ে আহার করিয়া, আগের মতো কাহাকেও তার বিচিত্রস্বরে সম্ভাষণ না জানাইয়াই, সে আবার চলিয়া গেল! সব বোবা লোকের মতোই যসিমের মুখও ভাবলেশহীন ; এখন তার এই ভাবলেশহীন মুখ যেন একেবারে পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে। আহারের পরে সে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এবং সোজা খড়ের গাদার দিকে গেল।

রাত্রি হইল—পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি। খড়ের উপর অলসভাবে সে শুইয়া পড়িল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরতর হইয়া উঠিল। সে কেবলি এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সে অনুভব করিল, কী একটা প্রাণী যেন তার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। সে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল, কিন্তু মাথা তুলিল না বরং আরো দৃঢ়ভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। ...কিন্তু আবার সেই টানাটানি! বরং এবারকার টানাটানি পূর্ব্ব হইতেও বেশী জোরে চলিল। সে লাফাইয়া উঠিল!... দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলার চারিদিকে রজ্জুবদ্ধ মুমু! সে কেবলি মুখ এপাশ-ওপাশ করিতেছিল। যসিমের নির্ব্বাক বক্ষতলে একটি অপরিসীম আনন্দ-প্রবাহ উথলিয়া উঠিল। মুমুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে দৃঢ়ভাবে তাকে বাহুবদ্ধ করিল। মুমু তার নাক, চোখ, দাড়ি আর গোফ চাটিতেছিল।... যসিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর সাবধানে খড়ের গাদা হইতে নামিয়া আসিয়া চারিদিকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। যখন বুঝিল কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছেনা, সে সন্তুষ্ট চিত্তে মুমুকে বগল-দাবা করিয়া নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। যসিম তার সহজ সংস্কারবলেই বুঝিতে পারিযাছিল। মুমু তার কোনোরূপ অযত্নের ফলে পলাইয়া যায় নাই। কর্ত্রীর আদেশেই কোথাও তাকে নির্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে। কোনো কোনো চাকরের ইঙ্গিতেও সে এ-কথাটা বুঝিতে পারিয়াছিল।

মুমুকে তার ঘরে আনিয়াই সে তাকে এক টুকরা রুটী খাইতে দিল, তাকে খুব আদর করিল এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর ভাবিতে বসিল। সমস্ত রাত সে ভাবিল, কি করিয়া মুমুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা যায়। অবশেষে ঠিক করিল, দিনে সে তাকে ঘরেই রাখিয়া যাইবে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখিয়া গেলেই চলিবে এবং রাত্রে তাকে বাহিরে আনিবে। ইহাই তার কাছে খুব সুব্যবস্থা বলিয়া মনে হইল। সে তার ঘরের দরজার ছিদ্রটা কোট চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর ভোরের আলো দেখা দিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। যেন কিছুই হয় নাই। এমন একটা নিরীহ ভাব সে মুখে ফুটাইয়া তুলিল।

কিন্তু হতভাগ্য বোবা লোকটা বুঝিতেও পারিল না যে, তার এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কৌশলটা মুমু নিজেই তার চীৎকারে ফাঁক করিয়া দিবে! আর হইলও তাই। আবার কুকুরটী যে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তা যে এর ঘরেই আবদ্ধ আছে, অল্প সময়ের মধ্যেই জানিতে বাড়ীতে কাহারো বাকী রহিল না। কিন্তু কতকটা তার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এবং কতকটা তার ভয়ে কেহই তাকে জানাইতে সাহসী হইল না যে, তারা তার গুপ্ত কৌশলটী ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। সরকার নিজের হাত চুলকাইল এবং হতাশভাবে তাহা আন্দোলিত করিল—যেনো তার মনের ভাবখানা এই : হায় হতভাগা কর্ত্রীর কানে এ-সংবাদ না পৌছিলে বাঁচি!

কিন্তু সেদিন কাজকর্ম্মে বোবার যে স্ফূর্ত্তি দেখা গেল এমনটী আর কখনো দেখা যায় নাই। প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিয়া এমন ঝরঝরে করিয়া ফেলিল যে ধুলা-বালি, খড়-কুটার অস্তিত্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা খুঁজিয়া বাহির করাও কঠিন হইত। এমনকি যসিমের এই অস্বাভাবিক কাজের উৎসাহ কর্ত্রীর দৃষ্টিও এড়াইল না। সেদিন গোপনে লুকাইয়া দুইবার সে তার আবদ্ধ কুকুরকে দেখিয়া আসিল। রাত হইলে সে তাকে লইয়া আজ আর সেই খড়ের গাদায় গেল না, নিজের ঘরেই শুইয়া রহিল। যখন রাত দুইটা বাজিয়া গেল, সে কুকুরকে লইয়া মুক্ত বায়ুতে একটুখানি বেড়াইয়া আসিত বাহির হইয়া পড়িল। বেশ খানিকক্ষণ বেড়ানোর পর সে যখন ঘরে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ পিছনদিককার রাস্তার পাশে দেয়ালের নীচে একটা খস্ খস্ শব্দ হইল। মুমু কান খাড়া করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, হঠাৎ দৌড়িয়া দেয়ালের কাছে গিয়া, কিসের গন্ধ পাইয়া তীব্রস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দেখা গেল একটা মাতাল সেখানে শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে গোঁ গোঁ করিতেছে।

সেই সময়ে কর্ত্রী সবেমাত্র গুরুভোজন সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। পেটের গোলমালে নিদ্রা তখনো তাঁর গভীর হইতে পারে নাই। হঠাৎ কুকুরটার বিকট চীৎকারে তিনি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ডাকিলেন : কে কোথায় আছিস্‌রে, শীগ্‌গীর এখানে আয়!

সন্ত্রস্ত ভীত পরিচারিকার দল ছুটিয়া আসিল। কর্ত্রী হতাশভাবে হাত নাড়িয়া বলিলেন : মারা গেলুম! মারা গেলুম! আবার, আবার সেই কুকুর! শীগ্‌গীর ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। আবার সেই হতভাগা কুকুর! অহ্‌! বলিয়াই তিনি বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

পরিচারিকারা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহচিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে ছুটিয়া গেল। গৃহচিকিৎসক চিকিৎসায় ছিলেন একেবারে ধন্বন্তরী। তাঁর কাজের মধ্যে ছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা ঘুমানো, আর বাকী ১০ ঘণ্টা কর্ত্রীর সঙ্গে নানা গল্প করিয়া সময় কাটানো। কাহারো কোনো অসুখ হইলে তিনি ব্যবস্থা দিতেন ক্যাষ্টর-অয়েল, কর্ত্রীকেও তাঁর এই তীব্র ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইত। ফলে লোকটীর উপর কর্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

ডাক্তার ছুটিয়া আসিল। এক গ্লাস ক্যাষ্টর-অয়েল কর্ত্রীর গালের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। কর্ত্রী তিক্ত-বিরক্ত মুখে চোখ মেলিয়া চাহিলেন। আবার সুরু করিলেন : আবার সেই কুকুর! ডাক্তার, আবার সেই কুকুর! অপদার্থ সরকারটা দেখ্‌ছি আমাকে মেরেই ফেলবে। কেউ আমায় দেখতে পারে না। ডাক্তার! সবাই চায় আমার মৃত্যু! আমার কে-ই বা আছে!

তখনো মুমুর চীৎকার থামে নাই। যসিম বৃথা তাকে সেই দে'য়ালের নিকট হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কর্ত্রী আবার চীৎকার করিলেন : ঐ শোনো, ঐ শোনো সেই কর্ণভেদী চীৎকার! না আমি আর বাঁচব না ডাক্তার!

ডাক্তার একজন পরিচারিকার কানে কানে কি কহিলেন। পরিচারিকা দৌড়াইয়া গিয়া বয়কে জাগাইল। বয় গিয়া সরকারকে জাগাইল। সরকার সব শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তার গর্জ্জনে বাড়ীর সব চাকর-বাকর জাগিয়া উঠিল।

যসিম পিছন ফিরিয়া দেখিল, বাড়ীর সব ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একটা অমঙ্গলকর কিছু যে ঘটিয়া গিয়াছে, সহজ সংস্কার বলেই তাহা সে বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি মুমুকে বগল-দাবা করিয়া সে চুপি চুপি নিজের কক্ষে চলিয়া আসিল। আসিয়া ঘরে খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই পাঁচটি লোক আসিয়া তার দরজায় আঘাত করিল। কিন্তু ভিতর হইতে দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহারা থামিল। হাজার আঘাত করিলেও যসিম তাহা শুনিতে পাইবে না; তবে আর আঘাত করিয়া লাভ কি! সরকার তাহাদিগকে সকাল পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া পাহারা দিতে হুকুম করিলেন।

পরদিন সকালে কর্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিল একটু দেরীতে। তারপর যসিম? তার কুকুরকে লইয়া কী করা যায়, সে সম্বন্ধে কর্ত্রীর শেষ আদেশের প্রতীক্ষায় সরকার তাঁর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু কর্ত্রী নিজে দেখা দিলেন না। একটী পরিচারিকা আসিয়া সরকারের কানে কানে কী বলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, বাড়ীর সব চাকর মিলিয়া হল্লা করিতে করিতে চলিয়াছে জসিমের ঘরের দিকে। তাদের অগ্রভাবে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছে সরকার সেনাপতির মতো। যসিমকে তার বড় ভয় বটে, কিন্তু এত বড় বাহিনী সঙ্গে থাকিতে আর ভয় কিসের!

সরকার আগাইয়া গিয়া সজোরে ধাক্কা দিল। চীৎকার করিয়া বলিল : দরজা খোলো যসিম!

কুকুরের মৃদু চীৎকার শোনা গেল বটে, কিন্তু জসিমের কোনো উত্তর আসিল না।

আবার সরকার ডাকিল : দরজা খোলো,—শুনছ?

বয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল : শোন্‌বে কী করে সরকার সাহেব! ও যে বোবা!

সকলে হাসিয়া উঠিল।

সরকার অপ্রস্তুত হইয়া বলিল : তাইতো! এখন কি করা যায়!

বয়টাই আবার বলিল : কোনো চিন্তা নাই সরকাব সায়েব! দরজার মাঝখানে ঐ যে ফুটোটা দেখ্‌ছেন ওখান দিয়ে একটা লাঠি ভিতরে ঢুকিয়ে দিন্ এবং তা অনবরত নাড়তে থাকুন। যসিম দরজা খুলবে'খন।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?

সরকার নীচু হইয়া ফুটোর ভিতর দিয়া চাহিল। বলিল : তাইতো! ফুটোর ওদিকটা একটা কোট-চাপা আছে দেখ্‌ছি!

—বেশ তো! লাঠির গুঁতোয় কোটটা সরিয়ে দিন না!

সরকার কান চুলকাইল। বলিল : তাইতো! তা-ই বা কি করে করা যায়! যসিম তা'হলে নিশ্চয়ই তেড়ে আস্‌বে।... আচ্ছা, তুমিই ওকাজটা কর না হে বাপু!

বয় বলিল : বেশ, আমিই করছি। দরজার ছিদ্র দিয়া সে লাঠি ঢুকাইয়া দিল। কোট সরাইয়া দিয়া সে লাঠি অনবরত নাড়িতে লাগিল।

পরমুহূর্তে হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। চাকরের দল কয়েক পা হটিয়া গেল। সরকার গিয়া দাঁড়াইল একেবারে সকলের পিছনে।

পিছনে থাকিয়াই সরকার চীৎকার করিল : যসিম এদিকে এস! যা বল্‌ছি শোনো!

যসিম দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কৃষকের পোষাকের সাজে তাকে দরজায় সমবেত লোকগুলির সাথে তুলনায় মনে হইতেছিল যেনো কতকগুলি ক্ষুদ্র কাপুরুষের সম্মুখে এক আজানুলম্বিতবাহু বীরপুরুষ!

সরকার এই সময়ে এক-পা আগাইয়া আসিল। বলিল : শোনো বন্ধু, গোলমাল করো না—মন দিয়ে শোনো!

তারপর সে হাতের নানা বিচিত্র ইঙ্গিতে বুঝাইতে লাগিল যে, কর্ত্রী তার কুকুরটা চান; অবিলম্বে সেটা তাহাদিগকে দিতে হইবে—নতুবা যসিমের ঘোরতর বিপদ হইবে।

যসিম সরকারের দিকে চাহিল। কুকুরটাকে হাতের ইশারায় দেখাইয়া নিজের গলার চারিদিকে একবার হাত ঘুরাইয়া লইল। তারপর প্রশ্নসূচক মুখে আবার সরকারের দিকে চাহিল।

সরকার সম্মতিসূচক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল : হাঁ, হাঁ' তা-ই করতে হবে।

যসিম হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চোখ নত করিল। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পব সে হঠাৎ মাথা সোজা করিয়া সকলের দিকে চাহিল। পার্শ্বে দাঁড়ানো লাঙ্গুল-সঞ্চালনরত মুমুকে দেখাইয়া সে তার গলায় ফাঁস লাগানোর একটা ভঙ্গি করিল। তারপর নিজের বুক চাপড়াইয়া এমন একটা ইঙ্গিত করিল—যাহাতে বোঝা গেল : সে নিজের হাতেই মুমুকে ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবে।

সবকার হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল · যসিম নিশ্চয়ই ফাঁসী দিতে চাহিতেছে!

যসিম তার দিকে উদ্ধতভাবে চাহিয়া ঘৃণার হাসি হাসিল। তারপর আবার বুক চাপড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সকলে নীরবে একে-অন্যের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করিল! সরকার বলিল : ব্যাটার মতলব কি? সে যে আবার দরজা বন্ধ করল!

বয় আবার উপদেশ দিল : করুক দরজা বন্ধ। যা সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তা করবেই। তার প্রকৃতিই হচ্ছে এই। সে কোনো ব্যাপারে প্রতিশ্রুত হলে মনে করবেন যে, তা হবেই। আমাদের মতো নয় সে। সত্য তার কাছে সব সময়েই সত্য। হ্যাঁ!

সকলেই মাথা নাড়িয়া বয়ের মন্তব্যে সায় দিল · ঠিক বলেছে হ্যাঁ, একেবারে পাথরের রেখার মতোই ঠিক।

করিম চাচা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বলিল : হ্যাঁ, ছেলে যা বলেছে, তাতে আর ভুল নেই!

সরকার বলিল : বেশ, শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাবে। কিন্তু তবু ওর উপর নজর রাখতে হবে। বয়কে লক্ষ করিয়া বলিল : একটা লাঠি হাতে করে এখানে বসে থাকো। যদি কিছু অন্যরূপ হয়, আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেবে।

বয় লাঠি-হাতে যসিমের দরজায় পাহারায় বসিয়া রহিল। সকলেই একে একে চলিয়া গেল। সরকার বাড়ী গিয়া কর্ত্রীকে সংবাদ পাঠাইল যে, সবই তাঁর আদেশ মত ঠিক ঠিক করা হইয়াছে।

কর্ত্রী তাঁর রুমালে একটা গেরো দিয়া তার উপর কিছু ওডিকলম ছিটাইয়া দিলেন। মাঝে মাঝে তিনি রুমালের গন্ধ লইলেন। পরে ধীরে ধীরে একটুখানি চা পান করিলেন। তারপর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একঘণ্টা পরে যসিমের ঘরের দরজা হঠাৎ খুলিয়া গেল এবং যসিমকে বাহিরে আসিতে দেখা গেল। সে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত ছিল। দড়িতে বাঁধা অবস্থায় মুমু তার পিছনে পিছনে আসিতেছিল। বয় সরিয়া দাঁড়াইল। যসিম বাড়ীর সদর দরজার দিকে আগাইয়া গেল। প্রাঙ্গণে সমবেত ছোট ছোট ছেলেদের দল নীরবে তাহার গতি-ভঙ্গির দিকে তাকাইয়া রহিল। যসিম কিন্তু তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে রাস্তায় পা ফেলিয়াই টুপি মাথায় দিল। সরকার তাকে অনুসরণ করার জন্য ইঙ্গিতে বয়কে আদেশ করিল। বয় দূরে দূরে থাকিয়া অনুসরণ করিল। দেখিল, যসিম মুমুকে লইয়া একটা হোটেলে প্রবেশ করিতেছে। সে দূরে এক জায়গায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হোটেলের সকলেই যসিমকে ভালো করিয়া চিনিত। তার অঙ্গ-ভঙ্গির ইঙ্গিতগুলিও তাদের ভালো করিয়া জানা ছিল। যসিম হোটেলে প্রবেশ করিয়াই অঙ্গ-ভঙ্গিতে সুরুয়াসহ কিছু মাংস চাহিল। টেবিলের উপর বাহু রাখিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মুমু তার চেয়ারের পাশেই তার দিকে শান্তভাবে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হোটেলের চাকর সুরুয়াসহ কয়েকখণ্ড মাংস আনিয়া হাজির করিল যসিমের টেবিলে। সে রুটি টুকরা টুকরা করিয়া তাতে সুরুয়া মাখাইল, মাংসখণ্ডগুলি আরো ছোট ছোট করিয়া কাটিল। তারপর থালাটা মেঝের উপর রাখিল। মুমু সাগ্রহে তার স্বাভাবিক কায়দা-দোরস্ত ভঙ্গিতে খাইতে সুরু করলি। যসিম একদৃষ্টে তার খাওয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দু'ফোঁটা জল তার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল। এক ফোঁটা পড়িল মুমুর মুখের উপর, আরেক ফোঁটা থালায়। সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। থালার প্রায় অর্দ্ধেকটা মাংস ও সুরুয়াই মুমু সাবাড় করিয়া ফেলিল, তারপর ঠোঁট চাটিতে চাটিতে সরিয়া আসিল। যসিম উঠিয়া পড়িল। দাম চুকাইয়া দিয়া সে হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বয় গোপনে থাকিয়া আবার তার অনুসরণ করিল।

যসিম ধীরে ধীরে চলিতেছিল—তখনো মুমুর গলায় বাঁধা দড়িটা তার হাতে। রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া হঠাৎ সে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবিল। তারপর আবার দ্রুতপদে আগাইয়া চলিল। একটা ভাঙা বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ সে থামিল, দুইটা বড় বড় ইঁট কুড়াইয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চলিয়া সে গঙ্গার ধারে একটা ঘাটে পৌঁছিল। ঘাটে কয়েকটা ভাড়াটে ডিঙ্গি বাঁধা ছিল। একটা ডিঙ্গিতে সে মুমুসহ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং জোরে জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল। ডিঙ্গির অধিকারী তীরে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধ হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ডিঙ্গি ততক্ষণে প্রায় দু'শ গজ দূরে গভীর জলে চলিয়া গিয়াছে। বুড়া কিছুক্ষণ চীৎকার করিল, তারপর একবার বামহাতে, একবার ডানহাতে পিঠ চুলকাইয়া গজর গজর করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে হতাশভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যসিম দাঁড় টানিয়াই চলিল। এর যেন আর বিরাম নাই। ক্রমে কলিকাতা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নদীর উভয় তীরে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে কৃষকদের কুটীরও দু'একখানা করিয়া দেখা গেল। গ্রামের সুশীতল বায়ুর স্পর্শ লাগিয়া যসিমের শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। দাঁড় ফেলিয়া দিয়া সে মুমুর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। মুমু তার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া পাটাতনের উপর বসিয়াছিল। ডিঙ্গির তলাটা জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; ফলে দাঁড় ফেলিয়া দেওয়ায় ডিঙ্গির গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়া পড়িল।

যসিম একখানা হাত মুমুর পিঠে রাখিয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ সে মনের দ্বিধাভাব জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখে কেমন একপ্রকার কারুণ্য ও ক্রুদ্ধতা মিশ্রিত একটা অদ্ভুত ভাব ফুটিয়া

উঠিল। ইট দু'টা সে দড়ির একদিক দিয়া ভালো করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। দড়ির অপর প্রান্ত মুমুর গলার চারিদিকে জড়াইয়া একটা শক্ত গেরো দিল ; তারপর মুমুকে দুই হাতে উপরে তুলিয়া ধরিল, শেষবার তার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইল।... মুমুও তার প্রতিপালকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তাকাইয়া ছিল। কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা তার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। তখনো সে সানন্দে মৃদু মৃদু লেজ নাড়িতেছিল।... যসিম জোর করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিল। তারপর নদীগর্ভের দিকে তার হস্ত সঞ্চালন!... যসিম অবশ্য কিছুই শুনিতে পাইল না—নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে মুমুর চীৎকার-ধ্বনিও নয়, কিংবা তার পতনজনিত জলের সেই বিকট শব্দও নয়। তার কাছে দিবসের বিপুল কোলাহলও শব্দহীন, আর আমাদের কাছে রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতাও শব্দময়।....

সে যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি তখন নদীর উপর দিয়া দ্রুত ভাসিয়া আগাইয়া চলিয়াছে—কতকগুলি তরঙ্গ আসিয়া মাত্র ডিঙ্গির গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।....

ওদিকে বয়টা যসিমের ডিঙ্গির অনুসরণে কিছুদূর যাওয়ার পর বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল। সরকারের কাছে আসিয়া সে তার অনুসরণ-কাহিনী খুব দম্ভ করিয়া বিবৃত করিল। পরে বলিল : যসিম ওটাকে ঠিক ডুবিয়ে মারবে। কোনো চিন্তা নেই। কোনো বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলে সে....ইত্যাদি ইত্যাদি!

সেদিন দিবাভাগে যসিমকে কেহ দেখিতে পাইল না। খাওয়ার সময়েও তাহাকে দেখা গেল না। রাত্রির আহারের সময়েও সকলে একত্র হইয়া আহার করিল, কিন্তু যসিম তাদের দলে ছিল না।

একজন পরিচারিকা বলিল : কী অদ্ভুত লোক এই যসিম!... আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি, কুকুরটার শোকে সে পাগল হয়ে গেছে!

বয় হঠাৎ চীৎকার করে উঠিল : যসিমকে আমি কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে! সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল : কখন? কতক্ষণ আগে?

—কেন, এইতো মাত্র ঘণ্টা দুই আগে! দরজায় তার সাথে আমার প্রায় ধাক্কা লেগেছিল আর কি! বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। কুকুরটা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু বাপরে! তার মুখের যা চেহারা দেখলুম! কাজেই সাহস হোলো না। ধাক্কা দিয়ে সে আমায় সরিয়ে দিল। অবিশ্যি আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে ধাক্কা দেয় নি—তার উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন তার চলায় পথ থেকে সরে দাঁড়াই। কিন্তু তার সে মৃদু ধাক্কাই আমাকে যা কাহিল করেছে। বয় হাসি দমন করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে সে একবার নিজের মাথার পিছন দিকে হাত বুলাইয়া লইল। বলিল : হাঁ, তার একখানা হাত আছে বটে! তাকে মুগুর বললেই হয়।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। পরে আহার-শেষে যে যার বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল।

ঠিক সেই সময়ে ব্যাগ-কাঁধে লাঠি হাতে এক বিরাট মূর্ত্তি দূরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বাহিয়া দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতেছিল। এ যসিম। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিবারও যেন তার অবসর ছিল না। শহর-বাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আজ সে মনের দিক দিয়া সর্ব্বরকমে রিক্ত—তাই আপন বাসভূমির শান্তশীতল আশ্রয় তাকে এমন তীব্রভাবে আকর্ষণ করিতেছিল যে, চুম্বক-আকৃষ্টের ন্যায় তার গতি ছিল দুর্নিবার।

মুমুকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াই সে দ্রুত নিজের কক্ষে চলিয়া আসিয়াছিল। যা-কিছু নিজস্ব জিনিষ-পত্র ছিল, তাড়াতাড়ি একত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া লইয়া সে এ-বাড়ী হইতে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইল। এ বাড়ী তার মনে বড় দাগা হানিয়াছিল। পুঁট্‌লিটা কাঁধে ফেলিয়া সে রওয়ানা হইয়া পড়িল। তাকে যখন কলিকাতায় প্রথম আনা হয়, তখনই সে ভালো করিয়া রাস্তা চিনিয়া রাখিয়াছিল। বড় রাস্তা হইতে তার গ্রামের দূরত্ব ছিল পঁচিশ মাইল।

সে রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিল। তার মুখভাবে ছিল একটা বেপরোয়া ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দ-দীপ্তি। খাঁচার আবদ্ধ পাখী যেন ছাড়া পাইয়াছে! তার চোখ ছিল সম্মুখ পানে দৃঢ়নিবদ্ধ। ক্রমেই তার গতি দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল—যেন বহুদিনের প্রতীক্ষমানা তার বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেন দূর হইতে মা তার আহ্বান করিতেছে: আয় বাছা, শীগ্‌গির আয়!

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দূর দিকচক্রবাল অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিপাতে রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছিল—অপর দিকে রাত্রির কৃষ্ণ যবনিকা ক্রমে প্রসারিত হইতেছিল। চারিদিক হইতে নানা বিচিত্র ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বায়ুর সংঘর্ষে ধানশীষে নানা সঙ্গীতধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছিল।...যসিমের অবশ্য এ-সব শ্রুতিগোচর হওয়ার কথা নয়, কিন্তু পাকা ধানের মধুর গন্ধে তার নাসারন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—বাতাস যেন অতি প্রিয়জনের স্পর্শ তার মুখে বুলাইয়া দিতেছিল।...এইবার বড় রাস্তা ছাড়িয়া সে বাড়ীর ছোট রাস্তা ধরিল। আকাশের অনন্ত তারকা যেন মিটি মিটি আলোতে তাকে পথ দেখাইয়া দিতেছিল।...

পরদিন সে বাড়ী পৌঁছিল। তাকে দেখিয়া গ্রামের সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তার নাম তারা খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিল।...বাড়ীতে পৌঁছিয়াই সে গিয়া দেখা করিল গ্রামের মাতব্বরের সাথে। মাতব্বর সাহেব প্রথমে তাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু তখন ধানকাটা আরম্ভ হইয়া গেছে—আর যসিম একজন ধানকাটার পাকা ওস্তাদ। তৎক্ষণাৎ তাকে একখানা কাস্তে দেওয়া হইল। সে আগের মতোই আবার ধান কাটিতে গেল। এ কাজে তার যে নৈপুণ্য দেখা গেল, তাহাতে গ্রামের সকলে বিস্মিত না হইয়া পারিল না।

এদিকে যসিমের পলায়নের পরদিন বালীগঞ্জের বাড়ীতে তার জন্য একটা খোঁজ-খোঁজ সাড়া পড়িয়া গেল। চাকরেরা সকলে মিলিয়া তার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—এদিক-দিকও অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু যসিমের কোন খবর মিলিল না। অগত্যা সকলে গিয়া এ-সংবাদ বাড়ীর সরকারকে জানাইল। সরকারও আসিয়া অনেকক্ষণ খোঁজ করিল। কিন্তু যসিম কোথায় যে তার সন্ধান মিলিবে! সরকার অবশেষে কাঁধ কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য করিল :—হয় বোবাটা পালিয়ে গেছে, নয়ত সেই কুকুরটার সঙ্গে সে-ও ডুবে মরেছে! পুলিসে খবর দেওয়া হইল। কর্ত্রীও এ-সংবাদ জানিতে পারিলেন। শুনিয়া তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—রাগে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন : আমি তো কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হুকুম দেইনি। আদেশ দিলেন : যেখানে পাও, ওকে খুঁজে নিয়ে এসো। অকারণে তিনি এমন ধমক দিলেন যে, বেচারা সারাদিন কিছুই বলিতে পারিল না।

অবশেষে দেশ হইতে যসিমের খবর আসিলে কর্ত্রী অনেকটা শান্ত হইলেন। প্রথমতঃ যসিমকে অবিলম্বে ফিরিয়া আসিতে এক পরোয়ানা পাঠাইলেন। কিন্তু পরোয়ানা অনুযায়ী সে ফিরিয়া না আসায় তিনি ঘোষণা করিলেন—এমন অকৃতজ্ঞ জীবের তাঁর দরকার নাই।

এর অল্পদিন পরেই স্বয়ং কর্ত্রী মরিয়া গেলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের যসিম সম্বন্ধে কোনরূপ মাথাব্যথা ছিল না। কাজেই যসিমের কথা এবাড়ীর সকলেই ক্রমে ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল।

তা' হোক। যসিম কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছে। একা সে এক কুটিরে থাকে। আগেকার মতোই শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান। এবং একাই সে এখনো চারজনের কাজ করিয়া থাকে। তার প্রতিবেশীরা বলে—কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর সে মেয়েলোকের ছায়া মাড়াইতে চায় না। শুধু তা-ই নয়, তাদের দিকে সে ভুলিয়াও তাকায় না। এ ছাড়া, মুমুর খবর সে রাখে না। লোকে বলে : মেয়েলোকের সাহায্য ছাড়াই যে তার চলিয়া যাইতেছে এ-টা তার পরম ভাগ্য। আর মুমুর সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, মুমুকে দিয়া সে কী করিবে? কারণ চোর কখনো তার বাড়ীতে বাক্স ভাঙার সাহস করিবে না।

বোবার আসুরিক শক্তির এত খ্যাতি দেশে!

(১৩৪৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।)

যুবক মো'মেনের জবানবন্দী*

মাহ্‌বুব-উল আলম

(প্রথম দিন)

আমাব মাতামহীর মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর পাড়ায় এমন একজন লোক রহিল না যাঁহাকে দেখিয়া মনে হইবে--অজর অমর! সেই কতকাল হইতে বাঁচিতেছেন, আমাদের পরেও যে আরো কতকাল বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার ঠিক নাই। তাঁহার যে-মূর্ত্তি আমার চোখে ভাসে তাহা যেমনি অজর অমর, তেমনি নামাজ-রতা। এ-মূর্ত্তি আমার মনে এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বেহেশ্‌তে বসিয়া আমার মাতামহী এ মুহূর্ত্তে কি করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে জবাব দিব যে তিনি নামাজ পড়িতেছেন। শুধু তাই নয়, অনন্ত কাল ধরিয়া নামাজ পড়িতে পাইলেও যে উহাতে তাঁহার কখনও বিরক্তি ধরিবে, এরূপ আমার মনে হয় না। একমাত্র আর একজন সম্বন্ধে আমার ধারণা এরূপ। তিনি আমার মাতামহীর মেয়ে--আমার মা।

মাতামহীর দৌহিত্র, মায়ের ছেলে, আর একজনের আর-কিছু এবং আমার আমি হইয়া দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। ভরা যৌবনে একদিন এক সরকারী ঘোষণা সকলকে জানাইয়া দিল যে আমি কাহারও কিছু নহি, শুধু মাত্র সরকারের নোকর। ঘোষণায় বাবার নামের উল্লেখ থাকিল বটে, কিন্তু উল্লেখ থাকিল না সে-জায়গার, যাহাকে ব্যাপিয়া আমি বড় হইলাম; আর লেখা থাকিল না যে আমি মাতামহীর দৌহিত্র, মায়ের ছেলে, আর একজনের অনেক-কিছু এবং আমার একান্ত আমিটী। প্রথম কর্ম্মস্থলে প্রস্থানের প্রাক্কালে সেদিন বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়াইয়া মাতামহী তাঁহার দৌহিত্রকে এবং মা তাঁহার ছেলেকে খুঁজিয়া পাইতেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি যে আমার আমিকে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, তাহা ঠিক। কারণ, সরকারী কলমের এক আঁচড়েই আমি রাতারাতি হইয়া গিয়াছিলাম মৌলবী, আর দীর্ঘ একযুগ struggle করিয়াও এই মৌলবী-আমির সহিত আমি নিজের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি নাই। পারিলে এতদিনে একটা মওলানাগিরি--চাই কি, একটা শম্‌সুল-ওলামাগিরি কি আমার জুটিত না!

এই statutory মৌলবীগিরিতে পাঠাইবার পূর্ব্বে বাবা একটা পারিবারিক কন্‌ফারেন্স ডাকাইলেন। ইহাতে ডুবুরী বর্ম্মের ন্যায় মুরুব্বীরা আমার জন্য বর্ম্ম ঠিক করিলেন--নামাজ। তাহা হইলে লোকনিন্দার হাঙ্গর-কুমীরের আর ভয় থাকিবে না! আর মাতামহী ও মা যোগ করিয়া দিলেন ঃ "ইহাতে আল্লা রাজী থাকেন, শরীর ও মন ভাল থাকে, রাজী বরকৎ হয়" ইত্যাদি। পোষাকের প্রশ্নও উঠিল। আমি লুঙ্গী পরিতে পাইলে আর কিছুই চাহি না। কারণ, বেহেশ্‌তে এত সব দুধের ও শরবতের নদী থাকিতে শেষ পর্য্যন্ত এই লুঙ্গী ছাড়া পায়জামা যে আমাদের কি কাজে লাগিবে, তাহা আমি কোনদিনই বুঝিতে পারি নাই, আর পারাপারের কস্‌রৎ শিখার জন্য নদী-মাতৃক বাংলা দেশেই কি আল্লা আমাদিগকে পয়দা করেন নাই? লুঙ্গ ি আমি পাশ্‌ করাইয়া নিলাম। অবশ্য এই লুঙ্গী রক্ষা করিতে গিয়া বারবারই আমাকে বর্ম্মা দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে, যেখানে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত লুঙ্গী ব্যবহার করিলে সরকার কি জন-অসাধারণ কেউ টুঁ শব্দটী করেন না। যাহা হউক, মৌলবীত্বের নিদর্শন স্বরূপ বাবা আচ্‌কান চাপাইলেন, পাগড়ীও চাপাইতে চাহিলেন, কিন্তু পাছে কেহ কোন ফৎওয়া চাহিয়া বসে, এই ভয়ে আমি উহাতে অসম্মত হইলাম। শিরোভূষণ লইয়া কোন মীমাংসাই হইল না। শুধু সেই আর একজন আড়ালে ডাকাইয়া জানাইলেন যে তাঁহার ইচ্ছা আমি তাজ টুপী পরি। * * * * সেই হইতে উভয়ের মাঝখান দিয়া দীর্ঘ একটা যুগ কাল-স্রোতে লীন হইয়া গিয়াছে। তাজ-টুপীর সংজ্ঞা আজও তেমনি অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে--যেমনটী ছিল

---

*প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলিতে ছিল বালক ও কিশোর মো'মেনের জবানবন্দী। এই সংখ্যায় পাবেন যুবক ও প্রৌঢ় মো'মেনকে।

সে দিন; আর নির্দ্দিষ্ট হইলেও যে-সকল নবীন অতিথি তাঁহার কোল আলো করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের কচি মাথা ছাড়িয়া আমার এই কাঁচা-পাকা মাথায় যে তিনি উহা চড়াইতে চাহিবেন, তাহা ত মনে হয় না। তাজ-টুপী হইতেছে কিশোরী-মনের স্বপ্নসাধ, মাতৃত্বের এপারে পৌছিয়া যাহার অনেকখানিই তাহার মনে হয় যেমনি অর্থহীন তেমনি হাস্যকর। জীবনটাই এই। * * * * আজ এই 'কামাল পাশা', এই 'আমানুল্লাহ', এই লক্ষ্ণৌবী, এই দেহ্লভী টুপী পরিয়া আমার দিন কাটিতেছে। শুধু পরি না, 'তুর্কী টুপী'--অর্থাৎ ইটালীয়ান ফেজ্। কারণ, ইহার আব্দার এত বেশী যে বুড়া হইয়া আফিম ধরিবার পূর্ব্বে উহা পূর্ণ করিতে পারিব, এরূপ মনে হয় না।

নামাজের জন্য তাকিদ্ আমার জীবনে এই প্রথম নয়। প্রথম তাকিদ্ অবশ্য আসিয়াছিল আমার মাতামহী হইতে, যাঁহার বাস্তু-ভিটায় আমার জন্ম হইয়াছিল। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বড় হইতেছিলাম--আমি ও বালি। আমি ছিলাম মায়ের ছেলে, আর বালি ছিল একটী কুকুর-ছানা। নানী যখন প্রশান্ত মনে 'তস্‌বিহ্' জপিতেন, তখন আমি ও বালি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া খেলা করিতাম। তখন নানীর চোখে কেহ উঁকি মারিয়া দেখিলে দেখিতে পাইত যে, সে-চোখে আমার জন্য যতটা মায়া ভারে ভারে সঞ্চিত ছিল, বালির জন্য উহা হইতে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। কারণ, বালির মা ছিল না। মাতামহী বাস্তু-ভিটায় জন্মের পর বালির চোখ ফুটিতে না ফুটিতেই তাহার মা যে কোথায় পলাইয়া গিয়াছিল, সে-খবর কেহ রাখিত না। তারপর মাতামহীর হাতে খাইয়াই সে বড় হইতেছিল। তাহার কুকুরী-মায়ের জন্য সে যে কোন অভাব বোধ করিত, তাহা নয়। কারণ মাতামহীর হাতে খাইয়া এবং আমার সহিত খেলিয়া বালি প্রায় মানুষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সাম্নের দুই পা ধরিয়া উঁচু করিয়া তাহার চোখে চোখে যখন চাহিতাম, তখন মনে হইতে, মানুষেরই যত কথা তাহার স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখদুটির গভীর তলে প্রকাশের অপেক্ষায় আকুলি-বিকুলি করিতেছে --আর এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে হয়ত; উহা ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। আশা হইত, সেদিন বালি মানুষ হইয়া আমার সহিত লাটিম ঘুরাইবে।

কিন্তু, এমন যে বালি, তাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না এক জায়গায়। সেটি ঘরের সেই নির্দ্দিষ্ট কোণটি, যেখানে মাতামহী নামাজ পড়িতেন। অথচ সে-স্থানটুকু সর্ব্বক্ষণ এমন লেপিয়া-পুঁছিয়া চক্‌চকে রাখা হইত যে শিশুর দুই জোড়া উজ্জ্বল চোখ মুখে ধরিয়া আমি ও বালি কিছুতেই উহার লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ মাতামহীকে ঘেরিয়া লুকোচুরি খেলাই ছিল আমাদের খেলার আরম্ভ। এদিকে দিনের মধ্যে এত অধিকবার ও অধিকক্ষণ মাতামহী তাঁহার শুচি-শুভ্র কপালের রেখাগুলিতে একটা ইঙ্গিত জাগাইয়া নামাজ ও কোরাণ-শরীফ পাঠে রত থাকিতেন যে, 'স্থান-মাহাত্ম্য' মান্য করিলে আমাদের খেলা মাঠে মারা যাইবার কথা ছিল। অথচ এই খেলা ছাড়া আমাদের না ছিল খাওয়া পরার চিন্তা, না ছিল অন্য কোন কাজ। অবশেষে মাতামহী আমাদের জন্য শাসন-দণ্ড হাতে করিলেন। একখানি বাঁশের কঞ্চি সঞ্চালনের উপযোগী বেশ মোলায়েম করিয়া লইয়া জায়-নামাজের পাশে উহাকে বেড়ায় পুঁতিয়া রাখার ব্যবস্থা করিলেন। বালি সীমা-লঙ্ঘন করিলেই তাহার পিঠে কঞ্চি-প্রয়োগ হইতে লাগিল। আর মাতামহী যেখানেই যান, তাঁহার পীঁড়ি মাথায় করিয়া পেছন পেছন অনুগমন--যাহা পা দু'খানি শক্ত হওয়ার পর হইতেই আমি করিয়া আসিতেছিলাম--উহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করার ভয় দেখান হইতে লাগিল। বালির পিঠে কঞ্চি-প্রয়োগ আমার চোখে যেমনি জল আনিয়া দিত সমবেদনার, পীঁড়ি-বহনের অধিকার-লোপ তেমনি সে চোখে জল আনিয়া দিত অভিমানের। ফলে, নমাজের জায়গা মাড়ান আমাদিগকে ছাড়িতে হইল। ততদিনে মাতামহীর কপালের কুঞ্চনগুলিতে ঐ যে ইঙ্গিত জাগে, উহা আমার নিকট কৌতুকাবহ হইয়া উঠিল! তখন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বসিয়া সে ইঙ্গিতগুলিকে পাহারা দেওয়াই হইল আমার কাজ। মনে হইত, মাতামহীর সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঙ্গিতগুলিও বিভিন্ন-ভঙ্গীতে খোদার নিকট ফরয়াদ করিয়া যাইতেছে। আর বালি ততক্ষণ আমার পাশে বসিয়া ঘন ঘন লেজ নাড়িত, মুখে-চোখে এমন একটা উৎসুক তৎপরতার ভাব জাগাইয়া তুলিত, আর মাতামহীর কোরাণ-শরীফের প্রত্যেক পাতা উল্টানে চোখ-কান এমন খাড়া করিয়া তুলিত যে, দেখিয়া মনে হইত, যেন সেও ঐ ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝিতেছে--আর অধিকার পাইলে সেও এমন দুই দশ পাতা অনায়াসে উল্টাইতে পারে! কিন্তু এই নীরব সাধনা অধিক দিন আমাদিগকে করিতে হইল না। একদল বালিকা ও একটা কিশোরী আসিয়া শুধু তাহাদিগকেই আমাদের খেলার কেন্দ্র হইতে দিল তা নয়, আমাদিগকে কেন্দ্র করিয়াও নিজেরা অনেক খেলা শুরু করিয়া দিল।

এই দল আসিত মাতামহীর নিকট নামাজ শিখিতে। কাহারও বিবাহ হইয়াছে, অনেকেরই হবু হবু। নমাজ গেরস্থের মেয়েরা

সব সময়ে যে পড়িতেন, তা নয়। কিন্তু বিবাহের পরে নামাজ জানা আছে কি না, তাহার পরীক্ষা হইত। উহাতে ফেল হইলে মা-বাপের ও পাড়া-পড়শীর কলঙ্ক হইত। আর উহা শিখিতে হইত। পাড়ায় মাতামহী ছিলেন এ সকলের শিক্ষয়িত্রী......

নামাজ আর সারাদিন শেখান হইত না। কিন্তু মেয়েগুলি থাকিত সারাদিন। তাহারা নামাজ শিখিত, মাতামহীর ঘর লেপিয়া দিত, উঠানে ঝাঁট দিত এবং আরো অনেক-কিছু করিত। আর সব কিছুরই মাঝে আমার ও বালির নানারূপ খেলা দেখিয়া নামাজের মধ্যে থাকিলে মুচ্‌কিয়া হাসিত--আর অন্য সময় হইলে একেবারে হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িত। ইহা এমন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইল যে, ক্রমে দু'পক্ষই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। অর্থাৎ আমি ও বালি খেলা না করিলে যেমন তাহাদের ভাল লাগিত না, সেরূপ খেলার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলিয়া তাহাদের কৌতুক-ভরা চাহনীর বাহ্‌বা না পাইলে আমাদের খেলাও ভাল জমিত না। এরূপে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল, মাতামহী তাঁহার জায়-নামাজ ও কোরাণ শরীফ লইয়া উহার বাহিরে পড়িয়া রহিলেন--আর কৈশোরের ইঙ্গিতময় রূপ ও দেহ-ভঙ্গী লইয়া সেই কিশোরীটি তাঁহার স্থানে আসনগ্রহণ করিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আমি ও বালি কত খেলাই খেলিলাম! আর পরিণামে ইহারই সহিত পুঁথির রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমি একদিন প্রচণ্ড শক্তিতে জাগিয়া উঠিলাম--আমি পুরুষ!...

কিন্তু, জায়-নামাজ ও কোরাণ শরীফের আওতার বাহিরে বেশীদিন টেকা গেল না। বালি হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল এবং আমাকে অপেক্ষা করিতে দিয়া তাহার জাতের ভাইদের সাথে সাথে, বিশেষ করিয়া বোনদের পেছনে পেছনে, ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। তাহার বন্ধু ও বান্ধবীতে এবং উপ-বন্ধু ও উপ-বান্ধবীতে বাড়ী পুরিয়া গেল। আর এদিকে আমি জ্বরে শয্যাগত হইয়া মাতামহীর কন্থার তলে আশ্রয় লইলাম। তিনি সেবা-যত্নে যেমনি তুলিলেন আমাকে বাঁচাইয়া, তেম্‌নি মৌলবীর ছেলে, মৌলবীর ভাই-পো, মৌলবীর পৌত্র ও মৌলবীর দৌহিত্র এবং বংশ পরম্পরায় বহু মৌলবীর উত্তর-পুরুষ হিসাবে আমার যে নামাজ শিখার ও পড়ার বয়স হইয়াছে, এই এক নূতন বিশ্বাসও তুলিলেন আমার মনে দৃঢ় করিয়া। ভাল হইয়াই নামাজ ধরিলাম --জীবনে এই প্রথম।

কিন্তু, ঘটনার কোঠায় জ্বর যতই পুরাণ হইয়া উঠিল, মাতামহীর উপদেশের প্রতি আর্ত্তভক্তির ডোরও ততই শিথিল হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিনের এক ঘটনায় তাঁহারই কারণে আমি নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসিলাম এবং বিদ্রোহের প্রথম চিহ্ন স্বরূপ নামাজ পড়া ছাড়িয়া দিলাম--যে নামাজ পড়ার দরুণ তিনি ইদানীং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন। সে ঘটনাটি এইরূপ ঃ

পাড়ায় আধমাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে নয়খানি মস্‌জিদ ছিল। বারখানিই হওয়ার কথা। কিন্তু, পূর্ব্ব প্রান্তে বসতি না থাকায় কোন মস্‌জিদ নাই। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীরই নিজের মস্‌জিদ আছে। শুধু, আমরা সবে মাত্র দু'পুরুষ এ-পাড়ায় আছি বলিয়া আমাদের নিজের মস্‌জিদ নাই। অবশ্য, পূর্ব্ব প্রান্তে বসতি না থাকিলেও মাঠের মাঝখানে একখানি ঘর উঠাইয়া আমরা মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি। কিন্তু নিজের মস্‌জিদ না থাকাতে প্রত্যেক মস্‌জিদ হইতেই আমাদিগকে উহার জমা'ৎ ভুক্ত করার জন্য যে চেষ্টা চরিত্র করা হয়, উহাতে পাড়ায় আমাদের একটা বিশিষ্ট ভারিকি বজায় থাকে। আর মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় করিয়া শুক্রবারে জুমা'র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নামাজী খুঁজিয়া বেড়ান অপেক্ষা সে পুণ্যকে অপেক্ষা করিতে দিয়া শুক্রবারে এর ওর মস্‌জিদে নমাজ পড়িয়া প্রতিষ্ঠাতা-মহলে কৃপাবিতরণই আমার মতে বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য লোকের মত ইহার উল্টা। ইহা যে কত প্রচণ্ড রকম উল্টা, সেটা জানিবার সুযোগ হইয়াছিল একটি সভায়--যেখানে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ আছে সেখানে একটিকে জামে মস্‌জিদে পরিণত করিয়া অপর গুলিকে এবাদৎ-খানায় পরিণত করার পরামর্শ দিয়া। জনতার জানাইল যে আমি সৌভাগ্যশালী, কেননা আমার অঞ্চলে এতগুলি মস্‌জিদ আছে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কল্পনা-নেত্রে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আরো কতকাল লাগিবে-- বর্ত্তমান গতিতে তাহাদের অঞ্চলের অনুরূপ সৌভাগ্য পৌছিতে!

কিন্তু বেশী মস্‌জিদের দেশের লোক বলিয়া মস্‌জিদ-প্রতিষ্ঠার পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভের পেছনে কতখানি দীনতা লুকাইয়া থাকে, তাহা আমার চোখে প্রকট হইয়া উঠে মস্‌জিদগুলির সঙ্কীর্ণ আয়তন, শীর্ণ দেহ, শুক্রবারের এক এক গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জমাৎ, উহার ক্ষুদ্রতর ইমাম, অনুবারে আজানের বন্দোবস্তের অভাব প্রভৃতি দেখিয়া। আর নিজের বাড়ীর দরজায় এম্‌নি এক হতভাগ্য মসজিদ থাকায় মাতামহী যেমন প্রাণে বড় বেদনা অনুভব করিতেন, তেমন উহার নিত্য-ক্রিয়াগুলি ঠিক রাখার

জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। একদিন তিনি এই চেষ্টায় আমাকেও করিলেন অংশী।

সেদিন মাতামহীর সমস্যা ছিল ভোরের আজান কাহাকে দিয়া দেওয়াইবেন। অন্যান্য দিন একে ওকে পাওয়া যাইত। কিন্তু এই দিনে মাতামহীর সব টার্গেটই ফস্‌কাইয়া গেল। অথচ বাড়ীর দরজার মস্‌জিদখানিতে ভোরের আজানটিও যদি অন্ততঃ পক্ষে না পড়ে, তাহা হইলে মস্‌জিদের শাপে এ-বাড়ীর কপালে যে কি অঘটনই ঘটে, তাহা ভাবিয়া ভোর না হইতেই মাতামহীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার কম্বলের তলেই একটা ন্যাটা-ছেলে ঘুমাইয়া আছে এবং সে ইদানীং বালির সহিত বেশী মাখামাখি করে না, ইহা বোধ হয় তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। তিনি আমাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া ফেলিলেন এবং অতখানি শীতের মধ্যেই আমাকে অজু করাইয়া দিলেন। তারপর আমাকে লইয়া চলিলেন মস্‌জিদের দরজায় আজান দিতে -সে আজান শুনিয়া লোকে নামাজ পড়িতে আসিবে সে আশায় নহে, কিন্তু আজান না পড়িলে মস্‌জিদের অধীশ্বর ক্রুদ্ধ হইবেন, সে আশঙ্কায়।

মাতামহী বলিয়া দিতেছেন পেছনে থাকিয়া, আর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমি প্রাণপণে চেঁচাইয়া তাহা আওড়াইতেছি। একে মাতামহীর দাঁত নাই, তার উপর প্রচণ্ড শীতের ভোর-সকাল। তাঁহার মুখ দিয়া সব কথা ভাল বাহির হইতেছে না। যাহাও হইতেছে, শীতের কাঁপুনি উহার সহিত মিশিয়া এমন জগা-খিচুড়ী পাকাইতেছে যে নিতান্ত তাঁহার দৌহিত্র না হইলে অন্য লোকের পক্ষে তাহার মর্ম্মোদ্ধারই দায়। ওদিকে আমার প্রচণ্ড চেঁচানোর মাঝেও তাঁহার অনেক কথা ডুবিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমি আওড়াইতেছি, আর এক একবার পেছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেছি ঃ "নানী তারপর কি?" নানীর সহিত কথা কহিতে হইলে জোরে চেঁচানই আমার অভ্যাস। নতুবা বুড়া মানুষ চট্ করিয়া সবকথা বুঝিতে পারেন না। ফলে এ-জিজ্ঞাসাও এত উঁচু গলায় হইতেছে যে কাছে লোক থাকিলে আজানের ফাঁকে ফাঁকে এই "নানী, তারপর কি?" ও শুনিতে পাইত।

একজন সত্যই ইহা শুনিয়াছিল। সে পাশের বাড়ীর এয়ার আলী। এয়ার আলী বর্ম্মার চিফ সেক্রেটারীর পেয়াদাগিরি করিয়া পেন্সন নিয়াছিল। এখন বসিয়া বসিয়া পেন্সন খায়, আর পাড়ায় হাসি-মশ্‌কারার যাহাই যেখানে দেখিতে পায়, লোকের বাড়ী বাড়ী তাহাই ফিরি করিয়া বেড়ায়। সেদিন কম্বার তলে থাকিয়া প্রথম "নানী, তারপর কি?" শুনিতেই সে বিছানা ছাড়িয়া আসিয়াছিল এবং close range-এ তাহার হাসি-মশ্‌কারার ভাবী টার্গেট আমাকে ঠাহর করিয়াছিল। তারপর সুযোগ বুঝিয়া অনেক ছেলে-বুড়ার মাঝখানে যখন "নানী, তারপর কী?" বলিয়া ভাষ্যসমেত সে তাহার ঠাট্টার অভিধান খুলিয়া বসিল, লজ্জায় ও অপমানে আমার কানের গোড়াসুদ্ধ লাল হইয়া গেল। কিন্তু, পলাইবার পথ পাইলাম বিলম্বে- যেহেতু ছেলে বুড়া সকলেই তখন হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছিল। এম্‌নি সংক্রামক ছিল এয়ার আলীর মুখের laughing gas! এদিকে বাড়ী পৌঁছিয়াই মাতামহীর উপর আমার সে কি চোট্‌পাট্।

হেস্ত নেস্ত সহজে হইল না। মাতামহী যতই চাহেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে, আমি মরিয়া ঘোড়ার ন্যায় ততই বাঁকিয়া বসি। অবশেষে যখন চরম বাঁকিয়া বসিলাম, তখন রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত হইয়াছে। বাহিরে অন্ধকার জমাট। বড় বড় গাছের বিদ্‌ঘুটে ছায়াগুলি উহার মধ্যে যেন কাহাকে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। এতদিন মনে হইত, তাহারা বুঝি আমারই মত ছোট ছোট ছেলেকে খুঁজিয়া বেড়ায়--রাত্রির অন্ধকারে কোন গুপ্ত কক্ষে নিয়া তাহাদের ঘাড় মট্‌কাইবার জন্য। আর ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। কিন্তু, আজ? আজ রাগের মাথায় মনে হইল, যে-কোন সাহসী ছেলেই এক ফুৎকারে ইহাদের গত গোপন কানাকানির কণ্ঠরোধ করিতে পারে। আর মাতামহীর শীর্ণ হস্তের বাঁধনকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে একাকী নিজের বাড়ী চলিয়া আসিলাম। মাঝখানে রাস্তার তেমাথায় একটা ত্রিকোণ ভূমির উপর ছোট্ট একটি বেত-ঝাড়কে কেন্দ্র করিয়া বহু ভূত-প্রেতের কাহিনী পাড়াময় প্রচারিত হইত। নিশুতি রাতে নাকি সে ঝাড় হইতে লাঙ্গুলহীন ঘোড়া ও মস্তকহীন উহার আরোহী বাহির হইয়া তিন দিকের রাস্তাতেই রোঁদ দিয়া বেড়ায়। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ইহাদের প্রতীক্ষা করিলাম। ঝাড়টীর নিকটে পৌঁছিয়া অভিভূতের মত উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম--কিছুই নাই। শুধু বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গুম্ হইয়া আছে।

এই ঘটনা বাড়ীর সকলকে জানাইয়া দিল যে আমি সাহসী ছেলে। ইহারও অধিক আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম, ছোট

হইলেও সাহসে আমি বাবার চাইতে কম নই। কারণ, সাহসিকতায় বাবাই ছিলেন পাড়ার সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমার এই উপলব্ধি কাজে লাগিল--যখন আমি ক্রীড়াময় জগতের মাতব্বর সভ্য তখন। সে-সময় প্রতি রাত্রে 'খোন্‌কান্নীর মাঠে' কপাটি না খেলিলে আমাদের ভাত হজম হইত না, চোখে ঘুম আসিত না। আর এই 'খোন্‌কান্নীর মাঠ' আমাদের বাড়ী হইতে যেমনি দূর, তেমনি বাঁশ-ঝোপের ভিতর দিয়া, গোরস্থানের পাশ দিয়া, পাহাড়ী স্রোতের হাঁটু-জল ভাঙ্গিয়া এবং লোকের বাড়ীর গড়-খাই ডিঙ্গাইয়া আমাকে সেখানে পৌঁছিতে হইত। এই সময় বালি আমার কাছে থাকিলে দেখিতে পাইত যে অন্ধকার পথে তাহার বাল্য-সহচরের চোখ দিয়া ঠিক তেম্‌নি জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে, যেম্‌নি তাহার নিজের চোখে দিয়া বাহির হয়।

অন্ধকারের ভয়টা আমার নিকট কিছুই নহে। কিন্তু, মানুষের আস্তিকতার মূলে এই ভয়টাও যে রহিয়াছে এবং অনেকের পক্ষে এই ভয়টাই যে যথা-সর্ব্বস্ব, উত্তরকালে সুধীর ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। সুধীর ভগবান মানিত না। দর্শন-শাস্ত্রে এম. এ. পড়ার সময় বন্ধে যে বাড়ী আসিয়া ভগবানের অস্তিত্ব লইয়া আমার সহিত ভয়ানক তর্ক শুরু করিয়া দিয়াছিল এবং সে-তর্কে জিতিবার ঝোঁকে আমি এত অধিক যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছিলাম যে তর্কের শেষে দেখিতে পাইলাম, আমি একেবারে রিক্ত হইয়া গিয়াছি। যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, উহার একটিও আর আমার মনে ধরিতেছে না। সুধীরের সবল মনের ধাক্কা খাইয়া যেন আমার নূতন চেতনা লাভ হইয়াছে, আর মনে একটা প্রশ্ন উত্তর খুঁজিয়া মাথা কুটিতেছে-- "ভগবান নাই, উহা মানব-মনের প্রকাণ্ড একটা ভয় মাত্র! সত্যই কি তাই?"

ইমানের ভিত্তিতে যাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, মনের এই দ্বিধা তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীকে কাড়িয়া নিয়া তাহাকে যে এক নিমেষে কতখানি নিঃস্ব করিয়া ফেলে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। দুঃখে 'আল্লা' বলিতে পারিব না, আকাশের পানে প্রার্থনার যুক্তকর কখনই তুলিতে পারিব না, জীবনের প্রতি পদক্ষেপকেই মনে করিতে হইবে নিতান্ত অহেতুকী--জীবনের স্বাদ থাকিল কোথায়? ছয়টি মাস এই বিস্বাদ জীবন আমি কাটাইলাম। ইহার মধ্যে যদি কাহাকেও আমি খুন করিতাম, নিজেকে উহার জন্য আমি দায়ী মনে করিতাম না। এই ছয়টি মাস self-criticism-এর আমি কোন প্রয়োজন অনুভব করিলাম না যে self-criticism আমার ভিতরের মানুষটিকে শানিত অস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ ও ধারাল করিয়া রাখে। অথবা আমার যে সূক্ষ্ম একটি ভিতরের আমি আছে, সে-কথাই আমাকে ভুলিতে হইয়াছিল। জীবনে এই একমাত্র নিঃস্বতা আমি অনুভব করিয়াছি।***

ছয় মাসের পর আমার মুক্তি হইল- ইমাম গজ্জালীর 'সৌভাগ্য-স্পর্শমনি' পড়িয়া। জীবনে যত গ্রন্থ পড়িয়াছি, তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে এইখানিই শ্রেষ্ঠ; আর একখানি মহাগ্রন্থ রাতদিন আমার সম্মুখে খোলা থাকে। উহা উপরের ঐ অনন্ত আকাশ। মনে যখনই ব্যথা পাই, যখনই কোন বিপর্যায় উপস্থিত হয়, গভীর রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আমি জ্যোৎস্না-হাসিত আকাশের পানে চাহিয়া থাকি। সৃষ্টি-জগতে তখন নিজের স্থান খুঁজিয়া পাই--একটা পরমাণুর। কিন্তু সেই পরমাণুতে সমগ্র জগৎ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে. ইহারও অধিক সেই পরমাণুটি যেন সমগ্র চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া উহার অধীশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করে--"নিজের ঘাড়ের 'শাহী রগ্' অপেক্ষাও নিকটে।" কিন্তু, একটি জিনিষ আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। সেটি আল্লার অস্তিত্ব লইয়া কাহারও সহিত তর্ক করা।

যাহা হউক, মাতামহীকে ছাড়িলাম বটে, কিন্তু নামাজ আমাকে ছাড়িল না। কারণ, মাতামহীর আশ্রয় ছাড়িয়া আমাদের যে নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম, পাড়ার উহাই ছিল 'মৌলবী বাড়ী'। মুরগী মাথা-কাটা হইতে সন্তানলাভের জন্য 'লবঙ্গ -পড়া' দেওয়া যেম্‌নি উহার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল, তেম্‌নি ইহলোকে নামাজের আচার্য্যগিরি করা হইতে পরলোকে পরিত্রাণের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে এলাহীর হুজুরে কৈফিয়ৎ দেওয়া সব-কিছুরই দায়িত্ব ছিল এ বাড়ীর ঘাড়ে। অবশ্য এ সকল আরোহ-পদ্ধতিতে শিখিতে হইলে মুরগীর মাথা কাটাই ছিল সর্ব্বনিম্ন সোপান। আর বাড়ী পৌঁছিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই 'আমিনার মা'র মুরগীর মাথা যেখানে আড়াই পোঁছে অর্দ্ধেক মাত্র কাটার কথা, সেখানে প্রথমে পোঁছেই ষোলআনা কাটিয়া একদম দুই খণ্ড করিয়া ফেলাতে মাতামহীর ওখানে যে আমার কোন শিক্ষাই হয় নাই, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। আমিনার মা এখনও বাঁচিয়া আছেন—অবশ্য অতি বৃদ্ধা, অশক্তা। কিন্তু, সেদিন তাঁহার গায়ে জোর ছিল। মুরগী

ও ছুরি তাঁহার আঙ্গিনায় ফেলিয়া আমি ভোঁ দৌড় মারিয়াছিলাম দাদার নিকট। তিনিও 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন আমার পেছন পেছন। আমি জানিতাম, সত্য হউক, মিথ্যা হউক দাদা তাঁহার ছোট ভাইটির অনুকূলে ব্যবস্থা দিবেনই। আর মনে মনে এ ভরসাও ছিল যে ইংরেজী স্কুলে দুইশ্রেণী উপরে পড়িয়া এমনই তিনি বেশী আর কি জানেন? আর এতদিনের সযত্নে তামাক সাজিয়া দেওয়া কি বৃথায় যাইবে? সত্যই তিনি আমার অনুকূলে ব্যবস্থা দিলেন। অর্থাৎ আমিনার মা'কে অভয় দিলেন যে মাথা দ্বিখণ্ড হইলেও সে মুরগী খাওয়া সিদ্ধ। আমিনার মা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম অনেক পরে- এ কথা আবিষ্কার করার পরে যে আমিনার মা যে ছুরিখানি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, উহা ছিল 'শাম' দেশ হইতে আমদানী এবং এত তীক্ষ্ণধার ছিল যে মুরগীর মাথা কেন, সামান্য আয়াসেই উহার সাহায্যে মানুষের মাথা কাটা যাইতে পারিত। উহার কালো বাঁট, ত্রিকোণাকার ডগা, হতভাগ্য মুরগীর পালকের হলদে রঙ এবং সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া আমিনার মা কর্তৃক আমার পশ্চাদ্ধাবন আজ দেড়কুড়ি বৎসর পরেও আমার চোখের সাম্‌নে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে।

কিন্তু, এই ঘটনার এখানেই মীমাংসা হইল না। 'মৌলবী বাড়ী'র যে-ছেলে আড়াই পোঁচে আধখানি কাটার পরিবর্তে প্রথম পোঁছেই মুরগীর গলা ষোলআনা কাবার করিয়া দেয়, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাড়ীর অনেকেই উদ্বিগ্ন হইলেন। পরের দিনই মা আমাকে দিয়া বাড়ীর যত প্রাচীন কেতাব রোদে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এ-সকল কেতাবের অনেকগুলিই হস্তলিখিত এবং প্রাচীন স্বদেশী কাগজের। ইহাদের সবগুলিই ছিল বিবর্ণ এবং অনেকগুলিই ছিল মলাটবিহীন। এগুলির প্রতি মার এতদূর ভক্তি ছিল যে তিনি সকালে জায়নামাজ হইতে উঠিয়া 'সালাম, সালাম' বলিয়া ইহাদিগকে আমাদের মাথায় ঠেকাইয়া দিতেন। আর কোন অবস্থাতেই ইহাদের উপরে আসন নেওয়া আমাদের প্রতি নিষেধ ছিল। আমি মনে মনে ইহাদিগকে বলিতাম 'বাবাজী কেতাব'।

রাত্রে আমারও ঘুম হয় নাই। আমিনার মা যে মহিলা-মহলে আমার অপকীর্ত্তিটা প্রচার করিয়া বেড়াইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আর মহিলারা ইহাতে নিশ্চয়ই হাসিয়া কুটি কুটি হইবেন। অথচ আমার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত মহিলাদিগকে এ-ভাবে হাসাইবার ভার দুইজনে নানারূপ খেলা দেখাইয়া আমি ও বালি অবিসংবাদিতরূপে ভোগ করিয়া আসিতেছি। এখন বালি হইল পলাতক, মাতামহী আজান দেওয়াইয়া পুরুষ-মহলে আমাকে করিলেন উপহাসাস্পদ, আর তিনআনা দামের এক মুরগীর মাথা কাটাইয়া আমিনার মা মহিলা-মহলে আমাকে করিয়া ফেলিল খেলো। দূর হক্ ছাই! ঠিক করিলাম, 'মৌলবী বাড়ী'র নামাজী-কালামী সুশীল ছেলে বনিয়া যাইব।

সুতরাং ভোর হইতেই 'বাবাজী কেতাব'দের রোদে দেওয়ার জন্য মা যেমনি কড়া হুকুম করিলেন তেমনি ষোলআনা মনের সায় লইয়া আমি উহা তামিল করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ছেঁড়া ও অকেজো পাতাগুলিকে সসম্মানে দফন করিয়া ফেলিলাম। যেখানে মানুষের মাড়াইবার আশঙ্কা নাই, সেখানে পুঁতিয়া ফেলা অথবা গভীর জলে ডুবাইয়া দেওয়াই ছিল এই দফন করার রকম। ডুবাইয়াই আমি দিলাম। আর আর দিন ডুবাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে বহুক্ষণ ইহাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া খেলা করাই ছিল আমার অভ্যাস। কিন্তু, আজ ও-সবকে শুধু যে ফাজলেমিই মনে হইল তাহা নয়—আমার ছোট ভাই যদি ওরকম ফাজলেমি শুরু করিয়া দিত, আমি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না। তারপর রোদ উঠিলে পাটি বিছাইয়া সেই বুড়া ও রোগা বইগুলিকে উহাতে মেলিয়া দিলাম। কিন্তু, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা ভয়ানক বিপর্য্যয় বাধিয়া গেল। কোথা হইতে একপাল সখীসহ বালি আসিয়া হাজির হইল এবং অবলীলাক্রমে সেই বইগুলিকে মাড়াইতে মাড়াইতে সকলে মিলিয়া আমার প্রতি নানাভঙ্গীসহকারে এমন লেজ নাড়িতে লাগিল যে, আমার লেজ থাকিলে প্রত্যুত্তরে উহা না নাড়া নিশ্চয়ই ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত।

আমার মনে হইল, বালি হয়তঃ বহু সুখের আশা করিয়া বাল্য-সখার বাড়ীতে 'হনিমুনে' আসিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সে প্রথম চোটেই পরস্পরের আলাপ-পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া আমাকে ও তাহার বন্ধুর পক্ষকে বলিতে চায় যে 'Feel yourself at home' আমার এ-সব মনে হইতেছে, আর ওদিকে গোষ্ঠী-সুদ্ধ সকলে মিলিয়া লাঠিহাতে বালির দলকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রথমের কয়েকটি আঘাত বালির দল গায়েই মাখিল না--বোধ হয়, আঘাতের প্রত্যাশা করে নাই বলিয়া। কিন্তু, আঘাত

উপর্য্যুপরি হইতেই যখন বুঝিলে পারিল যে এ-নির্দ্দয়তা ইচ্ছাকৃত এবং আমার সম্মতি মৌন হইলেও ওদিকেই, তখন যেমন জোরে আসিয়াছিল, তেমন জোরেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার সময় এমন সব আওয়াজ করিতে করিতে গেল, যাহার অর্থ বোঝা না গেলেও প্রতিবাদের ভাবটি স্পষ্টই ধরা পড়ে। ভাবটি যেন এই ঃ কুকুরের তুলনায় মানুষের বন্ধুত্ব কত ক্ষণস্থায়ী!

ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই খবর আসিল, বালির হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। আমি দেখিতে গেলাম। মাতামহীদের বাড়ীর দরজায় বাদাম গাছটির তলায় তাহাকে রাখা হইয়াছিল। ভোরের সূর্য্য-কিরণে তাহার যে দেহটি নাইয়া উঠিতেছিল, উহা যেম্‌নি নধর তেম্‌নি সুগঠিত। মনে হইল বালি যেন ঘুমাইয়া আছে, আমি ডাকিলেই চোখ মেলিয়া চাহিবে। শুধু বিস্ফারিত ঠোঁটের কোণের ভঙ্গীটি মনে হইল আমার অপরিচিত। যত রাজ্যের ক্লান্তি আসিয়া যেন ওখানে বাসা বাঁধিয়াছে.....

(দ্বিতীয় দিন)

বালির স্থান একরূপ পূর্ণ হইয়া গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা সাদা কুকুরী আসিয়া জুটিল। মা তাহাকে ফেন খাইতে দিলেন, বলিলেন, "আহা। বেচারীর বাচ্চা হইয়াছে। বাচ্চা হওয়ার কি কষ্ট! ইহাকে খাইতে দিলে ছওয়াব হইবে।" কথা কয়টি শুনিতে শুনিতে আমি 'ধলী'র গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম। ধলী লেজ নাড়িল বটে, কিন্তু মনে হইল নিতান্ত দায়ে পড়া গোছের। তাহার চোখে আমার চোখ মেলিয়া ধরিয়া দেখিলাম যত রাজ্যের সন্দেহ উহাতে জড়ো হইয়া আছে। ... .ধলী হইল মার কুকুর। খাবারের আশায় মার পেছন পেছন লেজ নাড়িয়া বেড়ায়, তাঁহার ইঙ্গিতে মুর্গী-চোর শেয়ালের সন্ধানে তীব বেগে ছুটিয়া যায়, কিন্তু আমার খেলা-ধুলায় নির্ব্বিকার দর্শকের অধিক সে যোগ দেয় না। এ যেন আমার মাসীমা, একটা ছেলে মানুষের অধিক সে আমাকে কিছু মনে করে না।

কিন্তু, আমার সহিত না খেলিলেও ধলীর খেলার লোকের অভাব হইল না। মায়ের দেওয়া ফেনের ভাইটামিন খাইয়া সে চাঙ্গা হইয়া উঠিল, আর কোথা হইতে একটা কাল কুকুর আসিয়া বাড়ীর দরজায় উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। ধলী দেখিতে পাইয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করিয়া গেল বটে, কিন্তু কাছে গিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল এবং উভয়ে পরস্পরের গা শোঁকাশুঁকি করিয়া মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। সেদিন হইতে সে কাল কুকুরটাকে সর্ব্বদাই বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করিতে দেখা গেল!

তখন বৈশাখের শেষ। মধ্যাহ্নে দেশ-সুদ্ধ বয়স্কের দল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকেন। পাড়ায় জীবন-দীপ জ্বালিয়া জাগে— শুধু নবীন যুবক ও নবীনা যুবতীর দল। কিসের অশান্তিতে মন ভরিয়া উঠে বুঝিতে পারি না। কোমরে আম-কাটা এক আনা দামের চাকু গুঁজিয়া আমতলায় তলায় আম কুড়াই। কিন্তু একা খাইয়া সুখ পাই না। মনে হয়, সে কিশোরীটা কাটিয়া দিত আমি গল্প করিতে করিতে খাইতাম, বেশ হইত। আমে কোঁচড় ভরিয়া তাহাদের বাড়ি যাইয়া উঠি। উঠানেই তাহার সহিত দেখা হয়, আনমনে গৃহস্থালীর কাজ করিয়া যাইতেছে। মাথার চুল আঁচড়াইয়া এমন পাট করিল কিরূপে, নিশ্চয়ই উহাতে মোম ঘসিয়া দিয়াছে। সে আম কাটিতে বসে, আমি খাইতে খাইতে অন্‌মনা হইয়া যাই। কী সাদা তাহার পা দুখানি! আচ্ছা, মেয়েদের সব শরীরই কি একই রকম সাদা হয়, না কোথাও সাদা কোথাও একটু কম সাদা হয়!....

দুলাকে ইহা জিজ্ঞাসা করি। নিকটে কেহ কোথাও নাই। ঝাঁঝা রৌদ্রে আলের উপর তাহার ছোট্ট দা দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া সে সিমের বীচি গুঁজিতেছে, আমি পাশে বসিয়া আছি। প্রশ্ন শুনিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া সে আমার চোখে চোখ রাখে। ভাবটি যেন এই ঃ "এই প্রসঙ্গ অন্যায়, মাকে বলিয়া দিব।" আমি ভাবি ঃ দুলাটা কী ভীতু! তবুও তাহাকে ভালবাসি। সে তাহার রাঙ্গা গাই ও ধলী ছাগীটাকে কী ভালই না বাসে! এজন্যই তাহাকে আমার এত ভাল লাগে। কিন্তু দুলাটা যেম্নি ভীরু তেম্নি বোকা। সে সত্যই বিশ্বাস করে যে গরুর চাইতে মানুষের আড়াইখানা লোম বেশী। তাহাদের বাড়ীর আম্বিয়ার বাপও নাকি ইহা বিশ্বাস করে। আম্বিয়ার বাপ নমাজী-কালামী মানুষ। সকলেই তাহাকে খাতির করে। তা হোক্ গে, দুন্‌য়ার লোক এক বাক্যে বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না যে গরুর চাইতে মানুষের আড়াই খানা লোম বেশী হয়। আড়াইখানা লোম আবার বেশী হয়! সে আধখানা তাহা হইলে কোথায় কি ভাবে আছে?....

সেই যে নমাজ ধরিয়াছিলাম এই আম্বিয়ার বাপের সহিত একটা ঠোকাঠুকি হইয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। সেদিন সকলে মিলিয়া বড় মামার বিয়ের বরযাত্রী যাইতেছিলাম। মস্‌জিদে যাহারা সমবেত হইল তাহাদের সকলেরই গায়ে গরুর চাইতে আড়াইখানা লোম বেশী। ইহারা কোরাণ শরীফের নাম মুখে নিত না, বলিত 'বড় বস্তু'। পাছে 'বড় বস্তু'র অসম্মান হয় এই ভয়ে ঘরের সর্বোচ্চ মাচায় উহাকে তুলিয়া রাখিত। আর পুরুষানুক্রমে আমাদের বাড়ির কাউকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করাই ছিল ইহাদের রীতি।

আচার্যের আসনে দাঁড়াইয়া সেদিন আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। আমিনার মার মুরগীর মাথা-কাটা বিপর্যয়ের পর আমি আনুষ্ঠানিক কাজগুলি মন দিয়া শিখিতেছিলাম। ইহার ফলে কখনও একটু উচ্চহাস্য করিলেই অমনি তওবা করিতাম, পাছে ফেরেস্তার গায়ে পড়ে এ জন্য ডানদিকে থুথু ফেলিতাম না, আর শয়তানকে জব্দ করার জন্য বামদিকে যত ইচ্ছা থুথু ফেলিতাম। কিন্তু, এই সকল বাহ্যিকতার মধ্যে দিয়াও আমার অন্তরে যে আল্লা রূপায়িত হইতেছিলেন তিনি ছিলেন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় জগতের মহীয়ান মালিক। কারণ এ সময় আমি রূপের পূজারী হইয়া উঠিতেছিলাম। বাড়ির উঠানে আমার খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, হয়ত উহার ভিতর গা লুকাইয়া সেই রক্ত-চক্ষু কাল কুকুরটা ধলীর গতিবিধি লক্ষ্য করিত। কিন্তু দূরে আলের মাথায় দুলার বীচি হইতে যে শ্যামল চোখগুলি মাটি ফুড়িয়া তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি পৃথিবীর আলো-বাতাসের পানে মেলিয়া ধরিয়াছিল তাহাদের প্রাণ-শক্তির মূলে বারি অমৃত নিষেক ছিল আমার নিত্যকার আনন্দ। বাড়ির সামনের পাহাড়ী ঝর্ণাটি নিত্য সকালে আমাকে তাহার কূলে আকর্ষণ করিত, আর উহার 'কুলকুল্' গানে আমি শুনিতে পাইতাম দেশ-বিদেশের নানা কথা--বড় হইয়া যাহাদের সীমা-রেখা পার হইয়া আমি আরও দূরে আরও দূরে কাহার সন্ধানে জানি না অদৃশ্য হইয়া যাইব। কূলে যে একা একটি কাঁঠাল গাছ দাঁড়াইয়াছিল--নদীর ভাঙ্গনে যেটা হেলিয়া পড়িয়াছিল--সেটা যেন বলিত ঃ "আমার তলায় তোমার বসিবার স্থানটি চিহ্নিত করিয়া রাখ। তুমি যখন ফিরিবে ততদিনে আমি নদীর জলে গা ভাসাইয়া অনন্ত যাত্রা করিব।" আর সেই কিশোরীটীর ডাগর ডাগর চোখের তলে পাতলা ঠোঁট্ দুখানিতে যে রঙ্ ধরিতেছিল, আমি ভাবিতাম রসে পূর্ণ হইলে সেগুলি কি পাকা আমের মত একটু ফিকে দেখাইবে, না পাকা নাসপাতির ন্যায় একটু সাদাটে হইয়া উঠিবে...।

রূপময় জগতের মালিকের সহিত আমি মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলাম মুখে কোরানের আবৃত্তি করিয়া,--যাহার একবর্ণ না বুঝিলেও আচার্যের চলে—আর পেছনে দাঁড়াইয়াছিল দুলা ও আম্বিয়ার বাপের দল গরু হইতে তাহাদের গায়ে আড়াইখানি লোম বেশী লইয়া। আবৃত্তি আমার যাহাই থাকুক, অন্তরে আমার আত্ম-নিবেদন ধ্বনিয়া উঠিতেছিল ঃ 'প্রভো! আমরা সকলেই তোমার। তুমি দেখ তাই দুলার বীচির অঙ্কুরগুলি দিনে দিনে মাথা চাড়া দিয়া বড় হইয়া উঠে। তুমি শোন তাই ঝর্ণাটি রাতদিন অমন কুলুকুলু গান করে। আর প্রভো, সেই কিশোরীটীর রঙ-ধরা ঠোঁট্ যদি আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে (ইহার পূর্বেও আম্বিয়ার বাপ একবার গলা-খাঁকারী দিয়াছিলেন, এবার বার দুই দিলেন।) আমি জানি এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। (কেন করিবেন জানি না, কিন্তু আমার আজন্মের এবং আজীবনের বিশ্বাস এই যে আমার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লা ক্ষমা করিয়া থাকেন।)

নমাজ শেষ হইতেই আম্বিয়ার বাপ মাথা নাড়িলেন ঃ নমাজ হয় নাই। হয় নাই! কেন? "প্রথম সূত্র হইতে দ্বিতীয় সূত্র দীর্ঘতর আওড়ান হইয়াছে।" অতি সামান্য ত্রুটি। কিন্তু মস্‌জিদের বাহিরে গিয়া ইহা লইয়া ভয়ানক জটলা শুরু হইয়া গেল। ত্রুটি বড় হইয়া এমন মূর্ত্তি গ্রহণ করিল যেন উহা না ধরিলে সে আড়াইখানা লোম খসিয়া পড়িয়া মানুষ ও গরুতে একাকার হইয়া যাইবে। এদিকে আমার আত্ম-নিবেদন তখনও চলিতেছে। অবশেষে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত শেষ করিয়া যখন মস্‌জিদের বাহিরে আসিলাম তখন জনতা কমিয়া গিয়াছে। যাহারা ছিল আবার আমার পক্ষ হইয়া লড়িবার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম আর সারাটি পথই আমার মনে হইতে লাগিল ঃ নমাজ কি বাংলায় পড়িবার উপায় নাই?......

পরের দিন বাড়ি ফিরিয়া দেখি অভাবনীয় কাণ্ড! আমার ভাঙ্গা খেলার ঘরটি রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার মাঝে ধলীটা যন্ত্রণায় এই গড়াগড়ি দিতেছে, এই উঠিয়া বসিতেছে, এই আবার শুইয়া পড়িতেছে, আর একটার পর একটা তাহার

বাচ্চা বাহির হইতেছে। আমরা ছেলের দল চোখ কপালে তুলিয়া এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এমন কাণ্ড আর জন্মে দেখি নাই। মায়ের দেওয়া ফেন খাইয়া ধলীটা চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে জানিতাম, সে ফেন খাইয়া যে ধলীর পেটে এতগুলি বাচ্চা হইবে তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল! ... জননী দু একবার আমাদিগকে ডাকিয়া সেস্থান হইতে সরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এমন 1st class sensation ছাড়িয়া কোন ছেলে কি অন্যত্র যাইতে রাজী হয়? ...আজ মনে হইতেছে আমরা কাছে না থাকিলে জননী ধলীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেন আর বিপদে তাহাকে অভয় দিতেন। কিন্তু সেদিন তিনি বহুদূর হইতে দাঁড়াইয়া এ ঘটনাটি দেখিতে লাগিলেন। ...এমন সময় হঠাৎ সদর দরজায় সেই রক্তচক্ষু কাল কুকুরটাকে দেখা গেল। আমরা ছেলের দল কখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলাম না। সম্মুখেই বেড়াজালের ন্যায় আমাদের সব কটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে ভয়ানক হতভম্ব হইয়া গেল, পরক্ষণেই ধলীর বাচ্চা হইতেছে দেখিয়া সে তিন পা পিছাইয়া গেল। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। বিদ্যুতের ন্যায় একটা প্রশ্ন আমাদের চোখে চোখে খেলিয়া গেল ঃ "এ বেটারই যত নষ্টামী, পেদাও বেটাকে।" সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে আমরা লাঠি হাতে আক্রমণ করিলাম। এমন সময় জননীর সরল সকৌতুক আওয়াজ ভাসিয়া আসিল ঃ 'ওরে মারিস্ নি। ওর বৌয়ের ছেলে হয়েছে, দেখতে এয়েছে।' ও তাই! ধলী আবার এ বেটার বউ। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্ন জাগিল ঃ "আচ্ছা, মানুষ বিয়ে করে কেন? মামার না আজ বউ আসার কথা! মামা ত একলাটি বেশ ছিলেন। আবার একটা বউ আনিতেছেন কেন? কাল কুকুরটা পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিন তাহার প্রতি যে লাঠি উদ্যত করিয়াছিলাম উহা আমার স্মৃতিতে উদ্যতই রহিয়া গিয়াছে। যখন দেখি বছরের পর বছর বাচ্চা আমদানী হইয়া বাংলার শিশুদিগকে অকালে মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত করে এবং অনেকের ভাগ্যের সে বঞ্চনা ঘটে চিরকালের জন্য, তখন শিশু হাতের এই উদ্যত লাঠির কথা আমার মনে পড়িয়া যায়। এই অপরাধে বাংলার শিশু দল বাবা ও কাকার দলকে লাঠি হাতে কেন যে তাড়া করে না বুঝিতে পারি না।

মামাদের বাড়ি গিয়া দেখি--মামী সবে মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অনেকখানি কাপড়ে জড়ান একটা জড় পদার্থ, ঘোমটা দেখিয়া অনুমান হয় ইহার মুখ আছে—এই মামী! সহানুভূতির পরশ বুলাইয়া আমার বুঝিতে দেরী হইল না যে গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে কাপড়ে মোড়া এই জড়পদার্থটী ঘামিয়া একদম নাইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমি কাছে বসিয়া খুব জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলাম। মেয়েটি বোধ হয় এই সহানুভূতি বুঝিতে পারিল। কারণ, সকলে সরিয়া যাওয়া মাত্রই সে ঘোমটাটি খুলিয়া ফেলিল এবং চুপিচুপি আমাকে বলিল ঃ 'আমি বাদাম খাইতে ভালবাসি।' এই বলিয়া ঘরের এক কোণে যে কয়টি বাদাম গড়াগড়ি দিতেছিল তাহা দেখাইয়া দিল। পরক্ষণেই কেউ আসিয়া পড়ে এই ভয়ে আবার ঘোমটা টানিয়া বৌ সাজিয়া বসিয়া রহিল। আমার আশা হইতে লাগিল, যে ঘোমটা ভেদ করিয়া সকলের আগে ঘরের কোণে ছড়ান বাদাম দেখিতে পায় সে আমাদের পাড়ার সুফেয়া ও আমজির মত নিশ্চয়ই গাছে চড়িতেও জানে। তাহা হইলে ত কেল্লা ফতে। দুপুরে আমার গাছে চড়ার অর্দ্ধেক কষ্ট লাঘব হইয়া যাইবে। পরক্ষণেই মনে পড়িল যে বাদাম গাছ ত কাছে নাই। সদর রাস্তার পাশে একটি আছে বটে, কিন্তু সদর রাস্তায় বাদাম কুড়াইয়া বেড়াইলে কী ছোট লোকই না লোকে ভাবিবে! মেয়েটির উপর রাগও রইল। বাপের বাড়িতে বেশ ছিলে, মনের সুখে বাদাম খাওয়া চলিত। কেন বৌ হইয়া এখানে মরিতে আসিলে, এখন তোমার জন্য আমি নিত্য নিত্য বাদাম কোথায় পাই! ....নানীকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ নূতন বৌকে বাদাম কাটিয়া দিব কি না। তিনি তা হাসিয়াই খুন ঃ "পাগলা বলে কি, নূতন বৌকে মিষ্টি-মুখ না ক'রে বাদাম খাওয়াবি?' ভিতরে অভিমান জাগিয়া উঠিল। মাতামহী বেশ জানেন যে মিষ্টিটা আমিই বেশী পছন্দ করি। অথচ, পাছে আমার হাতে পড়ে এই ভয়ে কত সাবধানেই তিনি মিষ্টির হাঁড়িটাকে লুকাইয়া রাখেন। আর এদিকে যাহাকে বাদাম দিয়াই বিদায় করা চলে তাহার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে মিষ্টি-যোগের।.....কিন্তু এখন অভিমানের সময় নয়। ওদিকে মেয়েটী ঘোমটার আড়ালে বাদামের আশায় 'হা পিত্যেশ' করিয়া বসিয়া আছে। আমি বাদাম কাটিয়া একখানা প্লেটে সাজাইলাম, তারপর উহা হাতে লইয়া নানীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বৌয়ের নিকট হাজির করিলাম। নানী হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ "বৌমা, বাদাম খাও। তোমার ভায়ে এত কষ্ট করে কেটেছে।" বৌ মিহি গলায় বলিল ঃ "না, আপনি খান।" নানী ঃ "আমি খাব কি বাছা, ও ত ছেলেমানুষেই খায়" বলিতে বলিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বৌ ঘোমটা খুলিলে আমি বলিলাম ঃ "আচ্ছা ন্যাকামী ত, এদিকে জিভে জল পড়ছে, ওদিকে নানীকে সাধা হচ্ছে খাওয়ার জন্য!" বৌ চুপি চুপি বলিল ঃ "মা যে বলে দিয়েছেন আগে তাঁকে খাইয়ে

পরে নিজে খাওয়ার জন্য।" "কিন্তু তিনি ত বাদাম খান্ না। তাঁর যে দাঁত নেই।" "দাঁত নেই: ওমা, এত বুড়ো।" বৌ অবাক হইয়া গেল। কয়েকটি বাদাম খাইয়াই সে প্লেটখানা সরাইয়া রাখিল। আমি বিস্মিত হইলাম ঃ "আরও অনেক যে রয়ে গেল।" বৌ বলিলঃ "মা যে বলে দিয়েছেন কোন জিনিষের সবটা খেতে নেই।" আমার সন্দেহ হইল, মা তাহাকে নিশ্চয়ই গাছে চড়িতেও নিষেধ করিয়াছেন। এ সন্দেহ সত্য হইবে। কারণ, মামী কখনও গাছে চড়িয়াছেন এ অপবাদ তাঁহার অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারিবে না।

বাদাম-সংগ্রহের যে ভাবনা ছিল পরের দিন উহা দূর হইয়া গেল। কারণ, দেখিলাম কাঁচকলা, পাকা কলা, কচি আম, পাকা আম, তেঁতুল, থোঁড় পেয়ারা, জাম সব রকম ফল-পাকুড়েই মামীর সমান রুচি। এ সকলের আমি অফুরাণ সরবরাহ দিতে লাগিলাম। খুশী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কি পছন্দ হয়। আমি বলিলাম "বাতাসা।" মামী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন ঃ "বাতাসা কিন্তু গাছে ধরে না; দোকান থেকে কিনে খেতে হয়।" আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলাম ঃ সেই ত দুঃখ। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাচের বৈয়মটির কথা মনে হইল দিনে দিনে যাহাকে শূন্যোদর পাইয়া মা রাগ করিয়া সেই যে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন এখন পর্যন্ত পুনরায় ঘরে তুলিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পিপড়েরা যে কয়েক কণা বাতাসা উহাতে লাগিয়াছিল তাহা তাহাদের গুদামে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন ভাণ্ডটি রাতদিনই হা করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, আর আমাকে দেখিলেই যেন উপহাস করিয়া বলে ঃ 'তোমার জন্যই ত মিষ্টির ভাণ্ড হইয়াও আমার এই দুরবস্থা।' বাড়িতে এখন বাতাসা আমদানী হওয়া মাত্রই মা হাতে হাতে উহা ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু আমি যাহা পাই দিদার ও ওহিদ ছোট বলিয়া তার চেয়ে কিছু বেশী পায়। সুতরাং সেখানে খাইয়া সুখ পাওয়া যায় না। এতদিনে একটা কূল হইল। মেয়েটি হাত-সাফাই করিয়া বেশ বাতাসার যোগান দিতে লাগিল। এদিকে মামারও বাতাসার দোকানে গতিবিধি বাড়িয়া উঠিল।

পরের দিন স্কুলে পৌঁছিয়াই দু'দুটো sensation. স্কুলে সরস্বতী পূজা হইবে। আজ হইতে চাঁদা তোলা হইতেছে। এ কয়দিন পড়া হইবে না। নানান্ রকম উৎসব আমোদে স্কুল সরগরম হইয়া থাকিবে। সব শেষে হইবে যাত্রার গান। যাত্রার গান আর কখনও শুনি নাই। আমরা দিন গুণিতে লাগিলাম আর ইহার মধ্যে আহার নিদ্রা একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। .....দ্বিতীয় Sensation ঢেঙ্গা একরূপ গুঁড়া আনিয়াছে উহা মাখিলে নাকি শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠিয়া যায়। ঢেঙ্গার এখন দাড়ি গোঁফ হইয়াছে, পায়ের লোমগুলো পর্য্যন্ত মিস্‌মিসে কাল ও কোঁকড়ান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও রমণের মারের বিরাম নাই। আমরা অনেকে নীচে হইতে তাহার কাণ নাগাল পাই না বলিয়া টুলের উপর দাঁড়াইয়া তাহার কাণ মলিয়া দিতে হয়। রমণ কাছে দাঁড়াইয়া দেখেন জোরে মলা হইতেছে কি না। কম জোরে সন্দেহ হইলে আমাদের কাণের উপর তিনি আচ্ছা করিয়া কস্‌রৎটা দেখাইয়া দেন। ওদিকে বেশী জোরে সন্দেহ হইলেই রমণ ক্লাস ছাড়া মাত্রই ঢেঙ্গা সে ছাত্রকে ঠেলিয়া বেঞ্চ হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়, তাহার বই ছিঁড়িয়া দেয়, ছাতা কাড়িয়া রাখে ইত্যাদি। সুতরাং রমণ ও ঢেঙ্গার মাঝখানে পড়িয়া উলু-খাগড়ার ন্যায় আমাদের শান্তি ছিল না। আজ পড়া না থাকায় ঢেঙ্গা একেবারে বাদশা হইয়া বসিল এবং বাদশার ন্যায় খোশ মেজাজেই আমাদিগকে লোমনাশক চূর্ণ বিলাইতে লাগিল। কোথাকার লোম কেন নাশ করিতে হইবে সে প্রশ্ন কাহারও মাথায় গজাইল না। চূর্ণ যখন খয়রাতী যে যেখানে পারিলাম ঘসিয়া দিলাম।.... সে রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখি শুধু যন্ত্রণাই সার হইয়াছে, যেখানকার লোম ঠিক সেইখানেই পূর্ব্বের মত রহিয়া গিয়াছে।

পূজা হইয়া গিয়াছে। দেবীর চোখ ছিল ডাগর ডাগর। সেই কিশোরীরও চোখ ছিল ডাগর ডাগর। তফাৎ এই যে দেবী শুধু চাহিয়াই আছেন আর কিশোরীর চাহিয়া থাকার ফাঁকে ফাঁকে চোখের পাতা ও ভ্রূতে মিলিয়া যে খেলা করে উহা দেখিতে বড় সুন্দর। ঢেঙ্গা উপুড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল ঃ "এইই সরস্বতী। ইনিই বিদ্যা দেন।" আমি ভাবিলাম ঃ বিদ্যা দেন, না কাণমলা দেন। বিদ্যা ত দেন রমণ। আর এও আশ্চর্য্য মনে হইল যে--কেন মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা। মেয়ে মানুষকে পূজা করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে একটা আস্ত মেয়ে মানুষকে পূজা করিলেই ত পারিত। ধর সেই কিশোরীকে। কিন্তু সে কিশোরীকে দেবীর আসনে বসাইলে আমাকে আজ রাত্রে যাত্রাদেখার আশা ছাড়িতে হইত। যে ভীরু, আমাকে সারাক্ষণই তাহার নিকটে বসিয়া থাকিতে হইত।

অনেক রাত্রে অভিনয় শুরু হইল। শিক্ষকেরা, মাতব্বরেরা ও দেশশুদ্ধ বয়স্কের দল চারিদিকে এমন জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন যে আমাদের চুণোপুঁটাদের দেখিতে পাওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। সুতরাং আমরা আশ্রয় করিয়াছিলাম গাছের ডাল। ঘুম পাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। প্রস্রাব করার অসুবিধা মনে হইল। কুমুদ আবিষ্কার করিল যে সোজা গুঁড়ি বাহিয়া প্রস্রাব করিলে আওয়াজও হইবে না এবং উহা এমন নামিয়া যাইবে যে নীচে কাহারও মাথায় টপ্‌কিয়া পড়ারও সম্ভাবনা নাই। কুমুদের মত আমরা গ্রহণ করিলাম। কারণ ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্কুলের গাছে আম পাড়িতে উঠিয়া নীচের বাজারগামী লোকের মাথায় প্রস্রাব করার "error of judgement" এর দরুণ পূর্ণবাবু তাহাকে আচ্ছা করিয়া পিটিয়াছিলেন এবং উহার সব দাগ এখনও তাহার পিঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

প্রথম দৃশ্যেই আমরা হা করিয়া গেলাম। কতকগুলো ছোঁড়া আসিয়া একেবারে শিক্ষকগণের সামনেই নাচ ও গান শুরু করিয়া দিল। কী তাহাদের ফর্সা রং, কি চুলের ছাঁট আর কীই বা রাজপুত্রের মত পোযাক! কুমুদ বলিল ঃ "এসব কাপড় শহরে কিনতে পাওয়া যায়। বুঝলি? ওখান থেকে কিনে নিয়েছে।" শহরেই যদি কিনিতে পাওয়া যায়, মা-বাপেরা স্কুলের ছেলেদের এরূপ পোযাক কেন যে কিনিয়া দেন না বুঝিতে পারিলাম না। খুব দামি বুঝি? কিন্তু পূর্ণবাবু ত অনেক টাকা মাহিনা পান। তিনি ত অনায়াসে এরূপ পোযাক পরিয়া স্কুল করিতে পারিতেন।

"আরও চোখ ঠেরে, এই ছোকরা।" একজন শিক্ষক চেঁচাইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোক্‌রা--দলের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলা যায়--ভয়ানক চোখ ঠারিতে লাগিল আর দুহাত কোমর লাগাইয়া এমন মাজা দোলাইতে লাগিল যে সত্যই আশঙ্কা হইল তাহার না কোমর ভাঙ্গিয়া যায়। দর্শকগণের মধ্যে একটা হাসির হর্‌রা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পটাপট্ হাততালি। কিন্তু এ সকলকে ডুবাইয়াও এমন সব মন্তব্য ও চীৎকার কানে ভাসিয়া আসিল যাহাতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কারণ, আমার ও সেই কিশোরীর মধ্যে সে সকল হইলে আমরা পূর্ব্বেই চারিদিকে দেখিয়া লই--কোনদিকে কেহ দেখিতেছে কিনা। লজ্জা কিন্তু স্থায়ী হইল না। কারণ পর পর দৃশ্যে এ সবের এমন Practical demonstration হইল যে আমরাও মাতিয়া উঠিলাম।

সারা রাত নাচ-গানের পর ভোরে মজলিস ভাঙ্গিবে এমন সময় দর্শকদের মাঝখানে শ্রীমন্ত বারুই দাঁড়াইয়া গেল এবং জোর গলায় চেঁচাইয়া উঠিল ঃ "বন্দে মাতরম্।" সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল চেঁচাইয়া উঠিল ঃ "বন্দে মাতরম্।" আমাদের বৃক্ষ-শাখাগুলিও বাদ গেল না। পূর্ণবাবু হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং শ্রীমন্তকে খুব করিয়া বকিয়া দিলেন। তিনি এবং শিক্ষকদের কেহ কেহ চারিদিকে ভালরূপ চাহিয়া দেখিলেন ঃ লাল পাগড়ি কোথাও নাই। তারপর নিশ্চিন্ত হইলেন। ....তখন ১৯০৫ সাল হইবে। "বন্দে মাতরম্" সবে মাত্র আমদানি হইয়াছে। ইহার অনেক পরে কেতাবী শিক্ষার পর আমাদের অঞ্চলে "বন্দে মাতরম্" "বন্দে মাতরম্" হইতে পারিয়াছে। যে দিনের ঘটনা তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ধীরেন কয়েকজন সহপাঠীকে লইয়া বাজারে বাজারে গান করিয়া বেড়াইয়াছিল ঃ "নগরে নগরে জ্বালাব আগুন হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ--" আর পরের দিন স্কুলে আসিতেই পূর্ব্ববাবু তাহাদিগকে ধরিয়া কী ভীষণ মার!

সেই যে মাতিয়া উঠিলাম এ পর্য্যন্ত মাতামাতির শেষ হইল কিনা বলিতে পারি না। মাঠের মাঝে দীঘির পাড়ে রাখালেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মন্ত্রী ও সেনাপতির ভঙ্গীতে পার্ট্ বলিতে লাগিল, আর আমি ও চন্দ্র স্কুলের পথে চলিতে চলিতে যত সুন্দর-পানা পড়ুয়াদের হিসাব করিতে লাগিলাম। কে কাহার সহিত মিশে, কেন মিশে ইত্যাদি। তারপর একটা 'কোড্' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম--যেন ক্লাসে বসিয়াও সকলের সাক্ষাতে এই আলাপ চালাইতে পারি। দিনের পর দিন এসব আলাপ চালাইতে চালাইতে আমার মুখ চোখের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিনা কে জানে?

ইহার মধ্যে পড়িল এক রবিবার। সেদিন দুপুরে কিছু একটার জন্য প্রাণ হাঁই-ফাই করিতেছিল। কিন্তু কিছুই করিবার না থাকায় এক কোঁচড় আম লইয়া গিয়া উঠিলাম নানীদের বাড়ি। মামীকে দেখিয়া মনে হইল অতখানি সাজ-পোষাকের পেছনেও যেন কিসের ক্লান্তি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে--যেটা তাঁহার প্রতি পদক্ষেপকে করিয়া তুলিয়াছে এমন ভারী যে এককালে এই মেয়েটিই যে গাছে চড়িতে পারে বলিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম উহাই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়। তিনি আম কাটিয়া দিলেন, তারপর বলিলেনঃ 'খাও।' আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "আর তুমি?" মামী বলিলেন "না বাছা, আমি

খাব না।" তারপর পাইট করা চুলের উপর আঁচলখানি ঠিক করিয়া দিলেন। ওদিকে নানী ডাকিয়া বলিতেছেন, "সৌমা, তুমি আম খেয়ো না যেন। সময় হ'লে আমি আপনিই আম এনে খাওয়াব। আমরা বাছা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি।" আমি মামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। অসাধারণ কিছুই দেখিলাম না। শুধু মনে হইল এ মেয়েটা রাতারাতি বদলিয়া গিয়াছে। আমার সহিত আম খায় না, আমাকে "বাছা" সম্বোধন করে, এ মামী কোথা হইতে আসিল। আম আমারও ভাল খাওয়া হইল না। বাড়ির পথ ধরিয়াছি আর চলিতে চলিতে মনে হইতেছে নিজেকে বড় একা। কি করিয়া মনে এই একটা প্রতীতি আসিয়াছে যে মামীকে আর 'মামী' ডাকা চলিবে না, ডাকিতে হইবে "মামী মা।"

পরের দিন স্কুলে গিয়াই ঢেঙ্গাকে পাকড়াও করিলাম। আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলাম : "ঢেঙ্গা, ভাই, তোকে একটা কথা জিগ্যেস করি, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি?" ঢেঙ্গা বলিল : "কি কথা?" স্বর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : "মানুষ বিয়ে করে কেন?" থামিয়া বলিলাম : "শুধু ভাত রেঁধে দেওয়ার জন্য নয়, কি বলিস্?" ঢেঙ্গা বলিল : "নিশ্চয়ই নয়। ছেলে হওয়ার জন্যও বটে।" ঠিক এইটাই আমি এতদিন সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম : "ছেলে কি করিয়া হয়?" ঢেঙ্গা বলিল : "এই কথা? কিন্তু তোর ত এখনও বিয়ে হওয়ার অনেক দেরী।" "তা হোক্, তবুও তুই বল্।" ঢেঙ্গা চারদিক চাহিয়া দেখিল, তারপর বিনাইয়া বিনাইয়া মানুষের জন্ম-বৃত্তান্তের যতটা সে জানিত আমাকে বুঝাইয়া বলিল। আমি ঢোক গিলিয়া গিলিয়া -শুনা নয়- যেন সব গিলিতে লাগিলাম। কারণ এইখানে যে রহস্যভেদ হইল আমার সমগ্র জীবনের উহা শ্রেয়তম কিনা জানি না--কিন্তু প্রিয়তম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই। আর আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যেন কান পাতিয়া উহাদের চরম পরিণতির পরম রহস্যজনক ইতিহাস শুনিয়া লইল।

ঢেঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া বড় দুঃখ হইল। রমণটার কি কাণ্ড-জ্ঞান নাই। এমন বিজ্ঞ ছেলেটিকে কান মলিয়া দিতে আছে? ঢেঙ্গা বলিল : "কি ভাব্‌ছিস?" বলিলাম : "রমণটা তোকে দুচোখে দেখ্‌তে পারে না।" ঢেঙ্গা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, স্বরটা কিছু নামাইয়া বলিল : "তার বৌয়ের সাথে একটু আলাপ করেছিলাম কিনা, সেই থেকে দেখ্‌তে পারে না।" গাটা কাঁটা দিয়া উঠিল। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : "শিক্ষকের বৌয়ের সাথে আলাপ কর্‌লি?" ঢেঙ্গা নিমেষেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জোর গলায় বলিল : "ভারী ত শিক্ষকের বৌ। এই ত সেদিন বিয়ে করেছে আমাদের পাড়ার সরিকে আমাদের সরিকে বুঝ্‌লি?" ....

ইহার মধ্যে পূর্ণ বাবু চলিয়া গিয়াছেন। নূতন যিনি আসিলেন তাঁহার গায়ে কলেজী ছোকরার হাল ফ্যাশানের হাতকাটা জামা। পেয়াজের ঢিলা খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে উহাকে যেরূপ দেখায় তাঁহাকেও সেইরূপ চোস্ত দেখাইতেছে। ছেলেদের চোখে চোখ রাখিয়া তিনি পাঠ শিক্ষা দেন। সে চোখ যদি সুন্দর মুখের হয় তিনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ দুটিতে বৈদ্যুতিক বাতির ন্যায় একটা আলো হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তিনি আসার পরের দিনই এই ফিক্ করিয়া হাসা ও দপ্ করিয়া জ্বলার অর্থ সব ছেলেই বুঝিতে পারিল, আর তাঁহার সম্বন্ধে নানা গুজব বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল হইল আমার। আমি মনে করিতেছিলাম যে আমি ঢেঙ্গার ন্যায় সাবালক হইতে যাইতেছি, আর সঙ্কল্প করিতেছিলাম যে অচিরেই আমি তাহার ন্যায় যত সব চাঁদপানা ছেলের উপর কাপ্তানী শুরু করিয়া দিব। এদিকে নূতন মাষ্টার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন--একবার ফিক্ করিয়া হাসেন, আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠেন। ঢেঙ্গা বলিল : "এই রে, নূতন মাষ্টার তোকে পেয়ে বসেছে।" আমি বলিলাম "পেয়ে বসেছে না হাতী! আমি ওকে মজা টের পাইয়ে দেব।" ঢেঙ্গা হাসিয়া বলিল : "আর ওরই বা দোষ কি? দিনে দিনে তোর মুখ যা রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ছে!" উত্তরে আমি তাহার সহিত বহু বিশেষণসহ এমন সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিলাম, যে, উহা সত্য হইলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য সাগর-পার হইতে সালিস ডাকিতে হইত না। ঘরের বৌ-ঝিরাই উহার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। .....এর পর গোদের উপর বিষ ফোড়ার ন্যায় নূতন মাষ্টার একটু সময় করিয়া আমাকে জনান্তিকে জানাইলেন—আমি যেন ছুটির পর তাঁহার বাসায় যাই। আমি নিজেকে এতদূর অপমানিত মনে করিলাম যে, বিষে ব্যথায় আমার সর্ব্বশরীর রি রি করিতে লাগিল। আমি তখন-তখনই বাড়ি চলিয়া আসিলাম এবং আসিয়াই অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিতে লাগিলাম। ঢেঙ্গার কথাই ঠিক। যে রূপের পূজার আমি দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলাম উহাতে প্রীত প্রফুল্ল যৌবন-দেবতা আমার চোখে মুখে তাঁহার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে চোখ দুটি হইয়া উঠিয়াছিল

বিকশিত, কোণায় ঈষৎ অরুণ, আর মুখখানি হইয়া উঠিয়াছিল রাঙ্গা--সে কিশোরীর রাঙ্গা মুখের পরশ লাগিয়া নাকি কে জানে? কিন্তু দেবতা ধন্যবাদ পাইলেন না। রুখিয়া বলিলাম ঃ "ছি ছি দেবতা, এই মুখ-চোখ লইয়া কাপ্তানী চলিবে নাকি? ঢেঙ্গার মত গোঁফ্ কই, সারা দেহে মিশমিশে কালো কুঞ্চিত লোম কই?" আজ এ সব হইয়াছে। নাপিতের বিল শোধ করিতে করিতে মনে পড়ে ঃ সে দিনের আয়নায় মুখ দেখা, আর যখনই দেখি আমার স্বাস্থ্যবান ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিতেছে, তখন আশঙ্কা হয় নূতন মাষ্টার অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া এখনও বাঙ্গলার কোন হতভাগা স্কুলে বিরাজ করিতেছে না ত, আর উহার কিশোর ছাত্রের দল যৌবন-দেবতার নিকট অকাল বার্দ্ধক্য কামনা করিতেছে না ত।

রাত্রে সঙ্কল্প ঠিক করিয়া ফেলিলাম। এই নাবালকত্বের অবসান করিতে হইবে। কাল নূতন মাষ্টারকে ক্লাসে অপদস্থ করিতে হইবে এবং ছুটির শেষে স্কুলের সেরা রাঙ্গা ছেলেটিকে আমাদের বৈঠকখানায় আনিয়া সকলের নিকট জাহির করিতে হইবে যে এখন হইতে ও' আমার কাপ্তানী অধীন। বদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় আমি ভয়ানক অধীর হইয়া উঠিলাম ঃ কতক্ষণে ক্লাস শুরু হইবে এবং আমি নূতন মাষ্টারকে হাওয়ায়-উড়া তুলার ন্যায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। কারণ এই উড়াইয়া দিতে পারার উপরই আমার মান-ইজ্জত নির্ভর করে।

নূতন মাষ্টার ক্লাসে আসিলে আমি দাঁড়াইলাম না এবং মাষ্টারের টেবিলে রক্ষিত দোয়াত হইতে কালি লইয়া লিখিতে লাগিলাম, যেটা নিষিদ্ধ। মাষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম যে ঐ কালি আমার বাবার পয়সার কেনা এবং মাষ্টারের উহাতে আপত্তি করা সাজে না, যেহেতু তিনিও আমার বাবার পয়সার চাকর। মাষ্টার অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে সাহসী হইলেন না। বোধ হয়, পাছে শাস্তি দিতে গিয়া আমার মুখ দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলেন এই ভয়ে।

সন্ধ্যায় সেই ছেলেটিকে বৈঠকখানা নিয়া আসিয়াছি। ঢেঙ্গা বাহিরে পাহারাও দিতেছিল, অপেক্ষাও করিতেছিল। এই ছেলেটির মুখে আমার ঠোঁটের উপবাস ভঙ্গ করাই আমাদের প্রোগ্রাম! কিন্তু কাজটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে। ছেলেটির অপবাদ আছে। কিন্তু আমার ত অপবাদ নাই। ও যদি আমার বৈঠকখানায় ভাল মনে আসিয়া থাকে! তা ছাড়া সঙ্গীব মত আলাপ চালাইতে চালাইতে হঠাৎ পাগলের মত এই কাজটা করা যায় কিরূপে? কিন্তু পাগলই আমাকে হইতে হইবে। নতুবা ঢেঙ্গা ভয়ানক ঠাট্টা করিবে যে! আর এই ছেলেটির জন্য নূতন মাষ্টার পাগল হইয়া উঠিয়াছে না? ইহাকে কাড়িয়া লইয়া নূতন মাষ্টারকে দেখাইতে হইবে ঃ কত ধানে কত চাল!

আলাপ চালাইতে চালাইতে আমি হঠাৎ পাগলের ন্যায় ছেলেটির হাত ধরিয়া আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ভিতর অনেকগুলি কণ্ঠ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ঃ আমি ছেলেটির হাত ছাড়িয়া দিলাম।

এ কাহাদের কণ্ঠ আর একদিন বলিব।

(তৃতীয় দিন)

যাত্রার পরের দিন দাদা অভিনয়ের বই দুখানি আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাবার সামনে পড়িতে পারিলেন না। তাঁহাকে বাবার সামনে পড়িতে হইত। আমাকে কাহারও সামনে পড়িতে হইত না, শুধু মার সামনে খাইতে হইত। আমি লুকাইয়া বই দুখানিকে ঢেঁকিশালে লইয়া গেলাম এবং ঢেঁকির উপর বসিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। ঢেঁকিকে ঠাহর করিয়াছিলাম অভিনয়ের নারদের দৃষ্টান্তে। নারদ যদি পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঢেঁকিতে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারেন, আমি কেন ঢেঁকিতে চড়িয়া দুখানি বই শেষ করিতে পারিব না? বিশেষতঃ যখন নারদের ঢেঁকি হইতে মার ঢেঁকি অনেক বেশী মোটাসোটা, চাঁচাছোলা ও experienced আর ঢেঁকিতে চড়িয়া যেমন একদিকে নিরিবিলি পড়া চলিত, অপর দিকে তেমন উহা হইতে নামিয়া ঠিক সময়ে খাওয়ার জন্য হাজিরা দেওয়াও চলিত। ইহাতে মা খুশী হইয়া চাই কি দু একটা বাতাসাও বখ্‌শিশ করিতে পারেন।

হিন্দুরা তীর্থকে পীঠ বলেন। কিসের পিঠ জানি না। কিন্তু এ বয়সেও যখনই ঢেঁকি দেখি উহার পিঠের প্রতি একটা মায়া হয়। কারণ, এই পীঠে বসিয়াই আমি দিনের পর দিন গিলিয়াছি বটতলা হইতে বঙ্কিমচন্দ্র--হাতের কাছে যাহা পাইয়াছি তাহাই।

এই পীঠে যাহারা আমার চারিদিকে ভিড় জমাইয়া তুলিল তাহাদের অনেককেই আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, এই ঢেঁকি-মন্দার দিনে বাঙ্গলার সবগুলি ঢেঁকি তাহাদিগকে স্থান দিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আর ইহাদের মাঝে বসিয়া আমার মনের চোখে মন্দা হইয়া উঠিল কিশোরীর পা দুখানির সাদা রং ও ঢেঙ্গার বিস্তৃতা।

একদিন গিলার কিছুই নাই। ঢেঁকি হইতে নামিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। পাশের নদীর যৌবনের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে; উহার বন্যায় রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত; কতকটা ডুবিয়া গিয়াছে, আর উহারই মাঝে আমার সেই একলা কাঁঠাল গাছটি ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে-- যেন 'এই পড়ি, এই পড়ি' ভাব। একখানি গরুর গাড়ি আসিয়া থামিল, আমাদের সাহায্য না হইলে ভাঙ্গা জলে-ডুবে রাস্তায় পথ চিনিয়া ওপারে যাওয়ার উপায় নাই। আমাদের একজন চালকের সহিত দর ঠিক করিল। তারপর সকলে হাত লাগাইয়া গাড়ি পার করিয়া দিলাম। সারাদিন অনেকগুলি গাড়ি পার করিলাম।

দিনের শেষে পয়সা বাঁটরার সময় আসিল। গাড়ি পার করার বেলা আমি আগাইয়া গিয়াছিলাম, এবার সকলে আগাইয়া গেল। আমার যে শুধু উৎসাহ হইতেছিল না তাই নয়, ভয়ানক সঙ্কোচও বোধ হইতেছিল। পয়সার জন্য কাড়াকাড়ি দেখিয়া আবাল্যের সাথীদের মাঝে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কেমন একটু পৃথক হইয়া গিয়াছি। তাহাদের ঢেঁকিতে শুধু ধানই ভানে। আমাদের ঢেঁকিতে যত না হয় ধান ভানা, তার বেশী হয় উহার পিঠে পড়াশোনা। ...

পরের দিন স্কুলে গিয়া নূতন শ্রেণীতে উঠিয়াছি। এবার পণ্ডিত মশাই আমাদিগকে পড়াইবেন। পণ্ডিত মশায়ের খুব বড় বড় চোখ, আর তার চেয়েও বড় গোঁফ্ জোড়া। আর গোঁফ্ জোড়ার নীচে হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে একটা উদার হাসি। পণ্ডিত মশাই ক্লাসে আসিয়াই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'এ বেটা নাকি খুব পড়াশোনা করে, পিতা শব্দের বচনান্ত কর দেখি।' আমি উঠিয়া বলিতে লাগিলাম 'পিতা, পিতারা, পিতাকে.....' আর সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত মশাই হাততালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন "কেমন জব্দ! বেটার পিতারা হয়, আমাদের আর কারো একাধিক পিতা হয় না।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস হাসিয়া উঠিল।

এই দিন হইতে স্কুল হইল আমার প্রিয়তম বিহার, আর পণ্ডিত মশাই হইলেন উহার কেন্দ্র। পণ্ডিত মশাই উপহাস করিয়াছিলেন একের বেশী পিতা হয় না। এখন তিনিই হইলেন আমার (একের অধিক) পিতা এবং সাথী। তাঁহার একটা জীবন ছিল, আমাকে ছাড়া তিনি উহা ভোগ করিতে পারিতেন না। আমার একটা জীবন ছিল, তিনি ভিন্ন কেহ উহার দ্বার খুলিতে পারিত না। ঢেঁকিতে বসিয়া যে কল্পনা শিশু জন্মগ্রহণ করিল পণ্ডিত মশাই তিলে তিলে লালন করিয়া উহাকে বড় করিয়া তুলিলেন। ঢেঁকিতে বসিয়া পড়িতাম, পণ্ডিত মশাই লিখাইতে লাগিলেন। লিখা যতই ভাল হইতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয়ের রোগ ততই চড়িয়া যাইতে লাগিল : 'আরো ভাল, আরো অনেক ভাল লিখিতে পারিবে।' মাঝে মাঝে দুএকটা লেখায় মোটা কলমের মন্তব্য পড়িতে লাগিল 'বেটা, শুধু কথার ফাঁকি। আসল কথা কই?'.....পণ্ডিত মশাই এখন নাই। কিন্তু আমার মনে তাঁহার যে মূর্ত্তি সরল হাসি মুখে চাহিয়া আছে উহা আমার প্রত্যেক অঙ্গুলিসঞ্চালনের জন্যই তারিফ অনুভব করে, আর মাঝে মাঝে যেন চেঁচাইয়া উঠে 'বেটা, শুধু কথার ফাঁকি। আসল কথা কই?.....'

স্কুলের পড়া শেষ হইল। কাল শহরে যাইতে হইবে। শেষবারের মত ঢেঁকিতে বসিলাম। হাতের 'আরব জাতির ইতিহাসে' লিখিয়াছে : এক খলিফা সমুদ্রের জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়া জ্বর হইয়া মারা পড়েন। আমি বই বাঁধিয়া পুকুর ঘাটে গেলাম এবং জলে পা ডুবাইয়া ঘণ্টা পর ঘণ্টা বসিয়া রহিলাম। কিন্তু বিধি বাম। সমুদ্রের নির্ম্মল জলে পা ডুবাইয়া মহীয়ান খলিফার প্রাণ গিয়াছিল। আর পুকুরের ময়লা জলে পা ডুবাইয়া থাকিয়া ক্ষুদ্র আমার জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ একটু শীতবোধও হইল না। আর পরের দিন আসিয়া দাদা নির্ঘাতই শহরে ধরিয়া লইয়া গেলেন। পেছনে পড়িয়া রহিল ঢেঁকি ও পণ্ডিত মহাশয়ের অসম্পূর্ণ খাতা।......

শহরে আবদুল আজীজ বি. এ.র হোস্টেলে উঠিয়াছি। ইতিহাসের লর্ড রিপনের মত চেহারা স্কুলের ইন্সপেক্টর সাহেব-তিনিই আবদুল আজীজ বি. এ.। আমাদের স্কুলেও তিনি কত বার গিয়াছেন। সব ইন্সপেক্টরকেই ভয় হইত, ইঁহাকে হইত না। অন্য ইন্সপেক্টরেরা কট্ মট্ চোখে প্রশ্ন করিয়া আঙ্গুলি ঘুরাইয়া নিতেন, 'ইউ, ইউ, ইউ'। আর ইনি প্রশ্ন করিয়া সরল সকৌতুক চোখ আমাদের মুখে মুখে স্থাপন করিয়া নাম ধরিয়া বলিতেন 'তুমি মহবুব, মহেন্দ্র।' অপরেরা উত্তর পাইতেন কম। ইনি প্রত্যেকেরই নিকট হইতে উত্তর পাইতেন, আর কোন কোন উত্তরে তিনি না হাসিয়া পারিতেন না। আমি মনে মনে

জানিতাম আবদুল আজীজ বি এ আমাকে জানেন শুধু তাই নয়, আমি যে ভাল ছেলে তাও জানেন। তাঁহার হোস্টেল সে ত আমারই অধিকার। .. .আজ আবদুল আজীজ বি. এ. বাঁচিয়া নাই। পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া মনে হইতেছে তাঁহার বিভাগের প্রত্যেক ভাল ছেলের নামই তিনি জানিতেন এবং এই জানাই সক্রিয় হইয়া অগণ্য ছেলেকে সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছে।

তিনখানি থাকার ঘর, আর দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। ছোট একখানি হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বোঝা গেল, উহা পাকঘর। তাহা হইলে অপরখানি ঢেঁকিঘর। কাছে গিয়া দেখা গেল ঢেঁকি কোথাও নাই। শুনিলাম উহা খাওয়ার ঘর। পরে দেখিলাম শহরের কোন বাড়ীতেই ঢেঁকি নাই। গ্রাম হইতে এ বিষয়ে মস্ত বড় তফাৎ। আর ইহাও মনে হইল যে একটু খানি জায়গায় যত ছেলে পড়িতে আসিয়াছে প্রত্যেকেরই জন্য একটি করিয়া ঢেঁকির প্রয়োজন হইলে শহরে শুধু ঢেঁকিরই স্থান সঙ্কুলান হইত না।

আমার এক পাশে থাকেন সুফী সাহেব--মাদ্রাসার দাড়ী ছাত্র। কাল মুখ, কিন্তু খুব তেল্‌তেলে। অপর পাশে থাকে 'দারোগার ভাই'। ফর্সা মুখ -গোঁফের অর্দ্ধেক কামান, কিন্তু বেচারাকে জব্দ করিবার জনাই যেন কামান অংশে বড বড় ব্রণ উঠিয়াছে। ভাবিলাম, মন্দ নয় -ঢেঁকির দুই মাথার মতই.....incompatible. মাথা যখন ওপরে ওঠে, এমাথা তখন নীচে নামে। এমন সময় সুফী সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম কিসের ঘণ্টা। দারোগার ভাই বলিল 'আর বল কেন? নামাজের। দিনে চার চার বার নামাজ, আর নিজের হাতে চার চার বার হাজিরী লিখ্‌তে হয়। জোহরটা স্কুলে কাটে ব'লে রেহাই। মাসের শেষে যাকে মোটেই গরহাজির পাওয়া যায় না তাকে খেতে দে'য়া হয় সোডা, লেমনেড্ ইত্যাদি।'' দারোগার ভাইএর বিরক্তি দেখিয়া সুফী সাহেব একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। বুঝিলাম, লেমনেড শিকা এ পর্য্যন্ত আর কারো ভাগ্যে ছিঁড়ে নাই। সুফী সাহেব চটির আওয়াজ করিতে করিতে চলিলেন মস্‌জিদে। দারোগার ভাই চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল। দীর্ঘ ব্যবধানের পর আমিও আবার মস্‌জিদে চলিলাম।

মস্‌জিদের আচার্য্যকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। খুব উঁচু চেহারা আর এত ঋজু যে এই লোকটা (মস্‌জিদে ছাড়া) আর কাহারও নিকট মাথা নত করিবেন এরূপ মনে হয় না। বিশিষ্ট নাক, উদার চাহনি ও দীর্ঘ শ্মশ্রু--অত লোকের মাঝেও মনে হইতেছিল উনি একা এবং উনিই আচার্য্য। আমি উঁহার পাশেই অজু বানাইতে বসিলাম। আচার্য্য আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং যখন বলিলেন যে আমি তাঁহার বন্ধুর ভাইয়ের ছেলে তখন আমার বড় আনন্দ হইল। কিন্তু আমি আনন্দের আবেগে আকুল হইয়া গেলাম যখন রাত্রে তাঁহার আবৃত্তি শুনিলাম। একমাত্র তাঁহার কণ্ঠেই ঐরূপ আত্ম-নিবেদন ধ্বনিত হইতে পারে যাঁহার হৃদয় বিশ্বাসে স্থির ও ভক্তিতে প্রশান্ত।

এই দিন হইতে আচার্য্যের আবৃত্তি আমাকে মস্‌জিদে আকর্ষণ করিত। তাঁহার পাশে বসিয়াই আমি অজু বানাইতাম, আর তিনি তারিফের প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন : 'আগামী বেলায় নামাজ পড়া হবে নাকি?' কিন্তু আসরের সময় আবৃত্তি থাকিত না। তবুও নামাজটা পড়িতে হইত ব্যাডমিন্টন এর তাগিদে। এই খেলাটা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু আসরের নামাজ না পড়িলে ইহা খেলিতে দেওয়া হইত না। সুতরাং আমি নামাজও পড়িতাম, ব্যাডমিন্টনও খেলিতাম, কখনও কখনও খেলার সুযোগ স্থির নিশ্চয় রাখার জন্য 'র‍্যাকেট' বগলে করিয়াই নামাজ সারিয়া লইতাম। তখন খোদা আমার কোনটা গ্রহণ করিতেন নামাজ বা 'ব্যাড্‌মিন্টন' কে বলিবে! বর্ত্তমান সময়ে খোদা বাঙ্গলার মুসলমানের নামাজ না খেলাধূলা--কোন্‌টা কবুল করিতেছেন কে জানে?

রাত্রে শুইয়াছি। 'দারোগার ভাই' বিছানায় শুধু ওলট্ পালট্ করিতেছে। আমি ভাবিলাম : তাহার কামানো গোঁফে আর একটা ব্রণ উঠিতেছে, সেই জন্যই ঘুম হইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, 'দারোগার ভাই'র গলার আওয়াজে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম। অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, 'দারোগার ভাই' বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। আমাকে জাগিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'হুদা, মালেক, সিরাজ- এদের বালিশ সব কোথায় গেল বলিতে পার?' চাহিয়া দেখিলাম : হুদা, মালেক, সিরাজ, লেপের তলায় ঘুমাইতেছে, কাহারও শিয়রে বালিশ নাই। আমাদের আওয়াজে হাউস্ টিউটার জাগিয়াছিলেন, এবার আসিয়া লেপ কখানি উল্টাইয়া দিলেন। দেখা গেল লেপের তলায় বালিশগুলি ঘুমাইতেছে--হুদা, মালেক ও সিরাজ কোথাও নাই। ... . ঘণ্টা দুয়েক পরে হাউস টিউটার রামমূর্ত্তির সার্কাস হইতে ইহাদিগকে ধরিয়া আনিলেন। নারদের মত ঢেঁকি নাই যে হতভাগারা স্বর্গে পলাইয়া যাইবে। সুতরাং আসিতেই হইল। তারপর--ঢেঁকি ত নাই--মুষল-পর্ব্ব।

পরের দিন--খুব মাতামাতি। জালালুদ্দীন আসিয়াছেন। জালালুদ্দীন পূর্ব্বে এই হোষ্টেলে থাকিয়াই পড়িতেন। এখন তাঁহার ডানা গজাইয়াছে--কলিকাতায় পড়েন। শুধু তাই নয়, ইংরেজী বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতে ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন। এ গুণে কলিকাতার ধাড়ী মহলেও স্থান করিয়া নিয়াছেন। এহেন জালালুদ্দীনকে মাঝে বসাইয়া আমরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম আর দুচোখে তাঁহাকে গিলিতে লাগিলাম। জালালুদ্দীন বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রদীপ সমাজের এক একটা স্থান তোমাদিগকে আলোকিত করিতে হইবে। কেউ যদি কম জ্বল অথবা নিবিয়া যাও তাহা হইলে উহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি আঁধারে পড়িয়া থাকিবে...." আমি অপলক চোখে চাহিয়া আছি। মনে হইতেছে জালালুদ্দীন আমার Mesiah। Mesiah যেন আমাকে জীবন-বেদ পড়িয়া শুনাইতেছেন। পাশেই 'দারোগার ভাই'। গোঁফ চুলকাইতে চুলকাইতে সেও অভিভূত হইয়াছে। আমার দিকে চাহিয়া অস্ফুটে বলিল "নাঃ একটা কিছু করিতেই হইবে।"

রাত্রে--একবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। সুফী সাহেব নামাজ পড়িয়া আসিয়া দেখেন- নামাজের হাজিরা বই কোথাও নাই। যাহারা রীতিমত নামাজ পড়িত--বিশেষ করিয়া সুফী সাহেব, একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। যাহারা ব্যাডমিন্টনের তাগিদে নামাজ পড়িত তাহাদের দুঃখও কম নহে। আর্ত্ত ভক্তও ভক্ত ত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। খদ্দরের ইউনিফরমের ন্যায় ব্যাডমিন্টনের এই নামাজটুকুও যে কাজে লাগিত না তারই বা প্রমাণ কি? কালই মাসের শেষ সুফী সাহেবের সোডা বখ্শিশ পাওয়ার দিন। এমনই ভাগ্য--একেই বলে Slip between the cup (এখানে বোতল) and the lip! আর যাহারা নামাজ পড়িত না তাহাদের টনক নড়িল না। তলে তলে তাহারা নিজেরাই একটা সোডা-পর্ব্ব করিবে এরূপ মনে হইল। আর সব কিছুরই মাঝে 'দারোগার ভাই' সটান শুইয়া দিব্বি নির্ব্বিকার ভাবে গোঁফ চুলকাইতে লাগিল। . . .অনেক রাত্রে সুফী সাহেব নর্দ্দমার ভিতর হইতে খুঁজিয়া আনিলেন হাজিরা বইটাকে--কিন্তু পাতাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছেঁড়া, আর ছমিউদ্দীন বাবুর্চি আঁধারে টের না পাইয়া এঁটো ডাল দিয়া উহাদিগকে নাওয়াইয়া দিয়াছে।

হাউস্ টিউটার রাগিয়াই খুন। প্রত্যেককে মস্‌জিদে নিয়া গেলেন। প্রত্যেককে শপথ করিতে হইল যে সে পাতা ছিঁড়ে নাই। মুস্কিল হইল আমার বেলা। আমি বলিলাম যে খাতা আমি ছিঁড়ি নাই, কিন্তু মস্‌জিদে যাইতে ও শপথ করিতে অস্বীকার করিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অপর দুই ঘরের মাতব্বর ছেলেরা আমার সমর্থন করিতে লাগিল। হাউস্ টিউটার মুস্কিলে পড়িয়া স্বয়ং আবদুল আজীজ বি.এ.র নিকট Appeal করিলেন। তিনি আসিলেন। আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হাসো। উঁহার চোখ মুখ ভাসিয়া উঠিল। আমার দিকে চাহিয়া আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি বলিলেন 'মহবুব একাজ করে নাই। যে ছেলে এ কাজ করেছে সে তিন দিনের মধ্যে আমার কাছে স্বীকার করুক। তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। আমি শুধু তার নৈতিক সাহস দেখ্‌তে চাই।' ....তিন দিন পরে শুনিলাম দোষ স্বীকার করিয়াছে--'দারোগার ভাই'। ভাবিলাম মসজিদে গিয়া শপথ করিল কিরূপে! চাহিয়া দেখিলাম--পাশে সেই সটান শুইয়াই গোঁফ চুলকাইতেছে। মনে পড়িয়া গেল সেই যে জালালুদ্দীনের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিল একটা কিছু করিতে হইবে। যে কোন একটা কিছু করাকে হয়ত গোঁফ চুলকানোর অধিক কিছু সে মনে করে না।

বিদ্যায় এবং শরীরে আরও বাড়িয়া বন্ধে বাড়ীতে আসিয়াছি। কিশোরী আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, কাঁখে একটি ছেলে। আমার দেখিয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিল। তারপর ছেলে কাঁখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া মনে হইল বড় মামুলী। আমাকে বুকে কত মানসী--কত দলনী বেগম পায়ে পেশোয়াজ পড়িয়া ও কত শৈবলিনী কাঁখে কাপড় জড়াইয়া--বাসা বাঁধিয়াছে। কিশোরীর হাত দুখানি যে আমাকে বাঁধিতে পারিবে এরূপ মনে হইল না। তাহাকে দুটো কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে। কিশোরী খুশি হইয়া চলিয়া গেল। আজ মুরুব্বিয়ানার অধিক সে কিছু প্রত্যাশা করে না। কৈশোরে যে দুইজন এত মাখামাখি করিয়াছিল তারা যেন আমরা নই--যেন পাড়ার আর দুটি ছেলে-মেয়ে। আমি যেন চিরকালই শহরে পড়ি, আর সে যেন চিরকালই গাঁয়ের মেয়েটি--একদিন যেন প্রকৃতির পাঠশালায় উভয়েই পরস্পরের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করি নাই। চিররহস্যময়ী প্রকৃতি!

বাড়ীতে মন বসে না। একটা শিশু আমার মনে বড় হইতেছে। যেদিন গরুর গাড়ী পার করিয়া বখ্শিষ নিতে আমার বাধিয়াছিল সেদিন উহার জন্ম হইয়াছিল। আর যেদিন জালালুদ্দীন জীবন-বেদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন সেদিন এই শিশু কান পাতিয়া তাহা শুনিয়াছিল। যাহাদের চালে খড় নাই, পুকুরের জল যাহাদের পঙ্কিল, লতা-গুল্মের তলায় যাহাদের অপরিসর উনানে বৎসরের এ-মাথা হইতে ও-মাথা পর্য্যন্ত রান্না হয় শুধু সেই লতাগুল্মের শাক--এই শিশুটি শুধু তাহাদেরি আনাচে

কানাচে ঘুরিয়া ফেরে। উহাদের বউ পেটে সন্তান-সম্ভাবনা করিয়া যখন--পেটে নাই ভাত, পিঠে নাই কাপড়--ভবিষ্যতের মাঝে দুরন্ত মাঘের রাতে প্রসব বিপদের কথা ভাবিয়া নিজের মনের সঙ্গোপনে হতাশার ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসটিকে লুকাইয়া ফেলে, এই শিশুটি তখন ভয়ানক হাত পা ছুঁড়িতে থাকে। আর উহার হাত-পা ছোঁড়ার মাঝখানে আমি নিজের কর্ত্তব্য দেখিতে পাই-যে কর্ত্তব্য করার অর্থ জালালুদ্দীনের কথায় হইবে আমার জ্বলা, আর যাহা না করার অর্থ হইবে আমার নিবিয়া যাওয়া।

আমি দেবেনবাবুর কাছে যাই। তিনি কলেজে পড়িতেন বৎসরের কয়টি মাস আর গ্রামে আসিতেন পূজার কয়টি দিন। কিন্তু এ কয়টি দিনই সব কয়টি মাসের সমান হইয়া উঠিত আমাদের কর্ম্ম-চঞ্চলতায়। শহর হইতে অনেক কিছু সমস্যার রেশ তিনি আমাদের জন্য বহিয়া আনিতেন আর আমরা সার্কাসের ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র-শিশুর আহার পাওয়ার মত পাওয়া মাত্রই বক্তৃতার মধ্য দিয়া উহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া সাবাড় করিয়া ফেলিতাম। এ সকল বক্তৃতার জন্য পূজার সময় সভা হইত, আর উহাতে সভাপতি হওয়ার জন্য বুড়া মোক্তারবাবুকে শহর হইতে আনান হইত। তিনি সভাপতির মন্তব্য প্রথমে ধীর গলায় আরম্ভ করিতেন, ক্রমে উত্তপ্ত স্টোভের ন্যায় তাঁহার গলা বড় ও জ্বালাময় হইয়া উঠিত, আরও ক্রমে তিনি হাতের আস্তিন গুটাইয়া ফেলিতেন এবং কাঁধের চাদর দাঙ্গা-প্রার্থীর ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি মাথায় জড়াইয়া লইতেন। তখন আমরা এমন তুমুল হাততালি দিতাম যে, দর্শকরা তাঁহার মুষ্টি-আস্ফালন দেখা ছাড়া বক্তৃতার কিছুই শুনিতে পাইত না। হাততালি শেষ হইলে মোক্তারবাবু হাঁপাইতে থাকিতেন এবং বসিয়া পড়িয়া যুদ্ধজয়ী ক্লান্ত সৈনিকের ন্যায় চুমুকে চুমুকে একগ্লাস জল পান করিতেন।

দেবেনবাবু আমার প্রস্তাব মন দিয়া শুনিলেন। বলিলেন : ঠিক হাউবেছ। জ্ঞান, ব্যায়াম ও সেবা--এই তিনটি বিভাগ খুলিয়া আমাদিগকে কাজে নামিতে হইবে। শুভস্য শীঘ্রম। আগামী পরশুই ইহাদের উদ্বোধন। পরের দিন নানারূপ preliminaryতে কাটিল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য বিরাট বিজ্ঞাপন তৈয়ার হইল। উহাতে খুব সাহসী (bold) অক্ষরে লিখা হইল 'জ্ঞান' 'ব্যায়াম' ও 'সেবা'। অতঃপর উদ্বোধন।

মাঠের মাঝে দীঘি। উহার উঁচু পাড়ে উদ্বোধন হইতেছে। উদ্বোধন করিতেছেন এক ফটোগ্রাফার -ক্যামেরার সাহায্যে। জ্ঞানের পতাকার তলে দেবেনবাবু স্বয়ং আসীন গুরুম'শায়ের গেরুয়া পবনে; সম্মুখে সদস্যারা বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বটতলা যিনি যাহাই পাইয়াছেন খুলিয়া বসিয়াছেন। ব্যায়ামের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়াছে ঢেঙ্গা ও তাহার দলবল মুগুর হাতে- যাহারা জীবনে মুগুর হানে নাই, কিন্তু যাহাদের পিঠে মুগুর ভাঁজিয়া রমণ যমেরও শঙ্কা-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। (নতুবা, এত প্রার্থনা সত্ত্বেও যমের দুয়ারে যাওয়া দূরে থাক্ কোনদিন অসুস্থ বলিয়া তাঁহার স্কুল কামাই হইল না! আর সেবার পতাকার পাশে আমরা কয়েকজন--একটা কৃশ সঙ্গীকে মেথরের ঢঙে কাপড় পরাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছি। কিন্তু সঙ্গীটি ভয়ানক মুস্কিল বাধাইতেছে। কথা আছে যে সে কলেরা রোগীর ভঙ্গীতে বমি করিতে থাকিবে এবং চোখ উল্টাইয়া ফেলিবে। কিন্তু সে একবার বমির ভঙ্গী করিয়া দশবার এমন জোরে হাসিয়া উঠিতেছে যে সে হাসি সংক্রামক হইয়া এক দেবেনবাবু ছাড়া আর সকলেরই মুখে-চোখে উহার ছাপ আঁকিয়া দিতেছে। দেবেনবাবু যাব যাব কর্ত্তব্য করা সম্বন্ধে তখন ঝাঁঝাল বক্তৃতা ছাড়িলেন। আরও কয়েকবার rehearsal এর পর ছেলেটি ভাবিতে পারিল যেন সত্যই তাহার কলেরা হইয়াছে। সকলের নজর তাহার দিকে। অন্ততঃ উদ্বোধনের খাতিরে হইলেও তাহার কলেরা হওয়া উচিত। ... . ফটো উঠির গেল। দেবেনবাবু গেরুয়া ছাড়িয়া ধুতি-জামা পরিলেন, ঢেঙ্গার দল মুগুর রাখিয়া দিল, আর কলেরা রোগীটি অতখানি সেবার পরিবর্ত্তে চিমটি কাটিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। ... ...জীবনে আমি বহু উদ্বোধনে যোগ দিলাম; কিন্তু সেই যে আমাদের ফটো উঠিয়াছিল উহা হইতে কোন উদ্বোধনই ত পৃথক মনে হইল না।

রাত্রে বাড়ী আসিয়াছি। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। সদরের দরজায় রাস্তার পানে চোখ রাখিয়া মা দাঁড়াইয়াছিলেন যেমন তিনি চিরকালই দাঁড়াইয়া থাকেন বাহির হইতে আমার ঘরে ফিরিবার প্রতীক্ষায়। জ্যোৎস্না যেন মাকে ঘেরিয়া নাচিতেছে, জ্যোৎস্নার শিশুগুলি যেন মার পায়ে লুটাইয়া খেলা করিতেছে। মার সহিত চোখাচোখি হইতেই মন খুশিতে ভরিয়া উঠিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কি কর্‌ছিলি?" বলিলাম "ফটো উঠাচ্ছিলেম"। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আজ উদ্বোধনেরই কথা ছিল। কিন্তু মার সম্মুখে মিথ্যা কথা মুখে আসে না, আসল কথাটাই আসে। যখনই আত্মপ্রবঞ্চনা করি মা তাহা ধরিতে পারেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন "তুইও আমার মত ঃ চট্ করে বুঝতে পারিস না। আবার ভেবে দেখ্।"

বিছানায় শুইয়া ঘুম আসিতেছে না। জ্যোৎস্না আমি সহ্য করিতে পারি না। জ্যোৎস্না আমাকে পাগল করিয়া তোলে। পাতাল, মর্ত্ত্য ও আকাশের যেন সব দ্বার খুলিয়া যায়, আর প্রত্যেক দ্বারে হাত-ধরাধরি করিয়া যেন জাগে তাহাদের যুগল রূপ যাহারা জীবনে ভোগ করিল না মিলনের সুখ--শিরী ও ফরহাদের, লায়লী ও মজনুর, ইউসুফ ও জোলেখার, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের, দলনী বেগম ও মীরকাশিম... । আমি নিজেকে ভাবি যেন মজনু, যেন ইউসুফ, যেন চন্দ্রশেখর, আবার লায়লী, যেন শিরী, যেন জোলেখা...আমার চোখে জল আসে।...হঠাৎ আমি হৃদয়ের টাংকার শুনিতে পাই : কোথায় কোথায়, আমার অপেক্ষায় বসিয়া আসে একটা দেহ, আমার মনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে আর একটি মন--সে কোথায়?

মা আসিয়া নীরবে সে কাম্‌রায় ঢুকিলেন। নীরবে পাশে বসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার মনে হইল যেন হাত বুলাইবার ছলে মা আমার মনের কথাটি পাঠ করিতেছেন আর আমাকে প্রবোধও দিতেছেন। হঠাৎ মা আমাকে সোজা প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, বিয়ে কর্বি?" মার আর আমার মন একই সূত্রে বাঁধা। এই প্রশ্ন যে হইবে একরূপ সংস্কার সংস্কার বশেই তাহা আমি বুঝিতেছিলাম। বলিলাম "কর্ব"। "কাকে কর্বি"? এইবার ফাঁপরে পড়িলাম। বালির সাথে যখন খেলিতাম তখন কেউ জিজ্ঞাসা করিলে সোজা উত্তর দিয়াছি "নানীকে কর্ব"। তখন নানী ভিন্ন কাউকে জানিতাম না, আর ঢেঙ্গার নিকটও পাঠ গ্রহণ করি নাই। এখন? নাম একটা না করিলে হয়ত বিয়েটাই ফস্‌কাইয়া যাইতে পারে। এবার মরিয়া হইয়া গ্রামের সে মেয়েটির নাম করিয়া ফেলিলাম আজ বাড়ি ফিরিবার পথে যাহাকে ঘাটে গা মাজিতে দেখিয়াছিলাম। মা চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন "তুইও আমার মত, চট্ করে বুঝতে পারিস্ না। আরও ভেবে দেখ।" অপর ঘরে গিয়া বাবাকে হুকুম করিলেন "আমার একটি পাগ্‌লী বউ চাই।" বিছানায় আমি ঘামিয়া নাইয়া উঠিয়াছি। সত্য হউক মিথ্যা হউক নাম যে একটা করিতে পারিয়াছি এই আমার ঢের। মা যে ঠিক বৌ আনিবেন এতে আমার সন্দেহ নেই।

বিবাহ হইয়া গেল। যাহাদের ঢেঁকিতে শুধু ধানই ভানিল, আর যাহাদের ঢেঁকিতে যত না হয় ধানভানা তার অধিক হয় পড়াশোনা সব একাকার হইয়া গেল। উহাদের অনেকের বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছিল, এবার আমার হইল। উহাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছিল রূপকথার একটা মধুমালা পুঁথির হয়ত একটা গোলেবকাউলি - আর আমার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বটতলা যত রাজ্যের রূপকুমারিগণ। কিন্তু কল্পলোকের সব উর্ব্বশী মিলিয়াও ঠেকাইতে পারিল না এই বিবাহকে। আসলে মানুষ চলন্ত উদ্ভিদ্ অপেক্ষা বেশী কিছু নহে। উদ্ভিদের যখন ফুল হয়, ক্রমে বীজ পাকে, তখন কাকের মুখের রসেও সে বীজ গজাইতে চায়। হয়ত পেটে হাত, পিঠে কাপড়, আর বংশ-বৃদ্ধির সুযোগ, ইহার অধিক মানুষের কাম্য নাই।

বৌ পাগ্‌লী--পাগ্‌লীই বটে। এক বয়সের মেয়ে আছে--মানুষের ইচ্ছা করে তাহার গালটা টিপিয়া দেই, তাহাকে চটাইয়া দেখি তাহার রাগত মুখখানি কেমন লাল দেখায়, তাহাকে কাঁদাইয়া দেখি কেমন বড় বড় পক্ষ্মের তলে তাহার ডাগর ডাগর চোখে মুক্তার ফসল ফলে। কিন্তু এ মেয়ের গাল টেপার জো নাই, ইহাকে চটাইতে ভয় হয়, ইহাকে কাঁদাইতে গিয়া হয়ত নিজেকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। কারণ বিড়াল-ছানার মত এ সর্ব্বদাই on guard, মুহূর্ত্তেই নখ ও দাঁতের সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত, চাই কি বাঘের মত ঝাঁপাইয়াও পড়িতে পারে। বইতে যত প্রণয়িণীর কথা পড়া ছিল এক শৈবলিনী নদীতে সাঁতার কাটিয়াছিল--কিন্তু এমন নখদন্তযুক্ত জীব একটিও লিখে নাই। অথচ, মেয়েটি যে আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করে নাই তা নয়। সে পরম আগ্রহে আমাকে খাইতে দিবে, পরম যত্নে আমার বিছানা সাজাইবে, আর তার পা যদি আমার কাপড়ে লাগিয়া যায় অমনি নত হইয়া টুক্ করিয়া আমার পায়ের ধূলা নিবে। বলিলাম "তোমার বয়সী কিশোরীর ছেলে হইয়াছে।" মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আমি কি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি?" হাসিয়া বলিলাম "তুমি আমল না দাও, অপরে যদি দেয়।" মেয়েটি নিমেষেই জ্বলিয়া উঠিল, রক্ত-চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল ঝেঁটিয়ে ঘরের বার কর্ব্ব না?" আশ্চর্য্য! আমারি ঘর, আর এ মেয়েটি প্রস্তাব করিতেছে ঝাঁটাইয়া আমাকে ঘরের বাহির করিতে। ভাবিলাম, বিংশ শতাব্দীর মজনু! তোমার পুরাবৃত্ত সব ভুল। তোমার কপালে আছে খুন-জখম হওয়া, হাস্‌পাতালে যাওয়া।

আমি গোপনে লড়াইতে নাম লিখাইয়া দিলাম। সেই যে শিশুটা আমার মনে সর্বহারাদের দুঃখে ভয়ানক হাত পা ছুঁড়িতে থাকিত, সে আরও বড় হইয়াছে। সে ভয়ানক তিরস্কার করিতে লাগিল। ছিঃ, বাহিরে এত আলোড়ন আর তুমি একটি মেয়ের খেলার সামগ্রী হইয়া ঘরে বসিয়া আছ! জালালুদ্দীন মনের ভিতর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন : নাম দাও, নতুবা তোমার গ্রাম আঁধারে পড়িয়া থাকিবে।

শহরে আমার ডাক পড়িল। বাহাদুর আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন : ভাইরে দেশের দুঃখ আর কেহ বুঝিল না! বড় মহলে আমাকে নিয়া লোফালুফি হইতে লাগিল। এক উঁচু দরের বাড়ীতে গিন্নী আমাকে ডাকাইয়া নিলেন, বলিলেন "দেখ, তোমার মুখ দেখে আমার মনে বড় উচ্চ ভাবের উদয় হয়েছে। আমি চাকরদের বলে দিয়েছি তোমাকে দিবারাত্রি যে কোন সময় আমার কাছে আস্‌তে দেয়।"......

খুব ভোরে গিন্নীর কাছে আমার প্রয়োজন। এই ভোরটার সহিত আমার সাদৃশ্য আছে—কোথাও এতটুকু কালি নাই, সঙ্কল্পের সূর্য্য মুখে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে আর উহার আলোতে আমার অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখা যায়--কী সাদা! বাহিরে উহার স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে--কী শক্তিশালী আমার পা দুখানি, শক্তি ও সরলতায় মাখামাখি করিয়া আমার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে যে রূপ দিয়াছে উহা হয়ত দেবশিশুর। চাকর সোজা তাঁহার শোবার ঘর দেখাইয়া দিল। আমি নিঃসঙ্কোচে ঢুকিয়া পড়িলাম।

খুব সাজানো কামরা। কোণে কোণে আঁধার এখনও লুকাইয়া আছে। পালঙ্কের উপর সদ্য ফোটা পদ্মের ন্যায় গিন্নীর মুখখানি ভাসিয়া আছে। মুক্তার মত চোখ মেলিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর ইশারায় আমাকে কাছে ডাকিয়া পালঙ্কে বসাইলেন। গিন্নী আমার বাঁ হাতখানি নিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি বুকের কম্বল তুলিয়া আমার হাত খানিকে তাঁহার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। কী সাদা তাঁহার বুকখানি, আর আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বাম করে একাগ্র হইয়া অনুভব করিতেছে--কী কোমল উহা। গিন্নী চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্-পিণ্ড এত জোরে আছাড় খাইতেছে যে, সারা কামরায় যেন উহার প্রতিধ্বনি জাগিতেছে। আর আমার? আমার মনে একবার জোয়ার বহিতেছে, প্রচণ্ড ক্ষুধায় জাগিয়া উঠিতেছি আমি পুরুষ, হয়তো এ জোয়ারে সব ভাসিয়া যাইবে, এ ক্ষুধার সম্মুখে সারা বিশ্ব এসে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় আমি নারী-দেহটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। এ দেহ ভোগে লাগিবে নাকি? কিন্তু, মুহূর্ত্তে আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। এ যে নারী নহে, এ যে মা! গিন্নীর যে ছেলে আছে! অতখানি Passion এর মাঝেও যে তাঁহার মুখে জ্বলিতেছে জননীর ছাপ। আমি মাথা নত করিলাম, বিদ্যুতের ন্যায় আমার মর্ম্ম আলোকিত করিয়া গেল জননীর মূর্ত্তি -যিনি হয়ত আমার প্রতীক্ষায় সদরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর আকাশের চাঁদ জ্যোৎস্না শিশু হইয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া খেলা করিতেছে।......যখন বাহির হইলাম, দেখিলাম--কাম্‌রার দরজায় বসিয়া লম্বা পাঞ্জাবী চাকর। আমাকে দেখিয়া তাহার ঠোঁটের কোণে একটা বক্র হাসি উঁকি মারিতে লাগিল, আর একবার সে ভ্রূকুটি করিল। কেন জানি না, মনে হইল সে বহুদিন ধরিয়া আছে এবং হয়ত সব কিছুর গোড়াতেই আছে।

বৈকাল বাহাদুরের ওখানে বেড়াইতে গেলাম। বাহাদুরের প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। কাছারী হইতে আসিয়া বাহাদুর গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন, আর ভুঁড়িটা ছাড়া পাইয়া নীচের দিকে কাত হইয়া পড়িল। আমাদের হইতে ভুঁড়িওয়ালাদের মনে হইল পৃথক জাতীয় জীব। আমরা জামা পরি অভ্যাস বশে। আর ভুঁড়িওয়ালারা হয়ত পরে ভুঁড়িকে আটকাইয়া রাখার প্রয়োজনে। তবুও বাহাদুরের মস্ত ভুঁড়ির প্রতি কেমন একটা মায়া হইল। মনে হইল যে লোকটা দেশের দুঃখে দশজনের সাম্‌নে কাঁদিয়া ফেলিল, দেশের জন্য চিন্তা ছাড়া ও-ভুঁড়িতে আর কিছু নেই।

বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খাবে"? একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন "তোমার মত অনেক লাল ছেলেই আমার এখানে

(শেষ দিন)

আমি ও মামা মাছ ধরিতেছিলাম। মামা জাল ছুড়িতেছিলেন, আমি মাছ কুড়াইয়া লইতেছিলাম। আমি তখন কাপড় পরি না, কাপড় পরার হুকুমও আমার উপর হয় নাই। মামা মাঝে মাঝে কাপড় পরেন, যদিও তাঁহার উপর হুকুম হইয়াছে সর্ব্বক্ষণ কাপড় পরার জন্য.......

সেদিন হঠাৎ একটা মাছ উঠিয়াছিল রাঙ্গা। পুটিই বটে। কিন্তু, এ-রকমটা আমরা আর কখনও দেখি নাই। কান্‌কো, ডানা আর লেজে যেন কে মেহ্‌দীর ছোপ লাগাইয়া দিয়াছে। আমরা অবাক্ হইয়া অনেকক্ষণ উহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম। পরে মামার যেন হঠাৎ বুদ্ধি হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন : "এ-মাছকে খাওয়া হবে না। এর নতুন বিয়ে হয়েছে। দেখ্‌ছিস্ না, সারা গায়ে মেহ্‌দীর রং! খেয়ে ফেল্লে ওর বৌ ভয়ানক কাঁদ্‌বে।" আমি মামার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া উহাকে জলে

ছাড়িয়া দিলাম। মাছটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

এ-ঘটনা আমি ভুলিয়া গিয়েছিলাম। আরব সাগরে বরোদা জাহাজে বসিয়া ভয়ানক রোলিং ও পিচিং-এর মাঝখানে নিজের মেহ্‌দী-ছোপান হাতের দিকে চাহিয়া হঠাৎ উহা আমার মনে পড়িয়া গেল। সে-মাছটির তুলনায় নিজকে মনে হইল হতভাগ্য। হাতের মেহ্‌দী তাহাকে ব্যাধের পাশ হইতে নিয়া গিয়াছিল প্রিয়তমার বাহুডোরে, আর উহাই আমাকে নিয়া যাইতেছে সেই বাহু-ডোর হইতে এমন এক জীবনে যেখান হইতে হয়তঃ আমি আর ফিরিব না।

আমি এক নূতন সঙ্কল্প করিলাম--কিচেনারের ন্যায় নারীবর্জ্জিত জীবন গঠন করিব। তারপর যুদ্ধস্থলে পৌঁছিয়া রাইফেলের ঠেলায় হাতের মেহ্‌দী মুছিয়া গেল, রুটি খাইয়া বাঙ্গালী বুকের ছাতি শক্ত হইয়া গেল আর নিত্য মার মুখিতার মাঝে নারীকে লইয়া যত খেয়াল কোথায় উবিয়া গেল। এমন সময় আমার হাতে পড়িল--"A Belgian Girl's Confession." তখন দেখিলাম, নিত্য মার-মুখিতার মাঝে মনের নারী নাই, বরং দীর্ঘ বিশ্রাম পাইয়া কাপে বসে ভাবিয়া উহা হইয়া উঠিয়াছে যেমনই ঐশ্বর্য্যশালী তেমনি লোভনীয়। কিন্তু এখানে বলা উচিত, সেই Confession কি ও কিরূপে আমার হাতে আসিল।

হাসপাতালে আমার কর্ত্তব্য পাড়িয়াছিল। সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড কাপ্তেন Dর অধীন। উহার মাঝের এক কামরায় বসিয়া আমাকে হিসাব লিখিতে হয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব--কার ক'খানা গেল, ক'খানা বাঁকিয়া চুরিয়া রহিয়া গেল সে হিসাব। একচোটে কাটিয়া ফেলিলেই আমরা বাঁচি। Dরও কাজ সোজা হয়, আমারও হিসাব সহজ হয়। কিন্তু, যুদ্ধক্ষেত্রের wounded সহজে মরে না। সে শিক্ষা পাইয়াছে minor operation-এ সার্জ্জনের চক্‌চকে ছুরির দিকে তাকাইয়া দেখিতে--কতখানি ক্ষিপ্রতার সহিত D তাহার দেহে উহা ঢুকাইয়া দেন আর তীরবেগে ফিন্‌কি দিয়া লাল টকটকে রক্ত ছুটিয়া দানা বাঁধিয়া যায়। তাহাকে বলা হইয়াছে 'বীরের মত' উহা উপভোগ করিতে। যখনি ভয়ে সে মুখ ফিরাইয়াছে অথবা যন্ত্রণায় কাত্‌রাইয়াছে, D অমনি ধাক্কা দিয়া হাঁকিয়াছেন ঃ 'কেয়া, তোম্ সিপাহী নেহি হো?' অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেপনেলের গোলা যখন হুঙ্কার দিয়া ফাটে, উহার প্রতি টুক্‌রা মুখে করিয়া নিয়া যায় হয়তঃ তাহার উরুর একতাল মাংস, পায়ের একটা পাশ, মুখের অর্দ্ধেকটা--তখন সৈনিক এতটুকু সহানুভূতির প্রত্যাশা করে না। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ মৃত্যুর মুখে তাহার এই চর্ব্বণ, যন্ত্রণার প্রতিটি ফোঁটা সে উপভোগ করে। মা বোনের কথা বহুপূর্ব্বেই সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিষ্কৃতির কথা তাহার মনে উঠে না, যেহেতু সে জানে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। সে কিছুকেই ভয় করে না। কারণ, তাহার সম্মুখে মৃত্যু, পেছনে মৃত্যু, ডানে মৃত্যু, বামে মৃত্যু, উর্দ্ধে মৃত্যু, অধে মৃত্যু।...এ-ই যুদ্ধক্ষেত্রের আহত--ইহারা সহজে মরে না। মৃত্যুর মুখে থাকিয়া ইহারা যেন ঐ মুখের প্রতি অণু-পরমাণুর বিশ্লেষণ করিতে থাকে, আর ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সময় যেন তাহার 'দৌড়' ভুলিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

রাত্রে একটা আহতের মৃত্যু হইতেছিল। ইলেকট্রিক ফ্যানের তলায় আমরা তাহার খাটিয়াটা টানিয়া নিয়া গিয়াছিলাম। ফ্যান তাহাকে পাখা করিতেছিল। আমি ও হস্‌পিটাল-আর্দ্দালী নূরুদ্দীন তাহার পাশে বসিয়াছিলাম। মৃত্যুটা আমাকে নোট করিতে হইবে। নূরুদ্দীন লোকটার প্রতি ক্ষ্যাপা ছিল। নূরুদ্দীন যখনই অপর আর্দ্দালীদের সহিত গল্প করিতে চাহিত, লোকটির তখন সময় হইত কাত্‌রাইয়া রসভঙ্গ করার। এই অপরাধে নূরুদ্দীন তাহাকে কতবার মারিয়াছে। আজ আমাকেও এম জ্বালাতন করিতেছে না। কখন থেকে লোকটি মরিতেছে, আমার calculation মতে কখন তাহার মৃত্যুর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে--সে অনুযায়ী চাকর খাবার বাড়িয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গরম খাবার ঠাণ্ডা হইতে চলিল কিন্তু লোকটি শুধু গোঙাইয়াই চলিয়াছে, এখনও তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়ার সময় হয় নাই।

এমন সময় সিস্‌টার G আসিয়া পড়িলেন। Gর সাদা ধব্‌ধবে পোষাক, উহার তলায় ফ্যাকাশে মুখ এত ফ্যাকাশে যে চোখের কাল পালক ও ভ্রূ নজরেই পড়ে না। যেন সাদা দেওয়াল--চাহিয়া আছে, কিন্তু ভাষা নাই। আসিয়া মরণযাত্রীর পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন--যেন তাহাকে দেখিতে পান পাই!

অবশেষে লোকটির গোঙানী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। নূরুদ্দীন তাহার গল্পের বাকিটা শুরু করিয়া দিল। আমি নোট করিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। সিস্‌টার G তখন একটু সূপ্ এলাহাদাদের মুখে ধরিয়া সাধাসাধি করিতেছেন : 'আরেকটু খাও।' এলাহাদাদ জোওয়ান পঞ্জাবী সেপাই, পায়ে গুলি খাইয়া হস্‌পিটালে আসিয়াছিল।

ঘা এখনও শুকায় নাই, কিন্তু সিস্টার Gর হাতে খাইয়া তার ভুঁড়ি নামিয়াছে। গায়ে শক্তি যেন বাঁধিয়া রাখা দায় হইয়াছে, তাই সারাদিন ওয়ার্ডের সকলকে যে জ্বালাইয়া মারে। এলাহাদাদ সিস্টারের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল : "কাল তোমার সেই কুত্তীটাকে আন্‌তে হবে কিন্তু।" মেম হাসিয়া বলিলেন : "তা আনব"--থামিয়া পরক্ষণেই বলিলেন : 'তুমি কুকুর নাকি? তাই তোমার জাত-ভাইকে দেখ্‌তে চাও?' আমি ভাবিলাম : এলাহাদাদের উচিত ছিল সম্মুখের মেয়েমানুষটিকে দেখা! পরক্ষণেই মনে হইল, মেম সাহেবের চাইতে তাহার কুত্তীটি সত্যই সুদর্শন।

ভোরে কুত্তীর শিকল ধরিয়া G হাজির হইলেন। চোখ দু'টা ঢুলু ঢুলু--বোধ হয় সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু, এলাহাদাদের নিকট গেলেন না। কুকুরটাকে বাহিরের থামে বাধিয়া আমার পেছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঘাড় গুঁজিয়া হিসাব লিখিতেছিলাম। হঠাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ আওয়াজে সোজা হইয়া উঠিলাম : "ছোক্‌রা আমি চাই তুমি আমাকে দেখ্‌লেই দাঁড়াবে এবং বল্‌বে 'গুডমর্ণিং'।" মুহূর্ত্তেই আমি অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়া বড়গিন্নীর মনে উচ্চ ভাবের উদয় হইয়াছিল। আমার মুখ দেখিয়া এর আবার কোন ভাব-বিকার হইল! পরক্ষণেই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম : "ও তাই, গুড্ মর্ণিং সিস্টার।" G হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উহার আওযাজ ছোট, ধার তীক্ষ্ণ--আর উহার আড়ালে মনে হইল কোথায় একটা কান্নার উৎস লুকাইয়া আছে। G সঙ্গে সঙ্গেই আমার পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীর ফাঁকে কাগজের ছোট্ট একটা মোড়ক পাকাইতে পাকাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন : "সেই যে ভারতীয়েরা গলায় লট্‌কায়, উহাকে কি বলে?" আমি বলিলাম : 'তাবিজ।' 'উহার ইংরেজী কি বলিতে পার?' "বোধ হয়, talisman." "এটি আমার talisman". মেম সাহেবেরও এরূপ কুসংস্কার আছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

আবার হিসাব লিখিতেছি। কিন্তু, Gর জন্য কাজ করা দায়। আমার টেবিলে মাথা রাখিয়া G ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। লিখিতে লিখিতে আমার কনুই বার বার তাঁহার মুখে লাগিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কঠিন কিছু উহাতে লাগিতেই চাহিয়া দেখি সেই মন্ত্রের মোড়কটা--যাহাকে সিস্টার G গলার তাবিজ করিয়া রাখিতে চান। বড় কৌতূহল হইল। টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখি, খুব পাতলা কাগজে টাইপের লেখা। উপরে হেডিং--"A Belgian Girl's Confession" এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম।

বেলজিয়ামে যুদ্ধে বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটি মেয়ে বড় হইয়াছিল। সে কখনও পুরুষ দেখে নাই। দেশ পুরুষ-ছাড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপে লুকাইয়া কতকগুলি নারীর মধ্যে সে বড় হইতেছিল। ইহার মধ্যে একটা যুদ্ধের আহত কি করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে পল্লীতে উপস্থিত। মেয়েরা সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিল। অতঃপর এক গভীর রাতে মেয়েটি ঘুমাইয়া আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে চাহিয়া দেখে, কি করিয়া দরজা খুলিয়া সে আহত সৈনিকটি তাহার কক্ষে ঢুকিয়াছে। সে শীর্ণ হস্তে বাক্স-পেট্‌রা প্রভৃতি দিয়া দরজা 'ব্লক' করিয়াছে। তারপর একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে কাপড় নাই, ইলেকট্রিক আলোতে তাহার মাথার তালু হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত তাহার একগাছি লোম পর্য্যন্ত ঝল্‌মল্ করিতেছে। মেয়েটির অন্তর জাগিয়া উঠিল, সৈনিকটির প্রতি লোম-কূপের কথা যেন সে বুঝিতে পারিল। পুরুষের মহীয়ান রূপের প্রতি রেখা, অঙ্গের প্রতিটি অনুর ঐশ্বর্য্য তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। Confessionএ সে এই রূপের বিশ্লেষণ করিয়াছে, এই ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে বহুদিন ধরিয়া নিদ্রিত আমার অন্তরের নারী গা-মোড়া দিয়া উঠিল! মনে হইল, নারী-বর্জ্জিত জীবনগঠন হয়তঃ সম্ভব নহে। পুরুষের মানস হইতেই না নারীর সৃষ্টি, আর নারীর মানস হইতেই হয়তঃ পুরুষের অভ্যুদয়।

এমন সময় নূরুদ্দীন ডাকিয়া কহিল : আলী আহ্‌মদ খাঁ সালাম ভেজিয়াছেন অর্থাৎ খাওয়ার সময় হইয়াছে। আমি আর খাঁ সাহেব একত্র খাই। খাঁর বাড়ী মীরাটে। দেখিলে মনে হয়, এই লোকটি রাতদিন পাগ্‌ড়ি সমেত full dress পোষাক পরিয়া থাকেন, আর জীবনে কখনও কোন কাজে তাড়াহুড়া করেন নাই। ইনি যুদ্ধস্থলে শ্রেষ্ঠতম ড্রেসার বলিয়া খ্যাত। খুব বড় বড় operationএ ইঁহাকে ড্রেসিং করিতে নেওয়া হয়। খাঁ সাহেব খাইতে খাইতে প্রতিদিনের operation-এর আলোচনা করেন আর মাথা দোলাইয়া উহার আরোগ্যের আশা বা আশঙ্কা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আর আমি স্মরণ করি যে ইঁহার কোন ভবিষ্যদ্বাণীই মিথ্যা হয় নাই।

বাহির হইতেই দেখি Dর ছোট্ট জার্ম্মেণ কুকুরটি আসিয়া Gর কুকুরীটির সহিত প্রেম জমাইতেছে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখি, Dর কাম্‌রার জানালা খোলা। উহার সম্মুখে D স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষে কুকুর-কুকুরীর দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছেন। পরণে তখনও operation-table-এর পোষাক। ....খাইতে খাইতে খাঁ সাহেব বলিতেছেন : D আজ worst

operation করেছে। রোগী চব্বিশ ঘণ্টা টিকে কিনা সন্দেহ। আমি বলিলাম : "Dর মন ঠিক নাই। মন আরেক ব্যাপারে পড়িয়া আছে।" ....পরের দিন D কি এক প্রয়োজনে আমাকে তাঁহার শোবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উহার বাহুল্য-বর্জ্জিত paritan সাজ-গোজের কথা জানিতাম। আজ ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। চাবি দেওয়াল ছবিতে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সব ছবিগুলিই নগ্ন মেয়েমানুষের।

দুপুরে মন হাল্কা করার জন্য বম্রা লাইট্ রেলে আমার চলিয়াছি। পাশের গাড়িতে এক পাল মেয়ে ordnance এ মজুরী করিতে যাইতেছে। গাড়ি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটি তরুণী--যাহাকে দলের মধ্যে বিশিষ্ট বলা যায়-- বুকে হাত দিয়া এবং তাহাকে ঘেরিয়া অপর মেয়েগুলি কলরব করিতে করিতে নামিয়া পড়িল। কেহ তরুণীর বুকে হাত লাগাইয়া দিয়াছে। নিত্য এরূপ হয়, আর মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে যাইতে অস্বীকার করিয়া উহার প্রতিকার করে। আমি নারী-বর্জ্জিত জীবন গঠন করিতে যাইয়া এদিকে দৃকপাত করি না। আজ কিন্তু আমার ভিতরের সদাজাগা নারীটি ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল আর আমি এক লাফে নামিয়া পাশের একটি বালি-স্তূপের উপর দাঁড়াইলাম। অস্তায়মান সূর্য্য-রশ্মিতে আমার ছায়া দীর্ঘ হইয়া সে নারীগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। সঙ্গীন কোষ-মুক্ত করিয়া আমি বলিলাম : "যে-কেহ পুনরায় ইহাদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছুক, সে যেন একবার আমার সহিত শক্তি পরখ্ করিয়া দেখে।" কাহারও মুখে কথা নাই, সময় যেন তাহার 'দৌড়' ভুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ....দুই যুগ গত হইতেছে। কিন্তু, এখনও আমার এই role-এর কথা মনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে--আর আমার যাবতীয় role-এর মধ্যে ইহাকেই আমি পূজা করিয়া থাকি।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, প্রেমের দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন--শ্রীমতীর চিঠি আসিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছে, এ যেন চিঠি নয়, আমি যেন তাহার মনের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি আর প্রতি পদ-ক্ষেপেই দেখিতেছি এক একটি সিংহাসন। প্রতি সিংহাসনেই আমি রাজা হইয়া বসিয়া আছি আর বিশ্বের নারী যেন একটি নারীতে একাগ্র হইয়া আমাকে প্রীতির ফুলে পূজা করিতেছে .....অতঃপর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

তিন বছরের কষ্টে তাহাকে জয় করিয়াছি এই অভিমান লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। দেখিলাম, যাহার উপর আমার অভিমান সে পাগ্লী-বৌ নাই। এ পূর্ণ-বিকশিতা নারী--এ যেখানে পা রাখিবে, ছবির মহাদেবের ন্যায় ইচ্ছা হয় সেখানে বুক পাতিয়া দেই। এর প্রতি কণা সজীব, প্রতি কণা যেন এক একটি নারী হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যে আপনি ডগ্‌মগ্।..... হাতে হাত রাখিয়া নারী বলিল : "হাতের তেলো শক্ত হইয়া গিয়াছে।" বলিলাম : "তিন বৎসর শক্তির চর্চ্চা করিয়াছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম : "এই তিন বৎসর তুমি কি করেছিলে?" "আমি নমাজ পড়িয়াছি। হাসি পাইল--সেই পুরাতন নমাজ! নারী বলিল : "তিন বৎসর কাহারও প্রতি বিদ্বেষপোষণ করি নাই, পাছে তোমার অমঙ্গল হয়। মোনাজাতে প্রথম প্রথম তোমার জন্য নিরাপদতা ও সুখ প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু, শুধু ইহাতে মন তৃপ্ত হইত না। এখন আপন-পর পৃথিবীর সকলের জন্য নিরাপদতা ও সুখ প্রার্থনা করি। ইহাতে অন্তর পূরে......" অভিমান কোথায় উবিয়া গেল। মনে হইল, আমি বিদেশে শুধু বন্দুকই ঠেলিয়াছি, আর এ নারী ঘরে বসিয়া তাহার অন্তর-সাম্রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই পূর্ণ-বিকশিতা নারী--কাহারও প্রতি তাহার এতটুকু বিদ্বেষ নাই--তাহার প্রতি অন্তরের পূজা উথলিয়া উঠিল। আজও সে পূজার বিরাম হয় নাই।

প্রৌঢ় মো'মেনের জবানবন্দী

মাহ্‌বুব-উল্ আলম

(প্রথম দিন)

আমি দাড়ি রাখিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি রাশভারী হইতে চাই। আমি যেন হিমালয়। আমার বুকে জন্মলাভ করিল যাহারা তাহাদের যৌবনের কলরোল দূরে— অতিদূরে শোনা যায় আর অসহ্য শৈত্যে আমার বুক জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে। আমি প্রৌঢ়। আমাকে পশ্চাৎপট করিয়াই সংসারের রঙ্গনাট্য চলিতেছে আর সদাজাগ্রত প্রহরীর ন্যায় আমি অনিমিখে চাহিয়া আছি। উপরের ঐ আকাশ নীচের এই মাটি— যাহারা অনন্তকাল ধরিয়া সংসারের দিকে চাহিয়া আছে হয়তঃ একদিন তাহাদের সহিত আমি এক হইয়া যাইব।

হিমালয় একদিন সাগর ছিল। ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে সাগর কি করিয়া হিমালয় হইয়া গেল— সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু, ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ব্যাপার: কি করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হইতেছে, কি করিয়া শিশুর গালে দাড়ি উঠিতেছে এবং যৌবনে দাড়ি চাঁচার সাধনা করিয়া প্রৌঢ়ত্বে সেই দাড়িকে কেন্দ্র করিয়াই শিশু [illegible] করিতেছে তাহার philosophy of life -বাঁচিয়া থাকার দর্শন।

আমাদের একটি মুরগী ছিল। উহার ডাক-নাম ছিল 'বড় মুরগী'। মুরগীর পালে সে ছিল নানী। যৌবনে তাহার গায়ে সোনালী পালক ছিল। মা তখন তাহার লেজের বড় বড় পালকগুলি মাঝে মাঝে উপ্‌ড়াইয়া দিতেন। ইহাতে নাকি মুরগীগুলি আরও বড় হয়। আমার সহিত যখন তাহার ভাব তখন সে retired list এ। তাহার বাচ্চা হইবে এটা আশা করা হইতে ছিল না এবং মা লেজের পালক উপ্‌ড়ান হইতে তাহাকে রেহাই দিয়াছেন। এ সময় মুরগীটি লেবুতলায় নরম মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া থাকিত। যৌবনে তাহার স্মৃতি মনের অবচেতনায় হারাইয়া গিয়াছিল, আজ প্রৌঢ়ত্বে আমারও যখন সোনালী পালক ঝরিয়া পড়ার সময় হইয়াছে কোথা হইতে স্মৃতির ডোর বাহিয়া সে আসিয়া হাজির হইয়াছে; আর আজ দুজনের মধ্যে এমনই বোঝাপড়া হইয়াছে যে সে যেন বলিতে চায় 'মানুষ হইলে আমি তোমারই মত দাড়ি রাখিতাম।' এবং আমি যেন বলিতে চাই 'মুরগী হইলে আমি তোমারই মত লেবুতলায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসিয়া থাকিতাম'। মাটা যেন সাড়া দিয়া বলে 'অবশেষে আমার বুকে আসিতেই হইত'। দুজনে তখন বলি 'সে জন্যইত আমাদের এই আয়োজন'। এমন সময় স্মৃতির ডোর বাহিয়া হাজির হয় ভোম্‌রা-বৌ।

যুদ্ধের তিনটি বৎসর পরে গিন্নীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছি। সোনালী জীবন,—রাতের আনন্দ দিনের দুয়ারে ধাক্কা খাইয়া ফেনা উপ্‌চাইতেছে আর দিনের আনন্দ রাতের বুকে হানা দিয়া ছড়াইতেছে গোলাপী আমেজ—এমন সময় একদিন দেখি গিন্নী বারান্দায় 'পাড়' এর বাঁশে চাকু দিয়া ছোট গর্ত্ত খুঁড়িতেছেন আর অদূরে মুখে এতটুকু আঁটাল মাটী লইয়া একটা ভোম্‌রা বসিয়া আছে। গিন্নী বাঁকা দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন "এর বাচ্চা হ'বে বাসার সন্ধান দেখছে। বাঁশের ফোকড়ে সুন্দর বাসা হ'বে, কি বল?" আমি সায় দিলাম এবং উভয়ে মিলিয়া এমন একটি ছিদ্র করিয়া দিলাম যেন উহার ভিতর দিয়া ভোম্‌রা-বৌর ভালরূপ যাতায়াত চলে।

ভোম্‌রা বৌকে বরাবর আসা-যাওয়া করিতে দেখি। কখনও কখনও আমাদের বিছানায় বসিয়া ভোম্‌রা-বৌ বিশ্রাম করে। আমার পড়ার মাঝে গিন্নী পেছন হইতে আসিয়া যখন বলেন "কিসের এত পড়া, সামনে পরীক্ষা আছে নাকি?" এবং বিনা-দ্বিধায় বই বন্ধ করিয়া দেন ভোম্‌রা-বৌ কোথা হইতে সশব্দে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার অধর-স্পর্শ করিয়া চকিতেই পলাইয়া যায়। ভোম্‌রা-বৌ যেন আমাদের মাষ্টার। অবশ্য দাম্পত্য-ব্যাপারে কাহারও শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে তখন আমাদের অভিমানে বাধিত। কিন্তু, আজ জীবনের 'সেমিকলনে' পৌঁছিয়া পেছনের ভুলগুলি তাহাদের দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া আমার পথচলা ভার

করিয়া তুলিল আর ইহাও মনে হইতেছে যে দাম্পত্য জীবনের সিঁড়ি-দরজায় দাঁড়াইয়া যৌন-তত্ত্ব ও যৌন-স্বাস্থ্য বিষয়ে যদি অবহিত হওয়ার সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে হয়তঃ এই দুর্যোগের কোন প্রয়োজন হইত না। মনে হয়, 'বড় মুরগী' হইয়া জন্মিলে ভুল কম করিতাম। কারণ, যৌন-ব্যাপারে পশু-পক্ষীদের প্রতি প্রকৃতির বিধি-নিষেধ যেমন সুস্পষ্ট মানুষের প্রতি তেমন নহে। হয়তঃ মানুষের দায়িত্ববোধ আছে বলিয়াই অবস্থা এইরূপ; কিংবা সভ্যতা-দুষ্ট কৃত্রিম মানসিকতার ফলেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি উন্মুখিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু, দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য কোনরূপ মানসিক শিক্ষা না দিয়াই যখন দুইটি মনুষ্য-শিশুকে মহাত্মা গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রতিকার-প্রস্তাবের ন্যায় এক কক্ষে আবদ্ধ করিয়া বলা হয় 'Settle accounts'—তখন আশ্চর্য্য কি যে তাহাদেব চিত্ত-বিভ্রম মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং ইহার ফলে পশু-জগৎ ও আদিম সমাজের তুলনায় আধুনিক সভ্য সমাজেই যত সব মানসিক-বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে যৌন-ব্যাধি রূপে।

ফুল-শয্যার রাত্রে B আমাকে একখানা সাদা রুমাল যৌতুক দিয়াছিল।[1] সাদা আকাশে কতকগুলি লাল তারা যেমন এক একবার হৃদয়ের দুর্ণিবার আবেগে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে B'র মুখ ছিল উহাদেরই মত একাধারে পবিত্র ও ভাবপ্রবণ। এহেন B যখন রুমালখানি আমার হাতে দিয়া ধরা গলায় বলিল "ভাই, আশা করি তুমি আমার সাদা রুমালে দাগ লাগাবে না" তখন তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল এই মুহূর্ত্তে একটা মহান ঘটনা ঘটিতেছে—বন্ধু বন্ধুকে এমন একটা অর্থপূর্ণ কথা বলিতেছে যাহা বহুকালের মরা পৃথিবী কান পাতিয়া শুনিতেছে। আর আজ এই মুহূর্ত্তের কথা মনে করিয়া আমার হাসিও পায়, কান্নাও আসে। হাসি পায় এই ভাবিয়া যে B মনে করিয়াছিল জীবনাকাশে কালবৈশাখীর ন্যায় দুর্ণিবার বেগে যে যৌবন পরিণতি খুঁজিয়া ফিরে লাল তারাব মত মুখের একটি কথাতেই তাহা শান্ত সমাহিত হইয়া যাইবে। আর কান্না আসে যখন ভাবি B র দেওয়া রুমাল বহুবাবই ত ধোপা-বাড়ি পাঠাইয়া ময়লা উঠাইয়া আনাইলাম, কিন্তু হায় জীবনপট যে, ভুলের আঁচড়ে ভরিয়া উঠিল উহার দাগ উঠাইবার যে কোন উপায়ই নাই।

বান্ধবী ভোমরা-বৌর কয়দিন দেখা নাই। আর সে আসিল কি গেল তাহা আমরা লক্ষ্যও করিতেছি না বড়। পরস্পরকে নিবিড় করিয়া পাওয়ার মধ্যেও কিসের একটা অতৃপ্তি মনের দুয়ারে ধাক্কা দিয়া বাহিরে আসতে চায়। আমার নিকট নারী একান্ত রহস্যময়ী, হয়ত নারীর নিকট পুরুষও তাই। নিত্য নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, রহস্যের আবর্ত্তে আমরা খেইহারা পাগল- পাগলিনী হইয়া গেলাম, কিন্তু তবু যেন আশা মিটে না; কোথা হইতে প্রশ্ন ভাসিয়া আসে "এই মাত্র! আর কিছু নাই?" আর সঙ্গে সঙ্গে যাহা ছিল লোলুপ মনের মদিরা তাহাই দেখা দেয় পেয়ালায় পরিত্যক্ত ক্লেদরূপে। আমি ভাবিলাম 'এই মাত্র, আর কিছু নাই'। এই উত্তরে আমার হাই উঠিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল এইবার চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িব। নারী না থাকিলে গোটা পৃথিবীটাই হয়ত 'Lotus-eater'— এর ন্যায় শুধু হাই তুলিতেই থাকিত।

গৃহিণীর কিন্তু অন্য ভাব। দিনের পর দিন নানা আয়োজনে তিনি আমাদের ক্ষুদ্র কুঠরীটা পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। বর্ষার সাগরের যেরূপ কাজের সীমা নাই—কোথাকার জলকে কোথায় ঠাঁই করিয়া দিতে হইবে তাহারি আয়োজনে সাগর ভুলিয়া থাকে বাতাসের সহিত তাহার ছুটাছুটি খেলা—তদ্রূপ গৃহিণীরও জীবনে যেন বিভিন্ন স্রোতধারা আসিয়া মিলিত হইতেছে আর উহাদেরই অর্ঘ্য—নিরালা ঝরণায় ছোট্ট পাখীটি যেরূপ তৃপ্তির সহিত জল ছিটাইয়া স্নান করে সেরূপ—তিনি দু'হাতে লুটিতে লাগিলেন। অবশেষে মুক্তার জন্ম-কামনা করিয়া শুক্তি একদিন ভাসিয়া উঠে, আয়োজনের চরম সার্থকতায় সাগরের বুকে পুলক-শিহরণ জাগে, আকাশে বাতাসে সেকথা কানাকানি হয়—তখন উদাসী আকাশে নূতন মেঘের সঞ্চার হয়। সেরূপ গৃহিণীও একদিন আমার কানে কানে বলিলেন " আমাদের একটি ছেলে হয়ত বেশ হয়"। ইহাতে আমার হাই বন্ধ হইয়া গেল, বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল, বিভিন্ন প্রকার ভোগ করিয়া মিটিল না যে ক্ষুধা— মনে হইল এবার উহার শান্তি হইবে গিন্নীর কোলে শিশু হইয়া জন্মিয়া।

---

[1] শ'র মতে নগদ অর্থ যৌতুক দিলেই ভাল হয় : ""Instead of giving people things you must give them money and let them buy what they like with it That is the use of money, it enables us to get what we want When a young lady is married her friends give her wedding presents instead of giving her money; and the consequence is that she finds herself loaded with six fish slices, seven or eight travelling clocks and not a single pair of silk stockings. If her friends had the sense to give her money (I do always) and she had the sense to take it (she always does), she would have one fish slice, one travelling clock and plenty of stockings. Money is the most convenient thing in the world"_The Intelligent Woman's guide to Socialism

সেদিন সকালে বাচ্চা ভোম্‌রায় আমাদের কুঠুরীটা ভরিয়া গিয়াছিল। কী তাহাদের গায়ের রং, কীই বা শরীরের গঠন— যেন এইমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কোলাকুলি করিয়া আসিয়াছে। সামনের দুই পা মাথায় উঠাইয়া তাহারা মিটামিটি চাহিতে লাগিল— যেন জন্ম-প্রভাতের এই পৃথিবীটাকে তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে। গিন্নী চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, তারপর আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু, এদের মা-টি কোথায়?" তখন দুজনেরই একসঙ্গে খেয়াল হইল যে বহুদিন ধরিয়া ভোম্‌রা-বৌর দেখা নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই বাচ্চা ভোম্‌রারা কোথায় চলিয়া গেল। 'পাড়' এর বাঁশটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কামলারা আসিয়া উহাকে খুলিয়া ফেলিয়া সে জায়গায় একটা জোয়ান বাঁশ লাগাইয়া দিল। আজ ভোম্‌রা-বৌ নাই, তাহার আশ্রয়-স্থল বাঁশটিরও প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। সুতরাং উহাকে টানিয়া পাকঘরে লইয়া যাওয়া হইল জ্বালাইবার জন্য।

বিকালে গিন্নী হঠাৎ আমাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাকঘরে লইয়া গেলেন— "ভোমরা-বৌকে দেখ্‌বে এস"। গিন্নী উনানে দেওয়ার জন্য বাঁশটি চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে গিরেয় একদিন আমরা ফোকড় কাটিয়া দিয়াছিলাম দেখিলাম উহারই ভিতর ভোমরা-বৌ বসিয়া আছে— তবে কঙ্কাল মাত্র— এখনও তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র কমে নাই! গিন্নী সজল চোখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কত সব সন্তান হ'ল তারা সব বড় হয়েছে—" যেন নিজের মনেই তিনি বাক্যের সমাপ্তি করিলেন—মেয়েলোকের ইহা অপেক্ষা বড় ভাগ্য আর কি আছে!". ......আবার কোথা হইতে প্রশ্ন ভাসিয়া আসে "এই মাত্র! আর কিছু নাই? এবার আমার পুরুষ-মন বলিল "আরও আছে। ঘর করিতে হইবে, গাড়ি কিনিতে হইবে, সমাজকে জাগাইতে হইবে, দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইবে।". .....

(দ্বিতীয় দিন)

একরাত্রে আমাদের খুকী জন্ম-লাভ করিল। ছোট বেলায় 'মা-বাবা' খেলা খেলিয়াছি। মা সাজিয়া জেঠাদের রউফকে দেখিয়া এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছি, ক্ষুদে বর্ আসিয়া 'মা' ডাকিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে পরম যত্নে.......তুলিয়া লইয়া 'ওনা'র সম্মুখেই বুকের কাপড় তুলিয়া মাই দিয়াছি—ততক্ষণে দুষ্ট ঘূর্ণি-বাত্যার ন্যায় না বলা না কওয়া হামাগুড়ি দিয়া লড়ায়ে ষাঁড়ের ন্যায় ভীষণ আওয়াজ করিতে করিতে খালেক আসিয়া আমাদের গেরস্থালী আক্রমণ করিয়াছে, আর চোখের পলকেই আমি তাহার মাথায় এমন ঢুঁ মারিয়া বসিয়াছি যে ষাঁড়টি মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছে "বাঃ, তুমি কেন? তুমি যে মেয়ে মানুষ!" কর্ত্তাটি চিরকালই হাঁদারাম। নিজে ত ঢুঁ মারিতে পারেনইনি, অথচ ষাঁড়ের মতে সায় দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিয়াছেন ঢুঁ মারাটা মেয়ে মানুষের কর্ম্ম নয়।" তারপর লাগিয়াছে ঝগড়া---যেমনটা লাগিয়াই আছে যে সকল মেয়ে লোক তাল ঠুকিতে চান তাঁহাদের সহিত হাঁদারাম পুরুষদের। ....

খুকীর জন্ম-রাত্রে। B আসিয়াছে। আমি ভাবিলাম আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই। আঁতুড়-ঘরের প্রতি আমার কাণ খাড়া, আর আমি নিজের অজ্ঞাতেই কাম্‌রাময় টহল দিতেছি। B চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শৈশবের দুইটি ধারণা আমার স্মৃতি-পথ পারাপার করিতেছে। প্রথম ধারণা এই যে আমার বিবাহ হইবে না, বিবাহের পূর্ব্বেই দৈব-দুর্ঘটনায় আমি মারা যাইব। শেষ, বিবাহ আমার হইলই। দ্বিতীয় ধারণা এই যে, ছেলে আমার কোন কালেই হইবে না। আমি ভাবিতাম ছেলে জন্ম দেওয়া একটা মস্ত বড় আর্ট কিম্বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হইবে। নিজেকে ভরসা করিয়া উহার 'কাবেল' ভাবিতে পারিতাম না। আজ এই আর্টে 'কাবেলতি'ও আমার করায়ত্ত প্রায়। অথচ কোন conscious চেষ্টা করিতে হয় নাই যেমন করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করিবার জন্য ছেলেরা করে। কেন যে নিজের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করিতাম আজ তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। হঠাৎ কিশোরীকে মনে পড়িল। বিবাহের পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কিশোরি, এখন কেমন লাগে?" কিশোরী এক গাল হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল "কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চাহেনা যে বিবাহটা সত্যই হইয়া গেল।" মনে হইতেছে বিবাহ ও ছেলে জন্মানটা মানুষের এরূপ আকাঙ্ক্ষিত সার্থকতা যে মানুষের ভীরুমন বরাবর তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কাই পোষণ করে।

খুকীর জন্মসংবাদে আমার কাঁধ হইতে মস্ত বোঝা নামিয়া গেল; মন এত হাল্কা হইল যে আর কিসের একটা সাফল্য আমাকে এরূপ উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল যে আমি আবেগে B কে জড়াইয়া ধরিলাম। এতক্ষণে আমার নজরে পড়িল যে

ঃ র মুখটা অস্বাভাবিক দেখাইতেছে...ঃ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল আমার মনে পড়িল ঃ বাসররাতে আমাকে সাদা একখানি রুমাল দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল যে আমি যেন উহাতে দাগ না লাগাই। ভাবিলাম গিন্নীর ছেলে হওয়াতে ঃ মনে করিতেছে, আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাদা রুমালে দাগ লাগাইয়া দিয়াছি এবং সেই দুঃখেই তাহার এই কান্না। কিন্তু, ঃ যখন অঙ্গুলের ডগা ধরিয়া আমাকে আম-তলায় লইয়া গেল এবং প্রথম কথা বলিল "বাবাকে বলতে পার আমাকে বিয়ে করাতে?" তখন কিছুটা হতভম্ব হইয়া গেলাম। সাদা রুমালে দাগ না লাগার প্রার্থনা করিতে করিতে সে যে উহাতে দাগ লাগাইবার জন্যই এমন উতলা হইয়া উঠিবে, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল!

দেখিলাম ঃ 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণ করিয়াছে। সে জানাইল মাঝে মাঝে সে কিরূপ নিজেকে জ্যা-খিচা ধনুর ন্যায় বোধ করে এবং কিছুতেই তখন নিজেকে সামলাইতে পারে না। অতঃপর বাঁ হাতের পটিবাঁধা তর্জ্জনী দেখাইল। মনে হইল আঙ্গুলটা অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসে কাটলে?" ঃ র মুখে পাণ্ডুর হাসি দেখা দিল। বলিল "চাকু ধারাইয়া নিজেই কাটিয়াছি যেন উহা দ্বারা কোন অন্যায়ই না সম্ভব হয়।" একটু থামিয়া কিছুটা হতাশার সুরে বলিল "কোনটাই যে বাকী রাখি নি।" আকাশে অগুন্তি তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। আমি ভাবিতে চেষ্টা করিলাম যে উহাদের প্রত্যেকেই এক একটি পৃথিবী, কিন্তু অনেকগুলিই প্রাণহীন এবং প্রাণী-বিহীন। তারপর মনে হইল আকাশের ঐ ইতিহাসের মতই প্রতি মানুষের জীবনে অপচয় আছে। আর বিষাদের সহিত ইহাও মনে হইল যে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যে অপচয় বাড়িয়াই চলিয়াছে।..........

বধূ "আমার ছেলে হইয়াছে। ছেলে হওয়ার এত কষ্ট, তাহা জানিলে............................ আমার খুকী যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে আমি কোন কালেই বিয়ে দিতে দিব না। খুকী চিরকালই মায়ের কাছে---আশ্চর্য্য আমি খুকীকে নিয়া জল্পনা কল্পনা শুরু করিয়া দিয়াছি! কিন্তু, যখন আমার প্রথম হুঁস হইয়াছিল? মনে হইতেছিল একবার মরিয়া যেন আবার আমার নূতন জন্ম হইল। খুকীকে আমার পাশে শোয়ান হইয়াছিল। মা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া আমাকে দেখাইলেন। এতটুকু মাংস-পিণ্ড ইহার জন্য আমি জান্ হারাইয়াছিলাম আর কি! উহার চোখ-দুটি বুজা ছিল, বোধ হয় ঘুমাইতেছিল। মা উহাকে মাই দেওয়ার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিলেন। কিন্তু, আমি কিছুতেই রাজী হইলাম না। হঠাৎ উহা চোখ মেলিল। ওমা, আশ্চর্য্য ব্যাপার! তিনি যেমন প্রথম ঘুম ভাঙ্গিতে চোখের পাতা কুঁচ্‌কাইয়া তাকান, মাংসপিণ্ডটা ইহারই মধ্যে সে ভাবে চোখের পাতা কুঁচ্‌কাইতে শুরু করিয়াছে! তারপর ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল 'ওঙা, ওঙা, ওঙা।' আর দেরী নয়। এত কষ্টের ধন--উহাকে আমি কাঁদিতে দিতে পারি না।"।

এক রাত্রে আমি প্রসূতির ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার কামরায় একা থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। উহার প্রতি জিনিসটাতেই দুজনার স্মৃতি জড়ানো ছিল। একজনের অভাবে উহাদিগকে শুধুই অহেতুক মনে হইতে লাগিল। সে ভাল হইয়া নিজের স্থানে ফিরিয়া আসুক ইহাই আমি চাহিতেছিলাম। আজ সঙ্কল্প দেখিয়া নিব দিল্লী আর কতদূর। আর অন্তরে তাহার আহ্বান অনুভব করিতেছিলাম। বোধ হইতেছিল আমার পদক্ষেপের লাগিয়া বৌ কান পাতিয়া আছে।

'অপারেশন টেবল'-এর ন্যায় আঁতুড়-ঘরেরও একটা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি আছে। খুন জখম, কাতরাণি, অস্পষ্ট গোঙানি, শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু---এসব যেন উহার আনাচ-কানাচ হইতে উঁকি মারিতেছে। উহারি মাঝে অঘোরে ঘুমাইতেছে বৌ--- যেন সাগরে যে শয়ন করিয়াছিল শিশিরে তাহার ভয় কি। পাশে একটা কাপড়ের পোঁটলায় হাওয়ার মৃদু উঠানামা চলিতেছে। উহাই খুকী। বৌয়ের মুখটা ফ্যাকাশে, বোজা পাতার পালকে পালকে যেন যন্ত্রণাশিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভয় হইতে লাগিল পাতা মেলিলেই চোখের ভিতর যন্ত্রণা, ভয় ও আশঙ্কার বহু চিহ্ন দেখা যাইবে।

আমার মনে পড়িল মালাকার মাসীকে। মাসী যখন একটি মেয়ের মা, তখন হইতেই আমি তাঁহার নিকট যাতায়াত করি। মাসী অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতেন, আমি ধার আনিতে যাইতাম। এত বছর ধরিয়া আমি এই ধার আনা-নেওয়া করিয়াছি যে, একটা বিশেষ পীঁড়ি তাঁহার বাড়ীতে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। তাঁহার ছেলেমেয়ের পাল আমার চোখের উপর প্রসব হইয়াছে বলিলেই হয়। একবার যাইয়া দেখি, মাসী আসিলেন না; বড় মেয়ে (আমাকে পীঁড়ি আনিয়া দিল। মাসী যেন ভিতরে শুইয়া আছেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা, আজ ফিরে যা। সকালে আমার একটি খোকা হয়েছে,

আমি এখনও চোখ মেলতে পাচ্ছি না।" মাসী যে দুর্ব্বল নহেন ইহাতে আমার বড় আনন্দ হইল। মনে হইল, প্রাচীনকালে মাসীর মত মেয়েরাই লড়াই করিয়া লড়াই জিতিতেন।

আমার পায়ের আওয়াজে বৌ চোখ মেলিয়া চাহিল, যেন অঘোর ঘুমেও আমার পায়ের আওয়াজেরই সে ধ্যান করিতেছিল। আমি নীরবে তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সে তাহার বিশীর্ণ চোখ দিয়া আমার মুখে ঠাহর করিতে লাগিল খাওয়া শোয়ার অনিয়মে এই কদিনে উহা কতটা শুকাইয়া উঠিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিলাম। . . বৌ বলিল "কিশোরী এসেছিল।" "কেন?" "ছেলে দেখ্‌তেও বটে, তার দুঃখের কাহিনী বুঝাতেও বটে।" "কেন, কিসের দুঃখ?" "শোন নি বুঝি? তার ছেলেটি মারা গেছে, স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছে, এখন তাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না"। তারপর স্বর নামাইয়া প্রায় চুপি চুপি বলিল "ছেলে হওয়ার সময় যে তার ভিতরের কল-কব্জা সব বিগ্‌ড়ে গেছ্‌ল।" আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। এটা নারীর মুখে পুরুষের indictment মনে হইল, যুগে যুগে পুরুষের ভালবাসাকে নারী skin-deep এর অধিক কিছু মনে করে নাই এবং তাই সর্ব্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে রক্ষা করিতে এই skin কে। তারপর তাহার একখানি হাত আমার উভয় হস্তে গ্রহণ করিলাম। অকস্মাৎ আমরা পরস্পরের চোখে চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, কেয়ামৎ পর্য্যন্ত একের চোখে অপরের ছবি দেখা যাইবে।...... ...

একটা নূতন সার্থকতা জীবনের একটা নূতন স্বাদ আনিয়া দিতেছিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমি উহা চাখিতে লাগিলাম। রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমি উহা চাখিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিল যে, রূপময় জগতের সীমা ছাড়াইয়া আমি কর্ম্মময় জগতে প্রবেশ করিয়াছি। ক্রীড়াময়, ধ্যানময় ও রূপময় সব জগতের ইহা যেমন একাধারে কেন্দ্র, তদ্রূপ পরিণতিও বটে। B যে আমার সাহায্য চাহিল, বৌ যে আমাকে সাবধান করিয়া দিল, ইহার নূতন অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম। প্রজননের সাথে সাথেই প্রকৃতি আমার কপালে পূরা মানুষের টিপ্‌ পরাইয়া দিয়াছে। সংসারের কর্তৃত্ব ভার অলক্ষ্যে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারের প্রত্যেকটি সমস্যা এখন হইতে আমার সমাধানের অপেক্ষা করিবে। ইহার সুখ-দুঃখ পূর্ণাবয়ব মানুষ হিসাবে আমার উপরও নির্ভর করিবে।........

ঠিক করিলাম, B র জন্য কিছু করিতে হইবে, কিশোরীরও একটা ব্যবস্থা চাই। আর? (র ছবি চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল। (র যৌবন প্রতি অঙ্গে দিশেহারা হইয়া কূল ছাপাইতেছে। তাহার হলুদ বরণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছেঙ্গার দল তাহাকে নিয়া আলোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু, মেসো-মাসী এখনও তাহাকে বর জুটাইয়া দিতে পারেন নাই। মেসো হাতুড়ে ডাক্তার, হাতুড়ে হইলেও তাঁহার পশার কম নহে। শুনি, তিনি কৃষ্ণ-মন্ত্রীও। কিন্তু, ইহা তিনি গোপন করিয়া চলেন। প্রকাশ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করেন, তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু, এই শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই মালাকারেরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। মালাকারদের মধ্যে যে-ঘরের অবস্থা ভাল, তাহারা আজকাল মালাকারের জায়গায় শিক্‌দার লিখে। শিক্‌দারেরা বলে "মালাকারের আবার এত বাড় কেন?" মেসো (কে ভাল লেখা-পড়া, কিছু গান বাজনা এবং সামান্য ধাত্রী-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। আশা, ইহাতে (র ভাল, বর জুটিবে। কিন্তু, বর যতবারই তিনি জুটাইয়াছেন, শিক্‌দারেরা অগ্রণী হইয়া ততবারই বিবাহ পণ্ড করিয়া দিয়াছে! তাহারা বারবার বর দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু, এ পক্ষের উহা কিছুতেই মনে ধরে নাই। ইহারই ফাঁকে ('অরক্ষণীয়া'বড় হইয়া উঠিয়াছে।.........

পরের দিন দুপুরে ক্ষীরা-ক্ষেতের ধারে আম-তলায় বসিয়া আছি। উদাস দুপুরে আম-তলায় বসিয়া থাকিতে বেশ ভাল লাগে। এটা চারাগাছ নহে, 'ফলবান' গাছ; আমিও শিশু নহি, 'ফলবান' মানুষ। এই গাছের সহিত আমার একটা সাদৃশ্য আছে। ইহার ছায়ায় বসিয়া তাপিত বিশ্রাম করে, গাছ উহাকে মিষ্ট ফলে তুষ্ট করে। আমার আশ্রয়ে আসিয়াও ব্যথিত শান্তি পাইবে, আমি সকলকে দিব আমার বিশ্বস্ত সেবা, স্নেহ-রস। আমি পিতা, আমি পরিপূর্ণ মানুষ।.......(র ভাই-বোন দুজন আসিয়া উপস্থিত। "দাদা: মা ও দিদি বল্লেন কিছু ক্ষীরা নিয়ে যেতে।" "ক্ষেত থেকে উঠিয়ে নিগে যা।" দেখিলাম, অনেক ক্ষীরাই উঠাইয়া নিল। ইহারা বরাবরই আসিয়া দু-চারটা খাওয়ার জন্য নিয়ে যায়। আজ এত যে উঠাইবে বুঝিতে পারি নাই। ভাবিলাম, হয়ত বা অতিথি আসিবে। ক্ষীরার বোঝাটা ভাইয়ের মাথায় চাপাইয়া দিয়া মেয়েটি তাহাকে আগাইয়া দিল। এবার আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দিদি তোমাকে প্রণাম বলেছেন।" "কেন রে?" মেয়েটি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল 'দিদি যে আজ রাতে B -দার সাথে পালিয়ে যাবেন!" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ... ..."মা জানেন?"

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া জানাইল 'হাঁ।' "মেসো কোথায়?" "রোগী দেখ্‌তে গেছেন। দুদিনের কমে ফির্‌বেন না।" এই মাসীকে আমি চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। আজও মনে হইল না যে তাঁহার সিদ্ধান্তে কোথাও ভুল আছে। তবুও চোখে জল আসিল। B. (—তোমাদের এই পরিণতি! খোদা জানেন, মাসীর বাকী ছেলে-মেয়েদের কি গতি হইবে!

রাতে খাইতে বসিয়াছি। খাইয়া অনেক চিন্তা করার ছিল। ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে আমাকে অনেক কাজে হাত দিতে হইবে।......কিন্তু, খাওয়া অর্দ্ধ-পথেই থামিয়া গেল। দাবানলের মত রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, কাল যে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল এই অপরাধে কিশোরীর স্বামী কিশোরীকে পিছ্‌-মোড়া করিয়া ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ঠেঙ্গাইতেছে। এতক্ষণে খুন হইল বুঝি! রক্ত আমার মাথায় চড়িয়া বসিল। আমি পাগলের মত কিশোরীদের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। অনেকেই আমার পিছু লইল। বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়া ইহারা থামিয়া গেল।— "যার বৌ সেই মারছে, আমাদের কি বল্‌বার থাকতে পারে!" আমি এমন কর্ত্তৃত্বের সুরে কিশোরীর স্বামীকে ডাকিলাম যে, সে বিনাবাক্যে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে খুব দীর্ঘকায়, তবুও মনে হইল তাহার ন্যায় কাপুরুষ দ্বিতীয়টি আমি দেখি নাই। "গাড়ীর বলদকে বেশী মার ধর কর্লে সরকার শাস্তি দেয় দেখেছিস্?" "রেঙ্গুনে দেখেছি।" "বলদকে মার-ধর কর্লে শাস্তি হয়, বৌকে মার-ধর কর্লে শাস্তি হয় না মনে করিস?" কাপুরষটা চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিয়া কিশোরীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিল। বলিল "দেখুন, বেশী মারি নি।" যে প্রাণীকে বেদম মারা হইয়াছে উহা যেরূপ রা হারাইয়া ফেলে, দেখিলাম তদ্রূপ কিশোরীও ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফেলিয়াছে। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে আর অবলীলাক্রমে কাপুরুষটার অনুসরণ করিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া একবার চোখ ডাগর করিল, আবার আপন মনেই মাথা নাড়িয়া কাপুরুষটার পেছন পেছন চলিয়া গেল।

(র অপহরণের কথাটা পরদিন রটিয়া গেল। শিক্‌দারের বাড়ীতে সভা হইয়া গেল। শিক্‌দারের নেতৃত্বে চাঁদা তোলা, পুলিসকে সাহায্য, উকীল-মোক্তার নিয়োগ, মোকদ্দমা চালান—(র উদ্ধারের জন্য সবই ঠিক হইয়া গেল। মেসোকে ইহারা ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিল। শিক্ষা-দীক্ষার দোষে যে-সমাজ তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, মেয়ে অপহৃতা হইয়াছে এই গুণেই যেন উহা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইল। মেসোর বোকামীতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু, মাসীর বিষয়ে আমি ভুল করিলাম না। জানিতাম, তিনি ঠিকই বুঝিতে পারিবেন যে, (কে যদি পাওয়া যায়, বাহিরে ভড়ং যাহাই দেখান হউক, ভিতরে এই সমাজ তাঁহাদিগকে 'পতিত' করিবে।

দুপুরে ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হইতেছি— আশা, আমগাছতলায় যাইয়া বসিব—কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাহার চোখের জলে পা ভিজিতেছে। তাহাকে উঠাইয়া গিন্নীর নিকট হাজির করিলাম। বলিলাম "কি চায় এ?" কিশোরী এবার গিন্নীর পায়ে লুটাইতে লুটাইতে বলিল "তালাক, তালাক, আর কিছুই নহে। এক ওই পার্বে, একমাত্র ওকেই ভয় করে।" গিন্নী এতটা তৃপ্তি আর এমন প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন—যেন দুনিয়ার যত পাপতাপ একমাত্র আমিই নিবারণ করিতে পারি। আমি তখনই কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

পাড়ার মাতব্বরদের দস্তখৎ লইয়া কিশোরীর প্রাণ সংশয় বলিয়া পুলিসে এত্তেলা পাঠাইয়া দিলাম। কাপুরুষটা ইহাতেই এলাইয়া পড়িল, তাহাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে আসিল। আমি কিছুতেই নরম হইলাম না। বলিলাম "কাল সকালে হয় তুমি ওকে তালাক দেবে, নয় ত জেলের পথ ধর্‌বে।" রাত্রে আমার ঘুম হইতেছিল না। সকালেই বিরাট সালিসের আয়োজন করা হইয়াছে। যতক্ষণ না কিশোরীকে মুক্ত করিতে পারি, ততক্ষণ কিছুতেই আমি শান্তি পাইতেছি না।......

সালিস বসিয়াছে। কিশোরীকে ডাকা হইল তাহার অভিযোগ জানাইতে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিশোরী আসিতে রাজী হইল না। বলিয়া পাঠাইল যে, তাহার কোন অভিযোগ নাই, সে বেশ সুখেই আছে। সমাগতেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আমার মুখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি হানিতে হানিতে যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সকলের পেছনে আমি বাড়ী ফিরিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।.......গিন্নী আসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মেজাজ ঠাণ্ডা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম " কি করে এ সম্ভব হল?" "তার সতীনের যত গয়না তাকে পরতে দেওয়া হয়েছে।" বলিলাম "যথাযোগ্যং। স্বামীর ভালবাসা যেমন skin-deep, স্ত্রীর ভালবাসাও তেম্‌নি ঐ অলঙ্কার পর্য্যন্ত।" মেয়েদের হীন অবস্থার মূল যে এই হীন মানসিকতা,

সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।......

ইহাতে ব জন্য আমার নূতন উৎকণ্ঠা দেখা দিল। মেয়েদের উপর আমার বিশ্বাস কমিয়া গেল। এই ভয় আমাকে পাইয়া বসিল যে, ই যদি তাহাকে ফাঁসাইয়া দেয়। তাহাদের লুকানোর স্থান হইতে আমার পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, শহরে গিয়া একবার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করি। এসব মামলায় তিনি খুব ওয়াকিফ-হাল, আর দেখাটাও হয়নি বহুদিন।...

বাহাদুরের বাড়ীর দরজায় গিয়া দেখি—নারীরক্ষা-সমিতির বিরাট বিজ্ঞাপন। বাহাদুরই উহার সভাপতি। তাঁহার বাসা রক্ষা-প্রাপ্তা নারীদের আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। সেইদিনই অপহরণ-মামলায় যে নারীটির উদ্ধারসাধন হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহাকে জাতে তোলার জন্য তাঁহাকে দিয়া সকলের পাতে পরিবেশন করান হইবে। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। ইচ্ছা হইল, একবার বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, আমার ঘুসি বাগানোর পর হইতেই তিনি ছেলে-রক্ষা ছাড়িয়া নারী-রক্ষায় মন দিয়াছেন কিনা। পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরুষের হাতেই প্রতিকার—নারীরা কোন্ জ্ঞানে আশা করেন বুঝিতে পারি না। Philip sober, Philip drunk হইতে কতক্ষণ?

ব বয়স যে আঠারোর উপর—গোরা সিভিল সার্জ্জন হইতে এরকম সার্টিফিকেট লওয়ার যোগাড় করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই হুকুম পাইলাম বাড়ী হইতে বহু দূরে বদলির।

(৩য় দিন)

দূরে যাইতেছি। বিছানায় শুইয়া মনে হইতেছে এ চিরকালের পাওয়া বাড়ীকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। উপরে চালের বাতায় বিরাট একটি ইঁদুর ছুটিয়া চলিয়াছে; পেছনে দুইটি বাচ্চা। সাদাটির বুক এত সাদা যে যেন উহার বুকের সব লোমই পাকিয়া গিয়াছে। ইহারা কোথায় যাইবে তাহা আমি জানি। 'পাড়' এর বাঁশের গিরে কাটিয়া ধাড়িটা বাসা করিয়াছে। উহাতে সুপারীর খোসা, কলার পচা ছাল, খবরের কাগজের কুচি কুচি টুক্‌রা আর হয়ত বৌয়ের হারানো আংটিটা আছে। কিন্তু সম্প্রতি বাচ্চা হইয়া স্থানের ও সময়ের এত অসঙ্কুলন হইয়াছে যে সারারাত করাতীর ন্যায় গিরের পর গিরে কাটিয়া ঠাঁই বাড়ানো হইতেছে। সে শব্দে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, পুসি এক লাফে টানার বাঁশের উপর উঠিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া থাকে,—কিন্তু হায়, বাঁশের কেল্লায় গা ঢাকিয়া ধাড়িটা মানুষ ও বিড়াল উভয়কেই সমান অগ্রাহ্য করিয়া তাহার করাতের মত দাঁত চালাইতে থাকে। এখন প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। 'পাড়' এর মাথার গিরেটা বন্ধ করিয়া মা ও বাচ্চার পেছনে পুসিকে লেলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু মন বাঁকিয়া বসিল। হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে হয়ত বাড়ীর ইঁদুরগুলা মায় তাহাদের উৎপাতটাকে পর্য্যন্ত আমি ভালবাসি। কতদিনে ফিরিব কে জানে? হয়ত ততদিনে কামলারা আসিয়া 'পাড়' এর বাঁশটি বদ্‌লাইয়া দিয়া যাইবে। আমি আসিয়া একটা নূতন বাঁশ দেখিতে পাইব, আর উহার তলায় বৌ, খুকী—সকলই তখন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। স্বতঃই মনে প্রশ্ন হল জীবনে অপরিবর্ত্তিত থাকে কি? বহুকাল পরে নিজেকে প্রশ্ন করিলাম আল্লা কোথায়, আমার আল্লার কি হইল? ভিতরের বাণী আমার জাগিয়া উঠিল "আমি আছি, তোমার ভিতরেই।" এই বাণীর উপরই আমার মন স্থিতি লাভ করিল। চিরকালের পাওয়া বাড়ীকে ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য আমি মনে মনে প্রস্তুত হইলাম।........

খাইতে বসিয়াছি। খাবারের ধুম লাগিয়াছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত এবং প্রত্যেক বাড়ী প্রত্যেক বাড়ীর সহিত যেন পাল্লা দিয়াছে কে আমাকে কত বেশী এবং কত ভাল খাওয়াইতে পারে। মনে হয়, মানুষের খাইতে না পাওয়াটাই সব চাইতে বড় দুঃখ ও খাওয়াইতে না পারাটাই সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা। ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পারাই হয়ত বড় মানুষীর একমাত্র লক্ষণ। ...... মা দূরে বসিয়া তদারক করিতেছেন, বৌ কাছে বসিয়া ভাল জিনিসটা পাতে তুলিয়া দিতেছেন, দরজায় কুকুর ভোলা শুইয়া আছে, পুসি তাহার গায়ে হেলিয়া পড়িয়া মিতালীর প্রমাণ দিতেছে, আর উঠানে কাল মুরগীটি 'ঢক্ ঢক্' আওয়াজ করিয়া তাহার বাচ্চা চরাইতেছে। ওহিদ কোথা হইতে আসিয়া মায়ের কোল ঘেসিয়া বসিল। ভোলাকে দুইটা 'কুত্তা মাছি' বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। ভোলা বুড়া হইয়াছে, একটিও দাঁত নাই কিন্তু সে মাছি দুটাকে এমন মুখ-ভ্যাংচি দিতেছে যেন

সতিাই তাহার দাঁত আছে, ইচ্ছা করিলেই সে উহাদিগকে কুচি কুচি করিয়া ফেলিতে পারে। মাছি দুটা যেন তাহার চালাকি ধরিতে পারিয়াছে, কিছুতেই তাহারা ভোলাকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িতেছে না। দেখিতে দেখিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মা ভোলার বয়স কত হল?'' মা হিসাব করিয়া বলিলেন ''দশ বৎসর, ওহিদের দু বৎসরের বড়।'' ওহিদ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই মাটিতে দাগ কাটিয়া বাড়ীর একখানি 'সিভিল লিষ্ট' তৈয়ার করিয়া ফেলিল—মর্য্যাদার ক্রম অনুসারে প্রথমে বাবা, পরে মা.... ক্রমে দাদা, ভাবী..... তারপর ভোলা, অতঃপর সে নিজে, ক্রমে পুসি, কাল মুরগী, আমাদের খুকী এবং সর্ব্বশেষ কাল মুরগীর ছানাগুলি। সে উহা এরূপ seriously প্রকাশ করিল যে, যেন ঈদের দিন সে ভোলাকে সালাম করিতে প্রস্তুত এবং সম্ভব হইলে কাল মুরগীর ছানাগুলি হইতে নিজেও সালামের প্রত্যাশা করে। এইই আমাদের পরিবার এবং মা-ই উহার কেন্দ্র। বাহিরে ভয়ানক একটা কোলাহল রণিয়া উঠিল। পাড়া ভাঙ্গিয়া যেন পূর্ব দিকে ছুটিয়াছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে মক্‌বুল চৌকিদার মোটা গলায় হাঁকিতেছে 'বাপ সকল উজারে!' বিদ্যুতের শক্-লাগা তারের মুখের মত আমাদের মুখে এক সঙ্গেই ধ্বনিত হইল 'আগুন! আগুন!!' বাঁশের গিরে ফাটার শব্দ মুহুর্মুহু ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহির হইয়া দেখি পূর্বের আকাশ আগুন, ছাই ও ধোঁয়ায় আড়াল হইয়া গিয়াছে। উহার ভিতর হইতে মিলিত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ও থাকিয়া থাকিয়া আগুনের এক একটা সাপ যেন সেই আড়ালকে দীর্ণ করিতেছে। আমিও আগুন লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইলাম।

বশিরের মারই ঘর জ্বলিয়াছে। বশির বলিয়া কাউকে আমরা দেখি নাই। বশির এখন একটা নামমাত্র। বশিরের মা কিন্তু বাস্তব—জরা, বার্দ্ধক্য, হতাশা ও অসহায়তার রূঢ় বাস্তব-মূর্ত্তি। কিন্তু এই যে বশির অকালে মরিল, পেটান চৌধুরী খাজনার টাকাটা উদরসাৎ করিয়া ভিটিটা নীলামে ডাকিয়া লইল, তারপর নিজের অর্দ্ধাঙ্গ-রোগ ইহা যেন যথেষ্ট নহে। তাই এখন প্রদীপের আগুন লাগিয়া সেই অবশ অর্দ্ধেক অঙ্গটা জ্বলিয়াছে আর কাপড়ের আগুন চালায় লাফাইয়া উঠিয়া ঘটিয়াছে এই লঙ্কা-কাণ্ড। পড়শীদের কাহারও ফুরসৎ নাই; ফুরসৎ থাকিবারও কথা নয়। দা, শাবল, লাঠি, শুধু হাত, কলসী, বাল্‌তি, মই—যে যেটা দিয়া পারুক, আগুনকে কোপাইয়া-কাপাইয়া পিটাইয়া খাম্‌ছাইয়া ভিজাইয়া মাড়াইয়া যদি যে কোন উপায়ে যখন তখন ঘায়েল করা না যায়, তাহা হইলে উহা সহস্র ফণায় যে কাহারও ঘর বাড়ী আস্ত রাখিবে না।

ঘায়েল তাহারা আগুনটাকে করিয়াছিল। বিরাট একটা কাল-অজগরের মত আগুনটা মাটীতে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফণা যখন লক্‌লক্ করিয়া আকাশকে লেহিয়া খাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় মকবুল চৌকিদার লাঠির আগায় দা বাঁধিয়া অকুতোভয়ে জ্বলন্ত চালের একটা কোণা খুলিয়া ফেলে। ইহাতেই যেন শিকারটা মুখে ধরিয়াই সাপটা মাটীতে পড়িয়া যায়। এখন তাহারও আয়ু শেষ, শিকারেরও আর কিছু বাকী নাই। একটা গলা কাটা জানোয়ারের মত আগুনটা যেন শিহরিয়া শিহরিয়া মরিয়া যাইতেছে, আর কসাই যেরূপ জানোয়ারের মৃত্যু হইতে দেরী হইলে, দেখিয়া দেখিয়া তাহার জীবনের শেষ আশ্রয় গ্রন্থি-উপগ্রন্থিগুলি কাটিয়া দেয় মক্‌বুল চৌকিদারও সেরূপ যেখানে যেখানে আগুনটা এখনও ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল দেখিয়া দেখিয়া সে সেখানে জল ঢালিতেছিল।

গাছ-তলায় বশিরের মা পড়িয়াছিল। মুখটা বড় বিকৃত দেখাইতেছিল, আর সে মুখে যন্ত্রণার একটা অস্ফুট আওয়াজ যখন বাহির হইতেছিল, তখন উহাকে বড়ই কদর্য্য দেখাইতেছিল। তাহার পাশে জড় করা ছিল একটা মুরগী ও তাহার গণ্ডা দুই বাচ্চা— ইহারা পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। বশিরের মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন সান্ত্বনার বাণীই আমার ভিতরে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমি বলিতে চাহিতেছিলাম ''বশিরের মা, খোদা তোমার ভাল করুন।'' কিন্তু ছোট পাখীর ন্যায় ভয়ে আমার বুক 'ঢিব্ ঢিব্' করিতেছিল। আমার বয়সী কি আমার অবস্থার কেহ হইলে এই কথাটি আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম। কিন্তু এই বিকৃত , কদর্য্য ও বিশীর্ণ মুখ, সংসারে ঐ অঙ্গারে পরিণত মুরগীগুলিই ছিল যাহার এক মাত্র অবলম্বন—জীবনে হারানোর দিক দিয়া তাহার মূর্ত্তি আমাকে ছাড়াইয়া এতই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে মনে হইল যে আমার খোদা উহার নাগাল পাইবে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।..........

এমন সময় নাজির চৌধুরী আসিয়া হাজির হইলেন। পরণে ধুতি— নমাজের সময় হইলে তিনি উহাকে তহ্‌বন্দের আকারে পরিয়া নেন, আর বাইকে চড়ার বেলায় উহাকে মাল-কোঁচা করিয়া প্রায় পাজামায় পরিণত করেন। সাদা কোট —উহার পকেটে 'ফেজ' টুপী ভাঁজ করিয়া গোজা—যখন প্রয়োজন হয় খুলিয়া মাথায় দেন। দাড়ি এ ভাবে ছাঁটা যে—রাখেন না

বলিয়া তাঁহাকে নিন্দাও করা যায় আবার রাখেন বলিয়া তাঁহাকে সে নিন্দা হ'তে অব্যাহতি দেওয়াও চলে। সর্ব্বোপরি তাঁহার মুখটাই বিশিষ্ট। বুদ্ধির একটা জ্যোতিঃ যেন চোখ দুটি হইতে ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া মুখ-খানিকে আলোকিত করিয়াছে, আর উহাতে লাগিয়া আছে একটা হাসি—যেন নিজের বুদ্ধির সাফল্যে তিনি নিজেই হাসিতেছেন।

মকবুল চৌকিদার সালাম করিয়া নত হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা লুঙীর মাল-কোঁচা করিয়া এতক্ষণ আগুনের সহিত লড়িয়াছিল তাহারা কোঁচা নামাইয়া দিল। পেটান চৌধুরির ছেলে; নাজির চৌধুরী সকলেরই জমীদার। তারও উপর এটা সকলে দেখিয়া আসিতেছে যে নাজির চৌধুরী কাহারও পক্ষে থাকিলে সে 'মরিয়াও মরে।'—চুরি করিয়াও তার জেল হয় না, নমাজ না পড়িয়াও সে একঘরে হয় না, আর একঘরে হইলেও সকলের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণ হয়। আর তিনি বিপক্ষে গেলে মিথ্যা অপবাদে সে ব্যক্তি থানায় গেরেফ্‌তার হয়, গায়ে পড়িয়া লোক তাহার সহিত ঝগড়া করে এবং সালিস ডাকিলে উহারা উল্টা তাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করে। সুতরাং তাঁহাকে না মানিয়া কাহারও উপায় নাই।

নাজির চৌধুরী সোজা গিয়া বশিরের মার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া তিনি এক পা আগাইয়া আসিলেন এবং সালাম করিয়া হাতে হাত মিলাইলেন। এই একটি লোক—অসাক্ষাতে ইহার বিরুদ্ধে আমার মন ফুঁশিয়া উঠে, কিন্তু সাক্ষাতে ইহার প্রতি আমি আকৃষ্ট না হইয়া পারি না। অসাক্ষাতে মনে হয় আমি যে শ্রেণীর লোক—নিম্নমধ্য শ্রেণী- লোকটি উহার শত্রু—এই শ্রেণীকে দিন-মজুরে পরিণত করাই ইহার কাজ। কিন্তু সাক্ষাতে তাহার কথা বার্তার ধরণ, সমাহিত মন হইতে বুদ্ধির স্ফুরণ এবং তাহার পেছনে বিরাট একটা শক্তি আছে এই একটা অনুভূতি আমাকে যেন তাহার হাতে গলাইয়া ফেলে। নিজের অজ্ঞাতে আমি তাহাকে খুশী করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এই ই আমাদের পল্লী জীবনের শয়তান। এ দেশের political system এ নগর স্বর্গ, গ্রাম মর্ত্ত্য। এই মর্ত্ত্যের শাসন-ব্যাপারে এই শয়তানই একমাত্র সত্য, আর সবই অবাস্তব। প্রত্যেকেই তাহার নিন্দা করে, কিন্তু এ vicious circle এর কেহই বাহিরে যাইতে পারে না—প্রত্যেকেই তাহার পথ পরিষ্কার করে।.....

মকবুল চৌকিদার বলিল "কাল্‌কেই আমরা কেউ বাঁশ কেউ শন দিয়ে বুড়ির একখানা ঘর তুলে দি।" নাজির চৌধুরী শুনিয়াও শুনিলেন না। এমন সমাহিতভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন যেন এটা তাঁহার বৈঠকখানা। মক্‌বুল চৌকিদার হুঁকা সাজিয়া আনিয়া দিল। তিনি সমীহের ভাবে মুখটা আমার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার পকেটে সিগারেটের কৌটা আছে। কিন্তু কোন্ সময়ে সিগারেট টানিতে হইবে তাঁহার সে সম্বন্ধে একটা নীতি আছে। তামাকের ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি মক্‌বুলকে বলিলেন "তোরা চার জনে ধরে বুড়ীকে এখনই আমাদের বাড়ী দিয়ে আয়। আমি একটু পরে আস্‌ছি।"

চার জনে বশিরের মাকে উঠাইয়া নিয়া চলিল। এদিকে হেকিম সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাজামা ও কোট-পরা, মাথায় লাল 'ফেজ'—শোয়ার সময়ও তিনি এ পোষাক ছাড়েন কিনা সন্দেহ। তিনি ম্যাট্রিক ফেল করিয়াছেন, হেকিমী পরীক্ষা ফেল করিয়াছেন এবং গতবারে ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শনে ফেল করিয়াছেন। তবুও নিজের মূল্য সম্বন্ধে তিনি খুব সজাগ, 'লেটার-প্যাড' এ তাঁহার নামের পর 'আণ্ডার-ম্যাট্রিক' ('আণ্ডার' ছোট ও 'ম্যাট্রিক' বড় করিয়া) ছাপাইয়াছেন, কোটের পকেটে তিনি একটি ষ্টেথেস্‌কোপ্ রাখেন এবং নাজির চৌধুরীর সঙ্গে (ইলেক্‌শনে ফেল করার পর হইতে) তিনি ছায়ার ন্যায় ফিরেন। কিন্তু তাঁহার যে মূল্য পাড়ার দশজনে দিয়া থাকে সেটা এই যে তিনি তাঁহার মৃত পিতার একমাত্র সন্তান এবং তাঁহার খাওয়া পরার কোন চিন্তা নাই।

হেকিম সাহেব দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন "চৌধুরী সাহেব, এবার এ ভিটি ষোল আনাই আপনার খাস হ'ল। ঘরের যে বাধা ছিল তা আপনিই দূর হ'য়ে গেল।" চৌধুরী সমানেই আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মকবুল যখন ঘর পুনরায় বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছিল তখনও তিনি কিছু বলেন নাই, এখনও কিছু বলিলেন না। তবুও মনে হইল এটাই তাঁহার মনের কথা; কিন্তু এটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া তিনি পছন্দ করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বশিরের মাকে নিজের বাড়ীতে সরানো সেটাও আশ্রয় দান নহে, ভক্ষ্য সম্বন্ধে অজগরের একটা সুব্যবস্থা মাত্র।

চৌধুরী হাসিয়া হেকিম সাহেবের দিকে তাকাইলেন। বলিলেন "আপনার সেই প্রস্তাবটা সাহেবকে বলুন।" হেকিম সাহেব

আবার দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন। নির্ব্বোধ লোকের এ হাসি দেখিলে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায়। তৎপর বলিলেন "আপনার বিদায় উপলক্ষে একটা পার্টি দিতে চাই।" আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। কিন্তু, না-খুশী হইলাম না। পার্টি দিতে চাহিলে না-খুশী হয় এ যুগে বোধ হয় এমন ইংরেজী পড়া লোক নাই এবং পল্লীর প্রত্যেক শয়তানই জানে যে ইংরেজী পড়া লোককে কাবু করিবার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ।.......

আলাপ করিতে করিতে চৌধুরীদের পুকুর ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রকাণ্ড শান-বাধানো ঘাট, দুই দিকে বসিবার আসন। আমরা আসনে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘাটের উপরই মকবুল চৌকিদারেরা নামাইয়া দিয়া গিয়াছে বশিরের মাকে। বশিরের মা পিণ্ড পাকাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সাড়া পাইয়া কি করিয়া দুইহাতের ফাঁকে মাথাটিকে নমাজের সেজদার ভঙ্গিতে সানের উপর রাখিল, তারপর জোরে জোরে মাথা ঠুকিতে লাগিল "আল্লারে! আল্লারে!" আমরা তিন জনই একসঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম........

রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম— আগুনের কথা। এ বয়সেই আমি এত ঘর জ্বলিতে দেখিয়াছি যে অর্থ এবং সুখ—পরিমেয় এবং অপরিমেয় উভয় দিক দিয়া ইহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার মুকাবিলায় কি করিয়া যে আমরা অথর্ব্বের ন্যায় বসিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। এক রাত্রির কথা মনে হইল— আমি 'লালা চন্দ্রের মাঠ' দিয়া আসিতেছিলাম। বিশাল মাঠ— সঙ্গে আমার আলো ছিল না। কিন্তু চারধারে এত বাড়ী জ্বলিতেছিল যে আঁধার রাতেও পথ চিনিতে কষ্ট হইতেছিল না। ধোঁয়ার গন্ধ আমার নাকে আসিতেছিল, চারধারে এত আর্ত্তনাদ আমার কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল যে মনে হইতেছিল এ দেশটাই আর্ত্তনাদের রাজ্য আর আগুনগুলি মাঝে মাঝে বিরাট হইয়া উঠিয়া দেখাইয়া দিতেছিল, যাহারা আর্ত্তনাদ করিতেছিল তাহারা কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়। বরাবরই আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে : ইহার প্রতিকার কি এবং কে করিবে? আমি সমাধান করিতে পারি নাই। কিন্তু সমাধান যাহাই হউক উহায় পৌঁছাইতে হইলে যে 'existing order'-এ একটা প্রকাণ্ড রকমের ভাঙ্গা-গড়া— একটা বিবর্ত্তন—একটা ওলট্ পালটের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝি। আর হয়ত বুঝি এই ওলট্ পালটে নাজির চৌধুরীর দলেরই ভয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।..... হঠাৎ বশিরের মা নাজির চৌধুরীর শান-বাধা ঘাটে মাথা ঠুকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে 'আল্লারে! আল্লারে!'— এই চিত্রটি আমার মনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল— যে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়াছে মরিবার জন্য তাহারই দরজায় মাথা রাখিতে বাধ্য হওয়া মানুষের ইহার বড় অপমান আর কি হইতে পারে! হয়ত মাথা গুঁজিবার স্থান-হারা হইয়া সে মাথা কুটে নাই, নাজির চৌধুরীর টিনের চালার আশ্রয় পাইয়া সে এই অপমানেই মাথা কুটিয়াছে। হঠাৎ আমার মনে হইল এই বশিরের মা মহামানুষ— হউক সে বৃদ্ধা, বিকৃত ও কদর্য্য। তাহার ভিতর মানুষের নিপীড়িত আত্মা ফণা তুলিয়া প্রতিশোধ চাহিয়াছে। আর ওই শান-বাধা ঘাট মানুষের মহাতীর্থ— ওই খানে জমা রহিল নিপীড়িত মানুষের বুকের আগুন। এইরূপ কতখানি আগুন জমা হইলে শুরু হইবে সে ওলট্-পালট্ কে বলিতে পারে!

পার্টি মন্দ জমিল না। খাঁ সাহেব হায়দর মোটরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে জেলা-বোর্ডের ইলেকশন। এই রকম পার্টি তিনি বাদ দিতে পারেন না। কাজেই রবাহুত হইয়াই আসিয়া পড়িলেন। সংবাদ আসিল ডাক্-বাংলোয় ইন্‌স্‌পেক্টর ও ইন্‌স্‌পেকট্রেস্ উভয়েই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। ইহাতে ভয়ানক সাড়া পড়িয়া গেল। কারণ, নাজির চৌধুরী বালক ও বালিকা উভয় স্কুলের নামেই সাহায্য পাইয়া থাকেন। খাঁ সাহেবের ভাড়াটিয়া মোটর চলিয়া গিয়াছিল। যান-বাহন না লইয়া গেলে তাঁহাদের মন উঠিবে না। অগত্যা নাজির চৌধুরী একখানি তাঞ্জাম এবং একখানি পাল্কী লইয়া উভয়কে আনিতে গেলেন। আমি এবং খাঁ সাহেবও সঙ্গে চলিলাম। নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

ইন্‌স্‌পেক্টর আফ্‌জল বেশ সুপুরুষ। চেহারা এবং কেতা-দুরস্ত চাল-চলন তাঁহাকে নগণ্য হইতে মোটা বেতনে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে। এক কালে তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের মোড়লি করিতে করিতে এখন উহাতে ছাতা ধরিয়াছে—ইস্কুল-মাষ্টারদের ন্যায় সে বিদ্যা হইয়াছে এখন কতকগুলি বাঁধি-গৎ। মাঝে মাঝে তিনি কলেজের মাষ্টারও হইয়াছেন—তখনই যা তাঁহার বিদ্যায় শান পড়িয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগই কাটিয়াছে তাঁহার ইন্‌স্‌পেক্টরেটের বদ্ধ-জলায়। একটি মেয়ের বৃত্তি-পরীক্ষা লইয়া কি গোল বাধিয়াছে। মেয়ে নাজির চৌধুরীর। কাহারা জানাইয়া দিয়াছে যে, উহার যে বৃত্তি-

পরীক্ষা হইয়া গেল তাহা 'নাম্‌কা ওয়াস্তে' মাত্র। পরীক্ষাকারী সব্-ইন্সপেক্টর তাহাকে সব দেখাইয়া দিয়াছেন। আফ্‌জল সাহেব তখন 'টুর' এ ছিলেন। অফিসের ভার ছিল ২য় ইন্স্‌পেক্টরের উপর। তিনি ইহার তদন্তের ভার দেন। জেলা-ইন্স্‌পেক্টরের উপর, জেলা ইন্স্‌পেক্টর উহা পাঠান মহকুমা-ইন্স্‌পেক্টরকে। ইনি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। উহা জেলা-ইন্স্‌পেক্টরের ও ২য় ইন্সপেক্টরের হাত হইয়া আফ্‌জল সাহেবের নিকট পৌঁছিয়াছে। তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তাই surprise visit এ আসিয়াছেন।

ইন্সপেকট্রেস্ মিস্ উপাধ্যায়কে উপাধ্যায় না বলিয়া বিরাট অধ্যায় বলা উচিত। এরূপ লম্বা-চওড়া মেয়ে মানুষ জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি শাড়ী পরেন, দেখিয়া মনে হয় মেয়ে-বেশী অর্জ্জুন। আর মনে হয় যেন হিমালয়ের চূড়া উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চোখে একটা ভঙ্গিমা আছে—উহা দেখিলে মনে হয় তিনি দর্শককে ঈর্ষাই করিতেছেন বুঝি। কুমারীত্ব ঘুচাইবার জন্য তিনি বহু সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধি বারবার হাতের কাছে আসিয়াও ফস্‌কাইয়া গিয়াছে। এই সাধনা ও সিদ্ধির আলেয়া—ইহারাই হয়ত আনিয়া দিয়াছে তাঁহার চোখে এই ঈর্ষা। হায়রে বরের দল, তোমাদের কি চোখ নাই? --আক্কেল নাই?—এতটুকু করুণা নাই?

কাণাঘুষা শুনিতেছিলাম যে একজন করুণা করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি মিঃ আফ্‌জল। কিন্তু সে কিরূপ করুণা— স্থায়ী কি মেয়াদী— তিনি কাহাকেও বলেন নাই। আর কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। যাহারা জিজ্ঞাসা করিবার লোক— মিস্ উপাধ্যায়ের বান্ধবীর দল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা একসঙ্গে "Advancement of learning" করিয়াছেন, তাঁহারা এখন যে যার Advancement করিতেই ব্যগ্র। আর উহার মধ্যে যাঁহারা বরের গলায় মালা পরাইয়া advancement এর শেষ দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা এমন কৃতীর ভঙ্গীতে তাঁহার দিকে তাকান যে উহাতে মিস্ উপাধ্যায়ের পিত্ত জ্বলিয়া যায়। তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজের ভিতরই বলিতে থাকেন "জানি, জানি তোমাদের ব্যাপার। এখন ছেলে বিয়োবে like bomb shells"। পরক্ষণেই তাঁহার ভিতরে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস পড়ে। রিক্তা নারী সংসারে কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পায় না। হয় বেয়ারাকে ডাকিয়া কৈফিয়ৎ তলব করে সে এতক্ষণ কোথায় কি করিতেছিল অথবা গল্পের আশায় কোন বান্ধবী বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া যায়। বেয়ারা কৈফিয়ৎ দেয়। মিস্ উপাধ্যায় জানেন উহা মিথ্যা, আসলে সে মালীর সঙ্গে বসিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে গল্প করিতেছিল।..........

ভাবিলাম, আফ্‌জল সাহেব ও মিস্ উপাধ্যায়ে একটা রফা হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তাঞ্জাম ও পাল্কী বাংলোর দরজায় নামিতে না নামিতে, আমরা কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই এবং আফ্‌জল সাহেব তখনও আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'টাই' ঠিক করিতেছেন এমন সময় মিস্ উপাধ্যায় আমন্ত্রণের অপেক্ষা-মাত্র না রাখিয়া গট্ গট্ করিয়া গিয়া তাঞ্জামে চড়িয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারের হাস্যকর দিকটা আমার চোখে ধরা পড়িয়া গেল। আফ্‌জল সাহেব তাঞ্জামে চড়িয়া যাইবেন এবং পেছন পেছন তিনি পাল্কীতে চড়িয়া যাইবেন মিস্ উপাধ্যায় ইহাতে রাজী নহেন। কিন্তু তিনি মেয়ে মানুষ হইয়া তাঞ্জামে যাইবেন—ব্যাটা ছেলে হইয়াও মিঃ আফ্‌জল উহার পেছনে পাল্কীতে যাইতে রাজী হইবেন কি? দেখিলাম, উপাধ্যায়ের মুখ বড় কঠোর—প্রয়োজন হইলে 'ডুয়েল' লড়িয়াও যেন তিনি তাঁহার অধিকার রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। নাজির চৌধুরী দস্তুরমত ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন। আফ্‌জল সাহেব একটানে টাই খুলিয়া ফেলিলেন, আচ্‌কান-পাজামা পরিয়া লইয়া এবার বলিলেন "চলিয়ে, পায়দল"।....

আফ্‌জল ও উপাধ্যায়ের গোঁজ্-করা মুখ জগদ্দল পাথরের ন্যায় পার্টির উপর ভারী হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। তাঁহাদিগকে চা-পান করাইয়া বিদায় দিয়া আমরা হাঁফ্ ছাড়িয়া—বাঁচিলাম না, খাঁ সাহেব বক্তৃতা শুরু করিয়া দিলেন। পান চিবাইতে চিবাইতে খাঁ সাহেব বক্তৃতা করেন বেশ। কিন্তু, উহার যেন শেষ নাই। যতদিন ইলেক্‌শন হইয়া না যায় ততদিন যে উহা থামিবে এমন লক্ষণ দেখা গেল না। বেলার দিকে চাহিয়া ইস্‌মাইল হাজী উস্‌খুস্ করিতেছিলেন। পরিশেষে হঠাৎ উঠিয়া বক্তৃতার মাঝেই তিনি আছরের নমাজের আজান শুরু করিয়া দিলেন। সভাস্থ জনতা নমাজের জন্য কাতার-বন্দী হইয়া দাঁড়াইল, যাহাদের অজু বানাইবার প্রয়োজন হইল তাহারা দৌড়াইল পুকুরের পানে। এরূপ ক্ষেত্রে নমাজ পড়া আমার অভ্যাস। শুধু অভ্যাস নয়, নমাজ না পড়িলে লজ্জাও করে এবং জমা'তের বাহিরে থাকিয়া গেলে নিজেকে যেন মনে হয় মর্য্যাদা-

ঈন। খাঁ সাহেবও রুমালে মুখ মুছিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নমাজের মাঝে মাঝে আমার মনে হইল খাঁ সাহেবের মুখে এখনও পান রহিয়া গিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া তিনি মুখের ভিতর উহা চিবাইতেছেনও। তাঁহার যে অজু বানানো ছিল না উহাতেও আমার সন্দেহ রহিল না। আহা বেচারি, নমাজ পড়িলেন না দেখিলে লোকে ভোট দিবে না। সেইজন্যই তাঁহার এই কস্‌রৎ।........

বিদায়-অভিনন্দন শুরু হইল অতঃপর। হেকিম সাহেবের নেতৃত্বে কতকগুলি স্কুলের ছোক্‌রা--লাল "ফেজ" মাথায়, পাজামা পরণে, পাজামার উপর শার্ট-পরা—এমন সব ভাষায় আমাকে অভিনন্দিত করিলেন, যাহারা মাথা-মুণ্ড কোন অর্থ হয় না; যেটুকুরই বা অর্থ হয় আমার সম্বন্ধে তার এক বর্ণও প্রযোজ্য নহে। এই সকল ছেলেকে আমি চিনি। তাহারা পাড়ার হিতার্থে পাঠশালা বসাইতে চায়, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া যখন ফরমাস্ পায় নিজের ভাই কি বোনকে পড়াইতে, তখন তাহাদের মাথায় রক্ত চড়িয়া বসে, মেজাজ গরম হইয়া যায়—কেননা তাহারা সমাজের কাজ করিতেছে। একবার আমাকে তাহাদের স্বাস্থ্য-মঙ্গল সমিতির সভাপতি করিয়াছিল। আমি যখন বাঁকিয়া বসিলাম যে প্রতি বাড়ীতে জল সিদ্ধ করিয়া ফিল্টার করিতে হইবে, তখন তাহাদের সমিতি বন্ধ হইয়া গেল। এই সকল ছোক্‌রা যখন মিথ্যা-কথার জাল বুনিয়া কাহাকেও অভিনন্দিত করে, তখন সে ব্যক্তির শুধুই মনে হইতে থাকে ইহার অধিক দুর্ভাগ্য তাহার আর কি হইতে পারিত।.. ...

খাওয়ার সময় দারোগা সাহেব এবং সার্কেল অফিসার আসিয়া জুটিলেন। ভূরি-ভোজনে সকলের মন চাঙ্গা হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, নাজির চৌধুরী লোকটার পছন্দ আছে। আর যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করে উহাদিগকে মনে হইল কতকগুলি 'পিগ্‌মী'—ভেড়ার দল। মনের যখন এমন অবস্থা তখন চৌধুরী সাহেবের উস্কানীতে দারোগা সাহেব প্রস্তাব করিলেন, আমি সমর্থন করিলাম, সার্কেল অফিসার মাথা নাড়িলেন : হেকিম সাহেবের নমিনেশন এককরূপ ঠিক হইয়া গেল। (পরে জানিয়াছিলাম পার্টির বাবৎ মোটা টাকা হেকিম সাহেব হইতে পূর্বেই উসুল হইয়াছিল এবং উহাতে এত কেক্ উদ্বৃত্ত হইয়াছিল যে এক পক্ষ কাল যাবৎ চৌধুরী-বাড়ীতে শুধু কেকের নাস্তাই খাওয়া হইয়াছিল।... ......)

ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সার্কেল অফিসারও 'রিজার্ভ' ফেলিয়া আমাদের একজন হইয়া উঠিলেন। এমন সময় দারোগা সাহেব মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর হুজুর, আপনার B C'র খবর কি?" আমি যে এ ব্যাপারের পেছনে ছিলাম তাহা দেখাইতে রাজী ছিলাম না। সুতরাং সংক্ষেপে বলিলাম "দুটিতে বেশ আছে।" সার্কেল অফিসার বলিলেন "এদিকে আব্দুল্লা সাহেবের অবস্থা শোনেন নি বুঝি? বেচারী ভুগ্‌ছিলেন 'নার্ভাস ডেবিলিটি'তে। খাচ্ছিলেন 'চ্যবণপ্রাস'—এমন সময় তাঁর উপর পড়ল এ মোকদ্দমার বিচার-ভার। তারপর তাঁর যা নাজেহালী— রোজ কোর্টে তাঁর প্যান্ট্ নষ্ট হ'তে লাগল। 'পয়েন্ট্' ছিল মেয়েটি নাবালেগ কিনা। রোজ রাত্রেই স্বপ্নে তিনি তার অতি-বালেগত্বের নানা প্রমাণ পেতে লাগলেন। ক্রমে তিনি C র বালেগত্বটাকে তাঁর এমনই একা জুরিস্‌ডিক্‌শনের অন্তর্গত ভাবতে লাগলেন যে B র উপর তাঁর একটা জাত-ক্রোধ হ'য়ে গেল! তিনি নিশ্চয়ই তাকে জেলে পুরতেন, যদি না ডাক্তার সাহেবের সাক্ষ্য তার অনুকূল হত।" দারোগা সাহেব বলিলেন "হুজুর! বল্‌ব কি? আমার বিবি কি বলে জানেন? বলে, তোমরা বিচার কর না ছাই কর! পুরুষ হয়ে আবার মেয়ে মানুষের চালাকী ধর্ত্তে পারবে! এ সব মোকদ্দমায় যদি মেয়ে জুরার দিতে দেখ্‌তে কেমন মেয়েদের যত সব চালাকী ঠিক্ ঠিক্ ধরিয়ে দিত।" সার্কেল অফিসার আবার গম্ভীর হইয়া যাইতেছিলেন। তবুও বলিলেন "অর্দ্ধেক জুরার পুরুষ আর বাকী অর্দ্ধেক মেয়ে হওয়া উচিত। আমার মনে হয়— কিছুটা জোর পছন্দ করাই নারী-প্রকৃতি। আর আমাদের মেয়েরা এত মেয়েলী যে পুরুষরা তাহাদিগকে লইয়া শুধু ছিনিমিনি খেলিতেই প্রেরণা পায়। নারীরা নিজের চেষ্টায় শরীরে ও মনে যদি কিছু শক্তিলাভ করিতে পারেন, উহাতে শুধু পুরুষের এই ছিনিমিনি-খেলার প্রবৃত্তিই সংযত হইবে না, তাহারাও নিজেদের মনোবৃত্তির উন্নতি করিতে —নিজেদের stature বাড়াইতে বাধ্য হইবে।....." দারোগা সাহেব বলিলেন "হুজুর! নারীদের অভ্যাস হ'ল to spill the milk and then to cry over it." আমি বলিলাম "না, তা নয়। নারীর ঘরের মায়াই অত্যধিক। রিক্ততার মুহূর্ত্তে নারী যত না ভাবে নিজের দেহের কথা, তারও বেশী ভাবে যে ঘর সে পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার কথা। নারী দেহ বিলাইয়াও যখন ঘরের পথ ধরে তখন এমন মিথ্যা নাই যাহার আড়ালে সে বিলানটাকে লুপ্ত করিতে না পারে, এমন শপথ নাই যাহার উপর সে তাহার ঘরের পাওয়াকে স্থিত রাখিতে না চাহিবে।"

দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া নাজির চৌধুরী সকলকে বিদায় দিলেন, কিন্তু আমার হাতে হাত রাখিয়াই দিলেন। অপরেরা দূরে গেলে বলিলেন "হুজুর ! বিদেশে যাইতেছেন। একটা ভাল 'বয়' রাখিবেন। তার চাপ্‌রাস চাই। আপনার নিজেরও কিছু সুট বানাইতে হইবে।" আমি বলিলাম "টাকা নাই, চৌধুরী সায়েব !" "সেই কথাই ত প্রাণনাথ বাবু বলছিলেন ! বলছিলেন যে যত টাকা লাগে তিনি দিবেন, সুদ-বেগার কিচ্ছুই নেবেন না। তবুও আপনার এ রকম চলা কারু পছন্দ হয় না।" অভিযোগটা পুরাতন। হাসিয়া বলিলাম "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

বাড়ী ফিরিয়া নিজের কামরায় ঢুকিয়া দেখি মেয়ে-বুকে বৌ শুইয়াছেন, কিন্তু তখনও ঘুমান নাই; আমার প্রতীক্ষায় আছেন। ঢুকিতেই চোখে চোখ পড়িল। মনে হইল সে চোখে বাস করিতেছে নিত্যকালের নারী। ইহাও মনে হইল যে বহু ক্ষতির পরও এখনও এই নারীই পৃথিবীতে একমাত্র মহিমময়ী মূর্ত্তি। অন্তর আমার নৃত্য করিতে লাগিল। উহাতে স্বতঃই ধ্বনিয়া উঠিল "খোদা ! খোদা ! আর কিছুর জন্য তোমার মহিমার অন্ত নাই।" আর নিজের অজ্ঞাতেই পরম সমীহে আমার অন্তর সেই নারীত্বের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল, কথায় ও কাজে দিনে এক শ'বার আমরা যাহার অবমাননা করি।

তারপর আমাদের নিত্যকার ব্যাপার চলিতে লাগিল —দিনের অভিজ্ঞতা পরস্পরের নিকট আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করা। এই প্যাক্টের প্রবর্ত্তক আমিই। আমি জানিতাম আমার কতখানি দুর্ব্বলতা আছে—বিশেষতঃ মেয়ে-লোক সম্বন্ধে। আমি safety-valve ঠাউরেছিলাম বৌ-কে। দিনে মনে যতখানি উত্তাপ ও ক্লেদ সঞ্চিত হইত, আমি ভাবিতাম বৌকে সব শোনানর সঙ্গেই আমি খালাস—অতঃপর বৌয়েরই কাজ আমাকে গড়িয়া পিটিয়া ঠিক রাখা।......আমি বলিয়া যাইতাম, বৌ আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শুনিয়া যাইতেন আর নীরবে আমার মনের প্রতি শিরায় উপশিরায় সহানুভূতির ষ্টেথেস্‌কোপ্‌ লাগাইয়া যেন বুঝিয়া নিতেন কি উহার আধি-ব্যাধি। কি চিকিৎসা তিনি করিতেন তাহা বলা শক্ত। কিন্তু যেন তিনি আছেন শুধু এই ভরসাতেই আমি অঘোরে ঘুমাইতাম এবং সকালে যখন উঠিতাম তখন আমি নূতন মানুষ—চিত্ত-চাঞ্চল্যের রেশ মাত্র আর খুঁজিয়া পাইতাম না।

ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয়

আইনুল হক খাঁ

অনেকের ধারণা, রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে আর কোন শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলণ্ডে যান নাই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি বই হইতে সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত বইখানি ভ্রমণকারীর লিখিত ফারসী বিবরণের ইংরাজি অনুবাদ।* উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, যে, রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে ১৭৬৫ সালে মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন নামক একজন বাঙ্গালী মুসলমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যব্যপদেশে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং দেড় বৎসর কাল ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন পুরাপুরিই বাঙ্গালী ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাঞ্চনুর বা পাঁজনুর নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। ই. বি. রেলওয়ে মেন লাইনের চকদহা ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে উক্ত গ্রামটি অবস্থিত। ১৮৫৫-৫৭ সালের রেভিনিউ সার্ভে-ম্যাপে পাঁজনুর গ্রামটির নাম বদলাইয়া কাজীপাড়া রাখা হয়। বর্ত্তমানে পাঁজনুর নদীয়া জেলার একটা পরগণা বলিয়া অভিহিত। মির্জা সাহেবের লিখিত "নসবনামা" বা পারিবারিক ইতিহাসে পাঞ্চনুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :

"প্রাচীনকালে পাঞ্চনুর একটী শহর ও বন্দর ছিল। ইহার তলদেশ দিয়া গঙ্গানদী বহিয়া যাইত। নদীর উপর দিয়া যে-সমস্ত জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করিত, গ্রাম হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত। বরকত খাঁর প্রাসাদের পশ্চিমে জাহাজ হইতে নামিবার ঘাট ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ব উপকূলে চর পড়িতে লাগিল এবং নদী পশ্চিম দিকে ভাঙিয়া চলিল। এইরূপে নদী যখন পাঞ্চনুর হইতে পশ্চিমে বহুদূরে সরিয়া গেল, তখন বন্দরটীও পাঞ্চনুর হইতে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হইল। অতঃপর গঙ্গা সাত-গাঁ হইতেও সরিয়া গিয়া হুগলি শহর ও বন্দরের সৃষ্টি করিল।

পাঞ্চনুরের পতনের পর একজন সম্ভ্রান্ত খাজা উহার উন্নতিবিধান করেন। উক্ত খাজা রাজার একজন জায়গীরদার ছিলেন। তিনি পাঞ্চনুর পরগণার জমিদার রাজারাম রায় ও রাজা রুদ্র রায়ের পৌত্রগণের নিকট হইতে পাঞ্চনুর ও আরও কয়েকটী গ্রামের ইজারা লন। এই খাজা সাহেবের বংশধরগণ পরে উক্ত পরগণার কাজীরা পদ লাভ করেন। তাঁহারা বংশপরম্পরায় বহুদিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর আনুলিয়া হইতে আরও চারিটি পরিবার আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া এখানে বসবাস করেন। পরে আনুলিয়া ও সমুদ্রগড় হইতে আরও অনেক পরিবার এখানে আসেন।"

পাঠান রাজত্বকালে আনুলিয়ায় বাঙ্গলার কোষাগার স্থাপিত ছিল এবং বহু সম্ভ্রান্ত বংশের বাস ছিল। দ্বিতীয় দলে আনুলিয়া হইতে যে-সমস্ত পরিবার পাঞ্চনুরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের অন্যতম। এহ্‌তেশামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষ—যিনি পাঞ্চনুরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ জামাল। এহ্‌তেশামুদ্দীন পিতৃধারায় নবম বংশধর, যথা : মোহাম্মদ জামাল, শেখ গুল মোহাম্মদ, শেখ বাহলুল, শেখ ফরিদ, শেখ হজরত আবদুশ্ শুকুর, হজরত শেখ-উল-ইস্‌লাম, শাহাবুদ্দীন, তাজুদ্দীন, এহ্‌তেশামুদ্দীন। মির্জা সাহেবের বংশধরগণ এখনও পাঞ্চনুরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদের অনেকে মুফ্‌তি, দেওয়ান, কাজী প্রভৃতি উচ্চপদ দখল করিয়া আসিয়াছেন।

মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীনকে কি ভাবে রাজকীয় ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে যাইতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা তাঁহারই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি : নবাব মীর জাফর আলি খাঁর শাসনকালে প্রধান মুনশী শেখ সলিমুল্লা সাহেবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তাঁহারই সাহায্যে আমি ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের সুযোগ পাই। মীর-কাশিম আলি খাঁর বংশধরগণের রাজত্বকালে আমি মেজর পার্কের অধীনে চাকুরিগ্রহণ করি। উনসুদ্ জমান খাঁ ও বীরভূমের রাজার বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ হয়, আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। যুদ্ধ-বিরতির পর আমি বাদশাহ শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করি

এবং পরে মেজর পার্কের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। মেজর পার্ক ইউরোপে চলিয়া যাওয়ার পর আমি মিঃ স্ট্রেচি ও আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের অধীনে চাকুরি করি। এই সময় (১৭৬৫ সালে) নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত লর্ড ক্লাইভের এক সন্ধি হয় এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। অতঃপর লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলে শাহ্ আলম সজল-নয়নে তাঁহাকে বলিলেন : 'আপনি নিজের ইচ্ছামত কোম্পানীর কাজের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আমার টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কোন পাকা বন্দোবস্ত করিলেন না। আমি যতদিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া আছি, ততদিন আপনি দিল্লীর নিকটে কোন ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন রাখিতে চান না। এখন আপনি আমাকে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেছেন।' ইহা শুনিয়া লর্ড ক্লাইভ ও জেনারেল চার্নক অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন : 'আমাদের রাজার অনুমতি না লইয়া এবং কোম্পানীর ইচ্ছা না জানিয়া ইংরাজ সৈন্য আপনার নিকট মোতায়েন রাখা যাইতে পারে না। আমরা ইংলণ্ডে রাজার নিকট সমস্ত বিষয় লিখিতেছি। তাঁহার হুকুম পাইলে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। তবে যতদিন তাঁহার হুকুম না পাওয়া যায়, ততদিন আপনি এলাহাবাদেই থাকুন। ইতিমধ্যে জেনারাল স্মিথ একদল সৈন্য লইয়া আপনার নিকট থাকিবেন এবং সকল বিষয়ে আপনার হুকুম তামিল করিবেন। তাহা ছাড়া জৌনপুরে ইংরাজ সৈন্যের একটী ঘাটি স্থাপিত হইয়াছে। জৌনপুর এলাহাবাদ হইতে বেশী দূর নহে। দরকার হইলে এখানকার সমস্ত সৈন্য আপনার নিকট হাজির হইবে।' অতঃপর বাদশাহ্ শাহ্ আলমের ইচ্ছাক্রমে ও তাঁহার মন্ত্রিগণের পরামর্শে লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ডে রাজার নিকট বাদশাহের নাম দিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র পাঠাইতে রাজি হইলেন : 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিলে আমি ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য পাইতে পারি, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় ইহাই আমি চাই। আপনার বন্ধুত্বলাভের জন্য আমরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।' ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, এই চিঠির সঙ্গে একলক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকনও বিলাতে রাজার নিকট প্রেরিত হইবে।

অতঃপর লর্ড ক্লাইভ ও বাদশাহের উজির কলিকাতা আসিলেন। উপরোক্ত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়া বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নামের শীলমোহর দিয়া বাদশাহের দূত হিসাবে ক্যাপটেন 'এস্'কে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। একলক্ষ টাকা মূল্যের উপহারও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ইহাও স্থির হইল যে, বাদশাহের পক্ষ হইতে একজন মুন্শীও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যাইবেন। মির্জা এহ্তেশামুদ্দীন এই কার্য্যের জন্য মনোনীত হইলেন এবং খরচপত্রের জন্য বাদ্শাহের নিকট হইতে ৪০০০ হাজার টাকা পাইলেন। ইউরোপ ভ্রমণের এই সুযোগ পাইয়া মির্জা সাহেব অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

এক সপ্তাহ সমুদ্রযাত্রার পর ক্যাপ্টেন মির্জা সাহেবকে জানাইলেন : লর্ড ক্লাইভ বাদশাহ্ শাহ্ আলমের চিঠি ফিরাইয়া লইয়াছেন এই অজুহাতে যে, একলক্ষ টাকার উপহার বাদশাহের নিকট হইতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। যাহা হউক, ক্যাপ্টেন তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, পর বৎসর লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং উক্ত চিঠি ও উপহার লইয়া ইংলণ্ডে রাজার নিকট উপস্থিত হইবেন। এহ্তেশামুদ্দীন এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন : কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিলেন না। এহ্তেশামুদ্দীন দেড় বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। যে-উদ্দেশ্যে মির্জা সাহেবকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল, তাহার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন : "আমি ইংলণ্ডে দেড় বৎসরকাল ছিলাম এবং প্রত্যেক দিনই মোগল বাদশাহের চিঠির প্রতীক্ষা করিয়াছি। ইংলণ্ডেশ্বরকে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য লর্ড ক্লাইভ যখন বিলাতে আসিলেন, তখন বাদশাহের লক্ষ টাকা মূল্যের উপহার তিনি সঙ্গে করিয়া আনিলেন, কিন্তু বাদশাহের নাম না করিয়া নিজের পক্ষ হইতেই সেগুলি রাণীকে উপহার দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যথেষ্ট রাজ-অনুগ্রহও লাভ করিলেন। লর্ড ক্লাইভ বাদশাহের চিঠি বা অনুরোধ সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করিলেন না। ক্যাপ্টেন 'এস্'ও লর্ড ক্লাইভের অনুগ্রহলাভের আশায় এ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই।"

তৎকালীন এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়াও এহ্তেশামুদ্দীন তাঁহার পুস্তকে নানা বিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। যাত্রাপথে তিনি যে-সমস্ত দ্বীপ ও স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন সেখানকার বহু দ্রষ্টব্য বিষয়ের আলোচনা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'মারমেড্' সম্বন্ধে যে-বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই হইয়াছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "এসেন্সন দ্বীপে এই অদ্ভুত জীব সম্বন্ধে আমি গল্প শুনি, কিন্তু

সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখিতে পাই নাই। 'মারমেড' মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত অবিকল একটী সুন্দরী নারী -ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ পাশ, কাজল-কাল চক্ষু, ধনুকের মত ভ্রূ, সুন্দর গঠন সবই তার আছে। কিন্তু খোদার কাছে প্রার্থনা, 'মারমেড' যেন কাহারও দৃষ্টিপথে না পড়ে। কেন না এরা জেনপরীর একটা জাত মাত্র। সমুদ্রের জলে এরা যখন কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকে, তখন এদের চেহারা নাবিকদের নজরে পড়িলে তারা অজ্ঞান হইয়া যায়। এক একটা নাবিকের নাম ধরিয়া এরা ডাকে আর সেই নাবিক একেবারে পাগল হইয়া যায় এবং যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। তৃতীয়বার ডাক শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারে না--জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়।"

এহ্‌তেশামুদ্দীন লণ্ডনে পৌঁছিলে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে। কালক্রমে তিনি সকলের নিকট পরিচিত হইয়া গেলেন এবং নানাস্থানে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি একটা মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইয়াছে--বহু মহিলা ও পুরুষ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নৃত্যগীত থামিয়া গেল এবং সকলে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার পোষাক, পাগড়ী ও শাল ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, ইহা থিয়েটারে অভিনয় ও নৃত্য করিবারই উপযুক্ত পোষাক। মির্জ্জা যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। মির্জা সাহেব লণ্ডনের বহু দ্রষ্টব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বৃটিশ মিউজিয়াম, থিয়েটার, সার্কাস, প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে আছে। মির্জা সাহেব লিখিয়াছেন: লণ্ডন শহরে যত সস্তায় নাচ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নহে। ভারতবর্ষে নাচ দেখিতে হইলে বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হয়, ধনী ব্যতীত অন্য কেহ সে ব্যয় বহন করিতে পারে না; কিন্তু লণ্ডনে সামান্য খরচ করিয়াই নাচ দেখা যায়।

অক্‌স্‌ফোর্ডে গিয়া মির্জা সাহেব আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় হস্তলিখিত অনেকগুলি পুস্তক দেখিতে পান। উহার পাঠোদ্ধারে ও অনুবাদে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। মিঃ জোন্‌স্ নামক এক ব্যক্তিকে তিনি ফারসী গ্রামার প্রণয়নেও সাহায্য করিয়াছিলেন।

অক্‌স্‌ফোর্ড লাইব্রেরীতে মির্জা সাহেব নানারূপ সুন্দর চিত্রকলার সহিত পরিচিত হন। এই সম্পর্কে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "বহুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এক চিত্রকর বাস করিতেন। সেকালে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। একদা তিনি একজন গরীব লোককে তাঁহার গৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাহার দুই পা ও বিলম্বিত দুই হাত দেওয়ালে পেরেক দিয়া আবদ্ধ করিয়া তাহার বুকে ছুরিকাঘাত করেন। যখন সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, সেই সময় চিত্রকর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখভাবের অবিকল চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলেন ঃ ইতিপূর্ব্বে এমন সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্র আর কেহ আঁকিতে পারে নাই; সর্ব্বত্র ইহার উচ্চ প্রশংসা ও আদর হইল। কিন্তু এই নরহত্যা গোপন রহিল না। বিচারে চিত্রকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। চিত্রকর বুদ্ধিকৌশলে এই প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পান। তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে এমন সময় তিনি বলিলেন : 'আমার চিত্র এখনও শেষ হয় নাই, উহাতে এখনও কিছু রং দিতে বাকী আছে।' তাঁহাকে উহা শেষ করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্রটির উপর কালো কালি লেপিয়া দিলেন। এমন সুন্দর চিত্রটি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'অনেক পরিশ্রম করিয়া আমি চিত্রটী আঁকিয়াছিলাম। ইহার জন্য যদি আমার জীবনই যায়, তবে ইহা রাখিয়া আমার লাভ কি?' ইহাতে রাজা বলিলেন, 'আমি তোমার জীবন রক্ষা করিব, যদি তুমি চিত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় আঁকিয়া দিতে পার।' চিত্রকর স্বীকার করায় রাজা তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। বলাবাহুল্য, চিত্রকর ছবিটী অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় আঁকিয়া দিয়াছিলেন।"

মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য এবং জাতীয় পোষাক ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লাম সম্বন্ধেও তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। মির্জা সাহেবকে ইংলণ্ডে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ফারসী শিক্ষা দিয়া অনায়াসে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। তাঁহাকে মদ ও শূকর মাংস খাওয়াইবার চেষ্টাও কম হয় নাই। কিন্তু এসমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে, যে-উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল, তাহা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন এবং ১৭৬৮ সালের কার্ত্তিক মাসে বাঙলায় ফিরিয়া আসিলেন।

(শ্রাবণ--আশ্বিন--১৩৪১)

কলম্বোর চিঠি

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্

রাইফ্‌ল গ্রীণ, কলম্বো।
৪ঠা নভেম্বর।

কথা দিয়া আসিয়াছিলাম, কলম্বো পৌছিয়াই আপনাকে চিঠি লিখিব। কিন্তু হইয়া উঠিল কই? ফুটবল টিমের মাঝখানে থাকিয়া চিঠি লেখা কিরূপ দুরূহ কাজ, সম্পাদক আপনি, বুঝিতে পারিবেন না। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই কলম লইয়া বসিয়াছি। একদল কাবুলি আসিয়া বলিল : "ইস্‌তারা মুশা"—তারা তাদের মুলকী ভাই জুম্মা খাঁর সঙ্গে মোলাকাত করিবে। রহমত জ্বরে পড়িয়া ছটফট করিতেছে--মাঝে মাঝে তামিল ভাষায় হাঁকিতেছে--'তানি কড়ুয়া'--পানি চাই, পানি চাই। একপাল ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে,--তারা অটোগ্রাফ দস্তখত করাইবে। কেহ বক্তৃতার দাওয়াত করিতে আসিয়াছে, কেহবা আসিয়াছে ডিনারের নিমন্ত্রণ লইয়া। তা ছাড়া প্লেয়ারদের ট্রেনিং দেওয়া, team selection, sight-seeing এসব তো আছেই। এর মধ্যে চিঠি লিখিতে যদি না পারিয়া থাকি, অপরাধ কবি নাই নিশ্চয়ই। আজ দু'ঘন্টা ধরিয়া বেশ বৃষ্টি হইতেছে--লোকজন আসিতে একটু দেরী হইবে, এই ফাঁকে চিঠিটা শেষ করিয়া ফেলি!

*　　　　*　　　　*

অদ্ভুত দেশ এই সিংহল! ছেলে-বেলায় বাল্যশিক্ষা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলের মনে লঙ্কা সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন গড়িয়া ওঠে। আমার মনেও একটা স্বপ্ন ছিল এই দ্বীপটি সম্পর্কে। আদম্‌স্-ব্রীজ পার হইয়াই বুঝিলাম, স্বপ্ন আর বাস্তবে অনেক তফাত। রাবণের লঙ্কা আর ইংরেজের কলম্বো একেবারে আলাদা জগত। কলম্বো শহরটি অতি-আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর, সভ্যজগতের ঠিক কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। কত দেশের যাত্রী লইয়া সপ্তডিঙ্গা আসিয়া এর কূলে ভিড়িতেছে! ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া--কত দেশে ঢেউ এর তীরে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে।

এখনকার লোকগুলিও অদ্ভুত। কত দেশের কত বর্ণের কত বিচিত্র মানুষের ধারা এখানে আসিয়া মিলিতেছে! এখানকার মনুষ্য সমাজ জীবনের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছে কত বিচিত্র, কত বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্য হইতে। ষ্টেশনে যাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাইতে আসিয়াছিলেন তাঁদের দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এক একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। কৃষি-মন্ত্রী মিঃ সেনানায়ক খাঁটি সিংহলী। সিংহলীরা বাঙ্গলার সেই বিজয়সিংহের বংশধর বলিয়া দাবী করে, যাঁর নাম হইতে লঙ্কার নাম হইয়াছে সিংহল। মিঃ ডোনোভান এড্রি 'বার্গার' সমাজের প্রতিনিধি। আমাদের যেমন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সিংহলের তেমনি বার্গার। বেশ ফর্সা চেহারা—তার মধ্যে চোখে মুখে একটু মঙ্গোলিয়ান তুলির পোঁচ (touch)। রৌফ পাশা আরব বলিয়া দাবী করেন—চেহারাও সেমেটিক। অনেক পুরুষ মাদ্রাজে ছিলেন, তা সত্ত্বেও মাদ্রাজীর রঙ তাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রৌফ পাশা জাহিরা কলেজের প্রফেসার। খেলাফৎ আন্দোলনের শেষ চিহ্ন খদ্দরের টুপি তাঁর মাথায় শোভা পাইতেছিল। রাজনৈতিক মতামত তাঁর অনেকটা প্যানইস্‌লামিষ্টদের মতো--মোহাম্মদ আলীর তিনি একজন ভক্ত শিষ্য।

প্রিন্সিপাল জয়া, মন্ত্রী মাকান মারকার দু'জনেই মালয় মুসলমান! মালয়রা কয়েক'শ বছর ধরিয়া সিংহলে আছেন। তা সত্ত্বেও এঁরা এখনো পুরো সিংহলী হইতে পারেন নাই। তাঁরা যতটা সিংহলী, মুসলমান তার চেয়ে বেশী; মুসলমান যতটা, মালয় তার চেয়েও বেশী। নামে, চেহারায়, পোষাকে, দৃষ্টিতে এঁরা পূর্ণ মাত্রায় মালয়!

মুক্তার ব্যবসায়ী আবদুল গফুর সাহেবের সঙ্গেও দেখা হইয়াছিল। তিনি এবং সিংহলের অধিকাংশ মুসলমান মূর বলিয়া পরিচিত। এদের মধ্যে আরব প্রভাব যত না, তার চেয়ে বেশী দেখিলাম দক্ষিণ ভারতের তামিল প্রভাব। আচার, ব্যবহার,

ভাষা--এমন কি, রঙটা পর্য্যন্ত এরা ধার করিয়াছে দক্ষিণ ভারত হইতে। তবু এরা মুর! মালয়দের এরা ভাল চোখে দেখে না, বলে : তারা খাঁটি মুসলমান নয়!

সিংহলে শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। প্রিন্সিপাল জয়ার বদৌলত সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরা কলেজে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বাঙ্গলা সম্বন্ধে বলিলাম, তাঁরা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন সিংহলের সব কথা। সিংহলের শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা ইংলণ্ডের মতো। কলেজগুলি যেন বিলাতের পাবলিক স্কুল। সেই কারিকুলাম, সেই খেলাধুলা, সেই আবহাওয়া! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংযুক্ত। এইজন্যে এখানকার ছাত্রেরা কলম্বোয় বসিয়া বি. এ. ও বি. এস-সি পরীক্ষা পাশ করে।

মুসলমানদের একটি মাত্র কলেজ--জাহিরা কলেজ। বেশ কলেজটি! একে ভাগ করা হইয়াছে চার ভাগে--আঙ্গোরা হাউস, ইস্তাম্বুল হাউস, কর্ডোভা হাউস ও বাগদাদ হাউস। সিংহলের নব্য-ইসলামের প্রতীক আঙ্গোরা হাউস।

*   *   *

'আঙ্গোরা হাউস' মজলিসের কয়েকটা মিটিংএ যোগ দিয়াছি। ছেলেগুলো মন্দ নয়--বেশ স্মার্ট, চালাক চতুর। আমাকে বাঙ্গলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে 'টেগোর'কে বেশ ভাল করিয়া চেনে। আর চেনে তারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। বাঙ্গলার মুসলমানদের সম্বন্ধে তারা খোঁজখবর খুবই কমই রাখে। স্যার আবদুর রহিম এবং ফজলুল হক সাহেব এসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট ও কলিকাতার মেয়র হওয়ার পর এঁদের নাম কেউ কেউ শুনিয়াছে। বাস্, ঐ পর্য্যন্তই! এঁদের এর বেশী পরিচয় তারা জানে না। বাঙ্গলা দেশের ইস্‌লাম ধর্ম্মালম্বী একজন মাত্র লোককে তারা জানে--ইনি 'খেলার মাঠে যাদুকর' সামাদ।

জাহিরা কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি বেশ ভালই লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িল এর ব্যয়বহুলতা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকেও এদের বেশ নজর আছে। কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত কমার্স ক্লাস। কমার্স ক্লাসের ছাত্রেরা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম হাতে কলমে শিখিতে পারে। কলেজের ভিতরে ছোট একটা ব্যাঙ্ক। টাকা জমা রাখে ছাত্রেরা, হিসাবপত্র রাখে ছাত্রেরা--কেরাণী, একাউন্ট্যান্ট, ডিরেক্টর সবই ছাত্র। কলেজের ভিতর ব্যাঙ্ক থাকার ফলে ছাত্রেরা ছেলেবেলা হইতে সঞ্চয় করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়। তা'ছাড়া অফিস চালাইবার, হিসাবপত্র রাখিবার ট্রেনিংও তাদের হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জাহিরার কর্ত্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এক একটি করিয়া স্বাস্থ্য পুস্তক রহিয়াছে। কেহ কলেজে ভর্ত্তি হইতে আসিলে কলেজের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করিয়া তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়া দেন। স্বাস্থ্য পুস্তকগুলি দেখিলেই ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সব-কিছু জানা হইয়া যায়। খেলাধূলার ব্যাপারেও জাহিরা কলেজ বেশ অগ্রসর। ইটন ও হারোর পরিচালকদের মতো এঁরাও মনে করেন, জীবন-যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রাউণ্ড খেলার মাঠ।

এখানকার মুস্‌লিম মন্ত্রী মিঃ মাকান মারকার একদিন আমাদের চা'য়ে দাওয়াত করিলেন। তাঁর সঙ্গে সিংহলের পলিটিক্স লইয়া আলোচনা হইল। ডোনোমোর কমিশনের প্রস্তাব মত এদেশে যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তা সত্ত্বেও একজন মুসলমান প্রতিনিধি মন্ত্রীর পদ অধিকার করিতে পারিয়াছেন। এখানকার একজন হাইকোর্টের জজ মুসলমান--জাস্টিস মিঃ আকবর। সাম্প্রদায়িকতা এখানে খুব উগ্রভাব ধারণ করে নাই। ভবিষ্যত মুসলমানেরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাইবে কিনা বলা মুশকিল।

মাকান মারকার সাহেব মুক্তার ব্যবসায় করেন। ইঁহার ও আবদুল গফুর সাহেবের লণ্ডন ও কায়রোতে জুয়েলারীর দোকান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-ডিগ্রি এঁদের নেই। তা সত্ত্বেও বিচার-শক্তি, শাসন-ক্ষমতা এঁদের অসাধারণ।

শুধু দেশ-বিদেশের বাণিজ্য-তরীই এদেশে আসিয়া নোঙ্গর করে তা নয়, ক্রীড়া জগতেরও কেন্দ্র-স্থল কলম্বো। প্রতি বৎসরই দেশ-বিদেশের সেরা খেলোয়াড়রা সিংহলের ময়দানে আসিয়া মিলিত হয়। রাইডারের নেতৃত্বে যে ক্রিকেট-টিম ভারতে আসিয়াছে তার সঙ্গে কলম্বোতে আমাদের দেখা হয়। এঁদের ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজারের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলাপ হইয়াছে। বেশ লোক এঁরা। ভারতীয়দের সঙ্গে এমন মন খুলিয়া আলাপ করিতে ভারতবর্ষে কোন ইংরেজকে দেখি নাই। কলিকাতায় ক্রিকেট খেলার পরিচালনভার ইংরেজদের হাতে, এইজন্য এঁরা খুব দুঃখ করিলেন। বলিলেন : আমরা ভারতে

যাইতেছি ভারতীয়দের সঙ্গে খেলিতে--ভারতবর্ষকে চিনিতে, ইংরেজদের সঙ্গে মিশিতে নয়।

* * *

সব চেয়ে খুশী হইয়াছি আমি এখানকার বাঙ্গালীদের দেখিয়া। মোহামেডান টিমকে এমনভাবে আপন ভাবিতে বাঙ্গলা দেশে কোন বাঙ্গালী হিন্দুকে দেখি নাই। আমাদের গৌরবকে এঁরা ভাবিয়াছেন নিজেদের গৌরব--আমাদের পরাজয় এঁদের নিকট ভারতবর্ষের পরাজয়। যিনি যাহাই বলুন, ভারতের বাহিরে না আসিলে কেহই ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইতে পারে না। ভারতের হিন্দু সমাজ 'জাতীয়তাবাদী' হইতে পারেন, তা হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবে (in terms of the whole of India) ভাবিতে তাঁরাও পারেন না। তাঁদের ভারত খণ্ডিত ভারত--তাঁদের জাতীয়তা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা। ভারতের মর্যাদা, জাতীয়তার মূল্য একমাত্র তাঁরাই বুঝিয়াছেন যাঁরা বিদেশে বাস করিতেছেন। মনে হয়, ভারতের জাতীয়তা বিকশিত হইবে খেলার মাঠের মধ্যে দিয়া।

* * *

কথায় কথায় অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। ভারতের জাতীয়তার কথা আজ থাকুক। ভারতবর্ষের হইয়া সিংহলের সঙ্গে টেষ্ট ম্যাচ খেলিতে হইবে--ইহাই আজ সব চেয়ে বড় কথা। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে--কোহাটের রশিদ্ বলিতেছে : 'মাখো শুকনো'--পেয়ারে ভাই, একটা রবার ব্যাণ্ডেজ না হইলে আমি খেলিতে পারিব না। জুম্মা খাঁ বলিতেছে : বাঙ্গালোরী ফরওয়ার্ডদের নাই জোশ--নাই 'কারেণ্ট।' আমাকে ফরওয়ার্ড খেলাও, দেখিবে কেমন গোল বানাইব, হয় গোল খালাস, না হয় ম্যান খালাস। শিরাজী বলিতেছে : কে তার বুটজোড়া ময়লা করিয়া দিয়াছে, ময়লা বুট লইয়া সে কেমন করিয়া মাঠে নামিবে?

আজ রাত্রে আঙ্গোরা হাউসে আমার বক্তৃতা। চিঠি লিখিতে গিয়া সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবা হইল না।"+

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্যাম্প

মহাকবি আলাওল

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কবি আলাওলের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার রচিত "পদ্মাবতী" কবিত্ব গৌরবে অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাবে তাঁহার সুন্দর গ্রন্থগুলি আজও শিক্ষিত সমাজের সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার নাম এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন।

প্রকৃতপক্ষে আলাওল চট্টল-গগনেরই প্রদীপ্ত ভাস্কর ছিলেন, যদিও বিধাতার বিধানে ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে বিদেশে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিবার জন্যই আজ এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।

পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ডি-লিট্ মহোদয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আলাওলের রচিত "পদ্মাবতীর" সমালোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সামান্য পরিচয় দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি কুক্ষণে লিখিয়াছিলেন ঃ "আলাওল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন।" দীনেশ বাবুর মত লোকের এরূপ উক্তি লোক-হৃদয়ে একটা ধারণা জন্মাইয়া দিবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। দীনেশবাবুর উক্ত মন্তব্য-মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, একমাত্র এই অকিঞ্চন ভিন্ন তাহার বিচারে আর কেহই এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন নাই। মাদৃশ ক্ষুদ্র লোকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর প্রবল-প্রতাপ দীনেশ বাবুর কর্ণে অবশ্য পঁহুছায় নাই। অন্য লোকেও যে আমার সে কথায় কোন আমল দিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, তদবধি আজ পর্য্যন্ত অনেকেই আলাওলকে ফরিদপুরের লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা পোষণ করিলেও কাহাকেও কাগজেপত্রে এতদিন সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য বা লেখালেখি করিতে দেখা যায় নাই। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদের মনের ধারণা মনের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল।

দীনেশ বাবুর উক্ত উক্তির ফলে লোক-হৃদয়ে যে ধারণার উদ্ভব হয়, তাহার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লা এম-এ, ডি-লিট্ সাহেব "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র এক মাসিক অধিবেশনে "সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবন্ধটি ১৩৩৩ সালের ২য় সংখ্যক "পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে।) "পরিষৎ"-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পরিষদের তৎকালীন সদস্য ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। মূল প্রবন্ধ ও সিদ্দিকী সাহেবের লিখিত মন্তব্য—এই উভয় সম্বন্ধেই আবার প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্ মহোদয় আর এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সর্ব্বপ্রথম সিদ্দিকী সাহেবের উক্ত মন্তব্য হইতে শুনা যায় যে,—"(ফরিদপুরের) ফতেহাবাদ গ্রাম আলায়ালের (?) পিতৃপিতামহের বাসভূমি ছিল।" যে উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি আলাওলকে ফরিদপুরের লোক প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, সে কথা শুনিলে পাঠকগণ কাণে আঙ্গুল দিবেন, কিন্তু সে সব কথা আমি এখন কিছু বলিব না।

তারপর ১৩৪০ সালের ৩য় সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" বিশ্বেশ্বর বাবু ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগণার এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেই বৃত্তান্তে তিনি পরিব্যক্ত করেন যে,—"তিনি (সৈয়দ কবি আলাওল) মূলতঃ ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর পরগণার অধিবাসী ছিলেন।" অতঃপর বিশ্বেশ্বর বাবু "ভারতবর্ষ" ও "Bengal Past and Present" নামক পত্রদ্বয়ে আলাওল সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সেই প্রবন্ধ দুইটি আমি দেখি নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে,

সেখানেও তিনি আলাওলের জন্মস্থান সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মনে হয়, আলাওল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বিশ্বেশ্বর বাবু খুব সুখানুভব করেন। কারণ আমরা দেখিতে পাই, তিনি পুনরায় বৎসরেক কাল পূর্ব্বে "বারোমাসী" নামক পত্রিকায় "কবি সৈয়দ আলাওল" শীর্ষক আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সেই প্রবন্ধটি "বুলবুলের" ১৩৪৩ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

এই প্রবন্ধে বিশ্বেশ্বর বাবু আলাওল সম্বন্ধে অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও গবেষণার বেশী পরিচয় মিলে না,—তিনি প্রায়শঃ সিদ্দিকী সাহেবের ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমরা অন্য সকল কথা বাদ দিয়া কেবল আলাওলের জন্মস্থান বা স্বদেশ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

তিনি প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"আলাওল নানা গ্রন্থে তাঁহার স্বদেশের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুদ্রিত বা হস্তলিখিত গ্রন্থে সে পরিচয়টা পরিষ্কার।" কিন্তু এই "পরিষ্কার" পরিচয়টা যে আলাওলের "স্বদেশের" পরিচয়, সে কথা বিশ্বেশ্বর বাবু কোথায় পাইলেন, তাহা বলিলে ভাল হইত। আলাওল যে পরিচয়টা দিয়া গিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার "স্বদেশের" পরিচয়, এমন কথা আলাওল কোথাও বলিয়া যান নাই। উক্ত পরিচয়কে বিশ্বেশ্বরবাবু আলাওলের "স্বদেশের" পরিচয় মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সে কথা আমরা পরে দেখাইব।

যাহা হউক, উক্ত কথাগুলি বলিয়া তিনি কবির দুইখানি গ্রন্থ হইতে কবির স্বকীয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা ঃ—

"মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌরতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান॥
বহু গুণবন্ত লোগ খলিফা ওলমা।
কতেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥
মজিলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
আমি হিন দিন তান পাত্রের সন্ততি॥
কার্য্য হেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্ম্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈলো দরশন॥
বহু জুদ্ধ আছিল সহিদ হৈলো তাতে।
রণক্ষেত্রে সুভযোগে আইলুম এখাতে॥"

(মুদ্রিত পদ্মাবতী)

'গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেহাবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সদা লোক হর্ষ মনোরম॥
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগিরথি গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য॥
রাজেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর আমাত্যতনয়॥

(সেকান্দর-নামা)

পাঠকগণের মনে আছে, বিশ্বেশ্বর বাবু আগে হইতেই ধরিয়া লইয়াছিলেন, কবির এই উক্তিগুলিতে তাঁহার "স্বদেশের"ই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অপর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া "শিশু-শিক্ষার" সুশীল বালকের মত কবির উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াই নেহায়েৎ ভাল মানুষের মত বিজ্ঞবর বিশ্বেশ্বর বাবু অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন,—"কবি ফরিদপুর জেলার উত্তর বা মধ্য অংশের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার (আলাওলের) বাসস্থান ছিল বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার মধ্যে।"

ইহা করিয়াও কিন্তু তাঁহার অনুমানের কেল্লার ভিত্তি দৃঢ় ও নিরাপদ হইল না মনে করিয়া তিনি আবার বলিয়া ফেলিলেন,—"ভাগ্যবিপর্য্যয় কবিকে বিদেশে টানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্বভাবতঃই দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিত।" কিন্তু শুধু কাঁদিয়া উঠিত বলিলেই ত আর দুষ্টলোকে বিশ্বাস করিবে না;—তাই প্রমাণ-রূপ ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তিনি শত্রুর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; যথা ঃ—

"স্বদেশ দেখিবার তরে প্রাণ কাঁদে উভরায়।"

আমরা আগেই বলিয়াছি, বিশ্বেশ্বর বাবুর মনে পূর্ব্ব হইতেই আলাওলের "স্বদেশ" সম্বন্ধে একটা সংস্কার বা কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এই সংস্কারই তাঁহার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহার বিচার শক্তির বিলোপ সাধন করিয়াছিল। তাহা না হইলে তাঁহার মত জ্ঞানী ও বিদ্বান লোক কি করিয়া অবিচারে এরূপ একটা অস্ত্রের প্রয়োগ করিতে পারেন, যাহা ছুটিয়া গিয়া পরে তাঁহার নিজের গায়ে পড়িবে? পূর্ব্বের সংস্কার-বশে তাঁহার বিচার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জানিয়া লইতে এবং বলিতে ভুলিয়াছিলেন যে, এই ব্রহ্মাস্ত্র কোথা হইতে আসিল এবং কোথা হইতে তিনি উহা পাইলেন? সিদ্দিকী সাহেবের কথিত মন্তব্যের একস্থলে আমরা দেখিতে পাই ঃ—"পদ্মাবতী" পুস্তকে পণ্ডিত আলায়াল (?) লিখিয়াছেন,—

মুল্লুক ফতেহাবাদ গৌরবে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান॥
আলাওল জন্ম-স্মৃতি আছে যে তথায়।
দেখিবার তরে প্রাণ কাঁদে উভরায়॥'

বিশ্বেশ্বরবাবু বলিয়া না দিলেও এখন আমরা সহজেই বলিতে পারি, তিনি সিদ্দিকী সাহেবেরই প্রাগুদ্ধৃত অংশ হইতেই ঐ চরণটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্দিকী সাহেবের বেড়াজালে প্রবেশ করিয়া স্বখাত সলিলে ডুবিবার পূর্ব্বে তাঁহার মত বিজ্ঞলোকের কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না, "আলাওল জন্ম-স্মৃতি" ইত্যাদি কথাগুলি তাঁহার নিজের অবলম্বিত "পদ্মাবতী" হইতে নিজের উদ্ধৃত অংশে নাই কেন? উহা কোথা হইতে আসিল, একথা সিদ্দিকী সাহেব হইতেও কি জানিয়া লওয়া তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত ছিল না? এ পর্য্যন্ত "পদ্মাবতীর" বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। কোন সংস্করণে ঐ কথাগুলি পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া না গেলে তাহার কারণ কি, এসব দেখা কি তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল না? কোন হাতের লেখা প্রাচীন পুথিতে ঐরূপ পাঠ মিলে কিনা, তাহার খোঁজ করিয়া দেখাও কি তাঁহার উচিত ছিল না? তিনি সম্ভবতঃ জ্ঞাত আছেন, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া আমি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ ও অনুশীলন করিয়া থাকি। আমি ক্ষুদ্র নগণ্য লোক, সন্দেহ নাই। তথাপি অন্ততঃ সত্যের খাতিরে একবার কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইত কি? কিন্তু তিনি এসব কিছুই করিলেন না, পরন্তু সিদ্দিকী সাহেবেরই কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন,—আলাওল ফরিদপুরের লোক! ইহা কি তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত ও শোভন হইয়াছে? সিদ্দিকী সাহেব ত মনে করিয়াছিলেন, "পরিষদের" যে সভাতে তিনি কথাগুলি বলিতেছিলেন, সে সভাতে এবং তাহার বাহিরে, এমন কি সারা বঙ্গদেশে তাঁহার উপর কথা বলিবার আর কেহ নাই!

সিদ্দিকী সাহেব একরূপ "পদ্মাবতীর" প্রকাশক। নিজেদের ছাপা পুথিতে যে কথা নাই, সে কথা বলিয়া বাহবা লইবার নির্লজ্জ সাহস তাঁহার কিরূপে হইল, বুঝা দুষ্কর। "পদ্মাবতীর" বহুসংখ্যক হস্তলিখিত প্রামাণ্য প্রাচীন পুথি হইতে আমি প্রমাণ করিতে পারি, "আলাওল জন্ম-স্মৃতি" ইত্যাদি কথাগুলি "পদ্মাবতীর" কোথাও নাই,—প্রাচীন ছাপা পুথিতেও তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে কথাগুলি কোথা হইতে আসিল? তাহা যে সিদ্দিকী সাহেবেরই উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত ও তাঁহারই পদ্ম-হস্তের লিখিত, এখানে সে কথা বলিতে আমার দ্বিধা নাই।

ঐ কথাগুলি যে সিদ্দিকী সাহেব কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত (পাঠকগণ "জাল করা" বলিলেও আমি আপত্তি করিব না,) তাহা ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই ধরিতে পারিবেন। আলাওল যদি নিজেই ঐ কথাগুলি লিখিয়া থাকেন, তবে "আলাওল জন্ম-স্মৃতি" ইত্যাদি রূপে লিখিয়া ছিলেন, এরূপ হাস্যাস্পদ কথা কোন পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐরূপ

কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়, আলাওলের জন্ম-স্মৃতি থাকায় সে দেশ দেখিবার জন্য বক্তারই প্রাণ কাঁদে। আলাওল বক্তা হইলে এরূপ কথা কখনও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিত না।

এখন আমি মূল বিষয়ে অর্থাৎ আলাওল ফরিদপুরের লোক ছিলেন কিনা, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"পদ্মাবতী" ও "সেকান্দরনামা"- ধৃত কবির যে উক্তিগুলিকে ভিত্তি করিয়া সিদ্দিকী সাহেব ও বিশ্বেশ্বর বাবু আলাওলকে ফরিদপুরে টানিয়া নেওয়ার প্রয়াস করিতেছেন, সেই ভিত্তি-মূল হইতে "আলাওল জন্ম-স্মৃতি" ইত্যাদি অংশটুকু উড়াইয়া দেওয়ার পরও কি তাঁহারা বলিবেন, প্রাগুদ্ধৃত উক্তিগুলি আলাওলের "স্বদেশের" বর্ণনা? যেই কবি স্বীয় পিতার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া যান নাই, তিনি স্বদেশের এমন বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? শুধু উদ্ভট অনুমান ভিন্ন আলাওলকে ফরিদপুরবাসী বলিবার স্বপক্ষে তাঁহাদের আর কি প্রমাণ আছে, দয়া করিয়া বলিলে বাধিত হইতাম। ফরিদপুরে অদ্যাপি আলাওলের কোন নামগন্ধও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইহাও কি তাঁহাদের অনুমানের বিরুদ্ধ প্রমাণ নহে? নিজের পরিচয় দিতে গিয়া কবি শুধু এই কথাই বার বার বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড়ের প্রধান স্থান ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুরাধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য-তনয় ছিলেন। এই বর্ণনায় তিনি যে সকল উক্তি করিয়া গিয়াছেন, সে সকল উক্তি একটু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, তাহা হইতে আমরা মজলিস কুতুবের—কবির পিতার প্রভু রাজেরই পরিচয় পাই,—তাহাতে আলাওলের "স্বদেশের" কোন পরিচয় পরিব্যক্ত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, লোকে আত্ম-পরিচয় দিতে যাইয়া সাধারণতঃ বংশের প্রধানতম পুরুষের নাম করিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কবি আলাওলও এই স্বাভাবিক রীতিরই অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

"মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর॥"
(সয়ফল মুলুক)

"রাজ্যেশ্বর মহারাজ কুতুব মহাশয়।
মুঞি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥"
(সেকান্দর-নামা)

"মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
আমি হীন দীন তান পাএর সন্ততি॥"
(পদ্মাবতী)

কবি একজন পরাক্রান্ত রাজার অমাত্য-পুত্র ছিলেন বলিয়া নিশ্চয়ই গর্বানুভব করিতেন এবং তদ্ধেতু পিতার নামটি পর্যান্ত উল্লেখ না করিয়া তিনি সর্বত্র "অমাত্য-তনয়" বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "অমাত্য তনয়" বলিলে কোন দেশের কোন্ রাজার অমাত্য-তনয়, স্বভাবতঃই এরূপ একটা প্রশ্ন শ্রোতার মনে আপনিই উদিত হইয়া থাকে। সেই প্রশ্নেরই উত্তর স্বরূপ আলাওল জালালপুর ও মজলিস কুতুবের বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর ভূপাল রাজের মন্ত্রী ছিলেন। আজ যদি তাঁহার কোন বংশধর আলাওলের অনুরূপ বর্ণনা দিয়া নিজকে ভূপাল-রাজের অমাত্যপুত্র বা পৌত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তবে তাঁহাকে ভূপালের লোক বলা যাইবে কি? যদি না যায়, ---তবে জালালপুররাজের অমাত্য-পুত্রকে জালালপুরের লোক বলা যাইবে কোন্ যুক্তিতে? সুতরাং আলাওলের বর্ণনা হইতে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, ইহা তাহার স্বদেশের বর্ণনা। পরন্তু পরিষ্কার রূপে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহা তাঁহার পিতার প্রভুরাজেরই বর্ণনা—তাঁহার "স্বদেশের" নহে।

ঐ সকল বর্ণনাকে আলাওলের "স্বদেশের" বর্ণনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত, যদি চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদের সান্নিধ্যে আলাওলের নামযুক্ত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, উহার সমীপে "আলাওলের বংশ" নামে খ্যাত বংশ এবং রাউজান থানার সুলতানপুরে ও আনওয়ারা থানার শোলকাটা গ্রামে আলাওলের কন্যাদ্বয়ের বংশ ও স্মৃতি বিদ্যমান না থাকিত।

এই অবস্থায় "তাঁহার (আলাওলের) বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার মধ্যে"---বিশ্বেশ্বর বাবুর এই সিদ্ধান্তের কোন

সার্থকতা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আলাওলকে আজ পর্যন্ত চট্টগ্রামের মুসলমানেরাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার সমুদয় কাব্যের প্রাচীন হস্তলিপি ও তাঁহার কীর্তিকলাপ চট্টগ্রামেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় চট্টগ্রামই যে তাঁহার স্বদেশ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নেই।

তবে সত্যের অনুরোধে বিশ্বেশ্বর বাবুর একটি সিদ্ধান্ত আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। "ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর তাঁহার (আলাওলের) আদি বাসস্থান" তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূলে কতকটা সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। আলাওলের পিতা জালালপুর রাজার সচিব ছিলেন। চাকরী উপলক্ষে তিনি (খুব সম্ভব সস্ত্রীক) জালালপুরেই থাকিতেন এবং তাঁহার জালালপুর অবস্থান কালে তথায় আলাওলের জন্ম হওয়া কিছু অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে এবং খুব সম্ভব তথায় তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনেরও কিয়দংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। এই হিসাবে জালালপুর তাঁহার জন্মস্থান ও আদি বাসস্থান ছিল অবশ্যই বলিতে হইবে; কিন্তু জালালপুর তাঁহার "স্বদেশ" ছিল না এবং উহার সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলিতে বাধ্য। এখানে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। সিদ্দিকী সাহেব ২৪ পরগণার লোক এবং বিশ্বেশ্বর বাবু কোথাকার লোক, জানিনা। আলাওলকে ফরিদপুরের লোক প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের এত গরজ কিসের, একটু জানিতে পারিলে মনের খট্‌কা ঘুচিত।

এই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ডক্টর মোহম্মদ এনামুল হক এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি ও আমার লিখিত "আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক গ্রন্থে আলাওল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, আলাওল চট্টগ্রামেরই মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলে আমাদের সে গ্রন্থ দেখিতে পারেন। তবে একটি কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সেখানে "স্বদেশ" অর্থে সর্বত্র "জন্মস্থান" শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

আজ এই পর্যন্ত। খোদাতালা বাঁচাইয়া রাখিলে বিশ্বেশ্বর বাবু এবং সিদ্দিকী সাহেবের অন্যান্য কথার আলোচনা আগামীতে করিবার বাসনা রহিল।

(বৈশাখ ১৩৪৫)

কবি সৈয়দ আলাওল

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

মধ্যযুগে যে সকল মুসলমান বাংলা ভাষায় কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর তাঁহার আদি বাসস্থান। কিন্তু তিনি কাব্য লিখিয়াছিলেন আরাকানের রাজধানীতে বসিয়া। পার্শী অক্ষরে লেখা তাঁহার পুস্তকের কয়েকখানা বাংলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই আক্ষরিক পরিবর্ত্তন এমন জঘন্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে, যুগপৎ হাসি ও দুঃখের উদ্রেক না করিয়া পারে না। আলাওলের পাণ্ডিত্য ও ললিত পদবিন্যাসের ইহাতে রীতিমত অপমান করা হইয়াছে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে আলাওলের কতকটা পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম সাহেব হস্তলিখিত পুঁথি হইতে আলাওলের কাব্যগ্রন্থের অনেকটা পরিচয় দিয়াছেন। (১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত (এখন ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ও আলাওলের নিজের কাব্যগ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মৌলবী আবদুল গফুর সিদ্দিকী ডাক্তার সাহেবও নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া আলাওলের অনেকগুলি গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। (২) বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃকও কোন কোন সাময়িক পত্রে আলাওলের বিষয় কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। (৩)

আলাওলের পিতা ফতেয়াবাদের জমিদার মজলিস্ কুতুবের অমাত্য ছিলেন। মজলিস্ কুতুব সামান্য লোক ছিলেন না। ইতিহাসে আমরা বাংলার সুবেদার ইস্লাম খাঁকে এই মজলিস কুতুবের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত দেখিতে পাই। এক সময়ে আ[illegible]ওল পিতার সহিত জলপথে কোথাও যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পর্টুগীজ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার পিতা দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া নিহত হন। ফলে আলাওলকে বিপদে পড়িয়া আরাকানে আসিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্গের উপকূল ভাগে তখন আরাকানের মগদিগের বিস্তর প্রতিপত্তি ছিল, অত্যাচারও কম ছিল না। অনেক স্থানে মগের মুলুকে পরিণত হইয়াছে গিয়াছিল। চট্টগ্রাম প্রদেশ বহুকাল মগদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। আরাকানে অনেক ভদ্র মুসলমান বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত মগরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেন। তাঁহারা মন্ত্রী, সেনাপতি, কাজী প্রভৃতির পদে নিযুক্ত থাকিয়া অনেকেই বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। মগ রাজপরিবারের সহিত কেহ কেহ উদ্বাহসূত্রেও আবদ্ধ হইতেন। আলাওল আরাকানে গিয়া এইরূপ মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদলে তাঁহার চাকুরী জুটিল। কিন্তু তিনি ছিলেন পণ্ডিত লোক, "আসোয়ার" এর কাজে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তাঁহার মুরুব্বিদিগের অনুরোধে তিনি অনেক সময়ই সাহিত্যচর্চ্চায় কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে বিদেশে সাহিত্যানুশীলনের ফলে এই মুসলমান পণ্ডিত কর্ত্তৃক অনেকগুলি বাংলা কাব্য রচিত হইল।

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী ডাক্তার সাহেব কবির মোট দশ খানি গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন--১। পদ্মাবতী কাব্য। (হবিবী ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "পদ্যাবতি") ২। সয়ফুল মুলুক বদিয়জাম্মাল কাব্য, ৩। দারাসেকেন্দার নামা কাব্য. ৪। সপ্তপয়কর কাব্য, ৫। সতী ময়না--সৈয়দময়না এবং লোরচন্দ্রানীর প্রসঙ্গ, ৬। তোহ্ফা, ৭। ইউসুফ জোলায়খা কাব্য, ৮। লায়লা মজনু কাব্য, ৯। শিরিখোসরোনামা কাব্য, ১০। আজিজকুমার রসবতী কাব্য।

ইহা ব্যতীত আলাওল বৈষ্ণব কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। দীনেশবাবুর গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে।

---

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২) সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৩৩শ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

(৩) সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ৩৩শ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা। ভারতবর্ষ ১৩৩-৩৩। Bengal past and present 1926

ফতেয়াবাদ সরকার একটী বহু বিস্তৃত জনপদ ছিল। আইন-ই-আকবরীতে ইহার যে পরিচয় আছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা এবং বর্ত্তমান যশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার খানিকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব আসিত জালালপুর মহাল হইতে। জালালপুর এখনও একটী বিস্তৃত পরগণা। ইহার অধিকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত, কতকটা ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যেও আছে। আলাওল নানা গ্রন্থে তাঁহার স্বদেশের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুদ্রিত বা হস্ত-লিখিত গ্রন্থে ভূরি ভূরি ভুল সত্বেও সে পরিচয়টা পরিষ্কার। মুদ্রিত "পদ্মাবতি" (পদ্মবতী?) গ্রন্থে আছে ঃ --

"মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌরাতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুন্য স্থান॥
বহু গুনবন্ত লোগ খলিফা ওলমা।
কতেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥
মজিলিস কুতুব তাহাতে অধিপতী।
আমি হিন দিন তান পাত্রের সন্ততি॥
কার্য্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হাক্কাদের নৌকা সঙ্গে হৈলো দরশন॥
বহু জুদ্ধ আছিল সহিদ হৈলো তাতে।
রণক্ষেত্রে সুভযোগে আইলুম এথাতে॥"

মৌলবী আবদুল গফুর সিদ্দিকী ডাক্তার সাহেব "দারা সেকেন্দারনামা" হইতে তুলিয়াছেন ঃ --

"গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেহাবাদ ভুম।
বৈসে সাধু সদা লোক হর্ষ মনোরম॥
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দু কুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগিরথি গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য॥
রাজেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর আমাত্য তনয়॥"

ইত্যাদি

মুদ্রিত সেকেন্দারনামা" গ্রন্থে ধৃত পাঠের সঙ্গে ইহার স্থানে স্থানে সামান্য কিছু ইতর বিশেষ আছে।

সরকার ফতেয়াবাদ বহুবিস্তীর্ণ হইলেও ইহার রাজধানী উত্তরাংশে ছিল। আর জালালপুর ও তাহার ভাগীরথী গঙ্গাধারা প্রভৃতির বর্ণন হইতে স্পষ্টতঃই মনে হইবে, কবি ফরিদপুর জেলার উত্তর বা মধ্য অংশের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার মধ্যে। ফরিদপুরের পক্ষে ইহা গর্ব্বের বিষয়। ভাগ্যবিপর্য্যয় কবিকে বিদেশে টানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্বভাবতঃই দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিত।

"স্বদেখিবার তরে প্রাণ কাঁদে উভয়ার।"

প্রধানতঃ যে পদস্থ অমাত্যের আশ্রয়ে ও উৎসাহে আলাওল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। নামটা মাগন ঠাকুর হইলেও লোকটী ছিলেন খাঁটি মুসলমান। দেবতার নিকটা মাগিয়া যে পুত্রবর জুটিয়াছিল তাহারই ফলে ইহার জন্ম, তাই হইয়াছিল "মাগন", আর রাজ্যে অমাত্য ছিলেন বলিয়া উপাধি হইয়াছিল "ঠাকুর"। ইনি আরাকানের বৌদ্ধ রাজবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত "পদ্যাবতি' কাব্যের ভাষায়—

"সেই (১) কিছু নিরাঞ্জনে কহিছে কোরানে।
সেই কর্ম্ম নিত্য কৃত্য অন্য নাহি মনে॥

ইনি আলাওলকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। আলাওল ইঁহার অনুরোধে শেখ মালেক মোহাম্মদ জয়সির হিন্দী কাব্য "পদ্মাওয়াৎ" অবলম্বনে তাঁহার পদ্মাবতী কাব্য লেখেন। ইহা চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর উপাখ্যান। কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপাখ্যানের সহিত ঘটনাংশে ইহার অমিল আছে। ঐতিহাসিক সত্য হয়ত দুইটীতেই কম, তবে আলাওলের কাব্যে অলৌকিকতা বেশী থাকিলেও ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে "রত্নসেন" নামটা অধিকতর ঐতিহাসিক। কাব্যের বিচার কাব্য হিসাবে করিতে হয়, উহার ঐতিহাসিকতা প্রাসঙ্গিক মাত্র। আলাওলের কাব্যের ভাল সংস্করণ প্রকাশিত না হইলে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার সম্ভব নহে।

আলাওলের কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ পার্সী ভাষায় লিখিত কাব্যের অনুবাদ, কোন কোন খানি কোন প্রচলিত উপাখ্যানের লইয়া রচিত। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থগুলিও আক্ষরিক অনুবাদ নহে, কবি নিজের কল্পনা শক্তির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

আলাওল কেবল কবি ছিলেন না, ধর্ম্মগুরুও ছিলেন। তিনি আরাকানের কাজী সৈয়দ মসউদ শাহের শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার 'তউফা' গ্রন্থখানি ধর্ম্মমূলক। ইহা আরাকানরাজের অমাত্য শ্রীমন্ত সোলেমানের অনুরোধে রচিত হয়। মজলিস্ গুণনবরাজের আদেশে 'দারা-সেকেন্দার নামা" এবং সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের অনুরোধে সপ্ত পয়কর' রচিত হইয়াছিল। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি 'সয়ফুলমুলুক বদিয়জ্জামাল' লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রন্থখানি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তাহার পর শাহ সুজার আরাকানে আশ্রয় লাভ ও শোচনীয় পরিণামের অনেক বৎসর পরে সৈয়দ মুসার একান্ত অনুরোধে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হয়। "সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী" (২) গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন দৌলত কাজী নামক আর একটী মুসলমান কবি। কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের পাত্র সোলেমানের অনুরোধে আলাওল গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব 'দারা সেকেন্দার নামা' হইতে যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩৩শ ভাগ ২য় সংখ্যা) তাহার যদি ঠিক পাঠোদ্ধার হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে মজলিস্ গুণনবরাজ আর কেহ ছিলেন না, স্বয়ং আরাকানপতি শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা, কিন্তু তাঁহার বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করাইবার হেতু কি বোঝা যায় না। মুদ্রিত "সেকেন্দার নামার" পাঠের সহিত ডাক্তার সাহেবের উদ্ধৃত পাঠের গরমিল আছে।

আলাওলের কাব্য হইতে কেবল তাঁহার আত্মপরিচয় নহে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীও অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তবে বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাবে সেগুলি বুঝিতে বিলক্ষণ গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত 'পদ্মাবতি' কাব্যে আরাকান রাজবংশের যে পরিচয় আছে তাহাতে পাওয়া যায় :--

দিল্লি মহারাজবংশ জদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহে হৈলো রাজ্যপাল।"

ইহার অর্থ করিতে গিয়া মৌলবী (এখন ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বিলক্ষণ ফাঁফরে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁহার প্রমাণ্য পুঁথি হইতে পাঠ তুলিয়াছেন ঃ --

মিম্বিমহারাজবংস যত্যপি হইল ধ্বংস
নৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাল।"

আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত পদ্মাবতী কাব্যের একখানা হস্তলিখিত পুঁথিতে আছে ঃ--

সর্ব মহারাজবংশ যদ্যপি হইল ডংস
নৃপতিগ্র হৈল রাজ্যপাল।"

ইহার কোন্ পাঠ ধরিয়া অর্থ করার চেষ্টা করা যাইবে? সম্ভবতঃ "মিম্বি মহারাজ বংশ"ই ঠিক, কারণ ইহাতে আরাকান রাজ

(১) যেই?

(২) অথবা "সতীময়না সৈয়দ ও লোরচন্দ্রানী"

নবপতিগ্রির পূর্ব্বতন রাজাদের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। এইরূপ কত ভুল যে আছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কবি তাঁহার "সয়ফুলমুলুক-বদিয়জ্জামাল" কাব্যে শাহ সুজা ঘটিত বিপ্লবের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেকটা আলোকপাত হইবে। তিনি নিজেও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে এই ব্যাপারে কিছুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন।

দীনেশবাবু পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের অনেক পরিচয় দিয়াছেন। বিবিধ নায়িকার কথা, কবিরাজীর কথা, জ্যোতিষ প্রসঙ্গ, হিন্দুর আচার ব্যবহারের বিষয় ত আছেই, তাহা ছাড়া সংস্কৃত শ্লোক এবং ভট্টাচার্য্য ও বৌদ্ধাচার্য্যের অনেক জ্ঞাতব্য কথা তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। শুদ্ধ পাঠের উদ্ধার ও অর্থবোধ অনেক স্থলে দুর্ঘট হইলেও তাঁহার পদ্মাবতী কাব্যের দুই এক স্থান হইতে (একটু বর্ণশুদ্ধির পর) কিছু উঠাইয়া দিতেছি। ইহাতে তাঁহার রচনার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে--

১। রূপবর্ণনায় ঃ

"ভুরুযুগ ধনুক কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ।
নয়ন সন্ধানে মারে থাকিতে পরাণ॥
অলকার পাশে যেন কমলেতে অলি
সগর্ব্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঁচলি॥"

২। "যাহার মরমে ঘাও সেই মাত্র জানে।
না বুঝে প্রেমের ব্যথা অব্যথিত জনে॥"

৩। যুদ্ধের সময়--

"অগ্নিতে আসিয়া যেন পড়িল পতঙ্গ।
রণভূমি হই গেল রুধির তরঙ্গ॥
উন্মত্তের মত যুঝে রাজপুত্রগণ।
ছাড়িয়া জীবন-আশা ইচ্ছিল মরণ॥"

৪। মগন ঠাকুরের বর্ণনায়--

"চন্দনের কুন্দে যেন কুন্দিল কন্দর্পে।
শত্রুবর্গ নাশ হয় ভুজযুগদর্পে॥
সুকোমল করতল পদ্মনাল তুল।
চম্পক-কলিকা জিনি সুন্দর আঙ্গুল॥
গজবর-শুণ্ড জিনি সুললিত উরু।
লজ্জিত গমনহীন কদলিকা তরু॥"

৫। ভগবানের প্রতি—

"অয়ে প্রভু নিরঞ্জন নিলক্ষ্যের লক্ষ্য।
কাতর জনের মাত্র তুমি সে স্বপক্ষ॥
ত্রিজগতে কেবা বুঝে তোমার মরম।
নৃপতিরে কর তিলে ভিক্ষুক অধম॥"

মুন্সী আবদুল করিম সাহেব লিখিয়াছেন সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থের অনেক পুঁথি এখনও পাওয়া যায়। বাংলার সাহিত্যসেবিগণের কর্ত্তব্য, নানা পুঁথি মিলাইয়া আলাওলের গ্রন্থাবলীর যতদূর সম্ভব একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা। হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিক একত্র মিলিয়া এই কার্য্য করিলেই ভাল হয়। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী ডাক্তার সাহেব ইহার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কেবল তাঁহার একার চেষ্টায় এই কাজ সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন পাঠে পার্থক্য বিষয়টীকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার সাহেব তাঁহার সংগৃহীত পুঁথি হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যেও অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। তিনি যে "জশাশিনি" কন্যার কথা বারবার তুলিয়াছেন তাহাকে কোন স্থানে "নৃপদগ্রি"র কন্যা, আবার কোথাও শ্রীচন্দ্র

সুধর্ম্মা রাজার কন্যারূপে আমরা পাই। শেষোক্ত লেখাটী 'সয়ফুলমুলুক-বদিয়জ্জামাল" কাব্যের মধ্যে কেমন করিয়া আসিল বুঝিয়া উঠা কঠিন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা ১৬৫২ হইতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (Phoyer's History of Burmah দ্রষ্টব্য)। তাঁহার মৃত্যুকালে মাগন ঠাকুর কখনই জীবিত ছিলেন না, খুব সম্ভব সৈয়দ আলাওলও ছিলেন না।

৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার একটী ভদ্র মুসলমান সংস্কৃত, পার্সী প্রভৃতি শিখিয়া ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে সুদূর আরাকানে গিয়া বাংলা ভাষায় অথচ (স্থানীয় লোকের পড়ার সুবিধার জন্য) পার্সী অক্ষরে এতগুলি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ভাবিলে একদিকে মন যেমন হর্ষাপ্লুত হয়, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের প্রতি আমরা যে এতদিন এতটা অবিচার করিয়া আসিতেছি তাহার জন্য কষ্টও হয় যথেষ্ট। --বারোমাসী

রোকেয়া-জীবনী

শামসুন নাহার

'বোন, এই ইংরাজী ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।'—পরম আদরের বালিকা ভগ্নির সম্মুখে একখানা বড় ছবিওয়ালা ইংরাজী বই খুলিয়া ধরিয়া এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আজি হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে এক কিশোর যুবক। কি ছিল কথাগুলির মধ্যে জানি না, কিন্তু কি এক যাদুমন্ত্রের প্রভাবে বালিকার হৃদয় মুগ্ধ হইল। সেদিন সেই মুহূর্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে জ্ঞানসাধনার যে মহামন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইলেন, তাহাই হইয়াছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র! বালিকার নাম রোকেয়া। উত্তরকালে ইনিই মিসেস আর, এস, হোসায়ন নামে বাংলা দেশে পরিচিত হন। বাংলার মুসলমান নারীপ্রগতির ইতিহাস-লেখক এই নামটিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।

বেগম রোকেয়া যে যুগে জন্মিয়াছিলেন এই বাংলার মাটিতে, সে ছিল মুসলিম ভারতের ইতিহাসে এক আঁধার যুগ। রাজ্য গিয়াছিল, সিংহাসন গিয়াছিল—সেটা তত বড় কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সবচেয়ে বড় অকল্যাণ। ইস্‌লামের সত্যিকারের শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্ব্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোঁড়ামির পাঁকে।

যে সময় গোটা সমাজের ছিল এমন শোচনীয় অবস্থা, তখন কুলবালাদের দশা ছিল কি—আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের দেহ কণ্টকিত হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ধকার পুরীর বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বন্দিনী মুস্‌লিম নারী। শিক্ষার আলোক তাহাদের জন্য হইয়াছিল হারাম! সত্য ও সুন্দর তাহাদের জীবন হইতে হইয়াছিল একেবারে নির্ব্বাসিত।

সেই বীভৎস আঁধারে বেগম রোকেয়ার মনে কেমন করিয়া জ্বলিয়াছিল জ্ঞানের আলো, কেমন করিয়া জাগিয়াছিল মুক্তির পিপাসা—তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। ভ্রান্ত মোল্লাদের প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া, সমাজের তীব্র কটূক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আপন হৃদয়মন তিনি আলোকিত করিয়াছিলেন শিক্ষার আলোকে, স্বাধীন চিন্তার আলোকে। শুধু তাহাই নয়। সেই আলোকের ক্ষীণ শিখায় ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁর চারিপাশের সমাজ,—অবরোধ-বন্দিনী নিগৃহীতা নারীসমাজ। শুধু দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকেন নাই। তাহার অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। শত শত বন্দিনী নারীর মর্ম্মের কথা অসহ্য বেদনায় রূপলাভ করিয়াছিল তাঁহার লেখায়, তাঁহার সাহিত্যে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটা কাজে। কেমন করিয়া শত বাধানিষেধের নাগপাশ হইতে তাহাদের মুক্তি দেওয়া যায়, কেমন করিয়া আলোকের পথে, কল্যাণে পথে, ধ্রুব ও সত্যের পথে তাহাদের তুলিয়া দেওয়া যায়—এই-ই হইয়াছিল তাঁহার দিনের চিন্তা আর রাত্রির স্বপ্ন। সেই কালরাত্রির অন্ধকারে জ্ঞানের দীপ না জ্বলিলে হতভাগিনী বন্দিনীদের মুক্তি নাই, তিনি বুঝিয়াছিলেন এই কথা। ভিতর হইতে সাড়া না আসিলে কারাগৃহের দ্বারের অর্গল খুলিবে না, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এই সত্য। তাই ঘুমন্ত নারীশক্তিকে নব জীবনের বোধন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন তিনি আপন হাতে। তাদের প্রত্যেকটা জীবনকে উন্নত, আলোকিত ও সুন্দর করিয়া তুলিবার সাধনাই হইয়াছিল তাঁহার জীবন।

পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মুসলমান নারীসমাজ আর আজিকার সমাজের অবস্থা তুলনা করিতে গেলেই চোখে পড়ে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন। যুগযুগান্তের স্বপ্নের কুহক ভাঙ্গিয়া আজ তাঁহারা জাগিয়াছেন। বন্ধন কাটিয়া একে একে দু'য়ে দু'য়ে তাঁহারা আজ সমবেত হইতেছেন মুক্ত বিশ্বের আকাশতলে। জগতের জাগর লোকে তাঁহাদের শূন্য আসন আজ সত্য সত্যই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই জাগরণের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে যে মহিমময়ী নারীর নাম আগাগোড়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, আপনার হৃদয়রক্তে যিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যুগের জীবন-কাহিনী—তিনি আর কেহই নহেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়েন।

পায়রাবন্দ

রংপুর জেলার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রাম। পায়রাবন্দের বিখ্যাত সাবের বংশের কন্যা রোকেয়া। ধনেমানে, শিক্ষায়, বংশগৌরবে সাবের পরিবারের তুলনা ছিল না। বিস্তীর্ণ লাখেরাজ জমি জুড়িয়া তাঁহাদের আবাসবাটি। রোকেয়ার স্বরচিত গ্রন্থে এক জায়গায় লিখিত আছে—"আমাদের এ অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়! সাড়ে তিনশত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, 'বউ কথা কও' 'ও খুকি, ও খুকি', 'চোখ গেল' প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যা ত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যাহুয়া' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর 'কা আক্ কা আক্ কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশব-জীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।"

রোকেয়া যখন সংসারে আসিলেন তখন সাবের বংশের ঐশ্বর্য-গৌরবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ভারতীয় মুসলমানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের উপর নামিয়া আসিয়াছিল যে কালরাত্রির ছায়া, এই সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ঘিরিয়া তাহাই পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। গৃহবিবাদ, বিলাসিতা প্রভৃতি যে যে কারণে ভারতে মুসলমান রাজত্বের পতন হয়, সাবের পরিবারের ধ্বংসের কারণও তাহাই হইল।

রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর জায়গা জমি ও সম্পত্তি তাঁহারই অপব্যয়িতা ও বিলাসিতার মুখে তাসের ঘরের মত উড়িয়া যায়। তিনি আরবী ও ফারসীতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু সে যুগের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বাসা বাঁধিয়াছিল।

সাবের পরিবারের মেয়েরা ছিলেন ঘোর পর্দ্দানশীন। আজ আমরা মনে করি আমাদের চলিবার পথে অনেক প্রতিবন্ধক, সমাজের অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমাদের পথ চলিতে হয়; কিন্তু তুচ্ছ মনে হয় এ যুগের কুসংস্কার, যখন মনে পড়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার—রোকেয়ার শৈশবের সেই আঁধার যুগের কথা। আজ আমরা হয়তো পুরুষের সামনে পর্দ্দা করি। কিন্তু তখন কুলবালারা পর্দ্দা করিতেন মেয়েদের সঙ্গেও। রোকেয়া বলিয়াছিলেন—তাঁহাদের পরিবারের মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরাণী ছাড়া অন্য কোন মেয়ে মানুষের সামনে বাহির হইতেন না। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারিতেন তাঁহারই তত বেশী কুলগৌরবের পরিচয় পাওয়া যাইত।

রোকেয়া লিখিয়াছেন—'সে অনেক দিনের কথা, রংপুর জেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমিদার বাড়ীতে দুপুর বেলা এক জমিদার-কন্যা আঙ্গিনায় মুখ হাত ধুইতেছিলেন। আলতার মা পাশে দাঁড়াইয়া জল ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক এই সময়ে এক মস্ত লম্বা চৌড়া কাবুলি স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত! হায় হায় সে কি বিপদ! আলতার মা চেঁচাইয়া উঠিল—বাড়ীর ভিতর পুরুষ মানুষ! স্ত্রীলোকটী হাসিয়া জানাইল—সে পুরুষ নয়। জমিদার-কন্যা প্রাণপণে উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভ্যন্তরে ছুটীয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—পাজামা-পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে। গৃহকর্ত্রী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে তোমাকে দেখিয়া ফেলে নাই তো? কন্যা সরোদনে বলিলেন—হাঁ দেখিয়াছে। অপর মেয়েরা শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন। কেহ বাঘ ভাল্লুকের ভয়েও বোধ হয় এমনি করিয়া কপাট বন্ধ করে না।'

আর একজায়গায় রোকেয়া লিখিতেছেন—"সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দ্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দ্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই; কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত : অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ-ভয়ে যত্র তত্র—কখনও রান্না ঘরের ঝাপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল-করিয়া জড়াইয়া - রাখা পাটীর অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম। বাচ্চাওয়ালা মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া

ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে লুকায়, আমাকেও সেইরূপ লুকাইতে হইত। কিন্তু মুরগীর ছানার ত মায়ের বুকস্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে লুকাইয়া থাকে; আমার জন্য সেরূপ কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগীর ছানা স্বভাবতঃই মায়ের ইঙ্গিত বোঝে—আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম্ম (Instinct) ছিল না। তাই কোন সময়ে চক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরব্বিগণ 'কলিকাতার মেয়েরা কি বেহায়া', ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

''আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে এই কলিকাতা থাকা কালীন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধূর পিত্রালয় হইতে দুই জন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের ফ্রী পাসপোর্ট' ছিল—তাহারা সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্র তত্র কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জ্জন চিলকোঠা ছিল। অতি প্রত্যূষে আমাকে 'খেলাই' কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত। প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। চাকরাণীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে চিলকোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনী-পুত্র হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই খাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়-হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতকগুলি বাক্স, পেঁটরা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার ছয় বৎসর বয়সের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারিধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজ-খবরও কেহ নিয়ম মত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিলকোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা বিন্নি-খই আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।''

সে যুগের মেয়েদের শুধু দেহই পর্দ্দানশীল ছিল না—পাছে পর পুরুষের চোখে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের লেখার বেপর্দ্দা হয়, এই ভয়ে লেখাপড়া শেখাই ছিল তাঁহাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। নিজের জ্যেষ্ঠা ভগ্নির বাল্যশিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছিলেন—''চিরাচিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখীর মত কোরান শরীফ ছাড়া আর কিছুই পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না। ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুন্‌শী সাহেবের কাছে ফারসী পড়িয়া আসিতেন—ভগ্নীকে শুনাইয়া ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিতেন; তখন ভগ্নিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাংলা পড়া শুনিয়া তিনিও মুখে মুখে বাংলা অক্ষর যোজনা করিতেন, প্রাঙ্গনে মাটিতে দাগ কাটিয়া বাংলা লিখিতেন। একদিন তিনি গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ পিতা আসিয়া পড়েন। কন্যা অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন এই বুঝি সর্ব্বনাশ! কিন্তু না, পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না বরং ভয়ে মূর্চ্ছিতাপ্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন এবং সেই দিন হইতে একটু একটু বাংলা সাধু ভাষা পড়াইতে লাগিলেন। বাস্ আর যায় কোথা? যত মোল্লা মুরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্যজ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।''

রোকেয়া যে আবেষ্টনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে এমনই পঙ্কিল এমনই বিষাক্ত!

ভাইবোন

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা রচনা করে, না পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই মানুষ গঠিত হয়—একথা নিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। সংসারে অসংখ্য নর-নারী জন্মগ্রহণ করে, তার পরে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে চলিতে দিন ফুরাইয়া গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। ইহারা সাধারণ মানুষ। ইহাদের জীবন বাস্তবিকই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই গঠিত হইতেছে। কিন্তু জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। গতানুগতিকের পন্থা তাঁহাদের জন্য নয়, পুরাতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাদের কাছে হার মানে। নিজের প্রতিভায়, নিজের শক্তিতে, মনের আনন্দে নূতন চলার পথ তাঁহারা রচনা করেন—আর সেই পথ বাহিয়া পশ্চাতে চলে আরও অগণিত নর-নারী।

পায়রাবন্দের সাবের পরিবারে এক সঙ্গে এমনই কয়েকটী সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল। দেশকালের অকল্যাণকর প্রভাব সে পরিবারে পূর্ণমাত্রায় সঞ্চারিত হইয়াছিল একথা আগেই বলিয়াছি। বিপুল ঐশ্বর্য্য ধ্বংশের মুখে; গৌরবের সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। কিন্তু ঘোর অকল্যাণের মধ্যেও করুণাময়ের অদৃশ্য কল্যাণহস্ত মানুষের অভিনন্দনের কোন বরণ-ডালা কি ভাবে সাজাইয়া তোলে, বলা কঠিন। ধ্বংশের ভিতর দিয়াই সাবের পরিবারে সৃষ্টির নবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিল। পঙ্কের মধ্যে কয়েকটী শতদল একসঙ্গে গলাগলি করিয়া ফুটি ফুটি করিতে লাগিল!

রোকেয়ারা ভ্রাতা ভগ্নি পাঁচজন—দুই ভাই ও তিন বোন। তাঁহাদের পরিবারে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শিকড় গাড়িলেও আমরা দেখিতে পাই অন্য দিক হইতে কেমন করিয়া যেন ধীরে ধীরে আধুনিকতার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। অবরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও দুই ভাই—আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের কেমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষার আলোক পাইলেন ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা কলিকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করিতেন। শৈশবে তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষের সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ তখন রংপুরের সিভিল সার্জ্জন। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা ইব্রাহিম ও খলিলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সেই প্রভাবে ইঁহাদের দুটী তরুণ চিত্ত একেবারে অন্য ছাঁচে ঢালাই হইয়া গেল। তাঁহারা মনে মনে সৈয়দ আহ্‌মদ, ও আমীর আলীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলেন। শুনা যায় ইব্রাহিম ইংরাজী শিক্ষার অগ্রদূত আমীর আলীর সঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তরুণ যুবক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালী উৎসব; সেই সঙ্গে দেখিলেন নিজের চারি পাশের অন্ধতমসা। মায়ের জাতি না জাগিলে দেশ জাগে না, মাতৃশক্তি উদ্বুদ্ধ না হইলে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই সত্য তিনি ভাল করিয়াই বুঝিলেন। ইস্‌লামের নারীর স্থান কত উচ্চে, ইস্‌লাম মাতৃজাতিকে কতখানি শ্রদ্ধা দিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন নিজের দেশ ভরিয়া নারী জাতির কি শোচনীয় দুর্গতি! তাঁহারও গৃহে তিনটী বোন রহিয়াছে—প্রখর বুদ্ধিমতী, প্রতিভাশালিনী। সুযোগ পাইলে ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিভার আলোকে বুঝি দেশ ধন্য হইতে পারিত!

গোপনে যে আকঙ্ক্ষা ভাইয়ের মনে ধিকিধিকি জ্বলে তাহাই ক্রমে সংক্রামিত হইল জ্যেষ্ঠা ভগ্নির হৃদয়ে। জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসা অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, একথা আগেই বলিয়াছি। রোকেয়া লিখিয়াছেন—"সমাজ তাঁহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা দেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের পর স্তর অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে অন্ধকার দেখায়; তিনিও সেইরূপ কাপড়চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই—জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্জ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন।"

চৌদ্দ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর তিনি বহুচেষ্টায় বাংলা শিখিবার সুযোগ পান। ইংরাজী শিখিবার জন্যও তিনি কম সাধনা করেন নাই। কেবলমাত্র নিজের সাধনায় তিনি বেশ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধ বয়সের একটী সুন্দর ঘটনা হইতে আমরা তাঁহার গভীর জ্ঞানপিপাসার পরিচয় পাই। রোকেয়া বলিয়াছেন—"একদিন তিনি ও আমি প্লানচেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বারা লিখাইতেছিলাম। আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরাজীতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—খেলাই (আয়া) মৃত্যুর পর ইংরাজী শিখিয়াছে দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে অনায়াসে ইংরাজী শিখিতে পারিতাম।"

করিমুন্নেসা স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক বাংলা কবিতা লিখিয়াছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি রীতিমত আরবী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি কনিষ্ঠা ভগ্নিকে লিখিয়াছিলেন "মন্ত্রপাঠের মত কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না—তাই আমি যথাবিধি আরবী পড়িতেছি।" তিনি ফারসী ভাষাও জানিতেন।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দেলদুয়ারে করিমুন্নেসার শ্বশুবালয়। বিবাহের নয় বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা

হওয়ার পর শিশুপুত্র দুইটীর শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে। তাঁহার মুক্ত উদার মন ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইল। দেলদুয়ারে ছেলেদের শিক্ষার অনেক প্রতিবন্ধক—এজন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল করিম গজনভীকে তিনি অল্প বয়সে বিলাত পাঠান ও কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল হালিম গজনভীকে কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। সেযুগে এতবড় পাপ কার্য্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা কুৎসা করিয়াছিল—তাহা বর্ণনা করা যায় না।

শৈশব হইতে যে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা করিমুন্নেসার মনে আকুলি বিকুলি করিতে তাহাকেই রূপ দিয়াছিলেন তিনি দুই পুত্র ও কনিষ্ঠা ভগ্নি রোকেয়ার জীবনে। ইঁহারই স্নেহের প্রসাদে রোকেয়া শৈশবে ইংরাজী ও বাংলার বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখেন। রোকেয়া বলিয়াছেন "জ্যেষ্ঠা ভগ্নি আমাকে দু'হরফ বাংলা পড়াইবার জন্য সমাজের বহু নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন।" পরিণত বয়সে কলিকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত থাকা কালে রোকেয়া পরম স্নেহশীলা এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দ্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলার পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহেব পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে আমি বাংলা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া, বঙ্গভাষা যে ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া এগার বৎসর যাবত এই উর্দ্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি। এখানেও সকলেই—পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দ্দুভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদের কল্যাণে।" পরম হিতৈষিণী এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নির জন্য আজীবন যে কৃতজ্ঞতা লোকচক্ষুর অন্তরালে কনিষ্ঠার চিত্ত ভরিয়া উছলিত হইত, তাহারই স্পষ্ট আভাস এই কথা কয়টিতে পাওয়া যায়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমের একনিষ্ঠ সাধনাও রোকেয়ার জীবন-গঠনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। বাস্তবিকই রোকেয়া আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে মঙ্গলের বাণী—যে আলোকের বাণী লইয়া তাহার জন্য এই দুইটী নব-নারীর কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী।

ক্ষুদ্র বোনটিকে ইব্রাহিম কেমন করিয়া নূতন পথের সন্ধান দিলেন, নূতন আশার বাণী শুনাইলেন—জীবনের প্রভাতে কেমন করিয়া তাহার কোমল চিত্তে অতি সন্তর্পণে রোপণ করিলেন আকাঙ্ক্ষার বীজ, তাহার আভাস প্রারম্ভেই দিয়াছি।

পিতা বাংলা বা ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। দিনের বেলা সকল সময় পড়াশুনার সুযোগ হয় না। ভ্রাতাভগ্নি অপেক্ষায় থাকেন কখন দিন গিয়া রাত্রি আসিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দু'ভাইবোনে বসেন পুঁথি পত্র লইয়া। গভীর রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়—আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দুটী কিশোর কিশোরীর শয়নকক্ষে স্তিমিত দীপ শিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দু'ভাইবোনে মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞান দান করেন ভাই, আব বালিকা ভগ্নি সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেন।

ইব্রাহিম মুখে মুখে ছাত্রীকে কত নূতন নূতন কথা শিখাইতেন—কত দেশ বিদেশের কাহিনী বলিতেন। 'ক্ষুদ্র বোন রক্' অবাক হইয়া সমস্ত শুনিত—জ্যেষ্ঠের প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেকটী ভাবভঙ্গি যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে চলিয়া যাইত।

বালিকা রোকেয়া শেষরাত্রে তাহাজ্জদের নমাজ পড়িতেন; ভোর বেলায় পড়িতে হইতে ফজরের নমাজ। গভীর রাত্রে পড়াশোনা শেষ করিয়া তাহাজ্জদের নমাজ পড়িয়া শুইলে জাগরণ-ক্লান্ত দেহখানি অসাড় ভাবে শয্যায় এলাইয়া পড়িত; ফলে এক একদিন সূর্য্যোদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া ফজরের নমাজ পড়া আর হইয়া উঠিত না। এই অপরাধে রোকেয়াকে প্রতিবেশীদের অনেক গঞ্জনা সহিতে হইত। শিক্ষার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এ কথা তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে বলিতেন। লেখাপড়া শিখিয়া মেয়ে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বিদ্রূপের কশাঘাত করিতেও তাঁহারা ছাড়িতেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোকেয়ার উৎসাহ বিন্দুমাত্রও দমিল না।

রোকেয়া নিজে বলিয়াছেন—"বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনো প্রবেশ করি নাই, কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন—কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারো বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।"

রোকেয়া দমিলেন না; তিনি অনুভব করিলেন, অনুদিন তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে—পর্ব্বতের মত অটল গম্ভীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুশীতল স্নেহচ্ছায়া। রোকেয়ার মনে যেমন অবসাদ কোনদিন আসে নাই, জ্যেষ্ঠের মনেও তেমনি মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তির আভাস জাগিতে পারে নাই; বরং ভগ্নির তরুণ হৃদয়কে তিনি শিল্পীর কৌশল দিয়া মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন—এক একবার দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া স্বপ্নরঙীন আশার ইঙ্গিতে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সুযোগ পাইলে রোকেয়া দিনেও শতবার ভাইকে পড়া বলিয়া দিবার জন্য ডাকিতেন। পুত্রকে বারে বারে বিরক্ত করা হইতেছে ভাবিয়া মা সময় সময় রোকেয়াকে মৃদু তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু ইব্রাহিম সস্নেহে বলিতেন—"মা, তুমি বকিও না। এতে যে আমি কতো আনন্দ পাই তাহা তো তুমি জান না, মা।"

এইভাবে ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দিন দিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রাতার সংসর্গে ভগ্নির মনের মণিকোঠার আলো দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সেই আলোকের স্থির নিষ্কম্প শিখা মুহূর্ত্তের জন্যও মলিন হয় নাই। সেই অন্তর-প্রদীপখানিকেই সাবধানে জ্বালাইয়া ধরিয়া তিনি চিরদিন দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছেন।

সাখাওয়াৎ

দিন যায়। দেখিতে দেখিতে শৈশব কাটিল, কৈশোর কাটিল, রোকেয়া যৌবনের সীমায় পা দিলেন। তিনি একেই অসামান্যা সুন্দরী। শুভ্র সুন্দর দেহতনু যৌবনের রূপলাবণ্যে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। পিতামাতা কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরম হিতৈষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিন্তার গতি এই সময় অন্যরূপ। ভগ্নি বড় হইয়াছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রতিভা শিক্ষার গুণে দিন দিন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহার সম্মুখে রহিয়াছে জীবনের এক বিরাট পরিবর্ত্তন। বিবাহই তাহার ভবিষ্যত জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিবে। কেমন ঘরে কাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, কে জানে! সাবধানে ঘর বর নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে ভাইভগ্নির দীর্ঘকালের সাধনা বুঝি বিফল হয়,—ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধ সমস্তই চূর্ণ হইয়া যায়! ইব্রাহিম চিন্তিত হইলেন। শুধু ধনজন, কুলমান দেখিয়া ভগ্নির বিবাহ দিলে তো চলিবে না; দেশকালের প্রভাব ব্যর্থ করিয়া এক নূতন ভাব তাহার মনে আশৈশব লালিত হইতেছে—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা চারিপাশের আবেষ্টন ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধলোকে পাখা মেলিতেছে। ইব্রাহিম স্থির করিলেন এমন লোকের হাতে রোকেয়াকে সঁপিতে হইবে যিনি এই বিপুল সম্ভাবনাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিবেন।

রোকেয়ার ভাগ্য অনুকূল। বিধাতা তাঁহার জন্য মনোমত পাত্র মিলাইলেন। যাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল, ভাই ভগ্নির মত ইঁহারও সেই একই মতিগতি, একই কল্যাণবুদ্ধি।

বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে রোকেয়ার শ্বশুরালয়। রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াৎ হোসায়েন বি. এ., এম. আর. এ. সি. ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে সময় তিনি উড়িষ্যার কণিকা ষ্টেটের কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিযুক্ত ম্যানেজার।

পাঠ্যজীবনে সাখাওয়াৎ কিছুকাল হুগলী কলেজে পড়িয়াছিলেন। হুগলীর যশস্বী উকিল মজহারুল আনোয়ার তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়কেও তিনি সহপাঠীরূপে লাভ করেন। সাখাওয়াতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়া মুকুন্দবাবু বলিয়াছেন—"সে বলিল, আমার নাম সাখাওয়াৎ হোসায়েন। আমার এখানে পরিচিত কেহ নাই। আমি দরিদ্র সৈয়দ, বিহারী মুসলমান। এখানকার কলেজের মাহিনা এক টাকা মাত্র, পাটনায় ছয় টাকা। মাসে মাসে উদ্বৃত্ত পাঁচ টাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতে পারিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি। বড়ই একা

পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়।'' মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন—''আমার মনে হইল, এ কে মহাত্মা পুরুষ, মাতৃভক্ত, ত্যাগী উদ্যমশীল, উচ্চবংশজাত; যাচিয়া আলাপ করিতেছেন এবং বিদেশে সমপাঠী প্রতিবেশীর নিকট একটু প্রীতিভিক্ষা করিতেছেন। আমরা অহঙ্কারে মত্ত দল, সুখে পালিত, ইঁহার চরণরেণুর যোগ্য নই। আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। বলিলাম : 'ভাই, আমরা দুজনে প্রত্যহ বিকালে খানিকটা সময় একত্রে থাকিব।'

''সাখাওয়াতের পরামর্শ অনুসারেই আমরা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তায় ইংরাজীর ব্যবহার ছাড়িয়া দিলাম। সে-ই বলিল—তোমার হিন্দীতে কথা বলিতে পারা উচিত। আমার বাংলায় কথা কহিতে পারার ইচ্ছা আছে, এ দেশ আসিয়া ভাষাটা না শিখিয়া ফিরিতে লজ্জা বোধ হইবে। তবে বাংলা বই পর্যন্ত পড়িবার অবকাশ হইবে না। তোমার সহিত কথাবার্ত্তাতেই বাংলা সাহিত্যের খবর কতকটা জানিয়া লইব।''

পাঠ্যাবস্থায় এক প্রতিপত্তিশালী ধনী পরিবারে সাখাওয়াতের বিবাহের কথা হয়। কন্যার পিতা কর্ণেল হেদায়েৎ আলী নিজ খরচে সাখাওয়াৎকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইতে চাহেন। সাখাওয়াৎ দরিদ্র কিন্তু তেজস্বী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তিনি বলিয়াছেন—'আমি দরিদ্র, কিন্তু আমার মনের ভিতর গূঢ়ভাবে আভিজাত্যের বিশেষ অহঙ্কার আছে। কর্ণেল হেদায়েৎ আলীর হঠাৎপ্রাপ্ত ধনের গর্ব্ব প্রচ্ছাদিত নহে। ওখানে বিবাহ করা আমার ঠিক হইবে না।'

অতঃপর সাখাওয়াৎ মাতার পছন্দমত এক আত্মীয় পরিবারে বিবাহ করেন। একটীমাত্র কন্যা হওয়ার পর অল্প বয়সেই সে পত্নীর দেহান্ত হয়। বিপত্নীক সাখাওয়াৎ দ্বিতীয়বারে যে রমণীরত্নের পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি আর কেহই নহেন—পায়রাবন্দের সাবের পরিবারের কন্যা, অপূর্ব্ব সুন্দরী, অশেষ গুণশালিনী বিদুষী রোকেয়া। শুভদিনে, শুভক্ষণে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়নের সঙ্গে পরিণয় প্রীতিবন্ধনে গ্রথিত হইলেন।

চরিত্রমাহাত্ম্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সাখাওয়াতের যোগ্যতাও বড় অল্প ছিল না। কৃষি-শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া তিনি ইংলণ্ডে যান। সংযমশীল, সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী, মেধাবী সাখাওয়াৎ বৃত্তির টাকা হইতে ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা সঞ্চয় করেন এবং অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডেল লইয়া ফিরিয়া আসেন। স্পষ্টবাদিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য চাকুরী জীবনে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেও সাখাওয়াৎ পূর্ব্বেকার সাদাসিধা চালচলনই চিরকাল বজায় রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সনে তিনি ভাগলপুরে কমিশনার পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট। খলিফা বাগে বাড়ী, মাটির দোতলা। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে সেই বাড়ীকেই তিনি পরিচ্ছন্ন সুন্দর করিয়া তোলেন। সাবেক পৈতৃক মাটির দেয়ালে বাহির পিঠে একখানি করিয়া ইট গাঁথিয়া তাহা পলস্তরা করিয়া চূণকাম করা হইল। ভিতর পিঠে পলস্তারা হইল। কিন্তু ভিতরে সেই সাবেক মাটিই থাকিয়া গেল। তিনি বলিতেন—''বাড়ীর আমূল পরিবর্ত্তন কেন করিব? শরীর এবং মনের কি তাহা করিতে পারি। ভিতরে সাবেক সাখাওয়াৎই আছি। পড়াশুনা করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিয়া উপরে একটু চাকচিক্য হইয়াছে মাত্র।''

সাখাওয়াৎ তাঁহার নব-পরিণীতা শিক্ষিতা পত্নীর জন্য বাড়ীর ভিতরে একটী আট কোণা সুদৃশ্য ঘর তৈয়ার করাইয়া মনোরম ভাবে সাজাইয়াছিলেন।

বন্ধু মহলে সাখাওয়াৎ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন—''ভাগলপুরে বহু লক্ষপতি বিদ্যমান থাকিতেও সকলের চেয়ে আমিই স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন। কারণ চারিশত টাকা যখন মাসিক আয়, তখন মাসের শেষে আমার হাতে উদ্বৃত্ত টাকার সংখ্যা আড়াই শত। অথচ আমার ঘোড়া টমটম্ অন্যদের চেয়ে ভাল। আসল কথা এই যে আমার খরচ কম। কাপড় ছিঁড়ি কম। খাওয়া সাবেক মোটা ধরণের রাখিয়াছি।'' একদিন এক ব্যারিষ্টার বন্ধু খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে সাখাওয়াৎ স্পষ্ট বলিলেন—''আপনি তো জানেন, আমার পেটে ঘি হজম হয় না। আমি তৈলের তরকারী এখনো খাই। কোন ভোজের নিমন্ত্রণ আমার জন্য নয়। উহার পূর্ব্বে বেলা থাকিতে গিয়া গল্প করিয়া আসিব।''

সাখাওয়াৎ মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধনলোভ একেবারেই ছিল না। কণিকার রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে সম্পত্তি হাতে নিবার পর সাখাওয়াৎকে পত্র লেখেন। সাখাওয়াতের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সম্পত্তির নানাদিক দিয়া যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল অন্য কোন ম্যানেজারের আমলে তাহার কিছুই হয় নাই। সাখাওয়াতের পেনসানের

জন্য মাসিক আড়াইশত টাকা গভর্ণমেণ্টে জমা দিয়াও মাসিক হাজার টাকা মাহিনাতে রাজা তাঁহাকে আবার নিজের সম্পত্তির ম্যানেজারীতে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সাখাওয়াৎ উত্তর দিলেন—"তুমি যে টাকা দিতে চাহিতেছে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু তুমি আমাকে খুড়া বলিতে, আমিও তোমাকে ছেলে-ভাইপোর মতই স্নেহ করিয়াছি। আমাদের সেই সম্পর্ক ঠিক থাকিবে তো? চাকর-মনিব সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমি করিব না।" প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পত্তির উন্নতিসাধন, দুদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে পরিমিত ব্যয় ইত্যাদি নিয়া তরুণ বয়স্ক রাজার সঙ্গে হয়ত মতভেদ হইতে পারে। ফলে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে, পরিণামের রাজার সঙ্গে স্নেহ প্রীতির সম্পর্কও হয়ত আর বজায় থাকিবে না। এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া সাখাওয়াৎ মাসিক এক হাজার টাকারও বেশী আয় মিষ্ট কথায় ঠেলিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন পাঁচ শতের শ্রেণীতে ডিপুটী কালেক্টর।

পারিবারিক জীবনেও সাখাওয়াৎ ভাগ্যবান—পরম ভাগ্যবান। পত্নীর গুণে কেবল তাঁহার বিবাহিত জীবনই সুখের হইয়াছিল এমন নহে। পরবর্ত্তীকালে মৃত্যুর পরপারেও প্রেমময়ী পত্নী স্বামীর স্মৃতি যুগ যুগ ধরিয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রোকেয়াও ভাগ্যবতী একথা আগেই বলিয়াছি। সাখাওয়াৎ কুসংস্কারবর্জ্জিত, উন্নতমনা, উদারহৃদয়। স্ত্রীর সংসর্গে তিনি ভাল করিয়াই বুঝিলেন স্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন মুসলমান সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। পত্নীর শিক্ষার পথে তিনি শুধু যে বাধা দিলেন না এমন নহে, বরং পত্নীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার বিকাশের সহায়তা করা তাঁহারই কর্ত্তব্য, একথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভাগলপুর

রোকেয়ার পিতৃপরিবারে মেয়েদের বাধা-নিষেধের অন্ত ছিল না একথা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুর পরিবারে আসিয়া রোকেয়া দেখিলেন, সে অঞ্চলের মেয়েরা আরও কূপমণ্ডুক। শুধু তাহাই নয়—তাঁহাদের যে একটা জীবন্ত সত্তা আছে, সমাজ যেন তাহা স্বীকার করিতেও নারাজ। রোকেয়ার স্বলিখিত গ্রন্থে স্থানে স্থানে যে সব বর্ণনা আছে তাহাতে পর্দ্দা প্রভৃতি প্রথার বিকট রূপ দেখিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—নারীজীবনের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদার জন্যই পর্দ্দা—না দেহমন এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া পর্দ্দার সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি!

রোকেয়া বলিতেছেন—"প্রায় একুশ বাইশ বৎসব পূর্ব্বেকার ঘটনা। আমার দূর সম্পর্কীয় এক মামী শ্বাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন। সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা। কিউল স্টেশনে ট্রেণ বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেণে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেণ ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ষ্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে চাকরাণী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—খবরদার, কেহ বিবী সাহেবার গায়ে হাত দিও না। সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ট্রেণের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন—কোথায় তাঁহার বোরকা আর কোথায় তিনি। ষ্টেশনভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিল, কেহ তাঁহার সাহায্য করিবার অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল। তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় এগার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। কি ভীষণ মৃত্যু!"

শুধু শ্বশুর পরিবারেব কথাই নয়, দুর্ভাগা মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্যতর মেয়েদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার আরও বহু বহু কাহিনী রোকেয়ার মনে চিরদিনের জন্য শেলের মত গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সেই সুযোগে রোকেয়া নানা দেশ বিদেশ বেড়াইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পান। নানা স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির সঙ্গে মিশিয়া দিনে দিনে তাঁহার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। শৈশব হইতে যে সকল নব নব ভাব তাঁহার মনের মধ্যে শত পাকে জট বাঁধিতেছিল, এখন দিনে দিনে যেন একটীর পর একটী করিয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া যাইতে লাগিল।

রোকেয়া যেখানে গিয়াছেন সর্ব্বত্রই তাঁহার চোখের সম্মুখে তীব্রভাবে জাগিয়াছে নারীর পরাধীনতার বীভৎস রূপ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যেন ভীষণ ব্যাধির মত আগাগোড়া ছাইয়া ফেলিয়াছে—বড় নিষ্করুণ, বড় মমতাহীন সে কাল ব্যাধির আক্রমণ!

তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার কি করুণ ছবি তাঁহার লেখনীমুখে স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন—"পাঠিকা, আপনি কখনও বিহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামক জড় পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটী বধূ বেগমের প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে বসাইয়া রাখিলে রমণী জাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটী রুদ্ধ ও একটী মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে বোধ হয় পর্দ্দার অনুরোধেই বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠুরীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বনাত-মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুল-রাগে-রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই বধূ বেগম। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার। মাথায় অর্দ্ধসের (৪০ ভরি), কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি), কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা), সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি), কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি), ও চরণ যুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা! এরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়া চড়া অসম্ভব। সুতরাং হতভাগী বধূ বেগম জড় পদার্থ না হইয়া কি করিবেন! কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।" অন্তরের তীব্র ব্যথা ও অনুশোচনাকে তিনি এখানে হাস্যরসের আড়ালে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন!

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—'বিহার অঞ্চলে বিবাহের পূর্ব্বে ছয় সাত মাস পর্য্যন্ত নির্জ্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েকে আধ মরা করা হয়। ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না— প্রয়োজন মত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়। রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়। ১৯২৪ সনে নাতিনীর বিবাহের নিমন্ত্রণে আরা গিয়াছিলাম। বেচারী তখন বন্দীখানায়! আমি সেই জেলখানায় গিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারি না—সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। বেচারী ছয় মাস সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। অবশেষে তাহার হিষ্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি হইল।'

'আর এক বেচারী ছয় মাস পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিল। বিবাহ হইলে দেখা গেল সর্ব্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটী চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!'

শুধু অবরোধের অত্যাচার নয়, অবরোধের ভিতরে আরও নানাবিধ উৎপীড়ন। রোকেয়া বলিতেছেন—'আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি! তিনি বিধবা। সন্তানসন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে। কিন্তু তাঁহার দেবর এখন সে সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটী কিন্তু রমাকে এক মুঠা অন্ন এবং আশ্রয় দানেও কুণ্ঠিত। রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়, কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি দেবরের সঙ্গে থাকিতে পান না কেন? কপালের দোষ! হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে বল কপালের দোষ। তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। রমা বলিলেন—'আমাদের সেই সহমরণ প্রথাই বেশ ছিল। গবর্ণমেণ্ট সহমরণ প্রথা তুলিয়া দিয়া বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিয়াছেন।' ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়? অন্তঃপুরের এ সকল ক্ষতকে নালীঘা না বলিয়া আর কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবাত সহমরণ আকাঙ্ক্ষা করে। উৎপীড়িত সধবারা কি করিবে?" এই সকল কথার অন্তরালে রোকেয়ার দরদী মনের অসহ্য বেদনা লুকাইয়া রহিয়াছে!

তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে বেশী করুণ মনে হইল একটি জিনিষ; তিনি দেখিলেন : উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা নানাভাবে নানারূপে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া ইহাদের পিষিয়া মারিতেছে, কিন্তু হতভাগিনীদের তাহা অনুভব করিবারও শক্তি নাই। দৃষ্টি তাহাদের সঙ্কীর্ণ, মন অসাড়। অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই। বাস্তবিকই মানুষের যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ যে-কোন দুর্গতির প্রতিকার একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না; কিন্তু দুর্ভাগা

তখনই চরম সীমায় পৌঁছায়, যখন অনুভূতিটুকুও একেবারে লোপ পায়। Murder of Delicia (ডেলিসিয়া হত্যা) নামক ইংরাজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"সভ্যতা ও স্বাধীনতার ললামভূমি লণ্ডন নগরীতেও শত শত ডেলিসিয়া-বধ-কাব্য নিত্য অভিনীত হয়। হায়, রমণী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবলা। ইংলণ্ডের নারী সমাজের সহিত ভারতললনা সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য! কিন্তু তাঁহারা বিদুষী এবং আমরা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। ডেলিসিয়ার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে, আমাদের তাহা নাই। নির্য্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিসিয়ার কেমন এক প্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে; অত্যাচারী কর্ত্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে, কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্ব্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্তকরে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না! এই মহান ভাবটা আমাদের নাই। ইহার কারণ এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব।"

দেখিয়া শুনিয়া রোকেয়ার তরুণ মন এক অসহ্য বেদনায় নিশিদিন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার বেদনা-বিদগ্ধ মনে জন্মগ্রহণ করিল দেশের ও জাতির যে কল্যাণ কামনা—তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বাংলার নারী-ইতিহাসের একটি নূতন ধারার বীজ দিনে দিনে অলক্ষ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার নিজের শিক্ষাও দিন দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। স্বামী সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ, সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিবাহিত জীবন তাঁহাকে পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার স্নেহচ্ছায়া তখনো পর্য্যন্ত একেবারে অপসারিত হয় নাই। ভাই ভগ্নিতে চিঠিপত্র লেখালেখি সর্ব্বদাই চলে। ইংরাজী শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য চিঠিপত্র ইংরাজীতেই লেখেন। ইব্রাহিম ভগ্নির চিঠিগুলি পড়িয়া তাহাতে ভাষায় কোন খুঁত থাকিলে চিহ্নিত করিয়া পরবর্ত্তী ডাকে আবার তাহা ভগ্নির কাছে ফেরৎ পাঠান। ভগ্নি গভীর মনোযোগের সহিত সে সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লন। ভাইয়ের চিঠিতে আরো থাকে কত উৎসাহের কথা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী। রোকেয়া প্রত্যেকটা কথা সযত্নে মনের মধ্যে গাঁথিয়া লন। রোকেয়ার ভিতরকার মহৎ সম্ভাবনা যেন এভাবে দিনে দিনে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তিনি ভবিষ্যতের এক বিরাট কার্য্যসাধনের জন্য নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

রোকেয়ার স্বামী অত্যন্ত উদার-ভাবাপন্ন, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, একথা আগেই বলিয়াছি। রোকেয়ার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যাসন্তান হইয়া অল্প বয়সেই মারা যায়। কাজেই রোকেয়ার সংসারের বন্ধন তত দৃঢ় নয়। এদিকে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কাহার জীবনের মেয়াদ কখন ফুরাইবে কিছুই বলা যায় না। দৃষ্টিমান স্বামী দেখিলেন—রোকেয়া নিঃসন্তান হইলেও তাঁহার বিবাহিত জীবনে যেন আর কোন অপূর্ণতা নাই। আপনার অন্তরের স্নেহ-প্রীতি দিয়া তাহার সমস্ত ফাঁকই যেন তিনি ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তারপর? তাঁহার মৃত্যুর পর রোকেয়ার জীবনের অবলম্বন বলিতে তো কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার মনোভাব মতিগতিরও যেন তিনি ক্রমাগত সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দিনের পর দিন চিন্তা করিতে করিতে পত্নীর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিয়া গেল—যাহাকে রূপ দিতে পারিলে তাঁহার অবর্ত্তমানেও বুঝি তাহার জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিতে পারে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন—তাঁহার অবর্ত্তমানে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করাই রোকেয়ার উপযুক্ত কাজ হইবে। ইহাতে শুধু যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার একটা উপলক্ষ পাওয়া যাইবে তাহা নয়- রোকেয়ার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন-সাধ সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিরও অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

মিতব্যয়ী সাখাওয়াৎ সত্তর হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। তাহা হইতে দশহাজার টাকা কেবলমাত্র কল্পিত স্কুল পরিচালনার জন্যই তিনি পত্নীকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যান। এভাবে স্বামীর জীবদ্দশাতেই রোকেয়ার ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

সাবধানী সাখাওয়াতের আশঙ্কা মিথ্যা হইল না। প্রিয়তমা পত্নীর ভবিষ্যতের পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এমন সময়ে একদিন পরপারের পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল। তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে ক্রমশঃ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সেই সদানন্দভাব শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন হয় নাই।

স্বামীর সাহায্য ও সহানুভূতি রোকেয়ার শিক্ষার পথে সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সাখাওয়াৎ সরকারী লেখাপড়ার কাজে রোকেয়ার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতেন। শুধু তাহাই নয়। সাখাওয়াতের বাংলা শিখিবার আগ্রহ ছিল, একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রোকেয়া নিজে বেহারী স্বামীকে বাংলা শিখাইবার ভার নিয়াছিলেন। এভাবে তিনি নিজের ঋণভার কিছুটা লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কালব্যাধির প্রকোপে সাখাওয়াতের দুইটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সাখাওয়াৎ চক্ষু হারাইলেন—সেই হইতে লেখাপড়ার ব্যাপারে স্ত্রীই হইলেন তাঁহার চক্ষু। রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসিয়া তাঁহাকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইতেন।

অবশেষে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে সাখাওয়াৎ দেহত্যাগ করেন। একটী মহৎ অন্তর, মমতায়-ভরা একটী অমূল্য হৃদয় ভূলোক হইতে দ্যুলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। কিন্তু তিনি সত্যই মরিলেন কি? না, তাহা নয়। তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল—কিন্তু এখানেই সব শেষ হইল না। প্রেমময়ী পত্নীর জীবনে তিনি আবার নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন।

রোকেয়ার বিবাহ হইয়াছিল আঠার বৎসর বয়সে—বিধবা হইলেন তিনি আটাশ বৎসরে। মাত্র দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন। এই সময়ের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী তাঁহাকে অন্তরের উচ্ছ্বলিত ভালবাসায় সিক্ত করিলেন—আবার ইহারই মধ্যে তাঁহার সকল দেনা-পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া একেবারে পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন।

রোকেয়া আজ সংসারে একাকিনী। অভাব তাঁহার কিছুরই নাই। স্বামীর মৃত্যুতে নগদ টাকাই তিনি পাইলেন পঞ্চাশ হাজার। তাঁহার দাসদাসী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপযৌবন আছে—কিন্তু সংসারের কঠিনতম বন্ধনটি তাঁহার আজ ভাগলপুরের মাটিতে সমাহিত। তাঁহার শোকার্ত্ত, উদাস মন বিহঙ্গের মত উড়িতে চাহিল। কিন্তু না, না—তাহা হইতে পারে না। তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাক দেয়। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই পথের দিশা স্থির হইয়াছিল। নারীজাগরণের যে-স্বপ্ন তিনি সঙ্গোপনে বহুদিন অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া আজ সেই স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার সময় উপস্থিত। আর স্বামী? দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে প্রাণপ্রিয় স্বামী যে পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণে বাঁধিয়া গিয়াছেন, তাহাও পরিশোধের এই উপযুক্ত অবসর। পতিব্রতা পত্নী পণ করিলেন, নিজের কর্ম্ম-সাধনার মধ্যে স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। শাহ্‌জাহান—প্রেমিক শাহ্‌জাহান ছিলেন রাজরাজেশ্বর। মণিমাণিক্যখচিত ধবলিত পাষাণে তিনি মহাসমারোহে দয়িতার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিলেন। আর রোকেয়া অসহায়া, অবলা; আপনার বুকের রক্তেও কি তিনি কালের কপোলে স্বামীর স্মৃতিলেখা ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারেন না? না, না, আর বিলম্ব নয়। দুঃসহ শোকের মধ্যেও তিনি চোখ মুছিয়া দৃঢ় পায়ে দাঁড়াইলেন।

সাখাওয়াতের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে পাঁচটী মাত্র ছাত্রী লইয়া ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তিপত্তন হইল। রোকেয়া বলিয়াছেন, 'তখনও আমি শোকের প্রচণ্ড আঘাত সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিতে পারি না।' জীবন-যৌবনের বাসন্তী উষায় ঐশ্বর্য্যবিলাস পিছনে ফেলিয়া কুসুম-কোমলা নারী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নিলেন কঠোর ত্যাগসাধনা। সম্মুখে জাগিয়া রহিল দারুণ বন্ধুর পথ—দিক্‌হীন, সীমাহীন!

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু রোকেয়া সংসার অনভিজ্ঞা—চিরকাল কঠোর অবরোধের মধ্যে মানুষ। স্কুল-পাঠশালার ভিতর তিনি কখনো পা দেন নাই। এখন স্কুল-পরিচালনার কাজ হাতে লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন—"প্রথম যখন পাঁচটী মেয়ে নিয়া স্কুল আরম্ভ করি, তখন ভারী আশ্চর্য্য ঠেকিয়াছিল এই কথা যে, একই শিক্ষয়িত্রী কেমন করিয়া এক সঙ্গে একই সময়ে পাঁচটী মেয়েকে পড়াইতে পারেন।" এমনই অনভিজ্ঞতা নিয়া সদ্য-বিধবা রোকেয়া প্রথম কাজে নামিয়াছিলেন।

এই সময়ে পরলোকগত স্বামীর পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। সাখাওয়াতের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত একটী কন্যা ছিল, একথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। সাখাওয়াৎ জীবদ্দশায় সে কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ দেন। এখন পিতার মৃত্যুর পর সে সুযোগ দেখিল। সংসারের কর্তৃত্ব, টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়া কন্যা-জামাতা উভয়ে রোকেয়ার সঙ্গে নানা দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিল। রোকেয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নি হোমেরা এ সময়ে

তাঁহার কাছে ছিলেন। ভগ্নির সাহায্যে তিনি সপত্নী কন্যা ও জামাতার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করিলেন।

পরলোকগত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুল মালেক তখন ভাগলপুরে। তাঁহার অজস্র সহানুভূতি এই সময়ে রোকেয়াকে যথেষ্ট শক্তি ও সাহস যোগাইয়াছিল। অতঃপর আরও কয়েক মাস তাঁহাকে ভাগলপুরে থাকিতে হয়। কয়েক মাস পরে রোকেয়া তাঁহার বিবাহিত জীবনের পুণ্যতীর্থ ভাগলপুর চিরদিনের মত ছাড়িয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলও কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

কলিকাতা

১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। একটী অসহায়া বিধবা ভাগলপুর হইতে আসিয়া কলিকাতার কোলাহল-মুখরিত বক্ষে আশ্রয় করিলেন। বাংলার নিপীড়িত মুস্‌লিম নারীর ভাগ্যাকাশে সকলের অলক্ষ্যে সেদিন নবীন উষার সূচনা হইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গলিতে আটটি মাত্র ছাত্রী লইয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্‌ স্কুলের কাজ শুরু হইয়াছিল। বিধাতা রোকেয়াকে শক্তি ও সাহস দিয়াছিলেন অফুরন্ত। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় কলিকাতার কয়েকটী বিরাটপ্রাণ মানুষ পরলোকগত ব্যারিষ্টার মিঃ আবদুর রসুলের গৃহে সমবেত হইলেন। স্কুল পরিচালনার কাজে রোকেয়াকে সাহায্য করিবার জন্য এভাবে একটী কমিটি গঠিত হইল।

এই সময় হইতে রোকেয়ার জীবন ও স্কুলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে লইলেন। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব ও সম্পূর্ণ তাঁহারই উপর। জাগরণের বাণী বহন করিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিলেন, কেহ তাঁহাকে বরণডালায় নন্দিত করিল না। বরং তাঁহার উপর বর্ষিত হইল তীব্র হইতে তীব্রতর আঘাত। কিন্তু রোকেয়ার জীবন সৈনিকের জীবন। আঘাতের ভয়ে পিছাইলে চলিবে কেন? প্রতি মুহূর্তে তাঁহার মাথার উপর দিয়া প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না, স্থির অকম্পিত চরণ ফেলিয়া দিনের পর দিন সম্মুখেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

যে গৃহে আটটি ছাত্রী ও দু'খানি বেঞ্চি লইয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের কাজ শুরু হইয়াছিল, দুই বৎসর পরে আর সেই ছোট ঘরখানিতে তাহার স্থান সঙ্কুলন হইল না। তৃতীয় বৎসরে যখন স্কুল নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইল, তখন ছাত্রী সংখ্যা চল্লিশ। স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই বলি, আর শিক্ষয়িত্রীই বলি—রোকেয়া একাই সব। আর দু'একজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিম্ন শ্রেণীর কাজ চালান। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীরাই অবসর সময়ে নিম্ন শ্রেণীর কাজে সাহায্য করে। যথেষ্ট-সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শুধু অর্থাভাবই নয়—উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবও রোকেয়াকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীদিগকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগত ছানিয়া কি দিব আনিয়া'—এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

রোকেয়া নিজেও স্কুলের নিয়ম কানুন, ব্যবস্থা, শৃঙ্খল ইত্যাদি বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞা। তিনি দেখিলেন, সুচারুরূপে স্কুল পরিচালনা করিতে হইলে তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাঁহার শক্তি ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তিনি কলিকাতার ইংরেজ, বাঙালী, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সমাজের অভিজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ মহিলাদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, উদার, জ্ঞানপিপাসু মহিলা সকলের কাছে সমান আদর পাইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! মিসেস পি. কে রায়, মিসেস রাজকুমারী দাস প্রভৃতি শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ মহিলাদের সহানুভূতির ফলে তিনি কলিকাতার বিখ্যাত বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের আভ্যন্তরীণ কার্য-প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন। এই সময় দিনের পর দিন স্কুলের ছাত্রীর মত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস্‌ স্কুল ও অন্যান্য স্কুলসমূহে যাতায়াত করিয়াছেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়া স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের গভীরতায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাধিধারীদের চেয়ে কম ছিলেন না; বরং অনেক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক কালের গ্রাজুয়েটদের বিদ্যার পরিমাণ দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন। কতবার তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—"এরা যা-ইংরেজী বা বাংলা লেখে, আমাদের মতো মুখ্যু সুখ্যু লোকের চোখেও তার ভুল ধরা পড়তে বাকী থাকে না।"

ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় রোকেয়ার অসাধারণ দখল ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নহেন বলিয়া স্কুলের কাজকর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে তাঁহাকে অনেক বাধা পাইতে হইত। তিনি অনেক সময় বলিতেন—"আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপা-মারা নই! গাধার খাটুনিই আমি খাটি! আধুনিক কালের উপাধিধারিণী শিক্ষয়িত্রীদের দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের ভালমন্দ বিচার করেন।" কথাগুলি বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে তিনি গল্প করিতেন, এই বিষম অসুবিধা দুব কবিবার জন্য স্কুলের প্রথম জীবনে তিনি কতবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সপ্তাহের ঝঞ্ঝাট চুকাইয়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে তিনি মিসেস রাজকুমারী দাসের কাছে কিছুদিন ধরিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পাঠগ্রহণ করিতে যাইতেন। গণিত লইয়াই তাঁহার মুশকিল হইত সকলের চেয়ে বেশী। একবার মিঃ রেজাউব বহমান খানকে কিছুদিনের জন্য রোকেয়ার শিক্ষকতা করিতে হইয়াছিল। মিঃ খান্ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজ হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহ বিকালে কিছুক্ষণ তিনি রোকেয়াকে গণিত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু রোকেয়ার মত ছাত্রীর শিক্ষকতা করা বড় সোজা কথা নয়। রোকেয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে শিক্ষককে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটী প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া কঠিন হইত, শিক্ষক কষ্টে অব্যাহতি পাইতেন।

এদিকে ধীর—অতি ধীরে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতি হইতে থাকে। স্কুলের দীর্ঘকালেব জীবনে ইহাকে কত আপদ-বিপদ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথম হইতেই একশ, দু'শ বা ততোধিক ছাত্রী লইয়া ইহার কাজ শুরু হয় নাই; দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যে ইহাকে হাই স্কুলের শ্রেণীতে উন্নীত করিতেও পারা যায় নাই। প্রথম প্রথম একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করা হইত, তবু বৎসরের পর বৎসব দেখা যাইত, ছাত্রীসংখ্যা তেমনই রহিয়াছে। পবিপূর্ণ দুইটী যুগ ধরিয়া একটী অবলা নারী তিল তিল করিয়া আপনার হৃদয়রক্তে ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

রোকেয়া বলিয়াছেন "টাকা উপাৰ্জ্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য, ইহা আমি কোনকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য: মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি. এ., এম. এ. পাশ করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত। সাদী বলিয়াছেন—'শিক্ষা না পাইলে লোকে স্রষ্টাকেও চিনিতে পারে না।' যে সকল মোল্লা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়, তাহারা ছদ্মবেশী শয়তান।"

একবার স্কুলের ছাত্রীদের তিনি শিক্ষার কথা বলিতে গিয়া একটী সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"তোমরা জান যে, শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে চিরকাল মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর থাকে। শয়তানই আমাদের দ্বারা পাপ করায়। শয়তানের অসংখ্য চেলারা সমস্ত দিন মানবের দ্বারা যে সব পাপ করায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শয়তানের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিয়া থাকে। একদিন কতকগুলি চেলা আসিয়া নানাবিধ পাপের রিপোর্ট দিল; শয়তান নীরবে শুনিতেছিল। শেষে যখন এক চেলা বলিল যে, সে এক ছাত্রের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, তাহাকে শয়তান কোলে লইয়া খুব আদর করিল। তাহা দেখিয়া অপর চেলারা হিংসা করিয়া বলিল, 'আমরা এত কঠিন কঠিন পাপ, নরহত্যা পর্য্যন্ত করাইলাম—তবু আমাদের অত আদর হইল না; ও' সামান্য একটা ছেলের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য ওকে কোলে লইয়া চুমা দেওয়া হইল। ইহা কি অবিচার!' তদুত্তরে শয়তান বলিল, 'তোমরা বুঝ না, তাই এরূপ বল। মূর্খতা, অজ্ঞতা হইল সমস্ত পাপের মা-বাপ। মানুষ যত মূর্খ থাকে ততই তাহাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিজ্ঞলোকের বিরুদ্ধে আমাদের কোন প্রকার শয়তানী খাটেনা। অতএব তোমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা কর, মানুষকে মূর্খ রাখিতে।"

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছেন—"মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত

করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার-ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।"

কলিকাতায় স্কুলের কাজ আরম্ভ করিবার অল্পদিন পরে রোকেয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ভুপালের মহামান্যা বেগম সুলতান জাহান সাহেবার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া বেগম সাহেবা রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা ও উচ্চ আদর্শের সহিত পরিচিত হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সহানুভূতি ও উৎসাহসূচক পত্র লেখেন।

শুধু ভুপালের বেগমই নন, রোকেয়ার মহান উদ্দেশ্য, অসাধারণ শক্তিসাহস ও ত্যাগসাধনা আরও অনেককেই আকর্ষণ করিয়াছিল। একেবারে অপরিচিতভাবে অনেক সমাজহিতৈষী মানুষ রোকেয়ার আহ্বানে আসিয়া সাড়া দিয়াছিলেন।

মনীষী মোহাম্মদ আলী এই সময় কলিকাতা হইতে 'কমরেড' বাহির করিতেন। তাঁহার কন্যা ছিল সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রী। বিপদ-আপদে সকল সময় মৌলানা মোহাম্মদ আলীকে রোকেয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত, —বোম্বাই হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড হইতে ক্বচিৎ এক একটী মহাপ্রাণ মানুষের দানের হস্ত একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই অবলা নারীর সাহায্যের জন্য প্রসারিত হইয়াছে। ক্বচিৎ এক একজন অজ্ঞাতনামা মানুষ আগাগোড়া নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অযাচিতভাবে অন্তরাল হইতে রাশি রাশি অর্থে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলকে পুষ্ট করিয়াছেন, এমনও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

একবার এক নববিবাহিত তরুণ-তরুণী তাঁহাদের বিবাহের সমস্ত যৌতুক—টাকাপয়সা ও দ্রব্যসামগ্রী স্কুলের উন্নতির জন্য হাসিমুখে দান করেন।

স্কুলের প্রথম জীবনের সংগ্রামের ইতিহাসে এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ অনেক সময় রোকেয়ার চলার পথে রশ্মিসম্পাৎ করিয়াছে। এই শ্রেণীর মহানুভব মানুষ হয়ত সংখ্যায় মুষ্টিমেয়; কিন্তু ইঁহাদেরই দরদী মনের স্পর্শ রোকেয়া নিয়ত নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, ইঁহারাই উজ্জ্বল তারকার মত তাঁহাকে কালরাত্রির অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন।

নিজের অক্লান্ত সাধনার ফলে রোকেয়া যে সকল খ্যাতনামা মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ আবদুল করীম জামাল, বোম্বাইয়ের মিঃ বি. এম. মালাবারি, মিঃ জাস্টিস সৈয়দ শরফুদ্দীন, সৈয়দ হাসান ইমাম, নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম, মিঃ আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহীম, নবাব শামসুল হুদা, নবাব নবাব আলী চৌধুরী, নবাব বদরুদ্দীন হায়দর, মৌলবী আবদুল করীম, মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মৌলবী মুজিবুর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্রমে গভর্ণমেন্টেরও সহানুভূতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাইতে লাগিল। তদানীন্তন বড়লাটপত্নী লেডী চেমস্‌ফোর্ড ১৯১৭ সনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল পরিদর্শন করেন। সেই অন্ধকার যুগে একটা মুসলিম নারীর সাধনা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল তখন মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

মাকড়-মাতা

রোকেয়া একদিন কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "ক্ষুদ্র জীব মাকড়সা তাহার নিজের বুকের রক্তে শত শত মাকড়-শিশুকে নূতন জীবন দেয়; আমরা মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আমরা কি কেহ এইরূপ একটী প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত শত মুসলিম নারীর মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে পারি না?" সমগ্র জীবন দিয়া তিনি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন—"হাঁ, পারি।"

একবার স্কুলের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা ঐ দোতলা বাড়ীটা দেখিতেছ, কিন্তু ইহাকে গঠন করিতে কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, কত মজুর-মিস্ত্রী ভারা হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা তোমরা অনুমান করিতে পার কি? ইহার অসংখ্য ইটের জন্য কত মাটি পুড়িয়াছে, সুরকীর জন্য কত ইট নিজকে চূর্ণ করিয়াছে, কপাট চৌকাঠের জন্য কত বড় বড় গাছ করাতকাটার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, ইমারতের চূণ

তৈয়ার করিবার জন্য কত ঝিনুক প্রাণ দিয়াছে, তাহা তোমরা ধারণা করিতে পার কি?" এই সামান্য কথা কয়টিতে আমরা তাঁহারই সর্ব্বস্বত্যাগের স্পষ্ট আভাস দেখিতে পাই।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "তোমরা এখন বড় হইয়াছ। কিন্তু তোমাদের বড় করিয়া তুলিতে তোমাদের মাতাকে কত ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কতখানি রক্তে এক ফোঁটা স্তনদুগ্ধ তৈয়ার হইয়াছে, তোমাদের অসুখের সময় মাতা কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন—তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যখন মা তোমাদিগকে স্নান করাইয়া তেল মাখাইয়া, চোখে কাজল দিয়া, দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া নিজে হাত মুখ ধুইয়া একটু কিছু খাইতে বসিয়াছেন, ঠিক সেই সময় তোমরা কান্না জুড়িয়া দিয়াছ! বেচারী অমনি মুখের গ্রাস ফেলিয়া দৌড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছেন!

"তোমরা হয়তো জান না সেইরূপ এই স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত কোন লোককে নিজের বাড়ী ঘর, আত্মীয়-স্বজন—সব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনেক সময় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বুকের কত রক্ত জল করিতে হইয়াছে, প্রায় ত্রিশ হাজার নগদ টাকা হারাইতে হইয়াছে।

"এক সময় রবিবারে স্কুল কমিটির একটী মিটিং হইবার কথা ছিল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারী উক্ত মিটিং সংক্রান্ত কতগুলি জরুরী কাগজ লইতে আসিয়া শুনিলেন, তোমাদের সেই দীনতমা সেবিকার মাতার মৃত্যু হইয়াছে—লাশ তখনও ঘরে। তিনি নীরবে ফিরিয়া গেলেন, আর ভাবিলেন যে মিটিংটা পণ্ড হইল। পরদিন মাতার দাফনক্রিয়া শেষ হওয়ামাত্র সে সর্ব্বপ্রথমে সেই কাগজগুলি সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।"

স্কুল পরিচালনার কাজে সহকর্ম্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথাও রোকেয়া এই প্রসঙ্গে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: "একবার স্কুলের প্রাইজের আয়োজন সমস্ত ঠিক। সেই সময় সেক্রেটারী সাহেব খবর পাইলেন যে, দেশে তাঁহার নওজেয়ান ভাই রোগশয্যায় পড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেশে গেলেন না। পরে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু সেক্রেটারী সাহেব স্কুলের খাতিরে কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন না। এজন্য তাঁহার পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট তাঁহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল।

"আর একবারের ঘটনা। স্কুলের প্রাইজ উৎসব হইতেছিল। তদানীন্তন গভর্ণরের পত্নী লেডী কারমাইকেল পুরস্কার বিতরণ করিতেছিলেন। সেই সময় সেক্রেটারী সাহেব টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া অশ্রুবেগে সম্বরণের চেষ্টা করিতেছিলেন আর অপেক্ষা করিতেছিলেন কতক্ষণে লেডী কারমাইকেল বিদায় হইবেন। অতঃপর হাস্যমুখে লেডী কারমাইকেলকে বিদায় করিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাদের লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন।"

পরিশেষে বড় দুঃখে রোকেয়া বলিতেছেন—"স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সব মহান ত্যাগের কি কোন মূল্য নাই? ইহার বিনিময়ে আমরা এযাবত সমাজের নিকট কি পাইয়া আসিয়াছি? কেবল অভিযোগ, অনুযোগ, নালিশ ও ফরিয়াদ।

"আজ চব্বিশ বৎসর সমাজসেবা করিয়া আমি এইটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, মুসলমান সমাজটা নিতান্ত অভিশপ্ত, আর যে ব্যক্তি ইহার কল্যাণকামনা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য। গরীবের কথার একটা মস্ত প্রমাণ—কাবুলের মহামান্য বাদশাহ্ আমানুল্লার সিংহাসনত্যাগ। আফগানিস্থান অধঃপাতে যাক, ব্যক্তিগত ভাবে বাদশাহ্ নামদারের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; অধঃপতন হইবে সমগ্র আফগান জাতির।"

দুর্ভাগ্য সমাজ রোকেয়াকে চিনিতে পারে নাই। যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন—কলিকাতার সমাজে প্রথম সময় এ কথা প্রায়ই শোনা গিয়াছে। স্কুল স্থাপনের অষ্টাদশ বৎসর পরে সমাজের নানা বিরুদ্ধতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া রোকেয়া বলিয়াছেন : "এই আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কতপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লা জানেন, আর কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।"

"স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। একথা বলি না

যে আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয় উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহাই করিয়াছি এবং অবরোধবন্দিনী বালিকাদের যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তাহাই তাহারা পাইয়াছে।''

জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রোকেয়া স্কুল পরিচালনার কাজে অবরোধের অত্যাচার কতটা সহিয়াছেন দুএকটা ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

তিনি বলিয়াছেন—''আজিকার (২৮ শে জুন, ১৯১৯) ঘটনা। স্কুলের একটী মেয়ের বাপ লম্বা চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে মোটর 'বাস' তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে বোরকা পরিয়া চাকরাণীর সহিত হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের এক শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দ্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই : —'অনুসন্ধানে জানিলাম হীরার বোরকায় চক্ষু নাই। অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ী হইতে দেখে চাকরাণী প্রায় হীরাকে কোলের কাছে লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। বোরকায় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল। কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।' দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র নয় বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরকা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে! ইহা না হইলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না!''

অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন—''কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,

কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন।'

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর বাস প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈক শিক্ষয়িত্রী, মেম সাহেবা মিস্ত্রীখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার– 'না বাবা, আমি কখনো মোটরে যাব না।' বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল, বাসের পশ্চাতের দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরো না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ী পৌঁছান হইল। চাকরাণী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী বড্ড গরম হয়, —মেয়েরা বাড়ী যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

''দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্ত মেম সাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙীন কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি স্কুলে আসিলে দেখা গেল, দু'তিনজন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই চারিজন বমি করিয়াছে, কয়েকজনের মাথা ধরিয়াছে ইত্যাদি। অপরাহ্নে মেম সাহেবা, বাসের দু'পাশের দুইটী খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দ্দা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

''সেদিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জ্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনাদের মোটর বাস তো সুন্দর হয়েছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে আলমারী যাচ্ছে নাকি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারী বলে ভ্রম হয়! Moving Black hole ('চলন্ত অন্ধকূপ') যাচ্ছে! তাইতো, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কি করে!

''তৃতীয় দিন অপরাহ্নে চারি পাঁচজন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন-'আপ্‌কা মোটর তো খোদাকা পানাহ্! আপ লাড়কীয়োঁ কো জীতে জী কবরমে ভর রহি হ্যাঁয়।' আমি নিতান্ত অসহায় ভাবে বলিলাম, 'কি করি, এরূপ না হইলে ত আপনারাই বলিতেন—বেপর্দ্দা গাড়ী।' তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'তব্ কেয়া আপ জান মারকে পর্দ্দা করেঙ্গী? কাল সে হামারা লাড়কীয়াঁ স্কুল নেহি আয়েঙ্গী।' সেদিনও দুতিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ী হইতে

চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটর বাসে আসিবে না।

"সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানাহীন ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজী চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন 'Brother-in Islam'. বাকী তিনখানা উর্দ্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর একখানায় পাঁচ জনের স্বাক্ষর। সকল পত্রের বিষয় একই সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ-কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বেপর্দ্দা করে। যদি আগামী কল্য পর্য্যন্ত মোটরে ভাল পর্দ্দার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিস' 'পলিদ' প্রভৃতি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন একপ বেপর্দ্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়ে আসে।"

বড় দুঃখে রোকেয়া বলিয়াছেন 'এতো ভারী বিপদ' 'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ!' রাজার আদেশে একদিন নয়, দুদিন নয়—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর বোধ হয় কেহ এমন করিয়া জীবন্ত সাপ ধরিতে পারে নাই।"

পঁচিশ বৎসর আগে—পঁচিশ বৎসর আগেই বা বলি কেন, এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন যাঁহারা স্কুলে মেয়ে পাঠানোকে একটা মস্ত বড় পাপের কাজ বলিয়া মনে করেন। যিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছেন, 'আমি রোকেয়াকে ধন্য করিলাম।' আর যিনি নানা ছল ছুঁতায়, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের পান হইতে চুণ খসিবার অপরাধে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তিনি মনে করিয়াছেন—'বিরাট শাস্তি দিলাম রোকেয়াকে!' স্কুলের মেয়েদের ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার, গান বাজনা শিখিবার বন্দোবস্ত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পরদিন হইতে শুরু হইল উর্দ্দু কাগজসমূহে স্কুলের শ্রাদ্ধ, স্কুল পরিচালিকার সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ!

রোকেয়া নিজে কোন কালেই অনাবশ্যক পর্দ্দার আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যাপারে নিজের বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারেন নাই। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে ছাত্রীর অভাব তখন আর ছিল না, কিন্তু তাহাদের অভিভাবকগণ তখনো অবরোধের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। স্কুলের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া রোকেয়া এই ব্যাপারে সমাজের সবচেয়ে গোঁড়া মানুষদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। এজন্য তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইত; কিন্তু তিনি যদি এত সতর্কভাবে অগ্রসর না হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল বহুদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

স্কুল কমিটিতে রোকেয়া বাহির হইতেন না। কমিটিতে প্রায় সবই পুরুষ মেম্বর। অন্তরাল হইতে তিনি তাঁহাদিগকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিতেন। তিনি গল্পচ্ছলে একবারের ঘটনা বলিয়াছেন—যে ঘরে আলমারীর মধ্যে তিনি জরুরী কাগজ পত্র রাখিতেন স্কুলের সেই কক্ষেই কমিটির মিটিং বসিয়াছিল। নানাবিধ আলোচনার মধ্যে হঠাৎ আলমারীর মধ্য হইতে একটা কাগজের দরকার পড়িয়া যায়। পর্দ্দানশীন রোকেয়া ও পুরুষ মেম্বরদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্য একজন অমুসলমান শিক্ষয়িত্রী মিটিংয়ের সময় হাতের কাছে থাকিতেন। কিন্তু তিনি সেদিন কিছুতেই দরকারী ফাইলটি আলমারীর মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। উপস্থিত ভদ্রলোকেরাও গলদঘর্ম্ম হইলেন—কাগজ বাহির হইল না। এদিকে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে রোকেয়া প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ফাইলটি কোথায় রাখিয়াছেন। এভাবে অনেক সময় অনেক কাজ পণ্ড হইত।

রোকেয়া বলিয়াছেন, "স্কুলের অনিষ্ট করিতে কতগুলি লোক বদ্ধ-পরিকর আছেন। কোন কারণে আমার প্রতি কেহ বিরক্ত হইলে তিনি আমার অনিষ্ট কামনায় এই স্কুলের অনিষ্ট করিয়া বসেন! আমি নিজে এমনই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছি যে আমার অনিষ্ট কেহ করিতে পারে না। কারণ 'ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।' লোকে আমার কি করিবে? আমার মেয়ের বিবাহ পণ্ড করিবে? আমার ছেলের বিবাহে ভাংচি দিবে? আমার নিজের পার্থিব কি আছে যাহা কেহ নষ্ট করিবে? বরং স্কুলের পতন হইলে সংসারে যেটুকু মায়ার বন্ধন আছে আমি তাহা হইতেও মুক্তিলাভ করিব। বলিয়াছি একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি জীবনের শেষ দিনে এই ভাবিয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিব যে এই স্কুল-পরিচালানার ব্যাপারে আমি নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য একটী মিথ্যাকথা বলি নাই—এবং স্কুলের একটী পয়সা নিজে ভোগ করি নাই।"

স্কুলের পয়সা ভোগ করাতো দূরের কথা, স্কুলের উন্নতির জন্য রোকেয়া নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে কত রাশি রাশি অর্থ যে ঢালিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দশ হাজার টাকা লইয়া স্কুল আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াও সময় সময় তাঁহাকে বার্ষিক হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্কুলের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে। স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁহার একটী নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল। কিন্তু সেই সামান্য পারিশ্রমিকেরও সমস্ত তাঁহাকে স্কুলের কাজেই ব্যয় করিতে হইত।"

স্কুল স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া স্কুলের প্রায় দশ হাজার টাকা নষ্ট হয় এবং নানা কারণে আরও প্রায় বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। নিজের ব্যক্তিগত অর্থ হইতে রোকেয়া এই টাকার ক্ষতিপূরণ করেন। তাহা না হইলে সেই সুদূর অতীতেই বোধ হয় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের অস্তিত্ব লোপ পাইত।

ব্যাঙ্ক ফেলের পরে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। তদানীন্তন সেক্রেটারী, অক্লান্তকর্ম্মী মিঃ সৈয়দ আহ্‌মদ আলী এই সময় রোকেয়াকে লিখিয়াছিলেন, "পরাজয় অবশেষে আসিল। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্য দিয়া আসিল, ইহাই দুঃখ।" আর একবার তিনি স্কুলের আর্থিক দুরবস্থার সময় মনের আবেগে লিখিয়াছিলেন—"চারিদিক অন্ধকার। কোনদিকেই আলোর আভাস দেখা যায় না। আমার যতটুকু সামর্থ্য তাহার চেয়ে এক বিন্দুও কম করি নাই, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল? সমাজ প্রতি পদে বাধা দিয়াছে, স্বয়ং বিধাতাও প্রতিকূল। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।" কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিবার জন্য রোকেয়ার জন্ম হয় নাই; একান্ত অভাবনীয় বিপদেও তিনি কখনো সাহস হারান নাই।

স্কুলের আঠার বৎসর বয়সে তিনি বলিয়াছেন—"একটা মজার কথা এই যে স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যে কোন জিনিসের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আল্লা আমাকে তাহাই হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমার মাতা সঙ্গে না থাকিলে আমার কলিকাতায় থাকা হইবে না। কিন্তু বৎসর অতীত হইতে না হইতে মাতার মৃত্যু হইল। পরে ভাবিয়াছিলাম টাকা না থাকিলে স্কুল চলিবে না; কিন্তু বিদ্যালয় খুলিবার আট মাস পরেই বার্ম্মা-ব্যাঙ্ক ফেল হইল, অতঃপর আরও নানা কারণে একুনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা নষ্ট হইল। তাহার পরে ভাবিয়াছিলাম কলিকাতার কতিপয় গণ্যমান্য রইসের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে বিদ্যালয়সহ কলিকাতায় টিকিয়া থাকিতে পারিব না; কিন্তু সেই গণ্যমান্য লোকেরাও বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবই গিয়াছে, কেবল বিধাতার কৃপায় স্কুল আছে। শুধু কঙ্কালসার হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নহে—বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলাম মাত্র দুখানা বেঞ্চ এবং আট জন ছাত্রী লইয়া অলিউল্লা লেনের একটী ছোট বাড়ীতে, এখন স্কুলের প্রায় ঝাড়া আঠার উনিশ হাজার টাকার আসবাব এবং নগদ বিশ হাজার টাকা আছে, ছাত্রীসংখ্যাও শত্রু-মুখে ছাই দিয়া দেড় শত। আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি—কোরাণ শরীফের এই বচনটীই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।"

মাকড়সা-জননী এভাবে দিনের পর দিন আপনার বক্ষঃ রক্তে শত শত মাকড়-শিশুকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মুস্‌লিম-বঙ্গে নারী আন্দোলন

বাংলার মুসলমান মেয়েদের সামাজিক জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় গত বিশ বৎসরে তাঁহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশ বৎসর আগে যাঁহারা গৃহের চারি প্রাচীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসাকে ঘোর পাপের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই আজ রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বিলাত পর্য্যন্ত দরবার করিতেছেন! সমাজের যে দিকেই তাকানো যায়, দেখা যাইবে আজিকার মুস্‌লিম নারী-সমাজে সমস্ত ব্যাপারে একটা নূতন চাঞ্চল্য ও উৎসাহের লক্ষণ জাগিয়াছে। সমস্ত বিষয়েই অনুভব করা যায় যে আমরা উন্নতির যুগে বাস করিতেছি, আমাদের চারিদিকে সমাজের চেহারা দিনে দিনে বদলিয়া যাইতেছে, দেশের মেয়েদের অভাব আকাঙ্ক্ষা সব কিছুতেই একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন আসিতেছে।

কিছুদিন আগে দমদম হইতে বিমান-পোত-চালনা শিক্ষার জন্য যে দাস-রায় মেমোরিয়াল বৃত্তি ঘোষণা করা হয়, মুসলমান মেয়েরা তাহাতে পর্য্যন্ত প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা আজ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে, হাইকোর্টের এডভোকেট হিসাবে এবং আরও নানাভাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্রীর অভাব নাই। মুসলমান মহিলারা স্কুল স্থাপন

করিতেছেন, স্কুল পরিচালনা করিতেছেন, সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সমিতির মধ্য দিয়া সমাজ সেবায় দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শুধু কলিকাতায় নয়, কলিকাতার বাহিরেও বহু বালিকা স্কুল, গার্লস্ হোম বা মহিলা সমিতি আছে, যাহার মূলে রহিয়াছে মুসলমান মেয়েদেরই সাধনা।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়া মুসলমান বালিকারা হিন্দু বালিকাদের চেয়েও অনেক অগ্রসর।

বাংলার মিউনিসিপালিটিতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রথম যে মেয়ে মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনি মুসলমান।

জাগরণের এই আলোকময় প্রভাতে আজ সকলের আগে যাঁহাকে মনে পড়ে, তিনি আর কেহই নহেন —বাংলার মুসলমান নারী-আন্দোলনের জন্মদাত্রী, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রদূত, মিসেস্ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়েন। আমরা জানি, ইংরাজের আমলে মুসলমান নারীদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্য হইতে আলোকের পথে টানিয়া আনিবার প্রথম চেষ্টা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আলোকের দূতী বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে আর কয়েকটী যুবক নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া নীরবে মুসলমান মেয়েদের চলার পথ সুগম করিবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করিতেছিলেন। পাঠ্যজীবনে ইঁহাদের চেষ্টায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় সুহৃদ-সম্মিলনী নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারই মধ্য দিয়া ইঁহারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে উদার মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যে নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশ জুড়িয়া স্কুল-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক সেই নিয়মে ইঁহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের মেয়েদের জন্য গৃহে গৃহে অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল সেদিন, যেদিন আলোকের দূতী রোকেয়ার অপূর্ব্ব প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল! আমাদের জীবনে মধ্যাহ্ন এখনো আসে নাই। কিন্তু আঁধারের বুক চিরিয়া যে-নারী আলোক-শিশুকে বাঁচাইয়া আনিলেন, মধ্যদিনে তাঁহাব উদ্দেশ্যে আমাদের হাতের জয়পতাকা নিশ্চয়ই অবনত হইবে।

গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুস্‌লিম নারীদের সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বা মুস্‌লিম মহিলা সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই মহিলা সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সহিত তাঁহার বিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আঞ্জুমনের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্ম্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।

আঞ্জুমনে খাওয়াতীন তাহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে, তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্তা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।

প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল! মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিবেন একথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাঁহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন।

কোথাও হয়ত বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে অভিভাবকের রোষকষায়িত-লোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে তখন তিনি সভার নির্দ্দিষ্ট

তারিখে কোন নিকট আত্মীয়ের গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে পুঁটলিতে রহিয়াছে সভার যোগদান করিবার উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টায় রোকেয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

একাকী অন্ধকার-পথে কত নিন্দা-গ্লানি, কত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইয়াছে তাঁহার একটীমাত্র কথায় তাহার সবখানি আমাদের চোখের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনে যখন আমাকে সমিতির কাজে হাত দিতে হইয়াছিল, তখন একবার বাহির হইতে অকারণে সামান্য বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলাম, সে সময় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা- গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।' এই একটী কথায় তাঁহার জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই একটী মাত্র কথার মধ্যে যেন আমরা এক নিমেষে তাঁহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিয়া পাই! বাস্তবিকই চিরদিন তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ও মস্তকের আবরণে কেবলই আঘাতের পর আঘাত বর্ষিত হইয়াছিল। উদগ্র কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সভাসমিতি কাহাকে বলে অনেক স্থলে তাহাও রোকেয়াকে অনেক কষ্টে শিখাইতে হইত। তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন— একবার অনেক সাধ্যসাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটী শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমনের এক মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিংয়ের কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'সভার নাম করিয়া বাড়ীর বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না!' রোকেয়া অনেক কষ্টে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, এখনই যে-কাজ শেষ হইয়া গেল তাহারই নাম সভা।

রোকেয়া বলিতেন, 'যে কক্ষে সভা বসিত প্রত্যেকটী অধিবেশনের পর তাহার দেওয়ালগুলি পানের পিকে এমন রঞ্জিত হইয়া যাইত যে, প্রত্যেক বারেই চূণকাম না করাইলে চলিত না।

স্বয়ং সভানেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সমাগত মহিলাদের মধ্যে কেহই অনুভব করিতেন না, যে সময় সভার কাজ চলিতেছে অন্ততঃ সে সময়টুকু নিজ নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা প্রয়োজন। সে যুগে রোকেয়া কি ধরণের সভা করিতেন আজ ত্রিশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

ক্রমে রোকেয়ার চারিধারে একটী ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। ধীরে অতি ধীরে তাঁহারা বুঝিলেন—সভা-সমিতি কাহাকে বলে, তাঁহারা দেখিলেন নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা শিখিলেন তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে আঞ্জুমনে খাওয়াতীন বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুসলিম নারীর চক্ষু ফুটাইল।

রোকেয়া আজ নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে পতাকা তিনি এতকাল উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা জাগিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের কাজ হইল : তাঁহার হাতের জয়পতাকা সাবধানে বহন করিয়া লইয়া পথ চলা— যে কাজ তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সম্পূর্ণ করিয়া তোলা।

মনে হয় দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের উপর আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লামের প্রভাব দিনে দিনে আরও বিস্তৃত হইতেছে। দেশের সমস্ত শক্তিশালী নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করাগতয় কয়েক বৎসরে নারী সমাজের সমুদয় কল্যাণ-আয়োজনের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। নারীর সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও আইনগত অধিকার অনধিকার লইয়া এই সমিতি যে আন্দোলন করিয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। এমন কি এসব ব্যাপারে দেশের গভর্ণমেণ্টও ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ইহার মতামতকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের আগামী শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে। ১৯৩৫ সনের শেষভাগে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে শেষ

মীমাংসা করিবার জন্য বিহার-উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার লরী হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, নারীর অধিকার লইয়া এই সমিতি তাহার সঙ্গেও দরবার করিয়াছিল। কলিকাতা কাউন্সিল হাউসে সমিতির প্রতিনিধি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বঙ্গনারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করেন।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমিতি যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপত্তন করিয়াছে, ভবিষ্যতে হয়ত ইহাই দেশের নারীসমস্যার একটা দিক সমাধানের পথে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গেল, এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার বিবরণ স্থায়ী অক্ষরে লেখা থাকিবে। আয়ার্লাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, গ্রীস, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড চীন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাকর্ম্মিগণ সমগ্র নারী জাতির কল্যাণকামনায় ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বাঙ্গলা বা নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি এই সম্মিলনে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া মুসলমান মেয়েদের কর্ম্মপ্রিয়তার পরিচয় দেন।

সমিতির কাজে রোকেয়ার অনুবর্ত্তিগণকে যে পদে পদে বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া পথ চলিতে হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু দেশের নারীচিত্তকে জাগ্রত করিবার জন্য যিনি এত দীর্ঘদিন আপনাকে তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গেলেন যুদ্ধজয়ের সমস্ত যশোভাগ তাঁহারই প্রাপ্য।

অবসান

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বাংলার নারী ইতিহাসে এক শোচনীয় দিন। আমাদের বড় আদরের, বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের রোকেয়া সেদিন অকস্মাৎ পরলোক যাত্রা করিলেন। দুর্ব্বার সাহস, একাগ্র সাধনা ও কঠিন পণ লইয়া যিনি এত দীর্ঘ দিন একই লক্ষ্যে চলিয়াছিলেন, কোন্ এক অদৃশ্য চালকের বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সকল ছাড়িয়া এক নিমেষেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। সৈনিকের জীবনের সহিত রোকেয়ার জীবনের কি চমৎকার সাদৃশ্য!

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবে মাত্র উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার জীবনের কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিদিনের মত নূতন উদ্যমে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এমনি সময়ে মুস্‌লিম বঙ্গের একটী বিরাট কর্ম্মকেন্দ্রে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইল।

কলিকাতার অলিতে গলিতে দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইল না; শুধু কলিকাতাই নয়, দেখিতে দেখিতে হাওড়া প্রভৃতি আশে পাশের সমস্ত স্থানে রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে শেষবারের মত দেখিয়া লইবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, অসংখ্য নারী সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন।

চিরদিনই রোকেয়া স্কুলের কাজকর্ম্মে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় বারটা পর্য্যন্ত কাগজ-পত্রের ফাইলের মধ্যে তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। সেই রাত্রিই তাঁহার জীবনের কালরাত্রি একথা তখন কে জানিত? প্রত্যুষে যখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন তখনও তাঁহার দেহে বা মনে গ্লানির চিহ্নমাত্র নাই। পূবের আকাশে হাস্যমুখী উষা। রোকেয়ারও ঠিক তেমনি শান্ত প্রসন্ন ভাব। মুখহাত ধুইবার জন্য তিনি গোসলখানায় ঢুকিয়াছেন। মৃত্যুর দূত বুঝি আলো-আঁধারের মধ্যে সেখানেই ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কি করিয়া কি হইল কে বলিবে? মুখহাত ধোওয়া আর হইল না। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা লইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রোকেয়া আবার শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে ব্যথিতের আর্ত্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দকুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল। সৌন্দর্য্যে রমণীয়, মহত্ত্বে বরণীয় ও গৌরবে স্মরণীয় একটী জীবনের উপর করাল কাল চকিতে তাহার কাল যবনিকা টানিয়া দিল। অর্দ্ধশতাব্দীর ও অধিক কাল যে প্রদীপ দীপ্ততেজে জ্বলিয়াছিল, কালের এক ফুৎকারে তাহা নিভিয়া গেল।

ভিতরে ভিতরে রোকেয়ার স্বাস্থ্য বোধ হয় কিছুদিন হইতে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি—সেই চিরপরিচিত প্রসন্ন-উজ্জ্বল হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন। শুধু কথা-

প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে জানিতে পারিতাম যে তিনি ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থা মত তিনি ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার বলিতেন—হাওয়া পরিবর্ত্তন ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। রোগী উত্তর করিতেন "বিশ্রাম করিব কি, আমার যে মরিবারও অবসর নাই।"

তাঁহার কথাগুলি কিন্তু আমার মায়ের মনে শঙ্কার উদ্রেক করিত। মা বলিতেন—এবারে বুঝিবা সত্য সত্যই তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইল! রোকেয়ার জীবনের পরিপূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা মায়ের বড়ই ইচ্ছা ছিল। যখনই সুযোগ হইত, মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিতেন, আর আমাকে বলিতেন—এই রহস্যময় জীবনের ইতিহাস পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ভার তোমার উপর রহিল।

স্কুল বা আঞ্জুমন সংক্রান্ত নানা কাজে রোকেয়ার সেখানে মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়িত। কখনো আঞ্জুমনের রিপোর্ট লেখা, কখনো স্কুলের কাগজ-পত্রের ফাইল গোছাইয়া দেওয়া, আর কখনো বা শিক্ষয়িত্রী কম পড়িলে স্কুলের অধ্যাপনার কাজে সাহায্য করা—এমনি নানা ধরণের কাজ। কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝে নিরালা এক একবার আমাকে নিয়া বসিতেন। সেই সুযোগে নানা কথা উঠিত। মৃত্যুর অল্পদিন আগে একবার হঠাৎ বলিলেন—'আমি তো চলিলাম!' বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম—'কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন—'আমি কি চিরটা কাল এই ভূতের বোঝা বহিয়া মরিব? এবার আমার ছুটি নিবার পালা। আমার জন্য এক 'হোজরা' তৈয়ার হইতেছে। বাকী কটা দিন আমি সেখানেই অজ্ঞাত বাস করিব।' কথাটা খুলিয়া বলিলেন না। পরে জানিয়াছিলাম যে ঘাটশীলায় তাঁহার নূতন বাড়ী হইতেছে। কিন্তু যে সাধনায় তাঁহার জীবন-যৌবন, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থসম্পদ সমস্তই ব্যয় হইয়াছে—পূর্ণ সাফল্য আসিবার আগেই তিনি তাহা ছাড়িয়া চলিলেন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবার জন্য, কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'স্কুলের তবে কি উপায়?' হাসিয়া বলিলেন, 'স্কুলের জন্য তোমরাই তো রহিলে। আমাকে এবার ছুটি দাও।' বলিলাম, 'কিন্তু পারিবেন কি, স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িয়া দূরে থাকিতে? বিশ্রাম যে আপনার পক্ষে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।' মুখে কথাটার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু উঠিয়া ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, চিঠিখানা লিখিয়াছেন তাঁহার চিরকালের এক হিতৈষী বন্ধু শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। চিঠিতে স্কুলের অবস্থা, সমাজের ব্যবহার, রোকেয়ার সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা রহিয়াছে। প্রতি ছত্রে ছত্রে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং রোকেয়ার প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—"আপনার এই যে জীবনব্যাপী ত্যাগ—দুর্ভাগ্য সমাজ তাহার কি প্রতিদান দিল? এক একবার ইচ্ছা হয় বলি, 'আপনি এই অকৃতজ্ঞ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করুন। স্কুলের জন্য জীবনপাত করিয়াই বা আপনার কি লাভ? যাহা করিয়াছেন এটুকুই মানুষের শক্তির অতীত। এবার নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির দিকে ফিরিয়া দেখুন। স্কুলের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে এবার বিশ্রাম সুখ উপভোগ করুন।'

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবি একি সম্ভব? পারিবেন কি, আপনি স্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিতে? মৎস্য যদি জলাশয় না হইলে একদণ্ড টিকিতে না পারে, আপনিই বা স্কুলের আবেষ্টনের মধ্যে না হইলে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন?"

"তারপরে সমাজের নিন্দা, ভ্রূকুটী ও বিরুদ্ধতা। এই লইয়াই ত আপনার জীবন! ইহাই আপনার পুরস্কার ইহাতেই তো আপনার তৃপ্তি। এ সব না হইলেই বা আপনি বাঁচিবেন কি লইয়া?"

মনে হইল চিঠিখানির মধ্যে রোকেয়ার অন্তরের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে, বুঝিলাম, প্রথমে যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা তাঁহার মনের কথা নয়। দেহে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকিতে স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব! কিন্তু যে বিদায়ের আভাস তিনি সে দিন কথা প্রসঙ্গে দিয়াছিলেন, জীবনে না হইলেও মরণে যে তাহা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে একথা তখন কে ভাবিয়াছিল?

রোকেয়া মরিলেন—জাতিকে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিয়া তিনি নক্ষত্রের দেশে নিরুদ্দেশ হইলেন। যে স্কুল গৃহের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে ছিল তাঁহার শিরা উপশিরার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে তাহা হইতে তিনি চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর! রোকেয়াকে হারাইয়া সে দিন কলিকাতা মহানগরীতে যেন শোকের তুফান বহিয়াছিল। বাংলার মুসলমান নারী পুরুষ সকলেই সেদিন বজ্রাহত!

১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলায় কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির পাতায় পাতায় দেখা গেল শোকের এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিখ্যাত পত্রিকাগুলির বিশেষ সংখ্যা বাহির হইল। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া দেশের ছোট বড় নেতা, সাহিত্যিক সকলে এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। স্বয়ং বাংলার গভর্ণর বাহাদুর দেশের ও জাতির এই বিরাট ক্ষতিতে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন।

বাংলা মায়ের দুলালী রোকেয়াকে স্মরণ করিয়া দেশবাসিগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতা আলবার্টহলে এক মহতী সভায় সমবেত হইলেন। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি ও আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বাঙ্গালা বা নিখিলবঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি। অতবড় হলে বুঝি সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না। যাঁহার জীবনে কোনদিন পর্দ্দার বাহিরে যান নাই, এমনও অনেক মুসলমান মহিলাকে সেদিন আলবার্ট হলের বক্তৃতামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা গেল। সভানেত্রীত্ব করিলেন কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস পি. কে. রায়। রোকেয়ার প্রতিভা, একনিষ্ঠ সমাজসেবা, মহান ত্যাগ, জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যচর্চ্চা ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইংরাজী, বাংলা ও উর্দ্দুতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিলেন। চিরদিন যে সমাজ আঘাতের পর আঘাতই হানিয়াছে সেই সমাজেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপনে এত শ্রদ্ধা প্রীতি, এত কৃতজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা কে জানিত?

সকলের শেষে বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইলেন রোকেয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এক তরুণ যুবক; তিনি বলিলেন, "আজকার এই বেদনা-উৎসবে সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু কিসের জন্য? লাটবেলাট নহে, রাজা-মহারাজা নহে—একটী অবলা নারীর মৃত্যু আজ এতগুলি লোককে একত্রে মিলিত করিয়াছে। জাতি যে আজ জাগ্রত, ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয়।

"সভায় অনেকে অনেক কিছু বলিলেন। রোকেয়ার যে সকল গুণ ও কার্য্যাবলীর কথা তাঁহারা উল্লেখ করিলেন প্রত্যেকটীই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জাতি তাঁহাকে কি প্রতিদান দিয়াছে? তাঁহার জীবনব্যাপী ত্যাগের ফলে সমাজের নিকট হইতে তিনি কি পাইয়াছেন? পাইয়াছেন অশ্রাব্য নিন্দা ও অকথ্য লাঞ্ছনা। এতবড় সভায় আজ কে আছে, একথার প্রতিবাদ করিবে? এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটী মানুষ আজ আপনার বুকে হাত দিয়া বলুন—একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পলে পলে কাহারা তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাহারা তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছিল।

"রোকেয়া নাই। তিনি আজ শহীদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রণক্লান্ত আত্মা বুঝি সমাজের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সকলের অলক্ষ্যে এই সভাগৃহে আজ অসহ্য ব্যথায় ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে।"

বিস্তীর্ণ সভাগৃহের প্রতি প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল—"অসহ্য বেদনায় ফরিয়াদ করিতেছে।" এই মর্ম্মভেদী অভিযোগের উত্তরে কিছু বলিবার জন্য কাহারও মুখে ভাষা জোগাইল না। বিপুল জনসভা শুধু নিরুত্তরে অশ্রু বিসর্জন করিল। যুগজননী রোকেয়ার চলার পথে কুশ-কন্টক রচনা করিয়া জাতি যে পাপ করিয়াছিল চোখের জলে বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

জীবনকালে শুধু ব্যথা আর আঘাতই ছিল যাঁহার পুরষ্কার, সেদিনকার মৃত্যু-উৎসবে বিপুল গৌরবে অশ্রুর মালায় তাঁহার অভিষেক হইল। কিন্তু পরপার হইতে বুঝি তিনি সেদিন তীব্র দুঃখে উচ্চারণ করিলেন—'অবেলায় এ যে বড়ই অবেলায়!'

তরুণ বক্তা আবার বলিলেন—"আমরা যে মহাপাপ করিয়াছি অশ্রুজলে তাহা মুছিবে না। তাহার একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্তই বুঝি সম্ভব। এই সভাস্থলে রোকেয়ার পুণ্যস্মৃতিকে সাক্ষী করিয়া আমরা প্রত্যেকটী মানুষ আজ পণ করিতে পারি যে আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকটী মেয়েকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। বাংলাদেশের একটী বালিকাও যেদিন আর অশিক্ষিত থাকিবে না, সেদিন—শুধু সেদিনই বুঝি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

সভানেত্রী তাঁহার নীতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পরলোকগতার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "রোকেয়া নাই এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা মিলিত হইয়াছি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মাত্র সেদিন তাঁহাকে দেখিলাম, স্কুল সংক্রান্ত নানা বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইল।

"প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়; সেদিনের কথা আজিও ভুলি নাই। খর্ব্বাকৃতি পরমা সুন্দরী নারী—দেখিয়াই মনে হইল এক বিশিষ্ট ছাপ সর্ব্বাঙ্গে লেখা রহিয়াছে; উৎসাহ উদ্যম ও শক্তির যেন এক জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

"আমি তখন কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন সবেমাত্র সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের স্কুলের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর সহিত তিনি পরিচিত হইতে চাহিলেন। তিনি নিজে কোন স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই। চোখে দেখিয়া স্কুল পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন এবং সেই অনুসারে নিজের স্কুল গড়িয়া তুলিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। তিনি ছিলেন সত্যিকারের মুসলমান। তিনি জানিতেন বাহ্য আচার অনুষ্ঠান কখনো প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে পারে না। মানুষের জীবনকে উচ্চতর স্তরে তুলিয়া দিতে পারে যে-ধর্ম্ম, তাহাই শাশ্বত সত্যধর্ম্ম।

"আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম; কারণ আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটা মিল ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ জানিতেন না, আমিও কখনো জানি নাই।

"আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কারণ ভারতীয় নারীত্বের যে আদর্শ আমি চিরদিন মনে মনে পোষণ করিয়াছি—যাহা একান্তই ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমি মনে করি—তাহারই বিকাশ দেখিয়াছিলাম তাঁহার জীবনে।"

শুধু আলবার্ট হলের এই জনসভায় যোগদান করিয়া কলিকাতার মহিলাসমাজ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; শোকার্ত্ত মনের বেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে এক বিরাট মহিলা সভার আয়োজন করিলেন। সভানেত্রীত্ব করিলেন লেডী আবদুর রহীম। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শত শত নারীর চোখে সেদিন বেদনার অশ্রু বহিল। বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া চোখের জলে অনেকেই মুখের ভাষা হারাইয়া ফেলিলেন। জীবনে যাঁহারা রোকেয়াকে চেনেন নাই সেদিন তাঁহাদেরও বুঝি চোখ ফুটিয়াছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতি ধূলিকণায় যেন সেদিন লেখা ছিল এক অব্যক্ত হাহাকার।

রোকেয়ার সমাধি হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে মল্লিকপুরে তাঁহার আত্মীয়বর্গের পুরাতন গোরস্থানে। আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শবদেহ মল্লিকপুরে নেওয়া হইল।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় কলিকাতার নারী সমাজে অসন্তোষ ও অতৃপ্তির মৃদু গুঞ্জন শুনা গিয়েছিল। 'কোকিল যতক্ষণ কাকের বাসায় থাকে ততক্ষণ সে কাকের, কিন্তু যেই মাত্র সে গান করিয়া উড়িতে শিখে তখন সে সমগ্র প্রকৃতির, সে বসন্তের, সে বিশ্বের।' রোকেয়ার উপরে আত্মীয় স্বজনের দাবী ছাড়াইয়া সমগ্র মানব-সমাজের দাবী আসিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ গোরস্থানের মাটিতে যেখানে শত শত মানুষের অস্থিমজ্জা মিশিয়া রহিয়াছে সেখানেই তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হইলে বুঝি তাঁহারও আত্মা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিত। যাহাদিগকে লইয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাদের চোখের অন্তরালে পল্লীজননীর নিভৃতক্রোড়ে তিনি চিরদিনের মত ঘুমাইয়া রহিলেন।

আজিও বৎসর বৎসর আঞ্জুমন খাওয়াতীনের উদ্যোগে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে রোকেয়ার স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়া থাকে। শোকের অশ্রু হয়ত আজ শুকাইয়াছে, কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিঃশেষ হয় নাই—হয়তো কখনো হইবেও না। রোকেয়ার ত্যাগ-পূত জীবনের পুণ্যস্মৃতি এদেশের মুসলমান নারী-সমাজে অনন্তকাল ধরিয়া শক্তি ও প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস হইয়া জাগিয়া থাকিবে।

বাংলার মুসলমান নারী-সমাজকে জাগ্রত করিয়া রোকেয়া আজ অমৃতলোকযাত্রী। রোকেয়া মরিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে বাঁচিয়া উঠিয়াছে শত শত রোকেয়া—রোকেয়ার স্মৃতিসভায় দাঁড়াইয়া সকলের আগে এ কথাই মনে পড়ে। রোকেয়া মৃত, একথা যে কত বড় মিথ্যা—শত শত নারী সেদিন আপনার বুকে বুকে তাহা অনুভব করেন!

সফল স্বপ্ন

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবেমাত্র উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার

জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল, একথা আগেই বলিয়াছি। এই ঘটনার একটী সুন্দর অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এ যেন আমাদের সমাজের অবস্থারই প্রতীক। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় গগনের প্রভাতীতারা। তাঁহার প্রয়াণ—সেও যেন হইল প্রভাতীতারারই বিদায়যাত্রা। তিনি আসিলেন কালরাত্রির অন্ধকারে, গাহিলেন প্রভাতের আগমনী। রাত্রি অবসান হইল, অন্ধকার কাটিয়া গেল। অরুণ আলোকে মুক্ত আকাশতলে সমবেত হইল আলোক-শিশুর দল। রোকেয়া রাত্রির আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়াছিলেন—অন্ধকারে জ্বলিয়াছিলেন প্রদীপের মতো। দিনের আলোয় তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তাঁহার কাজ ফুরাইল, আনন্দে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রোকেয়া শুধু কর্ম্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। নারী-জাগরণের যে অভিনব স্বপ্ন জীবনের সোনালী উষায় তাঁহার চোখের সম্মুখে জাগিয়াছিল, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। সংসারে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের অন্ত নাই। দৃষ্টিমান মানুষের নয়ন সমক্ষে ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বহু কর্ম্মযোগী, হৃদয়বান ব্যক্তি মানবকল্যাণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জীবনকালে স্বপ্ন হয়ত শুধু স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে—সম্ভবের দেশে পক্ষ বিস্তার করে নাই।

কিন্তু রোকেয়ার অদৃষ্ট অন্যরূপ। এযুগে আমরা দেখিতে পাই কামাল পাশা, মুসোলিনী প্রভৃতি মহামানুষ জীবনকালেই নিজের আরব্ধ কার্য্যের ফলভোগ করিতে পারিতেছেন। এদিক দিয়া ইঁহাদের ভাগ্যের সহিত রোকেয়ার ভাগ্যের তুলনা হয়। ইঁহাদেরই মত রোকেয়ারও জীবদ্দশাতে তাঁহার সাধের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছিল।

'সুলতানার স্বপ্ন' নামক ইংরাজী গ্রন্থে রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তাহার পরিণতি কল্পনা করিতে গিয়া আকাশপথে ভ্রমণের যে মনোরম স্বপ্ন মানস-নয়নে দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ আমাদের বাস্তব জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"যে সময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম তখন এরোপ্লেন ও জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি সে সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সে সব কিছুই দেখি নাই। প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ সনে) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনো উড়ো জাহাজে উঠিতে পারিব এরূপ আশা কোনদিন করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।"

কিন্তু সুলতানার সেই বিচিত্র স্বপ্ন কিরূপে রোকেয়ার নিজের জীবনে সাফল্যলাভ করিল, তাহারও বর্ণনা আমরা তাঁহারই লেখনী মুখে পাই।

"২রা ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃঃ) মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। দমদমের এরোড্রোমে পৌঁছিয়া দেখি একেবারে মুক্ত ময়দান। কেবল আমাদের মোটর তিনটী এবং আমরাই। আমি আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান মোরাদের প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি ধরাখানা সত্যই সরাতুল্য। আমি ক্রমে তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার! আমার দক্ষিণ দিকে অস্তগামী সূর্য্য, বামে দ্বাদশীর পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র-উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নীচে চাহিয়া দেখি, কলিকাতার পাকা বাড়ীগুলি—কোঠা, বালাকানা, ইমারত,—সব ইষ্টক স্তূপের মত দেখাইতেছে। হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা-বিশেষ! আর হুগলী নদী-সেত জলাশয়ের সামান্য একটী রেখার মত দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নীচে নামিলাম।

"পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুস্‌লিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধ-বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই।"

সুদূর অতীতে কল্পনার চোখে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের আনন্দে সেদিন তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তির বিকাশই তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নয়। নারী-জাগরণের সম্মোহন স্বপ্নে তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত বিভোর হইয়া ছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা বিফল হয় নাই। জীবনের সায়াহ্নে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাঁহার স্বপ্ন বাস্তব জীবনে অভিনব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার শেষ জীবনের কথা আলোচনা করিলে একটী সুন্দর ছবি মনে জাগে ঃ একটী মৃত নারী-সমাজ ধীরে অতি ধীরে নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছে, আর একটা কল্যাণী বিধবা সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া সেই জাগরণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতেছে।

রোকেয়ার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে একটী নারী-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলাম। এই সম্মিলনে সভানেত্রীত্ব করিয়া তিনি আমাদিগকে গৌরবান্বিত করেন। সাফল্যের গৌরব ও তৃপ্তি তাঁহার সেদিনকার অভিভাষণের প্রতি ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বলেন—"আজ আমি আপনাদের দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে আমি মুসলিম নারী-সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ঘুম তাঁহাদের কিছুতেই ভাঙিতেছিল না। ডাকিয়া ডাকিয়া জাগাই—আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমান। বাইশ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা আগে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেন, পরে উঠিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন—কিন্তু গা ছাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। সুখের বিষয় এদিকে কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, তাঁহরা চোখ রগড়াইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ এতগুলি শিক্ষিতা মহিলাকে দেখিতে পাইয়া চক্ষু জুড়াইল।"

এই সম্মিলনের কয়েক বৎসর আগে একটী মহিলা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনারা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে আমি আজ বাইশ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত নারী। ঐ জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে। তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটী লোকও এ ভূভারতে নাই।"

কিন্তু আজিকার সম্মিলনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতি ও স্থায়িত্বের বিষয়ে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া তিনি সকৌতুকে বলিলেন—"আমাদের মত অবরোধ-বন্দিনীদের পুড়িয়া দিলে ভূতেও খায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহস করিয়া অবরোধের নাগপাশ ছিঁড়িতে পারিয়াছেন তাঁহারাই একাজে অগ্রসর হউন।" বলিতে বলিতে আশা ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে তাঁহার দু চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ আর তাঁহাকে নারী জাতির জন্য কাঁদিবার লোক খুঁজিতে হইল না। জাগ্রত নারী শক্তিতে তাঁহার চেয়ে আর কে বেশী আস্থাবান ছিল? দায়িত্ব বাস্তবিক পক্ষে যাঁহাদের—তাঁহাদেরই হাতে তাহা তুলিয়া দিতে পারিয়া বুঝি তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রোকেয়ার সঙ্গে দেখা হইলে প্রায়ই অনুযোগ করিতেন—'তোমাকে আর কত বলিব? বি.এ. পরীক্ষাটা শেষ না করিয়া কেন যে ফেলিয়া রাখিয়াছ জানি না।' আনন্দের বিষয় এই যে, মৃত্যুর বৎসরেই তাঁহার এই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিন তাঁহার চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেহ হয় নাই।

একদিন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলাম যে, আমার পরীক্ষায় সাফল্য উপলক্ষ্যে তিনি এক মহিলা সভার আয়োজন করিতেছেন। বুঝিলাম, ইহাতে আমার কৃতিত্বের পরিচয় যতটা নাই—তার চেয়ে বেশী আছে তাঁহারই আনন্দের প্রকাশ।

রোকেয়ার আহ্বানে সেদিন জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সেদিন সভাসমক্ষে তাঁহার মুখে চোখে যে আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জীবনে ভুলিব না।

অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে গিয়া তিনি বলিলেন—আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না। যে বাদশাহ্ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।"

বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে বুঝি আর অপূর্ণতার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনিতাম—"বেশী নয়, আর দশটী বছর যদি বাঁচিতে পারি, তবে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি এমন মজবুত করিয়া দিয়া যাইতে পারিব যে তাহার স্থায়িত্বের জন্য আর ভাবিবার কারণ থাকিবে না।"

স্কুলের একটী নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি বিল্ডিং ফাণ্ডে সঞ্চয়ও কম করেন নাই। সভা সমিতিতে, বিবাহের মজলিসে কাপড় ধরিয়া চাঁদা আদায় করিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখিয়াছি। আর কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিলে স্কুলকে নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি এই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে প্রার্থিত অবকাশ দেয় নাই।

তিনি আজ মরণের পরপারে, কিন্তু তাঁহার বড় সাধের সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল আজ একটী প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এদেশের মুসলমান সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। ইহার পরিচালন ভার আজ দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজ হাতে লইয়াছেন।

শুধু তাহাই নয়। দেশব্যাপী জড়তা ও অবসাদের মধ্যে রোকেয়া যে কর্ম্মের স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন, তাহারও গতি দিন দিন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া চলিয়াছে। মুসলিম বঙ্গের মুক্তিপথ-যাত্রিণীদের ঘিরিয়া বুঝি তাঁহার কল্যাণ আঁখি আজিও অনিমেষে জাগিয়া আছে। মনে হয়, পরপার হইতে আজিও তিনি তাহাদের শিরে অহরহ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন!

চরিত্র পাঠ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাহজাহানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, তোমার তাজমহলের চেয়ে— হে সম্রাট, তুমি ছিলে মহত্তর।' রোকেয়ার জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই বলিতে ইচ্ছা হয়। মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য রোকেয়া একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—বহুদিন পরেও হয়ত একথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মানুষের শির অবনত হইবে। কিন্তু শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বলিলে তাঁহার সত্যকার পরিচয় হইল না—বাংলার মুসলমান নারী সমাজের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে একটা সমাজের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; আর এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী এই কল্যাণী নারী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকারের কুঁড়িতে রোকেয়া ফুটিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত, এ যেন প্রকৃতির রহস্য বিলাস। দীর্ঘকাল শবসাধনা করিয়া তিনি কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন, তাঁহার স্বপ্ন কিরূপে সফল হইল—তাহাও এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে মনে হয় সাফল্যের বীজ তাঁহার নিজের চরিত্রের মধ্যেই লুকানো ছিল।

মনে হয়, রোকেয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার কঠিন পণ ও আদর্শের প্রতি তাঁহার বিশ্বস্ততা। 'সত্য প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, সাধারণের গৃহীত হোক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হোক, সত্যকে বুঝিব, খুঁজিব ও গ্রহণ করিব' এই ছিল তাঁহার পণ। শুধুই ইহাই নয়। তাঁহার আদর্শ ছিল ইহার চেয়েও উচ্চ। সত্যকে শুধু গ্রহণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। সত্যকে প্রচার করিবেন—দেশের প্রত্যেকটী হতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পথে টানিয়া লইবেন, এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সমাজসেবা করেন অনেকেই। কিন্তু রোকেয়ার মত এমন আপন-ভোলা সমাজসেবা কে কবে দেখিয়াছে। সমাজের জন্য এমন করিয়া নিজের ঘর বাড়ী, আত্মীয় স্বজন, বিত্তসম্পত্তি, মানসম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্ত হইতে সংসারে কজন লোক পারিয়াছেন জানিনা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে কত প্রসিদ্ধ দেশনেতাকে অনেক সময় মত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ ও নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোকেয়ার ছিল একই মত ও পথ, অনন্য সাধনা ও লক্ষ্য। তাঁহার ছিল একই রাজনীতি—তাহা নারীজাগরণ। অর্দ্ধশতাব্দী আগে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকেই মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত সত্যপথ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এতখানি দৃঢ়তা ও এতখানি একাগ্রচিত্ততা যাঁহার মধ্যে ছিল, এত দীর্ঘ দিন পরেও সাফল্যের সুবর্ণ কুঞ্জিকা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

রোকেয়ার জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চোখে উজ্জ্বল হইয়া জাগে তাঁহার স্বভাবের একটী বিশেষ গুণ—কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাঁহার মন ছিল মমতা-মধুতে ভরা। নারীর দুঃখে সে মন মোমের মত গলিয়া যাইত। কি করিয়া এ দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি বেদনায় আকুল হইতেন। কিন্তু এই কোমল নারী-চিত্তেরই অন্তরালে এত দৃঢ়তার স্থান কোথায় ছিল তাহা কে বলিবে? কুসুম-কোমলা নারী কোথা হইতে পাইলেন অত অবিচলিত অধ্যবসায়, অত দুর্ব্বার শক্তি ও সাহস, কে এ কথার উত্তর দিবে?

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এই সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কিন্তু এই বিদ্রোহ তাঁহার স্নেহ-সুকুমার হৃদয়ের গভীর মমত্ববোধকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ধ্বংশের আনন্দের চেয়ে সৃষ্টির বেদনাই তাঁহার জীবনে বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভা। তাঁহার কথা, তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার সাহিত্য—সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তিনি সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে চিরকালই বেশী ফুটিয়াছে তাঁহার দরদী মনের তীব্র বেদনা-বোধ। তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র ও মৌলিকতা যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এখানেই।

জীবনের প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া তিনি সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা নির্ণয় করিয়াছিলেন তিনি নিপুণ চিকিৎসকের মতই। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা—একথা তিনি ধ্রুব জানিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, শিক্ষার আলো যেদিন জ্বলিবে সেদিন কুসংস্কার কুয়াসার মত আপনিই মিলাইয়া যাইবে—তাহার জন্য আর হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধপ্রথা একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রাণঘাতক কার্ব্বলিক এসিড গ্যাসের সহিত অবরোধপ্রথার তুলনা হয়। বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী শত শত নারীও এই অবরোধ-গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া মরিতেছে।'

পর্দ্দা অর্থে তিনি বুঝিতেন সবল ব্যক্তিত্ব, কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর নয়—তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই একথা বলিবেন। 'পর্দ্দা ও অবরোধ ভিন্ন জিনিষ—পর্দ্দা ঐসলামিক কিন্তু অবরোধ অনৈসলামিক' এই বুলি আজকাল অনেককেই আওড়াইতে শুনি। কিন্তু একদিকে নারীর আচরণের অর্থহীন, প্রাণঘাতী অবরোধ—এই দুইয়ের মধ্যে এক যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য সেই সুদূর অতীতে রোকেয়াই সকলের আগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই লেখনী মুখে একথা সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, তাঁহার 'মতিচূর' ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে রোকেয়ার আসল বিদ্রোহ অবরোধের বিরুদ্ধে নয়। তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি জানিতেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধের মুখোস আপনিই খসিয়া পড়িবে। তাই শিক্ষা প্রচারের জন্যই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। জগতের কয়জন সংস্কারক এত সংযম, এত সতর্কতা, এত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিতে পারি না।

রোকেয়া অক্ষরের দাসত্ব না করিয়া ইসলামের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী যেদিন প্রচারিত হয় সেদিন অন্ধ সমাজ বারে বারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল—'পাপের পথে লইয়া যাইতে চায়, কে এই ধর্ম্মদ্রোহিণী?' কিন্তু রোকেয়া বিচলিত হন নাই। মিথ্যা আচার ও অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি ইসলামের সত্যরূপ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন—একথা তিনি নিশ্চিত জানিলেন। ধর্ম্মের বাহ্য খোলসকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন নাই—এখানেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব।

টিয়া পাখীর মত কোরাণ মুখস্থ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি - 'শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরাণ মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত; ইসলামের মর্ম্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?'' এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন ''নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার

দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।''

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলিতেন—আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়—আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে সাত শ বছর আগে যে অধিকার দিয়াছে তার চেয়ে আমাদের দাবী এক বিন্দুও বেশী নয়।

তিনি বলিতেন—'ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসেরাত (পারলৌকিক সেতু) পার হইবেন, আর সে সময় স্ত্রীকন্যাকেও হ্যাণ্ডব্যাগে পুরিয়া পার করিয়া নিবেন।' এই তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তির অন্তরালে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার ক্ষমাহীন অভিযোগের তীব্র জ্বালা।

তিনি আরও বলিতেন—'বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলেই শুনি মুসলমান বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই। কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের জন্য হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র: তাঁহারা যদি শরিয়ৎ মানিতেন তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।' সমাজ তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহিণী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তিনি সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া ধর্ম্মের সত্যকার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দ্দেশকে কোরাণের পাতায় আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তবজীবনের কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন।

রোকেয়া ছিলেন অতি পুরাতন এক সম্ভ্রান্ত শরীফ্ বংশের সন্তান। মান মর্য্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে বর্ত্তমান বাংলায় যে সকল পরিবার অগ্রগণ্য তাহার অনেকগুলির সঙ্গেই ছিল রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কখনো গৌরব অনুভব করিতে দেখি নাই। বরং সম্ভ্রান্ত অর্থে তিনি বুঝিতেন অভিশপ্ত। আমার বি. এ. পাশ উপলক্ষে তিনি বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আরও কয়েকটী মুসলমান মেয়ে বি. এ. পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহারের পাশে একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ সে এক অভিশপ্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, যাদের জন্য লেখা পড়া একেবারে হারাম।' বংশমর্য্যাদাকেই আশ্রয় করিয়া অশিক্ষা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইবার বেশী সুযোগ পাইয়াছিল, তাই সম্ভ্রান্ত বংশের নামেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

ঘরের চেয়ে বাহিরকেই তিনি বেশী আপনার বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ঘরের সম্পর্ক দেহের রক্তের, কিন্তু বাহিরের সম্পর্ক হৃদয়ের—অন্তরের অন্তরতম জনার।

তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়া। মনে পড়ে তাঁহার সহজ, সরস, সাবলীল, অথচ তীক্ষ্ণ, জোরালো লেখা বাল্যকালেই মনকে যেন কেমন অভিভূত করিত। তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিত যে নূতন জীবনের বাণী, তাহা যেন অলক্ষ্যে প্রাণের দুয়ারে আঘাত করিয়া যাইত।

দশ বৎসর বয়সেই যখন স্কুল ছাড়িয়া পর্দ্দানশীন হই, তখন হইতেই উচ্চশিক্ষার জন্য মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াছিল; আর তাহাই ছিল রোকেয়ার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। সমাজের এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অভিযোগ করিতাম। পরে জানিয়াছিলাম আমার বাল্যের সেই ক্ষীণ প্রচেষ্টা রোকেয়ার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই।

পনের ষোল বৎসর আগে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—'তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া বহুকাল আগের একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রিবেলা আমরা বিহারের এক জলপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাহিরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু নদীতীরের অন্ধকারে বনভূমি হইতে কেয়াফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।'' এভাবে বিনা পরিচয়েই তিনি আমাকে স্নেহের সূত্রে বাঁধিয়া লইলেন। বাংলাদেশের কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী বালিকা শিক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইয়াছে, সেই ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে আপনার, তাহারই সঙ্গে ছিল তাঁহার প্রাণের যোগ সব চেয়ে বেশী।

আমার শৈশব ও কৈশোরের কল্পনার সেই রহস্যময়ী নারীকে প্রথম স্বশরীরে দেখিলাম ১৯২৫ সনে এই কলিকাতার বুকে। মনে হইল, আমি ধন্য হইলাম, আমার নূতন জন্ম লাভ হইল।

তাহার পর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রতিদিন যেন তাঁহার চরিত্রের নূতন নূতন পরিচয় চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে।

সহজ অনাড়ম্বর ভদ্রতা ও মধুর ব্যবহারে তিনি অতি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সরল সুন্দর একটী হাসির রেখা তাঁহার মুখে সকল সময়েই লাগিয়া থাকিত। শত ঘাত প্রতিঘাতেও তাহা কখনো ম্লান হইতে দেখি নাই। আঞ্জুমনের সভায় কতবার দেখিয়াছি, ছুতানাতা ধরিয়া মহিলাগণ তাঁহাকে অপ্রিয় ভাষায় অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; এমনকি কোন কোন অশিক্ষিত মহিলা সমিতি ও স্কুল সম্পর্কিত টাকা কড়ির হিসাব লইয়া তাঁহাকে মুখের উপর অপমান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে কখনো বিচলিত হইতে দেখি নাই।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার দেখা করিতে গিয়া যেন তাঁহাকে একটু মলিন দেখিলাম। মনে হইল তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখে একটু বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। বুঝিলাম, আজিকার আঘাত গুরুতর। জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, 'জীবনে অনেক দংশনই সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আজিকার দংশনের বিষ বুঝি সকলের চেয়ে তীব্র।' ঘটনা খুলিয়া বলিতে বলিতে ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল, কিন্তু ঠোঁটের কোণের হাসিটি তখনো মিলাইয়া যায় নাই।

কাজের কথাবার্ত্তার মধ্যেও তিনি উপমা দিয়া, ছড়া কাটিয়া বাক্যালাপকে সরস ও চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিতেন। এই রহস্য-প্রিয়তা তাঁহার স্বভাবের একটী চমৎকার বৈশিষ্ট্য। কি কথায়, কি বক্তৃতায়, কি সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রোকেয়ার নিজের কোন সন্তান বাঁচিয়া ছিল না। কিন্তু বাহিরকে তিনি ঘরে বাঁধিয়াছিলেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনে অসংখ্য পরের সন্তানকে তিনি আপনার বক্ষঃরক্তে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। স্কুলের অসংখ্য বালিকা তাঁহারই মধ্যে মাতৃরূপের সন্ধান পাইত। প্রত্যেকটী বালিকাকে তিনি চিরদিন কিরূপ গভীর স্নেহে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং বালিকাগুলিও তাঁহাকে কি অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছে, নীচের কয়েকটী কথায় তাহার পরিচয় দিয়া এই মহিমময়ী নারীর বিচিত্র চরিত্রের আলোচনা শেষ করি। কথাগুলি বলিয়াছে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের এক পুরাতন ছাত্রী, রোকেয়ার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এক আদর্শ বালিকা।

"সেই পুণ্যশীলা মহিয়সী মহিলার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে যেন একটী নিবিড় আন্তরিকতা মিশানো থাকিত। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাতে যেন তাহাদেরও প্রাণে সাড়া না জাগাইয়া পারিত না।

"মনে পড়ে তাঁর আদেশ মত দৈনিক ক্লাস আরম্ভের পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটা 'দোওয়া' পড়িতেন আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। ঐ 'দোওয়া'টি যখন তিনি পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতা-ভরা আবেদন! তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়—মুখে বলা যায় না।

"তিনি আমাদের মাঝে মাঝে নানারকম পরীক্ষার জন্য অন্যান্য স্কুলে নিয়া যাইতেন—যেমন বঙ্গীয় পরিষদের পরীক্ষা, বৃত্তি পরীক্ষা ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বে আমরা পরিক্ষার্থিনীরা যথাসময়ে মিলিত হইয়াই দেখিতে পাইতাম যেন এক পবিত্রা শুদ্ধা তপস্বিনী আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই ইঙ্গিতে আমাদের আহ্বান করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেন এবং মধুর সুরে দোওয়া পড়া আরম্ভ করিতেন; আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম, তারপর তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া বাসে উঠিতাম। 'বাস' স্কুল কম্পাউণ্ড না ছাড়া পর্য্যন্ত তেমনিভাবে আমাদের দোওয়া পড়া চলিতে থাকিত। ক্রমে 'বাস' চলার দ্রুততার মধ্যে তিনি থামিয়া যাইতেন, আমরাও যেন তখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতাম। ভয়ভীতি হইতে মন যেন তখন আমাদের অনেকটা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাণে আসিয়াছে যেন একটা স্বর্গীয় প্রেরণা।

"তখন অভিমত বুঝিতাম না; কিন্তু আজ ভাবি, সেই পতিপুত্রহীনা মহিলার আমরা কে ছিলাম, যে আমাদের কল্যাণ কামনায় তাঁর আকুল প্রার্থনা খোদার 'আরস' কাঁপাইয়াছে। আমাদের অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রীদের মঙ্গলই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল চান, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই মহীয়সী নারী সারাজীবন প্রাণ ভরিয়া রাশি রাশি নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় বালিকার মঙ্গল কামনা করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া—একথার উত্তর কে দিবে? প্রতিধ্বনি বলিতেছে, কে উত্তর দিবে?"

চিঠি

(এই পরিচ্ছেদে রোকেয়ার লিখিত কয়েকখানি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দেওয়া হইল। মনে হয় এই চিঠিগুলিতে তাঁহার সত্যকার পরিচয় ধরা পড়িয়াছে। চিঠি ক'খানি পড়িলে যেন আরো সহজে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুবিধা হয়।)

১৯-৫-৩২

স্নেহাস্পদা নাহার,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গতকল্যকার মিটিংয়ে যেসব রিজালিউশান পাশ হইয়াছে তার নকল যদি আজই দিতে পার তো বেশ হয়। কারণ Asst. D. P. I. দেখতে চাচ্ছেন। শুভস্য শীঘ্রম্।

তুমি আজ ও কাল দুদিন বিশ্রাম করে আগামী পরশ্ব সকালে ৯টা ও ১১টার মধ্যে দয়া করে নিশ্চয়ই এখানে আসিও। আল্লাহ্ হয়ত তোমাকে দিয়েই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। তাই তোমাকে চাই।

তোমার স্নেহের
আপা

৪৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৫

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

তোমার ১৯ শে আগস্টের প্রাণজুড়ানো চিঠিখানা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আমার মত জ্বলাপোড়া মরুভূমি তোমার মধুর স্নেহের যোগ্য নহে। তাই দেখনা তোমার সরস চিঠিখানা মরুভূমি একেবারে শুষিয়াই লইয়াছিল।

চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটা ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে। দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া সইস কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি—সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কিনা তা'ও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনি -- ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হচ্ছে—'ভাঁড় লীপকে হাত কালা'। (অর্থাৎ উনন লেপন করলে উনন তো বেশ পরিষ্কার হয়, সমাজ বিস্ফারিতনেত্রে আমার খুঁটি-নাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতে বদ্ধপরিকর।) কচি মেয়েরা মা-বাপের কাছে নিজেদের বুদ্ধিমত যাহা বোঝে তাহাই বলে। তা' নিয়ে একটু রঙ্গ হয়। এইরূপ সুখে দুঃখে এক রকম চলছি ভালই।

*   *   *

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পর দিন দেওয়া হবে! এখন পড়া তৈরী করছি!

*   *   *

আমি চিঠি লিখি বা না লিখি তুই মাসে একখানা লিখিস। হুরী এখন আমাদের স্কুলে পড়ে।

তোমার স্নেহের ভগিনী
রোকেয়া

৪৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা, ৫ই জানুয়ারী, ১৯২৬

কল্যাণীয়া মেরী,

খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি আলীগড়ে মাত্র তিন দিন ছিলাম। সহর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিন দিনই সভাসমিতি লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছে।

সেখানে কত মুসলমান গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে কি আমি মুখ খুলিতে পারি? কেহ তামাসা করিয়া সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার কথা লিখিয়া থাকিবে। আমি শিক্ষিত মহিলাবৃন্দকে দেখিয়া পূণ্য অর্জ্জন করিয়াছি। আমার চক্ষুকর্ণ ধন্য হইয়াছে। 'মঈনুন নেসওয়াঁ' (অর্থাৎ নারীকুলের সাহায্য) নামে সমিতি গঠনের জন্য জনৈক (সম্ভবতঃ অতি দরিদ্র) মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিলেন। আলীগড়ের মেয়ে-কলেজ শীঘ্রই দশলক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আর আমাদের বাংলা দেশ—আহা রে! সে কথা না বলাই ভাল? আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু খোদা আমাকে টাকা দেন নাই।

বলি, আমার বাংলাদেশ! যদি কিছু নাই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস্তো! সেজন্যও আর বেশী ভাবনা নাই—ম্যালেরিয়া ও কালা-আজার সে ভার লইয়াছে!! আহা, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়।

* * *

তোমার দুলার চিঠিও পাইয়াছি। তিনিও আমার বক্তৃতার জন্য মোবারকবাদ দিয়াছেন। আরে, বোরকা-ঢাকা অবস্থায় দু' একটি কথা বলিয়াছি কি বলি নাই, তাহারই নাম হইল 'বক্তৃতা'! আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিলেন কিরূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও 'বক্তৃতা'র কথা বলি নাই।

তোমার স্নেহের
বোন

(৪)

কলিকাতা
১৯/৮/২৬

অবসর অভাবে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই, সেজন্য দুঃখিত হইও না। আমার অবসর নাই বলিয়াই এতদিন মরিতেও সময় পাই নাই!

দাঙ্গায় আমরা প্রত্যক্ষে শহীদ হই নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতেছি; তন্মধ্যে প্রধান দুইটা এই—(১) অনেক লোক কলিকাতা ত্যাগ করায় স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা কমিয়াছে। (২) সইস, কোচম্যান দরওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।

বোন, বলিলাম তো মরিবার অবসর পাই না! পূর্ব্বের চেয়ে খাটুনি বাড়িয়াছে বই কমে নাই!

তোমার শুভাকাঙ্খিনী
ভগিনী

(৫)

কলিকাতা
২৪/৩/৩০

তুমি অমন আদর করে আমাকে যেতে বলেছ। তোমার প্রত্যেকটী কথায় স্নেহ মমতা ভরা ছিল—তা' পড়ে পড়ে আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল, আত্মীয়স্বজনের মমতা কি মধুর জিনিষ, তা আমার মত আত্মীয়হারা না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। শুনেছি, লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয়-স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হবে!

কিন্তু বোন, গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নেই' এই যে স্কুলসংক্রান্ত রাশীকৃত office work, এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশ্‌তের নিমন্ত্রণ পেলেও তো এই স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না!

তোমার স্নেহের
বোন
রোকেয়া

(১৩৪৩ সনের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় এই মহীয়সী নারীর জীবনী প্রকাশিত হয়।)

সাহিত্যিক আর, এস, হোসায়ন*

শামসুন নাহার, বি,এ,

এ-পর্য্যন্ত আমরা প্রধানতঃ রোকেয়ার কর্ম্মজীবনের বৈচিত্রপূর্ণ ইতিহাসই আলোচনা করিয়াছি। এবার আলোচনা করিব তাঁহার সাহিত্য-জীবন। রোকেয়া-জীবনীর একটা বিশিষ্ট দিক অধিকার করিয়া আছে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা। মনে হয় কর্ম্মী আর, এস, হোসায়নের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন সাহিত্যিক আর, এস, হোসায়ন।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ নারীজাতির শক্তি ও স্বাধীনতার যে গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ দেখা যা তাঁহার কর্ম্মজীবনে। তাঁহাকে যাঁহারা বাহির হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন— মুসলমান মেয়েরা সুশিক্ষালাভ করিবেন, এই অভিলাষই ছিল তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার গোড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ছিল ইহার চেয়ে কত বেশী উচ্চ, তাঁহার নারীত্বের আদর্শ ছিল ইহা অপেক্ষা কত বেশী মহান, নারীর শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল কত পর্ব্বত প্রমাণ— তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, শুধু তিনিই একথা জানেন।

রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুল, সমিতি, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য তাঁহার আজীবনের সাধনা, তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, শিষ্যবর্গ,— এসব দেখিয়া আমরা বাহিরের রোকেয়াকে একনিমেষে ধরিতে পারি। কিন্তু ভিতরের রোকেয়াকে— তাঁহার সুকুমার অনুভূতির সঙ্গে যে রোকেয়া মিশিয়া আছে, তাহাকে চিনিবার একমাত্র উপায় তাঁহার সাহিত্য। বাহিরে এই অসামান্যা নারীর যে বিরাট চরিত্র, যে বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই—তাহার উৎসমুখের সন্ধান পাইতে হইলে ফিরিয়া দেখিতে হইবে তাঁহার-সাহিত্যের দিকে। শুধু আজ বলিয়া নয়, দীর্ঘকাল পরেও মানুষ সাহিত্যের ভিতরেই তাঁহার সত্যিকার পরিচয় খুঁজিয়া পাইবে।

সুদূর অতীতে যে সকল মুষ্টিমেয় মুসলমান বাংলা সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, রোকেয়া তাঁহাদের একজন। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি, রোকেয়ার চলার পথ আগাগোড়া একেবারে নূতন ও নিজস্ব এ-ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সম-সাময়িক সাহিত্যকদের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার রচিত সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখের সম্মুখে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক সমাজে সে ছিল প্রধানতঃ অনুকরণের যুগ। আজিকার বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে যে পরিশ্রমী, চিন্তাশীল, শক্তিমান, নবীন সাহিত্যিক সংঘ—সে যুগে তাহা ছিল কল্পনাতীত। অনেকটা অন্ধভাবে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়াই সেকালের মুসলমান সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের নিত্যকার হাসিকান্না, অথবা নিজেদের সমাজের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁহাদিগকে সাহিত্যসৃষ্টিতে ততটা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। মোটের উপর তাঁহাদের সৃষ্টির মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে অনুকরণের চেষ্টা ও আগ্রহ। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন প্রতিভার আবির্ভাব হইল—কাহারও অন্ধ অনুকরণে নহে, আপনার ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসেই সাহিত্য সৃষ্টি করা হইল যাঁহার ধর্ম্ম। এই সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-প্রতিভা আর কেহই নহেন—মিসেস আর, এস, হোসায়ন।

অবরুদ্ধ মুসলিম অন্তঃপুরে রোকেয়ার আবির্ভাব যেন আগাগোড়া একটী পরম বিস্ময়ের ব্যাপার; তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা—বিশেষ করিয়া তাঁহার বাংলা সাহিত্য সাধনার দিক আলোচনা করিলেও এই ধারণাই আরও বদ্ধমূল হয়। আমরা দেখিয়াছি বাংলা ভাষা শিক্ষা তাঁহাদের পরিবারে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তাহারই মধ্যে শুধু যে তিনি বাংলা শিখিলেন তাহা নহে, বাংলা ভাষাকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসিলেন এবং সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা সাহিত্যসেবাকে জীবনের অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

---

* রোকেয়া-জীবনী গত বৎসর বুলবুলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'সাহিত্যিক আর, এস, হোসায়ন' রোকেয়া-জীবনীর শেষ অধ্যায়।

আজকাল সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাইলে প্রায়ই মুসলমান লেখিকার নাম চোখে পড়ে। কিন্তু সে-যুগে প্রকাশ্যে কগজপত্রে লেখনা চালনা করা মুসলমান মহিলার পক্ষে যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ ছিল তাহা আজ কল্পনা করাও কঠিন। নিজের সাহিত্য-সাধনা আলোচনা করিতে গিয়া রোকেয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসা খানমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।" করিমুন্নেসা নিজেও সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। রোকেয়া লিখিয়াছেন ঃ 'করিমুন্নেসার রচিত কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজকাল দেখি লোক ভালরূপে বর্ণজ্ঞানের সহিত পরিচিত না হইয়াও ভাড়া করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজ নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালভদ্রে কোন রচনা বা পুস্তক বেনামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই— বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্‌সের মধ্যেই লুক্কাইত থাকিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি জোর করিয়া তাঁহার কয়েকটী কবিতা কোন সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম। তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে সাবের বংশের জনৈক কন্যা নাম দেওয়া হইয়াছিল; সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন "সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার। আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরো পাঠাইবেন।"

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে করিমুন্নেসার মৃত্যু হইলে রোকেয়া বলিয়াছিলেন "তাঁহার দেহত্যাগ অকাল মৃত্যু বলা যায় না বটে, তবু কিন্তু আমার মনে হয় তিনি আরো দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দিলে ভাল হইত। এখন আর আমার কিছুই ভাল লাগে না— মনে হয় লিখিলে আর কে পড়িবে।" রোকেয়ার স্বামী ছিলেন বিহারের অধিবাসী। যৌবনের প্রারম্ভে যখন মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন হতেই বিহারের গোঁড়া উর্দ্দুভাষী মুসলমান সমাজে তাঁহাকে বিচরণ করিতে হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পরও কলিকাতায় উর্দ্দু সমাজেই তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। তাহা সত্ত্বেও চিরকাল তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালী; বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার সত্যকারের প্রকাশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মনে হয় করিমুন্নেসার প্রভাব ইহার গোড়ায় অনেকখানি কাজ করিয়াছিল।

এক মহান্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া রোকেয়া কলম ধরিয়াছিলেন। চাঁদের জ্যোৎস্না, তারার দীপালী ও ফুলের সুবাসই তাঁহার সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপুল মমতাময় অন্তরে নিপীড়িত নারীত্বের যে করুণ ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাকেই সম্মুখে রাখিয়া তিনি সাহিত্যসেবায় অগ্রসর হইলেন। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধাতা তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই সাফল্যের চেষ্টায় তাঁহার বিপুল সাহিত্য- প্রতিভা নিয়োজিত হইল। বাস্তবিকই তাঁহার শক্তিশালী লেখনী যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এবং মুসলমান নারী সমাজের জাগরণ ও অগ্রগতি সহজতর ও দ্রুততর করিয়া দিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রোকেয়া জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই ঘাতপ্রতিঘাতময় কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবার বহু আগেই তাঁহার সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে নূতন ভাব, নূতন বেদনা, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে সঞ্চিত হইতেছিল। বিবাহিত জীবনের সুখময় অখণ্ড অবসরে সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাহারা প্রকাশের সুযোগ পায়।

মতিচুর প্রথম ও দ্বিতায় ভাগ, পদ্মরাগ, অবরোধ-বাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে তাঁহার জীবনের ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে। মতিচুর দ্বিতীয় খণ্ডের ডেলিসিয়া-হত্যা প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখিকা মেরী করেলির Murder of Delicia নামক উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। সুসভ্য স্বাধীন দেশেও নারী কত অসহায় এই গল্পে তাহারই নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—"আজ আমরা ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সামাজিক দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব—অবলা-পীড়নে কোন সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত, ইংরেজ রমণীর জীবন কিরূপ! আমরা মনে করি তাঁহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষ, সমাজে আদৃতা, —তাঁহাদের আরও কত কি সুখ-সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্ত্তি মানসনয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিলে সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর।"

অন্যত্র বলিয়াছেন, ''তালাক লইতে হইলে ডেলিসিয়াকে প্রমাণ করিতে হইবে স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। ডেলিসিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। হায়রে আইন! পুরুষরচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি। অবলা-হৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটী করা—তাহাকে জীবন্ত হত্যা করা আইন অনুসারে অত্যাচার নয়। কাহাকেও শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন জখম করিলে অপরাধীর শাস্তি আছে। কিন্তু রমণীহৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে, রমণীপ্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে, কোন দণ্ড নাই।''

'মুক্তিফল' প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন নারীর সহায়তা না হইলে একা পুরুষের প্রচেষ্টায় দেশজননীর স্বাধীনতা অসম্ভব।

'অবরোধবাসিনী'তে বাংলা ও বিহার অঞ্চলের সত্যিকার অবরোধবাসিনীদের জীবনের অশ্রুকরুণ চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভূমিকায় আবদুল করীম সাহেব বলিতেছেন—অবরোধবাসিনী লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেকপ্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আর কেহ লিখেন নাই। অবরোধবাসিনী প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে রোকেয়া একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন অবরোধবাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় এতই আজগুবি যে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমি নিজে জানি যে ইহার একটী অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।''

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীর মুক্তির অন্যতম উপায়, পদ্মরাগ উপন্যাসের আগাগোড়া এই কথাটাই পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই তারিণী ভবনে বহু উৎপীড়িত নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে জীবনের সাফল্য খুঁজিয়া পাইয়াছে। পদ্মরাগের নায়িকা সিদ্দিকা বলিতেছে — আমি আজীবন নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার-ধর্ম্মই জীবনের সার মর্ম্ম নহে। তারিণী ভবনের পরিকল্পনার অন্তরালে তাঁহারই কর্ম্মজীবনের বিষাদ-তিক্ত অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোকেয়ার সাহিত্যের বিশেষত্ব তাঁহার সহজ, সরস, তীক্ষ্ণ, জোরালো ভাষা। সে-যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ সরল, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতা ও সজীবতা পূর্ণ রচনাভঙ্গি আর কাহারও আছে কিনা বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ''বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য টাকা চাহিলেই শুনি মুসলমান বড় দরিদ্র—তাঁহাদের টাকা নাই। কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা ইসলামিয়া কলেজে হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ত মানিতেন, তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।'' এইরূপ অকাট্য যুক্তি দ্বারা তিনি সকল সময়েই তাঁহার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতের মধ্যেও নির্ম্মমতার পরিবর্ত্তে তাঁহার দরদী মনটীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যাইত। যাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোশা উত্তোলিত হইত, তাঁহাদের পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা সহজ হইত না; এইজন্যই আঘাতের পরিবর্ত্তে তাঁহার উপর বর্ষিত হইত তীব্রতর আঘাত। তিনি বলিয়াছেন—''আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর, সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগর তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইয়াছি।'' কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার লেখা সকল শ্রেণীর পাঠকের চিত্তে যে আক্রোশ জাগাইত এমন কথা বলা যায় না। তাঁহার দেওয়া আঘাত হৃদয়বান ব্যক্তির মনে চিরকাল ফুল হইয়াই ফুটিয়া উঠিত।

শুধু বাংলা নয়, ইংরাজী ভাষায়ও রোকেয়া অবাধে লেখনী চালনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। তাঁহার পড়িবার ঘরে আলমারীর মধ্যে একটী রূপার সুন্দর শামাদানি দেখিতে পাইতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি সেই জিনিষটির ইতিহাস বলিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র জিনিষটি বহুকাল আগের একটী ছোট ঘটনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল। একবার কলিকাতার ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ, হলে (Y.W.C.A. Hall) একটী কবিতা- প্রতিযোগিতা হয়। মিস কর্ণেলিয়া সোরাবজীর একান্ত অনুরোধে রোকেয়া সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে Y.W.C.A. হলে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন

প্রতিযোগী মহিলারা প্রায় সকলেই ইউরোপীয়। দুই একজন বাঙালী যাঁহারা আছেন তাঁহারা শিক্ষিতা,— বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারিণী। একেই ভয়ে ভয়ে গিয়াছিলেন; গতিক দেখিয়া তাঁহার মন আরও দমিয়া গেল। হাতের মুঠার মধ্যে ছোট এক টুকরা কাগজে তিনি নিজের কবিতাটা সসঙ্কোচে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির করিতে সাহস হইতেছিল না। পরে যখন প্রতিযোগিতার ফল বাহির হইল, জানা গেল যে তিনিই প্রথম হইয়াছেন—আর সেই শামাদানিটি তাহারই পুরস্কার।

রোকেয়ার Sultana's dream (সুলতানার স্বপ্ন) একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তক। তিনি বলিয়াছেন—"সে বহুদিনের কথা (১৯০৫ খৃঃ)। আমরা তখন ভাগলপুরের বাঁকা নামক সাবডিবসনে ছিলাম। আমার পূজনীয় স্বামী 'টুর'-এ গিয়াছিলেন; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুই তিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুই দিন আমি কি করিতেছিলাম। তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, "Sultana's Dream" দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"A terrible revenge!" (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময় লেখাটা মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরত আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেই সঙ্গে ডিপুটী সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality : and they are written in perfect English, * * * I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious. ভাবার্থ—"ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং অপূর্ব্ব। রচনার ইংরাজীও নিখুঁত।''' আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ু পথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারই আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা অতি মনোরম।"

বাস্তবিকই 'সুলতানার স্বপ্নে' তিনি এক অতি উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত নারীরাজত্ব। পুরুষ সেখানে পর্দ্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ চালাইতেছেন। দুনিয়ার যত পাপ তাপ যুদ্ধবিগ্রহ সব কিছুর জন্য তিনি দায়ী করিয়াছেন পুরুষকে। তাঁর কল্পিত নারীস্থানে—পুরুষ যেখানে অবরোধরুদ্ধ, সেখানে চারিদিকে খালি শান্তি আর শান্তি। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হইতে হয়ত বহুদিন লাগিবে। হয়ত বা এই স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র স্বপ্ন হইতেই মানুষ বহু বহু কাল পরেও এক নিমেষেই বুঝিতে পারিবে তাঁর নারীত্বের আদর্শ কত উঁচু ছিল—নারীর শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস কত পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল। তাঁর এই স্বপ্ন হইতেই যুগে যুগে বাঙ্গলার নারী অনুপ্রেরণা পাইবে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই যুগে যুগে তারা উন্নতির পথে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি ঃ আর. এস. হোসায়ন আর নাই তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

ইক্‌বাল

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

কবি ও দার্শনিক ইক্‌বালের সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে গেলে স্বতঃই বড়ো সঙ্কোচ বোধ হয়; কেননা তাঁর প্রতিভা ও দার্শনিক চিন্তার দান সম্পর্কে আমাদের জানা-শোনা সত্যিই খুব কম।

অবশ্যি এ আমাদের নতশিরে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর মতো অতো বড়ো শক্তিমান প্রতিভার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটা খুবই দুঃখের বিষয়, এবং আমাদেরই খর্ব্বতার পরিচায়ক। তাঁকে আমাদের জান্‌তে চেষ্টা করা অত্যন্ত উচিৎ এবং হয়তো আমাদের মানসিক বিবৃদ্ধির জন্যে নিতান্ত প্রয়োজন।

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না—লোকে ব'লে থাকে। ইক্‌বাল সম্বন্ধে আমাদেরও কতকটা তাই হয়েছে। তাঁর কাব্য ও দর্শন সম্পর্কে আমাদের যৎসামান্য জ্ঞান তরজমার মারফতে হয়েছিল। তাঁর অজস্র প্রশংসা ভক্তদের কাছে শুন্‌বার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত ভারতবর্ষ যখন হায় হায় ক'রে উঠ্‌লো, লাহোরের আর্ত্তনাদ যখন এতো বড়ো দেশের সমগ্র অন্তরকে ব্যথিয়ে তুল্‌লো, আমরা বিস্মিত হলুম—অশ্রুভেজা চোখে সেই অন্তর্হিত বিরাট পুরুষটীর দিকে নতুন করে তাকিয়ে দেখলুম।

ইক্‌বাল কি ছিলেন? ইক্‌বাল ছিলেন একজন মহাকবি—শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী। শেষ জীবনের রচনায় তাঁর দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল।

সমস্ত বড়ো প্রতিভার সম্পর্কে একটা কথা এই বল্‌তে পারা যায় যে, তাঁরা যেমন আপন আপন পরিবেষ সৃষ্টি ক'রে নেন তেমনি তাঁরাও আবার এক একটা বিশেষ স্থানিক ও কালিক পরিবেশের সন্তান। এর মানে অবশ্যি এ নয় যে, তাঁদের কাছ থেকে চিরদিনের আনন্দ ও চিন্তার খোরাক মানুষ পায় না। বড়ো বড়ো প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই বরং এই যে, তাঁরা বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালের প্রয়োজনে এবং পরিবেষের চক্রান্তে সৃষ্ট হ'য়েও সমগ্র বিশ্বের জন্যে—অনাগত যুগের জন্য নিজেদের অম্লান রেখে যান।

ইক্‌বাল যে-যুগে জন্মেছিলেন, সে এদেশবাসী মুস্‌লিমের নবজারণের যুগ। রাজমহিমার আশ্চর্য্য সম্পদ ও শক্তি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে মুসলিম ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন হয়ে পথের ধূলায় পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের বিফলতায় তার ক্ষতবিক্ষত দেহ মুমূর্ষু মনকে বহন ক'রে যেন অনিবার্য্য মৃত্যুর অপেক্ষাই করছিল। এমন সময় এলেন সৈয়দ আহ্‌মদ, মুস্‌লিমের নবজীবনদাতা স্যার সৈয়দ আহমদ। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় মুস্‌লিম ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করতে লাগলো; পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে দিলে।

এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল তা ফলতে দেরী হলো না। পুরাতনের প্রাচীর ভেঙে মুস্‌লিম নতুননের সাধক হ'য়ে দাঁড়ালো। অন্ধ মোল্লারা প্রাচীন সংস্কারের শিকল দিয়ে তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছিলেন; তাকে অবহেলে ছিন্ন ক'রে মুক্ত মনের মাধুরীতে সে মশগুল হ'য়ে পড়লো। অতীতের উর্দু পারসী কবিদের পুরাতন গান—সেই ইশ্‌ক্ ও শরাবের মত্ততা আর তার ভালো লাগে না। ইন্‌শা, দর্দ্ বা গালিবের চাইতে শেক্‌স্‌পিয়র, বায়রন্, টেনিসন তাকে বেশ ক'রে টান্‌তে থাকে। মুক্তি ও স্বাধীনতার নবনীতির ভিত্তিতে সমাজ নতুন করে গ'ড়ে উঠ্‌তে চায়। সবখানেই মুক্তির হাওয়া, সবখানেই পুরাতনের বিরুদ্ধে নিষ্করুণ বিদ্রোহ, চারিদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি নব অনুরাগের অসীম আসক্তি। ইয়োরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং ঐ মহাদেশের লোকদের অভ্যুদয় মুস্‌লিমকে চমকিত ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তি তার শিথিল হয়েছে। স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তনায় সবকিছুর পশ্চাতে কারণ খুঁজতে সে ব্যস্ত। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম—কিছুরই এই মনোভাবের দণ্ড থেকে রেহাই নেই।

পুরাতন চিন্তার সঙ্গে এই নব মনোভাবের সংঘর্ষের ফলে একটা বুদ্ধির জন্ম হ'লো। পাশ্চাত্য আদর্শ মানুষের মনকে টানছে, কিন্তু তার প্রভাব সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ পাশ্চাত্যের চিন্তা ও কর্ম্মের নির্বিচার অনুকরণ এনে দিচ্ছে, কিন্তু নতুন সমাজের স্থায়ী ভিত্তি কিছু গড়ে তুলছে না। চিত্ত প্রলুব্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে চালাচ্ছে আনকোরা জড়বাদের দিকে। সবখানেই দেখা যাচ্ছে মর্মহীন ভিত্তিহীন জড়বাদের দিকে প্রবণতা। পুরাতনের প্রতি বিদ্রোহ মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন একটা অনন্ত 'না'র দিকে; সে কোন্ মাটীকে আশ্রয় ক'রে এগোবে, সে খেয়ালই তার নেই। পুরাতনের কিনারে নবীন ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে এই যে একটা বুদ্ধি জন্মলাভ করলো, হালী ও আকবর হ'লেন তারই কাব্যদূত।

এঁরা ভারতের - মুস্‌লিমের জাগরণকে শ্রদ্ধা দিলেন, সহানুভূতি দিলেন, কিন্তু এর ফলে জড়বাদের দিকে যে অনুগতি দেখা দিচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এঁরা বল্‌লেন ধর্ম্মকে ছেড়ে প্রগতি অসম্ভব।

এই যে বাণী এঁরা প্রচার করলেন, এরই মনোমার্গ অবলম্বন ক'রে হ'লো ইক্‌বাল প্রতিভার আবির্ভাব।

ইক্‌বালের জন্ম হয় সিয়ালকোটে—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের এক পুরাতন বংশে। এই বংশের লোকরা এখানে কাশ্মীরে বাস করেছেন; এঁদের পারিবারিক উপাধি হ'লো সাপ্রু। ইক্‌বালের পূর্ব্বপুরুষরা প্রায় দু'শো বছর আগে ইস্‌লাম গ্রহণ করেন একজন দরবেশের চরিত-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হ'য়ে। সুফী মতবাদের প্রতি এই পুরাতন আকর্ষণ শেষ পর্য্যন্ত ইক্‌বালের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। তাঁর গভীর জীবন-দর্শন যেন এর থেকেই প্রেরণা লাভ করেছিল।

শৈশবে তাঁকে মক্‌তবে পাঠানো হয়; এখান থেকে তিনি পড়্‌তে যান স্কুলে। পঞ্চমমান থেকে বৃত্তি পেয়ে পরে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্কচ্ মিশন কলেজে যোগদান করেন। এই সময়ে মৌলানা সৈয়দ মীর হাসানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মৌলানা ছিলেন তখনকার দিনের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। আরবী-পারসী ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ইক্‌বালের কাজে লেগেছিল। ইসলামী কৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রতি মৌলানার স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁর প্রীতিমধুর সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে বাসা বেঁধেছিল ইক্‌বালের চিত্তে। তিনি তাকে সাগ্রহে সানন্দে বরণ করেছিলেন—করতে পেরেছিলেন কেননা সুফীমতবাদের অচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। ইক্‌বালের দর্শনরূপায়িত ইস্‌লামী দৃষ্টি ও মনোভাবের মূল উৎস এইখানে।

সিয়ালকোটের স্কচ্ মিশন কলেজ থেকে ইক্‌বাল লাহোরের গবর্ণমেন্ট কলেজে পড়্‌তে যান এবং বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে বি-এ. পাশ করেন। এই সময় একটী মেডেলও তিনি পান।

সিয়ালকোটে মৌলানা মীর হাসানের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য্য যেমন ভাবী কবি ও দার্শনিক ইক্‌বালকে গ'ড়ে তুল্‌তে অনেকখানি সাহায্য করেছিল; তেম্‌নি লাহোরের একজন ইংরেজ অধ্যাপকের সুদৃষ্টি তাঁকে যথেষ্ট আশা দিয়েছিল, বিশ্বাস দিয়েছিল। মিঃ আর্ণল্‌ড্ আলীগড় কলেজে কাজ করছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লাহোর গবর্ণমেন্ট্ কলেজে তিনি আমন্ত্রিত হন। ইক্‌বালকে জানতে পেরেই তিনি বুঝেছিলেন যুবকটীর মধ্যে সোনা আছে। এই থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর তিনি বন্ধু হ'য়ে দাঁড়ালেন। ইক্‌বালকে কাছে পেলে তিনি আনন্দ বোধ করেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি খুশী হন। মিঃ আর্নল্‌ড্ বল্‌তেন ইক্‌বালের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ক'রে তিনি নিজেই লাভবান হয়েছেন।

এর পরে ইক্‌বাল এম্-এ. পাশ করেন। পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে মেডেল পান।

এম্-এ. পাশ ক'রে তিনি প্রথমে লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজের ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের লেক্‌চারার—এবং পরে লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজের ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদে বৃত হন। ইক্‌বালের জ্ঞান, যোগ্যতা, শালীনতা, মধুর আচরণ অধ্যাপক ছাত্র—সবারই প্রীতি অর্জ্জন করেছিল। মানুষের ভালোবাসা-মুগ্ধ দৃষ্টির নীচে বসে সাহিত্য-চর্চ্চায় সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানী ইক্‌বাল অন্তরের গহীন প্রদেশে যে বলিষ্ঠ প্রেরণা অনুভব করছিলেন, তার দুর্ব্বার গতিবেগে তিনি অধীর হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নিজের পাথেয় সঞ্চয় করবার জন্য ঘরের বাইরে বে'র হ'তে চাইলেন।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি কেম্‌ব্রিজে তিন বছর গবেষণা করেন। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনের উচ্চ উপাধি দেন।

পারসী দর্শন দিয়ে তিনি একখানি গবেষণামূলক বই লেখেন। জার্ম্মাণীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় এই বইয়ের জন্যে তাঁকে পি এইচ্-ডি উপাধি দেন। জার্ম্মাণী থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে তিনি লিঙ্কন্ ইন্ থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করেন। সোসিয়োলজি ও পলিটিক্স্ পড়বার জন্য তিনি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্ য়্যাণ্ড পোলিটিক্যাল্ সায়েনসেও কিছুদিন যোগ দিয়েছিলেন।

এতোদিনে ইক্‌বাল যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আর্নল্‌ডের স্থান অল্পদিনের জন্য তাঁকে দেওয়া হ'লো। আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপকের পদে তিনি কাজ করলেন।

ইক্‌বালের জীবনেতিহাসের আখ্যান হিসেবেই এই সব ঘটনার মূল নয়; তাঁর কাব্য সাধনা ও দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে এদের যোগও বেশ দেখবার মতো।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর যে-কটী লেখা বেরিয়েছিল, তাদের কথা বাদ দিলে ইক্‌বালের কাব্য-চর্চ্চাকে তিনটা যুগে ভাগ ক'রে দেখা চলে। প্রথম যুগ ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৫ পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় যুগ ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্য্যন্ত, এই সময়টা তিনি ইয়োরোপে ছিলেন। তৃতীয় যুগ ১৯০৮ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

প্রথম বয়সের কাব্য-রচনায় তিনি মির্জা দাঘের সহায়তা পেয়েছিলেন। ইক্‌বালের কবিতার দু'একটী ত্রুটী দাঘ্ সংশোধন করে দিতেন। ইক্‌বাল ও দাঘের মধ্যে প্রায়ই চিঠির আদান-প্রদান হতো। তথাপি অনেকে মনে করেন; ইক্‌বালের উপর দাঘের প্রভাব খুব বেশী পড়েনি। তার চাইতে বরং গালিবের প্রভাব তাঁর উপরে কিছুটা দেখা যায়। তাঁর কাব্যের প্রকাশ ভঙ্গিমা খানিক গালিবের অনুসৃতি।

এ যুগটা ছিল মুশা'য়েরার। মুশা'য়েরা কবিদের সম্মিলনী। এই মজলিসে কাব্যে যাঁর যা ভালো রচনা, তাই নিয়ে কবিরা মিলিত হন। ইক্‌বাল প্রায়ই এই সব মজলিসে যোগ দিতেন। এখান থেকেই দাঘ বুঝতে পারেন যে, এই তরুণ কবিটীর মধ্যে একটা বিশাল প্রতিভা লুকিয়ে আছে। লাহোরের মুশা'য়েরাতে ইক্‌বালের খুবই আদর হয়েছিল। কিন্তু মুশা'য়েরার রচনা দিয়ে ইক্‌বালের বিচার করতে যাওয়া ভুল। কেননা তাঁর খ্যাতি এর চাইতে ঢের বড়ো প্রকাশ-সম্ভাবনার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্র 'মাখ্‌জান'-এ ইক্‌বালের কবিতা সর্ব্বপ্রথম ছাপা হয়। ইক্‌বাল ছিলেন ভারি লাজুক; নিজের লেখা কাগজে ছাপ্‌তে দিতে তিনি খুবই সঙ্কোচ বোধ করতেন। 'মাখ্‌জান'-এর সম্পাদক তরুণ কবিকে অনেক ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, বল ভরসা দিয়ে কাগজের প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'হিমালা' কবিতাটী ছাপেন। এটা ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসের কথা। এর পর 'মাখজান'-এর প্রতি সংখ্যাতেই ইক্‌বালের এক একটী কবিতা বের হ'তে লাগলো। যতোদিন না ইক্‌বাল ইংল্যাণ্ডে গেলেন, ততোদিন কোনো সংখ্যাতেই ফাঁক যায় নি।

এই সময় থেকেই ইক্‌বালের কাব্যযশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো। সবখানেই তাঁর জন্যে ভক্তদের বিস্ময় মুগ্ধ আমন্ত্রণ জেগে উঠ্‌লো।

ইক্‌বালের লিখিত প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে 'হিমালা' (হিমালয় পর্বত), 'গুল্-ই-রঙ্গীন' (রঙ্গীন ফুল), 'পরিন্দে কি ফরিয়াদ্' (বিহগের কাঁদন), 'শামা ও পরওয়ানা' (প্রদীপ ও পতঙ্গ), 'এক আরজু' (একটা অভিলাষ), 'তারানা-ই-হিন্দ' (ভারত সঙ্গীত) 'চান্দ্' (চাঁদ), 'কিনারী রবী' (রবীতীরে) প্রভৃতি প্রধান। এ সব কবিতাই উর্দুতে লেখা। এদের ভাষা, কল্পনা এবং রচনা-ভঙ্গি কাব্যামোদীদের উপভোগের বস্তু! ইক্‌বাল তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হালির কল্পনা-সৌন্দর্য্য এবং মনোরম রচনা-নৈপুণ্যকে ছাড়িয়ে ঢের উপরে উঠেছেন এই সব রচনায়। ভাষা এদের কঠিন নয়; কিন্তু একটী সহজ লালিত্যের সৌন্দর্য্য এগুলোকে একেবারে অপূর্ব্ব করে তুলেছে।

ওগো প্রদীপ! পতঙ্গ কেন তোমায় ভালোবাসে
এবং তার অধীর জীবন বিসর্জ্জন দেয়;
তোমার মোহিনী মায়া তাকে চঞ্চল ক'রে
রাখে পারদের মতো,
প্রেমের এ কী রীতি তুমি তাকে শিখিয়েছ!
মরণের বুকে ঢ'লে প'ড়ে খোঁজে সে শান্তি,

তোমার আলোক-শিখায় কী অনন্ত জীবন
রেখেছে তার জন্যে?
তার অন্তরের নিবিড় কামনা ঃ
সে তোমার সাম্‌নে লুণ্ঠিত হয়;
তার ছোট্ট বুকটাতেও প্রেমের অনল জ্বলে উঠেছে।
(শামা ও পর্‌ওয়ানা)

তোমায় শাখা থেকে ছিন্ন করা আমার রীতি নয়;
হায়! যারা বাইরের শোভাটুকু দেখে
তাদেরই এ কাজ।
আমার হাত দু'খানি অত্যাচারের জন্যে নয়,
বাগানের হৃদয়হীন মালী আমি নই,
বিজ্ঞানের সমস্যার জন্যে আমি পরওয়া করি না,
বুলবুলের নয়ন দিয়ে আমি তোমায় দেখি।
(গুল্-ই-রঙ্গীন)

আমিও (জীবনের) যে অর্থ খুঁজে ফির্‌ছি
তার সন্ধানী তুমিও (চাঁদ),
তোমার আলোক হ'লো জ্যোৎস্না,
আমার আলো প্রেম।
তোমার জগতে সুষমায় তোমার তুলনা নাই,
আর আমি এখানে একলা।
সূর্য্যের আলো আনে তোমার মরণ,
আর শাশ্বত সুন্দরকে দেখে
আমি হই জ্ঞানহারা
(চান্দ্)

(ওহে জ্ঞান!) জীবনের গূঢ়তত্ত্ব তুমি জানো,
কিন্তু আমি (প্রেম) নয়ন ভ'রে তাকে দেখি,
তোমার কাজ বাহিরকে নিয়ে।
কিন্তু অন্তর নিয়ে—গোপনকে নিয়ে
আমার কারবার;
জানাজানি তোমার থেকেই হয়,
কিন্তু খোদাপ্রেম আমার কাছ থেকেই আসে
তুমি খোদাকে খোঁজো,
কিন্তু স্রষ্টাকে প্রকাশ করি আমি।
(আক্‌ল্ আউর ইশ্‌ক্)

ইক্‌বালের কাব্যসাধনার প্রথম যুগের কবিতাগুলোর নাম এবং বিষয়বস্তু দেখ্‌লেই তার কল্পনার সৌন্দর্য্য অনুভব কর্‌তে পারা যায়।

তাঁর কবিতার দ্বিতীয় যুগ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ পর্য্যন্ত। এই সময়টা তিনি ইউরোপে কাটান। লণ্ডনে ইস্‌লাম সম্বন্ধে

তাঁর অনেকগুলো বক্তৃতা শুনে বোদ্ধা লোকেরা তাঁর গুণ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এই সময় ডক্টর নিকল্‌সনের সঙ্গে ও তাঁর পরিচয় হয়। পরে ইনিই ইক্‌বালের 'আস্‌রারী খুদী'র ইংরেজী তরজমা করেন; তর্জমাটী নাম দেন [illegible]

ইউরোপ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তার প্রভাব ইক্‌বালের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল। এ সময় তিনি যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অপূর্ব্ব কাব্যশক্তির সবল প্রেরণাও যেন তাঁকে উৎসাহ দেয় না; কবিতা তিনি আর লিখ্‌তে চান না। 'মাখ্‌জান' পত্রের সম্পাদক শেখ আবদুল কাদিরকেও তিনি তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা জানালেন। সম্পাদক সাহেবও তখন ইংল্যাণ্ডে। ব্যাপার দেখে তিনি বিস্মিত হন। এমন অপূর্ব্ব কাব্য-প্রতিভা যাঁর ভেতর স্ফূর্ত্তি লাভ করছে, তিনি কবিতা লিখ্‌বেন না! এ যে বিষম ক্ষতির কথা!

তাঁর বন্ধু ও অধ্যাপক আর্নল্‌ড্‌, এই কথা জানতে পেরে ইক্‌বালকে অনেক উপদেশ দেন, উৎসাহ দেন। তাঁরই অনুরোধে ইক্‌বাল আবার কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। আর্নল্‌ড্‌ সাহেব চেষ্টা না করলে ইক্‌বালের কাব্যসাধনার শেষ হয়তো এইখানেই হতো।

এই যুগে ফারসী ভাষার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা দেয়। ইক্‌বাল্‌ ফারসীর সম্পদ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সূফী-মতবাদসম্পর্কিত তাত্ত্বিক কবিতা সেই ভাষাতেই লিখ্‌তে থাকেন।

এ যুগে রচিত কবিতার মধ্যে 'মুহব্বত্‌' (প্রেম), 'হকিকত্‌ হুস্‌ন্‌' (সৌন্দর্য্যের সত্য বা তত্ত্ব), 'পায়াম্‌' (বাণী), 'কোশেশ্‌-ই-নাতামাম্‌' (অসিদ্ধ সাধনা), 'পায়াম্‌-ই-ইশ্‌ক্‌' (প্রেমের বাণী), গজ্‌লিয়াত্‌ (গজল সমূহ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সব কবিতার নামগুলো দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় যুগে ইক্‌বালের চিন্তা আগের চাইতে এগিয়ে গেছে তাত্ত্বিক রহস্যের দিকে।

ক্ষুদ্র তটিনী নদীকে কামনা করে,
আর নদী প্রাণপণে চায় গহীন সমুদ্রকে;
সাগর-তরঙ্গ কামনা করে চাঁদের আলো-কে।
খিজরের কাছ থেকে জীবন-রহস্যের খোঁজ নাও
—জীবনে সাধনায় সিদ্ধি কারুর এলো না।
(কোশশ্‌-ই-না-তামাম)

পাশ্চাত্য বাণী! খোদার দুনিয়াটা নিতান্ত দোকান নয়;
তুমি যাকে খাঁটী মুদ্রা ভাব্‌ছো
আসলে কিন্তু সে মেকি;
তোমার সভ্যতাই তোমার মৃত্যু এনে দেবে—
যে নীড় রচিত হয়েছে দুর্ব্বল শাখার
উপর, তার টিক্‌তে পারে না বেশী দিন।
(পায়াম্‌)

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ইক্‌বাল ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলেন অনেক কৃতিত্ব ও সম্মানের ফুলডালি নিয়ে। তখন তাঁর বয়স হবে ৩২। এরি মধ্যে তাঁর চিন্তায় যে উৎকর্ষ, কল্পনা শক্তিতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, যেভাবে তিনি পাশ্চাত্যের অনেক গুণীর কাছে সমাদৃত হয়েছেন, তাতে তাঁর এদেশী বন্ধুদের বুক ফুলে উঠেছে। তাই যুবক ইক্‌বালকে—সূফী কবি দার্শনিক-কবি ইক্‌বালকে তাঁরা অন্তরের সাদর সম্বর্দ্ধনা দিলেন। এদেশের চারিদিকে তাঁর নাম জেঁকে উঠ্‌লো।

এই থেকে ইক্‌বালের কাব্য-জীবনের তৃতীয় ও শেষ যুগ শুরু হলো। হালি এবং আকবর পাশ্চাত্য সভ্যতার দিক থেকে মুস্‌লিমের মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে ইসলামের প্রাচীন গুণ গরিমার দিকে, ইসলামের অন্তর্নিহিত গতি-ও- মুক্তিদায়িনী শক্তির দিকে নিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করেছিলেন। ইক্‌বাল এঁদের চাইতে ঢের বড়ো প্রতিভার অধিকার নিয়ে এদেরই মনকে আরো স্পষ্ট ক'রে—আরো শক্ত ক'রে—আরো সুন্দর ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। সূফী-মতবাদের বিশিষ্ট ভক্ত বংশে তাঁর জন্ম।

সূফী মন এক রকম উত্তরাধিকার হিসাবেই তাঁকে দাবী করতে পারতো এবং করেছিল। তাই তাঁর প্রথম যৌবনের ভাবোদ্বেল কল্পনা-সুন্দর রসপ্রসিক্ত রচনার মধ্যেও ঐদিকে তাঁর প্রবণতার আভাষ ফুটে উঠেছিল। তাঁর কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় স্তরে এই আভাষ একটু স্পষ্ট হয়। এ সময় তিনি পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হচ্ছেন। এই পরিচয় যখন নিবিড় হলো, তাঁর কাব্য-দর্শনের তৃতীয় স্তর দেখা দিলে। তিনি গভীর দার্শনিক চিন্তাকে তাঁর কাব্যের খোরাক্ করলেন।

এই যুগের তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো পারসী ভাষায়; কিন্তু ছোট ছোট অনেক কবিতা তিনি উর্দুতেও রচনা করেছিলেন। 'মজ্‌হাব' (ধর্ম্ম), 'কুফ্‌র্ ও ইস্‌লাম' (ইস্‌লাম ও বিধর্ম্ম), 'মুস্‌লিম আউর তালিমী জদীদ্' (মুস্‌লিম ও শিক্ষার নবধারা), 'খিজ্‌র-ই রাহ্' (পথ-প্রদর্শক), 'তুলু-ই-ইস্‌লাম' (ইসলামের অভ্যুদয়), 'শিক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব্-ই-শিক্‌ওয়া' (অভিযোগ ও অভিযোগের উত্তর), 'জওয়ানান্-ই-ইস্‌লাম' (তরুণ মুস্‌লিম), 'আসিরি' (দাসত্ব) প্রভৃতি এই সময়কার।

'শিক্‌ওয়া', 'জওয়াব্-ই-শিক্‌ওয়া' এবং 'খিজ্‌র-ই-রাহ্' —এই তিনটি কবিতায় ইক্‌বাল মুস্‌লিমের দুর্গতির জন্যে খোদাকে ডেকে তাঁরই নামে নালিশ করছেন এবং মুসলিমের পুনরভ্যুদয় কোন্ পথে, হবে, তার নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। এ সবের মধ্যে জীবন, প্রেম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাও কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

তোমার সেই পুরাতন অনুগ্রহ এখন
আর দেখা যায় না,
তোমার সেই পুরোণো ভালোবাসা যে
উঠে গেলো, এর কারণ কি?
পৃথিবীর সম্পদ কেন আজ মুসলিমের নেই,
—তোমার শক্তির তো সীমা নেই।
তোমার ইচ্ছায় মরুতে প্রবাহিনীর সৃষ্টি হয়—
মরীচিকা-মুগ্ধ পথিক যেন তৃষ্ণায়
জল পায়।
অন্যেরা আমাদের উপহাস করছে—
দুর্গতি ও নিঃসহায়তা আজ আমাদের!
তোমার নামে আমরা মৃত্যুবরণ করলুম,
তারই কি এই পুরস্কার?
(শিক্‌ওয়া)

আমরা অনুগ্রহ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কেউ তো
তা চাচ্ছে না;
পথ দেখিয়ে দিতেও আমরা চাই, কিন্তু
পথিক তো নেই;
সাধারণ শিক্ষা আছে; কিন্তু উপযুক্ত ধাতু নেই
(যা দিয়ে মাল তৈরী হতে পারে।)
খাঁটি মাটীই যাচ্ছে না পাওয়া, যা দিয়ে
যোগ্য আদম (মানুষ) তৈরী হতে পারে।
যদি কেউ সাধনা করে, তাকে আমরা
মহিমা দান করি।
যে খোঁজ করে, তাকে নতুন জগতের
সন্ধান দিই।

জাতির জন্ম ধর্ম্ম থেকে—
ধর্ম্ম নেই তো জাতিও নেই
আর যদি পরস্পরের প্রতি না রইলো প্রেম,
সংসারও তো রইলো না।
তারা (প্রাচীন মুসলিমরা) সম্মানিত হয়েছিল
কেন না তারা ছিল মুস্‌লিম,
তোমার মান হারিয়েছ কোর্‌আনকে
ছেড়ে দিয়ে।
(জওয়াব্‌-ই কিক্‌ওা)

ক্ষতির আশঙ্কা ও লাভের আকাঙ্ক্ষার
উর্দ্ধে হলো জীবন—
তোমার আজ বা তোমার কাল দিয়ে
তাব পরিমাপ ক'রো না;
কেন না সে অনন্ত, চির চলন্ত, চির নতুন;
জীবন্ত মানুষ হ'তে চাও তো
নিজের জগৎ নিজে তৈরী ক'রে নাও;
জীবনই মানুষের মূল তত্ত্ব
মাত্র এক রা'শ ধূলামাটী সঙ্গী তুমি,
কিছুই তো নও,
আর যদি হও পরিপূর্ণ মানুষ
তাহ'লে তুমি অব্যর্থ তলোয়ার।
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র স্বৈরাচারের
পুরোণো বাদ্যযন্ত্র
তার পর্দার পেছনে ধ্বণিত হচ্ছে
কাইজারের সঙ্গীত।
গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে এ (মানুষকে)
ক'রে ফেলে চূর্ণবিচূর্ণ,
তাকেই তুমি খাঁটি জিনিষ ভাব্‌ছো।
শান্তিসভার সভ্যদের জ্বালাময়ী বাকভূষা—
সে তো ধনীদের যুদ্ধোদ্যম (মাত্র)।
(খিজর্‌-ই-রাহ্‌)

ইক্‌বালের কাব্য-সাধনার তৃতীয় স্তরের সব-চাইতে প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে 'আস্‌রারী-খুদী'', 'রমুজ্‌-বিখুদী' এবং 'পায়াম্‌-ই-মাশ্‌রিকী'। এদের মধ্যে প্রথম দুটো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কেন না, এদের বিষয়-বস্তু একই। ডক্টর নিকল্‌সন 'আল্‌রারী খুদী'র ইংরেজী তরজমা করেছেন Secrets of Self (আত্মার রহস্য) নাম দিয়ে। এই কবিতাটী এমন একটী জিনিষ যাতে সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্ব-কালের মানুষের জন্যে এক গভীর গম্ভীর আনন্দ বাণী সঞ্চিত রয়েছে।

স্যর জুলফিকার আলী খান এই কবিতাটীর সম্বন্ধে লিখেছেন : "চরিত্রগঠনের একটা নতুন পথ এতে দেখানো হয়েছে। এমন দর্শন এতে রয়েছে যা বিভ্রান্ত জগতের মুক্তিদাতাদের জন্ম দেবে। কী শক্তি এবং কাব্যরসই না এতে এসে এক সঙ্গে

মিলেছে! এমন আগুন ও তেজোদৃপ্তি এতে রয়েছে, যা আত্মাকে একেবারে অধীর ক'রে তোলে; চিন্তাকে নতুন পথে চালিয়ে দেয়। তুহিনাকীর্ণ সমুচ্চ গিরিশিখরকে জয় করবার জন্যে অবসন্ন ইচ্ছাশক্তিকে এ আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে। এই কবিতায় মনোরম রচনাভঙ্গিতে মানুষ, মানুষের জীবন, এবং কি ক'রে সে নব সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে—এ সমস্ত সমস্যারই আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা হজরতের শিক্ষাকে অবলম্বন করে বলিষ্ঠ কিন্তু সহজ সরল জীবন যাপন করতেন; এই জীবনে (একালের মুসলিমকে) ফিরে যেতে বলা হয়েছে।''

মানুষের ভেতরে যে শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, তাকে জাগাতে হবে: অনন্ত বেদনার মধ্য দিয়ে নিজের ভাস্বর প্রভুত্বগরীয়ান ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করতে হবে—ইক্‌বালের এই বাণী।

দীপশিখায় পুড়ে মরাই পতঙ্গের ভাগ্য,
পতঙ্গের দাহনের সার্থকতা হলো বাতি।
আত্মার লেখনী আজ শত বর্ণে লিখ্‌লো,
আগামী একটীমাত্র দিনের উষাকে
ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে।
এরা শিখা শত ইব্রাহিমতে জ্বালালো—
একটী মোহাম্মদের চেরাগকে ধরানোর জন্য

আত্মাকে বিকশিত করবার জন্য সাধনার তিনটী দিক ইক্‌বাল দেখিয়েছেন ঃ (১) আনুগত্য, (২) আত্মসংযম এবং (৩) খোদার খেলাফৎ বা প্রতিনিধিত্ব Divine Vicegerency

ওরে বেখেয়াল, হুকুম আমিল করবার চেষ্টা কর,
মুক্তি আসে বাধ্যতার ভেতর দিয়েই!
আনুগত্য অপদার্থকেও যোগ্য করে।
অবাধ্যতা তার আগুনকে করে ফেলে ছাই।
গ্রহ সূর্য্যকে যে হাতের মুঠায় আন্‌তে চায়
তাকে নিয়মের বাঁধনে বন্দী হ'তে হবে।
গোলাপের খোশবু'তে বাতাস বন্দী,
কস্তুরীর সৌরভ বন্দী মৃগের নাভিতে।
তারকা তার লক্ষ্যের পথে চলেছে
একটী বিধানের কাছে মাথা নত ক'রে।
বারিবিন্দু মিলনের বিধানে সমুদ্র হয়েছে
বালুকণারা হয়েছে সাহারা।
বিধান কঠোর ব'লে অভিযোগ করো না,
মোহাম্মদের পথকে অতিক্রম করো না।

সাধনার আর একটি দিক হল আত্মসংযম।

যে নিজেকে শাসন করতে পারে না
তাকে অন্যের শাসনের বশীভূত হ'তে হয়।
''আল্লা ছাড়া কেউ উপাস্য নেই''
(লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্)

—এই বাণীকে আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌বে যতোদিন
সমস্ত ভয় তোমার ভেঙে যাবে।
যার কাছে খোদা তার নিজের
আত্মার মতো,
অহঙ্কারেব বশীভূত সে হয় না।
ধর্ম্মের স্বীকারোক্তি হ'লো খোলস,
উপাসনা (ভিতরকার) মুক্তার মতো।

কঠিন নির্মুক্তি সাধনায় জয়ী হ'য়ে মানুষ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হলে আল্লার প্রতিনিধিত্ব কর্‌বার অধিকার তার লাভ হয়। আল্লা কোর্‌আনে মানুষকে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি নাম দিয়েছেন। সত্যিই যখন মানুষ খোদার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়, তখন—

সে খোদারই জন্যে ঘুমায়
খোদারই জন্যে জাগে;
বার্দ্ধক্যকে সে যৌবনের সঙ্গীত শোনায়;
জগতের সব-কিছুকে সে যৌবনের
দীপ্তিতে ভ'রে তোলে।
মানবের জন্যে সে আনে আনন্দ-সংবাদ
আর আনে সাবধান-বাণী।
সে জীবনের নতুন ব্যাখ্যা দ্যায়,
এই স্বপ্নের নতুন অর্থ বের করে।
তার গোপন অস্তিত্ব হয় জীবনের রহস্য,
জীবন-বীণার এক অশ্রুত সঙ্গীত।

আত্মা স্বর্গীয় বস্তু। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান একে একটা যন্ত্রের মতো ভাবে, দৈনন্দিনচক্রের অধীন করে রাখ্‌তে চায়; ইক্‌বালের মতে এ ঠিক নয়। তিনি বলেন—ইস্‌লাম মানুষকে সৃষ্টির অধিপতি করতে চায়; এবং যতোক্ষণ সে আত্মার গোপন তত্ত্বের অধিকারী না হয়, ততোক্ষণ এই আধিপত্য তার লাভ হয় না।

এই জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যাতারূপেই ইক্‌বাল পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

তাঁর 'পায়াম-ই-মাশরিক্' (প্রাচ্যের বাণী) জার্ম্মাণ কবি গ্যেটের স্টাইলে লেখা। মোটামুটী তিন ভাগে একে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগ রুবাইয়াত্। জীবনের নানা সমস্যা —যেমন, অনন্তত্ব, খোদার আত্মপ্রকাশ, কামনা, জগতের উপর কামনার প্রভাব, প্রেম ও জ্ঞান এবং মানুষের উপর এদের প্রভাব, পরিবর্ত্তন, জড়বাদ—এই সব ব্যাপার নিয়েই তাঁর রুবাইয়াত্ রচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে জীবন, কর্ম, ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞান, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইভাবে ইয়োরোপের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি—যেমন, শপেনহর, নিট্‌শে, হেগেল, বার্গ্‌স, গ্যেটে, টলষ্টয়, কর্ল্ মার্কস্—এঁদের সম্বন্ধেও কয়েকটী সুন্দর কবিতা ইক্‌বাল লিখেছেন। বইখানির শেষভাগে রয়েছে ইক্‌বালের গজল। এগুলো সা'দী, নাজিরী, উরফী, গালিব—এই সব কবিশ্রেষ্ঠদের রচনাভঙ্গির অনুসরণে লিখিত।

তাঁর 'পায়াম্-ই-মাশ্‌রিকী'র রুবাইয়াতের গোড়াতেই ইক্‌বাল প্রেমের গুণগান করেছেন।

আমার ভেতরকার উদগ্র কামনা আমার অন্তরে
আলো জ্বেলেছে, চোখে দীপ্তি দিয়েছে,
তারা দেখ্‌ছে—পৃথিবী রক্ত-অশ্রুতে
ভ'রে উঠেছে।

জীবনের গহীন তত্ত্ব সে জানে না
যে প্রেমের মধ্যে দেখে পীড়িত মন।
প্রেমই মরুকে রম্য কাননে
পরিণত করে;
প্রেমই ফুলকে দ্যায় তার মিষ্টি সুবাস।
সাগরের গহীনবুকে সে দীপ্ত রশ্মিপাত করে,
তা থেকে মৎস্য পায় পথের সন্ধানী আলো।
প্রেম কোমল ফুলদলে এনে দ্যায়
রাঙিমার লাজ-আবরণ;
আর দেখ, উচ্ছৃঙ্খল উদ্বেগে ভরা
আমাদের জীবন!
প্রেমের সম্পদ সকলের লাভ হয় না,
সকলের ও ভালোও লাগে না। যে হৃদয়
কামনায় জ্বলেছে—সবাইকে দাগিয়েছে,
প্রেমের জন্ম সেখানেই, বাদাখ্‌শানের
অগ্নিহীন পাথরে ও জন্মে না।
যে মানুষ নিজে রহস্য হ'য়েও সেই রহস্য
উদ্‌ঘাটন করেছে
প্রেমের মধুর গান তারই তৈরী।

মোটকথা ইয়োরোপের জড়বাদিতা দেখে ইক্‌বাল অনেক দুঃখ করেছেন, কেননা তাতে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নেই যা ধর্ম্ম এবং খোদাপ্রেম থেকে জন্মে।

একবাব তিনি বলেছিলেন ঃ "আমার আশঙ্কা হয় কোনো দর্শন আমার শিক্ষা দেবার নেই। বস্তুতঃ বিভিন্নরকমের দর্শনকে আমি ঘৃণাই ক'রে থাকি, দর্শনের মূলনীতি বা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে আমার ভরসা হয় না। মানুষের বুদ্ধিকে অর্থাৎ ধর্মের চরম বাস্তবতাব বিচারে প্রযুক্ত বুদ্ধিকে আমি যতো নিন্দা করেছি আর কেউই ততোটা করেনি। অবশ্যি দার্শনিকরা যাতে রস পায় এমন অনেক ব্যাপারের কথা আমি বলেছি। কিন্তু আমার কাছে সে সমস্ত হ'লো জলজ্যান্ত অভিজ্ঞতার বিষয়, দার্শনিক যুক্তিব বিষয় নয়।"

ইক্‌বালের রচনা মূল উর্দু ও পারসী ভাষায় যাঁরা পড়েছেন এবং প'ড়ে তার রস গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাঁরা কবির অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষা ও রচনাভঙ্গির অজস্র প্রশংসা ক'রে থাকেন। এবং আমরা—যারা অনুবাদ পড়েই সন্তুষ্ট হ'তে বাধ্য—একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, যাঁব কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাষা, কল্পনা এমন সুন্দর, এত মনোরম, তাঁর মূল রচনা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া আর কারুর কলম থেকে বেরুতে পারে না!

বস্তুতঃ এতে সন্দেহ নেই যে, যদিও ইক্‌বালকে প্রধানতঃ একটী জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক ব'লেই মনে হয়, তথাপি তাঁর সেই দর্শন এমন কাব্যকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত, যার ভাণ্ডারে মানুষের জন্যে অফুরন্ত রসসম্পদ এবং অপূর্ব্ব আনন্দমাধুরী সঞ্চিত রয়েছে।*

*এই লেখাটীতে ইক্‌বালের বিভিন্ন কবিতা থেকে যে-সব মর্ম্মানুবাদ দেয়া হলো, সেগুলো মূল কবিতার ঠিক লাইনের পর লাইনের অনুবাদ নয়: চিন্তার ঐক্য দেখে এখান সেখান থেকে নে'য়া।

কবিবর সার মোহাম্মদ ইক্‌বাল

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

এ যুগের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বার বার ইউরোপীয় কবিদের নামোল্লেখ করা হয়। এযুগ ঠিক কবিতার যুগ নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয় ও বস্তু বিশ্লেষণ করে' ক্লান্ত হচ্ছে না। কাজেই ভাবের বিশ্লেষণ বা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেছে যন্ত্রজগতের নিষ্পেষণে। ঘটনার পর ঘটনা চলে যাচ্ছে—অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, স্বার্থের সংঘর্ষ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—এসব যেন মানুষের সৃষ্টি হলেও মানুষকে ছোট করে' ফেলেছে।

নির্ম্মম দুনিয়া তাই ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে আজ বড় করে তুলতে চায় না। হাজার হাজার লোক যন্ত্রের চালনে বড় বড় কলকারখানার দাসত্ব করছে শান্তির সময়—আবার যুদ্ধবিগ্রহের সময় পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মরছে—ধনী ব্যবসায়ীর কূটচালে ও উপরিওয়ালার যান্ত্রিক হুকুমে। এই হল আধুনিক দুনিয়া! এর ভিতর প্রেমের বা ঘৃণার কারুণ্যের বা ঈর্ষার বহুমুখী রসচর্চ্চা একটা পরম অলীক ও তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগ জ্ঞানবাদী ও বুদ্ধিবাদী। সব কিছুরই হিসেব নিকেশ, চুলচেরা পরিমাপ না হলে এযুগ ক্লান্ত হয় না। এ যুগের সাধনা সমগ্র জগৎকে একটা [illegible] এ পরিণত করা—তার ভিতর কোন স্বপ্ন ও অজানা প্রেরণা যেন না থাকে। এরূপ অবস্থায় কাব্য কবিতার রসজ্ঞ কি করে প্রতিষ্ঠা পায়?

ইউরোপের এই জ্ঞানবাদ কাব্যচর্চ্চাকে বার বার নিস্তব্ধ করে তুলছে। এজন্য নতুন রস অপেক্ষা ভঙ্গীসৃষ্টি করতেই সেখানকার কবিরা উৎসুক। এজন্যই Andrew Lang বলেছিলেন "Our new poets last but three months" এদেশে ভাবের এতটা বিপর্যয় হয়নি— জীবন ও ধ্যানধারণা সেবা ও সাধনার রসগমকে পূর্ণ হয়ে আছে। এজন্য ভারতীয় কবিদের কাব্যে একটা সরল ও অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন আছে যা' বৈজ্ঞানিক বিকারে শীর্ণ হয়নি।

এজন্য মহাকবি মোহাম্মদ ইক্‌বাল যখন ইউরোপ যাত্রার সময় প্রাচীন ইসলামভূমির দুর্দশা দেখে' কবিতা রচনা করেন তখন তা হয়েছে একটা জীবন্ত ব্যাপার। কবির অশ্রুপাত যেন সমগ্র প্রাচীন আরব সভ্যতাকে আবার ক্ষণকালের জন্য জাগ্রত করে তোলে।—

> "একসময় তুমি ছিলে সভ্যতার আদিভূমি!
> তোমার দৃষ্টির আগুণে জ্বলে উঠ্‌ত দুনিয়ার সৌন্দর্য্য
> তোমার ধ্বংসের গান আজ আমাকে গাইতে হচ্ছে
> এযন্ত্রণা আমাকে সইতে হবে ও অন্যকেও দিতে হবে!
> তোমার ধ্বংশের বুকে কি কথা লুকান আছে?
> তোমার নীরবতাও আজ যেন মুখর হয়েছে।"

এর ভিতর একটা সুস্পষ্ট আত্মনিবেদন ও ভাবোচ্ছাস সমগ্র প্রাদেশিকতা ও আধুনিক জাতীয়তার ভিত্তি ভেঙ্গে অগ্রসর হয়েছে আরণ্য নদীর মত। বস্তুতঃ প্রাচ্যকবি খণ্ডভাবে জগতকে দেখে না—ভারতবর্ষের কবির নিকট আরবপ্রদেশ পুণ্যভূমি—এই পুণ্যভূমির বন্দনার সহিত ভারতীয় জাতীয়তার কোন বিরোধ সম্ভব নয়।—

অথচ ইকবাল ভারতের জাতীয় মহাকবি। তিনি বার বার বলেছেন দুনিয়ার সব জায়গা অপেক্ষা হিন্দুস্থান আমার প্রিয়। ভারতে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলমান শাসন অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সব কিছু আবছায়ায় পরিণত হয়—ভাবের ও রূপসৃষ্টির সব কেন্দ্রই ভেঙ্গে পড়ে। ফলে নানা জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র সৃষ্ট হয়ে এদেশের প্রাচীন ধারার প্রবাহকে অতি সামান্য ভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

কিন্তু তবুও এল একটা বিরাট অন্ধকার যুগ। এই যুগের ইতিহাস নেই, কোন আখ্যান নেই। সিপাহী বিদ্রোহ এই যুগের গুপ্ত ক্রন্দনকে একটা বিরাট বিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে' তোলে। এই বিস্ফোরণের ফলে আবার এল একটা এলোমেলো উন্মাদনা। নানা জায়গায় রক্তপাতের ভিতর দিয়ে আর একটা নবীনযুগের পত্তন হল অজানা ভবিষ্যতের অস্পষ্ট বুকে।

বাঙ্গলাদেশ এই নবীন যুগকে একটা সামঞ্জস্য দেওয়ার চেষ্টা করে রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়ে। ভারতের অন্যত্রও একটা নূতন বোঝাপড়ার চেষ্টা ও সূচনা হয়। মুসলমান সমাজ পরবর্ত্তী যুগে সার সৈয়দ আহমদের সাধনায় একটা সেতুবন্ধনের সূত্রপাত করে। মোহাম্মদ ইকবাল এই সেতুপথে অগ্রসর হয়ে আজ সমগ্র ভারতের চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ হয়েছেন।

মোগলাই নেশা ও শীলতা যা অনিবার্য্যভাবে রচনা করেছিল তা এ যুগের সহিত কোথাও খাপ খায় না। নব্যযুগের নব্য প্রয়োজন অনিবার্য্যভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। বহুকাল পরে ভারতীয় ইস্‌লাম এই প্রকাশ পথে সফল হয়ে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। গোড়াতে ভারতের প্রতি প্রীতি ছিল এই নূতন উপলব্ধির ভিত্তি। ইকবালের "নূতন অধ্যাত্মসৌধ" ও "সারা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" এই ব্যাপারের প্রমাণ। ভারতের নদনদী, শ্যামলপুলিন, পাহাড় পর্ব্বত—সব কিছুরই ইকবালের প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয় ছিল। এমনি করে' উর্দ্দু সাহিত্য আদিম মধ্যযুগের গণ্ডী অতিক্রম করে' বাঙ্গলাসাহিত্য অগ্রগতির সঙ্গে তাল রক্ষা করতে অগ্রসর হয়। ইকবালের—'বাঙ্গ-ই-দারা' তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্য—১৯২৪ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু ইকবাল উর্দ্দুরচনা করে তৃপ্ত হয়নি। উর্দ্দুর ভিতর দিয়ে বহু সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় ভাব দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। কোন বিচিত্র ও গভীর ভাব প্রকাশ করতে উর্দ্দু অভ্যস্ত নয়। এজন্য ভিন্নদেশীয় হলেও ইকবাল পারস্য ভাষার শরণাপন্ন হল।

যদিও হিন্দের ভাষা চিনির মত মধুর,
তবুও পারস্যভাষার ভঙ্গী মধুরতর!
মন আমার মুগ্ধ হয়েছে এ ভাষার সৌন্দর্য্যে
আমার ভাব অতি উচ্চ।
পারস্য ভাষাই এই ভাবের যথাযোগ্য বাহন!

এমনি করে ইকবাল বিচিত্র ও মহত জগতের উপলব্ধিকে কখনও উর্দ্দুতে কখনও পারস্যভাষায় প্রকাশ করে ধন্য হয়েছেন।

ইকবাল নব জাগরণের কবি। বর্ত্তমানের অধঃপতিত সমাজের ভিতর নূতন প্রেরণা সঞ্চারকরা—জীর্ণ প্রাচীনতার ভিতর শক্তির প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর ব্রত। এজন্য আদিম আরব্য সভ্যতার বলিষ্ঠ উগ্রতাকে তিনি আহ্বান করেন। ইউরোপের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাঁকে নিট্‌স্‌সের পক্ষপাতী করে' তোলে। নিট্‌স্‌সের অতিমানববাদ (Superman) ইউরোপে একটা প্রলয়ঙ্কর অস্থিরতার সূচনা করে। জগৎ দুর্ব্বলের জন্য নয়,—শক্তিমানের জন্য—এই হল এই তত্ত্বের মূল কথা। ইকবাল অধঃপতিত ও নির্ব্বাপিত ভারতের ইসলাম সমাজকে এমনি করে' জাগরণের মন্ত্রের দীক্ষিত করতে উৎসাহিত হন।

"বহুকাল তুমি রেশমের বিছানায় শুয়েছ
এখন কঠিন তুলোর উপর শুতে প্রস্তুত হও।"
মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করে' তিনি অনেক কথা বলেন ঃ—
"আমরা যারা ইস্‌লামের সিংহদ্বারে
পাহারা দি-ই।
হয়ে পড়েছি অবিশ্বাসী ইসলামের বাণীতে!
'সিরাজের মদিরার চক্র ভেঙ্গে গেছে
কাবা আমাদের মূর্ত্তিতে পূর্ণ হয়েছে!"

এমনি করে ইকবাল ধিক্কার দিয়েছেন শিথিল, কর্ত্তব্যবিমুখ সমাজকে। ধীরে ধীরে নব জাগরণের অগ্রদূতরূপে দীপশিখা হাতে করে' ভাবের এক নূতন চক্র রচনা করে' মহাকবি ধন্য হয়েছেন।

"ইসলামের পূর্ব্বগৌরব" নামক কবিতায় কবি সমগ্র ইসলাম সভ্যতা ও শীলতার উচ্ছ্বাসে ভরপুর হয়েছেন। বস্তুতঃ প্যানইসলামিক উচ্ছ্বাস কবিহৃদয়ে অনিবার্য্য হওয়া স্বাভাবিক। আরবভূমি ও ভারতের যোগাযোগ উভয়ের অকল্যাণজনক হওয়ার কোন কারণ নেই। আধুনিক জগতের যারা শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক— তারা এ দু'ভাগের লোক নয়। তারা বিরাট পাথরের মত যান্ত্রিক আধিপত্যে সকল দেশকেই অসহায় করে' তুলছে। দুর্ব্বলদের ভিতর সংহতি প্রয়োজন-- ভেদ নয়।

কাজেই ইকবালের শক্তিবাদ আত্মহত্যার পোষক হতে পারে না---আত্মপ্রতিষ্ঠারই নিয়ামক।

"উঠ, প্রাচ্যে উঠেছে অন্ধকার আকাশের সীমান্তে।
চল আমরা তা' দূর করি অগ্নিগানের সাহায্যে।
চল আমরা দুর্ব্বল শিশিরকণাকে জাগাই
এবং নদীতে পরিণত করি,
চল আমরা মোমবাতির মত বাঁচি
নিজেকে দান করে' কিন্তু সকলকে আলো দিয়ে।"

এই হল ইকবালের প্রাণের কথা। শুধু ভারতীয় কবির পক্ষেই এরূপ আত্মত্যাগের প্রশংসা সম্ভব।

ইকবাল মনে করেন জগতের প্রাণশক্তি প্রেমের। এই প্রেমের প্রেরণায় অনুপরমাণু, সূর্য্যচন্দ্র, পুষ্পমুকুল প্রভৃতি প্রাণবান হয়ে উঠে।

"সূর্য্য নক্ষত্র আন্দোলিত হল প্রেমের মহিমায়
মুকুল পেল রঙীন শোভা
ফুল ফুটল প্রেমের প্রেরণায়।"

কাজেই ইকবালের শক্তিবাদ ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠা চায় না--এদিক থেকে নিট্‌সসের সহিত এই মতবাদের বৈষম্যটা সুস্পষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রাচ্য কবি প্রেমের ভিতর দিয়ে—পাশ্চাত্য দার্শনিক ধ্বংসের ভিতর দিয়ে শক্তির বাণী প্রচার করতে উৎসাহিত।

ইকবাল আধুনিক কবি। প্রাচীন প্রাদেশিকতা, মধ্যযুগের অদ্ভুত ভঙ্গী ও আবেষ্টন হ'তে উদ্ধার করে' উর্দ্দু সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করে' কবি ধন্য হয়েছেন। উর্দ্দু সাহিত্যের গতিবেগ ও ধ্বনিমাধুর্য্য আছে --কিন্তু প্রাচীনতার আড়ষ্ট ভাবপুঞ্জ তা'কে পঙ্গু করে' রেখেছে। কবির হাতে এই অবস্থা থে'কে সে সাহিত্যের অনেকটা উদ্ধার হয়েছে। কবি একেবারে নিছক ইউরোপীয় বুলি বা ভঙ্গীর অবতারণা করে' এ সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননি। বুলবুল ও গোলাপ, এবং পারস্য সাহিত্যের অন্যান্য রূপকেলির ভিতর একটা নব্য মানবিকতাকে তিনি আহ্বান করেছেন। এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। একটা ধারার গোড়া কেটে অন্য একটা ধারা প্রবর্ত্তন করলে বিরাট সাহিত্যসমাজকে কক্ষচ্যুত করা হয়। সঙ্গীতের রাগরাগিণী বর্জ্জন করে নূতন একটা রীতি প্রবর্ত্তন করাতে যে বিপদ---সাহিত্যেও সে বিপদ আছে। কবিবর ইকবাল তার পাশ কাটিয়ে চলেছেন।

ভারতের মোগল চিত্রকলা যেমন একটা বিশিষ্ট শ্রীর অধিকারী—তেমনি উর্দ্দু সাহিত্যও একটা মহার্ঘ দান। এ সাহিত্যকে আরও পরিপুষ্টভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইকবাল যা' সূত্রপাত করেছেন আশা করি পরবর্ত্তী কবিরা তা আরও ব্যাপক ক'রে তুলবেন।

ইকবালের কাব্যসাধনা বিলাসিতা মাত্র ছিল না! শক্তিবাদের একটা বিশিষ্ট প্রেরণায় ভারতবর্ষকে উজ্জীবিত করা ছিল তা'র লক্ষ্য। সে বিষয়ে মহাকবি জয়যুক্ত হয়েছেন সন্দেহ নেই।

মনীষী ইকবাল

অধ্যাপক গোলাম মকসূদ হিলালী, এম-এ, বি-এল

আল্লামা সার মোহাম্মদ ইকবালের মৃত্যুতে জগতের জ্ঞান-গগন হইতে একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে; তাই শিক্ষিত মানব-সমাজ ইকবালকে হারাইয়া হাহাকার করিতেছে। জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহান ব্যক্তিরা বিশ্বজগতের, কোন বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডীতে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বহিতকর সাধনা তাঁহাদিগকে বিশ্বজগতের একজন করিয়া তোলে। ইকবাল দেশ ও সমাজের গণ্ডী এড়াইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুধী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই ইকবালের প্রয়াণে জাতি দেশ নির্ব্বিশেষে শোকের বন্যা বহিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডিত্য

মনীষী ইকবাল ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের কবিসমাজে তিনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত। প্রথম জীবনে তিনি স্বদেশে ইতিহাস, দর্শন, ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন। তৎপর বিলাত যাইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক রূপে কাজ করিয়াছিলেন। পারস্য দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি মুনিখ (Munich) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানাচার্য্য (Ph.D) উপাধি লাভ করেন। তিনি উর্দ্দু ও পারসীতে অসাধারণ নিপুণতার সহিত গভীর ভাবাত্মক কবিতা লিখিয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মচিন্তা আত্মপ্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারের জয় ঘোষণা করিতেছে।

বাণী

মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ইকবাল যখন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা শিক্ষা, অর্থ, নৈতিক-চরিত্র সব দিকেই পশ্চাৎপদ, তখন তাঁহার হৃদয় মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি এই অধঃপতনের কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মুসলমান নামে মাত্র মুসলমান রহিয়াছে; প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মত ইহাদের সে জ্বলন্ত অকৃত্রিম বিশ্বাস নাই, সে কর্ম্ম-প্রেরণা নাই। নানা দিক হইতে অন্-ইসলামী ভাব আসিয়া মুসলমানকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে—মুসলমানদের ভিতরে ঢুকিয়াছে ভেদনীতি, জন্মজনিত পার্থক্য, বংশগত পার্থক্য—তাই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিশ্বগ্রাসী শক্তির মূল প্রস্রবণ একতা ও সাম্য বর্ত্তমান যুগের মুসলমানেরা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুফীবাদের ভিতরে গ্রীক, পারসিক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সন্ন্যাস-মত-জাত চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হইয়া ইসলামের অন্তর্নিহিত কর্ম্মপ্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অলসতা কর্ম্মকুণ্ঠতা ও অদৃষ্টবাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। ইকবাল এই সমস্ত ব্যাধির ঔষধ দেখিতে পাইলেন প্রকৃত ইসলামের সরল ও শাশ্বত শিক্ষায়। তিনি বজ্রকঠোর ও মেঘগম্ভীর ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া করিলেন, "হে মুসলমান, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করিতেছে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার উপর। তিনি বলিলেন,

সবক ফির পর আদালৎ কা শজা' অৎ কা সদাকৎ কা,
লিয়া জায়েগা তুঝছে কাম দুনয়াকী ইমামৎ কা।

অর্থাৎ—(হে মুসলমান,) আবার তুমি ন্যায়, সাহস ও সততার অনুশীলন কর, তোমার দ্বারা জগতের নেতৃত্বের কার্য্য সাধিত হইবে।

তিনি বলিলেন, কোরআনের নির্ম্মল শিক্ষায় পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইতে, শত্রুতা ও জন্মগত পার্থক্য ভুলিয়া দৈনন্দিন কার্য্যে সাম্য, একতা ও সহানুভূতি দেখাইতে।

বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ মনুষ্যজীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই ব্যাধি সূফী মতের ভিতর দিয়া মুসলমান সমাজকে

অন্তঃসারশূন্য করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" ইকবাল লিখিয়াছেন,

মন নগুয়ম দর গুজর আজ কাখ্ ও কূয়
দৌলতে তুস্ত ঈজহানে রঙ ও বুয়

—আমি বলিনা যে প্রাসাদ ও রাজপথ হইতে চলিয়া যাও; এই বর্ণগন্ধ-ভরা দুনিয়া তোমার সম্পত্তি।

মানুষের মধ্যে চিন্তা ও ভাব দুইই বর্ত্তমান আছে। ভাবকে বাদ দিয়া শুধু বিচার লইয়া মানুষের জীবন চলে না--মানুষ মেশিন হইয়া যায়। Over-intellectualism বা অতিমাত্রায় বিচার-সর্ব্বস্বতার বিষময় ফল পাশ্চাত্য জগতে অনেকেই ভোগ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে দার্শনিক ইকবাল বলেন ঃ

ইলম তা আজ এশক বর খোরদার নীস্ত
জুজ্ তমাশা। খানায়ে অফকার নীস্ত্

জ্ঞান ও ভাব এক সঙ্গে না মিশিলে সে জ্ঞান চিন্তার তামাশা স্থল হইয়া দাঁড়ায়।

ইউরোপের জড়বাদ প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, ইকবাল তাঁহার কাব্যগুলিতে বার বার এ-কথার উল্লেখ করিয়া প্রাচ্যের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরবাসী Nicholas Machiavelli (১৪৬৯-১৫২৭) -র ন্যায়-অন্যায় বিচারবর্জ্জিত রাষ্ট্রনীতির (Unscrupulous statecraft) অনুসরণ করিয়া ইউরোপ পাশবিক হিংসার প্রশ্রয় দিতেছে, অখণ্ড মানবজাতিকে জাতীয়তার নামে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভিন্ন ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের কারণ জন্মাইয়া জগতের সুখশান্তি বিনাশ করিতেছে। স্যার ইকবাল যুক্তির সহিত এই মানবতা-বর্জ্জিত ধারণার দোষত্রুটিগুলির জগতের সামনে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইউরোপের অন্ধ-অনুকরণকে ইকবাল অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কামালী-তুরস্কে যে-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ ইউরোপেরই অন্ধ-অনুবর্ত্তন। এ সম্বন্ধে ইকবাল লিখিয়াছেন ঃ—

মুস্তাফা কো আজ তজদ্দুদ মী সুরূদ
গুফ্‌ত্ নক্‌শে কুহ্‌না রা বায়দ জদুদ
নও নগর দদ কা'বা রা রখ্‌তে হয়াৎ
গর জে আফরঙ্ আয় দশ লাৎ ও মনাৎ
তুর্ক রা আহঙে নও দর চুঙ্ নীস্ত
তাজা আশ জুজ্ কুহ্‌নায়ে আফরঙ নীস্ত্

সংস্কারপ্রিয় মুস্তাফা কামালপাশা পুরাতনকে ঘষামাজা করিতে বলিয়াছেন। কা'বাতে যদি ইউরোপীয় 'লাৎ' ও "মনাৎ" (১) আমদানী হয় তবে কাবা নব জীবন লাভ করিতে পারিবে না। তুর্কীদের বাঁশরীতে নূতন সুর নাই। তাঁহাদের কাছে (আজ) যাহা নূতন তাহা ইউরোপেরই পুরাতন জিনিস।

অধুনা ইকবাল ধনিক ও শ্রমিকদের সমস্যা লইয়া কবিতা লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রমিক ও সর্ব্বহারাদিগকে জাগাইয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন; "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" ইকবালের মতেও মনুষ্যত্বের চরম বিকাশই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। তিনি বলিয়াছেন ঃ

বরতর আজ গরদূঁ মকামে আদম অস্ত্
আস্‌লে তহ্‌জীব এহতেরামে আদম অস্ত্।

—আকাশেরও উপরে মানুষের স্থান। মানুষের সম্মানই সংস্কৃতির মূল।

দেশপ্রীতি

ইকবাল ইসলামকে যেরূপ অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন ভারতবর্ষকে তেমনই ভালবাসিতেন। তাঁহার তরানায়ে হিন্দ বা ভারত সঙ্গীত কে না শুনিয়াছেন! তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, ইসলামকে কোন স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে যে স্থান

হইবে ভারতবর্ষ - আরব পারস্য নয়। হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বাণী সকলের আদর্শ হওয়া উচিৎ। তিনি বলিয়াছেন:

মজহব নহীঁ সিখাতে আপস মেঁ বৈর রখনা;
হিন্দী হয়ঁ হম অতন হয় হিন্দুস্তা হমারা।

আমরা সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দিই না, নিজেদের মধ্যেই বিরোধ ছাপাইয়া রাখি; আমরা সকলে ভারতবাসী, আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের নানা নৈসর্গিক দৃশ্য ও ভারতীয় হিন্দুমুসলমান সাধকদের সম্বন্ধে ইকবাল অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষের দুরবস্থা দেখিয়া ইকবালের প্রাণ নীরবে ক্রন্দন করিত। নিম্নলিখিত কথায় তাঁহার হৃদয়ের ব্যথার মাত্রা উপলব্ধি করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

কয় শবে হিন্দুসেতাঁ আরদ বরুজ।
মুরদ্ জা'ফর জিন্দা রূহে হনুজ।
... .
আল্ আমান্ আয় রূহে জা'ফর আলআমান্
আল্ আমান্ আয় জা'ফরানে ঈ' জমান।

ভারতের রাত্রি কবে ভোর হইবে? মীরজাফর মরিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার আত্মা বাঁচিয়া আছে। ... মীরজাফরের আত্মা হইতে সতর্ক হও, বর্তমান কালের মীর জাফরগণ হইতে সাবধান হও।

কাব্য

কবি হিসাবে ইকবালের অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রুদ্র ও শান্ত, কঠোর ও কোমল, সমস্ত চিত্রই তাঁহার তুলিতে স্বভাবসুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন জাতি বা সমাজকে জাগ্রত করিতে ও কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্দীপিত করিতে হইলে বীররসের প্রয়োজন। আবার সুন্দরের বিভিন্ন দিকের রূপ-রস-গন্ধের ছবি আঁকিতে কোমলতার পরশ আসিয়া পড়ে। শক্তির প্রবল ঝটিকা ইকবালের বহু কবিতায় রহিয়াছে, ইহা অনেকেই জানেন। বিখ্যাত শেকোয়া কবিতায় প্রথম যুগের মুসলমানদের বীরত্ব ও বাহাদুরী বর্ণনাচ্ছলে ইকবাল বলিয়াছেন ঃ—

দশ্‌ত্ তো দশ্‌ত্ হয়ঁ দরয়াভী-ন-ছোড়ে হমনে
বহরে জুলমাত মেঁ দৌড়া দিয়ে ঘোড়ে হমনে।

—ময়দান তো ময়দান, সমুদ্র উল্লঙ্ঘনেও আমরা বিরত হই নাই; আটলাণ্টিক মহাসাগরে আমাদের ঘোড়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এস্থলে ইঙ্গিত রহিয়াছে মহাবীর ওকবার দিকে। তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা জয় করিয়া উন্মত্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার ঘোড়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিনি দুই হাত তুলিয়া খোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে খোদা, আজ যদি সমুদ্র আমার অগ্রগতি রোধ না করিত, তাহা হইলে পশ্চিমের অজ্ঞাত দেশ-দেশান্তরে তোমার একত্বের মহিমা প্রচার করিয়া চলিতাম।" শেকোয়া কবিতায়ই আর একস্থানে মুসলমানদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্বার্থত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া খোদাকে লক্ষ্য করিয়া ইকবাল বলিতেছেন।

ফেরভী হম সে যহ গিলা হয় কে ওফাদার নহীঁ।
হম ওফাদার নহীঁ তুভী তো দিলদার নহীঁ।

হে খোদা, এত সত্ত্বেও আমাদের নিন্দা যে আমরা ভক্ত নাই; আমরা যদি ভক্ত না হই তবে তুমিও হৃদয়বান নহ।

উষাকালে ফুল ফুটিয়া জগতের আনন্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধন করে। এই ব্যাপারে ইকবালের কলমে নিম্নলিখিতরূপে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে :-

যব দেখাতি হয় সহর আরেজে রঙ্গী আপনা
খোল্ দেতী হয় কলী সীনায়ে জর্‌রী আপনা

(১) 'লাৎ' ও 'মনাৎ' দুইজন দেবতার নাম।

একবাল

এস্, ওয়াজেদ আলি, বি. এ. (ক্যান্টাব), বার-এট-ল

একবাল মহাকবি ছিলেন বটে, কিন্তু এক হিসাবে তাঁকে কবি বলা ভুল। কবির কাজ সাধারণতঃ হচ্ছে ভাবের চর্চ্চা, আর তাই করে তিনি আমাদের আনন্দ এবং শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই ধরণের কবি। কিন্তু একবাল কাব্যের সাহায্যে দর্শনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন, ধর্ম্মের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন, আদর্শের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল, কাব্যের সৃষ্টি নয়, দর্শনের আদর্শের সৃষ্টি। এইখানেই একবালে এবং রবীন্দ্রনাথে প্রভেদ।

প্রায়ই লোক জিজ্ঞাসা করেন রবীন্দ্রনাথ বড়, না একবাল বড়। এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। কেননা এই দুই মহাসাহিত্যিক হলেন দুই বিভিন্ন ধরণের কবি। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় গোলাপ ফুল ভাল, না, নেবুর শরবৎ ভাল, তাহলে সে কি তার উত্তর দেবে? রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি-দার্শনিক, আর একবাল হলেন দার্শনিক-কবি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ হলেন মুখ্যতঃ কবি আর গৌণতঃ দার্শনিক, আর একবাল হলেন মুখ্যতঃ দার্শনিক আর গৌণতঃ কবি। দুই কবিতে প্রভেদ কোথায় তা এই একটি কথা থেকে বুঝবেন যে, একবাল প্রেমের বিষয় কিছুই লেখেন নি, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের ছড়াছড়ি।

একবাল সারা জীবন দর্শন নিয়েই আলোচনা করেছেন, কখনও বা পদ্যে আর কখনও বা গদ্যে। তাঁর লেখায় দর্শন ছাড়া আর কিছু নাই। তিনি হলেন জাত দার্শনিক।

দর্শনের চর্চ্চায় তিনি নানা তীর্থ দর্শন করেছেন। এক সময় তিনি বেদান্ত দর্শনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর প্রথম বয়সের কবিতায় বেদান্তের এবং হিগেলের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে কিন্তু তিনি ইসলামের কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। ঘরের ছেলে শেষে ঘরেই ফিরেছিল। তাঁর পরিণত বয়সের সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদ তিনটী গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, সে তিনটী গ্রন্থ হচ্ছে, আসরারে খুদী, রুমুজে বেখুদী এবং জাওয়েদ নামা। এই তিনটী গ্রন্থ এক সঙ্গে পড়লে দার্শনিক একবালকে চেনা যায়।

আসরারে খুদীর তরজমা Nicholson সাহেব The Secret of Self নাম দিয়ে করেছেন। এই গ্রন্থে একবাল বলেছেন, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য। খোদীর বা ব্যক্তিত্বের বিকাশই হল চরম এবং পরম ধর্ম্ম। জার্ম্মান দার্শনিক Nietzsche এই মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচার করেন। তাঁর মতবাদকে Superman Theory বলা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ কিছু নয়, তার কাজ হচ্ছে অতি মানবের দাসত্ব এবং সেবা করা। অতি-মানবের সৃষ্টিই হচ্ছে বিশ্বের লক্ষ্য। অতি-মানব আত্ম-প্রতিষ্ঠার ধর্ম্ম মেনে চলবে, আর কোন ধর্ম্ম মানবে না। সাধারণ মানবের জীবননীতি তার কাছে মূল্যহীন। খৃষ্টান ধর্ম্মে দয়া এবং করুণার ভাব বেশী মাত্রায় আছে বলে Nietzsche সে ধর্ম্মকে দাস-ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেছেন। অতি-মানব দাস-ধর্ম্ম মানবে না, কেবলমাত্র প্রভু-ধর্ম্ম মানবে। দাস-ধর্ম্ম মানলে তার হানি হবে। Nietzsche-এর মতবাদ জার্ম্মানিতে, তথা সমগ্র ইউরোপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান যুগের জার্ম্মানির Hitlerism এবং ইটালির Facsism Nietzscheএর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। মিসোলিনী হচ্ছেন Nietzsche এর বিশেষ একজন ভক্ত।

একবাল পাশ্চাত্য দর্শনে, বিশেষত জার্ম্মান দর্শনে একজন মহা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বিখ্যাত জার্ম্মান-দার্শনিকদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তিনি যে Nietzscheএর দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি একথা বললে অন্যায় হবে। তবে একথাও সত্য যে তিনি Nietzscheএর অন্ধ স্তাবক ছিলেন না।

Nietzsche এর শিক্ষার সাহায্যে তিনি ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। Nietzscheএর শক্তি যেমন তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর দৈন্যও তেমনি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। একবালের কবিতাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই Superman আদর্শ Nietzscheএর সৃষ্টি নয়। Superman আদর্শ প্রথমে কোরানেই প্রকাশিত হয়। "আনতুম খায়েরা উম্মতিন" (তোমরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানবের দল) কোরানেরই কথা। জালালুদ্দিন রূমী এই আদর্শ মহাগ্রন্থ মাসনাভীতে প্রচার করেছেন। 'ইনসানে কামেল'ই হচ্ছেন Superman। আর এই "ইনসানে কামেলে" পরিণত হওয়াই হচ্ছে মুসলেমের আদর্শ। "ইনসানে কামেল" অন্তরের নির্দ্দেশ ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম মানেন না। অন্তর যদি তাঁকে খুন করতে বলে, তিনি তা করতেও কুণ্ঠিত হন না। Superman আদর্শ আমাদের জন্য কোন নূতন জিনিষ নয়।

তবে Nietzsche এর মতবাদে যে ভীষণ এক ভ্রান্তি আছে তা একবালের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। Nietzsche ক্ষমতাকেই (power) চরম লক্ষ্য বলেছেন (The Will to power)। কিন্তু ক্ষমতা কিসের জন্য? Nietzsche তার উত্তর দেন নি। ইসলাম সে উত্তর দিয়েছে, কোরান সে উত্তর দিয়েছে, রূমী সে উত্তর দিয়েছেন, একবালও সে উত্তর দিয়েছেন। ক্ষমতা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম্মের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য, ইসলামের গৌরবের জন্য। এই হচ্ছে "রুমজে বে খুদীর" বাণী।

জাওয়েদ নামায় একবাল দেখিয়েছেন ঃ চলার নামই হচ্ছে জীবন। তবে সে চলা হচ্ছে আল্লার পথে। আর আমাদের রসুলাল্লাহ হলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। কোরান শরীফ হল আমাদের জীবনপথের নিয়ামক। প্রত্যেক যুগের জন্য কোরানে এক একটী নূতন বাণী আছে, নূতন মন্ত্র আছে। প্রত্যেক যুগকে নূতন সত্য নূতন তথ্য কোরান থেকে বার করতে হবে। আর সেই নব-আবিষ্কৃত সত্যের নির্দ্দেশমত চলতে হবে। মোটামুটিভাবে, এই হচ্ছে একবালের শিক্ষা।

কবি হিসাবে একবালের বিশেষত্ব হচ্ছে ঃ অনুভূত সত্যকে তিনি যেমন জোরের সঙ্গে প্রচার করেছেন, তার মধ্যে যে ভাবের হিল্লোল দেখিয়েছেন এবং ভাষার ঝঙ্কার তুলেছেন, তার তুলনা বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এ হিসাবে একবাল হচ্ছেন সত্যই একজন মহাকবি।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

দার্শনিক ইক্‌বাল

আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ

পরলোক গমনের এই অল্পদিন মধ্যেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে কবি ইক্‌বালের যে গুণগ্রহণ-বাচক আলোচনা হয়েছে, সে আলোচনার তিনি নিশ্চয়ই যোগ্য। কিন্তু দার্শনিক ইক্‌বাল বাঙ্‌লার চিন্তকদের কাছ থেকে যোগ্য সমাদর পান নি, এটা ভাল কথা নয়। কারণ, দার্শনিক ইকবাল কবি ইক্‌বালের চেয়ে অনেক বড়।

তাই বলে এই কয় লাইনে দার্শনিক ইকবালের আলোচনা করতে যাচ্ছি আমি, তা যেন কেউ মনে না করেন। যোগ্যতর ব্যক্তি দার্শনিক ইক্‌বালকে বাঙ্‌লার ভাবুকদের সাম্‌নে তাঁর বাণীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলুন, এই ইঙ্গিত করাই আমার এ কয়টা ছত্তর লেখবার উদ্দেশ্য।

দার্শনিক ইক্‌বালের যে নিজস্ব দৃষ্টি কোণটা আমার মতো নিরেট লোককেও ভাবিয়ে তুলেছে, আমার মতে সেইটেই তাঁর বিশেষত্ব। সেটার কথাই আজ বলব।

প্রজ্ঞাবাদ ও উপজ্ঞাবাদই বাহ্যতঃ দর্শন ও বিজ্ঞানের, প্রকারান্তরে পদার্থ-বিজ্ঞান ও অতি পদার্থবিজ্ঞানের, ভিতরকার চিরন্তন বিরোধ হলেও এই বিরোধ মূলতঃ দর্শন ও ধর্ম্ম-দর্শনের বিরোধ। গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন ব্যতীত আর কোনো দেশের বা যুগের দর্শনই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ নয়। সোক্রাটিস প্ল্যাটোর পরবর্ত্তী ইউরোপীয় সমস্ত দার্শনিকের দর্শনালোচনায় খৃষ্টধর্ম্মের গভীর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য যুগীয় মুসলমান দার্শনিকদের দর্শনসাধনাও ধর্ম্মের প্রভাব-মুক্ত নয়। আশারী, মোতাযালী প্রভৃতি মতবাদ, কিম্বা ইবনে রুশদ, গাযযালী, স্পেনীয় দার্শনিক মহীয়ুদ্দীন ইব্‌নুল আরাবী প্রভৃতি উঁচুদরের দার্শনিকগণের সকলের সাধনাই ইসলাম ধর্ম্মের দ্বারা পক্ষে বা বিপক্ষে প্রভাবান্বিত। হতে পারে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনালোচনার যুগে কোনো ধর্ম্মমত ডগ্‌মার আকারে বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি বলে দর্শনের সাথে প্রতিযোগিতা করবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তৎকালে তার ছিল না; এবং এই কারণেই হয়ত কোনো বিশিষ্ট ধর্ম্মমত গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনকে প্রভাবিত করতে পারে নি। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম ইসলামের আবির্ভাবের পরে মানুষের চিন্তারাজ্যে ধর্ম্মমত ডগ্‌মার আকারে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল। কাজেই এই যুগের দার্শনিকদের এক দলকে ধর্ম্মের বিপক্ষে এবং অপর দলকে পক্ষে লড়তে দেখা যায়। ফল যা হবার তাই হয়েছিল। মধ্যযুগীয় মুসলমান বড় বড় সকল দর্শন-সাধক ও ইউরোপীয় অসংখ্য দার্শনিকের মধ্যে কাণ্ট, হেগেল, শোপেনহার, নীশে, হিউম, দাকার্তে প্রভৃতি চিন্তানায়কদের সকলকার মতবাদ ইস্‌লাম ও খৃষ্টধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পূর্ব্বকালে প্রজ্ঞা ও উপজ্ঞা, জড় ও আত্মার যে বিরোধ দার্শনিকদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করেছিল, এই যুগে তাই নূতন রূপে আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের বিরোধে পর্য্যবসিত হয়েছিল। ফলে এই যুগের দার্শনিকদেরও কারো দর্শন সাধনা নিরেট প্রজ্ঞার হাল-ছাড়া নৌকোয় চড়ে নাস্তিক্যের দিগন্তহীন অনন্ত মহাসাগরে বানচাল হয়েছিল; আবার কারো দর্শন-সাধনা ধার্ম্মিকতার বালুচরে ঠেকে দিয়ে মামুলী শাস্ত্রালোচনায় পর্য্যবেসিত হয়েছিল। ইতিহাসের এই ভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

ইক্‌বাল এঁদের সবারই সাধনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের সকল শাখার, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানের, অসাধারণ উন্নতির যে সুবিধা ইক্‌বাল পেয়েছেন, এ সৌভাগ্য তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের কারো হয়নি। বিশেষতঃ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক জড়বাদ পদার্থ-বিজ্ঞানে যে বিপ্লব সাধন করেছে, এই বিপ্লব ইক্‌বালের দর্শন সাধনাকে অতি সহজসাধ্য করে দিয়েছে।

ফলে ইক্‌বাল দর্শন-সাধনার একটা বিশিষ্ট সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন। মানব-প্রজ্ঞার সসীমতা সম্বন্ধে তিনি কাণ্টের মতবাদ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু সে মতবাদের অবশ্যম্ভাবী নৈয়ামিক পরিণতি যে অজ্ঞেয়বাদ, তাকে তিনি আলগোছে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ইক্‌বাল নিশ্চিতরূপে একজন ধর্ম্মদার্শনিক। এই হিসেবে তিনি হেগেল ও নীশের সমপর্য্যায়ভুক্ত। কাজেই তাঁর দর্শন দৃষ্টিও ওঁদেরই মতই সঙ্কীর্ণ সুতরাং বাস্তব। ওঁদেরই মত ইক্‌বাল ইস্‌লামকে পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রজ্ঞাবাদের নৈয়ায়িক পরিণতি যে অজ্ঞেয়বাদ, তাকে এড়িয়ে চলতে হলে উপজ্ঞাবাদকে আকড়ে ধরতেই হবে। আবার উপজ্ঞাবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে মরমীবাদ। ইক্‌বালকে তাই বাধ্য হয়ে মরমীবাদী হতে হয়েছে। কিন্তু এই মরমী বাদ ইক্‌বালকে গায়যালী নীশে বা ইবনুল আরাবীর মত বিজ্ঞান নিরপেক্ষ ধর্ম্মবাদী করে তুলতে পারে নি। ইক্‌বালের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে।

প্রজ্ঞার অসীমত্ববাদী না হলেও ইক্‌বাল তার অসাধারণত্ববাদী। তবু নিরেট যুক্তিবাদের পিছনে ধাওয়া করে তিনি নৈরাশ্যের দিগন্তহীন মরুভূমিতে হারিয়ে যাননি। পক্ষান্তরে, পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট a priori নীতির রেলের উপর দিয়ে চিন্তার গাড়ীচালিয়ে তিনি বিজ্ঞান নিরপেক্ষ ডগমার পাষাণ প্রাচীরে সমাহিত হন নি।

কারণ, ইক্‌বালের চিন্তা গতির মূল উৎস যে অহংসত্তা, মানবসত্তাই উহা নামান্তর মাত্র। তাঁর মতে প্রকৃতির বাহিরে ধর্ম্ম, জীবনের বাহিরে দর্শনের অস্তিত্ব নেই, প্রজ্ঞা ও উপজ্ঞা তাঁর মতে যান্ত্রিক সম্বন্ধযুক্ত।

অতীত কালে অনেক দার্শনিক হয়ত এ কথা বল্‌বার এবং ভাববার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে এ কথার তেমন জোর বাঁধে নি।

কিন্তু ধর্ম্ম-দর্শনের যা বিপদ স্থবিরা মরমীবাদের যা বিপদ অতীন্দ্রিয়তা, ইক্‌বালের দর্শনকে তা স্পর্শ করতে পারে নি। পদার্থ বিজ্ঞানের গতিশীলতা ইক্‌বালকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক জড়বাদ ইক্‌বালের ধর্ম্ম দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বস্তুতঃ স্থান কাল কারণত্ব ডিঙ্গিয়ে মানব প্রজ্ঞা যে গতিবেগে এগিয়ে চলেছে তাতে করে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভেতরে আগেরকার দিনের মৌলিক ভেদ থাক্‌বার কোনো কারণ নেই।

সাধারণ ভাবে ধর্ম্মকে, বিশেষভাবে ইস্‌লামকে, দর্শন সাধনার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করায় অসতর্ক চিন্তকের কাছে ইক্‌বালের দর্শন গায়যালী বা নীশের দর্শনের মতো সঙ্কীর্ণতা কেন্দ্রিক তর্কজাল মনে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু ইক্‌বাল-দর্শন আসলে তা নয়। তিনি উপনিষদের জীবাত্মাকে মানব-ধর্ম্মরূপে এবং ইস্‌লামকে আত্ম ধর্ম্মরূপে কল্পনা করেছেন। ইস্‌লামকে বা কোনো ধর্ম্মকেই তিনি কোনো স্থিতি-স্থাপক কাঠামোর মধ্যে ফেল্‌তে রাজী হন নি। তাঁর দর্শনকল্পিত ইস্‌লাম প্রকৃত পক্ষে মানব ধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র।

এ বিষয়ে তিনি নীশের অনেক উপরে। নীশের রক্ত-সম্বন্ধবাদীকে ইক্‌বাল অবৈজ্ঞানিক সুতরাং অদার্শনিক সঙ্কীর্ণতা বলেউড়িয়ে দিয়াছেন। সুতরাং ইক্‌বালের দৃষ্টিতে ধর্ম্মই দর্শন, দর্শনই ধর্ম্ম।

এটা সম্ভব কি না? প্রজ্ঞা এখানে নিরাপদ কি না?

এই প্রশ্ন সমস্ত স্বাধীন চিন্তক প্রজ্ঞায় মুক্তিকামীর মনকে আন্দোলিত করবে নিশ্চয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

প্রজ্ঞা ও উপজ্ঞার মধ্যকার রহস্যের পর্দ্দা যেদিন উদ্ঘাটিত হবে পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পদার্থ বিজ্ঞানও অতি পদার্থ বিজ্ঞানের বিভেদ সেদিন ঘুচে যাবে, সেদিন জড়ত্ব ও আত্মা এবং ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিভেদ থাক্‌বার কথা তো নয়। ইক্‌বাল খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন, ধর্ম্ম ও দর্শনের যে বিরোধ উভয়ের ক্ষতি, সুতরাং মানবের সত্যিকার জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধকতা করেছে, সে বিরোধের মূল, এমন কি একমাত্র কারণ ধর্ম্মের স্থিতিস্থাপক ডগমা। ধর্ম্মকে সত্যিকার মানবধর্ম্ম হতে হলে তাকে ডগমা-মুক্ত হতে হবে।

কাজেই ইক্‌বালকে বাহ্যতঃ মরমীবাদী ধর্ম্ম-দার্শনিক মনে হলেও আসলে তিনি একটী মৌলিক ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে একটী অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরের সন্ধান করেছেন।

এই হিসেবে ইক্‌বাল মনে হচ্ছে। তাঁর মতবাদ ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীলতা কিনা সে কথা বলবার সময় অবশ্যি আজো আসেনি।

সৈয়দ জামালুদ্দীন আল্ আফ্গানী

কাজী আবদুল ওদুদ

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম সৈয়দ জামালুদ্দীন আল্ আফ্গানীর সঙ্গে বাংলার পরিচয় নূতন নয়। বহুদিন পূর্বে পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন "সমাজ ও সংস্কারক" নাম দিয়ে তাঁর একখানি সুলিখিত জীবনী প্রকাশ করেন, সে গ্রন্থখানি এখন বাজেয়াপ্ত; আর জামালুদ্দীন উত্তর জীবনে ফরাসী দেশ থেকে যে পত্রিকা সম্পাদন করতেন, শোনা যায় তারও বাণী ভার বিশেষভাবে বহন করতেন বাংলার কোনো কোনো মুসলমান। তাঁর প্রতি বাংলার মুসলমানের এক দলের এই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দলের বিরোধিতাও স্মরণীয়। তিনি যখন কলকাতায় উপস্থিত হন তখন নবাব আবদুল লতীফ প্রমুখ বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মুসলিম-নেতৃবৃন্দ কলিকাতা-মাদ্রাসায় তাঁর বক্তৃতাদানে বাধা দেন, কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু বাঙালীর চেষ্টায় অন্যত্র—বোধ হয় এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়।

নবাব আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কেন জামালুদ্দীনের বিরোধী হয়েছিলেন আজ তা বোঝা কঠিন নয়। জামালুদ্দীন, স্যার সৈয়দ, নবাব আবদুল লতীফ, এঁরা সমসাময়িক। এঁদেরই কালে ভারতীয় মুসলমানের এক বিশেষ ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তার সূচনা বহু পূর্ব্বেই হয়েছিল, তবে সে বিপর্যায় উৎকট আকার ধারণ করে এঁদের সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে—ভারতীয় মুসলমান সাধারণভাবে রাজরোষের পাত্র হয়। নবাব আবদুল লতীফ ও স্যার সৈয়দের বিশেষ সাধনা হয়েছিল এই রাজরোষ প্রশমনের সাধনা। কিন্তু জামালুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল শুধু ভারতীয় মুসলমানের সমস্যা নয় বিশ্ব-মুসলিম সমস্যা। তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের কানে ও চোখে তাঁর জাগরণ-বাণী ও নির্ভীকতা হয়ত ওহাবীদের মতোই ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। অকপট অভীত ওহাবীদের প্রতি আজন্ম-যোদ্ধা জামালুদ্দীনের শ্রদ্ধাহীন না হবারই কথা। কিন্তু তাঁর মত ও পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুমেয়। বিশ্ব-মুসলিম-সমস্যার প্রতি ওহাবীদের চাইতে অবিচলিততর তাঁর দৃষ্টি, আর তাঁর সমাধানও যে শ্রেষ্ঠতর সমাধান মুসলিম জগতের পরবর্ত্তী ইতিহাস তার প্রমাণ—ওহাবীদের অতীতমুখিতা নয়, তাঁর প্রচারিত জন-জাগরণ ও বিজ্ঞানমুখিতাই একালের মিসর-তুরস্কে সূচিত মুসলিম জাগরণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় স্থল।

ভারতীয় মুসলমানের চিন্তাভাবনার ধারা এখনো জামালুদ্দীনের নির্দ্দেশিত পন্থা থেকে দূরে। ওহাবীদের অতীতমুখিতা, অথবা তার একশ্রেণীর হিন্দু স্বদেশবাসীদের মতো প্রাচীন-গৌরবের স্বপ্ন এখনো তার উপজীব্য। সম্প্রদায় হিসাবে ভারতীয় মুসলমানের দুর্ব্বলতা অথবা দুর্ব্বলতা-বোধ তার এমন স্বপ্ন-বিলাসের মূলে রস জুগিয়ে চলেছে। এই দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় সমস্যাটি কত জটিল। কিন্তু নিবিড় দুর্য্যোগেরও অবসান হয়—জামালুদ্দীনের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের এই স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা তার শুভাদৃষ্টের পরিচায়ক মনে হতে পারে।

জামালুদ্দীনের নাতিদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হয়েছিল অপরিসীম কর্ম্মোদ্যমে। সেই সব অক্লান্ত উদ্যমের কেন্দ্রীভূত ছিল এই অভিলাষ যে এই সুন্দর জগতে মুসলমানের জীবন হোক সুপ্রতিষ্ঠিত—জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি আর সংহতি-শক্তি এই দুই প্রধান শক্তিতেই সর্ব্বপ্রকারের দাসত্ব তার জন্য হোক অপগত। মানবতার চিরন্তন জয়যাত্রার নির্দ্দেশ জামালুদ্দীনের প্রতিভায় মুসলমানের জন্য যে নূতন করে লাভ হয়েছে এর মর্য্যাদা চির-অম্লান হোক!

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

হিন্দু-মুসলমান
বহির্দৃষ্টি

লীলাময় রায়

আমাদের অনেকে নিখুঁৎ ইংরাজী বলেন, পোষাকও পরেন ইংরাজের মত। আমাদের কেউ কেউ ইংরাজের মত ফরসা। এমন কি, আমাদের মধ্যে ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বা আশৈশব শিক্ষা পেয়েছেন, এরূপ ব্যক্তিও বিরল নন। তবু কোনো ইংরাজ তাঁকে ইংরাজ বলে গণ্য করবে না। তিনি যদি ইংলণ্ডে বাস করেন নির্দ্দিষ্ট কাল, তবে আইনের চোখে তিনি ইংরাজ হতে পারেন। তবু তিনি ইংরাজের দলে ইংরাজ নন। তিনি যদি ইংরাজ-কন্যা বিবাহ করেন, চার্চ অফ ইংলণ্ডের সভ্য হন, তবু তিনি যে-কে-সেই। আমাদের কথা ছেড়ে দিন, স্বয়ং বার্ণাড শ' প্রায় যাট বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েও লোকচক্ষে এখানা আইরিশ। এবং লেডী য়্যাস্টর ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে বিবাহ করে তাদের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হয়ে তাদেব পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েও লোকচক্ষে এখনো মার্কিন।

তবে ইংরাজের গুণ এই যে, ওরা দু' এক পুরুষ বাদে মনে রাখে না, কে কার বংশধর। ইংলণ্ডের মাটীতে পুরুষানুক্রমে জন্মালে ও মরলে, ওদের সঙ্গে বিয়ে না করেও ইংরাজ হওয়া যায়--যেমন ইহুদীরা হয়েছে। কিন্তু এর জন্য ইহুদীদেরকে অন্যরকম ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তাদের হয়ত একসেট ঘরোয়া নাম আছে। কিন্তু বাইরে তারা জন স্মিথ, এডওয়ার্ড ব্রাউন, জর্জ জোন্‌স। তাদের পোষাক বেমালুম ইংরাজী। তারা বাড়ীতে যা' খুসী বলুক, বাইরে বলে নির্ভুল ইংরাজী। তারাও মুসলমানদের মত জবাই-না-করা মাংস খায় না, খায় না শূয়রের মাংস। কিন্তু সে তাদের বাড়ীতে। ইংরাজের দলে তারা আহারাদিতে বিল্‌কুল ইংরাজ। বিয়েটা নিজেদের মধ্যে না করলে তাদের ইহুদীত্বের ভিৎ নড়ে। রক্তের মিশ্রণ তারা হতে দেয় না। তাই তারা অন্যকে ইহুদীধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে ইহুদী করে নেয় না। রক্তে আলাদা থাকার দরুণ তাদের চেহারা দেখে চেনা যায়, তারা হাজার ইংরাজ সাজলেও তারা ইহুদী। তা বলে ইংরাজরা তাদের একেবারে পর মনে করে না। তারা ইংলণ্ডের অনেক উপকার করেছে। তা'ছাড়া নকলনবীশকে সবাই একটু অনুকম্পা করে থাকে। জার্ম্মানরা যদি ইংরাজদের মত সবল জাতি হত, তবে তাদের দেশে যে-সব নকলনবীশ আছে সে বেচারিদের উপর অনুকম্পাই করত। নিজেরা দুর্ব্বল বলে আজ এত আর্য্যামির ভড়ং। ইহুদীদের সঙ্গে বুদ্ধিতে না পেরে বাহুবলের শরণ নিতে হয়েছে। তর্কে হেরে গুণ্ডামি।

ইহুদীদের মত পার্সীরাও রক্তে মিশ্রণ এড়াবার জন্য পরকে তাদের ধর্ম্মে দীক্ষা দেয় না, পার্সী করে নেয় না। নিজেরা কিন্তু পোষাকে ভাষায় আচারে ব্যবহারে পরের নকল করতে করতে অন্যরকম হয়ে গেছে। মাণিকজি দাদাভাই--এর কোন্‌ কথাটি ফার্সী? আজকাল ইংরাজের অনুকরণে পার্থিব সুবিধা। যে-কারণে দত্ত হয়েছেন ডাট, মিত্র হয়েছেন মিটার, সেই একই কারণে পার্সীরা আর এক পা এগিয়ে গিয়ে কুপার, মরিস, কন্ট্রাকটর, ক্যাপটেন, রেজিষ্ট্রার ইত্যাদি ইংরাজি নামকরণ করেছেন। দুঃখের বিষয়, এর সবগুলি ইংরাজি শব্দ হলেও ইংরাজী নাম নয়।

ওদিকে নিগ্রোরাও নিজেদের ইংরাজী নামকরণে ওস্তাদী দেখাচ্ছে আরো বেশী। আমার কাছে 'লণ্ডন টাইম্‌সে'র সেই সংখ্যাটি নেই, যাতে এর অনেকগুলি নমুনা ছিল। আমরা ত নিচ্ছি শুধু বিশেষ্য পদ। ওরা নিচ্ছে ক্রিয়া-পদ, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ; একটা কিছু হলেই হল। যেমন, "জেমস ভেরি গুড প্লিজ অলরাইট ম্যান।"

এই নামকরণ-তত্ত্বটি অনুধাবনযোগ্য। যাঁরা সংস্কৃত পড়েছেন, তাঁরা সেকালের ভারতীয়দের নামগুলির সঙ্গে একালের আমাদের নামগুলি মিলিয়ে দেখুন। রামস্বামী আইয়েঙ্গার বা রামমূর্ত্তি আইয়ার শুনতে কেমন লাগে, যদিও শব্দগুলি সংস্কৃত কিম্বা সংস্কৃতভাঙ্গা। এরূপ নাম জাভাদ্বীপে ছিল এবং হয়ত এখনো আছে। এর মানে, "জেমস ভেরি গুড অলরাইট ম্যান"। অর্থাৎ নকলনবীশী।

যারা আর্য্যঋষিদের প্রকৃত বংশধর, তাদের নামগুলির হয়েছে বিবর্ত্তন। তারা বেমালুম নাম চুরি করতে গিয়ে এমন করে সং সাজেনি। তারা রামলাল, রামদাশ, রামাদেশ। আমি এমন কথা বলছি না যে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণরা গোড়াতে দ্রাবিড় ছিলেন। হয়ত আর্য্যই ছিলেন। তবে আর্য্য-সংস্কৃতির স্রোত থেকে কত দূরে গিয়ে পড়েছেন, তাঁদের নামেই তার পরিচয়। তেমনি আমরা বাংলার "আর্য্য" বংশধবগণও। রামমোহন রামকান্ত রামেন্দ্রসুন্দর এর সঙ্গে ট্র্যাডিশন তত নেই, যত আছে উদ্ভাবনী-শক্তি। বাংলার মাটার উর্ব্বরতা। সেই শক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। তা নইলে মন্মথমথন, বীরেশ লোভন, সুধীন্দ্রিয়নাথ ইত্যাদি তোমাশা সৃষ্টি করবে কে? এর পিছনে "জেমস ভেরি গুড অলরাইট ম্যান" লীলা করছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি মানব-পিতামহ, ডারউইন সাহেবের মতে। সংস্কৃত হরফ নিয়ে ওয়ার্ড-মেকিং খেলা।

একজনের নাম যদি হয় নসিরুদ্দিন, আমি লিখে দিতে পারি যে তাঁর ভাইদের নাম বসির, ওসির, কসির ও মসির। এগুলি কি সবই আরবী? বাঙ্গালী মুসলমানের নাম ক্যালকাটা-গেজেটের যেখানে ইউনিয়ন-বোর্ড নির্ব্বাচনের ফলাফল থাকে সেখানে পড়তে পারেন, যদি সন্দেহ হয় আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাকে। কোনো মতে একটা উদ্দীন জুড়ে দিতে পারলে সব নামই মুসলমানী নাম। মৌলবী মুহম্মদ আফজল বাঙ্গালী মুসলমানের নাম কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে সাবরেজিষ্ট্রার রূপে তাঁকে যে-সব মুসলমানী নাম শুনতে হয়, তার অনেকগুলি অতি কিম্ভুত। যেমন একজনের নাম পোকা ঘুড়া। এমন নামের সঙ্গে উদ্দীন যোগ করলেও এর যথেষ্ট শুদ্ধি হবে না। তাই মৌলবী সাহেবের ঐ সৎপ্রয়াস। কিন্তু তাঁর নজর শ্রুতিমাধুর্য্যের প্রতি। অর্থাৎ বিলু মোড়ল যেমন বিল্বমঙ্গল মণ্ডল হলে আমাদের হিন্দুদের মনে হবে, "আহা কি মধুর!" (যদিও ঠিক জেমস ভেরি গুডের মত), তেমনি পোকা ঘুড়া হবে ফখরুদ্দীন আহ্‌মদ, কিম্বা খায়রুল ইস্‌লাম।

মুহম্মদের যুগে আরবদেশে যে-সকল নাম প্রচলিত ছিল, সেগুলি যেমন সরল, তেমনি সংক্ষিপ্ত। আজ আরবদেশে সেই সকল নামের কি প্রকার বিবর্ত্তন হয়েছে, তা আমার জানা নেই। যতদূর লক্ষ্য করেছি, তার বিশেষ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটেনি। উদ্দীন বা ইস্‌লাম পড়েছি বলে ত মনে হয় না। ডাকনামের আগে বা পরে মুহম্মদ বা আহ্‌মদ যোগ করা বোধহয় ও-দেশে নেই। সম্ভবতঃ এসব ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

এবার ইংরাজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বহু ফরাসী ওলন্দাজ জার্ম্মান রাশিয়ান রক্তের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরাজ হয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণকে ইংরাজসমাজ ক্ষতিকারক মনে করেনি। ইংরাজ ধর্ম্মবিশ্বাসের ঐক্য দাবী করে না। অনেক ইংরাজ চার্চের এলাকার বাইরে। কেউ মুসলমান হলে তাঁর জাত যায় না। ইংরাজ ও অন্-ইংরাজে প্রভেদ ধর্ম্মগত নয়, রক্তগত। ইংলণ্ডবাসী ইহুদীদের ধরলে, রক্তগতও নয়, ঐতিহ্যগত। ইংলণ্ডের স্বকীয় ট্র্যাডিশনকে আপনার করলে, আপনাকে সেই ট্র্যাডিশনের বাহক করলে, ইংরাজের মত ভাবলে, ইংলণ্ডের স্বার্থকে প্রথম স্থান দিলে ইহুদী বা পার্সী থেকেও ইংরাজ হওয়া যায়।

এর সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা যাক।

এ-দেশেরও একটা ঐতিহ্য আছে। অতিদীর্ঘ এর ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের আদি থেকে কে কে এ-দেশে আছে, কে কে পরে এসেছে, তা হিন্দু সমাজের রূপ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এমন মিশাল ঘটেছে যে, যারা পরে এসেছে, তারাও নিজকে আদি-ভারতীয়দের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। রাজপুতরা ভাবে, তারা মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয়। মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয় রক্ত যে একেবারে তাদের দেহে নেই, তা কে জোর করে বলবে! তবু ক্ষত্রিয় না হয়ে রাজপুত হল তাদের নাম। নিশ্চয় এর মধ্যে রহস্য আছে। আমরা হিন্দুরা ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্যকে দাবী করে থাকি। আমাদের এ-দাবী অন্যায় নয়। কারণ আমরা যাদের বংশধর, তাদের কেউ-না-কেউ আদিতে এ-দেশে ছিল। তাদের রক্তধারার, তাদের ভাবধারার বাহক আমরা। তারা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

যারা আদিকাল থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে, তেমন জাতি পৃথিবীতে বেশী নেই। আমাদের হিন্দুদের প্রধান গর্ব্ব এই যে, আমরা তেমনি একটী জাতি। আমাদের কৌলিন্য অবশ্য ঝুটা। রক্তের বিশুদ্ধি কাল্পনিক। একদিন আমাদের ভ্রান্তি ছিল যে আমরা অমুক অমুক ঋষির গোত্র। আজো বিয়ের সময় সেটা মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে কোচেরা রাজবংশী ও রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হয়ে উঠল। এখন তারাও চন্দ্র সূর্য্যের নীচে কথা কইবে না।

তা হোক, একই দেশে একাধিক ঐতিহ্য সম্ভব নয়। একদিন-না-একদিন সবাইকে মূল স্রোতে ভাসতে হবে। মূলস্রোতটা সাত্তবংশীদের ধারণায় রক্তকৌলিন্য। যেমন আমাদের শিক্ষিতদের ধারণায় ছিল এবং দরকারের সময় ফিরে আসে। কিন্তু তা যে নয়, এ বিষয়ে শিক্ষিতদের দ্বিমত নেই। তবে কারুর কারুর নূতন ধারণা, হিন্দুর হিন্দুত্ব তার ধর্ম্মবিশ্বাসে। এই বলে এঁরা হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা তৈরি করছেন। সেই সংজ্ঞা যদি কোন জাপানী বা আমেরিকা গ্রহণ করে, তবে সেও নাকি হবে হিন্দু। তার মানে হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের বাইরে টিকতে পারে। এঁরা ভুলে যান যে নবদীক্ষিত 'হিন্দুরা' বা 'আর্য্যসমাজীরা' তাদের জাতীয় প্রকৃতি বদলাতে পারে না। এবং জাতীয় প্রকৃতি যদি বেঁচে থাকে, তবে একদিন ধর্ম্মের ভেক বদলানো কাপড় ছাড়ার মতই সোজা। জাভার দৃষ্টান্ত কি শিক্ষা দেয়?

দেশের মূলস্রোত ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। কোনো দেশ তা রাখতে পেরেছে। কোনো দেশ তা রাখতে পারেনি। কোনো দেশে একটানা স্রোত, কোন দেশের স্রোত মাঝখানে শুকিয়ে গেছে। অতীত ও বর্ত্তমান স্রোতের মাঝখানে বিস্মৃতির বালুচর। অতীত বন্ধ্যা, বর্ত্তমান তার দত্তক পুত্র। এসব দেশের একখানার স্থলে দু'খানা ইতিহাস লিখতে হয়। ফারাওদের মিসর, আরবদের মিসর। মায়া ও অজিটেক আমেরিকা, ইউরোপীয় আমেরিকা।

ভারতের ঐতিহ্যের সংজ্ঞা দিতে যাওয়া বৃথা। কোন জীবন্ত জাতি নিজেদের সংজ্ঞা দেয় না। মরণের সংজ্ঞা আছে, জীবনের নেই। আমরা বহমান আমরা বিদ্যমান। আমরা দিন দিন কাপড় ছাড়ছি। নখ কাটছি। চুল ছাঁটছি। আমরা পরিবর্ত্তিত হচ্ছি, বিবর্ত্তিত হচ্ছি। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসও তলে তলে বদলে যাচ্ছে। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ চূড়ান্ত নয়, তারও পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন আছে। পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করে হিন্দুসমাজ বার বার সংস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীবন্ত সমাজের রীতি এই। ইংরাজও চিরকাল বাঁধা ধর্ম্ম মানেনি, বাঁধা আচার মানেনি। ইংরাজ রক্তেও কত রক্তের সাঙ্কর্য্য। ইংরাজী ভাষাও কত ভাষার সাঙ্কর্য্য। আধুনিক ইংরাজের মধ্যে আদিম ব্রিটনও রয়েছে।

আমাদের মুসলমানদেরকে ইংলণ্ডের ইহুদীদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এরাও এঁদের স্বাতন্ত্র্য রাখতে চান। এরাও ঠিক ওদেরই মত আত্মপরিচয় দেবার সময় এক জোড়া কথা বলেন- ব্রিটিশ ইহুদী, ভারতীয় মুসলমান। ইদানীং দেখা যাচ্ছে 'বাংলা মুসলিম কথা সাহিত্য'। 'ইহুদী ছোটগল্পের' একখানা বই বেরিয়েছে।

তবে তুলনায় সাদৃশ্য যেমন লক্ষিত হয়, বৈসাদৃশ্যও তেমনি। ইহুদীদের সমাজে পোকা ঘুড়া নেই। ভারতীয় মুসলমান সমাজ আমাদের পোকা ঘুড়াগুলিকে নিয়ে সংখ্যায় স্ফীত হচ্ছেন। এই স্ফীতি স্বাস্থ্যকর কি না জিজ্ঞাসা। বেচারা পোকা ঘুড়া যতই পদদলিত হয়ে থাক, সে তার বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। এ শুধু তার নামের নয়- তার রক্তের নয়, এ তার আদিমভাব। একদিন সে মূলস্রোতে ভাসত। হয়ত দু'একটা কুলজী জাল করে ক্ষত্রিয় হত। কিন্তু সেটা কিছু নয়। সে এই দেশের আদিকে আপনার আদি ও এই দেশের ঐতিহ্যকে আপনার ঐতিহ্য বলে জানত। তাতে কিছুমাত্র অন্যায় হত না। এখন ত সে ফখরুদ্দিন আহ্মদ হল। এখন কি সে স্বীকার করবে যে অশোক বা বুদ্ধদেব তার জাতীয় পূর্ব্বপুরুষ?

কেমন করে যে ইব্রাহিম মুসা দাউদ ইত্যাদি ইহুদীরা আরবদের পূর্ব্বপুরুষ হলেন জানিনে। আরবদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম বা য়াকুব বা য়ুসুফ রাখা হত কিনা তাও জানিনে, রাখা হয় কিনা তা ত জানিই নে। অথচ আমাদের পোকা ঘুড়াটি চোখ বুজে সেই মুসা নু আদম ইত্যাদির দত্তকে নেবে। লোকে দত্তক নেয় ছেলে। পোকা ঘুড়ার উল্টা বিচার। অবশ্য রাজবংশীরা আছে নজীর। কিন্তু রাজবংশীয় চাঁদ সূর্য্য যাকেই নিক--কালিদাস, ভবভূতি, অজন্তার নামহীন শিল্পী, সাঁচীর নামহীন স্তূপনির্ম্মাতা প্রভৃতিকেও নেবে। ইংরাজরা যেমন বোডিসিয়াকে, রাজা আর্থারকে নিয়েছে।

পোকাঘুড়া ওরফে ফখরুদ্দীন কি বলবে না যে মুহম্মদের পূর্ব্বে ও পরে আরব পারসিক তাতার তুর্কি মিসরী মরোক্কী ইত্যাদিদের যেখানে যত কীর্ত্তি আছে, সব আমার আপন লোকের? আর ঐ যে কোনারকের সূর্য্যমন্দির, ওটা হচ্ছে আমার হিন্দুভাইদের? অবশ্য কাফের বলাটা আজকাল উঠে গেছে।

ধরা যাক, সে পোকা ঘুড়া নয়--সে হরিহর মুখুজ্যে, কুলীন ব্রাহ্মণ। ইস্লামগ্রহণ করে কি সে বলবে না, আশুতোষ মুখুজ্যের কীর্ত্তি আমার হিন্দুভাইদের কীর্ত্তি, আমাদের কীর্ত্তি কামাল পাশার জয়?

এই যে বহির্দৃষ্টি, আর ওই যে পশ্চাদদৃষ্টি--এতেই হিন্দু-মুসলমানকে মিল্‌তে দিচ্ছে না। দেবে কিনা, তাই আমাদের ভাবনা।

হিন্দুর পশ্চাদদৃষ্টি না থাকলে তার কিছুই থাকে না। যার পশ্চাদ্দৃষ্টি নেই, তার ভবিষ্যদদৃষ্টিও নেই। সে মুহূর্তজীবী। হিন্দুর পশ্চাদদৃষ্টি গেলে ভারতবর্ষ হয় একটা ভৌগলিক আখ্যা। যেমন য়্যান্টার্কটিকা, কিংবা অস্ট্রেলিয়া। আর মুসলমানের বহিঃদৃষ্টি না থাকলে ইস্‌লামের মূলআদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় হয়ত।

মুসলমানের ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে আর একটি জিনিস আছে। মুসলমান বিশ্বাস করেন যে সব মানুষ মিলে একজাতি। এদের সবাইকে একটি ভাষা, একটি ধর্ম্মগ্রন্থ, এক আইন একই আচার ইত্যাদির দ্বারা একাকার করা ইস্‌লামের উদ্দেশ্য। সে চেষ্টাও হয়েছে। সে-চেষ্টা আরবে, পারস্যে, মিসরে, তুরস্কে সফলও হয়েছে। সকলেরই আরবী নামকরণের রীতি, আরবীতে প্রার্থনা, মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ, আরবী রমজান মাসে উপবাস, একই সামাজিক আইন। এমন কি অন্য কোনো ধর্ম্মে আছে? রোমান ক্যাথলিকরা যারপর নাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েও মানুষের মধ্যে হাজার গণ্ডী মানে। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিগত মেজাজ ছাড়া আর কোনো প্রকার স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দেয়নি বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও আফগানিস্থানে বেলুচিস্থানে কত ট্রাইব ঠিক পূর্বকালের মত হানাহানি কাটাকাটি করছে। সমস্ত পৃথিবীকে একচ্ছত্রাধীন করার স্বপ্ন ইস্‌লামের ইতিহাসের প্রথম তিন চার শত বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যায়। ইউরোপে ক্রিশ্চিয়ানিটীর সঙ্গে, ভারতবর্ষে হিন্দুয়ানির সঙ্গে, চীনে কনফুসিয়ুসবাদের সঙ্গে, বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। তখন থেকে কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিই হয়েছে ইস্‌লামের স্বপ্ন—তা সে বিবাহের দ্বারা হোক বা দীক্ষার দ্বারা হোক। অশ্বমেধের ঘোড়া দিগ্বিজয় ছেড়ে চরে চরে ঘাস খাচ্ছে। কোনো মুসলমান কি বাস্তবিক আর ভাবেন যে সব মানুষ একজাতি? বা সবাইকে এক ধর্ম্মে, এক সমাজে বাঁধতে পারা সম্ভব? তুর্কিতে আরবে আফগানে পারসিকে দিব্য স্বার্থবিরোধ রয়েছে। মোগল ভারতের ইতিহাস ত আত্মহত্যারই ইতিহাস।

কিন্তু এখনো অসংখ্য মুসলমান আছেন, যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী দেশগুলিকে ভাই ভাই রূপে দেখবার আশা রাখেন, পরিকল্পনাও করেন। কামালপাশা খেলাফৎ তুলে দেবার পর এঁদের অনেকে অখণ্ড মুসলমান সম্প্রদায় বা প্যান ইস্‌লাম ছেড়ে তার জায়গায় স্বতন্ত্র মুসলমান সম্প্রদায়গুলির ঘরোয়া উন্নতিতে মন দিয়েছেন কামালের অনুকরণে। ঐক্যের বদলে প্রগতি হয়েছে এঁদের লক্ষ্য।

যেটিই লক্ষ্য হোক, এখনো একথা সমান সত্য যে মরোক্কো থেকে বোর্ণিয়ো পর্য্যন্ত যেখানে যত মুসলমান আছেন, তারা নিজেদের সম্বন্ধে যে-নীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তারা অপরের প্রতি সেই একই মনোভাব পোষণ করেন। পোকা মুড়ার ধারণা, ইবন সাউদ তাঁর সোদর ভাই, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রাম সম্পর্কে ভাই।

ইংলণ্ডের ইহুদীরও ঠিক এই মনোভাব। তা সত্ত্বেও ইংলণ্ড পরাক্রান্ত। মুসলমানকে নিয়ে আমরাও পরাক্রান্ত হবার আশা রাখি। নিরাশার হেতু নেই; তবে পরাক্রান্ত হওয়া এক কথা, সুসমঞ্জস হওয়া অন্য। তা কি সম্ভব?

হিন্দু-মসুলমান

সম্যগ্ দৃষ্টি

লীলাময় রায়

ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান আছেন তেমনি খ্রীষ্টানও আছেন। সংখ্যা কার বেশী কার কম সেটা আকস্মিক, সত্যই আসল। সংখ্যার বাড়তি কমতি আছে, একটা বন্যায় বা ভূমিকম্পে মেজরিটি মাইনরিটি হতে পারে। সংখ্যার উপর সত্যের স্থান। খ্রীষ্টানের সংখ্যা কম বলে তাঁর অস্তিত্ব কম নয়।

খ্রীষ্টান আছেন মালাবার অঞ্চলে প্রায় প্রথম শতাব্দী থেকে। তার মানে ইস্‌লাম যদি এদেশে আট শ বছর আগে প্রচারিত হয়ে থাকে খ্রীষ্টবিশ্বাস প্রচারিত হয়েছে আঠার শ বছর আগে। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক দ্বিগুণকালব্যাপী। তবে পর্তুগীজ আগমনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টবিশ্বাসে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না, মিশনারীতে দেশ ছেয়ে যায়নি।

সম্প্রতি এদেশের খ্রীষ্টানদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির নানা নিদর্শন লক্ষিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে যাতে একটা ন্যাশনাল চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্যোগ চলেছে। এতদিন এঁরা কেউ রোমান ক্যাথলিক, কেউ চার্চ অফ ইংলণ্ডের সভ্য, কেউ ব্যাপটিষ্ট মেথডিষ্ট সীরিয়ান খ্রীষ্টান ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়ে এসেছেন। সবগুলিই বিদেশী প্রতিষ্ঠান।

'খ্রীষ্টান' এই কথাটি বৈদেশিক বলে এঁরা নিজেদের 'ঈসাপন্থী' নামকরণ করেছেন এমনও দেখা যাচ্ছে। যেমন নানকপন্থী, কবিরপন্থী, তেমনি ঈসাপন্থী। এঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আপনাদের ইতিহাস বলে স্বীকার করেছেন। ভারতে বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত সাহিত্য স্থাপত্য চিত্র এঁদেরও উত্তরাধিকার। কারণ এঁরা ভারতসন্তান, ভারতবংশে এঁদের জন্ম। ইউরোপের লোক যেমন গ্রীস ও রোমকে আপনার বলে ভালোবাসে, এঁরাও তেমনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতকে। ইউরোপীয়দের মত এঁরা কেবলমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান।

বিদেশী রক্তকে এঁদের সমাজ ফিরিঙ্গী সমাজের মত মহামূল্য মনে করে না। আবার বর্জ্জনীয় বলে দূরে সরিয়ে রাখে না। কিয়ৎপরিমাণে বিদেশী রক্ত গ্রহণ করেছেন বলে এরা বিদেশী হয়ে যাননি, বিদেশী বলে আত্মপরিচয় দেবার মোহ এঁদের নেই। ক্রমশ এঁরা বিলিতী সাজ ও বিদেশী নাম ছাড়ছেন। মাইকেলের সমসাময়িকদের নাম ছিল তাঁরই মত বৈদেশিক। একালের খ্রীষ্টানদের নাম সাধারণ বাঙ্গালীর বা মাদ্রাসীর নামের মত, যে প্রদেশে যা চলে। একজন খ্রীষ্টান বাঙ্গালীকে খ্রীষ্টান বলে চেনবার কৃত্রিম উপায় নেই।

এখন খ্রীষ্টানরা যেমন প্রথম শতাব্দীতে মালাবারে আসেন সীরিয়া থেকে, তেমনি আরবরাও এসেছিলেন ও আসতে ছিলেন ভারতের সমুদ্রতটবর্ত্তী যাবতীয় প্রদেশে। আর্য্য যুগের পূর্ব্বে যখন দ্রাবিড় যুগ ছিল তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যও ছিল। সমুদ্রযাত্রায় আরবরা চিরকাল অভ্যস্ত। আরবদের হাত দিয়েই ভারতের পণ্য ইউরোপে যেত।

তারপর কেবল যে আরবদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই নয়, পারসিকরাও কখনো যুদ্ধ করতে, কখনো সৌর উপাসনা প্রচার করতে এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে। গ্রীক, গ্রীকবংশী, শক ও হূনদের কথা সবাই জানেন। আমি শুধু জোর দিতে চাই আরব পারসিকদের উপর। এঁরা ভারতবর্ষে বসবাসও করেছিলেন, করে অবিকল ভারতবর্ষীয় হয়ে গেছলেন? আমরা হিন্দুরা এঁদেরও বংশধর।

আরবরা নিরীহ বণিক জাতি ছিলেন, ইস্‌লাম তাঁদের দিগ্বিজয়ী করে। ইস্‌লাম নিয়ে তাঁরা ভারতে এলেন, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের এদিকে অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ আফগানদের উপর পড়ল। আফগান ও তুর্কিস্থানীরাই ভারতে রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরাজিত হয়ে মুঘলকে পথ ছেড়ে দেন। পারসিকদের এতে একেবারেই হাত ছিল না।

অথচ ভারতের আফগান, তুর্কিস্থানী মুঘলরা পারস্যের ভাষাকে রাজভাষা ও আরবের ভাষাকে ধর্ম্মভাষা করলেন। সেই দুই সূত্রে আরব পারস্যের সংস্কৃতি মুসলমান সংস্কৃতিরূপে ভারতে উপনীত হলো। আরব ও পারসিক কেউ কেউ ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসে রাজসরকারে কাজ পেলেন, জায়গীর পেয়ে এদেশে বাস করলেন। এঁদের স্বকীয়তা এঁদের মুসলমানত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হলো। অন্যান্য দেশে যেমন সারাসেন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তেমনি এদেশে হলো এক বিমিশ্র সভ্যতা, তাতে রাজপুতদেরও অংশ ছিল। তা ভারতের প্রচলিত ভাষাকে গ্রহণ করে তার ক্রিয়াপদ অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে বিদেশী বিশেষ্য বিশেষণ মিশিয়ে তার নাম দিল উর্দ্দু, অর্থাৎ তাঁবুর ভাষা। সে যে রাজভাষা হলো তা নয়, তা হলো সাহেবদের সঙ্গে তাদের চাপরাশী বাবুর্চির যে ভাষায় ভাববিনিময় হয় সেই ভাষা। ক্রমশ তাতে রসের কথা বলা সম্ভব হলো, তাতে প্রাণ এলো; কিন্তু তার ক্লাসিক ভিত্তি না থাকায় তার সাহিত্য এখনো উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয়নি, সে সংস্কৃতির বাহন ততটা নয় যতটা নাগরিকতার পরিচ্ছদ। শিল্পে ঘটেছে সারাসেনের সহিত রাজপুতের মিশাল, অনেক স্থলে রাজপুতের উপর সারাসেনের প্রলেপ। মন্দিরের কারুকার্য্য নিয়ে মসজিদের অঙ্গে গ্রথিত করলে পাঠান রাজাদের কার্যসংক্ষেপ হতো। মুঘলরা কার্যসংক্ষেপ করেননি, কিন্তু তাদের কার্যে ডাক দিয়েছেন রাজপুতদের, শিল্পীদের মধ্যে ভেদ-বিচার করেননি।

ছয় সাত শ বছরের মুসলমান রাজত্বে বিদেশী রক্ত যা এসেছে তাকে তার আগের দুই তিন হাজার বছর ধরে আসা বিদেশী রক্তের চেয়ে বেশী বলবার কারণ নেই। সংস্কৃতি যা এসেছে তার সম্বন্ধেও সেই কথা। কত আরব পারসিক গ্রীক গ্রীকবংশী শক কুশান হূন তিব্বতী চীনা মগ আর্য্য দ্রাবিড় আদিম রইল একদিকে। অন্য দিকে দাঁড়াল আফগান তুর্কীস্থানী আরব পারসিক ও তাদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত পূর্ব্বোক্তবংশীয়। দুই পক্ষের নাম হয়েছে হিন্দু মুসলমান। এই নামকরণও কৃত্রিম। কারণ আরবী ভাষায় হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতীয়। এদেশের মুসলমানরাও সেই অর্থে হিন্দু। দুই পক্ষের যদি দুটো পরস্পরবিরোধী নাম দিতে হয় তবে সে নাম মুসলমান ও অমুসলমান--উভয় পক্ষই ভারতীয়।

তা হলে আমরা যাকে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বলছি সেটা মুসলমান অমুসলমান সমস্যা।

মুসলমান বলতে যদি কেবল একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বোঝাত তবে এ সমস্যা নিবদ্ধ থাকত ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। আর সে ক্ষেত্রে সমস্যাও বাস্তবিক নেই। মুসলমানরা জেনেছেন যে সাকারবাদীরা প্রতিমাপূজা করবেই, তাদের ভিতর থেকে দুই চার কোটি লোককে দীক্ষা দিয়ে মুসলমান করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের বদলে দিতে পারা যায় না, অগত্যা সহ্য করতে হয় তাদের ভ্রান্তি, তাদের অন্ধতা। আর সাকারবাদীরা নিরাকার উপাসনার বিরোধী নন, তাঁরা মনে করেন সেও সত্য।

সমস্যা হচ্ছে এই যে মুসলমানরা দেশ বিদেশ মানেন না, মানেন বিশ্বব্যাপী একাকারত্ব। গোড়াতে সেটা ছিল সর্ব্বমানবের। তারপরে হয়েছিল সর্ব্ব মুসলমানের। অবশেষে ভেঙ্গে পড়ছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খণ্ড হয়ে। বটগাছের সেই সব ঝুরি এখনো সব দেশে সমান ভাবে মাটী পায়নি। তুর্কিতে পেয়েছে, পারস্যে পাচ্ছে, ভারতে পাওয়া ত উচিত।

ভারত যদি স্বাধীন দেশ হতো তবে এর মধ্যে রাজনীতি থাকত না, কিন্তু স্বরাজের সাধনায় একে আবশ্যক বিবেচনা করায় এ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ভাগবাটোয়ারার বিতণ্ডা। তার ছোঁয়াচ লেগে জীবনের অন্যান্য অঙ্গ চুলকাচ্ছে, যেন সে একটা বিছুটির ডাল। সাহিত্যেও স্বাতন্ত্র্যের দাবী নানা বিকৃতি ঘটাচ্ছে। শিক্ষাতে ত তার বীভৎস আকৃতি। মাদ্রাসা মক্তবের কথা নাই ধরলুম, ইংরাজি বিদ্যালয়েও নামাজের সুবিধার জন্য আলাদা ক্লাস, খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত ছেড়ে খেলার বন্দোবস্তও আলাদা, মুস্‌লিম টীম না হলে মুসলমান খেলবেন না। পাঠ্য পুস্তকের বাংলা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হওয়া চাই।

খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মবিশ্বাস স্বতন্ত্র, তাদের সমাজেও বিদেশী রক্ত আছে। কিন্তু তারা ত ফিরিঙ্গীর মত দেশের মাঝখানে বিদেশকে আনতে চায় না, দেশীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে না। চট্টগ্রামের মুসলমানদের চেহারা সে অঞ্চলের হিন্দুদের মত। আর সে অঞ্চলের হিন্দুদের চেহারা অনেকটা মগ ও চাকমাদের মত। অথচ হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রবৃত্তি এমনি প্রবল সে আরবী হরফে বাংলা কাগজ ছাপা হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানকে কোনো আরব কি আরব বলে গণ্য করবেন? চট্টগ্রামের মুসলমান বর্ম্মাতে ভারতীয় বলেই গণ্য হন, হিন্দুর যা ভাগ্য তাঁরও তাই।

ভারতের মুসলমান যখন হজ করতে আরব দেশে যান তখন সকলে যেমন আপন আপন জাতীয় পরিচয় দেন এঁরাও কি তেমন দেন না? এঁরা কি বলেন না যে এঁরা ভারতীয়? আরবী ভাষায় ভারতীয় হচ্ছে হিন্দু। এঁরা কি বলেন যে এঁরা হিন্দু?

হিন্দু মুসলমান একই দেশের মাটির উপর বাড়ী করেছেন এটা আকস্মিক। এই আকস্মিকের উপর মিলনের প্রতিষ্ঠা হতে পারে

না। মিলন হয় যদি দেশের সনাতন ধারার সঙ্গে এঁরা আপন আপন সত্তা মিলিয়ে দেন। প্রত্যেক দেশের একটি সনাতন ধারা আছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য আসেননি তখনো এ ধারা ছিল। আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গ যাননি তখনো এ ধারা ছিল। জয়গর্বে, আত্মাভিমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আগন্তুকরা আদিমদের অগ্রাহ্য করেন, সনাতন ধারাকে করেন অস্বীকার। মহাকাল নেন এর প্রতিশোধ। একদিন না একদিন আগন্তুকের ঘাড় ধরে একই ঘাটে জল খাওয়ান। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নেটিভদের দ্বারা অতি অলক্ষ্যে প্রভাবিত হচ্ছেন। নেটিভরা কেবল মানুষ নয় ওরা দেশ। দেশের জল বাতাস বন আকাশ ওদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। ওরা বিজিত হতে পারে, কিন্তু ওদের দেশ একদিন জয়ী হয় আগন্তুকের উপর। কাইজারলিং তাঁর "ইউরোপ" নামক গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। দেশের অতীতকে মেনে নিতেই হবে, নিস্তার নেই। ধর্ম্মবিশ্বাস তার সঙ্গে লড়াই করে পারে না, সামঞ্জস্য করতে বাধ্য হয়। আর্য্য বলে আমরা বড়াই করতে পারি, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধি আর আছে কি? সে সমাজব্যবস্থাই বা কোথায়? দ্রাবিড় জয়লাভ করেছে, আদিম তার সাথে যোগ দিয়েছে। আগন্তুক আর্য্যদের নাম নয়, আদিমদের জননীর নাম আজ আমরা ধারণ করেছি। আমরা হিন্দের সন্তান। আমরা হিন্দু। যে সব আর্য্য ভারতের বাইরে থেকে গেছেন যেমন জার্মান বা ইংরাজ—তাদের প্রতি আমাদের মমতা নেই। আমাদের ভারতীয়ত্বই আমাদের প্রকৃত রূপ। আমাদের আর্য্যামি একটা পৈতামহিক পরিচ্ছদ।

মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষ হিন্দু থাকতে "দাস্য সুখে হাস্যমুখ বিনীত যোড় কর" ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে "উন্নত মম শির" বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে "নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।" হিন্দুসমাজে যে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল ওকথা বলতে পারেন। জনসাধারণকে ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে হিন্দুসমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। ইস্‌লাম না নিয়ে থাকলে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের এত প্রাণ থাকত না।

ধার্ম্মিকের চিরকৌমার্য্যের প্রতি হিন্দুসমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত আছে এবং বিধবার পক্ষে এই হল বিধি। এগুলি হয়ত আমাদের তিব্বতী ও দ্রাবিড় পূর্ব্বপুরুষের কাছে পাওয়া সংস্কার। আর্য্যত্ব এসবের সমর্থন করে না। এমনি একটি সংস্কার আমাদের গোভক্তি। যারা ছাগরক্তে কালীঘাট ধৌত করছে, বলিদানে মহিষাসুর বধ করতে যারা দ্বিধা করে না, গোমাতাকে প্রহার করা যাদের নিত্য কাজ তারাই মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত, ওরা যে গোরু খায়! এসব সংস্কার যে কত বিসদৃশ ইস্‌লাম গ্রহণ করলে এক মুহূর্ত্তে বোঝা যায়।

হিন্দু ও মুসলমানে সামাজিক বিভেদ স্থায়ী হবে। তবে মুসলমানকে দেখে হিন্দু অনেক শিখেছে, অনেক শিখবে। যতদূর আমার চোখ যায় আমি অন্য সমস্ত সংস্কারের বিলোপ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সাকার উপাসনার নয়, জাতিবিভাগের নয়। হিন্দুসমাজ এ দুটির বেলায় নাছোড়বান্দা। নিরাকার উপাসনায় হস্তক্ষেপ করবে না, অসবর্ণ বিবাহ সহ্য করবে, কিন্তু যতই উদার হোক মুসলমান সমাজের মত একাকার হয়ে নিরাকারনিষ্ঠ হবে না। যারা বৈধব্যের দুঃখে বা অপমানের জ্বালায় মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল হিন্দু সমাজ তাদের যেতে দিতে চায় না, তাদের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করতে উদ্যত, যতটা উদার হলে তাদের ধরে রাখা যায় ততটা উদার হতে প্রস্তুত। কিন্তু জাতিবিভাগের কাঠামো মোটের উপর এমনি থাকবে, সাকারবাদের মূল তত্ত্ব ত্যাগ করা চলবে না। আমাদের দ্রাবিড় পূর্ব্বপুরুষ আরো পাঁচ সাত শতাব্দী কর্ত্তৃত্ব করবেন। এ আমাদের বিধিলিপি। তাই আমাদের সংস্কারকরা—'ব্রাহ্মরা' —হাল ছেড়ে দিয়েছেন। পর্দ্দা প্রথা, বহুবিবাহ, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি যাবার মুখে, কিন্তু জাতিবিভাগ ও সাকার-উপাসনা থাকার দলে।

সুতরাং মুসলমান আদর্শের প্রয়োজন আছে। খৃষ্টান আদর্শেরও। এদের উপস্থিতি আমাদের সংস্কারকদের বল দেবে। সেমিটিক না থাকলে ভারত কেমন করে মহামানবের সাগরতীর হবে?

মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে বেদের যুগ এক হাজার বছর, বেদ থেকে বুদ্ধদেব এক হাজার, বুদ্ধ থেকে কালিদাস এক হাজার বছর, কালিদাস থেকে আকবর এক হাজার। আকবরের যুগ থেকে এখনো এক হাজার বছর হয়নি, যখন হবে তখন অর্থাৎ সাত শ বছর পরে ভারতের সামাজিক বিভেদ থাকবে না বলে আশা করা যাক। তার আগে যদি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শী প্রভৃতির মিলন সম্ভব হয় তবে তা হবে একটিমাত্র উপায়ে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতসন্তানের চিত্তে ভারতের ঐতিহ্যের ও ভারতের ভবিষ্যের প্রতি মমতার সঞ্চারে। এর জন্য ঐক্যের প্রয়োজন নেই, এরই থেকে ঐক্য একদিন আসবে।

(শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৪১)

হিন্দু মুসলমান
সমাজের গঠন

লীলাময় রায়

আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হয়নি। যদি কোনো দিন হয়, তবে সম্ভবত আমার এই আনুমানিক ইতিহাসের খসড়া নেহাৎ অকেজো বোধ হবে না।

আদিমদের যুগের সমাজকে এক সেল (সেল) বিশিষ্ট প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তাদের জীবিকা বলতে মাত্র একটি জিনিষ বোঝাত, সেটি হচ্ছে শিকার। সমাজের সকল পুরুষের সেই ছিল পেশা। শিকারে সরঞ্জাম যা লাগত তা নিজেরাই বানিয়ে নিত। পাক করত স্ত্রীরা। কাপড়ের দরকার ছিল না। যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের সম্পত্তির বালাই নেই। ভূমির যে কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে তাও মৃগয়াজীবীদের অজ্ঞাত। সুতরাং একজনের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী কে হবে তা স্থির করা অনাবশ্যক। উত্তরাধিকারী স্থির করার সুবিধার জন্যই বিবাহ প্রথার উৎপত্তি। বিবাহের উদ্দেশ্য কে কার পিতা ও কে কার পুত্র এই তথ্য নিরীকরণ। এই তথ্যকে কেন্দ্র করে পরিবারের সৃষ্টি। পুরুষ বল্লে, "আমার সম্পত্তি আমি আমার পুত্রকে দেব। কিন্তু কেমন করে জানব কে আমার পুত্র? জানব যদি কোনো নারী আমার সঙ্গে--একমাত্র আমারি সঙ্গে--বাস করে। যদি আমার প্রতি সত্যপরায়ণা হয়, সতী হয়।" নারী বল্লে, "আমার সন্তান তোমার সম্পত্তি পাবে। এই সর্ত্তে আমি তোমার অনুগতা হতে--তোমার সতী স্ত্রী হতে--সম্মত আছি।"

আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে আদিম ছাড়া অন্য যে কয়টি জাতি ছিল তারা যে কে কখন ও কোনখান থেকে এসেছিল তা স্থির করা কঠিন। এই পর্যান্ত স্থির যে তারা স্বতন্ত্রভাবে নানাদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং আদিমদেরকে রেড ইণ্ডিয়ানদের মত খেদিয়ে দিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে বসেছিল। তারা গোড়া থেকে সভ্য ছিল, কি ক্রমে ক্রমে সভ্য হলো, তাও বলা কঠিন। কিন্তু তারা যে আর্য্য আগন্তুকদের চেয়ে সভ্য ছিল এর ভুল নেই। আমরাই ভুল করে থাকি আর্য্যদেরকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের চেয়ে সভ্য মনে করে। এটা আমাদের আগন্তুক মানসিকতা।

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে হিন্দুরা কম সভ্য ছিল না, তবু আমাদের মুসলমানদের ধারণা তাঁদের খানা ও পোসাক বেশী জাঁকালো বলে তাঁরাই সভ্যতর। তেমনি আমাদের আর্য্যামির মোহ। আসলে কিন্তু আর্য্যেরা ছিলেন মোটের উপর আদিমের মত এক 'সেল' সম্পন্ন প্রাণী। মৃগয়ার অতিরিক্ত তাঁদের করণীয় ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, তাঁরা আসবার সময় বেদের কতক অংশ রচনা করে সঙ্গে এনেছিলেন। কেমন করে তাঁরা এদেশে এলেন এ সম্বন্ধে আমার অনুমান এই যে, তাঁরা এলেন ঠিক তেমনি করে যেমন করে পরে এলেন পাঠান ও পাঠানের পরে মোগল। অর্থাৎ ভারতের গৃহশত্রুর আমন্ত্রণে। কোনো এক জয়চাঁদ কিম্বা লোদি বংশাবতংস তাঁদের ডাকলেন মিত্ররূপে। তাঁরা মিত্র হয়ে এলেন, রাজা হয়ে থাকলেন। আর্য্যদের আগমন একবারে ঘটেনি। একই পথেও তাঁদের সকলে আসেননি। আর এক জাতিও তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের নানা শাখা, নানা উপজাতি ছিল। আর্য্যদের আগমন বহু শতাব্দী কাল ব্যাপী।

তাঁরা এসে দেখলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের বিবেচনায় বর্ব্বর। আপনাকে বড় ও অপরকে ছোট মনে করে মানবমাত্রেই, বিশেষ করে বিজেতা মানব। এই অহঙ্কারটুকু অক্ষুন্ন রেখে তাঁরা যা দেখলেন তাই আত্মসাৎ করতে লাগলেন। আর্য্যপূর্ব্ব ভারতীয়দের সমাজদেহ বহু 'সেল' সম্পন্ন জটিল ছিল। তাদের কেউ করে চাষ, কেউ করে ভোগোপকরণ নির্ম্মাণ, কেউ করে আমদানি রপ্তানি, কেউ কেবল যুদ্ধই করে। ইংরাজরা যেমন মোগলদের শাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে তারই চাকাটা স্প্রিংটা কব্জাটা ইস্ক্রুপটা যখন যেটা দরকার তখন সেটা পাল্টিয়ে ও যোগ করে তাকে আজ পৌনে দু'শো বছর পরে ভিন্ন আকার দিয়েছেন, তেমনি আর্য্যরাও দ্রাবিড় ইত্যাদির চলন্ত ঘড়িতে দম দিতে দিতে মেরামত করতে করতে উন্নত করতে করতে তাকে আজ হিন্দুসমাজ নামক বিচিত্র জটিল দুর্ব্বোধ্য একটি ঘড়িতে পরিণত করেছেন।

জাতিবিভাগ ভারতের বৈশিষ্ট্য। এর তাৎপর্য্য এই যে সমাজের এক অঙ্গের কাজ অপর অঙ্গ করবে না, সেই অঙ্গই করতে থাকবে। এই উপায়ে প্রতিযোগিতা ও তার আনুসঙ্গিক অনিশ্চয়তা নিবারিত হবে। ইউরোপের সমাজে সকলের সব ব্যবসায়ে অধিকার আছে। ভারতে ডোমের অধিকার নেই ময়লা সাফ করবার। হাড়ির অধিকার নেই মড়া ছোঁবার। একের কাজ করতে অপর অসম্মত। তাতে উভয়ের অন্ন থাকে। এক পক্ষের অন্ন যায় না।

একান্নবর্তী পরিবার ভারতের বৈশিষ্ট্য না হলেও ভারতে বদ্ধমূল। বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেক সভ্য প্রয়োজনমত খাদ্যপরিধেয় পায়, সাধ্যমত উপার্জ্জন ক'রে পারিবারিক ভাণ্ডারে দেয়। বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা, বিকলাঙ্গ এদের ভরণপোষণের জন্য সমাজকে চাঁদা দিতে বা রাষ্ট্রকে সদাব্রত খুলতে হয় না। পরিবারের উপরই এর ভার।

আমার মনে হয় আর্য্যদের পূর্ব্বেই জাতিবিভাগ ও একান্নবর্ত্তী প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এমন বিপুল আয়তনে নয়। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রথা দিনে দিনে, বছরে বছরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে বিরাট বটবৃক্ষের ব্যাপকতা পায়। কোনো একদিন একদল বুদ্ধিমান মিলে রাতারাতি সমাজ গঠন করেন না। সমাজ গঠিত হয় বহুদিনের প্রয়োজনে, পরীক্ষায়, ভুলভ্রান্তির অভিজ্ঞতায়।

জাতিবিভাগ ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেমন সুবিধার দিক ছিল, তেমনি অসুবিধারও দিক ছিল। যারা এই ব্যবস্থায় আরাম বোধ করেনি, তারা এর বাইরে চলে গেছে, হয়েছে সন্ন্যাসী, গড়েছে সঙ্ঘ। আজকাল সঙ্ঘ শব্দের অপব্যবহার হচ্ছে, আশ্রম শব্দেরও। সেকালে একটা ছিল সন্ন্যাসীদের, অন্যটা গৃহীদের--গৃহস্থাশ্রমে আস্থাবান ঋষিদের। একালে সব উল্টোপাল্টা।

মুসলমান আগমনের সময় ভারতীয় সমাজের মোটামুটি কাঠামো এই রকম ছিল। আগন্তুকরা নিজেদের একটা সমাজ আনলেন সাথে। কিন্তু তাঁদের সমাজ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল না। তার মানে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সমাজের সকল অঙ্গ আসেনি। সাধারণতঃ যোদ্ধা, বণিক ও ধর্ম্মজ্ঞ মিলে প্রথম দিকের ভারতীয় মুসলমান সমাজ গঠন করেছিলেন। হারেমের খোজা, ঘোড়ার সহিস, তাঁবুর বাহক, খানার পাচক ও পোষাকের দর্জ্জিও কিছু ছিল। বাকী সব ভারতবর্ষেই পাওয়া গেল। হিন্দুর সেবা নিতে মুসলমানের কোনো দিন আপত্তি হয়নি, যেক্ষেত্রে হয়েছে সেক্ষেত্রে হিন্দুকে দীক্ষা দিয়ে মুসলমান বানাতে সময় লাগেনি। ইউরোপীয়রা যখন এদেশে প্রথম আসেন তখন মুসলমান চাকরবাকরের দ্বারা তাঁদের অধিকাংশ কাজ চলত। যখন অচল হতো তখন কোনো এক গরীবকে ছলে বলে কৌশলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষা দিলে আর ভাবনা থাকত না। আগন্তুক জাতি মাত্রেই বিজিত জাতির স্ত্রীলোক গ্রহণ ক'রে তার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে নিজের সমাজের নীচের স্তরে জায়গা দিয়ে তার সেবা সুলভে পেয়েছেন। আর্য্য, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ কেউ এবিষয়ে দ্বিধা বোধ করেননি। এখনো দেশের বহু অঞ্চলে বড়লোকদের দাসদাসীর অভাব বড়লোক স্বীয় পৌরুষের দ্বারা দূর করে থাকেন।

বিজেতাকে বয়কট করার নীতি আজকের নয়। হিন্দু সমাজ আটশো বছর আগে সংকল্প করে, মুসলমানের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। এই বয়কটের ভাব এখনো লোপ পায়নি। মুসলমানের জল খাবো না, তাকে স্পর্শ করলে স্নান করব ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে আসছে। এই নীতির ভুক্তভোগী মুসলমান আমাকে দুঃখের সহিত জানিয়েছেন যে এতকাল একত্র থেকেও তাঁরা হিন্দুর কাছে পল্লী-অঞ্চলে উদার ব্যবহার পাননি, এমন কি যেক্ষেত্রে হিন্দুরা তাঁদের প্রতিবেশী ও বন্ধুসদৃশ। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে তাঁরা হয় বিজেতারূপে এসেছেন, নয় বিজেতার দলে যোগ দিয়ে পর হয়ে গেছেন। হৃদয় জয় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। যারা হারে তারা কখনো ভোলে না, ক্ষমাও করে না তারা মহত্ত্বের পরিচয় না পেলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে হিন্দুদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। মুসলমান পীর হিন্দুরও গুরু। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান--মুসলমান সমাজ--হিন্দুসমাজের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন? হৃদয়জয়ের কোনো চেষ্টা হয়েছে কি? আকবরের সময় যা হয়েছিল সেটা তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টা, তাঁর জনকয়েক বন্ধুর চেষ্টা। কিন্তু প্রায় দুশো বছর হলো বিজিত হয়েও মুসলমান সমাজ আজো সেই বিজেতা ও বিদেশী মানসিকতা নিয়ে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করছে। আর্য্যকে দ্রাবিড় ক্ষমা করেছে, কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু ক্ষমা করেনি। এর কারণ সমষ্টিগতভাবে মুসলমান হিন্দুকে প্রসন্ন করেনি। এখনো মুসলমান সমাজের মন থেকে যাচ্ছে না যে, সে নিজে গরীব বলে কি হয় তার তুর্কী মামা, তার আরবী চাচা, তার আফগান দাদা বড়লোক। বিজিত হিন্দুদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, এরা তো ছোটলোক। আর এই যে ভারতবর্ষ, এও তার মাতৃভূমি নয়--এ তার হারানো জমিদারি। এর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলানো তার পক্ষে অবান্তর! তার ইসলাম তো তাকে এ কাজে উৎসাহ দিচ্ছে না।

কেমন করে সম্ভব হলো তার ইতিহাস নেই, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে 'ভারতবর্ষের মুসলমানদের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও তাদের বসতি বাংলায় ও পাঞ্জাবে। কেন যে মাঝখানে যুক্তপ্রদেশ ও বেহার বাদ গেল, কেমন করে যে লাফ দিয়ে মুসলমান মেজরিটি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এলো, এর গবেষণা চাই। আবার এই দুই মেজরিটি কেন যে কৃষিজীবী হলো তাও গবেষণার বিষয়। পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্য যে সব প্রদেশে মুসলমান বিদ্যমান সে সব প্রদেশে তারা চাষ করে না, গ্রামে থাকে না, অবশ্য এ উক্তির ব্যতিক্রম আছে। সচরাচর সে সব প্রদেশের মুসলমান ভূম্যধিকারী, বাণিজ্যজীবী ও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত। পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম। কাজেই সেখানকার মেজরিটির সংখ্যা বাংলার মাইনরিটির চেয়ে অনেক কম। বাংলা যদি অতি উর্ব্বর প্রদেশ না হতো, তবে এখানে না হিন্দু না মুসলমান কোনো সমাজের লোক এত বহুল সংখ্যক হতে পারত না।

বাংলায় দেখা যাচ্ছে চাষ প্রধানতঃ মুসলমানের হাতে। চাষী মুসলমান একটা জাত না হলেও জাতের যাবতীয় লক্ষণ তাদের ভিতর আছে। তারা ক্কচিৎ অন্য প্রকার মুসলমানের সঙ্গে বিবাহাদি করে কিম্বা খায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারও তাদের তেমনি হিন্দুদের যেমন। সম্পত্তিতে কন্যার অধিকতর থাকায় বহুবিবাহের প্রলোভন অনেকে এড়াতে পারে না। স্ত্রীর সম্পত্তির লোভে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। তাতে জনসংখ্যা এত বেশী বাড়ে যে সম্পত্তির ভাগ হলে দেখা যায় সম্পত্তির চেয়ে শরিক বেশী। বিধবার ভাগে সম্পত্তি পড়ায় বিধবাকে বিবাহ করতে অনেকের আগ্রহ। মুসলমান সমাজে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চাষী মুসলমানদের বেলায়।

আশ্চর্য্য এই যে চাষকে বাংলার ইস্‌লাম সম্মানকর মনে করে, অথচ তাঁতকে করে ঘৃণা। কসাইয়ের কাজ গর্হিত নয়, কিন্তু ধীবরের কাজ অবজ্ঞাত। তাঁতী ও জেলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে এরা সেন্‌সাসে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে নারাজ। এদের সঙ্গে চাষী মুসলমান কুটুম্বিতা করে না, এরা এক হিসাবে অন্ত্যজ। ঢাক বাজায়, গান করে, সাপ খেলায় এমন মুসলমান আছে বিস্তর। কিন্তু ইস্‌লামে এসব কাজ নিষিদ্ধ। সুতরাং এদের সঙ্গে বিবাহাদি করাও সৎ মুসলমানের পক্ষে নিন্দনীয়। আরো উদাহরণ দিতে পারতুম।

তা হলে মুসলমান সমাজেও এক প্রকার জাতিবিভাগ আছে। এটা অবশ্য সমাজের অননুমোদিত। কিন্তু সমাজ জানে যে এটা আছে। ভাষান্তরে, এটা Officially নেই, Unofficially আছে।

বস্তুতঃ একটা দেশে দুটো সামাজিক কাঠামো থাকতে পারে না। পাঠকরা যতই এবিষয়ে চিন্তা করবেন ততই উপলব্ধি করবেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান যে-ই সমাজ স্থাপন করুক তাকে প্রতিযোগিতার পাশ কাটিয়ে সহযোগিতার আয়োজন করতে হবে। এইটেই ভারতের বিশেষত্ব। এদেশের প্রকৃতি প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী নয়। ইউরোপ ভালোবাসে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাবিহীন জীবন কল্পনা করতে পারে না বলে যেখানে গেছে সেখানে প্রতিযোগিতা বহন করে নিয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে এই যে শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না, কাফ্রিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে, সুতরাং তাদের সরিয়ে আলাদা করে রাখবে, সুযোগ পেলে তাদের তাড়িয়ে দেবে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বেচাকেনা করে, হিন্দু মেথর না হলে মুসলমানের চলে না, নাপিতও হিন্দু, ধোপাও। আবার মুসলমানদের এযাবত এমন কতগুলো কাজ একচেটে ছিল যা হিন্দুরা করতে জানত না কিম্বা করতে চাইত না। যেমন দর্জ্জি, দপ্তরী, গাড়োয়ান, চামড়ার ব্যাপারী ইত্যাদির কাজ। লস্করের কাজ এখনো মুসলমানদের একচেটে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় একটা সামঞ্জস্য শ্বেত মনুষ্যদের অনভিপ্রেত। সেদেশে তিনটে সমাজ আছে, কিন্তু বৈবসায়িক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে তিনটের বেশী সমাজ আছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্সী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন। কিন্তু আহারবিহার ব্যতীত অন্য কিছু নিষিদ্ধ নয়। যদি বৈবসায়িক অসহযোগ থাকত তবে হিন্দু মেথর এদের সকলের মল পরিষ্কার করতে চাইত না; তার ফলে মুস্‌লিম মেথর, খ্রীষ্টান মেথর, পার্সী মেথর ইত্যাদির উদ্ভব হতো। তার মানে এই সব সমাজে জাতিবিভাগ যা আছে তার বহুগুণ থাকত। হিন্দুর জাতিবিভাগ থাকায় ভারতের সকলের কত সুবিধা হয়েছে তার একটা উদাহরণ দিলুম। ধরতে গেলে এ আমাদের সকল সমাজের আবশ্যকীয় জাতিবিভাগ। সব সমাজের এতে স্বার্থ আছে। মুসলমান খ্রীষ্টান মুখে যাই বলুক না কেন, আমি নিজে দেখেছি আমাদের মেথরদের তাঁরা আমাদেরই মত ঘৃণা করেন। আমরা জুতো খুলে মস্‌জিদে ঢুকতে পাই, মেথর কলমা পড়ে ব্যবসায় ত্যাগ না করলে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। জাতব্যবসা ছাড়াটাই যদি উন্নতির ছাড়পত্র হয় তবে সমাজের কি দশা হবে--কেবল হিন্দু সমাজের নয়, মেথরসেবিত সব সমাজের?

(বুলবুল : কার্তিক-পৌষ, ২য় বর্ষ, ১৩৪১)

হিন্দু-মুস্‌লিম্

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

হিন্দু-মুস্‌লিম সম্পর্ক দেশের একটী বৃহৎ সমস্যা। যে-দিন এর সৃষ্টি হ'লো, সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এর দুই রকমের সমাধান-চেষ্টা ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে : প্রথম ধার্ম্মিক, দ্বিতীয় রাষ্ট্রিক। রাষ্ট্রিক মিলন-চেষ্টার আজো অন্ত নেই; আর ধার্ম্মিক ঐক্য-সাধনার যে-প্রয়াস, ব্যর্থতার লজ্জায় হ'লো তার পর্য্যবসান। আমাদের যে-সব মহাজন ভারতীয় এবং তার বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতগুলোর ভেতর থেকে একটা সামান্য ধর্ম্ম উদ্ভাবন ক'রে তার মধ্যে এদেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁরা দেখেন নি যে, সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তার পত্র-পুষ্প, তার বর্ণ বৈচিত্র্য, তার বাইরের প্রকাশের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তার প্রাণবস্তু—যাকে গ্রহণ ক'রে, যার রসে রসায়িত হ'য়ে তার উত্থান, তার বিস্তার, চিরদিন সে রইলো জনগণের গণনার অন্তরালে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আসল ধর্ম্ম হ'লো তার অনুষ্ঠান, তার আচার, তার সমারোহ, তার যাবতীয় অনুষঙ্গ;—তার মর্ম্ম, তার তত্ত্ব হ'লো নিতান্তই গৌণ।

ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে জন-সাধারণের এই সংজ্ঞাহীনতা কোনো কালে কোনো দেশে কঠিন আবিষ্কারের বিষয় নয়। তথাপি যে আমাদের দেশের মহাজনেরা তত্ত্বের পথে মানুষকে আহ্বান ক'রে সমস্যার সমাধান কামনা ক'রেছিলেন, যে-টী বড়ো-জোর তার অবচেতনার অন্তর্গত সেটীকে তার সহজ সুস্পষ্ট চেতনার বিষয়ীভূত ভেবে মরমী মানুষকে মিলনের মসৃণ পথে ডেকেছিলেন, তার কারণ : বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রাণবস্তুর সঙ্গে, মর্ম্ম-তত্ত্বের সঙ্গে, তাদের জীবন ও শক্তির উৎসের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ই ছিল অপ্রচুর। এইজন্যেই পরস্পরের বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটী বস্তুর মধ্যে তাঁদের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেন তাঁদের প্রত্যাশাকে পরিহাস কর্ব্বার জন্যেই তাঁদের হিত-চেষ্টার বিপরীত ফলের মতো এক একটী উপধর্ম্ম বা সঙ্কর ধর্ম্ম জন্মলাভ ক'রেছিলো। তাতে সমস্যার সমাধান হয় নি, বরং সেটী কঠিনতর জটিলতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

বস্তুতঃ যাঁরা দেশের এই কঠিন সমস্যার সমাধান আন্তরিকতার সঙ্গে কামনা করেন, তাঁদের আজ এ-কথা পরিষ্কারভাবে বুঝবার প্রয়োজন হয়েছে যে, ভারতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা, এদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইস্‌লামের মূলতত্ত্বের মধ্যে অবিরোধ কল্পনা ক'রে এদের বন্ধুত্ব বিধানের প্রয়াস, ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কেন বাধ্য, সেটী বুঝতে হ'লে এই দুইটী ধর্ম্মের গোড়ার দিকে একটু তাকানো দরকার।

এদেশী প্রাচীন ধর্ম্মের গোড়া মেলা কঠিন। অতীতের অন্তহীন আবছায়ায় সে গেছে হারিয়ে। কিন্তু তার মূল আপাততঃ আমাদের সামনে না থাক্‌লেও তার হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের যে-পরিণাম, তাকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তার অন্তর-বাহির আজ আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট। বলা হয় : ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মও একটী সঙ্কর ধর্ম্ম; দ্রাবিড় ও আর্য্য ধর্ম্মের পরস্পরকে ধর্ষণ ও আকর্ষণের এই ফল। কিন্তু এটী বিশেষভাবে আমাদের দেখবার বিষয় নয়। আমরা আজ শুধু এই দেখতে পাচ্ছি যে, ইস্‌লাম যখন আরব মরুর বক্ষ ভেদ ক'রে উঠেছিল, সে দিন তার সঙ্গে লড়াই ক'রেছিল—তাকে হত্যা কর্ব্বার জন্যে অস্ত্র উদ্যত ক'রেছিল সে-দেশেরও একটী প্রাচীন সঙ্কর ধর্ম্ম, তার সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য ও সমতা অতি বিস্ময়কর। বর্ত্তমান ভারতীয় ধর্ম্মের যে-সব নিদর্শন—যেমন, জড়পূজা, প্রকৃতিপূজা, প্রতিমাপূজা, অসাম্য, জাতিভেদ, পৌরোহিত্যবাদ, নারীকে সম্পত্তি-জ্ঞান, এ-সমস্ত প্রাক্-ইসলামীয় আরব ধর্ম্মেরও ছিল শ্রেষ্ঠ পরিচয়-চিহ্ন। পৌত্তলিকতার উপাসক হ'য়েও আরবরা স্বীকার কর্ত্তেন অনাদি অনন্ত নিরুপম এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে; পৌত্তলিক ভারতীয়েরাও মানেন এক পরম ব্রহ্মকে, যিনি অমূর্ত্ত হ'য়েও সর্ব্বশক্তিমান। প্রাচীন আরবেরা শিশু কন্যা হত্যা কর্ত্তেন; ভারতীয়দেরও প্রথা ছিল গঙ্গা সাগরে সন্তান-নিক্ষেপের। গোত্রভেদ, গোষ্ঠিভেদ, মানুষে-মানুষে ঘোর অসাম্য ও অধিকার-ভেদ ছিল আরব সমাজের অঙ্গের ভূষণ; জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ, মানুষে-মানুষে অসম অধিকার হ'লো ভারতীয় সমাজের

বৈশিষ্ট্য। পুরোহিতদের পুরোবর্ত্তিতা ও প্রাধান্য-স্বীকার দুই ধর্ম্মেরই অচ্ছেদ্য বিধান। যৌন ব্যভিচার ও বীভৎসতার যে-চিত্র প্রাচীন আরব সমাজ-পটে অঙ্কিত, তার চেয়ে আরো লজ্জাস্কর ছবি আমরা দেখতে পাই ভারতীয় মন্দিরের প্রাচীরে প্রাচীরে, ঋষি-দেবতার চরিত্রের চিত্রে চিত্রে, সামাজিক ও ধর্ম্মীয় প্রথা-আচারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মন্ত্র-উচ্চারণের অপরাধে জিহ্বা কর্ত্তনের আদেশ, শাস্ত্র-বাণী শ্রবণের অপরাধে উত্তপ্ত গলন্ত সীসক দ্বারা ইন্দ্রিয়-রোধের ব্যবস্থা, বর্ণ-হিন্দুর পথে পঞ্চম-পারিয়ার পদ-চারণার নিষেধাজ্ঞা, মানুষের অঙ্গ-স্পর্শে, এমন কি ছায়ার ছোঁয়ায় পানাহার গ্রহণের অযোগ্য হওয়ার বিধান, আরব সমাজে ছিল না; কিন্তু ছিল ভারতেরই মতো অধম শূদ্র দাস-ক্রীতদাসের প্রতি নির্ম্মম অমানুষিক ব্যবহার; ছিল নারীকে নরকের দ্বার জেনেও তার নিঃসঙ্কোচ সত্তায়, তার স্ত্রী-দেহে বিধিহীন বীভৎস অধিকার। পাপে লজ্জায় অপমানে তখন মানবতা মরণার্ত্ত কণ্ঠে বিধাতার দয়া ভিক্ষা ক'রেছিল। ভারতে আজো এর অবসান হয় নি।

ইস্‌লাম যখন আপনার সত্য নিয়ে, শক্তি নিয়ে প্রকাশিত হ'লো, প্রাচীন আরব প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো; তার ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র ও নীতির এমন অদ্ভুত ও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটলো যে, তাকে আর চিনবার জো-টা রইলো না। কিন্তু এ কি অল্পায়াসে হয়েছিলো? কতো অপ্রত্যয় অবিশ্বাস অত্যাচার নির্য্যাতন; কতো সংশয় সংগ্রাম সংবোধ; কতো প্রলোভন প্রতারণা আবেদন সন্ধি-প্রার্থনা সমন্বয়-প্রয়াস ইস্‌লামের সত্যের পথ রোধ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু ইস্‌লাম সন্ধি করে নি, আপোষের তাগিদে নিজের ক্ষতি কখনো মেনে নেয় নি; বরং আপনাকে রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রাচীন ধর্ম্মের যা-কিছু পরিচয়, তাদের ইন্ধনে সত্যের আগুন জ্বেলেছিল। জ্বেলেছিল, কেননা তার জন্ম হ'লো মানুষ-সমাজের যে অপরিচ্ছন্নতা দূর কর্ব্বার জন্যে, তাকে পুড়িয়ে ছাই না কল্লে তার জন্মই হ'তো মিথ্যে।

এদেশের যাঁরা ইস্‌লামের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের সঙ্গতি কামনা করেছিলেন, তাঁদের প্রয়োজন ছিল ইস্‌লামের জন্ম-ইতিহাসের এই যে বারতা, তাকে এর বাইরে টেনে নিয়ে যাবার। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের প্রয়াস হ'লো প্রাণপণ; কিন্তু তাঁদের প্রয়াসের যে-ফল আমরা পেলুম, তাতে ইসলাম ও ভারতীয় মিলে হ'লো ভারতীয়, ইস্‌লাম গেলো ধুয়ে মুছে। অর্থাৎ ভারতে ইস্‌লাম বেঁচে আছে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি— ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্টের প্রতি, তার বিরুদ্ধতার মধ্যে। এর বাইরে সে নেই; কেন না সেখানে তার জীবন অসম্ভব। "দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে"—প্রাচীন ভারতের পক্ষ থেকে এই যে আমন্ত্রণ, এ হ'লো ইস্‌লামের বিনষ্টির আহ্বান। ভারতীয় ধর্ম্মসমাজ ও রাষ্ট্রের যে বিশিষ্ট আদর্শ, ইসলাম কর্ত্তে চায় তার মূলোচ্ছেদ। এখানে আপোষের কথা আসে না।

এই জন্যেই ধর্ম্ম-সমন্বয় যাঁরা চেয়েছেন, তাঁরা মিলনের সাক্ষাৎ পান নি; পেয়েছেন এক একটী সঙ্কর ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বা মতবাদ যারা ভারতীয় সমস্যার জটিলতা বাড়িয়েছে, কমায় নি! যাঁরা চাইলেন মিলন, কামনা কল্লেন সন্ধি, তাঁদের সম্মুখে আজ অবিরাম সংঘর্ষ আর শান্তিনাশা সংগ্রাম। কংফুচপন্থী ও তাওপন্থীর সঙ্গে ইসলামপন্থীর কেমন ক'রে মিলন হ'লো, কেমন করে চীনা জাতীয়তার কাছে ইসলাম আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলে—এ-প্রশ্ন যদিও কাউকে কাউকে বেশ খানিক ভাবিয়েছে, কিন্তু বস্তুতঃ এটী কোনো কঠিন প্রশ্ন নয়। জগতের যে-সব দেশে ইসলামের বিস্তার, তাদের ভেতর একমাত্র চীনেই রাজ্যাধিকার তার ভাগ্য হয় নি এবং সংখ্যায়, শিক্ষায়, অর্থে, শক্তিতে সেখানে তার যে লঘুতা সেই তার প্রকাশকে, তার প্রতিষ্ঠাকে সেদেশে ব্যাহত করেছিলো। মুস্‌লিমের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন সেখানে শুরু থেকেই হয়েছিলো অবরুদ্ধ। প্রাচীন চীনের বিষবাষ্প বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্বাসরোধ করেছিল। ইসলামের প্রতি সে এর থেকে স্বতন্ত্র আচরণ করে নি। অনাত্মীয় পরিবেশে—বৈরিতার উদ্যত তরবারির তলেও যে-শক্তির বলে ইসলাম অন্য দেশে আপনাকে প্রসারিত করেছিল, চীনের সংস্কার ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্র তার মূলে হেনেছিল কুঠারাঘাত। সে আঘাত ব্যর্থ যায় নি, চীনে ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। এই হৃতশক্তি, আদর্শচ্যুত আত্মবিস্মৃত জীবন্মৃত ইসলাম আর যার হোক, মুস্‌লিমের কাম্য নয়, হতে পারে না, মুহূর্ত্তের জন্যেও না।

মুস্‌লিমের এই মনোভাবকে কেউ বল্লেন অন্ধতা, কেউ বা পরবিমুখতা; কেউ কেউ আর একটু রং চড়িয়ে বল্লেন একগুঁয়েমি, গোঁয়ার্তুমি। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, মুস্‌লিম শাস্ত্রশাসিত সমাজের মধ্যে নতুনতম। পুরাতনের অন্তর-বাহিরকে সে বিশেষরূপে জানে; এবং জানে ব'লেই নবতর, শ্রেয়তর পথে তার গতি। ইস্‌লামের যখন আবির্ভাব

হ'লো, প্রাচীন আরব তাকে ভেবেছিল বেদ্‌আৎ ও জালালৎ; বলেছিল : এ এক অভিনব নাস্তিকতা, একে ধ্বংস কর্ত্তেই হবে; ভারতীয় বুদ্ধি মুস্‌লিমকে ভেবেছে আইকনোক্লাস্ট্‌— প্রতিমার শত্রু, তার বৈশিষ্ট্যের বৈরী; ইস্‌লামকে ভেবেছে এক অদ্ভুত অনাত্মীয় আসুরিক শক্তি। একে ধ্বংস কর্ব্বার আয়োজন বহুরূপে বহুবার হয়েছে, যেমন আরবে হয়েছিল। কিন্তু সেটী সফল হয় নি; এবং হয় নি যে, এই হ'লো বিক্ষোভের কারণ। এর শান্তি কেমন ক'রে হবে?

কৃষ্টি বল্‌তে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের যে দীর্ঘ-আয়াসিত সংযুক্ত সুবিস্তীর্ণ ও বহুধা-প্রসারিত প্রকাশকে আমরা বুঝে থাকি, মধ্যযুগ পর্য্যন্ত তার বুনিয়াদ হ'লো আচার ও ধর্ম্ম। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বেলায় এ যেমন সত্যি, নবতর ইস্‌লামী কৃষ্টির বেলায়ও ঠিক তেম্‌নি। মানুষের বুদ্ধি-চর্চ্চা জ্ঞান-সাধনা, সাহিত্যে শিল্পে স্থাপত্যে তার সৌন্দর্য্য-পূজা, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনে তার মনোবিকাশ, তার জীবন-যাত্রার পদ্ধতি-রচনা—সব-কিছুই এ-যুগে হ'লো ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে। মানুষের মনের রং, তার বুদ্ধির গতি, তার জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, প্রাণীজীবনের সমস্তরে ও ঊর্দ্ধে তার অন্তর-বাহিরের পারিপাট্য— এ সমস্তেরই মাল-মসলা জোগালো শাস্ত্র ও দেশাচার, যাদের একমাত্র শাসন-মন্ত্র হ'লো ধর্ম্ম। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পরযুগীয় ইসলামী কৃষ্টির মধ্যে যে সুস্পষ্ট বিরোধ, তার মূলতত্ত্ব হ'লো এইখানে। যে-বীজের এরা পরিণাম, তারাই হ'লো পরস্পরের বৈরী। এজন্যে দুষ্‌বো কাকে? এদের মধ্যে কে হবে ভোজ্য, কে হবে ভোক্তা—এই নিয়েই হ'লো দ্বন্দ্ব। বস্তুতঃ এদের মধ্যে যে-একটীমাত্র সম্পর্ক, সে হ'লো সংগ্রামের, পরস্পরকে হানাহানির—আঘাত-প্রতিঘাতের। কোথাও যুদ্ধ সুপ্রকাশ, কোথাও বা সেটী সভ্যজনসম্মত শিষ্টাচার ও দৈনন্দিন সাংসারিক প্রয়োজনের অন্তরালে; কিন্তু সংঘর্ষ চলছেই, বিরাম তার বিন্দুমাত্র নেই, কখনো হয় নি, হবে যে এ-আশারও কোনো কারণ নেই।

এই যে অবিরাম যুদ্ধ দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মী কৃষ্টির ভেতর, এর অবশ্যম্ভাবী ফল দুইয়ের জীবনেই কিছু কিছু ফলেছে, এখনো ফলছে এবং, এদের যদি কোনো ভবিষ্যৎ থাকে, তখনো ফলবে। প্রথমে ইস্‌লামের কথা বলি। ইস্‌লাম আরবের প্রাচীন ধর্ম্মকে গ্রাস করে নি, প্রধানতঃ ধ্বংস করেছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানে যেদিন সে এলো, এদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম সম্পর্কে মুখ্যতঃ তার ঐ ধরণের কোনো মতলব ছিল না; এবং এও দেখতে হবে যে তীব্রতায় বলিষ্ঠতায় সাধ্য তার যতোই হোক, গতিকালের দীর্ঘতার—গতি-বেগের দ্রুততার একটা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার জীবনে। তথাপি স্বীকার কর্ত্তে হবে যে, ইস্‌লাম ভারতীয় ধর্ম্মকে আঘাত হেনেছিল। তাতে যদি বা বৃদ্ধের দেহ হ'লো রক্ত-রঙীন, অঙ্গ হ'লো ছিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মৃত্যু তার হ'লো না। নিশ্চল হ'য়েও তার আয়তনই তাকে রক্ষা কর্‌লো। তখনো প্রদীপ্ত ছিল তরুণের চিত্ত, শক্তিদৃপ্ত তার সমুন্নত শির; কিন্তু পুরাতন বিপুলায়তন বৃদ্ধের পরিধিকে পরিবেষ্টনের জন্যে বাহুর যে দিগন্তপ্রসারী দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন সেটী যেন তার ছিল না। অর্থাৎ সাফা-মার্‌ওয়াকে টেনে এনে তাদের চাপে আরবের বিষবাষ্পকে তাড়িয়েছিল যে বিশাল বাহু, বিন্ধ্য-হিমালয়কে টেনে তাদের চাপে ভারতের অত্যন্ত অচলায়তনকে নিষ্পেষিত কর্ব্বার শক্তি তার হ'লো না।

এই অশক্তির ফল ইস্‌লামের জীবনে ফল্‌লো অতি করুণ। ভারতের প্রস্তরীভূত অঙ্গকে আহত ক'রেও অস্ত্র তার ফিরে এলো। তার খানিক গেলো দুম্‌ড়ে, খানিকটার ভাঙলো ধার। শুধু এইটুকু হ'লেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু আপনার অস্ত্র-চালনার বেগে তার দেহ গিয়ে পড়লো প্রাচীনের চিরব্যাদিত গ্রাসে। তথাপি ইস্‌লাম তার উদরস্থ হ'লো না; বৃদ্ধের আহার-চেষ্টায় ইস্‌লামের কঠিন কাঠামো টুট্‌লো না; কিন্তু তার মর্ম্মস্থানে লাগলো বিষম চোট। ইস্‌লামের প্রাণবস্তু যে নিষ্কলুষ একেশ্বরবাদ— নিষ্প্রতিম নিরংশ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দাসত্ব-স্বীকার, এদেশের আদিম প্রকৃতিপূজারী মন ইন্দো-ইরাণীয় ধর্ম্ম-দর্শনের ছদ্মবেশে তাকে কর্‌লো গুপ্তাঘাত। ইস্‌লামের ধর্ম্ম তার সাম্যনীতি— ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাম্য, পরিবারে পরিবারে সাম্য, সমাজের সর্ব্ববিধ অধিকারে সাম্য, রাষ্ট্রের অঙ্গ-হিসাবে মানুষে মানুষে সাম্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র একত্বে, নিরাকারত্বে, অবিভাজ্যতায় দৃঢ়গভীর প্রত্যয়—সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আরবের ইস্‌লামকে করেছিল অনিবার্য্য। ভারতের বর্ণভেদ জাতিভেদ ছুঁৎমার্গ একে হান্‌লো প্রাণঘাতী বিষাক্ত বাণ। তাই আজ মর্ম্মাহত ইস্‌লাম আমাদের সম্মুখে অবলুণ্ঠিত মূর্চ্ছিত।

এদেশে ইস্‌লামের যদি কোনো ভবিষ্যৎ থাকে, সে এই সম্মোহিত মূর্চ্ছিত ইস্‌লামের। এক ধরণের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ, মৃদু আকারে এক রকমের ছুঁৎমার্গ তার প্রাণশক্তিকে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু করেছে। এতেও হয়তো গুরুতর কোনো ক্ষতি

ছিল না যদি আপনার কৃষ্টির এই নবার্জ্জিত খর্ব্বতা সম্বন্ধে মুস্‌লিমের সংজ্ঞা ও দৃষ্টি জেগে থাক্‌তো। কিন্তু জেগে সে নেই। তার মর্ম্মস্থানে মহামারীকে পোষণ ক'রে মুস্‌লিম আজ নিদ্রিত, নিশ্চিন্ত। বর্ত্তমানকালে যাঁরা ইস্‌লামের বাহন, এ-যুগে যাঁরা তার উদ্গাতা, আপনাদের নীরব সম্মতি—এমন কি সবাক্ সমর্থন দিয়ে তাঁরাই আজ কচ্ছেন জীবন-ধ্বংসী এই ব্যাধিকে লালন। তাঁদের অন্তরের এই দীনতা নিয়ে—তাঁদের চিত্তের এই শূন্যতাকে ভিত্তি ক'রে ইস্‌লাম মানুষের কোন্ মঙ্গলের বুনিয়াদ গ'ড়ে তুল্‌তে পারে?

ভারতীয় ধর্ম্ম ও পরদেশী ইসলামের সংঘর্ষের ফল শুধু ইস্‌লামের জীবনে ফলে নি; এদেশী ধর্ম্মকেও সে বেশ খানিক নাড়া দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলিত হ'লেও তার নিষ্প্রাণ অবয়বে গতির সঞ্চার হ'লো না; তার চলা পথের সীমারেখাকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে সে আর গেলো না। তথাপি ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। ইসলাম এদেশে যে নব পরিবেষ সৃষ্টি ক'রেছিল, তার সাথে হাত মেলালো ক্রিশ্চান ধর্ম্ম; তাকে অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান করলো নবযুগের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার বাণী। ভারতীয় আপনার মৃত্যু-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো। যে ধর্ম্ম সমাজ ও কৃষ্টির সে বাহন, তার অচলায়তনকে টেনে হেঁচড়ে খানিক আগানোর জন্যে তার প্রয়াস হ'লো প্রাণপণ। অসবর্ণ বিবাহ, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, অস্পৃশ্যের মন্দির প্রবেশের অধিকার—প্রভৃতি নানা আন্দোলনকে আশ্রয় ক'রে তার আজ অনন্ত সাধনা। কিন্তু এই সাধনা কি বিপুলবপু বিগতশক্তি প্রস্তরস্তূপকে টলাতে পার্ব্বে? অসম্ভব, অসম্ভব।

কিন্তু এই অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা দেখবো তার বৈশিষ্ট্য চলে গেছে। মানুষের খর্ব্বতা সাধন ক'রে—তার স্কন্ধে শত অপমান লাঞ্ছনার ভার চাপিয়ে যে সমাজের অস্তিত্ব; নারীকে সম্পত্তি জ্ঞান ক'রে—তাকে নির্ব্বিচার কামনার সামগ্রী ভেবে—তাকে নরকের নিম্নতম মার্গে পর্য্যবসিত ক'রে যার শাস্ত্র-বিধান; পাথরের নুঁড়িতে, কল্পিত প্রতিমায়, প্রকৃতির অঙ্গীভূত প্রায় প্রতিটী পদার্থে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক'রে যার পূজারী মনের পরিতৃপ্তি; মানুষ-দেবতার—পশু-দেবতার উদ্দেশে লক্ষ প্রণতির অবনতি স্বীকার ক'রে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবার যার অব্যর্থ অস্ত্রায়োজন; তার স্ব-রূপ, তার নিজস্বতা, তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব-কিছুকে জলাঞ্জলি না দিয়ে, তাকে ইসলামের আদর্শেও আনা চলে না। এইটীই আজ এদেশবাসীর বিশেষ ক'রে বুঝবার প্রয়োজন হয়েছে।

অথচ বর্ত্তমান জগতে ইসলামেরই বা বস্তুতঃ কতোটুকু ভবিষ্যৎ? কালের ধর্ম্মে—বিশেষ ক'রে ভারতীয় এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে, তার অবশ্যম্ভাবী জরা বহুদিন থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চাতে তার ভারতীয়ের ভীতি, অতীত আদর্শের অসীম আকর্ষণ,—সম্মুখে তার উদারতর কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে আপনাকে হারিয়ে ফেলার অন্তহীন আশঙ্কা। এই দুইয়ের মাঝখানে তার গতিপথ আজ রুদ্ধ। সে প্রথম যেদিন মরু-গিরির বক্ষ ভেদ ক'রে আপনার নাভিগন্ধে অন্ধসম ছুটে চলেছিল, মানুষ ছিল তার পশ্চাতে। কিন্তু আজ সে যখন স্তব্ধ নিশ্চলতার প্রশান্তিকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়ালো, মানুষের চলিষ্ণু মন বহু দূর চলে গেলো তাকে অতিক্রম ক'রে। তার অন্তর্গত ছিল যে গতির বীজ, বিকাশের বৃহত্তম সম্ভাবনাকে স্মরণ ক'রে আজ সে মূর্চ্ছিত, মৃত।

দেশের দুর্ভাগ্য : এর কল্যাণের পতাকা বহন ক'রে যাঁদের আশ্চর্য্য পথ-সমারোহ, তাঁদের দৃষ্টি আজ সমাচ্ছন্ন। যে-সমাজ সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাণহীন দেহকে এড়িয়ে—বরং তাকে পশ্চাতে রেখে মানুষের আজ জয়যাত্রা, তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে হবে ভারতের—ভারতবাসীর মুক্তি,—এই উপদেশ-বাণী তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে! হিন্দু হোক নিষ্ঠাবান, মুসলিম হোক ধর্ম্মানুরক্ত, তাহ'লেই হবে দেশের—দেশচিত্তের দাসত্ব-মোচন,—এই পরামর্শ আজ তাঁদের! কিন্তু যখন দিকে দিকে তাঁদের এই অন্ধ আদেশ প্রচারিত হচ্ছে, দেশের ভাগ্য-বিধাতা আপনার সিংহাসনে ব'সে বিদ্রূপের হাসি হাসছেন। নিষ্ঠার প্রমত্ত প্ররোচনায় হিন্দু যখন অন্যের আহার্য্যের আয়োজন দেখে মর্ম্মাহত হচ্ছে—তাকে বঞ্চিত কর্ব্বার জন্যে শাণিত খড়্গ হাতে নিয়ে মার্ মার্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে; মুসলিম পৌত্তলিকতার অসহ্য পরিবেষ যুগ যুগ ধ'রে সহ্য কর্ব্বার পরেও যখন বাদ্যাতঙ্কে অতন্দ্র রজনী যাপন কচ্ছে এবং তার হস্তের ছুরিকা হিন্দুর উদ্দেশে বার বার উত্তোলিত হচ্ছে, তখনো দেশের কর্ম্মসাধক ও চিন্তানায়কেরা ধর্ম্মাশ্রয়ী কৃষ্টি ও সভ্যতার নিশান অনুদিন আন্দোলিত ক'রে দেশবাসীর দৃষ্টিকে কচ্ছেন প্রবঞ্চিত! তাঁরা সুসজ্জিত কক্ষের অন্তরালে অশ্রুপাতের অনন্ত প্রয়াসে নিমগ্ন! বিভিন্ন ধর্ম্মীয় সমাজ ও সভ্যতার শক্তি, তাদের

পরস্পরের কণ্ঠনালী ছেদন কর্ব্বার—পরস্পরের রক্ত-পিপাসা চরিতার্থ কর্ব্বার যোগ্যতা কেমন ক'রে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, এই তাঁদের গণনা! এ-দেশের সর্ব্বনাশের পথ কেমন ক'রে রুদ্ধ হবে?

ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে যে-জাতীয়তা, তার ভিত্তিমূল আজ শিথিল হয়েছে। কিন্তু ওকে অতিক্রম ক'রে দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ হ'লো যে-নব জাতীয়তার প্রাণকেন্দ্র, তার প্রতি ওর বিরুদ্ধতার আজো অন্ত নেই। ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে—পরস্পর-বিরোধী দুইটী ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে এক-জাতীয়ত্ব সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এতোদিনেও তার কি ফল ফললো? বলা হয় : আমাদের শাসকরা এদেশে শিক্ষা—বিশেষতঃ ধর্ম্ম-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা বিশেষভাবে করেন নি। কিন্তু কর্ম্মেও এই ধর্ম্মার্ত্ত দেশে—যে-দেশে এখনো শিক্ষিতের দ্বারা চলছে রাষ্ট্রের অধিকার থেকে ব্যাপক ধর্ম্মকে অনাহত রাখবার প্রয়াস, যেখানে এই-যুগেও ধর্ম্ম ধ্বজী চাইছে মানুষের নির্ম্মুক্ত কল্যাণ-বুদ্ধির উপরে বুদ্ধিনিরপেক্ষ ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা,—এমন দুর্ভাগ্য দেশে তার থেকে কোন্ মহামঙ্গল লাভের আশা আমাদের ছিল? যে জগদ্দল জড়বুদ্ধির প্রচণ্ডতায় ইসলামের মতো শক্তিশালী ধর্ম্ম এদেশে আপনার মূল বিস্তার কর্ত্তে গিয়ে এতো বাধা পেলো, সে যে অনাত্মীর জ্ঞানকে পদে পদে কর্ব্বে প্রত্যাহত, এ-তো বিস্ময়ের বিষয় নয়! বস্তুতঃ যে প্রতীচ্য থেকে এলো দেশকেন্দ্রী স্বাজাত্যের আদর্শ, সেখানেই বা আজ হিট্‌লারী-বুদ্ধির কি বীভৎস প্রকাশ আমরা দেখলুম! তার উদ্ধত আঘাত শুধু ইহুদীর শিরে নয়, আইন্‌স্‌টাইনের মতো বিজ্ঞান সাধকেরও শিরে নেমে এলো; এতোটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচ তার হ'লো না! এ থেকে কি আমরা বুঝবো যে, ধর্ম্মের শেষ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রে, স্বাজাত্য বোধ,—আমি ওর, ও আমার, মানুষে মানুষে এই অতি নিকট মমত্ব-বোধ,—মানব কল্যাণের অভিসারী নিঃশঙ্ক নির্ম্মুক্ত বুদ্ধি, ভারতের মতো দেশে কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে?

হবে না যে, এ অনুভূতি জন্মলাভ করেছে। কিন্তু এদেশের মাটী এমনই রুগ্ন, আবহাওয়া এর এমনি বিষাক্ত যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মলিনতা ওকে স্পর্শ কর্‌লো। হিন্দুত্বকে, ইস্‌লামকে অক্ষুণ্ণ রেখে—এমন কি তাদেরে উদ্যত উদগ্র ক'রেও এখানে স্বাজাত্যের—ন্যাশনালিজ্‌মের জয়টীকা পর্ব্বার নির্লজ্জতা হ'লো মানুষের! এদেশী নির্ব্বুদ্ধির আওতায় কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষী সোশ্যালিস্‌ট্—এমন কি কম্যুনিস্‌ট্‌ও রইলো খানিক হিন্দু, খানিক শিখ, খানিক মুস্‌লিম। নব-মানবতার পতাকাবাহী হয়েও সে রইলো অনেকখানি ধর্ম্মার্ত্ত। অর্থাৎ ভারতের মাটীতে নবীনতার পথে যার যাত্রা, তার দৃষ্টি যদি বা সামনের দিকে, কিন্তু তার মনের টান আজো বেশ খানিক পশ্চাতে; নতুনকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে তার ভয়। নবীনের নিবিড় আকর্ষণ তাকে টান্‌ছে, কিন্তু অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন কর্ত্তে তার মন যেন সর্‌ছে না।

কিন্তু আজ তাকে বুঝতে হবে : মানুষের যখন অভ্যুত্থান ঘটে পুরাতনের প্রতি সে হয় একেবারে নির্ম্মম। নতুনের উদ্যত অস্ত্রের তলে পুরাতন মূর্চ্ছিত হ'লেই তাকে সে নিরীহ মনে করে না, নিরাপদ জ্ঞান করে না আঘাতের পর আঘাত হেনে তার মৃত্যুকে সে করে সুনিশ্চিত। নব নবীন সাধন-পথের দুর্ব্বল পথিক যে, তার পা যদি না হয় এতোখানি অগ্রসর, তার হাত যদি না হয় এতোখানি নিষ্ঠুর, শত্রুর গ্রাস থেকে সিদ্ধিকে ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার হয় না। এইটীই আজ আমাদের বিশেষ ক'রে স্মরণ রাখতে হবে। মহাপুরুষ মোহাম্মদ ইস্‌লামের সত্য লাভ ক'রে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে যখন আহ্বান কল্লেন পুরাতনের প্রতিমা ভেঙে চুরমার কর্ব্বার জন্যে, দেশের মাটী থেকে—মরুবাসীর মন থেকে তার নাম-নিশানা পর্য্যন্ত ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন কর্ব্বার জন্যে, দুর্ব্বলচেতা সাকিফ গোত্রের প্রাণ প্রতিমার মমতায় ব্যথিয়ে উঠ্‌লো; তারা মহাপুরুষের সত্যে দীক্ষা নেবার পরেও সময় প্রার্থনা কর্‌লো—প্রথমে ছয় মাসের, শেষে এক মাসের—তাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লাৎ-দেবীর জন্যে। ভুলে গেলো : পরস্পরের বিরুদ্ধ দুইটী শক্তির একটীকে মেরে, তার শবকে নিঃশেষে সমাহিত ক'রে তবে অন্যটীর স্থান। আমাদের দেশে নতুন পথের যাঁরা যাত্রী, এই ভুল আজ তাঁদের মনকে—বুদ্ধিকে হান্‌ছে প্রতারণা। এর জাল ছিন্ন কর্ব্বার মতো বলিষ্ঠ বাহু কোথায়? একে পুড়িয়ে ছাই কর্ব্বার মতো অগ্নিময় চিত্তের দাবদাহন জ্বাল্‌বে কে?

আজ আমাদের দেশে শাস্ত্ররচিত ধর্ম্ম, বুদ্ধি-নিরপেক্ষ আচার-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও মানুষের মৃত্যুবীজবাহী সংস্কৃতিকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যে দিকে দিকে যে অবিরাম দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম, এটী বস্তুতঃ হলো আপনার মর্ম্মস্থানে মহামারীকে পোষণ ক'রে তার মারকতাকে অব্যাহত রাখ্‌বার প্রাণপণ অন্ধ সাধনা। এর চোখ ফোটাবে কে? আজ এদেশের ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ যদি হয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাইরে রাষ্ট্রের অবাধ অধিকার-সীমার অন্তর্গত, এবং রাষ্ট্র যদি হয় প্রাচীন সংস্কারের প্রাণঘাতী

পরিবেষের বাইরে নির্ম্মুক্ত বুদ্ধির বাহন—যে-বুদ্ধি মানুষের দৃষ্টিকে করে দিগন্তভেদী, তার চিত্তকে করে বিশ্বপ্রসারী, তার মনকে করে আপনার অজ্ঞাত অনুপলব্ধ উচ্চতা, আপনার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা, সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন,—তাহ'লে দেশ কল্যাণের নবীন সাধক যাঁরা তাঁদের পথপ্রান্তে স্তূপীকৃত হবে পুরাতনের দেহ-ভস্ম; আর সেই-ভস্মের ভিতে রচিত হবে নব-মানবতার এক প্রশস্ত লীলা-ক্ষেত্র। বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই মানবতার অনিবার্য্য জন্মবেদনা আজ ঘনিয়ে উঠ্‌ছে সাম্য ও অসাম্যের যুদ্ধে, মুক্তি ও শৃঙ্খলের সংঘর্ষে, বুভুক্ষা ও ব্যসন-বিলাসের সংগ্রামে—যার প্রবলতা, ভীষণতা এবং আসন্ন সফলতাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে চারিদিক থেকে অগণিত বাহু বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়েছে সনাতনের স্বার্থবাহী এক কঠিন নিষ্ঠুর প্রয়াস! একে চূর্ণ কর্ব্বে কে?

মহাপুরুষ মোহাম্মদ শত্রুর আঘাতে মর্ম্মাহত হ'য়ে তাঁর অন্তরোর্দ্ধ প্রদেশে বাণী প্রেরণ করেছিলেন : এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো! আজ ভারতের অভিনব ভবিষ্যতের শত্রু যারা, তাদের জন্যে এই হোক সাধকের অন্তরের প্রার্থনা। ভারতীয় কবির কণ্ঠে নব-নবীনের নিশানধারীর জন্যে ধ্বনিত হয়েছিল আকুল আবেদন : পতাকা যারে দিলে প্রভু, তারে বহনের শক্তি দাও! আজ যুগ-মানবতার তীর্থ-পথিকের জন্যে নবজন্মলিপ্স ভারতের বক্ষ ভেদ ক'রে ব্যাকুলিত হোক তার নিষ্ঠানিবিড় চিত্তের এই একমাত্র কামনা!

আগষ্ট, ১৯৩৬

[আশ্বিন, ১৩৪]

চিঠি

[কবি কাদের নওয়াজকে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে' আনন্দ পেয়েছি। তুমি তোমার সাহিত্য-সাধনার দ্বারাতেই তোমার জন্মভূমির মঙ্গল-সাধনা করচ—তোমার এই ব্রত উত্তরোত্তর ফলবান হতে থাক। জনসাধারণের ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বহুকাল থেকে আমার ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্বন্ধ আছে। শিক্ষিত ছাত্রদের নিকট পরিচয় আমি কামনা করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটেনি। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় ছাত্র-মিলন-সভায় আবৃত্তি করেছি, সাহিত্যে আলোচনা করেছি তখন যদি মুসলমান ছাত্রদের কাছে পেতুম অত্যন্ত খুসী হ'তুম্। শান্তি-নিকেতনে আশা করি কোনো অবকাশে তুমি আসতে পারবে। তখন দেখতে পাবে এখানে মুসলমানের আসন প্রস্তুত হয়ে আছে। কোথাও লেশমাত্র বাধা বা সঙ্কোচ নেই। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ৩১।১০।৩৬

উত্তরায়ণ,
শান্তিনিকেতন।

শুভার্থী—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩]

হিন্দু-মুস্‌লিম

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, এম্-এ

[গত বর্ষের আশ্বিন সংখ্যা 'বুলবুলে' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব-লিখিত 'হিন্দু-মুসলিম' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কয়েক মাস যাবৎ শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, এম্-এ, ও খান সাহেব মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী লেখকের সহিত ঐ সম্পর্কে অনেকগুলি পত্র বিনিময় করিয়াছেন। সে-সমস্ত পত্রই আমরা ছাপিয়াছি। এবারে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের একখানি পত্র এবং প্রবন্ধ-লেখকের জবাব ছাপা হইল। — 'বুলবুল' সম্পাদক।]

(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবকে লিখিত অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের পত্র)

প্রিয়বরেষু,

... আলোচনা ক্রমেই জটিলতার দিকে যাচ্ছে। কাজেই আমার বক্তব্য একটু বিস্তৃতভাবে বলা সঙ্গত।

ধর্ম্মের ভিতরে আমি দেখি দুটি ব্যাপার — প্রতীকচর্চ্চা ও আনুষ্ঠিকতা। ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান — philosophy translated into faith and action — এই আমার মূল সিদ্ধান্ত। জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বলে' ধর্ম্ম একটি বিশেষ রূপ লাভ কর্‌তে বাধ্য। বিভিন্ন ধর্ম্ম যে বিভিন্ন মহাপুরুষ বা মহাপুরুষ-গোষ্ঠি ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে বেড়ে উঠেছে, এ না হ'লে ধর্ম্ম ধর্ম্মই হতো না। সেজন্য 'লাইলাহা-ইল্লাল্লা' তত্ত্বদর্শীর কাছে যতখানি সত্য, 'মুহম্মদুর্ রসুলুল্লা' তার চাইতে কম সত্য নয় — 'লাইলাহা ইল্লাল্লা' এই তত্ত্ব রূপ পেয়েছে রসুলের জীবনে। তত্ত্বের দিক দিয়ে এ অসঙ্গতও নয়, কেননা সত্য'কে মানুষ চিরকাল গ্রহণ করে' আস্‌ছে সত্যান্বেষীকে দেখে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেজন্য গুরুর মূল্য গ্রন্থের চাইতে অনেক বেশী। এই দিক থেকে দেখ্‌লে সুফীর বা বৈষ্ণবের গুরুপূজার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। কোনো না কোনো রকমের গুরু-পূজা অর্থাৎ গুরু-ভক্তি জ্ঞানলাভের গোড়ার কথা। যদি এ ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হ'তে পারেন তবে সুফীদের উপরে আপনার অনেকখানি রাগ পড়ে যাবে। গুরু-পূজা যদি আপনার দৃষ্টিতে একটু অনুৎকৃষ্ট হয়, তবে প্রতিমাপূজা সহজেই অত বীভৎস বা অর্থশূন্য বলে' মনে হবে না। গুরু-পূজাও যেমন শুধু একটি ব্যক্তিকে পূজাই নয়, প্রতিমাপূজাও তেম্‌নি শুধু একটি বস্তুকে পূজাই নয়। ওর পেছনে রয়েছে একটি ভাবচর্চ্চা — আমিত্বকে ডুবিয়ে দেবার একটা চেষ্টা। আমিত্ব হয়ত কখনই যায় না, তবে এম্‌নি করে' যাঁরা ওটিকে প্রতীকে বা গুরুতে বা গ্রন্থে বা পরমেশ্বরে ডুবিয়ে দিতে পারেন তাঁরা সেই আমিত্বের একটি নতুন স্বাদ পান। আপনি এসব পথের পথিক নাও হ'তে পারেন, তবে জ্ঞান-পথের পথিক — যা জ্ঞানে সত্য বলে' প্রমাণিত হয় তা নিরভিমানচিত্তে গ্রহণ করব — আপনার এই যে সংকল্প ওর ভিতরে পাবেন এই আত্মসমর্পণ, আর এই আত্মসমর্পণে আনন্দ ও শক্তি কত, তাও আপনি বুঝবেন। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী সব ধর্ম্মের সেবকদের জন্যই প্রয়োজনীয় এই যে এক বিশেষ পদ্ধতির কাছে আত্মসমর্পণ, এরই নাম দিয়েছি প্রতীকচর্চ্চা। আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে এর সহজ যোগ রয়েছে তা না বল্লেও চলে।

এটি গেল ধর্ম্মের তত্ত্বের দিক। তার অন্য দিক হচ্ছে সামাজিক শাসন। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ উৎকৃষ্ট হোক, তার সামাজিক জীবনও সুনিয়ন্ত্রিত হোক, এই দুই-ই ধর্ম্ম চেয়েছিল। এই সামাজিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজনীয়তা বেশ বড় বলেই মনে হয়েছিল। কালে তাই ধর্ম্মের সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষের চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌লেও ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিকতা বা নিয়ম-কানুন হীনশক্তি হয় নি। ধর্ম্মের এই আনুষ্ঠানিকতা বলতে আমি মুসলমানের বিশেষ পদ্ধতির নামাজ রোজা হজ্জ জাকাত, হিন্দুর বেদপাঠ আরতি সংকীর্ত্তন ছোঁয়াছুঁয়ি — সবই বুঝি, হিন্দুর শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি বা আরতি, আর মুসলমানের শুধু পরপূজা গোরপূজা বুঝি না। ধর্ম্মের এই আনুষ্ঠানিকতা অর্থশূন্য নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কালে

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব — মানুষের জীবনের উৎকর্ষ সাধন — যখন ম্লান হয়ে গেল অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের যখন বিচ্ছেদ ঘটলো তখন ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিকতা যে মানুষের জন্য নিতান্তই অর্থশূন্য হয়ে পড়্তে লাগলো — বেড়ে-ওঠা গাছের জন্য অর্থশূন্য হয়ে পড়ে যেমন তার শুক্‌নো ও ফাটা বাকল — তা না বল্লেও চলে। কিন্তু তথাকথিত ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা তলিয়ে দেখ্‌লেন না। তাঁরা এখনো তাকাচ্ছেন তাঁদের দলের সংখ্যার দিকে, আর সেখানে যদি তাঁদের চোখে কম্‌তি কিছু না পড়ে তবে মনে করেন তাঁদের উৎকণ্ঠার কোনো কারণ ঘটে নি।

তা থাকুন এই ধার্ম্মিকেরা তাঁদের যথাস্থানে। এঁরা আপনারও ভাবনা-চিন্তার বিষয় নয়। আপনার মূল বক্তব্য হচ্ছে ধারাবাহিক উৎকর্ষের কথা। আপনি বল্‌তে চান প্রতিমা পূজার চাইতে নিরাকারবাদ শ্রেষ্ঠতর। আমি বল্‌তে চাই সব ধর্ম্মের ভেতরেই একই সঙ্গে নিরাকারবাদ অর্থাৎ তত্ত্ব-চিন্তা ও প্রতিমাপূজা বা প্রতীক-চর্চ্চা রয়েছে — ভেদ প্রধানত পদ্ধতির — কারো প্রতিমা কাঠ মাটি বা পাথর দিয়ে গড়া, কারো প্রতিমা মন্ত্র আচার অনুষ্ঠান এই সব দিয়ে গড়া। দুই-ই উৎকট হতে পারে। তার প্রমাণ মাটির প্রতিমার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হিন্দু, আর সেই প্রতিমার প্রতি একান্ত বিদ্বেষপরায়ণ মুসলমান। এই দুজনের মধ্যেই প্রবল মোহ, জ্ঞান নয়। কাজেই উভয়েই ভ্রান্ত। এই ধরণের মনোভাবের সমর্থন কারো ধর্ম্মশাস্ত্রে নেই। আপনি জানেন কোরাণে বলা হয়েছে — আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না পাছে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ সীমা অতিক্রম করে' আল্লাহ্‌কে গালি দেয়। গীতায়ও কাষ্ঠলোষ্ট্রপূজাকে অপকৃষ্ট কর্ম্ম বলা হয়েছে।

আপনি একটি তর্ক তুলেছেন — ইস্‌লামের ইতিহাস যাইই হোক মূল ইস্‌লাম নিরাকার আল্লাহ্‌র ধারণা ও উপাসনা, কিন্তু হিন্দুত্ব পৌত্তলিকতার সঙ্গে যুক্ত। আপনার এ-মত যথার্থ বলে' মানতে আমি নারাজ। স্থূলতঃ আপনার মন্তব্য সত্য কিন্তু মূলতঃ নয়। হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাসে সাকার ও নিরাকার উভয় তত্ত্বই চিরকাল ধ'রে প্রায় সমানভাবে বিদ্যমান। উপনিষৎ ও গীতা হিন্দুর দর্শনমাত্র নয়, ওসব তার ধর্ম্মগ্রন্থ এবং অনুশাসনও বটে। তেমনি ভাবে তাসাউফ—ওহাবী প্রতিক্রিয়ার যুগে ওটি অনেক মুসলমানের চোখে অর্থশূন্য মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ওটি হয়ত তত অর্থশূন্য নয়। অন্ততঃ ইসলাম যদি ধর্ম্মরূপে জগতের মানস উৎকর্ষের সহায়ক হতে চায় তবে ওটিকে বাদ দেবার উপায় আছে মনে হয় না। কেন না ওর মূলতত্ত্ব—গুরুবাদ—মানুষের মানস-জীবনে অসত্য নয়।

আধুনিক জগতের যে বিজ্ঞানবাদ, সেটি এক হিসাবে গুরুপূজার বিরোধী — সত্যের নিষ্কলুষ ও নিরঙ্কুশ সাধনা। এটি খুব বড় জিনিষ সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হয় এর ভিতরে গতি ও পরিবর্ত্তন-প্রবাহ এমন প্রচণ্ড যে সেজন্য এটি মানুষের জন্য কল্যাণদায়ক না-ও হতে পারে। গতি মানুষের জন্য কাম্য বটে, কিন্তু মানুষের পরম আনন্দ যে সৌন্দর্য্যবোধ, সেই সৌন্দর্য্যবোধ চায় স্থিতি — অন্ততঃ কিছু কালের জন্য। কোথায় সত্য কোথায়, শুধু এই আর্ত্তস্বর নয় — চারিদিকে যা দেখ্‌ছি তার ভিতরেও সত্য রয়েছেন পরম সুন্দরের বেশে — যা দেখ্‌ছি তাতে মন আমার আকৃষ্ট, সকলে আমার প্রিয় আমি সকলের প্রিয় — এই মনোভাবও মানুষের একান্ত বাঞ্ছিত। সহজেই বোঝা যায় এ মনোভাবের ভিতরে মোহের প্রবেশলাভ অনতিবিলম্বে ঘট্‌তে পারে। কিন্তু উপায় কি আছে? একান্ত গতি ও ব্যস্ততায় মানুষ যে হাঁপিয়ে পড়ে, শক্তিহীন ও দিশাহারা হয়ে পড়ে — সেও ত কম বিপদ নয়। প্রত্যেক ধর্ম্মেই একটি বড় কথা আছে — মাত্রাবোধ — golden mean। বিজ্ঞানের গতিবাদে — অন্তত একালে, সেই মাত্রাবোধ যেন নেই। সেজন্য আমি বলেছি সৌন্দর্য্যবোধ ও প্রেমধর্ম্মের সঙ্গে তার যোগ কিছু কম। হয়ত বিজ্ঞানবাদ সহজেই নিজের এ ত্রুটী শুধ্‌রে নেবে — ইংরেজ জাতি যেমন নিয়েছেন তাঁদের জীবনে। তাঁরা একই সঙ্গে অতীতের পূজারি ও পরিবর্ত্তনের প্রেমে আকৃষ্ট। আমার মূল বক্তব্য এই যে গতি যেমন মানুষের জন্য সত্য; স্থিতি তার চাইতে কম নয়। এই দুইকে মেলানো চাই জীবনে, নইলে জীবন হয় অসুন্দর ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

আপনি আর একটি তর্ক তুলেছেন। ইসলাম ও হিন্দুত্ব মূলতঃ যদি এক, তবে এত বিরোধ কেন? উত্তর কঠিন নয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইই হিন্দু, কিন্তু মারামারি তারা বেশ করেছে। হিন্দু-মুসলমান মারামারি করছে ধর্ম্মভাবের অধীন হয়ে নয়, ধর্ম্মভাবকে বিসর্জ্জন দিয়ে তথাকথিত ধার্ম্মিকতা নিয়ে, অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠানের একান্ত পূজারি হয়ে। আপনি জানেন হজরত ইহুদি খৃষ্টান পৌত্তলিক সবারই সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন, অবশ্য নিজের মতবাদ নয়, ব্যবহারিক জীবনের

প্রয়োজনে। তলোয়ার তিনি ধরতে চান নি — তলোয়ার তাঁর হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। তলোয়ার মুসলমানের চিন্তায় বেশ বড় জায়গা দখল করে' আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য ওটি তাদের বোঝার ভুলে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের তলোয়ার ধরতে হয়েছিল, কেননা তাঁরা বেশী অত্যাচারিত হয়েছিলেন। তারপর তলোয়ার ধরা হয়েছিল দিগ্বিজয়ের প্রয়োজনে। একালের মুসলমান চিন্তাশীলদের বেশ বড় প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের সেই প্রাথমিক সম্প্রসারণ মুহূর্তে রাজনীতির সঙ্গে তার অদ্ভুত যোগের কথা ভাল করে' ভেবে দেখা। একালেও মুসলমানের পতিত দশা তাকে বাধ্য করেছে জগতের দিকে অপ্রসন্ন ও অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। কিন্তু মোটের উপর সেটি তার দুর্দ্দশারই পরিচায়ক, তার শক্তির পরিচায়ক নয়। একথা ভাল করেই বুঝতে হবে। আমরা একালে কি চাই? — দিগ্বিজয় ও রাজ্য নয় — চাই জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের অনুরাগ, চাই জগতের মানব-সমাজের সঙ্গে সম্প্রীতি। তাই তলোয়ার যে একান্তই লোহার তলোয়ার তা তার খাপ্ দেখ্তে যতই সুন্দর হোক — একথা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

অনেক কথা বলা হলো, ঢের বাকী রইল। তবু এইবার থামা যাক।..

ঢাকা, ভবদীয়

৭.২.৩৭ আবদুল ওদুদ

পুনশ্চ — কোর্আন আল্লার বাণী, হজরত মুহম্মদ সেই বাণীর বাহক মাত্র, মুসলমানকে একান্তভাবে অনুসরণ করতে হবে সেই কোর্আন, — এই যে মত, এর দুটি পরিণতি হতে পারে। একটি একান্তভাবে কোরআন-পূজা অথবা কোরআনের আক্ষরিক অনুবর্ত্তন — অন্ধ পীরপূজার মতনই উৎকট হতে বাধ্য। এর দ্বিতীয় পরিণতি হতে পারে নিরঙ্কুশ জ্ঞানবাদে বা যুক্তিবাদে। যথা — কোরআন আল্লার বাণী অর্থাৎ জ্ঞান — জ্ঞান অর্থ জ্ঞানের বিচিত্র ইঙ্গিত, কাজেই কোরআন থেকে, অথবা প্রয়োজন হলে কোর্আন ত্যাগ করেও সেই বিচিত্র জ্ঞানান্বেষণ মানুষের কাম্য — এটির উপকারিতা আর বিজ্ঞানবাদের উপকারিতা একই পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু ধর্ম্ম চায় জীবনকে সুন্দর করতে, সুন্দর করে' সাজাতে। কাজেই ইস্লামকে ধর্ম্মরূপে যাঁরা জীবনে গ্রহণ করতে চান তাঁরা একান্ত কোরআনপূজায় তৃপ্তি পাবেন না — তাঁরা চাইবেন হজরতের ও কোর্আনের শিক্ষা মুসলমানের জীবনে যুগে যুগে যত রকমের সার্থকতা এনে দিয়েছে সবই চোখ ভরে দেখ্তে ও প্রাণ ভরে উপলব্ধি করতে। এতেই তাঁদের আনন্দ।

আমি নিজে জ্ঞানপন্থীই বিশেষভাবে, তবে ধর্ম্মের প্রতীকচর্চ্চাও আমাকে বেশ আনন্দ দেয় যদিও ধর্ম্মের বর্ত্তমান পরিণতি দেখে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অনেকখানি হতাশ্বাস।

আমি ধর্ম্মকে যেভাবে দেখছি তার ভিতরে যদি সত্য থাকে, সব ধর্ম্মের লোক সহজভাবে একে অন্যের সঙ্গে মিলতে পারবেন, তাঁদের বিভিন্নতা রেখেও। এটি মন্দের ভাল। কিন্তু আমি নিজে মানুষের জন্য কাম্য মনে করি জ্ঞানের একান্ত অনুবর্ত্তিতা শক্তি ও আনন্দলাভের জন্য — কোনো নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার জন্য নয় — যদিও নেশা যে মানুষের একান্ত অপরিহার্য্য নয়, তাও আমি স্বীকার করি।

আপনার ধর্ম্ম-বিচারের একটি বড় সূত্র — ধর্ম্মকে বিচার করতে হবে তার অনুশাসন দিয়ে, তার শাস্ত্র দিয়ে — এটি আমার চোখে ত্রুটিপূর্ণ। আমি বলতে চাই ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মের প্রচারকদের জীবন বাদ দিয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মের অনুশাসন বোঝা যায় না, যেমন কবিকে অর্থাৎ তাঁর জীবন ও যুগকে বাদ দিয়ে কাব্য বোঝা যায় না পুরোপুরি — এমন কি Shakespeareকেও বোঝা যায় না এলিজাবেথীয় যুগকে বাদ দিয়ে। তত্ত্ব বা সত্যমাত্রকেই বলা যায় আংশিক সত্য। কিন্তু চলার পথে মানুষ অগ্রসর হয় কোনো সত্যকে পূর্ণ সত্য জ্ঞান করেই, তা ভিন্ন হয়ত সে চল্তেই পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের এই বিভিন্নতা বড় অদ্ভুত, কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার ভুল হয় খুব।

(বৈশাখ ১৩৪৪)

মূল প্রবন্ধ-লেখকের জবাব

(অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে লিখিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের পত্র)

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার শেষের দীর্ঘ পত্রখানির জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার মনের রঙ — চিত্তের চেহারা এতে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ যেন আপনার সঙ্গে আমার নতুন ক'রে খানিক পরিচয় হ'লো।

আমার সর্ব্বপ্রথম নিবেদন : তর্ক আমরা করছি না। আমাদের পত্রালাপ প্রধানতঃ পরস্পরকে বুঝবার জন্যে, চিন্তার বিনিময় এখানে বড়ো কথা। তর্ক যদি করি, তার আবর্ত্তে আমাদের হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। তাতে লাভ যতোটুকু, বিপদ তার চাইতে কম নয়।

আমাদের আলোচ্য হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, এবং আমরা দেখতে চাই : কেমন ক'রে এরা পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধতা ত্যাগ ক'রে দেশের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণআয়োজনে বন্ধুভাবে — পরম আত্মীয়রূপে, একই পংক্তিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি বলতে চান : এদের মধ্যে যে-ধার্ম্মিক বিরোধ আমি আমার মূল প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছি সেটা ভিত্তিহীন, অন্ততঃ অতি স্থূল ব্যাপার, এবং এদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও 'ক্রিয়াকর্ম্মে' যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঐক্য ধীর, সংযত, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, কুশাগ্রবুদ্ধি ও বিচারশীল মানুষের চোখ এড়ায় না, তার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এই দু'টা সম্প্রদায় মিলিত অথবা অন্ততঃ পরস্পরের সন্নিহিত হ'তে পারে এবং হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আমার বলবার এই যে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দুইটা দৃষ্টিশালী বুদ্ধিমান ও স্বার্থদ্বন্দ্বহীন মানুষের সমস্যা নয়, দুইটী অনাত্মীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমস্যা, এবং মানুষের ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের ভিত্তি এবং মেরুদণ্ডই হ'লো এক ধর্ম্ম থেকে অন্য ধর্ম্মের যা স্বাতন্ত্র্য — যাকে নিয়ে তার বৈশিষ্ট্য — তাকে অনাহত অব্যাহত রাখবার অজেয় আকাঙ্ক্ষা। এও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের স্থায়ী অবসানই সকলের লক্ষ্য এবং তার জন্যে আপনার মতো কৃষ্টিমান আরো অনেক মানুষ — ('বুলবুলের' শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত লীলাময় রায় এঁদের একজন) — যুগ যুগ ধ'রে অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত। তাঁরা ঐক্য চান, মিলন চান — সন্ধি বা সান্নিধ্য মাত্র চান না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ এই দলে। আমি বলতে চাই : হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য হতে পারে, মিলন হতে পারে; কিন্তু দু'টা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হিসেবে এদের ঐক্য — পূর্ণ ঐক্য — কখনো হবে না, হতে পারে না। কেননা যে-বীজের এরা পরিণাম তারাই পরস্পরের প্রতি বিমুখ। যদি কোনো কালে এদের ঐক্য হয় হবে ধর্ম্মকে পশ্চাতে রেখে — সম্ভবতঃ ত্যাগ ক'রে, ধর্ম্মবহির্ভূত কোনো নীতির ক্ষেত্রে। হিন্দু-মুসলিম ধর্ম্মের সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা এদেশে বহুবার বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তার কী ফল এতোদিনেও ফল্‌লো?

ইসলাম ও হিন্দুত্ব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য কিন্তু তাতেও আমার অনেক আপত্তি। একে একে বলি।

আপনার সিদ্ধান্ত : ধর্ম্ম প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান। আমি ধর্ম্ম বলতে বুঝি অপৌরুষেয় জ্ঞান — revealed religion. জ্ঞানের মুক্তি ও গতি এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত নয়। আর্য্যদের বেদ অপৌরুষেয় কিনা, এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু তার দ্বারা শুধু এই-ই প্রমাণিত হয় যে, ওর উপর অপৌরুষেয়তা আরোপিত হয়ে থাকে। এ বলিনে যে হিন্দুত্বও একটি revealed religion; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের বক্তাদের শক্তি ও জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে অলৌকিকত্বের ধারণা বেশ দেখবার মতো। গীতার বক্তা কৃষ্ণ — শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীভগবান্‌। মুনিঋষিরাও এক এক জন।

'মুহম্মদুর রসুলুল্লা'-তত্ত্বের যে-ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন, সেটি ইস্‌লামসঙ্গত মনে হয় না। কোর্‌আন বলে : মোহাম্মদ রসুল বই আর কিছুই নন। এর অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে ইস্‌লামের একটী সাক্ষ্য-বাক্যে — মোহাম্মদান্‌ আবদুহু ও রসুলুহু — মোহাম্মদ মানুষ, যদিও রসুল। তিনি সত্যের বাহনমাত্র। কোর্‌আন বহন ক'রেই তিনি রসুল, তাকে অনুসরণ ক'রেই তিনি মহামানুষ।

বস্তুতঃ কোনো বাণী, নীতি তত্ত্বের মূল্যেই তার শিক্ষক, প্রচারক বা সাধকের উদ্‌যাপিত জীবনের মূল্য। সাধকের মূল্যে তত্ত্বের মূল্য দেয় গুরুবাদ। তত্ত্ব থেকে তত্ত্ববাহক বা তত্ত্বপ্রচারকের মানবীয় অস্তিত্বকে অভিন্ন দেখা — "গ্রন্থের চাইতে গুরু'কে বেশী মূল্য দেওয়া এই গুরুবাদেরই অঙ্গ। আমার মনে হয় : ইসলামপন্থীর কাছে যতোটুকু, তার চাইতে ঢের বেশী আধুনিকপন্থী বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে, এটি অবশ্যপরিত্যজ্য। কেননা ভক্তির আতিশয্য জ্ঞানকে সহজেই আচ্ছন্ন ও ব্যাহত করতে পারে। শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে বাধা নেই; কিন্তু সে-শ্রদ্ধা হবে তাঁর স্বীকৃত অনুসৃত ও প্রচারিত তত্ত্ব, আদর্শ বা সত্যেরপ্রতি আমাদের যে-অনুকূল মনোভাব তারই মাপকাঠিতে পরিমিত। কেউ জীবনকর্ম্মে কোনো সত্য, নীতি বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষের চোখে সেটি স্ফুটতর হয়, হয়তো একটু বেশী লোভনীয়ও হয়; কিন্তু তত্ত্ব থেকে পৃথক করলে গুরুর যতোটুকু থাকে শেষ, তার মূল্যে তত্ত্বের মূল্য বাড়ে না। কেননা তত্ত্বের মাহাত্ম্যেই গুরুর মাহাত্ম্য, তাঁর মাহাত্ম্যে তত্ত্বের নয়। এইজন্যে গুরু ভক্তির ব্যাখ্যায় যে-অন্ধতা আপনার অনুমোদন লাভ করেছে, সে আমার মর্ম্মকে পীড়িত করে। আপনি জানেন : হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু-সংবাদ যে-মুহূর্ত্তে প্রচারিত হ'লো ওমর একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন : যে বল্‌বে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে তার মাথা আমি কাট্‌বো। আবুবকর — হজরতের অন্তরতম সুহৃদ — তখন জনতাকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন : যারা মোহাম্মদের পূজা করতো তারা জানুক . মোহাম্মদ আজ মৃত; কিন্তু যারা আল্লাকে একমাত্র উপাস্য ভেবে তাঁর সত্যের অনুসরণ করতো তারা জানুক : তিনি অমর, তাঁর সত্য অক্ষয় অব্যয়। শিষ্যদের ভক্তির আতিশয্যকে প্রশমিত করবার জন্যেই হজরতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তার কঠোর প্রতিবাদ : আনা বাশারুম্ মিস্‌লুকুম্ — তোমাদেরই মতো মানুষ আমি — (কোর্‌আন)। শিক্ষক থেকে শিক্ষাকে পৃথক ক'রে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। যাঁরা বোঝেন নি, গুরুভক্তিকে গুরুপূজায় পরিণত করতে তাঁদের বাধা হয় নি।

প্রতিমাপূজার 'দার্শনিক' ব্যাখ্যা সুপরিজ্ঞাত। অন্ধ পৌত্তলিক ভিন্ন আর কেউ তাকে গ্রহণ করবে, আশা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ তাকে আর কেউ গ্রহণ করছেও না, নিরাকার-ব্রহ্মবাদী হিন্দুরাও না। আপনি বলেছেন : গীতা "কাষ্ঠলোষ্ট্রপূজা"কে "অপকৃষ্ট কর্ম্ম" বলে। কেন বলে? পৌত্তলিকের সাম্‌নে থাকে "কাষ্ঠলোষ্ট্র," "ভাবচর্চ্চা" থাকে পেছনে; অধিকাংশের সেখানেও না — থাকে তাদের ভাবনার বাইরে। গুরুবাদে যেমন গুরু মুখ্য তত্ত্ব গৌণ, তেম্‌নি এখানেও। "ভাবচর্চ্চা" অতি অস্পষ্ট কখনো বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত, সম্মুখে দেদীপ্যমান "কাষ্ঠলোষ্ট্র।" এর পরিণাম কাষ্ঠলোষ্ট্রসর্ব্বস্বতা; এবং সেটি মানুষের জন্যে হীনতম পাতিত্য। নিষ্প্রতিম ব্রহ্মের উপাসক হিন্দুরও সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস।

আপনি যাকে বলছেন : সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ, আমি তাকে বলি : মানুষের জাগ্রত দৃষ্টির রশ্মিতে সত্যের আত্মপ্রকাশ। পরীক্ষা এবং গ্রহণ যাকে বলি, সেটি আত্মসমর্পণ থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। হয়তো আত্মসমর্পণের ভাবটী এখনো মরেনি; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আধুনিকপন্থী বিজ্ঞানবাদীর কাছে ওটি সত্য। সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ তার নয়; সে তাকে হাতের অস্ত্র ক'রে মানুষের মঙ্গলের পথ কাট্‌বে, মানুষকে নতুন ক'রে রচনা করবে, তাকে উচ্চতর মহত্তর প্রশস্ততর ক'রে গড়ে তুল্‌বে। আত্মসমর্পণে গতি হয় অবরুদ্ধ। এইজন্যে বিজ্ঞানবাদী সাময়িক সত্য বা যুগসত্য নিয়ে ছুট্‌তে থাকে, ওর কাছে বিক্রীত হয় না। আত্মসমর্পণের পরিণাম ফুল্-ষ্টপ; বিজ্ঞানবাদীর সাম্‌নে বড়োজোর কমা-সেমি কোলন — জিজ্ঞাসা সন্দেহ, তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

মানুষের উপাসনা-প্রবৃত্তি আদিম কাল থেকে যে যে পন্থা ও পদ্ধতিতে রূপলাভ করেছে, তার স্তর-বিভাগ কঠিন নয়, অসঙ্গতও নয়। আমার মনে হয় : নিরাকার ব্রহ্মবাদ পৌত্তলিকতার চাইতে ঢের ঢের উঁচু ব্যাপার (গীতার মতেও পৌত্তলিকতা "অপকৃষ্ট কর্ম্ম"— আপনি বলেছেন।) এর থেকে আধুনিকপন্থীর বিজ্ঞানবাদ — (যাতে স্রষ্টা বিশেষভাবে উপাস্য নন, নিঃসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল বা দাসত্বকামী নন,) — আরো অনেক উঁচুতে স্থান পাবার যোগ্য। মানুষের তাত্ত্বিক মনোবিকাশের এই স্তর-বিভাগ। এর মাপকাঠিতে কাল-বিভাগ বা যুগ-বিভাগ করলে সেটি বৈজ্ঞানিকের হিসেবে হয়তো বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয় না। যদি বলি : আদিমযুগীয় প্রকৃতিপূজারী ও পৌত্তলিক মনোভাব হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগীয় ধর্ম্মতাত্ত্বিক মনোভাব — নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনা, তার অর্থ এ না-ও হ'তে পারে যে আদিম যুগের অভ্যন্তরে মধ্যযুগীয় চিন্তার ছায়াপাত কোনো দার্শনিক, ভাবুক বা জ্ঞানসাধকের চিত্তে হয়নি। এও তার অর্থ নয় যে, আধুনিক যুগে বা মধ্যযুগে আদিম-যুগীয় চিন্তা ও মনোভাবের পূর্ণ অবসান আমরা দেখ্‌তে পাই। কেননা আদি যুগ থেকে মানুষ

যেমন চল্‌তে চেয়েছে অনাগত কালের দিকে বিপুল বাধা-বন্ধকে তুচ্ছ ক'রে, তেম্‌নি বহু মানুষের পক্ষে অগ্রসর যুগেও অতীত-প্রীতি ও প্রাচীন মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

আপনার বক্তব্য : নিরাকার-ব্রহ্মবাদ হিন্দুসৃষ্ট দর্শনে বা তত্ত্বশাস্ত্রে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু নিষ্প্রতিম-নিরংশ-ব্রহ্মবাদী মন হিন্দুত্বের যথার্থ প্রতিনিধি, একথা হিন্দু সমাজেরও নির্ব্বিবাদ স্বীকৃতি লাভ করবে না। কেননা পৌত্তলিক হিন্দুত্বের বিরাট অবয়ব কখনো মিথ্যে নয়। নাস্তিক্যবাদী হিন্দুর সম্পর্কেও ঐ একই কথা . তাঁরাও হিন্দুত্বের প্রতিনিধি নন। বস্তুতঃ দৈবাৎ-হিন্দুর নাস্তিকতা বা নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনা ইসলামের পরিধির মধ্যে মুক্তবুদ্ধি-চর্চ্চার সঙ্গে তুলনীয়। আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, এই কারণে ব্রাহ্ম-সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনাদের একান্তভাবে হিন্দু নামে আখ্যাত করতে অনেকদিন পর্য্যন্ত অসম্মত ছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আমরা এও স্মরণ রাখ্‌তে পারি যে, আস্তিক, নাস্তিক, নিরাকার-ব্রহ্মবাদী প্রভৃতিরা হিন্দুত্বের গণ্ডীতে স্থান পায়, তার একটি কারণ তারা পৌত্তলিকতাকে হিন্দুত্বের অন্তর্গত মনে করে এবং পৌত্তলিকতাপৃক্ত অনুষ্ঠান ও সমাজ-ব্যবস্থা থেকে তাদের বিচ্ছেদ-বোধ সবল নয়, যথেষ্ট সাহসীও নয়। তৌহিদবাদী মুসলিমের অবস্থান এর থেকে স্বতন্ত্র। আপনি জানেন : নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান এক-আল্লার ধারণা প্রাচীন আরবীয় চিন্তাতেও দুষ্প্রাপ্য নয়। তথাপি তাদের পৌত্তলিকতা হজরত মোহাম্মদকে কঠিন প্রয়াসে নিযুক্ত করেছিল, তিনি তার উচ্ছেদ-সাধনে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় : তাঁর পরিকল্পিত সমাজের তাত্ত্বিক-চিন্তায় বিশুদ্ধ তৌহিদ ছাড়া আর কিছুই তাঁর কাম্য ছিল না। নবদীক্ষিত সাকিফ গোত্রের ক্ষণিক প্রতিমা-রক্ষার আবেদনের প্রতি কঠোর উপেক্ষায় তাঁর এই মনোভাব সুস্পষ্ট। মুসলিমের মনোভাব এর থেকে স্বতন্ত্র নয়।

প্রতীক-চর্চ্চার ব্যাপারটীকে আপনি যে-ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন, সে অত্যন্ত অসাধারণ। ওভাবে ধর্‌লে যে-কোনো মতবাদকে — প্রতিমালেশহীন যে-কোনো তত্ত্ব বা সত্যকে প্রতীক-চর্চ্চার অন্তর্গত ক'রে দেখা যেতে পারে। Symbol বল্‌তে আমাদের চোখের সাম্‌নে হাজির হয় কোনো-না-কোনো জড়পদার্থের চেহারা — কোনো তত্ত্ব বা সত্য নয়। তথাপি কোনো সত্য বা আদর্শকে প্রতীক বা প্রতিমা অর্থে গ্রহণ কর্‌বার অধিকার আমি অস্বীকার করিনে। আমার বল্‌বার এই যে, নিরাকার-ব্রহ্মবাদকে যদি কোনো রকমের প্রতীক-চর্চ্চাও মনে করেন, তথাপি সেটি পৌত্তলিকতার সঙ্গে সমার্থক নয়। আমার মনে হয় : ও দু'টি একই স্তরের ব্যাপার হতে পারে না। আর এই জন্যেই "কাষ্ঠলোষ্ট্র" গীতাকারের দৃষ্টিকেও অমনভাবে পীড়িত করে।

আর একটি কথা। আপনার তত্ত্ব-বিচারে যদি তৌহিদ ও পৌত্তলিকতা সমার্থে প্রতীক-চর্চ্চা হয়, মুসলিমের কাছে সেটি গ্রহণীয় হবে না। কোর্‌আন আল্লার অভ্রান্ত বাণী — তার অক্ষয় বিশ্বাস। কোনো বাণী, তত্ত্ব বা নীতি এর থেকে স্বতন্ত্র হলে তার কাছে হবে বর্জ্জনীয়; যে-যুগে যে-তত্ত্বই প্রচারিত হোক, মুসলিমের স্বীকৃতি ও আনুগত্য অর্জ্জন কর্‌বার আগে তাকে কোর্‌আনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে। তৌহিদবাদ এবং পৌত্তলিকতাকে কোর্‌আন সমস্তরের তত্ত্বসাধনা মনে করে — একথা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব্বে ইসলামের দৃষ্টিতে সেটি বর্জ্জনীয় হতে বাধ্য।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্রকে আমি স্বতন্ত্র ক'রে দেখেছি। আপনার কাছে এ দু'টি এক ও অভিন্ন। হিন্দুত্বের দৃষ্টিতেও হয়তো তাই; কিন্তু মুসলিমের দৃষ্টিতে নয়। তসউউফ-শাস্ত্র তার কাছে ধর্ম্মশাস্ত্র নয় — তত্ত্বশাস্ত্র; বড়ো জোর একটি 'ধর্ম্মসঙ্গত' দর্শন বা ধর্ম্মদর্শন; কিন্তু অপরিহার্য্য মোটেই নয়।

তসউউফ সম্পর্কে আমার আপত্তি প্রবল। হিন্দুর অদ্বৈতবাদ ইরাণের তাত্ত্বিক মনোভাবের ভিতর দিয়ে এটি ইসলামের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে। ওর অঙ্গীভূত গুরুবাদ মানুষের 'নিরঙ্কুশ' জ্ঞানসাধনার পরিপন্থী। ওর তত্ত্ব-সাধনার পদ্ধতি আধুনিকপন্থী বিজ্ঞানবাদীর যে-জ্ঞানসাধনা — (যাকে এক বিশেষ পদ্ধতির তত্ত্বসাধনা বলা যেতে পারে) — তার মাপকাঠিতে অতি অযোগ্য। এছাড়া পৌত্তলিক প্রবৃত্তির দিকে ওর যে সুস্পষ্ট প্রবণতা, সেটিও লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়।

বিজ্ঞানবাদ সম্পর্কে যে এতো আশঙ্কা আপনার মনে জেগে উঠেছে, তার কারণ গতিকে আপনার ভয়। সৌন্দর্য্যবোধ ও প্রেমধর্ম্মের যে-চেহারা আপনার মনে চিত্রিত রয়েছে, সেটির পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে প্রচুর অনিচ্ছা আপনার চিন্তাধারায় সক্রিয়।

একে অতীত এবং অনাধুনিক বর্ত্তমানের প্রতি খানিকটা মোহ মনে করলে কি বেশী ভুল হয়? স্থিতির প্রতি আপনার আকর্ষণেরও হয়তো এই কারণ। কিন্তু গতিকে সত্যিই আমাদের ভয় নেই। স্থিতি মানুষের সাধ্য বস্তু নয় : কেননা ওটি তার সহজ দুর্ব্বলতার অন্তর্গত। স্থিতিপ্রিয়তা মানুষকে স্থবিরতার দিকে প্রবণতা দেয়, তাকে নতুনভীতু করে। তাকে এড়িয়ে গতিশীলতাকে আশ্রয় করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটি সুনিশ্চিত নয়। কেননা তার ফলে সে এক সম্পূর্ণ নতুনরূপে বিকশিত হতে পারে। আপনার স্মরণ আছে কি না জানিনে, আমি সেবার ঢাকাতেও এই সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলুম।

আপনি এবং 'বুলবুলের' শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত লীলাময় রায় — দু'জনেই যেন বর্ত্তমান ইয়োরোপকে দিয়ে আধুনিকপন্থা ও বিজ্ঞানবাদকে বিচার করতে চান। আমার মতে এটি সুসঙ্গত নয়। কেননা ইয়োরোপেও আজ পর্য্যন্ত আদিমতা ও মধ্যযুগীয়তার সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া চোকেনি।

একটি কথার পুনরুক্তি করি। আমরা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে যখন চিন্তা করি, একটি বড়ো ভুল প্রায়ই আমাদের হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজ ও অখণ্ড মুসলিম সমাজকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্টিমান দৃষ্টিশালী মানুষের বিরোধকে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলি। ভুল এইখানে। আমি দেখতে চেয়েছি এক অদ্ভুত জটিল মনোবিকাশ ও ভাবনার উত্তরাধিকারী এবং অনুসারী, অতীতমুগ্ধ একটি সমাজের সঙ্গে অন্য একটি অনুরূপ সমাজের বিরোধকে। আমি বুঝতে চেয়েছি এদের পরস্পরের প্রতি মানসিক বিরুদ্ধতার কারণ। আপনি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বিচারে এদের ধর্ম্মতাত্ত্বিক ঐক্য ও অভিন্নতা প্রমাণ করতে চান। কিন্তু এই "ঐক্য" সত্ত্বেও এদের বিরোধ প্রবল, বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং আপনার মত ও দৃষ্টি হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বকে বুঝতে এবং তার একটা সমাধানে পৌঁছুতে বিশেষ সহায়তা করছে, মনে হয় না। শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ এবং হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বকে একই পর্য্যায়ে রেখে আপনি দেখতে চান। আমার মনে হয় : এটি আমাদের ভুল। শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ একই মহীরুহের দুইটা শাখার বিবাদ। কিন্তু তারা একই মূলের রসে রসায়িত, একই কাণ্ডের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। কৃষ্টি ও সমাজব্যবস্থা তাদের বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের বিরোধকে অতিক্রম ক'রে এক সুগভীর ঐক্য বিরাজমান। শুধু এই নয়; সেই ঐক্য তাদের উভয়ের চেতনার অন্তর্গত এবং সানন্দ স্বীকৃতির দ্বারা অভিনন্দিত। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম দু'টা স্বতন্ত্র বৃক্ষ। আরব এবং ভারতের মাটীতে যদি ঐক্য থাকে, সেই মাটীর অঙ্গীভূত জীবন-সূত্রে হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য থাকতে পারে। কিন্তু সেই মাটী ফুঁড়ে তারা স্বতন্ত্র উদ্ভিদ হয়ে বেরিয়েছে। মৃত্তিকা তাদের দু'জনেরই আশ্রয় — এ-অনুভূতি তাদের প্রবল নয়, এবং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এটি তাদের অনৈক্য ও ভিন্নতা দূর করবার জন্যে যথেষ্টও নয়।

হজরত মোহাম্মদ ইহুদি-খৃষ্টান প্রভৃতির সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। এখানেও হিন্দু-মুসলিমে হ'তে পারে। কিন্তু সেটি pact, মিলন নয়; তার পরিণাম উভয়ের একজাতীয়তাগঠন নয় — আমাদের দেশে বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির যেটি আন্তরিক কামনা। আমার আশঙ্কা : হজরতের কালের এবং নীতির সবগুলো দিক ভালো ক'রে আপনি দেখেননি। তিনি চেয়েছিলেন পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিক মনোভাবের উচ্ছেদ। ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি, এবং তার ছত্রছায়ার তলে আরবীয় সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়েছিল তাঁর কঠিন প্রয়াস। কারুর ধর্ম্মমতের উপরে তলোয়ার চালানোর মতলব সম্ভবতঃ তাঁর ছিল না। এজন্যে অমুসলিম সমাজগুলোর সঙ্গে তিনি সন্ধি করেছিলেন, কিন্তু তাদের তাত্ত্বিক মনোভাবের সঙ্গে নয়। আরবীয় পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে তিনি কি কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন — কতো বিপদ ও বিরুদ্ধতার সামনা নিয়েছিলেন, আপনি জানেন। কোর্‌আন নিষেধ করে জড়প্রতিমাগুলোকে গালি দিতে, তার কারণ মতভেদের জন্যে শিষ্টাচার ত্যাগ করা তার অভিপ্রেত নয়। অন্য কারণ : আল্লাকে গালি দেওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু এতে আপনার কোন্ বক্তব্য সপ্রমাণ হয়? পৌত্তলিকতার সঙ্গে হজরত মোহাম্মদের প্রচারিত কোর্‌আনিক ইসলামের মিলন সম্ভবপর নয় ব'লেই এসেছিল প্রয়োজনের সন্ধি। কিন্তু পৌত্তলিক সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে শক্তিলিপ্সু আদর্শনিষ্ঠ ইসলামের সংঘর্ষ কি তার ফলে থেমেছিল? — যতোদিন না ইসলাম আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আরবের মাটীতে? এবং ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে-দেশে ইহুদি ও পৌত্তলিক সমাজের ভাগ্য কি দাঁড়িয়েছিল? তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারে, বর্শার শাণিত উদ্যত ফলকে তারা উচ্ছিন্ন না হ'তে পারে — (হয়নি যে, সেটি ইসলামের সভ্যতার চিহ্ন) — কিন্তু সত্যি কি তারা বেঁচেও ছিল? এদেশে এবং একালে ইসলামে ও হিন্দুতে সন্ধি হলেও একের উপর অন্যের জয়-অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা কখনো বিলুপ্ত হবে, আশা হয় না। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম মনের গোপন কোণে তলোয়ার ও খড়্গ পরস্পরের প্রতি উঁচিয়ে থাকবেই। হজরত মোহাম্মদের

সময়ে পৌত্তলিক ও ইহুদী খৃষ্টানের সঙ্গে চিরস্থায়ী সন্ধির যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল, তারা তা গ্রহণ করেনি, শান্তিও হয়নি। নিষ্প্রতিম নিরংশ অবিভাজ্য অদ্বিতীয় এক চরম পরম উপাস্যের সমদাসত্ব স্বীকারের ভিত্তিতে সনাতন শান্তির সেই আহ্বান কোরআনে — হজরত মোহাম্মদের জীবনে সুস্পষ্ট। আমার মনে হয় : ভারতীয় মুসলিমের অন্তরেও সে আহ্বান আজো ধ্বনিত হচ্ছে। নিরাকার-ব্রহ্মোপাসক সমাজ যদি হিন্দুর বহুবিধ সামাজিক অবিচার ও অক্ষমতার বাইরে চলে আসে, মুসলিমের সঙ্গে তাদের স্থায়ী সন্ধি হতে পারে। তার পরিণাম — খুব সম্ভব, ঐক্য এবং মিলন।

কোরআনিক ইসলামের যে-পরিণতি আপনার কাম্য, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যেন বিস্মৃত হয়েছেন যে কোরআন revelation, Rationalism এ এর রূপান্তর কেমন ক'রে হবে? ওকে সে আসন ছাড়বে না, অন্য কোনো revelation-এর জন্যেও না। কেননা হজরত মোহাম্মদ শেষ নবী, কোরআন শেষ নবী, কোরআন শেষ বাণী, এবং কোরআনোক্ত ইসলাম পূর্ণ-পরিণত ধর্ম্ম। কোরআনের সুস্পষ্ট বাণী আপনি জানেন : আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ইত্যাদি। এই ইসলাম কোরআনিক প্রত্যাদেশের বাইরে অচল। অতএব আধুনিকপন্থী বিজ্ঞানবাদীর কাছে কোরআন লাগবে না, অর্থাৎ ওকে এবং অন্যান্য সব ধর্ম্মকে (অলৌকিক অপৌরুষেয় জ্ঞানকে) পশ্চাতে রেখে চলাই হবে বিজ্ঞানবাদীর কর্তব্য। আর সেই পথেই আসবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ ঐক্য বোধ।

এই জন্যেই আধুনিকপন্থায় স্বদেশবাসীকে আমার আহ্বান। ইতি

বাঁশদহা, খুলনা। আপনার

২৫.০২.৩৭ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

পুনশ্চ — আপনার ঐতিহাসিক বিচার সম্পর্কে আমার নিবেদন এই যে, অতীত সব সময়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাপকাঠি নাও হতে পারে। history repeats itself এ যেমন সত্যি, history never repeats itself — এও তার চাইতে কম সত্যি নয়। কেননা মানুষ অতীতকে জানলেই তার অনুসারী হবে, এটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। সে যেমন দেখে শেখে অনেক কিছু, তেমনি ঠেকেও শেখে কম নয়।

আপনি আমাকে স্মরণ করিয়েছেন : কর্ম্মনিষ্ঠ সাধক বা তপোব্রতী সংস্কারক আমরা নই। কিন্তু তা না হ'লেও অনেকের নির্লিপ্ত প্রয়াসনিরপেক্ষ চিন্তা হয়তো ঠিক আমাদের নয়। আমাদের মতো ক্ষুদ্রদের ব্যক্তিত্ব যতোই উপেক্ষণীয় হোক, মত ও পথ যতোই ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হোক, আমাদের মনে নবীনতার প্রতি যে অসীম আকর্ষণ সদা জাগ্রত, সেটি কর্ম্মী মনোভাবের দিকে বেশ খানিক প্রণোদনা দিতে পারে। এই প্রয়াসলেশহীন নিছক ভাবুকের উদাসীন দৃষ্টি — (যাতে নব নবীনের আদর্শপ্রীতির উগ্রতা নেই) — হয়তো আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ নয়। কিন্তু এও জানি যে "ভালোয় আলোয় আঁধারে" মিশে যে-অতীত, তার আত্মাকে স্বীকার ক'রে বর্তমান ও অনাগত কালের মানবগতির বিচার যিনি করবেন, তাঁর যোগ্যতায় কিছুটা অসম্পূর্ণতা থাকা সম্ভব। অতীতের যা পরিণাম, তাকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই নবীনতার পরিচ্ছন্ন আলোকে। অতীতমুক্ত দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সে আপনাকে অনেকখানি নির্জটিল রূপে ধরা দেয়। আমার মনে হয় : তারই নব জন্ম অনেকখানি সহজ, সার্থক ও সঙ্গত।

হিন্দু-মুসলিমের ধর্ম্মীয় 'ঐক্যের' ভিত্তিতে এদের মিলন নতুন সাধনার বিষয় নয়। কিন্তু সেটি কখনো সফল হয়নি। আমার আশঙ্কা : কখনো হবে না। যদি কেউ কামনা করেন : যেন না হয়, সেও এক হিসেবে দোষের নয়। কেননা হিন্দু মুসলিম দু'টী স্বতন্ত্র ধর্ম্মকেন্দ্রিক জাতি হিসেবে যদি মিলিত হয়, তার ফলে মোটের উপর মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হবে — নবীন-চিত্ত-চর্চ্চা ও অভিনব ভবিষ্যতের ইঙ্গিত-গ্রহণ, সুতরাং আপনার পরিপূর্ণ উচ্চতা ও প্রশস্তি লাভের পথে তার গতি স্বচ্ছন্দ হবে — এ আশা প্রবল নয়। অথচ তাকেই আমাদের কামনা করতে হবে, প্রয়োজন হ'লে অতীতকে জ্বালিয়েও। ইতিহাসের ধারা অবলম্বন ক'রে মানুষের এক অংশের অবনতি এবং অন্য এক অংশের সহজ মানসিক বিকাশের মিলন যদি ঘটে, তার ফলে যে-সঙ্গতের সৃষ্টি হবে, সেটি মানুষের জন্যে কল্যাণপ্রসূ নাও হতে পারে। এ-চিন্তা দুঃসাহসিক হতে পারে, কিন্তু শুধু সেই কারণেই বর্জ্জনীয় নয়।

আজ হিন্দু-মুসলিমে যে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম, কেউ কেউ একে রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ বল্‌তে চান। আমি দেখ্‌তে চাই সংঘর্ষের মূলীভূত কারণ। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষের পশ্চাতে অতীতের অজস্র মান-অভিমান, বর্ত্তমানের অসীম ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তারও মূলে আমি দেখি মন ও তত্ত্বের দিক দিয়ে মানবীয় বিকাশের বিভিন্ন পরিণাম যে-দু'টি জিগীষু ধর্ম্ম সমাজ ও কৃষ্টি, তাদের পরস্পরকে ধর্ষণ-ও-গ্রাস-চেষ্টা। সন্ধিতে এটি প্রশমিত হবে না; হ'তে পারে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক চিন্তার বাইরে কোনো নতুন ভিত্তির উপরে এদের সম্মিলনে। আমার আশা : আধুনিকপন্থী বিজ্ঞানবাদ সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ভিত্তি।

(বৈশাখ ১৩৪৪)

হিন্দু-মুস্‌লিম্‌

[আশ্বিনের 'বুলবুলে' প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের 'হিন্দু মুস্‌লিম্‌' প্রবন্ধটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব ও শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় লেখককে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম, দেশের এই জটিল সমস্যার বিভিন্ন দিক লইয়া আরো আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল প্রবন্ধ এবং এই পত্র দুখানি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলিম সুধী সাহিত্যিকবর্গ আলোচনা করিলে আমরা তাহা সানন্দে গ্রহণ করিব।— 'বুলবুল' সম্পাদক]

(১)

'বুলবুল' আমার খুব ভাল লেগেছে এজন্য যে, এর উদ্দেশ্য হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টির জীবন বাড়িয়ে তোলা। গতানুগতিকের পথ অবলম্বন না ক'রে 'বুলবুল' চলেছে তার নিজের পথে, যে পথ দিয়ে বাংলার মুস্‌লিম-জীবনে আস্‌বে নতুন জাগরণ—হয়তো বা হিন্দু-মুসলিমের মিলনও আসতে পারে। যতদিন আমাদের দৃষ্টি প্রসারতা লাভ না করবে, আমাদের মনের শত প্রকারের বিক্ষোভ দূর না হবে, কল্যাণের পথকে আমরা চিনে নিতে না পারবো, কেবল পুরাতনকেই সাগ্রহে ও সবলে আঁক্‌ড়ে ধরে থাকবো, ততোদিন আমাদের মনের মুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তি অসম্ভব। আর এ দুই জিনিসের মুক্তি ব্যতীত কৃষ্টির জীবন সাম্‌নের দিকে কোনো মতেই অগ্রসর হতে পাবে না।

কোনো কৃষ্টিকেই একেবারে আন্‌কোরা বলা যায় না। গ্রীক কৃষ্টির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইস্‌লামী কৃষ্টি, আর ইস্‌লামী কৃষ্টি হ'তে মাল-মশ্‌লা নিয়েই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। অতএব নূতনের দেহে পুরাতনের চিহ্ন দীপ্যমান হয়ে আছে। কৃষ্টির গতি সর্ব্বদাই সম্মুখের দিকে, যে দেশে বা যে জাতির মধ্যেই তার নব জন্ম লাভ হো'ক না কেন। অতএব নূতন কৃষ্টিকে বরণ করলে পুরাতনকে ধুয়ে-মুছে ফেলা হয় না, নিশ্চিহ্নও করা হয় না। বাংলার মুস্‌লিমকে একথা ভেবে চল্‌তে হবে।

পুরাতন নূতনকে করে অবজ্ঞা, মনে করে তাকে বাহুল্য ব'লে, অনাবশ্যক ব'লে। কিন্তু নূতনের সহিত দ্বন্দ্বে পুরাতনকে যেতে হয় হেরে। কারণ নূতনের সবলতা পুরাতনের নেই। কিন্তু কতকগুলি বিষয় আছে যা আবহমান কালের জন্য সত্য, নূতনকে তা গ্রহণ করতেই হয়, না ক'লে তার শক্তির উৎস যায় শূন্য হয়ে, তার পক্ষে অগ্রগমন হয়ে উঠে অসম্ভব।

'বুলবুল' পাঠকদের জন্য যে সব প্রবন্ধ পরিবেশন কচ্ছেন তার মূলে রয়েছে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে তাঁদের মনকে গড়ে তোলা, জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের এগিয়ে দেওয়া কল্যাণের পথে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা—তাঁদের জীবনকে পরিচালিত করা।

'বুলবুলের' এ সাধনা সিদ্ধ হউক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। মানুষে মানুষে মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক, উহা দোষের জিনিষ নয়, কারণ উহা জীবনের লক্ষণ প্রকাশক। এই মতানৈক্যের ভিতর দিয়ে ঐক্য আসা অসম্ভব নয়। মত ও পথের দ্বন্দের একদিন সমাহার হয়তো বা হতে পারে। সমন্বয় যে একেবারেই হবেনা এমন কথা বলা যায় না। আমি ধর্ম্মের সমন্বয়ের কথা এখানে বল্‌ছিনা। 'বুলবুলের' উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এক্‌থা বলেছি।

আপনার দুটি প্রবন্ধ আমি খুব মন দিয়ে বহুবার পড়েছি। শরৎবাবুর 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' এর উত্তরে আপনি যা লিখেছেন সেটি এবং আপনার হিন্দু-মুস্‌লিম প্রবন্ধ যা আশ্বিনে বেরিয়েছে।

আমি এ দুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা কর্‌বো। যদি অপ্রিয় কথা কিছু বলি, বড়ভায়ের দেওয়া আঘাত বলে তা হেসে উড়িয়ে দেবেন। পত্রই আমি লিখ্‌ছি, প্রবন্ধ নয়, অতএব প্রবন্ধের পারম্পর্য্য এতে থাকবে না।

ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন তা সত্য। "এ ধর্ম্ম কারুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে না, সমঝোতা করে না,--বুভুক্ষা এর ভীষণ, এ করে গ্রাস।. কিন্তু ইস্‌লামের জন্ম এদেশের মাটিতে নয়, অস্থি তার লৌহ কঠিন, মর্ম্ম তার অক্ষয় অব্যয়। ভারতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তার অঙ্গ হলো ক্ষত বিক্ষত কিন্তু মৃত্যু তার হলো না। হ'লো না বলে এই হো'ল বিষম সমস্যা। আপনার পত্র-পুষ্প পল্লবে তার বিস্তার হলো বিস্ময়কর; ভারতের মহামহীরুহ অতৃপ্ত ক্ষুধায়, বঞ্চিত অভিমানে হ'য়ে উঠলো বার বার আন্দোলিত। সেই আন্দোলন, সেই বিক্ষোভ আজ আমাদের সম্মুখে। বস্তুতঃ দুইটা অনমনীয় কঠিন সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ।" আপনি রোগের যে নিদান নির্ণয় করেছেন, এমন ভাবে আর কেউ তা করতে পারে নি। আমার মনে হয় আপনি তার প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন আপনার 'হিন্দু-মুস্‌লিম' প্রবন্ধে। যাক্, সে বিষয় পরে আলোচনা করবো।

"ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দুর মনকে করেছে অপরিসর তার দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম ক'রে গতি তার নিশ্চল" নিশ্চয়ই, তাই আজিকার দিনেও তারা নিজেদের 'আভিজাত্যের গর্ব্বে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান' আর 'আজো দুর্জ্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান দান কর্ত্তেও' তার আপত্তি অন্তহীন। আজো তাঁরা চাচ্ছেন হিন্দু ভারত প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে,---একটা অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করতে। আসলে কিন্তু তাঁরা মিলিত ভারত চান না। তাঁদের সকল চেষ্টার মূলেই ও বিষয়টা পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করে। বুদ্ধির মুক্তি নিয়ে আপনারা যতই বড়াই করুন, সে জিনিষটা আপনাদেরও লাভ হয় নাই, ওঁদেরও হয় নাই। দুর্ব্বল যদি বলে আমার বুদ্ধির মুক্তি হয়েছে, তা হ'লে বুঝতে হবে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। নিজস্ব বিসর্জ্জন করার নামই যদি আপনাদের পরিভাষায় বুদ্ধির মুক্তি হয়, তবে তা হয়তো আপনাদের লাভ হয়ে থাকবে।

মনে রাখবেন, সবলের বুদ্ধি মুক্ত না হলেও দুর্ব্বলের বুদ্ধির মুক্তিতে কোনো লাভ নেই। দুর্ব্বলের ওরূপ বুদ্ধির মুক্তিকে সবল মনে করে অত্যধিক দুর্ব্বলতা---সবলের সহিত সমান আসনে বসবার জন্যে দুর্ব্বলের একটা ব্যর্থ আকুল প্রয়াস। তাঁদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

হিন্দুরা আত্মকেন্দ্রী এবং পরবিমুখ বলেই যে-দেশকে মুসলমানগণ নিজের দেশ বলে বরণ করে নিয়েছে, সেখানেও তাদের অবস্থা পরবাসীর মতো। হিন্দু মুস্‌লিমকে বোঝে না, আর মুস্‌লিম বুঝবে হিন্দুকে? তবুও যতটা সম্ভব মুস্‌লিম হিন্দুকে বুঝতে চেষ্টা করে, বোঝে; কিন্তু হিন্দুর পরবিমুখতা তাকে বার বার সান্নিধ্য থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। অনেকেই বলে থাকেন বাংলার মুস্‌লিমের অধিকাংশের জন্ম হিন্দুর নিম্নশ্রেণী থেকে, ওদের আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এ কথাটার মূলে রয়েছে একটা ক্রূর কুটিল ইঙ্গিত--- ওরা অন্ত্যজ জাতি থেকে মুসলমান হয়েছিল, ওরা মিশে যাক আবার সেই অন্ত্যজ জাতির মধ্যে,--বাংলা দেশের বর্ত্তমান ঝড়ো হাওয়া সেদিন আর থাকবে না। অর্থ, এ যদি হয়, তা হ'লে বাংলা দেশে আবার বর্ণ হিন্দুর রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আমাদের হিন্দুপ্রতিবেশীদের মনে রাখা উচিত, হিন্দুদের মধ্যে যারা খৃষ্টান হচ্ছে তারা নাম বদলায় না, ধর্ম্ম মতই শুধু বদলায়। আচারে ব্যবহারে রয়ে যায় তারা হিন্দুদেরই মতো, যেমন চীনদেশে হয়েছে মুসলমানের অবস্থা। তাদের চীনা নামের ভেতর থেকে মুসলমান নামটি বেছে বা'র করা সুকঠিন। আপনি তার যে কারণ দিয়েছেন তা ঠিক বলেই মনে করি। কিন্তু এদেশে মুসলমান যারা হয়েছিল তাদের পরিবর্ত্তন হয়েছিল প্রচুর। ভাষায় ও ভাবে আচার ও ব্যবহারে তারা হয়ে গেছে হিন্দুর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাম তো তারা বদ্‌লিয়েছেই, সব কিছুই তারা বদলিয়েছে---ইসলামের প্রভাব তাদের উপরে এতোখানি পরিবর্ত্তন আন্‌তে পেরেছে। মাতৃভাষা তাদের বাংলা হ'লেও বহু আরবী ফারসী শব্দ তারা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে--- ভাষাকে বিকৃত করবার জন্য নয়।

যে পরিবর্ত্তনের কথা আমি উপরে উল্লেখ করলাম তার জন্য ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ইসলাম বা মুসলিমকে গ্রাস করতে পারে নি। আপনিই বলেছেন, এই না পাবার জন্যে যে ক্ষোভ তার ভেতরেই লুকানো রয়েছে হিন্দু-মুসলিমের যত সব দ্বন্দ্ব কলহ ও ঐক্যাভাব।

এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে কলহ, এই যে ঐক্যাভাব এ মিটাবে কে? হিন্দুগণ কখনও মুসলিমের জাগরণ চায় নি, চেয়েছিল

তাদের মৃত্যু—চেয়েছিল ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির অপ্রতিহত ক্ষমতালাভ, চেয়েছিল মুসলমানদের গ্রাস করে হরিজনদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া। সঙ্কল্প ছিল তাদের সুদৃঢ় এবং তাদের দিক দিয়ে সাধু, কিন্তু তা সাধন করতে তারা পারে নি।

মহাভারতীয় যুগে হিন্দুভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এক মহাধর্ম্মরাজ্য গড়তে—যার জাতি হবে এক, ধর্ম্ম হবে এক, সমাজ হবে এক, ভগবান হবে এক। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। আর আজ এমন কোন শক্তিধর পুরুষ এদেশে আছেন যিনি দুই বিভিন্ন কৃষ্টির প্রবল বিরোধকে মিটিয়ে দিয়ে একই ক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার দিয়ে দাঁড় করাতে পারবেন?

এই দুই বিভিন্ন কৃষ্টির যারা সাধক তাদের মিলনের শুধু একটা পথ আছে—উভয়ের সমাজ-জীবনের সমতা বিধান। বহু ইন্টারনেশনাল ডিনার তো হয়েছে, কিন্তু তাতে কি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের ভিতরে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে? তা একটুও আসে নি, বর্ত্তমান অবস্থায় আসাও অসম্ভব। আসলে হিন্দুর মনের ইচ্ছা, ভারতের পলিটিকাল জীবনে মুসলমানদের অপাঙক্তেয় করে রাখা। চারিদিক হ'তে চেষ্টা চল্‌ছে সেই মতলব নিয়েই। ধর্ম্ম ও সমাজের দ্বন্দ্ব তাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে রাজনীতির চষা ক্ষেতে!

যদি ইসলামের গণ্ডীর ভিতরেই আপনারা থাক্‌তে চান, তা হলে ব্যক্তির পূজা আপনারা করবেন না, ও আদর্শ তো ইস্‌লামের নয়। রামমোহনের দিকে আকুল নয়নে চাবেন না অনুপায়ের মতো—মাতৃহারা শিশুর মতো, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের দিকেও না। চাবেন আপনারা সব মুসলমান আরবের উম্মি নবী হজরত মোহম্মদের দিকে, তাঁর মহান্ জীবনের কর্ম্মধারার দিকে, অলৌকিক যদি কিছু তিনি করে থাকেন সে দিকেও না। আপাতঃ-মনোরম ভাবের বন্যায় মুস্‌লিম কেন ভেসে যাবে, ডুবে যবে, তলিয়ে যাবে? মুক্তির নামে যে বন্ধন আস্‌ছে তাকে কেন তারা বরণ ক'রে নেবে?

যাঁরা আমাদের political existence সমূলে বিনাশ করতে চান, তাঁরা আমাদের কোন্ উপকার করতে পারবেন বুঝতে পারি না। কোথাও কি এমন নজির আছে যে, কোন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় জাতিতে জাতিতে যে বিরোধ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ, বই লিখে তা মিটিয়ে দিতে পেরেছেন? মিসেস্ স্টো লিখেছিলেন Uncle Tom's Cabin নিগ্রোদের পক্ষ নিয়ে, দরদ দিয়ে যাকে বই লিখা বলে তাই। কিন্তু আজও নিগ্রোদের Flaying চলছে, তার আর বিরাম নেই। বিরাম নেই এজন্যে যে, সবল, দুর্ব্বলকে চিরদিন অত্যাচার করে এসেছে, চিরদিনই করবে।

যাঁদের পলিটিক্যাল মন রয়েছে মুস্‌লিম-বিরোধী, তাঁদের সাহিত্যিক মন কেমন করে মুক্ত হবে ওসব থেকে? এমন ভাবে মন জিনিষটাকে দুভাগ করে কেহ কখনও আত্মীয়তা দেখাতে পেরেছেন? যে ইঙ্গিত আপনারা পেয়েছেন বলে আপনাদের কেউ কেউ আনন্দে নৃত্য কচ্ছেন, তার কোনো মূল্য নেই, কোন স্থিরতা নেই। তার ভিতরকার উদ্দেশ্য হলো আমাদের উপচীয়মান শক্তিকে প্রহত করা—আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া।

মনে আছে তো, চিত্তরঞ্জন করেছিলেন বাংলার মুসলমানের সাথে একটা পলিটিক্যাল প্যাক্ট। মুসলমান তো আনন্দে নেচে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই প্যাক্ট কি কোন হিন্দু মেনে নিয়েছিলেন? নেন্ নি, বরং সেদিন থেকে বাংলা দেশে হিন্দু-মুস্‌লিমের বিরোধ আরও উগ্র হয়েছে। আর এই প্যাক্ট করবার ফলেই কি চিত্তরঞ্জনের দলের লোকেরা তাঁর মনে প্রচুর ব্যথা দেয় নি? তাঁকে অপমান করে নি, লাঞ্ছিত করে নি? তিনি ছিলেন অত্যধিক ভাবপ্রবণ, কবিরা সচরাচর যা হয়ে থাকেন। তাই তিনি দার্জ্জিলিং যে গেলেন আর ফিরে এলেন না—নিজের গৌরবের মাঝেই তিনি মারা গেলেন! বেঁচে থাক্‌লে তাঁর সে গৌরব হ'তো ধূল্যবলুণ্ঠিত, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা তাঁর হাত থেকে পতাকা নিত ছিনিয়ে। ভেবে দেখবেন আমি মিথ্যা বলি নি।

এই যে ঢাকাতে শরৎবাবু একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন ব'লে আপনারা বল্‌ছেন, তার কি কোন সমর্থন পেয়েছেন আপনারা হিন্দু-সমাজ থেকে? মামুলি যেমন সব খবর পত্রিকায় বা'র হয়, ও-খবরটাও ঠিক তেমনি বেরিয়েছে, তার বেশী কিছু নয়। ও-ইঙ্গিতের প্রতিধ্বনি আস্‌বে প্রথমে হিন্দু-সমাজ থেকে, তার পরে করবেন আপনারা নিজেদের কর্ত্তব্য নির্ণয়, তার আগে নয়। বন্ধু ধীরে, একটু ধীরে। শুধু একজনের ইঙ্গিত পেয়েই অসম্ভব ছুটে চলবেন না, চল্‌তে চাইবেন না, বিষম হোঁচট খাওয়ার

বহু সম্ভাবনা আছে। পায়ের তলার প্রতি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড পরীক্ষা করে চল্‌বেন, চোরা গর্ত্ত বা চোরা বালিও তো থাক্‌তে পারে, অসম্ভব তো কিছুই নয়।

হিন্দু-মুস্‌লিমের মিলন-বিরোধী আমি নই, কখনও নই। মিলন হচ্ছে না ব'লে আমার মনের যে অপরিসীম দুঃখ, তা আমি কেমন ক'রে আপনাদের জানাবো? আমার সব চেয়ে বড় কথা সবলে দুর্ব্বলে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, বিত্তশালী ও বিত্তহীনে কখনো মিলন হ'তে পারে না। আপনারা হয়তো ও-রূপ মিলনকে মিলন ব'লে চালিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমি তার নাম দেবো চিরদিনের জন্য দাসত্ব বরণ। তাতে হীন জনের হয় মৃত্যু, অপমৃত্যুও বল্‌তে পারেন।

এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সম্ভবপর হবে শিক্ষার বিস্তৃতির সহিত, অবজ্ঞার তিরোধানে। আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার যাতে বেশী হয়, আপনারা তারই চেষ্টা ও সাধনা করুন। আপনারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দিন আমাদের যুবকদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে, তাদের কৃষ্টির দিকটাকে সুদূরপ্রসারী এবং কল্যাণের অভিসারী করে। বাড়তে দিন তাদের সত্য ইস্‌লামের গণ্ডীর ভিতরে।

আপনি 'হিন্দু-মুস্‌লিম'-এ প্রথমে প্রাগ্‌-ইস্‌লামযুগের আরবের সহিত প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা দুটি প্রায় ছিল অভিন্ন। কিন্তু "ইস্‌লাম যখন আপনার সত্য নিয়ে, শক্তি নিয়ে প্রকাশিত হ'লো, প্রাচীন আরব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো; তার ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র ও নীতির এমন অদ্ভুত এবং আমূল পরিবর্ত্তন ঘটলো যে তাকে আর চিনবার জো-টী রইলো না। এ করা ইস্‌লামের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধু এই জন্য যে ইস্‌লাম সন্ধি করে নি, আপোষের তাগিদে নিজের ক্ষতি কখনও মেনে নেয় নি; বরং আপনাকে রাজ-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে প্রাচীন ধর্ম্মের যা কিছু পরিচয়, তাদের ইন্ধনে সত্যের আগুন জ্বেলেছিল। জ্বেলেছিল, কারণ তার জন্ম হ'লো মানুষ-সমাজের যে অপবিচ্ছিন্নতা দূর করবার জন্যে, তাকে পুড়িয়ে ছাই না কল্লে তার জন্মই হ'তো মিথ্যে।"

আপনি ঠিক বলেছেন, "দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে—প্রাচীন ভারতের পক্ষ থেকে এই যেন নিমন্ত্রণ, এ হ'লো ইস্‌লামের বিনষ্টির আহ্বান। ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের যে বিশিষ্ট আদর্শ ইস্‌লাম করতে চায় তার মূলোচ্ছেদ। এখানে আপোষের কথা আসে না। এই জন্যেই ধর্ম্মের সমন্বয় যাঁরা চেয়েছেন, তাঁরা মিলনের সাক্ষাৎ পান্‌নি, পেয়েছেন এক একটা সঙ্কর ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বা মতবাদ যারা ভারতীয় সমস্যার জটিলতা বাড়িয়েছে, কমায় নি। যাঁরা চাইলেন মিলন, কামনা কল্লেন সন্ধি, তাঁদের সম্মুখে আজ অবিরাম সংঘর্ষ আর শান্তিনাশা সংগ্রাম।... ..সংঘর্ষ চল্‌ছেই, বিরাম তার বিন্দুমাত্র নেই, কখনো হয় নি, হবে যে এ আশারও কোন কারণ নেই।" এ পর্য্যন্ত আপনার মতকে আমি সানন্দে মেনে নিয়েছি।

আপনি লিখেছেন, "ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে যে জাতীয়তা তার ভিত্তিমূল আজ শিথিল হয়েছে।" একথা লিখবার সময়ে আপনার হয়তো নবীন তুরস্কের কথা মনে পড়েছে – মনে পড়েছে কামাল আতাতোর্কের কথা। সেখানে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ হয়েছে 'রাষ্ট্রের অবাধ অধিকার সীমার অন্তর্গত।' সে দেশের ধর্ম্ম ছিল এক, জাত ও সমাজ ছিল এক, দুই নয়, তাই আতা-তোর্ক ধর্ম্মকে যে শুধু রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করেছেন তা নয়, তাকে দিয়েছেন ব্যক্তির মনের জিনিস করে। রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থেকে তথায় ইস্‌লাম মোল্লা শাসিত হ'য়ে হয়েছিল পঙ্গু, আসল রূপ গেছিল তার হারিয়ে, আর মোল্লাদের পাল্লায় প'ড়ে বিধি নিষেধের বেড়াজালের মধ্যে রাষ্ট্র হারিয়ে ফেলেছিল তার শক্তি, তার শৌর্য্য, তার সৃজন-প্রতিভা। কামালের সৃষ্টিধর্ম্মী মন সৈনিকের বজ্রবাহু দিয়ে সঙ্কীর্ণ মোল্লাদের দিয়েছেন পিষে, কিন্তু ইস্‌লামকে করেছেন মুক্ত, সবল এবং স্বস্থ। তাঁর এই আদর্শ ধীরে ধীরে অন্যান্য মুস্‌লিম রাষ্ট্রও মেনে নিচ্ছে। দেশভেদে পরিবর্ত্তনের রূপ বিভিন্ন হবে সন্দেহ নেই, কারণ প্রয়োজন সব দেশের তো এক নয়।

যে স্বাজাত্য বা জাতীয়তার কামনা ক'রে ইস্‌লামকে ভারতীয় মুস্‌লিমের জীবন থেকে আপনারা বিচ্ছিন্ন করে দিতে চান, নির্ব্বাসন দিতে চান, তাতে কি ফল হবে? আপনার কোন ধর্ম্মই রইলো না, রইলো শুধু জাতীয়তা তাই হ'লো আপনার ধর্ম্ম। আর এক দিকে ধর্ম্ম রইলো খাড়া তার সঙ্কীর্ণতা, পরবিমুখতা আর ছুঁৎমার্গ নিয়ে—অপরকে ধ্বংস করবার, গ্রাস করবার প্রবৃত্তি নিয়ে। সেই হ'লো তার জাতীয়তা! তখন তো আপনি অতি প্রাচীন অজগরের উদরে তার খাদ্য হয়েই ঢুক্‌বেন এবং এক নতুন অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি করবেন।

ধর্ম্ম যদি শুধু একটা Moral principleই হয়, স্রষ্টার প্রতি একমাত্র বিশ্বাস ও আত্ম-নিবেদন হয়, উহা যদি কেবল ব্যক্তির মনের ও বিশ্বাসেরই ব্যাপার হয়, শতবাহু বেষ্টন করে তা যদি না করে সমাজকে পেষণ, rites and rituals দিয়ে সমাজ-জীবনকে না করে পঙ্গু, না হয় তার উদার বিস্তৃতি ও বিকাশের পথে অন্তরায়, তবে তার শিথিলতা, বিনাশ বা বর্জ্জন কোনটাই লোভনীয় নয়। যে-ধর্ম্মের কথা আমি বলছি তাকে বিনাশ করলে মনুষ্যের নৈতিক মেরুদণ্ড যাবে ভেঙ্গে যা মানুষকে রাখে জীইয়ে, তাকে করে সবল, এনে দেয় তার মনে নির্ম্মল দেশপ্রীতিবোধ, করে তাকে জাতীয়তার মন্ত্র সাধক। ইস্‌লাম তো কখনও দেশপ্রীতির বৈরী নয় বা স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে কখনো কোথাও দাঁড়ায় নি। আমি মোল্লা ridden ইস্‌লামের কথা বলছি না, বলছি সত্য ইস্‌লামের কথা। আর এক কথা, মোল্লাদের মধ্যে সবই সঙ্কীর্ণমনা নয়—উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সৈয়দ জামালুদ্দিন আফ্‌গানীর কথা, আল্লামা মোহম্মদ আবদুহ্‌র কথা।

অতি প্রাচীন যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ তার করে হবে সংস্কার? মানুষে মানুষে যে ভেদবুদ্ধি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অভিভূত করে রেখেছে, তার নিবৃত্তির জন্য কি চেষ্টা চলেছে?—কোন চেষ্টা চলে নি, বরং তাকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। মুখে মুখে যদি নবীনতার উগ্রসাধক হওয়া যায়, আর ভিতরে ভিতরে চলে পুরাতনকে স্থায়ী করবার জন্যে অজস্র চেষ্টা, তাতে আমাদের কি লাভ? বুঝিয়ে দিন আমাকে তাতে কি লাভ হবে আমাদের? ধর্ম্মশাসিত সমাজ যাঁদের নিজের স্থান থেকে একটুকুও টল্‌তে চায় না—হরিজনদের শিখ হতে দিতে রাজি তবুও তাদের জন্য একটুও স্থান করে দিতে চায় না—তাদের অধিকার কিছু বিস্তৃত করে দিতে চায় না, সে সমাজ অন্যের সঙ্গে সমান ব্যবহার কি করে করবে? হিন্দুমিশনকে তাঁরা সাহায্য কচ্ছেন মুসলমানদের হিন্দু ক'রে আর্য্য সমাজে স্থান দিতে, আর তাদের নিজেদের অঙ্গ যারা তাদের কচ্ছেন ঘৃণা—হরিজনদের দিচ্ছেন তাড়িয়ে। আশাও মন্দ নয়, তাদের শিখ হতে দিয়ে শিখদের সাথে সাথে তাদেরও টেনে আন্‌বেন আবার হিন্দু গণ্ডীর ভিতরে! আমি তো দেখছি, সব দিক দিয়ে সেই একই উদ্দেশ্য তাঁদের—মুস্‌লিম বিতাড়ন! আপনি যে সম্‌ঝোতা চান তার কিছু সন্ধান পেয়েছেন?

ধর্ম্মকে সংহার করে রাষ্ট্র চলেছে এখন শুধু একদেশে—রাশিয়াতে। কিন্তু সেখানে ধর্ম্ম ও জাতি ছিল এক, সমাজও এক ছিল বলা যায়, পার্থক্য ছিল শুধু ধনী ও ধনহীনের মধ্যে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা মোটেই তা নয়। রাশিয়াতে প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন মত, প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন সমাজ ও প্রাচীন সংস্কারকে খণ্ড খণ্ড ক'রে—নিশ্চিহ্ন ক'রে—সে দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতে তা হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। প্রফেসর জোডের মতে কম্যুনিজম হ'লো সোশ্যালিজমের শেষ পরিণতির পূর্ব্বাবস্থা। অর্থাৎ কম্যুনিজম এর ভিতর দিয়ে সোশ্যালিজমে পৌঁছাতে হবে। সেটা হ'লো কার্ল মার্ক্‌সের সোশ্যালিজম্‌। কিন্তু নেশন্যাল সোশ্যালিজম বলেও একটা জিনিস আছে। তার স্বরূপ পাওয়া যায় কার্ল মার্কসের জন্মভূমি জার্ম্মানীর ন্যাজিজম-এ আর ইটালীর ফ্যাসিজমে। কিন্তু সেখানে ধর্ম্মকে তারা তাড়িয়ে দেয় নি, রেখে দিয়েছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে।

আপনি হিট্‌লারের উপর চটেছেন মুখ্যতঃ আইনস্‌টাইনের মতো মহামনীষীকে ইহুদী ব'লে তাঁর জন্মভূমি জার্ম্মেণী হতে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। সংবাদ নিয়ে দেখ্‌বেন, আইন্‌স্‌টাইনকে হিট্‌লার বা হিটলারের জার্ম্মেণী তাড়ান নি, তিনি অভিমান ক'রে চলে গেছেন। তাঁকে তাড়াবার কথা তাঁরা মুখেও আনেন নি। বিগত মহাসমরে জার্ম্মেণীর পরাজয়ের মূলে ছিল ইহুদীদের দেশ-বৈরীতা। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরেও তাদের সে বৈরীতার অবসান হয় নি। নিজের দেশকে আবার গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে জার্ম্মেণীর টিউটন জাতি দেখ্‌তে পেলেন প্রচুর ধনের মালিক ইহুদীদের জন্যে তাঁরা তা করতে পাচ্ছেন না। অতএব সেখানে তাঁরা আরম্ভ করে দিলেন আর্য্য ও অনার্য্যের বাছাই এবং অনার্য্যের বহিষ্কার। তা করতে পেরেছেন বলেই হিট্‌লারের জার্ম্মেণী আবার নিজের হৃতশক্তি ও স্থান ফিরে পেয়েছে।

ভারতে সোশ্যালিজমের প্রথম ও প্রধান উদ্‌গাতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেসের ভিতরে তাই Congress Socialist Party ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এখনই এ-দলকে বলা হয় কংগ্রেসের Left Wing. কিন্তু এই দলের কেহ কেহ আবার হিন্দু-মহাসভাপন্থীও বটেন, যেমন বিহারের জগৎনারায়ণ লাল। বাংলা দেশে হিন্দু সোশ্যালিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁদের বাইরের রূপ ওটা হ'লেও মনের দিক দিয়ে তাঁরা হিন্দু-মহাসভাপন্থী। তাঁরা আছেন হিন্দু-ভারতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে।

খাঁটি সোশ্যালিষ্ট 'আপনারা তাঁদের বলতে পারেন না।

ন্যাজিজম বা ফ্যাসিজম এর মত কোন 'ইজম' যে ভবিষ্যত-ভারতে মাথা তুলে দাঁড়াবে না একথাও তো আপনি আঁক কসে বলে দিতে পারেন না। ন্যাজিজম জার্মেণীতে ইহুদীদের যে দশা করেছে, কোনো ভারতীয় হিটলার যে ভারতে মুসলমানদের সে অবস্থা করবেন না কে বলতে পারে? আর্য্য অনার্য্যের বাছাই তো ভারতীয় হিটলারও করতে পারেন। তা হ'লে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা হবে ঠিক ইহুদীদের মত অথবা তার চেয়েও ভীষণ! সেখানে চলেছে বহিষ্কারের কাজ, এখানে চলবে বহিষ্কার এবং সংহার দুই-ই, ঠিক স্পেনে যা একদিন মুসলিমের ভাগ্যে ঘটেছিল। যেদিক দিয়েই যেতে চাইন, ভারতীয় মুসলিমদের মুক্তির পথ, বাঁচবার পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

সার মোহম্মদ একবালের পাকিস্তানের পরিকল্পনা নিয়ে সকলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, আমরাও করেছি। ও কথাটার ভিতরে ভাববার বহু বিষয় আছে। এখন দেখছি, তা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত কথা মোটেই নয়। তিনি হাল্কা মনে ওকথা বলেন নি, বলেছেন অনেক ভেবে চিন্তে। ধরুন, আপনি যা চাচ্ছেন তা যদি না হ'লো, দেশের মন সেদিক দিয়ে না গিয়ে অন্য পথ যদি গ্রহণ কল্লো, অর্থাৎ হিন্দু সোশ্যালিষ্টের মনের ভিতরেও যদি রইলো মুসলিমের প্রতি তাদের জন্ম-জন্মের হিংসার ভাব, বিরোধের ভাব, আর মুসলমান যদি তাদের খোলনলচে দুই-ই না বদলিয়ে ফেল্লো, তারা যদি মুসলমানই রয়ে গেল, তখন? সে সময়ে এমন অবস্থাও তো হ'তে পারে যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের টিকানো মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে। গৃহযুদ্ধ বহুকাল হয়তো চলতে পারে, তার পরে হবে একটা ভাগাভাগি, একটা শেষ রফা—পাকিস্তানের বাসিন্দা হবে সব মুসলমান, আর বাকী সব জায়গায় বাসিন্দা হবে সব হিন্দু। শিখরাও তাদের মধ্যে, কারণ মিতালি তাদের মধ্যে অনেক দিন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের একদিন হিজ্‌রত ক'রে যাওয়া তো নিতান্ত বিচিত্র ও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কে এসে আমাদের কানে দু'টো মিষ্টি কথা শুনালেন, আর অমনি আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বো উদ্ধারকর্ত্তা ব'লে? না, উদ্ধারের পথ এতো সোজা নয়। হজরত মুসা উদ্ধার করেছিলেন বণিইস্‌রাইলদের, সে কথা তো জানেন। আমাদের যিনি উদ্ধার করবেন তাঁর শুভজন্ম আমাদের মত পতিত-লাঞ্ছিতদের ঘরেই নিতে হবে, অন্য কোথাও নয়। একথা আপনারা সুনিশ্চিত ব'লে জানবেন।

যে দুটো মিষ্টিকথা সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভর্ৎসনা শুনে আপনারা পুলকে নেচে উঠেছেন, আর খুব বড়ো কাজ করা হয়েছে ব'লে আশ্বিনের 'বুলবুল'-এর প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, হতে পারে তার ভিতরের উদ্দেশ্য শুধু আমাদের মনকে বিকল, বিভ্রান্ত করে দেওয়া, আমাদের মধ্যে যে সংহতি আস্‌ছিল তাকে নষ্ট করা। জাতি বা সম্প্রদায়ের নবজীবন লাভ এতো সোজা নয় এবং সহজলভ্যও নয়। বহু সাধনা ও তপস্যার ফলে হবে তার শুভাগমন। বন্ধুর পথ দিয়েই তাকে আস্‌তে হবে, সরল সমতল রাজপথ দিয়ে নয়।

হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ চোখের পলকে মিট্‌বার নয়। মিটিয়ে দেওয়ার সাধ্য কারু নেই, কোনো যুগান্তকারী পুরুষেরও নয়। এতো সোজা নয় এ বিরোধ। এর সমাধান আস্‌বে দুই দলের মনের গুহা থেকে, বাইরের হাত মেলা মেলি বা অনুগ্রহের হাসি লাভ ক'রে নয়। এখন চলেছে শুধু তাই। আসলে কিন্তু মনের দিক থেকে এ বিরোধ মিটবার বিন্দু সাড়া নেই। আশু প্রয়োজনের খাতিরে জোড়াতালি দিয়ে কাজ সার্‌বার চেষ্টা চলেছে মাত্র। আমি আমার মন ও দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বল্‌বো, এ চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার একান্ত অভাব।

হিন্দু মহা-সভার একজন নেতা হবেন আমাদের মুক্তিদাতা! একথা ভেবে যেমন হাসি পায়, তেমনি অন্তর ফেটে আসে কান্না যে, আপনারা সহজেই গেলেন মোমের মত গ'লে! দেখিয়ে দিলেন আপনাদের মেরু-মজ্জা নেই! আপনারা কি আমার মত স্থাবরের ন্যায় সব হারিয়ে বসে আছেন? আগেই বলেছি সমানে সমানে ছাড়া আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হ'তে পাবে না। আগে চেষ্টা করুন সমান হওয়ার জন্যে। সমান যদি হ'তে পারেন, অবজ্ঞার ভাব যাবে দূর হয়ে। তখন মিলন আসা কতকটা সম্ভব। তার আগে,—আপনার ভাষায় বলতে গেলে বল্‌তে হবে—'অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব'।

ইস্‌লামের দুঃখের দিনে তাকে যা দেখছেন তাইতো তার আসল রূপ নয়। আপনিই তো বলেছেন, "ইস্‌লামের প্রাণবস্তু যে নিষ্কলুষ একেশ্বরবাদ—নিষ্প্রতিম নিরংশ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার, এ দেশের আদিম-প্রকৃতি পূজারী মন

ইন্দো-ইরানীয় ধর্ম্ম-দর্শনের ছদ্মবেশে তাকে কর্‌লো গুপ্তাঘাত। ইস্‌লামের ধর্ম্ম তার সাম্যনীতি—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাম্য, পরিবারে পরিবারে সাম্য, সমাজের সর্ব্ববিধ অধিকারে সাম্য, রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে মানুষে মানুষে সাম্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র একত্বে, নিরাকারত্বে, অবিভাজ্যতায় দৃঢ়গভীর প্রত্যয়—সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আরবের ইস্‌লামকে করেছিল অনিবার্য্য। ভারতের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ একে হান্‌লো প্রাণঘাতী বিষাক্ত বাণ; তাই আজ মর্ম্মাহত ইস্‌লাম আমাদের সম্মুখে অবলুণ্ঠিত মূর্চ্ছিত।"

যে শক্তির বলে ইস্‌লাম জগতে সাম্যের মন্ত্র প্রচার ক'রে মানুষের মনকে জয় করবার, বিশ্ব জয় করবার অধিকার পেয়েছিল, নিয়ে যান তাকে ফিরিয়ে তার সেই শক্তির উৎসে— হজরত যে ইস্‌লাম প্রচার করেছিলেন আর তাঁর চারি খলিফা যার অনুসরণ করেছিলেন ঠিক তারই মাঝে। তা হ'লে আবার আরম্ভ হবে তার নব জীবন ও নবীন সাধনা। ধুয়ে মুছে ফেলে দিন ইস্‌লামের অঙ্গের ইন্দো-ইরানীয় প্রলেপ, পীর পরস্তিকে দিন দূর ক'রে, যার জন্ম হয়েছে ভারতের গুরুবাদ থেকে—যা শোষণ কচ্ছে মুসলমানের মেদ, মজ্জা, শক্তি; বলুন আপনারা, কোরাণের বাণী ছাড়া, হজরতের বাণী ও জীবনের আদর্শ ছাড়া আর কিছু আমাদের গ্রহণীয় নয়।

বুদ্ধির মুক্তিকে ইস্‌লাম কখনও অস্বীকার করে নি—কর্‌লে মুতাজেলাদের উদ্ভব হতে পারতো না। বুদ্ধির আসল মুক্তি যদি আপনাদের কাম্য হয়ে থাকে তা হলে আপনাদের ভয় কাকে, ভয় কিসের? ইন্দো ইরানীয় ধর্ম্মদর্শন ইস্‌লামের কি ক্ষতি করেছে তা আপনি ধরতে পেরেছেন, এবং পেরেছেন বলেই আপনার ওসব বিশ্লেষণ আমার মনের ভিতরে গভীর ক'রে দাগ কেটে দিয়েছে।

ইস্‌লামকে এড়িয়ে যদি আপনারা বুদ্ধির মুক্তি চান, তবে আপনারা মুস্‌লমানের কে এবং মুসলমানের হয়ে আপনাদের কিছু বল্‌বার কী অধিকার আছে? তর্কের খাতিরেই এ কথা বল্লাম, এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ক্ষণিকের উত্তেজনা থেকে কিছু কর্‌বেন না। ভেবে চিন্তেই কর্‌বেন। বুদ্ধির মুক্তি হ'লেও মানুষ ভুল করতে পারে, তার পক্ষে ভুল করা একেবারেই অসম্ভব নয়। আমিও বলি স্বাজাত্য বা নেশন্যালিজমের ভারতে আগমন হবে সেদিন, যেদিন হিন্দু ও মুসলিম উভয়ে হবেন মুক্ত-বুদ্ধি—মনের দিক দিয়েও মুক্ত-বুদ্ধি, বাইরের দিক দিয়েও মুক্ত-বুদ্ধি। ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধির মুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তা উল্লেখযোগ্য হবে তখন যখন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে হবেন মুক্ত-বুদ্ধি। সেদিন নিশ্চয়ই হিন্দু-মুসলিমের মিলিত ভারতে স্বাজাত্যের শুভাগমন হবে, তার আগে নয়।

আপনি বলেছেন "যে জগদ্দল জড়বুদ্ধির প্রচণ্ডতায় ইস্‌লামের মতো শক্তিশালী ধর্ম্ম এ দেশে আপনার মত বিস্তার করতে গিয়ে এতো বাধা পেলো, সে যে অনাত্মীয় জ্ঞানকে পদে পদে করবে প্রহত, এ-তো বিস্ময়ের বিষয় নয়!...... ... এ থেকে কি আমরা বুঝ্‌বো যে ধর্ম্মের শেষ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রে, স্বাজাত্যবোধ,—আমি ওর ও আমার, মানুষে মানুষে এই নিকট মমত্ববোধ,—মানব-কল্যাণের অভিসারী বিশেষ নির্ম্মুক্ত-বুদ্ধি, ভারতের মতো দেশে কখনও প্রতিষ্ঠিত হবে?" ধর্ম্মের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এর প্রয়াস তো ইস্‌লামই করেছিল। মানুষে মানুষে সাম্য, পরিবারে পরিবার সাম্য, সমাজে সাম্য, অবশেষে রাষ্ট্রে সাম্য আন্‌তে ইস্‌লাম ছাড়া কি আর কোনো ধর্ম্ম চেষ্টা করেছিল? ইস্‌লাম আরও করতে চেয়েছিল—মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববন্ধন। সে-কথা কি অস্বীকার করতে পারেন? ইস্‌লামের সেই প্রাণবাণী তো লুপ্ত হয়ে যায় নি—আঁধারে ঢাকা প'ড়েছে মাত্র। সরিয়ে দিন সেই জমাট অন্ধকারকে, ইস্‌লাম তার নিজের স্বরূপ নিয়ে আপনিই প্রকাশমান হবে।

আগে বলেছি, কেউ কেউ কম্যুনিজমকে সোশ্যালিজমের পূর্ব্বোত্তর ব'লে মনে করেন। কিন্তু কম্যুনিজমের দেশ রাশিয়াতে এখনই কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসাম্য ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না? তা' না হ'লে একজন সাধারণ কৃষক বা মজুর থেকে কর্ম্মচারীদের পদ মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে তাঁদেরকে বেশী ক'রে কিছু ধ'রে দেওয়া হয় কেন? এ-ক'রে নূতন আভিজাত্য ও অনাভিজাত্যের সৃষ্টি হচ্ছে না কি? ইউটোপিয়া কোথাও সম্ভব নয়,—না এদেশে, না ও দেশে।

আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় আমদানী ক'রে সাহিত্যে ব্যবহার করা সম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ থেকে মহা মহা কবিগণ যে আপত্তি তুলেছেন, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করবো। আমার যতদূর মনে হয়, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কথা ছেড়ে দিলেও, খাঁটি বাংলা সাহিত্য বল্‌তে এখন যা বুঝায় তাতে সকলের আগে, এমন কি মুসলমান লেখক বা কবিদেরও আগে,

সর্ব্বপ্রথম আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়। সত্যেন্দ্র নাথ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার ক'রে ছন্দের সৌন্দর্য্য ও শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তখন তা দোষের ব'লে ধরা হয় নি। কিন্তু যত গোল বাধিয়ে দিয়েছেন কবি নজরুল ইসলাম। ইনি দেখিয়ে দিয়েছেন, আরবী ফারসী শব্দের যদি সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত প্রয়োগ করা যায়, তাতে সাহিত্যের হৃদয়াভ্যন্তরে এক অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়—তাতে ভাষার ওজঃগুণ যায় অনেক বেশী বেড়ে। কবি নজরুল ইসলামকে কেবল যে মুসলিম কবিগণই অনুসরণ করেছেন তা নয়। অনেক তরুণ হিন্দু কবিও অনুসরণ করেছেন, কারণ তাতে তাঁরা পেয়েছেন ভাব প্রকাশের সুবিধা। এই অনুসরণের মূলে রয়েছে কবি নজরুল ইস্‌লামের সৃজনী প্রতিভার নিকট বশ্যতা স্বীকার।

আপনি যে লিখেছেন, প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি ও সৃষ্টিশীল প্রতিভা না থাক্‌লে বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা অসম্ভব, তা স্বীকার ক'রে নিতে আমার কোনো আপত্তি। নেই আপনি জানেন, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি দুতিনটি প্রবন্ধে আলোচনাও করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইজ্জত বাঁচিয়ে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা সোজা ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়।

লেখ্য ভাষার যতদিন সাহিত্যে অপ্রতিহত অধিকার ছিল, ততোদিন আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের জন্য মুসলমানের দিক থেকে কোনো তাকিদ দেখা দেয় নি; কিন্তু যে-দিন কথ্য ভাষাকে টেনে আনা হ'লো পারিবারিক আওতার ভিতর থেকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে, সে-দিন থেকে প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ যা বাংলার মুসলিমগণ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাদের প্রচলন কিছু কিছু করে আরম্ভ হ'লো। এর গুণের ভাগ বাদ দিয়ে দোষ যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে তার জন্য দায়ী সেই সব মহা সাহিত্যিকরা যাঁরা কথ্যভাষাকে সাহিত্যের আসরে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। আমার শুধু নিবেদন, হিন্দুগণ যদি নিজেদের কথ্যভাষা ব্যবহার করতে পারেন, তা হলে ভাষার অঙ্গহানি না ক'রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বোধগম্য বাঙ্গালী মুস্‌লিমের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ কোন্ দোষে বাংলা ভাষার বুকে স্থান পাবে না? আমরা যদি কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ সইতে পারি, তার জন্যে কোনো আপত্তি না করি, তা' হ'লে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্য-সারথিরা অল্প কিছু আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধে এমন তুমুল আপত্তি তুল্‌বেন কেন? বাংলা যেমন তাঁদের মাতৃভাষা, আমাদেরও তো মাতৃভাষা। এর জন্যে তাঁদের যতখানি দরদ, আমাদের দরদ তার চেয়ে কোনো দিক দিয়েই কম নয়। কম যদি হ'তো, তা হ'লে সাহিত্যে তাঁরা যে রসসৃষ্টি করেন তা আমাদের ভালো লাগ্‌তো না। ভালো লাগে বলেই আমাদের বিরুদ্ধে তাঁরা যখন অন্যায় অভিযোগ আনেন এবং 'মুষ্টিমেয়' ব'লে অবজ্ঞা করেন, আমরা তখন যা দুঃখ পাই তা বলবার নয়। এমন দিনও তো আস্‌তে পারে, যে দিন এই 'মুষ্টিমেয়' দলের পুত্র-পৌত্রদের সাহিত্য সেবায় বাংলা দেশ ধন্য হবে। সাহিত্য কাহারও বংশের বা কোনো সমাজ বিশেষের একচেটিয়া জিনিষ নয়। সাধনার ফলে একদিন সাহিত্যের যশ ও গৌরব আমাদের ঘরেও আস্‌বে, সে আশা খুবই করি। কারণ সাহিত্যের ভিতর দিয়েই পাবো আমরা নব জীবন, তার সূচনা মাত্র হয়েছে; গৌরবের দিন সব সম্মুখে, সেদিন বাংলার মুসলমান দেখিয়ে দেবে তারা বাংলা দেশকে ভালবাসে অপরিসীম—যে ভালোবাসার অন্ত নেই, তার কোনো সীমানা সরহদ নেই, বাংলার অপর কোনো জাতি বা সম্প্রদায় থেকে কোনো দিক দিয়েই তা বেশী ছাড়া কম নয়।

সৈয়দ এমদাদ আলী

(২)

আপনার 'হিন্দু মুস্‌লিম' পড়েছি।..........আমার মনে হয় আপনি এই বল্‌তে চেয়েছেন যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, এর সঙ্গে হিন্দুত্বের সমন্বয় বা সন্ধি হ'তে পারে না, হবে না। সুতরাং সমাধান আপোষে নয়, সংগ্রামে নয়, পলায়নে। হিন্দু পলায়ন করুক modernism এর দিকে, মুসলমান পলায়ন করুক modernism এর অভিমুখে, দুই পলাতক মিলিত হোক modernism এর নব রাজ্যে।

এর নাম solution by escape. আজকাল অনেকেই এই পন্থী। তাঁরা খুঁজছেন nationalism এর মধ্যে escape; socialism এর মধ্যে escape ; modernism এর মধ্যে escape. কিন্তু এর পরিণাম অশেষ দুর্গতি। এক আঁচড়ে বোঝা

গেল বাঙালী হিন্দুর nationalism হচ্ছে communalism-ভীতি থেকে escape তেমনি এক আঁচড়ে বোঝা যাবে মুসলমানের communism হচ্ছে হিন্দু-জমিদার-ভীতি থেকে escape. চাপ পড়লে মাতৃভাষা মুখে আসে। তেমনি কোনো চাপে হিন্দু-মুসলমানের modernism এর মুখোস খুলে পড়বে। তখন যে দ্বন্দ্ব বাধবে সে অতি ভয়াবহ।

সমস্যাকে চুকিয়ে দেওয়াই সমাধানের প্রকৃত উপায়। সেজন্য যদি শত বর্ষও লাগে তবু সেও অতি অল্প কাল। যদি সংগ্রাম প্রয়োজন হয়; তবু সেও শ্রেয়। ইসলামকে যদি সত্য ও হিন্দুত্বকে অসত্য বলে জানেন, তবে যুদ্ধ করাই হবে আপনার কর্ত্তব্য, না করা কাপুরুষতা।

ইস্লাম সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।.......ইহুদীরা খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বেই জানত ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো প্রতিমা নেই। তাদের কিন্তু ধারণা ছিল ভগবান তাদের একচেটে অন্য কারুর নয়। খ্রীষ্ট বল্লেন, "তা নয়, তিনি প্রত্যেক মানবের।" যা ইহুদীরা এতদিন গুপ্তধনের মত আগলে রেখেছিল, তাকেই তিনি ছড়িয়ে দিলেন দেশে দেশ, জাতিতে জাতিতে; কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা রটালো যে তিনিও ভগবান—ভগবানের পুত্র-রূপ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল, তাই এলেন মোহাম্মদ। মোহাম্মদ স্পষ্ট ঘোষণা করলেন "ভগবানের পুত্র নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো প্রতিমা নেই।" মোহাম্মদ যা বল্লেন তা খাঁটি ও আদি ইহুদী মতবাদ, প্রভেদ এই যে তিনি ভগবানকে বিশ্বের প্রত্যেক জনের ভগবান বলে জানালেন—এখানে তিনি যীশুর সঙ্গে একমত। তিনি যদি আরবে না জন্মিয়ে ইহুদী দেশে জন্মাতেন তবে প্রতিমা ভঙ্গের উপর জোর দিতেন না, কারণ ইহুদী দেশে প্রতিমা ছিল না। প্রতিমাভঙ্গ ইস্লামের essence নয়, আনুষঙ্গিক। ইসলাম প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় trinity-তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এবং মূলতঃ ইহুদী ধর্ম্মেরই নব সংস্করণ।

ইহুদী-ক্রিশ্চান-ইসলামী তত্ত্বে লালিত মন theism এ আস্থাবান। Theism এর উপর রাগ করলে সে হয় atheist, অথবা অন্য সবাইকে ভাবে polytheist, যেন theism ছাড়া ও theism এর বাইরে সত্য নেই।

ভারতবর্ষ theism, atheism, polytheism- কোনোটারই ধার ধারত না। ভারতের ঋষিরা যাঁকে জানতেন তিনি ব্রহ্ম—God নন, subjective নন। তাঁর কাছে প্রার্থনা চলেনা, কল্পনা চলেনা। মনের বিশ্বাস অবিশ্বাস কামনা বাসনার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। "তিনি" বলছি—তিনিও ঠিক নয়। তৎ—that.

আর সাধারণ লোক যাদের চিনত তারা রৌদ্র বৃষ্টি আলো হাওয়ার শরীরী রূপ, forces of Nature, তারা পুতুল নয়। তাদের কাছে প্রার্থনা জানানো ইত্যাদির জন্য তাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়। সে সব মূর্ত্তি কেবল কুৎসিৎ নয়, কতক কতক অতি সুন্দর। এখনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় কলকাতার, রাজশাহীর, পাটনার, কোনারকের যাদুঘরে। সূর্য্য, বিষ্ণু, লক্ষ্মী—ইত্যাদির মূর্ত্তি উন্নত কল্পনা ও রুচির পরিচায়ক।

এর অনুরূপ দেখবেন ইউরোপের যাদুঘরে—গ্রীক রোমান দেবদেবী-মূর্ত্তিতে। সেগুলিও একই ভাবের অভিব্যক্তি। আবার মেক্সিকোতে পেরুতে পাবেন এই ধরণের বস্তু। বেশ বোঝা যায় পৃথিবীর বহুদেশে প্রতিমাপূজা প্রচলিত ছিল এবং প্রকৃতির কেবল বীভৎস হিংস্র দিকটা নয়, বরাভয়-মণ্ডিত মনোহর রূপও মানুষকে ও তার সভ্যতাকে পাথেয় দিয়েছিল।

তারপর এই ভারতবর্ষে একদিন বৌদ্ধধর্ম্ম পরিণত হয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে ক্রিশ্চান প্রভাব পড়েছিল। তাতে ছিল কতকটা Theism এর আভাস। মহাযান পরিণত হয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে। তাতে theism আরো স্পষ্ট হয়। এই সময় ইস্লামের আগমন। Theism বৈষ্ণব ধর্ম্মে ত প্রবল হলোই, শিখধর্ম্মে কবীর-পন্থে ও অন্যান্য ধর্ম্মবিশ্বাসে নব নব আকার ধারণ করল। এ সব ইস্লামের কীর্ত্তি। তারপর ক্রিশ্চিয়ানিটি এলো বিপুল প্রতাপে—আগেও এসেছিল অলক্ষে মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে। ইস্লাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটী—দুইয়ের মিলিত প্রভাবে এখনকার শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই ভগবানের নাম করেন, কালীর বা বিষ্ণুর নয়। "ভগবান" শব্দটার অর্থ ক্রমে ক্রমে বদলাতে বদলাতে এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তার দ্বারা theism এর ভাব ব্যক্ত হয়। সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু প্রতিমা সম্বন্ধে "না বর্জ্জন না রক্ষণ"-বাদী। বিপদে পড়লে কেউ কালীঘাটে ছুটে যান না, তবে যদি কেউ যায় তাকে বাধাও দেন না। মন্দির দর্শন এখন প্রধানতঃ শিল্পদর্শন, দেবদর্শন নামমাত্র। অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমরা একটা বিচ্ছেদ চাইনে। ওরাও ধীরে ধীরে theismএ পৌঁছাচ্ছে। গ্রামের চাষীকেও আমি "ভগবানের ইচ্ছা" বলতে শুনেছি। "ভগবান" বলতে সে যাঁকে বোঝে তাঁর মূর্ত্তি যে নেই তাও সে জানে। বিপদে পড়লে

অবশ্য সে মনসা কিম্বা কালীর মূর্ত্তির কাছে ছুটে যায়।

এ বিষয়ে সে স্পেন ইটালী প্রভৃতি দেশের চাষার থেকে অভিন্ন। ওরাও গ্রীক রোমান দেবীকে নতুন নাম দিয়ে পূজা করছে, মূর্ত্তি বানিয়েছে। যীশুর চেয়ে যীশুর জননী তাদের কাছে সত্য। বিপদে পড়লে তাঁর কাছেই তাদের গতি। ক্রিশ্চিয়ানিটী বাধ্য হয়ে আপোষ করেছে—নইলে বিচ্ছেদ অসহ্য হ'তো।

ইসলামও নানা প্রকারে আপোষ করেছে—সে আপোষ official নয়, কিন্তু actual. রোমান ক্যাথলিক saint এর মত মুসলমান পীরও যত্র তত্র। আগাখানী সম্প্রদায় ত রীতিমত মনুষ্য-পূজক। ইসলামের ভিতরে কত বৈচিত্র্য এসেছে তা ভারতে বসে কি ক'রে বুঝবেন? যেতে হয় আফ্রিকায়, মালয়ে, মধ্যএসিয়ায়।

এখন বলি modernism-এর কথা। প্রাচীন ভারতের মত প্রাচীন গ্রীসেও এক শ্রেণীর লোক ছিলেন তাঁরা নিজের মনের বাসনা কামনা ধারণা কল্পনা বাদ দিয়ে মানব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করতেন। এঁরাই বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করেন। সমাজের ব্যবস্থাতেও এঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরীক্ষা চেয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের বন্যায় এঁদের কীর্ত্তি ভেসে যায়। বিজ্ঞান-বিদ্বেষ ইসলামেরও কলঙ্ক। ভারতবর্ষেও ভক্তির আতিশয্যে লোকে জ্ঞানমার্গচ্যুত হয়। গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর যুক্তির প্রতিষ্ঠা—এসবের যেটুকু চেষ্টা হয়েছিল গ্রীসে ভারতে ঈজিপ্টে ও আরবে সবই চাপা পড়ে গেল [illegible]-এর প্লাবনে। তারপর ইউরোপের রেনেশাঁসের যুগে আবার শুরু হয় বিজ্ঞানের যাত্রা। ধর্ম্ম তাকে অনেক বাধা দেয়, তা সত্ত্বেও সে দিন দিন অগ্রসর হয়। শেষে একদিন সে ধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। উড়ে গেল ইহুদী-ক্রিশ্চান মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্ব, আদম হাওয়া, আদম-বংশাবলী। এলো বিবর্ত্তনবাদ। স্বর্গ-নরকের সত্তা রইল না। আকাশ ভরে গেল অসীম বিস্তারে ও অসংখ্য নক্ষত্রে। পৃথিবী এত সামান্য একটা বিন্দু যে এর জন্য ভগবানের বিশেষ ভাবনা প্রতীয়মান হলো না। মানুষ একটা সামান্য প্রাণী, প্রাণী একটা সামান্য বস্তু। সমাজের পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠল। ছোট বড় রাজা প্রজা বণিক চাষা ইত্যাদির ভাগ-বিভাগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। সমাজের উলট-পালট সম্ভবপর। নীতি বলে মানুষ যা ধরে নিয়েছিল তারও খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও জল-হাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন—সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ওতঃপ্রোত। এমনি করে ধর্ম্মের "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

Modern মন সব দেশে সব সম্প্রদায়েই আছে। এই মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে পরলোকাভিমুখ মনের। [illegible] মন মৃত্যুর ওপার দেখতে পায় না, সে ইহলোকেই গড়তে চায় ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা। একজন ভগবান কি তিনজন ভগবান, প্রতিমা-পূজা হবে কি দরগা-পূজা হবে—এ নিয়ে মাথা কাটাকাটি করতে তার প্রবৃত্তি নেই। কারণ subjective God সে মানে না, পূজার আবশ্যকতা সে বোঝে না। supernaturalকে সে একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন মনে করে।

সে চায় না গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীর সমন্বয় ঘটাতে না পেরে বাধ্য হয়ে এরোপ্লেন ভ্রমণ। সে এরোপ্লেন ভালোবাসে ব'লেই গোরু ঘোড়ার প্রতি তার বিতৃষ্ণা।

দেশের অগ্রসর দল যদি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মিলিত হয়, তবে প্রগতি-বিরোধীদের গ্রাম্য দলাদলি হিন্দু-মুসলিম বিরোধরূপে দীর্ঘকাল আমল পাবে না—কিন্তু অগ্রসর দলকে মনে রাখতে হবে যে চাপ পড়লে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য দলের মোড়ল হবে না।

শ্রীলীলাময় রায়

[আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলিম' প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবকে লিখিত অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের দুইখানি এবং শ্রীযুত লীলাময় রায় মহাশয়ের একখানি পত্র। —'বুলবুল' সম্পাদক]

(১)

সুহৃদ্বরেষু,

.. আপনার 'হিন্দু-মুসলিম' সম্বন্ধে এমদাদ আলী সাহেবের যে মন্তব্য বেরিয়েছে তা পড়েছি।

আপনার মূল বক্তব্য যা তাতেই আমার আপত্তি। আপনি বলতে চেয়েছেন ইসলাম সত্য প্রচেষ্টা জগতের অসত্য অনাচারের বিরুদ্ধে চির-বিদ্রোহ। আপোস সে করবে না, করা উচিত নয়। ইসলাম কেন, যে কোনো ধর্ম্ম অথবা দার্শনিক মত সম্বন্ধে সেই সেই মতের ভক্তরা এই ধারণা পোষণ করতে পারেন। আর ব্যাপারটি বাস্তবিকই তাই ভক্তের জন্যে। কিন্তু কোনো মতের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি আর তার ঐতিহাসিক বিকাশ এক জিনিষ নয়। আমার বক্তব্য আপনি কিন্তু এই দুটিকে এক ভেবে নিয়েছেন। ইসলাম ভারতে এসে যে তার শক্তি হারিয়েছিল তা নয়। তার পূর্ব্বেই সত্যান্বেষণের চাইতে আচার পূজা তার ভিতরে বড় হয়ে উঠেছিল। এর খুব বড় প্রমাণ সুলতান মামুদ। মোতাজেলাদের বিরুদ্ধে মুসলমান জনসাধারণের উত্থানও আর একটি প্রমাণ। হজরত প্রতিমা ভেঙেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিমা ভাঙা যে একটি বিচিত্র ও চিরন্তন ব্যাপার, হজরত একবার যে এক ধরণের প্রতিমা ভেঙেছেন তাতেই ওকাজটি চুকে যায় নি। এই সত্যের ধারণা মুসলমান মণ্ডলী কদাচিৎ পূর্ণভাবে করতে পেরেছে। হজরতের মৃত্যু সময়ে অনেক মুসলমানের বিহ্বলতা ও বিদ্রোহ থেকেও এই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই আপনি যে বলেছেন ভারতে এসে ইসলাম কাহিল হয়ে পড়লো, তার চাইতে এই ই আমার কাছে সত্য বলে মনে হয় যে ভারতে ইসলাম মুখ্যভাবে এসেছিল একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত হিসাবে তার বিচিত্র আচার ও মতবাদের জালে বন্দী হয়ে, সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণ ও প্রয়োগ-চেষ্টা হিসাবে নয়। ইসলামের প্রভাবে ভারতে ভাল যা কিছু হয়েছে সে সবও যে মুসলমান সমাজ সমাদরে গ্রহণ করে নাই, সেটি তাদের আচার-দাসত্বের আর একটি প্রমাণ।

সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণ হিসাবে ইসলামকে যে গ্রহণ করা না যায় তা নয়; কিন্তু সেটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটিকে বহুজনের ব্যাপারও করে তোলা যায়। সে-সাধনা যদি করেন তাতে অন্যায় কিছুই হবে না। তবে বিপদ তাতে কিছু আছে। ইসলাম কথাটি সুপ্রাচীন। আপনার নিজের মনে ওর যে অর্থ রয়েছে জনসাধারণ তার দিকে না চেয়ে ইসলামের ঐতিহাসিক অর্থের দিকেই চাইবে। তাতে আপনার প্রচার তাদের জন্য কল্যাণপ্রসূ নাও হতে পারে। আমি সেইজন্য বলি, আমরা সত্যের ও কল্যাণের পূজারী। সে সত্য ইসলাম ও অন্যান্য বহুবিধ মতবাদের ভিতরে রয়েছে। কিন্তু সে সবের ভিতরে আরো অনেক কিছু আছে। সেই সব আবর্জ্জনার ভিতর থেকে মানুষকে সত্যান্বেষণ-রত্ন খুঁজে বের কর্ত্তে হবে। সত্যকে বড় ক'রে ধরলে যে দুঃখ ভোগ করতে হবে না তা নয়, কিন্তু সান্ত্বনা এই থাক্‌বে যে আপনার সাধনা আচ্ছন্ন হবে না। আপনাদের চেষ্টা কর্ম্মীরা করতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীলদের জন্য ওপথ বিপথ। ওতে চিন্তা আচ্ছন্ন হয়, কর্ম্মও এগোয় না। তাছাড়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতবর্ষের মতো দেশেও মানুষ এতখানি সহজ হবার পথে দাঁড়িয়েছে যে সোজা কথাই তাদের কাছে বলা ভাল। ইতি

ঢাকা
৭. ১২. ৩৬

আপনার
কাজী আবদুল ওদুদ

(২)

(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের ছোট একখানি চিঠির উত্তরে)

প্রিয়বরেষু,

.....আপনাকে ঠিক বোঝা হয় নি, কথাটা হয়ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু সেজন্য দায়ী আপনি নিজেই। আমার পূর্ব্বপত্রে বোধ হয় বলেছিলাম : ইসলাম সম্বন্ধে আপনার যা ধারণা তা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে শ্রদ্ধেয় এবং সত্য দুই-ই। কিন্তু একে

যদি ঐতিহাসিক সত্য রূপে ভাবেন তবে আপনার মতের সঙ্গে অনেকের অমিল হবে। ঐতিহাসিক ইসলাম আর একালের ভাবুকদের ইসলাম যে পুরোপুরি এক নয়, সেকথাটা আপনি তেমন মনে রাখেন নি। এমন কি দুই এক জায়গায় বিশেষভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার বা আমাদের চিন্তায় যে বড় রকমের মিল রয়েছে তা ত নিঃসন্দেহ। আপনার "যুগের মন" লেখাটি ('বুলবুলের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যেটী বেরিয়েছিল) একালের মুসলমানের একটি শ্রেষ্ঠ দান ব'লেই আমি মনে করি।

প্রতিমা পূজারী হিন্দুত্ব আর প্রতিমা বিধ্বংসী মুসলিমত্ব এই দুইয়ের ভিতরে চিরবিরোধ আপনি দেখেছেন। প্রতিমাপূজা অর্থে যদি বোঝেন জড়ত্ব, গতানুগতিকতা আর প্রতিমা-ধ্বংস অর্থে যদি বোঝেন মানবচিত্তের সদাসক্রিয়তা, তবে আপনার কথা পুরোপুরি মেনে নিতে কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক হিন্দুত্ব আর ঐতিহাসিক ইসলাম এমন বিরুদ্ধভাবাপন্ন সত্যই নয়। ধর্ম্মমাত্রেই মোটের উপর symbolism কাজেই কোনো-না-কোনো রকমের প্রতীক-চর্চ্চা, অন্য কথায় প্রতিমা পূজা। তাছাড়া প্রতীক-চর্চ্চা জীবনের জন্য যে একান্ত নিরর্থক তাও হয়ত সত্য নয়। মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধের সঙ্গে এর নিত্য-যোগ। প্রেম-ধর্ম্মের সঙ্গেও এর যোগ দৃঢ়। (সুফীরা সেকথা বুঝেছিলেন)। প্রতীক-চর্চ্চা বা প্রতিমা-পূজা অভিশাপগ্রস্ত হয় তখন যখন এটি হয়ে ওঠে বিশেষ প্রতিমার বা বিশেষ পদ্ধতির অন্ধ পূজা। তখন যে এটি মানুষকে একান্ত দুর্ব্বল ক'রে ফেলে তা খুবই ঠিক। অবশ্য একালের মানুষ পৌরুষে একান্ত আস্থাবান, প্রেমধর্ম্মকে সে সন্দেহের চক্ষে দেখে। কিন্তু আমার ধারণা : একালের এই বিজ্ঞান-লালিত পৌরুষবাদেও ত্রুটী আছে—এর সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের যোগ কম। তবু আমাদের জড়তাগ্রস্ত দেশবাসীদের জন্য পৌরুষবাদই আপাততঃ বেশী কল্যাণকর ব'লে আমি মনে করি। এবং সেজন্য ওহাবীর প্রতীক-বিদ্বেষ আমার অপ্রিয় নয়। শুধু ওহাবীর দোষ এই যে সে আরো গভীরভাবে প্রতীকবিদ্বেষী নয়—অন্ধ আচার-ও পদ্ধতি পূজাও যে প্রতিমাপূজা, এদিকে তার দৃষ্টি নেই বল্লেই চলে। কিন্তু আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজে এ চেতনা যেন ধীরে ধীরে আসছে।

আপনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বল্‌তে যে বুঝেছেন মানুষের আদিমতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা এই দুইয়ের বিরোধ, তা আনতে আমি রাজি নই, দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। আমার চোখে এ বিরোধ হচ্ছে আদিমতার সঙ্গে আদিমতার বিরোধ—দুই দল প্রতিমা-পূজারীর বিরোধ—এদেশের সেকালের শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ। প্রত্যেক ধর্ম্মই কোনো-না-কোনো যুগে বিশেষভাবে কল্যাণ-অভিসারী ছিল। কিন্তু কালে কালে সব ধর্ম্মই আচার পূজা হয়ে গেছে, এই আমার মনে হয়। ধর্ম্মকে এই দশা থেকে মুক্ত করা অসম্ভব না হতে পারে, কিন্তু দুঃসাধ্য, একথা মান্‌তে হবে। আমি বল্‌তে চেয়েছি (আমার বক্তৃতায়) যে মানুষের সন্তান সৃষ্টিধর্ম্মের উপরে জোর দিলে "ধর্ম্ম"কে এই অনর্থ থেকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হতে পারে।

ঢাকা
২৭. ১২. ৩৬

আপনার
কাজী আবদুল ওদুদ

(৩)

(শ্রীযুত লীলাময় রায়-লিখিত)

সবিনয় নিবেদন,

.....আমার মত আপনার ভালো করেই জানা আছে, যদি আমার আগের লেখাগুলো পড়ে থাকেন। ("ভারতীয় মুসলমানে") নতুন কিছু বলিনি।

এমদাদ আলী সাহেব যা লিখেছেন তা এতবার শুনেছি যে তাতে রাগ কর্‌বার কিছু নেই। ইসলাম গ্রহণ ক'রে বাঙালীর ছেলেমেয়ে যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা জাতিতে পরিণত হ'য়ে থাকে তবে আমাদের উপর তাঁদের আত্মীয়তার দাবীও সেই সঙ্গে চুকেছে। হবেন Anglo-Indian অথচ দাবী কর্‌বেন Indian-এর স্নেহপ্রীতি বন্ধুতা—এর অসঙ্গতি কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না। সুবিধা দাবী কর্‌লে সুবিধা পেতে পারেন, কিন্তু হৃদয় পাবেন না। আর হৃদয় যদি না পান

তবে আপনাদের মধ্যে সত্যিই যা শ্রেষ্ঠ তাও আপনাদের হৃদয়েই রইবে, আমাদের হৃদয়ে আসবে না। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করব না যে ইসলাম হিন্দুত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা ওর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের গ্রহণযোগ্য। হিন্দু যদি স্বভাবত কুণো হতো তবে সে পৃথিবীর এত জাতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখত না। ইসলাম ও মুসলমানের সম্বন্ধে সে তেমন খোঁজ নেয় না, তার কারণ এমন নয় যে সে কুণো, তার কারণ : সে চায় না তার ছেলেমেয়েকে অন্য একটা জাতিতে পরিণত হতে। আমার কাকা আমাকে ছোট বেলায় গির্জ্জায় নিয়ে যেতেন, কিন্তু মসজিদে—না। খ্রীষ্টানকে আমরা পর ভাবিনে। কারণ খ্রীষ্টানও আমাদের পর ভাবে না। স্বতন্ত্র একটা জাতি হবার কথা এমদাদ আলী সাহেব যদি জোসেফ ঘোষ হয়ে থাকতেন তবে উচ্চারণ করতেন না।

আপনার প্রায় সব লেখাই আমি পড়েছি ও পড়ে খুসী হয়েছি। বিশেষ ক'রে আপনার মাদ্রাসা মক্তব সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। "বুলবুলের" লেখকদের প্রায় রচনাতেই আমি সাধনার লক্ষণ পাই। আপনারা পরিশ্রমী, সংযত, জিজ্ঞাসু। সেইজন্যে আমিও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ও যোগ দিয়ে আনন্দ লাভ করি। বাল্যকাল থেকে আমি মুসলমান সংস্রবে বেড়ে উঠেছি। আমাদের বাড়ীর বন্ধুস্থানীয় অনেকে মুসলমান। কলেজে আমি মুসলমান হষ্টেলে দু'বছর ছিলুম। মুসলমানদের প্রতি আমার আন্তরিক টান আছে। আমি বিশ্বাস করি না যে এরা অন্য এক জাতি। তবে দুঃখের বিষয় ওরা নিজেরাই বিশ্বাস করে যে ওরা অন্য এক জাতি। ওদের সবাই করে না, তবে নেতৃস্থানীয়েরা করেন। যত দিন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকবে, ততদিন দাঙ্গা—বাঁটোয়ারা "জিন্দাবাদ"। ততদিন হৃদয়ের মিলন হবে না, ইসলামের মধ্যে যা সত্যই বড় ও মুসলমানের মধ্যে যা সত্যই ভালো তাও রইবে অপরিজ্ঞাত।

প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন। ইতি—

মিহিজাম,
৯. ১২. ৩৬

লীলাময় রায়

মূল প্রবন্ধ-লেখকের জবাব

(শ্রীযুত লীলাময় রায় মহাশয়কে লিখিত)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র ঠিক সময়ে আমার হাতে এসেছিল। কিন্তু অসুস্থতা নিয়েও সম্প্রতি আমাকে একটী অসাহিত্যিক ব্যাপারে এমনই মশ্‌গুল্ হতে হয়েছিল কে আপনার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের সৌজন্যটুকু করতেও বহু বিলম্ব ঘটেছে। সেজন্যে বার বার ক্রটী স্বীকার করি।

আপনার যে-সব লেখা 'বুলবুলে' বেরিয়েছে, তার সবগুলোই আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। সব ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে একমত হবো, এ আশা করিনে। আমার সান্ত্বনা এই যে যেখানে আগ্রহ ও আনন্দ এতো স্বাভাবিক, সেখানে সকল বিষয়ে একমত হওয়া হয়তো বড়ো কথা নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি ও করছি, এই আমার পরম লাভ।

বাঙালীর ছেলেমেয়ে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হ'লে বাঙালীর মনে বেদনা ও অভিমান জাগ্‌তে পাবে। এংলো-ইণ্ডিয়ান বিশেষভাবে যিনি, তিনি ইণ্ডিয়ানের স্নেহপ্রীতি বন্ধুতা দাবী করলে সেটি সঙ্গত না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখ্‌তে চাই : বাঙালী জাতির স্বরূপ কি, তার আসল চেহারা কি হওয়া উচিত। আমরা জান্‌তে চাই : ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ হিন্দু ইণ্ডিয়ান্ মুসলিমকে—মুসলিম ইণ্ডিয়ান্‌কে সত্যিই কেন এংলো-ইণ্ডিয়ান্ মনে করবে। আমার মনে হয় : বাঙালী হিন্দুর চিত্তে একটী অভিমান দুর্জ্জয় হয়ে আছে। সেই অভিমান বলে : আমরাই বাঙালী জাতি, আমাদের ভাবনা ধর্ম্ম আচার কৃষ্টি বাঙালী জাতির নিজস্ব এবং সর্ব্বস্ব। এর অতিরিক্ত যা কিছু, এর সঙ্গে নাড়ীর যোগ যার নেই—নিবিড় আত্মীয়তা-বোধ নেই, এর ক্ষুদ্রতম অঙ্গের সম্পর্কেও যার অসঙ্গতি ও আপত্তি, এবং এর কাছে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে যার অনিচ্ছা, সে-

ই আমাদের পর। হিন্দু ইণ্ডিয়ানের মনেও এই অভিমান। আমরা বল্‌তে চাই : এই অভিমান যতোই সহজ হোক, অন্যায় এবং অসঙ্গত। হিন্দু এদেশবাসী, মুসলিম হাজার বছরের বাসিন্দা হয়েও অতিথি, সুতরাং পরগাছা মাত্র। গৃহস্থের কাছে অতিথির কোনো অধিকার নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সুখ-সুবিধার এবং মানসিক ও তাত্ত্বিক স্বস্তির নিঃশ্বাস অনাহতভাবে ফেল্‌বার দাবী নেই। সে আত্মীয়তা দাবী করবে---তার বুকের পাটা কতো বড়ো? গৃহস্থ তার নাক-কাণ কেটে, মুখে চুণকালির প্রলেপ দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে, তাকে আপনার আস্তানা থেকে শত যোজন দূরে দাঁড় করিয়ে যদি তার প্রতি আতিথেয়তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, দোষ গৃহস্থকে না দিতে পারি, কিন্তু অতিথির অন্তরের আত্মীয়তা সে কেমন ক'রে পাবে?

আপনি বলতে পারেন : আর্য্যরা অতিথি হয়েও আদিমদের আত্মীয় হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা হয়েছিলেন অধিকারী. আদিমরা বাধা পড়েছিল দাসত্বের শৃঙ্খলে। তাদের সংস্কৃতি আর্য্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, কেননা তাতে বাধা ছিল না,---কেননা আর্য্যরা প্রয়োজনকে বড় ভেবেছিলেন, তার তাগিদে সংস্কৃতির দিক দিয়ে খানিক হীনতা অর্জ্জন করতেও তাঁদের আপত্তি হয়নি। মুসলিমের অবস্থান এর থেকে স্বতন্ত্র। মুসলিম স্বদেশের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চায় এবং যুক্ত তাকে হ'তে হয়েছেও। কিন্তু সে নামবে না। বন্ধুত্বের হস্ত তার সম্প্রসারিত। তাকে গ্রহণ করতে গেলে হিন্দুকে এক ধাপ উপরে উঠ্‌তে হবে।

আমার অবস্থান থেকে আমি চাইনে যে মুসলিম নীচে নামুক। আমি চাই : হিন্দু উপরে উঠুক এবং হিন্দু মুসলিম দু'জনেরই গতি হোক আরো ঊর্দ্ধে---মানুষের অভিনব ভবিষ্যতের পথে। সেখানেই সার্থক হবে তাদের উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত ঐক্য।

আশার কথা : সচেতন হিন্দু আপনার হিন্দুত্বের অবসান কামনা করছে। 'ইস্‌লাম'-নামে যদি বিরাগ, ইসলাম না-ই হ'লো ক্ষতি কি? কিন্তু উপরে উঠ্‌বার চেষ্টা তাকে করতে হচ্ছে এবং হবে। রাষ্ট্রিক ঐক্য ও সাম্যপ্রতিষ্ঠার আগে তাকে মানুষে মানুষে অন্ততঃ স্থূল সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নারীকে মানুষ ভাবতে হবে, বহু বিধি-বিধান বদ্‌লাতে হবে, তার দৃষ্টি ও কৃষ্টির অনেক কৌণিকতা -- অনেক angularity- অনেক বন্ধুরতা মেজে ঘষে চোস্ত করতে হবে।

আমার আশঙ্কা : পৌত্তলিকতা যতোদিন থাক্‌বে, হিন্দু-মুসলিমে বড়ো জোর সন্ধি হবে, ঐক্য হবে না। পৌত্তলিকতা যদি লুপ্ত হয়--(কখনো হবে কি যতোদিন হিন্দু ধর্ম্ম থাক্‌বে?),---হিন্দু মুসলিম মিলে যাবে। কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে?

আমার আহ্বান আধুনিকপন্থীর বিজ্ঞানবাদে। এখানেই মানুষের মিলন ও মুক্তি সঙ্গত ও সম্ভবপর মনে হয়।

মুসলিমকে আপনি ভিন্ন জাতি মনে করেন না, তথাপি গির্জ্জায় যেতে আপত্তি না থাকলেও মসজিদে প্রবেশ করতে আপনার মন সরবে না। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে : কেন সর্‌বে না। ক্রিশ্চান মন্দিরে যায় না, মুসলিমও না। হিন্দুর পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে ক্রিশ্চানের স্থান নেই, মুসলিমেরও না। ক্রিশ্চানের সঙ্গে হিন্দুর বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে---একটা বিশেষ আইনের বিধানে; মুসলিমের সঙ্গেও হ'তে পারে। আপনি মুসলিমের সান্নিধ্য-চর্চ্চা করেছেন, হয়তো ক্রিশ্চানেরও (যদিও 'নিষ্ঠাবান' হিন্দু তা করতে রাজী নয়)। তবে কেন মুসলিম আপনার পর, ক্রিশ্চান কেন আপন-জন? জোসেফ ঘোষের মতো মুসলিমেরও আবদুল্লা চাটার্জ্জি, দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলী আছে এবং থাক্‌তে পারে। ক্রিশ্চান সমাজ হিন্দুর থেকে স্বতন্ত্র, মুসলিমও তাই। তবে কেন শুধু মুসলিম আপনার অনাত্মীয়? কেন বাঙালী জাতির সমস্যা আলোচিত হয় মুসলিমের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, তাদেরে উপেক্ষা ক'রে---সুতীক্ষ্ণ আঘাত হেনে?

দেখা যাচ্ছে : ইয়োরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের সম্পর্কে আপনার বিতৃষ্ণা আছে, দেশীয় ক্রিশ্চানের প্রতি নেই। তার এক কারণ এই হ'তে পারে যে তাদের হাতে হিন্দু ধর্ম্ম ও কৃষ্টি নিরাপদ। সহজেই তারা এর আধিপত্যের সামনে মাথা নোয়াবে---দরকার হ'লে নিজেদের নবার্জ্জিত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়েও। আর এক কারণ : দেশীয় ক্রিশ্চানের রাষ্ট্রিক অবয়ব, সুতরাং অধিকার-বোধ, উপেক্ষণীয়; তাতে হিন্দুত্বের ক্ষতিবৃদ্ধি অনুভবযোগ্য নয়।

পৌত্তলিক হিন্দু কৃষ্টির আধিপত্যকে অনাহত রাখবার যে প্রমত্ত আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখ্‌তে পাই, এটি প্রধানতঃ মুসলিমের প্রতি হিন্দুর ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক বিরুদ্ধতার পরিণাম। এখানে মুসলিমের স্বাদেশিকতার প্রশ্ন হয়তো খুব বড়ো নয়। কেননা এদেশ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুসলিমের স্বদেশ, অন্য কোথাও তার স্থান নেই। এদেশের প্রতি মমতা তার রক্তমাংস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু দেশ মানে দেশের মাটী নয়। এর মাটীতে অজন্তা ও তাজমহল দাঁড়িয়ে আছে, সে এর দৈব। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কীর্ত্তি ও স্মৃতি হিসেবে এদেরে চোখ ভ'রে দেখা চলে; রাষ্ট্রিক প্রয়াসে এদেরে রক্ষা করবার ব্যবস্থাও হ'তে পারে। কিন্তু নতুন

মানুষ যদি এদের স্থাপয়িতাদের জীবন ও কর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করতে পারে, সে-দোষ কার? এবং সেজন্যে রুষ্ট হবার অধিকার কেমন ক'রে জন্মলাভ করলো? দেশের মানুষই দেশের প্রতীক। তারা যদি অপূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক বুদ্ধির প্রেরণায় মুসলিমকে পর ভেবে ঠেলে দেয়, সে কেমন করে তাদেরে ভালোবাসবে? একটা সমাজ হিসেবে হিন্দুর সঙ্গে মুসলিমের মেলা-মেশা চলে না,—চলে হিন্দু সমাজের বাইরে—ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু অগভীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সমাজের অতলস্পর্শ চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না। অর্থাৎ মুসলিম স্বতন্ত্র জাতি নিজে হয়নি, তাকে স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজের ন্যাশনালিজম্ অনেকের আদর্শ; আমেরিকার ডেমোক্র্যাসিও। কিন্তু বৃটিশ স্বাজাত্যের আদর্শ নির্দ্দোষ নয়। চার্চ্চের এক বিশিষ্ট শাখার আধিপত্য সেখানে স্বীকৃত। এও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই ধর্ম্মীয় মতবাদের প্রাধান্যের কারণ তার রাষ্ট্রশক্তি। ইংলণ্ডে যদি হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু, অথবা অঙ্ক ও শক্তির দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হ'তো, সেখানকার "পার্লামেন্টের অতি-খৃষ্টান ভাব" চালু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এখানে আমরা প্রসঙ্গতঃ এ ও স্মরণ রাখতে পারি যে, পৌত্তলিকতা বা বহু-ঈশ্বরবাদ মুসলিম বা নিরাকার একেশ্বরবাদী চিত্তকে পীড়িত করলেও ইসলাম বা অপৌত্তলিক-ক্রিশ্চানিটী হিন্দুর আছে আপত্তিজনক নয়। আদিম-বৃটন ও প্যাগান-ইংরেজের স্মৃতিকে বর্ত্তমান বৃটিশ ন্যাশনালিজম লালন করতে পারে, কিন্তু তাদের ধর্ম্মীয় মতবাদ ও কৃষ্টির প্রাধান্য আধুনিক রাষ্ট্রিক ধার্ম্মিক বা সামাজিক জীবনে ইংরেজের স্বীকৃতি লাভ করে না।

আমেরিকান ডেমোক্র্যাসিরও খুঁৎ আছে। সেটী খুব অস্পষ্টও নয়। সেদেশে নিগ্রোদের যে-লাঞ্ছনা, এসিয়াটিকদের সম্পর্কে যে বিতৃষ্ণা, রাষ্ট্রপোষিত ধার্ম্মিক-মতবাদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যে-উপেক্ষা দেখে আমরা ক্ষুব্ধ হই, তাদেরে ডেমোক্র্যাসির অঙ্গ হিসেবে দেখলে খুব খুশী হওয়া চলে কি?

ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে ন্যাশনালিজমের জয়জয়কার। তথাপি সেখানকার একটী ক্ষুদ্র ঘটনার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইসলাম ও ক্রিশ্চানিটীর মধ্যে বিরোধ—পৌত্তলিকতা ও ইসলামের মতো নয়। তথাপি মুস্‌লিম-রাষ্ট্রশাসিত তুরস্কে ক্রিশ্চানরা তুর্কী জাতীয়তার মধ্যে ডুবে যেতে রাজী হলো না। তুরস্ক ও অন্যান্য দু'একটী দেশের মুসলিম-ক্রিশ্চান বাসিন্দা-বিনিময় এরই ফলে।

আর এক কথা। ন্যাশ্‌নালিজম্ ও ডেমোক্র্যাসির যে-চেহারা আমরা দেখেছি ও দেখ্‌ছি, তার ত্রুটী অনেক। এদের মধ্যে আত্মহত্যার বীজ এখনো লুকিয়ে আছে। তার প্রমাণ : ডিক্‌টেটরশিপ, নাৎসীবাদ, ফাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, হিংস্র জিগীষা এবং যুদ্ধ। আমার মনে হয় : সংখ্যার অঙ্ক থেকে যে-অন্যায়ের উদ্ভব হতে পারে, তাকে স্বীকার ক'রে কোনো আদর্শবাদ প্রচারিত হওয়া উচিত নয় এবং সেরূপ আদর্শবাদে দৃষ্টিমান মানুষের সম্মতি থাকাও সঙ্গত নয়। অতীত এবং বর্ত্তমান আবেষ্টনের সঙ্গে মানিয়ে চলাই আধুনিকপন্থী জীবনের বড়ো কথা নয়। সেটী নিরীহ শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের লক্ষণ হ'তে পারে। আমার ধারণা : আধুনিকপন্থী মানুষ প্রয়োজন বোধ করলে অতীতকে—আপনার আবেষ্টনকে জ্বালিয়ে ভস্ম করবে। সেই ভস্মের ভিতে নবসৃষ্টির আয়োজন করতে তার দ্বিধাবোধ থাক্‌বে না।

রোম্যান হরফে বাংলা লিখ্‌বার পক্ষে আমি, আপনাকে এর আগে জানিয়েছি। তার প্রধান কারণ : ওই প্রণালীটী আধুনিক যুগধর্ম্মের সঙ্গে অনেকখানি যুক্ত। রোম্যান পদ্ধতিতে যে-কোনো ভাষাকে তার ধ্বানিক বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে লিখ্‌তে বাধা হয় না। এছাড়া ওর নিজস্ব একটী সরলতা আছে। গতিস্বাচ্ছন্দ্যও ওর কম নয়। মুদ্রণ-ব্যাপারে ওতে যে সুবিধা, সেটীও কারুর নজর এড়ায় না। বর্ত্তমান ব্যস্ততার যুগে সর্ব্বক্ষেত্রে কাল এবং পরিসরের দিক দিয়ে যে-সংক্ষিপ্ততা অর্জ্জনের চেষ্টা চলেছে, রোম্যান প্রণালীতে সেও আমাদের অনেকখানি লাভ হতে পারে। আরো একটী দেখ্‌বার বিষয় এই যে, ওর ভিতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর মানব-সমাজের সঙ্গে আমাদের যোগ কিছুটা সহজতর হওয়া সম্ভব। তার ফলে আমাদের প্রাচ্য-জীবনের জড়তা ও গতিহীনতা কিছুটা ঘুচতে পারে।

রোম্যান অক্ষরের প্রবর্ত্তন হ'লে এদেশবাসীর মনে যে-মান অভিমান, যে-অনুযোগ-আপত্তি জাগতে পারে, তার প্রতীকারের উপায় এদের বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা। হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার অন্তর্গত একটী ব্যাপারের সমাধান যদি রোম্যান

বর্ণমালার সাহায্যে সম্ভব হয়, তাতে যার আপত্তি সে অতীতমুখী,—মানুষের মঙ্গলের চাইতে নিজের কাণাকড়ির দাম তার কাছে ঢের বেশী। এমন মানুষের জাতি যদি এদেশ থেকে লুপ্ত হয়, আমাদের শঙ্কিত হওয়ার কি-কারণ থাক্‌তে পারে? হিন্দু-মুসলিম সমস্যার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজ গুণেও যদি রোম্যান হরফ গৃহীত হয়, তাতেও কি এদের আপত্তি প্রশমিত হবে? আমার বল্‌বার এই যে, যাকে তার নিজস্ব উৎকর্ষের জন্যে আমরা গ্রহণ কর্‌বো, তাব দ্বারা যদি দৈবাৎ আমাদের সমস্যার একটী অংশেরও সমাধান হয়, তাতে তার গ্রহণীয়তা বাড়ে বই কমে না। আধুনিক-পন্থা যদি আমাদের কাম্য, সে-পথে হিন্দু-মুসলিমের মিলন ও ঐক্য কামনা করা কেন দোষের? সমস্যানিরপেক্ষভাবে কোনো পন্থা যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, তাতে সমস্যারও সমাধান হবে—একথা বলা কেন অন্যায়?

যারা আধুনিক-পন্থার শত্রু, যারা সমস্যার সমাধান একান্তভাবে কামনা করে না এবং যারা নিজেদের খর্ব্বতা সম্বন্ধে খানিক সচেতন হওয়ার পরেও সাম্‌নের দিকে অকুতোভয়ে পা-বাড়ানোর প্রয়োজনকে ধিক্কার দেয়, তাদের মন্তব্য আমাদের হিসাবের বাইরে রাখা ছাড়া উপায় কি? ইতি ..

বাঁশদহা, খুলনা। প্রীতিমুগ্ধ
২৬. ২. ৩৭ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

[অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম, এ, ও খান সাহেব মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব-লিখিত দীর্ঘ আর দুইখানি পত্র এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের উত্তর বুলবুলের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। —'বুলবুল'-সম্পাদক]

হিন্দু-মুস্‌লিম

সৈয়দ এমদাদ আলী

(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবকে লিখিত)

ভাই,

... শরীর ও মন দুই-ই ভাল না থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হ'লো; আপনার বক্তব্যের কিছু আলোচনা আজ করবো।

গতবারে মনের কথা খুলে বল্‌তে গিয়ে ভাষাতে জোর পড়েছিল বেশী। জানেনই তো ওটা আমার চিরদিনের স্বভাব। আমি রেখে ঢেকে বা ভাষার প্রহেলিকা সৃষ্টি ক'রে কিছু বল্‌তে পারিনে। মনের ভেতর ঘা খেলে আমার উচ্ছ্বাস যায় বেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠে কিছু উষ্মার ভাব। এও তো স্বীকার্য্য যে duplicity বা diplomacy-র আশ্রয় নিয়ে কিছু লিখলে তাতে শুভ হয় কম, অশুভই হয় বেশী। কারণ মনের দিককার বিভ্রাট তাতে বাড়ে বই কমে না। এখন সময় এসেছে বোঝাপড়া করার। অতএব হিন্দু বা মুস্‌লিম প্রত্যেককেই মনের কথা খুলে বল্‌তে হবে। খুলে না বল্‌লে কার যে বেদনা কোথায় তা বুঝতে পারা যাবে না। বেদনা যে আমাদের আছে, সেও তো অস্বীকারের বিষয় নয়। আর সেই বেদনা থেকেই জন্ম নিয়েছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস।

Defeatism এর ভাব আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে বেশই দেখা যাচ্ছে। ওটা ভালো নয়। ও-ভাব থেকে নিজেদের মুক্ত না করতে পারলে আমাদের বাঁচোয়া নেই। ভারতের বাইরের মুসলমানের ভাবনা এখন আর আমরা ভাবিনে। সহানুভূতি যা দেখাই তাও সাধারণ। কিন্তু বাংলার বাইরের মুস্‌লিমের ভাবনা না ভেবে আমাদের উপায় নেই। ভারতীয় মুস্‌লিমের একটা বিপুল অংশ বাস করে এই বাংলা দেশে। বাংলার বাইরের মুসলমানগণ বাংলার মুসলিমকে যে-চোখেই দেখুন না কেন, তাদের সকলের শক্তির উৎস হয়েছে এই বাংলার মুসলমান। বাংলার মুসলমান উঠ্‌তে পারলে সমগ্র ভারতের মুস্‌লিম জন-সমাজ উঠবে, তাদের পতন হ'লে স্বতন্ত্র ভাবে কারো ওঠবার সাধ্য হবে না, সাধ্যি থাকবে না, যে যতই বড়াই করুক না কেন। সমগ্র ভারতে যত মুসলমানের বাস, তাদের তিন ভাগের এক ভাগ বাস করে এই বাংলা দেশে। বাংলার মুস্‌লিম জনসংখ্যা পাঞ্জাবের মুস্‌লিম জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। ভেবে দেখুন, আমরা কি অবস্থায় পড়ে আছি। চল্‌তে হবে আমাদের সমাজকে নিয়ে, একাকী নয়। তাদের শিক্ষার অভাব দূর না করতে পারলে কেমন ক'রে হবে আমাদের উন্নতি — আবস্ত হবে আমাদের অগ্রগতি? বাংলার বাইরের মুসলমান উর্দ্দু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পেয়েছে জাগরণের প্রেরণা, কিন্তু আমরা বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সে প্রেরণা জাগাতে পারি নি। তাই তো এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত আমাদের জনসাধারণের যা মাতৃভাষা তার মধ্য দিয়েই তাদেরে প্রেরণা এনে দেওয়া।

পূর্ব্ব-পত্রে আমি ইস্‌লাম সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম, তাকে আপনি বলেছেন 'আনকোরা ওহাবী মত।' ওহাবী মত তা নিশ্চয়ই নয়, উহাই ইস্‌লামের সত্য স্বরূপ। মজহাব ও ফির্‌কার বাইরে যে ইসলাম আমি তার কথাই বলেছি। আমার ইসলামে শিয়া-সুন্নি নেই, হানাফী হাম্বলী মালেকী বা শাফি মজহাব নেই, বর্ত্তমানের ৭৩ ফিরকাও নেই। হজরত এবং তাঁর চার খলিফার সময়ে তো ওসব কিছু ছিল না। ওহাবীদের মতো আমি একথাও বিশ্বাস করি নে যে মুসলমানদের ৭৩ ফিরকার মধ্যে একমাত্র তারাই বেহেশ্‌তে যাবে, আর সব যাবে দোজখে। আমি পীরপূজা বা কবর পূজায় বিশ্বাসী নই, কারণ আমি ওসবকে ভাবি তওহিদের বিরুদ্ধাচার এবং যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে হজরত জীবন-ব্যাপী মহাসমর চালিয়েছিলেন তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সত্যিকারের মানুষকে সম্মান করা এক কথা, আর তাঁকে পূজা করা আর এক কথা। প্রথমটি হ'লো hero-worship, আর দ্বিতীয়টি হ'লো প্রতিমা-পূজারই রূপান্তর।

ওহাবীরা ধরেছিলেন কথাটি ঠিক, কিন্তু ইস্লামকে তাঁরা তার নিজস্ব উদারতম ভিত্তির উপর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাও গেছে বিফল হয়ে। এখন সময় এসেছে ইসলামকে তার উদারতম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার। ইসলামকে আমি এই ভাবেই দেখতে শিখেছি, অন্য ভাবে নয়। শিয়া-সুন্নির যে বিরোধ, ইতিহাসের মূল উৎসে গেলে দেখতে পাবেন তা ধার্ম্মিক বিরোধ নয় — রাজনীতিক বিরোধ। নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্ব নিয়েই তার উৎপত্তি, এখন যে পথই তা ধ'রে থাকুক না কেন। মাহ্মুদাবাদের পরলোকগত মহারাজা সাহেব শিয়া ছিলেন। তিনি বলতেন : "যতক্ষণ আমি মাহ্মুদাবাদের সীমানার মধ্যে থাকি ততক্ষণ আমি শিয়া, কিন্তু তার সীমানা পেরিয়ে গেলে আমি শিয়াও নই, সুন্নিও নই, আমি মুসলমান।" কবে আমরা এরূপ উদার মতের অনুসরণকারী হবো বা হ'তে পারবো?

রামমোহন সম্পর্কে আপনার ও আমার মতের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছিনে। ...

আপনি লিখেছেন : "আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন গণ্ডীকে অতিক্রম করেই মানুষ মনের মুক্তি।" ওটা হ'লো সাধনার শেস স্তর, প্রথম স্তর নিশ্চয়ই নয়। ধর্ম্মের সাধকদের কথা হ'লো ওটা, রাজনীতি বা সমাজনীতির কথা ওটা কোনোরূপেই হতে পারে না। যেখানে বহু স্বার্থের সংঘাত সেখানে গণ্ডীর ভিতরে থেকেই কাজ করতে হবে, গণ্ডীর বাইরে গিয়ে নয়। তবে গণ্ডীর বিস্তার বাড়িয়ে দিতে তো কোনো বাধা নেই। যে কোনো কাজই হোক না কেন তার সীমা ঠিক ক'রেই তা আরম্ভ করতে হবে, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে নয়, তাতে কাজ কিছুই হয় না। ক্রমে ক্রমে সীমা তো আপনিই বেড়ে যাবে। আপনার রচনার ভিতর সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আপনার পথ — আপনি মধ্যপন্থী, modern সত্য ultra-modern নন। ক্ষণিকের প্রশংসা লাভের আশায় যাঁরা ultra modern হতে যান বা চান আমি তাঁদের সইতে পারিনে। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে খান্ বাহাদুর মৌলবী নাসিরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমার ক্ষণিকের আলাপ হয়েছিল। সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন : "দেখুন, তরুণদের এই চলার ভঙ্গি দেখে কিন্তু ঘাবড়াবেন না। চল্তে দিন কিছু কাল ওদের মন যেদিকে যায় সেদিকে। হিন্দুদের মতো ওদের আবার নিজের গণ্ডীর ভেতরেই ফিরে আস্তে হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।" সে কথা আমি এখনও ভুলে যাই নি। তরুণদের সাথে আমার চিরদিনের সহযোগ। সে সহযোগ কেমন ক'রে এড়িয়ে চলি, বলুন?...

আমরা নিজেদের অন্ধতার জন্য প্রতিবেশী সমাজকে কলঙ্কিতরূপে দেখি বা দেখ্ছি, এ কথা বলা আপনার ঠিক হয় নি। এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি — প্রতিবেশী সমাজের কাছ থেকেই। তাঁরা বহুদিন থেকে কলঙ্কিত দেখ্ছেন ব'লেই আমরাও তাঁদের তাই দেখ্ছি। কিন্তু প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে যাঁরা দরদী, যাঁরা উদার তাঁদের আমরা খুবই সম্মান করি। অবজ্ঞা যারা আমাদের কর্তে এক তিলও দ্বিধা করে না তাদের আমরা কেমন ক'রে বুকে টেনে নিই? যারা নিশিদিন আমাদের ধ্বংস চায়, আমাদের সামান্য জাগরণে শঙ্কিত হয়, তাদের কেমন ক'রে হৃদয়ের আসনে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বসিয়ে দিই? হৃদয় দিলে তো হৃদয় পাওয়া যেতে পারে? হৃদয় না দিয়েই কি আমাদের প্রতিবেশী সমাজ আশা করতে পারেন আমাদের হৃদয় অধিকার করবার? বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ভারতবর্ষে একটি মাত্র হিন্দুই দেখেছি যিনি মুসলমানের হৃদয় জয় করবার সন্ধান জানতেন এবং হৃদয় জয় কর্তে পেরেছিলেন। তিনি মহাপ্রাণ দেশনেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে। যে গান্ধীজীর মহাত্মা ব'লে জগৎজোড়া নাম, তিনিও না, আর কেউ না। একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমি একথা প্রমাণ করবো।

মিন্টো-মর্লি সংস্কার এলো ১৯১০ সালে। তাতে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল সামান্য কয়েকটা আসন বিশেষ নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে। এর আগে ছিল মিশ্র নির্ব্বাচন। তার ভিতর দিয়ে কোনো মুসলমানের প্রাদেশিক কি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করা ছিল এক অসাধ্য ব্যাপার। সরকার বাহাদুর দু'একজনকে মনোনীত ক'রে মুসলমানদের দুধের সাধ ঘোলে মিটাতেন মাত্র। কিন্তু সমগ্র ভারতের যত-সব হিন্দু নেতা — তখন হিন্দু নেতারা সবাই ছিলেন কংগ্রেসপন্থী — একযোগে সেই বিশেষ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলেন তুমুল আন্দোলন। সেই সময়ে এক বিপুল বিরুদ্ধ দলের প্রতিবাদ করেছিলেন শুধু একজন হিন্দু — গোখ্লে। তিনি বলেছিলেন : "আমি সমগ্র ভারতের কথাই ভাবি; তার উন্নতি, তার স্বাধীনতাই আমার কামা। নানা দিক দিয়ে আমরা হিন্দুরা উঠে গেছি ওপরে, আর আমাদের মুসলমান ভাইরা পড়ে আছে নীচে। আমি জানি তাদের হাত ধ'রে উঠিয়ে না নিতে পারলে ভারতের কল্যাণ নেই। আমাদেরি তাদের উঠিয়ে নিতে

হবে, একাজ অন্যের নয়। এই যে মুসলমানদের বিশেষ নির্ব্বাচনাধিকার দেওয়া হচ্ছে, এ খুব বেশী দেওয়া নয়। আমি ভারতের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এর পূর্ণ সমর্থন করছি।" মুসলমানগণ অকৃতজ্ঞ নয়। কিছুদিন পরে গোখ্‌লে যখন তাঁর compulsory free primary education bill নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন একমাত্র সরকার মনোনীত সভ্য স্যর ওমর হায়াত খাঁ তিওয়ানা ছাড়া আর সব মুসলমান সভ্য মহামতি গোখ্‌লের সে বিলের করলেন সমর্থন। যাঁরা সে বিলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু হিন্দু জমিদার এবং বণিকও ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা আমাদের সত্য দরদী, তাঁরা আমাদের পরম ভক্তির পাত্র। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। হৃদয় দিলেই হৃদয় মিলে, একথা তাঁরা ভুলে যান কেন? মনে রাখবেন : বর্ত্তমানের হিন্দুমুসলিম বিরোধের গোড়া পত্তন হয়েছিল সেদিন আর গোড়া পত্তন করেছিলেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ। সেদিনকার বিরুদ্ধ দলের ভেতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মদন মোহন মালবাই বেঁচে আছেন। বাংলার সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন এ দলেরই লোক। সেই থেকে nationalism-এর যে-ভুল ব্যাখ্যা আওড়ান হচ্ছে, তার এখনও অবসান হ'ল না। কবে হবে কে জানে?

স্বাধীনতার অমন যে একনিষ্ঠ মহাসাধক মওলানা মোহাম্মদ আলী, বলুন তো কি দুঃখে তিনি কংগ্রেসের সংশ্রব থেকে, মিঃ গান্ধীর সংশ্রব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন? আপনি নিশ্চয়ই তার কারণ জানেন, অতএব আমার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্মরণ ক'রে দেখুন মিঃ গান্ধী — যাঁকে আমাদের প্রতিবেশী সমাজ 'মহাত্মা' উপাধিতে বিভূষিত করেছেন,— মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পরে অন্ততঃ দু'মাস কাল পর্য্যন্ত তাঁর নামও মুখে আনেন নি — মোহাম্মদ আলী নামে যে একটা লোক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু দুঃখ-কষ্টকে নিজের জীবনে অম্লান চিত্তে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, মিঃ গান্ধী নিজের গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন! এই যে মোহাম্মদ আলীকে বিস্মরণ ও অবজ্ঞা, এর ভেতরে রয়েছে মিঃ গান্ধীর মুসলিম বিতৃষ্ণা! আর এই মিঃ গান্ধীই হিন্দুদের রাজনীতিক মত গড়ছেন ভাঙ্গছেন, আবার গড়ছেন। তিনি এখন বলছেন তিনি রাজনীতির সংশ্রবে নেই এবং খদ্দরপ্রচার, হরিজনদের উদ্ধার, পল্লীসংস্কার ও পুনর্গঠনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে এখনও মিঃ গান্ধীই কংগ্রেস এবং কংগ্রেসই মিঃ গান্ধী। তিনিই মূল সূত্র ধারণ করে আছেন, আর কেউ নয়।

আমি তো একথা বলিনি যে আমাদের প্রতিবেশী সমাজ চোরা বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক কঠিন ভূমির ওপরে, কিন্তু আমাদের যে-গন্তব্য পথ তাতে রয়েছে চোরাবালি ; ভয় যত কিছু তা আমাদের, তাদের নয়। এগুতে যে হবে না একথাও তো আমি বলিনি, আমি বলেছি সাবধানে চলতে — অতিসাবধানীও তো হতে বলিনি। মনের ভেতরে সাহস যথেষ্টই আছে, নইলে বাঁচবো কেমন করে? আপনারা বলবেন এ আমার বয়সের দোষ, কিন্তু ঠিক তা নয়। আপনারা দেখেছেন হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের ছায়া, আমি দেখেছি তার কায়া। তবুও আমি আতুর হইনি। ভয় আমার একটুও নেই। আমি জানি সকল দিক দিয়ে যখন আমরা তাদের সমকক্ষ হবো, সেদিনই হবে তাদের সাথে আমাদের খাঁটি মিলন, তার আগে নয়। আমরা তাদের বুঝলেও তারা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করে না, চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না: কারণ তারা জানে যে আমরা দুর্ব্বল এবং আমরা সবল হওয়ার আগে যদি পিষে মারতে পারে তাহলে তাদের জন্য সবদিক পরিষ্কার হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিমের ব্যবধান দূর করবার জন্য সবল হওয়ার, সমান হওয়ার চেষ্টাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে : আর্থিক অবস্থার উন্নতি দ্বারাই আমাদের সবল হতে হবে।

মানবতার দিক দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী সমাজ কতকটা অগ্রসর হয়েছে এ আমি স্বীকার করি। যেমন, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় যখন লোকের দুরবস্থা হয়, তখন তাদের তরুণরা ছুটে যায় আর্ত্তের সেবার কাজে — তারা হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে সেবা ক'রে ধন্য হয়। আমাদের তরুণরা একাজে এখনও অচল, অর্থাৎ তারা মানবতার পথে এগুতে পারেনি। মনের দিক থেকে এসব কাজে তারা আহ্বান পায় না, কারণ শিক্ষার দিক দিয়ে তারা এখনও অবনত, আর শিক্ষাই ক'রে থাকে দরদী মনের সৃষ্টি। এরূপ মন সৃষ্টি না হলে কাজ করবার প্রেরণা আসে না। মানবতার দিক দিয়ে আমাদের এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য বয়স্ক প্রতিবেশীরা সেবাকার্য্যের শেষে আমাদের সমাজের লোকদের সাহায্য করা হয়েছে ব'লে খোঁটা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এও বুঝি, এসব কাজ মিলেমিশে না করতে পারলে মিলনের পথ তৈরী হয় না এবং যে পঙ্গু সমাজ থেকে বাইরে যাবার জন্যে আপনাদের এতো আগ্রহ সে সমাজের পঙ্গুতাও দূর হতে পারে না। মনের গতির সহিত শিক্ষার গতি সমানে চলতে পারে

না, এও তো একটা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। অতএব সয়ে থেকে গড়বার কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মানবতাই বলুন ; দেশপ্রীতিই বলুন সবই আসবে শিক্ষার প্রসার লাভের সাথে। আপনার মতো আমিও বলি : "মুস্‌লিম আপনাকে সুস্থ সবল মানুষে পরিণত করুক। সেই মানুষের মৃত্যু কামনা যে করবে সে আপনার সর্ব্বনাশের পথ কাট্‌বে।" কিন্তু খাঁটী শিক্ষা ব্যতীত আমাদের সুস্থ সবল মানুষে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

মিঃ জিন্না যে-কথা বলেছেন, ওটা হলো তাঁর political propaganda সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ উপলক্ষ ক'রে। প্রতিবেশী সমাজ চাচ্ছে সকল ঝোল নিজের পাতে টান্‌তে; জিন্নার উক্তি হলো তারই প্রত্যুত্তর। ধর্ম্মের আধুনিকতম ব্যাখ্যা ও' নিশ্চয়ই নয়। সেভাবে কথাটাকে বুঝতে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই ভুল করবেন। বাংলার হিন্দু সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ বা'র হ'...র পর খুবই যে মেতেছিলো তা নয়। মিঃ গান্ধী যদি হরিজনদের ঠকানো হয়েছে ব'লে কেঁদে বুক না ভাসাতেন এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করবার সঙ্কল্প ও সাধনা দুই-ই আরম্ভ না করতেন, তাহ'লে এ গোলমাল হয়তো মিটে যেতো এবং দশ বছর পরে বিনা আপত্তিতে মুসলমান মিশ্র নির্ব্বাচনে চলে আস্‌তো। এখন যে কি হবে তা বলা যায় না। সব নির্ভর করছে নূতন শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু-মুস্‌লিম কিভাবে কাজ করে তার ওপরে। নিরাশ হবেন না।

সৌন্দর্য্যের দিকে মানুষের অসীম বিকাশ-সম্ভাবনাই একমাত্র কাম্য জিনিস নয়, একটা জাতি বা দেশের জীবনে আরও বহু কাম্য জিনিস আছে। রোমানগণ একদিন সব হারিয়ে শুধু সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়েছিল, তাতে তারা মাথা উঁচু ক'রে যে খুব দাঁড়াতে পেরেছিল তা নয়। কৃষ্টির একটা দিক মাত্র সৌন্দর্য্যের সাধনা, সব দিক নয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে কেবল সৌন্দর্য্যের সাধনা করলেই চলবে না, আরও কিছুর সাধনা করতে হবে। যারা Cultureএর ঐ একটা দিক নিয়েই মেতেছে তারা বেশী দূর উঠতে পারে নি। আপনারাও যদি তাই করেন, তবে আপনারাও পারবেন না। ইটলি যে আজ জেগেছে সে সৌন্দর্য্যের সাধনা করে নয়, আর কিছুরই সাধনা ক'রে। মুসোলিনি চাচ্ছেন সীজারের যুগকে ফিরিয়ে আন্‌তে — যখন রোম ছিল বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী। বীর্য্যের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সাধনা ক'রেই রোমের সে সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। সে ইতিহাস আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন।

মোল্লাদের আপনি এতো ভয় করেন কেন? ওঁদের নিজের ক'রে নিতে চেষ্টা করুন, — ওঁদের উদার মত ও পথের মাঝে টেনে নিন। বর্ত্তমানে ওঁরা যে শিক্ষা পাচ্ছেন তা কালোপযোগী নয় ব'লেই মনে হচ্ছে ওঁদের সাথে আপনাদের সাথে মিলন অসম্ভব। আসলে ঠিক তা নয়। ওঁদের থেকে দূরে থাকি ব'লেই আমরা ওঁদের বুঝতে পারিনে। তবে যাঁরা স্বার্থান্ধ ও সঙ্কীর্ণমনা সেই সব মোল্লাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনি সন্ধান নিয়ে দেখবেন : তারা বিদ্যার দিক দিয়েও অনেক খাটো। জ্ঞানের সাধনা যারা করেনি তাদের মন কোনোরূপেই উদার হতে পারে না। আপনি সুরা বকর হ'তে যা উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে যে সহজ সুন্দর আদর্শ দেওয়া রয়েছে মানুষকে উন্নততর জীবনে টেনে নিতে তার চেয়ে মহত্তর আদর্শ আর কি আছে বা হতে পারে? কোর্‌আনের এই নির্দ্দেশকে মেনে যাঁরা জীবন-পথে চল্‌তে পারেন বা চল্‌তে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেন, তাঁরাই তো ইস্‌লামের প্রকৃত সেবক, তাঁরাই তো মুসলমান। সরল মনে সরল ভাবেই ইস্‌লামকে বুঝতে চেষ্টা করবেন, তাতেই আস্‌বে মনের ভেতরে প্রচুর আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি। আপনি তাই করছেন দেখে আমি কী যে খুশী হয়েছি, আপনাকে লিখে জানাতে পারিনে। আপনার মন দেখ্‌বেন খোদা, আপনার বিশ্বাস ও ভক্তির পরীক্ষা হবে তাঁর কাছে, মোল্লাদের কাছে নয়। মোল্লারাই কি নিজেদের সম্বন্ধে বল্‌তে পারেন যে বিশ্বাস ও ভক্তিতে তাঁরা খোদার দরবারে উৎরে গেছেন? ...

আপনি বা আমি যে ইসলামের কেহ নই একথা বল্‌তে পারলেন কেমন করে? এ শুধু আপনার অভিমানের কথা। আপনি বা আমি বা আমাদের কোটী কোটী লোকই তো ইসলামের সব। ইসলাম ভারতীয়ও নয়, ইরানীয়ও নয়, ইসলাম শুধুই ইসলাম, তার জন্যে কোনো দেশকালের সীমা-রেখা নেই। আপনি ইসলামের সত্য সেবক ব'লেই তো তাকে বুঝ্‌বার জন্যে অপরসীম চেষ্টা কর্‌ছেন। এ হ'তেই বুঝা যাচ্ছে তা আপনার মনের মধ্যে কত সক্রিয়। ইসলামকে তার নিজস্ব গতির পথে আবার ফিরে আসতেই হবে। আপনি বা আমি যদি তা না দেখে যেতে পারি, তাতেই বা ক্ষতি কি?

আপনি ঠিকই তো বলেছেন : "মানুষ ধর্ম্মের জন্যে নয়, ধর্ম্মই মানুষের জন্যে।" সুরা বকর হ'তে যা আপনি উদ্ধৃত করেছেন সে কথা আবার বলেই আমার কথা আজ শেষ কর্‌লাম—

"মানুষ যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়, কর্ম্মফল মানে এবং সৎকর্ম্ম দ্বারা আপনার জীবনকে মহীয়ান করে, নির্ভয় সে তার জন্যে পরম পুরস্কার।"

কোর্‌আনের এই মহাবাণীই কি আপনাকে উৎসমুখে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা দেবে না, ভাই? ...

দাসপাড়া, ঢাকা,

আপনার স্নেহানুগত —

এম্‌দাদ আলী

(বুলবুল—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)

হিন্দু-মুস্‌লিম

মৌঃ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি সাহেব লিখিত হিন্দু মুস্‌লিম প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়ের প্রথম চিঠি গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত চিঠির 'পুনশ্চ' ও তাঁহার দ্বিতীয় চিঠি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। 'বুলবুল' সম্পাদক

পুনশ্চ---

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান বৌদ্ধ সবাইকে যে ডাক দিয়েছেন তাকে আপনি বলেছেন ইসলামের পক্ষে বিনষ্টির আহ্বান। নতুন কথা শোনা গেল।

এ বিষয়ে আমার প্রথম মন্তব্য এই যে মুসলমান বল্‌তে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মোল্লা মৌলানা বোঝেন নি। বুঝেছেন তাজমহলের স্থপতি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গুণী, উর্দ্দু সাহিত্যের স্রষ্টা, উত্তর পশ্চিম ভারতের পোষাক ও সহবতের অগ্রণী, ভূমি রাজস্ব প্রণালীর উদ্ভাবক, ইত্যাদি ইত্যাদি- ভারতের ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট অংশের নায়ক-নায়িকা আকবর শাজাহাঁ শেরশাহ্ চাঁদ বিবি। ঠাকুর পরিবারেই মুসলমান মিলেছে ও মিলিয়েছে তার সভ্যতার ধারা। সুতরাং nationalism-এর আহ্বান তার পক্ষে বিনষ্টির আহ্বান কেন হবে?

দ্বিতীয়ত যদি এ আহ্বান মোল্লা মৌলানার প্রতি হয়ে থাকেও তবু এতে তাদের ষোলো আনা বিনষ্টি ও হিন্দুয়ানীর ষোলো আনা লাভ নেই—দশ আনা ছ'আনা বা আট আনা আট আনা। আর modernism-এর আহবানে তাদের ষোলো আনা ত বটেই আঠারো আনা বিনষ্টি হিন্দুরও। কাজেই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আপনার আহ্বানের চেয়ে তাদের পক্ষে অধিকতর সুবিধার।

তৃতীয়ত মিলনের কথা যখনি উঠেছে তখন কেবল ইসলামের বিনষ্টি কেন ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিনষ্টি সনাতন ধর্ম্মের বিনষ্টি ইত্যাদি রকমারি বিনষ্টির আপত্তি ওঠে। সেদিন লণ্ডনে যে World Conference of Faiths হলো তাতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ইহুদী সকলে উপস্থিত হলেন, কিন্তু ক্যাথলিক থাক্‌লেন অনুপস্থিত। বিনষ্টির অজুহাত। ক্যাথলিকের ধারণা তাঁর ধর্ম্ম হয় সবাইকে সাবাড় করবে, নয় নিজে সাবাড় হবে, কিন্তু আপোষ কিছুতেই কর্‌বে না। (আপোষ করা মানে essence বাদ দেওয়া নয়, details বাদ দেওয়া।)

দেখা যাচ্ছে মানুষের জন্য ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের জন্য মানুষ। মানুষের বিনষ্টি নিত্য ঘট্‌ছে, কাল Abyssinia আজ Spain-এ কাল ইউরোপ জুড়ে। ধর্ম্ম কোনো কাজে লাগ্‌বে না, তার বিনষ্টি মানুষের বিনষ্টির চেয়ে এত বেশী ভয়ঙ্কর। ভারতের স্বাধীনতা, ঐক্য ও প্রগতির জন্য তার গায়ে একটু আঁচড় লাগ্‌বে না। দূর হোক স্বাধীনতা, ঐক্য ও প্রগতি। ইতি

২৫ শে অক্টোবর, ১৯৩৬।

লীলাময় রায়

(২)

.... আমার শেষের চিঠিতে যদি আপনার উপর অবিচার করে থাকি ....। খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে আপনার লেখা পড়ার ঐ পরিণাম। আমার যুক্তি এই যে আমরা যদি modernism চাই তবে for its own sake চাইব। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হিসাবে নয়। একটা উদাহরণ দিই। হিন্দী উর্দ্দুর কোঁদলে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে প্রস্তাব করছেন Roman script ব্যবহার করা যাক। Ami-o anek samay tai bhabi, কিন্তু তাতে সমস্যাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তা ছাড়া Roman script এর প্রচার যদি হয় তবে নিজগুণে হওয়া সঙ্গত। নইলে সব সময় মনে হতে থাক্‌বে পরের জন্য Roman script এ লিখ্‌ছি, নিজের জন্যে নয়—যেন একটা কত বড় অনুগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ। এ রকম মনোভাব থেকে সহজেই আসে অভিমান

কি: ওদের জন্য আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের বর্ণমালা ছাড়লুম, হেন করলুম, তেন করলুম, তবু ওর মন পাচ্ছিনে—এমন অভিযোগ আসে। সেই জন্যে আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে modernist যদি কেউ হতে চান তবে তিনি নিজের অন্তরের প্রেরণায় হবেন—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে তুই একলা চল্ রে।" আমি নিজে modernist কিন্তু ও পথ এত কঠিন যে সাধারণ লোক এ পথে খুব বেশী চলবে বলে মনে হয় না শিক্ষার প্রসার ও চিন্তার চাষ না হলে। এতদ্‌ব্যতিরেকে হিন্দু মুসলমানে কোনো রকম মিটমাট সম্ভব কিনা সেইটে বিবেচনা করতে হবে। আমার মতে গান্ধীর মতো হিন্দুর সঙ্গে গফুর খাঁর মতো মুসলমানের এবং Andrews এর মতো ক্রিশ্চানের বুঝাপড়া হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। Essentially হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা religious conflict থেকে নয়, political majority ভীতি ও extra-territorialism থেকে উদ্ভুত। ইতি

লীলাময় রায়

মিহিজাম, ১৩ নভেম্বর, ১৯৩৬।

[ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "অবাঞ্ছিত ব্যবধান" নামক লেখাটা 'বুলবুলে' কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে কয়েকজন সাহিত্যিকের মন্তব্যও আমরা প্রকাশ করি। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী যে উত্তর দেন, তাহার কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া শরৎচন্দ্র সমালোচনা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সভায় তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণে। সেই সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে লিখিত অধ্যাপক কাজী আদুল ওদুদ সাহেবের একখানি পত্র। —'বুলবুল'র সম্পাদক।]

"রবীন্দ্র নাথের বুদ্ধিও মুক্ত নয়"—এই মন্তব্য করে শরৎ-বাবু আপনার কথার যে-ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা সঙ্গত হয়নি। তবে আপনার কথায়ও একটী গলদ আছে। আপনি হিন্দু মুসলমানের বিরোধের জন্যে হিন্দুর ঔদার্য্যের অভাব যে বড় করে দেখেছেন ঐতিহাসিকের বিচারে এটি টেকসই নয়—অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ ইতিহাসের শুধু এ কালের পরিণতির দিকটা দেখ্‌লে ও ব্যাপারটা খণ্ডিত ক'রে দেখা হয়। হিন্দু ছিল হিন্দুস্থানে। তাকে আঘাত করলে মুসলমান অথবা সে আঘাত পেলে মুসলমানের হাতে নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে। কিন্তু মুসলমানের হাতে যে আঘাত সে পেলে সেটি শুধু সত্যের আঘাত নয়, সেটি রণোম্মত্ত বিজয়ীর আঘাতও বটে। দীর্ঘ মুসলমান শাসন কালে হিন্দু যে মুসলমানকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখার অবকাশ পায়নি তা নয়, তবে সে যে বিজিত একথাও বহুবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা সে স্মরণ করেছে। ইংরেজকে হিন্দু যে সমাদরে বাংলার মসনদে বসালে তার ভিতরে দেশদ্রোহিতা আছে একথা যাঁরা বলেন তাঁরা সমগ্র ব্যাপারটা দেখেন না; এতে আর্ত্তের আকুলতাও কম নেই—যেমন মারহাট্টাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানেরা আহমদ শা আবদালিকে ডেকে এনেছিল। ইংরাজদের আমলে নানা কারণে—সে সবের কিছু কিছু আমি উল্লেখ করেছি—মুসলমান যেন পিছে হটে। হিন্দু আসর জমালে সদর আঙিনায়। সেই এ কালের হিন্দুর যে দম্ভও মুসলিম-বিদ্বেষ তাকে যথাযোগ্য স্থানে রেখেই দেখা সঙ্গত। নইলে আর সব ব্যাপার ঢাকা পড়ে। আমি বলতে চাই একালে হিন্দু জাগ্রত হতে চেষ্টা করেও যে পতনের দিকে ঝুঁকেছে তার জন্যে মুসলমানও কম দায়ী নয়। বহুদিনের আর্ত্ত ও রুগ্ন হিন্দু জীবনের পথে এক পা বাড়িয়েছিল। সে কেন আর এক পা বাড়াতে পারলে না একথা বলতে আমি লজ্জিত হই। আমি ক্রমাগত বলছি কেন মুসলমান আর এক পা বাড়ালে না? মুসলমান যদি সত্যকার জীবনে সঞ্জীবিত না হয়, তবে দেশের আশা নেই, এই আমার ধারণা। আমার মনে হয়, এই দিকটা আপনি কম করে দেখেছেন।

পুনশ্চ—আপনার এবারকার (হিন্দু মুসলমান) লেখাটীর সম্বন্ধে এর পরে আপনাকে লিখ্‌ব। ইতি

কাজী আবদুল ওদুদ

ঢাকা

মূল প্রবন্ধ লেখকের জবাব
(শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়কে লিখিত)

'হিন্দু-মুস্‌লিম' লিখাটার সম্পর্কে আপনার সমালোচনার প্রথম অংশটী অগ্রহায়ণের বুলবুলে ছাপা হয়েছে। 'পুনশ্চ' এবং আপনার শেষের চিঠিখানির নকল পৌঁছানোর আগেই সম্ভবতঃ ওটা ছাপা হয়। আর এক ভদ্রলোকের একটী সমালোচনাও ছাপা হয়েছে দেখলুম। ভদ্রলোক আমার একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি—পুরাতন সাহিত্যসেবক। মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক নবজাগরণে এঁর কিছু অংশ আছে। আমার আশঙ্কা হয় ওঁর attitude ও tone আপনার খুব ভালো লাগবে না....যা হোক, এঁর পরেও হয়তো কেউ কেউ এই আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। তার অপেক্ষা করছি। আপনার 'ভারতীয় মুসলমান'ও আমার প্রতীক্ষার সামগ্রী।

তথাপি দু'একটী কথা বলি। বর্ত্তমানে আমার লিখবার মতো স্বাস্থ্য নয়। কিন্তু আপনি ক'খানি চিঠি দিলেন আমি অসুস্থতা নিয়ে চুপ্‌চাপ্ বসে থাকবো হয়তো এতে আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন। শুধু এইজন্যে কিছু লিখছি।

'বুলবুলের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আমার একটী লেখা বের হয়—'যুগের মন'। লেখাটী সম্ভবতঃ আপনি পড়েছিলেন। আপনি আধুনিক মনের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি ঐ লেখাটীতে তার থেকে বেশী রকম আলাদা কিছু বলি নি, মনে হয়। তথাপি স্বীকার করতে বাধা নেই আপনার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল হলে মনটী যতোটুকু খুশী হতো আপনার চিঠি পড়ে ঠিক ততোটুকু হয়নি। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন প্রণালীর ধারা ও বহিঃপ্রকাশ আধুনিক মনের সম্পূর্ণ উপেক্ষার বস্তু হওয়া উচিত নয়। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ও ধার্ম্মিক জীবন ধারা মানুষের অতি-আদিম মনের অভ্রান্ত নিদর্শন। প্রকৃতি ও প্রতিমাপূজায় শিল্প ও সৌন্দর্য্যের দিকটীকে সম্মতি ও প্রশংসার চোখে দেখ্‌তে হলে যে অবস্থান থেকে দৃষ্টিপাত করা দরকার, সে-ই যে আধুনিক মনের লালনক্ষেত্র, এ কথা মান্‌তে বাধা পাই। কেন না শিল্প ও কারুতা হিন্দুর পূজারী মনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের প্রধান উপকরণ নয়। প্রকৃতি-ও—প্রতিমা-পূজক মানুষের পরিণতি মেরুদণ্ড-হীনতায়। জগত ও জীবনের প্রতি ঠিক সোজা হয়ে নির্ভয়ে মুক্ত চোখে তাকাবার শক্তি সে হারিয়েছে। মানুষের এই যে খর্ব্বতা, এর প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা আমাদের মনে শুধু একটা সকৌতুক আক্ষেপ মাত্র জাগিয়ে তুল্‌তে পারে। সুদূর অনাগত কালের মানুষ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আধুনিকতাকে অতিক্রম ক'রে কোনো সুন্দরতর মহত্তর ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন কর্ব্বে। তারা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থিতিকে সভ্যতা নাম দিতে পারে। এই আশা প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের অনুক্ষণ প্রলুব্ধ করে রেখেছে। নতুবা অত্যন্ত খর্ব্ব মানুষের জীবনের বিস্তৃত প্রকাশকে আমরা সভ্যতার প্রশস্তি দিতে প্রচুর সঙ্কোচ বোধ করতুম।

ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের যে-রূপ হিন্দুত্বের সুদীর্ঘ কালের সৃষ্টি, সে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ইস্‌লামের সৃষ্ট ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র তার থেকে অনেকখানি অগ্রসর। আধুনিক-পন্থা থেকে হিন্দুত্বের দূরত্ব ইস্‌লামের ব্যবধান থেকে ঢের ঢের বেশী। মানুষের ইতিহাসে — হিন্দুর আদিম-যুগীয় মনের উৎকৃষ্ট পরিণতি ইসলামের মধ্যযুগীয় মনে। এখান থেকে খানিক দূর এগুলেই আধুনিক-পন্থা। আমার মনে হয় হিন্দুর পক্ষে স্বজাত্যপরায়ণ ও আধুনিকপন্থী হওয়া যতোখানি বিপ্লবকর ব্যাপার, মুসলিমের পক্ষে আধুনিক পন্থী হওয়া ঠিক ততোখানি নয়।

আপনি জন-সাধারণের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করেন না। অথচ তারা—হিন্দু-মুস্‌লিম—যেখানে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কণ্ঠনালী ছেদন করতে উদ্যত এবং এই হানাহানি থেকে রেহাই পাওয়ার যে-ভুলপথ নেতারা খুঁজছেন, তা থেকে অন্যখানে তাদের আহ্বান করতেও আপনি নারাজ। কেমন করে এদেশের মুক্তি সম্ভব হবে? আধুনিক-পন্থায় আমাদের সমস্যার সমাধানকে তখনই পলায়ন বলা সঙ্গত, যখন অন্তরের গভীর বিশ্বাসকে চাপা দিয়ে মানুষ ছদ্মবেশে আপনাকে প্রকাশিত করবে। যে-পলায়নের পরিণাম নব সত্যের অর্জ্জন, তাকে পলায়ন বল্‌লে সত্যের অপলাপ ঘটে, কেন না বস্তুতঃ সে হলো বর্জ্জন। আমার আহ্বান পলায়নের জন্যে নয়, শুধু বর্জ্জনের জন্যেও নয়, নতুনকে গ্রহণের জন্যে যে-নতুন মানুষকে দেবে অভিনব মত, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, অভূতপূর্ব্ব চেতনা, তাকে করবে প্রাচীনের প্রাণঘাতী আওতার বাহিরে তার পরিপূর্ণ উচ্চতা সম্বন্ধে সচেতন।

আধুনিক মন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার ধারণার স্থূল প্রভেদ এইটুকু দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আপনি আপনার পরিবেশ

সম্পর্কে বেশ খানিক সচেতন হয়েও উদাসীন, আমি তা নই। আমার ধারণা উদাসীন হওয়া উচিত নয়। আধুনিক মন সব সম্প্রদায়েই আছে এ সান্ত্বনা আমাকে প্রশান্তি দান করে না। আধুনিক মন-বিশিষ্ট মানুষের জাতি এই ভারতে আবির্ভূত হোক, এই আমার অন্তরের কামনা। এরোপ্লেন যদি ভালোবাসি তার গতি স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, যাঁরা ঘোড়ার গাড়ীতে গরু যুত্‌বার চেষ্টায় প্রমত্ত তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত ওতে গতির উৎকর্ষ হবে না, বরং হবে এরোপ্লেনে। গতিশীল যে, অন্যের দুর্গতিকে ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত করা তার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নয়।

ইয়োরোপকে আমরা আধুনিক মনের প্রশস্ত ক্ষেত্র মনে করি। আমার পুরোপুরি সে বিশ্বাস নয়। বিজ্ঞানবাদ ইয়োরোপেও এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, হবার সম্ভাবনা মাত্র হয়েছে। তার পথের শত্রু যারা, তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো স্পেন ও ইটালীর চাষার দল যাদের মূর্ত্তিপূজক মন আদিম মানবতার কলঙ্ক স্খালন করতে আজও অক্ষম।

গান্ধী স্বাজাত্যের ক্ষেত্রে আবদুল গফুর খাঁর সঙ্গে মিলেছেন। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গেও মিলেছিলেন, কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছিল? স্বাজাত্যের অন্তর্গত গান্ধী হিন্দু নন, আবদুল গফুর খাঁ মুসলিম নন। হ'লে তাঁদের মিলন সেই মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হবে।

হিন্দু কৃষ্টির আধিপত্য যাঁরা এদেশে কামনা করেন, তাঁদের নিরপেক্ষতার সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু কৃষ্টি ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রকে যে-রূপ দান করেছে, তাকে মেনে নিতে মানুষের আপত্তি হতে পারে। গান্ধীর আপত্তি সুপ্রকাশিত তাঁর হরিজন আন্দোলনে, প্রতিমাপূজাবর্জ্জনে। অন্যান্যদের প্রতিবাদ ফুটে উঠ্‌ছে তাঁদের আইনগত ও আইনের বহির্গত নানাবিধ সংস্কার চেষ্টায়। আধুনিকপন্থী, হিন্দু-কৃষ্টির প্রাধান্য কামনা করলে তাঁর মানসিক সঙ্গতি রক্ষা হয় বিশ্বাস করা কঠিন।

'স্টেস্‌ম্যান' থেকে আপনি যে টুক্‌রো খবরটুকু পাঠিয়েছিলেন সেটি আগেই পড়েছিলুম। আরবী পারসী শব্দ বেছে বেছে বাদ দিলেও যদি তুর্কীদের ভাষা অক্ষম অসমৃদ্ধ বা অস্বাভাবিক না হয় তাঁরা স্বচ্ছন্দে তা করতে পারেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় চিঠি লিখ্‌তেও আমরা যদি ইংরাজি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি না করি, আরবী পারসীতে আপত্তির প্রবল কারণ কি? বিশেষ ক'রে যে-সব আরবী পারসী শব্দ চলন্তিকা বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মুসলিম সমাজ যে-সব শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করেন কতক সামাজিক অভ্যাসের বশবর্ত্তিতায় কতক বা তাঁদের বিশিষ্ট ভাবধারা প্রকাশের তাগিদে, তাদেরে নির্ব্বাসিত করা সঙ্গত কি? আমি ব্যক্তিগতভাবে বেপরওয়া আরবী পারসী শব্দ চালিয়ে দেবার পক্ষে নই। এমন কি নজরুল ইসলাম তাঁর বিভিন্ন কবিতায় যে ভাবে কঠিন কঠিন আরবী পারসী শব্দ চালিয়েছেন সেও আমার মনঃপূত নয় এইজন্যে যে তার অনেকগুলো আমরা বুঝিনে, বুঝবার প্রয়োজনও বোধ করিনে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার সম্পদ ও প্রকাশশালিতা যদি বেড়ে থাকে বিভিন্ন ভাষার শব্দ গ্রহণ ক'রে, আমাদের মতো এমন দরিদ্র ভাষার অধিকারীদের সে সুযোগ ত্যাগ করে নিজেদের কাণাকড়ি নিয়ে খুশী থাক্‌বার ইচ্ছা যেন কখনো না হয়।

সব কথা লিখ্‌তে পারলুম না। বেদনার্ত্ত শিরের কঠিন নিষেধ বার বার ধ্বনিত হচ্ছে। ... আমার বক্তব্য পরে আরো বিস্তৃতভাবে লিখ্‌বো ইচ্ছা রইলো।

বাঁশদহা, খুলনা
৩০/১১/৩৬

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

পুনশ্চ—

[সবিনয় নিবেদন, আপনাকে ক'দিন আগে একখানি চিঠি দিয়েছি। অসুস্থতার জন্যে তাতে অনেক কথাই লেখা হয়নি। যা লিখেছি তা-ও হয়তো হয়েছে খানিক এলোমেলো। এই কদিনে মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবের সমালোচনা পড়তে পড়তে মনে হলো আপনাকে আরো কটী টুকরো কথা আমার লিখ্‌বার ছিল।]

হিন্দু স্বাদেশিকতার এক অদ্ভুত আচরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। হিন্দু দেশের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, এমন কি দেশের মাটীকে পর্য্যন্ত ভালোবাসে। ("ও আমার দেশের মাটী, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা"—রবীন্দ্রনাথ।) দেশের মানচিত্রকে নারী-মূর্ত্তি দিয়ে, গোমূর্ত্তির আকারে অঙ্কিত করে অন্তরের পূজা পুষ্পমাল্যে নিবেদন করে। কিন্তু দেশের অগণিত লাঞ্ছিত উৎপীড়িত

নরনারীকে সে ভালোবাসে, এর প্রমাণ প্রচুর নয়। হিন্দু ধার্ম্মিকেরও এক অদ্ভুত রূপ আমরা বহুবার দেখেছি। গোরক্ষা আন্দোলনে বিভ্রান্ত হ'য়ে সে মানুষের নিধন-সাধনেও পরাঙমুখ নয়। এই উন্মত্ততা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, আজমল খাঁ, আনসারী, আবদুল গফুর খাঁ, এণ্ড্রুজ প্রভৃতির মিলনেও প্রশমিত হয় নি।

মুস্‌লিম সমাজে আগা-খানী সম্প্রদায়ের মানুষ-পূজা, সুফীমতবাদীদের পীরপূজা দরগাপূজা ইসলামের বিচ্যুতি। কিন্তু রামমোহনের চেষ্টায় হিন্দু সমাজে মানব-আরাধ্য নিরাকার-ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা ইসলামের অনুকরণে হিন্দুত্বের পরিমার্জ্জনা।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সংখ্যাগুরুত্বের ভীতি ও অতি স্বাদেশিকতা থেকে উদ্‌ভূত, আপনি বলেছেন। এ-মতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভারতে হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় : সুতরাং ভয় মুসলিমের। আমার মনে হয় এই ভয় অনেকখানি কৃষ্টিনাশের, ইস্‌লামের পরাভবের। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিনষ্টির ইতিহাস মুস্‌লিমের ভীরুতার এক কারণ হ'তে পারে। আর এক কারণ, ইসলাম ও ক্রিশ্চানিটী সমজাতীয় ধর্ম্ম হ'লেও ক্রিশ্চান কর্তৃক স্পেন থেকে মুস্‌লিম-বিতাড়ন। ইসলাম ক্রিশ্চান-ত্রিত্ববাদের খণ্ডন, এ-কথা যতোটুকু সত্য, ইসলাম প্রকৃতি-ও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ-ও তার চেয়ে কম সত্য নয়। কোর্‌আন-পাঠক এ-উক্তির সমর্থন সহজেই পেতে পারেন। ভারতে মুস্‌লিমের হিন্দুভীতির মূলে প্রতিমাপূজকের সম্পর্কে তার আস্থাহীনতা—প্রতিমাপূজকের আচরণ সম্পর্কে তার ঘোর সন্দিগ্ধতা এবং তজ্জনিত প্রচণ্ড মানসিক বিরুদ্ধতা বেশ দেখ্‌বার মতো।

অতিস্বাদেশিকতার নিন্দা মুস্‌লিমের পাওনা। অন্য কথায় একে বলা যায় : দেশকে অতিক্রম ক'রে ধর্ম্মকেন্দ্রিক স্বাজাত্য ও কৃষ্টির অনুগতি এবং তার প্রতি নির্ভরশীলতা। এজন্যে হিন্দুর ভয়। কেন ভয়, অন্ততঃ যতোদিন ইংরাজ এদেশের অধিপতি? বিশ্বাসহন্তার আমন্ত্রণ কোন্ দেশের কোন্ মুস্‌লিম দিগ্বিজয়ীর উদ্দেশে নিবেদিত হওয়া সম্ভব? তার প্রতিরোধে ইংরাজের ও হিন্দুর সম্মিলিত সামরিক শক্তি অপ্রচুর প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু? যদি হিন্দুর ভয় যথার্থ হয়, হিন্দুপ্রবর্ত্তিত ইংরাজ-রাষ্ট্রশক্তির বহিষ্কারের আন্দোলন, (যাকে 'জাতীয়' আন্দোলনের প্রশস্তি দান করা হয়), সেটী কৃত্রিম, অন্ততঃ অগভীর হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, যদি 'জাতীয়' আন্দোলন অকৃত্রিম হয়, হিন্দুর মুসলিম-ভীতি কখনো আন্তরিক নয়। অতিস্বাদেশিকতা নিন্দার্হ তখনই, যখন সে স্বদেশের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিযুক্ত হয় সমধর্ম্মী পরদেশীর অন্যায় লাভ অর্জ্জনে। কিন্তু অতিস্বাদেশিকতার একটী প্রশংসার দিকও থাক্‌তে পারে। সেটী আমরা দেখ্‌তে পাবো যদি ওকে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টির অন্তর্গত করে দেখা সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্রীদের এক বিরাট দলের অতিস্বাদেশিকতা বেশ দৃষ্টিসই। তাকে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টির প্রশংসা দেবার ইচ্ছা জগতে অল্প নয়। হিন্দু সমাজকে আপনি বলেছেন ফেডারেশন। যদি এদের ধর্ম্ম কেন্দ্রিক জাতি বল্‌তে পারতেন, দেখ্‌তে পেতেন : এদেরও প্রচ্ছন্ন অতিস্বাদেশিকতা আছে, যার সাম্প্রতিক প্রকাশ ঘটেছিল আফগান হিন্দুদের প্রতি স্বাদেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রদত্ত একটী আদেশের তুমুল প্রতিবাদে। আরো দেখুন : হিন্দুর কাছে ভারত মহাদেশ—মহাভারত। কিন্তু রাজপুত মারহাট্টাকে বাঙালী হিন্দু 'স্বজাতি' মনে করছে; তার কারণ সমধর্ম্মিতা। ঐ দুই জাতির দেশনিষ্ঠা, শৌর্য্য, সাধুতা, সতীত্ব প্রভৃতির আদর্শ নিয়ে বাঙালী হিন্দুর অশেষ গৌরব। একে অতিস্বাদেশিকতা বল্‌লে কি সত্যের গুরুতর অপলাপ হয়? মুসলিমের অতিস্বাদেশিকতার যা প্রকৃতি, এর কি তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র? তারপর ধরুন রবীন্দ্র নাথ ও তাঁর মতানুবর্ত্তীদের 'বৃহত্তর ভারতের' পরিকল্পনা। ভারতের আশে পাশে—সুদূর জাপানে, এমন কি মুসলিম ইরাণে ভারতীয় হিন্দু কৃষ্টির অনুসন্ধান কি হিন্দুর অতিস্বাদেশিক প্রবৃত্তির নিদর্শন নয়? একে যদি দোযাবহ ভয়াবহ মনে করা মুসলিমের পক্ষে সঙ্গত না হয়, মুসলিমের অতিস্বাদেশিকতাকে হিন্দুর কেন এতো ভয়? আমার মনে হয় : হিন্দুর এই ভয় হ'লো ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক বিরুদ্ধতার ছদ্মবেশ অথবা তার অর্থহীন পরিণাম। সংক্ষেপে, আমার বিশ্বাস : হিন্দু-মুসলিম বিরোধের আপাত কারণ যা-ই ধরুন, তার মূলে ধর্ম্মগত ও কৃষ্টিগত বিরোধই সক্রিয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সমন্বয়ের আহবান যদি হয় হিন্দু কৃষ্টির পক্ষ থেকে মুসলিম কৃষ্টির প্রতি মিলন-আমন্ত্রণ, তা'হলে কোর্-আনিক ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার অর্থ হবে ইসলামের বিনষ্টির আহবান। আধুনিক পন্থায় আমন্ত্রণ ইসলামের অগ্রগতির আহবান, যে-গন্ধ অন্ধ হয়ে কুঁড়ির ভিতরে কাঁদ্‌ছে তার মুক্তির আহ্বান। হিন্দুত্বের সঙ্গে মিলন-প্রস্তাব ঠিক তা নয়।

বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় আয়তনের দিক দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জন্যে যে ক্ষুদ্র স্থান আপনি নির্দ্দেশ করেছেন, সেখানে

তার অস্তিত্বের কি-এমন অর্থ থাকতে পারে? এখানে তার গতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান সাধনা, মানসিক বিকাশ প্রভৃতির আলোচনা অনেকখানি অপ্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান হ'তে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী, মানুষকে শুধু তুচ্ছ প্রাণী মনে করলে তার বিজ্ঞানবাদের কারণই হয় বিনষ্ট। বস্তুতঃ বিজ্ঞানবাদী-মানুষ আপনাকে সৃষ্টির সেরা মনে করে। বিশ্বে তার অবয়বিক অস্তিত্ব যতোই তুচ্ছ হোক, তার মন বুদ্ধি চিন্তা আপনার বিস্তারে সৃষ্টিকে অধিকার করতে চায়। মানুষের এই রূপ ইসলামের কল্পনায় ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ইসলামী পরিভাষায় মানুষ আশ্‌রাফুল্ মখ্‌লুকাত্—সৃষ্টির সেরা। বিজ্ঞানবাদী মানুষ সৃষ্টিকে আয়ত্ত করবে, তার রহস্য ভেদ ক'রে বিশ্বের যিনি কবি—শিল্পী, তাঁর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আপনার মনকে মেলাবে, এই হ'লো তার সাধনা। আমি যতোদূর বুঝি ইসলামেরও উহা অভিপ্রায় এই।

আমি রোমান হরফে বাংলা লিখ্‌বার অত্যন্ত পক্ষপাতী। কারণ পরে লিখ্‌বো। আপনার মৃদু আপত্তি সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য নিবেদন করবো।

প্রীতিমুগ্ধ
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বাঁশদহা, খুলনা
৭/১২/৩৬

(খানসাহেব মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলীকে লিখিত)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

.. রোগে ভুগ্‌ছি। দুর্ব্বলতাও যথেষ্ট। আপনার পত্রের বিস্তৃত উত্তর লিখ্‌বার শক্তি বর্ত্তমানে আমার নেই। তথাপি প্রাপ্তিস্বীকারের সৌজন্যটুকু না করলে আপনি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন।

আপনি বয়সে প্রবীণতায় সাহিত্যসেবায় আমার অগ্রজ। এই হিসাবে আমাকে কঠিন কথা শোনাবার — উপযুক্ত আমার মতের সমালোচনা কর্‌বার অধিকার আপনার কিছু বেশী স্বীকার করি। জানি এই উত্তাপ অন্তরালে সদিচ্ছা ও সুগভীর প্রীতির বেদনার্ত্ত প্রকাশ আপনার এই প্রতিবাদ। এতে আপনার স্নেহসুন্দর অন্তর ম্লান হবে না কোন দিন। এই ভরসা আপনাকে ক'টা কথা নিবেদন কর্‌তে আমায় প্রচুর সাহস দিয়েছে।

বুদ্ধির মুক্তি আপনার অকাম্য নয়, কিন্তু তাকে আপনি চান একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে। অথচ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন গণ্ডীকে অতিক্রম করেই মানুষ মনের মুক্তি। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম যখন নিঃসীম নীলিমার অনন্ত মাধুরীর আস্বাদনে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে, অন্যের পঙ্গুতাকে সে স্মরণ করে না। মুমুক্ষুর এই ধর্ম্ম চিরদিনের। যে অন্ধতার জন্যে প্রতিবেশী-সমাজকে কলঙ্কিত রূপে দেখ্‌ছেন তাকেই যদি আমরা বরণ করি, বিশ্বের বিরাট খতিয়ানে আমাদের সে ক্ষতি তুচ্ছ প্রতীয়মান হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত, এমন কি দেশগত জীবনেরও হিসাবের খাতায় সে হবে অতি বিরাট. হিন্দু মুসলিম বিরোধকে অনুক্ষণ সাম্‌নে রেখে অনাগত কালের দিকে আমাদের পা বাড়ানোর ভঙ্গি নির্ণয়ের প্রয়োজন যদি স্বীকার করি, সৌন্দর্য্যের দিকে মানুষের যে-অসীম বিকাশ-সম্ভাবনা আমাদের অন্তরে অবিরাম শিহরিত হচ্ছে তার নিধন অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-সাধনা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। আপনি কেমন ক'রে সবল কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনের আঘাতে চিরন্তনী মানবতার এই লাঞ্ছনা বিনা-বেদনায় নীরবে প্রত্যক্ষ কর্‌বেন?

আর বস্তুতঃ হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে? হিন্দু আজ যেখানে দাঁড়িয়ে মুসলিমের মৃত্যুকামনা করছে সেখানে চোরাবালির স্তূপ, তার নীচে শক্ত ভিত্তি কিছু নেই। এ যদি আপনারা জানেন এবং মনেপ্রাণে এই তথ্যকে প্রত্যয়ের প্রবঞ্চনা মাত্র না দিয়ে নির্ভীক নিঃসন্দেহে লালন করেন, মুস্‌লিমের কেন ভয়? মুস্‌লিম আপনাকে সুস্থ সবল মানুষে পরিণত করুক। সেই মানুষের মৃত্যু কামনা যে করবে সে আপনার সর্ব্বনাশের পথ কাটবে। কিন্তু মুস্‌লিম সত্যিই মানবতার পথে কতোখানি অগ্রসর, এ আপনাকে দেখ্‌তে হবে। বর্ত্তমান যুগে ইসলামের যাঁরা বাহন, তাঁরা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে—জ্ঞান-সাধনার পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা রচনায় ব্যস্ত। স্বার্থনাশের আশঙ্কায় শিক্ষিতেরা তাকে স্বীকার করতে সমুৎসুক। তাকে লঙ্ঘন কর্‌বার ইচ্ছা বা শক্তি মুসলিমের নেই। অথচ আজ নির্ম্মুক্ত জ্ঞানসাধনাই হ'লো তার পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পন্থা। কেমন ক'রে সে আপনার মানবসত্তাকে বিকশিত কর্‌বে?

স্বাস্থ্যে শিক্ষায় সমাজবিধানে, চিন্তার ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের বুদ্ধিবর্হির্ভূত নির্দ্দেশকে মেনে চল্‌লে মানুষ পুরোপুরি

বেড়ে ওঠে না, গতি তার অবাধ হয় না, দৃষ্টি তার দিগন্ত ভেদ করতে পারে না যদিচ ইস্‌লাম আধুনিক ধর্ম্ম, তথাপি সে ভবিষ্যতের অভিমুখে অপৌরুষেয়। জ্ঞানচালিত মানুষের শেষ পথচিহ্ন মাত্র, মানবতার শেষ পরিণাম নয়।

ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করতে আপনার অসম্মতি নেই। কিন্তু, জিন্নার ভাষায়, যতোদিন ধর্ম্ম থাক্‌বে, ততোদিন ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাক্‌বে, সম্প্রদায়গত স্বার্থও থাকবে। এ জিনিসটার সংক্রামণ-শক্তি এতোই ভয়াবহ যে ওকে মানব-সমাজের অঙ্গ থেকে ঝেড়ে না ফেল্‌লে তার স্বস্থ প্রকৃতিস্থ হবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কোর্‌আন্ বলে : মানুষ যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়, কর্ম্মফল মানে এবং সৎকর্ম্ম দ্বারা আপনার জীবনকে মহীয়ান করে, নির্ভর সে, তার জন্য পরম পুরস্কার। (সুরা বকর্)। মোল্লা এ কথা মানেন না। তাঁর ব্যাখ্যা অন্যরূপ। আপনার আমার ব্যাখ্যার অধিকার নেই। আমরা ইসলামের কে? মোল্লারাই ইসলামের বাহন। বাহনমুক্ত ইসলাম স্তম্ভিত—নিশ্চল। ডাক দিলেও সে আপনার সঙ্গে চল্‌বে না। তার প্রেমিক জনেরও গতিপথ তাই আজ রুদ্ধ।

ইসলামকে আপনি কোর্-আনে ও হজরত মোহাম্মদের জীবনে ফিরিয়ে নিতে চান। এ মনোভাব আন্‌কোরা ওহাবীর। নিন্দা বা প্রশংসার উক্তি এ নয়। ওহাবীর মতবাদ এই। এ সম্পর্কে কয়েকটী কথা আমি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের গত পূর্ব্ব বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলুম। আজ তা থেকে, দুটী মাত্র কথার পুনরুক্তি করি। প্রথমতঃ কোনো মহাপুরুষের জীবন একটী বিশিষ্ট যুগ—অনন্ত কাল নয় এবং কোনো বাণীর যোগ্যতা বিচারে মানুষ কোনো কোনো যুগে ধর্ম্ম বিশ্বাস দ্বারা চালিত হলেও চিরদিন তা হয় না। মানুষের মন ও সমাজ চিরবিকাশশীল। এদের শক্তি, সূক্ষ্মতা ও জটিলতা ক্রমশই বাড়ছে। কোনো ফ্রেমে এদের এঁটে রাখা চলে না। মানুষের মঙ্গলকে প্রদীপ ক'রে নিঃসীম গতির পথে তার যাত্রা। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারে কোনো যুগবাণীর নির্দ্দেশ সনাতন মাপকাঠি নয়। মাপকাঠি হলো মানুষের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণ কি? তার বিচারক সুস্থ সবল সচেতন প্রস্ফুটিত মানুষের নির্ম্মুক্ত বুদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ কোনো স্রোতোধারাকে তার মূল উৎসে ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। যে-নদী আজ মৃত্যুর সম্ভাবনায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সম্মুখের পথ কেটে মহাসাগরের দিকে ছুটিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু দূর সমুদ্রের আহবানে সে যখন ছুটে চলবে মূল উৎসকে স্মরণ করতে তাকে বাধ্য করবে কে?

রামমোহনের সম্পর্কে আপনার মতামত আমি জানি না। হজরত মোহাম্মদ নবী; রামমোহন নবী নন, সংস্কারক। হজরত মোহাম্মদ চেয়েছিলেন অপৌরুষেয় জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ঊর্দ্ধগতি। রামমোহন চেয়েছেন প্রধানতঃ হিন্দু সমাজের সংস্কার। তিনি বুদ্ধির সমর্থনে শাস্ত্রকে—মুখ্যতঃ হিন্দু শাস্ত্রকে নিযুক্ত ক'রে সমাজের পরিচ্ছন্ন জীবন কামনা করেছিলেন। তাঁর নিরাকার ব্রহ্মবাদ ইসলামপন্থীর অনুকরণ, যদিও হিন্দুর তত্ত্ব-শাস্ত্রই ছিল এর প্রচারে তাঁর প্রধান অবলম্বন। আধুনিক ইস্‌লামপন্থী চান ইসলামের সমর্থনে বুদ্ধির নিয়োগ। আপনিও সম্ভবতঃ তাই চান। কিন্তু যেখানে ইসলামী বিধানের সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ, সেখানে কোন্‌টী হবে আপনার কাম্য? এক্ষেত্রে যাঁরা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা বলিষ্ঠ বুদ্ধির দিকে রামমোহনের যে-সুস্পষ্ট প্রবণতা, তারই সমর্থক। রামমোহন নবসত্যের বাহন বা যুগস্রষ্টা, এ বিশ্বাস অন্ততঃ আমার নয়, যদিও একটী যুগের এক বৃহৎ অংশ তাঁর জীবন। কিন্তু যুক্তির দিকে তাঁর যে সুন্দর অভিমতি, তাকে আমি সানন্দে স্বীকার করি।

শরৎচন্দ্রের একটী সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে যদি কেউ বেশী মূল্যবান মনে করেন, তাতে আপনার আমার প্রবল আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে বোঝা শক্ত। তাঁর প্রয়াস যদি ব্যর্থও হয় তাতে আমাদের বৃহত্তর জীবন কোন্ নতুন ক্ষতির সম্মুখীন হবে? রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যা নন, তাঁকে তা কেন ভাব্‌তে যাবো? কিন্তু যাঁর যতোটুকু ন্যায্য পাওনা, তাও কি তাঁকে দেবেন না?

এই দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমাদের দেশের দুইটী বিরাট প্রতিভা। তথাপি তাঁরা যে-দৃষ্টি দিয়ে দেশের নানা সমস্যার দিকে তাকান সে যদি যথেষ্ট উদার এবং নিরপেক্ষ না হয়, তাতে আমাদের ক্ষোভ প্রচুর। তবে কোনো ব্যাপারে তাঁদেরও যে ক্ষোভ নেই, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় মানুষের যে-সাম্য কামনা করেছেন, অবিচারের বিরুদ্ধে যে-নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন, দেশচিত্ত তাতে সাড়া দেয় নি, হিন্দুচিত্তও না। কিন্তু এটী হয়তো কবি ও ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য নয়। তাঁরা তাঁদের অন্তরের বাণীকে দৃষ্টির অপূর্ব্ব স্নেহ-সুষমায় মণ্ডিত ক'রে বিশ্বের বুকে প্রেরণ করেন। বিশ্বের মানুষ তাকে

গ্রহণ করবে, কি উপেক্ষা করবে, সে-ভাবনা আপনার আমার, তাঁদের নয়। তাঁরা দেশ কল্যাণের জন্যে সত্যিকারভাবে অনুপ্রেরিত হ'য়ে যা-ই লিখুন সে আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী হবে, এই হোক প্রত্যেকটী সাহিত্যিক চিত্তের আশা। শরৎচন্দ্র মুস্‌লিম সমাজকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করবেন, তাঁর এই আকাঙ্খায় যে-দিক দিয়ে যাঁর যা বলবার ছিল, অনেকেই বলেছেন। এর পরেও যদি তাঁর সঙ্কল্প স্থির থাকে, আমরা সাগ্রহে তাঁর রচনার প্রতীক্ষা করি। মুস্‌লিমকে অপমানিত করবার ইচ্ছাই যদি তাঁর হয়, বড়জোর তিনি মুস্‌লিমের কলঙ্কিত চিত্র অঙ্কিত করবেন। কিন্তু, যদি অপরাধ না নেন, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি : আজ মুস্‌লিমের জীবন যে-শ্রীহীন কদর্য্যতার সমাবেশে লাঞ্ছিত, শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাও কি তার পরিপূর্ণ চিত্রণের জন্যে যথেষ্ট? সাহিত্যিক প্রয়াস যদি সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান আনয়ন করতে না পারে, তার পথ উন্মোচনে কি কিঞ্চিৎ সহায়তাও করতে পারে না? সেটুকুও কি দেশের বৃহত্তর জীবনের পক্ষে একটা পরম লাভ নয়? আর, কোনো সমস্যার সমাধান হয়তো সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যের অন্তর্গতও নয়। তিনি যদি সহানুভূতির সঙ্গে সমস্যার গোড়ার কথা বুঝতে ও বোঝাতে পারেন, সমাধানের দিকে অস্পষ্ট ইঙ্গিতও করতে পারেন, সে ই আমাদের পরম লাভ। তাঁর ইঙ্গিত আমাদের কাছে আসবে কি না, তা নির্ভর করে একদিকে যেমন তাঁর দৃষ্টি ও আন্তরিকতার উপর, অন্যদিকে তেমনি আমাদের অন্তরের গ্রাহিকা শক্তির উপর।

মুতাজিলাবাদ সম্পর্কে আপনার অনুকূল মত সত্যিই অনেককে আনন্দ দেবে। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তিকে ইস্‌লাম যদি স্বীকারই করলো, মুতাজিলদের ঐতিহাসিক ভাগ্যচক্রের অন্যরূপ আবর্ত্তন কেন হলো না? বস্তুতঃ, মুতাজিলা-দর্শন ইস্‌লামের অঙ্গীভূত হয়েছে, এ-কথা বড়ো জোর অর্দ্ধ-সত্য। ইন্দো-ইরাণীয় ধর্ম্মদর্শন ভারতীয় ইস্‌লামের মর্ম্মস্থান অধিকার করেছে। আপনি আমি ইস্‌লামের কে যে মুসলিমের মর্ম্ম ছিঁড়ে তাকে বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবিয়ে মারবার অধিকার দাবী করবো?

নাৎসীবাদ জার্ম্মেনীতে ইহুদীদের যে দশা করেছে কোনো ভারতীয় হিট্‌লার যে ভারতে মুসলমানদের সে অবস্থা করবে না, কে বলতে পারে?—আপনার প্রশ্ন। সত্যিই কেউ পারে না। তথাপি একদল মুস্‌লিম তারই মতো ধর্ম্মাভিমুখী এবং উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের আবির্ভাব এদেশে কামনা করেন, মনে হয়। আমরা এমন জাতীয়তাবাদ চাই না ধর্ম্ম যার আশ্রয়, আর্য্যামির অন্ধ গর্ব্ব যার অবলম্বন, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-গুণীর লাঞ্ছিত 'অভিমান' যার সাবজ্ঞ উপেক্ষার সামগ্রী এবং মুক্তিমান বুদ্ধিগরীয়ান মানুষ যার আওতায় আপনাকে খুঁজে পাবে না।

"হিন্দু-মুস্‌লিমের বিরোধ চোখের পলকে মিটবার নয়।" আমার আশঙ্কা যুগ যুগান্তের সাধনার ফলেও নয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় কখনো হবে না। সকল ধর্ম্মের সার বস্তু এক, সবাই ব'লে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তার দিকে মুখ্যতঃ কেউ দৃষ্টিপাত করে না, করে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে, যা নিয়ে এক ধর্ম্ম থেকে অন্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহত অক্ষুণ্ণ রাখবার ইচ্ছা আমাদের ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের মেরুদণ্ড। তাই আজও হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের বাণী দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে, আপনার বৈশিষ্ট্যের পতাকা নিয়ে মুস্‌লিম শক্ত পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে। এদের মিলন কেমন ক'রে হবে?

আপনি বলছেন : "একটা পথ উভয়ের সমাজ-জীবনের সমতা-বিধান।" কি ভাবে এটা সম্ভব? ফৌজদারী আইন, ভূমি- ও রাজস্ব-বিষয়ক আইন স্থূলতঃ হিন্দু-মুস্‌লিমের জন্যে এক; কিন্তু বিবাহ-আইন নয়, উত্তরাধিকার-আইন নয়, শাস্ত্রশাসিত যৌন জীবন ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার বিধানও নয়। আজ প্রকৃতি-ও-প্রতিমাপূজা এবং আর্থিক সামাজিক ও যৌন অবিচারের বিরুদ্ধে আইন-প্রণয়নের সাহস ও শক্তি কার? নারীকে পুরুষের সমভাগী করবার অধিকার কার? অগণিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষকে ভোগের সম-অধিকার দিতে অন্তরের কামনা কার? সর্দ্দা আইনের মতো অতিনিরীহ এবং অকর্ম্মণ্য একটী বিধানের বিপক্ষেও দেশব্যাপী যে-আন্দোলন জেগে উঠেছিল, তাকে নিধন করবার মতো অস্ত্র আজ কার হাতে? একমাত্র তারই হাতে থাকা সম্ভব, যে নির্ভয়ে বলতে পারে : মানুষ ধর্ম্মের জন্যে নয়, ধর্ম্ম মানুষের জন্যে; এক সুন্দর অভিনব ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে নিয়ে যে কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে : আমাদের প্রাণঘাতী ধর্ম্মার্ত্ততার অবসান হোক, মানুষের হোক আজ পরিত্রাণ! কে সেই যুগমানব, আপনি আমাদেরে তার সন্ধান বলে দিন।

বাঁশদহা, খুলনা

বিনীত—

৩/১২/৩৬ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

ধর্ম্ম সম্পর্কে দু'একটা কথা

(ধর্ম্ম- বিশ্বাস, জ্ঞান, শাস্ত্র, গুরু, প্রতীকচর্চ্চা, ইসলাম, হজরত)

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, এম্.এ

সুহৃদ্বরেষু,

তসলিম। আপনার পত্র পেলাম।

আমি ধর্ম্মকে বলেছি প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান। আপনি বলেছেন ধর্ম্ম revealed, ধার্ম্মিকেরা যে ধর্ম্মকে সাধারণতঃ revealed (প্রত্যাদিষ্ট) বলেই জানেন এ বোধ আমার আছে; তবু আমি কেন এটিকে প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান বলেছি তা একটু বিস্তৃতভাবে বলি। বিভিন্ন ধর্ম্ম নানা আচার অনুষ্ঠান মতবাদ ইত্যাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু এই সব ধর্ম্মের যাঁরা প্রবর্ত্তক অথবা শক্তিমান প্রচারক, তাঁদের জীবনের দিকে চাইলে যে ব্যাপারটির দিকে চোখ পড়ে, সেটি হচ্ছে বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভিতরে একটি সমর্পণের ভাব। তারই ভিতর দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাঁরা নিবিড়ভাবে যুক্ত। আপনি যেন বলতে চেয়েছেন ধর্ম্ম জ্ঞান বিচার নিরপেক্ষ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের এই ধারণা এবং সর্ব্বসাধারণের দিকে চাইলে তাই-ই মনে হয়। কিন্তু ধর্ম্ম ত শুধু সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার নয়। তা হ'লে ধর্ম্ম এত দিনে করে যে উঠে যেত তার ঠিক ঠিকানা নেই। ধর্ম্ম বল পায় ধার্ম্মিকদের আচরণ থেকে। সেই যথার্থ ধার্ম্মিকরা খুব serious লোক — জগতের দিকে তাঁরা যেন তাকিয়ে চলেন, অবশ্য এক বিশেষ ভঙ্গিতে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যা'ক। কোর্‌আনে কেয়ামত বেহেশ্‌ত্‌ দোজখ ফেরেশ্‌তা হুর ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদি বিচিত্র কথা আছে। সমসাময়িক লোকেরা হজরতের মুখে এ সব বর্ণনা শুনে হয়ত অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন — এখনো যেমন অনেকে করে। কিন্তু তারা হজরতকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল কি এই সব বর্ণনার শক্তির জন্যে? অবশ্য এই বর্ণনার শক্তিও কম শক্তি নয়। কিন্তু আমার ধারণা যে হজরত তাঁর সমকালের লোকদের উপর জয়ী হয়েছিলেন তাঁর চারিত্রিক শক্তি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রেমের শক্তির বলেই। এই শেষোক্ত শক্তিটী নিত্যকালের, জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে এর নিত্য যোগ। এই চারিত্রিক বল ও প্রেম-সম্পদ লাভ হয়েছিল তাঁর আল্লাহ্‌তে অর্থাৎ তাঁর ধারণায় পরম ও চরম সত্যে একান্ত নির্ভরতার ফলে। নাস্তিক বল্‌বেন : আল্লাহ্‌ই বিতর্কের বিষয়। কিন্তু তাতে আমার মূল বক্তব্য টলে না। আমি বলতে চাই জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান ত কখনো নয়। জ্ঞানের অর্থ জ্ঞানের অন্বেষণ। সেই অন্বেষণের পথে যাঁরা কোনো জ্ঞানকে পূর্ণ সত্য বলে' বিশ্বাস করেন ও সেইভাবে জীবন গঠন ক'রে জগতের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তাঁরা ধার্ম্মিক — আর জিজ্ঞাসাই যাঁদের প্রধান সম্বল, কর্ম্ম নয়, তাঁরা দার্শনিক। ধার্ম্মিকদের ভিতরে এই যে সত্যে সমর্পণের ভাব এটি তাঁদের বল দেয়, জগতের জন-সাধারণের কাছে জয়ী করে। কিন্তু এইজন্য ধর্ম্ম পরে পরে মানুষের চিত্তের বন্ধনের কারণও হয়। কিন্তু সেটি যে বল দেয় সে কথা ভুললে চল্‌বে না। এই বলের বিশেষ দরকার। এ না হ'লে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ মানুষকে বেশী দূর এগিয়ে নিতে পারে না। এই সব ভেবেই আমি বলেছি ধর্ম্ম প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান এবং ধর্ম্মের ভিতরকার এই প্রত্যয়ের ভাবটি অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেবার জিনিস নয়। অবশ্য সদা-জাগ্রতচিত্ততা ও প্রত্যয়, এ দুয়ের যোগ কেমন ক'রে হবে একথা আপনি তুলতে পারেন। তার উত্তর কঠিন নয়। জ্ঞানান্বেষণ ও প্রত্যয় এই দুইয়ের এমন যোগ জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ভিতরে ঘটেছে, যেমন সক্রেটিস, সাদি, গেটে, রামমোহন ইত্যাদি। আমি অতি অল্পসংখ্যক লোকের নাম করলাম, আরো ঢের আছেন এই দলে; এমন কি বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারকদেরও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে পারেন যদি তাঁদের আচারঅনুষ্ঠানের মোটা আবরণ চিরে তাঁদের স্বরূপ দেখতে পারেন।

কিন্তু আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার প্রধান বিরোধ হয়ত এই সব মহাপুরুষ ও চিন্তানায়কদের নিয়ে নয়। আপনি ধর্ম্মের প্রাত্যহিক রূপের দিকে চেয়ে কথা বলছেন ও সেখানে লোকেরা ধর্ম্মকে অদ্ভুত কিছু ভেবে যে অনর্থ সৃষ্টি করেছে

তারই দিকে ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য : লোকের যা নিয়ে মারামারি করছে তারও চাইতে বড় কথা কি সত্য সত্যের দিকে যদি তাদের আকর্ষণ করা যায় — আকর্ষণ করার শক্তি সত্যের নিজেরই আছে — তবেই সত্যকার কাজ হবে।

আমি গুরুকে শাস্ত্রের চাইতে বড় বলেছি, এতে আপনার আপত্তি টেকসই নয়। বৈজ্ঞানিক সত্য বলতে যা বোঝায় সেখানে অবশ্য শাস্ত্র বড়, গুরু নন। কিন্তু তার বাইরে যেগুলোকে moral truths বলা হয়, অর্থাৎ যে সব সত্য নিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও ব্যক্তিতে সমাজে প্রতিদিন কারবার চলে সে-সব ক্ষেত্রে গুরু বাস্তবিকই শাস্ত্রের চাইতে বড় শাস্ত্র গুরুর জীবন-বৃক্ষের একটি ফল। ধরুন হজরতের কথা। তিনি একেশ্বরতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, শুধু একথা বললে তাঁর দাম বেশী হয় না, কেন না নাস্তিকের কাছে সেই ঈশ্বরতত্ত্বের কোন দাম নেই, সুতরাং তার প্রচারকও মর্য্যাদাহীন। কিন্তু সেই প্রচারক যে মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজজীবন চেয়েছিলেন, এটি নাস্তিকের চোখেও মূল্যবান। আবার কবির চোখে মূল্যবান সেই প্রচারকের সৌন্দর্য্যবোধ মাত্রাবোধ ও বাক্‌শক্তি। এমন হজরতের জীবনের এতো দিকের ভিতরে আপনি যদি একটা মাত্র বেছে নেন, তবে আপনার প্রয়োজন চরিতার্থ হয়ত হয়, কিন্তু তাঁকে বোঝা হয় না, জগতের সবারই চরিতার্থতাও ঘটে না, অথচ হজরতের জীবন এমন একটি ব্যাপার যে বহু জীবন পথিকের ক্ষণিক অথবা দীর্ঘ দিনের আশ্রয়স্থল তিনি হ'তে পারেন।

শুধু এই নয়। কোর্‌আন কি বোঝা যায় হজরত ও তাঁর সময়কে না বুঝলে? আপনি ত জানেন যে একখানি বই বুঝতে হ'লে বহু বইয়ের জ্ঞান থাকা চাই, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা চাই। এ সব বুঝেও আপনি কেমন ক'রে বলতে পারেন মানুষের চাইতে মতামত বড়! মানুষ জীবনের পথে চলেছে; সেই চলার পথে যত দৃশ্য তার চোখে ভেসেছে, যত কথা তার মনে জেগেছে তাই লিখে লিখে সে যাচ্ছে। মানুষের দর্শন বিজ্ঞান কোর্‌আন কেতাব সেই সব রচনা। এ সব লিপিবদ্ধ, সুতরাং পরিপূর্ণ ও একই সময়ে অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু মানুষ আজো ত থামে নি, নতুন নতুন লেখা তার চলেছেই। সেই চিরপথচারীকে বিস্মৃত হ'য়ে আপনি বড় জ্ঞান করবেন তার বিশেষ বিশেষ পান্থশালার বিশ্রাম! কোনো মতামতকে বড় ক'রে দেখলে সেই মতামতের প্রচারকের জীবনের ভিতরকার চিরপথিক রূপটি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে।

গুরুবাদ সম্বন্ধে আমার কথাগুলো আপনি ঠিক অর্থে নেন নি। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার কথাই আমি বলেছি। সেই শ্রদ্ধা creative, গ্রন্থের বা মতামতের প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে। কেননা গুরুকে নানাভাবে দেখা যায়, গ্রন্থ বা মতামতকে তত বিচিত্রভাবে দেখা যায় না। মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লা-তত্ত্বের যে-ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি তা মানতে আপনি রাজী নন। বিলক্ষণ। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের দিকে চাইলে আমার ব্যাখ্যা আপনি ফেলতে পারবেন মনে হয় না। এ কালের ওহাবী মনোভাব হজরতকে তৌহিদের বাহনমাত্র হিসেবে দেখেছে। কিন্তু সে-ওহাবী মনোভাব মোটের উপর একটি প্রতিক্রিয়া। Creative ওটি নয়, ওর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি একদিকে formalism, অন্যদিকে ধর্ম্মবিসর্জ্জন।

আপনার চোখে ধর্ম্ম অদ্ভুত অনড় ব্যাপার — তার বিকাশ বিবর্ত্তন অসম্ভব, অতএব তাকে বিসর্জ্জন না দিয়ে উপায় নেই। আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা বলছি তাও এক হিসেবে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়াই। তবে আমি বলতে চাই ধর্ম্মের ভিতরে সমর্পণের ভাবটি যে আছে ওটি মানুষের জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ওটিকে বিসর্জ্জন দিলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেইজন্য revelation সহজেই আমার চোখে rationalismএ রূপান্তরিত হতে পারে। জীবনেও যে পারে তার প্রমাণ মুসলমান-ইতিহাসে মোতাজেলা-দল। আপনি ওঁদের দৈবাৎ-আগত বলেছেন। তা সত্যি নয়। মোতাজেলা সুলভ rationalism বার বার মুসলিম জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে — অথবা সব ধর্ম্মের ভিতরে ওটি আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্র পরিচয়ে। Revelation যে শুধু অপৌরুষেয় ব্যাপার নয়, ওটি পৌরুষেরই বিশেষভাবে, অর্থাৎ ওটির অন্য নাম inspiration, একথা বলতে হবে এবং ধার্ম্মিকেরাও শেষ পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করবেন যদি জ্ঞানের দিকে তাঁরা একেবারে পিঠ ফিরিয়ে না বসেন। তাছাড়া কোর্‌আনে ত বিচার কাণ্ডজ্ঞান ইত্যাদির মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। আপনি বলেছেন : ধর্ম্ম-"বিশ্বাস" সব সমাজের লোকদেরই নিয়ামক। কিন্তু তা ত সত্য নয়। ইহুদি ও খ্রীষ্টান সমাজ ত নয়ই, সেখানে আচার বিশ্বাসের চাইতে বড় জায়গা দখল করে আছে। একালে বিচারও বেশ বড় জায়গা দখল করছে সে-সব সমাজে। শুধু মুসলমান

সমাজেই মনে হয় 'বিশ্বাস' খুব বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের দিকেও ভাল করে' তাকালে দেখা যায় বিশ্বাসের চাইতে uniformity of conduct সেখানেও বড় কথা — শুধু একালে নয়, সবকালেই। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, একথা অন্যান্য সমাজের লোকদের মতো মুসলমান সমাজের লোকদেরও মান্‌তে হবে।

হজরত নিরাকার ব্রহ্মবাদই প্রচার করতে চেয়েছিলেন, অন্য কোন ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে তিনি আপোষ করতে চাননি, এই আপনি বলেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু একথা সত্য যে সেই একেশ্বরবাদ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যেমন উৎকট আকার ধারণ করেছে অন্যান্য সব মতের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে, এটি তাঁর ভিতরে ছিল না। প্রমাণ কোর্‌আনের এই সব কথা — শুধু প্রচার তোমার কার্য্য ... তারা তোমার কথা না শুন্‌লে তুমি কি জীবন ত্যাগ করবে ইত্যাদি (আমি শুধু ভাবটির উল্লেখ করলাম)। তাঁর বহু কার্য্যেও এর প্রমাণ রয়েছে। পৌত্তলিকদের সঙ্গেও তিনি অতি ভদ্র ব্যবহার করেছেন। মদিনায় প্রবেশ ক'রেই তিনি ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন "মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লাহ্"-র উপরে জোর না দিয়ে। হোদায় বিয়াব "মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লাহ্"র উপরে জোর দেওয়া হয়নি আপনি জানেন। হজরতকে তলোয়ার ধর্‌তে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। অবশ্য মুসলিম অনুশাসনে বিধর্ম্মীর প্রতি অসহিষ্ণুতাই প্রকট, কিন্তু সেটি সেই আদিযুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফল। যদি অতটা প্রতিকূলতা ইসলাম না পেত তবে তলোয়ারের সঙ্গে তার অত নিবিড় যোগ হতো না। হজরতের চরিত্র ও কোর্‌আন্ এই কথার সাক্ষ্য দেয়। আমার ত মনে হয় এ কথাটা মুসলমানদের নূতন করে' বুঝ্‌তে হবে এবং ইসলামের ইতিহাসকে আমি অনেকখানি ব্যর্থতার ইতিহাস বল্‌তে সাহসী হয়েছি এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই। একথা যথার্থ যে যা ভাল তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কি ভাল? মতবাদের হানাহানি, না মানবপ্রেম? অবশ্য হানাহানি সময় সময় অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটি আমাদের দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতার ফল।

আমি বলেছি সব ধর্ম্মই প্রতীক-চর্চ্চা অর্থাৎ এক রকমের পৌত্তলিকতা। আপনি বলেছেন : মুসলমান একথা মান্‌বে না, কথাটা অসাধারণ। অ-সাধারণ হয়ত এই মন্তব্য, কিন্তু মিথ্যা কি করে আপনি একে বল্‌বেন যখন দেখ্‌ছেন প্রত্যেক ধর্ম্মের লোক কতকগুলো মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেছে? সেই সঙ্গে আমি একথা বলেছি যে এই প্রতীক-চর্চ্চা খুব খারাপ নয়, এর দ্বারা কেবল যে অনর্থই হয় তা নয়। এর সঙ্গে সমর্পণ-ধর্ম্মের, সৌন্দর্য্যবোধের ও প্রেমধর্ম্মের যোগ রয়েছে। এটি মন্দ হয় তখন যখন এটি উৎকট আকার ধারণ করে — হিন্দুর প্রতিমাপূজা ও মুসলমানের প্রতিমাবিদ্বেষ যেমন একালে উৎকট আকার ধারণ করে হেয় হয়েছে। বাস্তবিক উৎকটতাই সত্যকার প্রতিমাপূজা, কেননা তাতে জ্ঞান ও মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক নষ্ট হয়। আর এ দুটি নষ্ট হলে মানুষের কল্যাণও আর করা যায় না। মুসলমানের সঙ্গে হজরতের পার্থক্য এই যে উভয়ই প্রতিমাপূজার বিরোধী, কিন্তু হজরতের ভিতরে মাত্রাত্যাগ ও উৎকটতা কখনো দেখা দেয় নি। দেখা দিলে তিনি তাঁর যুগের অজ্ঞ মূর্খদের অত ভালবাস্‌তে পারতেন না, অত ক্ষমাও কর্‌তে পারতেন না। আপনি জানেন বদরের যুদ্ধের পর কোরেশদের দশা দেখে তিনি কেঁদেছিলেন। এই প্রেম ওহাবীর মধ্যে নেই, একালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতা ইক্‌বালের মধ্যেও নেই। এই থেকেই বোঝা যায় মুসলমানের সহজ মানবতার অভাব, মতবাদের উৎকটতার প্রভাবে।

আপনি বলেছেন : ভারত আর আরব দুই স্বতন্ত্র দেশ। এরকম বহু স্বাতন্ত্র্য কালে নিশ্চিহ্ন হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের এই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হ'তে পারে যদি সম্মিলিত বৃহত্তর জীবন তারা চায়। যারা জ্ঞান-ও-কল্যাণ-অন্বেষী তারা কেবল সত্য ও কল্যাণই প্রচার করতে পারে, আর কিছু নয়, অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো দুর্ব্বলতার সঙ্গে আপোষ কর্‌লে চলবে না। যা সত্য, মানুষ তা গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য তা যত দেরীতেই হোক। আরজ ইতি*

ঢাকা — ভবদীয়

৫/৩/৩৭ — আবদুল ওদুদ

(বুলবুল—ভাদ্র, ১৩৪৪)

*মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবকে লিখিত। পত্রখানি "হিন্দু-মুসলিম" সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনার জের। — 'বুলবুল'—সম্পাদক।

"ধর্ম্ম সম্পর্কে দু'একটী কথা"

(উত্তর)

(হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, ধর্ম্ম, প্রত্যয়, জ্ঞান, ইসলাম, হজরত।)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

সুহৃদ্বরেষু

আপনার পত্র ...

আমাদের পত্রালোচনা যে ব্যাপার নিয়ে শুরু হয়েছিল, তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হিন্দু ও মুসলিম সমাজের অন্তর্গত লোকরা — সাধারণ লোকরা দু'টি বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে থেকেও ধর্মের ভিত্তিতে মিলতে পারে — এই ছিল আপনার বক্তব্য। আমার মত : ধর্মের ভিত্তিতে এরা মিল্‌তে পারে না, পারে ধর্ম্মবহির্ভূত অন্য কোনো নীতি বা সত্যের ক্ষেত্রে, কেননা ইসলাম ও হিন্দুত্বের মর্ম্মরূপ পরস্পরের বিরুদ্ধ; — এরা মিল্‌লে হিন্দুত্বের হয়তো ক্ষতি নেই, বরং রাষ্ট্রনৈতিক লাভ আছে, কিন্তু ইসলামের বিষম ক্ষতি; এবং আমার মতে তাত্ত্বিক মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে বিজ্ঞানবাদ-পরিকল্পিত নবীন মানবতার দিকে মানুষ যে এগুচ্ছে, তাতে সেটি হবে অনেকখানি ব্যাহত। এটি মোটের উপর মানুষের জন্যে অকল্যাণ।

এই আলোচনায় আপনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইসলাম ও হিন্দুত্বের 'ঐক্য' — জড়প্রতিমা থেকে তত্ত্ব-'প্রতীকের' অভিন্নতা এবং এই 'ঐক্যের' ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমের মিলন-সম্ভাবনা। আমি ইসলাম ও হিন্দুত্বের 'ঐক্য' স্বীকার করিনে — অর্থাৎ ধর্ম্মবাদ হিসেবে সকল ধর্মের ভিতরে যে-অবাঞ্ছনীয় অন্ধতা জড়তা গতানুগতি প্রভৃতি মোটামুটি বেশ দেখ্‌বার মতো, তাদের ছেড়ে। আরো, ইসলাম ও হিন্দুত্বের মধ্যে যে—'ঐক্য' আপনার চোখে অত্যন্ত অসাধারণ মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছে, সেটি যদি সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণ, তাহ'লে হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ এতোদিনে চুকে যাওয়া উচিত হ'তো এবং বাইরে থেকে যতোই তাকে জাগিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা হোক সেটি ব্যর্থ হতোই হ'তো; কেননা যেটি খুবই সহজ তাকে মেরে ফেল্‌বার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয় না; বরং দেখা যায় ঃ নানা আবরণ ও আচ্ছাদন-প্রয়াসকে ভেদ ক'রে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় মানুষের মতিগতিতে, তার আচরণে। বিভিন্ন ধর্ম্মবাদীরা — বিশেষ ক'রে পৌত্তলিক ও নিরাকার-ব্রহ্মবাদীরা যে চিরদিন পরস্পরের প্রতি বিমুখ হ'য়ে রইলো, এর সত্যিই কি কোন মানে নেই, কারণ নেই? আপনার নির্দ্দেশিত (তথাকথিত) ঐক্য নতুন আবিষ্কার কিছু নয়, কেননা ওই ক্ষীণ ঐক্যের ভিত্তিতে ইসলাম ও হিন্দুত্বের মিলন-চেষ্টা সমন্বয়-চেষ্টা আমাদের দেশে বহুবার হয়েছে। সে-সব কেন বিফল হলো?

কিন্তু এ-সব কথা থা'ক। আমি আপনার দৃষ্টি ও মনকে অনুসরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। তাতে এই বিশ্বাস আমার জন্মেছে যে যা-কিছু ছিল, আছে এবং থাকতে পারে তাদের সবগুলোর ভেতরেই একটা ছন্দ একটা সার্থকতা আবিষ্কার ক'রে আপনি আনন্দ পান; এবং সে-আনন্দ যেন আপনার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। অর্থাৎ আমার যেন মনে হয় ঃ আপনি যতোখানি আদর্শবাদী তার চাইতে একটু বেশী স্বভাব-কবি, যতোখানি কল্যাণ-জিজ্ঞাসু তার চাইতে কিছু বেশী ছন্দদর্শী, যতোখানি বিজ্ঞানপন্থী তার চাইতে একটু বেশী দার্শনিক বা দর্শনবাদী — যে-দর্শন মানুষের গতি ও দুর্গতিকে মিশিয়ে তার চলার সকল ভঙ্গিমাকে নির্লিপ্ত দৃষ্টির সুষমায় মণ্ডিত ক'রে দেখে এবং তার উপর সুন্দর অর্থ আরোপ করে, কিন্তু তাকে পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টার দিকে হয়তো খানিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে তাকায়। আমার আক্ষেপ এই যে, আপনার মনে

অতীতপ্রীতির অভাব আমি তীব্রভাবে অনুভব করতে পেলুম না। ধর্ম্মবাদকে নিঃসঙ্কোচে পরিত্যাগ করতে আপনার এখনো আপত্তি আছে বোঝা গেলো। হয়তো এইজন্যেই অনেক জিনিষ বা ব্যাপারকে আপনি এমন ভঙ্গিতে দেখ্‌ছেন, যে-ভাবে অন্যেরা সাধারণতঃ দেখে না। মানি . অতীতের সমর্থনে, এবং মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারে মমতা ক'রে যাকে পুয়ে রাখে তার ব্যাখ্যায়, কথা মানুষের আজো ফুরোয়নি; ফুরোবে না এখনো অনেক দিন। এতে দুঃখ বা নিরাশা নেই; নিন্দাও এজন্যে নয়। বুঝলুম . বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিকে ঝাপসা করতে পশ্চাৎমুখিতার কুয়াশা এখনো প্রীতিগভীর আত্মীয়তায় সুরক্ষিত।

লেখনীর আঘাত একে ছিন্ন করতে আজো অক্ষম। সুতরাং আমাদের আলোচনা শুধু পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টামাত্র। বর্তমান অবস্থায় এটুকুও হয়তো আমাদের পক্ষে বেদরকারী নয়। এই জন্যে আমার বক্তব্য আপনাকে জানাচ্ছি।

ধর্ম্মবাদ এবং নির্ম্মুক্ত জ্ঞান-ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে একটা যোগসূত্র আপনি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। এতে আমার আপত্তি নেই। শুধু দেখ্‌বার এই যে ধর্ম্ম ও মুক্ত জ্ঞান বিনিময়যোগ্য জিনিষ নয়, এবং জ্ঞানের বাইরেকার অনেক পদার্থ-অপদার্থ ওর সঙ্গে (আমি বলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে) জড়িয়ে আছে। তাদেরে ছেড়ে ধর্ম্ম চলবে না, যেমন চলেনি কোনো ধর্ম্মপ্রবর্তক বা ধর্ম্মপ্রচারকের জীবনে। ধর্ম্মকে যদি আপনি প্রত্যয়ীভূত জ্ঞান বলেন, প্রত্যয়কে কি বল্‌বেন? ধার্ম্মিকের প্রত্যয়, অন্ততঃ তার সবটুকু নিশ্চয়ই বিচারবুদ্ধিসাপেক্ষ নয়; সুতরাং তাঁর জ্ঞান বা জানার ব্যাপার এবং বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞান এক শ্রেণীর জিনিষ নয়। আমি এর আগে বলেছি যে, কোনো মহাপুরুষ দূরে থাকুন, কোনো তথ্যে বা সত্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণও বিজ্ঞানবাদীর ধর্ম্ম নয়। ঐ ধরণের আত্মসমর্পণে যদি শক্তি থাকে, সেটি সুস্থ চেতনাবান মানুষের জন্যে কাম্য নাও হতে পারে। ওতে অন্ধতা ও গতিহীনতার বীজ লুকিয়ে থাকা সম্ভব এবং প্রায় সবখানে থাকেও। ওতে আপনার কেন আপত্তি হবে না বোঝা শক্ত; আমার মনে হয়, নিছক বিজ্ঞানবাদীর আপত্তি অন্ততঃ কিছুটা থাকা সম্ভব। ধর্ম্মকে যদি আপনি সর্ব্বসাধারণের ক'রে দেখ্‌তে না চান, জনকয়েকের ব্যাপার নিয়ে মোটের উপর মানুষের লাভালাভের খতিয়ানে জমার ঘরে কতটুকু আমরা পাবো? হজরতের অপৌরুষেয় মহিমা থেকে বিমুক্ত হ'য়ে তাঁর চারিত্রিক শক্তি মানুষের আশ্রয় হয়েছে, তাকে চালিয়েছে, তাকে বাড়িয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে এ-সাক্ষ্য আমি বিশেষভাবে পাইনে; কেননা তাঁর অলৌকিক শক্তি কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যে বিশ্বাস তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের কাছেও প্রয়োজনীয় ছিল।

এ বলিনে যে, হজরত মোহাম্মদের চারিত্রিক উৎকর্ষ তাঁর কোনো কাজে লাগে নি। কিন্তু এই ব্যাপারে উৎকর্ষ এতো দূর থেকেও বিজ্ঞানবাদের ভক্তদের কাছে যতোটুকু মূল্যবান ঠেকে, তাঁর সমকালীয়দের কাছে ঠিক ততোটুকু মনে হয়েছিল, এটি নিতান্তই নিঃসন্দেহ নয়। ছোটো বেলা থেকে হজরতের বড়ো বিশেষত্ব ছিল তাঁর বিশ্বস্ততা, যার জন্যে তিনি আবাল্য আল্-আমীন নাম পেয়েছিলেন। এই বিশ্বস্ততার দাম লোকেরা দিত; কিন্তু ওর শক্তিতে ভরসা ক'রে যখন তিনি স্বগোষ্ঠিকে তাঁর প্রাপ্ত সত্যে আহ্বান করেছিলেন, তার ফল কি ফলেছিল আপনি জানেন। অথচ মানুষের চরিত্রকে অধ্যয়ন করবার সুযোগ নিকট জনেরই তো বেশী।

হজরতের বা অন্য ধার্ম্মিকদের আত্মসমর্পণের দাস-ভাব বিজ্ঞানবাদীর বিশেষভাবে কাম্য, মনে করা কঠিন। তার শক্তির উৎস অন্যত্র — হয়তো এর কাছেই, কিন্তু ঠিক এখানে নয়। কেননা যে-অন্ধতা ও গতিহীনতাকে এড়িয়ে না চললে বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞানবাদই হ'তে পারে না, তাদের জন্ম ও অধিবাস এইখানে। কল্যাণ-জিজ্ঞাসু যে সচেতন, সে যে জ্ঞান অন্বেষণ করছে এবং জিজ্ঞাসার পথে চলতে চলতে মানব-মঙ্গলের এক একটা পরিকল্পনা পরীক্ষা এবং ব্যবহারের জন্যে পেয়ে যাচ্ছে -- এ-ও তো কম জিনিস নয়। এখানে ফুল-ষ্টপ্ নেই ব'লেই যে ভরসাও কম, এ আমি জানিনে। অন্যদিকে দেখি : আত্মসমর্পণে আমাদের চলার পথে যে পূর্ণচ্ছেদ এক রকম অবশ্যম্ভাবী, সেটি সহজেই "মানুষের চিত্তের বন্ধনের কারণ" হ'তে পারে এবং সাধারণতঃ হয়ও। প্রাচীনদের মধ্যে যদি কেউ "সদাজাগ্রতচিত্ত" থেকে থাকেন, হয়তো বিজ্ঞানবাদের দিকে তাঁর প্রবণতা তাঁর ধর্ম্মার্ত্ততাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। তাঁর আদর্শ অংশতঃ বিজ্ঞানবাদীর হ'লে ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাঁর ধর্ম্মার্ত্ত জীবনের বৈশিষ্টের কাছে বিজ্ঞানবাদী মাথা নোয়াতে পারে না। কেননা এতে প্রত্যয়ের বিপদ অতিমাত্রায় জোরালো হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপদকে স্বীকার করতে জ্ঞানপন্থীর বাধবেই বাধবে।

প্রেমধর্ম্মের প্রশস্তি আপনার কাছে অনেকবার শুনলুম। কিন্তু, প্রথমতঃ এ-জিনিসটী শুধু ধর্ম্মের থেকেই উদ্ভূত হ'তে পারে, এ-কথা নিঃসন্দেহ নয়। দ্বিতীয়ত, সত্যিই এ-ব্যাপারটী কি? মানুষে মানুষে আত্মীয়তা-বোধ যদি হয়, সেটি নিশ্চয়ই সকলের কাম্য এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষের তা থাকবেই। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মপন্থীদের মানবপ্রেম বিশ্লেষণ করলে যে-সব জিনিস দেখতে পাই, তাদের সবগুলি বিজ্ঞানবাদীর চোখে শ্রদ্ধেয় জোর ক'রে বলা চলে না। প্রেম ধর্ম্মে একপক্ষে superiority complex বেশ দেখবার মতো; প্রেমিক মানুষকে দয়া করেন। তাঁর করুণা প্রকাশিত হয় প্রেমের রূপ ধ'রে। এই কারুণিক প্রেম কতোদূর এগুতে পারে? একজন মানুষ কেন আর একজনের করুণার পাত্র হ'য়ে থাকবে? হজরতের প্রেম ধর্ম্মকে বিজ্ঞানবাদীর প্রশংসা অকারণ না হ'তে পারে, কিন্তু ঐ প্রেমের রূপ রীতি ও প্রকাশভঙ্গি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা আধুনিকপন্থীর চোখে আদর্শস্থানীয় প্রতীয়মান না হ'লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকে না। এ-ও দেখতে হবে যে, হজরতের প্রেম অলৌকিক শক্তির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, ওকে জয়ী করবার মূলে এ-ধারণার যথেষ্ট হাত ছিল।

আপনি moral truth কে বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে চান। বিজ্ঞানবাদী যদি এতে রাজী না হন, আমাদের বলবার কি থাকতে পারে? "ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে সমাজে" যে সব সত্য নিয়ে কাজ-কারবার তারা কেন পরীক্ষার বিষয় হবে না? যুগে যুগে নতুন ক'রে তাদের বিচার করতে বিজ্ঞানবাদীর কেন অধিকার নেই? এবং এক্ষেত্রে গুরু কেন জিজ্ঞাসালব্ধ সত্যের চাইতে বড়ো? — অন্ততঃ বিজ্ঞানবাদীর কাছে? আমার মনে হয় : হজরতকে আস্তিক নাস্তিক সকলের কাছে চিরদিন দামী ক'রে রাখবার ইচ্ছা অসাধু না হ'লেও সেটি বিশেষভাবে ধর্ম্ম বাদীর যোগ্য, জ্ঞানপন্থীর পক্ষে স্বাভাবিক ও সনাতন না-ও হ'তে পারে। হজরতের জীবনের বিভিন্নমুখী প্রকাশকে আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন? যিনি তাঁকে সর্ব্বদা অলৌকিক শক্তির বাহন রূপে দেখবেন, তাঁর কাছে তাঁর সব কিছুই মহান তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ চিরমান্য চির-অনুসরণীয়, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য চির-বরণীয়। কিন্তু জ্ঞানপন্থীর কাছে তাঁর মানবপ্রেম ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপন-প্রণালী পরীক্ষার বিষয়, তাদের বিশ্লেষণ ক'রে কি কি তত্ত্ব ও তথ্য মেলে দেখবার বিষয়। হজরতকে যদি শুধু একজন মহাব্যক্তি হিসেবে দেখতে চান তাঁর "জীবন বৃক্ষের ফল" যে "শাস্ত্র" সেটি মানুষের আলোচ্য হ'তে বাধা। সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর পরীক্ষামূলক দৃষ্টিও সেখানে অচল নয়। যদি তাঁকে মাত্র রসুল হিসেবে নিতে চান, তিনি হবেন অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর চাইতে তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যের উৎসই হবে বড়ো, কেননা তাঁর সেই বিশেষ জন্ম বা জীবন সেই উৎস থেকেই আবির্ভূত।

হজরতকে বুঝলে কোর-আন বুঝবার সহায়তা হয়, একথা বললে তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, কোর আনের চাইতে হজরত বড়ো? অর্থাৎ গ্রন্থের চাইতে ব্যাখ্যা বড়ো? ব্যাখ্যার যদি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা থাকেও তথাপি তার মূলীভূত কারণ মূল গ্রন্থেরই মর্য্যাদা। কোনো গ্রন্থধারী ধার্ম্মিক মহাপুরুষের চিরপথিক রূপ যদি দেখতে চান, গ্রন্থের দিকে আপনাকে তাকাতে হবে, কেননা তাঁর চলার ভঙ্গি নির্দ্দেশ করেছে গ্রন্থ তাঁর গতির দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়েছে প্রধানতঃ গ্রন্থ। কতো কতো মানুষ সংসারে এলো গেলো যারা চরিত্রবলে মানবপ্রেমে হয়তো অনেক অনেক মহাপুরুষের সমশ্রেণীতে দাঁড়াইতে পারে। হয়তো আজো আপনার আশে পাশে তেমন লোক পাবেন। কিন্তু তারা ধার্ম্মিক সাধারণের চোখে বেশী বড়ো হয় না, কেননা তাদের কাছে একটী জিনিস নেই — যেটী গ্রন্থের দান।

"মোহাম্মদুর-রসুলুল্লা" তত্ত্বের ব্যাখ্যা বলতে আপনি যা বুঝতে চেয়েছেন সেটি আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয় না। কোর্-আনিক ইসলাম মানুষকে যা দিতে চেয়েছিল তা যদি সে না নিয়ে থাকে, সেজন্যে দায়ী কে? হজরত নিজের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের বলে তাঁর সমকালীয় শিষ্যদের মনে আপনার জন্যে যে-স্থান রচনা করেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, তাকে বরণীয় করেছিল তাঁর প্রতি আরোপিত অলৌকিক কর্ত্তৃত্বের অধিকার। হজরতের জীবনের একটী ক্ষুদ্র ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর প্রচারক-জীবনের প্রথম ভাগে নিজের সত্যপ্রিয়তা ও বিশ্বস্ততার শক্তিকে অবলম্বন ক'রে স্বগোষ্ঠিকে তাঁর প্রাপ্ত-সত্যে আহ্বান কিভাবে বিফল হয়েছিল, আমাদের স্মরণ আছে। এর বহুদিন পরে বিবি ফাতেমার কাছে তাঁর পিতৃ-পত্নীরা একটি ব্যাপার নিয়ে অনুযোগ করেন। বিবি ফাতেমা হজরতকে সেই অনুযোগের কথা জানালে তিনি উত্তরে

দিয়েছিলেন : আল্লার রসুলের যা পছন্দ, তোমার পছন্দ কি তা নয়, ফাতেমা? এখানে হজরত যে জিনিসটির উপর নির্ভর করছেন সে তো তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র-শক্তি নয়, বরং তাঁর অলৌকিক কর্ত্তৃত্বের অধিকার।

আমার ধারণা : "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা" তত্ত্ব থেকে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লা" তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করলে শেষেরটীর কোনো প্রবল অর্থ থাকে না, কেননা মোহাম্মদ মানব-সমাজের মুক্তিসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন অপৌরুষেয় প্রেরণা লাভ ক'রে — আল্লার রসুলরূপে এবং সে-আল্লা এক, তিনি ভিন্ন আর-কেউ মানুষের উপাস্য নন। হজরত দু'একখানি সন্ধিপত্রে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লা" — শব্দ দু'টি ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তাঁর রসুল রূপ ক্ষণকালের জন্যেও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার অর্থ বরং এই যে, যারা তাঁকে রসুল স্বীকার করছে না, তাঁর অলৌকিক প্রেরণায় বিশ্বাস যাদের নেই, তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে হ'লে দেহতঃ মনতঃ কোনো প্রকারে জবরদস্তির ভাব দেখানো কতোখানি অসম্ভব ও অসঙ্গত, সে-বোধ তাঁর ছিল।

ধার্ম্মিকের কাছে ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস বিনিময়যোগ্য শব্দ না-ও হ'তে পারে। ওহাবী মতবাদকে আমরা যতোই প্রতিক্রিয়াশীল মনে করি না কেন, এ কালের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেই মতবাদই তাদেরে শক্তি জুগিয়েছে — তা সে যতোই পরোক্ষভাবে হোক। অন্ধ গুরুভক্তি ইসলামের ইতিহাসে যা সৃষ্টি করেছে তাতে ইসলাম মোটের উপর শক্তিমান হয়েছে, এ বিশ্বাস আজ অনেকেরই নয়।

আপনি, যে ভাবেই হোক, যদি ধর্ম্ম-বিসর্জ্জনে আপত্তি না করেন, ওহাবী মতবাদের এক পরিণতি তাই হ'লে ক্ষতি কি? এবং ওর প্রতি আপনার কেন বিরাগ? আপনার বক্তব্য যতোটুকু আমি বুঝতে পারছি তাতে মনে হয় : ধর্ম্মকে ছাড়তে অসম্মত না হ'য়েও তার কোনো কোনো উপসর্গকে আপনি অক্ষুণ্ণ দেখতে চান এবং তাদেরে ধর্ম্ম নাম দিলেও আপনি সন্তুষ্ট। আমার ধারণা : এ-রকম মনোভাব অত্যন্ত আপোষমূলক এবং অতিনিরীহ স্বাচ্ছন্দ্য ও মৃদুতার পরিচায়ক। প্রগতিবিরোধী 'আত্ম সমর্পণ' আপনার চোখে এতোই প্রয়োজনীয় যে, ওকে বিসর্জ্জন দিলে "মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। আপনি ভাবছেন। আবার, "ধর্ম্মের প্রতীক-চর্চ্চাও" আপনাকে বেশ "আনন্দ দেয়" যদিও এটি সহজেই মানুষের বন্ধনের কারণ হতে পারে। অর্থাৎ ধর্ম্মকে আপনি মোটামুটী কাম্য মনে করেন শুধু ওর সঙ্গে সঙ্গে চান জ্ঞান-পথে কোর্-আনিক মতবাদের বিবর্ত্তন। কিন্তু কোর্-আন যে সত্যিসত্যিই অতোখানি চলৎশক্তিসম্পন্ন এটি শুধু মুতাজিলদের আবির্ভাব দ্বারা সপ্রমাণ হয়, বিশ্বাস করা কঠিন। আমার বল্‌বার এই যে, মুতাজিলাবাদ ইসলামের স্বাভাবিক পরিণতি এ-বিশ্বাস ইসলামপন্থীর নয়; সুতরাং ওকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদের বিদ্রোহ (হয়তো মৃদু বিদ্রোহ) বলাই সঙ্গত। কোনো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ইতিহাসে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভ্যুত্থানকে যে-স্থান দেওয়া যেতে পারে, ইসলামের ইতিহাসে মুতাজিলাবাদেরও সেই আসন প্রাপ্য, তার চাইতে এক তিলও বেশী নয়। এইজন্যে আপনি যে প্রাণপণে বিশ্বাস করছেন revelation এর পরিণতি rationalism এ হ'তে পারে, এটি আমার কাছে আদতেই নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। Revelation কে inspiration ব'ললে যে-তর্ক উঠতে পারে তার মীমাংসা মুসলিমরা করেছে 'ওহি' ও 'এলহাম্'কে আলাদা আলাদা আসন দিয়ে। অর্থাৎ আপনার ঈপ্সিত পথ মুসলিম সমাজ-মনের নিয়ামকরা স্বীকার করবেন কোনোদিন, আশা হয় না। জানি কোর্-আনে "বিচার ও কাণ্ডজ্ঞানের মাহাত্ম্য" "কীর্ত্তিত হয়েছে।" কিন্তু ঐরূপ দু'চারিটী উক্তি তার অন্য সমস্ত অংশকে গ্রাস করুক, এরূপ অভিপ্রায় কোর্-আনের বক্তার উপর আরোপ করা সঙ্গত কি? ধরুন কোর-আনের একটি উক্তি : ওদয়ু এলা সবিলে রব্বেকা বিল্ হিক্‌মতে (স্রষ্টার পথে মানুষকে আমন্ত্রণ দাও জ্ঞানের সাহায্যে)। এর অর্থ আপনার মনে যে-রূপ নিতে পারে মুসলিম তাকে গ্রহণ করবে না। সে বল্‌বে : স্রষ্টার পথ কোর্-আনে সুনির্দ্দিষ্ট, তার দিকে মানুষকে ডাক্‌তে হবে — চোখ রাঙিয়ে নয়, যুক্তি দ্বারা, অর্থাৎ যুক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে ইসলামের ব্যবস্থা ও বিধানের সমর্থনে। আপনি হয়তো বল্‌বেন : জ্ঞানই নির্দ্দেশ করবে স্রষ্টার অভিপ্রেত পথ, সেইখানে হোক মানুষের শুভাগমন। ইসলামের সরকারী ব্যাখ্যাতারা একে ইসলাম মানতে রাজী হবেন, মনে কর্‌বার কোনো কারণ দেখা যায় না। তাহ'লে প্রত্যাদিষ্ট ইসলাম যে আপনার আকাঙ্ক্ষিত rationalismএ রূপান্তরিত হবে, কেমন করে বুঝবো বলুন?

ইসলামের 'ইতিহাসের' প্রতি আপনার প্রবল অনুরক্তির দু'টী কারণ আমার মনে হয়। প্রথমতঃ revelation rationalism এ রূপান্তরিত হোক, আপনার এই কামনা পূর্ণ হ'তে পারে কোর্-আনের কোনো কোনো উক্তি থেকে অত্যন্ত বেপরোয়া ও বৈপ্লবিক deduction-এর সাহায্যে; এবং ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আপনি মুখ্যতঃ যে-ব্যাপারটীর দিকে ইঙ্গিত করছেন, মনে হয়, সে এই জিনিস অর্থাৎ deduction সময় সময় একেবারে বেপরোয়া deduction (যেমন কোর্-আনের সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের দিকে একজন খ্যাতনামা ইমামের দেওয়া তালাক-বায়েনের ফৎওয়া)। ওহাবীরা এই ধরণের deduction মানতে চান না ব'লেই হয়তো আপনি ওদের মতবাদকে বলছেন reaction কিন্তু আপনি যেন ভুলে যাচ্ছেন এই ধরণের deduction এর গতি ধর্ম্মের পরিধি অতিক্রম করতে চায়নি ব'লে ধার্ম্মিকদের দ্বারাই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাহত এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্জ্জিত হয়েছে (যেমন, কোনো কোনো ইমামের ফৎওয়া)। এ অবস্থায় ওহাবী-মতবাদ খুবই স্বাভাবিক। আপনি হয়তো বল্‌বেন : deduction এর দিকে প্রবণতা অবাধ গতিতে চলে যেতে পারতো। আমার কিন্তু মনে হয় পারতো না। কেননা ধর্ম্মের বন্ধনীতে deduction এর টান খুব-বেশী সইবার কথা নয়; এবং ওকে ছিন্ন করাও ধর্ম্মবাদীর ইচ্ছা নয়। সুতরাং ঐ বন্ধনীর সূত্রকে ছিঁড়তে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হওয়ার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই ইসলামের জীবনে ফলতে বাধ্য হয়েছে : deduction এর ইচ্ছাশক্তি গিয়েছে হটে এবং ধর্ম্মের বন্ধনী এসে দাঁড়িয়েছে তার আগের যায়গায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ওহাবী মতবাদকে আমরা আর যা-ই বলি ওকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া না বলে উপায় নেই।

ইসলামের ইতিহাসের দিকে আপনার স্থির দৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ আমার এই মনে হয় — (এবং আশা করি এই কারণটার উল্লেখ ক'রে আপনার উপর অবিচার করছি না) — যে, ইসলামের পরিধি যে-গতিতে প্রসারিত হচ্ছিল এবং এর বুকে যেভাবে জ্ঞানের সমর্থনে বিদ্রোহ জেগে উঠছিল তার ধারা অপ্রতিহত থাকলে মুসলিম (জ্ঞানপন্থী হোক বা না হোক) অন্ততঃ হিন্দুর মতো উর্দ্ধ আকাশ থেকে নেমে পায়ের তলায় মাটীর স্পর্শ খানিক পেতে পারতো, এবং তাহলে — একদিকে, তার হিন্দুর সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা ছিল; অন্যদিকে অলৌকিক-জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়ায় তাকে মুক্তির দিকে আহ্বান করলে সেটি একেবারে ব্যর্থ না-ও হ'তে পারতো।

বিধর্ম্মীর প্রতি আদিম মুসলিমদের অসহিষ্ণুতার যে-কারণ আপনি নির্দ্দেশ করেছেন, সেটি এযুগেও উল্লিখিত হ'তে পারে। অন্ততঃ মুসলিমদের তাই ধারণা। মিসরে মুসলিমরা বিধর্ম্মীর প্রতি পরম সদ্ব্যবহার করে, তাদের সঙ্গে প্রতিবেশ-সম্পর্ক রক্ষার জন্যে প্রচুর উদারতার পরিচয় দেয়। খুব সম্ভব ভারতেও এর থেকে বেশী রকম আলাদা ব্যাপার কিছু ঘটতো না, যদি মুসলিমরা সংখ্যা শক্তি ও শালীনতার দিক দিয়ে এ-যুগে ভারতীয় জনসমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ হ'তে পারতো, বিধর্ম্মীরা একদা শাসক সমাজের প্রতি অল্পতর প্রতিশোধমূলক ব্যবহার করতো এবং বিঘ্নকণ্টকিত পথে এদের আত্মপ্রকাশ চেষ্টাকে নিহত, অন্ততঃ বাধাগ্রস্ত, করবার জন্যে রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃশ্যতঃ—উদারনীতির অন্তরালে বস্তুতঃ কূটনীতির আশ্রয় না নিতো। এই জন্যে আমিও যে আপনার সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসকে মোটামুটী ব্যর্থতার ইতিহাস বলতে ইচ্ছুক তার কারণ আপনার থেকে একটু আলাদা। আমি যে-কারণ এই ব্যর্থতার দেখতে পাই সেটি এই যে, কোর্-আনিক ইসলাম মানুষকে জ্ঞানপন্থার দিকে যতোটুকু এগিয়ে দিতে চেয়েছিল আসলে সে ততটা এগুতে পারেনি — নিজেরই শক্তির অভাবে, কেননা পারিপার্শ্বিক paganism এর আবহাওয়ার আওতায় ইসলামকে প্রধানতঃ হজরতের ব্যাখ্যাত ও আচরিত রূপে গ্রহণ করবার মতো নিষ্কৃতি ও বিবৃদ্ধি অর্জ্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

মানবপ্রেম ও মতবাদের হানাহানিকে আপনি কেন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র পরস্পরের-বিরুদ্ধ মনে করলেন? সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণের কোনো বিশেষ রূপ যদি (সাময়িক ভাবেও) আপনার মনের পটে গভীর রেখাঙ্কে চিত্রিত হয়, তাকে মুছে ফেলতে যে-হস্ত উদ্যত তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন স্বীকার যদি না-ও করি, তাকে অন্ততঃ প্রতিহত করবার সার্থকতা না মেনে উপায় কি? এবং একে একভাবের মানব প্রেম বললে কি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলা হয়? মানুষকে ভালোবাসুন, কিন্তু তার বিহিত ও আচরিত অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কেন প্রয়োজন নয়?

আপনার কোনো অ-সাধারণ মন্তব্য মিথ্যে বলতে আমার স্বতঃই বাধে। কিন্তু এটুকু হয়তো বলতে হবে যে, যেখানে

সর্ব্বসাধারণকে নিয়ে প্রধানতঃ কারবার, সেখানে অ-সাধারণ মিথ্যের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা এ দু'য়ের ফলের পার্থক্য সবসময় সকলের অনুভবযোগ্য নয়। প্রতীক-চর্চ্চায় তীব্রতা আপনার পসন্দসই না হ'লেও মোটের উপর ও ব্যাপার আপনাকে "আনন্দ দেয়।" তা দি'ক এ নিয়ে আমাদের তর্ক প্রবল না হ'লেও চল্‌বে। কিন্তু হজরত নবীর সঙ্গে প্রতিমাপূজাবিরোধী মুসলিমের যে-পার্থক্য খুব বড়ো হ'য়ে আপনার চোখে দেখা দিচ্ছে, আমার কাছে সেটি অতো স্পষ্ট নয়। হজরত দু'একখানি সন্ধিপত্রে ডিপ্লোম্যাসির প্রয়োজনে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লা" কথা দুটি বাদ দিতে রাজী হয়েছিলেন এবং স্বভাবতঃই শত্রুর সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেছিলেন। এ-কালেও যদি দু'একজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কথা মন থেকে মুছে ফেলি মোটের উপর কি বলা চলেঃ মুসলিম শত্রুর সঙ্গে মৃদু ব্যবহার করতে একেবারেই নারাজ? হজরত যখন শক্তিতে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছিলেন, প্রতিমাপূজককে আঘাত কি কখনো করেননি? এবং প্রতিমাপূজকদের জন্য কেঁদেও কি তাদের প্রতিমাপূজার সমস্ত আয়োজন মাটিতে মিশিয়ে দেবার আদেশ দেন নি? সন্ধি তিনি অনেকবার ক'রে ছিলেন, কিন্তু স্বকীয় মতবাদকে অক্ষুণ্ণ রেখে। একালের মুসলিমও সন্ধিতে নারাজ মনে হয় না, কিন্তু সে paganism এর হাতে ইসলামকে ছেড়ে না দিয়ে। মুসলিমের মধ্যে জীবপ্রেম মানবপ্রেম নেই, একথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়, অংশতঃ সত্যি হ'তে পারে। কিন্তু মানবপ্রেমের আংশিক অভাব মানবপ্রেমীকদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। হজরতের মানবপ্রেম যদি তাঁর মতবাদকে ছাপিয়ে উঠেছিল, তিনি তবেই প্রতি শত্রুতা প্রশমনের জন্যে মানুষকে হত্যা করতে কেন সঙ্গীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন? শত্রুকে পর্য্যুদস্ত ক'রে, তার পূজার প্রতিমাকে ধূলিসাৎ করে, তার সনাতন সন্তোষকে বহ্নিশিখায় অর্পণ ক'রে তার জন্যে অশ্রুবর্ষণ কোনো বিশিষ্ট মমতাবান হৃদয়ের কাছ থেকে আশা করলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু একটা গোটা সমাজ বা সম্প্রদায়ের কাছে থেকে এ আশা নিতান্তই অমূলক, বস্তুতঃ এর দেখা মেলে না। দুর্গত শত্রুর (আত্মীয়-স্বজনের ভেতর থেকে উদ্ভূত শত্রুর) জন্যে হজরতের অশ্রুবর্ষণ, কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়নিধন-সম্ভাবনায় "মমতামুগ্ধ" অর্জ্জুনের অস্ত্রত্যাগ প্রভৃতি অসাধারণ ঘটনাকে আপনি সাধারণের ক'রে দেখতে চান; এর কারণ আমার এই মনে হয় যে, সামান্য ও অসামান্যের যে-প্রভেদ এবং সাধারণের পক্ষে এদের গ্রহণ-সম্ভাবনার বিচারে যে পার্থক্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে দেখা মানুষের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আপনার চোখে সেটা উপেক্ষণীয়।

হিন্দু মুসলিমের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হ'তে পারে যদি বিশ্বাস করেন, আমার তাতে আপত্তির কি-কারণ থাকতে পারে? আমার বিশ্বাস ঃ কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না (এবং যদি হয় মানুষ মোটের উপর ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। ইহুদী খ্রিশ্চান ও ইসলাম মূলত ঃ সমজাতীয় ধর্ম্ম হ'য়েও যদি এতোদিনেও মিশে গিয়ে না থাকে, ইসলাম ও হিন্দুত্ব কখনো মিলবে না, যেমন মেলে না religion ও paganism মিলতে পারে যদি religion এর খানিক অধোগতি হয় paganism এর দিকে এবং paganism খানিক এগিয়ে যায় religion-এর দিকে। কিন্তু আমার ধারণা ঃ এ হওয়া উচিত নয়, কেননা এতে মানুষ মোটের উপর লাভবান হবে না।

আপনি যে-মিলনসম্ভাবনাকে সত্যি মনে করেছেন, তা যদি আসলেই সত্যি হয়, তাকে আমরা যুগ যুগ অতিবাহনের পরও কেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম না? আপনি বলছেন : "সত্যের নিজেরই একটা আকর্ষণের শক্তি আছে।" আপনার এ-উক্তিতে কিন্তু গুরুবাদের অর্থ ঢের কমে গেল। তথাপি এ-কথা আমি মানি; তবে ঠিক বুঝতে পারিনে হিন্দু-মুসলিমের মিলন-বাণী (সন্ধির আহ্বান নয়, মিলনের বাণী) কেন যাঁরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ নন তাঁদেরও বিশেষভাবে আকর্ষণ করলো না? আমি বিশ্বাস করিনে ঃ কখনো করবে বা করা উচিত। ইহুদী ও খ্রিশ্চান সমাজের যে মনোভাব আপনার চোখে প্রশংসনীয়, তা সম্ভব হয়েছে সেই পরিমাণে যে-পরিমাণে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মানুষঙ্গিক আচারের নাগপাশ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদের আওতায় তাদের ধর্ম্মীয়তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে খানিক মুশড়ে পড়েছে, যদিও আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে—উদাহরণতঃ বিধর্ম্মীদের, বিশেষতঃ paganদের সঙ্গে মুকাবিলায়—ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংহত হওয়ার শক্তি ও প্রবণতা, দুই-ই তাদের আছে। আমার মনে হয় ঃ ধর্ম্মকে তারা ও আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করছে না, কেননা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তাদের মধ্যে এখনও বেশ দেখবার মতো। একথা অবশ্যি মান্‌বো যে, সমস্ত ধর্ম্মের লোক যদি

ধর্ম্মকে কার্যাতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার ভাব্‌তে পারে ওকে বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রয়োজন ঢের কমে যাবে। কিন্তু সম্প্রদায়-গঠনে ধর্ম্মের যে-সনাতন শক্তি, তার কাছে মানুষ এখনো হার মানছে। এইজন্যে আমার বিশ্বাস ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে (সন্ধি সম্ভব হলেও) মিলন অসম্ভব। বস্তুতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐক্য-তত্ত্ব ধর্ম্মকে কখনো জিয়িয়ে রাখ্‌তে পারে না, এই কারণে যে-ঐক্যের সত্যে মানুষকে আপনার আহ্বান, যদিচ সে নিজস্ব শক্তি ছাড়াও বহু অসামান্য ব্যক্তির মনোবলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তথাপি হাজার হাজার বছরেও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি তার ভাগ্যে হলো না।

মোটের উপর আমার বিশ্বাস ঃ এ দেশের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে (সন্ধি নয়) ঐক্য কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং জ্ঞানপন্থী হয়েও ধর্ম্মের প্রতি আপনার আকর্ষণ কখনো মানব-মঙ্গলের প্রশস্ত পথ রচনা করবে না। আমার আরো বিশ্বাস ঃ এ যুগে মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব কোনো অতিধর্ম্মীয় পন্থা অবলম্বন করে—কোনো বাস্তবের প্রশস্ততর নীতির ক্ষেত্রে। বহু যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা নির্দ্দেশ করছে যে সে-ই এখন মানব-মুক্তির একমাত্র-মার্গ। আমাদের নতুন ভীতু চিন্তার মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে স্বীকার না করলে ব্যর্থতার বিড়ম্বনা হবে আমাদের অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট।

ভারতীয় মুসলমান

লীলাময় রায়

হিন্দুত্বের সঙ্গে ইস্‌লামের যে অমিল ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে তার চেয়ে কম নয়। তত্ত্বের দিক থেকে ইস্‌লাম যত দূরে ক্রিশ্চিয়ানিটিও তত দূরে। তবু খ্রীষ্টানের সঙ্গে হিন্দুর মনোমালিন্য নেই, মুসলমানের সঙ্গে আছে। এর কারণ কি?

এর কারণ খ্রীষ্টানের সঙ্গে যে মামলা সে কেবল তত্ত্বের মামলা, সে স্বত্বের মামলা নয়। হিন্দুর মতো খ্রীষ্টানও ভারতীয়, তার আচার সংস্কার বিশ্বাস ভিন্ন, কিন্তু ঐতিহ্য সংস্কৃতি জাতি অভিন্ন। বিশ বছর আগে একজন খ্রীষ্টান নেতাকে খ্রীষ্টানদের সভায় ঘোষণা করতে শুনেছিলুম, "আমার প্রত্যেক ইঞ্চি ভারতীয়।" ভারতের অতীতকে তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করতেন, কেবল তিনি কেন আরো অনেক খ্রীষ্টান নেতাও। তাঁরা সীতা সাবিত্রীকে তাঁদেরও বলে দাবী করেন, রামায়ণ মহাভারতকে তাঁদেরও বলে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে কেবল হিন্দুর, তাঁদেরও নয়, এ কথা কখনো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা মধুসূদন দত্ত উচ্চারণ করতেন না। বরং হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে যত লোক ইঙ্গবঙ্গ বা নকল ইংরাজ, দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তত নন। আমরাও ভাবতে পারিনে যে মধুসূদন দত্ত বা তরু দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা সরোজিনী নাইডুর চেয়ে কোনো অংশে কম স্বদেশী।

সকলে জানেন যে প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আধুনিক ইউরোপের ধর্ম্ম বিশ্বাস এক নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রোমের খ্রীষ্টানরা প্রাচীন রোমক মন্দির চূর্ণ করে তাই দিয়ে গির্জা বানাতো। আর প্রাচীন দেবদেবী মূর্ত্তিকে সয়তানের বলে ধ্বংস করত। অথচ তাদেরই বংশধর পরবর্ত্তী কালে গ্রীক রোমক পুঁথি আবিষ্কার করে নতুন প্রাণ পায়, তাকে বলে ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জ্জন্ম। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন রোমের সংস্কৃতি হয়েছে এখন ইউরোপের ক্লাসিক সংস্কৃতি। সেই ভিত্তিকে খ্রীষ্টান পুরোহিতরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ছেলের নাম জুলিয়াস কি মেয়ের নাম ডায়েনা হলে নামকরণের সময় আপত্তি ওঠে না। পোপরাও যত্ন করে প্লেটো প্লোটিনাস পড়েন ও প্রাচীন কীর্ত্তি সংগ্রহ করেন। প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের কি অনির্ব্বাণ ঔৎসুক্য! সামান্য একখানা ইট উদ্ধার হলেই তারা উদ্ধার হয়ে যায়। একটা আস্ত মহোঞ্জোদারো অনাবৃত হলে কি জানি হয়ত তাদের আরো একবার পুনর্জ্জন্ম ঘটত।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণকে পূর্ব্বপুরুষ বলে অস্বীকার করা দূরে থাক অধিকার করতেই ইউরোপীয়দের ব্যগ্রতা। মুসোলিনির ফাসিস্টরা রোমক গৌরবে আত্মহারা। জার্ম্মানদের আবার গ্রীস রোম ও প্যালেস্টাইনের প্রতি সমান বৈরাগ্য। ওদের একটা নিজস্ব শ্রুতি আছে, ভাগ্‌নারের অপেরায় যাব পুনরুজ্জীবন। খ্রীষ্টান বলে তারা কম জার্ম্মান নয়, বরং জার্ম্মান বলে তারা কম খ্রীষ্টান হতেও রাজি।

কাজেই ভারতের খ্রীষ্টানদের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিপ্রায় হিন্দুত্বের প্রতি টান নয়, সাধারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহ। কয়েক বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরের বিশপ প্রমুখ খ্রীষ্টান অগ্রণীরা "ভারতের উত্তরাধিকার" শীর্ষক গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন, তাতে ভারতের তত্ত্ব দর্শন সাহিত্য ভাস্কর্য্য চিত্র সঙ্গীত ইত্যাদি যাবতীয় বিশিষ্টতা কীর্ত্তিত হয়েছিল। রচনা খ্রীষ্টানদের। নির্ব্বাচনও তাদেরই। মিশনারীদের মতো নিন্দা করবার ও ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করবার জন্য নয়। ভারতীয় খৃষ্টান যে দেশকালবিহীন ভুঁইফোড় নয়, এইটে তাদের কাছে ও বিশ্বের কাছে প্রতিপন্ন করবার জন্য। ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বিদেশীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে বলে তাদের স্বদেশের শিক্ষা কেন ছাড়বে? আর বিদেশীর কাছে মাথা হেঁট কেন করবে?

খ্রীষ্টানদের এই মনোভাব থেকে মনে হয় তাদের হাতে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিরাপদ। হিন্দুরা যদি বিলুপ্ত হয় ও খ্রীষ্টানরা যদি বিদ্যমান থাকে তবে ভারতের আবহমান ধারা তাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হবে, তত্ত্বের বিরোধ সত্ত্বে। আমরা আধুনিক হিন্দুরাও তত্ত্বের সবটা মানিনে, মানি যত মানিনে ততোধিক। কিন্তু তত্ত্ব মানিনে বলে বিচ্ছেদ চাইনে। খ্রীষ্টানরা

সামাজিকভাবে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আমরা দুঃখিত। সমাজের মধ্যে থেকেও তারা খ্রীষ্টীয় মতে উপাসনা করতে পারত, তার জন্য আলাদা সমাজ গড়ার আবশ্যক ছিল না। গোঁড়া হিন্দুরা একদা শঙ্করাচার্যকেও একঘরে করেছিল। বরং খ্রীষ্টীয় উপাসনা হিন্দু সমাজের ভিতরে প্রবেশ করত এতদিনে। চীন দেশের খ্রীষ্টানরা বিচ্ছেদনীতি পরিহার করেছে, সামাজিকভাবে তারা অভিন্ন, তাই অনায়াসে চিয়াং কাই শেক রাজ্যশাসন করেন। চীন নেতাদের অনেকেই খ্রীষ্টান। অথচ খ্রীষ্টান সংখ্যা সে দেশে মুষ্টিমেয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের একজন খ্রীষ্টান একজন বৌদ্ধ একজন কনফিউসিয়ান, এই উদারতা অনুকরণযোগ্য। একদিন যে ভারতেও তা ব্যাপক হবে তার সন্দেহ নেই। এ দেশের কয়েকটি পরিবারে তা ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তা কেবল হিন্দু শিখ খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ও জৈনের মধ্যে। পার্সী ইহুদী ও মুসলমানরা এর থেকে দূরে সরে থাকতে ভালোবাসে।

তার কারণ পার্সী ইহুদী ও মুসলমানরা কেবল তত্ত্বে স্বতন্ত্র নয়। ইহুদী ও পার্সীরা জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র। কেবল জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র হলে কথা ছিল না, মুসলমানদের ধারণা তারা ইংরাজের মতো বিদেশী বিজেতা, ইংরাজের তুলনায় দীর্ঘদিন আছে বলে তাদের স্বত্ব তামাদি হবে এমন কোনো কথা নেই।

সুতরাং মুসলমানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঠিক খ্রীষ্টান বৌদ্ধ শিখের সমতুল্য নয়, পার্সী ইহুদী আর্মেনীয়ানের সমান নয়। মুসলমান তত্ত্বের সঙ্গে হিন্দু তত্ত্বের বিরোধ কেন যখন তখন যত্র তত্র কথায় কথায় দাঙ্গা বাধায় তার জন্য যদি উভয়ের ধর্ম্ম পুস্তক খুঁজি তবে বৃথা খুঁজব। পৃথিবীতে বহু ক্ষেত্রে তত্ত্বের বিরোধ থেকে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তা কেবল প্রথম পরিচয়ে, তা দুই এক শতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয় নি! কিন্তু এ দেশে সাত আট শতাব্দী কাটল, তবু আজো এদের দুই পক্ষের মাথার খুলি ফাটে, মাথায় এমন কি বহু মূল্য নিধি আছে যা খুলে না দেখলে জিজ্ঞাসু চিত্ত মীমাংসা পায় না, রক্তে এমন কি পরম পদার্থ আছে যার জন্য এমন অফুরান রক্তপিপাসা।

যাঁরা তত্ত্বের বৈষম্যের এর বিজানু বীক্ষণ করেন তাঁরা পণ্ডশ্রম করেন। মুসলমান বৌদ্ধের কণ্ঠনালী ছেদন করে না, হিন্দুর করে। হিন্দু খ্রীষ্টানের পিঠে মুগুর ভাঁজে না, মুসলমানের পিঠে ভাঁজে। বেহারে আমার মেসের বামুন তার তেল চুকচুকে লাঠিখানিকে প্রতিদিন তেল মাখাতো। থেকে থেকে শুধাতো, কবে দাঙ্গা বাধবে, তবে একবার দেখতানি। এই অবোধ কি তত্ত্বের কথা ভাবত? না মুসলমান গাড়োয়ানরা ভাবে? তারা চায় একটা ছুতো। তাদের সেই যে সাবেক পলিটিকাল বিবাদ আছে তারই একটা নিষ্পত্তি চায়।

আসল কারণ তা হলে উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ। মুসলমানদের ধারণা তারা সকলে এ দেশে আগন্তুক, ঔপনিবেশিক, বিজেতা আর আমরা সকলে এ দেশে আদিম, নেটিভ, বিজিত। কতকটা আফ্রিকার কাফ্রিদের প্রতি বোয়ারদের মনোভাব। বোয়াররা ইংরাজদের দ্বারা বিজিত হয়েছে বটে, তবু তারা একদিন বিজেতা ছিল, কাফ্রিদের বিজেতা। "হিন্দু" শব্দটাই জানিয়ে দেয় যে আমরা ভারতীয়, ওরা নয়।

মহাত্মা গান্ধী সেদিন বলেছেন, যে মানুষ রামকে ভগবান বলে মানে না সে হিন্দু নয়। তা যদি হয় তবে স্বয়ং রামমোহন রায় তথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাদ যান। সেই সঙ্গে আমরা তরুণ দল। যেখানে হিন্দুত্বের স্বরূপ নিয়ে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর মিল নেই সেখানে হিন্দু মুসলমান মিলনের নাম গোঁজামিলন। গোঁজামিলন কখনো কোনো পক্ষের কল্যাণকর নয়, তাতে জাতিকে দুর্ব্বল করে আর দৌর্ব্বল্য একটা অভিশাপ। তার চেয়ে বিরোধ শ্রেয়ঃ। বিরোধও দুর্ব্বল করে সত্য, কিন্তু বিরোধ মানুষকে জাগ্রত রাখে, মিলনের পন্থা অন্বেষণ করায়, আর গোঁজামিলন মানুষকে মিথ্যা আশা দিয়ে পরিশেষে নিষ্ঠুর বঞ্চনা করে, দেহের দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে মেশায় মনের দৌর্ব্বল্য।

আমরা কি চাই তা সোজা। আমরা চাই যে ভারতের মুসলমান যা খুসী বিশ্বাস করুন, যেমন খুসী উপাসনা করুন, কিন্তু হোন ভারতীয়, হোন স্বাদেশিক। তাঁর পক্ষে বোধ হয় সহজ হোক যে হাফিজের চেয়ে কালিদাস তাঁর আপন, আলহামরার চেয়ে অজন্তা তাঁর আপন। এক কথায় তাঁরা তাঁদের দেশের উত্তরাধিকার বুঝে নিন, যেমন আমরা নিয়েছি। বৌদ্ধ মত কেন, 'সনাতন' হিন্দু মতের সঙ্গেও আমাদের মতের পার্থক্য, তা সত্ত্বে আমাদের সারনাথের ধ্বংসাবশেষ ও ভুবনেশ্বরের মন্দির সমান ভালো লাগে এবং ফতেপুর সিক্রী। দেশোত্তর সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, দেশীয় চিত্তের বিচিত্র স্ফূর্ত্তির জন্য। ভারতে যা

কিছু গড়া হয়েছে রচা হয়েছে লেখা হয়েছে তাতে ভারত মিশে রয়েছে, তার পশ্চাতে রয়েছে অদৃশ্য ধারাবাহিকতা। সৃষ্টি কখনো আরোপিত হতে পারে না, যখন আরোপিত হয় তখন হয় ভুঁইফোড়, যেমন নয়া দিল্লী। আকবর তাঁর প্রথম বয়সের সঙ্গিনীর রুচি, শা জাহান তাঁর মাতাপিতামহীর রুচি নিজের রুচির মধ্যে পেয়েছিলেন, নইলে তাঁদের কীর্ত্তি আমাদের এমন আপন বোধ হতো না।

তুর্কী ইরানের দিক তাকিয়ে যদি কেবল আধুনিকতা দেখি তবে অর্দ্ধেক দেখব। লক্ষ্য করবার জিনিষ তাদের আধুনিকতার আধার, তাদের নিবিড় স্বদেশানুরাগ। দেশকে এত ভালোবাসে বলে তারা ইসলামের আনুষঙ্গিক আরবীয়তা থেকে সবলে মুক্ত হতে চায়। আরবী নাম পদবী নিষিদ্ধ হচ্ছে, কোরানের তর্জমা হচ্চে দেশ ভাষায়। আরবও তাদের কাছে বিদেশী। ইরানের প্রাক্-মুসলমান যুগ সম্বন্ধে এতদিন তাদের গ্লানি ছিল, গৌরব ছিল না। এখন তারা ঠিক আমাদেরই মতো অতীতের সঙ্গে মধ্যযুগের ও মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অবিচ্ছিন্ন অন্বয় রক্ষা করতে উৎসুক।

স্বাদেশিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হয়ত একদিন ভারতের মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হবে, সহজ হবে। সে দিনের অপেক্ষা করব। সেই ঐক্য হবে মৌলিক ঐক্য। জুড়ে জুড়ে জোড়াতালি দিয়ে যে ঐক্য তা মৌলিক নয়, যৌগিক। তার দুর্ভোগ অনেক। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান শিখ ইত্যাদিকে আটা দিয়ে আঁটার নাম জাতীয়তা নয়, জাতীয়তা একই ঐতিহ্যের স্বীকৃতি এবং একই ভবিষ্যতের অভীপ্সা। আর জাতীয়তার আধার না হলে আধুনিকতা সৃষ্টিতৎপরতা হয় না, ও বস্তু আকাশ কুসুম নয়, ওর ফলনের জন্য ভূমি চাই।

মুসলমানদের মনের এক স্থানে একটি শঙ্কা আছে, তাঁদের ভয় হয় পাছে ভারতের সত্তা তাঁদের স্বকীয় সত্তাকে আত্মসাৎ করে, পাছে নিজের বলে তাঁদের কিছুই না থাকে। রবীন্দ্রনাথের "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর" তাঁদের চিত্তে আশার পরিবর্তে আতঙ্ক জাগায়, আত্ম-বিলোপের দুঃস্বপ্নে তাঁরা কখনো হুঙ্কার ছাড়েন কখনো হতাশ হন। এবং যে শঙ্কা সত্তার প্রতি আরোপ করেন তত্ত্বে, যেন হিন্দু তত্ত্ব অধীর হয়েছে মুস্লিম তত্ত্বকে গ্রাস করতে। হিন্দুত্বের চেয়ে ভারত বড়, আর সে ভারত মুসলমানেরও সৃষ্টি। সেই ভারতে মিলিত হতে হিন্দুর যদি ভয় না থাকে, খ্রীষ্টানের যদি ভয় না থাকে, তবে মুসলমানের ভয় থাকা বৈদেশিকতার চিহ্ন।*

* লেখকের 'তারুণ্য' নামক বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে এই নূতন অধ্যায়টী সংযোজিত হইতেছে।—বুলবুল সম্পাদক।

আমাদের কথা

সল্‌মা রওশন-জাহান

"ভারতীয় মুসলমান" লেখাটী বেশ ভাল লাগল, শ্রীযুত লীলাময় রায়ের লেখা সাধারণতঃ যেমন লাগে। তাঁর আলোচনা এমন স্বচ্ছ এবং সমস্যাকে তিনি এত সহজে তুলে ধরতে পারেন যে, পড়লেই একটু আকৃষ্ট হতে হয়, আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু রায় মহাশয় সমস্যাকে এত শাগ্‌গীর এড়িয়েও বা যান কেন? তাঁর জ্ঞান, তাঁর বুদ্ধির সাথে আর একটু সমাহিতচিত্ততার যোগ হলে বাংলা সাহিত্যের এতগুলি সুন্দর পৃষ্ঠা আগাগোড়া half-truth-এ ভর্ত্তি হয়ে থাকত না। তাঁর মনটী বিশেষভাবে একটা অভিজাত হিন্দু-মন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে তিনি একজন পরিমার্জ্জিত হিন্দুর চোখেই দেখেন, হয়ত নিজেরই অজ্ঞাতসারে, — হয়ত তেমনি অজ্ঞাতসারে আমরাও মুসলিম মন নিয়েই দেখি। তবু মনে হয় আরও একটু দেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে যদি দেখতে তিনি আর একটু আগ্রহী হন। মুসলমান বলতে তিনি চিন্তার দিক দিয়ে একেবারে বর্ব্বর মুসলমান ছাড়া দেখছেন না। "মুসলমানদের ধারণা তারা ইংরেজের মতো বিদেশী বিজেতা।" "মুসলমানদের ধারণা তারা সকলে এদেশে আগন্তুক, ঔপনিবেশিক বিজেতা আর আমরা সকলে এদেশে আদিম, নেটিভ, বিজিত।" অমন আন্তরিকতাপূর্ণ একটা প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত বলেই এই কথাগুলি পড়বার সময় আমার হাসি পেয়েছিল, বিরক্তি ধরেনি। কিন্তু তিনি "মুসলমানদের ধারণা" না বলে "মুসলমানদের 'অনেকের' ধারণা"-ও তো ভদ্রভাবে খাতিরে বলতে পারতেন, যদিও সে ধারণা আসলে মুসলমানদের 'কারো-কারো' ধারণা, বাংলা দেশের উর্দ্দুভাষী চাকুরে মুসলমানদের কারো-কারো, — অন্যান্য মুসলমানদের সম্বন্ধে এতটা নির্দ্দিষ্ট করেও বলা যায় না। রায় মহাশয় কি আমাদের মত মুসলমানদের একেবারেই বাদ দিলেন? তিনি যেমন বেছে বেছে কয়জন হিন্দুর এবং কয়জন খৃষ্টানের মনোভাব নিয়ে হিন্দু এবং খৃষ্টান সাধারণকে বোঝাতে চেয়েছেন, তেমন চোখ বুঁজে বললে আমরাও তো বলতে পারি যে ভারতকে কোন মুসলমান হিন্দুর চেয়ে কম আপনার ভাবে না। তা হ'লে কি একেবারে মিথ্যা বলা হয়? কোন্‌ হিন্দু আমার চেয়ে বা আপনার চেয়ে ভারতকে বেশী ভালবাসে? মহাত্মা গান্ধীর মাপকাঠিতে রায়-মহাশয়ের হিন্দুত্বই টিক্‌লো না, এহেন মহাত্মা গান্ধী যখন জোর গলায় ভারতকে 'হিন্দুস্থান' ব'লে প্রচার করেন, তখন মহাত্মাই বা মনে মনে মুসলমানদের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করেন, শ্রীযুত রায় মহাশয়ই বলুন। রামকে আমরা ভগবান মানবো কি? মানি, একজন শিষ্ট-শান্ত উৎসর্গিতপ্রাণ সৎলোক এবং সুশাসক বলে। রামায়ণকেও ধর্ম্মগ্রন্থ মানিনে, মানি একটী ভাল কাব্যগ্রন্থ ব'লে। এতে কি মহাত্মাজী রাজী হবেন? মনে হয় তর্কের খাতিরে রাজি হলেও আসলে গোঁজামিলই সার। হিন্দুরা বিলুপ্ত হোন্‌ এ-কামনা আমাদের নয়। কিন্তু যদি তাঁরা বিলুপ্ত হতেন, তবে রায়-মহাশয়ের ধারণা : খৃষ্টানরাই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুসলমানের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর এ মনোভাবে আমার হিংসা নেই। খৃষ্টানদের অনেক গুণ। কিন্তু মুসলমানের এ চিত্রের সমর্থন গত হাজার বছরের ভারত-ইতিহাসের কোথাও কি তিনি পেয়েছেন? এই হাজার বছরে কয় কপি বেদ-বেদান্ত মুসলমানরা পুড়িয়েছে? আর আজকের মুসলমানদের সম্পর্কেও যেন তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের রক্তের মতো আমাদের প্রতিটী স্নায়ু শিরায় মিশে আছে; তবু আমাদের চেহারা এতোখানি আলাদা কেন দেখালো তাঁর চোখে? মুসলমান হিন্দুকে পর ভাবে, এর জন্যে কি একা মুসলমানই দায়ী? সেদিনও তো হরিজনদের শুধু ইসলামের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যেই শিখ ধর্ম্মের অভিনব প্রয়োগের চেষ্টা হতে দেখা গেল! মুঞ্জে নিজে কি শিখ হতে রাজী আছেন, না শিখ ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাস করেন? বাঘে-খাওয়া পাঁঠাকেও খড়্গ দিয়ে বলি না দিলে চল্‌বে না! রায় মহাশয় বলতে পারেন : এ রাজনীতি। আমাদের কাছে কিন্তু রাজনীতি সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। সমাজ-জীবনে ওর হাওয়া এসে লাগে। সমাজ-জীবনও

তো বাদ যায় নি। একটা বড় দৃষ্টান্ত দেই। আমার জনৈক হিন্দু-বান্ধবী আমার জনৈক মুসলমান বন্ধুর প্রণয়াসক্ত হন। বান্ধবী অল্পবয়স্কা ছিলেন না, বন্ধুও ছিলেন উচ্চ-বংশের সন্তান, সুপুরুষ এবং উচ্চশিক্ষিত, অধিকন্তু পরম জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তৎকালীন একজন একচ্ছত্র দেশনেতার কারসাজিতে বন্ধুকে ভারতভূমি ছাড়তে হল, বান্ধবী জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে ভারতীয়ত্ব বজায় রাখলেন।

হিন্দু-ব্যক্তির সাথে মুসলমান-ব্যক্তির যা-ই সম্বন্ধ হোক্ না কেন, শ্রীযুত রায়কে বলতে চাই যে, হিন্দু যদি এদেশ থেকে একদিন হঠাৎ বিলুপ্ত হয়েও যায়, তাহ'লে হিন্দু সৌধকলা, হিন্দু-ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় থাকবে কলা হিসাবে; প্রতিমাকে আমরা প্রণাম করবো না, কিন্তু ভারতের এক-সময়কার শিল্পের নিদর্শন-হিসাবে সযত্নে রক্ষা করবো, — এই-ই আমার দৃঢ় ধারণা। তা'ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত আমরা আজকের মতই পরম আগ্রহে পাঠ করবো, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসেবে নয়, কাব্য-হিসেবে। কালিদাসকে আমরা আপন ভাবি নে, একথা খুব সত্য নয় : মেঘদূত-শকুন্তলা আমাদের চেয়ে কার অধিক প্রিয়? আমাদের-মানে, ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি সবটা আদিম ভারতীয় নয়, কতকটা ইন্দো-ইরানীয়ানই বটে।

হাফিজকে আমরা ভালবাসি, — সে কি হাফিজ অভারতীয় ব'লে? হাফিজ আমাদের মনের কথা বলেন,—আমাদের প্রাণের স্ফূর্ত্তি, আমাদের কামনা-বিরহ হাফিজের সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তাইতো হাফিজ আমাদের আপন। 'সোমরসে'র চাইতে 'শারাব' যেন আমাদের একটু অধিক প্রিয়, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'র চাইতে 'সাকী'। এটুকু রায় মহাশয় যেন আমাদের ক্ষমা করেন। এতে ভারতের অপকার কিছুই নেই, বরং "দেশীয় চিত্তের বিচিত্র স্ফূর্ত্তির" জন্যেই এ অপরিহার্য। কালিদাসকে আমরা খুব ভালবাসি, হাফিজকে আর-একটু বেশী ভালোবাসি, ভালো লাগে ব'লেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আমরা ভালবাসি রবীন্দ্রনাথকে; রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতীয় ব'লে নয়, যে-জল যে-বাতাস যে-আলোতে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের বিকাশ, সে আমাদের এত পরিচিত, এত আপন যে, ভারতীয় দর্শনের সাথে রবীন্দ্রকাব্যের জগাখিচুড়ি তৈরী না ক'রেই মন আমাদের বলে ওঠে —

"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী!

আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি!"—

মন ভরে ওঠে এই গৌরবে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের!

তারপর, অজন্তারও অমর্য্যাদা আমরা তো করি নি, আল্-হাম্‌রা—তথা Saracenic সৌধ-সম্পদের সাথে আমাদের কাল্‌চার-এর যোগ আছে। ওতেও বা বক্রদৃষ্টি কেন? আল্-হামরার চেয়ে তাজমহল তো আমাদের আরও কত গুণ প্রিয়!

হিন্দুসভার মহারথীদের নিয়ে হিন্দু-সাধারণের বিচার আমরা করি নে। শ্রীযুত লীলাময় রায়কে অনুরোধ : মুস্‌লিম-সমাজকে সাধারণভাবে বিচার করতে তিনিও যেন দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করেন। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার তাতে যাই লাভ-ক্ষতি হোক্ না কেন, তাতে আমাদের বন্ধুত্ব অন্ততঃ আরও একটু মধুর হবে তো?

(৩য় বর্ষ, মাঘ সংখ্যা)

সাফাই

লীলাময় রায়

এক রকম প্রতিবাদ আছে তা শুনে সুখ। যখন বলি, বোন পরের ঘরে গেলে পর হয়ে যায়, আর উত্তরে শুনি, কখনো না, বোন চিরদিন সমান আপন, বরং ভাই পর হয়ে যায়, তখন যেমন খুশী হই তেমনি খুশী হলুম বেগম সল্‌মা বওশন জাহানের প্রতিবাদ পড়ে।

এই ত চেয়েছিলুম শুনতে, "কোন হিন্দু আমার চেয়ে ভারতকে বেশী ভালোবাসে? ... ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের প্রতিটি স্নায়ু শিরায় মিশে আছে। ... মেঘদূত শকুন্তলা আমাদের চেয়ে কার অধিক প্রিয়?"

এর পরে আমার কি বলবার থাকতে পারে। মনে মনে শুভ কামনা করব, এবং প্রাণভরে প্রত্যাশা করব যে এই মনোভাব সকলের হোক, এই মনোভাব শাশ্বত হোক।

বেগম সাহেবার প্রধান অনুযোগ এই যে আমি "মুসলমানদের" না বলে "মুসলমানদের অনেকের"ও তো বলতে পারতুম। আমি তাঁর মতো মুসলমানদের কি একেবারেই বাদ দিলুম?

এ রকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকতে পারে এ কথা আমার মনে হয় নি। লেখকরা যখন তর্কের খাতিরে বলেন ইংরাজরা সাম্রাজ্যবাদী, আমেরিকানরা তেমন নয়, কিম্বা রাশিয়ানরা কমিউনিষ্ট, জার্ম্মানীরা তেমন নয়, তখন ভালো করেই জানেন যে ইংরাজদের মধ্যে সাম্রাজ্যবিরোধী, আমেরিকানদের মধ্যে সাম্রাজ্যলোলুপ, রাশিয়ানদের মধ্যে বুর্জোয়া ও জার্ম্মানদের মধ্যে কমিউনিষ্ট অনেকেই। ভদ্রতার খাতিরে এঁদের উল্লেখ করলে তর্কের সুরাহা হয় না। দেখতে হবে তর্কটা মোটের উপর ঠিক পথে চলেছে কি না।

আমার তর্ক ছিল এই যে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসের যতটা অমিল মুসলমানদের সঙ্গেও ততটা। তবু কেন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে না, মুসলমানদের সঙ্গে বাধে। আমার মতে এর প্রকৃত কারণ খ্রীষ্টানরা ধর্ম্মে স্বতন্ত্র হলেও জাতিতে এক, মুসলমানরা ধর্ম্মেও স্বতন্ত্র, জাতিতেও স্বতন্ত্র, অন্ততঃ তাই তাঁদের ধারণা। এখানে লিখতে পারতুম, তাই তাঁদের অনেকের ধারণা। কিন্তু সেটুকু না লিখলেই যে সত্যটা অর্দ্ধ সত্য হয়ে যায় ও ভদ্রতার অভাব ঘটে তা আমার মনে ছিল না।

বেগম সাহেবা, আমার উপর অবিচার করেছেন আমার একটি বাক্যের অন্য রকম অর্থ করে। প্রত্যেক দেশের একটি স্বাভাবিক ধারা আছে, সেই ধারা রক্ষা করতে হয় দেশের প্রত্যেক সন্তানকে। তবে জ্যেষ্ঠের উপর যেমন বংশগত ধারা রক্ষার দায়িত্ব একটু বেশী, তেমনি হিন্দুর মনেও দেশগত ধারা রক্ষার দায়িত্ব একটু বেশী করেই উদয় হয়। হিন্দু এ দেশে অনেক আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এই দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ এত কালের যে তা প্রাগৈতিহাসিক।

কেউ যদি বলেন যে আমি না থাকলে আমার ছোট ভাই আমাদের বংশের ধারা রাখবে, তার মানে শুধু এই যে ছোট ভাই পৃথক হয়ে যাবে না, অন্য বংশের লোক বলে পরিচয় দেবে না। তার মানে এমন নয় যে মেজ ভাই বংশ বদল করে পর হয়ে যাবেই যাবে। বরং আমার প্রবন্ধে আমি এই প্রত্যাশাই করেছি যে মুসলমানও এই দেশের উত্তরাধিকার বুঝে নিয়ে রক্ষা করবে।

এখন বেগম সাহেবা আমার বক্তব্য থেকে একটি বাক্য কেটে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের কল্পনা যোগ করে যা আমার

উপর আরোপ করলেন তা এই যে, আমার ধারণা খ্রীষ্টানরাই মুসলমানের গ্রাস থেকে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখত। এতে আমি তাজ্জব বনেছি।

আমার বাক্য — "হিন্দুরা যদি বিলুপ্ত হয় ও খ্রীষ্টানরা যদি বিদ্যমান থাকে তবে ভারতের আবহমান ধারা তাদের কর্তৃক রক্ষিত হবে, তত্ত্বের বিরোধ সত্ত্বে।"

বেগম সাহেবরা ভাষ্য, "রায়মহাশয়ের ধারণা খ্রীষ্টানরাই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুসলমানের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখত।"

আমার প্রবন্ধে, সে প্রবন্ধ যে বইয়ের অংশ সে বইয়ে, আমার এ যাবত লেখা কোন প্রবন্ধে বা বইয়ে মুসলমানের গ্রাস সম্বন্ধে আভাস পর্য্যন্ত নেই। এবং আমি কোনো দিন বিশ্বাস করিনি যে মুসলমানের দ্বারা ভারতবর্ষের কোনো বড় জিনিষ নষ্ট হয়েছে বা হবে। বরং ওয়াজেদ আলী সাহেবের মতো লেখকের মনে এর বিপরীত আশঙ্কাটাই আছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে ইসলামকে বিনষ্টির আহ্বান করছে এই অমূলক ধারণা আছে, এবং আমার প্রবন্ধে আমি তাঁকে নিরস্ত করেছি।

(জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪)

অবাঞ্ছিত ব্যবধান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বর্ত্তমান প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের তথা বাঙ্গলা দেশের একটা বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের কি করে অবসান হতে পারে, কিভাবে এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচানো যায় তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন তিনি এই লেখায়। মুস্‌লিম সাহিত্যিক সমাজের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। এ সম্পর্কে মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের বক্তব্য আমরা বুলবুলে প্রকাশ করব। - বুলবুলের সম্পাদক]

সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। একথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠছে বলেই মনে হয়। আমি মুসলমান সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেমন পরাঙ্মুখ নন এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশীও সে নয়। যে কারণেই হোক এতদিন বাংলাদেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য চর্চ্চা করে এসেছেন। মুসলমান সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়া এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হতে পারেনি। তাই, ক্রোধের বশে কেউ-কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা জায়গায় এত বড় বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে। স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছু-কাল পূর্ব্বে আমার একটী নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত, অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করেনি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, এক-ই দেশে, এক-ই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, এক-ই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এম্‌নি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবন-ধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ,—প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ-তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।

তারপরে দু'জনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে আমরা ভীতু। তোমরা বীর। তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এ-ও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনো বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশী।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন এমনি নন-কোঅপারেশনই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে-অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো। বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।

(বৈশাখ, ১৩৪৩)

"অবাঞ্ছিত ব্যবধান"

মীজানুর রহমান এম্-এ

বৈশাখ সংখ্যা বুলবুলে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রের 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' শীর্ষক লেখাটি পড়লুম। সর্ব্বপ্রথমেই লেখক সাহিত্যের একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—"সে এর প্রয়োজনের দিক—এর কল্যাণ করার শক্তির" দিক। তাঁর অনন্য-সুলভ সুন্দর ভঙ্গীতে শরৎবাবু ব'লেছেন—"সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেম্‌নি পারে করতে মানুষের অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে উঠে।"

সাহিত্যের ধর্ম্ম, সুন্দর, সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথা সুন্দরভাবে বলা। এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য-রসিকগণ সময় সময় 'Art for art's sake' কথাটার উপর বেশীর ভাগ জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে হয় রস-সৃষ্টি সাহিত্যের সার কথা হ'লেও সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার নিপুণ সমাবেশের ভিতরই বলতে গেলে সাহিত্যের সত্যিকার সার্থকতা। সাহিত্যের ব্যাপারে 'Art for man's sake' -পন্থী লোকের সংখ্যাও নেহায়েৎ কম নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি শেষোক্ত দলেরই পক্ষপাতী, তা বল্‌তে সঙ্কোচ নেই।

সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলার মুসলমান সমাজে 'ক্ষোভ ও বেদনা' উত্তরোত্তর বেড়ে উঠ্‌ছে এবং "রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলতেও পরাঙ্মুখ নন" বলে শ্রদ্ধেয় লেখক অনুযোগ ক'রেছেন। তবে এ "ক্ষোভ, বেদনা ও রাগ" যে অহেতুকী নয়, তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন এই ব'লে—"অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখ্‌তে পাবেন, অজুহাতের বেশীও সে নয়।"

উপরোক্ত অনুযোগ মোটামুটি ভিত্তিহীন নয়, তা হয়তো অস্বীকার করা যায় না। তবে তা ষোল আনা মেনে নেওয়াও মুশ্‌কিল—ঐ অন্ততঃ রাগের মাথায় ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলবার অভিযোগটা।

বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-উর্দ্দু বা এক কথায় মুসলমানী শব্দের আমদানী নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে তা হয়তো অশুভ লক্ষণ নয়। বল্‌তে গেলে উহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সজীবতা এবং সবলতারই অভিব্যক্তি। প্রবহমানা নদী বা সমুদ্রের বুকে সামান্য বাতাসে যতটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস হ'য়ে থাকে, স্বল্প-সলিল সীমাবদ্ধ জলাশয়ে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেও তা সম্ভবপর নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'জলাশয়ত্ব' নিশ্চয়ই কেটে গেছে, এক-ধারা 'স্রোতস্বিনিত্ব'ও হয়তো কাট্‌তে বসেছে। "যে কারণেই হোক এতদিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা করে এসেছেন। মুসলমান সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই বাণী-দেবতা বর দিয়া এসেছেন এঁদেরকে।" ইহা শরৎ বাবুরই কথা। কিন্তু তা হ'লেও এ হয়ত পুরোপুরি সত্য কথা নয়। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, শৈশবে বাংলা সাহিত্য মুসলমান আমীর-ওমরাহ, নওয়াব-বাদ্‌শাহের আশ্রয়ে এবং উৎসাহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। বহুদিন হ'তেই মুসলমান জনসাধারণও বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাঁদের কাব্য বা পুঁথি রচনা করেছিলেন। তাঁদের কাব্য-সমূহ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এ সম্পদের মূল্য এবং মর্য্যাদাও কম নয়। ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবির কয় লাইন উদ্ধৃত করছি। পয়ার ছন্দে লেখা হ'লেও ভাব-সম্পদে তা নেহায়েৎ খেলো জিনিষ নয়। বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায় উদাসীন বা শ্রদ্ধাহীন সমাজের একজন অপরিপক্ক লেখকের লেখাও তা হ'তে পারে না :—

"বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ।।

বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর মরণ।।

(লয়েলী-মজনুন কাব্য—বাহারাম খাঁ দৌলৎ উজীর)

সৈয়দ মর্ত্তুজা নামে আর একজন প্রাচীন মুসলমান কবির একটী সঙ্গীতের নমুনা দেখুন ঃ—

রাজ—গুঞ্জরী ভাঙ্কা

"মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার সনে।
নিঠুর কালার প্রেম জ্বালা না সহে পরাণে।। ধূ।
ঘরেতে বসিআ শুনি মথুরাএ বাজে বাঁশী।
শুতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী।।
বাও নাই বাতাস রে নাই কদম্ব কেনে হেলে।
মুঞি নারীর কর্ম্মদোষে ডাল ভাঙ্গি পড়ে।।
কলসীতে জলরে নাই বসিয়া রৈলুং ঘরে!
চলিতে না পারি আমি যৌবনের ভরে।।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে মনেত ভাবিআ।
মুঞি কেনে বসিয়া রৈলুং পীরিতি লাগিআ।"

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের এমন-ধারা আরও বহু নজীর পেশ করা যেতে পারে। মুসলমানেরা মোটামুটি বাংলা সাহিত্যকে অনাদর বা অশ্রদ্ধা করেন নি। একজন মুসলমান নওয়াবের উৎসাহে এবং সাহায্যেই ত হিন্দুর রামায়ণ সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ ও ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক কর্ত্তৃক রচিত "আরকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য", ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজের দানের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

মোটকথা, বাংলাদেশে মুসলমান আমলদারীতে ও মুসলমান জনসাধারণ বাংলা ভাষাকে যথা সম্ভব আপন করেই নিয়েছিলেন। তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিবর্ত্তনের প্রথম এক শতাব্দী তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। এসম্বন্ধে চট্টগ্রাম সাহিত্য-মজলিসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করে দিলুম ঃ—

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে। রাজ্যহারা হইয়া, শক্তি হারাইয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে অধঃপতনের চরম সীমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের সাহিত্য সাধনায় ভাটা পড়ে। এই সময়েও তাঁহাদের মধ্যে কম কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লবে তাঁহাদের মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্ব শক্তি অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। সাহিত্য সেবায় মনের যে একাগ্রতা আবশ্যক, সম্ভবতঃ তাহার অভাবে তাঁহারা আর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।"

আলোচ্য প্রবন্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায় মুসলমান সমাজের যে ঔদাসীন্যের উল্লেখ করেছেন, তা উপরোক্ত ও অন্যবিধ কারণ-সমূহেরই জের। আজ সে ঔদাসীন্যের সমাধি হয়েছে বলেই মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের একটানা স্রোতে তাই আরম্ভ হয়েছে আর একটা ধারা বা সুর। সেটা নব-জাগ্রত মুস্‌লিম বাংলার প্রাণ-চঞ্চল শিহরণের সুর—'বঞ্চিত বুকে সঞ্চিত ব্যথা'র প্রতিক্রিয়া ও অভিযান।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট মুস্‌লিম-ধারা বর্ত্তমান ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পার্থক্যে তখনকার সেই মুস্‌লিম-ধারা চোখে বে-খাপ্পা বলে প্রতীয়মান হয়নি। নানা কারণে মাঝখানে সে ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। মুসলমানরা আবার সেই লুপ্ত ধারা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। সে ধারার পুনঃ-প্রবর্ত্তনে বাংলা ভাষার লাভ ছাড়া লোকসান হ'বে না। বিভিন্ন কৃষ্টির আমদানীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্টই হ'বে। এই ধরণের আমদানী ও assimilation ভাষা বিশেষের শক্তি ও সজীবতারই লক্ষণ—

দুর্ব্বলতার নহে। আশা করি শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু নিজেও তা স্বীকার করবেন।

কিন্তু তর্ক উঠছে পন্থা এবং পরিমাণ নিয়ে। মুসলমান সমাজের over-enthusiast একদল বলছেন—"চালাও মুসলমানী শব্দ ও ভাবের বন্যা। 'কলেমা' পড়িয়ে বাংলা ভাষাকে করে ফেল পুরো-দস্তুর মুসলমান।" তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রগতি-বিরোধী একদল বলছেন—"মুসলমানী শব্দের আবর্জ্জনায় বাংলা ভাষাটা বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ করতে হবে।"

সুখের বিষয়, এই উগ্র-পন্থী উভয় দলের সংখ্যা খুব বেশী নয়! উভয় দলই যে ভ্রান্ত, তা বলতে দ্বিধা নেই। জোর করে ভাষা বা সাহিত্যের গতি বাড়ানোও যায় না—বন্ধও করা যায় না। সাহিত্যের ব্যাপারে জোর-জবরের স্থান নেই। সমুদ্রের অবারিত স্রোতের মত ভাষা আপন স্বাভাবিক গতিতেই প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হয়। একটা দেশ বা জাতির সমষ্টিগত ভাবধারার অভিব্যক্তিই বলতে গেলে সে দেশ বা জাতির সাহিত্য। ভাষা সাহিত্যের পোষাক এবং ভাবের বাহনমাত্র; ভাব-ই সাহিত্যের সত্যিকার উপাদান। ভাবের উৎস লেখকের মন। লেখা লেখকের মনেরই প্রতিচ্ছবি। লেখনী তুলিকা মাত্র। লেখকই রং ও তুলিকার মালিক। লেখকের ইচ্ছা মতই লেখা রূপ ছবি তৈরী হবে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, লেখকের সহজাত প্রবৃত্তিই লেখার উৎস। লেখকের স্বচ্ছন্দ মনের উপর অতিমাত্রায় আদেশ-উপদেশ বা বিধি-নিষেধের বোঝা চাপালে লেখা মন্দ ছাড়া ভাল হ'তে পারে না।

তারপর বঙ্কিমবাবুর কথায়—"সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজী, ফরাসী, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দের প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে। অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন "যাহা চলতি—চালাও।"

ভাষার পরিপুষ্টির ব্যাপারে, ইহাই খাঁটী কথা। এ কথা মনে রেখে ভাষার বিচারে প্রবৃত্ত হ'লে আর বিসংবাদের সম্ভাবনা থাকে না। আজকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দরবারে বিদেশী ভাব ও শব্দের আমদানী নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, তার ফলে হয়তো এর সুমীমাংসা হবে। এ জন্যই বলছিলাম, এ তর্ক-বিতর্ক অশুভ লক্ষণ নয়। অবশ্য বিতর্ক বিদ্বেষ প্রসূত হ'লেই মুস্কিল। যাক্ সে কথা। প্রসঙ্গক্রমে মূল আলোচ্য বিষয় থেকে কতকটা দূরে চলে এসেছি। শরৎ বাবুর প্রবন্ধের আর একটী বিষয়ের যৎসামান্য আলোচনা করেই উপসংহার করবো।

শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবু জনৈক মুসলমান অধ্যাপকের মারফতে একটী অতি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করেছেন। সে হচ্ছে হিন্দুসাহিত্যিকদের রচনায় বিরাট মুসলমান সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি-অবনতির চিত্র ও বিবরণের স্বল্পতার কথা এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা। এর প্রতিকার হতে পারে একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—শরৎচন্দ্র একথা স্বীকার করেন। অধ্যাপক বন্ধুকে তিনি বলেছেন—"এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ-তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়তো এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।"

মনে হয় শরৎবাবু উপরোক্ত উক্তিতে মুসলমান সমাজের প্রতি মোটামুটী অবিচার করেছেন। যদি এ সত্যিকারের মত হয়, তবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবো, তাঁর এই অভিমত নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

বঙ্কিমবাবু প্রমুখ কতিপয় হিন্দু সাহিত্যিকের লেখায় মুসলমান সমাজের যে অসত্য এবং অবাঞ্ছিত চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে, তাতে মুসলমানরা ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এ কথাও সত্যি, যে সকল হিন্দু লেখক-লেখিকা সহানুভূতির প্রেরণায় মুসলমান সমাজের সত্যিকার ছবি—তা উচ্চ-ই হোক আর নীচ-ই হোক, গৌরবেরই হোক আর অগৌরবেরই হোক—আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন, মুসলমানরা তাঁদের লেখাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই বরণ করে নিয়েছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শৈলবালা ঘোষজায়া মহাশয়ার "সেখ আন্দু", "মিষ্টি শরবৎ" প্রভৃতি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন, তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচুদরের লোকের নয়। কিন্তু তাই বলে

মুসলমান সমাজে তাঁর উপন্যাসের কম সমাদর হয়নি। হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতীকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছা-প্রণোদিত এমন্-ধারা নির্ম্মম কশাঘাতও মুস্‌লিম সমাজ অম্লানবদনে গ্রহণ করবে, তা জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গলার কথাসাহিত্যসম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

"অবাঞ্ছিত ব্যবধান"

(১)

একটি কথা আছে, "সত্য বলতে পার, প্রিয় বলতে পার, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বোলো না।" কথাটি ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে অমূল্য। ব্যবসাদার কাউকে চটাতে চায় না, সবাইকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। তেমন লোক লোকসান না দেখলে সত্য বলে, লাভ দেখলে প্রিয় বলে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলে না কিছুতেই।

আত্মীয় কিন্তু আত্মীয়ই নয় যদি না সে প্রয়োজন মত অপ্রিয় সত্য শুনিয়ে দেয়। ভাই যখন বলে, 'গোল্লায় যাক! আমি কেন অপ্রিয় সত্য বলে ঐ গোঁয়ারটার হাতে মার খেয়ে মরব," তখন আমরা দুঃখিত হয়ে ভাবি, ভাই না বল্লে কে বলবে, কার মাথাব্যথা! বাস্তবিক অপ্রিয় সত্য বলবার সাহস বা প্রবৃত্তি সংসারে যদি কারো থাকে তবে তা মা বাপের, ভাই বোনের। বন্ধুও অনেক সময় বন্ধুকে ভয় করে।

এখন, সাহিত্য যারা লেখে তারা পাঠকের আত্মীয়তুল্য। তারা সত্য বলে, প্রিয় বলে, অপ্রিয় সত্যও বলে। তা নইলে তারা নিতান্তই ব্যবসাদার, কেবল মিষ্টি কথাই বেচে। কিন্তু সাহিত্যিকেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে। ঘরপোড়া আগুনে ইন্ধন দিলে সে হিতের চেয়ে বিপরীত করবে। তাই যেক্ষেত্রে ধর্ম্ম বদলে নাম বদলে পোষাক বদলে পূর্বপুরুষ বদলে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বদলে পরের চেয়েও পর হয়েছে সেক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য বলা মোটেই নিরাপদ নয়, ফলপ্রদও নয়। সেক্ষেত্রে টাকার বা চাকরির বা অন্য কোনো রকম সুবিধার দরকার থাকলে মিষ্টি বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। যার তেমন কোনো মতলব নেই অথচ হাত পা গুলো আস্ত রাখা আবশ্যক সে বড় জোর প্রিয় সত্য বলে। তাতে বন্ধুত্বের সুনাম থাকে, যদিও ঠিক বন্ধুর কর্ত্তব্য করা হয় না।

তারপর যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজো তা মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মত থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমানকাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র রচনাই যাঁদের স্বপ্ন আমরা তাঁদের কে যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাব?

প্রতিকার যদি থাকে তবে তা সাহিত্যে নয়, তা স্বাজাত্যে। স্বাজাত্যের যে সূচনাটুকু লক্ষিত হয়েছিল আন্দোলনে, তাতে ছিল কাজ উদ্ধারের তাগিদ। তা আত্মীয়তা নয়, তা ব্যবসাদারের সঙ্গে ব্যবসাদারের মিতালি। হিন্দুরা বল্ল, তোমরা আমাদের স্বরাজটা পাইয়ে দাও, আমরা তোমাদের খেলাফৎ বজায় রাখছি।" যেমন স্বরাজ কেবল হিন্দুর সুখের জন্য, আর খেলাফৎ মুসলমানের পক্ষে জরুরী। সেয়ানে সেয়ানে সেই কোলাকুলি এতদিনে চুলোচুলিতে পৌঁচেছে।

আপোষের দ্বারা মামলা থামে, যুদ্ধ স্থগিত হয়, সংসোরযাত্রায় শান্তি আসে, কিন্তু আপোষের দ্বারা জাতিগঠন হয় না। এও এক অপ্রিয় সত্য। তোমরা টিকি কাট, আমরা দাড়ি ছাঁটি, তোমরা মন্দির ভাঙ্গ, আমরা মসজিদ ভাঙ্গি, তোমরা আরবী-ফারসী চালাও, আমরা সংস্কৃত চালাই, তোমরা পায়জামা পর, আমরা চাদর গায়ে দিই, তোমরা আট আনা আমরা হও, আমরা আট আনা তোমরা হই—এ হচ্ছে আপোষের সোলেনামা। এতে নেশন তৈরী হয় না। অথচ এই মনোভাব আজ সর্ব্বত্র। এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল আগের সেই না ছোঁয়া না খাওয়া না মেলামেশা।

ঐক্য জিনিষটা অর্গ্যানিক। হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙ্গালী হয় না, ভারতীয় হয় না। জোড়াতালির দ্বারা হয়ত স্বরাজ পর্য্যন্ত হতে পারে, কিন্তু সে স্বরাজও হবে কাঁথার মত। চীনের ঐক্য আছে, যদিও সে দেশে খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ তাওপন্থী ও কংফুচপন্থী বিদ্যমান। চীনের কংফুচপন্থী সে দেশে মেজরিটি। অথচ চীনে মেজরিটি-মাইনরিটি সমস্যা নেই। তাদের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাদের সমস্যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির রেষারেষি, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর স্বার্থবিরোধ। আসল কথা চীনারা রক্তেমাংসে সংস্কারে আচারে ভাষায় ভাবে এক। তাদের ঐক্য অর্গ্যানিক আর

আমাদের ঐক্য ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ী জুড়ে ঘোড়া গাড়ীর নামক যৌগিক পদার্থ। হিন্দু সমাজও ঘোড়ার গাড়ীর মত যৌগিক সংস্থা। এক জাতি থেকে বহু জাতি হয়নি, বহু জাতি চিরকাল ছিল। হিন্দু সমাজ একটা ফেডারেশন। এই যদি হয় হিন্দু সমাজের দশা তবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কোনো অর্থ হয় না। হিন্দু সমাজ নিজেই যখন একটা আপোষ তখন হিন্দু-মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।

লীলাময় রায়

(২)

হিন্দু-মুস্‌লিমে যে সম্পর্ক—রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, সে অনেককে অনেকভাবে ভাবিয়েছে যুগ যুগ ধ'রে। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা ও চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুস্‌লিম মন হয়ে দাঁড়িয়েছে খানিক সচেতন; আর তার ফলে এই দুই সমাজের পুরাতন সম্পর্ক--বা অসম্পর্ক--রূপ নিয়েছে একটী প্রবল সমস্যার। এর সমাধান কেমন ক'রে হবে? প্রাচীনদের পথ যাঁদের অবলম্বন, তাঁরা মানুষে-মানুষে মিলন কামনা করেছেন তার বুদ্ধিকে অনেকখানি পশ্চাতে রেখে—তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সন্দেহ-অবিশ্বাস, তার চিন্তা-সম্ভাবনা—তার মনের যা কিছু বিচিত্র পরিচয় তাদেরে একটা চটুল প্রবঞ্চনায় সম্মোহিত ক'রে। এই জন্যে তাঁদের মিলনাশা সত্যি হয়ে আমাদের জীবনে দেখা দেয় নি, তাঁদের স্থূল কল্যাণ-প্রয়াসের সঙ্গে দেশের বাড়ন্ত যে-মন সেটী বিশেষভাবে যুক্ত হয় নি। আজ যাঁরা নতুন ক'রে আমাদের দুই প্রতিবেশী-সমাজের সম্বন্ধ বিচার কর্ব্বেন, এ নিয়ে যে আশ্চর্য্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।

বস্তুতঃ আজ অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই যে, হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যা আপনার আয়তনে দেশের, সমাজের সমগ্র অবয়বকে স্পর্শ ক'রেছে। কিন্তু দূরপ্রসারী আয়তন এর বাইরের চেহারা, অতলস্পর্শ গভীরতা এর অন্তর-রূপ। যারা এতো যুগ ধ'রে সাধনা কর্‌লেন দুইটী বিশিষ্ট সম্প্রয়াদের হাতে হাত মেলাবার জন্যে, তাঁরা দু'জনের দীর্ঘ বাহুর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন প্রচুর, কিন্তু তাদের অন্তরটীকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখবার প্রয়োজন বেশী অনুভব করেন নি। অর্থাৎ যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হ'লো। তাতে যদি বা শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিল্‌লো, কিন্তু তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'লো না, একজনের অন্তর রইলো আর-একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে। সভায়, সমিতিতে, কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, গোল-টেবিলে, মিলন-বৈঠকে এদের যে ঐক্য সাধনা, বস্তুতঃ সেটী হ'লো সান্নিধ্য-সাধনের প্রয়াস; তাতে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের হিসাব প্রচুর, মনের যোগ-বিয়োগের, চিত্তের লেন-দেনের কথা সেখানে নেই।

অথচ আমাদের আসল সমস্যাটী হ'লো এইখানে; এবং এইটীই আজ আমাদের বিশেষ ক'রে বুঝবার প্রয়োজন হয়েছে। যে-দিন মুস্‌লিমের রাষ্ট্রীয় অধিকার এদেশে প্রতিষ্ঠিত হ'লো, সেইদিন হ'লো এর জন্ম। পরাজয়ের সহজ অভিমান আপনার অনিবার্য্য ব্যর্থতায় দুর্জ্জয় হ'য়ে রইলো; তার সঙ্গে এসে হাত মেলালো হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর সংস্কৃতি। পরদেশী ইসলাম এলো হিন্দুস্তানের অতিথি। অভ্যর্থনা তার হয় নি এমন নয়; কিন্তু সে-অভ্যর্থনা ব্যক্তির, এদেশী ধর্ম্ম সমাজ বা সংস্কৃতি তাতে সায় দেয় নি, তার আতিথ্যের আবেদন দেশচিত্তকে স্পর্শ ক'রে নি। অচেনা মুস্‌লিম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার কর্‌লো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজ-সম্মান সে পায় নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার ক'রেও দেশ-মনের মিতালী তার ভাগ্য হয় নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটী অবাঞ্ছিত হলেও কোনোদিন ঘোচে নি। তারপর মুস্‌লিমের রাজ্য গেলো। সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হ'তো যদি ইসলামের মন্ত্রাধিকার, সেও এক কথা ছিল। কিন্তু তা হ'লো না; আপনার অদ্ভুত সংক্রামকতায় সে অক্ষয় হ'য়ে রইলো। এতেও হয়তো কিছু ক্ষতি ছিল না যদি সে অনাত্মীয় পরিবেশে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌তে পার্‌তো। কিন্তু সেটী সে পার্‌লো না। এতেই সমস্যা হ'লো দুরূহ।

ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের এক আশ্চর্য্য স্বভাব সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটী এই যে, এ-ধর্ম্ম কারুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে না, সমঝোতা করে না, আত্মীয়তা করে না—বুভুক্ষা এর ভীষণ, এ করে গ্রাস। এর বক্ষভেদ ক'রে যারা উঠ্‌লো, শত বাহু বিস্তার ক'রে তাদেরে এ কর্‌লো আপনার কুক্ষিগত। কিন্তু ইসলামের জন্ম এদেশের মাটীতে নয়; অস্থি তার লৌহ-কঠিন, মর্ম্ম তার অক্ষয় অব্যয়। ভারতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তার অঙ্গ হ'লো ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু মৃত্যু তার হ'লো না। হ'লো না যে,

এই হ'লো বিষম সমস্যা। আপনার পত্রপুষ্প পল্লবে তার বিস্তার হ'লো বিস্ময়কর; ভারতের মহামহীরুহ অতৃপ্ত ক্ষুধায়, বঞ্চিত অভিমানে হ'য়ে উঠ্‌লো বার বার আন্দোলিত। সেই আন্দোলন, সেই বিক্ষোভ আজ আমাদের সম্মুখে।

বস্তুতঃ দুইটী বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে—এই বিক্ষোভ। এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুস্‌লিমকে বোঝে না, এজন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হ'চ্ছে। কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম ক'রে গতি তার নিশ্চল। আপনার আভিজাত্যের গর্ব্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজো দুর্জ্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচাগ্রপরিমিত স্থান দান কর্ত্তেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ মুক্তি যার নেই, সে চলে না, চল্‌তে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির প্রতিকূল পরিবেশে এদেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' ক'রে রেখেছে, ভারতের মাটীর রসে রসায়িত হ'য়েও তার মন যেন ভিজ্‌ছে না।

মুসলিম হিন্দুকে বোঝে না, এজন্যেও বিলাপ হচ্ছে। কিন্তু কথাটী অর্দ্ধ-সত্য, এই কারণে যে, ইসলাম তরুণ ধর্ম্ম, এর কৃষ্টি ও দৃষ্টি স্বতই অনেকখানি জাগ্রত। নতুন পুরাতনকে স্থূলতঃ এবং অনেকখানি মর্ম্মতঃ বোঝে ব'লেই সে নতুন। পুরাতনকে না জান্‌লে, তাকে না বুঝলে তার থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার, বিযুক্ত হওয়ার, তার বিরুদ্ধ হওয়ার, প্রয়োজন হয় না। আবার, নতুনের অস্তিত্ব ও সার্থকতা তার স্বাতন্ত্র্যে, তার নবতর, শ্রেয়তর আদর্শ-নিষ্ঠায়। ইস্‌লামের এই নিষ্ঠা স্বস্থ এবং বলবান্ ব'লেই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের গ্রাস থেকে সে রক্ষা পেয়েছে একথা আমাদের মান্‌তে হবে।

অর্থাৎ ভারতীয় সমস্যার মূল দ্বন্দ্বটা হ'লো ভোক্তা ভোজ্যের। ভোজ্য নিঃসংজ্ঞ হ'লে মুশকিল ছিল না। কিন্তু একদা-মৃদুসংবিৎ মুস্‌লিম আজ ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে; দুভার্গ্যের নির্ম্মম প্রহারে যে ছিল মূর্চ্ছিত, তার চেতনা আজ ফিরে আস্‌ছে। এই চেতনাকে উপেক্ষা কর্‌লে, একে সহানুভূতি ও সমবেদনার চোখে না দেখলে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়--না রাষ্ট্রে, না সমাজে, না সাহিত্যে।

মুস্‌লিমের এই নবস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌লো, হয়তো দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে, দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? 'বুলবুলে' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে মুস্‌লিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালোবাসার অভাব, এবং মোটামুটী একটা অন্তর্দ্দৃষ্টির অভাব। মুসলিম সাহিত্যসেবক আরবী ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি-'অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা। কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটী হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এ দু'টী যেখানে নেই, সেখানে ভাষা ভূষণ পর্‌তে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে। কিন্তু একটী মারাত্মক কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন : তিনি মুস্‌লিমকে ভয় করেন--অর্থাৎ মুস্‌লিম সাহিত্যরসিক পাঠককেও। যেখানে ভয়, শ্রদ্ধার আসন--ভালোবাসার স্থান সেখানে নয়, এবং ভালোবাসার যেখানে অভাব, বিচারশক্তি সেখানে নির্ব্বিকার নয়। এ বলিনে যে, শ্রদ্ধার প্রকাশ অনাবিল প্রশংসায়, তিরস্কারে নয়। কিন্তু একথা বার বার বল্‌তে হবে যে, নিন্দা ও প্রশংসা, কশাঘাত ও প্রশস্তি সহনীয় হয়, মধুর হয় তখনই, যখন তার পশ্চাতে থাকে একটী শ্রদ্ধাসুন্দর মন, একখানি প্রীতিপেলব অন্তর। মুস্‌লিমের বুকেও মানুষের প্রাণস্পন্দন জেগে আছে, তার অন্তরের অনুভূতি আবেগ সবই মানুষের,--অন্ততঃ এতোটুকু যাঁর বিশ্বাস, তিনি কেমন ক'রে একথা ভাব্‌তে পারেন যে, মুস্‌লিম শুধু মুস্‌লিম ব'লেই তিরস্কারে তিরস্কারে প্রভেদ কর্ত্তে জানে না, ভালোবাসার ভ্রূকুটী এবং অপ্রেমের স্তুতিবাদে পার্থক্য বোধ তার নেই! মুস্‌লিমের জন্যে, ইসলামী কৃষ্টির জন্যে যদি শরৎচন্দ্রের অন্তরে কণামাত্র সহানুভূতি সঞ্চিত থেকে থাকে, তাহ'লে তিনি কেমন ক'রে—সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে, একজন মুস্‌লিম সাহিত্যিকের মুখের উপর বল্‌তে পার্লেন যে, মুস্‌লিমের 'বীরত্বের ধারণা'-কে তাঁর একমাত্র দেয় বস্তু 'ভয় ও সঙ্কোচ'? মুসলমান গুণ্ডা--বাজারপ্রচলিত এই অতি অশ্রদ্ধেয় কথাটীকে তীব্রতর ক'রে শরৎচন্দ্র যে অসাহিত্যিক ভাষায় বলেন নি : বিদগ্ধ মুস্‌লিম সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকও গুণ্ডা—এজন্যেই কি তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র?

শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়, জাতি, এক ছাড়া দুই নয়। একথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী কর্ত্তে পারে। কিন্তু আরো একটি সহজ কথার দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করি। সেটি এই যে, সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি; এবং মানুষের মনকে

তৈরী করে তার ধর্ম্ম, তার সমাজ, তার পরিবেষ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটী কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

তথাপি দুই সম্প্রদায়ে অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘোচাতে হবে—শুধু সাহিত্যে নয়, সর্ব্বত্র। সাহিত্যিক মিলন থেকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ঐ জিনিষটী সংক্রামিত হবে, একথা সত্যি না-ও হতে পারে। কেননা সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিচ্ছেদ, সেটী স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্ভূত, স্বতন্ত্র কোন জিনিষ নয়; সে হ'লো একটী বৃহত্তর দ্বন্দ্বের, একটি বিপুলতর ব্যবধানের একখানি শাখা। রাষ্ট্রিক বিরোধ, ধার্ম্মিক বিবাদ, সামাজিক ব্যবধান—এদের মূলে সক্রিয় যে কৃষ্টিগত অনাত্মীয়তা, কৃষ্টিজাত স্বার্থবুদ্ধির যে সংঘর্ষ, সাহিত্যের উর্ব্বর ভূমিতেও তারা দেদার কাজ কচ্ছে। এযুদ্ধ কেমন করে বন্ধ হবে?

মনে হয় : দেশের কর্ম্মসাধক ও চিন্তা-নায়কেরা আজ দিক্‌ভ্রষ্ট। কোন্ পথে, কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, এই সনাতন প্রশ্ন তাঁদের বুদ্ধিকে বার বার কচ্ছে বিদ্রূপ। কেউ রেগে বল্‌ছেন : প্রয়োজন নেই এর সমাধান-চেষ্টার; সংঘর্ষ চলুক, সমাধান আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়্‌বে। এ যাঁরা বলেছেন, তাঁরা সমস্যার সম্মুখে—একটু ঘুরিয়ে—আপনাদের বুদ্ধির, সংস্কৃতির হীনতা স্বীকার কচ্ছেন। কারুর কারুর, দেখা যাচ্ছে পুরাতন প্রথায় অক্ষপাতের দিকে এখনো মোহের অন্ত নেই। আবার কেউ কেউ বল্‌ছেন : প্রচলিত ধর্ম্ম সমাজ ও কৃষ্টির বাইরে মানুষকে টেনে আন্‌তে হবে একটা উদার আর্থিক সাম্যনীতির ক্ষেত্রে;—এখানে সবার সঙ্গে সবাই আনন্দে হাত মেলাবে। এতো মত ও পথের মধ্যে কোন্‌টী হবে আমাদের?

জগতের প্রত্যেক বস্তুরই অভিনবত্বের একটা সৌন্দর্য্য আছে। আর কোনো কারণে না হোক, শুধু এই জন্যেই শেষের অপেক্ষাকৃত নতুন সমাধানটী অনেকের চোখে লাগে বড়ো মনোরম, বড়ো সুন্দর। কিন্তু এর মনোহারিত্বের ফল কতখানি ফল্‌বে, কতোখানি কল্যাণপ্রসূতা এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সে কেউ জানে না। কিন্তু এতটুকু হয়তো নির্ব্বিবাদে বলা যেতে পারে যে, এই মীমাংসার ফল বা পশ্চাৎপট যদি হয় শাস্ত্র, সমাজ ও কৃষ্টির বাইরে বাধাবন্ধহীন মুক্তির দিকে মানুষ মনের অভিগমন, তা'হলে বর্ত্তমানের এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান স্বল্পায়তন হবে, হয়তো নিশ্চিহ্ন হবে এবং হিন্দু-মুস্‌লিমে বিচ্ছেদের যে বেদনা আজ দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে তাকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে ভারতবাসী সম্মিলিত মানবতার জয়গানে দশদিক মুখরিত কর্ব্বে।

আজ, যাঁরা সাহিত্যের সেবক, তাঁদের গতি হোক অনুদার শাস্ত্র, সমাজ ও কৃষ্টির কুহেলিকার উর্দ্ধে—সুন্দরের ধ্যানলোকে; তাঁদের সাধনা হোক কঠিন নীরন্ধ্র ব্যবধানের বক্ষ ভেদ ক'রে পরস্পরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জান্‌বার, ভালোবাস্‌বার, অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

(আষাঢ়, ১৩৪৩)

"অবাঞ্ছিত ব্যবধান"

ইব্রাহীম খাঁ

বৈশাখ সংখ্যা 'বুলবুলে' শরৎচন্দ্র মুসলমান সাহিত্যিকগণকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি তিনি দরদের সঙ্গে বলিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। তবে সব কথায় তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই।

শরৎবাবু বলেন, "একথা বোধ করি বহুলোকই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যরসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে উঠে। বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা যেন উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছে। ....

অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু অজুহাতের বেশীও সে নয়।"

ইহার মর্ম্ম বোধ হয় এই ঃ—

সাহিত্য-সৃষ্টি মুসলমান পাঠকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

সেই জন্য মুসলমানের দৃষ্টি উদার হয় নাই, তাহার মন সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল হয় নাই।

তাই সংকীর্ণ অনুদার দৃষ্টিতে সে হিন্দুর ভাল কথাকে মন্দ কথা ভাবিয়া রাগ করে।

এরূপ রাগ করার সঙ্গত কারণ নাই।

আমাদের নিবেদন—

আমরা কিছু কিছু সাহিত্য বই পড়ি এবং পড়িয়া আনন্দ পাই। যে কয়জন মুসলমান সাহিত্যিককে চিনি, তাঁহাদের কাহাকেও দুর্ব্বাসা-ধর্ম্মী বলিয়া মনে হয় নাই। নজরুল ইস্‌লাম, কায়কোবাদ, ইয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখ লেখকের লেখা পড়িয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া মনে হয় নাই যে তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ নাই, আছে শুধু ক্ষোভ।

আমাদের মতে কি পুঁথি সাহিত্য, কি আধুনিক সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান গ্রন্থকারদের এক বিরাট অংশ সংস্কার-ধর্ম্মী এবং তাঁহাদের লেখার ফলেই মুসলমান সমাজে অশিক্ষার তুলনায় কুসংস্কারের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম; হয় ত সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের তুলনায়ও কম।

মুসলমান পাঠক ও লেখক সমাজ আপত্তি করিয়াছেন 'রাজসিংহ', 'পলাশীর যুদ্ধ' শ্রেণীর বইয়ের জন্য। এ আপত্তিকে আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টি বা অনুদার মনের পরিচায়ক মনে করি না, যেমন অনুদার মনে করি না হিন্দুর পক্ষে 'মাদার ইণ্ডিয়া'র প্রতিবাদ। কারণ কুমারী মেয়ো, বঙ্কিমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অপর সমাজের বা অপর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু বলিয়াছেন, "ক্রোধের বশে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু রটনা আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।"

আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত নই। যে কারণে জার্ম্মাণ সাহিত্য জার্ম্মাণ সাহিত্য, যে কারণে ইংরেজী সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্য, ঠিক সেই কারণেই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দু-সাহিত্য। তবে সেজন্য মুখ্যতঃ দায়ী মুসলমানের আলস্য ও কর্ম্মকুণ্ঠতা, এবং গৌণতঃ দায়ী হিন্দু লেখকদের অধিকাংশের মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য।

পরিশেষে শরৎ বাবুর নবীন মুসলমান বন্ধু যখন তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন, সাহিত্যে "আপনারা আমাদের টেনে নিন।

স্নেহের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন, দেখবেন.........বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ, একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়," তখন শরৎ বাবু বলিয়াছেন, "একথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমার না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয় ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।" শরৎচন্দ্রের এ উত্তর সদয়ও নয়, সঙ্গতও নয়। আমরা জানি ভালর সঙ্গে মন্দ বলার জন্য অনেক বাঙ্গালী হিন্দু গ্রন্থকার জেলে পচিয়াছেন, তবু তাঁহারা কলম ছাড়িয়া দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' লইয়া হিন্দু সমাজে তুমুল প্রতিবাদ হইয়াছে, তবু তাঁহার লেখা অব্যাহতই চলিয়াছে; স্বয়ং শরৎচন্দ্রের "শেষ-প্রশ্নে"র তীব্র প্রতিবাদ হিন্দুরাই করিয়াছেন, তবু তিনি 'যা আছে তাই ত নিরাপদ' মনে করিয়া লেখা বন্ধ করেন নাই। তবু বাংলার বাহিরের কোন্ মুসলমান কি করিয়াছে সেই অজুহাতে বাংলার বিরাট মুসলমান সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করার যে সঙ্কল্প ও সাধনা, ইহাকে কি করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিব? একটা সমাজের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন উক্তি করার পর তিনি আবার তাহাদিগকে 'বীর' বলিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা আর যাই হউক, শরৎচন্দ্রের যোগ্য হয় নাই।

আসল কথা, নবীন অধ্যাপকটীর এ আকুল আবেদন যে স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাটের নিকটও ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে আবেদন ভিক্ষার ভদ্র নামান্তর মাত্র, এবং ভিক্ষায় আর যাহাই পাওয়া যাক, মান পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান হইবে তিন পথে। প্রথমতঃ মুসলমানকে শিক্ষায় ও সম্পদে শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে হইবে; তখন হিন্দু লেখক স্বভাবতঃই তাহাদের কথা আলোচনা করিতে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইবেন। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান গ্রন্থকারগণকে নিজেদের বিষয় যোগ্যভাবে লিখিয়া হিন্দু গ্রন্থকার ও পাঠক-সমাজকে আকর্ষণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—দেশ সম্বন্ধে হিন্দু সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আরও উদার হইলে মুসলমানদের কথা আপনিই আসিবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ অভিজাতদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন; শরৎচন্দ্র তাঁহার চেয়ে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন এবং হিন্দু অস্পৃশ্য ও 'পতিত'গণকে লইয়া লিখিতেছেন, আরও লিখিতেছেন। আরও উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন ভবিষ্যৎ হিন্দু লেখক আজিকার-অবহেলিত মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখিতে অগৌরব বোধ করিবেন না।

শরৎ-সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যে আজ একথা বলিলাম, এ অতি ব্যথিত চিত্তেই বলিতে হইল, আশা করি শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সম্রাট ইহা বিশ্বাস করিবেন।

(শ্রাবণ, ১৩৪৩)

"অবাঞ্ছিত ব্যবধান"

কাদের নওয়াজ বি-এ, বি-টি

বৈশাখের "বুলবুলে" ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "অবাঞ্ছিত ব্যবধান" পড়ে দু'বছর আগের একটী স্মৃতি আমার মনে উঁকি দিচ্ছে। রূপনারায়ণ নদীর ঠিক ধারেই একটী লতা-বল্লরী ঘেরা বাড়ীতে উপন্যাস-সম্রাট আরাম কেদারায় বসে রূপনারায়ণের পানে চেয়ে ছিলেন, হঠাৎ আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম্। বেশ মনে আছে তিনি আমাকে সব-প্রথমেই বলেছিলেন যে ঢাকার পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব আক্ষেপ ক'রে তাঁকে ব'লেছেন যে মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের কবিতা মন্দ নয়, হিন্দু কবির কবিতার সাথে অনেকটীর তুলনা চল্‌তে পারে। কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে মুস্‌লিম লেখকেরা পিছনে এবং খুবই পিছনে, হিন্দু লেখকের সাথে এদিকে তাঁদের তুলনা চলে না। আমার মনে হয় আজ "অবাঞ্ছিত ব্যবধানে" শরৎবাবু যে নবীন মুসলমান বন্ধুর কথা বলেছেন তিনি উক্ত কাজী সাহেবই। যাক্, এবার তাঁর দু-একটী কথার উত্তর দেই—

শরৎবাবুর মতে সাহিত্যের "প্রয়োজনে"র দিক্‌টা কেউ আলোচনা করেন নি। সহিতের ভাব যাতে বর্ত্তমান আমরা তাকেই সাহিত্য ব'লে জানি। এই সাহিত্যের প্রভাবও যথেষ্টই তা মানি। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন--"The aim of literature is to vivify us, comfort us, speak to us and open its heart to us as friends." সত্যই তাই। বাংলাদেশ হ'তে সুদূর য়ুরোপের লোকের চিন্তা-ধারার সাথে আজ বাঙ্গালী সুপরিচিত ও তাঁদের ভক্ত, অনুরক্ত। মূলে আছে একমাত্র সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রয়োজন কি বলা খুবই শক্ত। কেউ ব'ল্‌বেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য "সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্"; কিন্তু এটাকে ঠিক আইনগত ক'রে মান্‌তে রাজী নই। ফুল আপন পুলকেই ফোটে, সুরভি ছড়ায়। এই ফোটাতেই তার আনন্দ। এর প্রয়োজনটা কি জানি নে, বৈজ্ঞানিক যাই বলুন। রাতে যখন চাঁদ ওঠে, জ্যোছ্‌নার রজত-তরণী বেয়ে সাদা পরী তার মিছিল্ নিয়ে যায় নীল গগনে, তখন ভিন্‌দেশী এক রাখাল ছেলে মুক্ত মাঠে ব'সে তলতা বাঁশের বাঁশীর সুরে আকাশ ভুবন ছেয়ে ফেলে--গানে গানে, তার মনের আনন্দে—এর প্রয়োজনটা কি জানি নে। তা ছাড়া শাওনের বিষ্টি পড়ার শব্দে, ভিজে মাটির ভুর্‌ভুরে গন্ধে, তর্ তর্ ক'রে ঝর্ণা নাচার ছন্দে, পাখীর কূজনে, ভোম্‌রার গুঞ্জনে ভাবুকের মন স্বভাবতঃই উচাটন হয়ে উঠে, কবির লেখনী সুন্দর কবিতার সৃষ্টি ক'রে ফেলে। এ সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা তখন মনেই ওঠে না। উপন্যাস-সম্রাটের নিজের কথাই এখানে বলি। তাঁর দেবদাস, পল্লী-সমাজ, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি লিখ্‌বার সময় সিনেমা-ম্যানেজারদের প্রয়োজনের কথা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সাহিত্যের প্রয়োজনটাও ঠিক এই ধরণের। সাহিত্যিক মনের আনন্দে সাহিত্য-সৃষ্টি করেন, প্রয়োজনের কথা তখন তাঁর মনেই থাকে না। Keats এর ভাষায় "It comes as naturally as leaves and flowers in a tree." অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে জোর করেও কিছু লেখা যেতে পারে, কিন্তু সেটাকে প্রকৃত সাহিত্যের মর্য্যাদা দেওয়া সচরাচর সাহিত্যিকের ধর্ম্ম নয়।

শরৎবাবুর মতে সাহিত্য মুস্‌লিম সমাজের অন্তর থেকে কুসংস্কার দূর ক'রে সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে নি। শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজে "ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠছে" এবং জিনিষটাকে আয়ত্ত না ক'রতে পেরে তাঁরা "বিকৃত ক'রে তুল্‌তেও পরাঙ্মুখ নন্।"

এথেকে স্বভাবতঃই মনে হয় মুস্‌লিম সমাজ একটা মরু-সদৃশ নীরস জড়পিণ্ড। কারণ যে মেঘ একস্থলে অঝোর ধারে বৃষ্টি ঢেলে দেয়, সেই মেঘই যখন মরুভূমির উপর দিয়ে ভেসে যায় তখন উষর মরুর সাধ্য থাকে না যে তার থেকে এক বিন্দু জলকণা সে নিঙ্‌ড়ে নেবে। সেটা হয়তো করিম রহিম অথবা বাংলার কতকগুলি মুস্‌লিমের পক্ষে খাটে, কিন্তু তাই বলে বিরাট মুস্‌লিম সমাজ সাহিত্যের সুবিমল রসাস্বাদনে অক্ষম একথা কী ক'রে বলা যায়? এই বাংলাদেশেই এক উর্দ্দু কবি মৃত্যুশয্যায় গেয়েছিলেন—

''সব্জা আ আ'বে রাওয়াঁ মুঝ্‌কো বহুৎ ভাতি হ্যায়,
কি জিয়ে দফনে উহাঁ মুঝ্‌কো যাহাঁ এয়সা হো'' ইত্যাদি

(অনুবাদ)

ছায়ায় ঘেরা ঐ সে সবুজ কুঞ্জ যেথায় রয়্
ছেয়েই আছে শষ্প শ্যামল মলয় মারুৎ বয়,—
যার পাশেতেই ফুলের ফসল আর ফুলেরি 'বাগ্',
কুল্‌কুলিয়ে নিঝর যেথায় ছড়ায় অনুরাগ,
শোভায় ঘেরা ঠাঁই সে আমি বড়ই ভালবাসি,
গোর দিও মোর সেথায় যেথা ফুট্‌ছে ফুলের রাশি।

কবি মৃত্যুশয্যায় কবিতাটী রচনা করেছিলেন এবং এ থেকে বেশ উপলব্ধি হয় যে তিনি মৃত্যুর পরও প্রকৃতির রম্য নিকেতন ও কবিত্বময় ঠাঁই কামনা করেছিলেন। প্রকৃত সাহিত্যিক যে, সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হ'ক্ তার প্রাণে সাহিত্য সুবিমল রসের সৃষ্টি না ক'রে পারে না। এটা স্বভাবের ধর্ম্ম, প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম।

এরপর শরৎবাবু সাহিত্যকে 'বিকৃত' করার কথা বলেছেন। 'বিকৃত' অর্থে তিনি কি ইঙ্গিত ক'রেছেন জানি নে। সাহিত্যে উর্দ্দু ও ফার্সি শব্দ ব্যবহারের কথাই হয়ত ব'লেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিকট বিনীত আরজ যে, যে সব উর্দ্দু-ফার্সি শব্দ ভাব-সম্পদের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বা সাহিত্যকে "like a prodigious helmet containing a head as small as the size of a walnut" গোছের ক'রে তুলেছে তার আমরা নিশ্চয়ই বিরোধী, সেটা সাহিত্যই নয়। কিন্তু যে যে শব্দ মুস্‌লিম আবাল-বৃদ্ধের আট্‌পৌরে ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না ও চিন্তাধারা যে শব্দগুলির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সাহিত্যে সেগুলির প্রবেশ-নিষেধ কোনরূপেই চল্‌তে পারে না। বরং সেগুলিকে বাদ দিলেই সাহিত্য কৃত্রিম রূপ ধারণ করবে এবং তাতে সুষ্ঠু ভাব প্রকাশেরও অসুবিধা ঘট্‌বে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই—

এক মুসলিম কৃষাণের বিষয় কথা-সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। কৃষাণের শেষ-শয্যা। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে, নীল গগনে আলোয়-কালোয় হোলিখেলা শুরু হয়েছে। কৃষাণের ছেলে বল্‌ছে—একটা ''হাফেজ'' ডাকো, বাপ্‌জানকে ''কোরানশরীফ্'' শুনাও, ''সুরে-ইয়াসিন''টাও পড়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস ফেল্ল।' তার পুত্র তখন ''লাশের'' ''গোসলের'' ব্যবস্থা ক'রে ''কাফন্'' আন্‌তে গেল।

এই বর্ণনার মধ্যে ''হাফেজ'' ও ''কাফন্'' শব্দের বাংলা পরিভাষা যাই দেওয়া হ'ক, সুষ্ঠু ভাব তা'তে প্রকাশ হবে না। ''লাশ''কে মৃতদেহ ব'লে ''গোসল্''কে স্নান বলার কোন সঙ্গত কারণও এখানে থাক্‌তে পারে না। ''কোরান''কে ধর্ম্ম-পুস্তক ব'লে ''সুরে-ইয়াসিন''কে মন্ত্র আখ্যা দিলে ভাব পরিস্ফুট না হয়ে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করবে। এরূপ স্থলে ঐ শব্দগুলি উর্দ্দু, ফার্সি বা যে ভাষাই হ'ক ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে সাহিত্য বিকৃত হবার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে ব'লে আমরা মনে করি নে। ইংরেজী ভাষায় ল্যাটিন্, গ্রীক প্রভৃতি শব্দ প্রবেশ ক'রে তাকে ''বিকৃত'' না ক'রে বরং পরিপুষ্টই ক'রেছে। বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও ঠিক সেই কথা খাটে ব'লে আমরা মনে করি।

শরৎ বাবু তাঁর নবীন মুস্‌লিম বন্ধুর আব্দার শুনে ব'লেছেন—''কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালকথার সঙ্গে মন্দকথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না ক'রবে বিচার না ক'রবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে।'' বল্‌তে কি, শরৎ বাবুর এ উক্তি সম্বন্ধেও একমত হ'তে পার্‌লুম নে। সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, পুরস্কার ও তিরস্কার সংসারে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সব নিয়েই যখন সাহিত্যের সৃষ্টি, তখন কথা-সাহিত্যেই বা তার ব্যতিক্রম হ'তে যাবে কেন? মুস্‌লিম সমাজ কি চান যে কথা-সাহিত্যে থাক্‌বে কেবল তাঁদের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ? এটা কি শরৎবাবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছেন? প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু এরূপ হ'তে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। হিন্দু সমাজ শিক্ষিত, উদার ও ক্ষমাশীল তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু একথাও সত্যি যে প্রকৃত মুস্‌লিম দীন হলেও হীন নয়, বাসা তার ভাঙ্গা হলেও আশা তার উচ্চ এবং সে ভক্ত ও শক্ত। অবশ্য মুসলমান সমাজের অনেকে

শিক্ষা-দীক্ষা হীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের কথাই শরৎবাবু হয়ত ইঙ্গিত করছেন, কিন্তু এই শ্রেণীর অজ্ঞের দল সব সমাজেই কম বেশী কি নেই? সেই সব ভাবপ্রবণ অজ্ঞদের কার্য্যকলাপ কোন সমাজই সমর্থন করেন না, বরং তীব্র নিন্দাই ক'রে থাকেন। এই সব ঘৃণিত ব্যাপারের পরিসমাপ্তি সেই দিনই হবে যেদিন দেশে শিক্ষার আশাতীত উন্নতি হবে। তবে একথা সত্যি যে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের লেখা পড়ে তাঁদের জাতি-ধর্ম্মের কথা কারো মনেই আসে না। মহাপুরুষের ধর্ম্ম "মানবতা"। সাম্প্রদায়িকতা সেখানে কর্পূরের মতই উবে গেছে। তাঁদের পেয়ে হিন্দু-মুস্‌লিম সমভাবেই গৌরবান্বিত, তাতে সন্দেহই থাকতে পারে না। কবিগুরুর "তাজ মহল" কবিতা প'ড়ে আমরা সগৌরবে বলি—"It is a greater Tajmahal than that of Shahjahan." সুতরাং সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের কথাই যদি প্রাধান্য লাভ করে তবে সেটা বিশেষ লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

পরিশেষে বক্তব্য, হিন্দু-সাহিত্য বা মুস্‌লিম-সাহিত্য ব'লে কোন বিভিন্ন সাহিত্য আছে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি নে। সাহিত্যের স্বরূপ এক, সে চিরন্তন ও সার্ব্বজনীন। তবে তাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা perfect ক'রতে গেলে হিন্দু ও মুস্‌লিম সাহিত্যিকের সহানুভূতি, সহযোগ ও সম্প্রীতির একান্ত দরকার। আমার মনে হয় সাহিত্যের এই "পূর্ণিমা-মিলন" সাহিত্য-গগনের "শরৎচন্দ্রে"র দ্বারাই সম্ভব। তিনি যে মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের দোষত্রুটি সংশোধনের চেষ্টায় "অবাঞ্ছিত ব্যবধানে" নিজের মত ব্যক্ত ক'রেছেন এটা আশা ও আনন্দের কথা।

(ভাদ্র, ১৩৪৩)

বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 'বুলবুলের' লেখক লেখিকাদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। এ সম্পর্কে আমাদের লেখক ও পাঠক-গোষ্ঠির বক্তব্য আমরা 'বুলবুলে' প্রকাশ করিব।—বুলবুলের সম্পাদক]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে, বাঙ্গালী জাতির ভাষা প্রাকৃত হইতে পরিবর্তিত হইয়া, প্রাচীন বাঙ্গলার রূপ ধরিল। ...পাল ও সেন-রাজাদের যুগে যখন বাঙ্গালীর ভাষা গড়িয়া উঠিল মগধ হইতে বাঙ্গালায় আনীত প্রাকৃত ও অপভ্রংশের। স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালা ভাষা তাহার স্বকীয় রূপে প্রথম যখন দেখা দিল, তখন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও সূত্রপাত হইল।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে, বিদেশ হইতে আগত মুসলমান তুর্কী বাঙ্গালায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিবার পূর্ব্বে নিখিল ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির অংশ-স্বরূপ বাঙ্গালীর সংস্কৃতির স্বাধীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি দেখা দিল। আদিম-বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী এই প্রথম যুগের বাঙ্গালী, সাহিত্যে, দর্শনে, ভাস্কর্য্যে ও চিত্র-শিল্পে চিরকালের জন্য বিশ্বমানবের আস্বাদন ও আলোচনার উপযোগী সম্পদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী তখন সাক্ষাৎভাবে নেপাল ও তিব্বতের গুরুর কাজ করিয়াছে, যবদ্বীপ ও দ্বীপময় ভারতেও বাঙ্গালীর প্রভাব পহুঁছিয়াছে, এবং তখন খুব সম্ভব ব্রহ্মদেশের ইতিহাসেও বাঙ্গালীর স্থান হইয়াছে, ব্রহ্মের শিল্পে—বাস্তুবিদ্যায় ও ভাস্কর্য্যে খুব সম্ভব বাঙ্গালীর হাত পড়িয়াছে।

*

তার পরে ঘটিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী বিদেশী তুর্কীদের দ্বারা উত্তর-ভারত বিজয়; এবং বাঙ্গালা-দেশেও তুর্কী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হইল। এই বিদেশীদের দ্বারা আক্রমণের ঝঞ্ঝার মুখে, বাঙ্গালী প্রমাদ গণিয়া ঘরমুখো হইয়া পড়িল। কিন্তু শীঘ্রই সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সে মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনায় মন দিল—রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলচণ্ডীর কথা, কৃষ্ণায়ণ অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত, এবং নানা পুরাণ, সংস্কৃত হইতে ভাষায় ভাঙ্গিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য, মহাপুরুষ-চরিত্রে, মহাজন পদাবলীর গানে, দার্শনিক বিচারমূলক গ্রন্থে, অপূর্ব্ব শ্রী ও সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিল। তখন এই ব্রহ্মদেশেও, বর্মী-ভাষী মগ বা আরাকানীদের রাজসভায়, বাঙ্গালা সাহিত্য একটা বড় স্থান করিয়া লইল। ব্রহ্মের অংশীভূত আরাকান-রাজ্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠে; চট্টলের কতকগুলি প্রথিত-যশাঃ মুসলমান বাঙ্গালী কবি, আরাকানের রাজা ও রাজামাত্যদের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্য-সাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের রচিত 'আর্‌কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', কলিকাতা, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)। বাঙ্গালী পণ্ডিতের কুশাগ্র বুদ্ধি নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে আরও তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মোগল-বিজয় ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ঘটিল;—বহুদিন পরে বাঙ্গালা-দেশ নূতন করিয়া আবার তাহার সংস্কৃতির মূল উৎস-স্থল উত্তর-ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হইল।

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজের সাহচর্যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-এশিয়ায় নূতন যুগের অগ্রদূত-রূপে দেখা দিল; বাঙ্গালী রামমোহন রায়, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে নূতনভাবে আবিষ্কার করিয়া (রামমোহনের পূর্ব্বেও উপনিষদ যথেষ্ট আলোচিত হইত) আধুনিক সভ্য মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দিবার প্রয়াস করিলেন।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা, এবং বিবেকানন্দের কর্মের মধ্য দিয়া, ভারতের শাশ্বত শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও পুনঃপ্রচারে বাঙ্গালী যত্নবান্ হইল। এই সময়ে, বাঙ্গালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভূয়োদর্শন ও সমীক্ষা, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আত্মপ্রকাশ করিল; মধুসূদনের কাব্যে নবীন যুগের বাঙ্গালীর সাহিত্যবোধ এবং নূতন ভাবের সাহিত্য-চেষ্টা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তাহার স্থান করিয়া লইল, এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর বিশ্ববিমোহিনী প্রতিভার প্রসাদে, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাঙ্গালীর স্থান, সমগ্র মানবজাতির প্রীতিস্মিতের সঙ্গে সাদরে স্বীকৃত হইল। এই যুগের নেতা ইংরেজ-জাতি; যুগনেতা ইংরেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবকে, অদৃষ্ট শক্তিকর্তৃক নিয়োজিত বলিয়া, ওদিকে যেমন বাঙ্গালীই প্রথম মানিয়া লইয়াছিল, ইংরেজের পতাকার তলে থাকিয়া বাঙ্গালী যেমন ওদিকে সমগ্র উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া, এক অভিনব বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ইংরেজের অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতি ও discipline অর্থাৎ চরিত্রনীতিকে সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল,—তেমনি আবার এদিকে ভারতবর্ষের ও অন্য পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বাঙ্গালীই প্রথমে সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত করিল, বাঙ্গালীই ভারতের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল, এবং এই হেতু তাহাকে এক দুঃসহ দুঃখের বোঝাও স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বিজ্ঞান ও দর্শনের সার্থক সাধনায় বাঙ্গালী আত্মনিয়োজিত হইল; শিল্প ও কলায় শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীনন্দলাল, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে রূপ ও রস-সাধনাকে অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি প্রদান করিলেন; এবং ইঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা, ও নানা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও পণ্ডিতের সাধনার দ্বারা, বাঙ্গালী বিশ্বমানবের সেবায় তাহার অর্ঘ্য উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইল,—তাহার সে অর্ঘ্য, বিশ্বের পণ্ডিত ও রসিকজন সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে এবং ভারতমাতাকে সম্মানিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙ্গালীর চিন্তা, বাঙ্গালীর কর্ম, বাঙ্গালীর শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত, এবং বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা, যে-কোনও জাতির পক্ষে গৌরবময় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতে বাঙ্গালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, জাতির মহত্ত্বের অংশভাক্ প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের গৌরব অনুভব করিবার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে।

কিন্তু বাঙ্গালী হওয়ার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে, অবস্থা-গতিকে তাহার বহু দায়িত্ব এবং দুঃখও আসিয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত দায়িত্ব যেন আমরা মানুষের মত পালন করিতে পারি; সে দুঃখ-সমূহ যেন বীরের মত পরাভব করিতে বা সহিয়া যাইতে পারি। আমাদের সে সমস্ত দায়িত্বের কথা এবং দুঃখের কথা আমি নূতন করিয়া বলিতে চাহি না—তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

*　　　*　　　*　　　*

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের কথা আমি ভাল রকম জানি না। মুসলমান সমাজে বোধ হয় অন্ধ-বিশ্বাসের প্রভাব বেশী, আনুষ্ঠানিক ধর্মের দিকেই ঝোঁক বেশী; মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের মত শিক্ষা এতটা বিস্তারলাভ করে নাই; এবং যে-ধরণের শিক্ষা বাঙ্গালা দেশে মুসলমান সমাজের নেতারা আদর্শ-শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন বা আপনাদের মনকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, সে-ধরণের শিক্ষা মুসলমানকে নিরাবিল জ্ঞানের সাধনা হইতে দূরে রাখিবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। এবিষয়ে আমাদের হাত নাই; কিন্তু এ ব্যাপারটি, রক্ত-সম্পর্কে আমাদের সাক্ষাৎ ভ্রাতৃ-স্থানীয় একই জাতির একই ভাষার প্রতিবেশীর জীবনকে গড়িয়া তুলিবে বলিয়া, ইহার প্রভাব অথবা ইহার সংস্পর্শ নানা ভাবে আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী হিন্দুদের জীবনেও আসিয়া পড়িবে।

হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজের সংহতি-শক্তি প্রবলতর; ভাব ও চিন্তার জগতে এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-সাধনায় হিন্দু সংস্কার-মুক্ত হইলেও, ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু তাহার বর্ণ-ভেদ, তাহার স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার, বিবাহ-বিষয়ে তাহার নানা বিধি-নিষেধ লইয়া, কুল-ক্রমাগত সংস্কারের বোঝা বহিয়াই বিব্রত; এবং যেখানে তাহাকে বাহিরের জগতে আসিয়া অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষে পড়িতে হইতেছে, সেইখানেই ব্যবহারিক জীবনের এই সমস্ত সংস্কার তাহাকে ধীরে ধীরে বর্জ্জন করিতে হইতেছে। সামাজিক বিধি-নিষেধ জিনিসটিকে জীবনের পথে কেবল বাধা বলিলে অন্যায় হইবে; উহাতে এক উচ্চ চরিত্র-গত আদর্শের স্থানও আছে; আত্ম-দমন ও ত্যাগ উহার দুই বড় স্তম্ভ; উহা এক প্রকার সামাজিক শৃঙ্খলাও বটে, উহা মানুষের

মনকে ও চরিত্রকে disciplined অর্থাৎ নীতি ও সদাচারযুক্ত করিতেও সাহায্য করে; হেলায় উহাকে উড়াইয়া দিলে চলে না। কিন্তু জিনিসটিকে যুগোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীর কোলে যে হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপযোগী সামাজিক বিধি-নিষেধ এখনকার বৃহত্তর ব্যাপক জীবনের অনুপযোগী হইয়া যাইতেছে। ইহা আমরা অহরহঃ দেখিতেছি। এখানে প্রাচীন রীতির দোহাই পাড়িয়া, নিরর্থক মাথা না কুটিয়া, ধীর ভাবে, বিশেষ সহানুভূতির সহিত, করুণার চোখে সমস্ত পূর্বাপর বিচার করিয়া, মত দিতে হইবে।—যাহা হউক, দেখা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ চিন্তায় ও মতে স্বাধীন, সামাজিক জীবনে আবদ্ধ। মুসলমান উহার বিপরীত; চিন্তার স্বাধীনতা মুসলমান ধর্মের কতটা অনুমোদিত, তাহা মুসলমানগণই বিচার করিবেন; তাঁহাদের সামাজিক জীবনে উহার প্রভাব বা প্রসার কম—অন্ততঃ হিন্দুর চেয়ে কম বলিয়াই বোধ হয়। নবীন কিছু যদি উপযোগী ও সুন্দর হয়, তাহাকে গ্রহণ করিবার আগ্রহও তাঁহাদের মধ্যে কম। কিন্তু মুসলমান, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, বর্ণ-ভেদ, বিবাহ-সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ প্রভৃতি হইতে সামাজিক জীবনে মুক্ত বলিয়া, তাহার মনে ক্রমাগত 'ইহা করিও না, উহা করিতে নাই' এরূপ নিষেধ ঝঙ্কৃত না হওয়ায়, সে জীবনের পথে মুক্তচ্ছন্দ হইয়া এবং নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতে পারে।

বাঙ্গালী হিন্দুর যে আদর্শ, যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা এতদিন ধরিয়া তাহার জীবনের সব চেষ্টায় ও তাহার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাঙ্গালার বহু মুসলমান এখন সাত্মাভিমান হইয়া সেই আদর্শ ও সে-সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে, তাহার ধর্মানুমোদিত আধ্যাত্মিক আদর্শের এবং তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির বিরোধী বলিয়া মনে করিতেছে। বহু বাঙ্গালী মুসলমান নেতা এখন নূতন পথে বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন। অল্পসংখ্যক বিদেশী তুর্কী মুসলমানের বাঙ্গালায় আগমনে ও তাহাদের রাজশক্তির প্রতাপে, এবং ক্বচিৎ বিদেশী মুসলমান প্রচারক ও সাধকের প্রভাবে, বাঙ্গালার হিন্দু ও বৌদ্ধ অনেকে মুসলমান ধর্মকে স্বীকার করায়, বাঙ্গালী মুসলমানের উদ্ভব হইল। সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী মুসলমান বাড়িয়া চলিয়া, অবশেষে বাঙ্গালায় সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান বাজাদের রাজত্বকালে, দেশে অপ্রতিহত মুসলমান প্রতিপত্তি থাকার সময়ে, বাঙ্গালী হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে মুসলমান রাজশক্তির বা সাধারণ প্রজার মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ঘটিলেও, তাহাতে তেমন ক্ষতি হইত না; কারণ, বাঙ্গালী মুসলমানের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধি, বাঙ্গালী হিন্দুর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত স্বাজাত্য অনুভব করিত। সাধু ও দরবেশ, যোগী ও কালন্দর, সুফী ও বৈদান্তিক, এবং উভয় ধর্মের সাধারণ নীতিপরায়ণ গৃহী, পরস্পরকে একই তীর্থের উদ্দেশে যাত্রী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তখনকার দিনে, যে দিন এই বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালী মুসলমান তাহার মাতৃভাষাকে নিজ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিরোধী বলিয়া মনে করিত না, মাতৃভাষার রূপটী বজায় রাখিয়া তাহাতে সাহিত্য-রচনা ধর্ম-বিরোধী বলিয়া কখনও তাহার মনে হয় নাই;—এখন কতকগুলি গোঁড়া মোল্লা ও মৌলানা, মাতৃভাষা-সম্পর্কে যে-ভাবের শিক্ষা দিতেছেন, সে-ভাব মুসলমানদিগের মধ্যে পূর্বে ছিলই না। এই চরমপন্থীদের কথা যে মুসলমান সমাজের প্রাণের কথা নহে, তাহা বঙ্গভাষার বহু সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান লেখক অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সেইজন্য, চট্টলের বাঙ্গালী মুসলমান কবিরা বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি বড় বড় মুসলমানী কাব্য দান করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে-সমস্ত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে অ-মুসলমান বাঙ্গালীর মোটেই বাধে না। সেই জন্যই ইস্‌লামের বীজ বাঙ্গালীর প্রাণে উপ্ত হইয়া, অঙ্কুরিত হইয়া তরুরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার পরে, খাঁটী বাঙ্গালা মারফতী গানে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরভি পুষ্প মঞ্জরিত হইয়াছিল। তখন ভিতর হইতেই বাঙ্গালী মুসলমানের আধ্যাত্মিক জাগৃতি ঘটিয়াছিল; বাহিরের অনুচিকীর্ষা তখন তেমন প্রবল ভাবে কার্যকর হইতে পারে নাই; বাঙ্গালী মুসলমান ধর্মে ইস্‌লামীয় হইলেও, জাতি-ভ্রষ্ট হইবার কথা ভাবে নাই। এখন বাহিরের হাওয়া, এবং দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত বাতাবরণ, উভয়ে মিলিয়া, বাঙ্গালার মুসলমানের মনোভাবকে তাহার জাতীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী সংস্কৃতি-গত কেন্দ্র হইতে অপসারিত করিয়া দিতে চাহিতেছে। এক গৌরবময় মুসলিম জগৎ, যাহার সহিত তাহার রক্তের যোগ বা নাড়ীর টান নাই, যাহার সম্বন্ধে আছে কেবল এক ভাবময় আকর্ষণ, সেই আরব-ইরানী-তুর্কীর অতীত গৌরবের মধুর স্বপ্ন এবং তাহার আবেগময় অনুকরণের চেষ্টা, তাহাকে উৎকেন্দ্রী করিয়া দিতে চাহিতেছে। নূতন ভাবে তাহাকে তাহার সপ্ত-শতবর্ষ-ব্যাপী জীবনে, এই প্রথমবার সম্পূর্ণরূপে পরাশ্রয়ী করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে, বাঙ্গালার মুসলমান শিক্ষিত সমাজ দোটানায় পড়িয়া গিয়াছে; তাহার নিজের অবস্থায় সে অস্বস্তি

অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং নূতন করিয়া তাহার চক্ষুর সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত এক গৌরবময় বিশ্ব-ইস্‌লামের আদর্শ, সেই অস্বস্তিকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমানের এইরূপ আদর্শ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে যে প্রতিফলিত হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। একথা সত্য যে, এই নবীন আদর্শের প্রকাশ এ-যাবৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া হয় নাই। কারণ, এই আদর্শ এ ভাবে বাঙ্গালা দেশে ইতিপূর্ব্বে দেখা দেয় নাই, ইহা নূতন যুগের জিনিস। ইতিমধ্যে কতকগুলি মুসলমান সাহিত্যিক এই নূতন ভাবের উপযোগী করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস ব্যাপক হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় হয় তো একটি নূতন মূর্তি দেখা দিবে; এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য এক সার্বজনীন ভাষা ও সাহিত্য না থাকিয়া, দুইটি সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিখণ্ডিত হইবে। সে দিন আসিতে হয় তো দেরী আছে; হয় তো বা সে দিন অতি সন্নিকট। কিন্তু মনে হয়, সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ভাষা নিজ শক্তিতে বিদ্যমান আছে, ও যাহার সাহিত্য এতদিন ধরিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া, বিভিন্ন উপভাষীদিগকে এক সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা এত শীঘ্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে না। তবুও, বাঙ্গালা ভাষার সমক্ষে বিদ্যমান এই সম্ভাব্যতা—আমার মতে ইহা একটা গুরুতর সঙ্কট—ইহা যে একটি অস্বস্তিকর রূপ ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ঐক্য রক্ষায় চেষ্টাশীল প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর অবহিত হওয়া উচিত।

আমি হিন্দু, কিন্তু বাঙ্গালা তথা ভারতের মুসলমান সংস্কৃতিকে, তাহার সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, বাস্তুরীতি, সঙ্গীতকলা, নাগরিকতা প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত অঙ্গকে, নিজের জিনিস বলিয়াই মনে করি, ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিতে অত্যন্ত গৌরব বোধ করি; সেই সংস্কৃতি উত্তোরোত্তর প্রবর্ধমান হইয়া, ভারতের অবিনশ্বর গৌরবকে আরও মহনীয় আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলুক, ইহা আমি প্রাণের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা করি। তথাপিও, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমি মুসলমান সাহিত্যাদর্শ ও ভাষা পরিচালনের প্রস্তাব সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চা করিব না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য এই নবীন ভাবের মুসলমান আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করিতে পারে কিনা, তাহা বাঙ্গালী মুসলমান চিন্তানেতা, মনীষী ও পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। আশা করি, বাঙ্গালী মুসলমান মনীষিগণ এই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐতিহাসিক সত্যদৃষ্টির চোখে এবং সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানানুমোদিত অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুসারী বিচারের চোখে বিশ্লেষ করিয়া দেখিয়া, নিজ সমাজের তথা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, যথা-কর্তব্য নির্দেশ পূর্বক মুসলমান সমাজের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রচেষ্টাকে সুপথে পরিচালিত করিবেন। তবে এই যে বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে 'হিন্দু' নাম দিয়া ইহা যে বাঙ্গালার হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিক্‌থ, সে কথা ভুলিয়া গিয়া, বাঙ্গালী মুসলমান ইহা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, তাহা কতটা আভ্যন্তর প্রেরণার ফল এবং কতটা বা বাহিরের উত্তেজনার ফল, তাহা বিচার করিবার বিষয়। এখন ইংরেজ রাজশক্তির বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করায়, বাঙ্গালার মুসলমান জগতে এক নূতন উল্লাসের হিল্লোল বহিতেছে। যদিও, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ রাখেন না ও যাঁহারা সত্যকার দেশভক্ত ও দেশসেবক, এমন বহু মুসলমান, এই অবস্থায় উৎফুল্ল হইবার কিছু দেখেন না।

বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানের উৎপত্তি, ভাষা, গভীর অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি যেমন এক, উভয়ের ঐতিহ্য যেমন এক, তেমনি উভয়ের শেষ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিও এক; যদিও আমাদের কেহ-কেহ ক্ষণিক লাভ বা লোকসানের মোহে, ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে পড়িয়া, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছি না। উপস্থিত অবস্থা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জীবনের পক্ষে এক বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

[চৈত্র, ১৩৪৩]

অভিভাষণ*

নজরুল ইস্‌লাম

আপনারা আমাকে আপনাদের ফরিদপুর মুস্‌লিম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ ক'রে যে গৌরব দান করেছেন, তার জন্য আমার প্রাণের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমি বর্ত্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে, দেশের সেবা থেকে, কওমের খিদ্‌মতগারী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগরদ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাথীহীন নির্জ্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোল-সঙ্গীত; আর সেই শব্দায়মান সুর-ঊর্ম্মির মুখরতার মাঝে আমি বসে আছি বন্ধুহীন—একা। এই বিশ্বজুড়ে যে মহামৌনীর স্তবগাথা নিঃশব্দ-ঝঙ্কারে রণিত হচ্ছে, যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌন-মহিমার পূজারী, তবু এ-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জ্জনতার বক্ষ জুড়ে শুন্‌ছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায়, তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্ম্মন্তুদ! কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপর আমি আমার ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি কর্‌তে চেয়েছিলাম, কী অপরিমাণ আশা, দুর্জ্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন জাতি নতুন মানুষের কল্পনা করেছিলাম, আমার সেই ভিত্তিকে জানি না কার অভিশাপে ধরণীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বস্তুর জগত অভাবের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি আজও করি নি, কিন্তু ধৈর্য্যের দুর্গম দুর্গে আর কত দিন আত্মরক্ষা কর্‌ব?

বেশী দিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই ছাত্রসমাজকে অগ্রদূত ক'রে নব বিজয়-অভিযানের আমি হব তূর্য্যবাদক, নকীব, সৃষ্টি করব সুন্দরের জগৎ—কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণীর পঙ্কিল বক্ষভেদ ক'রে আন্‌ব পবিত্র আব-জম্‌জম্-ধারা—সে আশা আমার আজও ফল্‌ল না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধূলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত, কতদিন মনে করেছি আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে। তাই যারা কোলাহল ক'রে আমায় নিতে আসে, মনে হয় তারা নিতে এসেছে আমায় গোরস্থানে—প্রাণের বুলবুলি-স্থানে নয়। কতদিক থেকে কত আহ্বান আসে আজও; যত সাদর আহ্বান আসে, তত নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি,—ওরে হতভাগ্য, তোর দাফনের আর দেরী কত? কতদিন আর ফাঁকি দিয়ে জয়ের মালা কুড়িয়ে বেড়াবি? কওমের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য কতটুকু আমি করেছি—তবু তার প্রতিদানে অতি কৃতজ্ঞ জাতি যে শিরোপা আনে, তাতে শিব আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়! তাই আপনাদের দাওত যখন পেয়ে ধন্য হ'লাম, তখন দ্বিধাভরে অসঙ্কোচে তা কবুল কর্‌তে পারি নি। যে ভাগ্যহীন নির্জ্জনতার অন্ধ-কারায় অভাবের শৃঙ্খলে বন্দী, সে কোথায় পাবে মুক্তির বাঁশী? শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি আপনাদের কাসেদের কাছে, দূতের কাছে—কিন্তু তাঁরা আমার আর্জ্জি মঞ্জুর করেন নি। একদিন যারা ছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মার আত্মীয় তারা যখন তাদের প্রতি আমার ভালবাসার দোহাই দিল তখন আর থাক্‌তে পারলাম না। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন, দুঃখশোকের শত জিঞ্জীরে বন্দী হয়েও আস্‌তে হ'ল আমাকে আপনাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে। ফরিদপুরের তরুণ ফরীদদলের নেতৃত্ব করার অধিকার নাই এই সংসারের চিড়িয়াখানায় বন্দী সিংহের—যে সিংহ আজ হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের ট্রেডমার্কের সাথে এক গলাবন্ধে বাঁধা পড়েছে! আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উল্লেখ ক'রে একদিন বলেছিলেন "যাকে বিলিতী কুকুরে কাম্‌ড়েছে তাকে আমাদের মাঝে নিতে ভয় হয়!" সত্যি ভয় হ'বারই কথা; তবু কুকুরে কাম্‌ড়ালে লোকে নাকি ক্ষিপ্ত হ'য়ে অন্যকে কাম্‌ড়াবার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠে, আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই আমি হ'য়ে গেছি বিষজর্জ্জরিত নির্জ্জীব!

কিন্তু এ শোনাতে ত আমায় আপনারা আহ্বান ক'রে আনেন নি, আমায় আপনারা শামাদানে এনে বসিয়েছেন সেই

---

* ফরিদপুর জেলা মুস্‌লিম ছাত্রসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

প্রদীপকে যা একদিন হয়ত বা অত্যুগ্র আলোকদান করেছিল। আপনাদের এ আদরের অসম্মান আমি কর্‌ব না, নিভ্‌বার আগে আমি আমার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে যাব। তাতে আপনাদের পথের হদিস্ মিল্‌বে কিনা—সকল পথের দিশারী খোদাই জানেন। আমি নিভ্‌বার আগে এই সান্ত্বনা নিয়েই নিভ্‌ব যে, আমি আমার শেষ স্নেহবিন্দুটুকু পর্যান্ত জ্বালিয়ে আলো দিয়ে যেতে পেরেছি।

তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যা'দের দেখ্‌লে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কাবাশরীফ জিয়ারত করলাম; যা'দের চোখে দেখেছি তৌহীদের রওশনী, যা'দের মুখে দেখেছি খালেদ-তারেকের-মুসার ছবি, যা'দের মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হ'য়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র। যা'দের বাজুতে দেখেছি আলী হাইদারের বেদেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজান-ধ্বনি! তোমরা আমার সেই ধ্যানের মহামানব-গোষ্ঠী। এ আমার এতটুকু অত্যুক্তি কল্পনা নয়। তোমাদেরে আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রম ক'রে সহস্রাধিক বৎসর দূরে—ওহদের যুদ্ধে বদরের ময়দানে, খয়বরের জঙ্গে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকায় মুসা তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মেশেরের পীরামিডের পার্শ্বে—পীরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরাণের বিরাণমুলুক আবাদ কর্‌তে তা'র আল্‌বোর্জ্জের চুড়া গুঁড়া ক'রে দিতে! দেখেছি জাবলুত তারেকের—জিব্রাল্‌টারের অকূল জলরাশির মধ্যে নাঙ্গা শম্‌সের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হ'য়ে স্পেনের কার্ডোভায় বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত কর্‌তে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতান সালাহ্‌উদ্দিনের সেনাদলের মাঝে—দেখেছি কুরূপা য়ুরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি—রীফসর্দ্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে, পহ্‌লবীর দক্ষিণে, ইবনে সউদের সম্মুখে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশান-বর্দ্দার হ'য়ে। তোমরা যে পথ দিয়ে চলে গেছ, মনে হয়েছে—আমি যদি ঐ পথের ধূলি হ'তাম! আমি প্রাণ-মন পেতে দিয়েছি তোমাদের অভিযানের ঐ পায়ে-চলা পথে। আমি যেন তোমাদেরই সেই পায়ে-চলা পথের ধূলিসমষ্টি মূর্ত্তি ধরে এসেছি তোমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তোমাদের আর একবার তেমনি ক'রে আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে।

কোথায় সে শাম্‌শের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো, আর একবার তেম্‌নি ক'রে—যে কওম যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে—যে পথে চ'লে তা'রা একদিন পারস্যসাম্রাজ্য রোমকসাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহীদের বাণী শুনিয়েছিল। তোমাদেরই মাঝে থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম—দাঁড়াও তাঁ'র পতাকাতলে তহ্‌রীমা বেঁধে। বল, আল্লাহো আক্‌বর, হাঁকো হায়দরী হাঁক্, হপ্ত আস্‌মান চাক্ হ'য়ে ঝরে পড়ুক খোদার রহমত, নবীর দোওয়া। চাঁদ সেতারা গলে পড়ুক কল্যাণের পাগল-ঝোরা।

আর্ত্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ কর্‌ছে—কে কর্‌বে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্ব্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে পথ দেখাও। তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসরাত— সেই পুলের ওপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নূতন জাতি। তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জ্জন, যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জ্জন কর এ জ্ঞানার্জ্জন। নওকরীর জন্য, দাসখৎ লিখার কায়দাকানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নমে যাক্ তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন—তা স্কুলই হোক্—আর কলেজই হোক্ আর মাদ্রাসাই হোক্— পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মস্‌জিদের মতই পাক্। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত্ কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয়, তবে কাজ কি এই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বাজে খরচ ক'রে।

জরাগ্রস্ত পুরাতন পৃথিবী চেয়ে থাকে যুগে যুগে তোমাদের এই কিশোরদের—এই তরুণদের মুখের পানে, তোমরা শোনাও তাকে তাজাবতাজার গান, আর তোমাদের এই প্রাণ-চঞ্চল সঙ্গীতের যাদুতে সে পা'ক নব-যৌবনের কান্তিশ্রী! তোমাদের বরণ ক'রে দুলহিনের সাজে সেজে ষড়ঋতুর ডালা শিরে ধরে। আজও সে চেয়ে আছে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমাদের পানে—তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দানে তার প্রতীক্ষার শূন্যতা কি পূর্ণ হবে না? কত কাজ তোমাদের—ধরণীর দশদিক ভ'রে কত ধূলি, কত আবর্জ্জনা, কত পাপ, কত বেদনা—তোমরা ছাড়া কে তার প্রতীকার করবে?—কে তার এলাজ করবে?

তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আয়ুর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধি-নিষেধের, অনাচারের জিঞ্জীরে বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদীর আশায় ফরয়্যাদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে, তার এ আর্জ্জী কি বিফল হ'বে?

এই বাংলায় নাকি শতকরা পঞ্চান্নজন মুসলমান। কিন্তু গুনতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্নজনকে নিয়ে বাঙ্গলার সত্যকার গৌরব করবার কতটুকু আছে তা হিসাব করতে গেলে মনে হয়—আমরা শতকরা পাঁচজন হ'লেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দুঃখে তাই বলেছিলাম—

ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত।

এ লজ্জা, এই অপমানের গ্লানি থেকে তোমরা তরুণ ছাত্রদল বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও। সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার নিরাকরণ কর।

ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে, সুবহ্ সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তিরূপে আমাদের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান ক'রে আমাদের শুধু সহধর্ম্মিণী নয়, সহকর্ম্মিণী হয়েছিলেন—যে নারী সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসুলকে—তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দুরতম দুর্গে বন্দিনী ক'রে—সকল আনন্দের, সকল খুশীর হিস্‌সায় মহরুম ক'রে। তাই আমাদের সকল শুভকাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দ্দার—তোমাদের অর্দ্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর ক'রে দাও তাঁদের সাম্‌নের ঐ অসুন্দর চটের পর্দ্দা যে পর্দ্দার কুশ্রীতা ইস্‌লাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্ত্তব্যের কঠোরতা, জীবনপথের দুরধিগম্যতা হ'য়ে উঠবে সুন্দরের পুষ্পপেলব। কর্ম্মে পাবে প্রেরণা, মর্ম্মে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা, ভগিনী, কন্যা, জায়াদের যে অপমান করেছি—আজও তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মে এ জাতির আর মুক্তি হবে না। তারও আগে তোমাদের কর্ত্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিমজাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদেব সে একতা নেই—হিংসায়, ঈর্ষ্যায়, কলহে, ঐক্যহীন, বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি ক'রেছি; কত তার নাম—সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফী, শাফী, হাম্বলী, মালেকী, লা-মজহাবী, ওহাবী আরও কত শত দল—এই শত দলকে একটী বোঁটায়, একটী মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধাবিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক সামিল কর, এক জামাত কব—সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে ফেল!

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪০]

অভিভাষণ*

নজরুল ইস্‌লাম

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সব চেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন, ''ঝড় আসে নিমিষের ভুল!'' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জীরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

''কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর হ'তে
চেপে আছ দ্বারখানা।''—

তখন আপনারা তাকে বরণ ক'রেছিলেন খাঞ্চাভরা সওগাত, রেকাবী-ভরা শির্‌নি দিয়ে, শিরীন্ নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা প'ড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপ্‌নি নুয়ে পড়েছিল। সেবার শুধু সে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে—ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণ-তীর্থ জিয়ারত্ কর্‌তে।

সেবারে সে বলেছিল—

খুল্‌ব দুয়ার মন্ত্র বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্ণাধারা
মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।
হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুল্‌ব দুয়ার
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়!
দ্বারের মায়া ক'রে তোরা
বন্দী রবি নিজ কারায়?
নাইক চাবি, হাত আছে তোর
খুল্‌ব দুয়ার তা'র সে ঘায়!

সেই ঝড় আবার এসেছে—হয়ত বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়োহাওয়া এসেছে ''পূবের হাওয়া'' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়ত বদলে গেছে। আজ হয়ত সে বল্‌তে চায়—

''ঘা দিয়ে দ্বার খুল্‌বনা গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাব!''

---

* চট্টগ্রাম এডুকেশান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দিবসে সভাপতির অভিভাষণ।

সেবার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল-ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনিই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কাল-বৈশাখী রূপে, শ্রাবণে সেই আসে পূবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভ'রে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দু'লে ওঠে তারি হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * * * * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই ব'লে তাকে ফেলেও দিইনি। আমি গোধূলি-বেলায় রাখাল-ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণ-শিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে—সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বল্‌বার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে, যাঁর কীর্ত্তি শুধু তাঁকেই মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের—তথা বাঙ্‌লার সারা মুস্‌লিম-সমাজকে নরনারীনির্ব্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও—পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শা'জাহানের তাজমহল গ'ড়ে উঠেছিল শুধু মোমতাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime- মহিমময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ—সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজও করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে—আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এম্‌নি ক'রে এক একটা সর্ব্বভোলা সর্ব্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন ক'রে। তাঁকে বলি, হয় পাগল—নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ্‌খবরী নিয়ে, কর্ত্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্তশেষে উড়ে যায় নতুন বুল্‌বুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জু'ড়ে জাগে বিরাট একটা অভাববোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখী উ'ড়ে যায়—তারপর আসে সেই সুদিন—যার আগমনী-গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখীকে। কিন্তু পাখী তখন থাকেনা'ক, থাকে পাখীর স্বর।

আমি তাঁরির মত গানের পাখী—আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণই কর্‌তে—যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার হাজার সালাম!

তিনি আজ আমার এ সালাম নিবেদনের বহু ঊর্দ্ধে, বহু দূরে, তবু এ ভরসা রাখি, যে, আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন, এবং আমার এই ভাসিয়ে-দেওয়া সালামী-ফুলও সেই না-জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি—তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা ক'রে—তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুল্‌তে পার্‌ব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা ব'লে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের 'আজিজ' নাই, কিন্তু বাঙ্‌লার আজিজরা—দুলাল ছেলেরা আজও বেঁচে আছে—তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে এই হোক্ আপনাদের—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি ক'রে গেছেন। তাঁর 'বাহারের' মত বাহার হয়ত বা থাক্‌তেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারের' মত 'নাহার' আপনাদের চট্টলের মুসলমানদের ঘরে কয়টী আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। ওস্তাদ নেই, শিষ্যরা ত আছেন। একজন ওস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের ওস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্ব্বত-মালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নি-গিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণ-ধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য হিংস্র শার্দ্দুল সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে —এ কথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

আপনাদের শিক্ষা সমিতিতে এসেছি আমি আর একটী উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুস্‌লিম সমাজের বিশেষ ক'রে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, আমি যে মহান স্বপ্ন দিবারাত্রি ধ'রে দেখছি, তাই ব'লে যাওয়া। সে স্বপ্ন যে একা আমারই, তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুস্‌লিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নবনবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধ'রে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্ব্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুস্‌লিম, যেমন ক'রে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জ্বরা'র খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্যে হোক, আদাওতি ক'রে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইস্‌লামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কাল্‌চারের পীঠস্থান—আর্‌ফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণে ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না—ঋণ দানও করব, আমরাও আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব—এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্যপানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি, সমুদ্র বেশী দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মত আমাদেরও কাল্‌চারের, সভ্যতা জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমাদের মত শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্য সত্যই বুল্‌বুলিস্তানে পরিণত হোক,—ইরানের শীরাজের মত। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী শমশিত-তব্‌রেজ এই শীরাজ বাগে—এই বুল্‌বুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকীর মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ "কাল্‌চারাল সেন্টারের" প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শু'নে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়—আমি শুধু ততটুকুই বল্‌ব। এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না! এই কাল্‌চারাল্ সেন্টারের সঙ্গে রাজনীতির কতটুকু সম্পর্ক, আমি তাই একটু খু'লে বল্‌ব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনতি দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সব চেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষাদীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে, যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার অতীত মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের

অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ মজুরদেরে (আর, তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশী) দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়ত বা এরা যথাপূর্ব্বম্ তথা পরম্। দরিদ্র মূর্খ কলিমদ্দি মিঞাই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিম্বা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না—মনে করে ও শুধু কাহিনী। হয়ত একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদেরে অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা (State language) ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন—এখন যেমন আমরা ইংরেজী শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁরা কোনো মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্ম্মের উপর বিরূপ হয়ে উঠেননি। শিবাজী প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজীব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে, person এর against এ—গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডিই এই যে, আমার সব চেয়ে কাছের মানুষটিকেই সব চেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায় ইংরাজি, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু ক'রে ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানীশ, চেক, স্ক্যানড্যানেভিয়ান, চীনা, জাপানী, হনলুলু, গ্রীনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর—তারিরই কোনো খবর রাখিনে বা রাখবার চেষ্টাও করিনে বরং ঐ না জানার গর্ব্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, penny wise pound foolish!

হিন্দু আরবি ফার্সি উর্দ্দু জানেনা, অথচ আমাদের শাস্ত্র সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু ক'রে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওঁদের মুখের বোর্কাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোর্কা-মুক্ত হ'লনা আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানেনা ব'লে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য, আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা-বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ ক'রে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙীন উঠানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে, যে, অন্ততঃ বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত—তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম্ম সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহ'লে তাকে আরবি ফার্সি বা উর্দ্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল ক'রে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরিজী ভাষায় ইস্লামের ফিরিঙ্গী রূপ দেখতে হবে! কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল ক'রে শেখেনা, তার আবার আরবী ফার্সি! কাজে ন' মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা "পড়ে ফার্সি বেচে তেল!" আর তাঁদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ্ হালুয়া রুটীর জন্য! কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদেরে আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবী ফার্সির সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত এনে দিয়েছেন জানিনা। সে অমৃত তাঁরা একা পান করেই খোদার খাসি হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি—এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে অর্থ আছে—যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্র-ভূমির যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা' না পারলে অনর্থক ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে, ইস্লাম বলে চীৎকার করবেন না।

আমাদের next-door-neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই

ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামীরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে—সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition—Sportsman-like competition.

[ফাল্গুন, ১৩৪৩]

"মুসলমান অবনত যতই হউক বাঙলার মাটী আঁকড়াইযাই সে পড়িযাছিল। আর হিন্দু উন্নতি যতই করুন মাটার সহিত সম্বন্ধ তাঁহার ক্রমেই আলগা হইয়া গিয়াছিল। ফলে মুসলমান দুঃস্থ যতই হউক সে করিয়াছে অর্থ 'উৎপাদন', আর হিন্দুর পথে সাফল্য যতই আসুক তিনি করিয়াছেন অর্থ 'উপার্জ্জন'। যে দেশে কৃষিই প্রায় অধিবাসীর জীবিকা সে দেশে 'উপার্জ্জন' আসিয়া দাঁড়ায় শোষণে। কোন সম্প্রদায়—মগজ তাহার যতই থাকুক, যখন শুদ্ধ মাত্র শোষকের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার দ্বারা বৃহত্তর দেশের কল্যাণ আর সম্ভবপর হয় না। আর মাটী আঁকড়াইয়া যে পড়িয়া থাকে অযোগ্যতা তাহার যত বড় হউক শুধু বুদ্ধির জোরে তাহাকে জিতিবার উপায় নাই—যেমন করিয়া বুদ্ধিমান ছোক্‌রারাও মায়ের উপর জিতিতে পারে না..............বাঙলার হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই অল্পাধিক গৌরবের বস্তু। কিন্তু কৃষি-প্রধান বাঙলা দেশে মাটীর সহিত সম্পর্কচ্যুত উহার যে ইতিহাস উহা কাঁচে আবদ্ধ পুতুলের ইতিহাস। উহার রঙ আছে, প্রাণ নাই, উহাতে কলের আটার চাকচিকা আছে, কিন্তু ঢেঁকীছাঁটা ক্ষুদকুঁড়ার 'ভাইটামিন' নাই। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করিতে হইলে মাটীর সহিত যে সম্বন্ধ শিক্ষিত হিন্দু ক্রমে হারাইয়া বসিয়াছেন উহা পুনঃ স্থাপিত করিতে হইবে। তাঁহাদেরও অনেক জনকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে। বাঙলার মঙ্গলের জন্য ইহা করা প্রয়োজন।"

স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি

হুমায়ুন কবির

আজ আপনারা যে আমায় ত্রিপুরা জিলা ছাত্র সম্মেলনে ডেকেছেন, সে জন্য আমি একান্ত গৌরব বোধ করছি। কুমিল্লার সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের বহু স্মৃতি জড়িত -- পুরাতন সেই সমস্ত দিনের কথা স্মরণ করে আপনাদের এ সাদর আহ্বান আমার কাছে আদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কলকাতায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদ উপেক্ষা করেও আমি আজ না এসে পারিনি।

বাংলার জাতীয় জাগরণের আন্দোলনের বহুদিক থেকেই কুমিল্লা স্মরণীয়। যখন কোন শাসনতন্ত্রকে আমূল পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা হয়, পুরাতন তন্ত্র তখন প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি আঘা তের সৃষ্টি করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়---মানুষের দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে সেই আঘাত সহ্য করে এগোতে না পারলে নতুন সমাজ নতুন রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সেই দুঃখসাধনায় ত্রিপুরা কোনদিন পিছুপা হয়নি---জাতির পুরাতন ইতিহাসের সমস্ত গ্লানি দুঃখের আগুণে জালিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার চেষ্টাই ত্রিপুরার গত দুই তিন দশকের ইতিহাস।

ছাত্র জাতির এবং সমাজের অংশ তাই জাতির জাগরণের আন্দোলনে ছাত্র পরাঙ্মুখ থাকতে পারেনা। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসেই তাই আমরা দেখি যে সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ছাত্র তার অংশ গ্রহণ করেছে---আন্দোলনে এনেছে তীব্রতা, এনেছে ক্ষীপ্রতা, এনেছে স্বার্থচিন্তানিষ্কলুষ আত্মত্যাগের প্রেরণা। বহুবার বহুক্ষেত্রে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে রাজনীতিনিরপেক্ষ আত্মসমাহিত ছাত্রজীবনের পরিকল্পনা কেবলমাত্র স্বপ্নবিলাস। সমাজের নিবিড় সংগঠনের মধ্যে বাস করে যে সংগঠনের চাঞ্চল্য, সে সংগঠনের পরিবর্ত্তন ছাত্রকেও স্পর্শ করতে বাধ্য। তাই রাজনীতিকে এড়াতে গেলেও রাজনীতি ছাত্রকে এড়িয়ে চলবে না।

বিপদও কিন্তু সেইখানে। রাজনীতিকে ছাত্র এড়াতে পারে না, কিন্তু যৌবনের সমস্ত আবেগ সমস্ত উদ্দামতা দিয়ে ছাত্র যদি রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলেও দেশের ভবিষ্যৎ সমস্যাময় হয়ে উঠে। ছাত্র এবং যুবক দেশের ভবিষ্যৎ আশার প্রতীক---আজ যারা ছাত্র, কাল তাদেরই উপর পড়বে দেশের রাজনীতি পরিচালনার ভার। বর্ত্তমানের জগতে রাজনীতি কেবলমাত্র আবেগ বা বিলাসের সামগ্রী নয়---বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার বিচার করে আজ আমাদের দেশে রাজনীতির ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার জন্য চাই অবকাশ, চাই কঠোর সাধনা, চাই বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও সাধনার সঙ্গে পরিচয়। আবেগ-উদ্বেল প্রেরণায় যদি ছাত্র আজ রাজনীতির স্রোতে ভেসে যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা, সেই পরিচয় লাভ করবার অবকাশ কই? সেইজন্য আমার বহুবার মনে হয়েছে যে রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ছাত্রের পূর্ণ সহযোগিতা প্রথম দৃষ্টিতে কাম্য হলেও দেশের মঙ্গলের দিক থেকে সে বিষয়ে সন্দেহ উঠে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের তাগিদে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-হানির সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে।

দেশের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে তাই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা এই দুই বিপদের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পনে আপনার কর্ম্ম-ধারার নির্দ্দেশ। একপক্ষে রাজনীতিপরাঙ্মুখতা আত্মঘাতি এবং ঘটনার সংস্থানে বোধ হয় অসম্ভব। অন্যপক্ষে রাজনীতি-সর্ব্বস্বতাও দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে হানিকর। তাই ছাত্রকে আজ রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, অথচ রাজনীতির মধ্যে আবেগের প্রাবল্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে চলবেনা। আবেগ যৌবনের ধর্ম্ম, অথচ সেই যৌবন ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করেই আজ ছাত্রকে আপনার কর্ম্মধারা স্থির করতে হবে।

একমাত্র বুদ্ধির সাধনা---বুদ্ধির স্বাধীনতা দিয়েই তা সম্ভব। তাই আজ ছাত্র আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হবে বুদ্ধির স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। আমাদের দেশে আবেগের প্লাবন বহুবার আমরা দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে একথাও দেখেছি যে সে প্লাবণে

সমাজে কোন বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন হয়নি। যে পরিমাণ উদাম, যে পরিমাণ আশা, যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ এবং সাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সে পরিমাণ সার্থকতা মেলেনি। তারি একমাত্র কারণ যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দিক হান, তাই চারিদিকে চাঞ্চল্য তাতে জাগে, কিন্তু সম্মুখের অটল পাহাড়ের স্তুপ তাতে ভেসে যায় না। আমরা প্রায়ই শুনি বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, তখন অন্য কোন চিন্তার সময় নেই। আবাল বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সবাইকে সেই আগুন নেবাতে এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে নরনারী শিশু যুবাবৃদ্ধ সবাই মিলে আগুন আগুন বলে হাহুতাশ করলে আগুন নেবেনা। সবাই মিলে চারিদিকে ছুটোছুটি করলেও ঘর বাঁচেনা – ঘর বাঁচাতে হলে, আগুন নেবাতে হলে চাই সংগঠন, চাই বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কার্য্যধারা। বালক বা শিশুকে তখন হয়তো আগুন থেকে সরিয়ে রাখাই প্রয়োজন, কারণ যারা আগুনের সঙ্গে যুঝবে তারা চায় সবল সহযোগিতা, তারা চায় কর্ম্মের নির্ব্বিঘ্ন অবকাশ। আমাদের দেশে যে ভাববিলাস, যে আবেগউদ্বেলতা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, বুদ্ধির শাসনের মধ্যে তাকে একাগ্র ও শক্তিশালী করে তোলাই আজ তাই ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবেই ভাববিলাসের সমৃদ্ধি। যে বিষয়ে জ্ঞান বিশদ, সেখানে ভাববিলাসের অবকাশও নাই; আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবালুতার মূলেও তাই সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্র সংগঠনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাব; পরিচয়ের তীক্ষ্ণতার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের যে সমস্ত গলদ এবং অবিচার প্রকাশিত হয়, সে অন্যায় ও ত্রুটীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভাবালুতার প্রয়োজন নাই। আবেগ সেখানে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত এবং সেজন্য একাগ্র। একাগ্র আবেগ প্রবাহের মধ্যে যে উদাম, তার শক্তি বিপুল, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটী তার সম্মুখে টিকতে পারে না। তাই ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা বুদ্ধির সাধনা এবং স্বাধীনতা, যে সবল মুক্ত বুদ্ধির প্রতাপে দেশের সমস্ত অভাব অভিযোগ স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও নির্দ্দেশ করে দেবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে ভাবালুতার যে দুর্ব্বলতা, তার উল্লেখ করেছি। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে, অথবা সে বিষয়ে আমরা ভাবিনা বলেই যে সে সম্ভব, সে কথাও বলেছি। তারই আরও একটা দিকের এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের অতীত ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখতে পাই যে আমাদের কর্ম্মসাধনা ব্যক্তি, পরিবার বা বড় জোর গোষ্ঠির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—প্রকৃত জাতিয় আন্দোলনে সে প্রায় কোনখানেই বিকাশ লাভ করে নাই। তাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্য প্রাণপাতের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পারিবারিক স্বার্থের জন্যও ব্যক্তি আত্মদান করেছে, গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য সাধনারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু জাতি বা দেশের জন্য যে প্রেরণা, তা আমাদের ইতিহাসে অল্পদিনের আবির্ভাব, এবং সেজন্যই আজও তা আমাদের মজ্জাগত হয়ে ওঠেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ বিদেশীর উপস্থিতি আমাদের মনে দেশাত্মবোধ খানিকটা জাগিয়েছে, কিন্তু সেখানে যে সে উপলব্ধি নিগূঢ় নয়, বিদেশীর উপস্থিতিই তার প্রমাণ। একথা নিঃসন্দেহ যে দেশাত্মবোধ যদি প্রকৃতপক্ষে আজ সর্ব্বভারতকে কর্ম্মপ্রেরণা দিত, তবে বিদেশী একমুহূর্ত্ত এদেশে টিকে থাকতে পারত না। আমাদের রাজনৈতিক দলাদলির আজও খানিকটা এরই মধ্যে মেলে—জাতিয়তার চেয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই আজ পর্য্যন্ত আমাদের মানস সংগঠনে অধিকতর কার্য্যকরী, জাতির চেয়ে গোষ্ঠির প্রতি অনুরাগ ও আবেদন আমাদের কাছে প্রবলতর।

রাজনীতি ক্ষেত্রের বাইরে একথা আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বিদেশীর উপস্থিতির দরুণ সেখানে জাতিয়তা বোধের পরিচয় খানিকটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি আজ বোধ হয় গোষ্ঠিপর্য্যন্তও পৌছেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেরই একমুখী প্রকাশ, কিন্তু নিছক সামাজিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় আরো পরিস্ফুট। ব্যক্তি হিসাবে আমাদের মতন পরিচ্ছন্ন মানুষ পৃথিবীতে বেশী নাই—স্নান পোষাক সমস্ত বিষয়েই আমরা শুচিতাপ্রিয় কিন্তু সামাজিক পরিচ্ছন্নতা বোধের কথা তুল্লেই আমাদের আর সেমূর্ত্তি থাকে না। সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধ, সামাজিক স্বাস্থ্যচিন্তা আমাদের একেবারে নাই বল্লেই চলে—ব্যক্তি বা বড় জোর পরিবারের ভাবনা করেই আমরা ক্ষান্ত। পরিবার বা গোষ্ঠি পর্য্যন্ত তাই আমাদের একাত্মবোধ পৌছেছে—আজ পর্য্যন্ত দেশ বা সমাজকে তা গ্রহণ করতে পারেনি।

ছাত্র আন্দোলনের বুদ্ধির সাধনার অন্যতম লক্ষ্য হবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডি অতিক্রম করে সামাজিক বোধের সৃষ্টি। এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত তীক্ষ্ণ এবং নিবিড় হবে, সামাজিক বোধও ততই প্রবল হতে বাধ্য।

সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবধারার নিগূঢ় সম্বন্ধ আজ অনস্বীকার্য্য। তাই আধুনিক সমাজেব অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রূপের বিশ্লেষণের ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বোধের পরিবর্ত্তনও অবশ্যাম্ভবী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতদিন ব্যক্তি বা পরিবার স্বাতন্ত্র্যই প্রচলিত ছিল, ততদিন ব্যক্তি স্বাধীনতা বা পারিবারিক একত্ত্ববোধ সমাজের ভাবধারায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য। নিজের অথবা পরিবারের পরিশ্রম যখন সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনধারার অঙ্গে পরিণত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নতুন লক্ষ্য খুঁজে পায়। তাই আমাদের ইতিহাসে এতদিন যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় একত্ববোধের অভাব ছিল, তা দূর করবার একমাত্র উপায় সমাজগঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

সমাজের বিপুল জনজাগরণের মধ্যে আপনার স্থান নির্দ্দেশে তাই ছাত্র আন্দোলনেব সার্থকতা। বুদ্ধির সেই সাধনায় ছাত্র যেদিন বুঝবে যে দেশের যারা মেরুদণ্ড, সমাজের যারা সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বহারা বঞ্চিত মানুষকে সমাজ সংগঠনে আপনার স্থান না দিলে দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক যুক্তি কেবলমাত্র স্বপ্ন-বিলাস, সেদিনই দেশের ছাত্র আন্দোলন জয়যুক্ত হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ গুরুতর আকার ধারণ করেছে, এবং সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি বহুক্ষেত্রে বহুবার প্রকাশ করেছি—আজ কেবল এইটুকু বলব যে সমস্যা কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা। ছাত্র আন্দোলন যদি কেবলমাত্র গোষ্ঠিব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ছাত্র আন্দোলনেও যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এসে পড়বে, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তা আসছেও। কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাগবাটোয়ারাব যে কলহ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে ছাত্রেরাও সে কলহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ছাত্র আন্দোলন গোষ্ঠির সীমানা অতিক্রম করে সমস্ত দেশ এবং সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক সংগঠন বুঝতে চাইবে, এবং সেই জ্ঞান ভিত্তি করে নতুন সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখবে, সেই মুহূর্ত্তেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা তার কাছে অর্থহীন।

মূলত ছাত্র আন্দোলনের সমস্যা তাই এক। বাস্তব জ্ঞানেব ভিত্তির উপর আমাদের কর্ম্ম প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং সেই বাস্তব জ্ঞানের সাধনাই ছাত্র আন্দোলনের সাধনা। সমাজগঠনের নিবিড় সংযোগ এবং পরস্পর নির্ভরতার ফলে সমাজের নতুন প্রতিচ্ছবি ছাত্র আন্দোলন এনে দেবে—সমাজের বঞ্চিত এবং চির-নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির স্বপ্ন তারই মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে মুক্তি কেবল বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দাসত্বশৃঙ্খল যে বিচিত্ররূপে সমাজের পূর্ণবিকাশকে ব্যহত করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বাধার সৃষ্টি করে, সেই দাসত্বশৃঙ্খল চূর্ণ করাই ছাত্র আন্দোলনের চরম লক্ষ্য।

২

ছাত্র আন্দোলনে বুদ্ধির মুক্তির সাধনার কথা কাল আপনাদের কাছে বলেছি, বলেছি যে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে পৃথিবীর বিপুল বঞ্চিত জনসাধারণের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ বলে গ্রহণ না করতে পারলে ছাত্র আন্দোলনের কল্যাণ নেই। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বার্থগত যে বিরোধ, সে বিরোধকে এড়াবার একমাত্র উপায়ও সেইখানে, কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্ত কলহেব মূলে মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালী শ্রেণীসমূহের স্বার্থ সন্ধান। পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্যের মধ্যেও তার পরিচয় মেলে।

আপনারা সবাই জানেন যে ছাত্র আন্দোলন একান্ত ভাবে বিংশশতাব্দীরই অভিব্যক্তি। বিংশশতাব্দীতেও মহাসমরের পূর্ব্বে এর বিশেষ কোন লক্ষণ বা প্রকাশ ছিল না। আমি বলতে চাইনে যে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কোনদিন ছাত্রদের মধ্যে কোন আন্দোলন হয়নি, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবে ছাত্র তাব অংশ গ্রহণ করেনি। আমার বক্তব্য এই যে ছাত্রেরা পূর্ব্বে এসমস্ত আন্দোলনে যোগ দিলেও ব্যক্তিগত হিশেবেই দিয়েছে—সংবদ্ধভাবে ছাত্রসমাজ পূর্ব্বেকার কোন আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেনি। বর্ত্তমানে পৃথিবীব প্রায় প্রত্যেক দেশেই যে সুসংবদ্ধ এবং সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তার অস্তিত্ব ছিলনা বল্লেই চলে। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরে এভাবে ছাত্র আন্দোলন প্রসারলাভ করল কেন, সে কথাও আমাদের বিশেষ করে বিচারের বিষয়।

এই সঙ্গে আর একটী বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছাত্র আন্দোলনের পতাকা আপনারা তুলেছেন—সে পতাকার বাণী কি, স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি,—পৃথিবীর দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বলে

ঘোষিত হয়েছে। আপনারা কি ভেবেছেন যে আরো বহু আদর্শ, আরো বহু লক্ষ্যের মধ্যে এই তিনটাকেই ছাত্র আন্দোলন কেন বেছে নিল? সে সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি, যদি এ আদর্শের তাৎপর্য্য বোঝবার চেষ্টা করি, তবে সেই সঙ্গেই ছাত্র আন্দোলন যে কেন মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই গড়ে উঠল, তারও ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি—ছাত্র আন্দোলনের সংঘবদ্ধ বিকাশ ঠিক মহাযুদ্ধের পরে। এদুটো জিনিষ মনে রাখলে এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিকভাবে উপলব্ধি করলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

মহাযুদ্ধের পরে কি এমন অবস্থা হয়েছিল যার জন্য দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলন স্বতউৎসারিতভাবে আত্মবিকাশ করল? মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে কা'রা একথা বিচার করলেই একথার উত্তর পাওয়া যাবে। প্রতি দেশেই প্রাণ দিয়েছে তরুণেরা—তারা জীবনের আনন্দ, জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসাকে ঢেলে দিয়েছে—কি জন্য? প্রতি দেশেই একই রব - দেশের স্বাধীনতার জন্য? দেশের গৌরবের জন্য, দেশের আত্মবিকাশের জন্য এ মহাযুদ্ধ। প্রতি দেশেই গির্জ্জায়, স্কুলে, কলেজে বক্তৃতামঞ্চে একই ধ্বনি উঠেছে—ন্যায়ের জন্য, সত্যের খাতিরে আদর্শের তাগিদে এ যুদ্ধ। প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তরুণেরা তারা শুনেছে যে পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানের জন্য তাদের এ উৎসর্গ। যুদ্ধের শেষে কিন্তু দেখা গেল যে চিরকালের মত যুদ্ধের অবসানের জন্য যে মহাযুদ্ধ, তার পরিণতিতে যে শান্তি, তার ফলে পৃথিবী হতে শান্তির চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থাই হয়েছে।

যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত তরুণেরা দেশে দেশে একথা ভেবেছে। স্বভাবতই এ সমস্যা তাদের মনে উঠেছে যে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আত্মরক্ষার জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল কেমন করে? প্রত্যেক দেশেই বলেছে যে তার অভিযান কেবলমাত্র ন্যায়ের জন্য, সত্যের মর্য্যাদায়। কিন্তু যুযুধান প্রতিপক্ষ দেশ সকলেই ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে সে ন্যায়ের, সে সত্যের স্বরূপ কি? তাই দেশে দেশে তরুণেরা ভাবতে লাগল—যুদ্ধ হয় কেন? যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কোন অভিলাষ, কোন আদর্শ সাধনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম?

সেই আত্ম-বিশ্লেষণ, সেই ভাবনার ফলেই ছাত্র আন্দোলনের জন্ম। সেই জন্যই ছাত্র আন্দোলন একান্তভাবে যুদ্ধপরবর্ত্তি যুগের বিকাশ। সেই জন্যই ছাত্র আন্দোলনের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি।

ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা—স্বাধীনতা। যুদ্ধে যে-সমস্ত তরুণ গিয়েছিল, তারা দেখল যে এক দেশ অন্যদেশকে অধিকার করে গ্রাস করতে চায় বলেই পৃথিবীতে অশান্তি, পৃথিবীতে বিপ্লব। মানুষ রাজনৈতিক জীব বটে কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। সাধারণ মানুষ চায় যে নিরুদ্বেগ শান্তিতে কোনভাবে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেই, তাই অসহ্য দুঃখ-গ্লানি বা অসুবিধা না হলে সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে যোগ দিতে চায় না। পরাধীন দেশে কিন্তু পদে পদে সেই গ্লানি জীবনকে ভারাক্রান্ত করে, পদে পদে বাধা ও নিষেধ চিত্তের প্রকাশকে ব্যহত করে, সহজ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সম্ভাবনাকে ধ্বংশ করে। তার কারণও স্পষ্ট। একদেশ অন্যদেশকে জয় করে অধীন করে রাখতে চায় কেন সে প্রশ্ন তুল্লেই আমরা দেখতে পাই যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই একদেশ অন্যদেশকে জয় করে।

সাম্রাজ্যের গৌরব, জাতির গর্ব্ব এ সব কারণ যে নেই, তা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু সে সব কারণ তো সব দেশেই রয়েছে। তাই একদেশ অন্যদেশকে জয় করতে চায়, জয় করতে পাবে কেবল তখনই যখন বিজয়ী দেশ বিজিত দেশকে নিজের পণ্যসামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ইংরিজিতে কথা আছে—Trade follows the flag—পতাকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা—সে কথার মর্ম্মও এই। প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্য দেশে নিজের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করে সে দেশের অর্থ নিজে ব্যবহার করবে—প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্য দেশের জিনিষ ব্যবহার করে দেশের অর্থ বিদেশে যেতে দেবে না। দেশ অর্থে অবশ্য এ ক্ষেত্রে দেশের ধনিকদেরই বোঝায়—তারা খোঁজে নিজেদের লাভ এবং সেই লাভের লোভে দেশকে ছেড়ে তারা বিদেশকেও গ্রাস করতে চায়। বিদেশের অর্থ এসে দেশে জমে এবং সেই অর্থের অংশ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যে জোটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে একশো বৎসর আগে ইংলণ্ডের গ্রামে সপ্তাহে দুদিন মাংস খেতে পারত এ রকম লোক বেশী ছিল না। অথচ আজ যার দিনে দুবেলা মাংস জোটেনা, সে নিজেকে হতভাগ্য মনে করে, আর

যার কাজ জোটে না সেই বেকারও সরকার থেকে সপ্তাহে চৌদ্দ টাকা ভাতা পায়।

ধনতন্ত্রবাদ এমনি করে গড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে সাম্রাজ্য, কারণ বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করবার জন্য রাজনৈতিক প্রভুত্ব চাই। ইংরেজ আমাদের দেশে যে ভাবে তাদের কাপড়, তাদের অন্যান্য সওদা চালিয়েছে, অন্যদেশে কি তা পেরেছে? কিন্তু ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপদও সেইখানে। অন্যান্য দেশ দেখল যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের দৌলতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি। তখন ফরাসী ভাবল, জার্ম্মাণি ভাবল যে আমরাই বা বাদ যাব কেন? সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেশে ধনতন্ত্রবাদ গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাইল নতুন নতুন বাজার, নতুন নতুন সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যলিপ্সু যুযুমান শক্তি সমূহের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবী ভরে উঠল।

কেবল মাত্র তাই নয়। কেবল বিভিন্ন দেশেই এমনি ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়নি—একই দেশের ধনতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক স্ফুরণে আত্মবিরোধ প্রকাশ করেছে। আমরা দেখেছি যে ধনতন্ত্রবাদের শ্রীবৃদ্ধির দিনে দেশের দরিদ্রের ভাগের উদ্‌বৃত্ত অনেক খানির অংশ জোটে। ফলে দেশে জীবিকার মান বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মজুরের মজুরী, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকে। তখন ধনিক দেখে যে তার লাভের পরিমাণ কমে এসেছে, তখন সে খোঁজে পৃথিবীর কোথায় জীবিকার মান নীচু, কোথায় মজুরী কমে মজুর মিলবে, কোথায় জায়গাজমির দর নামমাত্র। তার স্বাভাবিক পরিণতিতে ধনিকের অর্থ বিদেশে চলে যায়, ইংরেজ চেষ্টা করে যে তার অর্থ ভারতবর্ষে খাটিয়ে মুনাফার মাত্রা বাড়ায়।

মুনাফার মাত্রা তাতে বাড়ে, কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের বিপদও ঘনিয়ে আসে। একতো বিভিন্ন স্বাধীনদেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশে প্রত্যেক দেশই চায় যে কেবলমাত্র তার জিনিষই সমস্ত জগতে চলবে, প্রত্যেক দেশই চায় যে তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে সূর্য্য ডোববেনা। তারপরে এসে জোটে অধীন এবং অর্দ্ধ-অধীন দেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ—সেখানেও কিন্তু বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরই স্বার্থ জড়িত। ফলে যুদ্ধ বাধতে আর দেরী লাগে না—মানুষ শান্তি ও প্রগতির বাস্তবরূপ ভুলে গিয়ে মোহের টানে আত্মবিনাশে মেতে ওঠে।

যুদ্ধের পরে পৃথিবীর দেশে দেশে তরুণেরা একথা ভাবল। তারা দেখল যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদই পৃথিবীতে যুদ্ধের গোড়ার কথা, এবং পরাধীনতা, বিদেশজয়ের উপরেই সে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। তারা দেখল যে যতদিন পৃথিবীতে কোন দেশ পরাধীন থাকবে, ততদিন যুদ্ধেরও সঙ্কট ঘুচবে না, কারণ বিজয়ী দেশ তার উপরে প্রভুত্ব করতে চাইবেই, তাকে শোষণ করতে চাইবেই। স্বাধীনতা ভিন্ন সে পরাধীন দেশের দারিদ্র্যও ঘুচবে না, কারণ পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে যে রাজশক্তির সাহায্য, রাজশক্তির অনুকূলতা ভিন্ন শিল্প বানিজ্যের প্রসার হয় না, এবং পরাধীন দেশে রাজশক্তি দেশের শিল্প বানিজ্য বিনষ্ট করে বিজয়ী দেশেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে। তাই পরাধীন দেশ সর্ব্বত্রই দরিদ্র, সর্ব্বত্রই অসন্তোসে ভরা—সঙ্কটের এক একটা সন্ধিস্থল। যতদিন সে বিক্ষোভের কারণ ঘুচবে না, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও দূর হবে না—হতে পারে না।

তাই পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলনের প্রথম এবং গোড়ার কথা স্বাধীনতা। যতদিন সমস্ত দেশ স্বাধীন হবে না, ততদিন শান্তি আসবে না। কিন্তু অন্য পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও কারণ অন্তর্দ্ধান করে—শান্তি আপনা আপনি পৃথিবীতে আসে। তাই ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় লক্ষ্য শান্তি স্বাধীনতারই বিকাশের ফলে বাস্তব হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী। যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে, শান্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন ক'রে আত্মবিকাশের চেষ্টা করবে—সেদিন প্রগতির জন্য আর আলাদা সাধনা করতে হবে না. প্রগতি সেদিন নিজে থেকেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। সেইজনাই ছাত্র আন্দোলনের পতাকায় "স্বাধীনতা" প্রথম ও প্রধান স্থান পেয়েছে—সেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আপনাদেরও লক্ষ্য হোক। তাতে কেবল ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা আসবে না—পৃথিবীর নিদারুণ সঙ্কটের অবসানও তারই মধ্যে মিলবে।

(কুমিল্লা ছাত্র সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ)

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

সাম্যবাদের সঙ্কট

শ্রীসুশোভন সরকার

১

গত নভেম্বর মাসে সোভিয়েট্ রাশিয়ার বিশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কিছুকাল ধরে' অনেকেই নূতন রাষ্ট্রের আশু পতনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, বিশেষতঃ রিগা নগর থেকে উদীয়মান শক্তির প্রতিপক্ষেরা প্রায়শঃই তখন খবর পাঠাত যে সোভিয়েট্-তন্ত্রের উচ্ছেদ আসন্ন। তারপর ক্রমে ক্রমে নব্য রাশিয়ার অস্তিত্ব সহজসত্যে পরিণত হয়ে এসেছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে নানা ঘটনার প্রতিঘাতে তার প্রকৃতি এবং প্রগতি সম্বন্ধে একটা সন্দেহও বহুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে এ সন্দেহের মূল কথা এই যে রাশিয়া সাম্যবাদের পথ বর্জ্জন করে' স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এখন ধনতন্ত্রের পুনর্গঠনে ব্যস্ত এবং বলশেভিকদের হাতে ঘসামাজার ফলে নাকি সাম্যবাদের সংস্কৃত ভদ্রস্বরূপ দিন দিন মার্ক্সের আদর্শ থেকে চ্যুত হচ্ছে। এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য একমাত্র ভবিষ্যৎই প্রমাণ করতে পারে। তাছাড়া এ সম্বন্ধে যে-তর্ক সাহিত্য গড়ে' উঠেছে তার অনেকাংশ রুশ ভাষায় লিখিত বলে' আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং মার্ক্সের মূল গ্রন্থও এদেশে সুপরিচিত নয়। কিন্তু তবুও এ আলোচনা থেকে নিবৃত্তি সব সময় সম্ভব না কারণ এক্ষেত্রে অন্ততঃ সাময়িক একটা মত গঠন ভিন্ন সাম্প্রতিক ইতিহাস একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

প্রথমেই অবশ্য সন্দেহের উপাদানগুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের পর থেকে রুশ মন্ত্রী লিট্‌ভিনভ্ পশ্চিম ইউরোপস্থিত ডেমক্রাটিক শক্তিদের সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ বহুকাল সাম্যবাদীদের বিদ্রূপের বস্তু ছিল অথচ ১৯৩৪ এর সেপ্টেম্বরে রাশিয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তার সভ্যপদ গ্রহণ করল। পর বৎসর মে মাসে এল রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সখ্যবন্ধন—অনেকের কাছেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই মৈত্রী মহাসমর ও বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী এ রাজ্যদুটির নিবিড় সংযোগের পুনরুক্তি মাত্র। ১৯৩৫-এর অগাষ্টে কমিন্‌টার্নের সপ্তম মহাসম্মেলনে ডিমিট্রভ্ সাম্যবাদীদলের নূতন কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে [illegible] এর প্রবর্ত্তনা করলেন—তদনুসারে স্থির হয় যে ফাশিজ্‌ম্ প্রসারে বাধাসৃষ্টির জন্য কমিউনিষ্টরা অন্যান্য শ্রমিক, কৃষক ও ফাশিষ্ট-পরিপন্থীদলের সঙ্গে সহযোগে প্রস্তুত থাকবে। এর পরই ফ্রান্সে সম্মিলিত গণশক্তির সঙ্ঘনির্ম্মাণ ১৯৩৬ সালে সম্পন্ন হ'ল—ফরাসী সাম্যবাদীরা হঠাৎ তাদের অভ্যস্ত বিরুদ্ধাচারণ পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য উদার দলসমূহের সাহচর্য্য প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল। ইতিপূর্ব্বেই ট্রট্‌স্কির পক্ষে স্বদেশে বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠে এবং সেই থেকে ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের গোপন ও প্রকাশ্য অসহযোগ রাশিয়াকে সন্ত্রস্ত করে' আস্‌ছে। ১৯৩৬-এর আগষ্টে জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ প্রমুখ পুরাতন বল্‌শেভিক নেতাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচার ও প্রাণদণ্ড সকলকে স্তম্ভিত করল। ১৯৩৭-এর জানুয়ারি মাসে রাডেক্, সকল্‌নিকভ, পিয়াটোকভ্ প্রভৃতি সুপরিচিত লোকদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শাস্তির সংবাদে একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। তারপর গত জুন মাসে মার্শাল্ তুকাচেভস্কি ও অন্যান্য রুশ সেনাপতির আকস্মিক পতন প্রমাণিত করল যে রাশিয়ার অন্তর্লীন সঙ্কট এখনও হ্রাস হয় নি। এদিকে উৎপাদন কার্য্যে ষ্টাকানভ্ পদ্ধতি প্রভৃতি নূতন ব্যবস্থার জন্য ষ্টালিনকে নিন্দাভাগী হ'তে হয়েছে। ১৯৩৬ সালে আঁদ্রে জীদ্ রাশিয়া ভ্রমনের পর ষ্টালিন্‌পন্থীদের আদর্শনিষ্ঠায় সন্দিহান হয়ে পড়লেন। সে বছর ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার নবশাসনপদ্ধতিতে ডিমক্রাসির আংশিক প্রবর্ত্তন অনেকের চোখে সাম্যবাদের অবসানচিহ্ন রূপে গণ্য হ'ল। তাছাড়া স্পেনে ১৯৩৬ থেকে এবং পর বৎসর থেকে চীনদেশে কমিউনিষ্টরা অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করছে এবং বলা বাহুল্য যে তাদের এই নূতন উদ্যম রুষদেশের আভ্যন্তরিক বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তিত বৈদেশিক নীতির সঙ্গে তাল ফেলে চলেছে।

উপরের তালিকা থেকে সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের ভিত্তি সহজেই প্রকাশ পাবে। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে

আসবার আগে এই ঘটনা ধারার কিছু বিশ্লেষণ আবশ্যক। আর সেই সঙ্গে মার্ক্সের থিওরিতে এই সমস্যার কোন ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নেরও বিচার করা উচিত।

২

রাশিয়ার পক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা এবং দেশে দেশে সম্মিলিত গণশক্তির উদ্বোধন কার্য্যে কমিনটার্নের নূতন উদ্যমের মূল কারণ এক এবং সে কারণ সহজেই অনুমেয়। ১৯৩৩এ এবং তার পূর্ব্বে হিট্‌লারের অভিযানকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বলে' অনেকে মনে করেছিল—রাডেক্ প্রভৃতি নেতারা তখন পর্য্যন্ত জার্মান্ সাম্যবাদী ও শ্রমিকদের শক্তিসম্বন্ধে অযথা অতিরঞ্জিত আস্থা পোষণ করে' এসেছিলেন। পরিণামে দেখা গেল যে নাৎসি আন্দোলনের প্রকোপ ও প্রভাবকে অবজ্ঞা করলে বিষময় ফলের সম্ভাবনাই বেশী। হিট্‌লারি প্রতিবিপ্লব শ্রমিক শক্তিকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে বিধ্বস্ত ও পদানত করে' ফেলবার মন্ত্র জানে এই সত্যকে জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে সাম্যবাদীদের শিখতে হ'ল। সে শিক্ষা অবহেলা করলে ফাশিষ্ট অত্যাচারে দেশে দেশে শ্রমিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত ও শ্রমিক আন্দোলন অবসন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা সবিশেষ রয়েছে। জনগণের সম্মিলিত শক্তিগঠন এই আসন্ন বিপদকে পরাস্ত করবার অস্ত্র মাত্র। তাছাড়া হিট্‌লারের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েট্ শক্তিকে নিঃসঙ্গ ও দুর্ব্বল করে' তার পতনের পথ সহজ করে' তোলা। জার্মান্ নাৎসী ও ইতালীয় ফাশিষ্টদের নিবিড় সখ্যের পিছনে রয়েছে এই ইচ্ছা—সে সংকল্প রূপ নিচ্ছে সাম্যবাদের বিরোধী চুক্তিপত্রে। সম্প্রতি জাপানও এ দলে যোগ দিয়েছে এবং জাপান রাশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলে ঘোর শত্রু। জার্মানি ও জাপানের যুগ্ম আক্রমণের সম্ভাবনা রোধের জন্য রাশিয়াকে বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে মিলিত হ'তে হয়েছে। আর এ বিপদ শুধু রাশিয়ার নয়। সোভিয়েটের পতন হ'লে সাম্যতন্ত্রের অগ্রগতি অনেক বেশী দুরূহ হয়ে উঠবে। সোভিয়েট্ রাশিয়া শ্রমিকদের প্রথম বিজয় চিহ্ন—সে দুর্গের রক্ষাই এখন শ্রমিকদের প্রথম কর্ত্তব্য। মূল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সময়োচিত বিভিন্ন অস্ত্রের আশ্রয় শক্তিরই পরিচায়ক—দৌর্বল্যের নয়।

৩

কমিনটার্নের নির্দ্দেশে যে-নূতন কর্ম্মপদ্ধতি এখন সাম্যবাদী দলগুলিকে পরিচালিত করছে, তার সঙ্গে ডিমিট্রভের নাম অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত। এই বুল্‌গেরীয় কমিউনিষ্ট্ নেতা হিট্‌লারি বিপ্লবের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সম্মিলিত সহযোগিতার নানা দিক তাঁর লেখার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাসে ফাশিষ্টদের বিজয় অভিযানই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। জার্মানি, ইটালি ও জাপান ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যগুলি এর আয়ত্তে এসে পড়ছে। সাম্যবাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ফাশিজ্‌ম্ এর প্রাণই হ'ল শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনারোধের চেষ্টা। এর কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনকে নানা উপায়ে ক্ষীণ করে' ফেলে ধনতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা। পৃথিবীব্যাপী ফাশিষ্ট্ প্রগতির কেন্দ্র অবশ্য হিট্‌লারের নাৎসি দল। তাদের রুষবিদ্বেষ সকল শ্রমিকদের ভাবনার কথা। ট্রট্‌স্কি পন্থীদের মতন এ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করা মূঢ় অদূরদর্শিতার নামান্তর।

বাওয়ার, ব্রেলস্‌ফোর্ড, কাউট্‌স্কি, প্রভৃতি সোশ্যাল্ ডিমক্রাট্‌দের ধারণা আছে যে ফাশিজম্ নিম্নস্তরভুক্ত মধ্য শ্রেণীর আধিপত্যের প্রতীক। সাম্যবাদীদের মতে এ বিশ্বাস মারাত্মক ভ্রান্তি। ফাশিষ্ট্ আন্দোলনের অনেক ছদ্মবেশ আছে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার জাতিগত পার্থক্যের অভাব নেই, বুর্জোয়া ডিমক্রাট্‌দের হাত থেকে তারা সবলে ক্ষমতা কেড়ে নিতে দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু আসলে ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র যে ধনিকদের আধিপত্য সংরক্ষণের সময়োচিত ব্যবস্থা মাত্র, ধনিক কর্ত্তৃত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের আটকে রাখার প্রচেষ্টা যে তার অভ্যুত্থানের কারণ, সাম্যবাদীদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অথচ ফাশিজম্ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার শক্তি অর্জ্জন করেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণ লোকের সাময়িক অভাব অভিযোগ মোচনের আশা ফাশিষ্ট্ আন্দোলনে স্থান পায়। জনগণের মনে অন্যায়ের প্রতিকার এবং অবস্থা উন্নতির যে আকাঙ্ক্ষা থাকে, ফাশিষ্ট্ নেতারা তার সাহায্য নিতে পশ্চাদ্‌পদ হ'ন না—সেই জন্য ইটালিতে কর্পোরেট্ রাষ্ট্রের কল্পনা উদ্ভব হয়, জার্মানিতে নাৎসি আমল নূতন সমাজ গঠনের দাবী করে। ফাশিজম্ সাম্রাজ্যবাদের পরাকাষ্ঠা অথচ

স্বজাতিকে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত গণ্য করে' জাতীয় অভিমানকে উত্তেজিত করাই তার রীতি। শ্রমিকদের দলে টানবার জন্য ধনিক তন্ত্রকে কড়া কথা শোনাতে তাদের আপত্তি নেই এবং এইভাবেই ফাশিষ্টেরা প্রথমে প্রবল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করবার পর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রচারের অবশ্য ধূম পড়ে যায়, তখন আর সংস্কারের অবকাশ থাকে না, তার উপর বিদেশীদের সঙ্গে বিবাদের উত্তেজনাও আছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর অযথা জোর দেওয়া এবং ইহুদিবিদ্বেষ প্রভৃতি কুসংস্কারের প্রশ্রয়ও জনসাধারণকে হাতে রাখবার অন্য উপায়।

কিন্তু ফাশিষ্ট প্রভুত্বে জনসাধারণের বস্তুত কোন লাভ নেই, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এর সাক্ষ্য দিতে পারে। যেখানে ন্যায্য মাহিনা প্রতিশ্রুত হয়েছিল শ্রমিকেরা সেখানে স্বার্থত্যাগের মহিমা শুনছে, কাজের সুযোগের অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রায় অর্দ্ধদাসত্বের অবস্থা। উপার্জ্জনের স্থিরতা ফাশিষ্ট আমলে আগের চাইতেও অনিশ্চিত, উপরন্তু ফাশিষ্ট-ভাবাপন্ন কর্ত্তাদের তাড়নার অভাব নেই। কৃষকেরাও ধনিককবল থেকে বিন্দুমাত্র উদ্ধার পায় নি। আর শ্রমিক সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিই ফাশিজমের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়েছে—জার্মানি, ইটালি, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে এদের সংখ্যা সাম্যবাদীদের হিসাবে বহুশত এমন কি অনেক সহস্রের কোঠায় পড়ে। ধনিকতন্ত্রেরও স্তরভেদ আছে এবং ডেমক্রাটিক শাসন থেকে ফাশিষ্ট আমলে শ্রমিকদের অনেক বেশী দুরবস্থা হয় স্বীকার করতেই হবে। এই পার্থক্য অগ্রাহ্য করে' ট্রটস্কির দল শুধু রোমাণ্টিক ভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

অনেকের মতে ফাশিজম অনিবার্য্য—সমাজের বিবর্ত্তনে এ একটা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়। আন্দোলন হিসাবে ফাশিষ্ট উদাম একটা বিশেষ সময়ে অবশ্যম্ভাবী হ'তে পারে কিন্তু ডিমিট্রিভ-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে ফাশিষ্টদের জয়লাভের কারণ বিরোধীশক্তির ভুল ভ্রান্তি মাত্র। United Front সেই ভ্রমের পুনরাবৃত্তির পথে বাধাসৃষ্টির প্রয়াস। ফাশিষ্ট অভ্যুদয় অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে সোশ্যাল ডিমক্রাটদের মূর্খতার জন্য। জার্মানি এবং অষ্ট্রিয়াতে তারা শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল বলা যায়। ফাশিষ্ট বিপদ অঙ্কুরে বিনাশ করতে তারা কখনও যত্নবান হয় নি। পক্ষান্তরে শ্রমিক-ঐক্যভঙ্গ আর কৃষকদের অবহেলা এবং বুর্জোয়া দলগুলি ও তাদের ধনিক বন্ধুদের সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে তারা ফাশিষ্ট বিজয়েরই আনুকূল্য করেছে। অপরদিকে কমিউনিষ্টরা এখন বুঝতে পারছে যে তাদেরও অনেক ভুল হয়েছিল। অতীতের ভ্রান্তিস্বীকার অবশ্য সাম্যবাদের ইতিহাসে নূতন না। জার্মান সাম্যবাদীদের বিশ্বাস ছিল যে জার্মানি ইটালি নয়। সেইজন্য নাৎসিদের শক্তিবৃদ্ধি তাদের কাছে অবজ্ঞার বস্তু ছিল। পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশেও সাম্যবাদীরা ঠিক প্রকৃত অবস্থা ধরতে পারেনি। কিন্তু এই ধরণের ভ্রম নিরাকরণ হ'লে ফাশিষ্টদের পরাজয় কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। অন্ততঃ সেই বিশ্বাস থেকেই ইউনাইটেড ফ্রন্টের উৎপত্তি।

ফাশিজমের প্রতাপ যতই হোক না কেন, তার পতন অনিবার্য্য এই ধারণা সাম্যবাদের মজ্জাগত। সাম্যতন্ত্রের আগমন যে শেষ পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত শুধু এই আস্থার উপর এ ধারণা নির্ভর করছে না। ফাশিষ্ট-রাষ্ট্রের একটা প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার কথাও সেই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। সেখানে শ্রেণীবিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া দূরে থাকুক, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত প্রবলতর হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা বেশী; ফাশিষ্ট গণআন্দোলনেরও কোন আন্তরিক ঐক্য নেই—তার বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। অবশ্য ফাশিষ্ট-রাষ্ট্র আপনা থেকেই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে শ্রমিক অভিযানের আশার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রামই যদি সাম্যবাদের গোড়ার কথা হয় তাহলে এই অভিযানের সহায়তা সকল শ্রমিকের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রথম কথাই হ'ল সকল শ্রমিককে একত্রীকরণ। এই সম্মিলিত শক্তির গঠনে সাম্যবাদীদের শুধু একটি সর্ত্ত আছে—একত্রিত জনগণকে ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। সকল শ্রমিককে সাম্যতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সময়সাপেক্ষ অথচ ফাশিজমের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার প্রয়োজন এখনই। সাম্যবাদীদল নিজের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে অবশ্য প্রস্তুত নয়, তাদের আদর্শ প্রচারের স্বাধীনতাও তারা ছাড়ছে না। কিন্তু সোশ্যাল ডিমক্রাটদের আক্রমণের পরিবর্ত্তে তাদের সহযোগিতাই এখন সাম্যবাদীদের কাম্য। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ শ্রমিকই আসলে সকল সোশ্যালিষ্ট দলের গণ্ডীর বাইরে। ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের আবাহন করতে হ'লে সর্ব্বত্র শ্রমিক সমিতি গড়ে' তুলতে হবে আর সে সমিতিগুলি কোন দলবিশেষের সম্পত্তি থাকবে না। এভাবে শ্রমিকসমাজের মিলিত শক্তিকে সংগ্রামে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য এখন সাম্যবাদীদের

উৎসাহিত করছে। আর শুধু শ্রমিক কেন, ফাশিষ্ট বিপদকে আটকাবার জন্য কৃষক, নিম্নস্তরের মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী প্রভৃতিরও সহযোগ বাঞ্ছনীয়। তাই স্থানবিশেষে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট শুধু শ্রমিক নয়, সমগ্র জনসাধারণের মিলনে পর্য্যবসিত হ'তে পারে। ফাশিষ্টবিরোধী অন্য মণ্ডলীর প্রতি অবজ্ঞা কিম্বা বৈরীভাব সাম্যবাদীদের আপাততঃ সযত্নে পরিহার করা উচিত।

এইভাবে পপুলার ফ্রন্ট্ গড়ে তুললেও তার কার্য্যক্রম সর্ব্বত্র ঠিক এক হ'তে পারে না। আমেরিকায় প্রথম কর্ত্তব্য এখন একটি স্বাধীন শ্রমিক কৃষকদলের সংগঠন। ইংল্যাণ্ডে সাম্যবাদীরা এখন লেবার পার্টিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত যদি সে দল ফাশিষ্ট-গতিরোধের ব্রত গ্রহণ করে। ফ্রান্সে সম্মিলিত জনশক্তির সাফল্য ফরাসী ফাশিষ্টদের অনেকখানি দাবিয়ে রেখে নূতন আদর্শকে জয়যুক্ত করেছে যদিও সম্প্রতি সেখানে আবার অবস্থা বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যে দেশে ফাশিষ্ট কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে পপুলার ফ্রন্টের উদ্দেশ্য হবে ফাশিষ্ট সমিতি সঙ্ঘগুলিকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনে অসন্তোষের বহ্নি জ্বালানো; সে ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের সামান্য প্রাথমিক দাবীগুলিকে আশ্রয় করে' আন্দোলন আরম্ভ করাই উচিত। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনগণের যোগ রয়েছে প্রকৃত সাম্যবাদীর কর্ম্মস্থল সেইখানেই, ফাশিষ্ট দেশে এই নিয়ম স্মরণ রাখা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আর যে-দেশে সোশ্যাল্ ডেমক্রাটদের প্রতিপত্তি অথবা শাসনকর্ত্তৃত্ব রয়েছে সেখানে পপুলার ফ্রন্টের লক্ষ্য হবে আন্দোলনের সাহায্যে সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্দের পদস্খলন ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অসম্ভব করে তোলা। সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্ নেতারা সহযোগে রাজি না হ'লে সেখানে আলোড়নের ফলে জনমতের জাগরণই লক্ষ্য হবে।

এ ছাড়া সর্ব্বত্রই কতকগুলি প্রচেষ্টা নূতন কর্ম্মপদ্ধতির সাধারণ অঙ্গ হয়ে থাকতে বাধ্য। প্রতি দেশে সকল ট্রেড্ ইউনিয়ানকে এক সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে এবং এক জগদ্ব্যাপী মহাপ্রতিষ্ঠানে সকল শ্রমিকসমিতির একতাও বাঞ্ছনীয়। যুবক-আন্দোলন, নারীজাগরণ এবং অনুন্নত জাতিসমূহের মুক্তিকামনাও এক সূত্রে যুক্ত করা ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের অন্যতম আদর্শ। প্রয়োজন হ'লে পপুলার ফ্রন্টের রাজ্যশাসন কার্য্যেও সাম্যবাদীরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এই অভিযানের প্রথম কাজ ফাশিষ্ট-থিওরির প্রতিরোধ। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ ফাশিজিমের একটি প্রধান সহায় কিন্তু সে ভাবকে সাম্যবাদের কাজে লাগানো একেবারে অসম্ভব নয়। বুর্জোয়া জাতীয় ভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় কিন্তু ডিমিট্রভের মতে সাম্যবাদের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় ভাবধারার স্থান থাকতে পারে। মার্ক্স্ বাস্তবপন্থী ছিলেন তাই তাঁর নির্দ্দিষ্ট শ্রমিকদের মিলনমন্ত্রে জাতীয়তাবোধের কোন স্থান নেই ভাবা অনুচিত। সোভিয়েট্ রাষ্ট্রে লেনিন্ বিভিন্ন জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন আর বহুকাল পূর্ব্বেই স্টালিন্ বলেছিলেন যে সোশ্যালিষ্ট্ আমলে সংস্কৃতির বাহ্যরূপ হবে জাতীয় যদিও তার অন্তর্লীন প্রাণশক্তি নির্ভর করবে শ্রমিকশ্রেণীর আশা ভরসা ও অভিজ্ঞতার উপর।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন বৈদেশিক নীতি এবং কমিনটার্ণের নূতন কর্ম্মপ্রণালীর কারণ নির্ণয় বিশেষ শক্ত নয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পদ্ধতির যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন হয়েছে বলা চলে। কিন্তু রাশিয়ার আভ্যন্তরিক বিপদ সম্বন্ধে সম্প্রতি বহু জল্পনা সাধারণে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবতঃ অনেকেরই এখন এই বিশ্বাস যে পুরাতন কোন কোন নেতার শাস্তি এবং আর্থিক বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন রাশিয়ার আদর্শ চ্যুতির পরিচায়ক। সাম্যতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অকস্মাৎ এতখানি দরদ অপ্রত্যাশিত ও হাস্যাস্পদ।

জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক্ এবং তুকাচেভস্কির পতন বহুলোকের কাছে এত অপ্রত্যাশিত বোধ হয়েছিল যে ষ্টালিনের মস্তিষ্কবিকৃতির একটা গুজব পর্য্যন্ত উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ষ্টালিনের সমর্থকেরা যে অজস্র এবং রাশিয়ায় তাদের প্রতিপত্তি যে এখনও দৃঢ় সে কথা ভোলা অন্যায়। ড্যান ও এব্রামোভিচ প্রভৃতি মেনশেভিক নেতারা এবং ট্রট্স্কির অনুচরগণ বিশ্বাস করেন যে ষ্টালিনের দল খাঁটি বিপ্লবীদের সরিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে আর তাদের আচরণ ফরাসী বিপ্লবের থার্মিডরিয়ান্দের অনুরূপ। কিন্তু দণ্ডিত সেনাপতিদেরও শোনা যায় এ ধরণের একটা সংকল্প ছিল—সুতরাং তাঁদের শাস্তির কারণ কি? মিলিকভ্ ও কেরেন্স্কির মতে ষ্টালিনই ঘোর বিপ্লবী, তিনি দলের মধ্যে উগ্রপন্থার বিরোধীদের উৎপাটিত করতে চান। তবে রাশিয়ার ট্রট্স্কির শিষ্যদের আজ এ দশা কেন? নানা থিওরির এভাবে উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু তাদের বোধ হয় একটি সাধারণ বিশ্বাস আছে। সম্প্রতি রুষদেশে যাদের গুরুদণ্ড হয়েছে এই মত অনুসারে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সাজানো এবং মিথ্যা তাদের শাস্তির আসল কারণ নাকি ষ্টালিনের সঙ্গে মতভেদ মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের কথা যে এক্ষেত্রে মিথ্যা নয় এই মত মেনে নেবার পক্ষেই বা বাধা কি? রাশিয়ার শাসকেরা বর্ব্বর এ ধারণাই কি আসলে সে বাধা নয়?

মস্কোতে বিচারের সময় বেশীর ভাগ বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছিলেন, সে স্বীকারোক্তিকে অবিশ্বাস করবার একমাত্র কারণ হ'তে পারে এই সন্দেহ যে তাঁদের কারাগারে উৎপীড়ন হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ অবশ্য এখনও অনুপস্থিত। অসীমসাহসী বন্দীদের মধ্যে একজনও কেন তা'হলে সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ্য বিচার সভায় ফাঁস করে দেন নি? আইনব্যাবসায়ী প্রিট্ তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সময় বলেছেন যে আসামীদের দেখে এ সন্দেহ তাঁর কাছে অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং এ কথা মনে হওয়াই বেশী স্বাভাবিক যে ষড়যন্ত্রের এত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে দোষস্বীকার অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের সময় অবশ্য বন্দীরা এই প্রমাণের পরিমাণ বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর একজনের দোষস্বীকারকে সমর্থন করেছে অন্যদের সাক্ষ্য; অভিযোগগুলির এত বিস্তাবিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বন্দীদের বিবৃতিগুলিও এত দীর্ঘ, প্রকাশ্য বিচারের সময় বাদানুবাদও এত দ্রুতগতি চলেছিল যে অপরাধীদের দোষ কল্পনা মাত্র এ সন্দেহের অবকাশ নিতান্তই কম। তুকাচেভ্স্কির অপরাধ সম্ভবত অতি গুরুতর ছিল—তিনি শুধু ষ্টালিন্‌কে সরাবার সংকল্প করেন নি, তাঁর সঙ্গে জার্মান্ সেনাধ্যক্ষদের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল এবং গুপ্ত যোগস্থাপনের চেষ্টা চলছিল। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে ফরাসী ও চেকোশ্লোভাক্ যুদ্ধবিভাগের হাতে এব ষড়যন্ত্রের কিছু প্রমাণ সঞ্চিত আছে। Foreign Affairs পত্রিকায় কৌতূহলী পাঠক তার বিবরণ পাবেন।

জিনোভিয়েভ্ প্রভৃতির শাস্তিতে সোভিয়েটের অপযশ বাড়বে এটুকু বুদ্ধি রাশিয়ার শাসকদের আছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিচারে প্রবৃত্ত হবার সুতরাং বৈধ কারণ থাকাই সম্ভব। তুকাচেভ্স্কি এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ আস্থা ভোগ করেছিলেন; তাঁর আকস্মিক দণ্ডবিধান শুধু খামখেয়ালির ফল মনে করা কঠিন। তাই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হঠাৎ আবিষ্কার মেনে নিলে, মস্কোর বিচার কয়েকটির অনেক রহস্য মিলিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে শুধু আর দুটি কথা উল্লেখযোগ্য। জিনোভিয়েভের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে অনেকে ভুলে যান যে ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রের ফলে কিরভ নিহত হয়েছিলেন। তাছাড়া ষ্টালিন, মোলোটভ ও ভোরোশিলভের প্রাণসংশয় হয়েছিল এবং সাম্যবাদের ইতিহাসে এঁদের কারও স্থান তুচ্ছ নয়। দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত প্রাচীন নেতাদের প্রতি এত উচ্ছ্বাস একটু আকস্মিক। এঁরা যখন লেনিনের সহচর ছিলেন, তখন এঁদের নিন্দার বিরাম ছিল না। ষ্টালিনের বিরোধী বলেই কি এঁদের এখন এত সম্মান?

৫

সাম্যবাদের পরাজয়ের নিদর্শন হিসাবে রাশিয়ার বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাকে অনেকখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর্থিক বিধানের বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের স্বল্পায়তনের মধ্যে অসম্ভব। মোটের উপর জীদ্ প্রমুখ সমালোচকের বক্তব্য বোধহয় এই যে ধনতন্ত্র আবার সে দেশে গড়ে' উঠ্ছে; আর সামাজিক পরিবর্ত্তনের এই গতির প্রতিফলন হিসাবে রুষদের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি, ধর্ম্মদ্বেষিতার হ্রাস, বৈষম্যবৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। প্রকাশিত না হ'লেও সমালোচকদের মনে একটা সিদ্ধান্ত সহজেই অনুমান করা চলে—রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা উচিত সোশ্যালিজ্‌ম্ অসম্ভব।

মার্ক্সের মত অনুসারে সাম্যতন্ত্র গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, (ধনতন্ত্র গড়ে' উঠতে যেমন একাধিক শতাব্দী লেগেছিল) যদিও এ যুগের দৈর্ঘ্য একমাত্র ভবিষ্যতেই বোঝা যাবে। পূর্ণ সাম্যতন্ত্র বা কমিউনিজ্‌মে পৌঁছিবার আগে একটা প্রস্তুতির অবস্থা পার হ'তে হবে, তাকে এখন সমাজতন্ত্র অথবা সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। রাশিয়া এখন মাত্র এই প্রাথমিক অবস্থায় পৌঁছিবার প্রয়াস পাচ্ছে এবং সেই উদ্যমের মধ্যে স্বভাবতই অগ্রগতি ও তার বিপরীত দুই থাকবে। বিবর্ত্তনগতির লক্ষ্য ও দিকটাই আসল, তার বেগ ও সাময়িক অবস্থান তুচ্ছতর ব্যাপার।

সাম্যতন্ত্র গঠনের প্রথম সোপান শ্রমিকবিপ্লব। ১৯১৭ সালে রুষদেশে সোভিয়েট্ শক্তির অভ্যুত্থানের পর কমিন্‌টার্ণের আশা ছিল দেশে দেশে তার অনুকরণ হবে। আসলে নানাকারণে ধনিকতন্ত্র রাশিয়ার বাইরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল না। তখন বল্‌শেভিক্‌দের যে-সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের দ্বন্দ্ব তার থেকে উৎপত্তি এবং গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস সেই সমস্যারই নূতনরূপ মাত্র।

ট্রট্স্কির মত ছিল যে পৃথিবীর নানা দেশে বিপ্লব উপস্থিত না হ'লে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব সুতরাং সমস্ত শক্তি সেদিকে নিয়োগ করাই উচিত। ষ্টালিনের বিশ্বাস এই যে শ্রমিকবিপ্লব ছেলেখেলা নয়, তার একটা সুযোগ

আসে; সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লক্ষ্য অবিচলিত থাকবে অথচ কর্ম্মপদ্ধতি স্থানকাল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হতে পারবে; ডায়ালেকটিক্-এর গতিছন্দ শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজগঠনকার্য্যের মধ্যেও রূপ পাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথম দৃষ্টিতে ট্রটস্কিপন্থাকে ঘোর বিপ্লবী মনে হয়। কিন্তু ১৯২৪এর পরে রাশিয়ার সঙ্কটে তার প্রকৃতরূপ ধরা পড়ল। বলশেভিক্‌দের দেশের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা এবং বিদেশে গণ্ডগোলসৃষ্টির ব্যর্থপ্রয়াসে শক্তিক্ষয়—ট্রট্স্কির থিওরির ন্যায্য পরিণাম ত এই দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ষ্টালিনের মত ছিল যে রাশিয়ার মধ্যে নূতন সমাজের গঠনচেষ্টায় শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং তার ফলে আবার কোন সুযোগের মুহূর্ত্তে শ্রমিকশক্তির বিদেশে প্রসারও তখন সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। এই বিশ্বাসের থেকে নিশ্চেষ্টতার বদলে এল পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। কৃষিকার্য্যে সঙ্ঘবিস্তারের ফলে রাশিয়ার চেহারা বদলে গেল এবং ধনতন্ত্রের অন্যতম মূলাধার কুলাক্ বা বড় কৃষক শ্রেণীর উৎপাদন ও উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে চালিত করল।

ট্রটস্কিপন্থা বস্তুতঃ অনেকখানি কথার আস্ফালন—তার অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীও মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টিকের থেকে স্বতন্ত্র। স্ট্রেচি, জ্যাক্‌সন্, হেকার প্রভৃতির সুপরিচিত ইংরাজি গ্রন্থেও এ পার্থক্য পরিস্ফুট আছে। প্রথম জীবনের মেন্‌শেভিক্ চিন্তাধারা ট্রটস্কিকে এখনও অভিভূত করে রেখেছে। লেনিনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্য্যন্ত নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলেছিলেন, এখন আবার তাঁর পূর্ব্বমতের ছায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করছে। অথচ সম্প্রতি তাঁকেই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য বলে' বহুস্থানে অভিনন্দিত করা হয়। মার্ক্সের নিজের ভুল হওয়া বিচিত্র না কিন্তু ট্রটস্কির ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদের বিকৃতি মাত্র। ষ্টালিনের কর্ম্মপ্রণালী মার্ক্সবাদের বিরোধী এ কথা ট্রটস্কির দল বার বার ঘোষণা করলেও আজ পর্য্যন্ত তার সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত হয় নি।

ট্রট্স্কি প্লেকানভের শেষযুগের মতের মতন মেন্‌শেভিক্ আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে ১৯৩০ সালেই ডেবরিন্ ও মিটিন্এর দার্শনিক তর্কযুদ্ধে একথা পরিষ্কার হয়। সাম্যবাদী দল ষ্টালিনের অনুসরণ করল কিন্তু দুঃখের বিষয় ট্রটস্কি বিরুদ্ধাচরণ ছাড়লেন না। তার নির্ব্বাসনের পরও সে দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। ট্রটস্কির অনুচরেরা শেষ পর্য্যন্ত গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সাম্যবাদের প্রকৃত সঙ্কট বোধ হয় এইখানেই; ট্রট্স্কিপন্থীরা দলের সিদ্ধান্ত না মেনে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে' শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌ছে।

মার্ক্সবাদের চর্চ্চা করলে দেখা যায় যে ট্রটস্কির বাহ্যিক উগ্রমত ও ব্যবহারিক পশ্চাদ্‌গমন নিতান্ত নূতন ব্যাপার নয়। মার্ক্সের থিওরিকে বরাবরই দুই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে—দক্ষিণ ও বামে না টলে' মধ্যপন্থায় অগ্রসর হওয়া তার অভ্যাস আছে। প্রথম জীবনে মার্ক্সকে ব্লাঙ্কির (Blanqui) প্রভাব খণ্ডন করতে হয়েছিল—এই ফরাসী বিপ্লবীর ব্রতই ছিল স্থানকাল অগ্রাহ্য করে' নির্ব্বিচার বিদ্রোহের অভিযান। তারপর ম্যাক্স্ ষ্টার্নার্-এর উগ্রপন্থাকেও মার্ক্স অগ্রাহ্য করলেন। বহুদিন ধরে' মার্ক্সের সঙ্গে বাকুনিন্-এর মতভেদ চলে—বাকুনিন্ এবং তাঁর নৈরাজ্যবাদী অনুচরেরা বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে বিলাসে পরিণত করেছিলেন। এঁদের মনোভাব অনেকখানি পেটিবুর্জোয়া—সামাজিক জীবনে এর অনুরূপ চিন্তা বোহেমিয়ান্ যথেচ্ছাচারের রূপ গ্রহণ করে। লেনিন্‌কেও এইভাবে চল্‌তে হয়েছিল—চরমপন্থী সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিদ্রুপাত্মক পুস্তিকাটি সম্ভবতঃ এতদিনে সুবিদিত হয়েছে। তাঁর মতেও অধীর উচ্ছ্বাস অনেক সময় নিশ্চেষ্টতার নামান্তর। শুধু বিপদ এই যে উগ্রপন্থাকে আট্‌কাতে গিয়ে সাম্যবাদ সোশ্যাল্ ডিমক্রাসিতে পরিণত না হয়ে পড়ে। তবে ষ্টালিন্এ বিপদ সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত সতর্ক হয়ে চলেছেন বলেই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। বুকারিন্ রাকোভস্কি প্রভৃতি যাঁদের বিচার এখন মস্কোতে চলেছে তাঁদের অনেকেই দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও সোশ্যাল ডিমোক্রাট ভাবাপন্ন হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সাম্যবাদের ইতিহাস থেকে মনে হওয়া অন্যায় নয় যে ষ্টালিনের তথাকথিত আদর্শচ্যুতি প্রকৃত পক্ষে মার্ক্স ও লেনিনের অনুসরণ এবং ডায়ালেক্‌টিকের ন্যায্য প্রয়োগ মাত্র। লেনিন্ যখন নেপ্-এর প্রবর্ত্তন করেছিলেন তখন তাঁকেও এই অভিযোগ শুনতে হয়েছিল—সে সময় বলশেভিজ্‌ম্-এর অবসান সম্বন্ধে বই লেখাও হয়েছিল। অবস্থা অনুসারে সাম্যবাদীদের কর্ম্মপদ্ধতি হয়ত আবার বদলাবে। সেই জন্য শুধু সাময়িক দু'চারটি নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করে' সাম্যবাদের সঙ্কট সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত।—পরিচয়

(বৈশাখ ১৩৪৫)

অবরোধ-মুক্ত আলবেনিয়া

হোস্‌না জাহান চৌধুরী

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বলকান অঞ্চলে আলবেনিয়া দেশ। আলবেনিয়ার অধিকাংশ লোক মুসলমান। এর শাসন-রশ্মি বাদশাহ্‌ আহ্‌মদ জগুর হাতে।

মুসলিম জগতের অন্যান্য দেশের মত গত শতাব্দীর শেষভাগে আলবেনিয়ার ইতিহাসেও কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

আঁধারের পর আবার আসিল আলো — নিদ্রার পর জাগরণ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আহমদ জগু আলবেনিয়ান গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৮ সনে আরম্ভ হয় তাঁহার রাজত্ব। আহ্‌মদ জগু হইতেই আলবেনিয়ার নবজাগরণের সূচনা। ইনি যেন রূপকথার রাজকুমার। ইঁহারই আহ্বানে জাগিয়া উঠিল দেশের সহস্র নরনারী।

২৫শে মার্চ্চ আলবেনিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এই দিন বাদশার হুকুমে আইন করিয়া পর্দ্দাপ্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা স্বাধীনতা সংস্কৃতি — সব দিক দিয়াই এই দিন স্মরণীয়। পতন-যুগে পর্দ্দা ও আনুষঙ্গিক সহস্র কুসংস্কার জাতীয় জীবনে ঘুন ধরাইয়া দিয়াছিল। শুধু মুসলিম নয়, রোমান ক্যাথলিকদের ঘাড়েও চাপিয়াছিল অবরোধের পাষাণ ভার। খৃষ্টান ক্যাথলিকরাও রীতিমত পর্দ্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কবে, কোন্‌ অতীতে আলবেনিয়ায় প্রথম পর্দ্দাপ্রথার প্রচলন হয় বলা মুস্‌কিল। গতযুগে এর অত্যাচার অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এর প্রভাব অনুভূত হয়।

কয়েক বৎসর আগে পর্দ্দার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠে। এই সর্ব্বনাশকর প্রথা জাতির উন্নতির পথে কিভাবে বাধা জন্মাইতেছে দেশের আপামর সাধারণ একটু একটু করিয়া তাহা বুঝিতে আরম্ভ করে। দশ বৎসর আগে গভর্ণমেন্ট পর্দ্দার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন।

আলবেনিযার অবরোধ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বয়ং রাজা আহ্‌মদ জগু ও তাঁহার ভগ্নীগণ। রাজপরিবারের মেয়েরা বিশেষ করিয়া রাজার বোনেরাই সকলের আগে পর্দ্দা ছাড়িয়া ঘরের বাহির হন। দেশের লোক রাজপরিবারকে অনুকরণ করিবে — এ স্বাভাবিক। কেহ কেহ — আধুনিকতার হাওয়া যাদের গায়ে লাগিয়াছিল তারা — ধীরে ধীরে পর্দ্দা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা পর্দ্দার প্রভাব কাটাইতে পারিতে ছিলেন না। সরকারী প্রচারকার্য্য সফল হইয়াও হইল না। সরকারী স্কুলগুলি খালি পড়িয়া রহিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা দুচার বৎসর স্কুলে পড়িয়া আবার ঘরে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

গবর্ণমেন্ট দেখিলেন এভাবে আর চলে না। শুধু প্রচারকার্য্যে এতযুগের কুসংস্কার দূর হইতে পারে না। এসম্পর্কে আইন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইল ২৫শে মার্চ্চ। এই দিন হইতে পর্দ্দাপ্রথা আইনের চোখে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। আইন হইল : যে নারী পর্দ্দা করিবে — বোরকা পরিবে, তার জরিমানা হইবে; যে পুরুষ নারীকে পর্দ্দা করিতে বাধ্য করিবে তার হইবে কারাদণ্ড।

অন্যান্য দেশের মত আলবেনিয়ায়ও পর্দ্দাপ্রথা শহরে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের গরীব মেয়েদের সঙ্গে পর্দ্দার কোনই সম্পর্ক ছিল না। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া যাদের অন্নের সংস্থান করিতে হয় পর্দ্দা মানিবে তারা কেমন করিয়া?

নূতন আইন যেদিন জারী হইল সেদিন হইতে দেশে সত্যই নূতন যুগের সূচনা হইল। শরীফ বংশের মেয়েরা অনেকে

মুশকিলে পড়িলেন — যুগের সংস্কার কেমন করিয়া ছাড়িবেন। শহরে শহরে সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিবারের মেয়েদের লইয়া কমিটি গঠিত হইল। ঠিক হইল মেয়েরা একসঙ্গে বাহির হইবেন। একা বাহির হইতে যাদের লজ্জা করে অনেকের সঙ্গে মিশিয়া তাঁরা বাহির হইবেন।

রাজা আহমদ জগুর রাজত্বে আলবেনিয়াবাসী নানা দিক দিয়াই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপের সঙ্গে সমান তালে চলিবে ইহাই তাদের পণ। পর্দ্দা বর্জ্জনের ফলে আলবেনিয়ার জাতীয় জীবনে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইল। জাতির যে অর্দ্ধাঙ্গ এতদিন অবশ হইয়া ছিল তাহাতে এতদিন পরে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার হইল।

২৫শে মার্চ্চের আগে জাতীয় জীবনে নারীর কোন স্থানই ছিল না। আজ নারীর অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। নারী তার অধিকার -- তার দায়িত্ব বুঝিয়া লইতেছে। স্কুলে কলেজে আজ ছাত্রীর ভিড় — আফিসে আদালতে সভাসমিতিতে নারীর অবাধ আনাগোনা। শুধু সাধারণ শিক্ষা নয় — ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে আলবেনিয়ার মেয়েরা ছুটিয়া যাইতেছে উচ্চশিক্ষার জন্য। শিক্ষা শেষ করিয়া দেশের নানা বিভাগের দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করিবেন। নারী যদি সমাজ-জীবনে তার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে আলবেনিয়ার পক্ষে জগতসভায় উচ্চ আসন লাভ করা মোটেই কঠিন কাজ হইবে না।

আলবেনিয়ার সুলতান আহ্‌মদ জগু প্রথম। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি আলবেনিয়ান গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সুলতান আহ্‌মদ জগুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করেন। দেশের নারী-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

আলবেনিয়ার অবরোধ-বর্জ্জন আন্দোলনের একজন অগ্রনায়িকা। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিলেও ইনি কোন দিনই পর্দ্দা করেন নাই, যদিও মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই ইঁহার বিবাহ হয়।

সুলতান আহ্‌মদ জগুর বিদূষী ভগীত্রয়। ইঁহারা তিনজনই উচ্চশিক্ষিতা — তিনজনই দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অবরোধ-বর্জ্জন আইন প্রধানতঃ ইঁহাদেরই চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া রাজপরিবারকে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইঁহারা যেদিন প্রথম পর্দ্দা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন সেদিন সত্য সত্যই আলবেনিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

আলবেনিয়ার একটী ছোট প্রাইমারী স্কুল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে।

সৈনিকের বেশে সুলতান আহ্‌মদ জগুর ভগ্নীত্রয়। মাঝখানে আলবেনিয়ার প্রধান সেনাপতি।

আলবেনিয়ার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। প্রাচীনপন্থী মাতা, আলোকপ্রাপ্তা কন্যা ও গৃহস্বামী। কন্যা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, গড়িয়া উঠিয়াছেন একেবারে আধুনিক ভাবে। নূতনের প্রভাব মায়ের উপরও পড়িয়াছে। তাঁকেও পর্দ্দা ছাড়িতে হইবে। তিনিও ধীরে ধীরে নূতনকে বরণ করিয়া লইবেন। রেডিওর সাহায্যে বহির্জগতের হাওয়া ঘরে আসিয়া লাগিতেছে। কার সাধ্য এর প্রভাব এড়াইয়া চলে?

| আশ্বিন ১৩৪৪ |

নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ

কামাল উদ্‌দীন

আমাদের শাস্ত্র ও সমাজ-বিধান পুরুষের হাতে রচিত। অবশ্য তাই বলিয়া পুরুষ যে কিছু দোষ করিয়াছেন এমন বলিবার অভিপ্রায় আমার নয়। মানুষের সামাজিকতার প্রয়োজন আছে এবং সামাজিকতার অর্থই নিজের ও প্রতিবেশীর স্বার্থবুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। তাই স্থান-কালের প্রয়োজন অনুসারে মানব-সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ কার্য্যে এতদিন নারীজাতির প্রভাব নগণ্য ছিল বলিয়াই পুরুষ নিজ হাতে সমাজ-গঠনের ভার লইয়াছিলেন। আজ বা কোন কালে যদি পুরুষ বলিতে চাহেন যে সমাজের বিধি-বিধান রচনায় একমাত্র তাঁহারই অধিকার, তবে তাঁহার সে দাবী প্রমাণ করিবার পক্ষে গায়ের জোর ভিন্ন কোন যুক্তি আছে কিনা সন্দেহ। যে কালে গায়ের জোরে লোকের অধিকার সাব্যস্ত হইত, সে কালের কথা স্বতন্ত্র। সে কালের নজির দেখাইয়া আজিকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আজ যদি পুরুষের অভিভাবকত্ব নারীরা না মানিতে চাহেন, তবে দেশের আদালতে পুরুষ ইহার কোন প্রতিকার পাইবেন না। যদি পুরুষ পশুবলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, নারীর অন্ততঃ চীৎকার করিবার সাহস হইয়াছে। ফলকথা, নারীরা যতদিন প্রতিবাদের সাহস করেন নাই, ততদিন পুরুষের অভিভাবকত্ব নির্ব্বিবাদে খাটিয়াছে। আজ যখন তাহা খাটিতেছে না, তখন সমাজ-জীবনেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

নারী আজ সমাজে পুরুষের সহিত সমানাধিকার দাবী করিয়াছেন। তাঁহাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলে অবশ্য এ দাবী পুরুষের দরবারে পেশ করিবার কোন অর্থ হইত না, তাঁহাদের পথ তাঁহারাই দেখিয়া লইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের মুখাপেক্ষী বলিয়াই এ সম্পর্কে তাঁহাদের যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তাঁহারা অধীন ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদের চিরদিন অধীন থাকিতে হইবে, এ কথা নারী আজ মানিতে চাহেন না। কার্য্যকুশলতা, বুদ্ধি বা মনীষায় যে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহাও পুরুষের মনগড়া যুক্তি। নারীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে সুযোগ পাইলে তাঁহারাও এম এ পাশ করিতে পারেন, অফিস চালাইতে পারেন, ব্যারিষ্টারী করিতে পারেন, ফুটবল-হকি খেলিতে পারেন, সাঁতার কাটিয়া সাগর পাড়ি দিতে পারেন, উড়ো জাহাজ চালাইতে পারেন, যুদ্ধ করিতে পারেন;—এমনকি এসব কাজে তাঁহাদের যোগ্যতা পুরুষের চাইতে কম নয়। কিন্তু ইহা নেহাত যুক্তির কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যুক্তি সহজে, কার্যকরী হইতে দেখা যায় না; এই ব্যাপারে আমাদের সমাজনেতৃবৃন্দের সুবুদ্ধিও জাগ্রত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা তর্ক ও কটূক্তি যথেষ্ট করিতেছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সংস্কারবুদ্ধি ছাড়িয়া কিছু যে তাঁহারা বুঝিতে বা করিতে ইচ্ছুক এমন মনে হয় না। দুঃখিনী নারী তাই আজ নির্ম্মম আত্মহত্যার আশ্রয় লইয়াছেন। স্নেহলতার আত্মত্যাগ হইতে বহু বৎসর গত হইয়াছে; প্রতি বৎসর আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমরা ইহার প্রতিকারের জন্য আজিও সত্যিকার চেষ্টা করি নাই। নারীকে হয়ত আরও প্রচুর ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। হয়ত এমন দিনও আসিবে যখন এই হতাশা ও অসহায়তার ভাব কাটাইয়া নারী জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবেন। সেই দিন হয়ত তাঁহার বিদ্রোহের প্রবল আঘাতে আজিকার অথর্ব্ব সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া পড়িবে। ইহারও পরে যে সব নারী-পুরুষ সসম্মানে একত্র বসবাসে ইচ্ছুক—মনে করা হউক—আমরা তাঁহাদেরই সমাজ-ব্যবস্থার কথা ভাবিতেছি।

মনে করা হউক, সে, সমাজে পরস্পর শুভেচ্ছার ফলে সর্ব্ব বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। তখন প্রথমতঃ নারী উত্তরাধিকার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরুষের সমভাগী হইবেন, এবং সাথে সাথে আর্থিক জীবনে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমানে যে যে উপার্জ্জনক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, সে সে স্থানে কোথাও তাঁহারা সম্প্রদায় হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েন নাই, বরং নানা পুরুষোচিত ব্যাপারেও তাঁহাদের দক্ষতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশ্বের নারী সম্প্রদায় আজ পরমোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেছেন। কৃতকার্য্যতা লইয়া বিচার করিতে গেলে বর্ত্তমান জগতে নারীকে কোন সাহসিক বা কষ্টকর কার্য্য হইতেই বিরত করা যায় না। পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে বা খনি খুঁড়িয়া

কয়লা তুলিতে--কোথাও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। তথাপি কতকগুলি ব্যবসায়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব স্বভাবতঃই অধিক হইবার কথা, যেমন -সঙ্গীতচর্চ্চা, রন্ধন, চিকিৎসা, শিশুর লালনপালন ও শিক্ষাদান, গৃহশিল্প-রক্ষণ ইত্যাদি। সব ব্যবসায়ের দ্বার প্রত্যেকের জন্য মুক্ত করিয়া দিলেই নিজ নিজ পছন্দ ও কৃতিত্ব অনুসারে বিভিন্ন কর্ম্মী বিভিন্ন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন। প্রতিযোগিতার প্রবল তাড়নাই তখন তাঁহাদের স্বাভাবিক কার্য্যকুশলতাকে জাগাইয়া তুলিবে এবং যে ব্যবসায় যাঁহার জন্য সুগম তিনি সে ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। ইহাতে ক্ষতি কাহারও হইবে না, বরং সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর বাড়িয়া যাইবে। অতএব এ ভাবে যদি নারী নিজ আর্থিক-জীবনে স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করিতে পারেন, ভবিষ্যৎ পুরুষ সম্প্রদায়ের তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না।

তারপর সমাজজীবনেও তখন নারীর সমকক্ষতা সানন্দে স্বীকৃত হইবে। নিজ বিবাহে বা প্রয়োজন হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে নর ও নারীকে সমান ক্ষমতা দান করা হইবে। আজ যাঁহারা বিবাহ-বিচ্ছেদের নামে তুমুল প্রতিবাদের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা বরং সময় থাকিতে নারী-শিক্ষার গতিরোধ করিতে পারিলেই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন। অশিক্ষিতা ও সম্বলহীনা আজন্ম বন্দিনীদের পক্ষে যাহা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল, আজ যদি জ্ঞান ও সভ্যতালোকভূষিতা মহিলাদের প্রতিও তাহাই বিধান হয়, তবে এ শিক্ষা বা সভ্যতার মূল্য কি? পুরুষের নিজ বিবাহে যদি নিজ পছন্দ-অপছন্দের অর্থ থাকে, নারীরও তাহা থাকিবে। তখন কোন পুরুষ নারীকে নিজে গৃহপালিত জীব বিশেষ মনে করিবেন না। গৃহ-প্রাচীরে কাহাকেও কেহ বন্দী না করিয়া একে অপরের চিত্ত আকর্ষণে চেষ্টিত হইবেন। দুইটী সংস্কৃতিমণ্ডিত বীরহৃদয়ের পরস্পরের প্রতি মমতা ও প্রেমের বন্ধনই তখন বিবাহকে সার্থক করিয়া তুলিবে। আধুনিক সমাজে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা কম নয়। ভবিষ্যৎ-সমাজেও ভ্রমপ্রমাদ ক্ষমার্হ হইবে। দুঃখ যদি সত্যই দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তবে সে দুঃখকে সংস্কার বা স্বার্থবুদ্ধির নামে লালন করা হইবে না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির বন্ধন যদি ছিঁড়িয়া যায়,--দাম্পত্য-বন্ধনও তখন ছিঁড়িয়া ফেলিবার সহজ বিধান থাকিবে। ধৈর্য্য যে স্থলে জীবনের মহত্ত্ব সাধনার পরিপোষক, সে স্থলে তাহা প্রশংসনীয় হইবে; যে স্থলে কাপুরুষতা, সে স্থলে পরিত্যক্ত হইবে।

প্রগতির পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে মানুষের মনোজগতে আরও অসংখ্য অভিনব বিপ্লবের সূচনা হইবে। সমাজ-জীবনে তাহাদের প্রতিফলন আমরা বীরোচিত আগ্রহে বরণ করিয়া লইব, এবং তাহাদের সাহায্যে পৃথিবীর দুঃখভার-লাঘবে চেষ্টিত হইব। নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের মর্ম্মকথা আমরা ততদিনে বৈজ্ঞানিকের যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে বুঝিতে সক্ষম হইব। উন্নত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর মধ্যে মিলন বাঞ্ছনীয়, স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞানে গবেষণার ফলে তারা আমরা জানিতে পারিব। ইহার জন্য সমাজ-জীবনে যে প্রচুর পরীক্ষণের প্রয়োজন হইবে তাহাতে যৌবন-ধর্ম্মী নারী ও পুরুষ--কেহই পশ্চাৎপদ হইবেন না। সুখ ও দুঃখকে নির্ব্বিচারে অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে জয় করিবার সাধনাই তখনকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব হইবে। আজিকার কূটবুদ্ধিকণ্টকিত সমাজ-শৃঙ্খলের আবেষ্টনে যে নিরাপত্তা, তাহার পরিবর্ত্তে মহত্ত্বের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ জীবন-পথে অভিযানই তখনকার যুব-মনকে অধিক অনুপ্রাণিত করিবে। পরস্পর নিবিড় পরিচয় ও শুভকামনায় আবদ্ধ তখনকার নর-নারী এ অভিযানের ফলাফল সমভাগে গ্রহণ করিবেন।

আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য, অর্থাৎ আমাদের বাহিক কিম্বা মানসিক জীবনে কিছু ঘটে না। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়; আর সে সব দিনও একটি অপরটির যমজ ভ্রাতার ন্যায়। বিশেষতঃ এদেশে যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতেই আমাদের জীবনের ইতিহাস সমাজ কর্ত্তৃক লিখিত হয়ে থাকে। আমরা শুধু চিরজীবন তার আবৃত্তি করে যাই। সেই আবৃত্তির এখানে ওখানে ভুলভ্রান্তিটুকুতেই পরস্পরের ভিতর যা বৈচিত্র্য। কিন্তু যন্ত্রবৎ চালিত হলেও, মানুষ এ কথা একেবারে ভুলে যায় না যে, তারা কলের পুতুল নয়, ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট স্বাধীন জীব। তাই নিজের জীবন ঘটনাশূন্য হলেও অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চ্চা করে মানুষে সুখ পায়। অন্যরূপ অবস্থায় পড়লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হয়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারত--এই মনে করে' আনন্দ অনুভব করে।

আধুনিক বাংলা কাব্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের নানা বিভাগেই আমি লেখনী চালিয়েছি তার কারণ সে সব দিকে আমার মনের সহজ প্রবণতা ছিল। কেবল সাহিত্য যাচাইয়ের কাছে আমার মন ভেড়েনি। সাহিত্য বিচারে একেবারে হাত দিইনি তা বলতে পারিনে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার বিষয়গুলি ছিল দূরবর্ত্তী। তাদের সম্বন্ধে অনেকখানি দাগিয়ে কাল নিয়েছে স্বয়ং, তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়েছে সুদীর্ঘ কালের সম্মিলিত সম্মতিতে। বহু যুগের অভিজ্ঞান-পত্রে আমিও দিয়েছি একটা স্বাক্ষর।

উপস্থিত কালের বিচারে সাহিত্য-রচনা মাত্রই কখনো সমাদর কখনো অনাদর পেয়েছে। কিন্তু বারম্বার দেখা যায় উলটিয়ে গেছে বিচারের রায়। তার প্রধান কারণ বর্ত্তমান কালে যথোচিত সংখ্যক জুরি মেলে না। অতিদীর্ঘ কাল লাগে জুরির দল জোটাতে। ব্যক্তিগত খেয়াল পেরিয়ে বিচার বিশুদ্ধ করতে বহুকালের বহু লোকের মধ্য দিয়ে খেয়ালকে ছেঁকে নিতে হয়। বর্ত্তমান কালের মেজাজ অনেক আকস্মিক উত্তেজনার দ্বারা বিশেষ মূর্ত্তি ধরে প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সকল সময়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক আবেগ থেকে ঘটে না, অনেক সময়ে বিদেশী সাহিত্যের আকস্মিক প্রভাব বা অনুকরণ তার মূলে থাকে। তার মধ্যে স্থায়িত্বের লক্ষণ আছে কি না জীবিতকালে তার প্রমাণের অবসর পাওয়া যায় না। এই রকম ক্ষণকালের সীমানায় সংশয়িত অবস্থার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশের কাজ আমার কাছে রুচিকর হয় না।

আমাকে বলা যেতে পারে ভীরু। ভীরুতা আমার আছে। আমার ভয় পাছে ভুল করি। যেটা চোখে পড়েছে তার আড়ালে হয়তো অনেকখানি চোখে পড়েনি। যাকে অঙ্কুরে দেখছি তাকে হয়তো পরিণত রূপের আদর্শে বিচার করছি। শেষ পর্য্যন্ত দেখবার অবকাশ আমার নেই। যে প্রবর্ত্তনার ভিতর দিয়ে আগামী কাল রূপ নিয়ে উঠছে আমার অন্তরে তার নিকট স্পর্শ না থাকবারই কথা, সেই জন্যে তার অন্তর্নিহিত অনাগতকে আমি স্পষ্ট দেখতে না পেতে পারি। আধুনিক কালের ধ্যানের মধ্যে যা বিকাশোন্মুখ তার সমগ্র মূর্ত্তি তারাই কম বেশি উপলব্ধি করতে পারে যাদের চিত্ত সেই ধ্যানলোকের অন্তর্গত।

আমার সাহিত্য-যাত্রাপথের পূর্ব্ব অংশের দিকে যখন মুখ ফিরিয়ে দেখি তখন আমার সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পারি। সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত যখন প্রকাশিত হয় তখন দুই একজন সাহিত্য-রসিক তৎকালীন সাহিত্যের সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারদেশে বঙ্কিম সন্ধ্যাসঙ্গীতের সন্ধ্যা কবিতার বিশেষ উল্লেখ করেই আমাকে মালা পরিয়ে ছিলেন। তখনো যা দেখা দেয়নি — তাই বোধ হয় তাঁর চোখে পড়েছিল। আমার নিজের মধ্যে আজকের দিনের যে বিচারক আছে সে যদি সেই সভাদ্বারে সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির দেখা পেত তাহোলে তাকে মালা দিত না। যে রূপটি ফুটে ওঠেনি সে যে ভাবীকালে পূর্ণ হয়ে উঠবে সে কথা আন্দাজ করে আগাম মূল্য দিতে পারে ক'জন যাচনদার?

আজ বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটা নতুন রূপের প্রকাশোদ্যম দেখতে পাচ্চি। কিছুকাল পূর্ব্বে সেই প্রথম চেষ্টার মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল, হয়তো এখনো বা কিছু আছে। যে স্বপ্ন অপ্রীতিকর, তার থেকে কোনো মতে জেগে ওঠবার প্রয়াসে মানুষ যেমন নিদ্রাবেশের বিরুদ্ধে ঝুটোপুটি করে সেদিন সেই রকম একটা অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে একটা উগ্রতা ছিল। যে-প্রচলিত প্রভাব তখনো প্রবল ছিল তাকে অস্বীকার করবার উত্তেজনায় তাকে অসম্মান করবার চেষ্টা উগ্র হয়েছিল; এই বিদ্রোহের অবস্থায় অবিচার স্বাভাবিক।

বন্ধন মোচনের এই প্রয়াসের বাইরে আমার নিজের রচনার ক্ষেত্র। এ অবস্থায় আমার কাজ চুপ করে তাকিয়ে দেখা। যখন নিজের উপর আঘাত এসে লাগে তাকে সহ্য করা। আমার রুচিতে যখন অদ্ভুত কিছু লাগে তখন নিজেকে বোঝাই;

আদ্যলীলায় আমিও ছিলেম অদ্ভুত। সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন এখনকার অধিকাংশ পরিচিত কবির চেয়ে আমার বয়স অনেক কম ছিল; তখন একদিন কাজ-কামাই-করা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমাদের তেতালার ঘরে বসে প্রবল খেয়ালের প্রমত্ততার শ্লেট হাতে করে একটা কবিতা লিখেছিলুম। সেকালের ভদ্র আদর্শে তার এলোমেলো ক্ষ্যাপাটে আচরণ নিতান্তই ছিল সৃষ্টিছাড়া। তার বাক্য ছিল যা-খুসি-তাই, তার অগোছালো লাইনগুলোর আয়তন কারো সঙ্গে কারো মিল রেখে চলেনি। কিন্তু সেটা লেখবামাত্র নিবিড় আনন্দ পেলুম। জিনিষটা ছিল নিরতিশয় কাঁচা কিন্তু নিঃসন্দেহে অকৃত্রিম। মন বলে উঠল এইবার আমার নিজের রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে, আর আমার ভয় নেই। অর্থাৎ ভয় নিজের কাছে ঘুচল, বাইরের কাছে বেড়ে উঠল ভয়ের কারণ। সেই বাইরের লোক বেদস্তুরকে অসত্যের চেয়ে বড়ো পাপ বলে মনে করে। পাঠকের কৌতূহল মেটাতে পারব না, সেই আমার সর্বপ্রথম আপন লেখাটি অন্তর্ধান করেছে। নিজের কাছে অত্যন্ত যা সত্য তাকে নির্ম্মম লোকচক্ষে প্রকাশ করতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম। এখনকার মতো বুকের পাটা ছিল না।

সেই লেখাটার রূপ যদি নিঃসংসক্ত ভাবে দেখবার শক্তি আমার থাকত তাহোলে হয়তো তাকে অন্যদের মতোই বিদ্রূপ করতুম, কিন্তু তার বেগ আপনার মধ্যে একান্তই অব্যবহিতভাবে অনুভব করেছিলেম। সেই বেগের মধ্যে ভাবী সৃষ্টির প্রেরণা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। নীহারিকামণ্ডলকে তার বেগের সঙ্গে এক ক'রে দেখলে বোঝা যায় তা নিরর্থক বাষ্পপুঞ্জ নয়, তা নিত্য বিকাশোদ্যত জগৎ।

বাংলাসাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আজ একটা নব উদ্যম জেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চেষ্টা প্রচলিত বিধানের বাঁধন ভাঙতে প্রবৃত্ত ব'লেই ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অতিকৃতি অতিভঙ্গীতে গিয়ে পৌঁছয়। আন্তরিক বেগের থেকেই যে তার স্বাভাবিক উৎপত্তি তা সকল ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কোথাও কোথাও তার উদ্ভব আত্মপ্রচারের অতিশয় স্পর্দ্ধা থেকে, কোথাও বা ব্যর্থ বিদেশী অনুকরণ থেকে। অপেক্ষা করতে হবে। অতিসজাগ ঔদ্ধত্য ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে। তখন রূপসৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেবে। অনেক কিছু লুপ্ত হবে, আলোড়িত সমুদ্রের জলবিম্বের মতো। আবার অনেক কিছুই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে নবযুগের বাণীকে নূতন ভাষায় বহন ক'রে। ক্রমশই এই কথাটা স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকবে যে, গায়ে-পড়ে ধাক্কা দেওয়া নূতনত্ব, — আত্মশক্তিতে গভীর অবিশ্বাসেরই প্রমাণ। যার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে সে পুরাতনকে জোর ক'রে এড়িয়ে যায় না, পুরাতনের ভূমিকাতেই সে নূতনকে উদ্ভাবিত করতে পারে।

সবশেষে একথা আমি স্বীকার করব যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বারম্বার আমাকে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে এবং আশান্বিত করে তোলে। জানি এই ভিড়ের মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে এসে জুটবে অনেক অভাজন, আসবে তারা আধুনিকতার উদগ্র ছাপমারা ভেক ধারণ ক'রে -- তারা মেঘের মতো জমা হয়ে জ্যোতিষ্কদের আচ্ছন্ন করতে থাকবে। এরাই লোককে ভুলিয়ে দেয় দলবাঁধা সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়, সাহিত্য বিশেষ কারখানার প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন মার্কামারা বস্তাবন্দী মালের ভাণ্ডার নয়, সাহিত্যে প্রতিভার আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য আত্মসমাহিত! সাহিত্যিক পত্রিকায় যখন একত্রে জমাট-করা বহু কবিতার পিণ্ড দেখতে পাই তখন ভয় হয় শ্রেণীগতভাবে আধুনিক মেল-বন্ধনের সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রে পাঠকদের মনে পাছে তারা বিভ্রম জন্মাতে থাকে এবং সমষ্টির কলঙ্ক লাগায় বিশিষ্টদের উপরে। (পরিচয়)

(বৈশাখ ১৩৪৪)

সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্যাণীয়েষু

রস-সাহিত্যের রহস্য অনেককাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বারবার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলি আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্য রূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথাথ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হোতে নানাখানা, রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিক মতো হোতে পারলেই খুসি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মানুষের মন চায় মিলতে, মিলে গিয়ে হয় খুসি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না -- সাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে প্রচলিত সৌন্দর্য্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল এতদিন যা উল্টো ক'রে বলছিলুম তাই সোজা ক'রে বলার দরকার। বলছিলুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের বোধকে জাগায় সে-কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাহিরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে ওথেলো নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্বেলিত করেছিল যে সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্য্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আছি এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারদিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক। কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের চৈতন্যকে স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় ব'লে জানে, অথচ আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। এ'কে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুসি হয়ে, লীলা যদি না হোত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীটস্-এর বাণী মনে পড়ল — truth is beauty, beauty truth. অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা "হৃদা মনীষা মনসা" উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানাভাবে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য, — তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়। সে অসুন্দর হোলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলঙ্কার শাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে — বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলা-জগতের সৃষ্টি সাহিত্যে।

কিন্তু এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্ব্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের নির্ব্বাচনের কর্ত্তব্য আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁঝ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ ক'রে চিরকালের সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিলে যায়।

প্রাচীন আরবী সাহিত্য

আমীনউদ্দীন আহ্‌মদ, এম এ.

ফুলের বুক ফাটিয়া বাহির হয় গন্ধ, বাঁশীর বুক ফাটিয়া সুর, তেমনি মানুষেরও বুক ফাটিয়া বাহির হয় ভাষা, সুর, ছন্দ, কাব্য — জীবনের এক বিরাট রঙীন চিত্র। যুগে যুগে দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে এই কাব্য এই গান গাথা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আবহাওয়া ও পরিবেশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করিয়া সকল যুগের মানবমনের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি এই কাব্যগাথা সবখানেই প্রায় একই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সকল দেশের সর্ব্বকালের কাব্যে এক আশ্চর্য্য সঙ্গতি দেখিতে পাই। বর্ব্বর যুগের বেদুঈন উটের পিঠে বসিয়া দিগন্তপ্রসারী সাহারার বুকে যে গান গাহিয়াছে তাহা আমরা এই নদী-মাতৃক বাঙ্লায় বসিয়াও উপভোগ করিতে পারি। যখন সে বলে

"O fool to barter sleep for awaking! Blest is he whose eyelids close in rest" - তখন মনে হয় যেন আমাদেরই দেশের কোন এক আধুনিক কবির সঙ্গীতধারা কানের ভিতর দিয়া আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছে।

ইব্‌নে-আব্বাস বলিয়াছেন — "কবিতা আরব-বাসীর মনোজগতের খতিয়ান (তাঁহার কথায় আশ-শেয়রো দীওয়ানুল্ আরব)।" বস্তুতঃ আরব জাতির জীবনেতিহাস তাহাদের কবিতা, গাথা ও প্রবাদ-বাক্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাহাদের জীবনের ছবি যদি কোথাও পাইবার আশা করি, তবে তাহা তাহাদের প্রাণ-ঢালা সঙ্গীত ও কাব্যে। এই কবিতা ও গান যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের বুকে বুকে সঞ্চিত ছিল; কালের পরিবর্ত্তনে এখন তাহা পুস্তকের পাতায় স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন আরবে আজ এক কবি একটা গান রচনা করিয়া শুনাইল, কাল তাহা মরুভূমির প্রান্তে প্রান্তে ধ্বনিত হইল, কিছু দিন পরে সারা দেশের লোকের স্মৃতিতে তাহা বাঁধা পড়িল। এই ছিল সে-যুগের রীতি। তখন রসিক বেদুঈন জ্বলন্ত সূর্য্যের নীচে বসিয়া মনকে উজাড় করিত — প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত শিশুর কণ্ঠ ভেদিয়া তাহার অন্তরের তেজস্বিতা বাহির হইয়া আসিত

"War! War! War! War!
It has blazed up and scorched us sore
The highlands are filled up with its roar
Well done, the morning when your heads
you shore!"

আজ কাল আমরা কাব্য-চর্চ্চা করি বিশিষ্ট এক শ্রেণীর-লোক যাঁহারা জ্ঞান অথবা বিদ্যার বড়াই করিতে পারেন, কিন্তু প্রাচীন আরবগণের মধ্যে কাব্য-চর্চ্চা করিত যাযাবর বেদুঈন। তাহারা গান গাহিত, গান শুনাইত। কিন্তু যাহারা নগরে বা পল্লীতে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত, তাহাদের কণ্ঠে যেন সুর গতিলাভ করিত না — প্রকৃতি যেন তাহাদের অনেকখানি মূক করিয়া রাখিয়াছিল। কেন না প্রকৃতির উলঙ্গতার মধ্যে তাহাদের জীবনের গতি বিধি খুবই কম ছিল, আর সেই জন্যই তাহাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ নাগরিক জীবনে কাব্য-গাথার প্রেরণা কদাচিৎ অনুভূত হইত। তাহাদের কবি-পরিচয়ের সংজ্ঞা দেখিলে হয়ত আমাদের হাসি পাইবে, কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, তাহাদের মতে কবি যিনি তিনি অলৌকিক, অমানুষিক জ্ঞান ও গুণে অলঙ্কৃত; তিনি ঐন্দ্রজালিক, "জিন" তাঁহার সহায়। এই বিশ্বাস খৃষ্টোত্তর প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই কবির শক্তিতে তাহাদের বিশ্বাস ছিল অপূর্ব্ব, ভক্তি ছিল অটল। তাহারা মনে করিত : কবির মুখ হইতে যাহা কবিতা হইয়া বাহির হয় এবং যাহা দুই দিনেই সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং গোত্রের গৌরবকে শতদিকে বাড়াইয়া তুলে তাহা সাধারণ ব্যক্তির কার্য্য নহে। এই জন্য কবি তাহাদের সংগ্রামে মহাবলী, শান্তিতে সহায় ও পথদর্শক এবং সব সময়ে সমগ্র সম্প্রদায় বা গোত্রের মুখপাত্র।

জালালুদ্দীন সুয়ূতি বলেন, প্রাচীন আরবগণ স্বগোত্রে কোন কবির আবির্ভাব দর্শন করিলে এক মহাভোজের আয়োজন

করিত, একে অন্যের সহিত কোলাকুলি করিত, মহিলাগণ বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিত — তাহাদের মধ্যে যেন আর আনন্দ ধরিত না। এই আনন্দ ও উৎসবের কারণ কি? কবি যে তাহাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে ইহাতে যেন তাহারা ধন্য হইয়াছে। কবির কাব্য তাহাদিগকে অমর করিতে পারে — এ কথা তাহারা বেশী করিয়া ভাবিত না; ভাবিত যে কবি তাহাদের সংগ্রামে গান গাহিয়া উত্তেজিত করিবে, তাহাদের বিজয়কাহিনী গাথায় রূপায়িত করিয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া দিবে, শত্রু গালি দিলে তাহার পাল্টা জওয়াব দিবে এবং সুখের দিনে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিবে। আমরা কবির কাব্য-গুণের মাপকাঠি দিয়া তাহাকে বিচার করি, হয়ত তিনি "নোবেল" প্রাইজ পাইলে, অথবা তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর হইলে "জয়ন্তী" উৎসব করিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করি, কিন্তু প্রাচীন আরবেরা কবির আবির্ভাবেই উৎসব করিত। ইহাতেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহারা কবির জন্ম বা আবির্ভাবকে বিধাতার অবদান বলিয়া গ্রহণ করিত।

যে যুগের কথা বলিতেছি তখন যদি মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে হয়ত প্রাচীন অক্ষর-জ্ঞান-হীন বেদুঈনদের অনেক সম্পদ আমাদের হাতে আসিত। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার এই প্রধান উপকরণটী তখনো মানুষের কল্পনার বাহিরে ছিল। তাই তাহাদের গাথা-গান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষের মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে। আরবে ইসলাম প্রচারের পরেও কিছুকাল এই অবস্থা চলিয়াছিল। তারপর আরবদের জীবনে এক ঘোর পরিবর্তন আসে, এবং তাহার ফলে তাহাদের পূর্ব্ব জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন পথে পরিচালিত হয় এবং নূতন করিয়া কাব্য-সাহিত্যের পত্তন হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবী কাব্যের বিশেষ কোন সন্ধান আমরা পাই না। তখনকার বেদুঈনগণ যে প্রাণ খুলিয়া গান করিত না, অথবা তখনকার রাজসভায় যে একেবারেই কোন কবির স্থান হইত না তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের গান সম্ভবতঃ অর্দ্ধপথে দীর্ঘমরুর মরীচিকায় মিলাইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই একটা খণ্ড কবিতা আমরা "কেতাবুল আগানীর" মারফতে পাইয়া থাকি। তাহাতেই বিস্মিত হইয়া আমরা দেখি সেই প্রাচীন এবং বর্ব্বর-যুগেও তাহারা কত সুন্দর করিয়া ভাবিতে পারিত ---

"Time brings to pass full many a wonder
Where of the lesson thou must ponder.
Whilst all to thee seems order fair
Lo! Fate hath wrought confusion there.
Against a thing foredoomed to be
Nor cunning nor caution helpeth thee."

নিয়তির নিষ্ঠুর-চক্র কি করিয়া যে আমাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাই বলিতেছেন এক মুমূর্ষ নৃপতি। (১) তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁহার পুত্রকে জীবনের এক বিরাট অধ্যায়ের পরিচয় দিয়া যান। এই কয়টী লাইন তাহারই একাংশ। ফন্ ক্রেমারের মতে এই কবিতাটী বহু পুরাতন।

জনৈক ভাগ্য-বাদী কবি (২) রাজাদের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন -

"They reigned and prospered; yet their glory past,
In yonder tombs they lie this many a year.
At last they were like unto withered leaves
Whired by the winds away in wild career".

এই কবিতা হইতে অনেক প্রাচীন কাহিনী জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাদের গোড়ার কথা না জানিয়াও মনে মনে খুশী হই যে উমর-খাইয়াম্ সহস্র বৎসর পরেও ঠিক এই কথা বলিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

প্রাচীন কবিদের উল্লিখিত কবিতা এবং পরবর্ত্তী যুগের কবিগণের কাব্যের মধ্যে আমরা যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাই। কবিতাগুলিতে বেদুঈন-জীবনের অবাধ গতি, চঞ্চল উদ্দামতা এবং উগ্রতার স্পর্শ নাই। ইহার কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে;

(১) আসাদ কামেল, য়্যামেনের বাদশাহ্ — উপাধি তুব্বা : হিম্‌য়ার বংশীয় রাজাগণ এই উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

(২) আদী বিন জায়দ্।

এ সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে এগুলি যে-যুগের কবিতা সেটী প্রাচীন আরবী-সাহিত্যের অতি শৈশবকাল। তাহার কৈশোর বা যৌবন আসিতে তখনো অনেক বিলম্ব।

প্রাচীন আরবী-সাহিত্যের যৌবনকাল মাত্র সোয়া'শ বৎসর। এ যুগের কবিতা বা গাথা আরবী সাহিত্যের, তথা বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই অপেক্ষাকৃত অনতিদীর্ঘ যুগের কাব্যসাধনা যে শুধু কোর্‌আন্ ও হাদীসের ব্যাখ্যায় কাজে লাগিয়াছে, অথবা শুধু মানব-মনের আনন্দের উপকরণ জোগাইয়াছে তাহা নয়, ভাষার দিক দিয়াও মানুষকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিয়াছে। এই সুবর্ণ যুগে ভাষার গতিবেগ ঠিক অশ্বারোহী বেদুঈন-যোদ্ধার মতই দ্রুতচারী। যেন রণবেশী বেদুঈনের অন্তর কাব্যের ভিতরে যুদ্ধোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে।

প্রাক্-ইস্‌লামিক কবিদের মধ্যে কয়জনকে আমরা যে কোন যুগের প্রথম শ্রেণীর কবির সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। তাঁহাদের ভাষা, ভাব এবং বলিবার ভঙ্গি এমনি সুন্দর যে, তাহা এ-যুগেও আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। একদিকে বেদুঈনের উগ্রতা, উদ্দামতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অদম্যতা, আবার অন্যদিকে নমনীয়তা, কমনীয়তা, রসিকতা, এবং ভাব-প্রবণতা — এই সব ভাব ও রসের অপূর্ব্ব মিশ্রণে তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভা আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে।

চিরতরুণ রাজপুত্র ইমরুল কায়েস যৌবন-মহিমার গান গাহিয়া গিয়াছেন। সে গান শুধু তাঁহাকেই অমর করে নাই, আরবী-সাহিত্যকে এবং আরবভূমিকেও অমর করিয়াছে। তাঁহার খণ্ড-কাব্য "মোয়াল্লাকা" সৌন্দর্য্য, বীরত্ব এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনার এক অপূর্ব্ব আলেখ্য।

অভিমানিনী প্রিয়ার উদ্দেশে তরুণ কবি গাহিয়াছেন :

"But ah, the deadly pair, thy streaming eyes !
They pierce a heart that all in run lies'.

আরবীয় ও ইউরোপীয় সমালোচকগণ এই দুইটী লাইনের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

কবি তাঁহার প্রিয়ার রূপবর্ণনায় সিদ্ধহস্ত :—

"Her slender waist and legs more plump than fine —
A graceful figure a complexion bright,
A bosom like a mirror in the light;
A white pale Virgin pearl such lustre keeps
Fed with clear water in untrodden deep."

কিশোর - কবি তারাফা তিনটী জিনিস ছাড়া আর কিছুই চান না :

"Save only for three things in which noble
youth take delight"

সেই তিনটী জিনিষ কি?

প্রথম — "Wine that foams when the water is poured on it, ruddy not bright".

দ্বিতীয় — "My charge at the cry of distress on a steed."

এবং তৃতীয় —" The day-long with a lass in her tent of goats' hair to hear the wild rain and beguile of their slowness the hours."

এই কয়টী লাইন পড়িলে মনে হয় তরুণ কবি Keats তাঁহার কণ্ঠে সুর দিতেছেন।

কিশোর কবি তারাফা জীবনের স্বপ্ন-রঙীন দিনগুলির এই বাস্তব ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাঁহার বয়স উনবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে নিয়তির নিষ্ঠুর হস্ত যদি তাঁহাকে জগৎ হইতে অপসারিত না করিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহার কাছে আরো যৌবনের রসস্নিগ্ধ গান শুনিতে পাইতাম। হীরার রাজা আম্‌র-বিন্-হিন্দ্ এর রাজ-কবি হিসাবে তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারই নিষ্ঠুরতা হইয়াছিল কবির অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একদিন রাজ-সহোদরা, রাজা এবং কবি এক টেবিলে বসিয়াছেন। কবি তারাফা গাহিয়া উঠিলেন :

"Behold she has come back to me,
My fair gazelle whose earings shine.
Had not the king been sitting here,
I would have pressed her lips to mine."

এইপ্রকার আরো অনেক কারণে উদ্দাম কবি তারাফা অকালে জীবন হারাইয়াছেন। তাঁহার Sensuous-romanceকে আমরা ইংরাজ কবি Keats-এর সহিত তুলনা করিতে পারি।

বীরত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে আম্‌র-বিন্‌-কুল্‌সুম্‌ ও আন্‌তারা-বিন্‌-শাদ্দাদের কবিতায়। উভয়ের ভাষার গাঁথুনী যেমন কঠিন ভাবের ধারাও তেমনই প্রবল। আম্‌র-বিন্‌-কুলসুমের বীরত্ব আরবী-সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মাতা লায়লাকে অপমান করিতে গিয়া হীরার রাজা আম্‌র-বিন্‌-হিন্দ্‌ এক নিমেষে এই বীর কবির হস্তে প্রাণ হারান। কবি আম্‌র এই রাজার নিকট এক সময়ে তাঁহার কবিতা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে বলিয়াছেন :

"Ours is the earth and all thereon, when we strike
There needs no second blow,
Kings lay before the new weaned boy of Taghlib
Their heads in homage low."

আবার, তাঁহার কবিতার প্রথম লাইনটীতেই শয্যালগ্না রূপসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :

"Up maiden! Fetch the morning drink and spare not
The wine of Andarin,
Clear wine that takes a saffron hue when
Water is mingled there in.
The lover tasting it forgets his passion.
His heart is eased of pain,
The stingy miser, as he lifts the goblet
Regardeth not his gain"

অগ্নিক্ষরা সাহারার বুকে এ যেন এক অন্তঃসলিলা ফল্গু!

আনতারা ছিলেন কাফ্রী-দাসীর পুত্র। তাঁহার বীরত্ব এবং কাব্য তাঁহাকে সাধারণ শ্রেণীর অনেক উর্দ্ধে স্থান দান করিয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন :

"On one side nobly born and of the best –
Of Abs am I : my sword makes good the rest."

তাঁহার নীজের বীরত্বের কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন : —

"With straight hard shafted spear
I dealt him in his side,
A sudden thrust which opened
Two streaming gushes wide;
So with my daughty spear
I trussed his coat of mail,
For truly when the spear strikes
The noblest man is frail."

কিন্তু তাঁহার বীরত্বের চেয়ে তাঁহাকে সাহিত্যজগতে সুপরিচিত করিয়াছে তাঁহার Romance এবং পাশ্চাত্য জগতে তিনি "Romantist Antara" নামেই সুপরিচিত। তাঁহাকে আমরা Achilles of the Arab নামে সহজেই অভিহিত করিতে পারি। একদিকে তাঁহার পৌরুষ, অন্যদিকে তাঁহার প্রেম-প্রবণতা, তাঁহাকে একাধারে বেদুঈনের বীরত্ব এবং কামিনীসুলভ কমনীয়তা দান করিয়াছিল।

প্যাগান আরবদের মধ্যে যে সব কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে কেহ ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন, তিনি "সপ্ত মোয়াল্লাকার" কবিদের অন্যতম জোহায়ের বিন্ আবি-সাল্‌মা। জোহায়েরের কবিতায় যাযাবর জীবনের উদ্দামতা, মরু-জীবনের অবাধ অগ্রগামিতা অথবা বেদুঈন জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, সেখানে আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকের সরল ও সহজ জীবনের মর্ম্মস্পর্শী বাণী শুনিতে পাই। তিনি কাহাকেও অনাবশ্যক প্রশংসা করিতেন না। এমন কি তিনি কবিতা লিখিয়া কাট-ছাট ও সংশোধন করিয়া এবং সমপন্থী কবিদের দেখাইয়া শুনাইয়া এক বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে তাহা কখনও লোকচক্ষুর গোচর করিতেন না।।

তিনি তাঁহার কবিতায় একস্থানে বলিতেছেন :—

"Will ye hide from God the guilt ye dare
not unto Him disclose?
Verily, what thing soever ye would hide
from God, He knows,
Either it is laid up meantime in a scroll
and treasured there
For the day of retribution, or avenged all
unaware."

এই দূরদর্শী দার্শনিক কবির অনেকগুলি কবিতার লাইন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। সত্য ও কর্ত্তব্যের পথ যে মানুষের একান্ত অনুসরণীয় তাহা তিনি একটী লাইনে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন — To the sanctuary of duty never needs to hesitate." তাঁহার কাব্য-প্রতিভা তিনি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পুত্র কা'ব কে প্রদান করিয়া যান, — উত্তরকালে যাঁহার কাব্য-যশ-আরবী-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। জোহায়েব-এর কাব্যের সুর যেন উত্তরকালের দার্শনিক ইংরাজ কবি Wordsworth-এর সহজ রচনায় দেখিতে পাই।

"সপ্ত মোয়াল্লাকার" কবিদের মধ্যে লবিদ ছিলেন বেদুঈনেরও বেদুঈন। তাঁহার 'বেদুঈনী' বর্ণনা ইউরোপীয় সমালোচকগণকেও অবাক করিয়া দিয়াছে। প্রাক্-ইস্‌লামিক গীতি-কাব্যে আমরা যাহা আশা করিতে পারি লবিদের কবিতায় তাহার সবকিছুই পাইয়া থাকি। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় এবং যাযাবর-জীবনের হুবহু চিত্র অঙ্কনে অন্যান্য মোয়াল্লাকার তুলনায় ইহার স্থান অতি উর্দ্ধে। প্রিয়াহীন 'বিয়াবানে' দাঁড়াইয়া তিনি অতীতের কত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন, দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, এমন কি কাঁদিয়াছেনও, তারপর বলিয়াছেন :—

'I stopped and asked, but what avails it that we ask
Dumb changless things that speak a language
all unknown?"

লবিদ মোয়াল্লাকার কবিদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া কাব্য-চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন : "God has given me the Quran in exchange for it".

হারিস-বিন হিল্লিজার কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক তথ্যের নির্দ্দেশ পাইয়া থাকি। কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহা অন্যান্য কবিদের রচনার সহিত তুলিত হইতে পারে না। তথাপি তাঁহার কাব্য সপ্ত মোয়াল্লাকার একটী বলিয়া এই কবির নাম উল্লেখ করিতে হয়।

মোয়াল্লাকার সপ্ত-কবি ব্যতীত আরো তিনজন কবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাক্-ইসলামিক যুগে তাঁহাদের প্রাধান্য যথেষ্টই ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে সাহিত্য সমালোচকগণ বিনা দ্বিধায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন।

নাবেগা, নোমান-বিন্-মুন্‌জেরের সভাকবি ছিলেন। সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁহার নিপুণতা অতি চমৎকার। রাজ-রাণী মোতজারিরদার রূপবর্ণনায় তিনি এত সূক্ষ্ম বিষয়ের ও বিভিন্ন অঙ্গের এত সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অবশেষে কবি প্রাণ-ভয়ে রাজসভা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাজসভা ছাড়িয়া তাঁহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া ওঠে এবং কালে তিনি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন। তিনি দূরদেশ হইতে রাজাকে লিখিতেছেন:—

"They brought me word, O King, thou blamest me;
For this I am overwhelmed with grief and care"

তারপর রাজাকে খুশী করিবার জন্য প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন :

"Seest thou not God hath given thee eminence
Before which monarchs tremble and despairr?
All other kings are stars and thou a sun
When the sun rises, lo, the heavens are fare!"

শেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন :— I may have sinned and sinning all men share. তাঁহার কবিতার সবেগ প্রবাহ যেন পদ্মার মতন খর-স্রোত অথচ মেঘনার মতন নিস্তরঙ্গ। আমাদের এই বাঙ্‌লা দেশের বাউল কবিদের মতই আরব কবি আশা আরবের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বীণাহস্তে গান গাহিয়া এবং রাজ-রাজড়াদের প্রশংসা করিয়া ফিরিয়াছেন। সভা হইতে সভান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সহিত অবাধ মিলনের কারণে তৎকালীন সর্ব্বপ্রকার কৃষ্টির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তাঁহার সময়ে এমন রাজা বা গোত্রপতি ছিলেন না যিনি আশাকে ভয় না করিতেন। কারণ তাঁহার কণ্ঠ ছিল তরবারির চেয়েও ধারালো। প্রশংসার বিনিময়ে তাঁহার ন্যায্য বা অন্যায্য দাবী পূর্ণ করা না হইলে আশার কবিতা পরদিন রাজা বা গোত্রপতির যশোমহিমাকে কলঙ্কে পরিণত করিত। এইজন্য তাঁহাকে প্রধানতঃ ব্যঙ্গ কাব্যের কবি মনে করা হয়। কিন্তু তাঁহার এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব ছিল দ্রাক্ষারসের গুণবর্ণনায়। একস্থলে তিনি বলিতেছেন :—

"When the loose-robed chantress touched
it (wine-glass or goblet) and sang shrill
with quivering throat,
Here and there among the party damsels
fair superbly glide :
Each her long white skirt lets trail and
swings a wine-skin at her side.

কথিত আছে সুজন পথিক পথ চলিতে চলিতে তাঁহার কবরের পাশে থামিয়া যাইত এবং উহার উপরে তাহাদের মদ্য-পাত্রের শেষ বিন্দু কয়টী কবির মদ্য-প্রীতির স্মৃতি স্বরূপ ঢালিয়া যাইত। আর একজন কবির কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নারী-চরিত্র-বিশ্লেষণ এই বিংশ-শতাব্দীর মনস্তত্ত্ববিদকেও হয়ত অবাক করিয়া দিবে। নারী যে মন প্রাণ দিয়া যৌবনের মত্ত মদিরা পান ও কামনা করিতে পারে, ধনসম্পত্তি বা বাহিরের সৌন্দর্য্য যে তাহাকে সব সময়ে লুব্ধ করে না তিনি তাহা এই কয় লাইনে বলিতেছেন :—

"Of women do ye ask me? I can spy
Their ailments with a shrwed physician's eye.
The man whose head is grey, or small his herds
No favour wins of them but mocking words.
Are riches known, to riches they aspire
and "youthful bloom" is still their hearts' desire"

হামাসা নামক গ্রন্থকে আমরা আরবী 'কাব্য-সঞ্চয়' নামে অভিহিত করিতে পারি। প্রাচীন ও ইস্‌লামী আমলের কবিদের খণ্ড কবিতা ইহার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রাচীন আরবী সাহিত্যে গীতি-কবিতার প্রাচুর্য্য খুবই দেখা যায়, তবে খণ্ড কবিতা ইহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। হামাসার মধ্যে সবগুলিই প্রায় খণ্ড কবিতা। প্রত্যেকটী কবিতা বিশেষ একটী বিষয় লইয়া অতি-অল্প কথায় সহজ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আরবীয়দের বিশিষ্ট গুণানুযায়ী যে-সব কবিতা হামাসার বিশিষ্ট অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সাহসিকতা, যুদ্ধপ্রিয়তা, আতিথেয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর কবিতা — মর্‌সিয়া। আমরা ইহাকে শোক-গাথা বা অশ্রু-গীতি বলিয়া অভিহিত

করিতে পারি। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গীতি কবিতার কবিগণ প্রায়ই পুরুষ এবং তাঁহাদের কাব্যের সুর ও ধারা মেয়েলী ও অনেকটা রোমান্‌স্‌-ঘেষা; আর মেয়েলী ও রোমান্স -ঘেষা না হইলেও অশ্রু-কবিতার মত তেমন তেজো-ব্যঞ্জক নহে। আর এই শোক-গাথা বা মর্‌সিয়ার কবিগণ প্রায়ই মহিলা! তাঁহাদের সতেজ ও সরল মনের সহজ প্রকাশ মর্‌সিয়াকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। খান্‌সা নাম্নী একজন মহিলা তাহার বীর ভ্রাতার মৃত্যুতে গাহিয়াছেন :—

"Death's messenger cried aloud the loss
of the generous one,
So loud cried he, by my life, that far
he was heard and wide.
In my misery & despair I seemed
as a drunken man
Up standing a while - then soon his
tottering limbs subside"

★ ★ ★ ★ ★

"Sunrise awakes in me the sad
remembrance
Of Sakhr and I recall him at every
sunset."

এই সব কাব্য-গাথা হয়ত আমাদের হস্তগত হইবার বহু পূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত যদি না বস্‌রা এবং কুফা শহরে "ব্যাকরণ-বিদ্যালয়" স্থাপিত হইত। এই দুইটী শহরে জীবনের বহুপ্রকাব তাগিদে বিভিন্ন দেশের লোকের সমাগমে এবং ইসলামের ছায়ায় বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের আগমনে আরবী ভাষা দিন দিন বিকৃত হইতে আরম্ভ করে, তখন কোর্‌আন্‌ ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও টিকার প্রয়োজন হয়, আরবী ভাষার বিশ্বকোষ তখনই রচিত হইতে শুরু হয়। এই কারণে প্রাচীন কবিতা অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিতে তৎকালীন পণ্ডিতগণ তৎপর হন। এই সময় দূর-দূরান্তের বেদুঈন কবি, কাব্যরসিক বা সমালোচকদের নিকট হইতে বহু কবিতা সংগ্রহ করিয়া কোর্‌আন হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এইরূপে প্রাচীন কাব্য-সম্পদ রক্ষিত হয়।

দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে প্রাচীন কাব্যের সঠিক ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। হয়ত অনেক কবিতা একজন কবির লেখা হইলেও অন্য কোন নামজাদা কবির নামেই চলিয়া গিয়াছে; এমন অনেক কবিতা সূক্ষ্ম সমালোচনায় ধরাও পড়িয়াছে। তবু আমাদের সান্ত্বনা এই যে ঐ সব কাব্য যাঁহার দ্বারাই লিখিত হউক আমরা তাহাদের রসসম্পদ হইতে বঞ্চিত হই নাই!

প্রাচীন আরবী সাহিত্যে শুধু কবিতার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। গদ্য -সাহিত্যের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। বেদুঈন-সাহিত্যের যখন শিশুবয়স তখন সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল — তাহার অনর্গল গতি ভঙ্গিতে। ইহার যোগ্য বাহন কবিতা, গদ্য রচনা নয়! কথাটী আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধেও খাটে। বর্ত্তমানের রাবীন্দ্রিক গদ্য, অথবা অতীতের বঙ্কিম-সাহিত্যের গদ্য, বাংলা সাহিত্য তাহার বাল্যাবস্থা কাটাইয়া উঠিবার অনেক পরে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে গদ্য-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছিল একান্ত অকিঞ্চিৎকর। আরবী গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করিবার পর হইতে আশ্চর্য্য গতিতে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মুস্‌লিম আমলে উৎকৃষ্ট আরবী গদ্যের নিদর্শন আল্‌-হারিরী অথবা আল্‌-হাম্‌দানী কবিদ্বয়ের মাকামা নামক গদ্য-কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেকথা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।*

(শ্রাবণ, ১৩৪৪, চতুর্থ বর্ষ)

* এই প্রবন্ধ লিখিতে Layall এর (Trans) The Ancient Arabic Poetry, Arnold এর Anc, Arabic Poetry, Nicholson এর Lit. Hist of the Arabs, Kitabul Aghani, (Abul,faraj Ispahani), Mujhir of Jalaluddin Suyuti ইত্যাদি বহির আংশিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে আরবীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী কোটেশান দিয়াছি। — লেখক।

বাঙ্গলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ

প্রমথ চৌধুরী

নব পর্য্যায় ''বুলবুল' পেয়ে ও পড়ে খুব খুসী হ'লুম। খুসী হবার প্রথম কারণ, এদেশে নূতন পত্রিকা প্রায়ই পুরোনো হয় না। আমাদের দেশে কাগজ পত্র টেক্‌সই হয় না এর নানা কারণ অবশ্য আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, মাসিক-পত্রিকার পাঠক অনেকে থাক্‌তে পারে, কিন্তু গ্রাহক অত্যন্ত কম। হিন্দু শাস্ত্রে বলে যে, দাতা ও গ্রহীতা একমন না হলে দান সিদ্ধ হয় না। আমরা সাহিত্যিকরা আমাদের মুখের ও মনের অনেক কথা দান করতে সদাই প্রস্তুত--কিন্তু সে দানের উপযুক্ত গ্রহীতা নেই। সাহিত্যই বলুন, শিক্ষাই বলুন, ধর্ম্মই বলুন, কর্ম্মই বলুন, সব মানব-প্রচেষ্টারই একটা economic basis থাকা চাই; শূন্যের উপর এর কোনটিই প্রতিষ্ঠা করে চলে না। অথচ আমাদের দেশে, বিশেষতঃ এই ইকনমিক দুর্দ্দশার দিনে, আমরা শিক্ষা-বাতিকগ্রস্তই হই আর সাহিত্য-বাতিকগ্রস্তই হই, আমরা শিক্ষা কিম্বা সাহিত্যের প্রচার করতে বসলেই দেখতে পাই যে, এ দুয়ের কোনটিরই পাকা ইকনমিক ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বৃথা, কেননা এ সত্যটি obvious, আর যা obvious অর্থাৎ স্পষ্ট সত্য, তা নিয়ে মানুষের বাক্‌বিতণ্ডার আর অন্ত নেই। এমন কি, যাঁরা পরের কথার অনুবাদ করেন, তাঁরাই বেশী করে প্রতিবাদ করেন। যে বিষয়ে কোনও সমস্যা নেই, সেখানেই সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই।

বুলবুল সম্পাদক জানতে চেয়েছেন যে বাঙলা ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত কি?

আমার মত এই যে, ফারসী ও আরবী শব্দ ছেঁটে দিলে বাঙলা ভাষা বলে কোনও একটা ভাষাই থাকে না। এই দেখুন না কেন, বাঙলায় জমাজমির প্রতি কথাটি ফারসী; সুতরাং সে সব কথা বাঙলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়, লেখাও বন্ধ হয়। যদি এমন কোনও কাণ্ডজ্ঞানরহিত হিন্দু সাহিত্যিক থাকেন, যিনি ফারসীর পরিবর্ত্তে তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তাঁকে বলি সংস্কৃত ভাষায় সে জাতীয় প্রতিশব্দ নেই। বহুকাল পূর্ব্বে আমার জনৈক মারহাট্টি বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি দু'চারটি ছাড়া জমা-সেরেস্তা ও শুমার-সেরেস্তায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বেদে পুরাণে খুঁজে পাননি।

আইন-আদালতের কথাগুলি প্রায় সব ফারসী কথা। অবশ্য আজকাল আইন-আদালতের অনেক ইংরাজী কথাও আমাদের ভাষায় ঢুকছে। আর ফারসীর সঙ্গে তাদের সমাস হয়ে যাচ্ছে, যেমন--'ডিক্রি-জারী'। সুতরাং এস্থলে কোন সমস্যাই নেই। অতএব এ সমস্যা তুললে শুধু গোলযোগের সৃষ্টি হবে।

বাঙলার প্রত্যেকের ও প্রত্যহের নিত্য ব্যবহৃত অনেক কথার কুল-শীলের খবর ইউরোপে খুঁজতে হয়। দেদার পর্ত্তুগিজ শব্দ বাঙলা ভাষা আত্মসাৎ করেছে। ফরাসী শব্দ ও ওলন্দাজ শব্দও অনেক আমাদের ভাষায় আছে, অবশ্য গা ঢাকা দিয়ে।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, উত্তর ভারতবর্ষের সব প্রচলিত ভাষায় তিন জাতীয় শব্দ আছে,--যথা তৎসম, তদ্ভব ও দেশী। কিন্তু সত্য কথা এই যে, বাঙলা ভাষায় অন্ততঃ লেখায় অনেক তৎসম কথা আছে, আর আছে তার চাইতে ঢের বেশী তদ্ভব শব্দ; কিন্তু দেশী শব্দ খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। উপরন্তু আছে অসংখ্য বিদেশী শব্দ, যথা ফারসী, আরবী, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজী শব্দ। বাঙলা ভাষার বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যও এই কারণেই। সুতরাং শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত লেখকেরা যখন এই বিদেশী শব্দগুলিকে অস্পৃশ্য করতে চান, তখন তাঁরা বাঙলা ভাষার অঙ্গহানী করতে চান; এ কাঁটা তাঁরা বাছতে পারবেন না।

তবে একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক; নূতন করে ফারসী ও আরবী শব্দ আমাদের ভাষায় আমদানী করবার কোন প্রয়োজনও নেই, অবসরও নেই। নূতন নূতন যে সব শব্দ বাঙলায় ঢুকবে সে সবই ইংরাজী শব্দ।

এখন আর একটি কথা বলেই এ পত্র শেষ করি। একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা বাঙলাকে প্রায় সংস্কৃত করে তোলবার প্রস্তাব করতেন। যদি তাঁদের অনুরূপ কোনও সম্প্রদায় মুসলমান সমাজেও থাকে, তাহলে বীরবলের একটি পুরোনো কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিই। বীরবল বলেছিলেন--''এ দোটানায় পড়ে বেচারা বঙ্গ-সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই স্থির করতে না পেরে চলৎশক্তি রহিত হবেন।''

গৌড়ের সুলতানের আদেশে রচিত "বিদ্যাসুন্দর"

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহদানের ফলেই বঙ্গভাষা শৈশবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ এবং মুসলমানগণের মধ্যেও অনেকে বঙ্গভাষার গ্রন্থাদি প্রচারের যেরূপ বিরোধী ছিলেন, তাহাতে গৌড়েশ্বরগণের সভাগৃহে স্থানলাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা শৈশবেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌড়ের সুলতানগণের মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ সাহেবের (রাজত্বকাল ১৪৭৪—১৪৮২ খৃষ্টাব্দে) আদেশে জৈনউদ্দীন নামক মুসলমান কবি "রসুল বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করিলে সুলতান তাঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রশংসাদ্যোতক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া পরাগল খাঁর আদেশে রচিত "মহাভারতে" উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও নসিরা শাহ (সম্ভবতঃ উক্ত নসরত শাহ) এবং গৌড়েশ্বর "প্রভু গয়াসউদ্দীন সুলতানের" প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নসরত শাহ যে প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমার আবিষ্কৃত একটি পদেও এই সুলতান নসিরা শাহের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির বাসনায় পদটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

ধানশী বেলাবলী।

অ কি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল ২ গজরাজ গমনী ধনি ধনি॥ ধু।
কাজলে রঞ্জিত ধনী ধবল নয়ান ভালে।
ভ্রমোরা ভুলল ২ বিমল কমল দলে॥
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাজাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি॥
সুন্দরী চান্দমুখী বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে যৈছে শারদ পূরণ শশী॥
সেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাছির শাহা ভুলিছে কমলবনে॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণও এক গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই "গৌড়েশ্বর" কে ছিলেন, কবি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি উক্ত গৌড়েশ্বরের যে সভা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-বিশিষ্ট ছিল। তদীয় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার অনেকটাই পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর গ্রন্থ পাঠে পরিজ্ঞাত আছেন। অতঃপর আমরা যাহা বলিব, তাহা বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট সম্পূর্ণ নূতন—একবারে অশ্রুতপূর্ব্ব। সে কথাটি এই যে, সুলতান নসরত শাহের পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকসমাজে এ সংবাদ প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যেই আজ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

সুলতান ফিরোজশাহের আদেশে "দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ" কর্ত্তৃক রচিত একখানি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দুইখানিই আদ্যোপান্ত খণ্ডিত। একখানির ২—৮ ও ২৭ সংখ্যক পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। অপরখানি একটি মাত্র পত্রাবশিষ্ট।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালে অনেক কবিই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের রচিত গ্রন্থের নাম "কালিকা মঙ্গল" দৃষ্ট হয়। আমাদের এই দ্বিজ শ্রীধরের পুঁথিরও ঐরূপ নাম ছিল কিনা, খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে তাহা বলিবার উপায় নাই।

নিম্নে কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

(১) নৃপতি নসির সাহা তনয় সোন্দর।
নাম ছিরি(শ্রী) পেরোজ সাহা রসিক সেখর॥
* * *
দ্বিজ ছিরিধর (শ্রীধর) রচিলেক পুনি॥

(২) নৃপতি নসির সাহা তনয় সোন্দর।
সর্ব্বকলা নলিনী ভুগিত মধুকর॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর (শ্রীধর) কবি রাজা পরমাণ॥

(৩) শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পাঞ্চালি ছন্দে ছিরি (শ্রী) কবিরাজ॥

(৪) রাজরাজেশ্বর তনয় সোন্দর
কর্ণ সম দাতা বিচক্ষণ।
শ্রীপেরোজ সাহা পঞ্চ গুণে অবগাহা
ছিরিধর (শ্রীধর) কবিরাজে ভাণ॥

(৫) নৃপতি নসির সাহা নন্দনে
ভোগপুরে মেদিনী মদনে।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান
ছিরিধর (শ্রীধর) কবিরাজে ভাণ॥

প্রাগুদ্ধৃত তৃতীয় ভণিতায় পাঠকগণ দেখিতেছেন, ফিরোজ শাহ তখনও যুবরাজ মাত্র,—রাজসিংহাসনে তখনও তিনি সমাসীন হন নাই। নসরত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ। ফিরোজ শাহ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং পুঁথিখানি ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নসরত শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

পুঁথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে। "মাধব ভাট রূপগুণং বিস্তার্য্য কথয়তি" "কন্যা কথয়তি" ইত্যাদিরূপ সংস্কৃত

বাক্য প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পুঁথিখানি যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে রচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুঁথিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা (দেবী) ও রাজ্যের নাম কাঞ্চী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

তখনও বাঙ্গালা ভাষাকে "বাঙ্গালা ভাষা" না বলিয়া "প্রাকৃত বা দেশী ভাষা" বলা হইত। প্রাচীন কালের বহু কবির লেখা হইতেই তাহা জানা যায়। কবি শ্রীধরের সময়েও বাঙ্গালা ভাষা "প্রাকৃত বা দেশী ভাষা" নামে অভিহিত হইত; যথা :—

"সাবধান নরলোক পাএ জেন মতে।
দেসি ভাসে পদবন্দে গাহি পরকৃতে॥"

কবি শ্রীধর গৌড় রাজসভায় থাকিতেন, আমরা এই মাত্র অনুমান করিতে পারি। তাঁহার বাড়ী ঘর কোথায় ছিল, আপাততঃ তাহা জানিবার কোন উপায় দেখি না। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অক্ষত শরীরে থাকিতে পারে নাই। ইহাতে মহাকালের যে অসীম প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার নিকট মানুষের ক্ষমতা যে কত তুচ্ছ, আমরা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। গৃহস্থের গৃহকোণ হইতে অযত্নে রক্ষিত জীর্ণশীর্ণ পাতা কয়টি কুড়াইয়া আনিয়া তৎসাহায্যে আজ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এক মহানুভব নৃপতি ও এক বিস্মৃতনামা কবির কীর্ত্তিকাহিনী বলিতে পারিলাম বলিয়া জরাগ্রস্ত মনে যে আনন্দানুভব করিতেছি, তাহা বর্ণনাতীত। *

* প্রবন্ধটি বিগত "চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনে" প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, আমার জানা নাই। —লেখক। *

উর্দ্দু সাহিত্যের ধারা

এস্ খোদা বখ্শ্

উর্দ্দু সাহিত্যের সঠিক জন্মবিবরণ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। যতদূর জানা যায় তৈমুরের ভারতাক্রমণ (১৩৯৮ সাল) হইতেই ইহার সমৃদ্ধির সূত্রপাত। আবার অনেকের ধারণা তৈমুরেরও বহুদিন আগেই 'ভারতের এই সাধারণ ভাষা'র অভ্যুদয়। তাঁহাদের মতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই মসউদ 'রেখ্‌তা' রচনা শেষ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত আমীর খসরুর উর্দ্দু কবিতাবলীর কথাও কেহ কেহ এ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

মুসলিম রাজত্বের গোড়ার দিকেই দেশীয় ভাষা ও ছন্দ মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদেরই প্রভাবে এ দেশের ভাষায় ও সাহিত্যে ধীরে ধীরে ফার্সি শব্দের প্রচলন হয়। চান্দ ও কবিরের হিন্দি রচনায় যে ফার্সি শব্দের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহারও গোড়ায় এই বিদেশী প্রভাব। মুসলমান প্রভাবে এ দেশের সাহিত্যের শক্তি শতগুণ বাড়িয়া যায় এবং সকলের অগোচরে হিন্দুস্থানের উর্ব্বর ভূমিতে উর্দ্দু সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

আকবরের উদারনীতি উর্দ্দু ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার আগ্রহে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ফার্সি ও হিন্দির সম্বন্ধ নিকটতর হইতে থাকে। এই দুই সুপ্রাচীন ভাষার সীমান্তদেশই উর্দ্দুর বিহার-ভূমি। রাজধানী দিল্লী হইতে এই ফার্সি-প্রধান হিন্দি ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত,— এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করে।

এইভাবেই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় উর্দ্দুর প্রভাব বিস্তৃত হয়। দাক্ষিণাত্যের কথাভাষার সঙ্গে অবশ্য উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষার কোন সংস্রবই ছিল না। গোলকুণ্ডার ভাষা ছিল তেলেগু, বিজাপুরের কানারী—দুইই দ্রাবিড়। উর্দ্দু সাহিত্য জন্ম হইতেই আর্য্যভাষা ফার্সির নমুনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। উর্দ্দু-কাব্যের রীতি-নীতি এমনকি বর্ণনা-ভঙ্গি পর্য্যন্ত —ফার্সিরই অনুকরণ। উর্দ্দুর ক্বাসিদা, গজল, মর্সিয়া, মস্‌নভি, হিজ্বা, রুবায়ী—সব কিছুই যেন ঈরাণের আঙ্গুর-গোলাব-সাকীশরাবের রঙ্গে রঙ্গীন।

কুলিকুতুব শাহের শাসনকালে গোলকুণ্ডা উর্দ্দু চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ্ কুতুব শাহ্ উভয়েই যশস্বী কবি ছিলেন। তাঁহারই সময় স্বনামধন্য ইবনে নিশাতীর অমরদান "তুতি নামা" ও "ফুলবন" প্রকাশিত হয়। বিজাপুর দরবারের কৃতিত্বও কম নয়। ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (১৫৯৯-১৬২৬) -এর "নওরস" একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আলী আদিল শাহের সভাকবি ছিলেন জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 'নুস্‌রতি'- কবিনামে প্রকাশিত তাঁহার মস্‌নভি-গ্রন্থ "গুল্‌শনে-ইশক্" দুর্লভ কবি প্রতিভার নিদর্শন।

ইহাদের পর আওরঙ্গাবাদনিবাসী ওয়ালী ও তাঁহার সমসাময়িক সিরাজের সাধনায় উর্দ্দুকাব্যজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তন হয়। উর্দ্দু সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইঁহাদের স্থান উপেক্ষার নয়। পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর ইঁহাদেরই ভাব ও ভাষা ছিল কবিযশাকাঙ্ক্ষীদের আদর্শ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওয়ালীর জীবন-কথার অতি অল্পই আজকাল আমরা জানিতে পারি।

দিল্লীতে উর্দ্দু সাহিত্যের গৌরবের সূচনা হয় জহিরউদ্দীন হাতিমের সময় (জন্ম ১৬৯৯, মৃত্যু ১৭৯২)। ইনি ছিলেন ওয়ালীর একজন ভক্ত। ওয়ালীর প্রভাবে দিল্লীর সাহিত্যিক-সমাজে দস্তুরমত বিপ্লবের সূচনা হয়। এ বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন হাতিম এবং তাঁহার সহযোগী বন্ধু— নাজী, মজনুন ও আব্‌রু। এ যুগের অন্য দুইটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রফি-উস্‌সওদা খান আরজু। ফার্সি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য আরজুর খ্যাতি ছিল প্রচুর; কবি হিসাবেও তিনি অনুপম সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ উদ্ভাবনীশক্তি ও সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। সওদার বয়স্য মীর ছিলেন তাঁহারই শিষ্য। নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠনের পর (১৭৩৭) আরজু লক্ষ্নৌ চলিয়া যান এবং জীবনের অবশিষ্টকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন।

ইয়াকিন্ ও খাজে মীর দর্‌দের নাম এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ইয়াকিনের অভ্যুদয় আহ্‌মদ্ শাহের রাজত্ব-কালের (১৭৪৮-১৭৫৪) একটি স্মরণীয় ঘটনা। নব-যৌবনেই তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়; কিন্তু অল্পপরিসর জীবনে যাহা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন, উর্দ্দু সাহিত্যের ইতিহাসকারের নিকট তাহা পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী। মীর দর্‌দের নামও নানা কারণে আমাদের স্মরণীয়। ছন্দের অনুপম লীলাভঙ্গি ও রহস্য-বাদের সমাবেশে তাঁহার কাব্য-সৃষ্টি অনন্তকাল বিশ্বজনের সমাদর লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। চিরন্তন মানবমনের আকুল কামনা ও করুণ আত্মাহুতি, আশার উজ্জ্বল দীপ্তি ও হতাশার তীব্র বেদনা তাঁহার গানে সহজ ও সুন্দর রূপ লাভ করিয়াছে। তাছাড়া ধর্ম্মপ্রাণতা ও উদার মানসিকতার সমন্বয় তাঁহার চরিত্র ও কাব্যকে করিয়া তুলিয়াছে সকলের লক্ষ্যযোগ্য।

আসফ্‌উদ্দৌলার আগ্রহে সওদা এবং মীর লক্ষ্ণৌ-নগরীতে বসবাস স্থাপন করেন। মীরের নাম উর্দ্দু সাহিত্য-রসিকের নিকট সহস্র ভাবের প্রতীক। তাঁহার চিন্তাধারা ছিল উদার, বর্ণনাভঙ্গি ছিল মার্জ্জিত। মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁহার গানে কোথাও বা তীব্র বহ্নিজ্বালায় জ্বলিয়া উঠিত, কোথাও বা নীরব অশ্রুধারায় রূপায়িত হইত। তাঁহার সুর ছিল শিরীন, ভাষা ছিল করুণ। মনোজগতে তাঁহার মমতার সূর্য্যরশ্মি ও নিরাশার মেঘমালার খেলা ছিল অপূর্ব্ব! সওদা ছিলেন শক্তির সাধক। তাঁহার ভাবধারা যেমন প্রবল বন্যার ন্যায় ছুটিয়া চলিত, তাঁহার শব্দসম্ভারও তেমনি পাঠকের মনে তীব্র আঘাত হানিয়া যাইত। আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা ছিল তাঁহার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। দুই বন্ধুর একজনের বাণীতে ছিল করুণা ও সহানুভূতির স্নিগ্ধতা, অপরের বাণীতে ছিল জীবন-যুদ্ধের হুঙ্কার।

রাষ্ট্রবিপ্লবে দিল্লীর উত্থান-পতন বহুবার হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের দরবার হইতে দিল্লী স্থানচ্যুত হয় নাই কোন দিনই। এমনকি পতনযুগেও বাদশাহ্‌দের কেহ কেহ চমৎকার কবিতা ও গান রচনা করিতেন। দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৬১-১৮০৬) -এর "দিওয়ান" ও "মন্‌জুমি-আক্‌দস" সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার পুত্র সোলায়মান শাহের রচিত 'দিওয়ানের' কথা এখনো শোনা যায়। শেষ মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহও ছিলেন একজন সাহিত্যরসিক সমজদার ও পরম বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। মর্সিয়া রচনার ছলে তিনি নিজ দুর্ভাগ্যের নিদারুণ কাহিনীই যেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কান্নার সুর আজিও উর্দ্দু সাহিত্য-রসিকের প্রাণ দ্রবীভূত করে।

বাহাদুর শাহের সহিত তাঁহার গুরু জওক্ এর নাম অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। কাসিদা-রচয়িতা হিসাবে সে যুগে জওক-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। জন্মভূমি দিল্লীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন; মুসলিম ভারতের সান্ধ্যগগনে হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি ব্যথার আলিম্পন আঁকিয়া গিয়াছেন। আরও কয়েকটি প্রতিভার রশ্মি মোগল রাজধানীর নৈশ-গগনে আলোক বিকীরণ করিয়াছিল; মুশাফি ও গালেব দিল্লীর সাহিত্যাকাশের শেষ দেউটীযুগল। মুশাফির প্রতিভা ছিল উল্কারশ্মির ন্যায় তীব্র ও দীপ্তিমান; গালিবের রচনা শাশ্বত ও চিরন্তন। মীরের বর্ণনার চমৎকারিত্ব, সওদার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, দরদের বিশাল কল্পনা বা মুমিনের আবছা মায়াবাদ ও বিপুল হাস্য-রসিকতা গালিবের লেখায় না থাকিলেও নিঃসন্দেহে তিনিও উর্দ্দু-সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল। তখনকার মুসলিম ভারতের চিন্তাধারা তাঁহারই সঙ্গীতে প্রাণলাভ করিয়াছিল। যুগের চিন্তা-নায়ক হিসাবে তিনি আবুল আ'লা এবং ওমর খৈয়ামের সমাসনের অধিকারী। তাঁহার প্রতিভা বিভিন্নমুখী, ---সব ক্ষেত্রেই তাঁহার অপরূপ সাফল্য। জালেমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সমাজের অসাম্য, ভণ্ডামী ও ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে বাগিচার ফুল ও বুলবুলির কথা, সাকী ও শরাবের কথা, মাশুকের প্রত্যাশা ও বেদনার কথা, প্রেমাকুল চিত্তের চুম্বন ও আলিঙ্গনের কাহিনী তিনি পরম উৎসাহে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবন তাঁহার মতে লক্ষ কুসুমের স্ফূরণ, কবিতা সেই জীবনের মর্ম্মকথা। মাটীকে অস্বীকার করিয়া কাল্পনিক জগতে তিনি প্রশান্তি অন্বেষণ করেন নাই; তিনি ছিলেন ধূলিকর্দ্দমময় পৃথিবীর একান্ত আপনার জন, ভুলত্রুটীকন্টকিত মানুষের বেদনার ভাগী এবং অনুরক্ত সহযাত্রী।

দিল্লীর পতনের পর, উর্দ্দুসাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে লক্ষ্ণৌ নগরীর নামোল্লেখ করিতে হয়। আরজু, সওদা ও মীরের সাধনা অযোধ্যার এই গুলবাগিচাকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করে। তাঁহাদের পর মীর হাসান (মৃত্যু ১৭৮৬), মীর সজ (মৃত্যু ১৮০০) এবং কলন্দর বখ্‌শ জুরাতের (মৃত্যু ১৮১০) সময় এর খ্যাতি দিল্লীর গৌরব-যুগের সমকক্ষতা অর্জ্জন করে। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পতনকাল পর্য্যন্ত ইহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। আতশ্ (মৃত্যু ১৮৪৭) ও নাসিখ্ (মৃত্যু ১৮৪১) ছিলেন লক্ষ্ণৌর কবিমালঞ্চের শেষ প্রসূন।

ইহার পর দুঃস্থ সাহিত্যিক সম্প্রদায় পরম উদার রামপুর-দরবারে আশ্রয় ও সমাদর লাভ করিতে থাকেন। গুণগ্রাহী কল্‌ব আলী খানের রাজসভায় তৎকালীন যশস্বী কবিবৃন্দের এক চমৎকার দল গড়িয়া ওঠে। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এর দুই ভাবধারা এস্থানে মিলিত হওয়ায় উর্দ্দু-সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। নাসিখের কৃত্রিম ও বাক্য-বহুল বর্ণনাভঙ্গি অথবা দিল্লীর পুরাতনপ্রীতি ইঁহারা পরিত্যাগ করেন। স্বাভাবিকতা, সারল্য ও জীবনের যথাযথ বর্ণনাকেই ইঁহারা কাব্যের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। এ যুগের অগ্রদূত কবি দাগ। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর সমন্বয়ই শুধু তাঁর সাহিত্যে হইয়াছিল তা নয়, জীবনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও বিশ্বাসই তাঁহাকে সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভার মর্য্যাদা দান করিয়াছিল।

এতক্ষণ আমরা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, রামপুর ও দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এবার আমাদের প্রিয় জন্মভূমি পাটনা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এক সময় দিল্লী লক্ষ্ণৌর মতো পাটনাও উর্দ্দুচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সময় মির্জ্জা বেদিল দিল্লীর শাহী মহলে গৃহশিক্ষকের কাজ করিতেন। ইনি ছিলেন পাটনার একজন নাম করা কবি ও সাহিত্যিক। এর পর বিহারে আর একজন খ্যাতনামা লেখকের আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম মির্জ্জা মুইজ খান। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় পাটনায় সাহিত্যের বেশ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

সাহিত্যিক আবহাওয়ার জন্য এই সময় মোগল শাহজাদাদের অনেকের দৃষ্টি পড়ে পাটনার উপর। শাহ্‌জাদা আজীমউশ্‌শান এর নাম দেন আজীমাবাদ। ফররোখশিয়ার এইখানেই কবি নওয়াব হাসান আলী খানের সাহায্যে সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন।

অনেকের ধারণা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয় সাহিত্যের আদর কমিয়া যাওয়ার পরই পাটনায় সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তাহা নহে। পাটনার কবি গোলাম আলী রাশেখ ছিলেন মীরেরই সমসাময়িক। তাঁহার বেদনার সুর সে যুগে দেশে একটা মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও কুসংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনি যে মানবতার গান গাহিয়া গিয়াছেন বহুদিন তাহা ভারতবাসীর মনে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

শৈশবে উর্দ্দু সাহিত্যে দিল্লীর বাদশাহদের স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অবগত আছেন; উর্দ্দুর পরিপুষ্টির ব্যাপারে লক্ষ্ণৌর নবাব সুজাউদ্দৌলা বা আসফদ্দৌলার দান কতখানি তাহাও কাহারও অজানা নাই। কিন্তু পাটনার সুবাদারদের সহানুভূতি উর্দ্দু সাহিত্যের উন্নতির ব্যাপারে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে খুব অল্প লোকই অবগত আছেন। বিহারের সুবাদার রাজা রামনারায়ণ ও রাজা সিতাব রায় সাহিত্য-প্রীতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সমঝদার বলিয়া তাঁহাদের বেশ নাম ছিল। রাজা রামনারায়ণ ছিলেন শেখ আলী হাজিনের শিষ্য। ফার্সিভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। উর্দ্দুর প্রতিও তাঁহার মমতা ছিল যথেষ্ট। 'মউজুম' ছদ্মনামে তাঁহার অনেক চমৎকার কবিতা প্রকাশিত হয়। দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক খ্যাতনামা আলেম সিতাব রায়ের দরবারে একত্রিত হন। আহ্‌মদ শাহের ধর্ম্মভ্রাতা নওয়াব আশরফ আলী 'ফুঘান' ইঁহাদের অন্যতম। আশরফ আলী একজন শক্তিমান লেখক ছিলেন। ইঁহার ভাষা ছিল সরল সহজ ও সাবলীল। ইঁহাদের চেষ্টায় পাটনার উর্দ্দু সাহিত্যে নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছিল। রাজা সিতাব রায়ের পুত্র রাজা বাহাদুরও পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সমঝদার ছিলেন। রাজন 'তখল্লুস' লইয়া তিনিও সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন।

এইভাবে পাটনার সাহিত্যিক খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মীর শের আলী আফসোস ও মীর আম্মানের মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিক (কেহ কেহ ইঁহাদের উর্দ্দু গদ্যের জনক বলিয়া অভিহিত করেন) পাটনায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

পাটনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু একটি নাম উল্লেখ না করিলে আমাদের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইনি সৈয়দ হেদায়েত আলী খাঁ 'আসাদ জঙ্গ'। হাজীগঞ্জের 'বার-হাউলি' যিনি দেখিয়াছেন তিনিই আসাদজঙ্গের উন্নত রুচির তারিফ না করিয়া পারিবেন না। তাঁহার দোঁহা, চৈতি, সাওয়ান ও ঠুমরি সেকালে লোকের মুখে মুখে চলিত। তাঁহার গজলের আদরও বড় কম ছিল না। সেকালে ওস্তাদ বলিয়াই তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

আসাদজঙ্গের পুত্র সিয়ার-উল-মুতাখখারিন প্রণেতা নবাব গোলাম হোসেন খান ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। শুধু ইতিহাস-শাস্ত্রেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল তা নয়; তিনি ছিলেন একাধারে কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তা ছাড়া সাহিত্য-জগতে 'তাজকিরাহ্‌-ই-গুলজারে ইব্রাহিম' প্রণেতা নবাব আলী ইব্রাহিম খান এবং রাজা পিয়ারীলাল 'উলফাতির' দানও কম নয়। উলফৎ হোসেন ফরিয়াদ ও শওক নিমউয়ী পাটনার গতযুগের শেষ কবি। ফরিয়াদের পিতৃব্য ছিলেন দরদের একজন ভক্ত শিষ্য। এই জন্যে ফরিয়াদের কবিতার ছত্রে ছত্রে দেখা যায় দরদের 'মিষ্টিসিজম্‌' এর প্রভাব। ফুলের সুবাস, বুলবুলের গান,

প্রিয়ার চাহনি—এ সবে এঁর কবিমন মোহিত হয় নাই। তিনি সন্ধান করিয়াছেন মানুষের আত্মার ঃ তাঁহার সাধনা ছিল এ নশ্বরতার বহিরাবরণে সুন্দর অবিনশ্বরের ধ্যান।

তিনি ছিলেন দরদেরই ন্যায় উর্দ্ধতম স্বর্গলোকবিহারী; তাঁহার বাণী প্রেম ও শান্তির, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের। শওক কিন্তু মানবতার বাণীবাহক, বেদনার কবি। তাঁহার বর্ণনা, অলঙ্কার, উপমা ভাষা—সব কিছুই অতুলনীয়। সাধারণ মানুষের আশা ও আকাঙক্ষা, সুখদুঃখ ও কল্পনা তাঁহার গানে অভিনব রূপ লাভ করিত। জনসাধারণের তিনি ছিলেন পরম প্রিয় কবি।

স্বনামধন্য কবি শাদ কিছুদিন আগে ধূলার পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে গতযুগের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। আজ মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর আগের কথা যখন আমাদের বাড়ীতেই মজলিস বা মুশায়েরার অধিবেশন হইত। দেশ-বিদেশের বড় বড় সমঝদারবা এসব মহফলে যোগ দিতে আসিতেন। লক্ষ্ণৌর আবদুল হাই সাহেব এবং জ্ঞানের একাগ্র সাধক শিবলীকেও আমি এসব মজলিসে দেখিয়াছি। কবি শাদ কেমন সুন্দর ভঙ্গিতে এসব মজলিস জমাইয়া তুলিতেন এখনো আমার মনে উজ্জ্বল ভাবে আঁকা রহিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা কাব্য-সাহিত্যের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এবার গদ্য-সাহিত্যের কথা বলিব। উর্দ্দু গদ্যের নিয়মিত চর্চ্চা আরম্ভ হয় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। সেকালে বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা আলেমরা এইখানে সমবেত হইতেন। ইঁহাদের কাজ ছিল রাজকর্ম্মচারীদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা করা। ১৮৩৭ সালে উর্দ্দু লিথোগ্রাফীর প্রচলন হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে উর্দ্দু পুস্তকের প্রচারও বাড়িয়া যায়। উর্দ্দু গদ্যের প্রচার কলিকাতায় আরম্ভ হইলেও উর্দ্দু কাব্যের মতো এরও সত্যিকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল মোগল রাজধানী দিল্লীতে। গদ্য সাহিত্যের জনক মীর আম্মান, আফসোস্, জওয়ান—ইঁহারা তিন জনই দিল্লীর অধিবাসী। আজিকার পুষ্পপল্লবময় উর্দ্দু ভাষাকে শৈশবে ইঁহারাই অশেষ স্নেহসিঞ্চনে লালন-পালন করেন। ইঁহারাই এই নূতন ভাষাকে ফার্সির বহিরাবরণ ও অলঙ্কারবাহুল্য হইতে মুক্ত করিয়া সহজ সতেজ ও সম্ভাবনাময় করিয়া তোলেন।

। । । ।

এই সময় উত্তর ভারতে এক শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি বেরিলির মৌলানা সৈয়দ আহ্‌মদ। প্রচলিত ধর্ম্মমতের সংস্কার করিয়া নূতন পথসৃষ্টিই ছিল ইঁহার সাধনা। মৌলানা সৈয়দের আন্দোলন এদেশে ওহাবী আন্দোলন বলিয়া পরিচিত। ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দিকে দিকে ধর্ম্মযুদ্ধের আগুন ধূমায়িত হইতে থাকে। এই ধর্ম্মযুদ্ধ উর্দ্দুগদ্যের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ওহাবী আন্দোলনের বাহন ছিল উর্দ্দু সাহিত্য। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দুভাষার লেখক ও পাঠক সংখ্যা বাড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভাব-প্রকাশের ক্ষমতাও চমৎকাররূপে বৃদ্ধি পায়। মৌলবী আবদুল কাদির ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কোরআন- অনুবাদ শেষ করেন। মৌলানা সৈয়দ আহ্‌মদের শিষ্য সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌র চেষ্টায় ১৮১৯ সালে এই মহাগ্রন্থ হুগলি হইতে প্রকাশিত হয়। মৌলানা সাহেবের লেখা 'তম্বিহুল গাফিলীন' নামক ফার্সি কেতাবের অনুবাদও আবদুল্লাহ্ সাহেব একই প্রেসে ছাপিয়া ১৮৩০ সালে প্রকাশ করেন। হাজী ইসমাইল রচিত উর্দ্দুগ্রন্থ 'তকভিয়াত-উল-ঈমান' এই সময় খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

শুধু ওহাবী আন্দোলন নয়, উর্দ্দু সাহিত্যের উন্নতির গোড়ায় কার্য্যকরী হইয়াছিল আরো কয়েকটি শক্তি। ১৮৩২ সালে সরকারী দফতরে ফার্সির পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার প্রবর্ত্তন হয়,—সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দুরও আদর বাড়িয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতেও উর্দ্দুসাহিত্যের কম লাভ হয় নাই। তা ছাড়া সংবাদ-পত্রও উর্দ্দুর প্রচারে বেশ সাহায্য করিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়ে গতযুগের এই যে রেনেসাঁ এর ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যি নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছিল— জ্ঞানের ও কর্ম্মের পথে, সত্য ও সুন্দরের পথে নূতন করিয়া হইয়াছিল আমাদের যাত্রা শুরু।

শৈশব হইতেই উর্দ্দু সাহিত্য সত্যিকারের ইস্‌লামী ভাবধারা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। মীর তকী, জওক, গালেব—

[১] মৌলানা সৈয়দের অনুবর্ত্তিদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সেযুগে ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ঃ তরগীবে-জেহাদ, হিদায়তুল মু'মিনীন, মুজিহ্‌উল কাবায়ের ওয়াল বদীহ্, নসিহাতুল মুসলিমীন, মী'আতে মসায়েল।

সকলেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছেন সাম্যের দিকে, ভ্রাতৃত্বের দিকে মহত্তর জীবনের দিকে। জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে সাম্যের গান। প্রথম প্রথম এই গান গীত হইয়াছে শুধু খাস-দরবারে; একজন শক্তিমান সাহিত্যিক একে সমাজের আম-দরবারে ছড়াইয়া দেন। এই শক্তিধর মহাপুরুষ আর কেহ নহেন— আলীগড়ের স্বনামধন্য স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ (১৮১৭-১৮৯৮)। স্যার সৈয়দ ছিলেন মুক্তিবুদ্ধির নিশান-বরদার। নির্ভয়ে ঘোষণা করিয়াছেন তিনি শুভবুদ্ধির আহ্বান। একদিকে তিনি যেমন উর্দ্দুগদ্যের গোড়াপত্তন করেন, অন্যদিকে তেমনি করেন তিনি উদারতার বাণী প্রচার। এই কাজে তাঁহার সহযোগী ছিলেন কবি আলতাফ হোসেন হালী, নবাব মুহসিন-উল-মুলক এবং আরো অনেকে।

গালেবের শিষ্য হালী চল্লিশ বৎসর বয়সে সৈয়দের পতাকাতলে উপস্থিত হন। দৃষ্টি তাঁর উর্দ্ধে— কণ্ঠে তাঁর জাগরণের বাণী। 'মুসাদ্দাসে হালী' সেযুগের জীবন বেদ। এর সুরে সুরে জাগিয়া উঠিয়াছিল সেকালের ঘুমন্ত মুসলমান, সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে রূপকথার রাজকুমার।

এযুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক দিল্লীর মৌলবী নজির আহ্‌মদ। শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নন, দেশ-প্রেমিক হিসাবেও তিনি আমাদের স্মরণীয়। সমাজের ভণ্ডামী ও মিথ্যাচার তীব্র বেদনায় তিনি অনুভব করিয়াছেন। রহস্যচ্ছলে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ অনুযোগবাণী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ইকবাল বর্ত্তমান উর্দ্দু সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টিপ্রতিভা। তাঁহারও কাব্যের মর্ম্মবাণী তীব্র দেশাত্মবোধ। নিরাশা বা পরাজয়ের ভাব তাঁহাকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেশ ও সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা তাঁহার কাব্যে দুঃসহ যাতনার সৃষ্টি করিয়াছে। সহস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও টেনিসনের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তিনি উৎসাহের বাণী শুনাইতেছেন ঃ

But something ere the end,
Some work of noble note may yet be done!

বিগত একশত বৎসরে আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ওয়ালীর যুগের ভারত ও ইকবালের যুগের ভারতকে এক বলিয়া চেনাই আজ দুষ্কর। সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও হয়ত এতটা কল্পনা করিতে পারেন নাই। সেকালের সাধনার লক্ষ্য ছিল আত্মসমর্পণ—আত্মবিলোপ। আর আজ আমাদের সাধনা জীবনের সাধনা, বাঁচিবার সাধনা, স্বপ্রতিষ্ঠার সাধনা। হালীর—নজির আহ্‌মদের লেখায় যা ছিল প্রচ্ছন্ন, ইকবালের কাব্যে আজ তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে প্রবল শক্তিতে। যুদ্ধোত্তর উর্দ্দু লেখকদের লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে মুক্তবুদ্ধির বাণী—নবযুগের নবজীবনের বোধন-সঙ্গীত।

শুধু কাব্য ও মৌলিক রচনার দিক দিয়া নয়, অনুবাদের দিক দিয়াও আমাদের সাহিত্যিক সম্পদ লক্ষ্যযোগ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন সাহিত্য হইতে নিত্য নূতন ভাবসম্পদ আহরণ করিয়া উর্দ্দু যেভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ভারতের প্রাদেশিক ভাষার ইতিহাসে তা সত্যই অতুলনীয়। ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আওরঙ্গাবাদের আঞ্জুমনে তরক্কিয়ে উর্দ্দু, আজমগড়ের দারুল মুসন্নিফীন প্রভৃতি সমিতির দান কালের কৌটায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ইহাদেরই চেষ্টায় উর্দ্দুভাষা ভাবসম্পদে ভারতে প্রাদেশিক ভাষা-সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে আজ এই যে নব-জাগরণের সূচনা হইয়াছে তার গোড়ায়ও উর্দ্দু সাহিত্যের দান কম নয়। সৈয়দ আহ্‌মদ, হালী, নজির আহ্‌মদ দেশবাসীর প্রাণে যে স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া গিয়াছেন তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব আমাদের। এ উত্তরাধিকারের গৌরব আশা করি আমরা হেলায় হারাইব না।

অতীতের অন্ধ অনুবর্ত্তিতায় নবসৃষ্টি সম্ভবপর নয়। নবজাগরণ যিনি চান,
অতীতকে কিছু রূপান্তরিত করে না নিয়ে তাঁর উপায় নাই।

* * * *

বড় বড় দুঃস্বপ্ন দেখার চাইতে সত্যকার ছোটকাজ অনেক বেশী মূল্যবান, এই সত্য
আমাদের দুঃস্থ সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ুক।

(বৈশাখ--১৩৪৩)

প্রতিধ্বনি

মুশায়েরা

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

অনেক দিনের কথা; তখন সবে মাত্র লক্ষ্ণৌতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এ-দেশীয় কয়েকটি সুকবির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন- হামিদ আলী খাঁ। খাঁ সাহেব এক সময় ব্যারিষ্টারি করিতেন, কিন্তু অগত্যা সে ব্যবসায়টা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি উর্দ্দু কবিতা ও হোমিয়োপ্যাথি চর্চ্চায় ব্যস্ত। উর্দ্দুভাষায় তিনি একজন সুকবি বলিয়া জনসমাজে বেশ যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু খ্যাতি ছিল। তবে সেটা বন্ধুবর্গ উপহাসচ্ছলেই উল্লেখ করিতেন। যৌবনাবস্থায় বিলাতে অবস্থান কালে তিনি নাকি রমণীগণের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সমসাময়িক একজন বন্ধু তাহার দুই একটি নমুনা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। সেগুলি শুনিলে আদিরসের উদ্রেক হউক বা না হউক, হাস্যরসের উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। বোধ হয় খাঁ সাহেব একই কারণে ব্যারিষ্টারি ও ইংরাজি কবিতা রচনা উভয় চেষ্টা হইতে বিরত হন। আমি তাঁহাকে আচকান, দোপল্লি টুপি ও চুড়িদার পায়জামা ছাড়া অন্য কোন পরিচ্ছদে দেখি নাই।

একদিন তিনি আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন, 'সেন, চলো ম্যয় তুমকো মুশায়েরা মে লে চলুংগা'। তখন আমার উর্দ্দু বিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক। বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাঙ্গলা-ভাঙ্গা বিকৃত হিন্দি তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম--খাঁ সাহেব, মুশায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব, 'খাঁ সাহেব মুশায়েরা ব্যাপার ক্যা হ্যায়?' তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন,--'লক্ষ্ণৌ আসিয়াছ, আর কমবখ্‌ৎ, এও জান না মুশায়েরা কাকে বলে?' তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুশায়েরার অর্থ কবি সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমার শুনিয়া লোভ হইল, বলিলাম--'চল; কিন্তু খাঁ সাহেব, একটু কাছে বসাইও, বুঝাইয়া দিতে হইবে।' তিনি বলিলেন,--'আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শোন; যেখানে যাইবে সেখানে ইংরাজি সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই; সে স্থানটি প্রাচীন লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রস্থল, সেখানকার লোকদের বেশভূষা, ভাষা, আচার-ব্যবহার ঠিক নবাব আসফদ্দৌলার সময়ে যা ছিল তাই; তাহারা ইংরাজি কহে না; ইংরাজি জানে না; বস্তুতঃ তাহারা ইংরাজি ভাষাকে ও ইংরাজি সভ্যতাকে ঘৃণা করে।' এসব শুনিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম; ভাষা ও বেশ সম্বন্ধে মনে নানা প্রকার দ্বিধা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। খাঁ সাহেব বলিলেন,--'শীঘ্র চল, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লও।' তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানী ও বিদেশী মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া খাঁ সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। তখন পর্য্যন্ত একেবারে খাঁটি খাঁ সাহেবটি সাজিতে একটু সংকোচ বোধ করিতাম। আমার বন্ধুটি হিন্দুস্থানী পোষাকের সপক্ষে অনেক অকাট্য যুক্তি দর্শাইলেন; আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে হিন্দুস্থানী বেশ ইংরেজি পোষাক অপেক্ষা অধিকতর শোভন, সহজ ও সঙ্গত। তদবধি কার্য্যতঃ কখনও কখনও এ মতের পোষকতা করিয়া থাকি।

লক্ষ্ণৌর একটি পুরাতন পল্লীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ী থামিল। আঁকা বাঁকা অনেকগুলি সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিলাম, কেননা সে গলিতে গাড়ী চলিতে পারে না। দুদিকে জীর্ণ ইমারত--জন্মাবধি কখনও তাহার সংস্কার হয় নাই; দুই পার্শ্বে সেই সনাতন আবর্জ্জনা; আবার সেই অপরিষ্কার গলির দুই ধারে দধি, 'বালাই', (লক্ষ্ণৌতে মালাইকে বালাই বলে) কবাব, রুটি, জিলেবী, বরফি ইত্যাদি খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের দোকান ও তৎসঙ্গে যথেষ্ট মাছি। মাঝে মাঝে দু-একটি ভাঙ্গা ও ছাড়া বাড়ীর ভাঙ্গা কামরায় ছিন্ন-বসন বা বিবসন আফিমসেবিগণ নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্তিমিত নেত্রে বিশ্রাম করিতেছেন। পানের দোকানের অবধি নাই; দু পা হাঁটিলেই এক একটি পানের দোকান। এখানকার মুসলমানেরা পান করেন না বটে, কিন্তু পান খান অজস্র। এরূপ গলির ভিতর দিয়া প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর

আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। গৃহের দ্বারেই গৃহকর্ত্তা করযোড়ে দাঁড়াইয়া। খাঁ সাহেবকে দেখিয়াই তিনি "তসলিমাত্ আরজ খাঁ সাহেব, তশরিফ্ লাইয়ে" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আরও অনেক ফারসি-বহুল উর্দ্দুভাষায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। খাঁ সাহেব সৌজন্যের রাজা, তিনি প্রত্যুত্তরে ভূয়সী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, এবং দাঁড়াইয়া মাথা একটু নত করিয়া দুই হাতে এক সঙ্গে তিনবার সেলাম করিলেন। আমি পড়িলাম মুশ্‌কিলে; পূর্ব্বে কখনও দুই হাতে কিম্বা একসঙ্গে একবারের বেশী সেলাম করি নাই। আমি অতি সন্তর্পণে খাঁ সাহেবের অনুকরণ করিলাম। পরিচয়ের পর নিমন্ত্রাতা আমাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

যাহা দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। দেখিলাম, সেখানে কবিবৃন্দ গোলাকারে বসিয়া আছেন; খাঁ সাহেবকে দেখিবামাত্র তাঁহারা সকলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং সৌজন্য প্রকাশের একটা কলরব পড়িয়া গেল। একসঙ্গে এতগুলি হস্তযুগলের উত্তোলন ও আন্দোলন আমার কাছে এক প্রকার ব্যায়াম বলিয়া ঠেকিল। সকলে আমাদিগকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। খাঁ সাহেবের এরূপ প্রভূত সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি একজন যশস্বী কবি। খাঁ সাহেব কবিদের পংক্তিতে বসিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিলাম। তাঁহাদের বসিবার প্রণালী ঠিক আমাদের বাঙ্গালীর মতন নয়। তাঁহারা হাঁটুর উপর ভর করিয়া একটু অগ্রদিকে হেলিয়া হাত দুটি জানুর উপর রক্ষা করিয়া বসেন। পিছনে তাকিয়া নাই; প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মৃৎভাণ্ড, তাহাতে পান রাখা। কিছু দূরে দূরেই একটি করিয়া উগলদান, তাহার কারণ, লক্ষ্ণৌর পানে তাম্বুলের মাত্রা একটু অধিক। কিন্তু মুশায়েরার আসরের একটি বিধি এই যে, গজল পাঠের সময় কেহ ধূম পান করিতে কিম্বা পান খাইতে পারিবেন না। মাঝে মাঝে যখন পাঠের বিরাম হয় সে অবসরে তামাকু ও পান খাইয়া লইবেন।

আগত কবি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খাঁ সাহেব, ঐ ফর্সা সুপুরুষটি কে?' উত্তরে জানিলাম উনি একজন কাশ্মীরী হিন্দু কবি—তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। ঐ রোগাপানা, আচকান গায়ে, দোপল্লি টুপি উল্টো ভাবে পরা, বিষণ্ণবদন মুসলমানটী কে—উনি একজন প্রসিদ্ধ মরসিয়াখান্; অর্থাৎ তিনি মরসিয়া শোক-সঙ্গীত খুব ভাবের সহিত সুন্দরভাবে পাঠ করেন, আর উত্তম কবিতাও লেখেন। উনি কে? ঐ যে লম্বিতকেশ, কুঞ্চিত কুন্তল, প্রকাণ্ড মাথার অগ্রভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি, ঢুলু ঢুলু অর্দ্ধনিদ্রিত (হয়ত অহিফেন সেবন করেন) স্থূলকার পুরুষটি? উনি? উনি একজন বিখ্যাত কবি; শাহীযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আতসের বংশধর, ইঁহার সমকক্ষ কবি এখন লক্ষ্ণৌতে নাই। আর ঐ যে তাঁহার পার্শ্বে অত্যন্ত কৃষ্ণকায়, অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া হাস্যবদনে বসিয়া আছেন, উনি কে? ও লোকটি? শুনিয়া হয়ত হাসিবে, ইনি এক্কাওয়ালা নামে সাহেব, লক্ষ্ণৌর একজন সুকবি; দিনের বেলা এক্কা হাঁকান, লিখিতে বা পড়িতে পারেন না; কিন্তু মনে মনে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং স্বরচিত গজল মুশায়েরাতে পাঠ করিয়া বেশ যশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার তখল্লুস্—শফিক্। তখল্লুস্ মানে কবির একটি বিশেষ নাম। এদেশে কবি মাত্রেরই এক একটি করিয়া তখল্লুস্ থাকে; এ নামে তাঁহারা কবিসমাজে পরিচিত; কবিতার অন্তিম চরণে এ নামেই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

এইরূপ হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক, শ্বেতবর্ণ ও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নানা শ্রেণীর কবিগণ সে সভায় আসীন। আমার দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। কবি-সমাজে এরূপ সাম্য বড়ই সুদর্শন। তারপর পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ সুললিত কণ্ঠে সুর করিয়া নিজের রচনা আবৃত্তি করিলেন; কেহ একটু নাকি সুরে, কেহবা গুরুগম্ভীর নিনাদে স্বীয় কবিতা পাঠ করিলেন। সকলেরই উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, একবারেই দ্রুত নয়। ইহাদের পাঠ করিবার প্রণালী অতি সুন্দর।

মুশায়েরার পদ্ধতিটা এই : যিনি মুশায়েরা আহ্বান করেন তিনি নিমন্ত্রণ পত্রের নিম্নভাগে দুই এক চরণ কবিতার নমুনা লিখিয়া পাঠান; তাহাকে বলে 'মিশ্রাতরাহ'। মিশ্রাতরাহর শেষ কথাটিকে বলে 'রদিফ্'। আর ঠিক তাহার পূর্ব্বের শব্দটিকে বলে 'কাফিয়া'। একটি উদাহরণ দিতেছি :

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্ এ বাহার ক্যা'

ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ :

শুষ্ক যদি অন্তর আমার, বসন্তের আনন্দ কোথায়?

এ পংক্তিটির 'ক্যা' শব্দটি রদিফ্, আর 'বাহার' শব্দটি কাফিয়া। বাঙ্গলাতে হইবে 'কোথায়' কথাটি রদিফ্ আর 'আনন্দ' কথাটি কাফিয়া।

এখন, নিমন্ত্রণ পত্রে যদি কেহ এই মিস্রাতরাহটি লিখিয়া পাঠান :

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্এ বাহার ক্যা।

তবে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রিত কবিগণ মুশায়েরায় পাঠ করিবার জন্য যে গজলটি লিখিয়া আনিবেন তাহার প্রত্যেক দ্বিপদীর দ্বিতীয় চরণের কাফিয়া হইবে 'বাহার' অর্থাৎ বাহার কথার সঙ্গে মিল থাকিবে; আর শেষ কথাটি হইবে 'ক্যা'। যথা :

'চলতি হ্যয় ইস চমনমে হাওয়া ইনকিলাব্ কি

শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা।'

এখানে 'বাহার' ও 'করার' এর কাফিয়া মিলিল; আর রদিফ 'ক্যা'ও বক্ষা হইল। উপরি উক্ত কবিতার বাঙ্গলা অনুবাদ

হেথাকার ফুল-বনে সদা চলে পবন চঞ্চল

তাইত শিশির-বিন্দু পুষ্পকোলে সদা টলমল।

সর্ব্বপ্রথমে নিমন্ত্রাতা কোনও বিখ্যাত কবির দুই একটি কবিতা আবৃত্ত করিয়া মুশায়েরা আরম্ভ করেন। তারপর কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করেন। গজল ছাড়া মুশায়েরাতে আর কোন রকম কবিতা পাঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও মাননীয় কবি তাঁহাকেই সচরাচর প্রথম পাঠ করিতে অনুরোধ করা হয়। অনেক সময় তিনি কৃত্রিম বিনয় অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার আপত্তি প্রকাশ করেন—'আমি এখন সেকালের, আজকালকার নবীন কবিদের আমার কবিতা ভাল লাগিবে কেন? ইহাদিগকে প্রথমে পড়িতে বলা হউক।' অমনি সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাহার প্রতিবাদ করেন, হয়ত বলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও আপনার ন্যায় কবি জীবিত আছেন—ইত্যাদি'; এরূপ অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশের পর নিজের অঙ্গরাখার পকেট হইতে একটি পরচা বাহির করেন। তাহাতে স্বরচিত গজলটি লিখা। একটি সৌজন্যসূচক সেলাম করিয়া তাঁহার গজলটি পড়িতে আরম্ভ করেন। দ্বিপদী গজলের প্রথম পদটি আবৃত্তি করিলে পর সভাস্থ কবিকুল সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে করুন উনি পাঠ করিলেন, 'চলতি হ্যয় ইস্ চমনমে হাওয়া ইনকিলাব্ কি'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল 'চলতি হ্যয় ইস চমনমে হাওয়া ইনকিলাব কি'। তারপর কবি নিয়ন্ত্রিত কাফিয়া-সংযুক্ত দ্বিতীয় চরণটি পাঠ করিলেন, 'শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা'। যেমনি দ্বিতীয় চরণটি পড়িলেন অমনি কবিবৃন্দ ও শ্রোতৃগণের প্রশংসা-ধ্বনির কলরবে গৃহটি পরিপূর্ণ হইল। কেহ বলিল—'আ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেহ বলিল—'সুভানাল্লা, ফির দোহরাইয়ে'; কেহ বলিল—'ক্যা খুব মিস্রা লাগায়া'; কেহ বলিল—'ওয়াহ ওয়া, আপনে বেনজীর মিস্রা কহি' এইরূপ আরও অনেক স্তুতিবাদ। কবি তখনই উঁচু হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সেলাম করিতে লাগিলেন, এবং কবি-ভ্রাতাদের প্রশংসাবাদের জন্য অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। একটি কবির গজল পাঠ শেষ হইলে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কবিটির পালা; এবং ঠিক সেইরূপ পুনরাবৃত্তি, সেইরূপ প্রশংসাধ্বনি, এবং ঠিক সেইরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেলাম। এইরূপ পাঠপরম্পরায় কবি-চক্রটি সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হইলে পর সর্ব্বশেষে নিমন্ত্রাতা আপনার রচিত গজলটি পাঠ করেন। সৌজন্যে জন্যই হউক বা কাব্য-মাধুর্য্যের জন্যই হউক প্রশংসার মাত্রাটা তাঁহার ভাগ্যেই একটু বেশী পড়ে।

মুশায়েরা চক্রটি একটি মধুচক্র; ইহার আকর্ষণ অসাধারণ। চারিদিক হইতে, এমন কি সুদূর নগর ও গ্রাম হইতে, কাব্যামোদিগণ 'মধুগন্ধে অন্ধ অলি'র ন্যায় তথায় আসিয়া একত্রিত হন। অনেক মুশায়েরাতে অতি মনোরম ও উচ্চাঙ্গের গজল পাঠ করা হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌতে একটি মুশায়েরা হয়, তার গর্ব্ব আজও অনেক লোকে করে। সে মুশায়েরার ভাল ভাল কবিতাগুলি অনেক কাব্যপ্রিয় লোকেরই কণ্ঠস্থ। উদাহরণচ্ছলে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। যিনি মুশায়েরা আহ্বান করিলেন তিনি নবাব ওয়াজিদ আলী শার সময়কার বিখ্যাত কবি আতস্-এর একটি গজল হইতে 'মিস্রাতরাহ' লিখিয়া পাঠান। তার দুটি চরণ এই :

দো রোজ হ্যয় ইয়ে লুতফ ও আয়েস ও নিস্‌বৎ দুনিয়া

বুই সবাই উরুছি মেহমান হ্যয় পিরহন মে।'

বাঙ্গলা অনুবাদ :

দুদিনের তরে হায়, সংসারের সুখ লাস্য যত।

বধূর বাসরবাসে ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধের মত।

মুশায়েরা সম্মিলনে অনেক সুকবি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সুকবি 'হাকিমের' গজলের দুইটি লাইন :

'ফির গয়ের গয়েবহি হ্যয় গো হ্যয় অঞ্জুমন মে;
বেগানগি সবজা যাতি নেহি চমন্ মে।'

'পিরহনমে' আর চমনমে'র কাফিয়া মিলিল।

বাঙ্গলা ভাবানুবাদ : —

যদিও সে একসঙ্গে লভেছে আসন
তথাপি সে পর, কভু হবে না আপন;
ফুল-বনে বন ঘাস উঠে ফুল পাশে;
ফুলত চায় না তারে মনে উপহাসে।

এ কবিতাতে প্রতিযোগী প্রেমিকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।

সুকবি 'মজহার আগা'র গজলের দুটি চরণ : --

'নাজ ও নয়াজ দেখে বুলবুল কে আওর গুল্ কে--
হামভি চলে চমন্ মে তুমভি চলো চমন্ মে।'

বাঙ্গলা অনুবাদ :

চল বধূ দুজনাতে যাই ফুল বনে
দেখিগে ফুলের লীলা বুলবুলের সনে।

কবি 'ইউসুফে'র গজলের দুটি পদ :

'সাগর ভরে ধরে হ্যয় সাকী কি অঞ্জুমন্ মে।
তহ রহে হ্যয় কৌসর ফিরোজ কে চমন্ মে।'

বাঙ্গলা :

সুরা-পাত্র উছলিত সাকীর সভায়
নন্দন উদ্যানে যেন মন্দাকিনী ধায়।

সুকবি পণ্ডিত 'বিষণনারায়ণ দর' এ-সভায় তাঁহার সুন্দর গজল পাঠ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতায় কংগ্রেস সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গজলের দু'টি চরণ এই ঃ

'গুল্‌কে যো কাণ ওড়াই বক্ বক্‌কে বুল্‌বুলোনে,
বোলি কলি ছিটক্ কর ক্যা সোর হ্যয় চমন্ মে।'

বঙ্গানুবাদ :

বুল্‌বুলের গোলমাল শুনি ফুল বন,
হইল অধীর, তার বধির শ্রবণ।
হেন কালে জাগি উঠি মেলি আঁখি-পাতা
ফুলকলি ফুকারিল--কার গোল হেথা?

নবাব ওয়াজিদ আলী শার সময়ে মুশায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুশায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদ আলী শাহ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদশাহ্ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুশায়েরাতে

শরীক হইতেন। সে সময়ে কয়েকটি কবি খুব যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একজনের কবিনাম 'আতস্', অন্যজনের কবি-আখ্যা 'নাছিখ্'! উভয়েই প্রতিভাশালী কবি; তবে আতসের প্রতিভাই উজ্জ্বলতর। অনেকে বলেন যে 'আতস্' লক্ষ্ণৌর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি! উভয়ের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও ছিল; নাছিখ ছিলেন একটু উদ্ধত। উভয়ের শিষ্য ও স্তাবকের সংখ্যা বিস্তর।

একবার একটি বিখ্যাত মুশায়েরাতে দুজনেই আহূত হয়েন। নাছিখের বয়স্যেরা আতস্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিল। নাছিখ্ ও তাঁহার দলবল নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুশায়েরার চক্রটিকে অধিকার করিয়া বসিলেন। আতস্ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ যখন আসিলেন তখন ঘর পূর্ণ। আতসের জন্য অবশ্য স্থান হইল; কিন্তু তাঁহার সহচরগণকে স্থানাভাবে পশ্চাতে বসিতে হইল! প্রথমেই পাঠ করিলেন নাছিখ্। তারপর তাঁহার শিষ্যবর্গ খুব লম্বা লম্বা গজল বিশেষ আস্ফালনের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কবিতা আওড়াইলেন যেন তাহাতেই রাত্রিটি কাটিয়া যায়, যেন আতসের আর গজল শুনাইবার সুযোগ না হয়। রাত্রিও শেষ হইল--তাঁহাদের গজলপাঠও সমাপ্ত হইল। এবং তৎপর-মুহূর্ত্তেই নাছিখ্ এবং তাঁহার অনুচরগণ সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, ভাবিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই মুশায়েরাও সাঙ্গ হইবে, শ্রোতৃবর্গের আর ধৈর্য্য থাকিবে না। কিন্তু বহুলোক আতসের গজল শুনিবার জন্য উৎসুক। তাঁহারা নাছিখের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। ঠিক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আতসের গজল পড়িবার সময় আসিল। আতস তখন তখনই নাছিখ্ ও তাঁহার স্তাবকগণকে নির্দ্দেশ করিয়া দুটি পদ রচনা করিলেন। তাহা এই :

'রাতভর হর সবিতো ও সইয়ারা গবমে লাফ্ থা;
সুবোকো খুরসিদ্ যব নিকলা তো মতলা সাফ্ থা।

অর্থাৎ :

সারারাত গ্রহ তারা চমকিল গর্ব্বে মাতোয়ারা;
দিনমণি যেমনি উদিল পলাইল কোথায় তাহারা?

আতসের এরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিদ্রূপ পূর্ণ জবাবে সকলে চমৎকৃত হইলেন এবং উল্লাসে হুঙ্কার করিয়া সভাস্থলে ও সভার বাহিরে রাজপথে--'রাতভর হর সবিতো......' এ চরণ দুটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শহরে এমন একটা জয়রোল উঠিল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, নিশান্তে নিদ্রিত বাদশা ওয়াজিদ আলী হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত গোলমাল কিসের? নিশ্চয় কোথাও ডাকাত পড়িয়াছে; যাও শীঘ্র সিপাহীদিগকে খবর দিতে বল।' সিপাহিরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, ডাকাত নয়, মুশায়েরায় কবি আতস নাছিখের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্ব্যবহারের এমন উচিত জবাব দিয়াছেন যে, শহরময় তাঁহার জয়োল্লাসধ্বনি উঠিতেছে।' বাদশাহ কবিতাটি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আতসকে ডাকিয়া ইনাম দিলেন।

এত গেল শাহি-জমানার কথা। আজকালও মুশায়েরা এদেশে খুব প্রচলিত ও সমাদৃত। নগরে নগরে--এমন কি গ্রামে গ্রামেও মুশায়েরা হইয়া থাকে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরাও মুশায়েরা উৎসব করে। এখনও মুশায়েরার মজলিসে বেশ ভাল ভাল গজল শুনিতে পাওয়া যায়। তবে নিকৃষ্ট রচনাও কখনও কখনও প্রশ্রয় পায়; এমন কি তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। সময় সময় শুধু ব্যঙ্গ রসের অবতারণার জন্য এরূপ নির্ব্বোধ গজল-রচয়িতাকে আহ্বান করা হয়। আমি নিজে দেখিয়াছি, একজন রচয়িতা নিতান্ত অর্থশূন্য ও বালকসুলভ কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা খুব তারিফ্ করিতেছে এবং কবি কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে সকলকে সেলাম করিতেছে। অল্পবুদ্ধি বুঝিতেছে না যে, সে তারিফ্ বিদ্রূপে ভরা

* * * * *

মুশায়েরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিলাম। আমার মনে হয়, বাঙ্গলা-সাহিত্যসমাজে এরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

(বুলবুল ২য় বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪১)

—উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৩৩

বীরবলের পত্র

'বুলবুল'-সম্পাদিকা মহাশয়া সমীপেষু

'বুলবুলে'র জন্য লেখার তাদিগ আমি যথাসময়েই পেয়েছি। তবে যে আমি এতদিন নীরব ছিলুম, তার কারণ আমি সব সময়ে ফরমায়েশ মত লিখে উঠ্তে পারিনে। এক হিসেবে লেখা জিনিসটে আমার পক্ষে তেমন কঠিন পরিশ্রম নয়। বহুকালাবধি লিখে আস্‌ছি বলে কলমকে এক রকম পোষ মানিয়েছি। যদি কোন কথা বল্‌তে চাই, ত আজীবন অভ্যাসের ফলে সে-কথা আমি একরকম গুছিয়ে বল্‌তে পারি। বলা বাহুল্য, লেখা মানেই হচ্ছে মনের কথা গুছিয়ে বলা। আমরা যাকে মনোভাব বলি, তা স্বভাবতঃই এলোমেলো, আমাদের মুখের কথাও তাই। "যো আপ্‌সে আ'তা, উস্‌কো আনে দেও"—এ-কথা লেখকের মুখে শোভা পায় না। কারণ যা স্বভাবতঃই বিক্ষিপ্ত, তাকে সংক্ষিপ্ত করাই লেখার ধর্ম্ম। কবিরা ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ করেন, কিন্তু লেখকমাত্রই ভাবকে যথাসাধ্য ছন্দোবদ্ধ করতে বাধ্য। এ-কথা যদি সত্য হয়, তা'হলে আমি ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, লেখার কৌশল আমি কতকটা আয়ত্ত করেছি--অর্থাৎ আমার লেখায় ভাবের হ য ব র ল বেশি নেই।

আর এক কথা। জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় কবি, তাঁর ছোকরা বয়েসে কোনও বন্ধুকে বলেন যে, ঘরে বসে নির্জ্জনে ভাষাচর্চ্চার ফলে ভাষার উপর তাঁর এতটা অধিকার জন্মেছে যে, তিনি যদি কোন কথা বল্‌তে চান, তা তিনি অনায়াসে লিখে বল্‌তে পারেন। কিন্তু তাঁর বইপড়া কথা ছাড়া অপর কোন কথা বল্‌বার নেই। আমাদের মত লেখকদের অবস্থাও যে তাই সে-বিষয়ে আমরা সকলে সচেতন নই। আমাদের অনেকেরই মনে বইয়ের কথা এতটা ভিড় করে রয়েছে যে, নিজের মনের কথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া কঠিন। সত্য কথা এই যে, আমাদের অধিকাংশ লেখকের লেখা হচ্ছে ইংরেজী কথার বাঙ্‌লা অনুবাদ। মনোজগৎ এখন পড়ে-পাওয়া কথায় ভরে গিয়েছে। কোন্‌টা আমাদের নিজের মনের কথা, আর কোন্‌টি পরের কাছে ধার-করা কথা, তা কি আমরা ঠিক চিন্‌তেও পারি? অথচ বইয়ের—অর্থাৎ পরের কথার উপর নিজের মনের অন্ততঃ রঙ্‌ ধরাতে না পারলে সে-কথা সাহিত্য হয় না। কিন্তু মনের রঙও চিরস্থায়ী নয়, তাই এখন আমার লিখ্‌তে ভয় হয়। সে যাই হোক, এখনও আমার লেখ্‌বার অভ্যাস আছে বলে সম্পাদক ও সম্পাদিকাদের অনুবোধ আমি যথাসাধ্য রক্ষা করি। এর একটি কারণ, উক্ত অনুরোধেই প্রমাণ যে আমার কথা পাঠকসমাজ শুনতে চান। তবে আপনাদেব কাগজে আমার পক্ষে লেখা একটু মুশ্‌কিল। আমার কলমের মুখ একটু ছুঁচলো, তাই সে কলম ফূর্ত্তি করে অর্থাৎ বেপরোয়া ভাবে চালাতে ভয় হয়, পাছে তার খোঁচা কারও গায়ে লাগে। এককথায় 'বুলবুলে'র জন্য লিখতে হলে একটু বিশেষ সতর্ক হয়ে লিখ্‌তে হয়। অপর পক্ষে 'সাবধানের মার নেই' এ-বচন শিরোধার্য্য করে আমি কলম চালানো অভ্যাস করিনি। হিন্দুসমাজের পিঠে আমি কখনো হাত বুলোইনি, চিরকাল চিম্‌টি কেটেই এসেছি। এখন অবশ্য তার জন্য আমাব হাত থেকে কলম কেড়ে নেবার প্রস্তাব কেউ করেন না। বহুকাল পূর্ব্বে আমার স্বর্গগত বন্ধু ব্যারিষ্টার রসুল আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমার লেখা তোমার সমাজ সহ্য করে কি করে? আমি তার উত্তরে বলি যে, হিন্দু সমাজের কোন বাঁধাধরা মত নেই; সুতরাং সব রকমেরই মত শুন্‌তে তারা প্রস্তুত—অবশ্য গ্রাহ্য করতে নয়। হিন্দুর-সামাজিক জীবন অসংখ্য বিধিনিষেধের ফাটকে আট্‌কে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার মনোজগতে কোনও বেড়া নেই। আমাদেরও অবশ্য শাস্ত্র আছে; কিন্তু সে শাস্ত্রে নানামুনির নানামত। আর এ-সব মতের পরস্পর কাটাকুটি করে যা পাওয়া যায় তার নাম শূন্য। আমরা হিন্দুরা জীবনে সমাজের দাস, কিন্তু মনে মুক্ত। এই জীবন ও মনের আকাশ-পাতাল প্রভেদই হচ্ছে হিন্দু সমাজের যুগপৎ Tragedy (ট্রাজেডি) ও Comedy (কমেডি)....। সুতরাং এ নিয়ে আমরা কাঁদতেও পারি, হাস্‌তেও পারি। আর সে কান্নাও আমাদের সহ্য হয়, সে হাসিও।

এসব কথা বল্‌লুম এই সত্যটি স্পষ্ট করবার জন্য যে, হিন্দু পাঠকদের কাছে কথা হইতে আমার পক্ষে কোন সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন নেই। ভাষার ক্রিয়া-কর্ম্মের যোগ রাখ্‌তে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু 'বুলবুল' যে সম্প্রদায়ের মুখপত্র, সে-

সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের যে মনের ষোলোআনা মিল নেই, সে-সত্যটিও ত উপেক্ষা করা চলে না। আজকাল যাকে বলে Hindu-Mahomedan problem, সে problem অতীতে ছিল, আজও আছে--কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে না, বড় জোর এই পর্য্যন্ত আশা করতে পারি। ফরাসী দার্শনিক Bergson বলেন যে, মনের সেই আলোকই যথার্থ আলোক, যাতে আমাদের মনগড়া অনেক সমস্যা অদৃশ্য হয়ে যায়। সে-আলোক এখনও আমাদের চোখ খুলে দেয়নি। এখন এ-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নানালোকে করছেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টায় problemটি সরল হচ্ছে কি জটিল হচ্ছে, তা আমি বলতে পারিনে, বলতে পারেন পলিটিশিয়ানরা।

শুনতে পাই যে, বিলেতি বৈজ্ঞানিকদের মতে জীবন মানে struggle for existence। এ-কথা যদি সত্য হয়, তা'হলে মানব-জীবনে যে একদিন struggle থাকবে না, এ আশা করা যায় না, কারণ তাহলে মানব-জীবনও থাকবে না। মানুষকে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে struggle করতে হয় না--পরস্পরের সঙ্গেও struggle করতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মানব-জীবনকে ভবযন্ত্রণা বলেছেন। যখন মানুষ হয়ে জন্মেছি, তখন অন্নবস্ত্রের জন্য আমাদের সকলকেই struggle করতে হবে। আর পৃথিবীতে যত রকম struggle আছে, সে সবই এই অন্নবস্ত্রের struggle-এর রূপান্তর মাত্র। পলিটিক্সের মূলে যে economics আছে তা আজ সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং আমরা শুধু জীবনে নয়, মনেও ছট্‌ফট করতে বাধ্য। আর বিলেতি পণ্ডিতদের দল এই ছট্‌ফটানিকেই প্রাণের লক্ষণ বলেন। যদি তাই হয় ত স্বীকার করতেই হ'বে যে ভারতবাসীদেরও বিলেতি প্রাণ আছে। তবে আমার মনে হয় যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ সমস্যার বালাই নেই। কারণ সাহিত্যচর্চা আর যাই হোক, দুনিয়াদারী নয়। হিন্দুদের নানাশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র বলে একটি অদ্ভুত শাস্ত্র আছে। এ শাস্ত্র একরকম লুপ্ত শাস্ত্র, যেহেতু ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের নিকট এ-শাস্ত্র প্রিয়ও নয়, পরিচিতও নয়। কারণ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে এ-শাস্ত্র পাগলের শাস্ত্র। সে যাই হোক, এ-শাস্ত্রের অনুমত একটি সাধকসঙ্ঘের পরিচয় দিচ্ছি। এ-সঙ্ঘের নাম ছিল ভৈরবীচক্র। এই ভৈরবীচক্রে কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই দ্বিজোত্তমরূপে গণ্য হত। এমন কি, এ চক্রে যোগ দেবার স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

এ-কালের সাহিত্য-সমাজকেও ঐ জাতীয় একটি চক্র বলা যায়। কারণ সাহিত্যসমাজেও কোনও জাতিভেদ নেই--স্ত্রী-পুরুষের কোনও প্রভেদ নেই। সাহিত্যধর্ম্মের সাধকেরা সকলেই শুধু মানুষ, সকলেই সমান স্বাধীন; equality ও liberty হচ্ছে এ-সঙ্ঘের মূলমন্ত্র। পরস্পরের সঙ্গে শুধু মিল এইখানে 'যে, সকলেই একই সাধনায় ব্রতী। ভৈরবীচক্র থেকে বেরিয়ে সকলেই নিজ নিজ স্বধর্ম্ম পালন করতেন--লোক যাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। ভৈরবীচক্রের উপমাটি আমি একটু ভয়ে ভয়ে দিচ্ছি। কারণ হিন্দুসমাজে ভৈরবীচক্রের সুনাম নেই।

সাহিত্যসমাজের সঙ্গে এই তান্ত্রিক চক্রের এক জায়গা মিল আছে। এ সমাজেও জাতিভেদ নেই, স্ত্রী-পুরুষের বিভেদ নেই। তা' যে নেই, তা "বুলবুল" পড়লেই বোঝা যায়। আমি আপনার পত্রিকা পড়ে, 'বুলবুলে'র লেখকদের সঙ্গে এ-যুগের হিন্দু-লেখকদের বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখতে পাইনি। মুস্‌লিম লেখকরা যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন দেখা যায় যে, তা মানব-আত্মারই প্রকাশ। আর সেই চির-পুরাতন ও চির-নূতন আত্মার প্রকাশই হচ্ছে সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(বৈশাখ--আষাঢ়, ১৩৪১)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

হুমায়ুন কবির

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার একান্ত অভাব। তার কারণ খুঁজতেও কোন বেগ পেতে হয় না ঃ সমালোচনা বাঙালীর ধাতে বেশী নেই বলেই সাহিত্যে সমালোচনার বিকাশ হয়নি। কিন্তু সাহিত্যের বাইরেও অভাবের পরিচয় মেলে। বাঙালীর মত হঠাৎ মেতে উঠে এমন করে হঠাৎ নিভে যাওয়ার ক্ষমতাও পৃথিবীতে আর বোধ হয় কোন জাতির নেই--বেহিসেবী বলেই তা সম্ভব হয়। রাজনীতি সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে সমালোচনা-বোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্র নিয়েই সে সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলা যেতে পারে।

সাহিত্যের বেলায় হয়তো একথা বলা চলে যে বাঙলা সাহিত্যে আজও এমন অবস্থা আসেনি যাতে আমরা সত্যিকার সমালোচনা প্রত্যাশা করতে পারি। প্রথমে হয় সাহিত্য-সৃষ্টি--পরে সেই সাহিত্যকে নিয়েই সমালোচনা গড়ে ওঠে। একা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেই বাংলা সাহিত্যের ফাঁক বড্ড বেরিয়ে পড়ে-- এত দরিদ্র যে সাহিত্য, সেখানে সমালোচনার ভরসা করা দুঃসাহস।

সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে সমালোচনার সম্বন্ধ নিয়ে আজ বিচার ক'রতে চাই না, তবে তা নিয়েও অনেক কথা বলা যায়। প্রথমে হবে সাহিত্যসৃষ্টি এবং পরে তাই নিয়ে সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠবে--একথা যে ধ্রুব সত্য তা মনে করবার কারণ নেই। সমালোচনার অভাবে সাহিত্যসৃষ্টি চলে না, একথাও অনেকে বিশ্বাস করেন। বাংলা দেশে সমালোচনার অভাবের জন্যই সাহিত্যেরও অভাব একথা মনে করায় কোন জ্বলজ্বলে অসঙ্গতি নেই। সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে যে সমালোচক চিত্ত আছে, সে কথা না বল্লেও চলে। তা নইলে ছাপার হরপে যা বেরোয় তাই হ'ত সাহিত্য। কেবল তাই নয়। সাহিত্যপ্রতিভা আমরা মানি। কেবলমাত্র কোন অবোধ্য এবং অনিশ্চিত প্রেরণার ফলেই যদি সাহিত্যসৃষ্টি হ'ত, তবে যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন রকমের লেখা ফুটে বেরোতে পারতো। ভালো লেখক এবং খারাপ লেখকের যে তফাৎ অতি সহজেই চোখে পড়ে, তার কোন অর্থই থাকতো না। সমালোচক চিত্ত রয়েছে বলেই ভালো লেখা ভালো--তার অভাবেই কলমনবীশ কোনদিন রবীন্দ্রনাথ হ'তে পারে না।

বাংলা সাহিত্যের দৈন্যের দোহাই দিয়ে সমালোচনার অভাবকে তাই ঢাকা যায় না। সমালোচনার যে অভাব, সেটা কেবলমাত্র সাহিত্যের দৈন্যের ফল নয়--লক্ষণও বটে। ঠিক যে কারণে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, ঠিক সেই কারণেই সাহিত্যের সমালোচনাও পুষ্টিলাভ করেনি। সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে গুপ্তহত্যাবাদের যে ব্যাপ্তি দেখা দিয়েছে, তারও পেছনে রয়েছে বাঙালীর চরিত্রে স্থৈর্য্য ও বিচারের অভাব, তার জীবনে বুদ্ধির পরাজয়।

এ কথাটাকে বোধহয় আরো একটু স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত। বুদ্ধির পরাজয়ের অর্থ এ নয় যে বাঙালীর বুদ্ধির অভাব। বুদ্ধি ও বিচারের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারলেই আমার বক্তব্যও বোধ হয় সহজ হয়ে উঠবে। বুদ্ধি মনের একটা বিশেষ বৃত্তি--কোন একটা অবস্থার মধ্যে কোন একটা বিশেষ লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করাই তার কাজ। সেদিক থেকে বুদ্ধিকে অনেক সময় যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। বিশেষ কোন একটা কলে যেমন কোন একটা বিশেষ কাজ সহজে করা যায়, তেমনি বিশেষ অবস্থায় জীবনরক্ষার উপযোগী পথ খুঁজে বের করাই বুদ্ধির কাজ। সমস্যা-পূরণের ফন্দী যত সহজে এবং যত শীঘ্র বের করা যায়, বুদ্ধিকে আমরা ততই বেশী বাহবা দিই। বিবেচনা বা বিচার বলতে কিন্তু আমরা সমস্যাপূরণের শক্তির চেয়ে বেশী কিছু বুঝি। বিচার বা বিবেচনা মনের বিশেষ কোন বৃত্তি নয়। বাস্তব জগতের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝবার যে শক্তি, তাকেই আমরা বিবেচনা বা বিচার বলি। ইংরিজিতে বুদ্ধি মানে intellect বা understand-ing, বিচার বা বিবেচনার অর্থ reason বা rationality. বিচারের ফলে তাই জীবের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় হয়--সে সম্বন্ধ

নির্ণয়ের ফলে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব, সেগুলি পূরণ করতেই বুদ্ধির ডাক পড়ে। তাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও বিচারের অভাব থাকতে পারে; কিন্তু বিচারবোধ যার সবল, প্রথম দৃষ্টিতে তার বুদ্ধি কম মনে হলেও সেটা কেবলমাত্র দেখার ভুল। চলতি কথাতেই আছে : অতি চালাকের নাকে দড়ি। এ প্রবাদ এই সত্যকেই নির্দ্দেশ করে।

বিচার বা বিবেচনাকে তাই অন্যদিক থেকে বাস্তববোধও বলা হয়। পৃথিবীতে সমস্যা কখনো আলাদা অবিমিশ্রভাবে মেলে না--অনেক সমস্যা জড়িয়ে গোলতাল পাকিয়ে জীবনকে জটিল ক'রে তোলে। কেবল বুদ্ধিতে তখন কুলোয় না- জীবনের জটিলতাকে উপলব্ধি করবার জন্য তখন বিবেচনা বা বিচারবোধের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর ইতিহাসেও তাই দেখা যায় যে কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে কোন জাত বড় হ'য়ে ওঠেনি। কথা চিরে চিরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক করতে ভারতীয় বুদ্ধির তুলনা বোধহয় পৃথিবীতে মেলে না--কিন্তু বিচারবোধের অভাবে ভারতীয় বুদ্ধির সে তীক্ষ্ণতাও অনেকখানিই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধির প্রখরতার তাই অনেক নিদর্শন আমরা এদেশে পাই, কিন্তু যে বিচারবোধ বুদ্ধির সকল সাধনায় গভীরতা ও ব্যাপকতা এনে দেয়, তার পরিচয়ের অভাবে মন ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যর্থতার কারণও এরই মধ্যে রয়েছে।

এই বাস্তববোধের অভাবেই আমাদের সাহিত্যও সম্পূর্ণ ও সুঠাম হয়ে ওঠেনি, সমালোচনা যে আমাদের সাহিত্যে প্রায় একেবারেই নেই, তারও কারণ এখানেই মেলে। বুদ্ধি আমাদের দেশে আছে, কিন্তু বিচার নেই। তাই মনের প্রখরতা ও গতির পরিচয় মেলে, কিন্তু সে গতিতে কাঠিন্য ও প্রবলতার অভাব।

অতিরিক্ত ভাবালুতা বিচারবোধের অভাবের লক্ষণ। পৃথিবীর সংস্পর্শে মানুষের চেতনা সাড়া দেয়, কিন্তু সে চেতনা কেবলমাত্র জ্ঞানগত নয়। আমরা পৃথিবীকে কেবলমাত্র জানি না--জানার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির ফলে আমরা সে সংস্পর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে বা ডুবিয়ে দিতে চাই। যে সংস্পর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই তার আমরা নাম দিয়েছি সুখকর এবং যাকে ডুবিয়ে দিতে চাই তার নাম হ'ল--কষ্টদায়ক। অনুভূতিকে জাগানো এবং অনুভূতির সাড়া আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তেই রয়েছে-- কেবল কোথাও সে সাড়া অত্যন্ত মৃদু বলে আমরা তাকে লক্ষ্যই করি না--সেখানে চিত্তের সমস্ত ঝোঁক কেবলমাত্র জানাজানির উপরেই পড়ে। যেখানে সে সাড়া অত্যন্ত প্রবল, সেখানে আমরা জ্ঞানের দিককে লক্ষ্য না করে তাকে বলি আবেগ। কিন্তু আবেগের মধ্যেও জ্ঞান রয়েছে, তা নইলে আমাদের পক্ষে আবেগ অনুভব বা প্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

যেখানে আবেগের কারণের সঙ্গে আবেগের প্রকাশের কোন সামঞ্জস্য নেই--সামান্য কারণে বা কারণের অভাবেও আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে, তাকেই আমরা বলি ভাবালুতা। বিচারবোধের সঙ্গে ভাবালুতার সম্বন্ধ তাই অতি সহজেই বোঝা যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মধ্যেও আমরা তাই ভাবালুতার পরিচয় পাই--যারা বেশী রকমে আত্মকেন্দ্রী তাদের নিজেকে নিয়ে ভুলে থাকার মধ্যেও এই বিচারবোধের অভাব বলেই সেটা হাস্যকর ঠেকে। তাই আবেগের কারণকে বাদ দিয়ে কেবল আবেগের প্রকাশভঙ্গীকে গ্রহণ করে হাস্যরসের প্রকাশ।

এই কথাটীকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে দার্শনিকেরা বলেছেন যে মানুষ সজ্ঞান জীব। তার সজ্ঞানতার লক্ষণই এই যে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে তার আচার-ব্যবহার বিভিন্ন। যেখানেই এই রীতির ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই মানুষ হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। হাস্যাস্পদ হওয়ার মানেই হল যে মানুষ অজ্ঞান জীবের মত ব্যবহারে নিত্য নবীনতা না দেখিয়ে অজ্ঞান জড়ের মত বিভিন্ন ঘটনায় একই রকমের সাড়া দিচ্ছে। সজ্ঞানতা যে হাসির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় তার প্রমাণ এই যে অজ্ঞান জীবের ব্যবহারে আমরা হাসি না। জীবজন্তুর স্বভাবে হাসির উপাদান নেই--যেটুকু আমরা হাসি সে কেবলমাত্র মানবস্বভাবের সঙ্গে তাদের স্বভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে, তাদের--মানুষের সঙ্গে সমধর্ম্মী ভাববার ফলে। বিচারবোধের ব্যত্যয়ে মানুষ তাই জড়ধর্ম্মী হয়ে পড়ে--মানুষের মধ্যে জড়তা লক্ষ্য ক'রেই হাসি, তার কারণ মানুষের স্বভাবে আমরা জড় ভাব প্রত্যাশা করি নে।

ভাবালুতাও জড় মনের লক্ষণ। বাঙলা সাহিত্যে ভাবালুতার বাড়াবাড়িও তাই বাঙালী মনের বাস্তববোধর অভাবকেই প্রকাশ করে। এই অভাবের আর একটী লক্ষণ সমালোচনায় আমাদের অসহিষ্ণুতা। আমাদের বিষয়ে যদি কেউ সমালোচনা করে, তাকে আমরা শত্রুতা মনে করি। দোষগুণ নিয়ে যথার্থভাবে আমাদের বাস্তববিচারের চেষ্টা যে সে-সমালোচনায় থাকতে পারে, সেকথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। সমালোচনায় আমাদের যে অসহিষ্ণুতা, সেটা আমাদের সমালোচনাতেও প্রকাশ পায়। অন্যে আমাদের সমালোচনা করলে আমরা তা সইতে পারি না; কিন্তু অন্যপক্ষে আমরাও কারুর সমালোচনা করতে গিয়ে

অস্থির হয়ে পড়ি। বাস্তববোধের অভাবে আমাদের প্রশংসা ও নিন্দা দুইই ভয়াবহ। যাকে ভালো লাগে, তার বিষয়েও আমরা যেমন অতিভাষী, নিন্দার বেলায়ও আমরা তেমনি পঞ্চমুখ।

আমাদের বাস্তববোধের অভাবের নতুন একটী দৃষ্টান্ত অল্পদিন হ'ল আমি পেয়েছি। 'বুলবুলে' একবার হাস্যরসের আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস যে উঁচুদরের রসসৃষ্টি নয়, একথা আমি বলেছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবোধ আছে, চরিত্রের প্রবলতাও আছে, কিন্তু যে বাস্তববোধের ফলে তীক্ষ্ণ অনুভূতি সাহিত্য হ'য়ে ওঠে, দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে তার একান্ত অভাব। বাস্তববোধ যার আছে, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ" একথা তার কলম দিয়ে কোন দিন বেরুতে পারে না। তবু, দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের জন্য অনুভব করেছেন, দেশের গ্লানিকে গান কবিতায় উপহাস করেছেন বলে তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন--সাহিত্যিক বলে নয়, সমাজ-চিকিৎসক বলে। যারা সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করে এবং ব্যক্তিগত প্রীতি-অপ্রীতির কথা বাদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির বিচার করতে চায়, তাদের মধ্যে যে এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ আছে, আজো তার কোন পরিচয় মেলে নি।

শুনেছি যে কেউ কেউ আমার এ কথায় আঘাত পেয়েছেন। কাউকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না--হাস্যরসের সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য বা ব্যর্থতার বিচারই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কেউ ব্যথা পেয়ে থাকলে সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু তবু আমি ব'লব যে সাহিত্যকে বিচার করার অর্থ সাহিত্যিকের বিচার নয়। কারুর সাহিত্যসৃষ্টি ব্যর্থ--এ-কথার অর্থ এ নয় যে সেই সাহিত্যিকের চরিত্রগত কোন দোষ ছিল। সাহিত্যের বিচারও তাই ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। যেখানে তা হয়, সেখানে সাহিত্যের বিচার হয়নি। কিন্তু সাহিত্যকে নিজের বুদ্ধিমত বিচারের ফলে যদি কোন রচনাকে নিকৃষ্ট মনে হয়, তবে তাকে নিকৃষ্ট না বলে উপায় নেই। তাতে যদি কারুর মনে আঘাত লাগে, সে বেদনা কেবলমাত্র ভাবালুতার—সাহিত্যবিচারে তার কোন স্থান নেই।

আর একটা কথা বলে আজ এ প্রসঙ্গ শেষ ক'রতে চাই। বাঙলা সাহিত্যের বিচার যেদিন শুরু হবে, সেদিন অনেক প্রতিমাই ধুলোয় লুটোবে। বাস্তববোধ ছিল না, সাহিত্যের বিচার ছিল না বলেই হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথকেও কবি বলে গণ্য করা হয়েছে; যাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্যসেবী, তাঁদের মনে করা হয়েছে সাহিত্যের স্রষ্টা। তবে আজীবন সাধনার মূল্য আছে, তাই সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও বাঙ্‌লা ভাষার সেবক, বাঙ্‌লা সাহিত্যের সদাগর হিসেবে তাঁরা সকলেই চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন।

(শ্রাবণ--আশ্বিন, ২য় বর্ষ, ১৩৪১)

ডি. এইচ. লরেন্স

হুমায়ুন কবির

জীবন-যাপনের মতই সাহিত্যেরও দুইটী স্তর। সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে জীবন কাটিয়ে যেতে চায়, সাধারণ সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের পালার মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটে, সেই সহজ জীবনযাত্রার মধ্যেই তারা পূর্ণ। জীবনের এই স্বচ্ছন্দ গতিকেই যারা জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ মনে করে, তাদের জীবনেও সুখ-দুঃখের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সে বৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে এবং সহজে ধরা পড়ে বলেই আমরা তাকে অগভীর মনে করি। অগভীর হলেও তাতে লাভ ক্ষতি দুইই আছে, গভীর সুখ তাদের ভাগ্যে না জুটলেও গভীর দুঃখও তারা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু আর একদল লোক আছে তারা জীবনকে এত সহজে নিতে পারে না, তার বহিঃপ্রকাশকে পার হয়ে অন্দর-মহলে তার সত্যিকার রূপ দেখতে তারা উৎসুক। এ অনুসন্ধিৎসার পরিণাম কিন্তু অনিশ্চিত, কারণ জীবনের গভীরতম কেন্দ্রে আঘাত দিলে জীবন যে কী ভাবে আপনাকে প্রকাশ করবে, তার কোনই স্থিরতা নেই। রূপকথার রাজপুত্র যেমন সাতসমুদ্রের পরপারে জনহীন প্রাসাদে কখনো বা রাজকন্যা কখনো বা দৈত্যকে জাগিয়ে তোলে, জীবনের সদর দরজা পার হয়ে গেলে মানুষের ভাগ্যেও তেমনি কখনো বা বিপুল বিস্ময়, কখনো বা অলৌকিক আশঙ্কা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে।

রূপকথায় রাজপুত্রের পরিণাম অনিশ্চিত হলেও একটা কথা আমরা প্রথম থেকেই জানি। অপরিচিত পথে সমস্ত অস্বীকারের মধ্যে যখনই রাজপুত্র সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছে, তার অন্তরীক্ষে অদৃষ্ট তখনই তার জন্য সুখ-দুঃখকে তীব্রতর কঠিনতর করে তোলে। বিপদ সে পথে যেমন বেশী, পুরস্কারে আশাও তেমনি বিপুল। সাধারণ জীবনের সহজ সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে তার বাজী, বাজী জিততে পারলে সার্থকতা যেমন সম্পূর্ণ, হারলেও পরাজয়ের গ্লানি তেমনি একান্ত। জীবনের মর্ম্মকথা যারা খোঁজে, তাদের ইতিহাস তাই চিরদিনই মর্ম্মান্তিক। তাদের কাছে আত্মোপলব্ধি এবং আত্মবিনাশের মধ্যে বড় বেশী তফাৎ নেই, এবং সেই জন্যই জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের নতুন নতুন স্তর উদ্ভাসিত করে, সুখ-দুঃখ অনুভূতির নতুন নতুন পর্য্যায় বিকশিত করে মানবাত্মার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

সাহিত্যের ব্যাপারেও আমরা এ স্তর-বিভাগ দেখতে পাই। সাহিত্যকে যারা সহজে নিয়েছে, সে সব সাহিত্যিকের রচনায় দ্বন্দ্বের অবকাশ কম, সার্থকতার পরিমাণও তাদের তাই অল্প। এ স্বল্পতা কিন্তু মূল্যহীন নয়, কারণ জীবনের অগভীর স্বচ্ছতাকে সাহিত্যরূপ দেওয়াই যাদের প্রয়াস, সার্থকতা তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। তাদের সাধনায় তাই সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু সে সমৃদ্ধি পরিধিগত, স্তরমূলক নয়। জীবন এবং সাহিত্যের নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন কেন্দ্র সে সাহিত্যে প্রকাশ পায় না সত্য, কিন্তু পরিচিত পৃথিবীর পরিচয় সে সাহিত্যের ফলে আমাদের কাছে প্রিয়তর হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে নিঃসন্দেহ এবং অপ্রশ্ন-চিত্তে গ্রহণ ক'রে যে সাহিত্য, তার সাম্য এবং সৌকর্য্য অবিসম্বাদি। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দুর্গম ও দুঃসাধ্যের অনিবার্য্য মোহ দুঃসাহসী চিত্তকে পরিচিত জগতের কক্ষচ্যুত ক'রে নতুন সৃষ্টি অথবা নতুন প্রলয়ের দিকে আকর্ষণ করে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অসমসাহসিকের সেই অসাধ্য-সাধনার অভিযানেই সাহিত্য নতুন রূপে নতুন সৃষ্টিতে আমাদের চিত্তলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

যারা সাহিত্যকে অতিক্রম করে তার বাহ্যরূপের অন্তরালে তার সত্যিকার স্বরূপ জানতে উৎসুক, তাদের রচনা সাহিত্যের প্রচলিত মাপকাঠিতে তাই ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না বলেই তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশও কঠিন, মতবিরোধের অবকাশও বেশী। প্রচলিত সাহিত্যকে অতিক্রম করার চেষ্টায় যে নতুন রূপকল্পনা প্রকাশিত হয়ে ওঠে, তার প্রকৃতিও তাই অনির্দিষ্ট, রূপকল্পনার বদলে রূপনাশের সম্ভাবনাও সেখানে যথেষ্ট।

সাহিত্যিকও সে সমস্ত ক্ষেত্রে আর কেবলমাত্র সাহিত্যিক নয়—তার দৃষ্টি সেখানে সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে সত্যান্বেষী। নাগরিক

যতক্ষণ বিনাপ্রশ্নে সমাজ ও রাজতন্ত্রের শাসন মেনে চলে, ততক্ষণ সে কেবলমাত্র নাগরিক, কিন্তু সে শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে যখনি তার মনে প্রশ্ন জাগে, তখনই সে দার্শনিক। নাগরিকের পক্ষে নিয়মানুবর্ত্তিতাই সমাজ-জীবনের উপাদান, কিন্তু দার্শনিকের বিশ্লেষণে সমাজের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাতে সমাজ ধ্বংসও হতে পারে, নতুন সার্থকতায় সঞ্জীবিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সাহিত্যিকও তাই যেখানে সত্যান্বেষী, সেখানে তার সাধনায় সাহিত্যের নতুন সমৃদ্ধি অথবা চরম বিনাশ দুই-ই সমান সম্ভব।

ডি. এইচ. লরেন্স সম্বন্ধে আলোচনায় এ কথা আমাদের প্রতিপদে স্মরণ রাখা দরকার। সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম দিয়ে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ কেবলমাত্র সাহিত্যিক তিনি কোন দিন ছিলেন না, কখনো হতেও চান নি। সাহিত্য দিয়ে তিনি জীবনকে বিচার করতে চেয়েছেন, পরিচিত এবং প্রচলিত জীবনধারার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে নতুন সত্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। নতুন সত্যের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল বলে সাহিত্যের সাধারণ নিয়মকে তিনি লঙ্ঘন করে চলেছেন, ফলে যে সৃষ্টি তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, তাকে গ্রহণই করি অথবা বর্জ্জন করি, অন্ততঃপক্ষে সাধারণ সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা চলে না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্যান্বেষী ও সত্যদ্রষ্টার অভাব নেই—তাঁরা সাহিত্যের প্রসার বাড়িয়ে দেন, অভিজ্ঞতার গভীর হতে গভীরতর স্তরে সাড়া দিয়ে যান। তাঁদের সার্থকতা ও ব্যর্থতা দুই-ই মহৎ, এবং মহৎ বলেই আমাদের কাছে তার আবেদন গভীর। শিল্পী ও সত্যান্বেষী যেখানে একলক্ষ্য, যেখানে সত্যের সন্ধান ও প্রকাশের প্রেরণা একমুখ, সেখানে সে সম্মিলিত সাধনায় সাহিত্যের বিপুল প্রসার আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, উদ্দীপ্ত করে; কিন্তু যেখানে সত্যদ্রষ্টার সঙ্গে শিল্পীর বিরোধ, সেখানে বিচ্ছিন্ন-ব্যক্তি সাহিত্যিকের সাধনা আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, তার আত্মপরাজয় আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে কিন্তু উদ্দীপ্ত করে না।

লরেন্সের জীবনে আমরা এ আত্মবিরোধের পরিচয় পাই। দেহের অণুতে অণুতে শিল্পবোধ নিয়ে তাঁর জন্ম, কিন্তু সত্যের দীপ্তি প্রকাশের সাধনায় তিনি উৎসুক। স্বভাবে তিনি কবি, কিন্তু তিনি হতে চেয়েছিলেন নবী, এবং সর্ব্বদাই তাঁর মনে ভয় ছিল যে কবিত্বে তাঁর বাণী ভেসে যাবে, নবী হ'তে তিনি পারবেন না। কবির সঙ্গে নবীর বিরোধে তাঁর স্বভাব দ্বিখণ্ডিত এবং কবিত্ব এবং নবীত্ব দুই-ই তাঁর পক্ষে তাই অসম্পূর্ণ। যেখানে সন্দেহ, যেখানে দ্বিধা, সেখানেই শক্তির অপচয় এবং সে বিরোধ ও অপচয়ের ফলে প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশও অসম্ভব। লরেন্সের রচনার অনিশ্চয়তা এবং চাঞ্চল্যের কারণও বোধ হয় এইখানেই মেলে। অগ্নিশিখার মতন তাঁর প্রতিভা কখনো কখনো দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে দীপ্তি ক্ষণিক, মুহূর্ত্তের শেষে ধূম্রমান অগ্নিকুণ্ডে তার অবসান। ধোঁয়ার গন্ধ, অন্ধকার এবং অস্পষ্টতার মধ্যে অগ্নিশিখার ক্ষণিক উজ্জ্বলতা তাই তাঁর প্রতিভার প্রতীক।

লরেন্সের রচনায় দুঃসাহসিক অভিযানের ইঙ্গিত স্পষ্ট, পরিচিত জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্রও গভীর। অভিজ্ঞতার বাহ্যপ্রকাশের অন্তরালে যারা তার প্রকৃত স্বরূপ খোঁজে, তাদের সাধনায় যদি অভিজ্ঞতার সংগঠন বা রূপমণ্ডলের বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার বিষয়বস্তু বা উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটে, তবে জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হয়ে পড়ে, সে সাহিত্য জীবনবিচ্যুত বলে আমাদের আর স্পর্শ করে না। তাই সাহিত্যিকের রূপবিচারে অভিজ্ঞতার প্রকাশ-ভঙ্গি যতই বদলাক না কেন, অভিজ্ঞতার প্রাণবস্তুর সংরক্ষণ না করতে পারলে তাকে আর সাহিত্য ব'লে স্বীকার করা যায় না।

লরেন্স সে কথা জানতেন, তাই মানুষের জীবনের বিপুল প্রবাহকে কেন্দ্র করেই তাঁর সাহিত্য। প্রতিদিনকার জীবনের যে সব সুখদুঃখ, যে সব ভাবনা সমস্যা প্রতি মানুষের অভিজ্ঞতায় চিরজাগ্রত, মানব-মনের সেই চিরন্তন ভাবধারাতেই তার সাহিত্য সঞ্জীবিত ও সরস। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে জীবনের বিশেষ ভঙ্গিকে বিশিষ্ট প্রকাশ দিয়ে আজকাল অনেকে সাহিত্যে স্বকীয়তা প্রকাশ করতে চান, তাঁদের সাধনায় অভিজ্ঞতার কোন একটি ছোট কোণ হয়তো উজ্জ্বল হয়েও ওঠে, কিন্তু তাঁদের মৌলিকতায় প্রাণপ্রাচুর্য্যের অভাব। লরেন্স অসাধারণের মধ্যে মৌলিকতা পেতে চাননি, সাধারণ জীবনের সাধারণ সমস্যার উপর নতুন আলো ফেলে তারই মধ্যে তিনি নতুনত্ব খুঁজেছেন, তাই অভিজ্ঞতার বস্তুবৈশিষ্ট্য তাঁর লক্ষ্য নয়, গভীরতার সন্ধানেই তাঁর সাহিত্য উদগ্রীব।

অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতার মধ্যে লরেন্স মৌলিকতার সন্ধান করেননি, তাই সৃষ্টির আদিম এবং অনন্ত সমস্যা নিয়েই তাঁর সাহিত্যসাধনা। নরনারীর সম্বন্ধকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সাহিত্য এবং সমাজ, ধর্ম্ম এবং সভ্যতা। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বঞ্চনা এবং পরিপূর্ণতার মাপকাঠিও এ সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত, তাই পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ও সমস্যাকে সাহিত্যের

উপাদান করে লরেন্স সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

কবির চোখে নরনারীর সম্বন্ধের মাধুর্য্য এবং বেদনা কাব্যে নিত্য নব রূপ পেয়েছে, এবং চিরদিনই পাবে, কিন্তু রূপসৃষ্টিতে লরেন্স তৃপ্তি পাননি। তাঁর স্বভাবের নবী-প্রকৃতি তাই এ সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের সন্ধান করেছে, ভেবেছে যে তীব্র অনুভূতির ফলে এ সম্বন্ধের সত্য যদি একবার প্রকাশ পায়, তবে জীবন ও জগতের প্রতি আমাদের যে মনোভাব, তার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সমস্ত সহজ সমাধান অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের জীবনের আধুনিক প্রকাশ বিচ্ছিন্ন, আত্মদ্রোহী। সৌন্দর্য্য, শান্তি এবং সাধনার সেখানে অবকাশ নেই, আত্মবঞ্চনা এবং আত্মরতির মোহের মধ্যে আমাদের দিন কাটে। সভ্যতার উপাদান দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, নিত্য নতুন আবিষ্কারে প্রকৃতির নতুন নতুন ভাণ্ডার আমাদের কাছে খোলা। কিন্তু এ অবিশ্রান্ত অগ্রগতির মধ্যে আত্মার পরিতৃপ্তি কই? শক্তিকে আজ আমরা পূজা করি। কিন্তু আজকার সভ্যতায় শক্তিরই বা প্রতীক কই? বিলাসের বিপুল আয়োজনের মধ্যে ক্লান্ত চিত্ত নতুন নতুন বিস্ময় খোঁজে, কিন্তু এ শ্রান্তিহীন অভিযানের মধ্যে শান্তি কোথায়? পুরুষের সঙ্গে আজ পুরুষের আত্মঘাতী কলহ, কিন্তু সে আত্মবিকাশের মোহ আজ রমণীকেও আচ্ছন্ন করেছে। গৃহেও তাই শান্তি নেই, স্নিগ্ধতা নেই, সান্ত্বনার আশ্বাস নেই। নারীত্বহীন নারী এবং পৌরুষহীন পুরুষ সভ্যতার শ্মশানে আজ আত্মবিস্মৃত।

কবির সহজ অনুভূতি দিয়ে লরেন্স জীবনের এ বিপ্লব ও বিপদ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কবির দৃষ্টি দিয়ে তার রূপ দিয়ে তিনি সান্ত্বনা পাননি। নবীর মতন তিনি তার সমাধান খুঁজেছেন, সাধনা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেবেছেন যে স্বভাবের সহজ অনুভূতির মধ্যেই মানবচিত্তের মুক্তি। বুদ্ধি এবং অনুভূতির দ্বন্দ্ব ও বিভাগে আমাদের জীবন দ্বিখণ্ডিত, এবং সেইজন্যেই আমাদের জীবনে এত গ্লানি। সে বিভাগকে অতিক্রম ক'রে আমরা যদি আবার সহজ অনুভূতি দিয়ে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তবে অভিজ্ঞতার সমস্ত বঞ্চনা নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বুদ্ধির বিরুদ্ধে তাই তাঁর মর্ম্মান্তিক বিদ্রোহ। বুদ্ধি জীবনকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাই বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে আমরা আবার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করব। এ উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ দেহের প্রাধান্যে। বুদ্ধির বিশ্লেষণে সমস্ত অভিজ্ঞতা চিন্তামলিন ও বিবর্ণ, বুদ্ধিবর্জ্জিত দেহসর্ব্বস্ব মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতা তাই পরিপূর্ণরূপে প্রকট। দেহের শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহে যে জীবনবোধ, সেই ভাষাহীন চিন্তাতীত জীবনস্রোতের মধ্যে সমস্ত সত্তাকে ডুবিয়ে দিলে অভিজ্ঞতাও আর অসম্পূর্ণ বা ছায়ালু থাকবে না, রক্তের মতনই তাকে আমরা গাঢ়ভাবে অনুভব ক'রব।

নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে যৌনব্যাপারেই বুদ্ধির প্রাধান্য সকলের চেয়ে কম। অন্যান্য সমস্ত সম্বন্ধের বেলায়ই যুক্তি চিন্তা বিচার আমাদের অভিজ্ঞতাকে রঞ্জিত করে, কিন্তু যৌনসম্বন্ধের মধ্যে মানসিকতার ছায়া নেই বল্লেই চলে। দেহ-সর্ব্বস্ব সে অভিজ্ঞতার মধ্যে চেতনা বিলুপ্তপ্রায়, বুদ্ধি মূর্চ্ছিত। তাই লরেন্স সেই অভিজ্ঞতাকেই মানুষের সম্বন্ধের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার স্বরূপ প্রকাশ তাই লরেন্সের প্রধান সাধনা, কিন্তু দেহ-সর্ব্বস্ব বলেই তার প্রকাশও কঠিন। সংবেদনাকে কখনো ভাষায় প্রকাশ করা চলে না, কেবলমাত্র ইঙ্গিতে আভাসে নির্দ্দেশ করা যায়। তাই দেহ-সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞতার সংবেদনা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করতে গিয়ে বারে বারে লরেন্সের ভাষা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাঁর সমস্ত সাহিত্য-প্রয়াসই কুজ্ঝটিকার রূপহীন অবিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয়।

চেতনাকে অস্বীকার করবার প্রয়াস লরেন্সের রচনায় নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অভিজ্ঞতার বুদ্ধি-দীপ্ত আলোকিত অঞ্চলকে পেছনে রেখে সংবেদনার মূক অন্ধকার আলোড়নের মধ্যে তিনি জীবনের পূর্ণতা খুঁজেছেন। মানুষের মধ্যেও তেমনি অমার্জ্জিত মাটীর মানুষের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। যারা শিক্ষিত, যারা সচেতন, যারা নিজেদের চিন্তাভাবনায় সজাগ, লরেন্সের চোখে তাদের স্বভাব বিচ্ছিন্ন। পোষাকী আদবকায়দা, পোষাকী ভাবধারায় তাদের পোষমানা স্বভাব আচ্ছন্ন, প্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগ হারিয়ে তাদের জীবনধারা ম্রিয়মান। আদিম ও অসভ্য যারা, যারা মাটীর সঙ্গে যোগ রেখেছে, তাদের স্বভাবে সভ্যতার উপাদান নাইবা থাকুক, কিন্তু তাদের প্রতি অঙ্গে পঞ্চভূতের স্পর্শ, আকাশ বাতাসের আবেদনে তাদের জীবন পরিপূর্ণ।

মাটীর সঙ্গে যোগ স্থাপনের প্রথম সোপান নরনারীর যৌনসম্বন্ধ। স্বভাবতঃই চেতনা সেখানে মলিন, কামনার তীব্রতায় মানুষের ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায়, সংবেদনার তীক্ষ্ণতায় বুদ্ধিবৃত্তি অবসন্ন। তাই যৌনসম্বন্ধের মধ্যে লরেন্স নতুন অর্থ খুঁজেছেন,

বলেছেন যে ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত অনাত্ম সম্বন্ধে মানুষের সিদ্ধি। সে সম্বন্ধের মধ্যে নরনারী যদি আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পারে, তবে সংসারের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত সমস্যার মধ্যেও সেই পূর্ণতার ছোঁওয়া বেঁচে থাকবে, তার ফলে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আত্মকেন্দ্রিক জীবনের স্বার্থপরতা পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলেছে--আত্ম-বিস্মরণী কামনার তীব্রতায় মানুষের ব্যক্তিত্বের জঞ্জাল দূর করে পৃথিবীকে নতুন ক'রে তুলবে।

নরনারীর সম্বন্ধ ও সংঘাত লরেন্সের চোখে প্রতীক মাত্র। পুরুষ ও প্রকৃতির যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রকাশের মূলে, নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে তিনি সে দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফলে তার সৃষ্ট নরনারীও ছায়াময়। আবেগ তাদের প্রবল, সংবেদনার প্লাবনে জীবন তাদের পরিপূর্ণ; কিন্তু রক্তমাংসের নরনারীর মতন তারা আমাদের হৃদয়ে আসন পাতে না, বন্ধুর মতন এসে আমাদের সম্বোধন করে না। ঘন কুয়াসার মধ্যে যেমন অস্পষ্টভাবে মানুষের ছায়া দেখতে পাই, কুয়াসার আবরণে স্ফীত হয়ে ছায়াগুলি অমানুষিক অবয়বে প্রকাশ পায়, লরেন্সের ছায়ামূর্ত্তিগুলিও তেমনি আবেগের বাষ্পালোকে বিপুল ও প্রবল মনে হয়। সে জগতে আমরা পরিচিত পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলি, মনে হয় বুদ্ধির প্রদীপ নেবাবার ফলে সংবেদনার যে অন্ধকার জগতে এসে পড়েছি, সেখানে ভাষাহীন অন্ধকারে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য লোপ হয়ে গেছে, কেবলমাত্র সত্তার অনুভূতি হৃদয়কে মায়া জালে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সত্য হিসাবে তাই লরেন্সের রচনা আমাদের জীবনে যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, কাব্য হিসাবে হৃদয়ে তার প্রভাব অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

সাহিত্যে নারীর স্থান

আবদুল হাকিম, এম. এল. এ

সৃষ্টির আদিকাল হ'তে নারী বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নরের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় নারী বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। বৃক্ষ পত্রে, প্রস্তরগাত্রে, গ্রন্থাকারে নরনারীর বিচিত্র সম্বন্ধ হয়েছে অশ্রুস্নাত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় সাহিত্য যুগ যুগান্তর ধ'রে নারীর অপূর্ব্ব প্রতিভায় উদ্ভাসিত। অতীত যুগে গ্রীস দেশে কবিগুরু হোমার বিশ্ববিমোহিনী হেলেনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গ্রীস ও ট্রয়ের কত বীরকেশরী সম্মুখসমরে নিপতিত হ'লো। এই সৌন্দর্য্যের রাণী রমণী-ললামভূতা স্পার্টা-রাজমহিষীকে কেন্দ্র ক'রে কত বিচিত্র ঘটনা ঘ'টে গেল। নেপথ্যে কত ইউনানীর জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে গেল। যুদ্ধের অবসানে, গ্রীক বীরগণ কর্ত্তৃক হেলেনা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে, হোমারের সঙ্গীত শেষ হ'ল না। ইলিয়াডের পর অডিসিয়াস দেখা দিল। যুদ্ধবিজয়ী ইউলিসেস কত কল্পনাতীত অবস্থা পরিবর্ত্তনের ভিতর পতিত হ'লেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ইথাকার রাজমহিষী পেনিলোপীর সাক্ষাৎকার লাভ করি। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধ'রে সতী-শিরোমণি পেনিলোপী কিরূপে দেশের রাজন্যবর্গের অযাচিত ভালবাসা উপেক্ষা ক'রে স্বামীর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করেছিলেন—শতাব্দীর যবনিকা ভেদ ক'রে আজিও সে আদর্শ আমাদেরকে পুলকিত স্তম্ভিত করে।

ফিনিশিয়ান রাজকুমারী অনাঘ্রাত কুসুম-সদৃশ অশেষ লাবণ্যময়ী নওসিকা ইউলিসেসকে যে প্রেম-নিবেদন করেছিলেন, তা যে-কোন দেশের যে-কোন কাব্যেই স্থান পেতে পারে। কখনও ট্রয় অন্তঃপুরে কখনও বা গ্রীস-রাজপ্রাসাদে প্রবেশ ক'রে কবিগুরু যে গার্হস্থ্য-ছবি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করেছেন, তা এই অতি আধুনিক সভ্যতার যুগেও তামাদি হবার নয়। ট্রয় রাজকুল-বধূ হেক্টর-মহিষী অ্যাড্রোম্যাকি আপন শিশুসন্তানকে বুকে নিয়ে স্বামী সেবায় অবহিতচিত্ত থেকে গার্হস্থ্য-ধর্মের যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা সকল যুগের, সকল দেশের। অশীতিবর্ষ শ্বশুরের জন্য পেনিলোপী যে "থলিয়া" প্রস্তুত করছিলেন, সে কথা কাব্য-জগতে অমর। সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিতপালিত রাজকুমারী নওসিকা সখীগণ সহ আপন হস্তে বস্ত্র ধৌত করা গৌরবের কাজ মনে করেছেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্বকবি শেক্সপীরের মারফৎ যে সব আলোকসামান্যা নারীচরিত্রের পরিচয় পাই, তাতেও দেখি নরনারী পরস্পরকে বিরুদ্ধধর্ম্মী ব'লে মনে করেন নাই। পরন্তু নরনারী একই মহামানবতার দুইটী অঙ্গ। উভয়ের উৎকর্ষে উভয়ের পরিপূর্ণ সৃষ্টি।

ইটালীয় আকাশের পরিপূর্ণ চন্দ্রমা ভুবনমোহিনী পোরসিয়া আপন অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মীতায় সারা দু'নিয়াকে চমৎকৃত করেছেন, কিন্তু তিনি ব্যাসানিওর নিকট নিজেকে "Unschooled" বলে আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বিবাহের প্রাক্কালে সরলা অবলা বালিকার ন্যায় এই মহীয়সী নারী ব্যাসানিওকে উদ্দেশ ক'রে, বলেছিলেন, "আজ হতে এই রাজ-প্রাসাদ, এই অতুল ঐশ্বর্য্য, তাদের রাণী খোদ আমি, সমস্তই তোমারই।" সৃষ্টির সেরা ডিজডেমনা কাফ্রি অথেলোর বীরত্ব-গরীমায় মুগ্ধ হ'য়ে তা'কে স্বামী রূপে বরণ করেছিলেন। জুলিয়েট ও রোমিও'র প্রেমকাহিনী অপেক্ষা করুণতম মধুরতম বস্তু কাব্য-জগতে অতি অল্পই আছে। মাইর‍্যাণ্ডা ও ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রেম মাধুর্য্যে জনমানবহীন বিজন দ্বীপও মহামহিমান্বিত হয়েছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দি পারস্য-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব গরিমার যুগ। মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে অপূর্ব্ব ছন্দে পারস্য ও সমসাময়িক রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের জীবনকাহিনীর বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হারকিউলিস বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তম ও তদীয় পত্নী তহ্‌মিনার মারফৎ সে যুগের নরনারী সম্পর্ক ও গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাই। কোথাও তো এমন কিছু দেখি না যে, নারী পুরুষের সমপর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে নাই ব'লে সৃষ্টি অচল হয়েছে, অথবা পুরুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক নারীকে তার দাবী

দাওয়া হ'তে দূরে রেখে খাটো করেছে।

অতীত ভারত একদিন মহিমা-গরিমায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। এই সোনার দেশে নারী জ্ঞানবিজ্ঞানে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে প্রভৃত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। কবির কণ্ঠে ভারতীয় নারীর মহিমা ঝঙ্কৃত হয়েছে ঃ—

"মনে আছে সেই অযোধ্যা কোশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল,
মগধ কনোজ সুপবিত্র ধাম,
সেই উজ্জায়িনী নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে।
"এই রঙ্গভূমে করেছিলো লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
ক্ষণা লীলাবতী প্রাচীনা মহিলা,
সাবিত্রী ভারত পবিত্র ক'রে।"

একদিন জগদ্বিখ্যাত কার্থেজের রমণিগণ আপন আপন কেশরাজি কর্ত্তন ক'রে স্বাধীনতা যুদ্ধে রজ্জু-রূপে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, শত্রুকবল হ'তে রক্ষা পেতে অম্লান বদনে অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। নারীর এই আত্মোৎসর্গ কাব্যে স্থান পেয়েছে ঃ—

"অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে,
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার,
সুকেশিনী শিরঃশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

নারী পুরুষকে জীবন সংগ্রামে এতখানি সাহায্য করেছে, পুরুষও নারীকে "অখিল মানসস্বর্গে" স্থাপন করেছে। বাস্তব নারী যতটুকু, তার উপর কল্পনার মোহন তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গ'ড়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনীর পরিচয় She was a phantom of Delight" কবিতায় দিয়েছেন; ইউরোপের আবহাওয়ায় সে সৃষ্টি নরনারীর সনাতন স্বরূপ ও গৃহধর্ম্মকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই।

'A creature not too bright or good
For human nature's daily food."

পারসিক সুফী কবিগণ প্রিয়ার গণ্ডস্থলের একবিন্দু তিলের জন্য "সমরকন্দ-বোখারা" হাসিমুখে বিলিয়ে দিতেন। নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে চির-প্রেমবিধুর হাফেজ আপন পরাণ-প্রিয়কে প্রকাশ করেছেন। ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী-মজনু, শিরী ফরহাদ, প্রেমের অপূর্ব্বতায় 'বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ মাঝখানে' তাদের পাদপদ্ম রেখেছে। অনন্ত সাকী পান-পাত্র হস্তে আসর 'মশগুল' ক'রে আছে।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে তাঁর কাব্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। পারস্যের Selection ও ভারতের বৈষ্ণব-প্রভাবে রবীন্দ্র-সৃষ্টি অনুপ্রাণিত। নারী পুরুষকে গৌরব-মুকুট দান করেছে, তার হৃদিশয্যা-তল শুভ্র দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শীতল, সেখানে তাকে বসিয়েছে, সমস্ত জগৎ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, সে অন্তর অন্তঃপুরে তার পথ নেই! যে প্রেমের অমরাবতীতে নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, পুরুরবা মহাশ্বেতা, সুভদ্রা-ফাল্গুনী অনন্ত সৌন্দর্য্যে মিলিত হ'য়ে আছে সেখানে নারী তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছে; "সেথা তার সভাসদ রবি চন্দ্র তারা।" পুরুষ বহির্জগতের কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে কেহ না হ'তে পারে, অতি তুচ্ছ, সহস্রের মাঝে একজন হয়তো সে, কিন্তু নারীর হৃদয়ে তার মানসীর অন্তর-অন্তরপুরে সে অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান; 'সেথা তার সৌন্দর্য্যের নাহি পরিসীমা।' সে অমরালয়ে নারীর সোহাগ-সুধা পানে তার অঙ্গ অমর হয়েছে, সে মহিমময়ী তাকে সম্রাট করেছে।

শাহ্‌জাহান পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব প্রেমের অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। আজও 'তাজমহল' সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিস্ময়রূপে প্রেমের জয়গান করছে। নারীর প্রেমের যজ্ঞ-শালায় পূজারী পুরুষের একি কম অর্ঘ্য! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত,
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমাব দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙ্গাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে,
তোমার সৌন্দর্য্যেব দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহাবা এই বার্ত্তা নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।"

কবে কোন অতীত যুগে কুবেরের এক ভৃত্য প্রভুর কার্য্যে অমনোযোগিতার জন্য রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" সে বিরহী যক্ষ আপন পরাণ-প্রিয়ার উদ্দেশ্যে নব মেঘকে যে দৌত্যে নিযুক্ত করেছিল, কালিদাস সে অমর কাহিনী নিখিল বিশ্বের প্রণয়ীর জন্য রেখে গিয়েছেন। কত প্রবাসী আষাঢ়-সন্ধ্যায় ক্ষীণ দীপালোকে বসে ঐ ছন্দ মন্দ মন্দ উচ্চারণ ক'রে আপন 'বিজন বেদন' দূর করেছে। কত বিরহীচিত্ত মেঘ-রূপে দেশে দেশে ফিরে কামনার মোক্ষধাম, অলোকার মাঝে প্রিয়তমার সন্ধানে ছুটেছে ঃ

"সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, কবি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণ-সরোজ-ফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।"

এমনি ক'রে নারী যুগযুগান্তর ধ'রে বিশ্বের প্রেয়সীরূপে কাব্যসংসারে স্থান লাভ করেছে! "মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।" নারীর তনুর তনিমা জগতের অশ্রুধারে ধৌত। তার চরণশোণিমা ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা।

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ

সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা,
কতো বর্ণ কতো গন্ধ ভূষণ কতোনা,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোনা
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙ্গাতে কীট দেয়, প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ
তোমারে দুর্লভ করি করেছে আপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

বস্তুতান্ত্রিক কবিতা

আবদুল কাদির

অধুনাতন বাঙ্গালী কবিদের মনে বস্তুতান্ত্রিকতার নেশা বেশ লেগেছে। কবি গোলাম মোস্তফাকে কেউ বলে রবীন্দ্র ভক্ত, কেউ বলে সত্যেন্দ্র শিষ্য। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ইত্যাদির প্রভাব তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় হলেও তাঁকে বস্তুবাদী বলা কিছুটা সুবিধাজনক। রবীন্দ্রনাথের সত্যানুসন্ধান ও স্বানুভূতির অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট কিনা, সে-বিচার অন্যে করবেন। আমি আজ বিশেষভাবে দেখাতে চাই তাঁর কবিতার বস্তুতান্ত্রিক দিক্।

রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীতে তিনি নিজের "খেয়াল" সম্বন্ধে প্রার্থনা বল্‌ছেন—

আমায় তুমি ভেঙে আবার গড়ো জীবনস্বামী'
একলা শুধু আমার মাঝে রইবো না আর আমি।
হাজার ভাবে হাজার কাজে
ছড়িয়ে যাব জগৎ মাঝে,
হাজার রূপে আমার আমি দেখ্‌বো দিবস যামী।
(খেয়াল, খোশরোজ, ৪৩ পৃঃ)

কিন্তু সে "খেয়াল" স্বপ্নচারীর নয়। নিজেকে তিনি 'পীর', 'পাড়াগাঁয়ের মোল্লা-মৌলভী', 'গয়লা কুমোর কামার' প্রভৃতি 'হাজার ভাবে' গড়্‌বার কথা ভাব্‌ছেন। তিনি বেশ কাজের লোকের মতন পরে বলেছেন—

সওদাগরী ব্যবসা ক'রে হবো বড়লোক,—
রক্‌ফেলার ও ফোর্ড হবার জাগ্‌ছে বেজায় ঝোঁক।
চিরদিনই গরীব হ'য়ে
জীবন কেন যাবে বয়ে!
ধনী হ'তে ক'দিন লাগে থাক্‌লে সেদিক চোখ।
(খেয়াল, খোশরোজ, ৪৯ পৃঃ)

সাধারণ্যের ভাষায় সাধারণ-বোধ্য ভঙ্গীতেই তিনি কথা বলেন। হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুতে বলছেন : 'হঠাৎ তোমায় এমন ক'রে কর্‌লো কে সে গেরেফ্‌তার?'

সর্ব্বজনগ্রাহ্য উপমা আর কল্পনার সাহায্যে তিনি অতঃপর বলেছেন—

রুগ্ন ভারত, হাকিম তুমি দিলেই যখন আপন প্রাণ,
মৃত্যু এ নয়, দিয়েই গেলে ইউনানী কোন্ দাওয়াই দান!

মোদ্দা কথা, প্রচলিত প্রাদেশিক ও বৈদেশিক শব্দাবলী ব্যবহারের দিকে গোলাম মোস্তফার প্রবণতা অনেকটা লক্ষ্যযোগ্য। 'আমীর আলী' সম্বন্ধে তিনি বল্‌ছেন—

ইন্‌সিওরে মাল রেখে দেয় বিজ্ঞ মহাজন,
মাল মারা যায়, যায় না মারা আসল যে-মূলধন।
তেমনি ক'রে রক্ষা ক'রে রাখ্‌লে, হে ধীমান,
বিশ্ব-জগৎ-ব্যাঙ্কে তোমার অমূল্য পরাণ।

নিঃসঙ্কোচেই তিনি ইংরাজি শব্দ বাংলা কবিতায় চালিয়েছেন—

মানুষ তো নও, তুমিই খাঁটা 'স্পিরিট অফ্ ইস্‌লাম',
ইস্‌লামেরই সাথে সাথে রইবে তোমার নাম।
হে মহান হে মৌনী তাপস, মওলানা-মিষ্টার,
কোথায় তুমি পেয়েছিলে ইস্‌লামের এই 'সার'!

গোলাম মোস্তফাকে প্রবীণেরাও ব'লে থাকেন 'মুস্‌লিম জাতীয় কবি'। তাঁর বহু কবিতায় মুসলমান সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বাণী আছে। মুস্‌লিমত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত অভিনব; আমীর আমানুল্লাহ্ সম্বন্ধে তিনি বলছেন —

'কাফের' হউক, তবু সে তো খাঁটী 'কাফের-মুসলমান'!

ধর্মবিষয়ক গম্ভীর দার্শনিকতার গাধাবোট তাঁর কবিতা নয়; ইস্‌লাম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার ধরণ-ধারণ সহজ অথচ অদ্ভুত—

হ্যাট্ কোট্ যদি পারে করিবারে মুস্‌লিমে খৃষ্টান,
মুস্‌লিম কি গো পারেনা করিতে হ্যাটেরে মুসলমান?
হ্যাট্ পরিয়াছে দেখিয়া সবারে দিতেছ জাহান্নাম,
হ্যাটের পেটে যে মাথা ঢুকায়েছে দেখনি কি ইস্‌লাম?
যত হ্যাট আছে, যত কোট আছে, যত আছে ধুতি শাড়ী,
ঢুকে যাও সবে তাদের ভিতরে—সকলের বাড়া বাড়া।
(বাচ্চা-ই-সাকা, মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

বলা অনাবশ্যক যে, আমানুল্লাহ্‌র সিংহাসন-চ্যুতিতে কবির অকৃত্রিম বেদনাবোধই এখানে এমন অপরূপ রসমূর্তি লাভ করেছে।

পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ বা সৌন্দর্যবোধ না খুজে তাঁর মধ্যে সহজ সাংসারিকতার সুরটি উপভোগ করা অভিপ্রেত।

অঙ্গে যাদের ত্রুটী আছে, ভূষণ শুধু তা'রাই পরে,
তা'রাই কেবল ভূষণ দিয়ে সুশ্রী হ'তে চেষ্টা করে।
(ভূষণ, হাস্নাহেনা, ৮ পৃঃ)

থিওরি হিসেবে এ কথার সত্যতা খুঁজে কী লাভ? তাঁর ব্যবহৃত উপমা আর অলঙ্কারে যে স্বকীয়তা রয়েছে, সেদিক দিয়েই সে সবের বিচার বাঞ্ছনীয়। —কবিপ্রিয়া অন্যের বধূ হতে যাচ্ছে, কবির মনে তাই জেগেছে হাহাকার, কবিকে কেবল সান্ত্বনা দিচ্ছে প্রকৃতিদেবী,—এই ছবিটি তিনি ফুটিয়েছেন এইভাবে ঃ

রাজকর্মচারী যথা রাজপথে কর্ম্মে দাঁড়াইয়া
নীরবে চাহিয়া দেখে মৌন দুটী আঁখি বাড়াইয়া
স্বদেশ-নেতার মৃত্যু-সমাধির বিপুল মিছিল,
যোগ দিতে পারে না কো, তবু তার কেঁদে যায় দিল,
সেইমতো শশী-তারা আকাশ-বাতাস
নিজ কর্ম্মে দাঁড়াইয়া ফেলি দীর্ঘশ্বাস
মোর শোকদৃশ্যপানে চেয়েছিল নীরব নয়ানে,
আমার এ ব্যথা যেন বেজেছিল তাহাদেরো প্রাণে!
(পাষাণী, হাস্নাহেনা, ২২-২৩ পৃঃ)

এ ধরণের কবিতায় তাঁর স্পষ্টভাষিতা বেশ উপভোগ্য। কবিপ্রিয়া কোন্ পরবধূ হতে যাচ্ছে, তার কারণ আভাসে উল্লেখ ক'রে কবি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলছেন—

অলঙ্কার কোথা পাব? নাহি মোর বিষয়-গৌরব,
আমি শুধু পারি তোমায় দিতে মোর চিত্তের সৌরভ।
(পাষাণী, ঐ, ২৭ পৃঃ)

সংসারের সাধারণ ব্যাপারগুলিকে কী মনোহারী করেই না তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন -

কতদিন আমি যবে বসেছি আহারে
দূর হ'তে চুপি চুপি দাঁড়াইয়া কক্ষের দুয়ারে
দেহখানি লুকাইয়া শুধু আঁখি দিয়া
দেখেছ আমারে তুমি চাহিয়া চাহিয়া।
(মিলন স্মৃতি, হাস্নাহেনা, ৩৬ পৃঃ)

তিনি "পাশের বাড়ীর মেয়ে"-কে মানসী রূপে দাঁড় করিয়েছেন একেবারে বাস্তবের ভিত্তিতে

পাশের বাড়ীর মেয়ে,
নিত্য আসে সকাল বেলা
ছাদের উপর নেয়ে।
ধোওয়া কাপড় নিয়ে আসে হাতে
ছোট ছোট ভিজা কাঁথার সাথে,
মেলে দিতে ছাদের আলিসায়।
কাঁথাগুলো আর কাহারো নয়,
ভাই-বোনেদের হবেই নিশ্চয়,
মূত্র-মাখা ছিল সমুদয় -
সকাল বেলা ধুয়ে দেছে তায়।
(মোস্‌লেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাং)

বিষয় বস্তু সাধারণ হলেও তাঁর কল্পনা সব ক্ষেত্রে সাধারণ নয়।

ঝিল্লির তানে বন-উপবন মুখরিত অনিবার
সে যেন সুপ্ত নিশ্বাস-ধ্বনি বিশ্বের নাসিকার।

ঝিল্লীধ্বনিকে এভাবে বিশ্ব-নাসার নিশ্বাস-ধ্বনি ভাবার মধ্যে দুঃসাহস আছে, বল্‌তেই হবে।
পরাধীন ভারতের দুস্থ অধিবাসীদের চির-জড়ত্ব দেখে দুঃখেই তিনি বলেছেন-

আল্লা রেগে কসম্ খেয়ে কর্‌লো তখন কঠোর পণ—
এদের সেবায় লাগ্‌বে যারা, তাদের সাজা ঠিক মরণ।
(হাকিম আজমল খাঁ, নোশরোজ, ৫৮ পৃঃ)

আল্লাহ্‌র গুণ-কল্পনা এভাবে করার মধ্যেও দুঃসাহসিকতা নিশ্চয়ই আছে।

ওই যে তরুণীদল চলিয়াছে দোলাইয়া কণ্ঠে ফুলমালা,
অঙ্গতলে সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র মণিদীপ জ্বালা!...
বাহিরে উহারা 'বধূ' হয় হোক্ যার খুশী তার,
ধ্যানলোকে ওরা যে গো চিরপ্রিয়া সবাই আমার।
(প্রিয়তমা, হাস্নাহেনা, ১৩ পৃঃ)

অন্যের গৃহিনী হলেও পৃথিবীর সকল তরুণীই তাঁর প্রিয়া, একথা বলাতেও তাঁর কম দুঃসাহস প্রকাশ পায়নি।
ছল-চাতুরী প্রবঞ্চনা শিখেছে আজ তাই খোদা! ....

ভাণ্ডারে তার নাই বেশী রূপ, মিশিয়ে দিয়ে তাই ভেজাল,
গড়পড়তায় বিক্রী করে যাচ্ছে সে তার সকল মাল।
(শেষ ক্রন্দন, সাহারা, ৫০-৫২ পৃঃ)

খাঁটা মুসলমান হয়েও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাঁর যে এই বক্রোক্তি, তাতেও দুঃসাহসের দরকার কম নয়। মোদ্দা কথা, রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র প্রভৃতির প্রভাব থেকে ব্যবচ্ছেদ ক'রে তার কাব্যপাঠ করলে যে-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হচ্ছে কিছুটা বস্তুতান্ত্রিকতা। কুণ্ঠিত বস্তুতন্ত্রীর মতো তিনি নেমেছেন সাধারণ্যের সমভূমিতে, অথচ স্থানে স্থানে হয়েছেন দুঃসাহসী।

অত্যাধুনিক বাংলা কাব্যে নানা প্রাকৃত ও পাশ্চাত্য পদ যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে, ভাব-কল্পনাকে যেরূপ বেয়াড়াভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, বস্তুবাদ ও দেহবাদ যেরূপ অসঙ্কোচ বাণীরূপ লাভ করছে, তাতে গোলাম মোস্তফার কবিতা পাঠকের উপকারে আসবে। তাঁর কবিতায় মুস্‌লিম জাগরণের পূর্ব্বাভাস ও সৌন্দর্য্যানুভূতির অভিব্যক্তি কতখানি রয়েছে বাঙ্গালী পাঠক তা যৎসামান্য জানে; কিন্তু কেউ আজ যদি তাঁকে বলে "কামনার কবি" তবে একেবারে অসত্য কিছু বলা হয় কি?

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

আলাওলের রচিত নূতন পদ

আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ

চট্টগ্রামে প্রাচীন কালে সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইত। হিন্দু মুসলমান বহু পণ্ডিত এ বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাবলম্বনে নূতন রূপ দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি "রাগমালা", "রাগনামা" "ধ্যানমালা" প্রভৃতি নামে পরিচিত। আলাওলও এদেশের সঙ্গীতবিশারদদিগের সহিত মিশিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের অংশ-বিশেষ রচনা করিয়া অন্য পণ্ডিতদিগের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত "রাগমালা" প্রভৃতি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি একজনের রচিত নহে--মনসা-পুঁথির ন্যায় নানা কবির রচনা সম্ভারে গঠিত। গ্রন্থগুলি একাধারে সঙ্গীতগ্রন্থ ও "পদকল্পতরু" প্রভৃতির ন্যায় পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ। এ পর্যান্ত আমরা মুসলমান কবি রচিত যতগুলি পদ প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমস্তই এই সকল সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আলাওল শুধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এমন নহে—বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কয়েকটি পদও রচনা করিয়াছিলেন। আমার আবিষ্কৃত তাঁহার রচিত একটি সুন্দর পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় আমার নামোল্লেখ ব্যতীত তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার রচিত আরও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সবগুলির বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব নয়। তাই আজ কেবলমাত্র তিনটি নূতন পদ পাঠকগণকে উপহার দিলাম--

রাগিনী--কানাড়া

হাহারে বন্ধুর বাঁশী বিষম ফাঁসী
লাগিআ রৈল রাধার গলে।
বন্ধুর বাঁশী চিত্ত-চোর লাগাইআ প্রেম ডোর
যুবতীর মন ধরি টানে।
কুল বধূ কুল হিআ হরি নিল বাঁশী দিআ
প্রাণ নিল বুঝি অনুমানে।
তুই বন্ধুর কঠিন হিআ আনলেত কাষ্ঠ দিআ
জ্বলিআ পুড়িআ হইলাম ছালি। (১)
কহে হীন আলাওলে জল ঢাল সে আনলে
নিবাও আনল প্রেম রস দিআ।

রাগিনী পঞ্চম

আলি (২) কাহে মুঝে মিলায়ব কাম
ঘঠেতে না রহে প্রাণ। ধু।।
না জানি কি হৈল কি দিআ কি কৈল
না জানি নছিবে আছে কি।
বিনি দোষে কালা দিআ এত জ্বালা
ঐ না দুঃখে প্রাণ মাত্র তেজি।।

---

(১) ছালি — ছাই, ভস্ম। (২) আলি — সম্বোধনে সম্ভবতঃ ওলো অর্থে

অবিরত পোড়ে মন কালা মোরে নিদারুণ
ভুলিআ রহিলা ভিন্ন দেশ।
বিরহ বেদন মদন দাহন
তনু ক্ষীণ প্রাণি শেষ।।
চন্দন আগর (৩) শীতল মন্দির
কিছু না লাগ এ অঙ্গে।
হীন আলাওলে ভণে এই না দুঃখ রৈল মনে
কানাইআ দেখো তোর সঙ্গে।

নিম্নোদ্ধৃত গীতটিতে কবি দয়াময় আল্লাহ্‌তালার সমীপে স্মরণ প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা কবির অন্তিম প্রার্থনা ও তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে রচিত। জীবন-প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে গতজীবনের ছবিগুলি মানসপটে উদিত হইলে মানুষের মনে অনুতাপের যে তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়, কবি এই গীতটিতে তাহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

দুঃখিনী ভাটিয়াল

প্রভু দয়াল হের ল (লো) মোরে
অনাথেরে দেয় (দেও) রে চরণ। ধু।।
তোহ্মার কৃপার বলে আপনা পাপের ফলে
তে কারণে তাহে না শুনিলুম।
অখনে সঙ্কট ভেল শমন নিকটে আইল
উদ্ধার কর মোরে কাতর হইলুম।
ভুলিলুম সংসার লোভে বন্দী হৈলুম মায়া জালে
তে কারণে তাহে নাই জানি।
তুহ্মি ত্রিজগত ছাঞি (৪) তুহ্মি বিনে গতি নাই
উদ্ধার মোরে আপ নাম গণি।।
তোমারে ভরম হইলুম আপনে আপনা খাইলুম
তেকারণে লাগিল বিদশা।
হীন আলাওলে ভণে যদি ভাবে দিলে মনে
অবশ্য পূরিব তোর আশা।

(বৈশাখ, ১৩৪৪)

---

(৩) আগর — অগুরু। (৪) ছাঞি — সাঞি — স্বামী, প্রভু

চট্টল-গীতিকা

(১)

(ওভাই) আমার 'সাম্মান' যাত্রী ন লয়, ভাঙা আমার তরী।
(আমি) আপনারে লইয়া রে ভাই এপার ওপার করি।।
(ওভাই) দেবালা কইর‍্যাছে মোরে যে নদীর জল
(আমি) ডুবা দেখ্‌বার আইছি রে ভাই সেই জলের তল!
(আমি) ভাস্‌বার আইছি--ন আইছি ভাই কামাইবার লাগ্ করি।।
(আমি) এই জলের আয়নাতে ভাই দেখ্যাছিলাম তায়
(এখন) আয়না আছে পইর‍্যা রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।
(তাই) চোখের জলে নদীর জলে রে আমি তারেই খুঁজ্যা মরি
(আমি) 'সাম্মান' লইয়া তাবির আশায় ঘাটে বইসা থাকি
(আমার) তাবির নাম ভাই জপমালা তারেই কাঁদ্যা ডাকি,
(ও সে) চোখের তারা লইয়া গেছেরে
(এ চোখ) দরিয়ার পানিতে ভরি'।
নদীরও জল শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিইর‍্যা
মানুষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথার কির‍্যা,
(আমি) ভালবাস্যা গেলাম ভাস্যারে
(আমি) হ'লাম দেশান্তরী।।

নজরুল ইসলাম

(২)

তোমায় কূলে তুইল্যা বন্ধু আমি নাম্‌ছি জলে।
(আমি) রই নাই হইয়্যা পথের কাঁটা তোমার পায়ের তলে।।
(আমি) তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা তোমার বঁধুর লাগি,
(যদি) আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইছি বিবাগী!
(আমি) বুকের তলায় রাখ্‌ছি তোমায়--
(পর‍্যা) শুকাইছিনা গলে।।
যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সেদেশ থনে আইস্যা
(আমার) দুখের 'সাম্মান' ছাইর‍্যা দিছি--চলতেছে সে ভাইস্যা
(এখন) যে দেশে নাই তুমি বন্ধু
সেই দেশে যাই চলে।'

নজরুল ইসলাম

(৩)

তোর লয় মোর লয় সল্লা নাই, '
নিশীথে রাইতে কিল্লাই রইলি বাহিরে খাড়াই?
কত জোয়ার গেল ভাটা আইল নদীর কিনারায়,
আমার চোখের পানি বাঁধ না মানে দিল কাঁথা ভিজাই।
ওরে, আসমানে চাঁদিনী কত জ্বালিল রোশনাই,
আমি কত নিশি কাটাই দিলাম রে চেরাগ জ্বালাই!
তখন যদি আইস্জ রে বঁধু বাড়ীর কিনারায়
আঁচল পাতি রাইখ্‌তাম আমি গো
দিতাম বুক বাড়াই।
আমার পরাণ বাঙ্গা কপাল ভাঙ্গা
আশাত দিলা ছাই,
ওরে কাটা মন না জোড়া লাগেরে
তোর কি জানা নাই?

সংগ্রাহক : গোপাল দাশগুপ্ত বি. এল

(৪)

চান মুখের মধুর হাসি,
দেবাইল্যা বানাইল মোরে 'সাম্মানে'র মাঝি।
কুতুবদিয়ার উত্তর পাড়ে 'সাম্মান'ওয়ালার ঘর,
লাল বাওটা তুলি দিছে 'সাম্মানে'র উপর
বাহাব মারি যায় ঐ 'সাম্মান' রে--
না মানে উজান ভাটি
দেবাইল্যা বানাইল মোরে 'সাম্মানে'র মাঝি।

(পূরবী)

সংগ্রাহক ঃ ফকির অহ্‌মদ
(ফাল্গুন, ১৩৪৩)

(৫)

মন রে আমার ধৈর্য্য মানে না রে দাদা,
দিল্ রে আমার ধৈর্য্য মানে না,
চাটি-গাঁ ছাড়াইল মোরে পরীজান সোনা।

' তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে সল্লা (পরামর্শ) নাই।

পরীজান ত বাস্তা দিয়ে যায়
ফির্ ফির্ ফির্ ফির্ শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ায়,
তার চোখেতে বিজলী ঝরে মন করে দেওয়ানা।

পরীজানের গামছা বড় 'উম',
বুকত্ রাইখলে বুক যে জুড়ায় চোখত্ আইয়ে ঘুম,
তার ঠোঁটের কথা শুনলে উঠে পরাণে মুর্ছনা।

পরীজানের মাথায় কাল চুল
যেন মেঘের পিছে হাজার চাঁদি করে রে জুল্ জুল্,
তার চোখ ডাকে ইশারায়, ও সে হাতে করে মানা।

তার হাতে বাজু পায়ে জোড়া মল
তার বুক দরদের ঝরনা মুখে করে ছল,
ও তার মুখের কথা কে চায় দাদা
দিল যদি যায় জানা।

সংগ্রাহক : শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস বি. এল

(৬)

আমার বন্ধের চাটিগাঁ বাড়ী।
আমার বন্ধের নদীর কূলে ঘর,—
কর্ণফুলীর উত্তর পারে লাল কুঠির উপর।
(ও যার) পোবন গাছের ফাঁকে ফাঁকে রে . . .
সূর্য্য উঠে লাল মারি।
আমার বন্ধের চাটিগাঁ বাড়ী।।

আমার বন্ধু হাসি কথা কয়,—
আঙ্খির ঠারে পাগল করি বক্ষে টানি লয়।
(আমার) হৃদের আগুন জ্বালায় দ্বিগুণ রে. . .
আমার বুকের বসন যায় পড়ি।
আমার বন্ধুর চাটিগাঁ বাড়ী।।

আমার বন্ধু মুল্লুক গিয়াছে,—
ছ'মাস ধরি ন পাই খবর মৈরেছে কি আছে।
(আমি) বনের পাখী হইতাম যদি রে....
যাইতাম গৈ উর্কা মারি।
আমার বন্ধের চাটিগাঁ বাড়ী।।

চটুল গীতিকা

বন পুড়িতে সকলে দেখে,—
মন পোড়া যায় কেমন করি কেউত না দেখে
বন পোড়া যায় কেমন করি কেউত না দেখে
বন পোড়া হরিণীর মত রে....
কোযাব হইলাম মুই নারী।
আমার বন্ধের চাটিগাঁ বাড়ী।। পূরবী

সংগ্রাহক : ফকির আহমদ

(৭)

ওলরে দুঃখিনীর দুঃখ রে।
কইওরে স্যাম বন্ধের লাগ পাইলে
কইওরে শ্যাম বন্ধের ঠাঁই—
এদেশে মনিষ্যরে নাই,
আর নাইরে কোকিলার ধ্বনি,
রে দুঃখিনার দুঃখ রে।।

(যদি) শ্বাশুড়ী মরিয়া যাইত,
ননদীরে বাঘে খাইত,
তবে হইত মুই নারীর বসতি রে।
দুঃখিনীর দুঃখ রে।।
যে দেশে নাই রবি শশী,
কি হালে পোহাইব রে নিশি,
আর নাই রে পশু পক্ষীর বা।
রে দুঃখিনীর দুঃখ রে।।

সংগ্রাহক : আবদুস সালাম
ওহীদুল আলম
(মাঘ, ১৩৪৩)

ঈশান ফকীরের দুইটী গান

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

এবারে ঈশান ফকীরের দুইটি গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গেল। ঈশান ফকীরের অন্যান্য গান মৎসঙ্কলিত 'হারামণি' নামক গ্রাম্যগান সংগ্রহে পাওয়া যাইবে। "বঙ্গবীণা" নামক কবিতা-সঙ্কলন গ্রন্থে ইহার আরও দুইটি গান আছে। শ্রী হবেন আশরাফ হোসেন "বাগবাউল" নামক গ্রাম্যগান সঙ্কলনগ্রন্থে ইহার একটি গান ছাপাইয়াছেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত "ভাটিয়ালী গানে" আর একটি বাউল গান পাওয়া যায়।

ঈশান ফকীর সম্বন্ধে চারু বন্দোপাধ্যায় 'বঙ্গবীণার' কবি-পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি :-

"বঙ্গের নিরক্ষর কৃষকসমাজ হিন্দু-মুসলমান লইয়া গঠিত। তাই তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মমতের সমন্বয় সাধনের জন্য কত রকম নূতন ও সার্ব্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গুরুসত্য ধর্ম্মমত এই শ্রেণীর এক উদার ধর্ম্মমত। এই মতের সাধকেরা প্রায় নিষ্কামভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন, এবং অবিবাহিত থাকিয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া উদার মত প্রচার করেন। ইহাদের চেলারা গুরুর গানের সঙ্গে সঙ্গে "ভিরান" দিয়া তাহাদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। এই গুরুসত্য সম্প্রদায়ের যিনি গুরু, তিনি এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, তিনি কোনও মানুষ নহেন। এই সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে লাল ফকীর ও ঈশান ফকীর ছিলেন প্রধান। ঈশান ফকীরের গান সামান্য ই কয়েকটা পাওয়া যায়। ঈশানের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" বঙ্গবীণা (পৃঃ ৪০৩-৪০৪)

প্রথম গানটার নিম্নোদ্ধৃত দুইটা ছত্রের সঙ্গে পারশ্যের বুদ্ধিজীবী কবি ওমর খইয়ামের কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। উভয় কবির মধ্যে যুক্তির ধারা একই রকমের।

ঈশান ফকীর

ডাকলে সে দয়া করে, দয়াল বলে কে কয় তারে,
না ডাকিলে দয়া করে, দয়াল সে জনা।

ওমর খইয়াম

If grace be grace, and Allah gracious be
Adam from paradise why nourished He?
Grace to poor sinners shown is grace indeed
If grace hard-earned by work no grace I see.
(Omar Khayyam by E.H. Whirefield Quatrain No 102)

(১)

আরে আমা হৈতে দয়াময় নাম্ গিয়াছে জানা।
যারে তারে কোরে দয়া, আমি চাই না।
ডাক্‌লে সে দয়া করে,
দয়াল বৈল্যা কে কয় তারে,

না ডাক্‌লে সে দয়া করে দয়াল সে জনা।
এভব বিষম সাগরে, কেহ জানি ডুব্যা মরে,
লবে না তোর এ হরির নাম পেয়ে যাতনা।
শোনো ওহে বংশীধারী,
কর্‌্যাছ কড়ার ভিখারী,
তবু তোমার চরণ তরী আমি কখন ভুলি না।
ঘরের বাহির করলি মোরে,
এই ছিল তোমার অন্তরে,
নিরাশ কর্‌্যা গাছের তলে লৈতে পারলি না
আরে দুঃখের কত আছে বাকী, যা আছে তা দাও দেখি,
আমি দুঃখের ভয় রাখি, তাই কি জানো না।
চিরদিন কাটাইলাম দুঃখে, আর আশা নাইক সুখে।
মনের মতো দুঃখ দিয়ে পুরাও বাসনা।
ঈশানচন্দ্র বলে ভাবছি বেরথা, আপনি খাইলা আপন মাথা,
কার কাছে কই দুঃখের কথা ভেবে বাঁচিনা।
সমান দুঃখী পাইলে পরে
কথা বল্‌তাম প্রকাশ করে,
সুখী জনা দুঃখীর বেদন কখন জানে না।

(২)

মন-মাঝি তোর সাধের তরী বাইতে জানো না।।
উল্টা জলে ধরছ পাড়ি, ভাটির খবর রাখো না।
মহাজনের পুঁজি ল'য়ে ধরছ পাড়ি কাম-সাগরে,
মদনগঞ্জের ঢেউর চোটে ভাঙ্‌বে তরী রবে না ।।
পাগল মাঝি হয় না রাজি, ঢেউ তুফানে ধরছ পাড়ি,
তার পাছে ভাই ছয়টা গাজি, কারো কথা শোনে না।।
ভক্তি-দ্বারে শক্তি করো, রূপগঞ্জতে নৌকা ধরো,
মদনগঞ্জের কাণ্ডার ছাড়ো, ঢেউ তুফানে ধরবে না ।।
জমীর আলি বল্‌ছে কথা,
ঢেউ তুফানের ছাড়ো কথা,
মুরশীদপুরের খালে চলো,
রংপুরের চোর আস্‌বে না ।। *

আষাঢ় (১৩৪৩)

[* গানদুটী সুপণ্ডিত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আমি নিজেও ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মনসুর উদ্দীন]

‘বস্তুরহস্যে’র জের

কামাল উদ্দীন এম.এস্-সি

‘বুল্‌বুল্’-এর প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আমার ‘বস্তু-রহস্য’ প্রবন্ধটী সম্পর্কে এখন আরও কিছু বলা প্রয়োজন। প্রবন্ধটী লেখা ও প্রকাশ-কালের মধ্যেই বিজ্ঞান-জগতে দু’একটা বড়দরের আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তার উপর দু’এক জায়গায় একটু আধটু অসম্পূর্ণতা বা ভুলচুকও চোখে পড়িল।

(১)

Mendeleeff-Meyer-এর লিষ্টি অনুযায়ী পৃথিবীর মৌলিক পদার্থের মোট সংখ্যা ৯২, ১১৮৩ হইতে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাত্র ৯০টীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ওজন-ক্রমে সাজাইলে এই ৯২এর মধ্যে ৮৫ ও ৮৭ নম্বর বস্তু দুইটা এখনও অনাবিষ্কৃত। অক্সিজেনের ওজন ১৬ ধরিলে ইহাদের প্রথমটির ওজন ২১০ ও ২২২ এর মধ্যে, এবং দ্বিতীয়টির ২২২ ও ২২৬ এর মধ্যে। দুইটীই radio-active পর্য্যায়ভুক্ত। হয়ত ইহারা এত ক্ষণস্থায়ী যে, বৈজ্ঞানিকের কল-কব্জা ইহাদের সাথে পাল্লা দিতে আজিও সমর্থ হয় নাই। আমাদের জানা সবচাইতে ক্ষণজীবী বস্তু Radium CI এর আয়ু $\frac{১}{৫০০০০০০০}$ সেকেণ্ডের অতি অল্প বেশী। ৯৩ নম্বর কিম্বা তদূর্দ্ধের কোন বস্তুর সাক্ষাত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা মোট বস্তু-সংখ্যা ৯২ মনে করিব।

(২)

Prof. Aston এর Isotope-theoryতে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। নতুন নতুন সূক্ষ্ম প্রথায় অধিক সংখ্যক মৌলিক পদার্থেরই একাধিক রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ বিভাগের আশ্চর্য্যতম আবিষ্কার Hydrogen-isotope. এতদিন আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরিয়া কাজ চালাইতেছিলাম। অক্সিজেনকে ১৬০০০ ধরিলে ইহা দাঁড়ায় ১০০৭৮, Aston তাঁহার Mass-spectrograph-এর সাহায্যে ইহা নির্দ্ধারিত করেন ১·০০৭৭৮ ± ০০০১৫। অতএব এই দিক দিয়া সন্দেহের কোন হেতু ছিল না! কিন্তু অক্সিজেনের পর-পর ১৮ ও ১৭ ওজনের আরও দুইটী রূপ আবিষ্কৃত হওয়ায়, হিসাবে হাইড্রোজেনেরও অন্ততঃ আর একটী রূপের কল্পনা সম্ভব হইল। Birge ও Menzel-ই প্রথম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং বলেন যে এই নতুন হাইড্রোজেনের ওজন মোটামুটী পুরাতনটীর দ্বিগুণ হইবে। সাধারণ হাইড্রোজেনের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ইহার আবিষ্কার করেন Urey, Brickwedde ও Murphy. তারপর Bainbridge ১৯৩২ সালে Mass-spectrograph দ্বারা ইহাকে বৈজ্ঞানিক-জগতের সম্মুখে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেন। তাঁহার হিসাবে অক্সিজেন (১৬)র তুলনায় ইহার ওজন ২.০১৩৫১±০ ০০০১৮। Kallmann এবং Lazareff-ও একই বছরে ইহাকে স্থির নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত করেন।

জলে একটু এসিড মিশাইয়া তাহাতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইলে, সে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হইয়া পড়ে; তখন এ দুই উপাদান ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংগ্রহ করা যায়। এইভাবে একই জলে প্রায় তিন বৎসর বিদ্যুৎ চালাইবার পর Washburn ও Urey দেখিলেন, ভুক্তাবশিষ্ট জলে সাধারণ জল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ‘গুরুতর’ হাইড্রোজেন রহিয়াছে। এই প্রথায় তাঁহারা দুই হাইড্রোজেন ভিন্ন ভিন্নভাবে সংগ্রহ করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হন। ইহাতে দেখা যায়, এই নতুন আবিষ্কৃত বস্তুর গুণাগুণ সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অনেক ভিন্ন। Lewis ও Macdonald বাইশ সের জলকে কতকটা উন্নত উপায়ে () ছটাকে (অংশে) পরিণত করিয়া তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ হাইড্রোজেনই ‘গুরুতর’ দেখিতে পান। এইভাবে ১৯৩৩ সালে তাঁহারা অবিমিশ্র ‘গুরুতর জলে’র গুণাবলী নির্দ্ধারণ করেন। Lewis আগেই বলিয়াছিলেন যে ইহাতে জীবনী-শক্তির স্ফুরণ বিঘ্নকর

হইবে। কার্যতঃ দেখা গেল তামাক বীজ সাধারণ জলে দুই দিনেই অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু ইহাতে পনর দিনেও অপরিবর্তিত থাকে। নানাপ্রকার জীবাণুর প্রতি ইহা বিষক্রিয়া করে।

সাধারণ হাইড্রোজেনের মধ্যে গুরুতর হাইড্রোজেনের পরিমাণ এখনও বিচারাধীন; কেহ বলেন ইহা $\frac{১}{৪০০০}$ ভাগ, কেহ বলেন $\frac{১}{৩২০০০}$ ভাগ। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Isohydrogen বা Denterium বা Diplogen, সঙ্কেতে "D".

Kallmann ও Lazarell, Conard এবং Latimer ও Young তিন ওজন বিশিষ্ট আরও এক প্রকার হাইড্রোজেনের সম্ভাবনার পক্ষপাতী। তাহারা ইহার কিছু কিছু প্রমাণও দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু Lewis ও Spedding অনেক চেষ্টায়ও ইহার কোন প্রমাণ পান নাই। Astonও দৃঢ়স্বরে ইহার অস্তিত্বের প্রতিবাদ করেন।

Lewis ও Macdonald এখন আমেরিকা হইতে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে গুরুতর জলের চালান করেন। ইহার গুণাবলী এত বেশী তথ্যের ইঙ্গিত করে যে, Prof. Aston এক কথায় বলিয়াছেন . "We have before us a new chemistry and a new biology".

(৩)

Cosmic radiations নামে এক প্রকার অতি তীক্ষ্ণ রশ্মি কয়েক বছর হইতে আমাদের জানা আছে। Prof. Millikan ইহার আবিষ্কর্তাদের অন্যতম, এবং ইহা সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণে অগ্রণী। তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ইহার পর্যাপ্তি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ঊর্দ্ধ আকাশে এবং জলের নীচেও ইহার খোঁজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লইয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। prof. Piccard বেলুনে চড়িয়া আকাশে ১০ মাইল পর্যন্ত ইহার গুণাবলী তদন্ত করেন। ফলে জানা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক স্তরের বিভিন্ন স্থানে cosmic rays এর পর্যাপ্তি প্রায় সমান, কিন্তু যত উচ্চে উঠা যায়, ততই ইহার পরিমাণ বাড়িয়া চলে। Piccard বলেন,১০ মাইল উপরে ইহা বৃষ্টিধারার মত তাঁহার যন্ত্রের উপর পড়িতে থাকে।

এই cosmic radiation সম্বন্ধে গবেষণার বেলায় ১৯৩২ সালে Anderson এক গৌরবজনক আবিষ্কার করিয়া বসেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার photographic plate এর এখানে সেখানে আকারে ইঙ্গিতে ঠিক ইলেকট্রনেরই মত কতকগুলি বস্তু চুম্বকের আকর্ষণে ইলেকট্রনের উল্টাপথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক কম, ১৩০০ ফটোর মধ্যে ১৫টাতে মাত্র ইহার চিহ্ন বিদ্যমান। প্রথমে তিনি মনে করেন, হয়ত বা ইলেকট্রনই উল্টাদিক হইতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমোৎপাদন করিতেছে, কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় দেখা গেল, ইহা সত্যই অন্য বস্তু। শুধু তাই নয়, ইহা আমাদের এত দিনের প্রতীক্ষিত ধন, অবিভাজ্য ধনাত্মক বিদ্যুতিন--positive ইলেকট্রন বা positron.

আজকাল অল্পয়াসেই লেবোরেটরীতে positron উৎপাদন করা যায়। ইহার ওজন ইলেকট্রনের ওজনের অপেক্ষা শতকরা বিশেষ অধিক তফাত নয়; ইহার বিদ্যুৎসঞ্চয় (charge) ও electron-charge অপেক্ষা শতকরা দশের অধিক তফাত হইতে পারে না। Prof. Dirac-এর হিসাবে ইহার আয়ুষ্কাল জলে ১০ (অর্থাৎ $\frac{১}{5000000000}$ সেকেণ্ড; যে বস্তু যত ঘন, সে বস্তুতে ইহার আয়ু তত কম।

Cosmic rays-এর মধ্যে আজকাল তিন প্রকার রশ্মির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতক ঋনাত্মক বিদ্যুৎ (electron) ও কতক ধনাত্মক বিদ্যুৎ (positron) কণার মিছিল এবং বাকী বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। দূর আকাশে যে cosmic rays এর সাক্ষাত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতে electron ও positron-এর সংখ্যা প্রায় সমান সমান, অতএব positron এর জন্মস্থান আমরা ঊর্দ্ধ আকাশে নির্দ্দেশ করিতে পারি। পৃথিবীতে নামিবার পথে ইহা কোন ইলেকট্রনের সন্ধান পাইলেই তাহার সহিত মিলিয়া উভয়ের জীবনের বিনিময়ে দুই বিন্দু আলোকের সৃষ্টি করে। এই আলোক-বিন্দুর নাম Photon.

(৪)

লঘুতর হাইড্রোজেন-পরমাণু একটী proton ও একটী electron সমবায়ে গঠিত। ধনাত্মক বিদ্যুৎকে আমরা এতদিন এই

proton হইতে অবিচ্ছেদ্য মনে করিতাম। কিন্তু positron আবিষ্কারের পর সে ধারণা পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। এদিকে Lord Rutherford বস্তুর ওজনের একক হিসাবে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ একটা কিছুর সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছিলেন, Chadwick ১৯৩২ সনে তাহার আবিষ্কার করেন। এই বস্তু কণার নাম Neutron। ওজনে ইহা protonএর কাছাকাছি। Proton এর ওজন যদি ১০০৭২ ধরা হয়, তবে ইহার ওজন ১০০৫৭ হইতে ১০০৭০এর মধ্যে। ইহার সচরাচর গৃহীত ওজন ১০০৬৭। ইহার অভ্যন্তরে একটী positron ঢুকিয়া Protonএর সৃষ্টি করে, কিম্বা proton এর অভ্যন্তরে একটা ইলেকট্রন ঢুকিয়া ইহার সৃষ্টি করে--এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই। বলা বাহুল্য, Neutron-এর ওজন প্রথম ব্যাপারে proton এর চাইতে কম ও দ্বিতীয় ব্যাপারে proton এর চাইতে বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু electron বা positron এর ওজন এত অকিঞ্চিৎকর যে আমাদের সম্প্রতি আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দৌড় অতদূর সহজ পৌঁছায় না। তদুপরি, কোন কোন কারণে বস্তুর ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ধারণা। ১৯৩৪ সালের গবেষণায় মনে হয়, Proton ও Neutron এর মধ্যে Neutron প্রাথমিক, এবং জগতের বস্তু-সমষ্টির হাজার করা ৯৯৯ ভাগই ইহাতে তৈরি।

(৫)

Neutron আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিক হেঙ্গাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বস্তুকেন্দ্র (nucleus)কে আগে আমরা proton ও electron এর সমষ্টি বলিয়া জানিতাম। এখন Proton ও nutron সমবায়েও nucleus সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, বুঝা কঠিন। Nucleus হইতে নানা উপায়ে electron নিষ্কাশন করা যায়, অতএব ইহাতে electron যে নাই এমন বলিবার উপায় নাই; অথচ electron আছে বলিলেও যুক্তিটি দাঁড়ায় এইরূপ ঃ বন্দুকে ধোঁয়া আছে, কারণ আওয়াজ করিলেই আমরা ইহার মুখে ধূম উদ্গীরণ হইতে দেখি।

গুরুতর হাইড্রোজেনের nucleus এর নাম Deuton বা Diplon। ইহার ওজন দুই unit এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎসঞ্চয় এক unit। ইহাকে এখন মনে মনে তিন উপায়ে সৃষ্টি করা চলে। যথা : এক নম্বর--দুইটী proton ও একটী electron, দুই নম্বর -দুইটা neutron ও একটী positron; এবং তিন নম্বর- একটী proton ও একটী neutron

(৬)

পৃথিবীর অভ্যুদয় সম্পর্কে Protyle থিওরীর উল্লেখ গতবার করিয়াছি। আর একটি theory প্রচলিত আছে। অধিক সংখ্যক অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ইহারই পক্ষে—সৃষ্টির আগে নানা প্রকার বায়বীর পদার্থ সূর্য্যের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। কালক্রমে এইসব পদার্থকণা একটীর সাথে আর একটী মিলিয়া আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সাথে সাথে মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি হয়। আশেপাশের অন্যান্য বস্তুকণা সমূহও এই মাধ্যাকর্ষণের জোরে ইহাদের সহিত আসিয়া মিলিতে বাধ্য হয়। তারপর ধীরে ধীরে শীতল ও কালোপযোগী হইয়া যাহা দাঁড়াইল, তাহাই আমাদের জন্মভূমি, এই সুন্দর পৃথিবী।

(৭)

*১২৫ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনে 'uranium' শব্দটীর স্থানে 'radium' হইবে। Radiumও অবশ্য Uranium-এরই বংশধর; Uranium হইতে উৎপত্তিলাভে ইহার ৬,২০২,৯৯২,০০০ বছরের কিছু বেশী লাগে, এবং পাঁচ বার জন্মান্তরিত হইতে হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪। (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪১)

---

*উল্লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ও লাইন সংখ্যা প্রথম বর্ষের মূল পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ও লাইন সংখ্যা।

ব্যবসায়ে রসায়ন

ডক্টর মুহম্মদ কুদরৎ-ই-খুদা

আজ বাঙলার ভাই বোনদের আমি ব্যবহারিক রসায়ন সম্বন্ধে দু'একটা দরকারী কথা বলতে চাই। পশ্চিম আজ যে শক্তির তপস্যায় বিশ্বজয়ী, তার মূলে আছে বিপুল বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়নই বোধ হয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসায়ন বলতে কোন একটা বিশেষ ব্যবসায় বা কারখানার কথা বুঝায় না, বরং এই সম্পর্কে বলতে গেলে অধিকাংশ উৎপাদক শিল্পের কথাই আসে। ইউরোপে জার্মানীই সম্ভবতঃ রাসায়নিক কারখানায় এখনও উচ্চস্থান অধিকার ক'রে আছে, আর সেই জন্য তার শক্তিও অপরাজেয় বলে মনে হয়। এই বিরাট শক্তি প্রত্যেক জাতিই সঞ্চয় করতে পারে--অতএব এর আলোচনা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় এবং সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়।

রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে যে সব সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে তাদের সবগুলিই যে ব্যবসায়ীর ধূলো-মুঠিকে সোনায় পরিণত করে জাতীয় ধনাগমের পথ প্রশস্ত করতে পারবে তা নয়, তবে তার মধ্যে অনেকগুলো এই ধরণের সাফল্যলাভ করেছে, আর অদূর ভবিষ্যতে করবেও। এখন অবশ্যি একটা কথা উঠতে পারে যে, যদি এর ফলে মানুষের সম্পদ তেমন না বাড়ে, তবে এ গবেষণায় লাভ কি এবং এতে এত ব্যয়ই বা করা কেন? কিন্তু যাঁরা রাসায়নিক প্রচেষ্টার ইতিহাস অবগত, তাঁরা বুঝবেন, যে যে দেশে যত বেশী এর গবেষণা হয়, সেই অনুপাতে সেই সেই দেশে নব নব শিল্পও দেখা দেয় তত বেশী। আবার সব সময় শুধু শিল্পকেই সামনে রেখে গবেষণা করা চলে না--কারণ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞাতকে জ্ঞাত'র মধ্যে এনে মানুষের জ্ঞানের সীমারেখা আরও বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু আমাদের দেশে দেখছি, আর সব কিছুর মত এটাও উল্টা। কারণ অনেকে বলেন (যাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে অনেকই আলোচনা হয়েছে) যে, এই সব গবেষণায় কি কোন অর্থকরী শিল্পের উদ্ভব হ'তে পারে?

কিন্তু যাক এখন সে কথা। গবেষণার কথা বলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর প্রয়োজন ও বিভিন্ন প্রচেষ্টা সফল করবার উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার সম্বন্ধে অন্যদিন আলোচনা করব। আজ বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

বিভিন্ন গবেষণার ফলে যে সকল শিল্পালয় গড়ে উঠেছে তাদেরকে সচরাচর দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে--গবেষণার দ্বারা বিভিন্ন দেশে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষ্য--তথ্য সাহায্যে নানাবিধ কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা এবং ভবিষ্যতেও এজন্য আরও প্রচেষ্টা করা। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করতে চাই, কিন্তু গোড়ায় প্রথম শ্রেণীর কথাই একটু বলা যাক।

Inorganic Chemistry বা অজৈব রসায়নের আলোচনায় বিভিন্ন খনিজ-পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। দেশের খনিজ পদার্থ যে ধনাগমের একটা উৎকৃষ্ট পন্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ধাতু এই খনি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, তবে বিশুদ্ধ অবস্থাতেই এগুলি সংগৃহীত হয় না। লাল গেরুয়া মাটীর আকারে মূল্যবান লোহার খনিজ 'ওর' ore পাওয়া যায়; আবার শাদা কাদার মত চীনা-মাটীর নামেই এলুমিনিয়াম 'ওর' সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন কারখানায় এই সকল কাঁচা মাল (Raw ore) থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নির্গত হচ্ছে।

একবার টাটানগরে গেলে লোহার দ্বারা যে কি বিরাট ব্যাপার সংসাধিত হয় তা কিঞ্চিৎ ধারণায় আনতে পারা যায়। তামা, দস্তা প্রভৃতিও খনি থেকে উত্তোলিত হয়ে এইরূপে খাঁটি ধাতুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। চীনা-মাটীতে কেবল যে এলুমিনিয়াম পাত্রাদি প্রস্তুত হয় তা নয়, বরং আরও রকমারি পোরসিলেন পাত্রও এই একই পদার্থ থেকে তৈরী হচ্ছে। বালি সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই জিনিষটাও কম প্রয়োজনীয় নয়। এরই সাহায্যে নানাবিধ কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ সব ছাড়া কয়লাও একটি অতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ। রাসায়নিকের প্রসাদে এই তুচ্ছ কয়লায় কত কি-ই না দৈনিক প্রস্তুত হচ্ছে। এই পদার্থের প্রতিটি খণ্ডই মহা মূল্যবান। পূর্ব্বোক্ত লোহার কারখানায় কয়লা প্রচুর পরিমাণে লাগে এবং সেই ব্যাপারে আনুষঙ্গিক পদার্থ

হিসাবেই একটী বায়বীয় ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়, আধুনিক সভ্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার manure এমোনিয়াম সালফেট। এমোনিয়া নাইট্রোজেন সম্বলিত নাইট্রেটও অতি উত্তম সার। আবার এই নাইট্রেটই যুদ্ধকালের বিস্ফোরকরূপে কত প্রলয় সৃষ্টি করে, কিন্তু শান্তির সময়ে ইহা বিভিন্ন উদ্ভিদের খাদ্যরূপে মানুষের কি কল্যাণই না সাধন করে।

নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকলেও অল্পকাল পূর্ব্বপর্য্যন্ত মানুষ একে সাক্ষাৎভাবে কাজে লাগাতে পারেনি, কিন্তু আজ জগতের অধিকাংশ নাইট্রোজেন সম্বলিত সার এই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকেই আবদ্ধ ক'রে প্রস্তুত হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, ভারতের ন্যায় এমন বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে বর্ত্তমানে এমন কোনও রাসায়নিক প্রচেষ্টা নাই, যার সাহায্যে কৃষকের এই প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হ'তে পারে। একথা সত্য যে, আমরা অন্যান্য সার অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু তবু মনে হয়, যদি আমাদের দেশে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকত তাহলে আরও উৎকৃষ্ট উর্ব্বর বস্তু সহযোগে আমরা জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে পারতাম। বর্ত্তমানে দেশের দৈন্য যেরূপ বেড়ে গিয়েছে তাতে মাটীর জোর আর না বাড়ালে দেশবাসীর যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান হবে না। ফলে জন-স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আরও অবনতির দিকে এগিয়ে যাবে।

বড় দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আজ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলায় অভাবের উৎপীড়নে ঘরে ঘরে নানা রোগের উৎপাতে দেশ জুড়ে হাহাকার উঠেছে। দেশের স্বাস্থ্য উন্নয়ন উদ্দেশ্যে নানাভাবে নানারূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশে শক্তির সঞ্চয় না হলে পীড়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। বাঙালী নানাভাবে তার শক্তি সংগ্রহ করুক, তা কে না চায়? তার রোগের সময় যদি তাকে দেশের তৈরী কার্য্যকরী ঔষধ দিতে পারা যায় তাহলে তার ঘরের ধন ঘরেই থাকে, দৈন্য বাড়ে না এবং তার ফলে তার দারুণ অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন হতে পারে। আধুনিক যুগের যাবতীয় ঔষধ রাসায়নিকের কারখানায় তৈরী, কিন্তু এ দেশে বেশীর ভাগ ঔষধই বৈদেশিক আমদানী বলে এই অভাবগ্রস্ত দেশের অভাব কমা দূরের কথা, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেশে যে সকল রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাতে করে ভরসা হয়, একদা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে; কিন্তু এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে আরও নূতন নূতন প্রচেষ্টার। ভারতবর্ষের মধ্যে পেট্রোলের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উৎস নাই, অথচ ঐটীর চাহিদা তো আমাদের দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা আপাততঃ এই পরম প্রয়োজনীয় পদার্থটী বিদেশ থেকে আমদানী-শুল্ক দিয়েও হয়তো সস্তাতেই পেয়ে থাকি। যে দেশ স্বভাবতই ঐরূপ কোন বস্তু হতে বঞ্চিত তাকে অবশ্য কোন বিদেশের উপর এজন্য নির্ভর করতে হবে। কিন্তু পরিণামদর্শী জাতি তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য কখনও পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না, কারণ তাকে বিপদে পড়তে হতে পারে। যেমন, সেদিন জাতিসঙ্ঘ এই পেট্রল নিয়ে ইটালীকে একটু শিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। জার্ম্মানীতেও কোন পেট্রল উৎস নাই, কিন্তু কয়লা প্রচুর পরিমাণেই তার খনিগুলিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য এই, জার্ম্মান জাতি এই কয়লার সাহায্যেই এক নূতন পেট্রল সৃষ্টি করেছে। এ দেশের কয়লা কি কোন দিন এই দৈন্য দূর করতে আমাদের সাহায্য করবে না? জানি না এই নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ জাতির মধ্যে একরূপ প্রেরণা কোন দিন জাগবে কি না!

কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি আমাদেরকে এই সব কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদেরকে তেমনভাবে তৈরী করে তুলছে না। এই শিক্ষার সংস্কার হওয়া খুবই দরকার কিন্তু উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয়কে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে এজন্য দায়ী করা চলে না। এর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন। আমাদের প্রধানতঃ অভাব সেইগুলির। শিক্ষার জন্য যে দেশ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে পারে না—তার দৈন্য চিরকালের। আমরা কতদিনে এই সব নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারব জানি না; তবে আমার মনে হয়, এই অভাব অন্ততঃ আংশিকভাবেও বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে সাধিত হতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল বিরাট প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছি তার জন্য অবশ্য এই অল্প শিক্ষা যথেষ্ট নয়, আর সেগুলি গড়ে তোলাও অল্প অর্থের কাজ নয়; তবে ব্যবহারিক রসায়নের অল্প শিক্ষার দ্বারাও অর্থকরী ব্যবসায় বেশ চালাতে পারা যায়। এই বার এই ধরণের দু-একটী প্রতিষ্ঠানের কথা বলব।

অল্পকাল পূর্ব্বে সরকারী শিল্পবিভাগ থেকে চেষ্টা চলেছিল দেশের কর্ম্মঠ যুবকদের মধ্যে অর্থকরী শিক্ষার প্রসার দ্বারা বেকার সমস্যার কতক পরিমাণে সমাধান করার। তাঁদের চেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তার সঠিক সংবাদ আমার জানা নাই। তবে বরাবর মনে হয়েছে যে, শিল্পবিভাগের এই প্রচেষ্টা যেন ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে শিল্পবিভাগের ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ থাকা এই হিসাবে প্রয়োজন ছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র বেরিয়ে এসে বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে মাত্র। যদি তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে এই শিল্প শিক্ষা কিছু কিছু দেওয়া হত, তা'হলে আজ তারা কলেজী গণ্ডি পার হয়ে এসে ভুবনভরা কেবল সর্ষের ফুল ফুটে থাকা দেখত না এবং সরকারও অল্পতর ব্যয় দ্বারা তাঁদের এই মহৎ উদ্দেশ্যে অধিকতর সাফল্যলাভ করতে পারতেন, সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে সরকারী শিল্পবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগ একত্রে যুক্ত করে একটা অভিনব ব্যবস্থার আয়োজন করতে পারলে আমাদের এই আটপৌরে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যে অভাব রয়েছে, তা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হ'তে পারে। আমি এই বিশেষ বিষয়টার সম্বন্ধে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নূতন চেষ্টার প্রয়োজন দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকতর চিন্তামূলক, কিন্তু ছেলেদেরকে সত্যিকারের শিল্পী ক'রে তুলতে হ'লে, তাদের জন্য এবিষয়ে কেবলমাত্র পরীক্ষামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব সরকারী শিক্ষায়তনগুলি যদি তাঁদের বি-এস-সি শ্রেণীর সঙ্গে এই বিভাগটি যোগ করতে পারেন—তাহলে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রভূত পরিমাণে সহায়তা হতে পারে। মাত্র এক বৎসর কাল একটা বিশেষ বিষয়ের শিক্ষায় ছাত্রেরা পারদর্শিতা লাভ করতে পারলে যথেষ্ট কাজ করতে পারবে।

আমি বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করলাম না, প্রধানতঃ এই কারণে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় যে ব্যয়ভার শিক্ষায়তনের উপর পড়তে পারে, তা বহন করবার সামর্থ্য হয়তো তাদের অনেকেরই হবে না। কারণ সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই এই সকল শিক্ষালয়গুলির নাই। এই শিল্পবিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সহজেই শেখান যেতে পারে।

দেশে নানাবিধ প্রসাধন-সামগ্রীর চাহিদা অত্যন্ত অধিক। স্নো, ক্রীম, এসেন্স প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামেও এই সব প্রসাধন-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে কাটে। এগুলি ছোট ছোট কেন্দ্রে অল্প পুঁজি দ্বারা সহজেই প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু যথোচিত শিক্ষার অভাবেই এগুলি তৈরী করা হচ্ছে না। বর্তমানে যদি বা দু'একটী নবীন যুবকের প্রচেষ্টায় নূতন কারখানার আবির্ভাব হয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উৎকৃষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করতে না পারায় অর্দ্ধপথেই তাদের অনেককেই ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু যদি এসব জিনিস নিয়ে তাকে কিছুদিন রীতিমত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তখন আর এই ভাবে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে তাকে বিফল হয়ে বিদায় নিতে হবে না। এই সঙ্গে কালি তৈরী করা, জুতার পলিশ অথবা অল্প আয়তনে কাপড়কাচা সাবান, এমন কি গায়-মাখা সাবানও তৈরী করা শেখান যেতে পারে। এসব কাজ সত্যই খুব কঠিন নয়। সাবধানী যুবক এ কাজের জন্য সহজেই উপযুক্ত হতে পারবে।

রসায়ন শ্রেণীর ছাত্রদের যে সাধারণ পরীক্ষা করতে হয়, তার উপর তারা সহজেই রক্ত এবং মূত্রের পরীক্ষাও করতে পারে। এই পরীক্ষা রাসায়নিক উপায়েই হয়, তবে আংশিকভাবে অণুবীক্ষণের সাহায্যও প্রয়োজন। Physiology department এর সামান্য সহযোগিতা পেলে এই শিক্ষা রসায়ন পরীক্ষাগারেই সুচারুরূপে হতে পারে। শিক্ষার পর তাদের কাজ পেতে যে আর অসুবিধা হবে না, তা আর উল্লেখ করবার প্রয়োজন নাই। এই সঙ্গে, যদি ডিসটিল্ড ওয়াটার প্রভৃতি নিয়ত প্রয়োজনীয় পদার্থ তারা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে, তাও বোধ হয় বেশ চলতে পারে। কলকাতার বিভিন্ন ডাক্তারখানায় ও যাবতীয় হাসপাতালে, ডাক্তারের লিখিত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করা, অতি সহজ কাজ। পূর্বোক্ত শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষাও সহজে আয়ত্ত করতে পারবে, আর তারা এসব জায়গায় নিযুক্ত হলে ঔষধ প্রস্তুতের কাজ যে অধিকতর সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে সে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

দুধের ব্যবসা আমাদের দেশে তেমনি অর্থকরী হয় না, কারণ দুধ থেকে আরও অন্য জিনিস তৈরী করতে না পারলে, ও ব্যবসা ভাল চলে না। প্রত্যহ সমুদয় দুধটুকু বিক্রয় করা সম্ভবপর হয় না, অথচ কি উপায়ে দুধ থেকে তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলিকে পৃথক করতে পারা যায় তা সব গোয়ালা জানে না। দুধের কারবার অবশ্য একটা বড় ব্যবসা, কিন্তু ক্ষুদ্র আয়তনেও এ ব্যবসা চলতে পারে। তার জন্য দুধ থেকে মাখন, পনির প্রভৃতি তৈরী করা জানা চাই। এমন কি জলীয় দ্রবণে যে মিল্ক-সুগার বর্তমান, তাকেও না ফেলে আহরণ করতে হবে।

এ সব ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু সে সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পরন্তু ব্যবহারিক রসায়নের এই দিকটার উল্লেখ দ্বারা আমি পাঠকদের মনে এই কথাটাই জাগাতে চেয়েছি যে, রসায়নের এই বিভাগের উপযুক্ত আলোচনার ফলে আমাদের দারুণ বেকার-সমস্যার অন্তত আংশিক সমাধান হতে পারে।

আধুনিক আল্‌কিমিয়া

কামাল উদ্‌দীন

কিমিয়া শাস্ত্র আজকাল কবি-কল্পনার বিষয় হইলেও এককালে ইহার দিন ছিল। বলিতে কি, এই এক মৌলিক বস্তুকে অপর মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টাতেই রসায়ন শাস্ত্রের জন্মলাভের যে কিম্বদন্তি আমাদের সকলেরই জানা আছে, তাহার অনেকখানিই সত্য। আরব মুসলমানগণ ছিলেন এ পথে অগ্রণী। তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া প্রচুর লাভবান হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে নূতন নূতন দ্রব্য ও দ্রব্যগুণের পরিচয় লাভ করেন, এবং এভাবে আজিকার বিপুলবপু রসায়ন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। প্রফেসার পীকক্‌ "ইসলামিক রিভিউ"তে এবং প্রফেসার কুদরত-ই খোদা কলিকাতা মুসলিম সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর মৌলিক রূপান্তর উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের হাতে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ, মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের স্বরূপ তখন তাঁহাদের জানা ছিল না; তাঁহাদের এবং প্রিষ্টলী পর্যন্ত পরবর্তী সব বৈজ্ঞানিকের মূল ধারণাই ছিল ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর লেভোসিয়ে কি উপায়ে যে 'আব্‌ আতশ্‌-খাক্‌-বাত্‌'মতের অকাট্যরূপে খণ্ডন করিলেন, তাহার বিবরণ 'বুলবুলে' প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আছে।[1]

মাত্র ১৯১৯ ইংরেজীতে লর্ড রাদারফোর্ড এক নব স্পর্শমণির আবিষ্কার করেন। ইহার প্রক্রিয়া বুঝিতে হইলে বস্তু সম্পর্কে আমাদের কয়েকটী বিশিষ্ট তথ্য জানা থাকা প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত আমরা মোট ৯০টী প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থের নির্ভুল পরিচয় পাইয়াছি, আরও অন্ততঃ দুইটার পরিচয় লাভের আশা রাখি। কেন?

মনে করা যাক, এক স্কুলে একশো'র কাছাকাছি ছাত্র আছে, এবং সেই পাড়ার এমনই গুণ যে, ছাত্রদের দৈর্ঘ্যক্রমে লাইন বন্দী করিলে দেখা যায়, একদিক হইতে গণনা করিতে থাকিলে ৮৪ নম্বর ও তৎপরবর্তী ছাত্রটার মধ্যে যে তারতম্য তাহা অন্য যে কোন নিকটতম দুইটা ছাত্রের তারতম্যের দ্বিগুণ, অর্থাৎ দুই নম্বর ছাত্রটা যদি এক নম্বরের চাইতে চার ইঞ্চি অধিক লম্বা হয়, আর এ নিয়ম অন্য সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, তবে ৮৫ নম্বর ছাত্রটীও ৮৪ নম্বর ও তৎপরবর্তী ছাত্রের দৈর্ঘ্যে ঠিক আট ইঞ্চির তারতম্য রহিয়াছে, তবে একথা মনে করাই সমীচীন যে ৮৫ নম্বর ছাত্রটী অনুপস্থিত এবং ৮৪ নম্বরের পরবর্তী ছাত্রটা ৮৬ নম্বর ছাত্র বই নয়। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরিচিত সমস্ত মৌলিক পদার্থ এভাবে ওজন-ক্রমে সাজাইতে বসিয়া দেখিলেন যে সাধারণতঃ ওজনের তারতম্যের সাথে সাথে এসব বস্তুর গুণাগুণ এই বিদ্যুৎ শক্তি-সঞ্চয়েরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব বৈজ্ঞানিক তাঁহার সমস্ত ছাত্রদের ওজন ও গায়ের জোরের অনুপাতে সাত লাইন ও আট স্তম্ভে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। হাইড্রোজেনের ওজনের তুলনায় কার্বনের ওজন বারো, নাইট্রোজেনের ওজন চৌদ্দ এবং অক্সিজেনের ওজন ষোল; অতএব এই তিন বস্তুর মধ্যে অন্য কোন বস্তু না থাকায়, আমরা ইহাদের পরপর সাজাইতে পারি ঃ --

C N O

বিদ্যুৎ-সঞ্চয়ের অনুপাতে নম্বর দিয়া গেলে উহারা ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম স্থানের অধিকারী। কিন্তু কার্বন ও সিলিকনের, নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের এবং অক্সিজেন ও সাল্‌ফারের বিদ্যুৎ-সঞ্চয় পরস্পর সমান। আবার ইহাদের প্রত্যেক দুইটার মধ্যেই আটটা করিয়া স্থান অন্যান্য মৌলিক পদার্থ-দ্বারা অধিকৃত। সুতরাং সিলিকন, ফস্‌ফরাস্‌ ও সালফারকে যথাক্রমে কার্বন, নাইট্রোজেন্‌ ও অক্সিজেনের সাথে একই স্তম্ভে স্থানদান করিয়া আমাদের ফর্দ্দ নিম্নের আকারে দাঁড়ায় ঃ --

C_6 N_7 O_8

Si_{14} P_{15} S_{16}

এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক মোট ৯২টী স্থান আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেল ৯০টী। ৮৫ ও

---

[1] বুল্‌বুল্‌ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

৮৭ নম্বর স্থান খালি পড়িয়া রহিল। বস্তুর নম্বর নির্ণয়ের প্রথা এত সুনির্দ্দিষ্ট যে তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা এতটুকুও নাই। অতএব দুইটা বস্তুর পরিচয় না পাওয়া সত্ত্বেও সেই দুই বস্তুর স্থান এবং মোটামুটি দোষ-গুণ নির্ণয়ে, বা মোট বস্তুসংখ্যা নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিকের একটুও ইতস্ততঃ নাই। ৯২টার অধিক মৌলিক বস্তু আছে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে "না" বলিবার একমাত্র কারণ অবশ্য এই যে আজ পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীতে এর অধিক নম্বরের কোন মৌলিক বস্তুর সন্ধান পাই নাই। আমাদের পরিচিত সংখ্যাতীত যৌগিক পদার্থের সব গুলিই এই ৯০টা মৌলিক পদার্থের কোন-না-কোনটার সংযোগফল। শ্রীযুক্ত নর্‌লিকার (V. V. Narliker) অবশ্য আঁক কষিয়া সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে ৯২টার অধিক মৌলিক বস্তু ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। প্রমাণের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও, যে সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সব তথ্য সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। অতএব কেহ যদি আর একটা নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, তবে বৈজ্ঞানিক তৎক্ষণাৎ আমাদের লিষ্টিতে সে দ্রব্যের স্থান নির্ণয়ে বসিয়া যাইবেন।

আমাদের আরও জানা আছে যে একই মৌলিক বস্তুর কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন ওজন থাকা সম্ভবপর। উদাহরণতঃ আমরা ষোল, সতেরো ও আঠারো ওজনের তিন প্রকার অক্সিজেনের পরিচয় রাখি। তবে এ তিনটা অক্সিজেনকে তিনটা ভিন্নবস্তু কেন বলা হয় না? কারণ আগেই বলা হইয়াছে যে বস্তুর গুণাগুণ নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহার বিদ্যুৎ-সঞ্চয়ের উপর। বিদ্যুৎসঞ্চয়ক্রমে এই তিনটা অক্সিজেনই একই আট-নম্বর স্থানের অধিকারী। ইহারা বৈজ্ঞানিক যমজ ভাই-বোন; দেখিতে ইহারা একই প্রকার এবং কার্য্যতঃ একই গুণাগুণের অধিকারী। কিভাবে এ ব্যাপার সম্ভব হইল, তাহা বস্তুর উপাদান ও গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

বিদ্যুৎকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, আমরা ইহার দুই বিপরীত গুণের সাক্ষাৎ পাই। এক প্রকার বিদ্যুৎ অন্যপ্রকার বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, কিন্তু স্বপ্রকার বিদ্যুৎকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ যে যে বিদ্যুতের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ অনুভূত হয় তাহারা স্বজাতীয়, এবং যাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহারা ভিন্ন জাতীয়। এই দুই জাতির একটীকে ধনাত্মক বলিলে, অপরটিকে ঋণাত্মক বলা হয়। প্রয়োজনের খাতিরে ইহাদের কাহাকে ধনাত্মক ও কাহাকে ঋণাত্মক বলা হইবে তাহা বিদ্যুৎশাস্ত্রচর্চ্চার প্রারম্ভেই স্থির করা হইয়া গিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত আমরা সে শ্রেণীবিভাগ মানিয়া চলি। আমাদের পজিট্রন হইল ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা এবং ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা—এই অর্থে যে ইহাদের অপেক্ষা অল্প বিদ্যুৎ-সমাহার আর কোথাও দেখা যায় নাই। বিদ্যুৎ-সমষ্টিতে ইহারা সমান এবং অন্য সব বিদ্যুৎ-সমষ্টিই ইহাদের বিভিন্ন সংখ্যায় মিলন-ফল। ইহাদের ওজন সচরাচর ধরা হয় না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের, তথা বিদ্যুৎশক্তির নির্দ্ধারিত ওজন আছে, যদিও তাহা যৎসামান্য এবং বিদ্যুৎকণার গতির উপর তাহার পরিমাণ নির্ভর করে। আর একটা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বস্তুকণা আছে, তাহার নাম নিউট্রন্; ওজনে ইহা হাইড্রোজেন-কোষ বা প্রটনের প্রায় সমান। সম্প্রতি আরও একটি বস্তুকণার খবর পাওয়া গিয়াছে, যদিও নির্ভুল প্রমাণে ইহাকে আজও যাচাই করা হয় নাই। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "নিউট্রিনো।" ওজন ইহার ইলেক্ট্রন্ বা পজিট্রনেরি কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রায় ৮.৯৯৯×১০[illegible] গ্রাম্। প্রটন অবশ্য আমাদের জানা জিনিষ, ইহার ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চয় পজিট্রনের সমান এবং ওজন হাইড্রোজেন্ পরমাণুর প্রায় সমান।

পজিট্রন বা ইলেক্ট্রনের বিদ্যুৎ সঞ্চয়কে বিদ্যুতের একক এবং নিউট্রনের ওজনকে ওজনের একক ধরিয়া আমরা কল্পনায় বস্তু নিম্মানে বসিয়া যাইতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান ধারণা অনুসারে প্রত্যেক পরমাণু একটা কোষ ও তাহার বাহিরে বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার পথে ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রন্-সমষ্টিতে গঠিত। বাহিরের এই ইলেক্ট্রন্ সংখ্যা নির্ভর করে কোষ সঞ্চিত ধন-বিদ্যুৎ-সমষ্টির উপর। ধরা যাক্, হাইড্রোজেন্ পরমাণুর কথা। ইহার কোষে একটা প্রটন্ আছে, এবং আমরা জানি যে প্রটনের ওজন এক ও ধন-বিদ্যুৎ-সমষ্টি এক। অতএব এই ধন-বিদ্যুতের আকর্ষণে একটী ইলেক্ট্রন হাইড্রোজেন-কোষের চারিদিকে বৃত্তাকারে বন্‌বন্ ঘুরিতেছে। এই কোষ বহির্ভূত ইলেক্ট্রন-সংখ্যা আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বস্তুর নম্বরের সমান। অতএব হাইড্রোজেন ওজনে একক ও এক নম্বর বস্তু। দুই-ওজনের বস্তু তৈরি করিতে হইলে আমরা একটী প্রটন্ ও একটী নিউট্রনে কোষ গড়িয়া তাহার বাহিরে একটী ইলেক্ট্রন্ ছাড়িয়া দিতে পারি। ইলেক্ট্রনটা কোষের চারিদিকে বৃত্তাকারে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে থাকিবে। এই বস্তুটী ওজনে দুই হইলেও নম্বর একই রহিল; অতএব ইহা ভিন্ন বস্তু নহে, হাইড্রোজেনেরই যমজ ভাই। ইহার কোষের নাম deuton বা diplon। নিউট্রন্, পজিট্রন্ ও ডাইপ্লন্ অধুনা আবিষ্কৃত জিনিষ। ইহাদের আবিষ্কার-কাহিনী 'বুলবুল' সম্পাদকের কাছে লেখা আমার চিঠিতে সংক্ষেপে আছে।*

---

* বুলবুল ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা।

এইবার দুই নম্বর বস্তু গড়িতে বসা যাক্। ইহা আমাদের পরিচিত হিলিয়াম্- একটী নিষ্কর্ম্মা বায়বীয় পদার্থ, ওজনে হাইড্রোজেনের চারিগুণ। অতএব ইহার কোষের ওজন চার ও ধনবিদ্যুৎ-সঞ্চয় দুই; এবং বাহিরের ইলেক্ট্রন্ সংখ্যাও দুই। এই কোষটাকে বলা হয় আল্‌ফা-কণা। এই কণাটী এত শক্ত যে ইহার আঘাতে অন্যান্য পরমাণু ভাঙ্গিয়া গেলেও ইহার কোন বিকৃতি ঘটে না। এই আল্‌ফা-কণা, নিউট্রন্ ও প্রটন্ সমবায়েই অন্যসব পরমাণু-কোষ গঠিত। কার্ব্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের উদাহরণ লইলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। কার্ব্বনের ওজন সাধারণতঃ বারো এবং নম্বর ছয়। অতএব তিনটী আল্‌ফা কণা একত্রে জুড়িয়া দিলেই কার্ব্বনের কোষ গড়া যায়; তখন ছয়টি ইলেক্ট্রন্ এই কোষ-সঞ্চিত ধন-বিদ্যুতের আকর্ষণে আসিয়া জুটিবে। নাইট্রোজেনের ওজন চৌদ্দ ও নম্বর সাত। তিনটী আল্‌ফা-কণা, একটী নিউট্রন ও একটী প্রটন্ মিলিয়া ইহার কোষ নির্ম্মিত হয়, এবং বাহিরে সাতটী ইলেক্ট্রন্ আসিয়া জোটে। এই ভাবে চারিটী আল্‌ফা-কণাসমষ্টিতে অক্সিজেন-কোষ তৈরি।

আমরা যেমন বসিয়া বসিয়া কল্পনায় পরমাণু নির্ম্মাণ করিতেছি, প্রকৃতি তেমনই কার্য্যক্ষেত্রে ভারী ভারী পরমাণু ভাঙ্গিয়া লঘুতর পরমাণুর জন্ম দিতেছেন। আমাদের পরিচিত সব চাইতে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম্, ইহার ওজন ২৩৮ ও নম্বর ৯২। ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী আল্‌ফা-কণা ছাড়িয়া অন্য এক বস্তু ইউরেনিয়াম্ XI-এ পরিণত হয়. এ কার্য্যে ইউরেনিয়ামের ওজন চার ও নম্বর দুই কমিয়া যাওয়ায় UXI-র ওজন হইল ২৩৪ এবং নম্বর ৯০। এভাবে রেডিয়াম্ ভাঙ্গিয়া রেডন, রেডিয়াম-এ, রেডিয়াম্-বি ইত্যাদিতে পর্য্যবসিত হইয়া ক্রমে সীসকে পরিণত হইতেছে। ইউরেনিয়াম রেডিয়ামে পরিণত হইতে লাগে মোটামুটী ছয়শো কোটী বছর, এবং রেডিয়াম্ সীসকে পরিণত হইতে লাগে ২,৩৩৩ বছরের কাছাকাছি।

এসব বস্তুকোষ হইতে পরিবর্ত্তন-কালে আরও দুই প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়,—তাহাদের নাম বিটা ও গামা। গামা রশ্মি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ আলোক-তরঙ্গের সমষ্টি। বিটা-রশ্মি ইলেক্ট্রনেরই ভিন্ন নাম। অতএব ইহা কোষ হইতে ঠিকরিয়া পড়িলে কোষের ধন-বিদ্যুৎ-সঞ্চয় এক বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ বস্তুর নম্বরও এক বাড়িয়া যায়। কোষ-মধ্যে ইলেক্ট্রন্ ইলেক্ট্রন্-হিসাবে থাকে কিনা, সে প্রশ্ন বিচারাধীন। কাহারও মতে জল ফুটাইলে যেমন বুদ্বুদের উদ্ভব হয়, অথচ বুদ্বুদ-হিসাবে ইহা জলে থাকে না, তেমনি অবস্থা-বিশেষে কোষ নিহিত শক্তি হইতেই সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের হঠাৎ উদ্ভব হয়। কিন্তু আমাদের আবহাওয়ায় পজিট্রনের আয়ুষ্কাল অত্যল্প—১০^{-*} সেকেণ্ডের কিছু কম—হাওয়ায় পজিট্রন্‌টী অতি শীঘ্র বাহিরের কোন মুক্ত ইলেক্ট্রনের সাথে মিশিয়া আলোকতরঙ্গে রূপায়িত হয়, এবং পূর্ব্বের ইলেক্ট্রন্‌টী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাতে ধরা পড়ে।

রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটিতে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে এ গুণবিশিষ্ট পরমাণু-সমূহের পরিবর্ত্তন-রীতি এক বিশিষ্ট আইন মানিয়া চলে, আমাদের হাতে এমন কোন অস্ত্র নাই যাহার সাহায্যে আমরা ইহার ব্যতিক্রম সাধন করিতে পারি। আমরা যদি একটী নির্দ্দিষ্ট ওজনের ইউরেনিয়াম্ লইয়া বসি, তবে তাহার কোন্ পরমাণুটী আগে ভাঙ্গিবে, কোন্‌টী পরে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু কত সময়ের মধ্যে মোট পরমাণু-সংখ্যার অর্দ্ধেক রূপান্তরিত হইবে, তাহা সঠিক ভাবে জানা যায়। অর্থাৎ এক সের ইউরেনিয়াম্ আধ সের হইতে যতদিন লাগে, বাকী আধসের একপোয়া হইতেও ঠিক ততদিন লাগিবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর এসময়ের পরিমাণ ও বিভিন্ন ঃ—ইউরেনিয়ামের বেলায় ইহা সাড়ে চারশো কোটী বছর, থোরিয়ামের বেলায় সাড়ে ষোল শো কোটী বছর এবং অ্যাক্‌টিনিয়ামের বেলা $\frac{১}{৫০০}$ মাত্র সেকেণ্ড।

বিভিন্ন রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্ বস্তু হইতে যে আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরিত হয় তাহার গতি এত তীব্র যে তৎসাহায্যে আমরা অন্যান্য অনেক পরমাণু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি। এ কৌশল অতি সোজা। মনে করা যাক্, একটী নাইট্রোজেন-পূর্ণ আবদ্ধ বাক্সে একটু রেডিয়াম বা অন্য সুবিধাজনক রেডিও-অ্যাক্‌টিভ বস্তু হইতে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত আল্‌ফা-কণা সমূহ নাইট্রোজেন-পরমাণুর উপর প্রবলবেগে পতিত হইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাহার কোষ হইতে প্রটন্ ছুঁড়িয়া দেয়। প্রত্যেকটী আল্‌ফা-কণাদ্বারা অবশ্য একার্য্য সাধন হয় না; সাধারণতঃ লাখে একটী মাত্র আল্‌ফা-কণাই কৃতকার্য্য হয়। নাইট্রোজেনের বেলায় লাখে দুইটী এবং এলুমিনিয়ামের বেলায় দশ-লাখে আটটী মাত্র আল্‌ফা-কণাকে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়। এ আল্‌ফাকণা এত জোরে পরমাণু-কোষে ঢুকিয়া পড়ে যে ইহা কোষের একেবারে অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যায়, আর বাহির হইতে পারে না। অতএব আক্রান্ত পরমাণুটীর ওজন ও বিদ্যুৎ দুইই বাড়িয়া তাহা এক নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। এভাবে কার্ব্বন ও অক্সিজেন-ভিন্ন পাঁচ হইতে উনিশ নম্বর পর্য্যন্ত সব কয়টি বস্তুকেই ভাঙ্গিয়া নূতন বস্তুতে পরিণত করিতে পারা গিয়াছে। পারা হইতে অত্যল্প পরিমাণে সোণা প্রস্তুতও

সম্ভব হইয়াছে। লঘুতর বস্তু সমূহ অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙ্গা যায়; আবার ইহাদের মধ্যে বিজোড় নম্বরের বস্তু ভাঙ্গা জোড় নম্বরের বস্তু ভাঙ্গার চাইতে সোজা। আল্‌ফা-কণা কিভাবে অন্য বস্তুর উপর আপতিত হয় এবং অন্য বস্তু কি ভাবে দুই টুকরা হইয়া দুই পথে ছুটিয়া পড়ে, এসব পরীক্ষা করিবার সুনির্দ্দিষ্ট নির্ভুল নিয়ম আজকাল বৈজ্ঞানিকের জানা আছে; ফটোগ্রাফীর সাহায্যে এসব প্রক্রিয়ার কাহিনী অবৈজ্ঞানিকের কাছেও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়।

আমেরিকানগণ পরমাণু ভাঙ্গিবার আর একটী নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রটন্, নিউট্রন্ বা ডাইপ্লন্ বৈদ্যুতিক শক্তি-সাহায্যে পরিচালিত করিয়া অন্য পরমাণুর উপর আপতিত করা হয়। ইহাতে স্থল-বিশেষে সেই পরমাণু ভাঙ্গিয়া নূতন পরমাণু গঠনও সম্ভবপর হইয়াছে। পূর্ব্বের উপায়ে যেসব বস্তু প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেগুলিকে স্থান দিতে আমাদের লিষ্টিতে কোন নূতন স্থান খুঁজিতে হয় নাই। কিন্তু এ উপায়ে দুইটী বস্তু প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহারা আমাদের নিকট অভিনব। এ কৃতকার্য্যতার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিকের শক্তি এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে তিনি এখন যে কোন পদার্থ তৈরির আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন। এতদিনে আল্‌কিমিয়া পন্থীদের স্বপ্নের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতার পূর্ব্বাভাষ দৃষ্টিগোচর হইল। ধরাপৃষ্ঠে স্বল্পকালও টিকিয়া থাকার উপযুক্ত যে কোন বস্তুই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যে সম্ভব, তাহাতে আমাদের সন্দেহের আর অবকাশ নাই। উপযুক্ত প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবিত হইলেই আমরা এখন বসিয়া বসিয়া নূতন নূতন মৌলিক পদার্থ তৈরি করিতে পারি।

গত জানুয়ারী মাসে যশস্বী কুরী-দম্পতির কন্যা কুরী ও তাঁহার স্বামী জোলিও কয়েকটী লঘু বস্তুর উপর বিশেষ অবস্থায় আল্‌ফা-কণা ছুঁড়িয়া দেখিলেন, তাহারা পূর্ব্বকথিত প্রটনের বদলে পজিট্রন্ উদ্‌গীরণ করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল, এ পজিট্রন উদ্‌গীরণ হইতেছে কোষকর্ত্তৃক আল্‌ফা-কণা অবরোধের কিছুক্ষণ পরে। তত্ত্বের দিক দিয়া এ ব্যাপারের বিশেষত্ব অনেকখানি। কৃত্রিম উপায়ে রেডিও-অ্যাকটিভ্ বস্তু তৈরির ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম কৃতকার্য্যতা। বরন্ (৫)-কোষের মধ্যে একটী আল্‌ফা-কণা ঢুকিয়া পড়িলে তাহা নাইট্রোজেনে (৭) রূপান্তরিত হয়। ইহা কিছুক্ষণ পরে পজিট্রন্ বিকীরণ করিয়া অন্য বস্তুতে পরিণত হয়। অতএব ইহাও এক প্রকার রেডিও-অ্যাকটিভ্ বস্তু হইল; এবং ইহার নাম হইল রেডিও নাইট্রোজেন। এভাবে ম্যাগ্নেসিয়াম (১২) হইতে রেডিও-সিলিকন্ (১৪) এবং এলুমিনিয়াম্ (১৩) হইতে রেডিও-ফস্‌ফরাস্ (১৫) কুরীই তাঁহার সহকর্ম্মী জোলিয়োর সাহায্যে প্রস্তুত করেন।

মাস দুই আগে একাজে আরও অগ্রসর হইতে গিয়া সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন ইতালীয়ান্ প্রফেসার ফার্মি। আমাদের পরিচিত সব চাইতে ভারী মৌলিক পদার্থ ৯২ নম্বর ইউরেনিয়াম্। ফার্মি ইউরেনিয়াম্-কোষের মধ্যে একটা নিউট্রন ছুঁড়িয়া দেখিলেন, তৎপরিবর্ত্তে একটী ইলেক্ট্রন্ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ইউরেনিয়ামের ওজন এক বাড়িয়া গেল এবং বিদ্যুৎ সঞ্চয় তথা -নম্বরও এক বাড়িয়া গেল। অতএব এ নূতন বস্তু হইল ৯৩ নম্বর,– আমাদের সম্পূর্ণ অজানা এক মৌলিক পদার্থ!

এভাবে তৈরির পূর্ব্বে প্রকৃতিতে আমরা ইহার কোন চিহ্নই দেখি নাই, দেখিবার আশা ও কার নাই। ইহার নামকরণ লইয়া এখনও তুমুল তর্ক চলিতেছে। কেহ বলিলেন ইহার নাম হোক্ ফার্ম্মিয়াম্, কেহ বলিলেন মুসোলিনিয়াম্। কেহ বলিলেন বিজ্ঞানের জয়, কেহ বলিলেন ফ্যাসিস্তির জয়! যা' হউক, এ নব আবিষ্কৃত পদার্থটীও রেডিও-অ্যাক্টিভ্। মোটামুটী ১৩ মিনিটের মধ্যে ইহার মোট পরমাণু-সংখ্যার অর্দ্ধেক রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ আয়ুষ্কাল প্রায় সাড়ে উনিশ মিনিট।

আমেরিকান্ পদ্ধতিতে প্রস্তুত দ্বিতীয় নব-বস্তুটী ৩.০১৫১ ওজনের হাইড্রোজেন। এক-ওজনের হাইড্রোজেন আমাদের লিষ্টির এক নম্বর বস্তু, দুই-ওজনের হাইড্রোজেন ও তাই। তিন ওজনের হাইড্রোজেন আছে কিনা তাহা লইয়া বচসার অন্ত নাই। নানা পরীক্ষাও চিন্তার পর এ বিভাগের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মী প্রফেসার আষ্টন্, ইহার সম্ভাবনার বিপক্ষে মত দিলেন। কিন্তু সেদিন ওলিফেন্ট, হার্টেক্ ও লর্ড রাদারফোর্ড (Proc. Roy. Soc. A. 144, 692, 1934) কৃত্রিম উপায়ে এ বস্তু তৈরির কাহিনী শুনাইয়া বিজ্ঞানজগতকে বিস্ময়াপ্লুত করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এই ঃ –

$$D^2 + D^2 - He^4 - H^1 + H^3$$
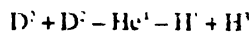
একটী ডাইপ্লন্ অপর একটী ডাইপ্লনের উপর ছুঁড়িয়া মারিলে দুইটী মিলিয়া স্বল্পক্ষণস্থায়ী এক চারি-ওজনের হিলিয়াম্-পরমাণুতে

পরিণত হয়। সে হিলিয়াম্-কণাটী তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া একটা এক-ওজনের এবং একটা তিন-ওজনের স্থায়ী হাইড্রোজেন পরমাণু গঠিত হয়।

সম্প্রতি বিজ্ঞান-জগতে যে বিপ্লব চলিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান মনোভাবের কতকটা পরিচয় রাখিতে হইবে। এখন প্রায় প্রতিমাসে বড়-ছোট এক-আধটী আবিষ্কারের খবর পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহাদের অধিকাংশই বস্তুকোষ সম্পর্কে। গত শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি আবিষ্কারের পূর্ব্বে বস্তুকোষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্প্রতি এদিকে আমাদের বিদ্যা অনেক বাড়িয়াছে ঃ—কোষের গঠন কি কি উপাদানে হইল, এক বস্তুর কোষ হইতে অপর বস্তুর কোষ কি কি ভাবে ভিন্ন এবং এক বস্তুকে অপর বস্তুতে রূপান্তরিত করিতে কোন প্রথা অবলম্বন সম্ভব,—এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজকাল আমরা দিতে পারি। ইহাতে শুধু নিচ্ছলা জ্ঞান যে বাড়িয়াছে তাহা নহে, প্রকৃতির শক্তি-সঞ্চয়ের এক বিপুল ভাণ্ডার আজ আমাদের চোখে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সুরক্ষিত দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য আমরা আজ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিতেছি। অবশ্য এতটুকু সোণা তৈরিতে আমাদের যে ব্যয় হইতেছে, তাহাতে হয়ত শতগুণ অধিক সোণা বাজারে পাওয়া যাইবে। কিন্তু বস্তুর রূপান্তরণের সমস্ত তথ্য আমরা যখন জানিয়া যাইব, ও তাহা ইচ্ছামত সাধন করিতে পারিব, তখন পরমাণুর অভ্যন্তরে সঞ্চিত বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বক্ষে বক্ষে রেল ষ্টীমার চালাইলেও আমাদের সঞ্চয়ের নগণ্য অংশমাত্র ব্যয়িত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়াম্ প্রস্তুত করা যদি সম্ভব হয়, তবে একসের হিলিয়াম প্রস্তুত করিতে যে শক্তি ছাড়া পাইবে তাহার সবটুকু ব্যবহার করিতে পারিলে ৫,৪০,০০০ মণ কয়লার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

মোহামেডান দলের শীল্ড বিজয়

এক একটা বিশেষ কারণে এক একটা বৎসর ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া থাকে। ১৯৩৬ সন ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বৎসরই প্রথম ভারতীয় দল কলিকাতা ফুটবল লীগ ও আই. এফ. এ. শীল্ড একসঙ্গে জয় করিল। জাতির জন্য এত বড় একটা গৌরব যাহারা বহিয়া আনিল তাদের কি বলিয়া আজ সম্বর্দ্ধনা জানাই!

মোহামেডান স্পোর্টিং আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করিয়াছে বলিয়াই যে ১৯৩৬ সন স্মরণীয় তা নয়, নানা কারণে এই বৎসরটি চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। নানাদিক দিয়া এইবার কলিকাতা ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের সিংহের ভাগ পাইবার অধিকারী মোহামেডান স্পোর্টিং। এইবার সিঙ্গাপুর রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন দলকে হারাইয়া চৈনিকদল কলিকাতা আসিয়াছিল। 'সামাদ' ও 'রশিদে'র অনুপস্থিতিতেও ভারতীয় দল ইহাদের সহিত সমান সমান খেলিয়াছে; পূর্ব্বএশিয়াজয়ী চীনাদল বার্লিনের এবারকার আন্তর্জ্জাতিক খেলায় গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে খুব ভাল খেলিয়াও মাত্র দুই গোলে হারিয়াছে। ইউরোপের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিলে ভবিষ্যতে তারা আরো ভাল খেলা দেখাইতে পারিবে। চৈনিক দলের খেলার ফলাফল হইতে একথাই প্রমাণিত হইল যে, আন্তর্জ্জাতিক ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে বিচার করিলে ভারতবর্ষ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির প্রায় সমকক্ষ।

ভারতীয় ফুটবল বলিলে তো এখন মোহামেডান স্পোর্টিংকেই বুঝাইবে। গত বৎসর সিংহলে মোহামেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে সিংহল সম্মিলিত দল 'টেষ্ট ম্যাচ' খেলিয়াছিলেন। প্রথমে আমরা সঙ্কোচ করিতেছিলাম। পরে ভাবিলাম দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমাদিগকে যেমন করিয়াই হোক সমগ্র ভারতবর্ষকে represent করিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। আজ সত্যি সে অধিকার একমাত্র আমাদের--মোহামেডান দলের।

বম্বে চ্যাম্পিয়ন ডারহাম মুসলিম দলের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে--রেঙ্গুন চ্যাম্পিয়নরা গতবার মোহামেডানদের নিকট ৫-০ গোলে হারিয়াছে। আই. এফ. এ.-জয়ী ইষ্ট ইয়র্কসকে হারাইয়া প্রিমিয়ার ইণ্ডিয়ান দল গতবার সুপ্রসিদ্ধ দ্বারভাঙ্গা শীল্ড জয় করিয়া আনিয়াছে। মোহামেডান স্পোর্টিং সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার একমাত্র অধিকারী -একথা আজ কে অস্বীকার করিবে?

আজ যা সত্যে পরিণত হইয়াছে মাত্র দশ বছর আগেও এ ছিল আমাদের নিকট স্বপ্ন। মোহামেডান দলের অন্যতম স্রষ্টা মিঃ এ. কে. আজিজ একদিন বলিতেছিলেন ঃ কি কারণে ভারতীয় দল লীগ বা শীল্ডে ভাল ফল করিতে পারে না? উত্তরে বলিয়াছিলাম ঃ ভারতীয়েরা অদৃষ্টবাদী--তারা বৈশিষ্ট্যবাদী। জল হোক, কাদা হোক, তারা খালি পায়ে মাঠে নামিবে। গোল খাইয়া, মার খাইয়া বাড়ী আসিবে তবু বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য ছাড়িবে না। বাঙ্গালী দল আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। রোদ হয়, ভাল। বৃষ্টি হয়, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। কে একজন একবার দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন ঃ কাল বৃষ্টি, পলাশীর যুদ্ধে বৃষ্টির জন্যে বাঙ্গালী হারিয়া গেল--এই বৃষ্টিরই জন্যে মোহনবাগানেরও বার বার পরাজয় হইল। কিন্তু শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি না হইয়া যে কি হইবে--তা ভাবিয়া পাই না। সেই দিনই স্থির হইল খেলোয়াড়দের বুট পরাইয়া মাঠে নামাইতে হইবে। অনেক গবেষণার পর নূতন বুট তৈরী হইল--পাতলা হালকা বুট। খেলার মাঠে মোহামেডান দলের বিজয়ের ভিত্তিপত্তনও হয়ত সেই দিন হইতে।

মোহামেডান দল খেলার মাঠে শুধু শীল্ড জয় করে নাই। প্রকৃতিকেও তারা জয় করিয়াছে। ভারি মাঠে ভারতীয় দলের নিকট সৈনিকদলের পরাজয় ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। মোহামেডান দলের অনুকরণে ছোট বড় সব ভারতীয় দলই আজকাল বুট পায়ে দেওয়া অভ্যাস করিয়াছেন।

যে বার আমরা বোভার্স খেলিতে যাই সেবারই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর মুসলিম দল গঠিত হয়। তারপর গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় মোহামেডান দল সত্যই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা এ কয় বৎসর আজিকার চ্যাম্পিয়ন দলের উন্নতির পথে পাথেয় জোগাইয়াছেন গৌরবের দিনে তাদের সকলকে স্মরণ করি।

মোহামেডান দলের এবারকার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল টিম কেমন করিয়া শীল্ড জয় করিল এ অনেকের নিকটই রহস্যের মত থাকিয়া যাইবে। রশিদ, রহমত ও বিশেষ করিয়া সামাদের মত 'জায়ান্ট'রা যাহা করিতে পারে নাই, সাবু, খোকা রশিদ, রহিম, 'বেবি' আব্বাস ও বাচ্চি খাঁর মত বাচ্চা খেলোয়াড়রাই তাহা সম্ভব করিল। সাহস, ইচ্ছাশক্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বাচ্চারাই যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবারে তাহাই নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল। ১৯১১ সনে শিব ভাদুড়ীর ক্ষিপ্র গতি, অভিলাষ ঘোষের ''উইনিং স্কোর''-এ সবের কথা ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। ১৯৩৬-এর তিন দিন ফাইনাল, রশিদ রহিমের গোল, আব্বাসের সেণ্টার, নূর মোহাম্মদ ও শফির ডিফেন্স এসবও এবার হইতে ইতিহাসের অন্তর্গত হইল। মোহামেডান দলের ভূতপূর্ব্ব ক্যাপ্টেন হিসাবে আজিকার ইতিহাস-স্রষ্টাদিগকে তস্‌লিম জানাই।

মোহামেডান জিন্দাবাদ

জীবনে যে একবার ইতিহাস সৃষ্টি করে সে অভিনন্দনের যোগ্য। নিত্য নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যারা, সকল প্রশংসা সকল অভিনন্দনের ঊর্দ্ধে তাহাদের স্থান। চতুর্থবার লীগ বিজয়ী মোহামেডান দলকে কি বলিয়া আজ অভিনন্দন জানাইব: নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় যখন, এমনি করিয়াই সে চলে — জাতির জীবনে জলতরঙ্গ যখন জাগিয়া ওঠে, এমনি দুর্ব্বার হয় তার গতি। নিন্দা প্রশংসার অপেক্ষা সে রাখে না তখন। একবার মাত্র লীগ জয় করাও ছিল ভারতীয়দের জন্য অসম্ভব। সেই অসম্ভব আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। চার চারবার লীগ জয়, যাহা ছিল ইংরেজ বাঙ্গালী সকলেরই জন্য কল্পনার ব্যাপার, তাহাই হইয়াছে আজ বাস্তব। অসম্ভবকে যে করে সম্ভব, কল্পনাকে যে পরিণত করে বাস্তবে, সেই হয় ইতিহাসে স্মরণীয়।

প্রীতিভাজন আব্বাস মির্জ্জা ও তার সঙ্গীরা সত্যই আজ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্য নূতন গৌরব বহন করিয়া আনিল। আব্বাস, রহিম, মাসুম, জুম্মা খাঁ, রশিদ, ওসমান, শফি, নূর মোহাম্মদ, সলিম, সাবু, শমশের - ইতিহাস সহজে এদের ভুলিতে পারিবে না। এই সেদিনও যারা ছিল 'বেইব' তারাই --- সেই খোকারাই, এতগুলি জায়ান্টকে আজ পর্য্যুদস্ত করিল।

খেলাধূলা খেলাধূলাই। লীগ বিজয়ী আব্বাস বা রহিম মীরকাসিম বা টিপুসুলতানের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদের আজিকার জয়লাভে পলাশী বা মহীশূরের ক্ষতিপূরণ হয়ত হইবে না। কিন্তু খেলার মাঠের এই জয়লাভে জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে, কে তাহা অস্বীকার করে।

মোহামেডান দল জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্য গৌরব বহিয়া আনিয়াছে, আজ বিশেষ করিয়া আমাদের আনন্দ এই জন্য। ভবিষ্যতে দেশের ইতিহাসে সৃষ্টির ব্যাপারে এমনি করিয়াই মুসলমান সমাজ সিংহের ভাগ গ্রহণ করিবে, আশা করা যায়।

কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার আমদানি হয় বলা আজ সম্ভব নয়। যতদূর জানা যায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে প্রথম ফুটবল খেলা হয়। খেলাটি হইয়াছিল দুইটি ইংরেজ সৈন্যদলের মধ্যে। এর পর ভারতের দিকে দিকে ফুটবল খেলা ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ট্রেডস্ ক্লাব (এখনকার ডালহৌসী) স্থাপিত হয়। এর কয়েক বৎসর পরই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন সৈনিক দলগুলিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য একটি প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি হয়। এই ভাবেই হইয়াছিল সুপ্রসিদ্ধ আই. এফ. এ. শিল্ড প্রতিযোগিতার সূচনা। কলিকাতা লীগের জন্ম হয় আরো দশ বৎসর পরে। ১৮৯৮ সনে মেসার্স ওয়াল্টার লক কোম্পানী হইতে একটি কাপ কিনিয়া লীগ খেলা শুরু হয়। এইটিই সুপ্রসিদ্ধ ফার্ষ্ট ডিবিশন লীগ কাপ।

এদেশে ফুটবলের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়েরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হন। মিঃ এন সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় শোভাবাজার ক্লাব নাম দিয়া সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী ক্লাব গড়িয়া ওঠে। তারপর গড়িয়া উঠে ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল, ন্যাশনাল, হেয়ার স্পোর্টিং, মোহামেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান, চুঁচুড়া স্পোর্টিং প্রভৃতি দল। এই সকল ভারতীয় দল নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, গোরাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ম্যাচ খেলিত। কিন্তু আই. এফ. এ. শিল্ড বা লীগ জয় করিবার সৌভাগ্য এদের কখনো হয় নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম শিল্ড জয়ের গৌরব লাভ করে। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একটি মাত্র বৎসর ১৯১১! একটানা পরাজয়ের মাঝখানে একটি মাত্র বিজয় — মরুভূমির মাঝখানে ওয়েসিস। এর কাহিনী অতীতের স্মৃতিস্বপ্নেই পর্য্যাসিত হইয়াছিল। তারপর আবার কেবলই একটানা

পরাজয়ের ইতিহাস। ভারতীয় দলগুলির এই দীর্ঘকালের পরাজয়ের কালিমা মোচন করিয়াছে মোহামেডান স্পোর্টিং। শুধু কলঙ্ক স্খালন নয় — ১৯৩৬ সনে শিল্ড এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ পর্যন্ত লীগ জয় করিয়া এরা খ্যাতনামা সামরিক অসামরিক দলগুলির অর্দ্ধশতাব্দীর অর্জ্জিত গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। খেলার মাঠে নূতন করিয়া এই যে ইতিহাস রচনা — যুগে যুগে ভারতবাসী এইজন্য মোহামেডান দলকে স্মরণ করিবে।

মোহামেডান স্পোর্টিং-এর এই যে জয়লাভ, শুধু খেলার মাঠেই নয়, এ হইতে জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে নূতন আশা ও বিরাট সম্ভাবনার সূচনা হইয়াছে। প্রতি রক্তবিন্দুতে ভারতবাসী অনুভব করিতেছে দুনিয়ার শক্তিমান জাতিসমূহের তুলনায় হীন নয় তারা।

লীগ ও শিল্ড বিজয়ী মোহামেডান দলের গৌরব আজ বাঙ্গলার সীমারেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় এই দল গড়িয়া ওঠে। সৃষ্টি হইতে বাঙ্গলার নেতৃস্থানীয় অনেকেরই সঙ্গে ছিল এর সংযোগ। ১৯১১ সনের আগে মোহামেডান স্পোর্টিং তিনবার ১৯০২, ১৯০৬, ১৯০৯ - কুচবিহার কাপ জয় করে। ন্যাশনাল ও মোহনবাগান যখন গৌরবের উচ্চতম শিখরে, তখনো মোহামেডান দলের সঙ্গে বহুবার এদের শক্তি পরীক্ষা হইয়াছে। অনেক বার ভবিষ্যতের শিল্ড বিজয়ীরা মুসলিম দলের নিকট হার মানিয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত মোহামেডান দলের ফুটবল ইতিহাসে আঁধার যুগ। এ যুগে ক্লাবের খেলোয়াড়রা ফুটবল ছাড়িয়া হকি ক্রিকেটে মন দেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মোহামেডান স্পোর্টিং ট্রেডস কাপে ফাইনালে উঠিয়া পর বৎসর দ্বিতীয় বিভাগ লীগে খেলিবার অধিকার পান। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে উঠিবার জন্য সত্যিকারের সাধনা আরম্ভ হয়। মাত্র তিন বৎসরের চেষ্টায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মোহামেডান দল দ্বিতীয় বিভাগ লীগ জয় করেন। এর পরের ইতিহাস একটানা বিজয় ও রেকর্ড সৃষ্টির ইতিহাস।

গত চারি বৎসরে মোহামেডান স্পোর্টিং যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে তার চেয়ে বৃহত্তর কীর্ত্তি আর কেহ অর্জ্জন করিয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। চার বৎসর পর পর লীগ জয় করিয়া দেশী বিদেশী সামরিক অসামরিক সকল দলের রেকর্ড এরা ভঙ্গ করিয়াছে। আই. এফ. এ. শিল্ড এদের করায়ত্ত হইয়াছে। রেঙ্গুন লীগ বিজয়ীদের এরা পাঁচ গোলে হারাইয়াছে। নিখিল ভারত দ্বারভাঙ্গা শিল্ড পাইয়াছে; সিংহলের সম্মিলিত দলের সঙ্গে ভারতের হইয়া টেষ্ট ম্যাচ খেলিয়াছে। এতবড় গৌরব ভারতীয় ফুটবলে অদূর ভবিষ্যতে আর কেহ কখনো অর্জ্জন করিতে পারিবে কিনা কে জানে।

এই অসম্ভব কেমন করিয়া সম্ভব হইল? খেলার মাঠে অনুগ্রহ নাই, অনুকম্পা নাই, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নাই আসন সংরক্ষণ নাই। আছে শুধু প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তা ছাড়া, মুসলমান বলিয়া সুবিধার পরিবর্ত্তে বিশেষ বাধারই সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ইহাদের পদে পদে। তা সত্ত্বেও অন্যেরা পঁচিশ বৎসরে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই এত অল্প সময়ে এরা তা কেমন করিয়া সম্ভব করিল? 'বাঙ্গালী মাদ্রাজী মস্তিষ্ক এবং পাঞ্জাবী পেশোয়ারী দেহের সমন্বয়ে মোহামেডান দল গঠিত। বাঙ্গলা ও মাদ্রাজের বুদ্ধি, পাঞ্জাবের তেজ ও ক্ষিপ্রগতি, পেশোয়ারের সাহস -- এর সম্মিলনে যে অপরাজেয় শক্তির সৃষ্টি হইতে পারে, মোহামেডান স্পোর্টিং-এর লীগ বিজয়ে এই কথাই নূতন করিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

ভারতীয় ফুটবলে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ মোহামেডান স্পোর্টিং করিয়াছে, সে হইল প্রকৃতিকে জয় করা। কয়েক বৎসর আগে ভারতীয়রা শুকনো মাঠে বেশ ভাল খেলিত। আর বৃষ্টি হইলেই পরাজয় ছিল অবধারিত। কে একজন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল : কাল বৃষ্টি! বৃষ্টির জন্য পলাশীতে বাঙ্গালীর পরাজয় হইয়াছে। এই কাল বৃষ্টির জন্যই মোহনবাগানের ভাগ্যে লীগ জয় ঘটিল না। এই বৃষ্টিকে মোহামেডান দল জয় করিয়াছে। ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া যাঁহারা কাদার দিনেও খালি পায়ে মাঠে নামিতেন তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে ইহাদের মুক্ত বুদ্ধির দৃষ্টান্তে। কুসংস্কারকে জয় করিয়া বুট পায়ে খেলিতে শিখিয়াছে বলিয়াইতো রোদে বৃষ্টিতে দেশে বিদেশে সকল সময় সর্ব্বত্র ইহারা ভাল খেলিতে পারে।

মোহামেডান দলের সাফল্যের অন্য একটি বড় কারণ হইতেছে তাদের টিম ওয়ার্ক। নিজের জন্য কেউ তারা খেলে না, প্রত্যেকেই খেলে টিমের জন্যে। 'হব জয়ী নয় হইব শহীদ' এই পণ করিয়াই যেন এরা মাঠে নামে। এই বৎসরের লীগ খেলায় দুইটি ম্যাচ মাত্র তারা হারিয়াছে। হারিলেও শেষ পর্যন্ত তারা নিরুৎসাহ হয় নাই — সমান উদ্যমে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলিয়া গিয়াছে। এক আধবার কোন শিল্ড বা কাপ জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু চার চার বৎসর মাসের পর মাস খেলিয়া দুর্দ্ধর্ষ-দলগুলিকে পরাস্ত করা পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন দলের পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

মোহামেডান টিম সম্বন্ধে একটা কথা সব সময়ই মনে হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন এই টিমটিতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বাঙ্গলা, মহীশূর, অন্ধ্র, সীমান্ত, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ, দিল্লী, আজমীর সব প্রদেশের লোক লইয়া যে দল, সে দল একটা অদ্ভুত কিছু নিশ্চয়ই। একবার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যাওয়া আর ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসা একই কথা। কথাটা বোধ হয় অতিরঞ্জিত নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষকে মোহামেডান দল যেমন জানে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে আর কে জানে? মনে হয়, ভারতে এক জাতি গঠনের ব্যাপারে মোহামেডান দল বেশ সাহায্য করিবে।

ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব

স্যর যদুনাথ সরকার

আমি প্রবাসে গিয়া প্রথমেই ইতিহাস-চর্চ্চা আমার জীবনের ব্রত বলিয়া নির্ব্বাচন করি, আর নানা প্রবাসভূমিতে থাকিয়া ইতিহাসরচনা, ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ও তদুপযোগী নূতন ভাষাশিক্ষা এই সব কাজ আরম্ভ করি এবং শেষ প্রবাস-বাস পর্যন্ত তাহারই অনুসরণ করি। এই বহুবর্ষব্যাপী কাজের মধ্যে একটা কথা সতত‌ই আমার মনে জাগিত যে, ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে পর-প্রদেশে বাস এবং দীর্ঘ ভ্রমণ যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নহে। একথা যে দিল্লী বা আগ্রা, রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে সত্য তাহা আপনারা সহজেই মানিয়া লইবেন। কিন্তু নিজ বাংলার ইতিহাস লিখিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষেও বাহিরে প্রবাস ও ভ্রমণ অত্যাবশ্যক। কারণ একে তো দেবভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধনে সব ভারতীয় প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত জড়িত, তাহার উপর, অতীত যুগে কত বঙ্গাধীপ বঙ্গের বাহিরে নিজ নিজ বিজয়বাহিনী লইয়া গিয়াছিলেন, আর পর-প্রদেশীয় কত রাজা আমাদের এই বঙ্গভূমিতে নিজ অভিযান প্রেরণ করেন। আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকদের ও আমাদের দিগ্বিজয়-আকাঙ্খী পণ্ডিতদের চক্ষে নিখিল-ভারত একই দেশ ছিল, তাঁহারা প্রাদেশিক সীমানার বেড়া ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লঙ্ঘন করিতেন। ভারতের ভিতর আচার-ব্যবহার, শব্দ ও সাহিত্য, ধর্ম্ম ও কলার এত আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে যে, বঙ্গের বাহিরের ভারত না জানিলে বঙ্গের সভ্যতার ধারাও বুঝা যায় না, বঙ্গদেশের প্রকৃত সম্পূর্ণ ইতিহাস পর্য্যন্ত লেখা যায় না।

সুতরাং তুলনামূলক ঐতিহাসিক চর্চ্চা অত্যাবশক। এই কাজে প্রবাসী বাঙ্গালীরা একটি বড় সহজ স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতেছেন। পুরাতন ভারতের নানাবিভাগের নিদর্শন তাঁহাদের চারিদিকে; তাঁহারা শুধু চোখ খুলিয়া এগুলি দেখিবেন, এগুলি হইতে ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিবেন, আর তথ্যগুলি সমবেত করিয়া অতীতের অবিকল ছবি অঙ্কিত করিবেন। বঙ্গে এই নিদর্শনগুলি নাই, বঙ্গে থাকিয়া আমরা এ-সুযোগ পাই না।

তাহার পর ভাষার কথা। প্রাচীন ভারতের, এমন কি, মধ্যযুগীয় ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে, শুধু বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষার অভ্যাস করিলেই চলিবে না। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথচ এখন পর্য্যন্ত জীবিত কত কত প্রাদেশিক ভাষা ভারতের প্রাচীন শিলালেখা ও গ্রন্থের অর্থবোধে অনেক স্থানে যে সাহায্য করে, তাহা বিশুদ্ধ কালীদাসী সংস্কৃত হইতে পাওয়া যায় না। আর মধ্যযুগের ভারতকে জানিতে হইলে হিন্দী ফারসী ও মারাঠী ভাষায় দক্ষ না হইলে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রবাসে কার্য্য উপলক্ষে আপনারা সকলেই এ-সব প্রাদেশিক ভাষাগুলির দুই একটি শিখিতে বাধ্য হন, সুতরাং ঐতিহাসিক উপকরণসংগ্রহ এবং তাহার অর্থগ্রহণ আপনাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে, যেন দৈনিক কাজের মধ্যে।

তাহার উপর প্রবাসে চারিদিকে কত কত অ-বাঙ্গালী জাতির আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় গীতি ও কথা শুনিয়া আমাদের মনের মধ্যে এক একটি অপরিচিত নবরাজ্যের দ্বার খুলিয়া যায়--সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ঘুচিয়া যায়--সত্যসন্ধানের প্রধান যন্ত্র দুটি, অর্থাৎ উদারতা ও দীর্ঘ দৃষ্টি লাভ হয়। এ-সুযোগগুলি বঙ্গে আবদ্ধ বাঙ্গালীর পক্ষে দুঃসাধ্য।

তাই আমি প্রার্থনা করি যে, প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই পরম সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করুন--তাঁহাদের মধ্যে ভারতের পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ব, ভাষান্তর, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য শত শত প্রবীণ তাঁহাদের কষ্টলব্ধ অবসর, শত শত যুবক তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্খা ও উদ্যম নিবেদিত করুক, যেন আমাদের মত বৃদ্ধদের তিরোধানের পর ইতিহাস-চর্চ্চার এবং ইতিহাসরচনার ধারা সদানীরা জাহ্নবীর মত প্রবাহিত হইতে থাকে, যেন ঐতিহাসিক সত্য-সন্ধানীরা "যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী" হইয়া জ্ঞানের পথ অবিরাম মুখরিত করিতে থাকেন।

এই শাখায় আগত আপনারা সকলেই ইতিহাস-সাহিত্যিক, অন্তত ইতিহাসপ্রেমী। তাই অতি বৃদ্ধ কারিগরের মত আমি

মাদের কারখানার দুটি মূলমন্ত্র আপনাদের নিকট বলা উচিত মনে করি। প্রথমটি এই যে, বর্তমান যুগে সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে এবং বিজ্ঞানের শক্তি সর্বত্র প্রবাহিত হইবার ফলে ইতিহাস একদিক থেকে বিজ্ঞানের শাখাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ইতিহাসের আদি উপকরণগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া, ধুইয়া গলাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তবে আমরা তাহাকে কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করিতে পারি। আর এ-যুগের নিয়মই এই যে, আমাদের নিজ নিজ চর্চার বিশেষ বিষয়টির উপর যথাসম্ভব সব দিক হইতে আলোকপাত করিতে হইবে, সমস্ত বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ একত্র করিতে হইবে। ইহা অতি কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইহার ফলে ইউরোপে এখন আর একজন সার্ব্বভৌম পণ্ডিত কোন গ্রন্থ সমগ্র একা লেখেন না, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সমষ্টি করিয়া তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে সেই বিষয়টির জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করা হয়। এক একজন বিশেষজ্ঞ এক একটি অধ্যায় অথবা এক এক খণ্ড গ্রন্থমাত্র রচনা করেন। ইহাই বর্তমানে অনুসৃত ইউরোপীয় রচনাপদ্ধতি; পণ্ডিতমণ্ডলীর পরস্পর সহযোগ বিনা রচনায় এত উচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে। ইতিহাস প্রণালীতে বিজ্ঞান হইলেও বাহ্যকলেবরে এবং অন্তরের উদ্দেশ্যে সাহিত্যকলা। এই সত্য না মানিলে মহা ক্ষতি হয়, ঐতিহাসিকের জীবনব্যাপী শ্রম পণ্ড হয়। ইতিহাসকে যে আর্য্যগণ ইতিকাব্য নাম দেন, সেটা বিদ্রূপের বিষয় নহে, এই নামের মধ্যে একটি নিগূঢ় মানব-সত্য নিহিত আছে। ব্যক্তিবিশেষকে ঘিরিয়া কাল্পনিক উপকরণ লইয়া কাব্য রচিত হয়, অথচ ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় জনসমষ্টির উত্থানপতন, দেশের উপর দশের উপর জননায়কের প্রভাব এবং ইহার উপকরণ সত্য মানবের চেষ্টায় যতটুকু সত্য খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই। কিন্তু যে আকারে ইতিহাস গ্রন্থটিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার যে অন্তর্নিহিত মন্ত্রটিকে বাক্যে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে, তাহার কথা ভাবিলে ইতিহাস ও কাব্যকে একই শ্রেণীর সাহিত্য বলা উচিত। একজন ইংরাজ লেখক নেপোলিয়ানের যুদ্ধবর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে সর্বোচ্চ প্রতিভাশালী সেনাপতি ও চিত্রকরের প্রতিভা একই প্রণালীতে একই পথ দিয়া চলে, একটি বিখ্যাত অভিযান (ক্যাম্পেন) যেন একটি অতুলনীয় তৈলচিত্র। ঠিক সেইরূপ সর্বোচ্চ ইতিহাস-লেখকও প্রকৃতই চিত্রকর, তিনি চিত্র আঁকেন ভাষার তুলি দিয়া প্রকৃত মানব মানবীর ভাব ও কর্ম্ম তাঁহার রঙের মশলা। এই চিত্ররচনার দ্বারাই ইতিহাসের অন্তরের সার পাঠককে দেখান যায়, ইতিহাস গ্রন্থ চূড়ান্ত সফলতালাভ করে।

কারণ ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় এটা নহে যে কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কখন ঘটিয়াছিল। ইতিহাস দেখাইবে যে অতীত ঘটনাগুলি কেন ঘটিয়াছিল, কিরূপে ঘটিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডীতে যেমন অদৃষ্টের অনিবার্য্য প্রতাপ প্রমাণ করা হইত, আমাদের ইতিহাসও তেমনি সত্যকার জগতের কার্য্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়--মানব সঙ্ঘের চিত্তের ভাব ও উদ্যম কোন পথে চলিয়াছিল, জাতীয় জীবনে পূর্ব্বপুরুষদের দত্ত মনোবৃত্তি ও সভ্যতার প্রভাব কতদূর গিয়া দাঁড়ায়, মহাপুরুষ জননেতারা কিরূপে দেশমধ্যে বিপ্লবের সমান পরিবর্ত্তন সংঘটিত করেন, নূতনকে ঝড়ের মত আনিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া জাতিকে নবীন পথে প্রচালিত করেন, এই সব মনস্তত্ত্বের কথা কাব্যের তুলিতে ইতিহাসে প্রকাশ করিতে পারিলে তবে সে ইতিহাসগ্রন্থ প্রকৃত ফলবান হইবে, অমর হইয়া থাকিবে--নচেৎ নহে।

এইজন্য ঐতিহাসিকের পক্ষেও কল্পনাশক্তির আবশ্যক, সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশের ফলে গঠিত, সংযত নিয়ন্ত্রিত কল্পনার সাহায্যে অগ্রসর, কবির মহান গঠনশক্তিতে রচিত, ভাষা ও ভাবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে পুটপাক ঔষধের মত যে ইতিকাব্য, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য। জাতিবিশেষের দেশবিশেষের অদৃশ্য জীবনধারা এই ইতিকাব্যের ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে, তাহার প্রাণের প্রক্রিয়াগুলি আর অতীতের সমাধিগর্ভে নিশ্চল হইয়া থাকিবে না, চলচ্চিত্রের মত পাঠকের সম্মুখে জীবন্ত দৃশ্যমান হইবে। ইহাই ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব।

(প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ)

(কার্ত্তিক-পৌষ--২য় বর্ষ, ১৩৪১)

সোলতান মাহ্‌মুদ

আবদুল কাদের, বি এ

সোলতান মাহ্‌মুদের পূর্ব্বেই খলীফারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এই সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকেরা সমগ্র প্রাচ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা নিয়ত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া চতুর্দ্দিকে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাজেই এক জন শক্তিশালী সম্রাটের অভ্যুদয় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মাহ্‌মুদ সে অভাব পূরণ করেন। তাঁহার আমলে পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম ভারতের খণ্ড রাজ্যগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়; উহাদের ধ্বংস-স্তূপের উপর এক সম্রাটের অধীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতিগত পার্থক্য ও কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও এক শাসনে আসিয়া একতা সূত্রে গ্রথিত হয়।

সোলতান মাহ্‌মুদ সর্ব্বপ্রথম মোসলমান সম্রাট। তাহার পূর্ব্বে খলীফারা যুগপৎ রাজ্য ও ধর্ম্ম গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিতেন। মাহ্‌মুদের সময় হইতে খেলাফৎ ও সোলতানৎ দুইটী ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ধর্ম্ম নীতি হইতে রাজ নীতিও পৃথক হইয়া যায়। ধর্ম্ম রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হওয়ায় মোসলমান ও অ-মোসলমানের একত্র বাস অধিকতর সম্ভবপর হইয়া পড়ে।

মোসলমানদের মধ্যে রাজত্বের (monarchy) অভ্যুদয়ের জন্য মাহ্‌মুদই দায়ী। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজপুরুষের জন্ম ও তদীয় বংশ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেলজুক সোলতান ও দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা শাসন-নৈপুণ্যে এবং তৈমুর ও চেঙ্গীজ দিগ্বিজয়ে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যান। কিন্তু তাই বলিয়া মাহ্‌মুদের গৌরব হ্রাস পাইতে পারে না। প্রতিষ্ঠাতার ক্রটী থাকিতে বাধ্য।

সোলতান মাহ্‌মুদ সে যুগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নরপতি।[১] তাঁহার আমলে গজনভী সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। আব্বাসিয়া খেলাফৎ ধ্বংসের পরে প্রাচ্যে এত বড় সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হয় নাই। সিংহাসনারোহণকালে মাহ্‌মুদ সামানিয়াদের অধীনে গজনা, বাস্ত্ ও বল্‌খের রাজা মাত্র ছিলেন। এক বৎসর অতীত না হইতেই খোরাসান তাঁহার দখলে আসে; সামানিয়াদের অধীনতা-পাশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অন্যান্য রাজার ন্যায় খলীফার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ক্রমে গোর, রাই, জাবল, সিস্তান, খারিজম, ইস্পাহান, কাফিরিস্তান ও গর্জিস্তান তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। কাসদর, মাক্‌রাণ, জুর্জ্জণ, তাবারিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাঞ্জাব স্ব-রাজ্যভুক্ত করেন। কনৌজ, কালঞ্জর, গোয়ালিয়র, নারায়ণপুর, দক্ষিণ কাশ্মীর ও গঙ্গা-দোয়াবের বহু রাজা তাঁহাকে কর দানে বাধ্য হন। ফলে মাহ্‌মুদের সাম্রাজ্য ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর তীর হইতে গঙ্গানদী এবং আরল সাগর ও ট্রান্স্‌ওক্সিয়ানা হইতে ভারত মহাসাগর, সিন্ধু দেশ ও রাজপুতনার মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২০০০ মাইল ও প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে ১৪০০ মাইল।[২]

সত্য বটে, সামানিয়া বংশের পতন ও ভারতীয় রাজাদের অনৈক্যের ফলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারের সুবিধা হয়; সত্য বটে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই গজনভীদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়; তথাপি এই রাজ্য-বিস্তার অতি আশ্চর্য্যজনক। এক দিকে তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দুদের ও অন্য দিকে স্বজাতীয় তুর্কদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইত। মধ্যএশিয়ার দুর্দ্দান্ত জাতিরা নিরন্তর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিত। কিন্তু স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী সকলের বিরুদ্ধেই মাহ্‌মুদ তুল্য সফলতা লাভ করেন। বস্তুতঃ একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করা সামান্য প্রতিভার কার্য্য নহে।[৩]

অনেকের ধারণা, মাহ্‌মুদ কেবল রাজ্য জয় করিয়াই যাইতেন, বিজিত জনপদের শাসন-সৌকর্য্যের সুব্যবস্থা করিতেন না।

বর্ত্তমানে অধ্যাপক হবীব জোর-গলায় এই মত প্রচারের ভার লইয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মাহ্‌মুদ কোন নূতন আইন প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন নাই, করিবার অবসরও পান নাই। শাসনকার্য্যে খেলাফতের আইন-কানুন প্রয়োগ করিযাই তিনি চমৎকার সফলতা লাভ করেন।

কোন সাময়িক পত্রে জনৈক উদীয়মান লেখক লিখিয়াছেন, মাহ্‌মুদের গঠনমূলক প্রতিভা ছিল, একথা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। ইতিহাস সোলতানের প্রতিভার সাক্ষী। কোন থার্ড ক্লাস এম্-এর অবিশ্বাসে তাহা উড়িয়া যাইতে পারে না। মাহ্‌মুদের পক্ষে এরূপ লোকের ওকালতীর কোনই প্রয়োজন নাই। অনেক বড় ঐতিহাসিক তাঁহার গঠনপ্রতিভার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "মাহমুদের গঠন-মূলক প্রতিভা অত্যন্ত অধিক ছিল।[৩] তাঁহার সময় রাজ্যে এরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল যে, পথিকেরা নিরাপদে লাহোর হইতে সুদূর খোরাসানে গমনাগমন করিতে পারিত।" কীন বলেন, "মাহ্‌মুদ যেমন বিস্তৃত রাজ্য জয় করিতেন, তেমন তাহা বিজ্ঞতার সহিত সুশাসন করিতেও পারিতেন।"[৪] তিনি যে কেবল পিতৃরাজ্য বর্দ্ধিত করিযাই যান নাই, সঙ্গে সঙ্গে উহা দৃঢ়ীকৃত (consolidated) করারও ব্যবস্থা করেন, স্যার উলস্‌লী হ্যাগও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[৫] গিবন বলেন, "মাহ্‌মুদ গজনভীর প্রজারা সুখ-শান্তিতে কাল কাটাইত। প্রাচ্যের লোকেরা আজিও তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।"[৬]

উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের নিকট সেকালে রাজদ্রোহ অনেকটা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। মাহ্‌মুদ প্রায়ই রাজধানী হইতে সুদূর উত্তর পশ্চিম বা দক্ষিণ সীমান্তে অনুপস্থিত থাকিতেন। অথচ দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন সেনাপতি, শাহ্‌জাদা বা শাসনকর্ত্তা তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করেন নাই, কোথাও কোন প্রজা-বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয় নাই, একটা প্রদেশ হইতেও তিনি বেদখল হন নাই। সুশাসিত ও দৃঢ়ীকৃত না হইলে এই বিশাল সাম্রাজ্যে কখনও এরূপ অভগ্ন শান্তি বিরাজ করিত না। নিরন্তর দিগ্বিজয়ে ব্যস্ত থাকিয়া, কোন নূতন আইন বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি না করিয়া কেবল প্রাচীন আইনের সাহায্যে এরূপ সুশাসন প্রবর্ত্তিত করা কম গৌরবের কথা নহে।

পাঞ্জাব মাহ্‌মুদের গঠন-প্রতিভার অন্যতম প্রমাণ। সেখানে গজনভীদের ক্ষমতা এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াও হিন্দুরা একমাত্র নগরকোট ব্যতীত আর কোন স্থান পুনরধিকার করিতে পারে নাই।[৭] গজনভীরা দৃঢ়ভাবে পাঞ্জাব তাঁহাদের শাসনে রাখেন। অনেক সময় তাঁহারা সুদূর গঙ্গা-তীরের নগরাবলী লুণ্ঠন করিতেও সৈন্য প্রেরণ করিতেন। আলাউদ্দীন গোরী গজনা ধ্বংস করিলে (১১৫২ খৃঃ) শাহজাদা খসরু যখন অসহায় অবস্থায় লাহোরে উপস্থিত হন, তখন প্রজারা তাঁহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লয়।[৮] স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াও গজনভীরা সুদূর প্রবাসে আরও পয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

গজনভী সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্যও অনেকে মাহ্‌মুদের গঠনপ্রতিভাহীনতাকে দায়ী করিয়া থাকেন। এই মত ঠিক নহে। কীন বলেন, "গজনভী বংশের পতন নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। বড় বড় দিগ্বিজয়ী সব সময় বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায়ই অপদার্থ হইয়া থাকেন। বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অলিভার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি সৈনিক রাজা অপেক্ষা অধিকতর সফলকাম হইলেও মাহ্‌মুদের বেলায়ও এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই অপদার্থ ছিলেন।"[১০] "মাহ্‌মুদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন না।"[১১] প্রধানতঃ এই কারণেই দশ বৎসর পরে জেন্দেকানের যুদ্ধে পরাক্রান্ত সেলজুকদের হাতে গজনভী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, মাহ্‌মুদের গঠন-প্রতিভার অভাবে নহে। সেলজুকেরা তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য গ্রাস করিতে পারে নাই। অনেক দুর্ব্বল হইলেও গজনভীরা আরও এক শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত গোর, পাঞ্জাব, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন; সোলতান মউদুদ সেলজুকদের হাত হইতে ট্রান্স্-ওক্সিয়ানাও কাড়িয়া লন। কাজেই 'নয় বৎসর পরে গজনভী সাম্রাজ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়' মি. হবীবের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক নহে।

অধ্যাপক সাহেব গজনভী সাম্রাজ্যকে 'উদ্দেশ্য-বিহীন সৌধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি মাহ্‌মুদের সম্মুখে কোন 'আদর্শ'ও দেখিতে পান নাই। যদি রাজ্যবিস্তার ও সুশাসন রাজার উদ্দেশ্য ও আদর্শ হয়, তবে মাহ্‌মুদের অবশ্যই তাহা

ছিল। কেহ ইচ্ছা করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিলে তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। হবীব বলেন "সেল্‌জুকেরা যখন এই উদ্দেশ্যহীন সৌধ ভূমিসাৎ করিয়া দেয়, তখন কেহই তাহার জন্য ক্রন্দন করা দরকার মনে করে নাই।" সোজা কথায়, গজনভীরা কুশাসনের দরুণ কাহারও স্নেহ-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত ইতিহাস এই মতের পরিপন্থী। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মিত্রও পর হইয়া যায়। অকৃতজ্ঞ আব্বাসিয়া খলীফা বিজয়ী তুগ্রলকে স্বীয় প্রতিনিধি বলিয়া অভিনন্দিত করেন। ভারতের পথে পলাতক মসউদের হিন্দু-মোসলমান দেহরক্ষীরা তাঁহার ধন-ভাণ্ডার লুটিয়া নেয়। কাজেই স্বার্থপর লোকেরা তাঁহার পতনে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কেহই গজনভীদের জন্য দুঃখিত হয় নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। লোকে তাঁহাদিগকে এত ভক্তি করিত যে, সয়ফুদ্দীন গোরী গজনা অধিকারের পর নিজকে জনপ্রিয় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।*[১২] যদি গজনভীরা সুশাসক না হইতেন, যদি লোকে তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত না হইত, তবে কিছুতেই তাহারা নবাগত নিরপরাধ ভূপতিকে বিদূরিত করার জন্য হৃতগৌরব পলাতক সোলতানকে ডাকিয়া আনিত না।

মাহ্‌মুদ সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ নরপতি।*[১৩] পারস্য ও ভারতের যুগ-যুগব্যাপী সঞ্চিত অর্থে তাঁহার কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রাচীন কালের কোন রাজার সাত সন্দুক রত্ন ছিল শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'খোদাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমায় শত সন্দুক রত্ন দিয়াছেন।'

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহ্‌মুদ অর্থলোভী ছিলেন। যদি অর্থলোভ বলিতে অর্থ সংগ্রহের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বুঝায়, তবে তিনি বাস্তবিকই এ দোষে দোষী। অর্থের জন্য তিনি বারংবার হিন্দুস্থানের দুর্গম জনপদে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দেন। কিন্তু বিজেতার পক্ষে অর্থলোভের বাতিক দোষনীয় নহে। জগতের প্রত্যেক বড় দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় তুল্য অর্থলোভী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, চেঙ্গিজ, নেপোলিয়ান কে শত্রু রাজ্য বা শত্রুর ধনাগার লুণ্ঠন করেন নাই? যুদ্ধ-নীতি অনুযায়ী ইহা চিরকাল বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য মাহ্‌মুদকে দায়ী করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

লোভীর ন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিলেও ব্যয়ের বেলায় মাহ্‌মুদের লোভের পরিচয় পাওয়া যাইত না। জগতের অপর কোন দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় এত মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট সঞ্চিত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন নাই। তিনি প্রত্যহ গরীব দুঃখীদিগকে খয়রাত দিতেন। সাম্রাজ্যের অক্ষম লোকেরা তাঁহার নিকট ভাতা পাইত। যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবকদিগকেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার দুই লক্ষ গিনি বা চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। সহস্র দিনারের কম তিনি কাহাকেও দান করিতেন না। তিনি গজনায় বহু স্কুল ও একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভাষার দুর্লভ গ্রন্থে এক বিরাট লাইব্রেরী পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নানা দেশের বিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য পদার্থে তাঁহার যাদুঘর ভরিয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু টাকা জমা রাখিয়া দেন; অধ্যাপকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তিদানের জন্য তিনি মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন।

মাহ্‌মুদের নির্ম্মিত 'স্বর্গের কণে' প্রাচ্যের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এই বিরাট জামে-মজ্‌জেদ মর্ম্মর ও গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। ইহার সৌন্দর্য্য দর্শকমাত্রেরই তাক্ লাগাইয়া দিত। গালিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের শামাদান ও অন্যান্য আসবাব-পত্রে ইহা সুসজ্জিত থাকিত। লোকের সুখ-সুবিধার জন্য প্রজাবৎসল সোলতান রাজ্য-মধ্যে বাঁধ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রভুর অনুকরণে আমীরেরাও নিজেদের ও সর্ব্বসাধারণের জন্য বহু আড়ম্বরময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই গজনা ও প্রাদেশিক রাজধানীসমূহ মস্‌জেদ, তোরণ, প্রস্রবণ, প্রমোদ-উদ্যান ও পয়ঃপ্রণালীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে গজনা কতকগুলি কুটীরের সমষ্টি মাত্র ছিল; শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মাহ্‌মুদের মুক্তহস্তে অর্থব্যয়ের ফলে উহা অচিরে প্রাচ্যের সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরময় নগরে পরিণত হয়।*[১৪]

ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে মাহ্‌মুদের দরবারের আড়ম্বরের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। চারিটী পালকখচিত লম্বা টুপি পরিয়া সোনার গদা হাতে লইয়া দুই হাজার ক্রীতদাস তাঁহার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ও দুইটী পালক-ভূষিত টুপি মাথায় দিয়া রূপার মুগুর হাতে দুই হাজার ক্রীতদাস বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত।*[১৫] তাঁহার শিবিরের জাঁকজমক দেখিয়া লোকে

অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার সৈন্যেরা উচ্চশ্রেণীর সাজ-সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। এক একটী অভিযানে তাঁহার অজস্র অর্থ ব্যয় পড়িত। বাস্তবিক পক্ষে মাহ্মুদের অর্থলোভে কৃপণতা ছিল না। লোভের বশে দেশ-বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেও কিরূপে বিজ্ঞতা ও বদান্যতার সহিত তাহা ব্যয় করিতে হয়, মাহ্মুদ তাহা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন জগতের আর কেহই অর্থ ব্যয়ের সময় তাঁহার ন্যায় এরূপ বিচার-বুদ্ধি ও আড়ম্বরের পরিচয় দিতে পারেন নাই।[১৬]

অবিশ্রান্ত ব্যয়ের পরেও মাহ্মুদের রাজকোষে অতুল অর্থ সঞ্চিত থাকে। কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই ধন ভাণ্ডার ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনের দুঃখে অশ্রুপাত করেন, অথচ কৃপণতা করিয়া একটি কপর্দ্দকও কাহাকে দান করেন নাই। অস্-সাবির বিলুপ্ত তাজারিবুল উমামের বরাত দিয়া শ্রদ্ধেয় সোলতানের মৃত্যুর পৌনে দুই শত বৎসর পরে ইব্নে জাওজি তাঁহার আল্ মোন্তাজামে সর্ব্বপ্রথম এই ঘটনার উল্লেখ করেন। আরও প্রায় তিন শত বৎসর পরে (১৪৯৫খৃঃ) মির খাওয়ান্দ তাঁহার রওজাতুশ-শাফায় সোলতানের ক্রন্দনের এই মন-গড়া ব্যাখ্যা দেন। সমসাময়িকদের নিকট মাহ্মুদ সদাশয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের কবিরা 'পিলওয়ার' বা 'হস্তীভার স্বর্ণ-রৌপ্য দাতা' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতার সহিত এই অর্থ গৃধ্নুতার গল্প মোটেই খাপ খায় না।[১৭] কত ঘোরতর যুদ্ধ, কত মূল্যবান রক্তপাত করিয়া ঐ বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে হয়ত তাহারই করুণ চিত্র তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। খুব সম্ভবতঃ সেজন্যই তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। মাক্রাণ তখনও বিদ্রোহী; সেলজুকেরা আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। শাহ্জাদাদের মধ্যে কেহ যে ধনবৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। কাজেই তখন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য রাজকোষের প্রত্যেকটী কপর্দ্দক রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল। জীবনে মাহ্মুদ যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন মৃত্যুকালে যে অবশিষ্ট টাকা বিলাইয়া দিয়া পুত্রকে ফতুর করিয়া যান নাই, ইহা তাঁহার বিজ্ঞতারই প্রমাণ, কৃপণতার পরিচয় নহে।

মাহ্মুদের সৌধাবলী তাঁহার স্থাপত্যানুরাগের পূর্ণ বিকাশ। গজনার সমস্ত স্থাপত্য-কীর্ত্তিই জাহান-শোজ আলাউদ্দীন আগুনে পোড়াইয়া দেন। মহামতি মাহ্মুদের সমাধি ও দুইটী মিনার বা বিজয়-স্তম্ভ মাত্র এখন উহার স্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছে। মিনারদ্বয়ের প্রত্যেকটী ১১৪ ফুট উচ্চ ও পরস্পর হইতে ৪০০ গজ দূরে অবস্থিত। উত্তরেরটী মাহ্মুদ ও অপরটী মসউদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দুইটীই ইষ্টক-নির্ম্মিত ও সযত্ন-সম্পাদিত অতি-সুন্দর দগ্ধমৃত্তিকার কাজে সুশোভিত; উহাদের চাক্চিক্য অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে।[১৮] দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনারের আদর্শ এবং পারস্যের দামগান ও মেসোপর্টেমিয়ার মুজাহ্ ও তওকের মিনারের অনুরূপ বলিয়া স্থপতিবিদ্দের নিকট এই মিনার দুইটীর গুরুত্ব খুব বেশী।

মাহ্মুদের সমাধি হালফ্যাশনে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। কেবল ইহার মূল্যবান দ্বারগুলিই এখন অবিকৃত অবস্থায় ভ্রমক্রমে আগ্রা দুর্গে রক্ষিত আছে। ইহাতে আরব্য প্রণালীর খোদাই-কার্য্য ও বিজড়িত নক্শা অসাধারণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য এগুলি দর্শকদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।[১৯]

মাহ্মুদের পূর্ত্ত-কার্য্যের মধ্যে সোলতানের বাঁধ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; আজিও লোকে ইহার জল ব্যবহার করিতেছে। রাজধানী হইতে ১৮ মাইল দূরে এক গিরি পথের মুখে নাওয়ার নদীর জলের ২৫ফুট উর্দ্ধে এই বাঁধ নির্ম্মিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০গজ; স্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্য উপরে একটী ও নিম্নে আর একটী স্রোতো দ্বার ছিল। ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন গোরী ইহা ধ্বংস করিয়া দেন। ৩৭০ বৎসর পরে বাবরের আদেশে ইহার সংস্কার সাধিত হয়।

প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে মাহ্মুদ বরাবর সচেতন ছিলেন। তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। "সোলতান মাহ্মুদ ও বিধবার গল্প" তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। এই রমণীর পুত্র সাম্রাজ্যের কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে দস্যুহস্তে নিহত হয়। তাহার আবেদনে মাহ্মুদ দস্যু-দমন করিয়া যাত্রীদল রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাহাকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। নিশাপুরের জনৈক আমির এক রমণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে সংবাদ পাইয়া মাহ্মুদ তাঁহকে বেত্রদণ্ড দিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে অকালে তুষারপাতের ফলে খোরাসানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সদাশয় সোলতান দুঃস্থ লোকদের মধ্যে অর্থ ও শস্য বিতরণের আদেশ দিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করেন।

সোলতান মাহ্‌মুদ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ নরপতি ছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার দয়া ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইত। কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সদয় ব্যবহার পাইত। মাহ্‌মুদ নিষ্ঠুর ছিলেন না। কেহ তাঁহার অসন্তোষভাজন হইলে বড় জোর তাহার নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড হইত। এমন কি বিদ্রোহীকেও তিনি চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না। একবার ক্ষমা পাইয়া স্বপদে বহাল হইয়া আবার অপরাধ করিলেও তিনি তাহাদিগকে কখনও কারাদণ্ড ব্যতীত অপর কোন কঠোরতর শাস্তি দিতেন না। কখনও কেহ তাঁহার হস্তে কোন অমানুষিক শাস্তি ভোগ করে নাই। অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী ভূপতির দরবারে ও পরিবারে সচরাচর যে সকল নিষ্ঠুর ও শোকাবহ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, মাহ্‌মুদ তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।[১২০] পুত্র হত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কখনও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। আরসলান যাদের সেলজুকদিগকে নিহত করার বা তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তিনি অবজ্ঞা-ভরে উত্তর দেন, "খোদার কলম রদ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।"

ন্যায়-বিচারের জন্য সোলতান মাহ্‌মুদের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কঠোর হস্তে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ছোট বড় কাহারও ন্যায়সঙ্গত শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না। তাঁহার ন্যায় বিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। গজনার জনৈক সওদাগর মস্‌উদের নিকট টাকা পাইতেন। তিনি কাজীর নিকট নালিশ করিলে শাহ্‌জাদা তাড়াতাড়ি দাবী মিটাইয়া দিয়া তবে নিষ্কৃতি পান। আলী নুশ্‌তিগিন নামক জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইস্‌লামী আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য করায় মাহ্‌মুদ তাঁহাকে ধৃত করিয়া বেত্রদণ্ড দান করেন।

অনেক রাজারই প্রিয়পাত্র থাকে। যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা এই অপদার্থগুলিকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। মাহ্‌মুদের কোন প্রিয়পাত্র ছিল না। যোগ্যতাই তাঁহার কর্ম্মচারী নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। প্রিয়জন বলিয়া কখনও তিনি কাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক কার্যেই তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যাইত।[১২১]

জগতের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে মাহ্‌মুদ অন্যতম। ইরাক হইতে গঙ্গা-দোয়াব ও খারিজম হইতে কাথিওয়াড় পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগে তিনি দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল অতুল উদ্যম ও অপূর্ব্ব সফলতার সহিত যুদ্ধ করেন। কখনও তিনি তুর্কিস্তানের সমস্ত রাজার সহিত সংগ্রাম করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে উত্তর ভারতের রাজগণের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত। চল্লিশ বৎসরের অবিশ্রান্ত সমরে কখনও তিনি পরাজিত হন নাই। পারস্য, তুর্কিস্তান ও হিন্দুস্থানের নরপতিরা তাঁহার নামে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন। বর্ব্বর তাতারদিগকে তিনি সির দরিয়ার উত্তরে হাঁকাইয়া দেন। পারস্যের ক্ষুদ্র রাজবংশগুলি তাঁহার বীরত্বে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উত্তর ভারতের রাজগণের ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত বা পদানত করেন। ইস্পাহান হইতে বুন্দেলখণ্ড ও সমরকন্দ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের সমস্ত রাজাই তাঁহার হস্তে পরাজিত ও অপদস্থ হন। আফগানিস্তান, ট্রান্স অক্সিয়ানা, খোরাসান, তাবারিস্তান, সিস্তান, (দক্ষিণ) কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বৃহদংশে তাঁহার জয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়।[১২২] জগতের অতি অল্প দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় এত বিপুল খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।[১২৩]

দিগ্বিজয়ী হিসাবে মাহ্‌মুদ আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।[১২৪] পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াই গ্রীক বীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। অধিকতর দুর্গম জনপদ অতিক্রম করিয়া মাহ্‌মুদ সুদুর গুজরাট ও কালঞ্জর পর্য্যন্ত অভিযান করেন। আলেকজাণ্ডার ভারতের যে অবস্থা দেখিয়া যান, মাহ্‌মুদের সময় তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানকালে পারস্যে একই সম্রাটের হুকুম চলিত। মাহ্‌মুদের জমানায় উহাও ভারতের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটী মাত্র বড় যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া গ্রীক বীর পারস্য হস্তগত করেন; সোলতান মাহ্‌মুদকে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া তথাকার রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হয়। এক জন সম্রাটকে দুই একটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য হস্তগত করা বড় সহজ; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজার সহিত পৃথকভাবে যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য গঠন করা অতি কঠিন। এক জনের পরাজয়ে কেবল তাঁহার রাজ্যই বিজেতার হস্তগত হয়; পরবর্ত্তী রাজ্যটী অধিকারের জন্য আবার তাঁহাকে নূতন সংগ্রামে নামিতে হয়।[১২৫] ভারতে এই দুর্লঙ্ঘ্য বিপদের সম্মুখীন হইয়াই আলেকজাণ্ডারের

বীরত্ব ফুরাইয়া যায়। যদি মাহ্‌মুদের ন্যায় পারস্যেও তাঁহাকে এই সঙ্কটে পড়িতে হইত, তবে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভারত-সীমান্তে পৌঁছিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, পাঞ্জাব প্রবেশ ত দূরের কথা।

সোলতান মাহ্‌মুদ সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা সামরিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি।*২৬ তিনি সৈনিক-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অবদানই তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও রাজ্য-কৌশলের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ।*২৭ তিনি বুয়াইহিয়াদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দেন, জিয়ারিয়াদের রাজ্য (তাবারিস্তান) তাঁহার দখলে আসে, সামানিয়ারা তাঁহার হস্তে পরাভূত হন, বার বার তিনি ভারত আক্রমণ করেন। পিতৃ-রাজ্যের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমান্ত বর্দ্ধিত করিয়া তিনি বুখারা ও সমরকন্দ হইতে কনৌজ ও গুজরাট পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহই ভীরু ছিলেন না। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহাকে বীরের ন্যায় বাধা দেন। মাহ্‌মুদ যেমন কোন নূতন আইন প্রণয়ন করেন নাই, তেমন কোন অভিনব যুদ্ধ-পদ্ধতি বা অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনিও পুরাতন পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার শত্রুদের ধর্ম্মগত ও জাতিগত একতা ছিল, মাহ্‌মুদের সৈন্যদের তাহাও ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। মাহ্‌মুদের ব্যক্তিগত উদ্যম, দয়া, শৌর্য্য, সাহস, খোদা-ভক্তি, গঠনশক্তি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, রণ-চাতুর্য্য, সতর্কতা, মর্য্যাদা ও অদ্ভুত দ্রুতগতি এই অপূর্ব্ব সফলতার কারণ।

সোলতান মাহ্‌মুদ সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। অনেক সময় তিনি সৈন্যদলের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। কথিত আছে, জীবনে তিনি বাহাত্তরটী অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হন। মুলতান অবরোধের সময় তিনি এত শত্রু নিধন করেন যে, রক্ত জমিয়া তাঁহার হাতে তরবারির মুষ্টি আটকিয়া যায়; শেষে খুলিবার জন্য গরম জলে হাত ডুবাইয়া রাখিতে হয়। অনেক যুদ্ধেই তিনি নামাজ পড়িয়া খোদার নিকট বিজয় ভিক্ষা করিতেন। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁহার সাহস, অকুতোভয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতা সৈন্যদের মনে নব উৎসাহের সঞ্চার করিত এবং আত্মবিশ্বাস জন্মাইয়া দিত।

মাহ্‌মুদের শৌর্য্য সর্ব্বযুগে অনুকরণীয়। কোন পরাজিত রাজাকে নিহত করিয়া কখনও তিনি স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। তিনিই আকবর ও অন্যান্য পরবর্ত্তী রাজার উদারনীতির আদর্শ। সকলেই তাঁহার নিকট ক্ষমা ও সদ্ব্যবহার পাইতেন। রাজনীতির অনুরোধে কাহাকেও তিনি সিংহাসনচ্যুত করিতেন, কাহারও সহিত কর লইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। কোন কোন রাজা তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া বিনা যুদ্ধেই তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিতেন। একবার মাহ্‌মুদ বুয়াইহিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বালক-রাজার মাতা তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "আমার স্বামী আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় সিংহাসন একটী বালক ও রমণীর হাতে আসিয়াছে। আপনি কি তাঁহাদের শৈশব ও দুর্ব্বলতার সুযোগে রাজ্য আক্রমণে সাহসী হইবেন? যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাহাতে আপনার কোনই গৌরব নাই; কিন্তু পরাজিত হইলে লজ্জার সীমা থাকিবে না।" সুচতুরা মহিলার এই পত্র পাইয়া মাহ্‌মুদ তাঁহার মৃত্যু ও বালক রাজার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পশ্চিম-পারস্যের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধে নামেন নাই।*২৮

অধিকাংশ দিগ্বিজয়ীর ন্যায় মাহ্‌মুদ নিষ্ঠুর ছিলেন না। ওয়াখেন ও গ্যারেট বলেন, "মাহ্‌মুদ খামখা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন বা নিরর্থক শোণিতপাত করিতেন বলিয়া মনে হয় না।"*২৯ টেইলার সাহেব বলেন, "প্রতিহিংসার বশে মাহ্‌মুদ কখনও কাহারও প্রাণ লন নাই, কোন বে-পরওয়া হত্যাকাণ্ডে কখনও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা। সে যুগের আদর্শ দিয়া বিচার করিলে মোটের উপর মাহ্‌মুদকে দয়ালু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।*৩০ তাঁহার সদয় ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া সময় সময় শত্রুরা বিনা বাধায় বা নামমাত্র বাধা দানের পর তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিত।

মাহ্‌মুদের উৎসাহ ও উদ্যমের তুলনা নাই! তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে বিশ্রামের অবসর ছিল না। সাধারণতঃ তিনি গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়ায় ও শীতকালে ভারতে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেন। কেবল মানুষের নিকট হইতেই তিনি বাধা পান নাই, প্রকৃতিও তাঁহাকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দান করিয়াছিল। শহীদের উপকরণে গঠিত না হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। প্রখর শীতাতপ, তুঙ্গ গিরি, প্রশস্ত নদী, অনুর্ব্বর মরুভূমি, অসংখ্য শত্রু, অদম্য রণ-হস্তী-যূথ কিছুই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তিনি গোরের দুর্গম পর্ব্বত-মালা ও কাশ্মীরের তুষারাচ্ছন্ন গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করেন; উত্তাল

তরঙ্গময় নদী, মুষলধার বৃষ্টি, পাঞ্জাবের জনমানবহীন ক্ষারময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও রাজপুতনার দগ্ধ মরুভূমি — সমস্তই তাঁহার অদম্য ইচ্ছার সম্মুখে তৃণবৎ ভাসিয়া যায়। তিনি লোহকোট জয় করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্থানটী অতি দুর্গম; মাহ্‌মুদকে যে সেখানে আরও অধিকতর দুর্য্যোগ ভোগ করিতে হয় নাই, তাই একমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়।[৩১]

তুর্ক, হিন্দু, আরব, আফগান, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমবায়ে মাহ্‌মুদের সৈন্যদল গঠিত হইলেও কঠোর শৃঙ্খলা বিধানের ফলে তাহারা একযোগে কার্য্য করিতে শিখে। তাতারেরা মনে করিত, যুদ্ধজয়ের পক্ষে সাহসই যথেষ্ট, পক্ষান্তরে রাজপুতেরা বিজয়লাভের জন্য সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিত। মাহ্‌মুদ তাহাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে, সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই সফলতা লাভের মূল। যে হস্তী বহু যুদ্ধে ভারতীয়দের পরাজয়ের কারণ, তাহার সাহায্যেই তিনি পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার অনেক যুদ্ধ জয় করেন। প্রধানতঃ বিজ্ঞতার সহিত হস্তী সাজাইবার গুণেই বল্‌খের যুদ্ধে ইলাক খাঁর বিপুল বাহিনীর পরাজয় ঘটে।[৩২] তাঁহার গঠনশক্তি এতই চমৎকার ছিল।

কখন কাহাকে আক্রমণ করিলে কৃতকার্য্য হইবেন, অদ্ভুত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির বলে মাহ্‌মুদ গজনায় বসিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন। যাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোমর বাঁধিয়াই লাগিতেন। তজ্জন্য তিনি বরাবরই বিজয়-মাল্যের অধিকারী হইতেন।

মাহ্‌মুদের দ্রুতগতি দেখিয়া শত্রুরা বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। একই শীত ঋতুতে তিনি মুলতানের কার্‌মাথিয়া ও বল্‌খের তাতারদিগকে পরাজিত করেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিতস্তা নদী তীরে একজন বিদ্রোহী সেনাপতিকে ধৃত করিতেও তাঁহার সময়ের অভাব হয় নাই। বিদ্রোহী সুখ পাল যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমঘোরে অচেতন, তখন মাহ্‌মুদ অকস্মাৎ মুলতানের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বজ্রনাদে তাঁহার সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। কাসদবের রাজা সোলতানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার শহর ঘিরিয়া ফেলেন। দুস্তর রাজপুতনা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি এত অকস্মাৎ অনহিল্বরায় উপস্থিত হন যে, গুজরাটের রাজা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হইলেও তাড়াতাড়ি নগর ত্যাগে বাধ্য হন। থানেশ্বর অভিযানের সময় তিনি পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হন যে, পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াও রাজা বিজয় পাল তাঁহাকে বাধা দানে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।[৩৩] এমন কি যখন তিনি মরণ-রোগে আক্রান্ত, তখনও অপূর্ব্ব দ্রুতগতিতে মেনুচেহরের ঘাড়ে আপতিত হন এবং সেলজুকদিগকে খোরাসান হইতে হাঁকাইয়া দেন। শত্রুরা সম্মিলিত হওয়ার পূর্ব্বেই মাহ্‌মুদ বিদ্যুৎগতিতে তাহাদের একজনকে পরাজিত করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। এমতাবস্থায় তাঁহার সাহসী অথচ মন্থরগতি শত্রুরা যে উৎসন্ন যাইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? উত্তরকালে নেপোলিয়ান এই নীতি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন।

মাহ্‌মুদ ছিলেন সেনাপতি, সৈন্য নয়। প্রয়োজন হইলে তিনি শত্রু-বাহিনীর নিবিড়তম অংশে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু অনর্থক বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া তিনি বৃথা বিপদ টানিয়া আনিতেন না। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক সেনাপতি ছিলেন। যখন যাহাকে আক্রমণ করিলে জয়ের আশা নাই, তিনি তখন তাহাকে আক্রমণ করিতেন না। কোন অসম্ভব কার্য্যে হাত দিতেন না বলিয়াই তিনি কখনও পরাজিত হন নাই।

সেনাপতির প্রধান গুণ সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা। কেহ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে মাহ্‌মুদ কঠোর হস্তে তাহার শাস্তি দিতেন। একবার এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করিল, এক সিপাহী তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাহার পত্নীর সহিত ব্যভিচার করিতেছে। সোলতান বলিলেন, "সে আবার কবে আসিবে আমাকে বলিয়া যাও; আমি স্বয়ং তাহার শাস্তি বিধান করিব।" নির্দ্দিষ্ট তারিখে মাহ্‌মুদ ছদ্মবেশে তাহার গৃহে গিয়া দেখিলেন, পাপিষ্ঠ সত্যই গৃহকর্ত্তার পত্নীর সহিত শুইয়া আছে। আলো নিবাইয়া দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পরে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়া অপরাধীর মুখ দেখিয়া তিনি সেজ্‌দায় যাইয়া খোদার নিকট শোকর করিতে লাগিলেন। ভূমি হইতে উঠিয়া মাহ্‌মুদ পেট ভরিয়া জল পান করিলেন। তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকটী বিস্ময় গোপন রাখিতে পারিল না। সোলতান বলিলেন, "এই লোকটীকে আমার পুত্র বলিয়া সন্দেহ হয়; যাহাতে স্নেহবশে কর্ত্তব্যে ত্রুটী না ঘটে তজ্জন্য আমি বাতি

নিবাইয়া দেই। শাস্তি দানের পর যখন দেখিলাম, সে অন্য লোক, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। এই অন্যায়েব প্রতিবিধান না করিয়া কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। তোমার নালিশের পর হইতে আজ তিন দিন পর্যান্ত আমি কিছুই খাই নাই।"[২৮]

ভারতাভিযান মাহ্‌মুদের সামরিক প্রতিভার চরম বিকাশ। ইহা সাহস ও সতর্কতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তিনি বিরাট নদী ও গভীর অরণ্য-পূর্ণ এক অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। তথাকার অধিবাসীদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একটী মাত্র ভুলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে পারিত। একবার পরাজিত হইলেই শত্রুরা তাঁহার সৈন্যগণকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিত। অন্যের নিকট ইহা অন্ধকারে পদক্ষেপ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু মাহ্‌মুদ অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া সাবধানে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশ্য তাঁহার অনুচরদের সাহস ও নির্ভীকতাও তুল্য প্রশংসনীয়। প্রথমে তিনি দশ বার মঞ্জিলের অধিক দূর যাইতে সাহসী হন নাই। এই সতর্কতার ফলে তাঁহার জয়লাভ হইতে লাগিল। দিন দিন সফলতা লাভ করায় ক্রমশঃ তাঁহার নামের মর্য্যাদা বাড়িল। শত্রুদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তিনি তিন বার গঙ্গাতীরে ও একবার গুজরাটে প্রবেশ করেন।

মাহ্‌মুদের অভিযান বিজয়-যাত্রা বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। মন্দিরের অর্থের জন্য তাঁহাকে ভীষণ সঙ্কটের ঝুঁকি মাথায় লইতে হইত। একটী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হইলেও হৃত-সাহস ভারতীয়দের মনের বল ফিরিয়া আসিত। ১০১০ খৃষ্টাব্দে বিনা বাধায় রাজধানী হইতে তিন মাসের পথ দূরে গিয়া মাহ্‌মুদের মনে বাস্তবিকই এই ভয় হয়। কিন্তু তাঁহার নামের মর্য্যাদা এত বেশী ছিল যে, রাজা গন্দ বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নৈশ অন্ধকারে পলাইয়া যান। বস্তুতঃ অবিশ্রান্ত পরাজিত হওয়ায় ভারতীয় রাজাদের মনে মাহ্‌মুদের নাম শ্রবণেই ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইত। তিনি শারওয়ার রাজা চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে নিদার ভীম তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "সোলতান মাহ্‌মুদ ভারতীয় রাজাদের ন্যায় কৃষ্ণকায় লোকের নেতা নহেন। তাঁহার ও তাঁহার পিতার নাম শুনিলেই সৈন্যেরা ভয়ে পলাইয়া যায়। ... প্রাণ বাঁচাইতে চাহিলে আপনি কোথায় লুকাইয়া থাকুন।" এই পত্র পাইয়া চাঁদ রায় পর্ব্বতে পলাইয়া যান। মোসলমানেরা বরাবর জয়লাভ করিবে, এ ধারণা ভারতীয়দের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

ভারতে মাহ্‌মুদের সফলতার প্রধান কারণ, তাঁহার অবিভক্ত শক্তি। গজনার ধনবল, জনবল কেবল তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত হইত। পক্ষান্তরে আর্য্যাবর্ত্ত অসংখ্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ রাজা, মহারাজা ও স্থানীয় সর্দ্দারের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তাঁহাদের কেহই অপরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহিতেন না। এক গোত্রের রাজপুত অন্য গোত্রের সহিত কলহ-বিবাদে মত্ত থাকিত। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় তাহারা সহজে নিজেদের ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা অপেক্ষা বৃহত্তর স্বার্থের কল্পনা করিতে পারিত না। অবশ্য সময় সময় যে তাহারা দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইত না, এমন নহে। ঐহন্দের যুদ্ধে হিন্দু রমণীরা নিজেদের গহনা-পত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সাহায্য প্রেরণ করে। একাধিক বার ভারতীয় রাজারা বিজেতার অগ্রগতি রোধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দেয়। ঐহন্দে ভালরূপে যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই যখন বিরাট হিন্দু-বাহিনী পলাইয়া যায়, তখনই তাহাদের এই আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা মাহ্‌মুদের চক্ষে ধরা পড়ে। ইহার সুযোগ গ্রহণে কখনও তাঁহার ত্রুটী দেখা যায় নাই।

বিভিন্ন জাতীয় লোক লইয়া গঠিত হইলেও বহু বৎসর পর্য্যন্ত একযোগে কার্য্য করায় সোলতানের সৈন্যদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয়। অতীত বিজয়ের গৌরব ও ভাবী লুণ্ঠনের আশায় তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়; বরাবর একই প্রভুর অধীনে কাজ করায় তাহারা কেবল তাঁহারই জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিখে। পক্ষান্তরে জায়গীর-প্রথা বিদ্যমান থাকায় রাজপুতেরা জায়গীর-দারের যত আজ্ঞাবহ হইত, রাজার জন্য তত মাথা ঘামাইত না। নিরন্তর পরাজিত হওয়ায় পশ্চাদনুসরণ ও হত্যার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই তাহাদের কল্পনা-নেত্রে ভাসিয়া উঠিত না।

জাতিভেদ প্রথার দরুণ চারিবর্ণের মধ্যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিত। তজ্জন্য সকল সময় বিজেতাকে বাধা দানের জন্য পর্য্যাপ্ত সৈন্য পাওয়া যাইত না। সামরিক জায়গীরের দোষে সৈন্য সংগ্রহেও বিলম্ব হইত। পক্ষান্তরে মাহ্‌মুদের বেতন-

ভোগী সৈন্যেরা অহরহ প্রভুর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিত। সময় সময় ভারতীয়েরা তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হওযাব পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যুৎগতিতে তাহাদের রাজধানী বা দেব-মন্দির লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়িতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর প্রায় সর্ব্ববিষয়ে মাহ্‌মুদের অসীম শ্রেষ্ঠত্ব ও তদানীন্তন ভারতেব সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দরুণই ভারতীয়েরা তাহাদের ধন-প্রাণ ও তীর্থস্থান রক্ষা করিতে পারে নাই।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহ্‌মুদের ভারতাক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য লুণ্ঠন, রাজ্যস্থাপন নহে। কেহ কেহ তাঁহাকে একজন 'বড় দস্যু' বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অধ্যাপক হবীব বলেন, "তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, একটী তুর্ক-পারস্য সাম্রাজ্য গঠন করা; ভারতাভিযান সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র।" ভারত আক্রমণের ফলে মাহ্‌মুদের জনবল ও নামের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু সে অর্থ তিনি কেবল পারস্য জয়েই ব্যয় করেন নাই, ভারত জয়েও তাহা সমভাবে ব্যয়িত হয়। নামের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুরূপ উপকারে আসে। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা ভারতেই তিনি বেশী উপকার পান।

অধ্যাপক সাহেব মাহ্‌মুদের পারসিক ও ভারতীয় নীতির মধ্যেও পার্থক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি নাকি পশ্চিমাঞ্চলের বিজিত জনপদ বরাবরই স্বরাজ্যভুক্ত করিতেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ায় মাহ্‌মুদের অনেক করদ নরপতি ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি গজনার চতুর্দ্দিকস্থ নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করিতেন, কিন্তু দূরবর্ত্তী রাজ্য করদ রাজাদের হাতে রাখিয়া দিতেন। ভারতেও তিনি একই নীতির অনুসরণ করেন। তিনি পাঞ্জাব স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন, কিন্তু দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলি করদ রাজাদের হাতে থাকে। অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে রাই খ্বারিজম প্রভৃতি কয়েকটী দূরবর্ত্তী প্রদেশও প্রত্যক্ষভাবে মাহ্‌মুদের শাসনাধীনে আসে। ভারতে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার কারণ, ঐ রাজ্যগুলি মোসলমান-প্রধান দেশ। অথচ ভারতে মোসলমান অধিবাসী ছিল না। মাহ্‌মুদ বড় জোর প্রধান প্রধান নগরে কয়েক হাজার সৈন্য রাখিতে পারিতেন। তাহারা কি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে দাবাইয়া রাখিতে পারত? অধ্যাপক হবীব নিজেই স্বীকার করেন, "যেখানে শাসন-তন্ত্রের সমর্থনের জন্য মোসলমান অধিবাসী নাই, সেখানে ইস্‌লামী শাসন প্রবর্ত্তন বাস্তব রাজনীতির বহির্ভূত ব্যাপার। ভারত জয় সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই মাহ্‌মুদ সে চেষ্টা করেন নাই।" অথচ এই 'অসম্ভব' ও 'বাস্তব রাজনীতির বহির্ভূত কার্য্য' করেন নাই বলিয়া অন্যান্য ঐতিহাসিকের সহিত সুর মিলাইয়া তিনিও মাহ্‌মুদকে দায়ী করিয়া থাকেন! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্?

ভারত স্বরাজ্যভুক্ত করা বাস্তবিকই তখন অসম্ভব ছিল; কিন্তু মাহ্‌মুদের আদৌ সে ইচ্ছা ছিল না, এ কথা ঠিক নহে। পাঞ্জাব ইহার প্রমাণ। অবশ্য ইহা দখলে আনিতে বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্বকে অধ্যাপক সাহেব সোলতানের ভারত-জয়ের অনিচ্ছার অন্যতম প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে এখানেও উক্ত কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, তিনি মোসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করেন। নানা কারণে এখানে অধিকতর সফলতা লাভ করে। সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পাঞ্জাবের সহিত মোসলমানদের সংশ্রব ঘনিষ্ঠতর ছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশে মাহ্‌মুদ সাধারণতঃ একাধিকবার অভিযান করিতেন না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেখান হইতে ইস্‌লামের চিহ্ন মুছিয়া যাইত। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবে তিনি বহুবার যুদ্ধ করেন। প্রত্যেক অভিযানেই তাঁহাকে এই প্রদেশের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। কাজেই তাঁহার সঙ্গে যে সকল ধর্ম্ম-প্রচারক থাকিতেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অধিকতর সফলকাম হন। দ্বিতীয়তঃ, অন্যায়রূপে আনন্দ পাল বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে সিংহাসনচ্যুত করা মাহ্‌মুদের ইচ্ছা ছিল না। ভীমপাল যখন অনর্থক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান, তখন ন্যায়তঃ পাঞ্জাব অধিকারের পথে আর কোন বাধা রহিল না। ইহাও নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার। মাহ্‌মুদ বহু পূর্ব্বেই আনন্দ পালকে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করেন। ত্রিলোচন পালের হাত হইতে তিনি নন্দনা কাড়িয়া লন। ভীমপাল ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতেন। সুতরাং পাঞ্জাবের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্ব্বেই গজনভী সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

ভারতের ইতিহাসে পাঞ্জাব অধিকারের গুরুত্ব অপরিমেয়। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব তীরে স্থায়িভাবে

মোসলমান সৈন্য স্থাপিত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতে মোসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। খসরুর সময় স্থায়িভাবে লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় গজনভীরা চিরতরে ভারতের বাসিন্দা হইয়া যান। শত চেষ্টা করিয়াও হিন্দুরা তাঁহাদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে নাই। এই পাঞ্জাবকে ভিত্তি করিয়াই উত্তরকালে মোহাম্মদ গোরী হিন্দুস্তানে মোসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। নতুবা এত শীঘ্র দিল্লীতে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ভারতে মোসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ গৌরব একমাত্র মাহ্‌মুদেরই প্রাপ্য। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরবেও ন্যায়তঃ তাঁহার দাবী আছে; উহা একা মোহাম্মদ গোরীর প্রাপ্য নহে।

সৌভাগ্যবশতঃ দুই এক জন ঐতিহাসিক মাহ্‌মুদের প্রতি কতকটা সুবিচার করিয়াছেন। ওয়াথেন ও গ্যারেট বলেন, "লুণ্ঠন ও দিগ্বিজয় তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়।"*৩৫ কীন বলেন, "যে সকল স্থান শাসন করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল, মাহ্‌মুদ তাহা স্থায়িভাবে রাজ্যভুক্ত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন। সেজন্য ভারতে তিনি পিতৃরাজ্য (প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক বেশী) লইয়াই তৃপ্ত থাকেন; দেশের অবশিষ্ট অংশ লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেও তথাকার শাসন-ভার নিজের হাতে রাখার চেষ্টা করেন নাই।"*৩৬ বাস্তাবিকই পশ্চিমে ও উত্তরে তাঁহার রাজ্য-সীমা এত বর্দ্ধিত হয় যে, সেকালে এক ব্যক্তির পক্ষে উহা শাসন করা কঠিন ছিল। তিনি যে পূর্ব্বদিকে উহা আরও বৃদ্ধি করেন নাই তাহা তাঁহার অপরাধ নহে, রাজনৈতিক বিজ্ঞতারই পরিচয়।

ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ মাহ্‌মুদের ভারতাভিযানকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। আজকাল যেমন কোন ঘটনায় এক পক্ষে হিন্দু, অপর পক্ষে মোসলমান — এমন কি এক দিকে হিন্দুর ও অন্য দিকে মোসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও অনেকে তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইয়া থাকেন, মাহ্‌মুদের বেলাও তাহাই ঘটিয়াছে। হিন্দু-মোসলমানের সংগ্রাম বলিয়া লোকে তাঁহার ভারতাক্রমণকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মাহ্‌মুদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা যে নিছক বিজয়াভিযান মাত্র, সমসাময়িক প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা, মাহ্‌মুদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত, তাঁহার সৈন্যদল গঠনের বৈশিষ্ট্য ও হিন্দুদের সহিত তাঁহার অনুপম উদার ব্যবহারই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মাহ্‌মুদের বহু পূর্ব্বেই ধর্ম্ম-যুদ্ধের যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সময় মোসলমানেরা যে সকল যুদ্ধ করিত, তাহা কেবল রাজ্যরক্ষা, রাজ্যবিস্তার বা অনুরূপ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নহে। এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মাহ্‌মুদের ভারতাভিযান কিছুতেই ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।*৩৭

ধর্ম্ম-যোদ্ধার গৌরব দান দূরের কথা, "সমসাময়িক মোসলমান ঐতিহাসিকেরা ধর্ম্মের প্রতি মাহ্‌মুদের অন্ধভক্তি ছিল বলিয়াও স্বীকার করেন না; তাঁহারা বরং তাঁহাকে সন্দেহবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া থাকেন।*৩৮ তিনি নাকি (কেয়ামতের) সাক্ষ্যপ্রমাণে বিশ্বাস করিতেন না, পরলোকও মানিতেন না। অবশেষে যখন তাঁহার মনে হয়, তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, হজরত স্বপ্নে আসিয়া তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছেন।"

সোলতানের সৈন্যেরা বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করিত; হজরত বা প্রাথমিক খলীফাদের অনুচরদের ন্যায় তাহাদের কেহই ইস্‌লাম প্রচারের মহান্ আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে আসে নাই। মাত্র পরবর্ত্তী দুইটী অভিযানে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেয়। নিয়মিত সৈন্যের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য; দ্রুতগতিতে অভ্যস্ত ছিল না বলিয়া তাহাদের দ্বারা সোলতানের বিশেষ উপকার হয় নাই।

মারাঠা বাহিনীর ন্যায় মাহ্‌মুদের সৈন্যদলে হিন্দু, মোসলমান উভয় জাতীয় লোকই ছিল। উদরান্নের জন্য তাহারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে সমভাবে যুদ্ধ করিত। এরূপ উদর-সর্ব্বস্ব মিশ্রিত বাহিনী লইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করা চলে না; উহার জন্য চাই শতে শতে স্বার্থহীন আত্মোৎসর্গকারী বীর-পুরুষ।

মাহমুদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী, অলী বা ধর্ম্ম-প্রচারক নহেন। উন্নত সদাশয়তা ও পরমতসহিষ্ণুতা তাঁহার ভারতীয় নীতির ভিত্তি। তিনি হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা দান করেন। তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াই

তিনি তৃপ্ত থাকিতেন, কখনও তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগে বাধ্য করিতেন না।[৩৯] কয়েকজন ভারতীয় রাজা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক গরজ সিদ্ধির জন্য। সোলতানের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যান।

হিন্দু রাজাদের সহিত ব্যবহার কালে বরাবরই মাহ্‌মুদের দয়া ও ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যাইত।[৪০] এমন কি তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও সদাশয় সোলতান তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেন না।[৪১] পুরুর প্রতি সদাশয়তা দেখাইয়া আলেকজাণ্ডার বিখ্যাত হন; মাহ্‌মুদ তাঁহার দয়া ও মহানুভবতায় শত শত রাজাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। তিনি হিন্দুদিগকে অবাধে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিতেন। সন্ধি সর্ত্তানুযায়ী ভারতীয় করদ রাজারা তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে তাহাদিগকে লইয়া জনৈক হিন্দু সেনাপতির অধীনে একটী পৃথক বাহিনী গঠিত হয়। সোলতানের কর্ম্মচারী মহলে তিনি অত্যন্ত সম্মানার্হ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পরে বহুসংখ্যক হিন্দু গজনার গৃহ-বিবাদে যোগদান করে। তিলক নামক জনৈক প্রতিভাবান ক্ষৌরকার-সন্তান সোলতান মসঊদের আমলে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইনি মাহ্‌মুদের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ভারতের সহিত তাঁহার পরিচয়ের মাত্র সাত বৎসর পরে একদল হিন্দু সৈন্য মোসলমানদের সহিত একযোগে অ-মোসলমান ইলাক খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয়-মাল্যের অধিকারী হয়।[৪২] তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে কিছুতেই তাহারা সুদূর মধ্য-এশিয়ায় তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিতে যাইত না।

মাহ্‌মুদের হিন্দু সৈনিকদিগকে যে ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। গজনার বুকে বসিয়া তাহারা শাঁখ বাজাইয়া অবাধে মূর্ত্তি পূজা করিতে পারিত। তাহাদের বাসের জন্য পৃথক পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। মাহ্‌মুদ ধর্ম্মান্ধ হইলে তাহারা তাঁহার রাজধানীতে এরূপ স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে পারিত না, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার নিকট এত সুবিধাজনক ব্যবহারও পাইত না।

মোস্‌লেম-বিদ্বেষী হইলেও এলফিনষ্টোন বলেন, "প্রাচ্যবাসীরা যেমন লোভী বলিয়া মাহ্‌মুদের খুব নিন্দা করিয়া থাকে, ইউরোপীয় লেখক মহলেও তেমনি ধর্ম্মান্ধ বলিয়া তাঁহার বদনাম আছে। প্রথম অভিযোগ সত্য হইলেও অপর অপবাদ ভ্রান্ত ধারণার ফল বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধে মাহ্‌মুদের লাভ হইত; বিশেষতঃ তাঁহার সময় ইহাই ছিল যশোলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। তজ্জন্যই তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। অন্যান্য মোসলমানের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার আগ্রহ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন; হয়ত এ বাসনা তাঁহার মনেও জাগিত। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কখনও তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বার্থ ত্যাগ করেন নাই। এমন কি যখন ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার কোনও ক্ষতি হইত না, তখনও তিনি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহা দেখাইতেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার যাবতীয় অভিযানে যত লোক ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই একটী প্রদেশ স্থায়িভাবে দখলে আনিলে তদপেক্ষা অধিক লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত।...

এমন কি যে সকল স্থান তাঁহার অধিকারে আসে সেখানেও মাহ্‌মুদ ধর্ম্ম প্রচারে কোন উৎসাহ দেখান নাই। তিনি গুজরাটে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন; লাহোর তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। অথচ সেই সকল স্থানের কোন লোককে তিনি আদৌ ইস্‌লামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না, বলপূর্ব্বক দীক্ষা দান ত দূরের কথা।[৪৩] তাঁহার একমাত্র মিত্র কনৌজের রাজা অ-দীক্ষিত হিন্দু ছিলেন। লাহোরের রাজার সহিত তাঁহার সম্পর্ক কেবল রাজনীতিতেই নিয়ন্ত্রিত হইত, ধর্ম্মের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তিনি যখন এক জন হিন্দু সন্ন্যাসীকে গুজরাটের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার চিন্তা-স্রোত নিশ্চিতই অন্য পথে ধাবিত হয়, ইস্‌লাম প্রচারের কথা তাঁহার মনেও হয় নাই।"

এলফিনষ্টোন ও মৌলভী দাকাউল্লা খাঁর মতে মাহ্‌মুদ হিন্দুদের দেব-মন্দির লুণ্ঠন করায় তাহাদের মনে ইসলামের প্রতি উৎকট ঘৃণা জন্মে। অধ্যাপক হবীব এই মত ধার করিয়া তাহাতে রং ফলাইয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আল্-বেরুনি বলেন, হিন্দুরা ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই, তাহাদের ধর্ম্মের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্যের জন্য। দ্বিতীয় কারণ, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের আন্তরিক ঘৃণা। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ" — ইহাই তাহাদের চিরন্তন নীতি। তৃতীয় কারণ পৌরোহিত্যবিরোধী নব ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণদের প্রবল শত্রুতা। চতুর্থ কারণ, হিন্দুদের আত্মম্ভরিতা। আল্-বেরুনির ভাষায়, জগতে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশ ও হিন্দু ছাড়া অপর কোন জাতি

আছে বা আর কেহ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান জানে, একথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। পঞ্চম কারণ তখনও ধর্ম্মপ্রচারের সময় উপস্থিত হয় নাই; এজন্য শান্তির দরকার। মাহ্মুদের যুগ নিছক বিজয়ের যুগ। মোহাম্মদ গোরী হিন্দুস্থান দখলে আনিয়া নিয়মিত শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলে ইসলাম প্রচারের সুবিধা হয়। পারস্যের অদ্বৈতবাদী সূফীদের কল্যাণে ইতিমধ্যে কোরান ও বেদান্তের মধ্যে একটা ছোটখাট সন্ধি হইয়া যায়। পীর-পূজা ও গোরপূজা আসিয়া মূর্ত্তি-পূজার স্থান গ্রহণ করে। দর্গাহ ও মসজেদে মানত এবং স্থল বিশেষে গান-বাজনা বা কীর্ত্তন মোসলমানদের বিশ্বাসের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী কালের ইসলামকে কতকটা হিন্দু ধর্ম্মের টুপি পরা সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কাজেই উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে হিন্দুদের মনে স্থান পায়। এতদ্ব্যতীত সমগ্র দেশে ইস্‌লামী শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শাসক জাতির সহিত সমান সম্বন্ধ স্থাপন, সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে অনেক হিন্দু মোসলমান হইয়া যায়। মাহ্মুদের সময় তাহাদের সম্মুখে এ লোভ ছিল না।

হিন্দুদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার উদারতা প্রদর্শন সত্ত্বেও মাহ্মুদ তাহাদের কয়েকটা মন্দির লুণ্ঠন ও মূর্ত্তি ভগ্ন করেন। দৃশ্যতঃ ইহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। হবীব প্রভৃতি যে সকল সমালোচক তাঁহাকে 'খামখা রক্তপাত' ও 'বে-পরোয়া মন্দির লুণ্ঠনে'র জন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা মেহেরবানী করিয়া ভুলিয়া যান যে, কেবল যুদ্ধের সময়ই এই সকল তথা-কথিত 'বর্ব্বরতা' অনুষ্ঠিত হয়। পরাজিত শত্রুর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া নেওয়া চিরকাল বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। জগতের সমস্ত বড় বিজেতাই তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা ইহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তবে অন্যত্র সাধারণতঃ কোষাগার লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু ভারতে মন্দিরেই বেশী টাকা থাকিত। সুদূর অতীত কাল হইতেই এ দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক। খনি হইতেও যথেষ্ট স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তোলিত হইত। হিন্দুরা অতি ধার্ম্মিক জাতি। তাহাদের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যুগে যুগে ভক্তদের প্রদত্ত অর্থে দেব মন্দির ভরিয়া যায়। অনেক সময় রাজারাও সেখানে টাকা জমা রাখিতেন। রাজভাণ্ডারের ক্ষয় হইত, কিন্তু দেব-ধন হ্রাস পাইত না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা লইয়া দেশ-বিদেশের লোকে গল্প করিত।

মাহ্মুদের সময় এই বিপুল অর্থ জাতীয় বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তিনি মন্দির লুণ্ঠন করিয়া ভারতের যুগ-যুগব্যাপী সঞ্চিত অর্থ গজনায় লইয়া যান। ইহা নিছক অর্থলোভ, ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, মাহ্মুদ কখনও কোন ধন-রত্নহীন মন্দির লুণ্ঠন বা ধ্বংস করেন নাই। ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইলে তিনি নির্ব্বিচারে দেশের সমস্ত মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। দ্বিতীয় প্রমাণ, যতদিন মাহ্মুদ মন্দিরের অর্থের সন্ধান পান নাই, ততদিন তাঁহার হস্তে কোন মন্দির লুণ্ঠিত হয় নাই। ষষ্ঠ অভিযানে নগরকোটের মন্দির লুণ্ঠন করিয়াই তিনি সর্বপ্রথম হিন্দু তীর্থের অতুল ঐশ্বর্য্যের খোঁজ পান। এই সময় হইতে বড় বড় মন্দির লুণ্ঠন তাঁহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেশের অধিকাংশ টাকা জমা করিয়া হিন্দুরা তাঁহার কাজ সহজসাধ্য করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দিরের অর্থের প্রতি মাহ্মুদের লুব্ধ দৃষ্টির সন্ধান পাইয়াও তাহারা ইহা অন্যত্র অপসৃত করা বা লুকাইয়া রাখা দরকার মনে করে নাই। তাহারা কিছু বুদ্ধি খরচ করিলে কেহ তাঁহাকে 'মূর্ত্তি ভঙ্গকারী' বলিয়া বদ্‌নাম দিবার সুযোগ পাইত না।

কেবল যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই মাহ্মুদ মন্দির লুণ্ঠন করিতেন; শান্তির সময় কখনও কোন হিন্দু তীর্থ তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং সমর-নীতির দিক্ দিয়া কিছুতেই তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। তাঁহার সময় শত্রুপক্ষের উপাসনাগার লুণ্ঠন করা ন্যায়সঙ্গত সামরিক কার্য্য ও পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়া বিবেচিত হইত। তজ্জন্য সমসাময়িক হিন্দুরা তাঁহার কার্য্যে ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হইতেন না। একালের ঐতিহাসিক বা সমালোচকেরা না জানিলেও সেকালের ভারতীয় রাজারা বেশ জানিতেন, মাহ্মুদের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক নহে। তজ্জন্য তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাকে প্রচুর ধন-রত্ন উপঢৌকন দিতেন। মাহ্মুদও দেব-মন্দির বা দেব-মূর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রসন্নচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন।

জগতের কোন বড় দিগ্বিজয়ীই ধর্ম্ম নিয়া বেশী মাথা ঘামাইতেন না। দরকার হইলে তাঁহারা ধর্ম্মকে রাজনৈতিক গরজ সিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করিতেন মাত্র। নেপোলিয়ান মিসরে মোসলমানী পোষাক পরিতেন, এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ পড়িতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদের চিত্তজয়। তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে মোসলমান বলিয়া

অভিহিত করিলে তিনি নাচার। মাহ্মুদের বেলায় এরূপ ভুল হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। তিনি এক অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ দেশে প্রবেশ করেন। সীমান্তের দুর্ভেদ্য গহন বন ও পঞ্চনদের বাহিরে বহু গ্রাম, নগর ও নির্জ্জন অরণ্যে মোয়াজ্জেনের আজান-ধ্বনি ভাসিয়া উঠে। আলেকজাণ্ডার বা শাহ্নামার বীরদের কেহই এমন আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কাজেই তাহা যে সহজে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীদের চিত্ত বিমোহিত করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? পক্ষান্তরে তাঁহার মন্দির লুণ্ঠন দেখিয়া বিধর্ম্মীরা তাঁহাকে স্বভাবতঃই ধর্ম্মান্ধ বলিয়া মনে করিত, অনেকে এখনও করে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখার ফলে শত্রু মিত্র প্রায় সকলেই মাহ্মুদকে ভুল বুঝিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। ধর্ম্ম-যোদ্ধার গৌরব কিছুতেই তাঁহার প্রাপ্য নহে, --- খামখা রক্তপাতের জন্যও তিনি দায়ী নহেন। শান্তির সময় কখনও কোন হিন্দু তাঁহার হাতে প্রাণ দেয় নাই। যুদ্ধকালীন নরহত্যার জন্য যদি সিজার, হানিবল, আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ান দায়ী না হন, তবে মাহ্মুদকেও দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট হিন্দু-মোসলমানে ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু রাজাদের ন্যায় পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার আমীরদিগকেও তিনি সমভাবে উত্যক্ত করিতেন, মোসলমান বলিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট রেহাই পাইতেন না। সিন্ধু ও গঙ্গাতীরে যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধবিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় আমুদরীয়ার তীরে, কাস্পিয়ান সাগর তটে ও পারস্যের মহামরুভূমির চতুষ্পার্শ্বে তুল্য নিরপেক্ষতার সহিত তাহারই পুনরাভিনয় ঘটে। এলফিনষ্টোন বলেন, যুদ্ধ বা অবরোধের বাহিরে তিনি কোন হিন্দুকে হত্যা করিয়াছেন, এমন কথা কোথাও নাই। তিনি হত্যা করিতেন, শুধু পারস্যের তাঁহার মোসলমান ভাইদিগকে।"•৪৪

বস্তুতঃ হিন্দুরা মাহ্মুদের নিকট ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেও মোসলমানেরা পায় নাই। কেহ গোঁড়া সুন্নীদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। নৈতিক অপরাধী ও প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধবাদীদিগকে শাস্তি দানের জন্য তিনি একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। কার্ম্মাথিয়া ও বাতেনীরা তাঁহার হাতে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে। সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশ হইতে ধরিয়া নিয়া তিনি তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। যাহারা মত পরিবর্ত্তন না করিত, তাহারা নির্ব্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এমন কি তাহাদের সাহিত্যও এই নিষ্ঠাবান যোদ্ধার ক্রোধানল হইতে রক্ষা পায় নাই। তাঁহার আদেশে তাহাদের প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক কার্ম্মাথিয়া দমনকেও মাহ্মুদের ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাহিয়াছেন। "পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিতে বসিয়া ব্রাউন সাহেবও এই অনধিকার চর্চ্চাটুকু না করিয়া পারেন নাই।

বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা মাহ্মুদের ধর্ম্মোন্মত্ততার ফল নহে; এখানেও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান। তিনি রাজ্যের ধর্ম্মনৈতিক একতায় বিশ্বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা সুন্নী বলিয়া তাহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী ধর্ম্ম-নীতি নিয়ন্ত্রিত না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তদুপরি কার্ম্মাথিয়া ও বাতেনীদের সাহায্যে ফাতেমিয়ারা প্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেন বলিয়া বাগদাদের খলীফার তাহাদের প্রতি জাত-ক্রোধ ছিল। ক্ষমতাহীন হইলেও হজরতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মোসলেম জগতের যে কোন অংশ যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারিতেন। তাঁহার মঞ্জুরী ব্যতীত কাহারও রাজ-ক্ষমতা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইত না। কাজেই তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের অত্যন্ত সুবিধা হইত। প্রধানতঃ তাঁহার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মাহ্মুদ কার্ম্মাথিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাহারা ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে হজযাত্রীদল ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে, শত সহস্র সুন্নী যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের হস্তে অকারণে নিহত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরেও কার্ম্মাথিয়া দলনের জন্য মাহ্মুদকে দায়ী করা চলে না।

এলফিনষ্টোন বলেন "এই মোসলমান-হত্যাও যুগের দোষ — মাহ্মুদের নহে। জনৈক উদারতম ইংরেজ ঐতিহাসিক দার্শনিক পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ বলিয়া যে অ-মোসলমান চেঙ্গিজ খাঁর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।"•৪৫

কেবল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী বলিয়াই ইতিহাসে মাহ্মুদের নাম পরিকীর্ত্তিত হয় নাই, সাহিত্য ও শিল্পকলায়

উৎসাহদানের জন্যই তিনি সর্ব্বাধিক বিখ্যাত। "তাঁহার সময় সৈনিকের পক্ষে এরূপ বিদ্যোৎসাহিতা ও শিল্পানুরাগ দুর্লভ ছিল। সাহিত্য ও শিল্পকলার মুরুব্বী হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।"[৪৬]

যুদ্ধের ন্যায় মাহ্‌মুদ জ্ঞান-চর্চ্চায়ও অনুরূপ আনন্দ লাভ করিতেন। প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় ভারতের গ্রাম-নগর, প্রান্তর-পর্ব্বত মথিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে শত শত মাইল ছুটিয়া অথবা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় অকস্মাৎ আরব সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী খ্বারিজমের উপর আপতিত হইয়া এই অস্থিরচিত্ত দুঃসাহসী বীর-পুরুষ গজনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগে কাবা ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেন। এমন কি শ্রমসাধ্য যুদ্ধাভিযানের মধ্যেও তিনি কবিতা বা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য একটু অবসর করিয়া লইতেন। তিনি গজনায় বহু স্কুল, একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়, এক বিরাট লাইব্রেরী ও একটী যাদুঘর স্থাপন করেন। পুস্তক ও লেখক সংগ্রহ তাঁহার বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোথাও কোন সুধী ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিলেই মাহ্‌মুদ তাঁহাকে গজনায় আনাইবার জন্য লোক পাঠাইতেন। প্যারিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নেপোলিয়ান বিজিত জনপদের উৎকৃষ্ট শিল্প-দ্রব্যসমূহ লইয়া যাইতেন। মাহ্‌মুদের কাজ অধিকতর প্রশংসনীয়; কোন নূতন নগর হস্তগত হইলে তথাকার লাইব্রেরীর সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থ গজনায় পাঠাইয়া দিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইত না; তিনি স্বয়ং শিল্পী ও কবিগণকেই রাজধানীতে লইয়া আসিতেন।

বিদ্যানুরাগী সামানিয়া বংশের পতনে বহু কবি ও পণ্ডিত বেকার হইয়া পড়েন। সোলতান মাহ্‌মুদের জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা গজনায় ছুটিয়া আসিলেন। পারস্য ও খোরাসান এবং আমুদরিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে প্রাচ্যের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সেখানে সমবেত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত সৌর-মণ্ডলের ন্যায় নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন। ফলে মাহ্‌মুদের দরবার মর্ত্ত্যের ছায়া পথে পরিণত হয়।[৪৭] চারিশত কবি তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন। এশিয়ার অপর কোন রাজার দরবারে অদ্যাপি এত অধিক বিদ্বজ্জনের সমাগম হয় নাই।[৪৮]

বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি মাহ্‌মুদের বদান্যতার সীমা ছিল না। এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পণ্ডিতদিগকে তিনি বার্ষিক প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি দিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট আশাতীত পুরস্কার পাইতেন। গাজায়রীর একটী কাশিদার জন্যই সোলতান তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার দেরহাম দান করেন। তিন বার তিনি রাজ-কবি আন্‌সারীর মুখমণ্ডল মুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। কেবল ফেরদৌসী ও আল্-বেরুণীই তাঁহার নিকট আশানুরূপ ব্যবহার পান নাই। কিন্তু সে দোষ একা মাহ্‌মুদের নহে; উহা তাঁহাদের ঈর্ষ্যাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্রের ফল।

বার্থল্ড সাহেব বলেন, মাহ্‌মুদ বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহায্য করিতেন গজনার গৌরব বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃত জ্ঞানানুরাগের অনুরোধে নহে। রাজধানীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ছিল না একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কবি ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নিজেরও কিছু খ্যাতি ছিল। তিনি ফেকাহ্ সম্বন্ধে তাফ্রিদুল ফুরু নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। যে সকল রাজা সময় সময় কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহাদের তালিকায় আওফি মাহ্‌মুদকে দ্বিতীয় স্থান দিয়াছেন। তাঁহার লুবাবুল আল্‌বাবে তিনি সোলতানের দুইটী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৯] মাহ্‌মুদ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কেও যোগদান করিতেন; অবশ্য শিক্ষিত মোসলমানের আন্তরিক উৎসাহ লইয়া, আকবরের ন্যায় মনে বিকৃত সন্দেহ রাখিয়া নহে। এমতাবস্থায় বার্থল্ডের এই অস্বাভাবিক অনুমানের কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

মাহ্‌মুদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার ফলে পারসিক সাহিত্যের যে বিরাট উপকার সাধিত হয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। 'পারসিকেরা তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁহারই নিকট ঋণী।'[৫০] হবীব বলেন, 'পারসিক সাহিত্যের নব জাগরণের মুরুব্বীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। তাঁহার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে গজনভী সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ (?) হইয়া যায়, কিন্তু শাহ্‌নামা অমর।'

যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গজনার দরবার আলোকিত করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এশিয়ায় — এমন কি কেহ কেহ এশিয়ার বাহিরেও সুপরিচিত। আবু রায়হান আল্-বেরুণী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ। ডাক্তার সাচু (Sachau) বলেন, 'বর্ত্তমান সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা পাইয়াও তাঁহার ন্যায় নির্ভুলভাবে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অন্যের পক্ষে বহু বৎসরের প্রয়োজন হইবে।' এই বিপুল জ্ঞানশালী ব্যক্তি প্রায় বর্ত্তমানের ন্যায় সমালোচনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন।[৫১] তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদের তথা-কথিত নব্য-জ্ঞান প্রতিভার ন্যায় পুরাতন বলিয়াই মনে

হয়।[৫২] আন্‌সারীর পূর্ব্বে এশিয়ার আর কেহই কেবল কবিত্ব-প্রতিভার জন্য এত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নাই।[৫৩] আসাদী মুনাদারা বা সামরিক কবিতার আবিষ্কর্ত্তা না হইলেও তাঁহার হস্তে যে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। ফেরদৌসী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।[৫৪] তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত মহাকাব্য শাহ্‌নামা তাঁহাকে মর জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সোলতান মাহ্‌মুদ ও ফেরদৌসী সম্বন্ধে বাজারে যে গল্প প্রচলিত আছে, প্রত্যেকেই তাহার সহিত সুপরিচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মজাদার কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তুসের শাসন কর্ত্তার জুলুমে অতিষ্ঠ হইয়া ফেরদৌসীর গজনা গমন, প্রতিভা-মুগ্ধ আন্‌সারীর অনুগ্রহে সোলতানের সহিত পরিচয়, দার্কিকির অসমাপ্ত শাহ্‌নামা রচনার ভারগ্রহণ, স্বর্ণ-মুদ্রার প্রতিশ্রুতি, অথচ ত্রিশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্তি -- এই সকল চমকপ্রদ কাহিনী কোন সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থেই নাই; দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে লিখিত কোন প্রাচীনতম ইতিহাসেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজামীর চাহারা মাকালা (১১৫৭) ও আওফীর লুবাবুল আল্‌বাব (১২২৮) ফেরদৌসী সম্বন্ধে দুইখানি প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রথমটাতে ফেরদৌসী-কাহিনী আছে, কিন্তু এই গল্পটীর উল্লেখমাত্র নাই। আওফী শাহ্‌নামার কবির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে হামদুল্লাহ্ তারিখ-ই-গাজিদা রচনা করেন। ইলিয়ট ও ডাউসনের মতে এই গ্রন্থখানি অটল বিশ্বাসের যোগ্য। তিনি ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম ও মৃত্যুর তারিখ দিয়াছেন; কিন্তু বাজার-প্রচলিত গল্পের কোনই উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর তিন শত বৎসর মধ্যে (১০৩০-১৩৩০) এই গল্পটীর উৎপত্তি হয় নাই। অধ্যাপক নোলডেক ন্যায়তঃ ইহাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ব্রাউন সাহেব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন।[৫৫] লেনপুল ও এলফিনষ্টোনও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।[৫৬]

মাহ্‌মুদের মৃত্যুর সোয়াশ' বৎসর পরে লিখিত চাহার মাকালা ফেরদৌসী উপাখ্যানের মূল; কিন্তু উহা বাজারের গল্প নহে। নিজামীর মতে ফেরদৌসী শাহ্‌নামা সমাপ্ত করিয়া আলী দায়লাম নামক এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা নকল করাইয়া গজনা গমন করেন। উজীর আহ্‌মদ বিন্ হাসানের মারফতে এই মহাকাব্য দেখিতে পাইয়া মাহ্‌মুদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু উজীরের শত্রুরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, ফেরদৌসী একজন শিয়া মুতাজিলি; তাঁহাকে অর্দ্ধ-লক্ষ দেরহাম দানই যথেষ্ট। কাজেই সোলতান তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশ (একখানা অনুলিপিতে আছে ষাট) হাজার দেরহাম দিয়াই বিদায় দেন। অসন্তুষ্ট কবি ঐ টাকা হাম্মামের প্রহরী ও সরবৎ-বিক্রেতাকে বিলাইয়া দিয়া ছয় মাস হেরাতে লুকাইয়া থাকেন; তৎপরে বাড়ী ঘুরিয়া তাবারিস্তানে গিয়া সোলতানের নামে দুইশত ছত্র ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তথাকার রাজা তাহা একলক্ষ দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন; দশটী ছত্র মাত্র কোনরূপে থাকিয়া যায়। কিছুদিন পরে মাহ্‌মুদ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ফেরদৌসীকে ষাট হাজার দিনার মূল্যের নীল পাঠাইয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা তুসে পৌঁছাবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই কবির মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা ঐ অর্থ গ্রহণ না করায় তদ্দ্বারা তাঁহার বিশ্রামাগারের সংস্কারের-কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তুসের জনৈক আলম শিয়া বলিয়া সুন্নীদের কবরস্থানে ফেরদৌসীর শব সমাহিত করিতে দেন নাই; তজ্জন্য মাহ্‌মুদ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

নিজামীর বর্ণনানুসারে সোলতান কর্ত্তৃক ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতিতে ফেরদৌসীকে শাহ্‌নামা রচনায় নিয়োগের কথা মিথ্যা। তিনি পূর্ব্বেই উহা রচনা করিয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণ মাহ্‌মুদকে দেখাইবার জন্য গজনায় লইয়া যান। একটু তলাইয়া দেখিলেই গল্পটীর ভিত্তি মূল ধ্বসিয়া পড়ে। ১০১০ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ বিন্ হাসান সোলতানের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার সহিত ফেরদৌসীর পরিচয় হইতে পারে না। যদি সেই বৎসরই তিনি শাহ্‌নামা রচনার ভার পান এবং উহাতে যদি ত্রিশ বৎসর লাগিয়া থাকে, তবে ১০৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই এই মহাকাব্য শেষ হইতে পারে না? অথচ ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে, মাহ্‌মুদেরও অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব্বে ফেরদৌসীর মৃত্যু হয়! কাজেই ফেরদৌসীও গজনায় বসিয়া শাহ্‌নামা সমাপ্ত করিতে পারেন না, মাহ্‌মুদের পক্ষেও তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। সোলতানের প্রতি গল্প-লেখকদের মেহেরবানী কত! তাঁহারা ফেরদৌসী ও মাহ্‌মুদের অস্থিগুলিকে পর্য্যন্ত কবর হইতে টানিয়া উঠাইয়াছেন! নচেৎ আসর জমিবে কেন?

চাহার মাকালা ও তারিখ-ই-গাজিদার বিবরণ এবং ডাক্তার এথি (Dr. Ethe) ও অধ্যাপক নোলডেকের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া ব্রাউন সাহেব স্থির করিয়াছেন, ৯২০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার সামান্য পরে ফেরদৌসীর জন্ম হয়। ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহ্নামা রচনা আরম্ভ করেন। পঁচিশ বৎসর পরিশ্রমের পর ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত হয়। প্রথম সংস্করণ কবি আহমদ বিন্ মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে উৎসর্গ করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ মাহ্মুদকে উৎসর্গীকৃত হয়। গজনা ত্যাগের পর তিনি তাঁহার অন্যতম মহাকাব্য ইউসুফ জোলায়খা রচনা করেন। ১০২০ বা ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৫৭]

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ফেরদৌসী যখন শাহ্নামা রচনা আরম্ভ করেন, তখন মাহ্মুদের জন্মই হয় নাই। কাজেই তাঁহার হুকুমে গজনায় থাকিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ফেরদৌসীর কাব্য রচনার কথা নিছক গাঁজাখোরী গল্প। ইহা দৌলত শাহের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। মহামতি সোলতানের মৃত্যুর সাড়ে চারিশত বৎসরের অধিক কাল পরে (১৪৮৭) লিখিত তাজকেরা তুশ্ শুয়ারায় সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামীর ফেরদৌসী-কাহিনীর শেষাংশের মর্ম্ম অনেকটা অবিকৃত রাখিয়া তিনি ইহার ঐতিহাসিক ভাগ সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু শাহ সাহেবও স্বর্ণ-মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করেন নাই। খোন্দামিরের হাবিবুশ্ শিয়ারেও (১৫৩৪) এই অঙ্গীকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ মাহ্মুদের মৃত্যুর পর পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে লিখিত কোন গ্রন্থেই তাঁহার মোহর দানের প্রতিশ্রুতির আভাসমাত্র নাই। ইহা ফিরিশ্তা (১৬০৬) প্রভৃতি আরও পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকগণের সৃষ্টি।

গল্পটীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও কি মাহ্মুদের সদাশয়তার লাঘব হয়? লেনপুল বলেন, একখানা কাব্য লেখার (প্রকৃতপক্ষে উৎসর্গ করার) জন্য ষাট হাজার টাকা দান সামান্য কথা নহে। উহা প্রায় আড়াই হাজার পাউণ্ডের সমান। বর্ত্তমান সময় এই টাকায় এক লাইব্রেরী কাব্য লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে। 'প্যারাডাইজ লষ্টে'র কবিকে মাত্র দশ পাউণ্ড পারিশ্রমিক পাইয়াই তৃপ্ত হইতে হইয়াছিল। ঘৃণাভরে প্রভু-দত্ত বিপুল অর্থ ভৃত্যদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া ব্যঙ্গ-কবিতা লেখাই কি এই সদাশয়তার উপযুক্ত পুরস্কার? প্রকৃতপক্ষে গল্পটীতে মাহ্মুদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রকৃত চিত্র নহে। মহাপ্রাণ ভূপতি যে অবশেষে এই অপমান ক্ষমা করিয়া ক্ষুব্ধ কবির ক্রোধ শান্তির জন্য পঞ্চাশ হাজার গিনি উপহার প্রেরণ করেন, তাহা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব প্রতিভাত হয়।[৫৮] এলফিনষ্টোনের মতেও এই ব্যঙ্গ-কবিতা ভুলিয়া গিয়া আশাতীত অর্থ প্রেরণই মাহ্মুদের মহানুভবতার প্রমাণ।[৫৯]

অধ্যাপক হবীব ও ডাক্তার নিজামের গ্রন্থই মাহ্মুদের উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত। প্রথমখানা প্রধানতঃ ইলিয়ট ও ডাউসনের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। দ্বিতীয়খানার গবেষণার কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। অথচ ডাক্তার সাহেবও এই গল্পটীর ঐতিহাসিকতা লইয়া আলোচনা করা দরকার মনে করেন নাই। 'ফরদৌসী-উপাখ্যানের সত্যতা যাহাই হউক' বলিয়া হবীব যেখানে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, সেক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, "ফেরদৌসী সম্ভবতঃ সোলতানের অনুরোধে তাঁহার অমর শাহ্নামার এক বৃহদংশ গজনার দরবারে রচনা করেন।" তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটী কথার জন্য তিনি প্রামাণিক গ্রন্থের বরাতী দিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোনই প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই! এই উপেক্ষার কারণ বুঝা দুষ্কর।

কাব্যের ন্যায় ইতিহাসের গতি নিরঙ্কুশ নহে। কবি হইয়াও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া 'ফেরদৌসী-চরিত'-লেখক বাঙ্গলায় সোলতান মাহ্মুদের কুৎসা প্রচারে যত সহায়তা করিয়াছেন, আর কেহই তত করেন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইংরেজীনবীশ হইয়াও 'পারস্য-প্রতিভা'র গ্রন্থকার এই গতানুগতিকতার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। হবীব বলেন, 'ধর্ম্মান্ধ মোসলমানেরাই বরাবর ইস্লামের ভীষণ শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে।' কথাটা সত্য। কিন্তু ইস্লামের আর এক শ্রেণীর ভীষণ শত্রু আছে; তাঁহারা হইতেছেন, অন্ধ অনুকরণকারীর দল। ইতিহাস লিখিবার খেয়াল ইঁহাদের যত কম হয়, ইস্লামের ততই মঙ্গল।

কথা আছে, "মাছি শুধু ঘা খুঁজিয়াই বেড়ায়।" স্থূলদর্শী ঐতিহাসিকেরাও মাহ্মুদের দোষ ছাড়া কোন গুণ দেখিতে পান না। পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে তাঁহার চরিত্রের নানাদিক্ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের অনেক

অহেতুক অভিযোগের উদ্ভব রহিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক কোন সমাজেই একেবারে বিরল নহেন। কেহ কেহ মাহ্‌মুদের প্রতি বাস্তবিকই অনেকটা সুবিচার করিয়াছেন।

মিঃ নাজিম সোলতান মাহ্‌মুদ সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ (thesis) রচনা করিয়া কাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি.এইচ্.ডি. (Ph.D.) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ হিসাবে মাহ্‌মুদ শুদ্ধচিত্ত, স্নেহবান, ধার্ম্মিক, দয়ালু, খোদাভক্ত, সদাশয় ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র বাস্তবিকই উন্নত ও প্রশংসনীয়। তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে কখনও তাঁহাকে পরাজয়ের অপমান ঘাড়ে লইতে হয় নাই। প্রাচ্য-লেখকেরা তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; এই প্রশংসা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। ফারসী সাহিত্যের গঠন ও শ্রীবৃদ্ধি তাঁহারই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের ফল। শাসক হিসাবে তাঁহার নাম সসম্মানে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য। যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে বারংবার স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলেও তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কেবল বংশ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই তিনি ব্যর্থকাম হন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য-সীমা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়া যান যে, একজনের পক্ষে তাহা শাসন করা সম্ভবপর ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মাহ্‌মুদ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও বিজেতাদের অন্যতম। শাহ্‌জাদা মস্‌উদের ভাষায়, কোন জননী মাহ্‌মুদের ন্যায় সন্তান আর গর্ভে ধারণ করিবেন না।"

ডাক্তার ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "ইতিহাসে মাহ্‌মুদের স্থান নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। সমসাময়িক মোসলমানেরা তাঁহাকে গাজী ও ইস্‌লামের নেতা বলিয়া জানিতেন। হিন্দুরা অদ্যাপি তাঁহাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, আদি হুন এবং মন্দির ও মূর্ত্তি ভগ্নকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সে যুগের বিশেষ অবস্থার খবর রাখেন, তিনি ভিন্নমত পোষণ করিতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে মাহ্‌মুদ একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক, ন্যায়-পরায়ণ ভূপতি, সাহসী ও প্রতিভাশালী সেনাপতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার মতে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতিদের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হওয়ার যোগ্য।"*৬০

মার্শম্যান সাহেব বলেন, "মাহ্‌মুদ কেবল সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী নহেন, সর্ব্বপ্রধান নরপতিও বটে। আরব সাগর হইতে পারস্যোপসাগর ও কুর্দ্দিস্তানের পর্ব্বতমালা হইতে শতদ্রু তীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বিশাল ভূভাগে যেরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল, তাহাই তাঁহার শাসন-প্রতিভার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। এশিয়ায় তাঁহার দরবারই সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরময় ছিল; বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতায় কখনও কোন রাজা তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ... এশিয়ার অপর কোন রাজার দরবারে কখনও এত অধিক প্রতিভাশালী বিদ্বান ব্যক্তি সমবেত হন নাই।"*৬১

ভারতীয় স্থাপত্য-বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেল স্যার জন মার্শাল বলেন, নবম ও দশম শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব পারস্যের সামানিয়া বংশ যে সভ্যতা ও আড়ম্বরের অধিকারী ছিলেন, তাহা যেন উত্তরাধিকারসূত্রে গজনভীদের হস্তগত হয়। মহামতি মাহ্‌মুদ ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সোলতানদের আমলে স্থাপত্যের আড়ম্বরে গজনি খেলাফতের সমস্ত নগরের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়।"*৬২

স্যার জন মার্শালের বহুপূর্ব্বে ফার্গুশন সাহেবও সোলতান মাহ্‌মুদকে the Great বা মহামতি উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।*৬৩ তিনি যে বাস্তবিকই এই গৌরবের যোগ্য পাত্র, নিরপেক্ষ লোক মাত্রই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

(১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত)

*১ "Thus died Mahmud, certainly the greatest sovereign of his own time..."– Elphinstone, 333.

*২ Nazim. 169

*৩ "It was no mean genius that could expand a little mountain principality into an empire..." – Lane-poole, Mediaeval India, 32.

*৪ "Mahmud was richly endowed with creative genius." – Dr. Iswari Prasad, Mediaeval India, 90.
*৫ "... he was able to make extensive conquests and to rule them well and wisely." – Keene, History of India, vol.-I, 30.
*৬ Cambridge History of India, iii, 12.
*৭ "The name of Mahmud the Gaznavide is still venerable in the East; his subjects enjoyed the blessings of prosperity and peace;" – Gibbon, vi, 243.
*৮ Marsden, History of India, 378.
*৯ "... He (Khusrou) wes received amidst the acclamations of his subjects who were not displeased to see the seat of government permanently transferred to their country,"– Elphinstone. 349.
*১০ "But his treasury, .. were all inherited by unworthy sons,"–Keene, 36.
*১১ "There was not one of his race so able or vigorous as he had been."–Hunter, 94.
*১২ Elphinstone, 348.
*১৩ "Mahmud was, perhaps, the richest king that ever lived."–Elphinstone, 338.
*১৪ "...the city of Gazni ... had become the grandest in Asia. ."–Marshman, History of India, 23.
*১৫ Wilson, History of India, 44
*১৬ "...he was unrivalled in the judgment and grandeur with which he knew how to spend it."– Elphinstone, 336.
*১৭ "...it is hard to reconcile this reputation for avarice with what is recorded of the Sultan's gifts..." – Lane-poole, 31.
*১৮ ...Furgussion, Indian and Eastern Architecture, 496.
*১৯ Cambridge History of India, iii, 574-5.
*২০ "...he does not seem to have been cruel. We hear none of the tragedies and atrocities in his court and family which are so common in those of other despots. No inhuman punishments are recorded; and rebels, even when they are persons who had been pardoned and trusted, never suffer anything worse than imprisonment."–Elphinstone, 337.
*২১ লেখকের সদ্য-প্রকাশিত বই 'সোলতান মাহ্‌মুদ' হইতে। -- "বুলবুল" সম্পাদক।
*২২ Browne, Literary History of Persia, vol. ii, 95.
*২৩ "...there are few of the world's conquerors who have established a reputation equal to his."– Latif, History of the Punjab, 87.
*২৪ "The Sultan of Gazna surpassed the limits of the conquest of Alexander."—Gibbon, vi, 241 ; "The exploits of Alexander in the East were rivalled, and, in fact, surpassed."–Habib, 66.
*২৫ "Each victory meant no more than the conquest of one or more princes; the rest were uneffected, and, since there was no single supreme head to treat with, the most complete success in the field did not imply the submission of the country."– Lane-poole, 28.
*২৬ "the greatest military genius of the age." – Habib, 31.
*২৭ "of military genius and of statecraft his acheivements afford ample evidence." – Browne, ii 95.
*২৮ Gibbon, vi, 243-4.
*২৯ "...he does not seem to have been wantonly cruel or to have taken life needlessly." – Wathen and Garret. History of India, 102-3.
*৩০ "No instance, it may be said to his credit, are recorded of wanton or revengeful massacre or executions ... Tried by the standard of his times, therefore, Mahmud must be considered, on the whole, humane." – Taylor, History of India, 34.
*৩১ "the only wonder is, that two invasions of so inaccessible a country should have been attended with so few disasters.' – Elphinstone, 323.
*৩২ Elphinstone, 327.
*৩৩ "Mahmud marched with such rapidity through Punjab as to forestall Bijay Pal's preparations and found the shrine at Thanesar undefended." – C. Hist. of India, iii, 18.

*৩৪ "I extinguished the light that my justice might be blind and inexorable; so painful was my anxiety that I had passed three days without food ..." – Gibbon, vi, 243; Elphinstone, 338.

*৩৫ "...his chief motive seems to have been the love of conquest and plunder." – Wathen and Garret, 106.

*৩৬ "He also knew how to avoid the temptation of extending his conquests permanently beyond his means to administering them. Therefore, in India he contented himself with the possession of his father; and while amassing wealth by the plunder of the rest of the country, made no attempt to retain posssession of the government." – Keene, 36.

*৩৭ "The non-religious character of his expeditions will be obvious to the critic who has grasped the salient features of the age ... It is impossible to read a religious motive in them." – Habib, 77.

*৩৮ "Mahomedan historians are so far from giving him credit for a blicn attachment to the faith that they charge him with seepticism." – Elphinstone, 337.

*৩৯ "Content to deprive the unbelievers of their worldly goods, he never forced them to change their faith." – Habib, 77.

*৪০ "In his dealings with the Hindu rulers, he showed leniency and mercy." – Wathen and Garret, 103.

*৪১ "... in his dealings with Hindoo princes he was in all cases merciful, even though they had proved unfaithful, to their promises."

*৪২ C. History of India, iii, II.

*৪৩ "Mahmud carried on war with the infidels because it was a source of gain, and, in his day, the greatest source of glory ... he never sacrificed the least of his interests for the accomplishment of that object; and he even seems to have been perfectly indifferent to it, when he might have attained it without loss ...

Even where he had possession he showed but little zeal. Far from forcing conversions ... we do not hear that he ever made a convert at all." – Elphinstone, 336.

*৪৪ "It is nowhere asserted that he ever put a Hindu to death except in battle, or in the storm of a fort. His only massacres are among his brother Mussalmans in Persia." – Elphinstone, 336.

*৪৫ "Even they were owing to the spirit of the age, not of the individual, and sink into insignificance, if compared with those of Chengiz khan, who was not a Mussalman, and is eulogised by one of our most liberal historians as a model of philosophical toleration." – Elphinstone, 336

*৪৬ "The real source of his glory lay in his combining the qualities of a warrior and a conqueror, with a zeal for the encouragement of literature and the arts, which was rare in his time, and has not yet been surpassed." – Elphinstone, 333.

*৪৭ "... he pressed into his service the lights of oriental letters ... to revolve round his sun like planets in his firmament of glary." – Lane-pool, 30.

*৪৮ "He ... showed so much munificence to individuals of eminence that his court exhibited a greater assemblage of literary genius than any other monarch in Asia has ever been able to produce." – Elphinstone, 343.

*৪৯ Browne, ii, 117–8.

*৫০ "... it is to Sultan Mahmud that she is indebted for full expansion of her national literature." – Elphinstone, 334.

*৫১ Browne, ii, 105

*৫২ Macdonald, Development of Muslim Theology, 197.

*৫৩ Elphinstone, 334.

*৫৪ Sir Roper Lethbridge, History of India, 36.

*৫৫ "no trace of it is to be found in the oldest accounts ... and Professor Noldeke is undoubtedly right in rejecting it as purely fictitious." – Browne, iii, 181.

*৫৬ Elphinstone, 335, Lane-Poole, 39.

*৫৭ Browne, ii, 141

*৫৮ "The notable part of the story is, not that the poet indignantly spurned the gift, ... and then rewarded Mahmud's kindness and support by a scathing satire ... but that the great Sultan at last forgave the insult and sent a second lavish gift ..." – Lane-poole, 31.

*৫৯ "... Mahmud magnanimously forgot the satire, while he remembered the great epic, and sent so ample a remuneration to the poet as would have surpassed his highest expectation." – Elphinstone, 335.

*৬০ "But the unbiassed historian who keeps in mind the peculiar circumstances of the age, must record a different verdict. In his estimate Mahmud was a great leader of man, a just and upright ruler ... and deserves to be ranked among the greatest kings of the world." – Mediaeval India, 191.

*৬১ "Mahmud was not only the greatest conqueror, but the grandest sovereign of the age ... the order which reigned through the vast territories gave abundant proof of his genius for civil administration. His court was the most magnificient in Asia and few princes have ever surpassed him in the munificent encouragement of letters ... his capital was adorned with a greater assemblage of literary genius than any other monarch in Asia has ever been able to collect." – Abridgement of the History of India, 22.

*৬২ "... under Mahmud the Great and his immediate successors, Gazni became famous among all the cities of the Caliphate for the splendours of its architecture." – Cambridge History of India, iii, 574.)

*৬৩ "the Great Mahmud." – Indian and Eastern Architecture, 496 (edition of 1876)

বাবরের একটী ফর্‌মান

এন্‌, সি, মেহ্‌তা আই. সি. এস্‌

গত অক্টোবর মাসে আমি একবার ভুপালে যাই। হিজ্‌ হাইনেস্‌ নবাব তখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটীর কন্‌ভোকেশানে বক্তৃতা দিতে আহুত হইয়াছেন। এলাহাবাদেরই তিনি একজন কৃতী গ্রাজুয়েট, 'আল্‌মা মাতের'-এর এ আহ্বানে তাঁকে বেশ আনন্দিত দেখা গেল। ডিনার পার্টিতে দেশের কৃষি-বাণিজ্য ও হাল-রাজনীতির সাথে সাথে সেদিন অতীত ইতিহাসের অনেক কথাও বলাবলি হইয়া গেল। মোগল বাদশাহদের উদারনীতির কথা, আকবর-জননী হামিদা বেগম সাহেবার দানশীলতার কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নবাব বাহাদুর বলিলেন, স্বয়ং বাবরশা'রই একটী ফর্‌মানের মূল কপি তাঁর হাতে আছে। পরদিন হামিদা-পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে আমি ফরমানটী স্বচক্ষে দেখি। পড়িয়া মনে হইল, ভারত-ইতিহাসের ইহা একটী মূল্যবান সম্পদ :—

"বাদশাহ জহীর উদ্দীন মুহম্মদ বাবরের পক্ষ হইতে শাহ্‌জাদা নসীর উদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুনের প্রতি গোপন উপদেশ,—আল্লাহ্‌,—তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

পরম স্নেহভাজন! সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্যই তোমাকে এ-চিঠি লিখিতেছি। হিন্দুস্থান বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী বহু লোকের আবাসভূমি। মহান ন্যায়বান আল্লাহ্‌র অপার প্রশংসা যে এ রাজ্যের শাসনভার তিনি তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছেন। তোমার উচিত, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মান্ধতা হইতে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও প্রথা অনুযায়ী তাদের বিচার করা। বিশেষতঃ, গো-হত্যা হইতে বিরত থাকিও; তাহাতে প্রজাপুঞ্জ তোমার অনুরক্ত হইবে এবং তুমি তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। তোমার শাসন-সীমার মধ্যে কোন জাতিরই ধর্ম্ম-মন্দির বা উপাসনালয়ের উপর যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়। শাসনকার্য্য এমন ভাবে সমাধা করিবে যাহাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষা জন্মে। অত্যাচারীর তরবারির জোরে ইস্‌লামের প্রসার সম্ভব নয়; সম্ভব দয়া-দাক্ষিণ্যের জোরে। শিয়া-সুন্নীর পার্থক্য ভুলিয়া যাও, আত্মকলহই ইস্‌লামের দুর্ব্বলতার কারণ। নিপুণ রাসায়নিকের ন্যায় পঞ্চভূতের সমন্বয়ে তোমাকে নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হয়। হজরত তৈমুর সাহেব-কিরাণীর কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হও! 'উপদেশ দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য, (বলপ্রয়োগ নহে।)' পহেলা জমাদিউল্‌-আউয়াল, ৯৩৫ হিজরী।" (১১ই জানুয়ারী—১৫২৯)

এ-লিপি হুমায়ুনকে যখন লেখা হয়, তখন তাঁহার বয়স মোটে কুড়ি বৎসর। দিল্লীর তখ্‌তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতেই বাবরের ১৫২৬ সাল পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। আগ্রার নিকটবর্ত্তী ঢোলপুরের লোটাস্‌-গার্ডেনে তাঁবুতে বসিয়া তিনি এই ওসিয়তখানি রচনা করেন (৯—২০ জানুয়ারী, ১৫২৯)। একধারে তাঁর কীর্ত্তি ও বেদনার লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমির যেদিকে যান সেই দিকেই সুপেয় জলের অভাব বিশেষ ভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই তিনি এসময় নানাস্থানে দীঘি ও খাল খনন, গোসলখানা ও জলাধার নির্ম্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হন। গুল্‌বদন বেগম তাঁহার পিতার যে সুন্দর জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে যে এ সময় রাজত্বের জাঁক্‌জমকের প্রতি বাবর কতকটা বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৫২৮ সালের ২৭শে নভেম্বর হুমায়ুনের একটী পুত্র লাভ হয়। এই উপলক্ষে তিনি লেখেন : "শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলের মতো দৃঢ় বন্ধন আর নাই। অবসরের সুখ ও শান্তির সাথে রাজদণ্ডের প্রতাপ তুলনীয় নয়।" এস্থলে তিনি অমর কবি সা'দীর দুই ছত্র উদ্ধৃত করেন :—

"পায়ে যদি তোমার বেড়িই পড়ে থাকে,
তবে অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ কর!
যদি একাই তোমাকে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটতে হয়,
তবে নিজ মস্তক নিজেই ছেদন কর।"

'এ-চিঠিতে তিনি আরও বলিয়াছেন : "বিধাতাকে ধন্যবাদ! জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল পথে অভিযান ও অসিচালনার সময় এখন তোমাদের। যে সুযোগ আজ নিয়তির চক্রে তোমার সম্মুখে আসিয়াছে, তাকে অবজ্ঞা করিও না। রাজ্যভার যার হাতে ন্যস্ত, অলস ও নিষ্কর্ম্মা জীবন-যাপন তার পক্ষে অশোভন।" হুমায়ুন ও কামরানের চরিত্রে তখনও পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর প্রতিভা দেখা দেয় নাই। তাই বাবর তাঁহাদের আরও লিখিয়া পাঠাইলেন, "হিসার, সমরকন্দ্‌, হেরী—যেদিকেই প্রসন্ন অদৃষ্টের ইঙ্গিত পাও ছুটিয়া চল, দ্বিধা করিও না।"

এর ছয় সপ্তাহ পরে আমাদের আলোচিত ওসিয়তনামাটী লেখা হয়। হাতের-তৈরি একফর্দ্দ কাগজের উপর সুন্দর ছোট অক্ষরে সোনার জলে লেখা। সহজ, শুদ্ধ ও মার্জ্জিত ফারসীতে মোট পাঁচ লাইনে লিপিটী সমাপ্ত, উপসংহারে পবিত্র কোর্‌আনের একটী শ্লোক। ভুপালের রাজ-পরিবারে এ-লিপিটী বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কোথা হইতে কখন ইহা এখানে আসিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই; এমন কি ঐতিহাসিকের কাছেও এতদিন ইহার অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল। নবাব বাহাদুর আমাকেই ইহার প্রথম প্রকাশের অনুমতি দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইলেন।

জাতি ও সমাজের আজিকার মতো দুর্দ্দিনেও শাহেন্‌শাহ্‌ বাবরের এই অনুশাসন-লিপিটীর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সব সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্য ও ন্যায়-বিচারের উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইয়াছেন। নিজ ধর্ম্মাবলম্বী দুর্দ্ধর্ষ মুস্‌লিমের কানে তিনি হজরত মুহম্মদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

তরক্কিয়ে ইস্‌লাম আজ্‌ তেগ্‌-ই-ইহ্‌সান,
বিহ্‌তরাস্‌ত্‌ ন-আজ তেগ্‌-ই-জুল্‌ম্‌!

"ইস্‌লামের গৌরব তার দয়াধর্ম্মে,—অত্যাচার বা অসহিষ্ণুতায় নয়।"

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটখাট ভেদজ্ঞানকে প্রশ্রয় না দিবার জন্যই তিনি নিজ উত্তরাধিকারীকে উপদেশ দিয়াছেন। আজ চারশো' বছর পরেও আমরা সেই উপদেশেরই অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। পৃথিবীর বিপুল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তৈমুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই মহাপ্রাণ ও দূরদর্শী সম্রাটের প্রত্যেকটী কথা আজিও আমাদের পরম শ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

মোগল-বংশের উদার নীতির ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। এমন আরও অনেক ফর্‌মানের খবর আজকাল ইতিহাস-পাঠকের জানা আছে। নাথদ্বারার (Nathdwara) গোস্বামীরাও এ ধরণের কয়েকটী ফর্‌মান প্রকাশ করিয়াছেন। হামিদাবানু বর্ত্তমান মথুরা জিলার ব্রজমণ্ডলের গোচরভূমি গোস্বামীদের নিষ্কর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীর সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটা দিন জীবহত্যা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যশস্বী সম্রাটদের উদারতার অনুসারী হইয়া চলিয়াছিলেন। ফলতঃ মোগল শাসকদের এই ঔদার্য্য এবং সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অপক্ষপাত দৃষ্টি যতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন তাঁদের সাম্রাজ্যও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিয়াছিল।

বাবর যে-কালে জন্মগ্রহণ করেন, এতটা উন্নত মনোভাব সেকালের জন্য খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। তখন জগতের সর্ব্বত্রই শাসকজাতির ধর্ম্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করা হইত। ইহাতে কোন দোষ বা অন্যায় হইতে পারে,—এমন ধারণাও তখন জনগণের মনে জন্মলাভ করে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবরের অনুসৃত উদারনীতি পরিত্যাগের ফলেই মোগল সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তারপর দেশের যে দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতা আমরা দেখিতে পাই, তাহার কলঙ্ক মোচনের গৌরব আর দেশবাসীর ভাগ্যে জুটিল না। দূরদেশাগত ইংরেজ-শক্তির মুখ চাহিয়াই যেন দুঃখিনী ভারত-ভূমিকে যুগের পর যুগ কাটাইতে হইল!

[আশ্বিন, ১৩৪৩]

ভারতবর্ষ ও ফরাসী জাতি

স্যার যদুনাথ সরকার

আজ চন্দননগরে বঙ্গভাষি-সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত। ফরাসী বিজয়বাহিনীর পুরোভাগে দোদুল্যমান, কবি বেরাঝের কবিতায় উদ্গীত, জগৎপ্রসিদ্ধ সেই ত্রিবর্ণ পতাকার তলে বঙ্গের নানাস্থান হইতে আগত পণ্ডিতগণ আজ মাতৃভাষার উন্নতির এবং লোকমধ্যে জ্ঞান-বৃদ্ধির উপায় আলোচনায় ব্যস্ত। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ইতিহাসের একটা ''হইলেও হইতে পারিত' নিজ হইতেই মনে জাগিয়া উঠিতেছে। যদি ক্লাইভ ও দুপ্লের যুগে ফরাসী নৌবল ভারতসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, যদি বাঙ্গালার রাজা পলাশীর যুদ্ধের ক'মাস মাত্র আগে চন্দননগরকে ইংরাজের গ্রাসে পড়িতে না দিতেন, যদি লালি এবং সার আয়ার কূট পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিতেন,—তবে নিশ্চয়ই ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিত, এই মহাভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। তখন, আমরা বৃহৎ ফরাসী রাষ্ট্রমণ্ডলের অঙ্গ হইয়া ভারতের সর্ব্ববিধ ধন ও পণ্যদ্রব্য, চিন্তা ও লোকবল সেই কৌরবান্বিত জাতির ও মহাদেশের সঙ্গে মিলাইয়া দিতাম। আর, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার সজীব স্রোত এবং নববিজ্ঞান ও দর্শনের বৈদ্যুতিক ধারা ইউরোপের লাটিন জাতির সংস্কৃতির ভিতর দিয়া ফরাসী ভাষার সাহায্যে গ্রহণ করিত;—ইউরোপের সুদূর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্বীপের টিউটনিক ভাষার যোগে পাইত না; এই ''পঞ্চবিংশতি কোটি মানবের বাস'' চিন্তায় ও স্বার্থে আকৃষ্ট হইত সেই মহাদেশীয় অর্থাৎ ''কন্টিনেন্টাল'' ভাব উদার সভ্যতার দিকে, ইংলণ্ডের কতকটা কোণ-ঠাসা সংস্কৃতির দিকে নহে; যদিও ইউরোপীয় সভ্যতাকে এক ও অভিন্ন মনে করা উচিত, তথাপি এই ইংলণ্ডীয় এবং কন্টিনেন্টাল সভ্যতা ও ভাবপ্রণালীর মধ্যে যে বেশ একটা পার্থক্য আছে তাহা ভারত বুঝিত, তাহার ফলভোগ করিত; রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য জগৎ আরও বিশ বৎসর পূর্ব্বে চিনিতে পারিত।

কিন্তু ভারতের ললাটে বিধাতা অন্যরূপ লিখিয়াছিলে। তাই আজ আমরা ফরাসী এবং অন্যান্য লাটিন জাতির সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা কিছু কিছু অনুবাদের সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া উপভোগ করিতেছি, সেই জ্ঞান-সমুদ্রে গা-ডুবাইয়া সাঁতার দিতে পারিতেছি না।

তথাপি, ফরাসীর সহিত বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধ একটা নগণ্য জিনিষ নহে, ইহা আজও অবিচ্ছিন্ন হিয়াছে। ইহার কয়েকটি নিদর্শন ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে। দুই শত বৎসর হইল এই শহরের অধিবাসী গ্যাসপার কোর্ণের সাহেবের নিকট একটি বাঙ্গালী বালককে সাত টাকায় বিক্রয় করা হয়, তাহার পিতার লিখিত দাসখত—ইয়াদী কর্দ ইত্যাদি—পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। আর একটি বাঙ্গালী ক্রীতদাস ফ্রান্সে গিয়া ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে একজন নেতা হইয়া পড়ে; স্ক্রীন সাহেব A Bengali Sansculotte in the French Revolution নামক প্রবন্ধে তাহার কাহিনী দিয়াছেন। এই চন্দননগরে বসিয়া শাসনকর্ত্তা শিভালিয়ে বহুদিন ধরিয়া দিল্লীতে ষড়যন্ত্র চালাইয়াছিলেন, কি করিয়া দিল্লীর বাদশাহের দরবারে ফরাসী জাতীয় প্রতিপত্তি স্থাপিত করা যায় এবং ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ গ্রাসের বদলে ফরাসী জাতিকে সিন্ধু প্রদেশ দেওয়া যায়।

যদি ফ্রান্সে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইত, তবে কেরী ও মার্শমান আর দিনেমারদের কুঠী শ্রীরামপুরে না গিয়া এই চন্দননগরেই আশ্রয় লইত, এবং এই শহর প্রথম বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র, বাঙ্গলা পুস্তক ও সংবাদপত্রের জন্মদাতা বলিয়া চিরস্মরণীয় হইত।

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ফরাসী প্রভাব কম ছিল না। অসংখ্য নীল ও রেশমের কুঠী বৃটিশ অধিকৃত বঙ্গে এমন কি কোম্পানীর যুগের আউধ ও দোয়াবা প্রদেশে অনেক স্থানে ফরাসীর দ্বারা চালিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতে ইংরাজ ভ্রমণকারীদের কাহিনী হইতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলার বিখ্যাত রেশমের কুঠী বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফরাসী-চালিত ছিল।

বঙ্গদেশের ঐতিহাসিকের চক্ষে চন্দননগরের ফরাসী দপ্তর অমূল্য। এগুলি হইতে আমরা এই দেশের শিল্প বাণিজ্য, রাজ্যশাসনের ধারা ও প্রজার দশা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, বর্গীয় হাঙ্গামা ও নবাব পরিবারে গৃহকলহ প্রভৃতির অতি মৌলিক ও সমসাময়িক বিবরণ পাই। এ সবগুলি ছাপা হইয়াছে। ফরাসী ভ্রমণকারী Comte de Modave ১৭৭৪-৭৫ সালে বঙ্গ দেশের তথা মোগল সাম্রাজ্যের সূক্ষ্ম সমালোচনা-পূর্ণ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ের রচিত ভারত বর্ণনা অপেক্ষাও মূল্যবান। অপর পক্ষে, সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা দখলের সময় ইংরাজ সরকারের প্রায় সব কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড নষ্ট হইয়া যায়; শুধু যাহা ইণ্ডিয়া হাউসে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাই বাঁচিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃটিশ বঙ্গের ঐতিহাসিক কাগজপত্র ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর হইতে মাত্র এদেশে সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

এই ত গেল বাঙ্গালার কথা; আর আমাদের প্রদেশের বাহিরে, ভারতবর্ষের অন্যত্রও ফরাসী প্রভাব বহুদিন বিরাজ করিয়াছে। কর্ণাটকে ও বঙ্গবিহারে ইংরাজ জাতির জয়ের পর অনেক ফরাসী সৈনিক ও শিল্পী এই দুই প্রদেশের নিজের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ দেখিয়া, আউধ নবাবের, দিল্লীর বাদশাহের, জাঠবাজার, মালবের ছোট ছোট রাজা নবাবের এবং দাক্ষিণাত্যের নিজামের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিল; তাহারা ভারতীয় পোর্টুগীজ এবং পূর্ব্বে আগত ফরাসী পরিবারগুলির সহিত বিবাহ বন্ধনে মিশ্রিত হইয়া একটি নূতন জাতি ও সমাজ সৃষ্টি করিল। তাহাদের অনেকেই দেশী পোষাক, দেশী নেশা, দেশী রীতি ও পারিবারিক নিয়ম অবলম্বন করিল; যেমন রীন মাডেকের সহিত অগষ্টিন বার্বেটের কন্যার বিবাহ (১৭৬৬ সালে) ঠিক সম্ভ্রান্ত পর্দ্দানশীন মুসলমান পরিবারের বাল্যবিবাহের মত হইয়াছিল। বিশপ হেবার ১৮২৪ সালে এইরূপ সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচের ফরাসী পরিবার আগ্রায় দেখেন।

ফরাসী সেনাপতিগণ মারাঠা ও শিখ রাজাদের জন্য সৈন্য শিখাইয়া, তোপ ও অন্যান্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম গঠিত করিয়া, বহু রণক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিয়া ভারত ইতিহাসে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সুবয়েঁ (Savoyard), পেরোঁ, দুদ্রেনেক বুর্কী, আভিতেবিল, কোর্ট এবং নিজামের রেমং—এই সব বীর ও সুদক্ষ লোকনেতার নাম ও কীর্ত্তি ভারত ভুলিবে না। ছোট ছোট ফরাসী ভাগ্যান্বেষণকারী সেনানীর সংখ্যা গণনা করা যায় না।

এখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া জ্ঞানের সত্য, শিব ও সুন্দর ক্ষেত্রে আসা যাউক। এখানেও ফরাসী জাতির দান ভারতকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছে, সে দানস্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে। ফরাসী বন্দী সেনা আঁকেতিল দুপেরোঁ সর্ব্বপ্রথমে জুরাশাস্ত্রধর্ম্মের শাস্ত্র অনুবাদ করিয়া ইউরোপে তাহার প্রচার করেন। আবার, তিনিই দারাশুকো কর্ত্তৃক পারসিক ভাষায় রচিত সংস্কৃত উপনিষদ্‌গুলির সংক্ষিপ্ত সার লাটিনে অনুবাদ করিয়া বেদান্তর উদার বাণী পাশ্চাত্য জগতকে প্রথম শুনান। তাঁহার এই গ্রন্থ Oupenikhet পড়িয়াই শোপেনহাবার প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের দিব্যজ্ঞানে নিজ চিত্তের চরম শান্তি লাভ করেন।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অঙ্কিত, প্রায় বিশুদ্ধ মানচিত্র দাঁভিল নামক ফরাসী পণ্ডিত প্রকাশিত করেন (১৭৫২)। ইহাতে প্রদত্ত ভৌগোলিক কতথ্যগুলি ফরাসী ও অন্যান্য ভ্রণকারীদের রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করা।

ব্রায়ান হজসন দীর্ঘকাল নেপালে রেসিডেন্ট থাকিবার সময় বহু পণ্ডিত লাগাইয়া অসংখ্য প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি নকল করাইয়া লন, কতকগুলি খরিদও করেন। ইহার এক বৃহৎ অংশ প্যারিস নগরে আশ্রয় পাইয়াছে। বির্ণুফ (Burnouf) তাহা চর্চ্চা করিয়া, ছাত্র শিখাইয়া, ইউরোপে বৌদ্ধ শাস্ত্রের গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি প্যারিসে যে বৌদ্ধজ্ঞানের পণ্ডিতদিগের টোল গড়িয়া দিয়া যান, তাহা আজও চলিতেছে, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ ফরাসী ভাষা না জানিলে বৌদ্ধধর্ম্ম ইতিহাস ও সভ্যতার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধেও একথা সমান সত্য। ফরাসী পণ্ডিত এমিল সেনার সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া অশোক সম্বন্ধে মহাবস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে জগতে অদ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাহার পর সিলভাঁ লেভি এবং শভানে ভারত ও চীনের পুরাতন সংযোগ বিষয়ে জ্ঞানের একটি নূতন মহাপ্রকোষ্ঠের দ্বার আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছেন। পেলিও এবং পুসাঁ আর দুইটি বিদ্যার ক্ষেত্রে জগতে অগ্রণী।

সিডান যুদ্ধের পর বাঙ্গালী বালিকা তরু দত্ত ফ্রান্সের পরাজয়ে অবসন্নহৃদয়া হইয়া বলিয়াছিলেন "না, এই মহান জাতি আবার জগতে মাথা তুলিবে, সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইবে।" আজ আমাদেরও সেই আশা সেই প্রার্থনা।*

---

* চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আকবরের নিরক্ষরতা

সা'দত আলি আখন্দ বি. এল্.

ভারতীয় ইতিহাস-পাঠকের নিকট সম্রাট্ আকবরের নিরক্ষরতার কাহিনী অত্যন্ত সুপরিচিত। পৃথিবীর নামজাদা বিজয়ী বীর ও শাসকবৃন্দের মধ্যে এক "মহান-মোগল" আকবরশাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই নিরক্ষর ছিলেন না। অবশ্য শেষ পয়গাম-বাহক হজরত মোহাম্মদের নিরক্ষরতা এই শ্রেণীর একটি সুপরিচিত ব্যতিক্রম।

সম্রাট আকবর যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর এই কাহিনী তাঁহার খাস্ উজীর আবুল ফজল আল্লামী সর্ব্বপ্রথম জগতের সম্মুখে বিঘোষিত করেন। উত্তরকালে ইহা সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর শাহ্ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল।

আকবরের নিরক্ষরতার কাহিনী মানুষ সর্ব্বপ্রথমে দ্বিধা সহকারেই গ্রহণ করিয়াছিল—কারণ উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তৎকালে এই মুখরোচক কাহিনীটি অপ্রমাণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সুপরিচিত কাহিনীটি জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা :—

(১) মোগলীয় প্রমাণ ও

(২) জেস্যুইট প্রমাণ।

মোগলীয় প্রমাণগুলি সংখ্যায় তিনটি—

প্রথম :—**"আইন-ই-আকবরী"**

এই গ্রন্থখানি সম্রাট আকবরের আদেশে মহাপণ্ডিত আবুল ফজল কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত হয়। ১৫৯০ হইতে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে এই প্রামাণ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে মিঃ গ্লাড্উইন এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুদিত করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত গভর্ণরের নামে উৎসর্গ করেন। ইহা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ্ ব্লকম্যান্ মূল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং মিঃ এইচ্. এস্. জ্যারেট দ্বিতীয় (১৮৯১ খৃঃ) ও তৃতীয় খণ্ড (১৮৯৪ খৃঃ) বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে ইংরাজী ভাষায় তর্জ্জমা করেন।

দ্বিতীয় :—**"আকবর-নামা"**।

এই গ্রন্থটিও আবুল ফজল ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। কিন্তু যুবরাজ সেলিমের ইঙ্গিতে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকারের জীবন-লীলার পরিসমাপ্তি হওয়ায় তিনি এই মূল্যবান ইতিহাসখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। উহার শেষ কয়েকটি অধ্যায় পণ্ডিত এনায়তুল্লাহ্ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ হেন্‌রী বিভারিজ, এফ্. এস্. এস্. বি. এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় :—**"তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী।"**

সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং এর লেখক। ইহা তাঁহার আত্মজীবনী।

অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ আলেকজাণ্ডার রোজার্স এই গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় তর্জ্জমা করেন। লণ্ডন রয়েল সোসাইটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম খণ্ড ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়াছে।

জেস্যুইট প্রমাণগুলির মধ্যে আমরা দুইটি প্রামাণ্য লেখকের রচনা আলোচনা করিব। ইঁহাদের নাম—

ফাদার এণ্টনি মনসেরাট, এস্. জে;

(Father Anthony Monserrate, S. J.)

ফাদার জেরম জেভিয়ার, এস্, জে।

(Father Jerome Xavier, S.J.)

অন্যান্য জেস্যুইট লেখক প্রত্যক্ষদর্শী নহেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের শুনা-কথার কাহিনীগুলি আলোচনা করা নিরর্থক মনে করিয়াছি। ফাদার মনসেরাট ১৫৮০ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ও ফাদার জেভিয়ার ১৫৯৫ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে দিল্লীর শাহীদরবারে যাতায়াত করিতেন। এই হিসাবে তাঁহাদের লেখাগুলি আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথম জেস্যুইট প্রমাণ :

(ক) দি রিলাকাম্ (১৫৮২ খৃঃ) (The Relacam)

(খ) দি মঙ্গোলিকা লিগাসিয়োনিস্ কমেনটারিযাস্। (১৫৯০ খৃঃ) (The Mongolica Legationes Commantarius)

এই দুইটি গ্রন্থই ফাদার মন্সেরাট কর্ত্তৃক ল্যাটিন ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় জেস্যুইট প্রমাণ :

ফাদার জেভিয়ার কর্ত্তৃক ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্র।

এই সমস্ত মোগলীয় ও জেস্যুইট প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া আকবরের ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে 'মহান্-মোগল' আকবর শাহ সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। এমন কি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, Akbar the Great নামক প্রামাণ্য জীবনী-রচয়িতা মিঃ ভি. এ. স্মিথ ও আকবরের শেষতম জীবনী-লেখক মিঃ লংেস বিনিয়ন (১৯৩২ খৃঃ) সাহেবদ্বয়ও আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

অথচ তাঁহাদের গ্রন্থেই আকবরশাহের অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-জ্ঞানের ভুরিভুরি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করিলাম—

(১) "আকবর আগ্রহ সহকারে সুফি কবি হাফিজ ও জালাল উদ্দীন রুমির আধ্যাত্মিক কবিতা সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।"

("Akbar willingly learnt by heart the mystic verses of the Sufi Poets, Hafiz and Jalal Uddin Rumi"........Smith's *Akbar the Great*. page 22).

(২) "আকবর অনেক মুস্লিম্ ঐতিহাসিক, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ ও এশিয়ার সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক সুফীকবিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জেস্যুইট পাদরীগণের নিকট হইতে বাইবেলের গল্প ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি শিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু, জৈন ও জোরওয়াষ্ট্রিনিয়ান ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ঐ সব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম শিক্ষার কোনো সুযোগ পান নাই।" (Akbar was intimately acquainted with the works of many Mahomedan historians and theologians, as weil as with a considerable amount of general Asiatic literature, specially the writings of the Sufi or mystic poets. He acquired from the Jesuit Missionaries a fairly complete knowledge of the Gospel story and the main outlines of the Christian faith, while at the same time learning from the accredited teachers the principles of Hinduism, Jainism and Zoroastrianism but he never found an opportunity to study Budhism." (Ibid-page. 337).

(৩) "যে কেহ আকবরকে কোনো একটি বিষয়ে সঠিক্ ও মনোরম ভাবে তর্ক করিতে শুনিয়াছে, সেই বিশ্বাস করিত যে সম্রাট প্রগাঢ় সাহিত্যিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি নিরক্ষর একথা কখনো মনে হইত না।"

"Any body who heard him arguing with acuteness and lucidity on a single debate, would have

credited him with wide literary knowledge and profound erudition and never would have suspected him of illiteracy." (Ibid)

(৪) "অথচ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে তৎকালীন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং স্পেন-সম্রাট ফিলিপ ব্যতীত অন্য সকল রাজা অপেক্ষা ধনবান্—ইতিহাস ও কাব্যে সুপণ্ডিত ও দার্শনিক আলোচনায় সুপবিপক্ক আকবর নিরক্ষর ছিলেন। তিনি পড়িতে কিংবা লিখিতে পারিতেন না।" ("And yet strange to say, Akbar, the greatest and except possibly Philip of Spain, the wealthiest potentate of his time in the world, a man versed in history and poetry and delighting in philosophical discussion, is illiterate. He can neither read, nor write." (*Akbar*—by L. Binyon, page 11).

এই সব কারণে স্বতঃই মনের ভিতরে দুইটি প্রশ্নের উদয় হয় :

(১) এতটুকু আক্ষরিক জ্ঞানের অধিকারী না হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রের এত বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করা একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল কি না।

(২) পৃথিবীর ইতিহাসে আকবরের নিরক্ষরতার তুলনা আছে কি না।

আমরা আকবরের নিবক্ষরতাকাহিনীর সৃষ্টিকারক ও সমর্থকগণের লেখা হইতেই এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

আকবরের নিরক্ষরতা-কাহিনীর স্রষ্টা আবুল ফজল আল্লামী ও তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ মেসার্স বিভারিজ, স্মিথ ও বিনিয়ন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কি ভাবে এই প্রশ্ন দুইটির মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব।

ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে তদীয় প্রভু শাহেন শাহ্ আকবর শাহ্ ছিলেন—

—"একজন ইন্সান্-ই কামিল অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ মানুষ"—

—"এই মরজগতে আল্লাহ্-তালার একজন প্রতিনিধি"—

—"স্বর্গীয় শিক্ষানিকেতনের বৃত্তিধারী ছাত্র"—

—"আল্লাহ্তালার কলেজের গ্রাজুয়েট।"—

সুতরাং তাঁহার পার্থিব-বিদ্যাশিক্ষার কি প্রয়োজন হইতে পারে?

আকবর শাহের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে আবুল ফজল সাহেব যে বিবরণ দিয়াছেন ও তাঁহাকে আজীবন "উম্মি" রাখা সম্বন্ধে যে সমস্ত কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা "আকবর নামা" হইতে নিম্নে উল্লেখ করা হইল*

---

* "At this time a set of superficialities, who were in the service of His Majesty the Shahinshah (Akbar) and were oblivious of an internal abode of wisdom, wrote to His Majesty Jahanbani (Humayun) and complained about His Highness. His Majesty, notwithstanding that he was aware of the inner light of the Shahinsah (Akbar) had regard to externals and sent a gracious letter containing instructions and admonitions full of kindness and not at all of a censuring or cautioning character *For what need has he, who has been taught at the Divine School, of human instructions? What concern has the nursling of Heaven with such didactics?* He (Akbar) was first taken before Mullazada Mulla Asamuddin to be taught. As this teacher was devoted to pigeons the servants reported against him. His majesty discharged him and made over the duty of outward instructions to Moulana Bayazid. He performed his duty but *as the world-adoring Deity (God) did not wish that his own special pupil should become tainted by exoteric sciences He (God) diverted him (Akbar) from such pursuits and made him (Akbar) inattentive to them. The shallow thought it was the fault of the teachers and reported against them,* but as the latter were right-thinking and of good character, the complaints were not accepted, or acted upon. At last His Majesty (Humayun) had an inspiration, to wit, that for the purpose of instructing that *pupil of the Divine School (Akbar)* lots should be cast between Mulla Abdul Qadir, Mullazada Mulla Asamuddin and Moulana Bayazid, so that he on whom the lucky chance would fall, should be exalted by being made the sole teacher. It happened that the lot fell on Moulana Abdul Qadir and an order was issued for the removal of Moulana Bayazid and the appointment of Moulana Abdul Qadir."

"It is not hidden from the wise and acute that the appointment of a teacher in a case like this, springs from use and wont and does not pertain to the acquisition of perfection. *For him, who is a God's pupil, what occasion*

—"এই সময়ে শাহেন-শাহের অধীনস্থ ও তাঁহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি বাজে লোক জাহান-বানির (হুমায়ুনের) নিকটে পত্রযোগে শাহেন শাহের বিরুদ্ধে আরজি দাখিল করিল। যদিও সম্রাট হুমায়ুন শাহেন-শাহের অন্তর্নিহিত জ্ঞানালোক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তথাপি বাহ্যিক সৌজন্য দেখাইয়া তিনি শাহেনশাহ্‌কে একখানি স্নেহলিপি প্রেরণ করিলেন। উপদেশ ও দয়ামায়া মাখানো অনুযোগ ভিন্ন কোনো প্রকার তিরস্কার বা সাবধানবাণী এই চিঠিতে ছিল না। কারণ যিনি স্বর্গীয় স্কুলে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার মানুষেব নিকটে পাঠ লইবার কি প্রয়োজন আছে? মানুষের নিকট শিক্ষার সঙ্গে স্বর্গীয় শিশুর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?.........

........লেখাপড়া শিক্ষার জন্য তিনি (আকবর) প্রথমে মোল্লাজাদা মোল্লা আসামুদ্দীনের নিকট প্রেরিত হন। কিন্তু এই শিক্ষক সর্ব্বদা পায়রা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া কর্ম্মচারিগণ নালিশ করায় সম্রাট হুমায়ুন তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া আকবর শাহের বাহ্যিক শিক্ষা-দীক্ষার ভার মৌলানা বায়জিদ সাহেবের উপর ন্যস্ত করেন। মৌলানা সাহেব কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশ্ব-বন্দিত প্রভুর (আল্লাহ-তালার) এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে তাঁহার খাস-শিষ্য পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে কলুষিত হইয়া উঠে। সেইজন্য তিনি আকবরকে উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহ হইতে দূরে লইয়া গেলেন ও তাহাদের প্রতি অমনোযোগী করিলেন। বাজে লোকে মনে করিল ইহা শিক্ষকগণের দোষ; সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিল। কিন্তু শিক্ষকগণ সত্য-চিন্তাশীল ও সচ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ গৃহীত হইল না, বা তদনুসারে কোনো কার্য্য করা হইল না। অবশেষে সম্রাট হুমায়ুন স্বর্গীয় প্রেরণা পাইলেন যে স্বর্গীয়-স্কুলের ছাত্রটিকে শিক্ষা-দীক্ষা দিবার জন্য মোল্লা আবদুল কাদির, মোল্লাজাদা মোল্লা আসামুদ্দীন ও মৌলানা বায়জিদের মধ্যে লটারী করা হউক ও সেই লটারীতে যিনি সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহাকেই (আকবরের) একমাত্র শিক্ষক নিযুক্ত কবা হউক। এই লটারীতে মৌলানা আবদুল কাদের জিতিলেন এবং তদনুসারে মৌলানা বায়জিদকে বরখাস্ত করিয়া মৌলানা আবদুল কাদিরকে নিযুক্ত করিবার পরওয়ানা বাহির হইল।

"জ্ঞানী ও পারদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে আকবর শাহের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত করিবার জন্য নহে, উহা একটী বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। কারণ যিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌তালার ছাত্র, মানুষের নিকট তাঁহার পাঠ লইবার কিংবা পাঠে মনোযোগ দিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? এই জন্য তাঁহার পবিত্র হৃদয় ও আত্মা কখনো বাহ্যিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয় নাই। তাঁহার (আকবরের) অন্তর্নিহিত গুণাবলীর আলোক প্রকাশের সময়, তাঁহার আক্ষরিক জ্ঞানলাভের অনিচ্ছাব সহিত সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে রাখা মানুষকে ইহাই দেখাইল যে এই যুগ-গুরুর উচ্চ জ্ঞানগুলি কোনো মানুষের নিকট হইতে বা নিজ চেষ্টায় লব্ধ নহে।—উহা আল্লাহ্‌তালার প্রদত্ত দান—উহাতে মানুষের কোনো হাত নাই।

আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আবুল ফজল সাহেব বলিতেছেন যে যুগ-গুরু ও আল্লাহ্-তালার প্রিয় শিষ্য আকবর শাহের পক্ষে নিরক্ষর থাকিয়াও বর্হিজাগতিক বিজ্ঞানগুলি আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, কারণ তাঁহাকে নিরক্ষর রাখিয়া আল্লাহ্‌তালা ইহাই জগতকে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে আকবর শাহের বর্হিজাগতিক জ্ঞানগুলি কোনো মানুষের নিকট হইতে বা আপন চেষ্টায় লব্ধ নহে। পরন্তু উহা স্বর্গীয় দান—উহাতে মানুষের কোনো হাত নাই।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে আবুল ফজল সাহেব একেবারেই নিরুত্তর রহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আকবর শাহের নিরক্ষরতার কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি যে সমস্ত কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন— তাহা পাঠ করিলে আমাদের দৃষ্টি স্বতঃই "উম্মি" পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এখন আমরা আকবর শাহের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব।

আবুল ফজল সাহেবের আধ্যাত্মিকতত্ত্বপরিপূর্ণ কৈফিয়ৎগুলি মেসার্স বিভারিজ, স্মিথ ও বিনিয়ন প্রমুখ মনীষিগণের

---

is there for teachings by creatures, or for application to lessons? Accordingly his holy heart and sacred soul never turned towards external teachings and his possession of the most excellent sciences together with his disinclination for the learning of letters were a method of showing to mankind, at the time of the manifestation of the lights of the hidden abundancies, that the lofty comprehension of this Lord of the Age (Akbar) was not learnt or acquired, but was the gift of God in which human effort had no part" (Akbar Namah : Chap III pp. 588-590).

মনঃপূত হয় নাই। কিংবা তাঁহাদের জড়বাদী মন উক্ত কৈফিয়ৎ গুলিকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করে নাই।

কারণ তাঁহারা জানিতেন যে সত্যিকার ইতিহাস পাঠকেরা আকবর শাহের নিরক্ষরতার যুক্তিপূর্ণ কারণ না পাইলে তাঁহার (আকবর শাহের) অগাধ বহির্জাগতিক জ্ঞান-সম্পদের কাহিনী কখনো বিশ্বাস করিবেন না।

সুতরাং তাঁহাদের সন্দেহবাদী মনকে নিঃসংশয় করিবার জন্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের যুক্তিপূর্ণ কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

আবুল ফজল সাহেবের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কারণগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা যে যুক্তিবাদপূর্ণ কারণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

"আকবর-নামার" নামজাদা অনুবাদক বিভারিজ সাহেব তাঁহার বিরাট গ্রন্থের কোথাও আকবর শাহের নিরক্ষরতার সহিত তাঁহার বিপুল জ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু তিনি বরাবর আকবর শাহের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে সন্দেহই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এবিষয়ে কোনো যুক্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া দ্বিধা সহকারে লিখিয়াছেন :

"ইহাও হয়ত সম্ভবপর হইতে পারে যে আকবর কখনো পড়িতে কিংবা লিখিতে জানিতেন না। হুমায়ুনের মত শিক্ষিত পিতার পুত্রের পক্ষে ইহা বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু এই নিরক্ষরতার জন্য তাঁহাকে (হুমায়ুনকে) কখনো দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।"—

কিন্তু মিঃ বিভারিজ খুব বেশীদিন এই দ্বিধাপূর্ণ আচরণ বজায় রাখেন নাই।

"তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর" ইংরাজী অনুবাদক মিঃ আলেকজাণ্ডার রেজার্স তাঁহার গ্রন্থে "উম্মি"—শব্দটির অর্থ "নিরক্ষর" অনুবাদ করার পর মিঃ বিভারিজ ক্রমশঃ সাহসী হইয়া উঠেন। অতঃপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সাহা প্রণীত "Promotion of learning in India during Mahomedan Rule" পুস্তকখানির পরিচয় দিতে গিয়া তিনি গ্রন্থকারকে আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে সন্দিহান দেখিয়া মৃদু তিরস্কার করেন। অথচ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "আকবর-নামা"র প্রথম প্রকাশের সময় তিনি স্বয়ং আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন।

মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "Akbar the Great Moghul" গ্রন্থখানিতে মিঃ বিভারিজের মত দ্বিধা প্রকাশ করেন নাই। আকবর শাহের নিরক্ষরতার কারণ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সাহস সহকারে মূল কাহিনী রচয়িতা আবুল ফজল সাহেবের সহিত ভিন্নমত হইয়াছেন এবং মহান্ আকবরের নিরক্ষরতার বিজ্ঞান-সম্মত কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

"স্কুল-শিক্ষকের দৃষ্টিতে আকবর একটী সম্পূর্ণ কুঁড়ে ছাত্র ছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষাদানের সমস্ত চেষ্টা তিনি এতই সফলতার সহিত ব্যর্থ করিয়াছিলেন যে তিনি কখনো বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরও শিক্ষা করিতে পারেন নাই এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে ও লিখিতে অক্ষম ছিলেন।"*

হায়, আবুল ফজল আল্লামী!

"আল্লার ছাত্র" "স্বর্গীয় স্কুলের বিদ্যার্থী" এবং "আল্লার কলেজের গ্রাজুয়েট"—মহান্ আকবরশাহ্ আজ অবিশ্বাসী ঐতিহাসিক মিঃ স্মিথের হাতে পড়িয়া "একটি সম্পূর্ণ কুঁড়ে ও অমনোযোগী পড়ুয়া" বলিয়া জগতে পরিচিত হইতেছেন!

পাঠ্যাবস্থায় আকবরকে সম্পূর্ণ কুঁড়ে ও অমনোযোগী ছাত্র প্রমাণ করিতে গিয়া মিঃ স্মিথ আপনাকে নিরক্ষরতার মূল কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে, আবুল-ফজলের আধ্যাত্মিক কৈফিয়ৎ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ না করিলে কখনই যুক্তি-তর্কের দ্বারা আকবরের নিরক্ষরতার কাহিনী গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

---

* "A throughly idle boy from the school-master's point of view, who resisted all attempts to give him book learning so successfully that he never mastered the alphabets and to the end of his days was unable to read and write.".....(Akbar the Great Moghul—2nd. Ed. P. 22.)

আকবরকে সম্পূর্ণ কুঁড়ে ও অমনোযোগী বলা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দর্শন, ইতিহাস, সাধারণ এসিয়াটিক সাহিত্য, সুফিতত্ত্ব ও জগতের সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী বলা—তাঁহার দ্বারা হাফেজ ও জালালুদ্দিন রুমির সমগ্র কাব্য আবৃত্তি করাইয়া লওয়া, দুইটী পরস্পর বিরোধী বিষয়—আবুল ফজলের আধ্যাত্মিক যুক্তি গ্রহণ না করিয়া ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন করা কখনো সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

মিঃ স্মিথের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তিনটি। আমরা এখন সেইগুলির আলোচনা করিতেছি।

(১) "একপ্রকার অতি-মানুষিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়া সাহিত্যিক জ্ঞান আয়ত্ত করা আকবর শাহের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। এই স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই তিনি তাঁহার সম্মুখে পঠিত পুস্তকের বিষয়—রাজসরকারের বিভাগীয় অবস্থা—এমন কি হাজার হাজার পক্ষী অশ্ব ও হস্তীর নাম স্মরণ রাখিতেও সমর্থ হইতেন।"*

আকবরকে এক "অতি-মানুষিক শক্তির অধিকারী" বলিয়া ঘোষণা করা মিঃ স্মিথের নিজস্ব কীর্ত্তি; মোগল বা জেস্যুইট—কোনো পক্ষই আকবর শাহ্‌কে অসীম স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন নাই।

মিঃ স্মিথের এই অভিনব "অতি-মানুষিক স্মৃতির" থিওরী যে কিরূপ হাস্যজনক ব্যাপার, তাহা মিঃ স্মিথের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের চক্ষেও ধরা পড়ে নাই।

আকবরকে সম্পূর্ণ অমনোযাগী ও আলস্যপরায়ণ বলিয়া চিত্রিত করার পর মিঃ স্মিথ তাঁহাকে এমন এক অসীম স্মৃতিশক্তির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন যে, যদিও তৎকালীন সভ্যজগতের সাতজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল ধরিয়া তাঁহাকে তালিম দিয়াছেন তবুও তিনি ফারসী বর্ণমালাব সামান্য কয়টা অক্ষর পর্য্যন্ত চিনিতে সমর্থ হন নাই! ফারসী ভাষা জন্মের আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনো পড়ুয়ার হাতে এমন বিড়ম্বিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে লিখিত হয় নাই!

অতঃপর মিঃ স্মিথের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এই "অতিমানুষিক স্মৃতি'র থিওরীটি যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসমর্থনীয়, তাহা বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন—মোগল বা জেস্যুইটি কোনো প্রকার সূত্র হইতেই ইহার সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

অবশ্য এই অভিনব থিওরীর অসারতা সম্বন্ধে মিঃ স্মিথও একেবারে অনবধান ছিলেন না। থিওরীটি গ্রহণযোগ্য করিবার মানসে তিনি যে বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

(২) "আকবর চক্ষু অপেক্ষা কর্ণদ্বারাই পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করা পছন্দ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার অপরিসীম স্মৃতি-শক্তির উপরই নির্ভর করিতেন। লিখিত বিষয় পাঠ করিতে না হওয়ায় এই স্মৃতি-শক্তি কখনো দুর্ব্বল হইয়া যায় নাই।"+

পাঠ্যজীবনের দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে এই অপরিসীম স্মৃতি-শক্তি আকবরশাহ্‌কে ফারসী বর্ণমালার অক্ষর কয়টিও চিনিবার শক্তি দান করে নাই কেন, ইহার উত্তর মিঃ স্মিথ তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকখানির কোনো জায়গায়ও দেওয়া সমীচীন মনে করেন নাই।

ইতিহাস লিখিতে বসিয়া মিঃ স্মিথ মনোবিজ্ঞানের যে নতুন থিওরী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মৌলিকত্ব অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস আমাদের নাই। লিখিত পুস্তক ব্যবহারে মানুষের স্মৃতি-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কিনা ইহার উত্তর মনোবৈজ্ঞানিকগণই দিবেন। কিন্তু আমরা, সাধারণ মানুষেরা অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বুঝিতে পারি যে মূর্খলোক অপেক্ষা লেখাপড়া জানা লোকেরাই পুস্তকের লিখিত বিষয় অতি সহজে স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। আকবরশাহের নিরক্ষরতা প্রমাণ করিতে গিয়া আগ্রহাতিশয্যবশতঃ মিঃ স্মিথ এমন সব অভিনব থিওরী আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা যুক্তিতর্কের নিকট কখনই টিকিতে পারে না।

---

* ". He possessed a memory of almost superhuman power, which enabled him to remember accurately the contents of the books read out to him, the details of the departmental business and even the names of hundreds of individual birds, horses and elephants.".... —Akbar the Great Moghul—p.337.

\+ Akbar "preferred to learn the contents of books through the ear, rather than the eyes and was able to trust his prodigious memory, which was never enfeebled by the use of written memoranda." .(Ibid p. 337)

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দুইটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে গিয়া মিঃ স্মিথ কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

(৩) "মূর্খতা ভারতবর্ষে নিন্দার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না। যোদ্ধৃ জাতিগুলির পুরুষদের মধ্যে লেখাপড়া কখনই উপযুক্ত পেশা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; এবং হায়দর আলি, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন।"*

মাত্র বৎসর কয়েক পূর্ব্বে (১৯১৬ খৃঃ) ডক্টর লাহার "Promotion of Learning in India during Mahomedan Rule" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া বিভারিজ সাহেব বলিয়াছিলেন—

"কিন্তু আকবরের নিরক্ষরতায় সন্দিহান হওয়া মিঃ লাহার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কারণ লিখিতে পড়িতে পারে না এমন নামজাদা শাসকের সংখ্যা প্রাচ্যে অসংখ্য। উদাহরণ স্বরূপ 'উম্মী' পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ, আলাউদ্দীন ও হায়দর আলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।" +

আমরা এমনি ভাবে প্রাচ্যের চারটি নিরক্ষর অথচ বিশিষ্ট শাসকের নাম পাইলাম। আমাদের এখন দেখিতে হইবে, আকবরশাহের সহিত ইঁহাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে তুলনা হইতে পারে।

এই শাসক-চতুষ্টয় নিরক্ষর হইলেও তাঁহাদের রাজত্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমরা মেসার্স বিভারিজ ও স্মিথের সহিত সম্পূর্ণ একমত। আমরা আরও মানিয়া লইতেছি যে নিরক্ষরতার দরুন তাঁহাদের শাসন-কার্য্য পরিচালনে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদ্বয় আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আকবর এবং উপরোক্ত শাসক চতুষ্টয়ের মধ্যে উপমেয় বিষয় মাত্র দুইটী—

(১) তাঁহাদের নিরক্ষরতা, ও

(২) তাঁহাদের সুচারু শাসন পরিচালন।

আসলে কিন্তু উপমেয় বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা জানিতে চাই :—

(১) বাদশাহ্ হুমায়ুন যেমন পুত্র আকবরের বিদ্যা শিক্ষার জন্য দশ বৎসর কাল ধরিয়া ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কোনো চেষ্টা হজরত মোহাম্মদ, আলাউদ্দীন, হায়দরআলী বা রণজিতের অভিভাবকগণ করিয়াছিলেন কিনা।

(২) আকবর শাহের শিক্ষার জন্য যেমন তৎকালীন সাতজন নামজাদা শিক্ষক পরপর নিযুক্ত করা হইয়াছিল—উপমিত শাসক-চতুষ্টয়ের বেলায়ও তেমন কোনো সুবন্দোবস্থ করা হইয়াছিল কি না।

(৩) নিরক্ষরতা সত্ত্বেও এই চারজন শাসক কখনো আকবর শাহের মত ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এসিয়ার সাধারণ সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া দাবি করিতেন কিনা।

(৪) আকবরশাহ্ যেমন এক "অতি-মানুষিক স্মৃতি" শক্তির অধিকারী হইয়াও দশবৎসর ফারসী বর্ণমালা শিখিতে সমর্থ হন নাই, তেমন অঘটন ইঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছিল কিনা।

(৫) শাসক-চতুষ্টয়ের হাতের কোন লেখা বিদ্যমান আছে কিনা।

সৌভাগ্যবশতঃ প্রাচ্যের নিরক্ষর শাসক-চতুষ্টয়ের প্রামাণ্য জীবনচরিত বিদ্যমান আছে এবং তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আকবর শাহের সহিত তুলিত হইতে পারেন না।

আকবর শাহের নিরক্ষরতার বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাইতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদ্বয় ন্যায়শাস্ত্রের যে অতি সাধারণ

---

* "Illiteracy carries no reproach in India. Reading and writing have never been regarded as fit occupations for men belonging to the fighting races and many of the most notable sovereigns, as for examples, Haidar Ali and Ranjit Singh have never been able to read and write."........(Ibid...p 41).

+ "But Mr. Law need not have doubted Akbar's illiteracy, for the East teems with instances of distinguished administrators who could neither read, nor write. For examples, we have the Prophet Mohammed, who was known as the 'unlessoned" (Ummi) Prophet and we have Alauddin Khilji and Haidar Ali." ..

ভ্রমে (fallacy) পতিত হইয়াছেন তাহা এই

হজরত মোহম্মদ, আলাউদ্দিন, হায়দার আলী ও রণজিৎ নিরক্ষর হইয়াও শ্রেষ্ঠ শাসক হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরও একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন; সুতরাং আকবরও নিরক্ষর ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী না হইয়াও সাধারণ মানুষ এমন ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আবুল ফজল আল্লামীর আধ্যাত্মিক কৈফিয়ৎ গ্রহণ না করিয়া, আকবর শাহের নিরক্ষরতার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে গিয়া মেসার্স বিভারিজ ও স্মিথ শুধু নিজেরাই বিড়ম্বিত হন নাই— সাধারণ ইতিহাসপাঠকগণকেও ভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় ফেলিয়া ছাড়িয়াছেন।

(২)

বিরুদ্ধবাদী দল

বলিতে কি আবুলফজল সাহেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অসারতা কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

মুস্‌লিম্ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৌলানা শিবলী "মাসির-উল্-ওমরা" নামক এক প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার "শের-উল্-আজম" নামক কাব্যে আকবর শাহের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে সন্দেহের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

মৌলানা শামস্-উদ্-দৌলা প্রণীত "মাসির-উল্-ওমরা" একটি সুপ্রামাণ্য ইতিহাস। শুধু মৌলানা শিব্‌লী নহেন, পাশ্চাত্যের 'প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদ' ব্লকম্যান্ ও বিভারিজ সাহেবদ্বয়ও "আইন-ই-আকবরী" ও 'আকবরনামা' অনুবাদের সময় এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মৌলানা শিবলীর পরে "আকবরের নিরক্ষরতা" মতবাদ সম্বন্ধে এক বিরুদ্ধবাদী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলায় এই বিরুদ্ধ মতবাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Promotion of learning in India during Mahomedan Rule-এর ভূমিকায় মিঃ বিভারিজের মন্তব্য* প্রকাশ করিয়া ডক্টর লাহা তাঁহার স্বমত সমর্থনের জন্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র রচনাকারে অনেক গ্রহণীয় প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রত্যেক ইতিহাসরসিক ছাত্রের এই পরিশিষ্ট পাঠ করা উচিত।

উক্ত পরিশিষ্টে ডক্টর লাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, মিঃ ব্লকম্যান্ "Hindiash" ও মিঃ বিভারিজ "Ummi" এই পার্শী শব্দদ্বয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। এই দুইজন নামজাদা 'প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদ' পাশ্চাত্য-অনুবাদক উপরোক্ত শব্দ দুইটির অপ-ব্যাখ্যা না করিলে আকবর শাহের নিরক্ষরতা-কাহিনী অনেক দিন পূর্ব্বেই ভিত্তিহীন বলিয়া মানুষের নিকট উপহসিত হইত। আমরা "Hindiash" ও "Ummi" শব্দদ্বয় সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ টমাস আর্নল্ড সুবিখ্যাত মোগল চিত্রকর ওস্তাদ বিহ্‌জাদের "জাফর-নামার" চিত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিনব চিত্র-পুস্তকখানিতে আমরা সর্ব্বপ্রথম "নিরক্ষর" আকবর শাহের হস্ত-লিখিত একটি শব্দের সহিত পরিচিত হই। এই শব্দটি যে "উম্মী" আকবর শাহের স্বহস্ত-লিখিত তাহা তন্নিম্নে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দস্তখত সহ সার্টিফিকেট হইতেই সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

"আকবর-নামা" আকবর শাহের ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষ তাইমুর লংয়ের জীবন-চরিত। বাদশাহ্ হুমায়ুন যখন রাজ্য-হারা হইয়া নির্ব্বাসিত-জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন এই মূল্যবান গ্রন্থখানি অপহৃত হয়। "আকবর-নামায়" এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

---

*"In his chapter on Akbar, Mr. Law disbelieves the story of his illiteracy, inspite of his son's statements, as well as those of the Catholic Missionaries and he relies on the spurious Memoirs which were translated by Major Price.".. .... .

"গাওয়ানেরা আসিয়া লুটপাট করিতে লাগিল এবং বাদশাহের (হুমায়ুনের) খাস দখল হইতে তাঁহার সত্যিকার বন্ধুস্বরূপ অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক অপহরণ করিল। ইহাদের মধ্যে মোল্লা সোলতান আলি কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও ওস্তাদ শিল্পী বিহ্‌জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত "তাইমুর নামা" (জাফর-নামা) খানিও অপহৃত হয়। এই চুরি যাওয়া বইখানি শাহেন শাহের (আকবর শাহের) লাইব্রেরীতে আছে।"* (আকবর নামা পৃঃ ৩০৯-৩১০)। অপহৃত বইখানি কেমন করিয়া পুনরায় আকবর শাহের লাইব্রেরীতে আসিল, সে সম্বন্ধে আবুল ফজল সাহেব কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু 'জাফর নামার" প্রথম পৃষ্ঠায় জাহাঙ্গীর শাহের লেখা হইতে জানা যায় যে মীর জালালুদ্দিন হোসেন নামক এক ব্যক্তি বইখানি রাজধানী আগ্রা নগরীতে আকবর শাহ্‌কে উপহার দিয়াছিলেন।

যে গ্রন্থখানি বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছিল উহা এমনি ভাবে আকবর শাহের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহানও যে এই গ্রন্থখানির সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা মিঃ টমাসের নব প্রকাশিত "জাফর-নামা"র প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁহাদের দস্তখত হইতেই বুঝা যায়।**

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ওস্তাদ বিহ্‌জাদ এই "জাফর-নামা" চিত্রিত করিয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীর পরিচয় প্রসঙ্গে মিঃ স্মিথ্ লিখিয়াছেন ঃ—***

"বাবর শাহের সমসাময়িক হিরাট শহরের বিহ্‌জাদ সাহেব আকবর শাহ্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্রাট আকবরের চেষ্টায় ফতেপুর শিক্রীতে যে সমস্ত শিল্পী সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ওস্তাদ বিহ্‌জাদের চিত্র-পদ্ধতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। আকবর শাহের অনুমত্যানুসারে রচিত গল্পের বই "দারাব-নামা' ওস্তাদ বিহ্‌জাদের অঙ্কিত একখানি চিত্র স্থান পাইয়াছে, উহা শিশু আকবরের চিত্র শিক্ষক আবদুস্ সামাদ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইযাছিল।"

এই "জাফর-নামা"র প্রথম-পৃষ্ঠায় সম্রাট্ আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের হস্ত-লিপি বিদ্যমান আছে। উহার একস্থানে **"ফরওয়ারদিন"*** এই পার্শী শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা যে সম্রাট্ আকবর শাহের হস্ত-লিখিত, তাহা বাদশাহ জাহাঙ্গীর নিজ হাতে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন :—

"এই শব্দ হজরত আস্তান (মহামহিম ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ আকবর) সাহেবের স্বহস্ত-লিখিত। মীর জালালুদ্দীন হোসেন এই গ্রন্থ শাহেনশাহ্‌কে রাজধানী আগ্রা নগরীতে উপহার প্রদান করেন।"**

মিঃ স্মিথ এই 'জাফর-নামা'র অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু আকবর শাহের শেষ-তম জীবনী-লেখক মিঃ বিনিয়ন এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। 'জাফর-নামা'কে জাল বলিয়া অভিহিত করিবার দুঃসাহস যদিও তাঁহার ছিল না, নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্বারা গ্রন্থখানিকে খাটো করিবার চেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন :—

---

* "The Gawans came and proceeded to plunder and many rare books, which were real companions and were always kept in His Majesty's (Humayun's) personal possession, were lost Among these was the Timur Nama (Zafar-Nama) transcribed by Mulla Sultan Ali and illustrated by Ustad (Master) Bihzad and which is now in the Shahinshah's (Akbar's) library.......p. 309-310 : *Akbar-Nama*

**"Mir Jalaluddin Hossein presented this manuscript (copy) to His Majesty (Akbar) at the Capital Agra" Front Page : *Zafar Nama.*

***"The Persian Master closely connected with the Indian Branch of the school founded by Akbar, was Bihzad of Herat, the contemporary of Babar. His works, more than any other man, was taken as a model by the numerous artists whom Akbar collected round him at Fatepur Sikri The darabnama, a story book prepared to Akbar's order, includes a composition by Bihzad, touched up by Abdus Samad, who had been the drawing master of Akbar, as a boy." *Akbar. the Great Moghul* By Smith

* "The word 'Forwardin' means the first month of the Persian year corresponding to March-April. It begins with the Vernal equinox and hence, perhaps, the allusion to its equability. "His justice equable as Forwardin.". *Akbar-Nama :* page 20.

** "This word is in the handwriting of Hajrat Astan (His late Majesty Akbar) and Mir Jalaluddin Hossein presented this manuscript to His Majesty at the...capital of Agra"...*Zafar-Nama.*

"সত্য বটে একখানি মূল্যবান হস্ত-লিখিত 'তাইমুর-জীবনী'র উপরের পৃষ্ঠায় তাঁহার (আকবরের) একটা 'ছেলেমানুষী' দস্তখত বিদ্যমান আছে এবং জাহাঙ্গীর সসম্মানে সেই দস্তখত তাঁহার পিতার দস্তখত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য দস্তখত আকবর শাহের সর্ব্বজনবিদিত নিরক্ষরতাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে।" (আকবর—১১পৃঃ)***

মিঃ বিনিয়নের উপরোক্ত মন্তব্য একেবারেই অর্থহীন। আকবরের হস্তলিপির কোনো নিদর্শন প্রমাণিত না হওয়ায় আমরা এতদিন তাঁহার নিরক্ষরতাকাহিনী বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষরের অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হওয়ার পরেও আকবরের জীবনী-রচয়িতাগণ তাঁহার নিরক্ষরতা-কাহিনীর অসত্যতা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিতেছেন। পরন্তু নবআবিষ্কৃত আকবরের হস্ত-লিপি "ছেলেমানুষী" লেখা বলিয়া উহার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য দিতে স্বীকৃত হইতেছেন না।

"আকবর-নামায়" আকবর শাহের হস্তলিপি আবিষ্কারের পরে মিঃ বিনিয়নের উপরোক্ত মন্তব্য শুধু কুযুক্তিপূর্ণ নহে, হাস্যকরও বটে।

প্রাচীন মতবাদ খণ্ডন

এখন আমরা আকবরের নিরক্ষরতাবাদীদের লেখা হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন না :—

(১) "আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত আছে যে, পড়ুয়ারা প্রত্যহ বাদশাহকে গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। প্রত্যহ যতগুলি পাতা পড়া হইত পাঠ শেষে সম্রাট স্বয়ং নিজ কলম দিয়া সেই পাতার সংখ্যা অঙ্কে লিখিয়া রাখিতেন। আবুল ফজলের মূল পারসী বিবরণ এইরূপ :—

"Wa har ruz ke badan ja rasad, shumar-h-i-ah hindiasah baqualam gauharbar naqsh kunad, a baadad awraq khawanandah ra naqd az surkh wa sufaid bakshish shawad."

অর্থাৎ—"প্রত্যহ (পুস্তকের) যে যায়গায় (পাঠক) উপস্থিত হইতেন সেখানে তিনি (আকবর) তাঁহার রত্নখচিত কলম দিয়া পঠিত পৃষ্ঠার সংখ্যা অঙ্ক দ্বারা লিখিয়া রাখিতেন। যত পাতা পড়া হইত তদনুযায়ী তিনি পাঠকগণকে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা দিয়া নগদ বিদায় করিতেন।"

"Hindisah" এই পারসী শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ "Numerical figures."

মিঃ ব্লকম্যান উপরোক্ত অংশের ইংরেজী তর্জ্জমা করিবার সময় "Hindisah" শব্দটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অনবধানতার ফলে সম্রাট আকবর যে অঙ্ক দ্বারা পুস্তকের পাতার সংখ্যা লিখিতে পারিতেন এই বহু মূল্যবান্ তথ্য ঐতিহাসিকগণের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

মিঃ গ্লাড়উইন কিন্তু এই মারাত্মক ভুলটী করেন নাই। তাঁহার অনুবাদে তিনি লিখিয়াছেন যে পড়ুয়ারা প্রত্যহ পড়া শেষ করিতেন, সেখানে সম্রাট নিজ হস্তে পৃষ্ঠার সংখ্যা লিখিয়া রাখিতেন।

অতএব স্বয়ং আবুল ফজলের রচিত 'আইন-ই-আকবরী' হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাদশাহ আকবর অন্ততঃ অঙ্ক দিয়া সংখ্যা লিখিতে পারিতেন।

'জাফর-নামার' এক খানি পাতায় আকবর শাহের স্বহস্ত লিখিত লেখা হইতে পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে সম্রাট পারসী বর্ণমালা দিয়া বাক্য লিখিতে পারিতেন।

সুতরাং "আইন-ই-আকবরী" ও 'জাফর নামা হইতে ইহাই অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হইল যে আকবরশাহ অঙ্ক ও বাক্য দুইই লিখিতে পারিতেন।

***"It is true that there exists on the fly leaf of a precious copy of the '*Life of Timur*"—Akbar's ancestor, a single signature of his, laboriously written in a childish hand and reverently attested to by his son Jahangir. But this signature preserved as an unique marvel, only confirms the universal testimony to his inability....*Akbar* p. 11

(২) "উম্মী" শব্দটীর অর্থ লইয়া বড়ই গোল বাধিয়াছে। তুজুক-ই-জাহাঁগিরীর অনুবাদক মিঃ রোজার্স "উম্মী" শব্দের শুদ্ধ অনুবাদ করিতে পারেন নাই বলিয়া ডক্টর লাহা অভিযোগ আনিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন :—*

"... ... তুজুক-ই-জাহাঁগিরীর যে অংশটির উপর মিঃ রোজার্স নির্ভর করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে তাহার অন্যরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থে "উম্মী" শব্দটি "লিখিতে পড়িতে অক্ষম" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'মুহিত্-উল-মুহিতে' (প্রথম খণ্ড ৪০ পৃঃ) উক্ত শব্দটির 'স্বল্পভাষী' (al-qualiul kalam) এই অর্থটিও পাওয়া যায়। পুর্ব্বাপর অংশের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া 'উম্মী' শব্দটীকে 'অল্পভাষী' অর্থে সুসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই অর্থটি ব্যবহার করিলে অংশটির অনুবাদ এইরূপ দাঁড়াইবে :—

'আমার পিতা (আকবর) প্রায়ই সকল শ্রেণীর—বিশেষতঃ পণ্ডিত ও হিন্দুস্তানের বিদ্বান ব্যক্তিদের সহিত উঠাবসা করিতেন। যদিও তিনি অল্পভাষী প্রকৃতির লোক ছিলেন, তথাপি সর্ব্বদা বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত সাহচর্য্য হেতু তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনায় কেহ তাঁহাকে অল্পভাষী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। গদ্য ও কাব্য রচনায় কেহই তাঁহার চেয়ে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন না'... ... ...উপরোক্ত বর্ণনার তর্জ্জমায় 'উম্মি' শব্দের অর্থ "লিখিতে পড়িতে অক্ষম" না দিয়া "স্বল্পভাষী" ব্যবহার করায় অর্থের কোনরূপ অসঙ্গতি হয় নাই। বরং এখানে 'উম্মি' শব্দের অর্থ 'স্বল্পভাষী' না করিলে শেষোক্ত বাক্যের কোন অর্থই থাকিতে পারে না। "লিখিতে পড়িতে অক্ষম" ব্যক্তি কেমন করিয়া গদ্য ও কাব্য রচনায় পরিপক্কতা লাভ করিতে পারেন? আবার নিরক্ষর অথচ গদ্য ও কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন একথা সুস্থ মস্তিষ্কে ও স্থির চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

(৩) জেস্যুইট প্রচারক ফাদার এন্টনী মনসেরাট ও জেরোম জেভিয়ারের গ্রন্থ ও পত্রাবলী এখন আমাদের শেষ বিচার্য্য বিষয়।

ফাদার এন্টনী ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর ও ফাদার জেভিয়ার ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ বৎসর কাল দিল্লীর শাহী দরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন।

উভয় প্রচারকই খুব উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণগুলি সহজে অবিশ্বাস করা সম্ভব নহে। তথাপি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাঁহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী—বিশেষতঃ এই দূর প্রাচ্যদেশে যে সকল বিষয় তাঁহারা শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন সব সময় সেগুলির যথার্থ বিবরণ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে সমসাময়িক ইতিহাস তাঁহাদের বিবরণগুলির স্বপক্ষে সাক্ষ্য না দিলে উহাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

The Jesuit and the Great Moghul নামক প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা স্যার ম্যাক্লাগণ (Sir Maclagon) ফাদার জেভিয়ারের পত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন;—

অনেক খানে পত্রগুলি একেবারেই মূল্যহীন প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই পত্রগুলি

---

*".......as regards the passage in the "Tuzuk-i-Jahangiri' on which Mr. Beveridge relies, I now notice that it is capable of a different interpretation. The word *"Ummi'* in the text has been taken to mean *'unable to read and write.'* But the *'Muhit-ul-Muhit'* (Vol I page 40) includes among other meanings of the said word that of *'taciturn'* (al-qualiul kalam) and this meaning would be quite in accord with the context of the aforesaid passage. The passage, thus interpreted, would run as follows :—

'My father (Akbar) often kept company with the learned men of all persuations, particularly with the Pandits and learned men of Hindustan. Though he was 'taciturn' (habitually silent), yet from his constant association with the learned and wise, no body could discover in his conversation that he was a man of 'taciturn' disposition. In regard to eleganges of prose and poetry, there was nobody more proficient than he......"

(Promotion of Learning in India during Mahamedan Rule by Dr. N. N. Law.)

(বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া) গ্রহণ করিতে পারি যেখানে সেগুলির কোনরূপ মূল্য আছে (অর্থাৎ সেগুলি সমসাময়িক ইতিহাসের সমর্থন পাইয়াছে।*

উক্ত প্রচারকদ্বয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিবরণগুলি সত্য নহে; কিন্তু দেখিবার কিংবা শুনিবার ভুলে মাননীয় প্রচারকদ্বয় সেগুলি সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক) ফাদার এণ্টনী মনসেরাটের The Relacam এবং The Mongolicae Legationis Commentarius— এই দুই খানি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ফাদার এইচ, ওষ্টেন, (Father H. Hostein)। তিনি গ্রন্থকারের কতকগুলি মারাত্মক ভুলের তালিকা দিয়াছেন। আমরা সেই তালিকা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(অ) "বিভিন্ন লোকের দ্বারা বাদশাহের পদদ্বয় চুম্বন করিবার বর্ণনা।" (১)

তাঁহার এই বিবরণ ভ্রান্ত, কারণ কেহই বাদশাহের পায়ে মুখ দিয়া চুম্বন করিত না—শুধু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া হস্তদ্বারা পদস্পর্শ করিয়া হস্ত ওষ্ঠে লাগাইত মাত্র।

(আ) "আহমদ নগরের মধ্য দিয়ে নর্ম্মদানদী প্রবাহিত হওয়ার বর্ণনা।" (২)

শুধু ভৌগোলিক জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু ফাদার মনসেরাট এমন হাস্যজনক ভুল করিয়াছেন।

(ই) "সিন্ধুনদের উপনদীরূপে চাম্বল নদীর বর্ণনা।" (৩)

—ইহাও পাদরী সাহেবের ভৌগোলিক ভ্রমের অন্যতম উদাহরণ।

(ঈ) "তাইমুর লংয়ের দিল্লী আক্রমণের সময় দিল্লীতে খৃষ্টান রাজার রাজত্বের উল্লেখ।" (৪)

ইহা গ্রন্থকাবের ভারতীয় ঐতিহাসিক জ্ঞানের অপ্রচুরতাই প্রমাণ করিতেছে।

(উ) "আকবর শাহের সৈন্য-বিভাগে বার-হাজারী কিংবা চৌদ্দ-হাজারী মনসবদারের উল্লেখ।" (৫)

আকবর শাহের দরবারী ওমরাহের যে কেহই গ্রন্থকারকে এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সত্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন নাই এবং বাজে লোকের নিকট হইতে একটা ভ্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সমাদরে পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

ডক্টর লাহা সন্দেহ করেন ফাদার মনসেরাট আকবর শাহের নিরক্ষরতার সংবাদও এমনি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন।**

কিন্তু মাননীয় মনসেরাট সাহেব যেখান হইতেই এই বেঠিক সংবাদ সংগ্রহ করুন না কেন এমন একটা সংবাদ যে তৎকালে বাজার গুজবের মত রটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই গুজবটা কাহার দ্বারা ও কেমন ভাবে বাজারে প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে ডক্টর লাহা কোনোই আলোচনা করেন নাই। আমরা এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করিব।

---

*"...In many instances they (letters) candidly admit of failures and we may in general accept them when they tell of success" . (page 17 The Jesuit and the great Moghul)

(১) *"His speaking of persons 'kissing the Emperor's feet "..(*J. A. S. B. 1912, page 202, f. n 4*)

(২) *"His mention of the river Narbada passing through Ahamad Nagar" . (*Ibid page, 206, f.n.4*)

(৩) "His mention of Chambal as an affluent of the Indus".... *Ibid. page 206, f.n.5.*

(৪) "His reference to the rule of the Christian King at Delhi in Timur's time".. (*Ibid, page 207 f.n.5*)

(৫) "His mention of commanding 12000 or 14000 in Akbar's military organisation. *Ibid. page 210.f.n 3*

**"In the present case, to get at a correct knowledge of the truth or degree of the Emperor's literacy or illiteracy, was not very easy for foreign missionaries in the environment of distrust and suspicion in which they lived and moved in the court of a Moghul monarch, surrounded with his peculiar 'pomp' and circumstances, which did not favour at all curious inquiries into a personal question of the present kind relative to the Emperor At best, remarks on such a question would be based on hearsay evidence, and not at all on first hand and would be valued as such......Monserrate himself. ......does not say that all his information garnered in his work is first hand." (*Promotion of Learning in India during Mahomedan Rule.* page 208)

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "Infallibility Decree"- জারি করিয়া সম্রাট আকবর "দ্বীন-ই-ইলাহী" নামক এক নতুন ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক পয়গম্বর রূপে আপন প্রজাবৃন্দের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রথম জেস্যুইট মিশনের অধিনায়করূপে ফাদার এন্টনী মনসেরাট, দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হন।

জেস্যুইট মিশন দিল্লীতে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজধানীর সাধারণ আবহাওয়া কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক বদায়ূনী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন "১৫৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পাদরী সাহেবেরা যখন দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন তখন তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে সাধারণ নমাজে হজরত মোহাম্মদের নাম উল্লেখ করা পর্য্যন্ত নিষেধ হইয়াছে।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বাদশাহের প্রতি রাজভক্তির চার শ্রেণীর সংজ্ঞা বিবৃত হইয়াছিল। বাদশাহের জন্য—সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম্ম—এই চারটি জিনিষ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকাকেই রাজভক্তির চার শ্রেণী বলা হইয়াছিল। সভাসদগণ সকলেই তখন সিংহাসনের অনুরক্ত শিষ্যরূপে নাম লিখাইয়াছেন।"+

জেস্যুইটগণ রাজধানীতে উপনীত হইয়া যে আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন তিনি শুধু মোগল সম্রাট আকবর নহেন,—তিনি নব-প্রচারিত "দ্বীন-ই-ইলাহী" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পয়গম্বর আকবরও বটেন। পরন্তু সম্রাট আকবরের এই পয়গম্বরী গ্রহণ তাঁহার ক্ষণিক খেয়াল মাত্র নহে—"পার্থিব ও ধর্ম্মীয় ব্যাপারে স্বকীয় আধিপত্য স্থাপনের" গোপন উদ্দেশ্য লইয়াই যে আকবর শাহ "সম্রাট পয়গম্বর" রূপে মানুষের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন,—মিঃ স্মিথ্ পর্য্যন্ত তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। (Smith—"Akbar the great Moghul"—Page 213).

ইতিহাসে সাধারণতঃ আকবর শাহকে পরমতসহিষ্ণু ও উদারমতাবলম্বী সম্রাট বলিয়া চিত্রিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু আকবরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনী লেখক মিঃ স্মিথ্ এবিষয়ে তাঁহাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যজনক ভাবে উপভোগ্য :—

Men, who ventured to express opinions contrary to his (Akbar's) fancies in religious matters, usually suffered for their honesty and sometimes even into death, *"(Smith : Akbar the Great Moghul page 211)."*

"আকবর শাহের ধর্ম্মীয় মতের বিরুদ্ধে যাঁহার মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন তাঁহারা সাধারণতঃ তাঁহাদের সাধুতার জন্য অত্যাচার ভোগ করিতেন, কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন।"

দিল্লীর সাধারণ আবহাওয়া যখন এমনি ভীষণভাবে পরমত-অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে—তখনই ফাদার মনসেরাট জেস্যুইট মিশনের প্রেসিডেন্ট রূপে শাহী দরবারে হাজির হইলেন।

এখন পাঠক আসুন, সম্রাট আকবর 'নিরক্ষর' এ সংবাদ কেন প্রচার করা হইয়াছিল,—আমরা এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করি। আমার মনে হয় মিঃ স্মিথ্ই ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। কোনো মন্তব্য না করিয়া মিঃ স্মিথের একটী পাদটীকা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Muhammadans glory in their Prophet's illiteracy as a proof of his divine mission and of the authenticity of his revelation. *Abul Fazl applied that argument in the case of Akbar." (Smith : page 339).*

"পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ প্রেরিত মহাপুরুষ ও তাঁহার প্রচারিত বাণী স্বর্গীয়"—ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার

+"As early as the beginning of 1580, the Fathers, when on their way to the Capital, were told that the use of the name of (Hajrat) Mohammed in the public prayers had been prohibited, and during the course of that year (1580) the Four Degrees of devotion to His Majesty were defined. The four degrees consisted in readiness to sacrifice to the Emperor : Property, Life, Honour and Religion; all the courtiers now put down their names as faithful disciples to the Throne." *(Badaoni page 299)*

(হজরতের) নিরক্ষরতা লইয়া মুসলমানেরা গৌরব অনুভব করেন। আকবরের বেলাতেও আবুল ফজল সেই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।"

মিঃ স্মিথ্ অত্যন্ত দ্বিধা সহকারে তাঁহার গ্রন্থের পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন সম্রাট আকবরকে আল্লার পয়গম্বররূপে পরিচিত করিতে গিয়া হজরত মোহাম্মদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আবুল ফজল সম্রাটকেও 'নিরক্ষর' বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন।

আবুল ফজল সাহেবের এই অভিপ্রায়টা তাঁহার রচিত "আইন-ই-আকবরী" ও "আকবর-নামায়" প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নানাস্থানে তিনি আকবরকে প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—বারংবার তাঁহাকে 'যুগ-গুরু" (Lord of the Age) সম্বোধন করিয়া পাঠকের মনে সম্রাটের বিরাটব্যক্তিত্বের ছাপ মারিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ফাদার মনসেরাটের বিশ্বস্ততায় কোনো সন্দেহ পোষণ না করিয়াও ইহা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে আকবর শাহের নিরক্ষরতার কাহিনী তিনি বাজার গুজব হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তৎকালে এই গুজবগুলি প্রচার করিতেছিল নবীন "পয়গম্বরের" বেতনভোগী অনুচরগণ।

(খ) এইবার আমরা ফাদার জেরোম জেভিয়ারের পত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিব।

তৃতীয় জেস্যুইট মিশনের অধিনায়ক রূপে ফাদার জেরোম জেভিয়ার ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে আকবর শাহের দরবারে উপস্থিত হন এবং প্রায় বিশ বৎসর কাল দিল্লীতে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন লোকের নিকটে প্রায় পঁচিশ খানা পত্র লেখেন। তন্মধ্যে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি আকবর শাহের নিরক্ষরতার উল্লেখ করিয়াছেন।

মিঃ বিভারিজ এই পত্রখানি মূল ল্যাটিন হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন (J.S.S.B. 1888, Page37).

দুঃখের বিষয় ফাদার জেরোম জেভিয়ার তাঁহার পত্রগুলিতে ভারতীয় সংবাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় সত্যাসত্যের বিশেষ যাচাই করেন নাই,—যেখানে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই পত্রস্থ করিয়াছেন। উক্ত পত্রগুলি যে তিন শতাব্দী পরে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কল্পনা হয়ত তখন জেভিয়ার সাহেব স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে আকবর শাহের মৃত্যু হয়। ঐ তারিখে ফাদার জেরোম জেভিয়ার স্বয়ং দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোর হইতে লিখিত একখানি পত্রে তিনি আকবর শাহের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বিষ দ্বারা সম্রাটকে হত্যা করা হইয়াছিল—এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন।*

মোগল সম্রাট আকবর শাহের মৃত্যু শুধু হিন্দুস্থানের নহে—পৃথিবীর ইতিহাসের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মৃত্যুর তারিখে দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়াও ফাদার জেরোম জেভিয়ার আকবরের মৃত্যুর যে কারণ দিয়াছেন—তাহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে মিথ্যা।

ফাদার জেরোম জেভিয়ারের মত উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রচারক কখনো জানিয়া শুনিয়া সম্রাট আকবর শাহের মৃত্যুর মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন, এমত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ তাঁহার লিখিত পত্রে এমন একটা আজগুবি সংবাদ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ফাদার জেভিয়ার যেখানে যাহা শুনিয়াছেন, তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই না করিয়া পত্রস্থ করিয়াছেন।

শুধু মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নহে, সম্রাট আকবর কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাসী থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন—সে সম্পর্কেও ফাদার জেরোম জেভিয়ার তাঁহার এক পত্রে সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

---

*In this letter he (Father Xerome Xavier) mentioned the general impression that Akbar's death was caused by poison." *The Jesuit and the Great Moghul—page 65.*

এই পত্রখানি ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের লেখা। তাহাতে লিখিত আছে—"ইস্‌লাম বা খৃষ্টান কোনো ধর্মেই তিনি (আকবর) প্রাণত্যাগ করেন নাই—তিনি হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু থাকিয়াই পরলোকগমন করিয়াছেন।++

ফাদার জেরোম জেভিয়ার বিশ বৎসরকাল দিল্লীতে ছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনা আকবর শাহের মৃত্যু। কিন্তু তিনি সেই স্মরণীয় ঘটনা ও সম্রাটের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা শুধু ভ্রান্ত নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অতএব আমরা দেখিলাম, আকবর শাহের নিরক্ষরতা প্রমাণের পক্ষে তাঁহার জীবনী লেখক মিঃ স্মিথ যে দুইজন পাশ্চাত্য লেখকের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহাদের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

আকবরের গৃহ-শিক্ষক

আকবর শাহের গৃহ-শিক্ষকগণের কাহিনী তাঁহার নিরক্ষরতার ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়। বাদশাহ হুমায়ুন যুবরাজ আকবরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করিয়া তুলিবার মানসে কিরূপ যত্নসহকারে তৎকালীন মুস্‌লিম্ জাহানের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা যদি অপরিজ্ঞাত থাকে, আকবরের শিক্ষার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে।

১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে শিশু-আকবরের হাতখড়ি হয়। তাঁহার প্রথম গৃহশিক্ষকের নাম মোল্লাজাদা মোল্লা আসামুদ্দিন। ইনি বেশী দিন শিক্ষকতা করিতে পারেন নাই। পায়রা উড়াইবার সখ প্রবল থাকায় শীঘ্রই তিনি পদচ্যুত হন। (আকবর নামা, ১ম খণ্ড ১৪শ অধ্যায়, ৫১৮ পৃঃ)।

দ্বিতীয় ওস্তাদের নাম মৌলানা বায়াজিদ। মিঃ স্মিথ বলেন : ইনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আকবরকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

তাঁহার পর মৌলানা আব্দুল কাদির গৃহ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় পক্ককেশ রণপণ্ডিত মুনিম খাঁ ও 'শিরিণ কলম' খাজা আব্দুস্ সামাদ আকবর শাহের অস্ত্র ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। বাদশাহ হুমায়ুন ভাবী মোগল-সম্রাটের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সামরিক চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমরা আরো চারজন গৃহ-শিক্ষকের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের নাম :—১। মৌলানা পীর মোহাম্মদ, ২। হাজি মোহাম্মদ খান, ৩। মৌলানা রুহুউল্লাহ্ (আকবরনামা, পৃঃ ৬৪৩) ও ৪। মীর আব্দুল লতিফ শিরাজী।

বাদশাহ হুমায়ুন বাঁচিয়া থাকিতেই মীর আব্দুল লতিফকে সুদূর শিরাজ হইতে পুত্রের শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু মীর সাহেব যখন দিল্লীতে পৌঁছেন তখন হুমায়ুন আর ইহজগতে নাই। তবু বৈরাম খাঁ তাঁহাকে নবীন সম্রাটের গৃহ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

মৌলানা বদায়ুনি এই আব্দুল লতিফকে 'মহত্ত্বের আধার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মিঃ স্মিথ বলেন : "আব্দুল লতিফই আকবর শাহকে 'সুলহ্-ই-কুল্ (সকলের সহিত শান্তি)-নীতি শিখাইয়া ছিলেন। আবুল ফজল আকবরশাহের সাম্যনীতি বর্ণনা করিতে গিয়া অনেকবার এই পারসী শব্দটার ব্যবহার করিয়াছেন।"(১)

আব্দুল কাদির বদায়ূনি সাহেব বলিয়াছেন : "৯৬৩ হিজরীতে (১৫৫৮ খৃঃ) আকবর মীর আব্দুল্ লতিফের নিকট 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।"

"++On the otherhand, Father Xavier himself, writing in 1615, states that Akbar *'died neither as a Moor, nor as a Christian but in the Gentile sect, which he had embraced."...The Jesuit and the Great Moghul– page 65.*

(১) "Abdul Lateef was the first that taught Akbar the principle of culk-i-kul (peace with all), the Persian term which Abul Fazl so often uses to describe Akbar's policy of toleration."--Akbar the Great Moghul, P. 41, f.n

চিত্রাঙ্কনেও আকবর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মিঃ স্মিথ বলেন :—"বাল্যকালে আকবর চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং সারাজীবন তিনি শিল্পকলার প্রতি দস্তুরমত আগ্রহ দেখাইয়াছেন। (২)

যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তিনি সবিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। মিঃ স্মিথের মতে আকবরের বিখ্যাত বিজয়গুলি রণপণ্ডিত মুনিম খাঁর শিক্ষার গুণেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

আবুল ফজলের মতে---এত সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও কিন্তু আকবর শাহ চিরকাল নিরক্ষরই রহিয়া গেলেন। নয় দশজন মহাপণ্ডিত গৃহ-শিক্ষকের দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী শিক্ষাদান-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি "উম্মী" উপাধি অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার "অমানুষিক স্মৃতিশক্তি" (memory possessing super-human power) ফারসী ভাষার সামান্য কয়টা অক্ষর পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে সাহায্য করিল না! যিনি চিত্র-বিদ্যায় নিপুণতা অর্জ্জন কবিলেন, যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে সমর্থ হইলেন, তিনি বর্ণমালার কয়েকটী অক্ষর শিখিতে পারিলেন না!!

আমরা ডক্টর লাহার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আকবর শাহের গৃহ-শিক্ষার অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি : "...যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে আকবর অলস ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, তবু বুঝিতে পারা যায় না যে একটী বালক— সে যতই অমনোযোগী হউক না কেন---কেমন করিয়া তাহার গৃহশিক্ষকগণের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দশ বার বৎসর পরেও বর্ণমালার কয়েকটা অক্ষর পড়িতে ও লিখিতে অক্ষম রহিয়া গেল!"(৩)

উপসংহার

বস্তুতঃ সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে আকবর শাহকে পয়গম্বরী প্রদান করিবার মূলে আবুল ফজল ও তাঁহার পরিবারের যথেষ্ট হাত ছিল। তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে শেখ মোবারক মাহ্‌দী-আন্দোলনের নেতা শেখ আলাইয়ের শিষ্য ছিলেন। তৎকালে দিল্লীর পাঠান দরবারের প্রধান মোল্লা ছিলেন মখদুম-উল্-মুল্‌ক্। মাহ্‌দীগণ দরবারী গোঁড়া মোল্লাগণের প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু মখদুম্ শাহের সহিত বিরোধ করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মাহ্‌দীগণ পর্য্যুদস্ত হইয়া গেলেন। শেখ মোবারকের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া মখদুম্ শাহ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শাহী দরবারে শেখ মোবারক ও তদীয় পুত্রদ্বয়---আবুল ফজল ও ফৈজী---সাদরে গৃহীত হইলেন। তারপর একদিন প্রগতিপরায়ণ বাদশাহের আদেশে মোল্লাদল উৎখাত হইয়া গেল---স্বয়ং মখদুম-উল্-মুল্‌ক্ দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। (৪)

(২) "As a boy Akbar took some drawing lessons and he retained all his life an active interest in various forms of art."--Ibid. p 338

(৩) "...even granting that he (Akbar) was idle and fond of sports, I do not understand how a boy, however recalcitrant he might be, could so systematically resist all the attempts at training him for at least ten or twelve years on the part of the guardians so as to come out at the end of the period without modicum of capacity for reading and writing the few letters of the alphabet."—Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, p 211

(৪) "A few years before 969 A.H during the Afghan rule, Shaikh Mubarak had, to his worldly disadvantage, attached himself to a religious movement which had first commenced about the year 900 A H and which continued under various phases during the whole of the 10th century.. . .It was at this time that Shaikh Mubarak also became a 'disciple' and professed Mahdawi ideas It is not clear whether he joined the sect from religious or political motives, in as much as one of the objects of the brethren was to break up the party of the learned at Court at whose head Makhdum-ul-Mulk stood, but whatever may have been his reason, the result was that Makhdum became his inveterate enemy, deprived him of grants of land, made him flee for his life and persecuted him for more than twenty years, till Mobarak's sons turned the tables on him and procured his panishment."
—Biography of Shaikh Abul Fazl-i-Allami

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

গুজরাট বিজয়ের পর নবীন বাদশাহ আকবর মহাসমারোহে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই শুভক্ষণে শেখ মোবারক বাদশাহকে প্রজাগণের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন : ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে-ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ইঙ্গিতকারী কিংবা সম্রাট—ইঁহাদের কেহই বিস্মৃত হন নাই। ছয় বৎসর পরে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সেই ইঙ্গিত কার্য্যে পরিণত করিয়া আকবরকে বাদশাহ ও পয়গম্বররূপে মানুষের সম্মুখে দাঁড় করাইবার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। (৫)

অতঃপর ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে 'দীন-ই-ইলাহী' প্রচারের পর পিতাপুত্র উভয়ে মিলিয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। শেখ মোবারক বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা বিসর্জ্জন দিয়া নবীন পয়গম্বরের শিষ্যরূপে রাজধানীর পথে পথে নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ''দীন-ই-ইলাহী''একে স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য লইয়াই আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' নামক গ্রন্থ দুইখানি প্রণয়ন করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আকবর শাহের পয়গম্বরীত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া আবুল ফজলের দৃষ্টি স্বতঃই 'উম্মী'-পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিরক্ষরতা ও পয়গম্বরীত্ব—এই দুইটিই ছিল হজরত মোহাম্মদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। আকবরকে পয়গম্বরী দিতে বসিয়া আবুল ফজল ঐ দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বারবার স্মরণ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আবুল ফজল সাহেবের এই গুপ্ত মনোভাব মিঃ স্মিথের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার গ্রন্থের ৩৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি অত্যন্ত সাহস সহকারে লিখিয়াছেন ঃ—

''হজরত মোহাম্মদের নিরক্ষরতা তাঁহার স্বর্গীয় ধর্ম্ম ও বাণীর বিশ্বস্ততার প্রমাণ বলিয়া মুসলিমগণ গৌরব অনুভব করেন। আবুল ফজল আকবরের সম্পর্কেও ঐ যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন।'' (৬)

এমন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরেও মিঃ স্মিথ শেষ পর্য্যন্ত আবার কেন আবুল ফজলের মত গ্রহণ করিলেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। আকবর শাহের নামের বাম পার্শ্বে ''উম্মী'' উপাধি লাগাইয়া তাঁহাকে পয়গম্বরের আসনে বসাইতে গিয়াই যে আবুল ফজল তাঁহার নিরক্ষরতার কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন,—একথাটা স্পষ্টভাবে বলিবার মত সৎসাহস তাঁহার কেন হইল না, তাহা আজো অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে।

'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা'র সমালোচনা করিতে গিয়া মিঃ বিভারিজ লিখিয়াছেন :—

''গ্রন্থকার আবুল ফজলকে কেহ সহানুভূতি বা প্রশংসা করিতে পারে না। তিনি একজন উঁচুদরের চাটুকার ছিলেন এবং অম্লানবদনে সত্য ঘটনা গোপন বা বিকৃত করিতেন।'' (৭)

মিঃ স্মিথ এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

''আবুল ফজলের গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি বিরক্তিকর বাক্যালঙ্কারের মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। স্বীয় প্রভুর একজন

---

(৫) "When he returned triumphed from Guzrat, at the turning point of his career, Shaikh Mobarak had gratified him by expressing the hope that the Emperor might become the spiritual as well as the political head of his people. The hint given in 1573 had never been forgotten by either its author or the sovereign. Six years later in 1579, the time was deemed to be ripe for the proposed momentous innovation which should extend the autocracy of Akbar from the temporal to the spiritual side and make him Pope as well as King."...p 178- Akbar the Great Moghul.

(৬) "Mahomedans glory in their Prophet's illiteracy as a proof of his divine mission and of the authenticity of his revelation. Abul Fazl applies that argument to the case of Akbar."—Smith.

(৭) "Abul Fazl is not an author for whom one can feel much sympathy or admiration. He was a great letterer and unhesitatingly suppressed or distorted facts."

—Akbar-Namah : Preface. Vol. I.

নির্লজ্জ চাটুকার হিসাবে তিনি কখনো কখনো সত্য গোপন করিয়াছেন,—এমন কি ইচ্ছা করিয়া সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন।"(৮)

প্রয়োজন হইলে আবুল ফজল কেমন ভাবে সত্য গোপন করিতে পারিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের দীর্ঘ কাহিনী সমাপ্ত করিব।

মিঃ স্মিথের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে 'দীন-ই-ইলাহী' প্রচারের পূর্ব্বে একটা মজলিস আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে তাহার সভ্যগণের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। (৯)

এই ঘটনাটি আবুল ফজল তাঁহার বিরাট গ্রন্থদ্বয়ের কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ব্যাপারটা স্থূল দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ঘটনা প্রকাশ করিলে মানুষের মনে আকবর শাহের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের স্বর্গীয়ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জন্মিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই আবুল ফজল এই সত্য ঘটনাটি গোপন করিয়া গিয়াছেন।

মোটকথা, আকবর শাহের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আবুল ফজল এই একই উদ্দেশ্যে আকবর শাহের অক্ষরজ্ঞানের কথা গোপন করিয়া গিয়াছেন।

'আইন-ই-আকবরীতে' তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আকবর শাহ অঙ্ক লিখিতে জানিতেন।

'জাফর নামা' হইতে বাদশা জাহাঙ্গীর শাহের সাক্ষ্য ও আকবর শাহের স্বহস্ত-লিখিত অক্ষর হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি শব্দ লিখিতে পারিতেন।

বাদশাহ বাবর বা হুমায়ুনের মত শিক্ষিত হয়ত তিনি ছিলেন না, কিন্তু বিশ্বস্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আকবর শাহ সত্য সত্যই নিরক্ষর ছিলেন না।

(৮) "The historical matter in Abul Fazl's book is buried in a mass of tedious rhetoric and the author, an unblushing flatterer of his hero, sometimes conceals or even deliberately perverted the truth."... p. 460.

—Akbar the Great Moghul.

(৯) "The interesting fact that a formal council was held to sanction the promulgation of the proposed new religion, is known from the testimony of Bartoli and Badayuni only and has escaped the notice of the modern authors."...p 213—Akbar the Great Moghul.

ভারতীয় সংস্কৃতি ও মুসলমান

শ্রীমাখনলাল চৌধুরী এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্

গ্রীক ও রোমক যুগে পণ্যসম্ভার বহুল পরিমাণে জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে নীত ও আনীত হইত। তদানীন্তন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থাবলীতে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকগণ যখন ভারতের উপান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখন হইতে ভারতের ভাবধারা ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে ক্রমশঃ প্রতীচ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। সেই যুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ঐ দেশসমূহে প্রচলিত হইল। বৌদ্ধযুগে অশোকের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বহু বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে পালি ভাষাও বেশ বিস্তারলাভ করে। খৃষ্টীয় যুগে সিরিয়া জেরুজালেমের মঠসমূহে আমরা বৌদ্ধবিহারের অনুরূপ চিত্র খুঁজিয়া পাই। ইহুদীর ত্যাগধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ত্যাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রাগ্ মুহম্মদীয় যুগে আরবের সমাজ ও ধর্ম্মের চিত্রেও ভারতের দেবদেবী ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন আভাস পাই। পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষার প্রভাবও আরবে প্রবেশ করে। ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কিত বহু শব্দ আরবী ভাষায় বিশেষভাবে মিশিযা গিয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, হজরত মুহম্মদ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই ভারতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। তিনি খ্রীষ্টান ইহুদী বৌদ্ধদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, অথচ হিন্দু কিংবা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। এই উক্তি নির্ভুল নহে। কারণ মিসর হইতে প্রকাশিত 'সিবহাতুলমরজান' নামক পুস্তকে হাদিসে উল্লিখিত বহু ভারতীয় গল্প বর্ণিত আছে। হজরত মুহম্মদ ভারতের লোকদিগকে "মুস্তামন" বা "শান্তিপ্রিয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্-মুহম্মদ যুগে গান্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্য আরব মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত বহু ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সেই সব দেশের পুরাতন নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতমূলক। আরবীয় ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, মুহম্মদের সময় ইয়ামান ও হজরামৌত প্রদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। আরবী সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে, আদম যখন স্বর্গচ্যুত হন, তখন তিনি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি—দ্বিতীয় স্বর্গ ঃ —

হিন্দ্-আস্ত কে নেয়ামুল বদল্
ফিরদৌস আস্ত
আদম্ ও বহিস্ত্ বি কে ওফ্ তাদ্
ব-হিন্দ্।।

খলিফা ওমরের সময়ে মুস্‌লিমেরা পারস্য জয় করেন। সেদেশে তখন আর্য্যধর্ম্ম বহুল পরিমাণে প্রচলিত। এই আর্য্যধর্ম্মের ও সেমিটীক ধর্ম্মের সম্মিলনে ইস্‌লামে অবতারবাদের আদর্শ সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে প্রবেশ করে। কিছুকাল পরে তাহা শিয়াধর্ম্মের অঙ্গরূপে ইস্‌লামে স্থান পায়। পরবর্ত্তী যুগে ভারতের গুরুবাদ মুসলিম সুফী-মতবাদীরা গ্রহণ করেন।

খলিফা ওসমানের সময় বহ্লীক প্রদেশ বিজিত হয়। তখন বহ্লীক প্রদেশে বহু বৌদ্ধ মঠ বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধমঠগুলি মসজিদে পরিণত হয়। বহু মঠাধিপ ইস্‌লাম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় ব্রহমক পরিবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম কৃষ্টি ও অনুশীলনে এই পরিবারের দান অতুলনীয়।

ওম্মিয়া খলিফাদের যুগে হিন্দুস্থানের সিন্ধুদেশ মুস্‌লিমগণের অধিকারে আসে। সিন্ধুবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবের সভ্যতা এক নূতন আকৃতি ধারণ করে। আরব রাজত্বের অবসানের পর আমরা সিন্ধুদেশে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলে এক নবীন সংস্কৃতির ধারা দেখিতে পাই। তাহারই ফলে সিন্ধু সুফীগণ ভারতের সাধনায় অভিনব স্থান দখল করিয়া আছে।

ওম্মিয়া বংশের বিজয় অভিযান প্রধানতঃ আফ্রিকা ও ইউরোপের দিকে চলিয়াছিল। তখন পারসী গ্রীকদের সংস্পর্শে আরবীয়গণ বহু নূতন তত্ত্ব লাভ করে।

তারপর আসিল আব্বাসীয়দের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। মুস্‌লিমের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-গরিমা যেন এই যুগকে কেন্দ্র করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। খলিফা মনসুরের সময় একজন ভারতীয় জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত তাঁহার পুস্তক লইয়া ১৫৬ হিজরীতে বাগদাদে গমন করেন। এই পুস্তক খানির নাম ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ইব্রাহিম ফারাবীর সহযোগে তিনি উহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। (১) আরবীয়গণ ইহার পূর্ব্ব হইতেই সিন্ধু প্রদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশ ভারতের গণনা ও সংখ্যার জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। এইবার ব্রহ্মসিদ্ধান্তের প্রচার ফলে অঙ্কশাস্ত্রে তাহারা বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করিল। আরবী ভাষা ডান দিক হইতে লিখিত হয়। মাত্র সংখ্যাবাচক শব্দগুলিই ভারতীয় লেখার অনুকরণে বাম দিক হইতে লিখিত হয়। এবং অঙ্ককে তাহারা হিসাব্‌-ই-হিন্দ বলে। খলিফা মনসুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এবং তাঁহার সময়ে খানজানী নামক এক পণ্ডিত কর্ত্তৃক একটী মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীতে এই মানমন্দির দেখিয়াছিলেন। (২)

খলিফা মনসুরের সময়ে নিয়মিতভাবে সংস্কৃত আলোচনা ও গ্রন্থানুবাদ হয়। এই সময়কার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির অনুবাদ উল্লেখযোগ্য ঃ --

খন্দখাদ্যক	অনুবাদক	আল্‌ফাজারী
পঞ্চতন্ত্র	,,	অজ্ঞাত
হিতোপদেশ (৩)	,,	ইবন্‌ উল মক্‌ফা
সংস্কৃত পঞ্জিকা	,,	খান্‌জানী
গণিত (আর্য্যভট্ট) (৪)	,,	অজ্ঞাত

খলিফা মনসুরের সময়ে নববিহারের ব্রহ্মকের (বারমেকীর) পুত্র খলিফার দরবারে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই চেষ্টায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ বাগ্‌দাদে আনীত হন।

হারুন অর রশিদের সময়ে ব্রহ্মক (বারমেকী) পরিবার রাজমন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন। সত্তর বৎসরের মধ্যে এই ভারতীয় ব্রহ্মক (বারমেকী) পরিবার আব্বাসীয় খিলাফতের সমৃদ্ধি বিজ্ঞান-দর্শন-স্থপতি-সম্ভারে এতদূর বর্দ্ধিত করেন যে, তাহার ফলে আব্বাসীয় যুগ ইস্‌লামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

হারুণ-অর-রশিদ একদা নিতান্ত রোগাতুর হইয়া ভারতবর্ষ হইতে মনক অথবা মানিক নামক একজন বৈদ্যকে আমন্ত্রণ করেন, তাঁহার চিকিৎসাগুণে তিনি নিরাময় হন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া হারুণ মনক বা মানিককে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে রীতিমতভাবে বাগদাদে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচিত হইতে থাকে।

বাগ্‌দাদ নগরে ব্রহ্মবাদের একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল। সেখানে ধহন্‌ নামক একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নামটী বোধ হয় ধন্বন্তরী নামের অপভ্রংশ। এই নামে আরবী বিভিন্ন যুগে লিখিত পুস্তক দেখিতে পাই। ভারতের চিকিৎসা ব্যবসায়িগণকে বোধ হয় সাধারণভাবে ধহন্‌ বলিয়া অভিহিত করা হইত। ব্রহ্মকগণ (বারমেকী) আরও বহু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহাদের মধ্যে ভল্ল পণ্ডিতের পুত্র শল্ল (শালেহ্‌) হারুণ-অর-রশিদের পিতৃব্য পুত্রকে চিকিৎসা করেন। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলে গ্রীক্‌ বৈদ্য গেব্রিয়েল তাঁহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। তারপর শল্ল পণ্ডিত তাঁহার চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করেন। (৫) তিনজন চিকিৎসকের কথা আমরা হারুণের রাজদরবারে বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখিতে পাই। তাঁহারা চিকিৎসাতত্ত্ব, ঔষধপ্রস্তুত প্রণালী, দর্শন ও জ্যোতিষ বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেন।

আমরা মনক পণ্ডিতের অনুদিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। তার মধ্যে সুশ্রুত, চনকের পশুচিকিৎসা, বিষশাস্ত্র, নির্ঘণ্ট, নিদানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধহন্‌ অনুবাদ করিয়াছেন অষ্টাঙ্গ ও সিদ্ধিস্থান। শালিহ পণ্ডিতের পুস্তকগুলি পাওয়া যায় না।

এই যুগে আবাল "পঞ্চতন্ত্র" অনুবাদ করেন এবং ব্রহ্মক (বারমেকী) মন্ত্রী তাঁহাকে ১০০,০০০ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান

(১) কিতাব্‌-উল্‌-হিন্দ্‌--লণ্ডন সংস্করণ ২০৮ পৃঃ।

(২) সিন্দ-ই-হিন্দ্‌ সাগীর কুফ্‌ভী, মিসর সংস্করণ, ১৭৮ পৃঃ।

(৩) হিতোপদেশ এই সময়ে অর্দ্ধসমাপ্ত ছিল, হারুণ অর-রশিদের সময় পূর্ণ অনুবাদ হয়।

(৪) ১৬৫ হিজরিতে আবদুল্লা বিন্‌ হেলাল পুনরায় অনুবাদ করেন।

(৫) ইবন্‌ ই-নাদির--৩০৩-৩৪৫ পৃঃ। তবাকৎ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩ পৃঃ।

করেন। (৬) ব্রহ্মাক (বারমেকী) বিদ্যালয়ের মারফতে আরবী ভাষায় জন্মপত্রিকা প্রণয়ন, কৃষি, অলংকারতত্ত্ব ও সামুদ্রিক বিষয়ে পুস্তক লিখিত হয়। (৭)

খলিফা মামুনের সময় মুহম্মদ-বিন্-মুসা ভারতীয় বীজগণিত প্রণয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে চরকসংহিতা পারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পারসী হইতে ইহা আরবী ভাষায় আবদুল্লা কর্ত্তৃক অনূদিত হয়।

আব্বাসীয়দের প্রথম শতাব্দীতে আরও কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ আরবে প্রচলিত হয়। "নারীরোগচিকিৎসা" (অনুবাদিকা রোশেনা) "গর্ভিনী রোগ", "সর্পবিদ্যা" (প্রণেতা -রায় পণ্ডিত) "পশু-চিকিৎসা" (প্রণেতা--কঙ্কায়ণ) "বাজীকর" (প্রণেতা রাজা কহন), "স্ত্রীচরিত্র" (প্রণেতা--রাজা কোষ), "সুরাশাস্ত্র", "সঙ্গীতশাস্ত্র", "পানীয় শাস্ত্র" (অত্রি রচিত)।

এই সব অনুবাদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই যুগে আরবীয়গণ বিশেষভাবে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র আলোচনা করিতেন।

৪৩৭ হিজরীতে আবু সালেহ্ ও আবুল হাসান আলী জীবলী মহাভারত অনুবাদ করেন। (৮) ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্রের ইয়াকুবী প্রণীত একখানি অনুবাদ পাওয়া যায়। এই সময়ে সিন্ধুবাদ নামক ভারতীয় নাবিকের মনোরম কাহিনী পারসী ভাষা হইতে আরবীতে অনূদিত হয়। "সহস্র রজনী" নামে পরিচিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থই সিন্ধুবাদ কাহিনী, পারসী ভাষায় এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়া নাম হইল "হাজার দাস্তান" বা হাজার রাত্রি, তারপর আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া নাম হইল "আলিফ লয়লা।" এই সিন্ধুবাদ কাহিনী মূল সংস্কৃতে লিখিত, তাহা হইলেও ইহার গৌরব আরবদেরই প্রাপ্য, কারণ তাঁহারাই ইহাকে জগতে প্রচার করেন।

খলিফা মাতোয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬০ খৃঃ) আহ্মন-বিন্ খাফীকে ভারতবর্ষে গ্রন্থসংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। স্পেন নিবাসী মুসায়লামা-বিন্-আহ্মদ মাতীর্তী খানজার্নী প্রণীত ভারতীয় গ্রন্থাবলীর একটি সারলিপি প্রস্তুত করেন (১০০৪ খৃঃ)। আবুলকাসিম আস্‌বেগ স্পেন দেশে ভারতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন (১০৩০ খৃঃ)।

আব্বাসীয় খলিফাগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সীমান্তবাসী জাতিগুলি মুসলিম সাম্রাজ্যের বন্ধন ছাড়াইয়া স্ব স্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। একে একে আন্দুলুস (স্পেন) আফ্রিকা, মিসর, পারস্য, কাবুল, হীরাট, বল্‌খ্, তুর্কীস্থান খলিফার হস্তচ্যুত হইল। এদিকে অন্যান্য ধর্ম্মের ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামও জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নব নব চিন্তা ও পন্থা গ্রহণ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ পারস্য ও আফগানিস্থানের প্রদেশসমূহে বৌদ্ধ, জরথুষ্ট্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্পর্শে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। পশ্চিমে যেমন গ্রীক (ইয়ুনান) ও ইসাই (খৃষ্টীয়) সভ্যতা এবং কেন্দ্রস্থলে ইহুদী রীতিনীতি, পূর্ব্বেও তেমনি জরথুষ্ট্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপাসকগণই ইস্‌লামকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তদানীন্তন বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলি ইসলামে প্রচলিত হইল। বুদ্ধের জীবনচরিত ইসাই আবরণে "জোসাফা এবং বলরাম" আখ্যায় আজিও ইস্‌লামে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তুর্কগণ ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রূপান্তরিত বৌদ্ধ শ্রমণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, নিজকে তারা "শ্রামান" নামে অভিহিত করিত। আপাতদৃষ্টিতে তুর্কগণকে যদিও বিশেষ গোঁড়া বলিয়া মনে হয়, কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়া চিরকালই তাহারা উদার--ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে। প্রাচীন ফিনিসীয়দের মত যেখানে যাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে বহুল পরিমাণে পারস্য আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া তুর্ক-এশিয়া দেশে এবং চীনের মধ্য দিয়া উত্তরপূর্ব্ব এশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল--তুর্ক সভ্যতার ভিতর তাহার রেশ এখনো খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পিকিন নগরীতে কুব্‌লে খান্ কর্ত্তৃক আহুত পৃথিবীর প্রথম ধর্ম্মসভায় ভারতীয় পণ্ডিত "মতধ্বজ"ই গুরুর পদে অভিষিক্ত হন এবং "ফাগ্‌সপা" (৯) বলিয়া অভিনন্দিত হন। পণ্ডিত মতিধ্বজের পৌরোহিত্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন তুর্কদের মধ্যে দেখিতে পাই।

---

(৬) জার্ম্মান পণ্ডিত বোয়ার বলেন মোকাফা ন্যায় একজন পণ্ডিত পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করেন। ইহা আংশিক সত্য, কারণ পঞ্চতন্ত্র বিভিন্ন যুগে ক্রমশঃ বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অনূদিত হয়।

(৭) হাজী খলিফা--১ম খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ ২৮২ পৃঃ।

(৮) ইলিয়ট--১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ।

(৯) এই ফাগ্‌সপার কাহিনীও সংস্কৃত, চীন, তুর্ক ও আরবী ভাষার মিশ্রণে উদ্ভূত নূতন ভাষার অনেক তথ্য "এশিয়া মেজর" পত্রিকায় ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ সাল।

মাহমুদ গজনবীর সমকালে গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ ও রক্ষণ, গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহদান, কাব্যালোচনা রাজন্যবর্গের ভিতরে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। মাহমুদ গজনবীর রাজসভাকে প্রসিদ্ধ গুণী ফারাবী, বেরুণী, আনসারী, ফারোবী ফিরদৌসী, উতবীর উপস্থিতি চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মাহমুদ গজনবী ভারত লুণ্ঠনের পরে ভারতের স্থপতিবিদগণকেও লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে লইয়া যান, তাহাদের দ্বারা তিনি একটী সুন্দর নগর রচনা করেন এবং তাহার নাম দেন "স্বর্গবধূ"। এই স্বর্গবধূ নগরেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবেরুণী মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। কথিত আছে তিনি কাশীতে ছদ্মবেশে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বোধ হয় ভারতবর্ষে আসার পূর্ব্বেও বেরুনী সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন এবং সংস্কৃত রত্নরাজির সন্ধান জানিতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত হইতে অনূদিত বহু গ্রন্থ ছিল ঃ

১। চরক সংহিতা - অনুবাদক আলী বিন্ জাইয়ান

২। পঞ্চতন্ত্র „ আবাল

৩। কারণাসার (বীতেশ্বর প্রণীত)

তাঁহার গ্রন্থে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বর্ণনাও তিনি করিয়াছেন ঃ নক্ষত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র (খেয়াল-উল্-ফাহামী) খন্দখাদ্যক, কারণ-শাস্ত্র সংখ্যা বিচার, জ্যোতিষটীকা। বেরুণী নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন--ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা, হরিভট্টের ছন্দ, বৃহৎ সংহিতা ও লঘুজাতকম্ (বরাহ মিহির), পুরাণ, মৎস্য, বিষ্ণু, বায়ু এবং আদিত্য; পুলিশসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খন্দ-খাদ্যক, পঞ্চসিদ্ধান্তক, বৃহৎ-জাতকম, উৎপললিখিত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত টীকা, কারণ তিলক, হস্তি-বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, খনিবিদ্যা।

বেরুণী নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন—

ব্রহ্মগুপ্ত	প্রণীত	পানীয় শাস্ত্র
ব্রহ্মগুপ্ত	„	ব্রহ্মসিদ্ধান্ত
কপিল	„	সাংখ্য
গৌতম	„	ন্যায়
বরাহ মিহির	„	লঘুজাতকম্
পাতঞ্জল	„	যোগশাস্ত্র

আল-বেরুণী কিতাব্-উল্-হিন্দ নামক গ্রন্থে ভারতের অঙ্কশাস্ত্র, সংখ্যা ও ত্রৈরাশিক নিয়মের সমালোচনা করেন। আর্য্যভট্টের প্রাচীন অনুবাদ সংশোধনও করেন আলবেরুণী। জামায়েযুল-সনজুব বে-খব্বাতুর হিন্দ্ নামক বৃহৎ গ্রন্থে সংস্কৃত সিদ্ধান্তের গুণাগুণ বিচার এবং আরও ভারতীয় সংখ্যা ও গণনার তুলনামূলক্ আলোচনা করেন তিনি। ভারতের জ্যোতিষ ও অন্যান্য দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রের তুলনামূলক সমালোচনাও তিনি করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় আলবেরুণী নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি রচনা করেন ঃ--

(১) আরব ও ভারতীয় জ্যোতিষীর প্রশ্নোত্তর।

(২) কাশ্মীরী পণ্ডিতের সন্দেহভঞ্জন।

(৩) আরবীয় জ্যোতিষমালা।

(৪) "মজষ্টী" (গ্রীক জ্যোতিষ)।

(৫) ইউক্লিডের সংস্কৃত অনুবাদ।

(৬) আরবীয় জ্যোতিষ।

মুহম্মদ ইস্রাইল তুনুকী আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। (১০)

আবুমা'স নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত বারানসীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। (১১) সুলতান মাহমুদের

(১০) কাসিরী ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃঃ।

(১১) আইন্-ই-আকবরী ২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ।

রাজত্বকালে মাসরুল সা'আদ সোলেমান নামক একজন পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'দেওয়ান স' আদ' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজা জয়নাল আবেদীন নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। মহাভারতের বিরাট অনুবাদ তাঁহার রাজসভায় হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের পর হইতে ভারতের সভ্যতার যে একটী বহির্মুখী প্রবাহ চলিয়াছিল তাহা মাহমুদ গজনবীর সভাপণ্ডিতগণের চেষ্টায় বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিল। এই প্রবাহ আওরঙ্গজেবের সময় পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। আল্‌বেরুণীর অনুবাদ ও আলোচনা ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে পৃথিবীর সঙ্গে কতদূর পরিচিত করিয়াছিল তাহার আলোচনা হওয়ার দরকার।

উত্তর ভারতে পাঠানবংশীয় দাসরাজগণ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু মুসলমান ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তখনই তাঁহারা বিশেষভাবে ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশবাসী সূফী পণ্ডিতগণ ভারতের বেদান্ত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আমীর খসরুই প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি নিয়মিতভাবে সংস্কৃত চর্চ্চা করেন। মুসলমানের কেহ কেহ আবার ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আলাউদ্দিন খিলজী মোবারক খিলজী রাজপুতনায় বিবাহ করেন। তোগলক শাহের ভ্রাতা রজ্জব সালার বিবাহ করেন দিপালপুরের নালাদেবীকে। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক।

নগরকোট বিজয়ের পর সেখানকার বিখ্যাত গ্রন্থাগার ফিরোজ তোগলকের হস্তগত হয়। মৌলানা আজুদ্দিন খলিদখানি ঐ গ্রন্থাবলী হইতে দর্শন, আধ্যাত্মবাদ (Divination) এবং omen (মঙ্গলামঙ্গল সূচনা) সঙ্কলন করেন। এই বহিখানি দলিল ই ফিরোজ শাহী নামে বিখ্যাত। লক্ষ্ণৌ শহরে নবাব জালাল উদ্দৌলার গ্রন্থাগারে ফিরোজ তোগলকের সময়ে অনূদিত একখানি সংস্কৃত বই আছে। খৃষ্টীয় ১৩৮৭ সালে মাহ্‌মুদ শাহ্ খিলিজীর আদেশে অনূদিত একখানি পশুচিকিৎসা বিষয়ক পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়--কুরুতুল মুল্‌ক বাগদাদে ভারতীয়। পশুচিকিৎসার একখানি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম কিতাব উল বেতারাত। সেকেন্দর লোদীর সময় ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক একখানি বিরাট গ্রন্থ পারসীতে অনূদিত হয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ শতকে তৈমুরলঙ্গের বিরাট সৈন্যবাহিনী তোগলক বংশের তথা পাঠান রাজত্বের ধ্বংস সাধন করিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, রাজনৈতিক বিরোধ হেতু বহু মুসলমান ভূস্বামী অথবা নৃপতিদিগকে হিন্দু প্রতিবেশীর উপর ন্যূনাধিক নির্ভর করিতে হইল। রাজনৈতিক নৈকট্য বশতঃ পরস্পরের ধর্ম্মীয় বৈরীভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইল, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যে। বিজাপুরের ও বিজয়নগরের ইতিহাসে এ বিষয়ে বহু তথ্যের আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন ইউরোপের নবজন্ম (Renaissance) হইল, তেমনি সেমিটীক দেশে ও ভারতবর্ষেও একটা পরিবর্ত্তনের আভাস সূচিত হইয়াছিল। মেহেদী আন্দোলন বাদখশান (বাদকস্থান) হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামী দেশসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। চীনদেশেও কুব্‌লেখানের চেষ্টায় তুর্কযুগের পরে এক নবযুগের সন্ধান পাই। ভারতেও হিন্দু মুসলমানের কৃষ্টি সমন্বয়ে বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। চৈতন্য নানক দাদু তুলসীদাস রায়দাস সুরদাস প্রভৃতি হিন্দু, লালশাহ কবীর শামস্-ই-সিরাজ প্রভৃতি মুসলমান মহাজনগণ পরস্পরের ভাব ও চিন্তাধারা গ্রহণ করিয়া নবযুগের সূচনা করিলেন। সিন্ধু বিজয়ের পর হইতে মুসলমানগণ বেদান্তের স্পর্শলাভে সুফী চিন্তাধারাকে নবীনরূপে রূপান্তরিত করিতেছিলেন, তাহা মধ্য ভারতের ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করিল। এই যুগের সুফীগণ কাব্যসম্পদে ও চিন্তার ঐশ্বর্য্যে ভারতবর্ষকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সুফী মনসুর পারস্য হইতে ভারতে আসিয়া "কুণ্ডলিনী" শক্তি জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন। কবি সাদী ভারতে আমন্ত্রিত হন। অবশ্য পৃষ্ঠপোষিকার অমতে তিনি ভারতে আসিতে পারেন নাই। বহু মুসলমান সম্রাট ভারতের সঙ্গীত ধারায় মুগ্ধ হইয়া জাতিবিভেদ ও ধর্ম্মবিচার ভুলিয়া সঙ্গীতসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রও তাঁরা আলোচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে মুবারক খিলিজী, আদিল শাহ ও বজবাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেই যুগের শিয়াসুন্নি কলহে ইস্‌মাইলিদের অত্যাচারে এবং শাফীদের দৌরাত্ম্যে বহু ভদ্র সম্ভ্রান্ত ও মার্জ্জিতরুচি মুসলমান ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতের সাধনার ধারার সহিত পরিচয়ের ইচ্ছায় সংস্কৃত আলোচনা করেন। বহু মুসলমান সুফী

ও পণ্ডিত যোগ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। "ইস্‌তালেহাত-ই-সুফিয়া" নামক গ্রন্থে বর্ণিত সুফী ক্রিয়াকলাপে বহু সংস্কৃত শব্দ ও চিন্তা স্থান পাইয়াছে। মালিক মুহম্মদ জায়সী সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। হিন্দি ভাষার চর্চা মুসলমানগণ খুব ভালভাবেই শুরু করিয়াছিলেন। তুর্ক-মুঘল রাজত্ব ভারতের এক অপরূপ যুগ। অশোক, বিক্রমাদিত্য ও রাজা ভোজের পর এদেশে চিন্তার গৌরবরশ্মি এমনভাবে ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করে নাই। দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও স্তব্ধতার পর মনীষী আকবরের জীবনকে প্রতীক করিয়া ভারতের সাধনা সভ্যতা সমস্ত প্রাচ্যভূমিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আকবরের উদারতা মুঘল রাজান্তঃপুরিকা হিন্দু মহিলাদের ধর্ম্মাচরণকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। রাজপুত মহিলাগণ স্বীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা স্ব স্ব বিশ্বাসানুযায়ী পূজা অর্চনা ও হোম করিতেন। সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানপিপাসু আকবরের সাধনা মাত্র ধর্ম্মালোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত ইবাদৎখানার পণ্ডিতদের সাহায্যে আরবী, তুর্কী, গ্রীক ও সংস্কৃত শাস্ত্রের অমূল্য রত্নরাজি পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইবাদৎ-খানাই এক হিসাবে পৃথিবীর প্রথম Parliament of religion. বিষাদময়ী স্বপ্নপুরী ফতেপুর শিকরীর অর্দ্ধবিলুপ্ত পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে যে অসংখ্য রত্নাবলী লুক্কায়িত আছে তাহার সন্ধান কয়জনে জানে। আকবরের আমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আবুল ফজলের পৌরোহিত্যে এক নবীন যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী, রামতীর্থ, নারায়ণ মিত্র ও আদিত্য সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার আকবরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে ধীমান আবুলফজল, ফৈজী, নকীব খান, মুল্লা শাহ মুহম্মদ, মুল্লা শেরী, সুলতান হাজী হাজী ইব্রাহিম, আবদুর রহিম খান খানান অনুবাদ ও মূল গ্রন্থের মধ্য দিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ফৈজী অনুবাদ করিলেন—যোগবশিষ্ট, লীলাবতী, নলদময়ন্তী, বত্রিশ সিংহাসন বাদায়ুনী ও হাজী ইব্রাহিম--অথর্ব্ববেদ; মোল্লা শেরী--হরিবংশ, হিতোপদেশ; নকীব খান বাদায়ুনী ও শেখ সুলতান--রামায়ণ ও মহাভারত; (১২) মুহম্মদ শাহ--রাজতরঙ্গিনী; আবদুর রহিম—জ্যোতিষ, খেট-কৌতকম্।

জাজ-ই-উলাগ-বেগ নামক বিরাট তুর্কী গ্রন্থ এই সময়ে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়।

জয়সিংহের মানমন্দিরে বহু আরবী পারসী জ্যোতিষ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। মুঘল রাজান্তঃপুরিকাবাও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহাদের প্রণীত পারসী কবিতা সংস্কৃত ভাবধারায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়েও এই কৃষ্টিধারা অপ্রতিহতগতিতে চলিয়াছিল। পিতার অনুকরণে বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী পণ্ডিতদের সহিত তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা দানিয়াল সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। হিন্দুর অবতারবাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে তিনিও বিশেষ উৎসুক ছিলেন। পণ্ডিত সিদ্ধিচন্দ্রকে তিনি বহু সম্মান প্রদর্শন এবং নাদির-ই-জমান (১৩) উপাধিতে বিভূষিত করেন। তিনি সংস্কৃত ভূগোল ও গণিত বিষয়ে স্বয়ং বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত হয়।

শাহ্‌জাহানের শরীরে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন হিন্দুত্বের প্রতি বিরূপ। তবে হিন্দুর সাধনার ধারাকে প্রতিরোধ করিতে কিন্তু তিনি চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সময়েও সংস্কৃত চর্চ্চা পূর্ব্ববৎ চলিয়াছিল। এই সময়েও রাজান্তঃপুরের মুসলমান মহিলারা সংস্কৃত আলোচনা করিতেন। তাঁহার দুইজন হিন্দু বেগম ছিল। এই যুগের সুফী সাহিত্য সংস্কৃত-ভাব-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। জাহান্‌আরার সমস্ত কাব্যে ভারতীয় ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে নিরন্তর চলিয়াছে। আকবরের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রসুন তাঁহার প্রপৌত্র দারা শেকো। দারা শেকো সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অকপটে হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত তিনি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাঁহার অনূদিত বহু সংস্কৃত পুস্তক আছে--সির্‌-উল্‌-বাহার ও মজ্‌ম-উল্‌-বাহরায়েন--নামক গ্রন্থ দুইখানি তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারা শেকোর সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ, অনুবাদ ও বেদবিশ্বাসই আওরঙ্গজেবের মতে অমুসলমানত্বের প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দারার হস্তাঙ্গুরীয়ের মধ্যে একটীতে সংস্কৃত শব্দ "প্রভু" (১৪) খোদিত ছিল। আওরঙ্গজেব ইহাতেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে কৃষ্টির স্রোত বিপরীতগামী হইল। মুসলমানদের সংস্কৃত পাঠ ও আলোচনা থামিয়া গেল। তথাপি তাঁহার কন্যা জেবউন্নিসার সংস্কৃত আলোচনার কাহিনী আমাদিগকে আজিও আনন্দ দান করে। রাজিয়া বেগমের সঙ্গীতের রেশ এই তিন শতাব্দী পরও আমাদের শ্রবণকুহরে সুধা বর্ষণ করে।

---

(১২) আকবর স্বয়ং এই মহাভারত অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্লকমান আইন-ই-আকবরী পৃঃ ১৪১।

(১৩) নাদির-ই-জমান অর্থে যুগের আলো।

(১৪) আকবরের বহু মুদ্রার পৃষ্ঠে "শ্রীরাম" শব্দ অঙ্কিত দেখিতে পাই।

পুরাতনী

"হে চির পুরাণো, চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর র'বে চিরদিন ধরিয়া।।"

--রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গলার মুসলমান

হাকিম হবিবুর রহ্‌মান

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই মুসলমানগণ আমাদের এই ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। ভারতের সঙ্গে আরববাসিগণের পরিচয় সুপ্রাচীন, কিন্তু এদেশের অধিবাসীরূপে পরিগৃহীত তাঁহারা হন নাই। মুসলমানগণ কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসীই হইয়া গেলেন। ভারতের উপকূলভাগ তাঁহাদের প্রথম অবতরণভূমি এবং "আল্ আক্‌রাবু ফাল্ আক্‌রাবু" (যত কাছে তত আগে) নীতির অনুসরণে ঐ সকল ভূভাগে নবাগতগণের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। তাই পাঞ্জাব ও দোআবা মোগল তুর্কীগণের এবং সিন্ধু বঙ্গ সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপের উপকূলভাগ আরব বণিকগণের ও মুস্‌লিম প্রচারকগণের বিচিত্র কর্ম্মভূমি। এই সমুদ্র উপকূলবাসীদের যে স্বরভঙ্গি ও তাহাদের মুখমণ্ডলের যে গঠন তাহাই অনেকখানি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের আদি বাসস্থান কোথায়।

সবাই জানেন আরব তুর্ক মোগল ও হাবসীদের হাজার করা একজনও এদেশে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রথানুযায়ী এদেশ হইতেই তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্তানী তুর্ক ও হিন্দুস্থানী মোগলের বংশ ভিত্তি স্থাপন এই ভাবেই। তারপর, ইঁহারা আবুমা'শেরে ফলকী ও আলবেরুণীর ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চার ব্রত লইয়া এদেশে আসেন নাই। তাই এদেশের যে ভাষা তাহাতেই তাঁহারা ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন ইহা সম্ভবপর নয়। এ ভিন্ন বিজেতা ও বিজিত উভয়েই উভয়ের ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চির-উৎসুক। তাই ইঁহাদের ভিতরে এক নবভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল--তাহার নাম হইল হিন্দি ও হিন্দুস্থানী। পারস্য ঐতিহাসিকগণ এদেশের হিন্দুগণের ভাষা 'হিন্দুভি' ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বক্তব্য, হিন্দিভাষা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্মেলন-জাত ভাষা, আর ক্রমশঃ রূপান্তরিত অবস্থায় উহা দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এইরূপে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু পূর্ব্বে পাঞ্জাবে এই ভাষার বর্ণমালা 'গুরুমুখী'তে পরিণত হয়।

মুসলমানগণ তাঁহাদের আনীত বর্ণমালা স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার করিতেন, যেমন, সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ তথায় আরবী (নস্‌খ্) বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি সিন্ধুবাসিগণ আরবী বর্ণমালায় দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য........দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহের দশম শতাব্দীর লিখিত, অধুনা ইউরোপের বহু গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পত্রাদি আমার এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপে দোআবার ভাষায় ফারসী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর ভিতরে যে ভাষার জন্ম হইয়াছিল তাহাই উর্দ্দুভাষা--তুর্কভাষায় সৈন্যবাহিনীকে উর্দ্দু বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও উর্দ্দুভাষা প্রকৃতপক্ষে একই ভাষা। ইহাদের ভিতরে পার্থক্য এই যে দিল্লীতে আসিয়া উর্দ্দুভাষা অধিক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং রাজশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিপুলকলেবর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলায় যে সকল মুসলমান সর্ব্বপ্রথম দেশের উপকূলভাগে বসতি স্থাপন করেন তাঁহারা বাণিজ্য ও নাবিকতাতেই আত্মনিয়োগ করেন; কেহ বা দেশে আল্লার নাম ও বাণী পৌঁছাইতে নিযুক্ত হন। এই আরব ও পারস্য-আগত মুসলমানগণ তাঁহাদের বংশধরদের ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টধ্বনিযুক্ত শব্দ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার উচ্চারণযোগ্য বর্ণ বাংলাভাষায় আদৌ নাই।

পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় জাতি যাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন তাঁহারা তুর্ক ও পাঠান। ইঁহারা সকলেই সৈনিকপুরুষ ছিলেন আর রাজ্যবিস্তারই ছিল ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যার্জ্জন বা অধ্যাপনা নয়। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের 'তুর্ক' বলা হইয়াছে, আর এদেশে নব দীক্ষিতকে 'খান' উপাধি দেওয়া হয় ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় পাঠান-প্রভাব বাংলার কত গভীর। সম্রাট আকবর বাংলাকে 'বেলগাকখানা' (ভীমরুলের চাক) বলিতেন। বাস্তবিক পাঠানগণ আফগানিস্থানের পরেই বাংলাকে তাঁহাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল "খেল" ও "জই" যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে বসবাস করিতেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা দিল্লীর শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, শেষ ভাগে বাংলার সন্তান শের শা ও ইসলাম শা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন হইতে জাহাঙ্গীর পর্য্যন্ত সকলকেই বাংলায় আধিপত্য বিস্তারকালে পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পাঠানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সৈনিক -যোদ্ধা, তবু মাদ্রাসাস্থাপন অনুবাদকরন স্বাধীন রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, ইত্যাকার বিদ্যানুরাগের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। বাংলার সুলতান গিয়াস্ উদ্দীনের নাম মহাকবি হাফেজ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।* কিন্তু তবুও বলিতে হইবে এসব তাঁহাদের সময়ের কীর্ত্তি; আর সেইজন্যই দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার উপযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি বাংলায় হইতে পারে নাই। বাংলার এই মুসলমানগণ যখন রাজ্যহারা হইয়া তরবারীর পরিবর্তে হল বা হাল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই 'পেদরম্ সুলতান বুদ' (আমার পিতা বাদশা ছিলেন) অবস্থায় নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট পত্রিকাদিতে মুসলমানী বাংলা দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার প্রথার প্রচলন করেন। অদূর অতীতের এই ধরণের বহু বাংলা রচনা এখনও দুর্লভ নয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলার দফ্তরের ভাষা ফারসী ছিল এবং হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গসন্তান ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু লিপিকার ও গ্রন্থকারের সুন্দর হস্তলিপির নিদর্শন আমরা এই ঢাকা নগরীতেই পাইয়াছি। মুসলমান রাজত্ব যখন ইউরোপীয় বণিকগণের হাতে আসিল তখনও বাংলার দফ্তরের ভাষা ফারসী ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ইংরেজগণও ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের ফারসী-অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বহু পুস্তক এখনও মজুদ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দূরদর্শি ইংরাজ দেখিলেন যে আশ্রয়হীন অথচ জনসাধারণের ভাষা উর্দ্দুর ভিতরে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে; তাই কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খোলা হইল, তথা হইতেই বর্ত্তমান উর্দ্দুর বিকাশ আরম্ভ হইল। আমার বিশ্বাস, এই কলেজের সৃষ্টি হইতেই বাংলার সরকারী ভাষা অকস্মাৎ ফারসী হইতে উর্দ্দুতে পরিবর্তিত হইল। এই উর্দ্দুভাষা কতিপয় বৎসর বাংলার দফ্তরের ভাষা রহিল। এই সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণও উর্দ্দুর ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাংলার এক প্রসিদ্ধ নেতার (শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তের) ঠাকুরদাদা একটী উর্দ্দু পুস্তকের রচয়িতা। উর্দ্দুভাষার কবিগণের সর্ব্বপ্রথম বিবরণীর সঙ্কলক জনৈক বাঙ্গালী হিন্দু (নুস্খা-ই দিলকুশা--রাজা জনমে জয় মিত্র)। উর্দ্দুভাষা শুধু

---

*কবি হাফেজ ও সুলতান গিয়াসউদ্দীন সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গল্পটী এই : সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সর্ব্ব, গুল ও লালা নাম্নী তিনটি বাঁদী ছিল। তাহারা প্রত্যহ সুলতানকে স্নান করাইত। তাহারা সুলতানের খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। একদিন সুলতান এই অর্দ্ধ শ্লোক রচনা করিলেন-- 'সাকী, হাদিসে সর্ব্বো গুলো লালা মিরওদ' (হে সাকী, সর্ব্ব, গুল ও লালার কথা সকলে বলিতেছে); কিন্তু দ্বিতীয় চরণটী তিনি আর সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দরবারের কবিদের আহ্বান করিলেন, তাঁহারাও কেহ বাদশাহের মনের মত চরণ জোগাইতে পারিলেন না। অবশেষে সুলতান প্রথিতযশাঃ হাফেজ শিরাজির কাছে অর্থ ও উপঢৌকন সহ লোক প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ জানাইলেন যে কবিবর যেন এই শ্লোকার্দ্ধ লইয়া ও ইহার ছন্দ ও মিল বজায় রাখিয়া একটী গজল রচনা করেন। হাফেজ সুলতানের অভিলাষানুযায়ী একটী গজল রচনা করেন ও সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি নিজে... ...

১। সাকী, হাদিসে সর্ব্বো গুলো লালা মিরওদ
বিঁ বহস্ বা সালাসয়ে গস্সালা মিরওদ।

হে সাকী, সর্ব্ব (সাইপ্রেস) গোলাব ও 'লালা' ফুলের কথা সবাই বলছে : তিন পাত্র শারাবের কথাও সবাই বলছে। (পারস্যের লোকেরা ফুল সামনে রেখে অথবা ছোঁড়াছুড়ি করে শারাব পান করতেন)।

২। শকরুর শিকন শওবন্দ হামা তুতিয়ানে হিন্দ
জিঁ কন্‌দে পারসী কে ববাঙ্গালা মিরওদ।

পারস্যের এই মিছরি বাংলায় পাঠানো হলো, এতে ভারতবর্ষের সমস্ত টিয়া মধুকণ্ঠ হবে।

৩। হাফিজ জে শওকে মজলিসে সুলতাঁ গেয়াসেদীন
গাফেল মশো কে কারে তু আজ নালা মিরওদ।

হাফিজ, সুলতান গিয়াসউদ্দীনের দরবারের প্রীতি সম্বন্ধে সজাগ থেকো, নইলে তোমাকে নিদারুণ অনুশোচনায় পড়তে হবে।

মুর্শিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতার সহিতই সম্পর্কিত ছিল না, সমস্ত বাংলাই ইহার চর্চ্চা ও আলোচনাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনকার বাঙ্গালী অপেক্ষা তখনকার বাঙ্গালী অধিকতর সাহসী ছিলেন; তাই লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারে একজন রাজকবি ছিলেন হুগলীর জনৈক মুসলমান (মালিক্-উশ্-শোয়ারা কাজী মোহাম্মদ সাদেক খান আক্তার)। হজরত মোহাম্মদ ও আম্বিয়াগণের যে জীবনী সর্ব্বপ্রথম উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত হয়, উহার রচয়িতা ছিলেন কুমিল্লার জনৈক মুসলমান (মৌলবী মোহাম্মদ সঈদ)। উর্দ্দু ভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকের রচয়িতা রংপুরের জনৈক মুসলমান (সাওলাতে আলমগীরি—সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত)। আর সব চাইতে গৌরবের কথা এই, লক্ষ্ণৌওয়ালাদের কবিত্ব বিষয়ে গবেষণামূলক সর্ব্বপ্রথম পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ 'তুমার ই-আগলাত' এর রচয়িতা এই বঙ্গমাতারই ফরিদপুরের এক সন্তান (মৌলবী আবদুল গফুর খান মস্‌সাখ), উর্দ্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কাছে আজও ইহার মর্য্যাদা অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদের জনৈক উর্দ্দু সাহিত্যিকও সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দুতে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষার (রেখ্‌তি) প্রথম বিবরণলেখক অথবা আবিষ্কারক। বাংলার স্ত্রীউর্দ্দুসাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণও কম নয়। মোট কথা, উর্দ্দুভাষা ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এক বড় সার্থকতা লাভ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এক রাজনৈতিক চালে হঠাৎ বাংলার সরকারী দফ্‌তরের ভাষা উর্দ্দু হইতে বাংলায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় মুসলমানদের এই অগ্রগতি বিষম বাধা পাইল এবং বাংলার মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে বাংলার মুসলমানকে যে সরকারী দফ্‌তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল সে-দুঃখের কান্না আজও আমাদের সভাসমিতিগুলি কাঁদিতেছে।

সেকালে আমাদের সাহিত্যিকদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। আলাওল সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি, তিনি আবার নেজামি গাঞ্জাবীর 'হাপ্ত পায়কর' নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকর্ত্তা, পারস্য ভাষায়ও তিনি কবিতা লিখিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিতদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু এই পুঁথি সাহিত্যের মূলে যে সাধনা আছে তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার যোগ্য। শাহ্‌নামার মত অতি বৃহৎ ও সুকঠিন ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উহার উর্দ্দু অনুবাদের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন রচয়িতার সংখ্যা অদ্য হইতে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কম ছিল না।

আমি একজন সেকালপ্রিয় লোক, তাই সেকালের কথা ভিন্ন আর কিইবা আমি বলিতে পারি। বাংলায় উর্দ্দুচর্চ্চার কথা যে একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম তাহার আর এক বড় কারণ ঃ বাংলায় উর্দ্দু ও বাংলা চর্চ্চা ভিতরে যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয়। উর্দ্দু বাস্তবিকই কোনও প্রদেশের খাস ভাষা ছিল না। উহা বরং সমগ্র ভারতবর্ষেরই ভাষা। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীবাসিগণ ইহাকে নিতান্তই এক খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিলেন, নানাভাবে ইহার এক বিশেষ মূর্ত্তি দিলেন, তাই ইহা একটি সীমাবদ্ধ স্থানের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজও উর্দ্দুর প্রসার ও প্রভাব বাস্তবিকই খুব বেশী। আজও ইহা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। বিদেশীয়গণও ভারতবর্ষীয়গণের সঙ্গে সাধারণতঃ এই ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। আর বঙ্গভাষাভাষীদেরও ক্রোধ বিরক্তি প্রকাশের ভাষা এই উর্দ্দু ভাষা। আপনাদের মাতৃভাষা বাংলার পুষ্টিসাধন তো আপনারা করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উর্দ্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সমস্ত ভারতের সঙ্গে আপনাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, আপনাদের ধর্ম্মকে তো আপনারা ছাড়িতে পারিবেন না, সেই ধর্ম্মের সাহিত্য-অংশ উর্দ্দুতে যেভাবে বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা একান্তই প্রশংসার যোগ্য। সেখান হইতে আপনারা প্রভূত প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমরা বাঙ্গালী মুসলমান ভারতের সমগ্র মুসলমানজনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক, অথচ আমরাই সর্ব্বপ্রকারে অবনতির গভীর তলে পতিত আছি। কিন্তু আফসোস করিয়া আর কি লাভ হইবে! আপনারা একদল তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এর চাইতে আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে। আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পুণ্যব্রত সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

কিন্তু কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে কর্ম্মবিভাগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা কে কে পারস্য ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন, কে কে আরবী ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া ফেলুন। এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আপনারা যে শুধু প্রাচীন ইতিকথা জ্ঞাত হইবেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাংলার লোকদের উৎপত্তি-কাহিনী, ইত্যাদি বিষয়েও বহু মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন—যেমন, বাংলার কবিত্বের উপরে পারস্যসাহিত্যের কি প্রভাব পড়িয়াছে ও

বাঙ্গালী মুসলমানের দেহে আরব রক্ত কি পরিমাণে আছে, এবং আরবের কোন্ প্রদেশেরইবা প্রভাব বাংলাদেশে বেশী, ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ তথ্য আপনারা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই মুস্‌লিম ইতিহাস বাংলার মুস্‌লিম ইতিহাসের মত এত অন্ধকারে পতিত নয়। অথচ এই বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিভাবানের জন্ম কম হয় নাই। এই বাংলার সোণারগাঁয়ে মাতামহের আলয়ে হজরত মখদুম-উল-মুল্‌কের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা সোণারগাঁয়ের ওলামা ও 'মোশায়েখ'দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ইমাম খাজেগীর মতো ইলমে-হাদিস অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বাংলায়ই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই বাংলারই জনৈক সুসন্তান সম্রাট ফিরোজ শাহের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মেহেদিভি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এই বাংলারই সন্তান; সে সম্প্রদায় অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে অবস্থিতি করিতেছে; 'মানাদুর' নামক মুসলমান করদরাজ্যটী এই মেহেদিভি সম্প্রদায়েরই স্মৃতি বহন করিতেছে। আর শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা নয়, কলাবিদ্যার চর্চ্চাও সেকালের বাংলায় কম ছিল না। ইব্‌নে বতুতা এরূপ গায়িকা এই বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন যাঁহারা ফারসী গজলে ও মজলিসি সঙ্গীতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কিন্তু আফসোস, সেই বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আমরা শিক্ষা করিতেছি কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজি ইতিহাস হইতে! আমার ধারণা এই যে যে সমস্ত অমুদ্রিত ফারসীভাষায় ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসের উপকরণ আছে, সেই গুলির এক লিষ্ট তৈয়ার করিয়া আমাদের তরুণদের হাতে দিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্তের অনেকগুলি এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না -ইউরোপের বিভিন্ন পুস্তকাগারে সেসব রক্ষিত আছে। তাই আমাদের দেশের যাঁহারা ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা যদি ঐ সকল পুস্তকের নকলাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের জ্ঞানেচ্ছু যুবকদিগের হাতে দিতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। বিভিন্ন জিলার ইতিহাস উদ্ধারেও আপনাদের ব্রতী হইতে হইবে। প্রচলিত ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারসমূহে ভুলত্রুটি যথেষ্ট। এইরূপে সব্বক্ষেত্রেই দেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার আপনাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

মুদ্রালিপি ও শিলালিপি পাঠের চেষ্টা আর একটী অতি বড় কাজ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ ভট্টশালী মুদ্রালিপি হইতে মুসলমান বাদশাহ্‌দের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু বাকী।

ফারসী ও আরবি শিলালিপি পাঠ আর একটি বড় ও সুকঠিন বিষয়। বাংলার বহুস্থানে এখনও বহু শিলালিপি অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এসবের কিছু কিছু সন্ধান মাঝে মাঝে দেয়। আমাদের এই ঢাকার প্রভিনশীয়াল মিউজিয়ামে এরূপ অপঠিত শিলালিপি বর্ত্তমান। এই শিলালিপি-পঠন-বিদ্যা আমাদের দেশে একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু-মুসলমান বংশ হইতে ফরমান, নিশান, সোক্কা, ইত্যাদি সংগ্রহের কাজও আপনাদের একদলকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার বহু ধর্ম্মপ্রচারকের ও আউলিয়া দরবেশের হস্তলিখিত জীবনচরিত চেষ্টা করিলে ধ্বংশের কবল হইতে এখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন। সার আর্ণল্ডের সুবিখ্যাত Preachings of Islam এ এই দুঃখ করা হইয়াছে যে বাংলার ইস্‌লাম-প্রচারকগণের জীবন-কাহিনী খুব কমই সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। একটা বড় দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের প্রাচ্যবিদ্যার এম-এ-গণ শুধু মুদ্রিত পুস্তকই পড়িতে পারেন, হস্তলিখিত পুস্তক পড়িতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের হস্তলিপি পাঠের দক্ষতা অর্জ্জন করা চাই।

বন্ধুগণ, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এক বর্ণহীন চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাকে বিভিন্ন রাগরঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিয়া এক মোহন মূর্ত্তিতে পরিণত করা আপনাদের কাজ। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার গীতাদি সংগ্রহে ও উহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিরুপণে আপনাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনারা জানেন, বর্ত্তমানে রাজপুতনার যে ইংরাজি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে উহা স্থানীয় গীতাদি হইতেই সংগৃহীত। বাংলার গানে দোস্তগাজি, কালুগাজি, মনোয়ার খাঁ, ইত্যাদি নাম সুপরিচিত। এইসব গীত হইতে তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

"রাত্রি ছোট আর কাহিনী দীর্ঘ।" এইবার অবসান করা যাক। আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লাগুন, এই আমার কামনা। আমরা বৃদ্ধেরা কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের যুবকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশী। "আগার পেদর না তাওয়ানদ পেসর তামাম কুনদ।" আপনারা গৌরবান্বিত মুসলমান হউন, এই প্রার্থনা করি।

আবতো জাতেহেঁ বুত্‌কদেসে মীব,
ফের মিলেঙ্গে খোগা লায়ে।।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৪১)

বাংলা, উর্দ্দু ও বাঙালী মুসলমান

আনোয়ার কাদির, এম. এ, বি. টি. বি. এল,

বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশেই প্রাদেশিক ভাষাসমূহের চর্চ্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের বাংলা দেশে শহরবাসী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে পূর্ব্বে কিছুকাল যাবৎ উর্দ্দুই মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। পল্লীবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারেও বহুকাল যাবৎ উর্দ্দু ও বাংলার চর্চ্চা একত্র চলিত, কিন্তু সেখানে উর্দ্দু ও ফারসীর প্রভাবই ছিল বেশী। বর্ত্তমানে, নানা কারণে বাংলাদেশে উর্দ্দু-চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

তবুও বিভিন্ন কারণে মুসলমান উর্দ্দুকে চিরদিন বজায় রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে উর্দ্দু নানা কারণে এখন আর প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না। শুনিয়াছি, মুসলমানদের তরফ হইতে ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে একটি স্কীম পেশ করা হইয়াছিল; তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে হয়ত উর্দ্দুচর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এই স্কীম সরকারের মনঃপূত হয় নাই। ফলে উর্দ্দুচর্চ্চা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ইহার পর বাংলা দেশে উর্দ্দুচর্চ্চার উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টা হয় নাই। এদিকে রাজা রামমোহন রায়ের স্কীম সরকার বাহাদুরের মনঃপূত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৭০ খানি। ইহার মধ্যে ৩২ খানি বাংলায় লিখিত। তিনি আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ইংরাজি, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ও উর্দ্দু এই নয়টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া, দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে কত নূতন নূতন তথ্য দ্বারা তিনি বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহনের পর আরও অসংখ্য মনীষী--যথা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়াছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

এদিকে উর্দ্দুভক্ত ও উর্দ্দু ভাষাভাষী বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো উদ্যোগী পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি রাজা রামমোহন রায়ের মত নানাভাবে আয়ত্ত করিয়া অথবা নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া উর্দ্দুসাহিত্যকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রীক, হিব্রু ইত্যাদি ইউরাপীয় ভাষা আয়ত্ত করা দূরের কথা, উর্দ্দু-ভাষাভাষী বাঙালী মুসলমান তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী মুসলমানের কথিত বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে প্রত্যেক মুসলমানেরই উর্দ্দু শিক্ষা করা উচিত; কিন্তু উর্দ্দু-ভাষাভাষীর বেলায় বাংলা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই! শুধু যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে; তাঁহারা মনে করেন যে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা একটি অপমানজনক ব্যাপার! এইরূপে মনোভাবের দরুণ তাঁহারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানকে অনেক সময়ে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকেন এবং অনাত্মীয় বলিয়া মনে করেন। ব্যাপার এখানে আসিয়াই শেষ হয় নাই। শুধু বাংলা ভাষাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন। বাংলা দেশকেও তাঁহারা পছন্দ করেন না। তাই আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া স্বীকার করিতেও তাঁহারা অনিচ্ছুক।

নেতৃস্থানীয় উর্দ্দুভাষী বাঙালী মুসলমানের এইরূপ মানসিকতার দরুণ বাংলাভাষী বাঙালী মুসলমানকে বহুকাল যাবৎ মহাসমস্যার মধ্যে কালযাপন করিতে হইয়াছে। এবং আজ বাঙালী মুসলমানের জাতীয় সাহিত্যের অভাব অনুভূত হইতেছে অথবা কোনো সাহিত্যেরই প্রভাব অনুভূত হইতেছে না।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে আজ ইসলামের অনেক কিছুর বাহন উর্দ্দু ভাষা। এই ভাষার সাহায্য লইলে ইসলামের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, কোরাণ, হদীস্, তফসীর, ফেকা, ওসুল, ফকীর দরবেশের জীবনী প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিতে পারে। সুতরাং যাঁহারা উর্দ্দু ভাল জানেন তাঁহারা ইসলামের সহিত বেশী পরিচিত ইহা সত্য। এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলার মুসলমানগণ তাহাদিগকে বেশ শ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়া আসিতেছেন। এই শ্রদ্ধার সুযোগ লইয়া উর্দ্দুভাষী বাঙালী মুসলমান তাঁহাদের পল্লীবাসী বাংলাভাষী বাঙালী মুসলমানের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাহাতে বঙ্গ-ভাষাভাষী মুসলমানের হৃদয় তাঁহারা জয় করিতে সক্ষম হন নাই।

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিমাণ বাড়ে কমে। পূর্ব্বে পল্লীবাসী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই উর্দ্দুচর্চ্চার প্রতি বেশ মনোযোগ ছিল। এখন ইংরাজী শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং বড় বড় সরকারী পদের জন্য উর্দ্দু জানার প্রয়োজন না হওয়ায় বাংলার বঙ্গভাষাভাষী মুসলমান ক্রমেই উর্দ্দু না শিখিয়াও উচ্চপদলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সব বাঙ্গালী উর্দ্দু না জানিলেও যে বেশ উচ্চশিক্ষিত এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সব উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে উর্দ্দুভাষাভাষী মুসলমানদের মনোভাব যে খুব সম্মানযুক্ত তাহা মনে হয় না।

আবার বাংলার উর্দ্দুভাষাভাষী মুসলমানদের যে-সমাজ তাহাও দিন দিন বেশ সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অভাব হওয়ায় অন্য কোনো কারণে তাঁহারা এখন আর পূর্ব্বের মত ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। তাই এখন অনেক বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী মুসলমান উর্দ্দু জানিলেই যে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করা যায় এ-কথা পূর্ব্বে যেমন অবাধে স্বীকার করিতেন, এখন আর তেমন স্বীকার করিতেছেন না।

অনেক উর্দ্দুভাষাভাষীর জীবনের আড়ম্বরপূর্ণতা, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞাপূর্ণ মমতাহীনতা প্রভৃতি কারণে বাঙালী মুসলমান উর্দ্দুভাষীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পায় না। পল্লীগ্রামবাসী বাঙালী মুসলমানদের উর্দ্দু শিক্ষা করিবার সুযোগ ও প্রয়োজনও খুব কম। দেশের দোকানদার, খরিদ্দার, জমিদার, প্রজা, খাতক, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী, লেখক, পাঠক, মক্কেল, রোগী, পোষ্টাফিসের পিওন, রেলষ্টেশনের বুকিংক্লার্ক, সরকারী ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ইত্যাদি যাহাদের সহিত তাহাদের নিত্য কারবার, তাহারা সকলেই বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী; তাঁহাদের মাতৃভাষাও বাংলা। সুতরাং বাংলা ভাষাকে এ-দেশের মুসলমানের অবহেলা করা চলে না। এতদিন উর্দ্দুভাষার কাছে অনেক কিছু আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু বাংলা দেশে উর্দ্দু সাহিত্য তেমন গড়িয়া উঠে নাই। উর্দ্দুভাষী কোন সমাজসেবক জাতীয় জীবনগঠনে তেমন কিছু চেষ্টা করেন নাই। অথবা বাঙালী মুসলমানদের রুচি অনুযায়ী কোন সাহিত্যগঠন করেন নাই। এদিকে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু মনীষী বাঙালী হিন্দুদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সহস্র উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁদের গঠিত সাহিত্যে উচ্চ জীবনের আদর্শ ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকের জীবনও এমন সহজ, সরল ও আড়ম্বরমুক্ত যে তাঁহাদের উদ্‌যাপিত জীবন এবং রচিত সাহিত্য বাঙালীর পক্ষে একান্ত লোভনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

বাংলাই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা, সুতরাং বাংলার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টাই সঙ্গত ও সহজ।

এবিষয়ে স্রোতের গতি যে কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের পরিবারে আজকাল সাধারণতঃ যে-ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দ্বারা। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় বড় কয়েকজন--যেমন : জষ্টিস্ সৈয়দ নসীম আলী, মিষ্টার এ. এফ. রহমান, খানবাহাদুর নওয়াব কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফারুকী প্রভৃতি অনেকের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাঁহারা এখন এতবড় হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে বর্জ্জন করেন নাই। ২০ বৎসর পূর্ব্বে আশাও করা যায় নাই, কোনো উচ্চপদস্থ মুসলমান ভদ্রালোকের পরিবারে বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি এমন অক্ষুন্ন থাকিবে। স্বদেশবাসী উর্দ্দুভাষাভাষী মুসলমান তাহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া এবং অনাত্মীয় মনে করিয়া যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন। কারণ এই অবজ্ঞার ফলে বঙ্গভাষাভাষী মুসলমান আজ তাঁহাদিগকে আত্মীয় মনে করিতে অক্ষম। এইজন্য একদিকে যেমন উর্দ্দুচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, অপরদিকে উচ্চপদস্থ উর্দ্দুভাষাভাষী সমাজের কাছে বাঙালী বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে বাঙালী মুসলমান বাংলার বুকে বাস করা সত্ত্বেও আপনাদিগকে বিদেশী ভাবিয়া আসিয়াছে। ফলে স্বদেশপ্রেম বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে লালিত হইতে পারে নাই। স্কট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :

"Breathes there a man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বাঙালী মুসলমানের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে স্বদেশপ্রেম বর্দ্ধিত হয় নাই, এই কারণেই তাহারা সমগ্র বাঙালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন। তাহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু এখানে মুশ্‌কিল এই যে, নিজেদের স্বার্থ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের উপর নির্ভর করে। সমগ্র দেশের শিক্ষা-সমস্যা, অন্নসমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা ইত্যাদিকে বাদ দিয়া শুধু মুসলমানের অন্ন বা বস্ত্র বা অন্য কোনো সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের অভাবে বাঙালী মুসলমান এ-সমস্ত সমস্যার ভার নিতে নারাজ। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনের প্রধান লক্ষ্য চাকুরী! সুতরাং চাকুরীর বাহিরে যে-সব বড় সমস্যা, সেগুলির সমাধানের জন্য তাঁহারা ভাবিতেছেন না। দেশের বড় বড় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক খুবই কম।

ভাষা লইয়া এতদিন যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহারই ফলে মুসলমানের আজ কোন সুবিকশিত ও সুসমৃদ্ধ সাহিত্য নাই। তাহাদের দ্বারা কোনো শিল্পেরও উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই, ঐ কারণে। সুতরাং দারিদ্র্য তাহাদেরই মধ্যে অধিকতর প্রকট। সমগ্র জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাম্প্রদায়িক অধিকারের ভগ্নাংশ ভাগের জন্য সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া থাকিলে এ দারিদ্র্য হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। সমগ্র জাতির সম্মুখে যে-সব সমস্যা, সে-গুলির সমাধানের চেষ্টা যে-সাহিত্যের ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিলে কোন সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, কোথায় যে কি সমস্যা আছে তাহার সন্ধানও তো পাওয়া যাইতে পারে না।

মুসলমানদের অনেকে বলিতে চান যে বাংলা সাহিত্য হিন্দুদের একচেটিয়া। হয়ত একথা সত্য যে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুলেখক হিন্দুসমাজের নানাস্তরের দুঃখ ও সমস্যার কথাই বলিয়াছেন এবং শুধু হিন্দুকেই কল্যাণের পথে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা জাতীয় Chauvinism ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং মুসলমানকে দূরে ঠেলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া দেশকে তাঁহারা বাদ দেন নাই। এ-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যে সমস্ত কবিতা, গাথা ইত্যাদি আছে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে দেশের প্রতি তাঁহাদের মমতা কত গভীর এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তাঁহাদের কত আগ্রহ।

যদি বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণে স্বদেশপ্রেম না জাগিবে, ততদিন দেশের সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যাপারে দেশের উন্নতির চেষ্টা মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। অথচ এগুলির মধ্যেই মুসলমানের নিজস্ব স্বার্থ নিহিত। বাংলায় বাস করা সত্ত্বেও উর্দ্দু ভাষাভাষী মুসলমান আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই, এবং তাঁহাদের খাতিরে বঙ্গ ভাষাভাষী বাঙালী মুসলমানও এতদিন আপনাদিগকে বিদেশী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। ফলে বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্য নাই। সব মুসলমানেরই যেন একটা পিছনের টান রহিয়াছে, তাহার দরুণ বাংলা সাহিত্যের আসরে সে যেমন অপরিচিত, তেমনি উর্দ্দুসাহিত্যেও তাহার উল্লেখযোগ্য কোন দান নাই।

বাঙালী মুসলমান যদি উর্দ্দুভাষার সাহায্যে একটি সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু বাংলার আবহাওয়া, বাংলার প্রকৃতি এবং বাঙালী মুসলমানদের জীবনের সুখ দুঃখ ইত্যাদিকে বাদ দিয়া, স্বদেশ-প্রেমকে বাদ দিয়া এবং মাতৃভাষাকে অস্বীকার করিয়া কোনো সাহিত্য গড়া অসম্ভব। সত্য কথা বলিতে কি, ভাষা সম্বন্ধে কোন দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। উর্দ্দুচর্চ্চায় আপত্তির সত্যই কোনো কারণ নাই। শুধু উর্দ্দু, পারসী, আরবী কেন—অন্য যত ভাষা আছে, কোনো ভাষার চর্চ্চায় আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু মাতৃভাষাকে বাদ দিয়া অন্য কোনো ভাষারই চর্চ্চা সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নয়। বাঙালী হিন্দু মনীষিগণ বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়াছেন বলিয়া অন্য অন্য সাহিত্যেও তাঁহাদের কিছু কিছু দান আছে। মুসলমানও যদি মাতৃভাষার প্রতি তাহার কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়া অন্য কোনো সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া উর্দ্দু সাহিত্যের-সেবা করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি হইবে না। তাহাতে বরং বাঙালী মুসলমানের গৌরবই বর্দ্ধিত হইবে।

এতদিন বাংলা ভাষাকে স্বীকার করিবার পথে যে কুসংস্কারের বাধা ছিল, আজ তাহা উঠিয়া গিয়াছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের অনেকেই আজ বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী মুসলমান। অনেক সরকারী বিভাগে আজ উচ্চশিক্ষিত মুসলমান

অনেকেই বঙ্গভাষাভাষী। এখন মুসলমান চাষীর দুঃখবেদনানিবেদনের পথ মুক্ত। ভাষার আগল আজ টুটিয়া গিয়াছে। পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর চিন্তাস্রোতের সঙ্গে মুসলমান চাষীর চিন্তাধারার পরিচয়ের বাধা অপসারিত হইয়াছে। এখন বাঙালী মুসলমানের নানাস্তরের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র আঁকা সহজ হইবে। সাহিত্য গড়িবার এমন সুবর্ণ সুযোগ এর পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। এখানে কাহারো কাহারো ভয় এই যে, হিন্দুলেখকের হাতে বাংলা সাহিত্য এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, উহার পাশে বাংলা ভাষার মধ্যস্থতায় আর একটি বাংলা সাহিত্য গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু অনেকেই তো বলিয়াছেন যে হিন্দু সম্প্রদায়িক গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে নাই, এবং যে-সাহিত্য তাহার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে কি? মুসলমান যদি উদারভাবে সনাতন সত্যের সন্ধানে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, এবং মঙ্গল ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া দেশের মিলিত চিত্তকে সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তবে তাহার হাতে-গড়া বাংলা সাহিত্য অন্ততঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের চিত্ত সরস করিয়া তুলিতে বাধা পাইবে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে বাংলা দেশকে যদি বাংলার অধিবাসী মুসলমান ভালবাসে, তবে যে-ভাষায়ই হোক, তাহাদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিতে কোনো বাধা নাই। উর্দ্দুভাষায় যদি ডি. এল. রায়ের "জন্মভূমি"র মত গান রচিত ও গীত হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? বাংলা দেশকে যাহারা ভালবাসে—হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক—তাহারা ইহাতে আনন্দিতই হইবে। স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলই যদি সকলের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ভাষা লইয়া এই যে দ্বন্দ্ব, ইহা থাকিবে না। এবং মাতৃভাষাও বাঙালী মুসলমানের কাছে তাহার উপযুক্ত আসন হইতে বঞ্চিত হইবে না। যাঁহারা উর্দ্দুতে লিখিবেন, তাঁহাদের পুস্তকাদিও বাংলায় অনূদিত হইয়া মাতৃভাষার সাহিত্যকে অধিকতর সম্পদশালী করিয়া তুলিবে।

(মাঘ-চৈত্র—২য় বর্ষ, ১৩৪১)

মোতাজেলাবাদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা

ফিদা আলী খান এম. এ.

অনাদিকাল হইতে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। মনে হয়, এইরূপ বিভাগ বলবৎ থাকিবে আরও হাজার হাজার বৎসর -হয়ত বা অনন্তকাল। এই দুই দলের একটীর নাম বিচারবাদী, অপরটি আনুগত্য বাদী। যাঁহারা প্রথম দলের তাঁহারা কোন কিছু নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিচারশক্তির প্রেরণায় স্বাধীন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারে যাহা সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহাই গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করেন। তাঁহারা জানেন, যে-জ্ঞান মানুষ লাভ করিতে পারে তাহা ইন্দ্রিয় ও বিচার-শক্তির সাহায্যেই সম্ভব। ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ অবশ্য সব সময়ে অভ্রান্ত হয় না, তাই সে সব পরিশোধিত করিতে হয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা। তাঁহাদের মতে বিচারবুদ্ধি হইতেছে সত্য-নির্ণয়ের চরম অবলম্বন। তাই যাহাতে এই বিচারবুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছুক। অন্যান্য ব্যাপারের মতো ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও মতবাদেও তাঁহারা এই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেন। এই পথে বিপদ যে কত সে-সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্ণভাবে সচেতন, কিন্তু তাঁহারা সাহসী পুরুষ—আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা তাঁহাদের বলদান করে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে।

যাঁহারা দ্বিতীয় দলের লোক তাঁহারা হয় নির্ব্বুদ্ধি অথবা অত্যন্ত শিথিল-প্রকৃতির। স্বভাবতঃ তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপরেও তাঁহাদের ভরসা নাই, তাই তাঁহারা অপরকে উচ্চতরজ্ঞানসম্পন্ন মনে করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করেন। অপরের নিকট হইতে নির্ব্বিচারে-গ্রহণ-করা মতের পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে অবশেষে তাহাই তাঁহারা মনে করেন অভ্রান্ত সত্য; আর যাহা তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছেন তাহার কোনরূপ সমালোচনা তাঁহাদের অসহ্য। তাঁহাদের সেই সব প্রিয় ধারণার বিরুদ্ধে যাঁহারা কোন কথা বলিতে যান তাঁহাদের বিপত্তির, এমন কি প্রাণহানির, আশঙ্কা আছে। মোতাজেলারা এই প্রথম দলের ও প্রাচীনপন্থীরা দ্বিতীয় দলের।

ইস্‌লামের চিন্তার ইতিহাসে কোন মুসলমানের পক্ষেই সংস্কারবিহীন হইয়া বিচার-জীবন আরম্ভ করা সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে পারেন না। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলের মুসলমানদের কয়েকটা ধর্ম্ম বিষয়ক মতবাদ অপৌরুষেয় বাণী হিসাবে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইত। মোতাজেলাদের মতে ধর্ম্মের এই সব গোড়ার কথা হইতেছে আল্লাহ, নবী ও 'ওহীতে' বিশ্বাস। এই সব বিষয়ে কোন প্রমাণের দাবি কোন দলই করেন নাই। মোতাজেলারাও এই সব বিষয়ে অন্যান্য মুসলমানের মতো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়শীল ছিলেন। তবে তাঁহাদের ধারণা ছিল, ইস্‌লামের এই মূলভিত্তির স্বরূপ-নির্ণয় ও এই সবের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে ইস্‌লাম তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ধারণা ছিল যে, ধর্ম্মের এই মূলভিত্তির সম্বন্ধে অথবা যে-কোন ধর্ম্মবিধান সম্বন্ধে কোনরূপ জল্পনা-কল্পনা অবৈধ, মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ ও বিচারবিশ্লেষণ পাপজনক।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ধর্ম্মের মূলীভূত বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে মোতাজেলারা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে কম নিষ্ঠাবান ছিলেন না। কিন্তু ইহার বাহিরে তাঁহারা চাহিতেন বিচারবুদ্ধির নির্দ্দেশিত পথে চলিতে, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা চাহিতেন চিরাচরিত ধারার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে। শেষোক্ত শ্রেণীর ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণ ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশের ভ্রান্তি ও অনেক বিষয়ে বিচারবুদ্ধির অক্ষমতা দেখিয়া উভয়েরই নির্দ্দেশ অস্বীকার করিয়া শুধু 'ওহী' বা প্রত্যাদেশকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিতেন। ইঁহারা নিজেদের এই দৃঢ় প্রবল বিশ্বাসের কারণ অপরকে বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা রাখিতেন না, আর অন্যের মতামত ও ইস্‌লামের প্রসারের দিকে আধুনিক মৌলানাদের মতোই ইঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। পক্ষান্তরে মোতাজেলারা এরূপ মনোভাব নবীন ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ও অমুসলমানদের ভিতরে উহার প্রসারের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করিতেন, আর সেই জন্যই ইস্‌লামের বিধানের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সঙ্গতি সাধনের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন; ইস্‌লামের কোন দুর্ব্বলতা প্রদর্শন যে ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল

না, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বরং উঁহাদের লক্ষ্য ছিল ইস্‌লাম সম্বন্ধে যে-সব ধারণা ইঁহারা অপ্রধান ও উহার প্রসারের পরিপন্থী মনে করিতেন তাহাই দূর করিয়া ইস্‌লামকে আরও মনোজ্ঞ করা। কিন্তু ইঁহাদের এই ধর্ম্মের সেবার মর্যাদা উপলব্ধির পরিবর্ত্তে কোন কোন ধর্ম্মনেতা ইঁহাদিগকে বলিতেন : 'কাফের'--তাঁহাদের অধিকারে ইঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইহা ত অপরাধের বিষয় হইবেই। এই ধরণের সামাজিক নির্য্যাতন আজিও অপ্রবল নয়।

মুখবন্ধস্বরূপ এই কয়েকটা কথা বলিয়া মোতাজেলাবাদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এতবড় একটি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। আমি তাই এই চিন্তাধারার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সর্ব্বজনবোধ্য মতামত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পরিতাপের বিষয়, এই সব চিন্তাশীলের কোন রচনাই আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। ইঁহাদের কয়েক-শত-বৎসর-পরে-আভির্ভূত ও প্রবল-বিরুদ্ধবাদী লেখকদের লেখা হইতেই ইঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিশ্বাস্য বিবরণ পাওয়া যায় এই সব গ্রন্থে :--

১। মাকালাতুন ইসলামিঈন--আবুল হাসান আল্‌--আশারী।
২। আল্‌-মিলাল ওন্নিহাল--বাকিলানী।
৩। আল্‌-মিলাল ওন্নিহাল--আবদুল কাহির বাগদাদী
৪। আল্‌-ফুস্‌সাল ফিল্‌মিলাল্‌ ওন্নিহাল--ইব্‌ন্‌ হাজ্‌ম বাহিরী।
৫। আল্‌-মিলাল ওন্নিহাল--আবদুল করীম শাহ্‌রিস্তানী।

হাসান বস্‌রী

(৬৪০-৭২৮ খৃষ্টাব্দ)

বস্‌রা এক সময়ে প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠে। সেই আন্দোলন ক্রমে এক উদার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। হাসানের প্রচারকার্য্য এই আন্দোলনের প্রাক্কালে। এখানেই প্রথম ধর্ম্মালোচনা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়-স্থাপয়িতা হাসান। সাধারণভাবে ধর্ম্ম—বিষয়ক মতবাদের উদারতা ও বিশেষভাবে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা তাঁহার প্রচারের বিষয় ছিল বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে মাবাদউল্‌-জুহানী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন--উম্মীয়বংশীয়গণ এই বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত অন্যায় ও নৃশংসতা সমর্থন করিতেছেন যে, সব-কিছুই সংঘটিত হয় বিধিলিপি ও বিধাতৃ-ইচ্ছার ফলে, তাঁহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এখানে নিরর্থক। ইহাতে হাসান নাকি বলিয়াছিলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র শত্রুরা মিথ্যাবাদী। তাঁহারই এক শিষ্য ওয়াসিল এই বিষয়ে (অমোঘ বিধিলিপি) প্রচলিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী হন। তাঁহার শিষ্য মা'বাদের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়াই হাসান তাঁহার উদার মতবাদের প্রচারে অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। তবু 'মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'-বাদের দিকে তাঁহার প্রবণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বিচারসমন্বিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তক হিসাবে হাসানের চেয়ে উচ্চতর আসন কাহারও নহে। সেই সময়ে মা'বাদ ও দিমাশ্‌কীর মতো ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় চিন্তার স্বাধীনতা তখন কত অকুতোভয় হইতে পারিয়াছিল।

হাসানের মতে ভয় হইতেই নৈতিক জীবনের উদ্ভব। তিনি নৈরাশ্যধর্ম্মী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যে-কেহ মনোযোগসহকারে কোরআন পাঠ করিবেন তাঁহারই আল্লাহ্‌র ভয়ে অভিভূত না হইয়া উপায় নাই। তাঁহার সমকালবর্ত্তী একজন বলিয়াছেন--হাসানকে সব সময়ে নিরানন্দ ও চিন্তাগ্রস্ত দেখাইত; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত কি এক দুঃখে তিনি পীড়িত। 'তাসাউফ' নামে ইস্‌লামে সন্ন্যাসবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি খ্যাত।

চর্ম্মচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখা যাইবে কি না এই বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি বিরোধী মত প্রচলিত আছে। একটিতে তিনি বলিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর--অপরটিতে বলিয়াছেন, অসম্ভব।

গাইলানী দিমাশ্‌কী

(মৃত্যু : ৭৩০ খৃষ্টাব্দ)

দিমাশ্‌কী একজন নীতিশিক্ষক ছিলেন। উম্মীয়বংশীয়দিগের সংসার-লালসার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি তৃতীয়

খলিফা ওসমানের বিমুক্ত দাস কায়াসানিয়াদের ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করেন। হজের সময়ে ইবন-হানফিয়ার দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইলে তিনি (ইবন হানফিয়া) বলিয়াছিলেন, 'দামশ্‌কবাসীদের প্রতিবাদরূপ এই আল্লাহ্‌র প্রমাণ চাহিয়া দেখ।' বিদ্যাবত্তায়, সংযমে, ধর্ম্মভাবে, আল্লাহ্‌র একত্ব ও ন্যায়পরাণতায় বিশ্বাসে (উদারপন্থী ধর্ম্মতত্ত্ববিৎদের এই সব ছিল প্রধান মত) তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। হিশাম বিন-আব্দুল মালিকের বিচারে তিনি ও তাঁহার সঙ্গী সালিহ্ অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন। এই নিষ্ঠুরতার কারণ এই,—দিমাশ্‌কী ওমর-বিন আবদুল আজিজকে লিখিয়াছিলেন "হে ওমর, আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারেন নাই. আপনি বুঝুন যে ইস্‌লামের অতি নগণ্য অংশই আপনি বুঝিয়াছেন। হায় মৃত পরিবেষ্টিত মৃত, আপনি কি জীবনে চলার কোন ইঙ্গিত পান নাই? আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করা যায় এমন বাণী কোনখানে পান নাই? ধর্ম্ম-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, আর ধর্ম্ম-বিকার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে! কোন বিচারানুমোদিত ধর্ম্মতত্ত্ব এখন জনগণের অনুবর্ত্তনীয় নয়। ধর্ম্মপ্রচারে নিয়োজিত হইতেছে অজ্ঞের দল! জনগণ যে মুক্তি অথবা ধ্বংসের দ্বারে উপস্থিত হয় সেটি অধিকাংশ স্থলে 'ইমামে'র জন্যই। ভাবিয়া দেখুন আপনি কোন পথাবলম্বী। এমন জ্ঞানী কি কেহ আছেন যিনি তাঁহার নিজেরই আচরণের নিন্দা করেন, অথবা যাহা নিন্দিত বিবেচনা করেন তাহাই আচরণ করেন?—যাহা বিধেয় বলিয়া আদেশ দেন তাহারই জন্য দণ্ড বিধান করেন—যাহা দণ্ডার্হ বিবেচনা করেন তাহারই বিধান দেন? আপনি কাহাকেও কি কখন দেখিয়াছেন—নিজে চলিতেছেন সত্যপথে আর অপরকে চালিত করিতেছেন বিপথে? এমন সদাসয়তা-গুণে-ভূষিত প্রভু কি আপনার নয়নগোচর হইয়াছেন যিনি তাঁহার ভৃত্যবর্গের উপর এমন আদেশ করেন যাহা তাহাদের সাধ্যের অতীত, অথবা তাঁহারই আদেশ পালনের জন্য তাহাদের শাস্তি দেন? এমন ধার্ম্মিক কি দেখিয়াছেন যিনি জনগণকে একই সঙ্গে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পালনে বাধ্য করিতেছেন? এমন সত্যবাদী কি কখনও দেখিয়াছেন লোকেরা পরস্পরের প্রতি অসত্যাচরণ করুক ইহাই যাঁহার ইচ্ছা?" এই চিঠিরই অন্যস্থলে তিনি খলিফাকে এই অনুরোধ জানান যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা অন্যায়ভাবে যাহা কিছু লোকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সরকারী ধনাগার পূর্ণ করিয়াছেন সে-সব স্বত্বাধিকারীদের ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হউক। কথিত আছে এই পত্রখানি খলিফার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। গাইলানীকে তিনি প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার যাহা প্রাপ্য কোষাগার হইতে তাহা তাহাকে বাস্তবিকই দেওয়া হইয়াছিল।—হিশামের সিংহাসনারোহণের কিছুদিন পরেই দিমাশ্‌কী একদিন বক্তৃতাকালে বলিয়া উঠিলেন,—"কাহার সাহায্যে আমি ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব যে বলে তাহারাই (উম্মিয়গণ) সত্যধর্ম্মাবলম্বীদের নেতা? যাহাদের ভাণ্ডারে অর্থ পুঞ্জীভূত অথচ জনগণ অনাহারে মরিতেছে?' এই সংবাদ হিশামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বুঝিলেন ইহাতে তাঁহাকে ও তাঁহার পিতাকে অপমান করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গাইলানী ও তাঁহার বন্ধু সালিহ্ আর্ম্মেনিয়ায় পলায়ন করেন—কিন্তু শীঘ্রই ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন ও পরে হিশামের আদেশে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর প্রাণত্যাগ করেন। শিরচ্ছেদের প্রাক্কালে হিশাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আল্লাহ্ তোমার জন্য কি করিলেন, মনে হয়?' খলিফার উপস্থিতিতে অথবা পরে আরও কত অত্যাচার তাঁহার উপর হইতে পারে এই সব চিন্তায় গাইলানী বিচলিত হইলেন না। খলিফার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন—'যাহারা আমার প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার যেন তাহাদের লাভ হয়।'

ওয়াসিল ইবন্ আ'তা আল্ গাজ্জাল্

ওয়াসিল প্রথম ছিলেন বস্‌রার উদারদলভুক্ত সুবিখ্যাত হাসানের শিষ্য। ইবন্-হানাফিয়ার নিকটেও তিনি কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। তখনকার দিনের প্রধান সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল মুসলমান সমাজের অধর্ম্মচারীদের লইয়া। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়াছিল। ইহার মধ্যে এই দুইটি ছিল দুই প্রধান পরস্পরবিরোধী মত—খারিজদের মত ও মুরজীদের মত। প্রথম দল ভাবিতেন, মুসলমান যখন কোন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করে তৎক্ষণাৎ সে অমুসলমান কাফের হইয়া যায়, কেননা আল্লাহ্‌র আদেশের অনুবর্ত্তিতাই হইতেছে ঈমানের (ধর্ম্ম-বিশ্বাসের) প্রধান অংশ। অপর দল ভাবিতেন, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস লইয়া,—কর্ম্মের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই; আর সেই কারণে যে পর্য্যন্ত কোন মুসলমান অন্তরে বিশ্বাসহীন না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অমুসলমান কাফের বলা যায় না। তাহার পাপ যতই হউক, তবু তাহার সমুদয় পাপ পরম করুণাময় আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিতে পারেন। ইমাম

আবু হানিফা এই শেষোক্ত-দল-ভুক্ত ছিলেন। এই দুই দল এইভাবে ধর্ম্মবিশ্বাস-হীনতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরস্পরবিরোধী (Contradictory) মনে করিতেন, হাসান বসরী মনে করিতেন অধর্ম্মাচারী মুসলমান মোনাফেক (ভণ্ড) পর্য্যায়ভুক্ত। ওয়াসিল হাসানের এই মত ও 'ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'বাদ আরও যুক্তি-অনুবর্ত্তী করিলেন। অধর্ম্মাচারী-মুসলমান কাফের ও মুসলমানের মধ্যবর্ত্তী, আর সে জন্য এরূপ লোককে ধর্ম্ম-বিশ্বাসীও বলা যায় না ধর্ম্ম-অবিশ্বাসীও বলা যায় না। এইভাবে ওয়াসিলের মতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী হইল না--কিছু বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় Contradictory হইল না Contrary হইল। তাঁহার মতে পরকালে এই রকম লোকের শাস্তি মুসলমান হইতে গুরুতর হইবে কিন্তু অমুসলমান হইতে লঘুতর হইবে। এইভাবে অধর্ম্মাচরণ বা পাপ তাঁহার মতে হইল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাস-হীনতার (কাফেরী) মাঝামাঝি। এই কথা শুনিয়া হাসান বলিলেন--"আমাদের ভাই আমাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন।" (ই'তাজালা আন্না আখুনা) ও তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যমণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ওয়াসিল শান্তভাবে বসরার মসজিদের আর এক স্তম্ভের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন শীঘ্রই একদল লোক তাঁহার চারিপাশে জুটিল। ওয়াসিল নিজে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইস্‌লামের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সুপ্রসিদ্ধ মতভেদের ফলে ওয়াসিল এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, তাঁহার অনুবর্ত্তীদের নাম হইল মোতাজেলা--অর্থাৎ দলত্যাগী।

ওয়াসিল পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইস্‌লামের সমস্ত বিধিবিধান তিনি যথাযথভাবে পালন করিতেন, নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত নামাজ পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার এই সব ধর্ম্মকর্ম্মের ভিতরেও তাঁহার নিজের মতবাদের প্রতিষ্ঠার অনুকূল সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিতেন। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার স্ত্রীর এই উক্তি হইতে। তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন : "তিনি (ওয়াসিল) রাত্রির অনেকখানি অংশ নামাজে ব্যয় করিতেন, কিন্তু সব সময়ে কাগজ কালি ও কলম পাশেই এক টেবিলের উপরে রাখিয়া দিতেন। কোরআন আবৃত্তি করিতে করিতে যখনই তাঁহার মতের সমর্থক কোন 'আয়াত' পাইতেন, তখনি থামিয়া উহা লিখিয়া রাখিতেন। কাজেই নামাজ তাঁহাকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইত। এইভাবে এই সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম এত দীর্ঘ-সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িত।" তাঁহার ধর্ম্মমতের অশিথিলতার আর একটি গল্প আছে। তাঁহার এক প্রিয় বন্ধু এক সময়ে নাকি বলিয়াছিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মত ভিন্ন আর কিছুতে যে বিশ্বাস করে সে কাফের! ইহাতে বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন।

ওয়াসিলের শিষ্য ও বন্ধু আম্‌র-এর মতে ওয়াসিলের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ ছিল। ধর্ম্মতত্ত্ব ভিন্ন শিয়া জিন্দিক দাহ্‌রিয়া প্রভৃতি মতবাদ ও সে সমস্তের খণ্ডন তাঁহার আয়ত্ত ছিল। মুস্‌লিম ধর্ম্মতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রণেতা আবদুল জব্বার বলেন, আবুল হুদাইল আল্লাফের মতো ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ওয়াসিলের নিকট ঋণী, ওয়াসিলের পত্নী নাকি তাঁহার দুই সিন্দুক গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু এত বিদ্যাবত্তা ও বাক্‌শক্তির সঙ্গে ওয়াসিলের একটী দোষ ছিল--তিনি 'র' অক্ষরটি উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আরবী-জ্ঞান নাকি এমন অগাধ ছিল যে বক্তৃতায় ও রচনায় এই 'র' অক্ষর বর্জ্জিত শব্দ তিনি ব্যবহার করিতেন। একজন ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে এই গল্পটী বলিয়াছেন--(গল্পটি অবশ্য সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে) : কোনো কুচক্রী প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াসিলকে জব্দ করিবার জন্য ও খলিফার নিকটে তাঁহার সম্মান লাঘবের জন্য খলিফাকে অনুরোধ জানান যে ওয়াসিলকে এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে বলা হউক "আমারাল আমারু আঁইইয়াহ্‌ ফিরা বি'রান লেইয়েশ্‌রিবা মিনহুল্‌ ওয়ারিদু ওয়াস্‌ সাদিরু" (বাদশা রাজপথে একটী কূপ খনন করিবার আদেশ দিয়াছেন যেন পথিকেরা গমনাগমনের সময়ে উহা হইতে জল পান করিতে পারে)। কৌতূহলপরবশ হইয়া খলিফা তাঁহাকে উক্ত কথাটী বলিতে বলেন। ওয়াসিল ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলেন--"হাকামাল হাকেমা আইইয়াজ আলা কালিবান ফিস্‌ সাবিলে লেইয়ানতাফেয়া মিনহুস সাদিয়ো ওয়াল বাদিয়ো।" পূর্ব্ব বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ ইহাতে ব্যক্ত হইল, অথচ বিঘ্নকর 'র' অক্ষরটি আগাগোড়া বাদ দেওয়া হইল।

ওয়াসিলের চিন্তার প্রভাব তৎকালীন মুস্‌লিম চিন্তাশীলদের উপরে গভীর ও ব্যাপক ভাবে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কেননা ইমাম হুসেনের পৌত্র যায়েদ (ইনি যায়েদিয়া-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পিতামহের ন্যায় উম্মিয়বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন) ও দ্বাদশতম উম্মিয় খলিফা এবিদ্‌ ইব্‌ন্‌ ওয়ালিদ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এবিদের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে মোতাজেলাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাঁহাদেরই সাহায্যে তিনি নাকি সিংহাসনলাভ করেন, আর রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তিনি যে মনোরম অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাও নাকি মোতাজেলাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

'ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'-বাদ বস্‌রার উদার ভাবুকদল প্রচার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সত্যকার দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে অবশ্য তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল দুইটী চিন্তা -(ক) স্বভাবতঃই আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ করি অথবা তাহা হইতে বিরত থাকি, (খ) ইহার বিপরীত বিশ্বাস যদি আমরা পোষণ করি তাহা হইল এই অদ্ভুত মীমাংসায় আমাদের পৌঁছিতে হয় যে আল্লাহ তাঁহার নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য শাস্তি দেন মানুষকে, কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র ন্যায় পরায়ণতার বিরোধী। এই শেষোক্ত যুক্তিধারা ওয়াসিলের তর্কের ক্ষমতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের ইচ্ছাশক্তির যদি কোনো স্বাধীনতা না থাকে, তবে তাহার নৈতিক জীবনের জন্য তাহার কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকে না, তাহা হইল তাহার অবস্থা হয় নিছক যন্ত্রের মতো - সেই যন্ত্রের যত দোষত্রুটি তাহার জন্য দায়ী যন্ত্রী অর্থাৎ আল্লাহ্। এই ভাবে পরম করুণাময়কে সাজানো হয় অতি ঘোর অত্যাচারীরূপে (যেমন অত্যাচারী নাদির শাহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের চক্ষু উৎপাটন করেন আবার সভাসদগণের শাস্তি দেন এই জন্য যে তাহারা তাঁহাকে বাধা দেয় নাই), শুধু তাই নয়, এই যদি সত্য হয় তবে মানুষ তাহার সুকৃতির জন্য পরকালে কোনো পুরস্কারের আশা করিতে পারে না—ইত্যাকার কথা ওয়াসিলের মতো পরিষ্কার ও জোরালো করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর কেহ বলিতে পারেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মোতাজেলারা "মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা' বাদ পোষণ করিতেন বিধাতৃবিধানের ন্যায়পরায়ণতা সমর্থনের জন্য। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিধাতার ধারণায় ন্যায়পরায়ণতা অবশ্য গণনীয়। কিন্তু ওয়াসিলের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পায় অন্য চিন্তাধারায়, সেটি হইতেছে জ্ঞান শক্তি ইচ্ছা জীবন প্রভৃতি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর স্বতন্ত্র সত্তার অস্বীকার। প্রথমে এই মতবাদ খুবই অবিকশিত অবস্থায় ছিল, ওয়াসিলের চিন্তাভাবনাও এই মতবাদের ক্রমবিকাশের ধারার সূচনা মাত্র। দুইজন অনাদি অনন্ত স্রষ্টার পরিচিন্তন অসম্ভব--এই ধারণা হইতেই ওয়াসিলের নূতন চিন্তাধারার সূচনা; কিন্তু যিনি স্রষ্টার গুণাবলীও চিরন্তন মনে করেন, তিনি প্রকারান্তরে দুইজন স্রষ্টাই স্বীকার করেন। প্রাচীন পন্থীরা দেখাইলেন, কোরআনে ও হাদিসে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর কথা আছে, ওয়াসিলের মতবাদ অনৈসলামিক।

কিন্তু মনে হয়, ওয়াসিল নিজে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার মতই ইসলামের সত্যকার একেশ্বরবাদের সঙ্গে সুসঙ্গত। মুসলমানরা আরবের বাহিরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, আর এই সময়ে তাহারা মুস্‌লিম সমাজের ভিতরে অন্ততঃ তার পশ্চিমাংশের অধিবাসী হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমোক্ত শ্রেণীর নিকট হইতে আল্লাহ্‌র মানবসুলভ ব্যক্তিত্ববাদ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট হইতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস, ত্রিত্ববাদ, প্রভৃতি বিষয় তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ সম্বন্ধে এই সমস্ত ধারণার প্রতিক্রিয়ারূপেই হয়ত ওয়াসিলের এই 'স্রষ্টার গুণাবলীর স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি'-বাদের উদ্ভব। কেননা দেখা যায়, অল্পকাল মধ্যেই এই সব যুক্তি-তর্ক খৃষ্টানদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

(কার্ত্তিক--পৌষ, ২য় বর্ষ- ১৩৪১)

জীবন-জিজ্ঞাসা

মোহিতলাল মজুমদার

কলকাতায় আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তারপর থেকেই স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রকট হয়ে উঠেছে, আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও টিকে আছি এবং সম্ভবতঃ এ বছরটা টিকে গেলাম। এই স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকেই একটা মানসিক বিপ্লব চলেছে। নিজের জীবন, চরিত্র, ভাগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে পড়েছি; যতকিছু পাপ, তাপ, ব্যথা, দুর্গতি, দুর্ব্বলতা ও দুর্ভাগ্যকে সৃষ্টিবিধানের অখণ্ডনীয় নিয়মের অনুযায়ী বলে--নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্বচেতনার অন্তর্ভূত ব'লে--উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি; বলা বাহুল্য আমার জীবনের যত কিছু ব্যর্থতাকে একটা law এর fulfilment হিসাবেই মেনে নিতে চাই। কোনোখানে কোনো বিরোধ আছে, কোনো অন্যায় আছে--এটা আমি স্বীকার করবো না। এই জগতটার আদিকরণ চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় থাকবে, কিন্তু এর আদিকে না জানলেও 'মধ্য'কে জানা যায়। বীজ কোথা থেকে এল, কেমন করে' অঙ্কুরিত হল, এ কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে, এই বিকাশ ধারায় সেই বীজরূপী অনাদি ও অনন্ত সত্তা আপনি আপনাকে realise করে' চলেছে; এ realisation এর শেষ নেই, বিরামও নেই। আমার জীবনের যেটুকু উপলব্ধি তাও সেই বিশ্বচেতনায় একটা contribution। যা 'মহতোমহীয়ান' তা 'অণোরণীয়ান'ও বটে; আমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে, আমার এই আমি-রূপেই সেই সত্তা একটা অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অতিশয় বিশেষ উপলব্ধি-ধনে ধনী হচ্ছে--আমার মত আর কেউ আগে ছিল না, পরে হবে না; কাজেই আমাকেও প্রয়োজন ছিল। 'অনন্তবাহুদরবক্ত্রনেত্র' যিনি আমিও তাঁরই একটী বিশেষ প্রত্যঙ্গ, আমাকে না হলে তাঁর চিৎস্ফূর্ত্তির একটা 'অণোরণীয়ান' অংশ blank থেকে যেত। এইটুকুই আমার জীবনের প্রয়োজন; এর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আমার নয়, আর একজনের; এবং এর কিছুই ব্যর্থ নয়, তাই ক্ষোভের কারণ কোথাও নেই।

মানুষের আমি বা অহংসংস্কারই যে প্রধান অবিদ্যা, একথা যে কত সত্য তা বুঝানো যায় না, নিজে না বুঝলে উপায় নেই। দেখুন, জগতের একটা প্রধান সংস্কার মানুষের মঙ্গল-বুদ্ধি; এর থেকেই যত পাপ-পুণ্য, ভাব-অভাব, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভের ধারণা আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না,--আধ্যাত্মিক চিন্তায় পর্য্যন্ত! কিন্তু এ সকলের মূলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির 'অহং'। আমি পরলোক বা পরকালে বিশ্বাস করি না (সংস্কার হয়ত আছে), তাই আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসে আমাকে এই জীবনের একটা অর্থ আবিষ্কার করতে হচ্ছে, নইলে অব্যাহতি নেই। প্রাণ হাহাকার করলেও আমাকে তা নিবারণ করতে হবে। যতটুকু স্থূলভাবে দেখছি, তাতেই নিবস্ত হ'লে নাস্তিক হতে হয়। আমি নাস্তিক নই। আমি এই সৃষ্টিকে বিশ্বাস করি; এবং এছাড়া আর কিছুকে সত্য বলে' মানি নে। কাজেই এই সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টির অর্থ আমায় খুঁজতে হবে। একটা বড় কথা আমি হিন্দুর বংশে জন্মে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, সে হচ্ছে এই যে--অহং-সংস্কার বা ব্যক্তিচেতনাই অবিদ্যা। এইটীকে সম্বল করে' আমি যে একটি অর্থের আভাষ পাচ্ছি, তা যুক্তি বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ আমি যে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করেছি, তাতে matter ও spirit-এ ভেদ নাই--matterই spirit; এই সৃষ্টির নিয়তিই ভগবানের নিয়তি--আমার নিয়তিও ভগবানের নিয়তি। এই সৃষ্টির বিকাশ-ধারায় সেই 'আপনি' আপনার পরিচয় সাধন করছে, সে পরিচয়ের শেষ নেই--প্রতিমুহূর্ত্তের পরিচয় সে পরিচয়কে পুষ্ট করছে--এমনি করেই চলেছে, অব্যক্ত ব্যক্তই হচ্ছে--কখনও 'ব্যক্তি' হয়ে উ'ঠবে না। আমার মধ্যদিয়েও সেই 'আপনার-সঙ্গে-আপনার-পরিচয়ে'র, একটা কণা পুষ্ট হচ্ছে। যতক্ষণ মানুষের অহং-সংস্কার থাকবে, ততক্ষণ এ চিন্তা রুচিকর হবে না, এতে শ্রদ্ধা হবে না। মানুষের সর্ব্বচিন্তা,--সূক্ষ্মতম চিন্তাও materialistic; এবং এই materialism-এর মূলে আছে ব্যক্তি-চেতনা বা অহং-সংস্কার--এরই নাম অবিদ্যা। কিন্তু এই জগতকে অখণ্ড আত্মার একমাত্র রূপ বলে বুঝতে পারলে, materialismই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায়। যারা পরলোকবাদী, তারাই ঘোরতর materialist,--অতি দুর্ব্বল, কৃপার পাত্র তারা। তারা ইহলোককে, অর্থাৎ এই অহং-অনুবিদ্ধ জীব-সংস্কারকে, পরলোকে প্রসারিত করেছে--spiritualism এর পাণ্ডারা মোহিনী প্রকৃতির অশেষ ছলনায় মুগ্ধ

হয়ে, এই জগতেরই একটা ছায়া রচনা করে', অবিদ্যাজনিত দুঃখকে মুলতুবি করে' রাখবার চেষ্টা করছে। সব চেয়ে দুঃখ হয়, যখন কোন বুদ্ধিমান হিন্দুও পাশ্চাত্যের এই শিশুসুলভ 'কাণা-মাছি'-খেলায় আকৃষ্ট হয়--যা science-এর বহির্ভূত, তাকেও science-এর অধিকারে নিয়ে এসে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন মোচনের উল্লাস করে। যাদুকরী যে এখানেও তাদের ঠকাচ্ছে, এ খেয়াল কারো হয় না; যতকিছু experiment বা প্রমাণের মূল্য যে কত সামান্য, তা এই আত্ম-প্রবঞ্চিত হতভাগোরা বোঝে না। সেগুলোও phenomena, এবং তার অন্যতর ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং একদিন তা পাওয়া যাবে। প্রকৃতির একটা ঘাগরি science খুলেছে, আরও খুলবে, কিন্তু তাকে কখনও উলঙ্গ করতে পারবে না। ওসব প্রমাণকে অতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি আমাদের দেশে এখনও আছে--আমি প্রকৃত যোগীদের কথা বলছি--তা অসম্ভব নয়। আসলে ও সবই জড়বাদী materialistদের সুখস্বপ্ন--'wish is father to the thought'। তারা ব্যক্তি-হিসাবে বাঁচতে চায়, বড় সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তি, সাহস বা অভিলাষ তাদের নেই। আমি এদের বিশ্বাস ও মতামত কিছু কিছু জানি কতকগুলো দেহাত্মবাদী অহংমুগ্ধ শিশু বা পশু। তারা spiritদের প্রমুখাৎ পরলোকের ও সেখানকার জীবনের যে বিবরণ শোনায়, তা এতই তুচ্ছ এবং এতই বালকোচিত যে অতিশয় প্রাকৃত-সংস্কারসম্পন্ন অশিক্ষিত অতিবিশ্বাসীর দল ছাড়া আর কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ওসব কথায় কান দেবে না। এই spiritism সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, মানুষের মোহবৃদ্ধির এ একটা নতুন হুজুগ উঠেছে; সেই পুরাণো moralityর সংস্কারকেই এই সব অখৃষ্টানবেশী খৃষ্টানেরা আবো দৃঢ় করে তুলে, মানুষকে আবার অবিদ্যার নরকে নিক্ষেপ করবার চেষ্টায় আছে। এই মত যদি মূলবিস্তার করে তবে আবার একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম--পুরা materialistic সংস্কার--প্রবল হয়ে উঠবে। ইহলোকের অধিকার নিয়েই এত বাদ বিসম্বাদ, এবার পরলোকের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকের সৃষ্টি হবে, হিন্দু-ভূত ও খৃষ্টান-ভূত আবার এক communal মারামারি বাধিয়ে দেবে। কি দুর্ব্বল অসহায় আমরা! বাঁচতে হবেই, একটা পরলোক বা স্বর্গ চাইই চাই; এবার সেটাকে science-এর দাবী দিয়ে শোধন করে নিতে হবে!!

কিন্তু আমি যে তত্ত্বের আভাস ও আশ্বাসের কথা বলেছি, তাতে আমি এই সৃষ্টিবিধানের মধ্যে একটা justice-এর সান্ত্বনামাত্র পাই, এখনও আনন্দ পাই নি। অহং-বুদ্ধি যে কিছুতেই যায় না। এই জীবনটার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মমতা কতদিক থেকে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে! অতীতকে বড় মধুর মনে হয়, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে--সেই বাল্য, সেই যৌবন, তার যত ব্যথা, যত দুঃখ— এমন কি যত misery ও squalor--আজ পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয় জীবনে যা পেয়েছি বা পাইনি তার জন্যে শোক নয়--আরও পাওয়া এবং আরও না-পাওয়া এরই মধ্যে শেষ হল, এই দুঃখ। মৃত্যুর জন্য সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত আছি বলে' যেমন মনকে প্রবোধ দিই, তেমনি হঠাৎ কোনো সময়ে এই ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ চিন্তা করে' নিদ্রাহীন নিশীথে বড় ভয় পাই। বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাব বা মহাসত্তায় লীন হব--তাতে সুখ দুঃখ কোন চেতনাই থাকবে না--এইটাই আশা হয় বটে, তবু the dread of something after death যেন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাসা বেঁধে রয়েছে। মহাকবির কি অব্যর্থ ভাবনা! মানুষের প্রাণের অন্তস্তলের সর্ব্বশেষ চিন্তাকে কেমন যথার্থ করে' প্রকাশ করেছেন। সব চেয়ে সেই আর এক কথা--

We must endure
Our going hence even as our coming hither.
Ripeness is all.

—এতবড় সত্য কথা এমন করে' আর কে বলতে পেরেছে? Shakespeare-এর সমগ্র কাব্য-কল্পনার মধ্যে যে নাটকীয় objectivity-র পরম রস উৎসারিত হয়েছে, তার মূলে আছে ওই attitude। জীবনকে তিনি এমনি করে' দেখতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর কাব্যে subjectivity-র সঙ্কীর্ণতা এত কম। এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি আপনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে, এই জড়ের মধ্যেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ আশ্বাস ধর্ম্মের আশ্বাস নয়, moralityর আত্মপ্রসাদও নয়--কোনও idealism-এর মোহও নয়; জগতের প্রাণ-প্রেরণার সঙ্গে নিজ প্রাণ-প্রেরণা যুক্ত করে' একটী পরমা নির্বৃতি লাভ। তাঁর কল্পনায় কোন ব্যক্তি সংস্কার ছিল না ব'লে তিনি কোন God-ব্যক্তির ধার ধারতেন না।

'Ripeness is all' কথাটার অর্থ আমার মতে এই যে, বিশ্ববিকাশধারার সঙ্গে নিজ প্রাণের বিকাশকে এক করে' দেখার যে রসময় উপলব্ধি,--যার ফলে সকল সুখদুঃখ একটী অপূর্ব্ব চেতনায় লয় হয়ে যায়--মনুষ্যজীবনের সেই সার্থকতাই পরম ও চরম বস্তু। আমি এই তত্ত্বের যে উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে law ও justice-বোধটাই প্রধান ও প্রবল; সে উপলব্ধি রসময় নয়, তার

মধ্যে একটা intellectual satisfaction আছে--প্রেমের প্রেরণা নেই। তাই আমার 'আমি'টা এত করে'ও শান্ত হচ্ছে না--আমার সমস্ত সত্তা রসবিগলিত হয়ে সমাধি বা harmonyতে ডুবে যেতে পারছে না। এই প্রেম যে-কোনো পাত্রকে আশ্রয় করেও মানুষকে সে অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। এ বিষয়ে সকল যুগের সকল ভাবুক, সকল কবি যে কথা বল্‌তে চেয়েছেন--তা' সে যেমন করেই বলুন, তার implication যেখানে যত সঙ্কীর্ণই হোক--তাতে তাঁরা একটা সহজ সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, হয়ত তার গভীরতর মর্ম্ম উপলব্ধি না করেও। Tennyson এর সেই দুটী লাইন স্মরণ করুন--

Love took up the harp of life and : smote
On all the chords with might,
Smote the chord of Self, that trembling
Passed in music out of sight

তাই যেমন করে' যে দিক দিয়েই জীবনের রহস্য সমাধান করবার চেষ্টা করি না কেন--ঘুরে ফিরে ওই একটা তত্ত্বকেই আশ্রয় করতে হয়, ওটাকে এড়িয়ে যাবার জো নেই। প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়--মহাকবি Shakespeare থেকে মহাতাপস বুদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র ওই এক। বুদ্ধ এই প্রেমের বলেই জীব-সংস্কার 'ত্যাগ করে' 'ব্রহ্মবিহার' করেছিলেন, Shakespeare এই প্রেরণার বশেই কাব্য-সাধনার পথে প্রাণের সেই পরমা নির্বৃতি লাভ করেছিলেন। অতএব--the problem of life is to live—মৃত্যু, পরলোক বা পরকাল নয়। 'Ripeness is all'। কিন্তু এ সব কি আপনার ভালো লাগ্‌ছে? আমার মত আপনি তো বৈতরণীর কূলে দাঁড়িয়ে তার প্রথম তরঙ্গের আঘাত প্রতীক্ষা করছেন না! অথবা আপনি তো আমার মত অপ্রেমিক নন। আপনার এ সব চিন্তার কি প্রয়োজন? আপনার যা কিছু চিন্তা, সে আত্ম-সমস্যামূলক নয়, পর-সমস্যামূলক; তাই তর্কে পরকে হারিয়ে দিতে পারলেই আপনি খুশী--নিজের কাছে জবাবদিহির কোনো প্রয়োজন নেই। প্রার্থনা করি, আমার মত এই রকম প্রাণের দায়ে আপনাকে যেন কখনো কোনো চিন্তার আশ্রয় নিতে না হয়।***

(শ্রাবণ--আশ্বিন, ২য় বর্ষ, ১৩৪১)

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, এবং সেগুলির সমর্থন ও প্রচারের জন্য তিনি কোন কোন যুক্তিতর্কের আশ্রয়গ্রহণ করেন, সে-সবের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তবে বলা আবশ্যক যে আমার নিজের কথার চাইতে কবির উক্তির আধিক্যই হয়তো এতে বেশী লক্ষিত হ'বে। কেননা, কবি নিজের মনোভাবটি যে-ভাবে প্রাণবন্ত ক'রে, ছবির মতো ক'রে প্রকাশ করেছেন, তেমন-কিছু কারুর কাছ থেকেই আশা করা যায় না। তাই আমার ক্ষুদ্র প্রদীপটি না জ্বেলে প্রদীপ্ত সূর্য্যের আলোর প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

রবীন্দ্রনাথের সহজ সত্যদৃষ্টিতে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির যে-সব গলদ ধরা পড়েছে, শিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও আনন্দহীনতাই তন্মধ্যে প্রধান। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আনন্দহীন, কেননা তা অস্বাভাবিক, আর অস্বাভাবিক, কারণ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন নয়। আনন্দহীনতার অন্যান্য কারণ পরে পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশু যতই ধাত্রীস্তন্য পান করুক শারীরিক পরিপুষ্টি লাভ করা তার পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। মাতৃভাষার রসবঞ্চিত শিক্ষার্থীর অন্তরও অপরিপুষ্ট থেকে যায়। শিক্ষা জিনিসটা আসলে মানসিক আহার ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীর বাঁচিয়ে রাখবার উপায় যেমন ডাল চাল প্রভৃতি আহার্যাদ্রব্য, অন্তর বাঁচিয়ে রাখবার উপায়ও তেমনি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি মানসিক খাদ্য। আহার্যাদ্রব্য পরিপাক লাভ ক'রে রক্তে পরিণত না হ'লে শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে,আর বাইরের প্রাপ্ত শিক্ষাও অন্তরের সঙ্গে এক হয়ে না গেলে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই সৃষ্টি করে বেশী।

মাতৃস্তন্য ব্যতীত শিশু যে তেমন পুষ্টিলাভ করে না তার হেতু এই যে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে শিশুর যে স্বাভাবিক নাড়ীর যোগ আছে, ধাত্রীস্তন্য অথবা অন্য কোন খাদ্যের সঙ্গে তেমন কোন স্বাভাবিক যোগ নেই ; এবং সেজন্য পেট তা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। (পরিণাম উদরপীড়া-পরিপাক-শক্তির অভাব) পেটের মতো অন্তরও সহজে অপরিচিত জিনিস গ্রহণ করতে চায় না, বারবার আপত্তি জানায়। তবু জোর ক'রে ঢুকাতে গেলে অন্তরবিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ ক'রে চিত্তলোকে বিকৃতি দেখা দেয়। মাতৃভাষার সঙ্গে অন্তরের যে সহজ যোগ আছে, বিদেশী ভাষার সঙ্গে সে সহজ সম্বন্ধ নেই। তাই তার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দেবার চেষ্টা অন্তরজগতে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। তা'ছাড়া, দেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে যে আনন্দ ও স্ফূর্তি পাওয়া যায়, বিদেশী ভাষায় তেমন আনন্দলাভ করা অসম্ভব। অবশ্য অনেক বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক আছেন যাঁরা আনন্দ জিনিসটাকে অপ্রয়োজনীয় বাজে ব'লে উড়িয়ে দিতে চান, কিন্তু আসলে তা অপ্রয়োজনীয় নয়, সুগভীর প্রয়োজনীয়। জিহ্বার মজাটা যেমন মজার জন্যই নয়, ভুক্তদ্রব্য হজমের জন্য,—আনন্দ জিনিসটাও, তেমনি আনন্দের জন্যই নয়, শিক্ষাবস্তুর পরিপাকের জন্য। শিক্ষাব্যাপারে আনন্দ জারক-রসের কাজ করে।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হওয়ার দরুণ ছেলেদের পক্ষে চিন্তা ও কল্পনা চর্চ্চা সম্ভব হচ্ছেনা; অথচ এই কল্পনা ও চিন্তাচর্চ্চা ব্যতীত শিক্ষা কখনো সার্থক হ'তে পারে না। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের ঘুমভাঙানো-অন্য কথায় চিন্তা ও কল্পনার উন্মেষসাধন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে বহু সময় ও শক্তির অপচয় হয় বলে ছেলেদের কল্পনা ও মননশক্তি তেমন কার্য্যকরী হয় না। ভাষা শিখতেই তাদের সময় যায়, ভাবচর্চ্চা আর হয়ে উঠে না। স্মরণশক্তি নিয়ে বেশীর ভাগ কাজ করতে হয় বলে মননশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত থাকা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে উঠে। তাই সংগ্রহের কাজটা যেমন চলে, নির্ম্মাণের কাজটা তেমন চলে না; আর সংগ্রহের সঙ্গে নির্ম্মাণ না চল্লে সংগ্রহ যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে, একথা নতুন করে প্রচার করা অনাবশ্যক। কবি বলেছেন : "একতো ইংরাজী ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা—শব্দবিন্যাস পদবিন্যাসের সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে,

সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।" অতএব অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, "অনেকস্থলেই বিশল্যকরণীয় পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরাজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না।" এ অবস্থার বিষময় ফল এই যে জ্ঞান কাণ্ডজ্ঞানে পরিণত না হ'য়ে তা কোষবদ্ধ তরবারির মতো মস্তিষ্কের অন্ধকার কুঠরিতে আবদ্ধ থাকে। অধিকারী তাকে প্রয়োগ করতে পারে না, পারলেও তা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে,--অনেকটা তরবারী দিয়ে নখ অথবা কচুগাছ কাটার মতো। তার কারণ এই যে, জ্ঞানের উপর অধিকারীর সত্যিকার অধিকার নেই; সে জিনিসটা সংগ্রহ করেছে, আয়ত্ত করেনি—সঞ্চিত করেছে, ব্যবহার শিখেনি।

শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে হ'লে অবশ্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-পাঠের মিশ্রণও আবশ্যক। শুধু দরকারী পড়ায় ছেলে ভালো ক'রে মানুষ হ'তে পারে না; শুধু অন্নে পেট ভরলেও প্রাণ তুষ্ট হয় না। কবির সুন্দর উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য : "হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটি শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক।" কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে এই হাওয়া খাওয়ার ভাগ্য বাঙালী ছেলেদের হয়ে উঠে না,—বাজেবই পড়বার ভাগ্য থেকে তারা নিদারুণ ভাবে বঞ্চিত। গুরুমশাই ও অভিভাবক উভয়ই ছেলেদেব হাতে বাজেবই দেখ্‌লে খাপ্পা হ'য়ে উঠেন,—অমূল্য সময়ের এরূপ নিরর্থক অপচয় তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। বাঙালী ছেলেদের এই দুর্দশা দেখে কবি বলেছেন : "বাঙালী ছেলেদের মতে এমনি হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্যদেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষুচর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপক কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মসলা মিশান নাই!' কবির এই সমবেদনপূর্ণ উক্তি যদি আমাদের প্রাণে সহানুভূতি সৃষ্টি না করে, তো বুঝ্‌তে হ'বে, অনুভব করবার স্বাভাবিক শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত—দুঃখ-বেদনার প্রভাব সেখানে সাড়া জাগাতে অপারগ। কিন্তু এখানেও সেই এক অসুবিধা। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন ব'লে পড়বার আনন্দলাভ করা ছেলেদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যে পরিমাণ বাংলা জান্‌লে বাংলা বই পড়ে রসগ্রহণ করা যায়, সে-পরিমাণ বাংলা-জ্ঞান তাদের নেই। আবার ইংরাজী বই থেকে আনন্দলাভ করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা, ছেলেদের ইংরাজী বইগুলি এমন খাস্ ইংরাজিতে লেখা যে, ছেলেদের তো দূরের কথা, মাঝে মাঝে তাদের বাবাদের পক্ষেও বুঝে উঠা কষ্টসাধ্য। অর্থগ্রহণ হয়তো কোন প্রকারে চলে, কিন্তু ইঙ্গিত-গ্রহণ হ'য়ে উঠে না, আর ইঙ্গিত-গ্রহণের মধ্যেই যে রসোপলব্ধি এ-বিষয়ে রসিক মাত্রেই একমত। ছেলেরা ভালো বাংলা জান্‌লে বেঁচে যেতো। কিন্তু বাংলা জানা যে অন্যায়, কাবণ তা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নয়; আর পণ্ডিত না হ'লেও পণ্ডিত হওয়া যে আমাদের সকলের লক্ষ্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জানা নয়, জানার ভান করাই আমাদের উদ্দেশ্য; এবং সেজন্য ইংরাজী যতটা সুবিধার, অন্য-কিছুই ততটা নয়। কারণ ইংরাজীতে সাধারণ কথাটাও আমাদের কাছে অসাধারণ হ'য়ে পড়ে; তাই না স্থানে অস্থানে ইংরাজী বুক্‌নি দেওয়া আমাদের অভ্যাস। বুদ্ধিমানের বুঝ্‌তে দেরী হয় না, বোকার লাগে তাক; আর বোকার সংখ্যাই সংসারে বেশি বলে পড়ে যায় সেসব কথার কথকদের জয়জয়কার! যাক, যা বল্‌ছিলাম। বাংলা ভাষার সঙ্গে ভালো করে পরিচিত নয় ব'লে, ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ করতে পারে না। এবং সে-হেতু তাদের অনুর্ব্বর চিত্তভূমি কোন সুফলও প্রদান করিতে সক্ষম হয় না।*

বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুণ শিক্ষার বিকীরণ সম্ভব হচ্ছে না—শিক্ষা জিনিসটা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না! ধনীর ছেলেরা অবশ্য হর্লিক্‌স বার্লি খেয়ে কোনো প্রকারে টিকে থাক্‌তে পারে, গরীবের ছেলের কিন্তু সে সম্ভাবনা নেই। স্বভাবপ্রদত্ত মাতৃস্তন্য ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা মুশ্‌কিল। অথচ মাতৃস্তন্য থেকে তাদের বঞ্চিত করবার যে ভয়ঙ্কর চেষ্টা চল্‌ছিল, এতদিন সেদিকে কারুর লক্ষ্যই ছিল না। কবি বলেছেন : "বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিক মতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আম্‌দানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়োমনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।" প্রকৃত পক্ষে হয়েছেও তাই; শিক্ষা জিনিসটা বর্ত্তমানে নাগরিক সভ্যতার বিলাসের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাহার আছে, কিন্তু কার্য্যকারিতা নেই; রূপ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হ'লে দেশের কচি তরুণ চিত্তগুলি এমন বিনা আবাদে প'ড়ে থাকত না—সেখানে সোনা ফলাবার বন্দোবস্ত হ'ত। বিদেশ থেকে বিলিতী লাঙল আনা কষ্টকব ব'লে দেশী হালে ভূমিকর্ষণ করব না, এমন

* ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থা যত ভয়ঙ্কর ছিল, বর্ত্তমানে ততটা নয়। নানা শিশুপাঠ্য পুস্তক এখন ছেলেদের চিত্তের সমৃদ্ধিসাধন করছে। ছেলেরা যদি সত্যিকার কিছু শিখে থাকে, তো এসব বাজে বই থেকে ; স্কুলপাঠ্য কাজের বই থেকে নয়।—লেখক।

সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। অথচ শিক্ষাব্যাপারে আমাদের অনেকের মনোভাব যে এই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-জন্যই জনশিক্ষা আমাদের দেশে সম্ভব হচ্ছে না, আর এই জনশিক্ষা ব্যতীত যে একটা জাতিকে মানুষ ক'রে তোলা অসম্ভব, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

অবশ্য মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হ'লে যে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হবে না তা নয়। তবে অসুবিধার তুলনায় সুবিধাই হবে বেশী। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান আপত্তি হ'বে যে, সে-ভাষা পড়বার মতো বইএর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু এই আপত্তি বুদ্ধিমানের চাল ছাড়া আর কিছুই নয়, এর চমক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। স্বরাজ না পেলে যেমন স্বরাজের উপযুক্ত হওয়া যায় না, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন না করলেও তা কখনো আপনা থেকে শিক্ষাদানের উপযুক্ত হ'তে পারে না। জলে না নেমেই যিনি সাঁতার শিখতে চান, তাঁকে খুব বাহাদুর বলা যায়, কিন্তু তাঁর বাহাদুরী এক অবাস্তব খেয়ালের উপর ভর ক'রে আছে, তা আকাশে দুর্গ-নির্ম্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি--আমাদের ভাষার ক্ষমতা অসাধারণ, যে কোন সূক্ষ্ম চিন্তা তাতে সহজেই প্রকাশ করা যায়। কবি বলেছেন : "জাপানী ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশী নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষার অপরিসীম। তা'ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার-প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে, এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ কেবল লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা, তেম্‌নি করা, তেমনি তার ফললাভ।" আইরিশদেরও একদিন আমাদের মতোই অবস্থা ছিল, কিন্তু আইরিশরা প্রবল আন্দোলনের দ্বারা সে-দশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। শুধু কি আমাদেরই মুক্তি নেই? বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হ'লে শুধু যে ছাত্রসম্প্রদায়েরই উপকার হবে তা নয়, সমগ্র দেশেরই তাতে লাভ। কেননা বহু জ্ঞানী ও গুণীর স্নেহদৃষ্টিলাভে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধতর হবে, আর ভাষার উন্নতি যে দেশোন্নতিরই অঙ্গ একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার, বাংলা ভাষাকে যত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল করা যায় ততই মঙ্গল। তা না করে অনুস্বারবিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত করে তুল্‌লে তাও বিদেশী ভাষার মতো দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠ্‌বে। সে-ভাষা হবে কতিপয় সংস্কৃত-জানা লোকের, সমগ্র বাঙালী জাতির নয়।

২

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটা প্রধান গলদ এই যে, তা আইনপ্রধান ও উপকরণবহুল। আইনকে অবজ্ঞা করা কবির উদ্দেশ্য নয়, আর উপকরণের অভাবে যে শিক্ষা সার্থক হতে পারে না, সে বিষয়েও কবি ওয়াকিবহাল। কিন্তু আইন আর উপকরণকে উপায় না করে লক্ষ্য করে তুললেই যত আপত্তির কারণ। আইনকে অবজ্ঞা করলে কারাবাস একথা সত্য, কিন্তু শুধু আইনের ভয়েই যাঁরা ভালোমানুষ তাদেরও তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। ভালোত্ব তখনই সত্যিকার ভালো যখন তা শক্তিরই একটা চমৎকার বিকাশ, শক্তির বিনাশ নয়। "ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" বেঁধে যে ভালোত্বের সৃষ্টি, যা মানুষকে নির্বীর্য্য ও অশক্ত করে শান্তিকামী ভালোমানুষে পরিণত করে, সে ভালোত্বের প্রতি জীবনবাদী অন্যান্য চিন্তাশীলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও নাসিকা কুঞ্চিত করেন। জীবনের আসল কথা হচ্ছে প্রকাশ, আত্মশক্তির উদ্বোধন। আত্মাকে বড় করে না দেখে আইনকে বড় করে দেখলে সে-বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে, মানুষ হয়ে পড়ে কলের মতো নির্জ্জীব জড়, অন্যকথায় আত্মার দিক দিয়ে মৃত। সেই কল মাঝে মাঝে ভালো কাজও করতে পারে; কিন্তু সেই কাজের মালিক সে নিজে নয়, সমাজ; সমাজযন্ত্রীর হাতে সে অসহায় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের অর্থাৎ ভবিষ্য সমাজকর্ত্তাদের এই দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি দিতে চান। আইনের প্রাধান্য নয়, শুভবুদ্ধির জাগরণই তাঁর উদ্দেশ্য। চিত্তের সজীবত্ব যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

আইন আর উপকরণ সংগ্রহ ব্যস্ত হয়ে আমরা কি ক'রে ছেলেদের সজীব অন্তরকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে ফেলি, কবির অনুপম রূপক--গল্প "তোতাকাহিনী" তার চমৎকার নিদর্শন। তোতার শিক্ষার জন্য রাজা হুকুম কর্‌লেন, আর অমনি কর্ম্মচারীবৃন্দ লেগে গেল তার জন্য উপযুক্ত খাঁচা নির্ম্মাণের কাজে। খাঁচা তৈরী হ'লে দেখা গেল, তোতা গেছে মরে, আর তার পেটের মধ্যে গজগজ কর্‌ছে কতগুলি শুক্‌নো পাতা। এই তোতা আর কেউ নয়, আমাদেরই কোমলপ্রাণ শিশু--পৃথিবী আর আকাশ যার জন্য বিরাট খেলাঘর তৈরী করেছে, আর ভুল ক'রে যাকে আমরা চারদিকে দে'য়াল-দেওয়া ঘরে বন্দী করবার চেষ্টা করছি। গল্পটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বিদ্যমান, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই তার লক্ষ্য।

আমাদের মনোভাবের প্রতি দৃক্‌পাত করলে বুঝতে পারা যায়, শিক্ষাব্যাপারে পরিশ্রমটাই আমাদের লক্ষ্য, লাভ নয়। একেবারে 'মাফলেষু কদাচন' গোছের অবস্থা আর কি শিক্ষকও খাটছে, অথচ কিসের জন্য এই খাটা কেউ বলতে পারে না; সকলেই নীতি বজায় রাখছে; কেননা তা না করলে শিক্ষকের পক্ষে চাকরী বজায় রাখা মুশকিল আর ছাত্রের পিঠে পরে বেত্রাঘাত। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের চিত্তের যোগ স্থাপিত না হ'লেও চলে; কিছু চক, কয়েকটি বেত, আর কতগুলি কথা নষ্ট করে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস পরিত্যাগ করতে পারলেই ব্যস্! তাই আজকালকার শিক্ষকের ছাত্র আছে অনেক, কিন্তু শিষ্য নেই একটিও। সম্বন্ধের নিবিড়ত্বের পরিবর্তে এক অস্বাভাবিক দূরত্ব উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। কবি যে স্কুল ও শিক্ষকের দু'টি চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য স্কুল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টারকলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তাহার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।'' আর শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁর উক্তি : ''আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যাইতে পারে।'' কিন্তু এতে ছাত্রেরও দোষ নেই; শিক্ষকেরও দোষ নেই। হেড্‌মাষ্টার বাবু তাদের থেকে এই চান এবং হেডমাষ্টার থেকে ইনস্‌পেক্টর, ইনস্‌পেক্টর থেকে ডাইরেক্টর এই কামনা করেন। আসলে সমস্ত দোষ ঐ কল জিনিসটার। কলের নিয়ম আছে, প্রাণ নেই; বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও প্রাণবর্জ্জিত নিয়মপ্রধান। রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি নির্দ্দেশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন : ''সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে। কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।'' রাশিয়ার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন আমাদের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধেও তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

প্রতিকারস্বরূপ কবি উপকরণের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। সেখানে বৃক্ষলতা, মুক্ত বায়ু, স্বচ্ছ আকাশ, নির্ম্মল জলাশয় প্রভৃতির উদার স্পর্শ মানবমনের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শের অনুসারী। তবে প্রাচীন ভারতের ব'লেই নয়,—সত্য ব'লেই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। কবি বলেছেন : ''মন যখন বাড়িতে থাকে তখন চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশাল ভাবে বিচিত্রভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দিয়া তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে একি নিরানন্দের সৃষ্টি হইয়াছে!'' ফুলের বিকাশের পক্ষে যেমন আলো-হাওয়ার প্রয়োজন, মানবমনের বিকাশের জন্যও তেমনি প্রকৃতির উদার স্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু বিষয়ী অভিভাবক হয়তো একথা কবির খেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেবেন, তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেবেন না। তাই তিনি তাঁদের সম্বোধন ক'রে বলেছেন : ''হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ি, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জ্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, একথা অন্ততঃ লজ্জাতেও বলিয়ো না যে ইহার কোন আবশ্যক নাই—তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশী কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে উপেক্ষা করিয়ো না।''

কবির বিশ্বাস, উন্মুক্ত প্রকৃতিতে লব্ধ শিক্ষা মানবচিত্তকে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলবে, আর এই শিক্ষাই হ'বে সত্যিকার স্বাভাবিক শিক্ষা। অতিরিক্ত বুদ্ধির চর্চা মানুষের চিত্তকে নিরসও ক'রে তুলতে পারে; তাই প্রকৃতির উদার সরস স্পর্শের কাছে আসবার জন্য কবির উপদেশ।

শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, সকল দেশেই আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা এই। আমরা তো সকল বিষয়ে য়ুরোপের নকল করি, কিন্তু সেখানকার বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলিও যে জনবহুল স্থানে অবস্থিত নয়, সে-কথা আমাদের ক'জনের জানা আছে? আর জানা থাকলেও এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করতে চেয়েছি ক'জন? নির্জ্জনতাই তপস্যার উপযুক্ত স্থান, আর শিক্ষা যে তপস্যারই অন্তর্গত একথা নতুন ক'রে প্রচার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শুধু মুক্ত প্রকৃতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হ'বে না,

তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যও আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য কৃচ্ছ্রসাধন বা দেহের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা নয়, চিত্তবৃত্তিকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা মাত্র। সংসারের নানাবিধ তরঙ্গ আমাদের অন্তরকে নিয়ত অস্থির ক'রে তুলে, এই অস্থিরতা অন্তরবিকাশের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা এই বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। কবির শান্তিনিকেতনে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্তে আজকাল নীতিশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হ'য়েছে। কিন্তু তাতে ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ব'লে মনে হয় না। ব্রহ্মচর্য্য মানবাত্মাকে ভিতর থেকে গ'ড়ে তুলে, আর নীতিশিক্ষা মানুষকে কোন প্রকারে ভালো রাখবার চেষ্টা ক'রে মাত্র। এ যেন চোখে দেখে পথচলা নয়, লাঠি দিয়ে হাত্‌ড়িয়ে হাত্‌ড়িয়ে পথচলা।

৩

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার আরেকটা লক্ষ্যযোগ্য বিষয় · প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মিলন--অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান-সাধনার সমন্বয়। অন্তরাত্মার সাধনা প্রাচ্যের একচেটে বস্তু কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে; কিন্তু প্রতীচি যে আজ জড়জগতের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে, সেকথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। জড়দৈত্যকে হাত করেছে ব'লে পশ্চিম আজ সমস্ত বিশ্বকে তার ভোগের বস্তু করে তুলেছে, অথচ আমাদের ভাগ্যে সামান্য শাকান্নও জুটছে না। সেজন্য আমাদের হাহুতাশের অন্ত নেই, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ চিত্ত পশ্চিমের পানে চেয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অনর্থক শক্তির অপচয় করছে। কোন প্রকারে দল বেঁধে জব্দ করতে চাইলেই যে তারা জব্দ হবে তা নয়। যে-বিদ্যার জোরে আজ তারা শক্তিশালী তা আয়ত্ত করতে না পারলে দলবদ্ধতা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য। কবি একটি সুন্দর উপমার দ্বারা কথাটা বলেছেন : "ড্রাইভারের মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চলবে, একথা মনে করা ভুল। বস্তুতঃ ড্রাইভারের মূর্ত্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্চে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই--তাহ'লেই সত্যের বর পাব।" তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বিজ্ঞানসাধনা ছাড়া আমাদের নিস্তার নেই। "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে ব'সে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ ক'রে আমরা প্রত্যেকে যে-কর্ত্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। ...এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।"

কিন্তু যে-বিজ্ঞানসাধনার কথা বলা হ'ল, তাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার অন্যদিকও আছে এবং তাতেই তাঁর পরম কল্যাণ নিহিত। তা অন্তরাত্মার সাধনা। এই সাধনার দিকে লক্ষ্য না রেখে বিজ্ঞানকেই একমাত্র সাধনার বস্তু ক'রে তুললে, মানুষের হাতে কল না ঘুরে' কলের হাতে মানুষ ঘুরলে যে-অবস্থা হয়, সভ্যতারও সে অবস্থা হ'বে। আর অনেকটা হয়েছেও তা'ই। পশ্চিমের সভ্যতা আজ নিজের বেগ সাম্‌লাতে না পেরে যেন পদে পদে হঁচোট খেয়ে পড়ছে; তার পায়ের তলার মাটী স্থির নেই বলে সে যেন ঠিক মতো নাচ্‌তে পারছে না। তবু তার পক্ষে বাহাদুরির কথা এই যে, সে মাটীতে কাত হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে না, পড়তে পড়তে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিচ্ছে।

আমরা প্রাচ্য দেশীয় লোকেরা য়ুরোপের এই দশা দেখে বিজ্ঞের হাসি হাসছি, এবং মনে মনে বলছি : এবার মজাটা দেখ, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়! কিন্তু য়ুরোপের দশা দেখে আমাদের হাস্‌বার অধিকার আছে কিনা ভেবে দেখ্‌বার বিষয়। য়ুরোপের তো রাজসিকতা আছে, আমাদের তো তাও নেই। আধ্যাত্মিকতার নামে আমরা যা চালাতে চাচ্ছি তা তো আসলে তামসিকতারই রকমফের। জড় জগতে অবনতিশীল হ'লেও আত্মার জগতে যে আমরা দিন দিন উর্দ্ধগতি লাভ করছি, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং য়ুরোপের যদি করতে হয় অন্তরাত্মার সাধনা, আমাদের করতে হ'বে অন্তর এবং বাইর উভয়েরই। কেননা, য়ুরোপ যা-হোক্‌ একটা কিছুর সাধনা করেছে, কিন্তু আমরা করেছি সাধনার ভান। রবীন্দ্রনাথ তাই য়ুরোপকে শুনিয়েছেন আত্মার কথা, আর আমাদের আত্মা ও বস্তু উভয়ের। আমাদের বস্তুহীনতা যে আত্মাহীনতা অর্থাৎ জড়ত্বেরই লক্ষণ, এ তত্ত্ব তাঁর নানা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জুগিয়েছে।

৪

এভাবে আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতালাভ করেছে। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতটা ভেবেছেন, কোন শিক্ষাতত্ত্ববিদ ততটা ভেবেছেন কিনা সন্দেহ। শিক্ষাতত্ত্ববিদ্

বড় করে দেখেছেন শিক্ষামন্ত্র, আর রবীন্দ্রনাথ বড় করে দেখেছেন শিক্ষার্থীর অন্তর। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ, আর কোন বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ততা সৃষ্টি করা শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ও অন্যান্য অভিভাবকগণের লক্ষ্য। ছেলে মানুষ হোক, এটাই বড়কথা নয়; কোন্ পথ অবলম্বন করলে সে সহজে টাকা উপার্জ্জন ক'রে সমাজে বরেণ্য হ'তে পারে সেটাই বড়কথা। এভাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা শিশুর অন্তরবিকাশের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়; নিজের অন্তরেব পবিচয় লাভ করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। আমরা যে আজকাল 'শিক্ষা, শিক্ষা' ক'রে চীৎকার করছি, তাও আমাদের সাংসারিক গরজে, শিক্ষার্থীর কল্যাণেব জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ এধরণের শিক্ষার বিরোধী, কারণ তা মানুষের চিত্তবিকাশের পরিপন্থী। চিত্তের বিকাশ ফুলের বিকাশের মতো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র--পরাধীন ও পরতন্ত্র নয়। ফুলের প্রতি জবরদস্তি ক'রে শিলাবৃষ্টি,--আলো হাওয়া তাকে প্রস্ফুটিত ক'রেই তুলে। আমাদেরও আলো হাওয়ার কাজ করা উচিত, শিলাবৃষ্টির নয়। ব্যক্তিগত বাসনার চাপে শিশুর অন্তরের স্বাভাবিক শক্তি যেন নষ্ট না হয়ে যায়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই মতপোষণ করেন। তিনি বলেছেন : "রাজার প্রদত্ত শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, স্কুলের শিক্ষা বা পিতামাতার শিক্ষা, ইহার কোনটারই উপর ছেলেদের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, কেননা প্রত্যেকটাই কোন-না-কোন একটা লক্ষ্যের সাধনের জন্য ছেলেদের তৈয়ারী করে, কিন্তু ছেলেদের নিজের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করে না। রাজা চান ছেলেরা জাতীয় ধনবৃদ্ধির সাহায্য করুক এবং বর্ত্তমান শাসনবিধির পোষণ করুক। যাজক চান ছেলেরা পৌরহিত্যের শক্তি বর্দ্ধিত করুক। স্কুলমাষ্টার চান ছেলে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করুক। পিতামাতা চান ছেলেরা বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। নিজেই নিজের লক্ষ্যের পরিপোষক হইয়া স্বতন্ত্র মানুষরূপে নিজের সুখ ও হিতের দাবী করিয়া বালক গড়িয়া উঠুক ইহা এই সব বাহিরের শিক্ষায় ব্যবস্থা করে না, করিলেও তাহা যৎসামান্যই। বালকের দুর্ভাগ্য এই যে, সে নিজের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত এবং সেইজন্যই বাহিরের জোরজুলুম তাহাকে পাইয়া বসে। .....ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানবের আশা আছে এবং তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করা উচিত, ইহা ধর্ম্মের কথা। এ-দৃষ্টিতে শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষগণ ছেলেমেয়েদের দেখেন না। তাঁরা ছেলেদের দেখেন সমাজকার্য্যের উপাদানরূপে, কলকারখানার ভবিষ্যৎ কর্ত্তারূপে, বা যুদ্ধের সঙ্গীনরূপে। যতক্ষণ না শিক্ষক মনে করেন প্রত্যেক ছাত্রই নিজে নিজের লক্ষ্যসাধক, তাহার নিজের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, কেবল সে সৈন্যদলের একজন নয়, ততক্ষণ শিক্ষক শিক্ষা দিবার উপযুক্তই নন। প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ে জ্ঞানের আরম্ভ হইতেছে মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা। শিক্ষা বিষয়ে ইহাই আবার মুখ্য।" রাসেলের এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। উভয়েই আত্মাকে বড় করে দেখেন।

৫

বলা হয়েছে, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্যসাধনই বর্ত্তমানে আমাদেব সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা সাধন করতে পারে একমাত্র বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্য যে শুধু এইজন্যই প্রয়োজনীয় তা নয়; শিক্ষার অবাস্তবতা দূর করবার জন্যও তার যথেষ্ট প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে যে বাঙালী জীবনের পরিচয় পাই তা যত সহজে আমরা আপনার ক'রে নিতে পারি, ইংরাজী সাহিত্যের চিত্রগুলি তত সহজে আপনার করা যায় না। বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশের সঙ্গে মানসিক আত্মীয়তা স্থাপিত ক'রে আমাদের শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত বাস্তব ক'রে তুলতে পারে। তাই যত শীঘ্র ছেলেদের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা যায় ততই মঙ্গল। তবে পুঁথিগত বিদ্যা কখনো শিক্ষাকে বাস্তব ক'রে তুলতে পারে না। সেজন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হলে, পুঁথি নয়, পুঁথি যার প্রতিবিম্ব সেই জাগ্রত সমাজকে পাঠ্য করে তোলা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের কাছে পুঁথি এত বড় হয়ে আছে যে, সমাজের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের হয় না। অর্থাৎ প্রতিবিম্বই তাদের উপাস্য, আসল বস্তু নয়। আর মুশ্‌কিল এই যে, যে সম্প্রদায়ের প্রতিবিম্ব তারা পেয়ে থাকে, তাও প্রায় সব সময় আমাদের নিজের সমাজের নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের--ভিন্ন পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিত মানবসম্প্রদায়ের। সুতরাং অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া তাদের ভাগ্যের আর কিছু লাভ হয় না। সেই অস্পষ্ট ভাসাভাসা ধারণা সম্বল ক'রে আমরা দারোগা হ'তে পারি, কেরাণী হ'তে পারি, কিন্তু পূর্ণবিকশিত মানুষ হতে পারিনে। প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত শিক্ষা কখনো সার্থক হ'তে পারে না। কবি বলেছেন, "প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই, বন, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জ্জীব ও নিস্ফল হইতে থাকে। অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিস্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন : আমরা নৃতত্ত্ব বা Ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বইপড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত্ত পোত বা গদী রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে--পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।" বাস্তবিক দেশে বাস করলেই দেশকে জানা হয় না, সেজন্য গভীর তপস্যা প্রয়োজন। তীক্ষ্ণ পর্যাবেক্ষণ, দেশের সকল ব্যাপারে সুগভীর মনোনিবেশ নানা জাতি-উপজাতির চারিত্রিক বিবরণসংগ্রহ, এসব সেই তপস্যার অন্তর্গত। "Sympathy is limited by comprehension"--সহানুভূতির মাত্রা জানার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। দেশকে জানিনে ব'লেই দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের স্বদেশপ্রেম আসলে বিলেত থেকে ধারকরা জিনিস, দেশের মাটিতে তার শিকড় নেই। সেই অবাস্তব জিনিস আমাদিগকে কতটুকু ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করতে পারে? যতটুকু করি তাও ইংরাজের উপর রাগ আছে বলেই, দেশকে ভালোবাসি ব'লে নয়। সুতরাং দেশকে শুধু পুঁথির মধ্যে জান্‌লে চল্‌বে না, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তাকে আয়ত্ত করা চাই। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানই হ'বে আমাদের সত্যিকার শিক্ষা--নব নব দানে যা দেশকে সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখার সন্ধানের আলো ফেলে। যখন অনাবিষ্কৃতকে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করা যায়, তখনই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। বইএর জ্ঞান তো চর্ব্বিত-চর্ব্বণ; অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই সত্যিকার নিজস্ব জ্ঞান।

৬

রাশিয়া পর্য্যটনের ফলে কবির মনে জনশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়েছে। জনশিক্ষা ব্যতীত যে দেশের মুক্তি নেই, একথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। 'রাশিয়ার চিঠির প্রায় জায়গাতেই এই শিক্ষার জন্য বেদনা সুস্পষ্ট'.......'রাশিয়া চিঠি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র।' শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি যথার্থই সত্য। রাশিয়াতে জনশিক্ষার জন্য যে উদ্যম ও চেষ্টা চলেছে তা দেখে কবি বিস্মিত--আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাবের কথা স্মরণ করে মর্ম্মাহত। বিদেশে থেকেও স্বদেশের জন্য এই মর্ম্মপীড়া কবির সত্যিকার স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। তিনি বলেছেন : 'আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত--ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয় তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিকর্ম্মা হয়ে না থাকে এজন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু রাশিয়ার জন্যে নয়--মধ্য এশিয়ার অর্দ্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষাবিস্তার করে চলেছে--সায়েন্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্য প্রয়াসের অন্ত নেই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল--এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে তাদের অবস্থা বদলে গেছে, আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।' চেষ্টাবলে কতদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, আর চেষ্টাহীনতার জন্য কত পিছিয়ে থাক্‌তে হয়-যথাক্রমে বর্ত্তমান রাশিয়া ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সাধারণ নিম্নস্তরের মানুষ--কবি যাদের 'সভ্যতার পিলসুজ' বলেছেন--তাদেরও সে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা হয়, একথা পূর্ব্বে কবির বিশ্বাস হ'ত না। কিন্তু রাশিয়া পর্য্যটনের ফলে তাঁর এ-ভ্রম দূর হয়েছে; তিনি বুঝতে পেরেছেন ঐকান্তিক এবং আপ্রাণ চেষ্টার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়--সমস্ত বাধাবিপত্তিই তার কাছে মাথা নত করে।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল, এবং দেখা গেল যে, শিক্ষার অস্বাভাবিকতা, আনন্দহীনতা, অবাস্তবতা ও জনশিক্ষার অভাব আমাদের জাতির প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে আছে। এসব ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীভূত না হলে শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না এবং জাতীয় জীবনে দুঃখরজনীর অবসানে ঊষার স্বর্ণালোক সম্ভোগ করবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা শিক্ষার সমস্ত গলদ তন্ন তন্ন ক'রে দেখালেন। এখন সে-সব দূর করবার ভার আমাদের সকলের উপর। আমরা যেন আমাদের সকল সামর্থ্য দিয়ে কবির অন্তরে বাসনাকে সফল ক'রে তুলি।

"আবদুল্লাহ্"

কাজী আবদুল ওদুদ

১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার-ভোগের পরে কাজি ইমদাদুল হক সাহেবকে দীর্ঘ হাসপাতাল বাস স্বীকার করতে হয়। তাঁর "আবদুল্লাহ্" সেই হাসপাতাল-বাসকালে রচিত। এর দুই বৎসর পরে "মোস্‌লেম ভারতে" ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হ'তে থাকে। প্রায় দেড় বৎসর কাল-স্থায়ী "মোস্‌লেম ভারতে" "আবদুল্লাহ্" যতখানি প্রকাশ করা হয়েছিল বোধ হয় ততখানি লিখেই ইমদাদুল হক সাহেব পাণ্ডুলিপি 'মোস্‌লেম ভারত' সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। এর পরে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙ্গে পড়তে থাকে, তাই এই বইখানি তিনি লিখে শেষ করে যেতে পারেননি। এর ৪১ পরিচ্ছেদের ৩০ পরিচ্ছেদ তাঁর নিজের রচনা। বাকি অংশটুকুর খসড়া তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে সেটুকুকে গল্পের আকৃতি দেবার ভার পড়ে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের উপরে। ৩১ পরিচ্ছেদ থেকে ৪১ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আবদুল্লাহ্‌র ভাষা আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি আরো দুই একজন মুসলমান সাহিত্যিককে নাকি পাণ্ডুলিপি খানি দেখানো হয়েছিল।

রচনার প্রায় পনের বৎসর পরে আবদুল্লাহ্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই দীর্ঘকালে আমাদের ভিতরে কোনো পরিবর্ত্তন যে হয় নাই তা নয়। আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দ্দা-সমস্যা, এখনো মুসলমান-সমাজে আছে; কিন্তু এ সবের উৎকটতার হ্রাস হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, মহাজন-খাতক সমস্যা এসবও নূতন রূপ নেবার পথে দাঁড়িয়েছে। তবু বাংলাদেশের এক যুগের সমাজের এই চিত্রের সত্যকার মর্য্যাদা এতটুকু যে হ্রাস হয়েছে তা নয়। এমন কি এই 'আবদুল্লাহ্' যে দিন বাঙালীর চোখে, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালীর চোখে, অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে সেই দিনই হয়ত বোঝা যাবে তার জীবনের উপরে অজ্ঞানতা যে দুর্য্যোগ-রাত্রির নিবিড়তা নিয়ে জমেছিল তার অবসান হয়েছে।

বলা হয়েছে এ একখানি সমাজ-চিত্র। কিন্তু চিত্রকরের ক্ষমতা যে কত, নানা দিক দিয়ে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। আমরা সেই সম্পর্কে দুই একটী কথা বলতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই চোখে পড়ে বইখানিতে সমস্ত রকমের আতিশয্যের অভাব। আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে সহজেই সে সব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু উৎকটতার প্রলোভন এড়িয়ে চলবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই কাণ্ডজ্ঞান-প্রেমিকের ও কৌতূহল-রসিকের। আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। ২৯ পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ হেড মাষ্টার হয়ে রসুলপুর স্কুলে যাচ্ছেন—গরুর গাড়ীতে। পল্লীগ্রামের পথ বর্ষার অত্যাচারে ভীষণাকার হয়েছে। এক জায়গায় গাড়ী অচল হ'য়ে দাঁড়াল। পাশের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পথ ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যাপার কি দাঁড়াল 'আবদুল্লাহ্'-কারের ভাষায় তার পরিচয় এই ঃ —

....গাড়োয়ান কহিল "হুজুর, আছে এট্টা পথ; কিন্তু সে এক ঠাহুরির বাড়ীর পর দ্যে যাতি হয়। আপনি গে ওনারে এট্টু করে বুলে দ্যাহেন যদি যাতি দেন।"

...আবদুল্লাহ্ গিয়া বৈঠকখানার বারান্দার উপর উঠিল। গৃহমধ্য হইতে শব্দ আসিল—"কে? আবদুল্লাহ্ কহিল,—"মশায় আমি বিদেশী, একটু মুস্কিলে পড়ে আপনার কাছে....." বলিতে বলিতে ঘরে উঠিবার জন্য পা বাড়াইল।

টুপি চাপকান পরিহিত অদ্ভুত মূর্ত্তিখানি সটান ঘরের মধ্যে উঠিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গৃহমধ্যস্থিত লোকটি সত্রাশে "হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি, বাইরে দাঁড়ান, বাইরে দাঁড়ান" বলিতে বলিতে তক্তপোষ হইতে নামিয়া পড়িলেন; আবদুল্লাহ্ অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি পা টানিয়া বারান্দায় সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি চান মশায়?" সেই লোকটি দরজার গবরাটের উপর দাঁড়াইয়' দুই হাতে চৌকাটের বাজু দুটী ধরিয়া একটু রুষ্ট স্বরে এই প্রশ্ন করিলেন।

আবদুল্লাহ্ যথাশক্তি বিনয়ের ভাব দেখাইয়া কহিল,—"মশায় আমি গরুর গাড়ী করে যাচ্ছিলাম, গ্রামের মধ্যে এসে দেখি রাস্তা এক জায়গায় ভাঙ্গা, গাড়ী চলা অসম্ভব। শুনলাম মশায়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি পথ আছে যদি দয়া করে......"

লোকটি রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন—"হ্যা; তোমার গাড়ী চলে না চলে তা আমার কি? আমার বাড়ীর উপর দিয়ে ত আর সদর রাস্তা নয় যে, যে আসবে তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে.....'

আবদুল্লাহ্ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল,—"মশায় বিপদে পড়ে একটা অনুরোধ কর্‌তে এসেছিলাম তাতে আপনি চট্‌ছেন কেন? পথ চেয়েছি বলে ত আর কেড়ে নিতে আসিনি! সোজা বল্লেই হয়, না দেব না!"

"ওঃ, ভারি ত লবাব দেখি। কে হে তুমি, বাড়ী বয়ে এসে, লম্বা লম্বা কথা কইতে লেগেছ ?" . ইত্যাদি।

গাড়োয়ানের সঙ্গে নিজে কাদায় নেমে গাড়ী চালিয়ে নেবার চেষ্টা করে' বিফল হয়ে অবশেষে অন্য গ্রাম থেকে লোক ডেকে এনে এই সঙ্কট থেকে আবদুল্লাহ্ পরিত্রাণ পেলেন। এমন ঘটনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে কি বিষম ফেনিয়ে উঠতে পরে আজকালকার পাঠকদের সে কথা বলবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু এমনি ভাবে বিপদ কাটিয়ে কাজি ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ্ সেই অদ্ভুত লোকটির প্রতি তাকিয়ে দেখ্‌লেন এইভাবে ঃ --

ব্রাহ্মণটি উঠিয়া গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে পান চিবাইতে চিবাইতে ডাবা আবার বাহিরে আসিয়া বসিলেন . .

যাইবার পূর্ব্বে আবদুল্লাহ্ সেই ডাবা প্রেমিক ব্রাহ্মণটির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ঠাকুর মশায় তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন এবং সুস্থচিত্তে ধূমপান করিতেছেন।

এমন বহু চিত্র এই আবদুল্লাহ্' গ্রন্থে আছে যেখানে মুসলমান সমাজের ক্লেদ, হিন্দু মুসলমান-সম্পর্কে ক্লেদ অশেষ দক্ষতার সঙ্গে এই চিত্রকর অনাবৃত করে ধরেছেন। কিন্তু এই সমস্ত মূঢ়তা বর্ব্বরতা ও বীভৎসতার উপরে ফুটে রয়েছে তাঁর হাস্যাটুল কিন্তু প্রীতিময় দুটি চোখ।

চরিত্রাঙ্কনে আবদুল্লাহ্-কারের কৃতিত্ব কতখানি প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ হতে পারে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, ব্যক্তির চাইতে সমাজের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশী, তাই তিনি যাঁদের আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা ব্যক্তি তেমন নয় যেমন সমাজের বিচিত্র গতিভঙ্গির পরিচয় চিহ্ন। এই মতের যথার্থতা অনেকখানি স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। আবদুল্লাহ্‌র পাত্রপাত্রীরা আমাদেরই চার পাশের অতিপরিচিত প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীর দল সন্দেহ নাই, কিন্তু এই চিত্রকরের চোখ দুটি বড় সজাগ, তাই অতি পরিচিতদেরও তিনি মাঝে মাঝে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছেন যে তাতেই এঁদের অনেকের ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে পাঠকদের কৌতূহলের সামগ্রী। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলির ভিতরে 'পূর্ব্বাঞ্চল নিবাসী' মৌলবী সাহেব, বরিহাটী গভর্ণমেন্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, তারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি আবদুল কাদের এম্‌নি ধরণের সৃষ্টি। অতিপরিচিত বলে এঁদের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সম্ভবপর নয়।

'আবদুল্লাহ্'র প্রধান চরিত্র এই ক'জন--আবদুল্লাহ্, সৈয়দ সাহেব, মীর সাহেব, আর ডাক্তার দেবনাথ সরকার। যে বিবেচনায় আমরা আবদুল কাদেরকে অপ্রধান চরিত্র বলেছি সেই বিবেচনা থেকে ডাক্তার দেবনাথ সরকারকেও কেউ যদি অপ্রধান চরিত্র ভাবেন তবে আপত্তি না করলেও চলে। কিন্তু এই ডাক্তারের ভিতরে এমন একটি সহজ সুন্দর নব্য-বাঙালীত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটে উঠেছে যে সেইজন্যই মনে হয়, হয়ত ডাক্তারের ভিতরে রূপ ধরতে চেয়েছে কাজি ইমদাদুল হকের এক সুগভীর আকাঙ্ক্ষা।

আবদুল্লাহ্, সৈয়দ সাহেব, মীর সাহেব এই তিন প্রধান চরিত্রের ভিতরে প্রধানতম কে, এ নিয়ে তর্ক চল্‌তে পারে। আবদুল্লাহ্‌কে সহজেই গ্রন্থের প্রধান ব্যক্তি ভাবা যেতে পারে, কেননা গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাঁর সাক্ষাৎ পাই, আর বহু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হতে পেরেছেন। তাঁর চরিত্রে তেজের চাইতে বুদ্ধি ও ভব্যতার অংশই বেশী, তবু যে-সাফল্য তিনি অর্জ্জন করেছেন তাকে বীর্য্যবন্তের সাফল্যই বলা যায়। কিন্তু যখন ভাবা যায় রক্ষণশীল সৈয়দ-সাহেবের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর চারপাশের জগতের উপর তাঁর প্রভাব, আর সমাজে অপ্রিয় কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিচক্ষণ মীর সাহেবের অনাড়ম্বর কিন্তু সুনিশ্চিত সংস্কার-প্রয়াস ও তাতে অনেকখানি সাফল্য, তখন মনে হয় এই দুই ব্যক্তি অথবা দুই শক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ্-কারের তুলিকার প্রধান বিষয়, --আবদুল্লাহ্, আবদুল কাদের, আবদুল খালেক, রাবিয়া, হালিমা, প্রমুখ মুস্‌লিম নবীন নবীনা হচ্ছেন বাংলার মুস্‌লিমসমাজের এই দুই বিরুদ্ধশক্তির অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ-জাত স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গই অবশ্য ভবিষ্যতের অচঞ্চল আলোকের পূর্ব্বাভাস।

পুরুষ চরিত্রের মতো নারী চরিত্র তেমন প্রস্ফুট করে আবদুল্লাহ্‌কার আমাদের সামনে ধরেন নাই, অথবা ধরতে পারেন নাই। এর প্রধান কারণ মনে হয়, বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা। তবু আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের যে মাধুর্য্যটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম। এই মুস্‌লিম অন্তঃপুরিকাদের দিকে চাইলেই ভাল করে' বোঝা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাহ্যতঃ যতই বিভিন্ন হোক বাস্তবিক পক্ষে তাদের বিভিন্নতা কত নগণ্য--নাই বল্লে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।

আবদুল্লাহ্‌র মতো একখানি সমাজ-চিত্রে বহু প্রাচীন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা জানতে স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়। কিন্তু এই লেখকের যে প্রধান কর্ম্ম, অথবা ধর্ম্ম, চিত্রাঙ্কন এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম তাঁতে ঘটে নাই। হিন্দু ও মুসলমানের কার অপরাধ কতখানি এ চুলচেরা ভাগে তাঁর রুচি নাই, তাদের ভবিষ্যৎ কেমন সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা তাঁর নাই। এক্ষেত্রেও তিনি কাণ্ডজ্ঞানপ্রেমিক ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি। হেড্‌মাষ্টার হয়ে যাবার প্রাক্কালে তাঁর আবদুল্লাহ্ সমাগত ছাত্রদের এই আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছেন--"আশীর্ব্বাদ করি তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও--যে মানুষ হলে পরস্পর

পরস্পরকে ঘৃণা করতে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে' মনে কর্ত্তে পারে.....।

আবদুল্লার ভাষা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মুসলিম বাঙালীরা সদাসর্ব্বদা যে-সব শব্দ ব্যবহার করেন অথচ হিন্দু বাঙালীরা সে-সব শব্দের ব্যবহার করেন না বাঙালা-সাহিত্যে সে-সবের প্রয়োগ কি ধরণের হবে এ-নিয়ে বেশ একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এমন একটি সমস্যা যে উঠেছে এ আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের দূরদৃষ্টি ও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাবেরই পরিচায়ক। কোনো ভাষা মাতৃভাষারূপে লাভ করা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সাধনা-সাপেক্ষ। সেই সাধনার দ্বারা সাহিত্যিক নিজেই ভাল বুঝতে পারেন তাঁর শব্দ-সম্পদ কি ধরণের হওয়া উচিত--চিত্রের কোন্ রূপ ফোটার জন্য কোন্ কোন্ রেখা ও রঙের তাঁর প্রয়োজন। এই ক্ষমতার যেখানে অভাব সেখানে ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো সমস্যাই ওঠে না। চিত্তের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকত্বে ইমদাদুল হকের ত্রুটি ছিল না। সর্ব্বোপরি তিনি বাঙলার সন্তান। তাই তাঁর রচনা সহজেই হয়ে উঠেছে সাহিত্য ও খাঁটি বাংলা ভাষা--যে জীবনের চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও তা অকৃত্রিম বাংলা ভাষা ভিন্ন আর কিছু নয়।--বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অবকাশ এখনো প্রচুর, তাই কোন্ কোন্ অপরিচিত পথে পদচারণা করে' সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করবেন সে-সবের আবিষ্কার সম্ভবপর কেবল তাঁদেরই ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা।

আনোয়ারুল কাদীর সাহেব আবদুল্লার শেষ কয়েক পরিচ্ছেদ লিখেছেন বলা হয়েছে। সে-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে আমার এই আলোচনা শেষ করছি। কাজি ইমদাদুল হক প্রধানতঃ চিত্রকর, আর আনোয়ারুল কাদীর প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক। তাই দুজনের রচনারীতির পার্থক্য সহজেই প্রস্ফুট হয়েছে। তবে দুটি পরিচ্ছেদে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বেশ। সেই দুটি পরিচ্ছেদের একটি হচ্ছে সালেহার মৃত্যু-বর্ণনা, অপরটি মীর সাহেবের অন্তিমকালের বর্ণনা। ইমদাদুল হক সাহেবের আঁকা সালেহা যেন প্রাণলেশবর্জ্জিত, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পিতার বিচারহীন মতবাদের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই আচার-অনুষ্ঠানের স্তবকের ভিতরেও আনোয়ারুল কাদীর সাহেব একটি ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছেন, তারই সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র কর্ম্মবহুল পরিশ্রান্ত জীবন ঈষৎ প্রেমসুধাস্পর্শে ক্ষণকালের জন্য একটু নূতন রকমের করে' তুলেছেন। সমাজের নিদারুণ বিরুদ্ধতায় সবল ও বিচক্ষণ মীরসাহেবও শেষে কেমন ভেঙে পড়েছেন সে-চিত্রটিও তিনি মর্ম্মস্পর্শী করে আঁকতে পেরেছেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের নিষ্ঠা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রতি একটু সদয় বা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি যে সফল-প্রযত্ন হতে পেরেছেন তা মনে হয় না। যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় সৈয়দ সাহেবের চরিত্রে নিষ্ঠা থাকলেও সে নিষ্ঠাকে ইমদাদুল হক সাহেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই, কেননা এই নিষ্ঠার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশেছে, বিষম আত্মপরায়ণতা। ভবিষ্যৎদৃষ্টির একান্ত অভাব, ও যা আছে বা ছিল তার জন্য প্রচণ্ড মোহ, অন্যকথায় আত্মম্ভরিতা, মনে হয়, এরই উপরে সৈয়দ সাহেবের চরিত্রের ভিত্তি। তাঁর নিষ্ঠা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এরই আনুষঙ্গিক; তাঁর স্বভাবদত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিও এই আত্মম্ভরিতার কুহক থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে নাই। এই সৈয়দ সাহেবেরা মুসলমান সমাজে বিরল নন আদৌ। এমন উৎকট আত্মম্ভরিতা মুসলমান চরিত্রে কেন এমন প্রবল হলো তার কারণ নির্ণয় চেষ্টার অবকাশ এখানে নাই; কিন্তু সমাজের এই দারুণ ক্ষতস্থান কাজি ইমদাদুল হকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এ সম্ভবপর নয়।

'মুসলিম কালচার' নামে যে সুন্দর কিন্তু সাড়ম্বর 'মোগল কালচারে'র ধ্বংসাবশেষের প্রতি আজও বাংলার শিক্ষিত মুসলমানের অনুরাগের অন্ত নাই তারও প্রতি আবদুল্লাহ্-কারের মনোভাব বেশ বুঝে দেখবার মতো। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনো শ্রেণীর মোহই যেন তাঁর জন্য প্রবল নয়। তিনি কাম্য জ্ঞান করেছেন বুদ্ধি-ও-সুরুচি-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা--এইই মনে হয়।

হয়ত আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবেরও যথেষ্ট বক্তব্য আছে, আর সেসব জানতে পারলে আমরা লাভবানই হব। তবু বইখানির ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইমদাদুল হক সাহেবের মূল খসড়াটি পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত থাকা সমীচীন মনে করি। পরে পরে এ বইখানি আরো বহু আলোচকের আলোচনার বিষয় হবে সন্দেহ নাই, তাঁদের জন্য এমন একটি পরিশিষ্টের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

এতদিনে বাংলার পাঠক সমাজে বইখানির প্রচার কেমন হয়েছে জানি না। বলা বাহুল্য বহুল প্রচারেরই এ যোগ্য, আর তার জন্য নানা ধরণের চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। এতে অবশ্য বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যে তাঁদের কোনো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত চিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করবেন তা নয়। তবে প্রতিভার যাদু স্পর্শে পরিচিত চিত্রও অনেক সময়েই হয় দর্শকদের দৃষ্টিতে ও চেতনায় অভিনবত্ব সঞ্চারের সহায়ক।

আবদুল্লাহ--স মার্জ্জচিত্র : মরহুম খানবাহাদুর কাজি ইমাদাদুল হক প্রণীত মূল্য দুই টাকা। (বৈশাখ--আষাঢ়, ১৩৪১)

বিষাদ-সিন্ধু

কাজী আবদুল ওদুদ

অনেকের ধারণা, মীর মোশার্‌রফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' 'জঙ্গনামা' ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধু ভাষায় রূপান্তর মাত্র। লেখক নিজে বলেছেন : "পারশ্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ সিন্ধু' বিরচিত হইল।" তা উপকরণ যেখানে থেকেই তিনি সংগ্রহ করুন, এই বইখানিতে তাঁর যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য-সাধারণ।

পুঁথি-সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু' লেখকের বড় মিল হয়ত এইখানে যে দৈব-বলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাস তাঁরও ভিতরে প্রবল দেখা যাচ্ছে। দৈববলে বিশ্বাস মাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষার্হ নয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানতার ও ভয়বিহ্বলতার, তখন এ হয়ে ওঠে জীবনের জন্য অভিশাপ, সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্ছিত। এই বিশ্বাসের জন্য 'বিষাদ-সিন্ধু'-কারের সাহিত্যিক ক্ষমতা যে অনেক জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে' ধর্ম্ম-বোধ সম্বন্ধে অতি-অকিঞ্চিৎকর ধারণার পরিচয় তিনি যে অনেক জায়গায় দিয়েছেন, সে-সব সবিস্তারে বল্‌বার প্রয়োজন করে না।

অথচ জীবন, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। আজরের মুখে তিনি বলছেন : "ধার্ম্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক।" মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তার পরিচয়ও যথেষ্ট।

তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা আর ধর্ম্ম পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস, এই দুইয়ের ভিতরে যে কোন একটি বিরোধ দেখা যাচ্ছে, এটি তাঁর সম্বন্ধে বেশ ভাববার বিষয়। শোনা যায়, বহু সাহিত্য-ব্রতীর মতো তাঁরও যৌবন উচ্ছৃঙ্খলতায় কেটে ছিল। হতে পারে; 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তাঁর যে নিয়তি-পূজা দেখা যাচ্ছে, এ সেই উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রতিক্রিয়া। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষ করে' তাঁর "গাজী মিঞার বস্তানি" খানি পাওয়া গেলে তাঁর চিত্তের পূরোপূরি পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হতো। যাইই হউক, তাঁর এই অসার্থক নিয়তি-পূজার কথা ভুলে তাঁর সাহিত্যিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ যাতে লাভ হয়েছে তারই অনুসরণ কর্ত্তব্য।—কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, কারবালার নিদারুণ প্রান্তরে কাসেম ও ইমাম হোসেনের যে বীরমূর্ত্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা তাতে প্রকট। কিন্তু এখানে নিয়তির লীলা না দেখে মানবজীবনের এক করুণ কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতির কথাও ভাবা যেতে পারে। ইমাম পরিবার ও তাঁদের সহচরবর্গ যে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় কারবালায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এ তাঁরা জানেন, কিন্তু বাস্তবিকই তেমন গভীর করে' জানেন না; কারবালায় তাঁদের অবস্থিতি এক সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিতি মাত্র।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মীর মোশার্‌রফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে' দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী—অবশ্য কিছু বেশী বাক্-বাহুল্য তাঁতে আছে; তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর নিবিড়তম যোগ মধুসূদনের সঙ্গেই। বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লিখিত হলেও গদ্য-লেখকের পরিচ্ছন্নতা লেখকের দৃষ্টিতে নাই—তাঁর চোখে বরং কবির স্বাপ্নিকতা; আর এঁর যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যেমন এজিদ-চরিত্র, এমাম-হোসেন কাসেম ও মোহাম্মদ হানিফার বিক্রম, সবই কাব্যসৌন্দর্য্য-মাখা।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মাঝে 'বিষাদ-সিন্ধু'র উপরে পড়েছে শুধু তাই নয়, 'মেঘনাদবধে'র দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ, তাঁর শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখও তেমনি অফুরন্ত। রাবণের মতনই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু তাঁর কামনার ধন জয়নাবকে তিনি যে লাভ করতে পারেন নাই এই দুঃখে তাঁর সমস্ত শক্তি বিপর্য্যস্ত—অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়। তেম্‌নিভাবে 'মেঘনাদবধে'র সীতা-চরিত্রের মাধুর্য্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদ-সিন্ধু'র জয়নাব-চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে

জয়নাবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তার সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস--একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদসিন্ধু'-কারের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কারণ। এই ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই তাঁর গ্রন্থে চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিকল্পনার পরিচয় যথেষ্ট থাক্‌লেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে। এরও মধ্যে যাঁদের তিনি দোষে-গুণে মানুষ অথবা বিচক্ষণ সাংসারিক মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদ ওৎবেঅলীদ আবদুল্লাহ্-জেয়াদ মার্‌ওয়ান জাএদা গাজী রহমান, তাঁরা অনেকাংশে এক একটি স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু যাঁদের তিনি ধার্ম্মিক অথবা আদর্শস্থানীয় মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদের পিতা মাবিয়া ইমাম পরিবারের নরনারী মদিনাবাসিগণ ও মোহাম্মদ হানিফার যোদ্ধৃবৃন্দ, তাঁদের বীরত্বের প্রকাশ মাঝে মাঝে মনোরম হলেও ইমাম হাসান ও জয়নাব ব্যতীত তাঁরা প্রায় সবাই মোটের উপর কথা ও ধর্ম্মাচারের সমষ্টি-মাত্র হয়ে উঠেছেন। জয়নাবের কথা আগেই বলা হয়েছে; ইমাম হাসানের চরিত্র বাস্তবিক বড় মধুর করে' 'বিষাদসিন্ধু'-কার এঁকেছেন। যে-বৃদ্ধ নিজের মনের বিষে তাঁকে বর্শা ফেলে মেরেছিল তার প্রতি ও তাঁর প্রাণঘাতিনী স্ত্রী জাএদার প্রতি তাঁর যে ব্যবহার তা বড় সৌজন্যময়। সেকালের পীর-বাদ ও সুফীমত-বাদ-প্রভাবান্বিত সম্ভ্রান্ত মুস্‌লিম পরিবারে লেখকের জন্ম, ইমাম হাসানের চরিত্রে যে স্নেহ ও সৌজন্য তিনি অঙ্কিত করতে পেরেছেন তা আমাদের একালের ওহাবী-প্রভাবান্বিত সমাজে দুর্লভ হলেও সেকালের সমাজে তেমন দুর্লভ ছিল না।--চরিত্রের পরিকল্পনায় এই লেখকের একটি বিশেষ কৃতিত্বও প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর সমস্ত নায়ক-নায়িকাই স্বাভাবিক মানুষ, এক সীমার ব্যতীত অমানুষ "শয়তান" কেউই হয়ে ওঠে নাই--যদিও 'শয়তান' বিশেষণে তিনি বহু নায়ক-নায়িকাকে বিশেষিত করেছেন। চরিত্র হিসাবে সীমারে অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নাই, সে যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র মাত্র।

জনসাধারণের যে সমাদর, এই শক্তিমান সাহিত্যিক নিজের বলেই তা লাভ করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে' তাঁর প্রতিভার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধানিবেদন এখন সাহিত্যরসিকদের কর্ত্তব্য। তাঁর ছোট বড় তিন চারখানি বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তার প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু সাহিত্যিক শক্তির চিহ্ন বিদ্যমান দেখেছি। দোষে গুণে মীর মোশাররফ হোসেন বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

আলমগীরের পত্রাবলী

[আলমগীরের পত্রাবলী শ্রী যামিনী কান্ত সোম প্রণীত, মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট ১৬-১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা। ৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ, গেটআপ সুন্দর।]

ইংরেজ ঐতিহাসিক লেনপুল ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "মহীয়ান মোগল সম্রাটদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে ক্ষমতাশালী; তাঁর সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনী দুইই ছিল আকবরের সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনীর চেয়ে বড়। তাঁর অগণিত প্রজা— তাদের উপর তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁর কথার উপর কথা বলবার অধিকার ছিল না কারো। আকবর যাহা করিয়াছেন উদার রাষ্ট্রনীতির মধ্য দিয়া, শাহজাহান যাহা করিয়াছেন ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যবলের দ্বারা, আলমগীর তাহা করিয়াছেন কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের জোরে। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বের অধিকাংশ সময় লোকে তাঁহাকে যে ভাবে ভয় করিয়াছে এবং মানিয়া চলিয়াছে তেমন আর কাহারও ভাগ্যেই ঘটে নাই। শাসন ক্ষমতাও তাঁহার ছিল সব চেয়ে বেশী।"

আওরঙ্গজেবের ত্রুটি ছিল না এমন কথা বলি না— ত্রুটি সকলেরই থাকে। তাঁর ধর্ম্মের গোঁড়ামি সেকালে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি যদি সংস্কারমুক্ত হইতে পারিতেন, পরিচ্ছন্ন চিন্তা যদি তাঁর থাকিত, ভারতের ইতিহাস আজ হয়ত অন্যভাবে লিখিত হইত।

কিন্তু শত ত্রুটি স্বত্বেও বলিতে পারা যায় ইতিহাস আওরঙ্গজেবের প্রতি সুবিচার করে নাই। মেনুকি, বার্ণিয়ার প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকগণ (সত্যিকাবের ঐতিহাসিক তাঁদের বলা যায় না) যে কলঙ্ক 'শেষ মহীয়ান মোগলের' চরিত্রে লেপন করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস এখনও তাহাই বহন করিতেছে। এমন কি অধ্যাপক যদুনাথ, যিনি আওরঙ্গজেবের ইতিহাস আলোচনায় জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান অংশ ব্যয় করিয়াছেন তিনিও, সব সময় সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যাক সে কথা।

'আলমগীরের পত্রাবলী'র কথাই বলি। আমাদের লেখকগণ যাঁহারা আওরঙ্গজেবের যুগের আলোচনা করেন তাঁহাদের অনেকেই নির্ভর করেন বিদেশী লেখকদের লেখার উপর। সমসাময়িক ফারসী ইতিহাস এবং বিশেষ করিয়া আলমগীরের ফরমান ও পত্রাবলী হইতে উপকরণ লইয়া যদি বিচার করা হইত, তাহা হইলে আওরঙ্গজেবকে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত।

আওরঙ্গজেবের পত্রগুলি সাধারণতঃ তিনি শাহজাদাদের এবং প্রাদেশিক সুবাদার ও ওমরাহ্‌দের নিকট লিখিয়াছেন। কোন কোন পত্র বাদশার নিজ হাতে লেখা, আবার কোনখানি বা বাদশা বলিয়া গিয়াছেন খাশ মুন্‌শী লিখিয়াছেন। বেশীর ভাগ চিঠিরই বিষয় বস্তু হইতেছে : আদেশ, নিষেধ, শাহজাদা ও আমীর ওমরাহ্‌দের তারিফ নিন্দা, শাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে উপদেশ এবং ধর্ম্ম সম্পর্কীয় আলোচনা। আওরঙ্গজেবকে বুঝিতে হইলে—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন জানিতে হইলে জানিতে হইবে এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়াই। ভাষা ও ষ্টাইলের দিক দিয়াও চিঠিগুলির দাম কম নয়। আওরঙ্গজেব ছিলেন কাজের লোক। অল্প কথায় চমৎকার বাদশাহী ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের দিক দিয়া এই চিঠিগুলির দাম কতখানি ঐতিহাসিকদের অজানা নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন কি ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে এই সব চিঠি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। তবে সংগ্রহ করা এক কথা, কাজে লাগানো অন্য কথা। আওরঙ্গজেবের চরিত্র আলোচনার সময় ঐতিহাসিকগণ অনেক সময়ে চিঠিগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমকে ধন্যবাদ— তিনি বাঙ্গালী পাঠকদের 'ভুবনবিজয়ী' বাদশার ব্যক্তিজীবন ও চরিত্রকে আংশিকভাবে বুঝিবার সুযোগ দিয়াছেন। 'আলমগীরের পত্রাবলীতে' 'রুকাইয়াৎ-ই-আলমগীরী' হইতে সংগৃহীত যে চিঠিগুলি স্থান পাইয়াছে তাহাতেই বাদশার চরিত্রের বিভিন্ন দিক উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যত্বের বেদনাবোধ, ক্ষমা, অনাড়ম্বর জীবন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য সত্যিকারের আগ্রহ, যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা—এসবের পরিচয় চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে।

আলমগীরকে লোকে কঠিন-হৃদয় শাসক বলিয়াই মনে করে। তাঁর চিঠিগুলি পড়িলে মনে হয় প্রজা-সাধারণের মঙ্গল-

সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি তাঁর পুত্রকে লিখিতেছেন

"মনে রাখিও, পুত্র, তোমার এবং আমার হিসাব নিকাশ আর একজন পাকা হিসাবী রাখিতেছেন—তাঁহার হিসাবের খাতায় অত্যাচারের জমা-খরচ দস্তুর মত হইতেছে। তোমাকে জানাইতেছি পুত্র, অবিলম্বে অত্যাচারগ্রস্ত প্রজাগণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কর—স্বয়ং তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর! ইহার অন্যথা-চরণ করিলে তোমার নিকট হইতে জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং জানিও তোমার এই ক্ষতি দ্বিতীয়বার পূরণ করা হইবে না।

তোমার নিয়োজিত চরগণ তোমাকে আসল খবর মোটেই দেয় না। পুত্র, রাজকার্য্যে অবহেলা এবং অমনোযোগ রাজধর্ম্ম নয়।"

শাসন-ব্যাপারে রাজর্ষি ওমর ফারুক ছিলেন আলমগীরের আদর্শ। শাসনকর্ত্তা নিয়োগকালে ওমরের মত আওরঙ্গজেবও তাহাকে নানা প্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ করিতেন। তার মধ্যে দুইটি সর্ত্ত এইরূপ

'দরবারের প্রবেশদ্বারে কোনরূপে পাহারা থাকিবে না, যাহাতে প্রজাগণ বিনা বাধায় তাহাদের অভাব অভিযোগ দরবারে পৌঁছাইতে পারে। প্রজা-সাধারণের হিতার্থে তিনি তাঁহার যাবতীয় সময় নিয়োজিত করিবেন। তাঁহার নিজের ও পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য কখনও রাজকোষ হইতে কোন জিনিস তিনি লইবেন না।' ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে নূতন শাসন-পদ্ধতি স্থির করিবার সময় ইংরেজরা মোগল-শাসনের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাপালন, কর্ম্মচারী-নিয়োগ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁহারা যদি আওরঙ্গজেবের নীতি অনুসরণ করিতেন সুখের বিষয় হইত।

অনেকের ধারণা আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়। খাফী খাঁ সত্যই বলিয়াছেন "আওরঙ্গজেব শাস্তি খুব কমই দিয়াছেন। শাস্তি না দিয়া দেশ শাসন করা সম্ভব নহে।" আওরঙ্গজেব বারবার তাঁর পুত্রদের মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করিতে এবং শত্রুকে ক্ষমা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আলমগীরের মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁর পুত্রকে লেখা চিঠিগুলি বড় করুণ! "আসিয়াছিলাম রিক্ত হস্তে, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেছি পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া।.......উদিপুরী বেগম, তোমার মাতা—আমার পীড়ারও অংশ-ভাগিনী হইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় হিন্দু সতী-নারীর ন্যায় আমার সহিত তিনি সহমৃতা হইবেন। .....আমার অবর্ত্তমানে আমার বিপুল বাহিনী ও বিশ্বস্ত অনুচরগণ যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সুপরিচালিত হইবে না। ......আমার শেষ অভিপ্রায় পালন করিও। যাহাতে অনর্থক রক্তপাত হয় এবং মুসলমানগণের যাহাতে জীবন নষ্ট হয় সেরূপ ঘটনা রহিত করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।......পুত্র, আত্মীয় স্বজন এবং ভৃত্যগণ ভণ্ড এবং কপটাচারী হইলেও তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে পদচ্যুত বা কোনরূপে নিগৃহীত করিও না। পুত্র, মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। বিদায় পুত্র বিদায়।"

সোম মহাশয়ের অনুবাদে কয়েকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল—যেসব ত্রুটি হইতে অনুসলমান লেখকগণ অনেকেই মুক্ত নহেন। প্রথমতঃ তিনি আরবী শব্দগুলির বানান ঠিকভাবে লিখিতে পারেন নাই—সায়েদ আল্লাখাঁ, আটিক আল্লা খাঁ, সুরত-ই-ইখালাস, সুরত-ই-সফায়া (কোরাণের সুরা?) আব্রাহাম খাঁ, আমন আল্লা, শাহীবাবাদ—এই শ্রেণীর বানান অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। তা ছাড়া "দ্বিপ্রহরের নামাজ", "সান্ধ্য উপাসনা", "ন্যায়পরায়ণ জগদীশ্বর" "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মোল্লাদিগের নমাজের শেষ চীৎকার"—এসব কথাও আলগীরের পত্রের উপযুক্ত হয় নাই। যিনি যে বিষয় লিখিবেন, সেই বিষয়ের atmosphere এর সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি পরিচিত হওয়া উচিত। বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারিলে সাহিত্যে কখনো সাফল্য লাভ করা যায় না।

এই শ্রেণীর কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও আলমগীরের পত্র বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন দিক খুলিয়া দিল, বলা যাইতে পারে। আওরঙ্গজেবের অন্যান্য পত্র, ফরমান, এবং অন্যান্য মোগল বাদশাদের রোজনামচা ও আত্মজীবনী হইতে সংগ্রহ ইত্যাদি যদি কেহ ভবিষ্যতে প্রকাশ করেন, বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্

'আয়না'

আয়নুল হক্ খাঁ

(আয়না — আবুল মনসুর আহ্‌মদ, বি. এল্.। প্রকাশক : মোসাম্মাৎ আকিকুন্ নেসা, ময়মনসিংহ। প্রথম সংস্করণ, ১৬৮ পৃষ্ঠা। দাম পাঁচ সিকা।)

মানুষ ঠাট্টা-মশ্‌কারি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তিন কারণে। সে কখনো বিদ্বেষ, বা অভিমানের বশে অন্যকে চিম্‌টী কাটিয়া নিজে হাসে, অপরকেও হাসায়। কখনো বা অত্যন্ত সদুদ্দেশ্য লইয়া কাহাকেও ব্যঙ্গের আঘাত দেয় তাহার ত্রুটী সংশোধনের জন্য। আবার কখনো এমনিই — উদ্দেশ্যহীনভাবে — খানিক রগড়ের আশায় চিম্‌টী কাটে, কান মলিয়া দেয়, হয় তো তার চেয়েও গুরুতর কিছু করিয়া বসে। এই তিনভাবের তিনটী ব্যাপারকে আলাদা আলাদা তিনটা নাম দেওয়া চলে : বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও কৌতুক।

আবুল মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের 'আয়না' ব্যঙ্গের পর্য্যায়ভুক্ত। মিঃ আহ্‌মদ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান্ ব্যঙ্গ রসিক। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যঙ্গসাহিত্য এখনো আমাদের দেশে যথেষ্ট বিকশিত নয়। এই ব্যাপারে যাঁহাদের নাম বাঙালী সমাজে সুপরিচিত, তাঁহারাও সর্ব্বত্র খুব পাকা হাতের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিলে হয়তো সত্য বলা হয় না। এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কেননা এদেশে সাহিত্য চর্চ্চার এখনো যে অবস্থা, তাহাতে অত্যন্ত উঁচু আদর্শের জিনিস বেশী তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তথাপি আবুল মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের রচনা পাঠ করিয়া খুশী হইতে হয়। 'আয়না'য় প্রতিফলিত বিভিন্ন চিত্রগুলি আমরা পূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় দেখিয়াছি এবং দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছি। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুণী তাঁহার একটী রচনা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন : এটা দেদার ফূর্ত্তি করিয়া লেখা। হয়তো তাই। কিন্তু এই উদ্বেল আনন্দের পশ্চাতে রহিয়াছে অসীম বেদনা, সমাজের পাতিত্যে সুগভীর ব্যথা বোধ। তাই 'আয়না'র ছবিগুলি দেখিয়া পাঠক যখন হাসির হুল্লোড়ে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে চাহিবেন, তাঁহার অন্তরে করুণ হইয়া বাজিতে থাকিবে একটী বিষাদের সুর। তিনি দেখিবেন: 'আয়না'র ছবিগুলির যিনি চিত্রকর, তিনি বাহিরে বাহিরে হাস্যরসিক, অন্তরে তাঁর কঠোর কল্যাণের তপস্যা। ঋষির দৃষ্টি নিয়া তিনি আমাদের কলঙ্কিত জীবনের যে-সব বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন, তারা সবগুলিই তাঁহার সহজ নিপুণতায় পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'আয়না'র ফ্রেম বাঁধিতে গিয়া নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন : "আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে স্বরোদ বাজাতে দেখেছিলুম। সেদিন সেই ওস্তাদের হাত-সাফাই দেখে তাজ্জব হয়েছিলুম; আর আজ বন্ধু আবুল মনসুরের হাত-সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান ম'লে রস-সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। ... বন্ধুবরের এ রসাঘাত কশাঘাতের মতোই তীব্র ও ঝাঁঝালো; কাজেই এ রসাঘাতের উদ্দেশ্য সফল হবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে।" আমরাও সেই আশা করি।

(বৈশাখ—১৩৪৪)

'মুহ্‌সিন' ও 'আমীর আলী'

[মহামানুষ মুহ্‌সিন : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত। মূল্য বার আনা। আমীর আলী: হবীবুল্লাহ্‌ প্রণীত। মূল্য আট আনা। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ২৩ ক্রেমেটোরিয়াম স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। উন্নত জীবন গ্রন্থমালা।]

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ প্রণীত 'আমীর আলীর' ভূমিকায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব লিখিয়াছেন "আমাদের সমাজে কিছুকাল ধরে কোন গগনচুম্বী প্রতিভার জন্ম হয় নাই সত্য; কিন্তু ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে সাহিত্যে যে সব গুণী একালে আমরা পেয়েছি তাঁদেরও যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ভালমন্দ সম্বন্ধে সজাগ হবার কোনো প্রয়াস আমাদের ভিতরে দেখা গেছে কি?" প্রশ্নটি গুরুতর সন্দেহ নাই। যে সমাজে প্রতিভার জন্ম হয় না, যে সমাজে গুণের সমাদর নেই, যে সমাজ তার চিন্তা-নায়কদের সম্বন্ধে সজাগ নয়, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হইয়া উপায় কি? তবে কথা হইতেছে এই, "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ভালমন্দ সম্বন্ধে সজাগ হবার কোন প্রয়াস" আমাদের ভিতরে দেখা যাইতেছে না একথা সত্যি নয়। সামান্য ভাবে হইলেও প্রয়াস যে শুরু হইয়াছে বুলবুল পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত সমালোচ্য বই দু'খানি এবং উন্নতজীবন গ্রন্থমালা পড়িলেই তা বেশ বোঝা যাইবে।

হাজী মুহ্‌সিন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ দানবীর, আর আমীর আলী ছিলেন জ্ঞানবীর—এঁরা শুধু বাঙ্গলার নন, শুধু মুসলমান সমাজের নন—এঁরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের।

হাজী মুহ্‌সিনের দানের কথা বাঙ্গালী এখনো ভুলিতে পারে নাই। তাঁর অর্থে প্রতিষ্ঠিত মুহ্‌সিন ফাণ্ড প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য পান নাই বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে এমন শিক্ষিত লোক বিরল। বিচারপতি আমীর আলী সাহেবও মুহ্‌সিনেরই অর্থ-সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শুধু দানশীলতা নহে—"তাঁহার পরদুঃখকাতর নিরহঙ্কার চিত্ত, ধার্ম্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব উদার দৃষ্টি, তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান, ভুয়োদর্শন, দৈহিক-শক্তি-সকল বিষয়েই তিনি সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে ছিলেন।"

মুহ্‌সিন ভাল লাঠি খেলা ও তলোয়ার খেলা জানিতেন। সাহিত্যিক প্রতিভাও তাঁর কম ছিল না, হাতের লেখা ছিল তাঁর মুক্তার মতো সুন্দর। ৭২ কপি কোরান তিনি নকল করিয়াছেন এবং এক একখানি হাজার টাকায় বিক্রী হইয়াছে।

দেশভ্রমণ করিয়া জ্ঞানের পরিধি মুহ্‌সিনের অসাধারণ বকম বাড়িয়া গিয়াছিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মক্কা, মদিনা, কায়রো, নজফ, প্রভৃতি মুস্‌লিম জগতের জ্ঞানকেন্দ্র সমূহ ঘুরিয়া "সংখ্যাতীত ছোট বড় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আপনাকে তিনি বিকশিত করিয়াছিলেন।"

দুঃখের বিষয় মুহ্‌সিনের জীবনীর উপকরণ যথোপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় নাই। তাঁর ষ্টেটের মতোওয়াল্লীগণ, গবর্ণমেণ্ট রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট, ইমামবাড়া-কমিটি, হুগলি কলেজ অথবা মুহ্‌সিনের টাকায় মানুষ হইয়াছেন এমন কোন গুণী ব্যক্তি—কেহ এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। মুহ্‌সিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাঁর হাতের লেখা কোরান এসব ইমামবাড়ায় রক্ষিত ছিল শোনা যায়। কিন্তু এখন এ সবের সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্টই অবকাশ আছে।

মুহ্‌সিনের টাকার অপব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে কেবল হতভাগ্য মতোওয়াল্লীরাই দায়ী তা নয়, গবর্ণমেণ্টেরও দায়িত্ব এ বিষয়ে যথেষ্ট। মুহ্‌সিনের সম্পত্তির উদ্বৃত্ত টাকা হইতে হুগলি কলেজের সূত্রপাত হয়। সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর যাবত এই কলেজের জন্য মুহ্‌সিন ফাণ্ড হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইতে। কলেজের নাম ছিল প্রথমে হুগলি মুহ্‌সিন কলেজ। পরে, কিভাবে বলা মুশ্‌কিল, মুহ্‌সিনের নাম বাদ পড়িয়া যায়। বাঙ্গলার প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র,

ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালী মনীষীরা মুহ্সিন কলেজে মুহ্সিনের অর্থে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম প্রথম কয়েক শত ছাত্রের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল অমুসলমান। তহবিল তসরূপ ছাড়াও এইরূপ নানাভাবে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত মুহ্সিনের টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের প্রতিবাদের দিকে কর্ণপাত করা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নাই। উইলিয়াম হাণ্টার এ বিষয়ে তাঁর পুস্তকে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। জনৈক ইংরেজ সিবিলিয়ানের যে উক্তি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে মুসলিম সমাজের মনোভাব কিরূপ তীব্র তার পরিচয় পাওয়া যাইবে : Rightly or not, the Muhammedans do think that Government behaved unjustly, and even meanly, towards them in this matter, and it is a standing sore and grievance with them. মুহ্সিন ফাণ্ড সম্পর্কে যে অবিচার গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে মনে হয়। এবার হুগলি কলেজের নামের সঙ্গে নূতন করিয়া মুহ্সিনের নাম জুড়িয়া দেওয়া হইল।

নবাব আবদুল লতিফের চেষ্টায় মুহ্সিন ফাণ্ডের টাকা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে স্থির হয়। বহুদিন যাবৎ মুসলমান ছাত্রেরা বৃত্তি ও বেতনের অংশ হিসাবে এই টাকা ভোগ করিতেছেন। (প্রেসিডেন্সী কলেজে ধনী দরিদ্র সকল মুসলমান ছাত্রকেই মুহ্সিনের দৌলতে অর্দ্ধেক বেতন দিতে হয়। পরীক্ষায় কেবল মুসলমানদের মধ্যে উঁচু স্থান অধিকার করিলে ধনী দরিদ্র সব মুসলমান ছাত্রই মুহ্সিন ফাণ্ড হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন।) বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী, যিনি ৬৪ হাজার টাকা সরকার হইতে পাইয়া থাকেন, তাঁর এবং অন্যান্য লক্ষপতি সমাজ-নেতাদের সাহেবজাদারাও মুহ্সিন ফাণ্ডের টাকা নিঃসঙ্কোচে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পরের অর্থ অপহরণের এই যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে কবে ইহার প্রতিকার হইবে, কে জানে? তা ছাড়া মুহ্সিনের টাকা একেবারে বিলাইয়া না দিয়া একে কর্জ্জে হাসানা বা debt of honour হিসাবে দেওয়ার প্রস্তাবও বহুবারই করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য কয়েক বৎসর আগে চট্টগ্রামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষামন্ত্রী খানবাহাদুর আজিজুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে এই সমিতির উদ্যোগে মুহ্সিন-স্মৃতিসভার যে অধিবেশন হয় তাতে এবং পরে কলিকাতা মুসলিম ইন্‌সিটিউটে এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্ট কিছু করিবেন তার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

কথায় কথায় অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। 'মহামানুষ' মুহ্সিন সম্বন্ধেই বলি। ৯১ পৃষ্ঠার এই বইখানিতে ওস্তাদ মুন্‌শী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহামানুষের জীবনী সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক একটা অধ্যায় পড়িলে মনে হয় যেন উপন্যাসের এক অধ্যায় শেষ করিলাম। জীবনী লিখিতে বসিয়া মাল মসলার অভাব লেখক প্রতিপদে অনুভব করিয়াছেন। তথাপি সামান্য মালমসলা লইয়াও যে এমারত তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর চিত্তজয় করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন : "তাঁহার জীবন-কথা যতোটুকু জানিতে পারা যায় ততোটুকুই আলোচনা করিলে মহত্ত্বের দিকে অনেকের প্রবৃত্তি বাড়িবে, আমাদের সমাজে তাঁহার ন্যায় মহামানুষের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মবিশ্বাস আবার খানিকটা ফিরিয়া আসিবে। —এই আশা আমাদের ক্ষতিকণ্টকিত জীবনে হয়তো কিছু লাভ আনিয়া দিবে।" মানুষ মুহ্সিনের জীবনী প্রচার হইলে, 'খানিকটা' নয়, আমাদের আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে ফিরিয়া আসিবে এবং আমরাও যথেষ্ট লাভবান হইব একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

মুহ্সিনের মত আমীর আলীও ছিলেন বাঙ্গলার সন্তান। সাধারণ অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম শিখরে তিনি উঠিয়াছিলেন। তাঁরও জীবন ক্ষুদ্র-পরিসর না হইলেও জীবন-কথা খুবই সংক্ষিপ্ত। এমার্সনের একটি উক্তি লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন : 'Great geniuses have their shortest biographies; their cousins can tell you nothing about them. They live in their writtings. অসাধারণ প্রতিভাবান যাঁরা তাঁদের জীবন-কথা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাঁদের আত্মীয়েরা তাঁদের পরিচয় জানে না। তাঁরা বাঁচিয়া থাকেন তাঁদের লেখার ভিতরে।'—এমার্সনের এই কথাগুলি আমীর আলী সম্বন্ধেই যেন সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য।

চুঁচুড়ার হেকিম সাদত আলীর কুঁড়ে ঘর হইতে কেমন করিয়া আমীর আলী প্রিভিকাউন্সিলের আসন পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলেন অল্পকথায় লেখক তার পরিচয় দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ হিসাবে আমীর আলীর কৃতিত্ব কতখানি বইখানিতে মোটামুটি তার পরিচয় মিলিবে। বিচারক হিসাবে আমীর আলী মুসলমান আইনকে যথেষ্ট

সম্প্রসারিত করিয়াছেন। আইনের উদার ব্যাখ্যা দিয়া সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর বিচারক জীবনের ব্রত। রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছেন। তা'সত্ত্বেও বলা যায় রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সব সময় মধ্যপন্থী। ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে আমীর আলী চিরকালই উদার মত পোষণ করিয়াছেন। লেখক চমৎকার ভাবে আমীর আলীর উদার মতবাদ পাঠকের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতের মুসলমান সমাজে যে উদার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, এই বইখানিতে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর বইএর প্রচার যত বেশী হইবে সমাজের মন ততই পরিচ্ছন্ন হইবে, মত ততই উদার হইবে, বলা যাইতে পারে।

আমীর আলীর মত আলোচনা করিতে গিয়া লেখক লিখিয়াছেন "ভারতে আমীর আলীর মতো রাজনীতিকের অভাব নাই, তাঁর মতো আইনজ্ঞও এদেশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত হিসাবে বাঙ্গলা দেশে, বিশেষতঃ মুসলিম বঙ্গে তাঁহার তুলনা নাই। ভবিষ্যৎ রাজনীতিক আমীর আলীকে ভুলিয়া যাইবে, আইনজ্ঞ আমীর আলীকেও হয়ত বিস্মৃত হইবে— কিন্তু মুক্তবুদ্ধির নিশান-বরদার আমীর আলী মুসলমানের মনে চিরন্তন হইয়া থাকিবারই দাবী রাখেন।...

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া জন্মিয়াছিলেন আমীর আলী। ইস্লামের প্রত্যেকটি বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যেকটি অনুশাসন তিনি বৈজ্ঞানিকের মন দিয়া বিচার করিয়াছেন। শতাব্দীর আবর্জ্জনা সরাইয়া ইস্লামের যে রূপ তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, মানুষের মনে আজও তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। আমীর আলী ছিলেন একজন জীবন্ত মানুষ। আধুনিক যুগের ভাবধারাকে তিনি পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। অন্তরের অনুভূতি দিয়া, আধুনিকের দৃষ্টি দিয়া হজরতের জীবন ও কোরানের শিক্ষাকে তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন। পুরাতনকে আমীর আলীর এই যে নূতন করিয়া আবিষ্কার জ্ঞানের পথে মঙ্গলের পথে এখনো তাহাই মুসলমানের সম্বল এবং পাথেয়।"

দানেশমন্দ খান

চলচ্চিত্রে অভিনয়

মিস্ শোভনা নার্গিস্ খানম্

আজকাল ভারতে চলচ্চিত্র অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যে-সব মেয়েরা চলচ্চিত্র-অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, তাঁদের আদরও তাই ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কিন্তু সত্যিই কে এই ব্যাপারে নৈপুণ্য দেখিয়ে নাম অর্জ্জন কর্ত্তে পারবেন, এর বিচার আগে থেকে করা শক্ত। অনেকগুলো মেয়ে হয়তো এমন আছেন যাঁরা অনুপম সুন্দরী; কিন্তু তা'হলেও অভিনেত্রী হিসেবে তাঁদের কৃতিত্ব তেমন কিছু নয়। আবার এমন মেয়েদেরও দেখা যায় যাঁরা দেহ-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় নন, কিন্তু তাঁদের অভিনয় সহজেই মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করে। এই জন্যেই মেট্রো-গোল্ড্উইনের হ্যারল্ড্ বুকেট বল্‌ছেন : অভিনেতাদের শুধু দেহ-সৌন্দর্য্য থাকলেই হলো না। রূপে যাঁরা শ্রেষ্ঠ নন, তাঁরাও নিজেদের সুন্দর করে তুল্‌তে পারেন। অভিনেতাদের যে জিনিষটী মানুষের চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশী, সে তাঁদের রূপ নয়। তাঁরা কি কথা বল্লেন এবং কেমন ঢঙে বল্লেন, এইটাই হ'লো দেখবার বিষয়। অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই নিপুণ অভিনেতা; সাধারণের প্রশংসা তিনিই অর্জ্জন কর্ত্তে পারেন। এ-ও ঠিক যে অভিনেতারা যে-ভূমিকাতেই নামুন না কেন, তাঁদের যে স্থির একটী ব্যক্তিত্ব আছে, সেটী কোথাও বদ্‌লায় না। এই জন্যই অভিনয-শিল্পীরা অভিনেতাকে যে-কোনো ভূমিকার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা করেন না; বরং কোন্ গল্পের কোন্ ভূমিকা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিল্‌বে সেইটীই দেখে থাকেন।

চলচ্চিত্র-অভিনয়ে ব্যক্তিত্বের কোন্ কোন্ নিদর্শন সাফল্য অর্জ্জনে সহায়তা কর্ত্তে পারে, হ্যারল্ড্ বুকেট তার একটা তালিকা দিয়েছেন। ইনি মেট্রোগোল্ড্উইনের অভিনেতাদের যোগ্যতা পরীক্ষক। এঁর তালিকাটীকে কয়েকটী প্রশ্নের ছাঁচে ঢাল্‌লে এইরকম দাঁড়ায় ঃ—

১। আপনার চোখ দু'টী কি কান্তিহীন? তা যদি হয়, তা'হলে মিছামিছি চলচ্চিত্রে আস্‌বেন না। বিবর্ণ চোখের ভালো ছবি ওঠে না।

২। আপনার দাঁতগুলো সমান ও সুবিন্যস্ত কি? চলচ্চিত্রে অভিনয় কর্ব্বার সাধ যাঁর আছে, এই রকম দাঁত তাঁর থাকাই দরকার।

৩। আপনার হাসিটী সরল, স্বাভাবিক ও মনোরম তো? হাসি কৃত্রিম হলে চলবে না।

৪। আপনার কণ্ঠস্বর কিরূপ? এদিকে একটু মনোযোগ দিলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। গলার আওয়াজ স্বভাবতই মধুর হওয়া প্রয়োজন। যদি দেখেন আপনার প্রিয়তম বন্ধুরা কিম্বা আত্মীয়েরা কোনো সময়ে কথার মাঝখানে আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছে, নিশ্চয় জানবেন আপনার কণ্ঠ খুব পসন্দসই নয়।

৫। লোকেরা কি সাধারণতঃ আপনার চারদিকে ভিড় জমায়? এটী ব্যক্তিত্ব যাচাই কর্‌বার চমৎকার মাপকাঠি। যদি আপনি দেখেন যে একটী ঘরে যথেষ্ট লোক রয়েছে, অথচ তারা আপনার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছে না, তা হ'লে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা ত্যাগ কর্ব্বেন।

৬। আপনার ফটো আরো কয়েকখানা ফটোর সঙ্গে মিশিয়ে কোনো অচেনা লোককে দেখাতে বলুন আপনার কোনো বন্ধুকে। যদি অচেনা লোকটী ফটোগুলো নেড়ে চেয়ে দেখতে দেখতে আপনার ফটোখানিতে বেশী মনোযোগী দেন, বুঝবেন আপনার ব্যক্তিত্বের মোহিনী শক্তি আছে এবং তার কাছে মানুষ সহজেই ধরা পড়বে।

৭। আপনার বন্ধুদের কাছে ক'টী হাসির গল্প বলবেন। দেখ্‌বেন তাঁরা আপনার গল্প শুনে প্রাণখোলা হাসি হাস্‌ছেন কিনা।

যদি গল্প বল্‌তে গিয়ে আপনার বাধো-বাধো লাগে, কিম্বা গল্পের মাঝখানে যেতে না যেতেই আপনার বলবার ভঙ্গিটা আর আগের মতো চমৎকার না থাকে এবং কোনো রকমে সেটা শেষ কর্‌তে হয়, তাহ'লে জান্‌বেন : ব্যাপার বড়ো সুবিধার নয়। দর্শকদের নির্ব্বাক ও মুগ্ধ করে রাখবার মতো শক্তি, কথার ওজন এবং অভিনয়-নৈপুণ্য আপনার কতোটুকু, তা বিচার কর্‌বার এটা একটা চমৎকার উপায়।

৮। যখন কারুর সঙ্গে আলাপ করেন, তখন তার চোখের উপর আপনার চোখ থাকে, না আপনি অন্য দিকে চেয়ে থাকেন? যদি অন্য দিকে চেয়ে থাকার অভ্যাস আপনার থাকে, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের চিন্তাও মনের মধ্যে আন্‌বেন না। অভিনেতার যথেষ্ট সাহস ও আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই। অবশ্যি এ জন্যে তাঁর দৃষ্টি তীব্র বা উদ্ধত হওয়ার দরকার করে না।

৯। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো ক'রে দেখুন। কি ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন? কুঁজো হ'য়ে? হাত দু'খানা কোথায় কিভাবে রইলো? একটু হাঁটুন। চলবার ভঙ্গিটা কেমন? মোটকথা, দাঁড়াবার ভঙ্গি, চলা-ফেরার কায়দা, হাত-পা'র কায়দা, চোখের চাহনির কায়দা, মুখের ভাবভঙ্গি—সব কিছু মিলে অভিনেতাকে মনোরম করে তোলে।

১০। সম্পদে বিপদে সকল সময়েই বন্ধুরা আপনার পাশে এসে দাঁড়ান কি না? মনে করুন : আপনার চাকুরী নেই এবং আপনি দুঃখের ঘায়ে ভেঙে পড়্‌ছেন, তখনো আপনার বন্ধুরা কি সত্যিই বন্ধু থাক্‌বেন? যদি থাকেন, তা হ'লে সেইটাই হয়তো আপনার ব্যক্তিত্বের একটা বড়ো প্রমাণ।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ার্থী হওয়ার আগে এই দশটী প্রশ্ন দিয়ে নিজেকে যাচাই কর্ব্বেন। প্রশ্নগুলো শুন্‌লে মনে হয় তেমন কিছুই নয়, কিন্তু অভিনেতাদের ব্যক্তিত্ব নিরূপণে এদের দাম খুব বেশী।

ভারতের মুসলিম অধ্যাত্মসৌধ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সকল সভ্যতার চরম স্বপ্ন ও কল্পনা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় প্রযুক্ত হয়েছে। শুধু ঐহিক ক্ষুদ্রতায় মাজ্জাত হয়ে জগতের বিরাট ধর্ম্মসমুদয় নিজেদের ভঙ্গুর করে তোলে নি—সে সব সময়েই অসীম ব্যাপ্তি খুঁজেছে এবং অপরাজেয় তুরীয় আবেষ্টনের পার্থিব ব্যবস্থার ভিতরেও নিজেদের সমাহিত করেছে। তাই গ্রীসীয় তত্ত্ব, মিসরীয় শীলতা ও ব্যাবিলনের ধর্ম্মব্যবস্থা অনুকূল অধ্যাত্মসৌধের ভিতরে নিজেদের গভীর হৃদ্‌স্পন্দনকে জাগ্রত করতে উৎসাহিত হয়েছিল। বিশ্বজয়ী ইসলামও নানাদেশে প্রসারলাভ করে'—অসীম-রূপমন্দির সৃষ্ট করেছে।

আরব্য শীলতা রজনীর মায়া সৃষ্টি করে' বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। রৌদ্রদগ্ধ মরুর প্রগল্‌ভ মুখরতা দুঃসহ, তাই আরব্য রজনীর স্রষ্টা নিয়ে এসেছে সুশীতল শৈলস্বপ্নের আবেষ্টন ও সুস্নিগ্ধ প্রলেপ। ভারতের বিরাট বক্ষেও প্রকৃতির অশ্রান্ত কুঞ্জবন শিহরিত হচ্ছে—বিরাট নদনদী সুস্বচ্ছ পুলক সৃষ্টি করে' এই বিরাট মহাদেশকে শস্যশামল করেছে। এখানকার রৌদ্রসমুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন নূতনতর কল্পনাজগত সৃষ্টি করেছে পুলকিত পুষ্পব্রততীর সুস্পষ্ট শিহরণের মাঝে। অভ্রভেদী পর্ব্বত, সুশীতল বিস্তীর্ণ পুলিন, বিরাট সমুদ্রসঙ্গম, নানাঋতুর অশ্রান্ত অর্ঘ্য ভারতবর্ষে নূতন আবেষ্টন, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছে। এই রূপশিহরিত, সুস্নিগ্ধ সুজল ও সুফল ভূমিতে ইসলামের গভীর অধ্যাত্ম বোধ নূতন সৃষ্টির উৎসাহে ব্যাকুল হয়ে উঠে। ঐশ্বর্য্যের ও বৈচিত্র্যের দিক হতে এ সৃষ্টির তুলনা নেই। একাধারে ষড়ঋতুর ক্রীড়া, গভীর তুষারাবৃত হিমাদ্রি, অগ্নিদগ্ধ মরু, নাতিশীতোষ্ণ নদী ও সমুদ্রসঙ্গম জগতে আর কোথা আছে? বিধাতার রূপের অক্ষক্রীড়া ভারতের বুকেই শোভা পায়। অপরদিকে জগতের উচ্চতম পর্ব্বত, বিরাটতম নদ নদী, অপরাজেয় উপত্যকা ও অধিত্যকায় যে দেশ সমৃদ্ধ, সে দেশের অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা একটা অসাধারণ রূপরচনায় উৎসাহিত হবে এরকম প্রত্যাশা করা একান্ত স্বাভাবিক। নানাজাতির সম্মিলনে এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একটা গভীর আবেগে শিহরিত হয়েছে। সে আবেগ যে একটা পরাসৃষ্টি সম্ভব করবে এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

স্পেন হ'তে মহা-চীন পর্য্যন্ত ইসলামের জয়যাত্রা একটা বিরাট অধ্যাত্ম আবেগের মত প্রসারিত হয়েছিল। এর ভিতর ভক্তের উপাসনার জন্য নানা অধ্যাত্মসৌধ নির্ম্মিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইস্‌লামপন্থী-ভারত যা রচনা করেছে তা শুধু অপরাজেয় নয়—অন্য সভ্যতার পক্ষে অকল্পনীয়। আরব্যোপন্যাসের দৈত্য আফ্রিকার যাদুকরের প্রেরণায় যা করতে পারেনি—ভারতীয় মুসলমান শিল্পীর সাধনা তার চেয়ে অনেক বিরাটতর সৃষ্টি সম্ভব করেছে। একটা কল্পনার ব্যাপার নয়, একটা অভূতপূর্ব্ব সত্য। এতে বোঝা যায় ভারতের অন্তরে একটা বিশিষ্ট মহত্ত্ব আছে যা' ইস্‌লামের আদর্শকে একটা অসামান্য রূপবিম্ব দান করে' ধন্য হয়েছে।

তাজমহলের ভুবনমোহিনী শ্রী বিশ্ববিদিত। কিন্তু শুধু তাজই ভারতীয় ইস্‌লামের একমাত্র দান নয়। বাঙ্গলাদেশের বৈচিত্র্য, দক্ষিণভারতের বিরাটত্ব, পশ্চিমভারতের স্বচ্ছ সারল্য, উত্তর ভারতের ধূমায়িত রূপবহ্নি একটা ভারতময় দীপালী সৃষ্টি করেছে ইসলামের অধ্যাত্মসৌধ-নির্ম্মাণে। এ সমস্ত সৃষ্টির ভিতর অতিপরিস্ফুটভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে ইস্‌লামের বিরাটত্ব, ঐশ্বর্য্য, সাম্যপ্রীতি ও বিশ্বভৌমিক বাণী। দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অন্ধ সংস্কার ইদানীং ভারতের ইসলাম-সাধনাকে তুচ্ছ করতে উৎসাহিত হয়েছে। এগুলির সাহায্যে কেউ কেউ ভারতের বাইরে ইস্‌লামের মহত্ত্ব খোঁজবার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে—যদিও তা সফল হওয়া সম্ভব নয়। তবুও ইদানীং কয়েকজন রসজ্ঞ ভারতীয় ইস্‌লামের অসামান্য দানে গর্ব্ব অনুভব করতে ইতস্ততঃ করছেন না। ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষ হ'তে অধ্যাপক Sattar Kheiri একটা পরিষ্কার মত ব্যক্ত করেছেন ঃ—

"Islamic Architecture reached its climax in India. Islamic Indian spirit can perform wonders...All the

great monuments of Saracenic Art in India surpass those of Arabia, Turkey, Egypt and Spain" আলহাম্‌রার আলেয়া, কেইরোর কেরামতি, দামাস্কাসের স্বপ্ন ও ইস্তাম্বুলের উচ্ছ্বাস ভারতীয় সৃষ্টির নিকট একান্তভাবে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে।

তাজের তরল সৌন্দর্য্য রূপগর্ব্বিত অপ্সরীর সহিত তুলনীয়। কিন্তু অপ্সরীই ইস্‌লামের একমাত্র মানসী সৃষ্টি ছিল না; তাজ যে ইতালীয় বা বহির্ভারতীয় আদর্শে নির্ম্মিত হয়নি একথা হ্যাভেলপ্রমুখ নিরপেক্ষ সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু শ্বেত মর্ম্মরের শুভ্র দেহশ্রীই ইস্‌লামের চরম দান নয় এবং ইস্‌লাম যে অসীমের সাহচর্য্য লাভ করেছিল, তাও একান্তভাবে মাধবীকুঞ্জ বা যমুনাপুলিনে সম্ভব হয় নি। জ্যোৎস্নাবিগলিত যমুনা, কদম্বের শিহরিত মাদকতা ও বাঁশীর আওয়াজে উচ্ছসিত ফেনিল স্রোতোভঙ্গ যে মোহিনীকে রূপান্বিত করে তোলে, তা কঠিনতর আবেষ্টনে ভৈরবী শ্রী পরিগ্রহ করে।

ইস্‌লামের কঠিন ও বিশ্বভৌমিক সাধনার সেই উগ্র সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হতে হবে দাক্ষিণাত্যের বিরাট প্রান্তরে। বাহ্‌মনী রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ার পর বিজাপুর রাজ্য স্থাপিত হয়। আরঙ্গজীব ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অতুলনীয় মুসলমান রাজ্যকে ধ্বংস করেন। মোগলের চরম সাধনায় যা' সম্ভব হয়নি বিজাপুরের গর্ব্বিত সংকল্পে তা সিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু ভারতের বুকে ক্ষণ ভঙ্গুরত্বের দৃষ্টান্ত যতটা দেখতে পাওয়া যায় বিধাতার আর কোন রাজ্যে তা' যায় না। বিজাপুরের গোলগুম্বজ জগতের বৃহত্তম গুম্বজ বহন করে' এক অলৌকিক দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়েছে। স্পেন, মিসর, আরব, পারস্য, তুর্কীস্থান সবই এক নিমেষে হার মেনে যায় ভারতের এই অভাবনীয় দৃষ্টির নিকট। বিজাপুরের অন্য সৌধ হচ্ছে ইব্রাহিম রওজা। ইব্রাহিম রওজা বলতে একটি মসজিদ ও একটি কবরের উপরকার হর্ম্ম্য বোঝায়। রওজা শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্যান। দ্বিতীয় ইব্রাহিম তাঁর কন্যা জোহ্‌রা সুলতানা ও বেগম নির্ম্মাণ করেন। সূক্ষ্ম অলঙ্করণ ও সৌকুমার্য্যে ইব্রাহিম রোজার তুলনা ছিল না. মিঃ কাজিন্‌স্‌ বলেন . "Ibrahim Rauza was the last word in decoration and luxurious magnificence." বিজাপুর এক দিকে এই তরল ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকে সম্ভব করে'—অন্য দিকে গোলগুম্বজের প্রগল্‌ভ্‌ ভৈরবতাকেও রূপদান করে' ধন্য হয়।

সেকালে বিজাপুরের প্রতিপত্তিও সামান্য ছিলনা। জগতের সব মহত্ত্বই বিজাপুরের নিকট হার মানত। কাইরো, দামস্কাস্‌ প্রভৃতি বিজাপুরের বিরাটত্ব কখনও লাভ করতে পারেনি। বিজাপুর তখন জগতের কেন্দ্রস্থানীয় হয়ে পড়ে। দনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্ভারে বিজাপুরের বাজার পরিপূর্ণ থাকত। এজন্য এ নগরটি দিল্লীর বাদ্‌শাহগণের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করত। তাজমহলও ইব্রাহিম রওজার অনুপ্রেরণা হতে সৃষ্ট হয়। ভারতীয় কল্পনার বিরাটত্ব ও ঔদার্য্য প্রমাণিত হয় গোলগুম্বজ সৃষ্টিতে। গোলগুম্বজের গুম্বজ জগতের সকল চেষ্টাকে পরাজিত ক'রে নিজের একচ্ছত্র মহিমা প্রকট করেছে। রোমের পার্থিননের অসাধারণ গুম্বজও এর তুলনায় ছোট। এত বড় একটা গোলক সৃষ্টি করা একটা ইন্দ্রজালের কাজ—ভারতীয় কারিগর এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করেছে। কত বড় ফাঁকা জায়গার উপর এ গুম্বজ ন্যস্ত করা হয়েছে তা' দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। কাজিন্‌স্‌ সাহেব বল্‌ছেন :—

"The great hall below, which is covered by the dome covers an arch of 18,337 sq. ft. and if we take 22 sq. ft. for the projecting angle of the piers carrying the cross arches which stand out from the walls into the floor, two on each side, we get a total covered area uninter rupted by supports of any kind of 18,109 sq. ft. This is the largest space covered by a single dome in the world—the next largest being that of Parthenon at Rome of 15,833 sq. ft. If we add the pendentures of the actual dome to which they naturally, belong as part of the superstructure, then this becomes the greatest domical roof in the world."

এ গুম্বজ সৃষ্টির অন্তরালে আছে বিরাট কল্পনার একটা অসামান্য কুহক। কল্পনার অসীম ব্যাপ্তি, সাধনার অপরাজেয় দৃঢ়তা, ভাবের অসামান্য গভীরতা ভারতীয় ইস্‌লামের এই সৃষ্টিকে অসীমকালের জন্য জয়যুক্ত করেছে। আজ পর্য্যন্ত জগৎ এই সৃষ্টির নিকট মস্তক নত করে আছে। গোলগুম্বজে অলঙ্করণ নেই, চিত্তবিভ্রমকারী ভূষণ নেই—কোন রকম লঘুতা ও তরলতার স্পর্শে এই সৃষ্টি চঞ্চল হয়নি। অথচ এই বিরাট সৃষ্টি ইস্‌লামের অপরাজেয় ঐশী প্রসারকে যেন নীল আকাশ ভেদ করে' প্রদীপ্ত করছে। এই হর্ম্ম্যের বিরাট গুম্বজ যেন ভূতলের শতমুখী বিচ্ছিন্ন বিপরীত ও লঘু খণ্ডতার অন্তর্নিহিত ঐক্যকে একটি অভ্রভেদী চূড়ার সাহায্যে অসীম আকাশের ললাটে প্রদীপ্ত করছে। মুসলমান সভ্যতা ও ধর্ম্মসাধনার যে ঐক্য সংসিদ্ধ হয়েছে

তারই বিরাট প্রতীকরূপে ভারতের গোলগুম্বজ দণ্ডায়মান। গোলগুম্বজের ভিতরকার whispering gallery নিয়ে এসেছে অসীমের ইন্দ্রজালের নূতন বাণী। ইস্‌লামীয় শীলতা ভাগবতী করুণার ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করে। "কিস্‌মত" এই ইন্দ্রজালেরই নামান্তর। এই আশ্চর্য্য সৌধে প্রবেশ করলেই অতি সামান্য পদক্ষেপও অজস্র প্রতিধ্বনিত হয়ে একটা জনতার সমাগম সূচনা করে। অতি লঘু আওয়াজে কথোপকথোনও এক প্রান্ত হতে আহত হয়ে' অন্য প্রান্তে চলে যায়। সামান্য হাসাও চারিদিকে অট্টহাস্যে পরিণত হয়। আরব্য যাদুকরের ইন্দ্রজাল অপেক্ষা এই মায়াজাল সামান্য নয়।

পশ্চিমভারতে ইসলামীয় সৌধকলা সৌন্দর্য্যের আর একটি অধ্যায় উন্মুক্ত করে। এক পলকে এখানে একটা নূতন স্বপ্নের অবতারণা করা হয় যা' পশ্চিমভারতের পক্ষেই সম্ভব। তাজের বঙ্কিম লাস্য বা গোলগুম্বজের গর্ব্বিত গৌরব আহমদাবাদের রাণী সিপারীর সমাধিসৌধে নেই। অসামান্য ঋজুতা ও সরল নিষ্ঠা রূপায়িত হয়েছে এই সৌধারণ্যে। স্তম্ভগুলি একে একে যেন সৌন্দর্য্যের পাঁপড়ির মত বিকশিত করে' তুলছে এর রূপশতদলকে। কোনটিই অন্যকে তুচ্ছ করে' মহিমা বা উচ্চতা লাভ করতে ব্যগ্র নয়—সবই একটা সংযত ছন্দে আত্মসম্বরণ করে' আছে। এই সমাধিসৌধ সম্বন্ধে Fergusson বলেন .- The most exquisite scene of Ahmedabad both in plan and details --the minarets surpassing in beauty of outline and richness of details those of Cairo."

পশ্চিমভারতে Sidi Sayyid's সমাধিসৌধে যে পাথরের জালি নক্সা আছে—জগতে তার তুলনা নেই। এ নক্সায় দুদিক দুরকম—যদিও এই বৈচিত্র্যের একটা বিস্ময়জনক ঐক্য সাধন করা হয়েছে। ভারতবর্ষেই এই বৈচিত্র্যের ঐক্য সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ তত্ত্বের দিক হতেও এই শ্রেণীর সমন্বয়বাদ ভারতবর্ষে সিদ্ধ হয়েছে। আলহাম্‌রাতে বা অন্যত্রও এরকমের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

উত্তরভারতের অনেক সৃষ্টি সুপরিচিত। তাজমহল জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এ অঞ্চলের অন্যান্য সৃষ্টিও ভারতীয় ইস্‌লামের গৌরবতিলকস্থানীয়। বস্তুতঃ ইস্‌লামীয় সাধনা ও তপস্যার সমীপে এসমস্ত রচনা অর্ঘ্যস্থানীয়। ফতেপুর শিক্রীর পঞ্চমহল এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ভারতের প্যাগোদা-রচনা এই নূতন কলেবর গ্রহণ করেছে ইস্‌লামীয় রীতির সাহচর্য্যে। এই রচনাটি যেন একটা আন্তর উচ্ছ্বাসস্থানীয়—যা মর্ম্ম হতে অসীমের দিকে উদ্বেলিত ছন্দে বিস্তৃত হয়েছে। সিকান্দ্রাও এই শ্রেণীর রচনা। উত্তরভারতীয় মনন শুধু এক ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেনি। নানা বিচিত্র আবেশ ও আয়োজনে তা' মঞ্জরিত হয়েছে নদীতীরে, উন্মুক্ত প্রান্তরে বা শৈলসঙ্গমে। সর্ব্বত্রই এসব সৃষ্টির রসবৈচিত্র ও রূপালঙ্কার লক্ষ্য করবার ব্যাপার। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরশিক্রীর রচনা যেন অজস্র কাব্যরচনার মত— সে কাব্যের তুলনা যে কোথাও পাওয়া যায়না একথা জগৎ স্বীকার করে। ভারতীয় ইস্‌লামের সাধনা এজন্যই তুলনাহীন—জগতের ইস্‌লামীয় তত্ত্ব ভারতেই সমগ্র গমকে ধ্বনিত হয়ে এক অসামান্য রাগিণীপরম্পরা সৃষ্টি করেছে।

মোগল চিত্রকলার মোহজাল

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

জগতের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের বাণী কখনও নিঃশেষ হয় না। আরব্য রজনীর স্বপ্ন যেমন অসীম কালে ফলিত হয়ে' উঠবে, হাফেজের বুলবুল ও পারস্য গোলাপ যেমন সকল সৃষ্টির ভিতর চিরনবীন হয়ে উঠবে, তেমনি জ্যোৎস্নাস্নাত কল্পনায় ভরপুর মোগল চিত্রকলাও জগতের জাগ্রত চিত্তে চিরকাল মোহজাল রচনা করবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মোগল চিত্রকলা একটা অসামান্য সৃষ্টি। মুসলমান সভ্যতা চিত্র ও মূর্ত্তিরচনার বিরোধী ছিল। এই বিরাগ ও বর্জ্জনের মরুভূমির ভিতর সৃষ্টি হয়েছিল একটা রসের উৎস যা মোগলচিত্ত সানন্দে বরণ করে। সৌন্দর্য্যের এই অপ্রত্যাশিত ও দুর্লভ পথ যেন অঙ্গুরীয়ক ঘর্ষণেই আবিষ্কৃত হয় জগদ্দল পাথর ভেঙ্গে। এজন্যই মোগলের ইস্‌লামীয় তপস্যার কঠিন ও বিশুদ্ধ রাজ্যে এই চিত্রকলা এসে পড়ে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত। সর্ব্বান্তঃকরণে মোগলচিত্ত এই মধুচক্রে আত্মসমর্পণ ক'রে এক দুর্লভ রূপবীথিকা সৃষ্টি করে।

মোগল চিত্রশিল্পের এই গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব অনেকের চক্ষুর অগোচর হয়েছে। পারস্য রচনার সম্পর্ক হ'তে নির্ম্মুক্ত নয় বলে এই তত্ত্বের স্বার্থকতা অন্তর্হিত হয়নি। বস্তুতঃ ভারতের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোগল চিত্রকলা উচ্ছ্বসিত নদীর মত এক কুহক সৃষ্টি করেছে। যা ছিলনা তা' হয়ে গেল এক ঝড়ের মত উড়ন্ত পতাকা উড্ডীন করে। মোগলেরা অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু সে জয়পতাকা এখনও ভারতের আকাশে উদিত আছে।

সম্রাট আকবর শাহই মোগল চিত্রকলার প্রধান ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের মোগল আমল হচ্ছে ষোড়শ হ'তে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে চিত্রকর বিহজাদের নাম উল্লেখ করে' গেছেন। তিনি এই শিল্পীকে সমসাময়িক চিত্রকরদের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গেছেন। বিহ্‌জাদ খোরাসানের সুলতান হোসেনের আমলের লোক। তাইমুরের বংশধরগণের আমলে সমরকন্দ, হিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে পারস্য চিত্রকলার চরম উন্নতি লক্ষিত হয়। পারস্যকলার কালোয়াতী চমৎকার, সূক্ষ্ম সন্নিবেশও মধুর, কিন্তু তাতে ভারতীয় সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র নেই। বর্ণের কুহক বা তুলিকার লঘুতা উচ্চশ্রেণীর দান সন্দেহ নেই। কিন্তু রসের বহুমুখী কারুতা ও রূপের সহস্রধারা লক্ষ্য করতে হয় ভারতবর্ষে। মোগল চিত্রকলার অশ্রান্ত দানের ভিতর আছে কাচফলকে বিম্বিত বিচিত্র রঙের হোলি। প্রাকৃতিক দৃশ্য, উদ্যান, পর্ব্বতশ্রেণী, পশুপক্ষী, প্রতিরূপ প্রভৃতি বহুদিকে মোগল শিল্পী অগ্রসর হয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। কিন্তু ভারতের রূপের ডালি চিরকালই সকলের লোভনীয় ছিল। মোগল চিত্রকর সে ডালিকে সার্থক ও সালঙ্কার করে আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন করেছে। অরূপবাদীর এই সকল রূপধ্যান জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় বস্তু।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল ভারতীয় চিত্রকলার মোগল অধ্যায়কে মুকুট দান করে' ধন্য হয়েছে। মোগল চিত্রের এই স্বর্ণযুগে আমরা সৃষ্টির পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হই। শাহাজাহানের আমলে চিত্রচর্চ্চা সামান্য হয়ে পড়ে এবং স্থাপত্যের আদর বৃদ্ধি পায়। পারস্যদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একসময় আমদানি করে' মোগল চিত্রের সৌষ্ঠব বাড়াবার চেষ্টা হয়। আবুল ফজলের তালিকায় কালনাকের শিল্পী ফরক, সিরাজের আবদুল সমদ ও তাব্রিজের আমীর সৈয়দ আলীর নাম আছে। কিন্তু মোগল চিত্রকলার বিশিষ্ট অগ্রগতির সময় শুধু মুসলমান শিল্পীর ভিতর ইহা নিবদ্ধ ছিল না। হিন্দু শিল্পীরাও মোগল চিত্রকলার প্রধান সহায়ক ছিল। ভারতের প্রাচীন ধারায় অভিজ্ঞ সুদক্ষ কারিগরদের সাহায্যও আকবর বাদশাহ গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ ভারতের স্থাপত্যও যেমন স্থানীয় কারিগরদের কীর্ত্তি, চিত্রকলাও তেমনি। আকবরের দরবারে বাসোয়ান, দেসবন্থ ও কেশুদাস প্রভৃতি হিন্দু শিল্পীর সমাদর ছিল। সম্রাট আকবরের হুকুমে পারস্য কবি বিজামির বইতে হিন্দু শিল্পীরা ছবি আঁকে। বস্তুতঃ মোগল চিত্রকলার মহার্ঘ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য বাদসাহেরা সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কারিগরদের আহবান করেন।

ইউরোপীয় আলোচকগণ মোগল চিত্রকলাকে ঐহিক ও বাস্তব (realistic) বলে' বর্ণনা করে গেছেন। এদুটির কোনটাই ঠিক কথা নয়। শিকারের দৃশ্য, রাজদরবার প্রভৃতি থাকলেই তাকে ঐহিক বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব রচনার আবহাওয়া ভারতীয় সূক্ষ্ম ধারণা ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির প্রেরণা লাভ করেছে। অধ্যাত্ম বা পারমার্থিক বিষয়ের ছবিও যে নেই তা নয়। সব কিছুতেই একটা সংযম ও গভীর সঙ্কল্প প্রস্ফুট হয়। মোগল চিত্রকলার পারমার্থিক প্রেরণা হ'তে বঞ্চিত হ'লে ছবিগুলি আরও ইতর ও মোটা রকমের সৃষ্টি হত। অথচ মোগল চিত্রের পেলব মাধুর্য্য অসাধারণ সাধনা ও আত্ম সমর্পণের ইতিহাসকে প্রস্ফুট করে' তোলে। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালটি ভারতের একটা নব উদ্দীপনার যুগ — এই উদ্দীপনা বৈষ্ণব কবিদের সংস্পর্শে অসাধারণ মহিমা ও মাধুর্য্য লাভ করে। মোগল বাদসাহদের কীর্ত্তির সহিত এ যুগের সমুত্থানের ইতিহাস যুক্ত। কোন লেখক বলেন ঃ— "Its medium of communication was the common tongue which became an instrument of unexampled power and extraordinary cadence in the hands of Vaishnavite poets such as Tulsi, Sur, Keshava, Tukaram & others. It was an age of religious ferment & impassioned songs." N.C. Mehta.

মোগল আমলের আড়ম্বর, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের বহুমুখী ব্যঞ্জনা জগতের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ব্যাপার ছিল। বাবরের আত্মজীবনী অর্থাৎ বাবরনামা আকবর কর্ত্তৃক বহু চিত্র-শোভিত করা হয়। আকবরের চিত্রপ্রীতি একখানি এলবামের দ্বারা বোঝা যায়। আবুল ফজল বলেন ঃ "An immense album was thus formed; those who have passed away have received a new life and those who are still alive have immortality promised them." মোগল চিত্রকলা শুধু বইর ছবি রচনায় আবদ্ধ ছিল না। ফতেপুর সিক্রীর রাজকীয় প্রকোষ্ঠাদির দেওয়ালে চিত্রের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর সেকান্দ্রার উর্দ্ধভাগে ছবি আঁকান। এই সম্রাট মোটেই গোঁড়া ছিলেন না। লাহোর ও আগ্রার প্রাসাদসমূহের দেওয়ালে ছবি আঁকান হয়। এমন কি আগ্রার audience hallএ William Finch ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে নানা চিত্র দেখতে পান। (Early Travels in India 1583-1619 pp (163-4.) "In the gallery where the king useth to sit are drawn overhead many pictures of angels, Devos intermixt in most ugly shape with long horns, staring eyes etc."

বাবরনামা ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ মোগল আমলে চিত্রিত করা হয়। আকবরের হুকুমে পারস্য কবি নিজামীর বইতে ছবি আঁকা হয়। তা ছাড়া Razmnama তে মহাভারতের চিত্র আছে। শাহাজাহানের পাদসানামাও চমৎকার ছবির বই।

'Wagiat-i-Barbari' বা বাবরের জীবনস্মৃতি গ্রন্থ হতে একখানি চিত্র দেওয়া গেল। গ্রন্থখানি বিলাতের Victoria and Albert Musiumএ আছে। সেকালে হাতীর, উটের লড়াই, মানুষের কুস্তীখেলা অতি প্রিয় ছিল। এই সব দৃশ্য চিত্রখানিতে আঁকা হয়েছে। ঘটনাগুলি বাবরের দরবারে হয় ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে। তখনকার লিপিকলার নমুনাও এই চিত্রে পাওয়া যায়। বাবর কর্ত্তৃক উদ্যান রচনা—আর একখানি চিত্র। কৃত্রিম জলপ্রপাত, বৃক্ষের সারি সৃষ্টি প্রভৃতি চমৎকারভাবে এই ছবিখানিতে আঁকা হয়েছে। ছবিখানিতে বর্ণের লালিত্য, তুলিকার নিপুণতা প্রভৃতি অতুলনীয়। সেকালের মোগল উদ্যানের প্রতি রাজকীয় আকর্ষণের এই নমুনা অতি প্রীতিজনক। বাবর কর্ত্তৃক রাজদূতদের দর্শনদান—আর একখানি চিত্র। এই চিত্রেও উদ্যানের একটি চমৎকার দৃশ্য আছে।

'আকবর ও তাঁর দুই পুত্র'—একখানি মনোহর রচনা। প্রতিকৃতি রচনায় মোগল কলার অসাধারণ সফলতা এই ছবি হতে প্রমাণ হয়। অতি সূক্ষ্ম কাজে চিত্রকরের অসাধারণ নৈপুণ্য উদ্ভাসিত হয়েছে। A European Embassy বা ইউরোপের দূত প্রসঙ্গ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র। সেকালে বিদেশী দূতদের কিভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হত এ ছবিতে তা দেখতে পাওয়া যায়। সোনালিরঙ প্রচুরভাবে এই চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র ছবিখানির ঐশ্বর্য্য ও কৌলিন্য সহজেই চোখে পড়ে। সেকালকার মোগল দরবার কি রকম ছিল তা' দেখবার সুযোগ রেখে গেছে বলে চিত্রকরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। 'তামুরের সম্মুখে বন্দী বিজাদ সুলতান' চিত্রখানি আরও পঞ্চাশ বছর পরের রচনা। তুরস্ক বাদশাহ বিজাদ তাইমুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন সেই দৃশ্যই চিত্রখানির প্রতিপাদ্য।

সম্রাট দারার ছবি—সংগ্রহ হতে একটি রমণীর চিত্র দেওয়া হোল। অতি নিপুণভাবে এই ছবি আঁকা হয়েছে। প্রত্যেকটি

অঙ্গ-ভঙ্গী লালিত্যে পূর্ণ। বস্তুতঃ মোগল কলা, স্ত্রী পুরুষ, পশুপক্ষী, দরবার উদ্যান প্রভৃতি অঙ্কনে চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করে।

একদিকে বিরাট মোগল সৌধের আকর্ষণ অন্যদিকে চিত্রকলার গভীর আকর্ষণ—কোনটি জগতের চিত্তকে জয় করতে পেরেছে—এই প্রশ্ন উঠে। বলতে হয় চিত্রের ঐশ্বর্য্য সৌধকলাকেও হতশ্রী করেছে। এরূপ চমৎকার চিত্র-সৃষ্টি দুর্লভ। ভারতের বর্ণসুষমা, আবেষ্টন ও রসবিতানে এই সব সৃষ্টি পরিপূর্ণ। পারস্য সৃষ্টি এই সব রচনার নিকট সঙ্কীর্ণ ও লঘু মনে হয়। বস্তুতঃ মোগল চিত্রকলা অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধার ব্যাপার হয়েছে।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

বাঙ্গলার মুসলিম সৌধকলা

যামিনীকান্ত সেন

ভারতবর্ষে বাঙ্গলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে সাত-কোটি লোক এক ভাষায় পরস্পরকে সম্বর্দ্ধনা করে। বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য ও শিল্প অসীম রসসম্পর্কে ভরপুর। হৃদয়ের নানা উচ্ছ্বাস ও উদ্বেলিত বৈচিত্রে সে সাহিত্য ইদানীং বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। এদেশ আদিকাল হতেই বিশ্বের সঙ্গে মধুর সামাজিকতা সৃষ্টি করে' তৃপ্তিলাভ করেছে। এদেশের মস্‌লিন চিত্তের রমণীয় ও পেলব স্পন্দনের ন্যায় সমগ্র প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভূমিতে নিজের নিঃশব্দ বাণী পাঠিয়েছে। এদেশের রেশম জগদ্ব্যাপী বিস্তারে বাঙ্গালীর কৌলীন্য ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছে। জাহাজ নির্ম্মাণ করে ও দিকে দিকে প্রেরণ করে' বাঙ্গালী বিশ্বজনীন সভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছে। বস্তুতঃ কোন কালেই এদেশ ক্ষুদ্র হতে চায় নি। অত্যবেব বিশ্বভৌমিক উদারতা আত্মপরভেদ-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীকে চিরকাল বর্জ্জন করে' এসেছে। বাঙ্গালীর আতিথ্য সকল জাতিই পেয়েছে। এই আতিথ্য পেয়েই ইংরাজ আজ ভারতের অধিকারী।

নানাকারণে বাঙ্গলার সভ্যতা এরূপ অপরূপভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। নদীমাতৃক দেশের সবুজ সমারোহ একদিকে চিত্তকে স্নিগ্ধ করেছে—অপরদিকে সমুদ্র স্পর্শে জাগ্রত মহত্ত্ব ব্যাকুলভাবে আত্মপ্রসার চেয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সাহিত্য ও শিল্প রচনা চিত্তের পেলব স্পন্দন ও সূক্ষ্মতর হিল্লোলেরই প্রতিফলক হয়ে জগৎকে সর্ব্বত্র মুগ্ধ করেছে। জগতের আর কোথাও কি মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্মসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে? মস্‌লিনকে বাঙ্গলার মনের তাঁতেরও সৃষ্টি বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এ দেশের মৌলিকতা ও বিশ্বমুখী দৃষ্টি সাহিত্যে ও শিল্পে অনিবার্য্য চিহ্ন রেখে গেছে।

বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য যেমন সৌধকলাও তেমন এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি। চারদিকের পরিপুষ্ট সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া, জনহৃদয়ের অর্গলহীন ভাবাবেশ, এবং সর্ব্বোপরি আত্মপর ভেদজ্ঞানের ক্ষুদ্রতা হ'তে মুক্ত বাঙ্গলাদেশ এক বিরাট বিশ্বযজ্ঞের হোমানল প্রজ্জ্বলিত করে' সমগ্র বিশ্ববাসীকে অকুতোভয়ে আহ্বান করেছিল। যারা বাঙ্গলাদেশে এসেছে তারাও এদেশের সার্ব্বজনীন আবহাওয়া, হৃদয়ের বিপুল উদারতা ও রসসম্পর্কের অজস্র দানে সর্ব্বতোভাবে এদেশের মহত্ত্বে মজ্জিত হয়ে অঘটন ঘটন পটুর কৃতিত্ব লাভ করেছে। বাঙ্গলার বাদশাহদের দৃষ্টি এজন্য ভারতবর্ষে এক অতুলনীয় অঙ্ক সূচনা করেছে।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রসঙ্গেই গৌড়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। একসময় গৌড়নগর বাঙ্গলাদেশের সভ্যতার বাহন হয়। এ নগর ঐশ্বর্য্যে ও আকারে সমসাময়িক লণ্ডন অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। বস্তুতঃ গৌড়ীয় যুগ প্রাপ্ত-ভারতীয় ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অধ্যায় সৃষ্টি করে। আগ্রা ও আজমীরের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয় অথচ শ্মশানে পরিণত বিরাট গৌড়নগরীর কথা কারও মনে জাগে না। প্রথম মহীপালের নেতৃত্বে গৌড়রাজ্যের পত্তন হয়। ব্রহ্মপুত্র হ'তে শোন নদীর তীর এবং হিমালয় হতে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত এই রাজ্য পালরাজগণের অধীনে বিস্তৃত ছিল। তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজগণের প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। পরবর্ত্তী মুসলমান আমলে গৌড়ীয় মহিমা অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়। মুসলমান বাদশাহদের শাসনকাল ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গলার ঐশ্বর্য এই রাজ্যের বিস্তৃতিতে যেরূপ সুস্পষ্ট হয় এমন আর কোথাও নয়।

পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফারিয়া-ই-সুজা ([illegible]) বলেন, একসময় গৌড়নগরে বার লক্ষ লোক বাস করত। এত বড় নগর আধুনিক ভারতবর্ষেও কি সম্ভব হয়েছে? ইদানীং এই বিরাট নগর একটা বিশাল ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হতে সংগৃহীত ইষ্টক ও মাল মশলার সাহায্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজমহল ও রঙ্গপুর প্রভৃতি শহরের সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছে গৌড় সমসাময়িক লণ্ডন অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর ছিল। গৌড়ের বিরাট বিস্তৃতি বিশ মাইল পর্য্যন্ত ছিল—প্রস্থেও নগরটি প্রায় পাঁচ মাইল ছিল। সেকালের প্রথা অনুসারে নগরের চারিদিকে প্রাকার ছিল—তা উচ্চতায় ছিল চল্লিশ ফুট এবং প্রশস্ত ছিল ২০০ ফুট। প্রাকারগুলি পাথর ও ইটের তৈরী ছিল। সেকালে এ সমস্ত প্রাকারের উপর অট্টালিকা শোভা

বর্দ্ধন করত। পূর্ব্বদিকের প্রাকার দেড়শ গজ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এর উপর দিয়ে একটা পথ তৈরী করা হয়েছিল। রাজধানীর পশ্চিম দিকে গঙ্গা প্রবাহিত হ'ত। প্রাকারের বাইরেও এই মহানগরী আরও কুড়ি মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে ব্যাপ্ত ছিল। শহরের পূর্ব্বে, উত্তরে ও দক্ষিণ দিকে আরও কয়েকটি প্রাকার ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে নগরের শোভা বর্দ্ধন করত এবং অনেক সময় বর্ষার প্লাবন রুদ্ধ করত। গৌড়ের রাজপথগুলি পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকদের মতে অতি সরল ও বিস্তৃত ছিল, উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রাজপথের শোভা বর্দ্ধন করত। ফারিয়া-ই-সুজা গৌড় সম্বন্ধে যে বিবরণ রেখে গেছেন তা হ'তে মনে হয় সমসাময়িক যুগে জগতের কোন নগরই গৌড়কে হতপ্রভ করতে পারত না। নগর হিসাবেও গৌড় একটা অপরাজেয় ও বিশ্বজনীন সৃষ্টি।

গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ বাঙ্গলা দেশকে মাতৃভূমির ন্যায় মনে করতেন এবং বাঙ্গলার প্রভাবেই নিজেদের অনুসিক্ত করেন। এজন্য বাঙ্গলা সাহিত্য মুসলমান বাদশাহগণের নিকট অশেষভাবে ঋণী। হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং পরিশেষে তাকে গুণরাজ খাঁ এই উপাধি দান করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলে' ঘোষণা করে। বাঙ্গাল কবি হুসেন শাহকে সাহিত্যে অমর করেছে . —

"শাহ হুসেন জগৎ ভূষণ সেহ এহি রস জানে
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দরগণে যশোরাজ খানে

এই সম্রাটের সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করে। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন। এরূপে দেখা যাবে বাঙ্গলাদেশের মুসলমান বাদশাহগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে অমর হয়ে গেছেন। এ দেশের আবহাওয়ায় ইস্‌লাম একটি নূতন ঐতিহাসিক স্তর রচনা করে গেছে। কোন রকম ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গলাদেশে সম্ভব হয় নি। গৌড়ীয় আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি আলাওল মাগন ঠাকুর নামক আরাকান রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আদেশে পদ্মাবতী প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এখানকার আদর্শ কিরূপ উদার এবং জীবন কিরূপ ভাবপ্রবল ছিল, সাহিত্যের এই মহার্ঘ অঙ্ক তা সূচিত করছে। গৌড়ের সম্রাট নাসির খাঁ মহাভারতের অনুবাদ তৈরী করান। বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠতম কবি বিদ্যাপতি নাসির শাহ ও গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দিনকে অজস্র প্রশংসা দ্বারা নিজের কাব্যে অমর করে গেছে। বস্তুতঃ ইস্‌লামের সাম্যবাদ বাঙ্গলার স্বাতন্ত্র্য প্রীতির সহিত যুক্ত হয়ে সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব মরীচিকা সৃষ্টি করে।

সৌধকলাতেও বাঙ্গলার মুসলমান সম্রাট্‌গণের কীর্ত্তি অমর হয়ে গেছে। বৈচিত্র্য, নূতনত্ব, রসসমাবেশের প্রাচুর্য্যে বাঙ্গলার সৌধসমূহ ভরপুর! মুসলমান বাদশাহগণের আমলে বাঙ্গলা দেশে যা সৃষ্ট হয় তা একান্তভাবে বাঙ্গলার শীলতা ও প্রতিভার দ্যোতক। ইদানীং সমগ্র গৌড় একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তবুও বাঙ্গলাদেশ যে প্রতিভাদ্বারা মস্‌জিদ রচনা করে' বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে তার যথেষ্ট নিদর্শন গৌড়ীয় স্থাপত্যে পাওয়া যায়। এখানকার এক একটী মস্‌জিদ এক এক রকম। এরূপ বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের ছন্দ সৌধজগতে অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সভ্যতা ও শীলতা, দুর্লভ স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের বার্ত্তায় এই সমস্ত সৃষ্টি মণ্ডিত। গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ এই সভ্যতার ঐশ্বর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত করেছেন। হ্যাভেল সাহেব এখানকার মস্‌জিদগুলি সম্বন্ধে বলেন: "They differ as widely from true Saracenic type as any Hindu temple. The Mahomedan buildings at Gour, Pandua and Malda are Bengali—not Arabic or Persian." এ গৌরব সামান্য নয়। দিল্লী, গুজরাট, আরব্য পারশ্য রীতিকে বর্জ্জন করে, একটা নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করা মুসলমান সভ্যতার ইতিহাসেও একটা নূতন ব্যাপার। শুধু বাঙ্গলাদেশেই এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে।

যারা মনে করে একটা গম্বুজ ছাড়া কোন মস্‌জিদ রচনা সম্ভব নয়—তারা ফতে খাঁর মসজিদ দেখে অবাক হয়ে যাবে। বাঁশের তৈরী বাঙ্গলা কুটিরের লালিত্যে মণ্ডিত ক'রে এই উপাসনাগৃহ তৈরী করা হয়েছে। ছোট সোনা মস্‌জিদের গম্বুজের লীলায়িত তরঙ্গের মাঝখানেও বাঙ্গলার সৌধ কল্পনার এই বিশিষ্টতা স্থান পেয়েছে।

বার দুয়ারী মসজিদের উপরের ভাগ দেখে' মনে হয় যেন একটা লীলায়িত তরঙ্গশ্রেণী উদ্বেলিত হচ্ছে। এরূপভাবে গম্বুজকে নূতন ছন্দে প্রয়োগ করা জগতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বাঙ্গলার কাব্যপ্রাণ আবহাওয়া ও রসভরপুর চিত্ত নূতনত্বের নেশায় মসগুল হয়ে এই রকমের অপরূপ রচনায় অগ্রসর হয়েছিল। আগ্রা দিল্লী কোথাও এত বৈচিত্র্য খুঁজে

পাওয়া যাবে না। ছোট সোনা মসজিদের প্রবেশদ্বারের অলঙ্কার একটি কবিতা স্থানীয়। এই দ্বারে নকসার যাদু রচনা করে' শিল্পী সকলকে মুগ্ধ করেছে। এর ভিতর ভারতীয় পদ্দার প্রাচুর্য্য দেখে পুলক সঞ্চার হয়। সমগ্র সৌধে বাঙ্গলার রীতিকে মধ্যমণি করে' শিল্পী এক অসামান্য সম্পদ রেখে গেছে। কোন ইউরোপীয় লেখক বলেন : "The whole building with its elaborate curving and other decorations is a striking contrast to the more severe great mosques and shows that the local craftsman was a master in elaborate work when this was required."

লোটন মস্‌জিদে সঞ্চারিত হয়েছিল বর্ণের লীলা। মুসলমান মস্‌জিদে চিত্রকলার স্থান নেই — হিন্দু মন্দির চিত্রের বহুমুখী বিলাসে ভরপুর। বাঙ্গলার মুসলমান প্রতিভা এই রিক্ততা পূরণ করেছে লোটন মসজিদে। শাদা, হলদে, নীল সবুজ ও লাল টালি দিয়ে খিলান্ রচিত হয়েছে। মনে হয় যেন অসংখ্য চিত্রে মস্‌জিদ পূর্ণ হয়ে গেছে। লোটন মস্‌জিদের বাইরের কুলুঙ্গির ছোট ছোট গভীর অংশগুলি Barvelief এর ন্যায় মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এরূপ রচনা দেখতে পাওয়া যায় না -- পৃথিবীর অন্য সভ্যতাও এই রকমের একটা স্বাধীন কল্পনা করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীর ঐশ্বর্য্যকেও এই সৃষ্টি-প্রতিভার নিকট লজ্জাবনত হ'তে হয়। ফ্রাঙ্কলিন বলেন : —"I have not myself met with any thing superior to it for elegance of style, lightness of construction or tasteful decoration in any part of upper Hindusthan."

আবার কদম রসুল মস্‌জিদে দেখা যায় আর এক রকমের সৃষ্টি। বস্তুতঃ বৈচিত্র সৃষ্টি করে' শিল্পীরা ক্লান্ত হয় নি। কাব্য রচনার ন্যায় এই সমস্ত সৌধ এক রকমের লীলায় হিল্লোলিত হয়েছে। বাঙ্গলাদেশের স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি এমনিভাবে সাহিত্য ও শিল্প সর্ব্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। কোন রকম একঘেয়ে ব্যাপার রচনা করে' কারিগর তৃপ্তি পায় নি-- -এ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান অখণ্ড ভাব সম্পদের অধিকারী হয়েছে। ভারতের অন্য কোথাও এরূপ উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী যুগে মুর্শিদাবাদেও মুসলমান স্থাপত্যের যে অধ্যায় রচিত হয় তাতে বাঙ্গলার শ্রী ও ধারা অক্ষত থাকে। মুর্শিদাবাদের চৌক মসজিদে শিরোভাগে গৌড়ের ছন্দ প্রাণবান্ হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদ প্রাসাদের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে এই মস্‌জিদটি অবস্থিত। মিরজাফরের মহিষী মণি বেগম এই সৌধটি রচনা করেন ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইদলফিতর এবং ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে এই মস্‌জিদটি ব্যবহৃত হয়। নিজামত কিল্লার দক্ষিণ সিংহদ্বারের চিত্রে দেখা যাবে অতি সামান্য উপকরণের সাহায্যে কিরূপ অসামান্য রূপ সৃষ্টি সম্ভব হয়। মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ সৌধই ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে—সমগ্র শহরটিও একটা বিরাট স্তূপে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গলার শেষ যুগের এই সমস্ত কীর্ত্তি বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মনন, প্রতিভা ও স্বপ্নের দ্যোতক হয়ে যে দৃশ্য উদঘাটিত করে তাতে মনে হয় বাঙ্গলাদেশের স্বাতন্ত্র্য একটা মূল্যবান ব্যাপার। যুগে যুগে বাঙ্গলাদেশ ঐ উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা যে নেতৃত্ব করে এসেছে তা কিছুতেই ভারতের অন্য প্রদেশের নিকট অবনতি স্বীকার করতে পারে না। বাঙ্গলাদেশের গৌরব বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের স্মরণ করে অগ্রসর হ'তে হবে। নগর সৃষ্টির ব্যাপারেও বাঙ্গলার প্রতিভা ছিল জগতে অতুলনীয়। লর্ড ক্লাইভের মতে মুর্শিদাবাদ লণ্ডন অপেক্ষাও মহত্তর— এই নগরকে প্রাচ্যের লণ্ডন (London of the East) আখ্যা দিয়ে সমগ্র এশিয়ায় বাঙ্গলাদেশের মর্য্যাদা বাড়ান হয়েছিল।

সঙ্গীতের প্রাণধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঙ্গীত এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে সংসারে প্রায়ই পণ্ডিতে পণ্ডিতে এমন দ্বন্দ্ব বাধে, যার সমাপ্তি হয় অপঘাতে। অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য্য করে--সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে, যা প্রায় ইউরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ। প্রাচীনকালে সঙ্গীত বিষয়ে যে যা বলেছেন সে-সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা আমার নাই, কাজেই সে-সমস্যা আমি এখানে তুল্‌বো না। আমি সাধারণভাবে বল্‌লে সকলের কাছে তা গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা না করে' আমার মন্তব্য সরল ভাষায় বল্‌ব।

সঙ্গীত একটি প্রাণধর্ম্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, এ-কথা বলা বাহুল্য। চতুর্দ্দিকের পরিশ্রমের ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর এবং যে যা পেয়েছে তারচেয়ে বেশী কিছু পাবার জন্য অন্তরের দাবী, প্রেরণা--এই দুইটী লক্ষণকে মিলিয়ে সঙ্গীতের তত্ত্বতে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করি। যে-স্পর্শ আমাদের প্রতিনিয়ত হচ্ছে তারই প্রত্যুত্তররূপে আমাদের চিত্ত থেকে এটা প্রকাশ পায়; প্রাণের যে-ধর্ম্ম সঙ্গীতেরও হবে সেই ধর্ম্ম। তা যদি হয় তাহ'লে আমাদের এ-কথা চিন্তা করিতে হবেই যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে-গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। এক সময় মোগলের আমলে রাজৈশ্বর্য্য যখন উচ্ছ্বসিত সেই সময় তানসেন প্রভৃতি সুধিগণ সঙ্গীতের যে-রূপ দিয়েছিলেন তা তৎকালীন সাম্রাজ্যের সহিত জড়িত। তখনকার কালের শ্রোতাদের কানে যে-গান যথার্থ তাঁদের নিজের অন্তরের জিনিষ হবে সেই গানই তাঁরা উপহার দিয়াছিলেন। তা' তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সেই Surroundings যে আজকে নেই এ-কথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগে এক রকম সঙ্গীত ছিল--'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল--বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়া কর্ম্ম, যজ্ঞে তা' রস, রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতালাভ করেছে। পরবর্ত্তীকালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা' আমরা নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি না। তারপর এল কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সঙ্গীত, নৃত্য, গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্যগৌরব এবং আবেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে। আনন্দ যখন হয়ে উঠেছিল অভ্রভেদী--তখন তারই অনুরূপ সঙ্গীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাঙলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্বর্ত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় বর্দ্ধনের দিকে। পরিমিতভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীর ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসে গানে, নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন বৈষ্ণব সঙ্গীত--সমস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে, বাঙালীর প্রাণ আপনার সঙ্গীতকে উদ্ভাসিত করেছে--যেহেতু তার ভিতরের হৃদয়বেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারেনি। যে-কীর্ত্তন বাঙালী গেয়েছিল তা' তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সে তার প্রাণের ধর্ম্ম প্রকাশ করেছে এবং আরও পাবার জন্য দাবী করেছে। এটা আমার কাছে গৌরবের বিষয় বলে মনে হয়। বাইরের স্পর্শে যে-ই কোনো উদ্দীপনা তাকে জাগিয়ে তুলেছে অমনি সে সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সাহিত্য তার প্রমাণ। আজকের দিনের বাঙালী, যে-বাঙালী একদিন এই কীর্ত্তনের মধ্যে লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে, সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে?

Classical আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কি গেয়েছেন জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন? আমরা তো তানসেনের সময়ের লোক নাই--আমরা কি জড়পদার্থ? আমাদের কি কিছুমাত্র নূতনত্ব থাক্‌বে না? কেবল পুনরাবৃত্তিই করব?

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন যে, পুনরাবৃত্তির পথে চলা আমাদের অভ্যাস নয়। নূতনের পথে ভুল করে যাওয়াও ভাল--তাতে মৃত্যুরও পরিপূর্ণতা আনে।

আমি স্বীকার করবো, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যের সীমা নেই--যেমন অজন্তার মত কারুকার্য্য আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ছোটছেলের মত তার উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে পুনচিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম্ম, সেই কি আমাদের আদর্শ? যে পূর্ণতা পূর্ব্বতনকালে আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, তাহ'লে ব্যর্থ হ'ল আমাদের শিক্ষা। বড় বড় লোকগণ শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ কর- সেই অনুপ্রেরণাকে তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ কর। তানসেন অনুকরণের কথা বলেননি এবং কোন গুণীই তা' বলেননি -বলতে পারেন না।

আজকের দিনে ইউরোপ অদ্ভুত দুঃসাহসের সঙ্গে নূতন নূতন পথে আপনাকে উন্মুক্ত করতে চলেছে। অন্তরের মধ্যে তাদের কী সে ব্যাকুলতা! তাদের সে প্রকাশ রূঢ় হ'তে পারে, কুশ্রী হ'তে পারে, কিন্তু তা যুগের প্রকাশ, তা' প্রাণের প্রকাশ। আমাদেরও তাই দরকার। যদি দেখি হোল না, তাহ'লে বুঝব- প্রাণ জাগেনি। আজ পর্য্যন্ত আমরা রাষ্ট্র-ভাষায়, স্বকীয়ভাবে ভাবতে পারিনি। ধিক্ আমাদের। তাদের প্রদর্শিত পথে চল্‌লে আমরা মোক্ষলাভ করব? কখন না- কখন না। এই যে গতানুগতিকতা, এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই। কত রকম যুগের বাণী, কত দুঃখ কত আঘাত আমাদের উপর পড়েছে। তার কিছু কি আমরা রেখে যাব না? ১০০ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশকে আমাদের নবজাগরণের চিত্র কি দেখাব? তাদের কি আমরা এক হাজার বছরের পুরাতন জিনিষ দেখাব? ইংরাজের নিজের প্রকৃতিগত রাজনীতিকে দূরদেশ থেকে নিয়ে এসে রোপণ করাব আর এই কথাই ভবিষ্যৎকে জানাব? আজ প্রথম চাই নূতনের সন্ধান। তার গান, তার রূপ, তার কাব্য, তার ছন্দ আমাদের মধ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ হবে। এই যদি হয় তবে বাঙালী হবে ধন্য। নকলে চলবে না। আমাদের সঙ্গীত চিত্রকলা রাষ্ট্রনীতি আমাদের আপন হোক—এই আমার বলার কথা।

আমি বলব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না; আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি থেকে যাবে। আমাদের সেই আভা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্ব্বতন কালে কীর্ত্তন-গানে, বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙালী আপনাকে সঙ্গীতে, চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে, তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না-- যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা-কিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে, নকল করে নয়।

(কার্ত্তিক-পৌষ/২য় বর্ষ ১৩৪১)

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ গত কার্ত্তিক পৌষ সংখ্যার "বুলবুলে" "সঙ্গীতের প্রাণধর্ম্ম" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি কোন্ কল্পিত বাঙালী অনুকারকের উদ্দেশ্যে কেন যে সহসা এত উষ্ণ হ'য়ে "ধিক্ আমাদের" "কখন না--কখন না" ধরণের উচ্ছ্বসিত ভাষা ব্যবহার করেছেন ভেবে পাইনে। কিন্তু যারই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শক্তিশেল নিক্ষেপ করুন না কেন--তাঁর মনে যখন আঘাত লেগেছে তখন তাঁর--বয়োবৃদ্ধত্বের দরুণই -ক্রোধের এ-ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার আছে। তাঁর প্রতিপক্ষ যদি কেউ থাকেনও, তিনিও নিশ্চয়ই এতে কিছু মনে করবেন না। আমরাও তাই এ-প্রবন্ধে শুধু তানসেনের সময়ের গানালাপের প্রতি তাঁর মূল আপত্তিরই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব -তাঁর উষ্ণতার উত্তর না দিয়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাবেই এ-প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি, আশা করি কবি নিজ গুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন--যদি প্রতিবাদের ঝোঁকে কোথাও দু'একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়ই। মনে রাখবেন যেন তিনি যে, সঙ্গীতে তাঁর কথা সারগর্ভ মনে করতে পারিনি আমরা বহু সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও। এবং এ চেষ্টাও আমাদের আজকের নয়, বহুদিনের। কাজেই মতভেদের জন্যে কবি রাগ না করেন যেন, এই বিনীত অনুরোধ রইল। ভরসা এই যে, কবি নিজেই আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে সঙ্গীত বা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতভেদ যদি হয়ই তবে তা যেন অকুণ্ঠে প্রকাশ করি, তিনি কিছুই মনে করবেন না, করতেই পারেন না।

প্রবন্ধটি পড়লেই যে-প্রশ্নটি সব আগে মনে হয় সেটা এই যে, কবি তানসেনের গানে "পুলকিত" হওয়াটাকে প্রাণ না থাকার এহেন মারাত্মক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করলেন কেন? যিনি চিরদিন সাহিত্যরসের চিরন্তনতা নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর কথাই বলেছেন, তিনি এ সহজ কথাটা ভুলে গেলেন কেন যে, সঙ্গীতের রসের মধ্যেও এমনি চিরন্তনতাই আছে ও থাকতে বাধ্য?

গত মাঘের "পরিচয়ে" কবির একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে শেষের দিকে আছে এই কয়টি কথা :

"বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দ-লোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে-সৌন্দর্য্য যে-প্রেম যে-মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে, তার তো বয়সের সীমা নেই! কোন আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না, বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন। ....সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ ক'রে আসছে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চির-পুরাতন। ....তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে, বর্ত্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন : যে তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে নবীনতাকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌তে পারিনে--

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল--

তাকে যেন সত্যই নূতন ব'লে ভ্রম না করি, সে আপন জন্ম-মুহূর্ত্তেই আপন জরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার আয়ুঃস্থানে যে শনি, সে যত উজ্জ্বলই হোক--তবু সে শনিই বটে।"

এ-কথাগুলির সারবত্তায় সাড়া না দেবে কোন্ রসিক? শেক্সপীয়র কালিদাস এস্কাইলাস ব্যাস বাল্মীকি হাফেজ এঁরা পুরোনো হ'য়েও আজও চিরনূতন, একথা অস্বীকার করবে কোন্ "ফিলিস্টাইন"? কে আজ লজ্জিত হবে স্বীকার করতে যে এই সব বিশ্ববরেণ্য নমস্যদের রসরচনায় তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত ভাবে সাড়া দেয়, তার তনু-মন প্রাণ "পুলকিত" হয়? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তানসেনের সঙ্গীতে (ব্যাস বাল্মীকি এস্কাইলাসের তুলনায় এ-সঙ্গীত সেদিনকার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও) পুলকিত হ'লে তার জবাব-দিহি করার দরকার আছে, একথা কবি উষ্ণ উগ্র ভাষায়ই প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখছেন : 'তানসেন কি গেয়েছেন জানি

না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর কেউ যদি পুলকিত হন তবে বলব, তিনি এখন জন্মেছেন কেন? আমরা তো তানসেনের সময়ের লোক নই--আমরা কি জড়পদার্থ?' (বুলবুল--২৫৭ পৃষ্ঠা)

একথা শুনে কিন্তু মনে হয়, সব সঙ্গীতরসজ্ঞই একবাক্যে বলবেন : "বিস্ময়ের আমাদের অবধি নেই যে তানসেনের অপূর্ব্ব চির-নতূন গভীর রাগমালায় সাড়া দেওয়ার জন্যে আধুনিকতার কাঠগড়ায় জন্মগ্রহণ করার জন্যে জবাবদিহি করতে আমরা বাধ্য--এই "পুলকিত হওয়ার শোচনীয় অপরাধে!" আমার মনে হয়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মর্ম্মজ্ঞ সবাই বলবেন যে ভারতে এমন অপূর্ব্ব খাঁটি ও উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতরস অদ্যাবধি কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি যার মহিমার কথা ভাবতে আজও বিস্ময় জাগে, মনে হয় এ অসম্ভব কী করে সম্ভব হল : এই যে চিরন্তন আনন্দ, এই যে চিরন্তন শিহরণ, এই যে চিরপুরাতনের চিরনবীনতা, এতেও সাড়া দেওয়া কবি অপরাধ মনে করেন!! "পুলকিত" হ'লে রুষ্ট সুরে বলেন যে, এ অসহ পুলক জড়পদার্থের লক্ষণ!!!

কবি য়ুরোপের প্রাণবত্তার কথা বার বার উল্লেখ করেন--এ-প্রবন্ধেও করেছেন বলেই বলছি, (নইলে এ প্রসঙ্গে য়ুরোপের নজীর দিতাম না) যে, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরসজ্ঞদের সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হ'য়েছিল - নিবিড় পরিচয়। তাঁরাও কিন্তু ভারতের তানসেন প্রমুখ সুরকারের সুরসমৃদ্ধিতে "পুলকিত" হতেন তারও বেশি আত্মহারা হ'তেন। এ সঙ্গীতের পূজারী আমরা যাই হই, তাঁরা তো জড়পদার্থ নন! রোমাঁ রোলাঁ তো জড়ধর্ম্মী মানুষ নন অথচ এ সঙ্গীতে তিনি তো চির-উচ্ছ্বসিত--মুগ্ধ। কত চিঠিই তিনি আমাকে লিখেছেন আমাদের ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের প্রাণবত্তায়। সে দিন জর্জ দুহামেলও* একটি পত্রিকায় লিখেছেন উচ্ছ্বসিত সুরে যে, ভারতের অপূর্ব্ব তানালাপ-সংবলিত রাগমালা : "vont, dans l'expression des sentiments, des passions et des idees, aussi loin et aussi profound qu'il est humainement possible d'aller". "অর্থাৎ শুদ্ধ সুরগতির সঙ্গীত মানুষের আবেগ অনুভূতি আইডিয়া উচ্ছ্বাস প্রভৃতির প্রকাশে তত সুদূর তত গভীর রাজ্যে পৌছতে পারে যতটা গভীরতার রাজ্যে পৌছন মানুষের পক্ষে সম্ভব।"+ এ কি সহজ তারিফ? এঁরা এবং অন্য অনেকেও বার বার আমাকে বলেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের তানালাপের বিকাশের এই ধারা যদি কোনো অত্যাধুনিকতার (কবির ভাষায়) "বিদ্রোহীভাবে নূতন" আঁধিতে পথহারা হয়, তবে জাপানী সঙ্গীতের মতনই দুরবস্থা হবে আমাদের সঙ্গীতের। এ সম্পর্কে এই কথাটা মনে রাখবার আছে বিশেষ করে যে, (কবিরই ভাষায়) "মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন।" কবি বার বার কত উপমায়ই না প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতি একই ফুল বার বার ফোটান যুগে যুগে কালে কালে--কেন না পুরাতনে তাঁর লজ্জা নেই, কেন না প্রকৃতি যে জানেন চিরপুরাতনে চিরনবীনতা সঞ্চারের গুহ্য তত্ত্বটা। (কবির "বনবাণী" দ্রষ্টব্য) তাই যদি তানসেনের গানে আমরা আজও "পুলকিত" হয়ে উঠি, তবে তার জন্যে কবি আমাদেরকে তাঁর অনুপম লেখনী-নৈপুণ্যের বলে লজ্জার কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও বীণাপাণির কাছে আমরা নিশ্চয়ই এ-আনন্দের অঙ্গীকারের দরুণ সাজা পাব না। তিনি বলবেনই বলবেন যে, এ আমাদের গৌরবের তিলক,--কলঙ্কেরই চুণকালি নয় যে, তানসেনের গানে আজও আমরা "পুলকিত" হ'তে পারি, হীরেকে হীরে বলে চিন্‌তে পারি ব'লেই কাচকে সে মূল্য দিতে মন চায় না, বা অন্য কোনো গানকে বিদ্রোহী আধুনিকতার দাবীতেও সে-আসনে বসাতে পারি না।

কিন্তু কবি হয়ত পারেন। জানি না পারেন কিনা। তবে এটা জানি যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূল ধারাটিকে তিনি কোনো দিনই দরদ দিয়ে বুঝতে পারেননি। বহুদিন আগে তাই তো কবি 'বঙ্গবাণী'তে এমন কথাও লিখেছিলেন যে সহজ সরল সুরের গান হ'ল সন্দেশ আর আলাপ হ'ল চিনিরপানা। কিন্তু আলাপ যে সুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গভীরতম রসমূর্ত্তি এ-কথা সুরপ্রেমিক মাত্রেই জানেন। কবি কথার প্রেমিক, সুরের পাগল নন, তাই সুরবিকাশের এ গোড়ার কথাটাও ধরতে পারেননি--যা সুরদরদী মাত্রেই জানেন ও মানেন একবাক্যে। আর পারেননি ব'লেই তানসেন প্রমুখ মহাসুরকারদের সুরসৃষ্টির মর্ম্মস্থলে তিনি এ-পর্য্যন্ত কোনো মতেই পৌছতে পারলেন না। সেইজন্যেই তিনি এই গোড়ায় গলদ ক'রে বসেছেন বার বারই (যে-রকম মারাত্মক ভুল সাহিত্যে তিনি কখনই করতেন না।) এই খবরটি না রেখে যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বহু বিচিত্র বিকাশ সম্ভব ও এখনো হচ্ছে ঠুংরি প্রভৃতিতে,

---

* জর্জ্জ দুহামেল ফ্রান্‌সের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক--বিশ্ববিখ্যাত রোমাঁ রোলাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইনি, এবং তাঁরই মত সঙ্গীতজ্ঞ। কয়েক বৎসর আগে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্পর্কে রোলাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিচিত্রাতে দ্রষ্টব্য। অথচ রোলাঁ এযুগেই জন্মেছেন একথা অস্বীকার কবি কী করে?

+ আমার নব 'নবগীতিমঞ্জরীর' দ্বিতীয় সংস্করণের নবভূমিকায় ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সমর্থনে অনেকগুলি কথা বলেছি। গত আশ্বিনের 'উত্তরা'য়ও তার পুনরুক্তি করতে চাইনি বলেই সঙ্গীতরসজ্ঞদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তার মূল ধারাটিকে (improvisation-এর ধারাকে) বজায় রেখে। একথা প্রমাণ করতে যাওয়াই বাহুল্য--তবু মূলধারা বলতে কি বুঝছি, বিশদ ক'রে বলি একটা উদাহরণ দিয়ে।

শেক্সপীয়র মিল্টনের আগেও ইংরাজি সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল--সবাই জানেন। নানা কবিই সে ছন্দে লিখেছেন। প্রত্যেকের হাতেই নানাগুণ ফুটে উঠেছে সে ছন্দে। কিন্তু হঠাৎ শেক্সপীয়রের মিল্টনের হাতে এ-ছন্দের অভূতপূর্ব্ব বিকাশ দেখা দিল--যা তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের হাতে দেখা দেয়নি। কিন্তু শুধু পুরাতন ব'লেই যদি সব-কিছু সনাতন আনন্দসৃষ্টি নূতনের রাজ্যে নামঞ্জুর হয় তবে বলতেই হয় যে, অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি পুরাতন ব'লে শেক্সপীয়র মিলটনের হাতে সে-ছন্দে নূতন মহাসৃষ্টি হওয়াটা হ'ল "পুনরাবৃত্তি"। কিন্তু এ-কথা কোনো কাব্যজ্ঞই বলেন না, কোন ছন্দজ্ঞই বলেন না। আসল কথা, নূতন পুরাতন নিয়ে নয়--আসল কথা প্রতিভা নিয়ে। কবি যদি সঙ্গীত-জগতের খবর রাখতেন, তবে জানতেন যে তানসেনের দরবারী কানাড়া আজও চির-নূতন আছে এ জন্যে নয় যে সব ওস্তাদ একই ধরণের (তাঁর ভাষায়) "পুনরাবৃত্তি" ক'রে থাকেন। তিনি যদি দরবারী কানাড়ার মর্ম্মে প্রবেশ করতেন তবে দেখতেন, ঐ একই রাগে প্রতি বড় সুরকার নিত্যই করেন নব সুরসৃষ্টি। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের বিকাশধারায় এ-কথাটি হ'ল সুরসৃষ্টির গোড়াকার কথা। কবি বারবার "নকল, নকল" ক'রে ক্রোধ-উচ্ছ্বসিত হ'য়েছেন।* মানি যে ছোট ওস্তাদে নকল করে। কিন্তু কোনো বড় শিল্পের অক্ষম কীর্ত্তিমন্তদের কীর্ত্তিই তো প্রামাণ্য নয় তার রসগভীরতার মহিমাবিচারে। দেখ্‌তে হবে, বড় গুণী কী করছেন। যাঁরা বড় গুণী তাঁরা তাঁদের প্রতিভারই প্রসাদে নকলে খুশি থাকতে পারেন না। আজও তাঁরা ঐ সা রে, কোমল গা মা পা, কোমল ধা, কোমল নি--এই কয়টি সুরের নানা বিন্যাসে, নানা দোলায়, নানা আরোহণ-অবরোহণেই দরবারীতে বিচিত্র চমক, বিচিত্র শিহরণ নিত্যই সৃষ্টি করেন। সে-বৈচিত্র্য এত রকম তানের, ঢঙের, নূতন বিস্তারভঙ্গির, নূতন কদমের--কত কী--যে ভাবতে লাগে বিস্ময়! --সব বড় সৃষ্টিই অবশ্য বিস্ময়-- তবু এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে প্রতি বড় ওস্তাদ এক একজন বিস্ময়কর স্রষ্টা সুরকার--Composer--একথা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহিমার একটি গোড়াকার কথা--প্রতি সঙ্গীতজ্ঞই মানবেন। কাজেই কবির ও অভিযোগ ব্যর্থ, যেহেতু ওটা হ'ল প্ল্যাটিচিউড যে, "তানসেন অনুকরণের কথা বলেননি এবং কোনো গুণীই তা বলেননি, বলতে পারেন না।" (বুলবুল ২৫৭ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আমরাও সানন্দেই কবির সঙ্গে সায় দিচ্ছি তাঁর একথায় : বলেননিই তো! কে বলেছে : তানসেনের তানালাপের মাছিমারা অনুকরণ করো? তাছাড়া তানসেনের অজস্র স্বরবিন্যাসের কি শতাংশের একাংশও জীবন্ত আছে যে আজ কেউ তা অনুকরণ করবেন--করতে চাইলেই? সবাই জানেন যে তানসেনের রাগের নানা পরিবর্ত্তন নানা বিকাশ ঘটেছে তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে এবং হওয়াই তো চাই। আর চাই ব'লেই অনুকরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। এ আমার পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা নয়। আমি অন্ততঃ দশবারজন ওস্তাদের কাছে শিখেছি--তাঁদের মধ্যে দু'তিনজন প্রতিভাবিহীন ওস্তাদ ছাড়া প্রত্যেকেই দেখাতেন, কি ভাবে নতুন নতুন স্বর-বিন্যাসের সৃষ্টি করতে হয়, উৎসাহ দিতেন নতুন নতুন তাল সৃষ্টির পথে। এ-ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটা গোড়াকার কথা--আমি বহুবার বহু রচনায় ও বক্তৃতায় নানাভাবে গেয়ে স্বরলিপি ক'রে দেখিয়েছি, কীভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতে নূতন সৃষ্টির পথ খোলা রাখা হয়।

কবি বলবেন হয়ত যে এ-সৃষ্টি টেক্‌নিক্যাল, এও "গতানুগতিকতা", অতএব "সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়" (২৫৭ পৃষ্ঠা)। এ-কথা বল্‌লে অবশ্য আমরা নিরুপায়। কারণ যে-বৈচিত্র্যের প্রতি স্পন্দনে হৃদয়তন্ত্রী আমাদের কেঁপে ওঠে, জৌনপুরীতে, দরবারীতে, মালকোষে প্রতি বড়গায়কের মধ্যে যে নিত্য নব তানালাপে মনে প্রাণে জাগে রোমাঞ্চ তাকে "গতানুগতিক" বল্‌লে কী ক'রে বোঝাব তাঁকে এর চিরনূতনত্ব, এর চিরসঞ্চলমান প্রবাহমান বিকাশধারা?

কিন্তু তাঁকে না বোঝাতে পারলেও কোনো প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞকেই এ-কথা বোঝাতে হবে না। কেননা তিনি অপরোক্ষ অনুভূতিতে একথা জানেন যে তানসেনের বাহার, আড়ানা, মিঞামল্লারে নূতন সৃষ্টির পথ আজও খোলা--নানা রাগের সঙ্গে

---

* বহুদিন আগে "রূপম্" পত্রিকায় ও সম্প্রতি 'নবগীতিমঞ্জরী'র ভূমিকায় এবং 'অতুলপ্রসাদতর্পণে' (আশ্বিনের 'উত্তরা'য়) আমি দেখিয়েছি যে আসলে সুরকারের সুরকে অনড় অচল করাটাই নকল--হুবহু নকল য়ুরোপের--ভারতের সঙ্গীতধারা গায়ককে বরাবর অবকাশই দিয়েছে স্বাধীনতার--ব'লেছে নকল না ক'রে নূতন তানালাপের সৃষ্টির পথে বড় হতে। গানে সুরকে অচল অনড় করতে ভারতীয় সঙ্গীতকার কোনাদিনই চাইবেন না--আর তাই ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রাগসঙ্গীত--আজও চিরনূতন।

নানা রাগ মিশ্রণের পথ আজও খোলা—(যার ফলে ঠুংরির উদ্ভব) নানা তালে নানা সুরের নানা নূতন মেলার পথ আজও খোলা—এককথায়, প্রতিভাবান গায়ক ও সুরকার ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যে আনন্দ পান তা তাঁর প্রাণধর্ম্মের নিঃসম্বলতার জন্যে নয়—(অতুলপ্রসাদ অতুল প্রাণোচ্ছল পুরুষ ছিলেন, অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কী পুলকিতই না হ'য়ে উঠতেন তিনি বরাবরই -কোন উছল দুঃসহ আনন্দই নিঃসম্বল নয়—গতানুগতিক নয়) পান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বহু নববিকাশ আসন্ন ও নিশ্চিত এটা প্রাণেমনে অনুভব ক'রে—সুরসাধকদের আলোয় দেখে--বসন্তের সাক্ষ্যের ও সাড়ার সমর্থন পেয়ে। গত ফাল্গুনের 'বিচিত্রা'য় সুররসিক গুণী বীরেন্দ্রকিশোর এই কথাই বলেছেন যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন হবে ঐ ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতেরই পথে--কেননা এ-ই হ'ল ভারতের সঙ্গীতের গভীরতম রসস্বরূপ। এ কথা কোন্ সঙ্গীতবেত্তা স্বীকার না করবেন। কবি সঙ্গীত-জগতের খবর রাখেন না—সে সময়ই যে তাঁর নেই--তাই তো এ গোড়ার কথাটাও বলতে হ'ল সংক্ষেপে; তাকে মনে করিয়ে দিতে হ'ল বিনীতভাবে যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এমন বস্তু নয় যাকে অজস্র সাধনা বিনা আয়ত্ত করা যায়। কোনো মহৎ শিল্পই বহুবর্ষব্যাপী একাগ্র সাধনা বিনা আয়ত্ত করা যায় না--হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তো নয়ই। শুধু আয়ত্ত করা কি,--তার মর্ম্মজ্ঞ হ'তে হ'লেও তার সঙ্গে চাই বহুদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ গভীরায়মান নিবিড় পরিচয়। আর পরিচয় হয় প্রেমের সূত্রে, দরদের অন্তর্দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধার আলোয়--(কবিরই ভাষায়) "নব্যতার মদিররসে মত্ত" বেদরদী বিচারের দৃষ্টিতে নয়। কবি যদি জানতেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মর্ম্ম-কথাটী তাহলে বুঝতেন যে আধুনিক সঙ্গীতের আধুনিকতম বিকাশেও সে-ধারার মহৎ বিকাশ সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয় টপ্পাতে হয়েছে, ঠুংরিতে এখনো হচ্ছে। খেয়ালেও হচ্ছে, কিন্তু কী ভাবে হচ্ছে বোঝাতে গেলে অনেক লিখতে হবে। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণরতনজনকরের খেয়াল, আবদুল করিমের আলাপচারী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের টপ-খেয়ালের নূতন বিকাশ প্রণিধানযোগ্য। তবে এ-বিকাশের সৌন্দর্য্য ও মহিমাকে চিনতে হ'লেও যে চাই বহু সাধনাবিকশিত সুরের কান -শুধু কাব্যসাধনায় তাকে চেনা যাবে কী ক'রে? যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরাই কেবল চিনতে পারেন ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্পন্দমান অভিনবতা, বিশেষ ক'রে মুসলমান বৈদগ্ধ্যের অবদানে—যে-কথা পণ্ডিত ভাতখাণ্ডে আজও উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব'লে থাকেন- কিন্তু যাঁরা সঙ্গীতের কোনো গভীর সাধনাই করেননি তাঁদের কেমন ক'রে বোঝাব এ-কথা? তবু যে এ-প্রতিবাদ করলাম, সে অভূয়োদর্শী নবীনপন্থীদের বোঝাতে নয়, ভূয়োদর্শী সঙ্গীতদরদীদেরই বোঝাতে--কারণ কবির দুঃসাহসিক রচনা-নৈপুণ্যের দরুণ ঠিকে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে অনেকেরই। বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত "বেলফাস্ট অ্যাড্রেসে" যে যাঁরা কোনো একটা কিছুতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন, তাঁরা সেই জোরে যে-বিষয়ের বিশেষ-কিছু চর্চা করেননি সে বিষয়ে কথা বললেও মানুষের একটা প্রবণতা জন্মায় সে-কথাকে সত্য মনে করার। কবির কাব্যনৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশে তাঁর গান সম্বন্ধেও তাঁর মতামতকে অত্যধিক প্রাধান্য দেবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেই ভুল পথে যেতে পারেন তাঁর কথা শুনে। তাই তাঁদের বলি বিশেষ ক'রে কবিরই কথা উদ্ধৃত ক'রে : "নূতন যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ ক'রে, তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাতে যে বাহবা দেয়, সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য-সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না।" দুঃখ এই যে কবি সাহিত্য সম্বন্ধে এ গোড়ার কথাটা এত ভালো ক'রে বুঝেও সঙ্গীত সম্বন্ধে অধৈর্য্য হ'য়ে এ-কথা ভুলে যেতে পারেন এত সহজে! তাই তো মনের কোণে আক্ষেপ হয় এত যে, কবি যদি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম্মজ্ঞ হ'তেন তা'হলে বুঝতেন, এ-বস্তু আমাদের কী অমূল্য সম্পদ--আর কী বিপুল বিকাশের সম্ভাবনা এর মধ্যে উপ্ত--যার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত তার 'সাবলীল' ধারা বজায় রেখে সমগ্র জগতকে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দেবে। যদি তা না ক'রে শুধু "নূতন কিছু করতে হবে" বলেই আমরা এ-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হই তবে সে-ই হবে য়ুরোপীয় অনড় অচলপন্থী সুরের "নকল"--অনুকরণ।

কলস্রোতা

ইস্‌লামিয়া কলেজ

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল বা কলেজ স্থাপন করিবার দাবী আমরা সাধারণতঃ সমর্থন করি না। কেন সমর্থন করি না, বাঙ্গলা দেশের মুস্‌লিম হাইস্কুলগুলির শোচনীয় অবস্থার আলোচনা করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। সাধারণ সরকারী স্কুলের জন্য গভর্ণমেন্ট যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন মুস্‌লিম স্কুলগুলির জন্য তার চেয়ে সাধারণতঃ ঢের কম টাকা ব্যয় করা হয়। তা ছাড়া এসব স্কুলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতার অভাবে ছাত্রদের প্রতিভাব বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্য এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্নেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিত্বের আমলে যখন ইস্‌লামিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় তিনি আশা করিয়াছিলেন ইহা একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া ওঠে নাই। নানা দিক দিয়াই পেছনে পড়িয়া আছে মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটি।

শিক্ষা-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লামিয়া কলেজ হক সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, মনে হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশ, গভর্ণমেন্ট ইস্‌লামিয়া কলেজের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবেন। অমুসলমান ছাত্রদিগকেও ইহাতে পড়িতে দেওয়া হইবে। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পদসমূহের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। ভাল অধ্যাপক পাইবার জন্য যদি হিন্দু অধ্যাপক লইতে হয়, গভর্ণমেন্ট আপত্তি করিবেন না।

ইস্‌লামিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস হইতে ইহাব অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ এ. এচ. হার্লি। ইহার অবসর গ্রহণ এবং হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়টির জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা আমরা আশা করিতে পারি।

প্রতিশ্রুতি ও গণতন্ত্র

জওহরলাল মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করিতে আহ্বান করায় মুস্‌লিম নেতাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন : মুসলমানদের সংস্কৃতি, শাসনব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অংশ ইত্যাদি ব্যাপারে ভিত্তিগত অধিকার সমূহ যদি কংগ্রেস বিশেষ ভাবে মানিয়া না নেয়, মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দান করিবে না। ইহাতে 'প্রবাসী' আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার মতে "কংগ্রেস যদি এক বা একাধিক সম্প্রদায়কে বিশেষ কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক না হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবেন।" প্রবীণ সম্পাদকের কথা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি : গণতন্ত্রের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রতিশ্রুতির বিরোধ কোথায়?

ইউরোপের কোন কোন গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ব্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া নয়, সত্যসত্যই অনেকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। মিসরে যাহা গণতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয় না, ভারতবর্ষে কেন তাহা গণতন্ত্রের বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক বলিয়া বিবেচিত হইবে?

প্রগতিক লেখক-সঙ্ঘ

কিছুদিন আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রগতিপন্থী সাহিত্যিকদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতিব সম্পাদক

কলস্রোতা বুলবুল পত্রিকার সম্পদ। বাছাই কয়েকটি সংবাদগুলিই এর সাক্ষ্য।

মিঃ সাজ্জাদ জাহির সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন :

"সাহিত্য একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, অপরের আদেশে সাহিত্য রচিত হয় না সত্য - - কিন্তু প্রগতিক লেখক সঙ্ঘ যা চায় তা হচ্ছে, লেখকগণ ভারতের বর্তমান সমাজ-জীবনের বাস্তব সত্যগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকবেন। এবং সাহিত্যের ভেতর দিয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আমাদের সাহিত্য এমন হবে যার ফলে দেশবাসী নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য হয়ে উঠবেন তৎপর। উদ্দেশ্যবিহীন আর্টের কোন মানে নেই আমার কাছে। আর্টের উদ্দেশ্য থাকবেই -- এবং সে উদ্দেশ্য হবে প্রগতি।"

প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে মাঝে মাঝে প্রচার পত্র ও নানা প্রকারের পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। জানা গিয়াছে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ডক্টর মুলকরাজ আনন্দ ভারতীয় ছোট গল্পের একখানি সংগ্রহ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লেখা গল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করাই সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই।

আদালতের ভাষা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আদালতের ভাষা কি হইবে, কোন্ অক্ষরে দলিল-পত্র লিখিত হইবে - এ লইয়া তর্ক বহুদিনের। ইংরেজ রাজত্বে মুসলমান সমাজের উপর যত অবিচার হইয়াছে ভাষা সম্পর্কিত অবিচার তার কোনটির চেয়ে কম বলিয়া মনে হয় না। ভারতের মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে একসময় একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল তারও গোড়ায় রহিয়াছে অনেকটা আদালতের ভাষার পরিবর্তন।

সম্প্রতি বিহারে সমস্যাটি নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। বিহারের ইউনুস-মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভবিষ্যতে পাটনা, ভাগলপুর ও তিরহুত জেলায় কাইথি বর্ণমালার সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দু বর্ণমালাও আদালতের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে। দেখিতেছি, ইহাতেই চারিদিকে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছে। নূতন বিধান মতে কাইথি বর্ণমালাকে বর্জ্জন করা হয় নাই এবং উর্দ্দু বর্ণমালার ব্যবহারও বাধ্যতামূলক হয় নাই। কাইথির সঙ্গে সঙ্গে আদালতে উর্দ্দু বর্ণমালা ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত। তথাপি এই বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন হয়, বুঝিতে পারি না।

এই সম্পর্কে পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দেই : কাইথি কোন ভাষা নহে --- বিহারের কায়েত, পাটোয়ারী, লালা ও দেওয়ানদের আবিষ্কৃত একটি বর্ণমালা মাত্র। একথা Sir Havilland Le Mesurier পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে বিহারের দলিল দস্তাবেজ ও আইন আদালতের ভাষা এখনো পুরোপুরি উর্দ্দু। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট বাদশা শাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন তখন পারসীই ছিল এদেশের রাজভাষা। অতঃপর ১৮৩৭ সনে পারসীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দুর প্রবর্ত্তন হয়। এই সময়ও আদালতে কাইথির অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অজ্ঞাত কারণে বিহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে কাইথি বর্ণমালাকে চালাইয়া দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। এতদিন পরে বিহারের মন্ত্রী মণ্ডল একটি অন্যায়ের প্রতিকার করিলেন মাত্র। এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ইউনুস সাহেব কিন্তু নিজের গ্রহণ করে নাই। মন্ত্রী মণ্ডলী একবাক্যে — এমনকি হিন্দু মন্ত্রীরাও — এই বিধান সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি এ বিষয়ে যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট এবং কংগ্রেস এক অভিনব উপায়ে হিন্দি উর্দ্দু সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এ সম্পর্কে কংগ্রেসের করাচী প্রস্তাবেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে কংগ্রেস ও ইউ. পি. গভর্ণমেন্টের নীতিতে বিশেষ কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। কংগ্রেস সম্প্রতি মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের জন্য একটি ইস্‌লামিক বিভাগ খুলিয়াছেন। এই বিভাগের কার্য্য সাধারণতঃ উর্দ্দুতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কংগ্রেসের বিবৃতি, প্রস্তাব, পুস্তিকা ইত্যাদিও হিন্দী উর্দ্দু দুই ভাষায়ই প্রকাশ করা হয়। উর্দ্দু কাইথি উভয় বর্ণমালাই স্বীকার করিয়া লইবার ব্যাপারে 'ইউনুস কেবিনেট' কংগ্রেসের 'নেহরু

কেবিনেট'কেই অনুসরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে পূর্ব্বে শুধু উর্দ্দু ভাষারই প্রচলন ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আদালতে হিন্দীর দাবী স্বীকৃত হয়। স্যার তেজ বাহাদুরের চেষ্টায় কয়েক বৎসর আগে যুক্তপ্রদেশে স্কুল পরীক্ষার জন্য উর্দ্দু নাগরি দুই বর্ণমালাই শিখাইবার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশে বর্ত্তমানে উর্দ্দুভাষী ছাত্রদিগকে কয়েকখানি হিন্দী বই পড়িয়া লইতে হয়, আর হিন্দীভাষীদের পড়িতে হয় কয়েকখানি উর্দ্দু বই। ফলে ছাত্ররা উর্দ্দু নাগরি দুই শ্রেণীর বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হয়। একই সঙ্গে উর্দ্দু হিন্দী শিখিবার এই যে রীতি ইহার নাম second form system। এই second form system-এর গোড়ার কথা হইতেছে এই : হিন্দুস্থানী হইবে ভারতের সাধারণ ভাষা, এই সাধারণ ভাষা উর্দ্দু নাগরি দুই অক্ষরেই লেখা হইবে, শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে ঠিক এই প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছিল। বিহারের উর্দ্দু কাইথি সার্কুলারেও এই নীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। তথাপি বিহারের কংগ্রেসপন্থীদের কেহ কেহ এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। পণ্ডিত জওহরলাল যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী। উর্দ্দুই তাঁহার মাতৃভাষা। বিহারের জননায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও উর্দ্দু-পারসীতে যথেষ্ট অধিকার আছে। সুতরাং হিন্দী উর্দ্দু ও উর্দ্দু কাইথি সমস্যার বিভিন্ন দিক ইঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। এ সম্পর্কে ইঁহাদের মতামত জানিবার জন্য সমগ্র দেশ উদগ্রীব হইয়া আছে।

(আষাঢ়, ১৩৪৪)

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

যাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের অভিযোগ করিতেছেন, একটী ব্যাপারের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত মনে হয়। বাংলার তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যে, এমন কি বিভিন্ন সংবাদ-প্রকাশে, হীন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। ইহা আইনের আমলে আসে কি না তাহার বিচারক আমরা না হইতে পারি, কিন্তু ইহাতে যে বদ্ধমূল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অসম্প্রীতির ভাব আরো বাড়িয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ নারী-ধর্ষণ সংক্রান্ত সংবাদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নারীধর্ম্মের অবমাননা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে নিন্দনীয়, এবং সামাজিক শান্তি ও নারী-স্বাধীনতার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের ব্যাপারে অত্যন্ত চঞ্চল হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এবং দৃষ্টিকোণের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া কথা বলা বা কাজ করা সম্ভব ও সঙ্গত নয় কি? আমরা দেখিতে পাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকরা কোন হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করিলে — 'মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু নারী ধর্ষণ', 'মুসলমান গুণ্ডার লোমহর্ষণ অত্যাচার' ইত্যাকার শিরোনামায় সংবাদ ছাপা হয়। ইহাতে গুণ্ডার গুণ্ডামির দিকে পাঠকের যতোটুকু মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহার 'মুসলমানত্ব'র দিকে তাহার চেয়ে কম তো নয়ই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটু বেশীই দৃষ্টি পড়ে। যেখানে মুসলিম নারীর প্রতি কোন দুষ্ট হিন্দু নজর দিয়াছে কিম্বা অত্যাচার চালাইয়াছে সেখানে কিন্তু — 'হিন্দু গুণ্ডা কর্ত্তৃক মুসলিম নারী ধর্ষণ' প্রভৃতি শিরোনামায় সংবাদ ছাপা হইতে দেখা যায় না। অথবা যেখানে কোন দুষ্ট হিন্দু হিন্দু-নারীর পবিত্র দেহ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে সেখানে — 'হিন্দু গুণ্ডা কর্ত্তৃক হিন্দু নারী ধর্ষণ' ইত্যাদি ধরণের শিরোনামাও দেওয়া হয় না। কোনোখানে মুসলিম জনতা হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইলে হয়তো হেডিং দেওয়া হয় 'নিরীহ হিন্দুদের উপর মুসলমান জনতার উন্মত্ত আক্রোশ' ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করিলে শিরোনামায় মুসলমানদের নিরীহতা বা হিন্দুদের আক্রমণের ভীষণতা বা অন্যায্যতা প্রমাণের কোনো প্রয়াসই আমরা লক্ষ্য করি না। এই সমস্ত এবং এই ধরণের আরো বহু ব্যাপার একত্র সংগ্রহ করিলে দেখা যায় এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দোহাই পাড়িয়া যাঁহারা কণ্ঠ বিদীর্ণ করেন, তাঁহারা সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। আমরা বলিতে চাই যাঁহারা স্বাধীনতা দাবী করেন, তাঁহাদের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবার এবং উহার অপব্যবহার হইতে বিরত থাকিবার মতো কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জন করা উচিত। হিন্দু সাংবাদিকদের মধ্যে ইহার অভাব আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জার সহিত বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি। একথা অবশ্য বলি না যে। মুসলিম সাংবাদিকদের দোষ নাই; কেননা তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু

তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দু একটী ব্যক্তিকে আমরা জানি যাঁহারা অত্যন্ত নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া লেখনী পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত। হিন্দু সমাজে এরূপ একজন লোকেরও সন্ধান আমরা জানি না। অথচ প্রধানতঃ হিন্দু সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই সংবাদপত্রের (তথা দেশের) স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ ও ব্যস্ততা প্রকাশ করেন এবং বহু ক্ষতিও স্বীকার করিয়া থাকেন!

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা

আমাদের দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এখনো কাজে পরিণত হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে হইবে কিনা সে সম্পর্কেও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। যে দেশে শিশুদের শিক্ষারই ব্যবস্থা হয় নাই সে দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা কে করিবে?

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বিশ্বভারতীর 'লোকশিক্ষা সংসদ' এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। পরিকল্পনার ভূমিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মসচিব বলিতেছেন : "আমাদের দেশবাসী যে বুঝিতে পারিয়াছেন, পল্লীবাসী জনসাধারণেরও শিক্ষালাভের প্রয়োজন তাহা বিশেষ সুলক্ষণ বলিতে হইবে। দেশে যত লোক আছে তাহাদের সকলের শিক্ষালাভের জন্য যতগুলি স্কুল কলেজ আবশ্যক ততগুলি স্কুল কলেজ দেশে থাকিলেও সকলে শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। কারণ আমাদের দেশের লোকের অতি অল্প বয়সেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। তারপর বর্ত্তমান যুগে রাজনৈতিক চেতনায় দূর দূরান্তরের পল্লীবাসীরা এবং সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকেরাও উদ্বুদ্ধ হইতেছে। এমন অবস্থায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি যদি সমাজের শুধু উচ্চ স্তরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তবে তাহা গৌরবের কথা নহে। রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও বিস্তার করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসর মত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব্ব পর্যান্ত তাঁদের পাঠ্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত ভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হ'য়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।

দেখা যাইতেছে 'দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার' দায়িত্ব বিশ্বভারতী গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা এ সম্পর্কে দেশব্যাপী আন্দোলন করিবেন। পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থের তালিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। যথেষ্ট মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কিনা বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা ও সাধারণ জ্ঞান, পাটিগণিত, সাধারণ লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ঘরকন্নার কাজ — এ সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা তিন স্তরের ডিপ্লোমা পাইবেন — আদ্য, মধ্য ও উপাধি। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন, এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইলে এখন যাহারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না তাহারাও তাহাদের অবসর সময়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে যে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে তাহাতে সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ছাড়া তাহারা অতিরিক্ত উপার্জ্জনের ক্ষমতাও লাভ করিবে।

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর মতামত এখনো জানা যায় নাই। পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করিবার ভার শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করিলে দেশবাসীর সত্যিকারের উপকার হইত সন্দেহ নাই।

(ভাদ্র, ১৩৪৪)

স্যর মোহাম্মদ এক্‌বাল

স্যর মোহাম্মদ এক্‌বালের মৃত্যুতে সাহিত্য ও চিন্তা জগতের একটা উচ্চতম আসন শূন্য হইল। স্যর মোহাম্মদের প্রতিভা ছিল গগনচুম্বী, তাঁহার চিন্তা ছিল দেশকালের উর্দ্ধচারী, তাঁহার কাব্যসাধনা ছিল ভাবগম্ভীর বৈচিত্র্যে সুসম্পন্ন। এক্‌বাল মুসলিম ছিলেন, কিন্তু কবি ও দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন বিশ্বের ---সকল মানুষের। কবিরূপে তিনি জীবনের ব্যাখ্যাতা; আবার ভাবুক দার্শনিকরূপে তিনি সত্যের ব্যাখ্যাতা ---তর্জ্জুমান্ ই হকিকত্।

কেহ কেহ বলিয়াছেন; স্যর মোহাম্মদ এক্‌বাল জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। আমাদের মনে হয় ঃ এ-উক্তিতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। তিনি সত্যকার কবি ছিলেন; কিন্তু তরল আনন্দের উদ্বেল প্রবাহে তিনি ভাসিয়া যান নাই; জীবনের মূলসূত্র তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য্যের সৌষ্ঠব এবং স্থিরদৃষ্টির অচঞ্চল সৌন্দর্য্য হইতে কোনো দিন বিচ্যুত হয় নাই বস্তুতঃ যে-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইলে কবি শিক্ষা-গুরুরূপে বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারেন, এক্‌বালের তাহা পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল।

এক্‌বাল ইস্‌লামের সাধক ও সেবক ছিলেন। নবযুগের মুসলিম জাগরণের তিনি ছিলেন পুরোহিত। কিন্তু তাঁহার ইসলামী মনোভাব ছিল একটা গভীর জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি ; বৈদেশিক এবং স্বাদেশিক দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সেই জ্ঞানের আলোকে তিনি নবজাগ্রত ইসলামকে বিশ্বজনীন দৃষ্টির বিপুলতা দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ এক্‌বাল যতো বড়ো কবি ছিলেন, তার চেয়ে বড়ো ছিলেন দার্শনিক। হয়তো তাই। তথাপি তাঁহার রচিত কাব্যে মানুষের জন্য --মত্ততা না থাকিলেও---প্রেরণা আছে, সাধনার আনন্দ আছে, উৎকর্ষের আহ্বান আছে। এইজন্য তিনি দার্শনিক হইয়াও একজন শ্রেষ্ঠ কবি, ভাবুক হইয়াও মানবমনের একজন পরমাত্মীয়।

এক্‌বালের প্রথম জীবনের কাব্যের মধ্যে 'হিমালা', 'গুল্-ই-রঙ্গীন', 'পরিন্দে-কি-ফরিয়াদ', 'শামা ও পর্ওয়ানা' 'এক্ আরজু', 'তারানা-ই-হিন্দ', 'চান্দ্', 'কিনারী রবী' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রচনা। এগুলি সমস্তই উর্দ্দু ভাষায় রচিত এবং অত্যন্ত উপভোগ্য।

ইহার পর পার্সী ভাষার দিকে তাঁহার প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও চিন্তা আরও উৎকর্ষ লাভ করে।

ইহার পর তাঁহার চিন্তার তৃতীয় যুগ উপস্থিত হয়। এ-সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছে। পারসীভাষায় তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ রচনা এই যুগের অবদান।

এক্‌বালের 'আসরারী খুদী' 'রমুজী বিখুদী' 'পায়াম-ই-মাশ্‌রিকী' প্রভৃতি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার এই তিনখানি রচনাকে অনেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন।

এক্‌বালের কোনো কোনো গ্রন্থ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ড্ঃর নিকল্‌সনের 'আস্‌রারী খুদীর' ইংরেজী তরজমাই সমধিক প্রসিদ্ধ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে এক্‌বালের জন্ম হয়। শিয়ালকোটের স্কচ্ মিশন কলেজে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে পড়িতে যান। পরে তিনি লাহোরের ওরিয়েণ্টাল কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হন।

ইহার পর তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। জার্ম্মাণিতে গেলে মিউনিক ইউনিভারসিটী তাঁহাকে পি.এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে।

তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বিলাতে থাকিয়া তিনি ব্যারিষ্টারিও পাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণপনার জন্য তাঁহাকে 'স্যার' উপাধিভূষণে ভূষিত করা হয়।

তিনি পাঞ্জাবের পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন।

তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন।

কবি এবং দার্শনিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অসামান্য ছিল। নিজের জীবনকালে তিনি যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পসংখ্যক কবির ভাগ্যে জুটিয়া থাকে।

তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের উর্দ্ধে কাব্যসাধক ও ভাবুক এক্‌বালের সমুচ্চ আসন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে কৃষ্টিমান মানুষের

বিস্ময়মুগ্ধ শ্রদ্ধা পাইয়াছিল। সাধারণ শিক্ষিত জনগণও "সারে জাহানসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা" সঙ্গীতের কবিকে ভালোবাসিয়াছিলেন। তাই মৃত্যুর পর প্রায় বিশ সহস্র মানুষ তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিল। এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না।

এক্‌বাল গত ২/৩ বৎসর ধরিয়া কার্ডিয়াক্ য়্যাজ্‌মা রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ২১ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রিতে তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছিল। ভোর ৪ টায় তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। তখনো বিশ্বাসবলী এক্‌বাল বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি বলিতেছিলেন ঃ আমি মুসলিম, মৃত্যুকে আমার ভয় নাই। ইহার পর একটি পারসী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন; এসিয়ার—বিশ্বের একটা উজ্জ্বলতম প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল! তাঁহার শূন্য আসন পড়িয়া রহিল ; কে কবে ইহা পূর্ণ করিবে?

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

সাম্প্রদায়িক অশান্তি

সম্প্রতি ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়াছে এবং কোনো কোনো স্থানে অদ্যাপি তাহার জের চলিতেছে। ইহা বৃহত্তর দেশকল্যাণের দিক দিয়া সর্ব্বথা শোচনীয়।

কেহ কেহ বলেন ঃ ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে এরূপ হাঙ্গামা বাধিত। কিন্তু তখনকার দিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা না থাকায় এবং সংবাদ পত্রের প্রচলন না থাকায় এরূপ ব্যাপার বহুব্যাপকরূপে দেখা দিত না কিম্বা একই সময়ে দেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত না। বৃটিশ আমলেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং বহুবিস্তৃতরূপে দেখা দিবার সুযোগ পাইতেছে।

আশা করা গিয়াছিল ঃ নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেক কমিয়া যাইবে এবং কালে কালে হয়তো একেবারে লোপ পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে মনে হয় ঃ এ আশা এখনো ঢের দিন পূর্ণ হইবার নয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিলে হিন্দু বা শিখরা মুসলমানদের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইত; মুসলিমরা হিন্দু বা শিখদের উপর দোষারোপ করিত। কংগ্রেসওয়ালারা বলিতেন ঃ বিদেশী আমলাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট এদেশে নিজেদের অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণের জন্য—এবং নিজেদের মুরুব্বিয়ানা ও মা বাপগিরি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে—লোক লাগাইয়া এই সব হাঙ্গামা বাধাইতেছে; নয়তো আসলে হিন্দু শিখ বা মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধের ভাব নাই!

বর্ত্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে শেষোক্ত কথাটা বলিলে আর মানায় না। তাই এখন আর এমন কথা কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে না যে, গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতেছে। এখন বলা হইতেছে ঃ গবর্ণমেন্ট প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ বা অমনোযোগী এবং উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়েরা হাঙ্গামাকারীদের উৎসাহদাতা। বাংলা দেশের কোনো কোনো স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ হিন্দু মহাসভাওয়ালারা হক মন্ত্রিসভার উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কোনো কোনো মুসলিম নেতা এলাহাবাদ বম্বে প্রভৃতি স্থানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিসভারগুলি উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় ঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য কোনো মন্ত্রিসভা বা বিশেষ বিশেষ নেতার উপর দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। এই ধরণের অশান্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা শুধু গুণ্ডাশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গুণ্ডারা যে-কাজ হাতে-কলমে করে, বহু 'শিক্ষিত' ও 'ভদ্র' নেতা তাহা মানসিকভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মানসিকতা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনায়, সংবাদদাতাদের সংবাদ লিখিবার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এবং সভাসমিতিতে প্রদত্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতায়। ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরিয়া, কোথাও কোথাও বা পুরাতন জোরদখলী স্বত্বের তথাকথিত অধিকারের ক্ষতির আশঙ্কাকে কেন্দ্র করিয়া, এদেশে এই মানসিকতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলোচ্ছেদ না হইলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ইতি হওয়া সম্ভবপর নয়।

অনেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আলোচনা করিতে গিয়া বলেন ঃ হিন্দু মুসলিম বা শিখ সম্প্রদায়ের গুণ্ডারাই এজন্য

দায়ী, এবং গুণ্ডাদের আদর্শ দণ্ড দিলেই হাঙ্গামা নিবারিত হইবে। এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। হাঙ্গামা মারামারি গুণ্ডারাই করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা জানে ঃ তাহাদের গুণ্ডামির পশ্চাতে এক শ্রেণীর নেতার সমর্থন আছে এবং যে-উদ্দেশ্যে তাহারা গুণ্ডামি করিতেছে তাহার সাধুতা ও ন্যায্যতা সম্বন্ধে বহু নেতার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। গুণ্ডা শ্রেণী যদি জানিত ঃ তাহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে কোনো লোকের কাছেই মুখ পাইবে না, কেহই তাহাদের পক্ষে কথা কহিবে না, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি কখনই গুরুতর আকৃতি ধারণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

মসজিদে শূকর মাংস নিক্ষেপ বা মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ, মসজিদের পার্শ্বে বাদ্য বা হিন্দু মহাল্লা দিয়া মহরমের বা অন্য পর্ব্বের শোভাযাত্রা,—ইত্যাদি ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। অনেক সময় ইহা অপেক্ষা তুচ্ছতর ব্যাপার হইতেও মারামারির সূত্রপাত হইতে শুনা যায়। এই সব ঘটনা দেখিয়া দেখিয়া আমাদের সময় সময় মনে হয় ঃ দল বাঁধিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার এদেশে থাকা উচিত নয় এবং ধর্ম্মকে নিতান্তই নিভৃত ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করিবার আইনগত চেষ্টা হওয়া দরকার।

শহরবাসী বহু হিন্দুর গোমাংসে আপত্তি নাই দেখিয়াছি। তাঁহাদের মন্দির-প্রবেশে বাধা নাই, ইহাও জানি। মসজিদের পার্শ্বে মুসলিমদের নিজেদের বাদ্যে অতোখানি আপত্তি হয় না, ইহাও সাধারণ ঘটনা। কোনো হিন্দু স্ত্রীলোক যদি কোনো মুসলিমের সঙ্গে ঘরের বাহির হইয়া যায়, হিন্দুদের খুব বেশী ক্রোধ হইতে দেখা যায়; স্ত্রীলোকটী কোনো হিন্দুর সহিত বাহির হইলে ততোখানি ক্রোধের সঞ্চার হয় না। মুসলিম আমলে যদি কোনো মন্দির মসজিদে পরিণত হইয়া থাকে তাহা হিন্দুরা ফিরাইয়া চাহিবে না, কেননা তাহা মুসলিম স্পর্শে কুলষিত হইয়াছে। মুসলিমরা মানুষকে এতোখানি অপবিত্র ভাবে না, এইজন্য শহীদগঞ্জের মসজিদটীকে ফিরাইয়া চাহিতেছে। শিখরা দিতে অস্বীকার করিতেছে। যদি হিন্দুরা উহাকে মন্দির ভাবিয়া ফিরাইয়া চাহিত, তাহা হইলেও দিতে অস্বীকার করিত। যদি উহাকে গুরুদ্বার ভাবিয়া শিখরা মুসলিম দখলিকারদের কাছে ফেরত দিবার আবেদন জানাইত, তাহাও অগ্রাহ্য হইত। অর্থাৎ হিন্দুর অপরাধ হিন্দুর কাছে, মুসলিমের অপরাধ মুসলিমের কাছে, শিখের অপরাধ শিখের কাছে ততো ভয়ানক নয়, যতো অন্যের কাছে।

এইরূপ মানসিক বিকৃতি এদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূলে প্রবলরূপে ক্রিয়াশীল। দল বাঁধিয়া ধর্ম্মক্রিয়া পালন করিবার অধিকার থাকাতে এইরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিবার সুযোগ হইয়াছে, আমাদের সন্দেহ হয় একথাটা হয়তো একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

বর্ত্তমান প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর দোষারোপ করিয়া কোনো লাভ নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের যদি দাঙ্গা করিবার প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে, কোনো গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নাই তাহা নিবারণ করিতে পারেন। দাঙ্গা বাধিবার পর পুলিস বা ফৌজ পাঠানো যাইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক স্থানে পাহারা দিবার মতো সংখ্যাধিক্য তাহাদেরও নাই।

এ-অবস্থায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির মূলে যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সর্ব্বদা সক্রিয়, তাহার নিরাকরণ কি উপায়ে হইতে পারে ভাবিয়া দেখা উচিত।

হিন্দু মুসলিম শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির কারণ যদি বিলুপ্ত করা যায়, ইহারা সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইতে পারে। তাহা করিবার উপায় কি? একশ্রেণীর ভাবুকরা বলেন ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কৃষ্টি ও সভ্যতার উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রের হামানদিস্তায় কুটিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারিলে কাজ হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রই যে এখন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের হাতে! সুতরাং একাজ হইবে না; সুতরাং—ঐসব ভাবুকের সিদ্ধান্ত অনুসারে—হিন্দু মুসলিম প্রভৃতি এক হইবে না; সুতরাং হাঙ্গামা বাধিবার কারণও বহুদিন বিলুপ্ত হইবে না।

অতএব সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা উহা নিবারণ সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে আরো কিছুদিন আমাদের মনোযোগ দিয়া দেখিতে হইবে।

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

নির্বাচিত বুলবুল

সূচিপত্র